দেবেশ দাশ

দেবেশ দাশ রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

দেবেশচন্দ্র দাশ ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি

তাপসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সময় এসেছিল যখন রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বেশ কয়েকজন আই.সি.এস. সাহিত্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, দেবেশচন্দ্র দাশ, নবগোপাল দাস প্রভৃতি। এঁরা সকলেই আজ প্রয়াত। সালের ৩১শে জুলাই দেবেশচন্দ্র দাশ লন্ডনে পরলোক গমন করেন।

পূর্ববঙ্গের নদী মেঘনার উদাস বালুচর—কোথাও কালো জল। তার কাছেই অধুনা কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রাম। সেখানেই তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটে। দেবেশচন্দ্রের পিতা গোপালচন্দ্র দাশ এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর তিনি ঢাকা হাইকোর্টে যোগদান করেন। ফজলুল হক সাহেবের পর তিনি ঢাকা হাইকোর্ট বার-এর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন।

পিতা যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন তখন ১৯১১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দেবেশচন্দ্র কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় শ্রীম-র স্কুলে ছাত্র ছিলেন। মেধাবী ছাত্র। সব পরীক্ষায় বৃত্তিভোগী। প্রতি রবিবার শ্রীম-র স্কুলে সৎপ্রসঙ্গ সভায় পৃথিবীর সব মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা হ'ত। পূর্ব বাংলার মেঘনা নদী তীরের এই দুরন্ত ছাত্রকে আকর্ষণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সমাজের লোকাচারের বাধা না মেনে অস্পৃশ্যদের নাইট স্কুলে পড়াতে গেলেন। উত্তরবঙ্গের বন্যায় স্বেচ্ছাসেবক হলেন। ছাত্রসভ্য হলেন সে যুগের নিষ্ঠাবান খদ্দরধারী ভারত সেবাশ্রম সংঘের।

সংঘের পিছনে সেকালের পুলিশের কৃপাদৃষ্টি ছিল। সেখানকার একজন সভ্যের কি বিলেতে উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের যন্ত্র আই.সি.এস. হওয়া উচিত হবে? মনে প্রচণ্ড সংশয়। সব সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন শ্রীম। তিনিই ১৯ বছর বয়সের তপ্তরক্ত এই তরুণকে বোঝালেন, যে অসামান্য মেধা দেখিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন, তা দিয়ে ইংরেজকেও হারাতে পারলে দেশেরই মান বাড়ানো হবে। অন্তত একজন ইংরেজকেও আই.সি.এস. পরীক্ষায় হারিয়ে দিয়ে নিজে ঢুকতে পারলে গরিব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে থেকে যাবে। স্বামীজীর শিক্ষা মনে রেখে আই.সি.এস. চাকরিতে ঢুকলে দেশের সেবা করার যে সুযোগ আসবে তা অবহেলার বস্তু নয়। তাই প্রথম খদ্দর ছেড়ে অন্য কাপড় পরে তিনি পুলিশ কমিশনারের অফিসে পাশপোর্ট নিতে চললেন।

সচ্ছল পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি পিতার অর্থে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত যেতে রাজি হলেন না। নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে টাটার বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেলেন। পরে নিজের উপার্জন থেকে সে অর্থ তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির পদপ্রান্তে বসে নতুনভাবে নিজের দেশকে চিনলেন।

১৯৩০-এর দশকে আই.সি.এস. পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেবেশচন্দ্র বিলেতে গেলেন। পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে তিনি ব্যারিস্টার হবেন বলে স্থির করেন। তাই তিনি একটি ইনস্ অব কোর্টে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। ব্যারিস্টারি পড়ার খরচ অবশ্য তিনি পিতার কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

বিলেতে যাবার সময়ে ইউনিভার্সিটির টার্মের ছুটিতে আর সব ভারতীয় ছাত্র যখন টমাস কুকের তৈরি প্রোগ্রাম নিয়ে প্যারিস-বার্লিন দেখতে যান, তখন দেবেশচন্দ্র পায়ে হেঁটে বোঁচকা পিঠে গ্রামে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে সারা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের অধিকাংশ দেখে বেড়াতেন। বহু জায়গায় তিনি ঘুরেছেন যেখানে আগে কোনও ভারতীয়ই যাননি। পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনার মধ্যে যে দুঃসাহসী স্বপ্নদ্রষ্টা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি তার উৎস এইখানেই।

'বিদেশে তিনি দুই আঁখি মেলে অনেক কিছু শেখার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। কোনও কিছু ছাড়েন নি। এ সম্বন্ধে একটা মজার কথা তাঁর ভাষাতেই বলি :

"আই. সি. এস. পরীক্ষার পরে Youth Hostel Movement-এর সভ্য হয়ে প্রায় নিখরচায় Scotland-এ

দুর্গম হাইল্যান্ডসের পার্বত্য অঞ্চলে গেলাম, সামান্য গ্রাম্য কুটিরে রাত্রিবাস। বিছানা খড়ের গাদা, কম্বল মোট তিন খানা, ভাড়া রাত্রি প্রতি মাত্র এক শিলিং। খাওয়া-দাওয়া নিজের ব্যবস্থা অর্থাৎ ডিম সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, আর চাল সিদ্ধ। হায়! এত করেও মাসের শেষের দিকে লন্ডনে ফিরে এলাম খালি হাত নিয়ে। মাস শেষ না হলে টাটার বৃত্তি আসবে না। সেপ্টেম্বরের শীতের রাত, পকেটে মাত্র নয়টি পেনি। পথের পাশে তাব্বা থেকে সাত পেনি দিয়ে কাগজে মোড়া এক প্যাকেট ফ্রায়েড ফিশ ও চীপস্ কিনলাম। বাকি দু পেনিতে হয় এক কাপ চা, না হয় একটি কলা। তৃষ্ণা মেটানো যাবে জলে, কিন্তু কলা না হলে তো পেট মানবে না। অতএব তাই নিয়ে রাত্রে ঘরে ফিরে এসে রাজকীয় এই ডিনার সারলাম। শেষ করে মনে হল, ঘরে ঢুকবার সময় একটি টেলিগ্রাম পড়ে আছে দেখেছিলাম। উদাসীন ক্লান্ত হাতে, টেলিগ্রামটি খুলে দেখি Her Majesty's Government থেকে আমন্ত্রণ—ভারত সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আই.সি.এস. চাকুরি দেবীর সঙ্গে আমার শুভ পরিণয়।

"সুদূর দুর্গম মেঘনার গ্রাম। গ্রাম্য অঞ্চল থেকে অখ্যাত জায়গা তার নাম বাজিতপুর। সেই বাজিতপুর থেকে বাকিংহাম প্যালেস। সেখানে কমনওয়েলথ্ কুইন ম্যাজেস্টির কাছে আমাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করে সমর্পণ করার পরিচয় করিয়ে দেওয়া, সেটা কি কম কথা হল! কাজেই সেভাবেই দেখি। যে শনৈঃ পর্বতঃ লঙ্ঘনম্ যাঁর কৃপায় হয়েছে তাঁদের আজকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি।"

আই.এ. ক্লাসে পড়ার সময় থেকে দেবেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা শুরু। তার আগে তিনি কলকাতার বাইরে বেড়াতে যাবার কোনও সুযোগ পাননি। আই.এ. পাস করার পর তাঁর বাবার সঙ্গে ছুটি কাটাবার জন্য তিনি শিলংয়ে বেড়াতে যান। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি শিলং এবং আসামের অন্যান্য জায়গায় ভ্রমণের কাহিনী লিখে ফেললেন। লেখাটার নাম দিলেন 'ভ্রমণস্মৃতি'। মাসিক 'বিচিত্রা' তিনি নিয়মিতভাবে পড়তেন। তাতে প্রতি মাসেই রবীন্দ্রনাথের লেখা থাকত। নিজের লেখাটি নিয়ে তিনি 'বিচিত্রা'র অফিসে গেলেন। পত্রিকার তখনকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি চিনতেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করে লেখাটা এগিয়ে দিলেন। উপেনবাবু হেসে বললেন 'খোকা, তুমি আমার কাছে লেখা নিয়ে এসেছ; জান, 'বিচিত্রা' কী ধরনের পত্রিকা?' দেবেশচন্দ্র বললেন, 'সেই জন্যই তো নিয়ে এলাম। যদি যোগ্য হয় তা হলে ছাপাবেন; তা না হলে ছাপাবেন না।' উপেনবাবু বললেন : 'ছাপা না হলে মনে কোনও কষ্ট পাবে না তো?' দেবেশচন্দ্র উত্তর দিলেন : 'না'। উপেনবাবু তখন বললেন : 'সাত দিন পরে এসো।'

সাত দিন পর দেবেশচন্দ্র 'বিচিত্রা'র অফিসে গেলেন। উপেনবাবু হেসে বললেন : 'খোকা, তোমাকে আর খোকা বলে ডাকবো না। তোমার অনেক বয়স হয়েছে। তোমার লেখা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি।' দেবেশচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন : 'বয়স হয়েছে! আমার তো দাড়ি-গোঁফও গজায়নি।' উপেনবাবু বললেন : 'তোমার মনের বয়স অনেক হয়েছে। পরিণত লেখা লিখেছ। আরও লেখো। কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, আমার পত্রিকার নিয়ম অনুযায়ী ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে ছবি ছাপা হয়। ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকখানা ছবি জোগাড় করে আনতে পারবে?'

দেবেশচন্দ্র বাড়ি বাড়ি ঘুরে শিলং ও চেরাপুঞ্জির ছবি নিয়ে এলেন। লেখাটি যথাসময়ে 'বিচিত্রা'-য় ছাপা হয়েছিল।

এর কয়েক বছর পর দেবেশচন্দ্র দেশে ফিরলেন আই.সি.এস. হয়ে। চাকরিতে ঢুকলেন। প্রথমেই গেলেন আসামে। সেখানে বনে-পাহাড়ে আদিম জাতিদের মধ্যে তেমন কিছু কাজ না থাকলেও ঘুরে বেড়াতেন। বাঘ বা হাতি রাতে হামলা করতে পারে। তাই তাঁবুর চারিদিক ঘিরে আগুনের বেড়াজাল দেওয়া হয়েছে শীতের রাতে। সেখানে আগুন পোয়াতে পোয়াতে পাহারা দিচ্ছে গারো, কুকি, রাভা, কাছাড়ীরা। তাঁবুতে না ঘুমিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়তেন তরুণ এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সন্ধানে। সেই বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বসে লিখলেন 'ইয়োরোপা'।

'ইয়োরোপা'-র কয়েকটি লেখা নিয়ে দেবেশচন্দ্র উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে বললেন : 'আমি লেখা এনেছি আপনার জন্য।' উপেনবাবু বললেন : 'আরে, তুমি তো এখন আই.সি.এস.।' দেবেশচন্দ্র বললেন 'হ্যাঁ, তবে এখন। যখন ছিলাম না তখন তো লেখা নিয়েছেন।' উপেনবাবু বললেন : 'হ্যাঁ, তখন বুঝেছিলাম তোমার মধ্যে আগুন আছে। এখন নিশ্চয় সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছ।' নির্বিকারভাবে দেবেশচন্দ্র বললেন : 'সেটা আপনি বিচার করে দেখুন।'

যথাসময়ে লেখাগুলি 'বিচিত্রা'য় ও 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু কোনও প্রকাশকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না বলে লেখাগুলি বই হিসেবে প্রকাশিত হবে বলে দেবেশচন্দ্র আশা করেননি। তাঁর ছাত্রজীবনের শিক্ষক শ্রীজগৎচরণ দাস নোটবই লিখে বেশ নাম করেছিলেন। সেই সুবাদে প্রকাশকদের সঙ্গে তাঁর খুব খাতির ছিল। 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত লেখাগুলি বই হিসেবে প্রকাশের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য দেবেশচন্দ্র জগৎবাবুকে অনুরোধ করেন। জগৎবাবু বলেন, তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। কিছুকালপর জগৎবাবুর উদ্যোগে সেন ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি তাঁর বইটি প্রকাশ করে। খুব ভালো কাগজে অনেক ছবি দিয়ে বইটি তারা প্রকাশ করেছিল ১৯৪০ সালে। এই বই দেবেশচন্দ্রকে মুক্তমনের অধিকারী ও সংবেদনশীল সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করে।

বইটি প্রকাশিত হবার পর দেবেশচন্দ্র একটি কপি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কবি তখন অসুস্থ। কিছুকাল আগে তাঁর দেহে একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাই বই সম্পর্কে কবির কোনও অভিমত চাওয়ার সাহস তাঁর হয়নি। বই-এর সঙ্গে পাঠানো চিঠিতে তিনি শুধু লিখেছিলেন 'আপনি যদি পড়ার সময় পান তো আমি সুখী হবো।' তারপর একদিন শান্তিনিকেতন থেকে কবির কম্পিত হস্তে লেখা একটি চিঠি এসে হাজির হলো। তারিখবিহীন এই চিঠিতে কবি লিখেছেন :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তোমার য়ুরোপা পড়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের অনেক লেখকের মতো তুমি য়ুরোপকে খর্ব করবার চেষ্টা করো নি। তুমি তার মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছ — দৃষ্টিতে প্রসন্নতা না থাকলে কোনো সুদূর নূতন দেশকে সত্য করে দেখতে পাওয়া যায় না। তুমি সেই দৃষ্টি দিয়ে য়ুরোপকে দেখেছ এবং সেই আনন্দ পাঠকদের বিতরণ করেছ। আমার দুর্বল দেহে অধিক লিখতে সয় না। ইতি

রবীন্দ্রনাথ

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) বইটির পরিচয় লেখেন। তাঁর কথায়, "লেখকের সঙ্গে যদি আমার পরিচয় না হত তবে 'ইয়োরোপা' পড়ে মনে করতুম যে গ্রন্থকার বহুদিন সাহিত্যচর্চা করেছেন, আর বর্তমান বইখানি তাঁর পরিণত বয়সের পরিপক্ক রচনা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপে জানলুম যে এইটিই তাঁর প্রথম উদ্যম এবং প্রবীণ হতে তাঁর এখনও বিস্তর দেরি আছে। অতএব অনুমান করছি—তিনি শুকদেবের মতন পূর্বসংস্কার নিয়ে জন্মেছেন অথবা শিশুকাল থেকেই মনে মনে হাত পাকিয়েছেন। 'ইয়োরোপা'র প্রথমেই নজরে পড়ে—ভাষার ঝরঝরে প্রকাশভঙ্গি, যাতে কোনওরকম কৃত্রিমতা মুদ্রাদোষ বা উৎকট মৌলিকতার চেষ্টা নেই। এ ভাষা খাঁটি বাংলা, ইংরেজি ইডিয়মের ভেজালে জাত হারায়নি। অথচ এতে অসাধারণ লক্ষণ সুস্পষ্ট। লেখক আবশ্যকস্থলে নূতন শব্দ গঠন করেছেন, নতুনভাবে বাক্য বিন্যাস করেছেন, কিন্তু সে সমস্তই বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে অবিরোধে খাপ খেয়ে গেছে; বইখানি মামুলী ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়। ইউরোপের গির্জা, মঠ, দুর্গ, সেতু, প্রাসাদ, চিত্রশালাদির বর্ণনা এর মুখ্য বিষয় নয়। ইউরোপ কত উঁচুতে আর আমরা কত নিচে পড়ে আছি, এরকম বিলাপও এতে নেই। লেখকের কৃতিত্ব এই—তিনি ইউরোপের যে বৈচিত্র্য দেখে নিজে মুগ্ধ হয়েছেন, তার রস লেখার প্রভাবে পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। ইউরোপীয় প্রকৃতির যে রূপ লেখক বাহ্য ও অন্তরদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন তা শুধু নিসর্গশোভা নয়, ঐতিহ্য মানবপ্রকৃতি জাতীয় সাধনা সবই তার অন্তর্ভুক্ত। তীর্থযাত্রী স্পেশাল ট্রেনের মতন তিনি পাঠকের টিকি ধরে বিশ দিনে বিলাত ঘুরিয়ে

আনেননি। এই পুস্তকে যে চিত্রপরম্পরা দেখতে পাই তা সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত, কিন্তু জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ইউরোপ দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু 'ইয়োরোপা' পড়ে মনে হয়েছে মনশ্চক্ষুতে দেখছি।"

একটি চিঠিতে দিলীপকুমার রায় লিখলেন, "তুমি বুঝতে পেরেছ ওদের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার প্রাণের কথাটি। ...ইয়োরোপা বইটি যদি শুধু একটুখানি উপাদেয় চমক পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হত তাহলে এটি কেবল belles letters জাতীয় লেখা হত। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য ওদেশের সঙ্গে এদেশের ঘটকালি করা শুধু আনন্দের অন্নসত্রে নয়, জ্ঞানের যজ্ঞসত্রেও বটে।"

খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখলেন, "ইউরোপকে নতুন করিয়া দেখিলাম। ...দুর্লভ মনীষা ও চিন্তাশীলতার ছাপ পড়িয়াছে।" সোমনাথ মৈত্র-র মন্তব্য, "লেখকের আছে দেখবার চোখ, জানবার উৎসাহ, যাচিয়ে নেবার বুদ্ধি আর সবার উপরে সেই দুর্লভ চিত্ত যা শুধু জিজ্ঞাসু নয়, যা গ্রহণীয় জিনিস শ্রদ্ধা ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে জানে। ...ইউরোপের প্রাণের স্পন্দন তিনি আপন প্রাণের ভিতরে পেয়েছেন।"

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখলেন, "কখনও বা বনি প্রিন্স চার্লি এবং সুন্দরী কুইন মেরী তাদের অপরূপত্বে চমক লাগিয়ে চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে। এবং সেই সময়ের মধ্যে অনুভব করি ইউরোপের চিত্তের এবং আত্মার সানন্দ স্পন্দন।" যাযাবরের ভাষায়, "পুঁথি ছাড়াও পথে বিচরণ করেছেন এবং ইউরোপকে তিনি শুধু পথিকের দৃষ্টিতে না দেখে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ...শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টির পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।"

এইভাবে প্রথম আবির্ভাবেই দেবেশচন্দ্র বাণীর বরপুত্রদের কাছে সমাদর পেলেন এবং আমৃত্যু বঙ্গ-বাণীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখলেন। বইখানি যে বিদগ্ধ মহলের সমাদর পেয়েছিল, তার প্রমাণ ১৩৪৭ থেকে ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে ন'টি মুদ্রণ হয়েছিল।

আর "ইয়োরোপা" সম্বন্ধে লেখকের নিজের মন্তব্য কি ছিল সেকথা বলেই এ-প্রসঙ্গ শেষ করব। "আমি যখন প্রথম 'ইয়োরোপা' লিখতে শুরু করি তখন বিরাট ব্রহ্মপুত্র নদীতে দারুণ বন্যা হয়েছিল এবং আমি বন্যার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। একটি স্টিমারে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। স্টিমারটির নাম ছিল 'এস্.এস্.চিত্রালী।' নামটি অত্যন্ত সুন্দর, স্টিমারটিও খুব সুন্দর এবং আমি যে বিষয়ে লিখছিলাম তার তুলনা নেই এই পৃথিবীতে। 'চিত্রালী'তে বসে আমি চিত্রময় ইয়োরোপের বিচিত্ররূপ বর্ণনা করে যেতাম।" 'ইয়োরোপা'র বাকী লেখাগুলি তিনি আসামের শ্যাম শৈলমালার ছায়ায় নির্জন তাঁবুতে বা দুর্গম গ্রামে বসে কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে লিখেছেন। 'ইয়োরোপা'য় তিনি রোমান্টিক কাহিনী, অন্তরের কাহিনী, ভালোবাসার কাহিনী, বিদেশী ও বিদেশ সম্বন্ধে এবং বিদেশী মন নিয়ে খেলার কথা লিখেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "কলসী কাঁখে নিয়ে ইউরোপের ঘাটে ঘাটে, স্রোতে স্রোতে জল তুলে বেড়াচ্ছি এবং সে জল বাঙালি পাঠকদের পরিবেশন করছি। এতো ভালো লেগেছিল!"

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় বই 'রাজোয়ারা'। এই বইটি লেখার পটভূমিকা দেবেশবাবু বর্ণনা করেছিলেন লন্ডনে এক সাক্ষাৎকারে। 'ইয়োরোপা' লেখার পরে এক যুগেরও অধিককাল পেরিয়ে গেছে। একদিন নয়া দিল্লির একটি পার্কে পায়চারি করার সময় তাঁর স্ত্রী কমল দাশ বললেন, "'ইয়োরোপা' লিখে তিনি নাম করেছিলেন। তারপর তিনি আর লিখছেন না কেন?"

দেবেশ দাশ বললেন, তাঁর লেখার ক্ষমতা বোধহয় হারিয়ে গিয়েছে।

কমল দাশ বললেন, তাঁর ভেতরে ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি লিখেছেন; বাইরের কোনও আকর্ষণে তিনি লেখেন নি। কাজেই তিনি আবার লিখতে বসলেই লিখতে পারবেন।

'রাজোয়ারা'র খসড়া দেখে কমল দাশ একটু নিরুৎসাহ হলেন। বললেন : "আমি চেয়েছিলাম তুমি কোনও উপন্যাস বা কাহিনী লেখ; আবার 'ইয়োরোপা'র মতো রম্যরচনা লেখ, সেটা আমি প্রত্যাশা করিনি।"

দেবেশ দাশ হেসে বললেন : "ইয়োরোপা একটি ভ্রমণকাহিনী নিশ্চয়ই; শুধু ভাষার প্রসাদে ও ভাবের প্রভাবে রম্যরচনায় পরিণত হয়েছে বলা যায়। 'রাজোয়ারা'ও তাই, শুধু পটভূমিকা ভিন্ন—এই যা।"

কমল দাশ এই যুক্তি মানলেন না। বললেন, "না, তা নয়। তুমি তখন মন নিয়ে লীলা করেছ, এখন তোমায় মানুষ নিয়ে খেলা করতে হবে। মহাযুদ্ধের এত বড় একটা অভিজ্ঞতা, এত বছরের কান্না-হাসির দোলা দেখলে, এখন তোমার কাছে নতুন জিনিস প্রত্যাশা করব।"

দেবেশ দাশ বললেন : "আরও খুলে বল; মনে হচ্ছে তোমার মনেও ঢেউ লেগেছে। কমল সায়রের

বুকে ঢেউ জেগেছে; কমলকলির লীলা সেই তরঙ্গে নতুন রূপ পাবে মনে হচ্ছে।"

কমল দাশ হাসলেন। বললেন : "তবে তোমার ভাষাতেই বলি, তুমি মন থেকে মানুষে নেমে এস; সরে আসতে নয়, ছেড়ে দিতে নয়—শুধু মানসের বাসর থেকে বেরিয়ে এসে সংসারেই আসর পাত।"

দেবেশ দাশ বললেন : "এত বছর তো গেল, যুদ্ধের হানাহানি আর হাহাকারের মধ্য দিয়ে, তারপর দেশ স্বাধীন হওয়া আর নতুন সংবিধানের টানা-হ্যাঁচড়া নিয়ে। মানুষের মনকে পেলাম কোথায়? সংসারাতীতের সন্ধান পাব কোথায়?"

কমল দাশ হাসলেন। বললেন : "চারদিকে ছড়ানো দেখবে, শুধু চোখ মেলে রাখ। এই ধরো, সেদিন ইন্ডিয়া গেটে মাঠের মধ্যে যখন আমরা বসেছিলাম একটি রাজস্থানী রূপসী বিরাট মোটরে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে এলো একটি ছেলে সাধারণ সাইকেলে চড়ে। তাদের নিভৃত কথাবার্তা আমরা অনেকখানিই শুনতে পেয়েছিলাম। রাজস্থানে প্রেমের অসহায়তা, অন্তঃপুরের প্রেম-বাসনার ব্যর্থতা, আধুনিকতা ও আভিজাত্যের বিরোধ অনেক কিছুরই আঁচ পেলাম। তার মধ্য দিয়ে রাজস্থান যাত্রার সন্ধানী আলো খুঁজে দেখ না কেন। সুন্দর পটভূমিকা হবে।"

হলোও তাই। রাজোয়ারায় যাওয়ার উপক্রমণিকা হলো ওইভাবেই। সেই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ই বুঝিয়ে দিল যে শুধু যুদ্ধ ও সংঘাত নয়, বিরোধ ও রক্তপাত নয়, আরও অনেক কিছু সেখানে আছে। শুধু জলসাঘর নয়, শুধু দেহলীলা নয়, রাওয়ালার অন্তঃপুরের যে-বেদনা, যে-বাসনা বন্দী হয়ে আছে, তাকে সংসারাতীত ভাবে প্রকাশ করা দরকার।

ঐ বছরই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হয় রাজস্থানের জয়পুরে। অধিবেশনের শেষে মেওয়ার-এর (উদয়পুর) মহারাণা অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের চিতোর ও উদয়পুর সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান। উদয়পুরের রাজদরবারে মহারাণা রাজস্থান সম্পর্কিত 'রাজোয়ারা' বইটির জন্য দেবেশচন্দ্রকে ১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের যুদ্ধে সম্রাট আকবরের মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত মহারাণা প্রতাপ সিং-এর ঢাল ও তলোয়ার উপহার দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। বইটির হিন্দি সংস্করণ মহারাণা পড়েছিলেন। প্রসঙ্গত ১৯৯৫ সালের উনিশে সেপ্টেম্বর এই ঢাল ও তলোয়ার দেবেশচন্দ্র দিয়ে দেন ভারতীয় যাদুঘরকে। শারীরিক কারণে উনি নিজে আসতে পারেননি। কন্যা অনুরাধাকে পাঠিয়েছিলেন। একটি মনোরম সভায় এ দু'টি দেওয়া হয়, এবং তখনকার রাজ্যপাল শ্রী রঘুনাথ রেড্ডি অনুরাধার কাছ থেকে এই ঐতিহাসিক জিনিস দুটি গ্রহণ করেন।

দেবেশচন্দ্রের এই ঢাল-তলোয়ার উপহার পাওয়া নিয়ে একটি মজার ঘটনা 'মিত্র ও ঘোষ'-এর শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে শোনা যায়। উপহার পাবার কিছুদিন পরে দেবেশচন্দ্র মিত্র ও ঘোষ-এর আড্ডায় গেছেন। ওখানে তখন অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যিকের সঙ্গে ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। বিশীমশায় ওঁর অনন্য ভঙ্গিতে দেবেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, যার ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, তার নাম তো আমরা জানি। কিন্তু, যার আছে, তার নাম কি?' সকলের মধ্যে হাসির রোল উঠল, দেবেশবাবুও যোগ দিলেন।

'রাজোয়ারা'ও সাহিত্যিক মহলে এবং পাঠকদের কাছে খুব সমাদর পেলো। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) লিখলেন, "শ্রীযুক্ত দাশ যেন বাঙালির প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক দূত হয়ে রাজস্থান ভ্রমণ করেছেন এবং তারই বৃত্তান্ত মনোরম ভাষায় লিখেছেন। ...বর্তমান রাজস্থানের নিবিড় পরিচয় পাচ্ছি। 'রাজোয়ারা' গল্পের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, এতে রাজপুত নরনারীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।" প্রবোধকুমার সান্যাল 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় লিখলেন, "অনন্যসাধারণ দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পেলুম....বঙ্গসাহিত্যের একটি অভিনব সম্পদ...তিনি সমগ্র রাজোয়ারার প্রাণ-মন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশ করেছেন...প্রত্যেকটি কাহিনী তার নিজস্ব রসব্যঞ্জনা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। ...ভাষা রচনায় যেমন অস্ত্র ঝঞ্ঝনার আওয়াজ শুনেছি বাক্য প্রয়োগে তেমনি সার্থক লেখকের সুকুমার লেখনী সঞ্চালন।" 'দেশ' পত্রিকায় বেরুলো, "রাজোয়ারার লেখকের অবদানে বাঙালির অন্তর ধর্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ...ভারতের সংহতির মূল সূত্রটি তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন। বাঙলায় সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিনব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।" 'আনন্দবাজার'-এর ভাষায়, "রাজস্থানের বেদনাকরুণ ঐশ্বর্যময় দ্বিপ্রহরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-তে বলা হল, "পেলাম ব্যাপক অনুভব, বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, ওজস্বী মেধা আর রসসমৃদ্ধি। বর্ণনা-শৈলীর আকর্ষণ সম্মোহক। এ তো রচনা নয়, তপস্যা।"

১৯৫৪ সালে প্রকাশ হল "রোম থেকে রমনা", এবং ছ'বছরের মধ্যে আরও তিনটি পুনর্মুদ্রণ। বাংলা ছোট গল্প যে প্রথম শ্রেণীর সম্মানের অধিকারী, তা প্রথমবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল—এই বইটির মাধ্যমে। জার্মানীর একটি বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা এক বিশেষ সংখ্যায় এই গল্পকে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত জুয়ান হিমনেজ, মাইকেল শলোকভ, আর্নল্ড জাইগ, আর্থার লান্ডকুইর্স্ট প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের রচনারও আগে সম্মানজনক সর্বপ্রথম স্থান দিয়েছে এবং পত্রিকার কভারে বিশেষ উল্লেখ করেছে। লেখক-পরিচিতিতে জার্মানীর সম্মিলিত সম্পাদকমণ্ডলী লিখেছেন যে দেবেশ দাশের ছোট গল্প ভারতীয় সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃততর করে দিয়েছে এবং পৃথিবীকে ভারতের দুয়ারে এনে দিচ্ছে। তাঁর রচনায় ভারতীয় সাহিত্যিকদের পক্ষে সুদুর্লভ একটি গুণ আছে।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে এই বই সম্বন্ধে তারাশঙ্কর বললেন, এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে; রচনাধর্মে রচনাভঙ্গিতে বীরবলের চার ইয়ারী রচনাশৈলীর সমধর্মী এই বইয়ে রোম থেকে রমনা পর্যন্ত তরুণ খুঁজছে তরুণীকে, তরুণী খুঁজছে তরুণকে, পেয়ে হারাচ্ছে; দুঃখ বেদনা ফুল হয়ে ফুটছে। সেই ফুলে ফুলে ভরা জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা সন্ধানী লেখক পেয়েছেন তার বিশ্বপথিক সাহিত্যমানসে। শুধু ঘটনা সৃষ্টি বা হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে নয়, বৃহত্তর বাঙালি চরিত্রের বন্দনায় এই গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ (যুগান্তর) এবং চিত্রাঙ্কনী শক্তিতে সার্থক (প্রবাসী)। প্রত্যেকটি গল্পেই একটি নতুন আঙ্গিকের ছাপ পাওয়া যায় (আনন্দবাজার)। শুধু নামকরণের বৈচিত্র্যেই নয়, বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্বে ও সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে সমুজ্জ্বল (মাসিক বসুমতী)। এই গল্পগুলিতেও প্রেম বিবাহ রোমান্টিক দৃষ্টি ও বাস্তবজীবন সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য আছে তা আজকার যে কোন লেখকের লেখনীকে গৌরবান্বিত করতে পারত (কথাসাহিত্যে শ্রী প্রমথনাথ বিশী)।

বিশ্ব জুড়ে জীবনসুধার তলানিটুকু পর্যন্ত চেখে দেখেছে এই বইয়ের নায়ক-নায়িকারা; কিন্তু এই দেশেরই মাটিতে তাদের নাড়ীর টান (অমৃতবাজার পত্রিকা)। একটা নতুন স্বাদ, একটা নতুন আকাশ তারা এনে দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। পৃথিবীকে তারা মেলে ধরল আমাদেরই ঘরের দুয়ারে (হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড)। তার নূতনত্বের চমক ও লাস্য কল্পনাকেও হার মানায় (ভারতবর্ষ)।

তাই সেই বিশ্বও—যাকে লেখক মুখোমুখি দেখেছেন, "কল্কি"—সর্বাধিক প্রচারিত তামিল সাহিত্য পত্রিকা—আদর করেছে 'রোম থেকে রমনা'কে। সুদূর মাদ্রাজে বইটির তামিল অনুবাদের ভূমিকায় তামিল সাহিত্যিক সংঘের সভাপতি শ্রীদেবন্ শ্রীরাজাগোপালাচারীর হয়ে লিখলেন যে এই গল্পগুলি পড়ে আমরা উল্লসিত হয়েছি, নিঃসন্দেহে প্রমাণ পেয়েছি যে ভারতীয় ছোট গল্প পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সমান স্তরে উঠে গেছে। গুজরাটি ও সিংহলী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এই গল্পগুলি; হয়েছে ইংরাজিতে। বর্মী আর কানাড়া ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছে। আর হিন্দিতে আত্মপ্রকাশ করল মস্কো থেকে মাড়বার নামে।

জার্মানীর একটি উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্র জাইস্ট উন্ড জাইট (Zeist Und Zeit) -এর সম্পাদক লিখলেন, "একটি ছোট গল্প 'রোম থেকে রমনা'। যেসব প্রতীচ্য পাঠক ভারতবর্ষের জীবনধারা, সামাজিক প্রথা এবং আচার-আচরণের সহিত মোটেই পরিচিত নয়, লেখকের লেখার গুণে তাহাদের পক্ষেও গল্পটির রসগ্রহণে বাধা লাগিবে না। গত মহাযুদ্ধের পর রোমের দুর্দশা এবং ভারত-বিভাগের পর উদ্বাস্তুদের অবস্থা একান্ত নৈপুণ্যে একই গল্পের সূত্রে বিজড়িত করিয়া লেখক যে করুণ সহানুভূতি সঞ্জাত রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অন্য প্রকারে সম্ভব হইত না।"

১৯৫৪-তেই আর একখানি বই প্রকাশ হল "অর্ধেক মানবী তুমি," বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটি খুব প্রশংসা পেল। 'দেশ' লিখল, "আধুনিক সমাজের তরুণ-তরুণীদের অবলম্বন করিয়া লিখিত। ....ব্যঙ্গের সঙ্গে রঙ্গও আছে...রস এখানে প্রমূর্ত, দীপ্ত। এ রচনায় বুদ্ধির প্রাচুর্য আছে। ...রসানুভাবনার পথে নারীর বন্দনা করিয়াছেন। ...আচার ব্যবহার, ভাষায় এবং রীতিনীতিতে বৈদেশিক অনুকরণের মোহের উপর সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বান বর্ষণ করিয়াছেন।" বাংলা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যঙ্গ উপন্যাস। ...বাঙালির চারিত্রিক ও সামাজিক জীবনের দুর্বলতাগুলিকে দুঃসাহসীভাবে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গ করেছেন। লেখার গুণে আগাগোড়াই ব্যঙ্গ বিদ্রূপগুলি বেশ উপভোগ্যভাবে জাতীয় জীবনকে বাস্তব আলোকে উদঘাটিত করে তুলেছে (যুগান্তর)।

আধুনিক বাঙালি জীবনের ত্রুটি ও দুর্বলতাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন। ...রোমান্টিসিজম ও শ্লেষরসের দুর্লভ সমন্বয় করাতে লেখক তুলনাহীন।...বহু বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অতুলনীয় শ্লেষরসে

বাংলা ভাষা যে কতখানি উঁচুতে উঠতে পারে তা দেখিয়েছেন (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পূর্ণ এই প্রথম বাংলা উপন্যাসটি একটি আবিষ্কার। ...এ পর্যন্ত বাংলার প্রায় অনাবিষ্কৃত শ্লেষ রসের বাংলা ভাষা যে কত নিপুণভাবে প্রয়োগ করা যায় তার সার্থক পরিচয়। অনবদ্যভাবে কিন্তু দরদ দিয়ে লেখক তা করেছেন। ছাব্বিশটি মোক্ষম কার্টুনে তাকে রূপায়িত করা হয়েছে (অমৃতবাজার পত্রিকা)। তাঁর লেখনী শাণিত অস্ত্রের কাজ করেছে। বইখানি এক নিঃশ্বাসে না পড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। . .বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে (বসুমতী)। একেবারে অন্য ধরনের বই। পাতায় পাতায় ভেজালহীন নিছক হাস্যরস। ...পাঠকের ক্ষতবিক্ষত মনে সহসা এক ঝলক আলো ফেললেন (অল ইন্ডিয়া রেডিও)। রঙ্গের মধু ও ব্যঙ্গের কাঁটা উভয়ই আছে। ...ঘটনা স্থাপন ও চরিত্র অঙ্কনে লিপিকুশলতার পূর্ণ পরিচয় আছে। ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল। ...দেবেশচন্দ্র বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন (প্রবাসী)।

পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় জীবন্ত...সহানুভূতির সঙ্গে উদ্ঘাটিত। বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম শ্লেষ ও ব্যঙ্গাত্মক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনা করিতেছে (ভারতবর্ষ)। এটাকে আবিষ্কার বলব না, বলব সাদামাঠা বাঙালিজীবনে নতুন একটা ডিস্‌কভারি। ...স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। টেকনিকের দিক থেকেও রসোত্তীর্ণ (সংহতি)। আজকাল হামেশাই হাস্যরসাত্মক ছবি উঠছে, কিন্তু বেশির ভাগই সেগুলি ন্যাকামি বা ভাঁড়ামির নামান্তর মাত্র। ...'অর্ধেক মানবী তুমি' চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবার যোগ্য ব্যঙ্গরসাত্মক কাহিনী (চিত্রবাণী)।

পরের বছর ১৯৫৫-তে বেরুল সামরিক পরিবেশের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস 'রক্তরাগ'। বিশ্ব পুস্তক প্রদর্শনীতে ভারতীয় সাহিত্যিকের রচিত এই বইটি একমাত্র উপন্যাস যা জার্মান অনুবাদে প্রদর্শিত ও বিপুলভাবে সম্মানিত হয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশেও 'রক্তরাগ' প্রচুর প্রশস্তি লাভ করেছিল।

সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যা পরিচয় তা সেকেলে ইংরেজি ক্ল্যাসিকাল উপন্যাসের মারফৎ। আধুনিক Strategy'র কিছুই জানি না। নেতাজী পরিচালিত সৈন্যদলের, বিশেষত যারা বাঙালি তাদের বিবরণ জানবার জন্য খুব কৌতূহল ছিল; রক্তরাগে তার vivid জীবন্ত চিত্র দেখে আনন্দিত হয়েছি, বিস্মিতও হয়েছি—এই বই সম্বন্ধে একথা লিখেছিলেন রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন, বর্তমান রণনীতির নবীনতম স্বরূপ বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থই প্রথম দেখিয়েছে এবং নব্য শিক্ষিত বাঙালির সামরিক গৌরবকে কল্পনার তুলিতে রঙ ফলিয়ে চিত্রিত করে লেখক তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে প্রমাণ করেছেন।

বাঙালির পক্ষে সুদুর্লভ সামরিক পরিবেশের কঠোর আসনে বসে জোর তপস্যা করেছেন লেখক। সেই জোর তপস্যার ফলে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে একটি অনন্য সাধারণ সম্পদ, আর সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য পেয়েছে এই প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধের পরিবেশে লেখা উপন্যাস,—কথাসাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে একটি সার্থক দিকচিহ্ন (গল্পভারতী—প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)। আর সেই দিকচিহ্নকে বলিষ্ঠ মূল্যস্বীকৃতি দিলেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি লিখলেন, এই বইয়ে দেশ এবং বিশেষ করে আমাদের সৈনিকরা কিছু দিকদর্শন পাবেন আর খাঁটি সৈনিকের আদর্শ তাঁদের সামনে প্রতিভাত হবে। ভারতের প্রায় সব ভাষায় অনূদিত 'রক্তরাগ' সেই উদ্দেশ্যে সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের পাঠ করা বাঞ্ছনীয় বলে একটি ইন্ডিয়ান আর্মি অর্ডার প্রকাশিত হল এবং ভারতের বিভিন্ন সেনা ছাউনীতে এই বই রাখা হল।

রহস্য উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর (প্রবাসী) এই বই পড়ার ফলে তুষারাবৃত কাশ্মীর সীমান্তে সেনাশিবিরে উষ্ণ অনুপ্রেরণার স্রোত বয়ে গেছে একথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় সামরিক এবং অসামরিক এই দুই জীবনেই 'রক্তরাগ' এই প্রথম একটি নতুন জগতে নিবিড়ভাবে নিয়ে যায় আর অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা এনে দেয় (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড); জাতির বৃহত্তম আকাঙ্ক্ষা, মহত্তর প্রচেষ্টা, জীবন ও কর্মে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যা ইউরোপীয় সাহিত্যকে বরণীয় করেছে তার রূপ এখনও আসেইনি আমাদের সাহিত্যে...কিন্তু রক্তরাগ তার প্রথম সূচনা করল...আমাদের মনের বন্ধ্যা মাটিকে উর্বর করে তুলেছে (যুগান্তর)। এই আসামান্য উপন্যাস বাঙালি অসামরিক এই বদনাম দূর করবে (অমৃতবাজার পত্রিকা) এবং বাংলা সাহিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করবে (আনন্দবাজার পত্রিকা)। বিশ্বসাহিত্যে রেমার্কের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে (দেশ—প্রমথনাথ বিশী)।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও বইটি খুব প্রশংসিত হল। স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী সম্পর্কিত এক অপূর্ব অধ্যায়ের গল্প বলেই নয়। শাশ্বত মানবমনের চিরন্তন আকৃতি ও বেদনাও এতে পরিস্ফুট (ভারতবর্ষ) হয়ে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে এবং লেখকের সুনিপুণ কৃতিত্বেরই ঘোষণা করেছে (বসুমতী)। নিখিল ভারতীয় বেতারে সাহিত্য আলোচনায় বলা হল যে লেখক একটি জাতীয় কর্তব্য করার জন্য ধন্যবাদার্হ।

নিখিল ভারতের বহু সাহিত্য পত্রিকা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই বইয়ের অনুবাদকে উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানালেন। রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', টলস্টয়ের 'ওয়ার এন্ড পীস', হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস', প্রভৃতি ক্লাসিক উপন্যাসের বিশ্বজনীন সামরিক আস্বাদ এই বই ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম এনে দিয়েছে বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় রক্তরাগের অনুবাদ সেই সার্থকতাকে স্বীকৃতি চিহ্ন দিয়েছে।

ঐ একই বছরে প্রকাশিত হল 'রাজসী'। 'রাজোয়ারা' ধাঁচেরই লেখা। বইটি সম্বন্ধে 'যুগান্তর' লিখলেন, "ভ্রমণ, দর্শন ও ইতিহাসের সমমাত্রিক মিলনে এই গ্রন্থটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি অভিনব। উপন্যাসের মতো অনাবিল স্বচ্ছ প্রবাহ। মনোরম প্রকাশভঙ্গী, জাগ্রত জীবনবোধ ও কবিত্বময় ভাষা বইটিকে এত উপভোগ্য করিয়াছে।" 'ভারতবর্ষ' লিখলেন, "পড়ে মন হল ধন্য এই বাঙালি জন্ম যার এহেন সম্পদ ও মানসিকতার গৌরবময় ইতিহাস আছে। ...সাহিত্যিক রম্যতা ও ঐতিহাসিক তথ্যের অমৃত রসায়ন দীপ্ত একটি সাধনা।"

তিন বছর পরে প্রকাশিত হল 'সেই চিরকাল'। এটি একটি ছোটগল্পের সংকলন। বইটি বিশেষ প্রশংসা পায় বিভিন্ন পত্রিকায়। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' লিখলেন, "নিবিড়ভাবে নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশ করাব সময়ে লেখকের অন্তরে ছিল অশ্রু, কিন্তু লেখনীতে ছিল ইস্পাত। এতে আমরা নূতন, স্পন্দনশীল সদ্যজাগ্রত যৌবনের, প্রস্ফুটিত জীবনের সন্ধান পেয়েছি।" 'দেশ' লিখলেন, "ক্ষণকালের উল্লাসে যে চিরকালেব মূর্তি ফুটে ওঠে, হৃদয়ের যে শাশ্বত সৌন্দর্য বিস্ফুরিত হয়ে ওঠে, তাই অনবদ্য ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন লেখক।"

এই গল্পগুলিতে লেখক মানবমনের নিগূঢ় রহস্যটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রেমেব বিচিত্রলীলাকে তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে লক্ষ করেছেন। বর্তমান জীবনের ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের বেদনাকে প্রত্যেক গল্পের মধ্যে দীপামান করে তুলেছেন। শেক্সপীয়র রোমিও-জুলিয়েটের মানব-ভাগ্যের অপচয়েব দিকটি উদ্ঘাটিত করেছিলেন। বাল্মীকির শোকগাথা আজও বিরহীর প্রাণে ঝড় আনে। কিন্তু একালের বল্লরী-বিকাশের মধ্যে (অভিনয় গল্প), অঞ্জনা-রঞ্জিতের আকাশে (বাল্মীকি গল্প) একই স্তরের গুঞ্জন তোলে, একই বেদনার সঞ্চার করে। অন্যদিকে সুখী জীবনের যে চকিত চমক এতে পাই তা মনোহারিত্ব ও চমৎকাবিত্বে মন মুগ্ধ করে (কথাসাহিত্য—প্রমথনাথ বিশী)।

গল্পের পটভূমিকাগুলি এমন এক জগতের যাকে পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরও চিনতে অসুবিধা হয় না। বাংলা গল্পে বা উপন্যাসে এই ধরনের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ পটভূমিকা পাওয়া যায় না (ভারতবর্ষ)। বাঙালি আজ নবযুগের যাত্রী; লেখক নবযুগের বাঙালির ছবি এঁকেছেন, অভ্যস্ত জীবনের প্রতিধ্বনি নয় (প্রবাসী)।

অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল (আনন্দবাজার পত্রিকার) এই গল্পগুলি লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দরদী মনের স্পর্শে সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি প্রেমের বিচিত্র লীলাকে অপরূপ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন (যুগান্তর)। পটভূমি ও বিষয়-বৈচিত্র্যে তাঁর একাধিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সাড়া এনেছে। আমাদের যুগে বাংলা সাহিত্যে যে শাশ্বত সৃষ্টি হচ্ছে সেই চিরকালের মধ্যে এই গল্পগুলি মহিমান্বিত আসন লাভ করবে (অমৃতবাজার পত্রিকা)।

'পশ্চিমের জানলা' প্রকাশিত হল ১৯৬০ সালে। পঁচিশ বছর আগে সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত এক তরুণ তাঁর ক্লাসিক রম্যরচনা ইয়োরোপার জন্য রবীন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। সেই দেবেশ দাশের দৃষ্টি এখন পূর্ণ পরিণত, অন্তঃপ্রসারী ও জীবনের আনন্দে সমুজ্জ্বল। 'ইয়োরোপা'র তরুণ প্রেমিক 'পশ্চিমের জানলা'য় রসোত্তীর্ণ শিল্পীরূপে উদ্ভাসিত। অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ তৃতীয় নয়ন সুদুর্লভ। আরও বেশি দুর্লভ সেই সূক্ষ্ম অনুভব যা ভিন্‌দেশের রহস্য ও পরদেশীয় মনের গোপন কথাটি খুলে প্রকাশ করতে পারে। সে সম্বন্ধে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে দেবেশ দাশের লেখনীতে যে মায়াকাঠি আছে তা আর কারও নেই (অমৃতবাজার)।

এতদিনে আমরা পশ্চিমের জীবনকে সত্য সত্যই আবিষ্কার করলাম। লেখকের অভিযান বাস্তবধর্মী,

বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটা গোটা যুগের নতুন করে সৃষ্টির ব্যাকুলতায় স্পন্দিত। নব নব চিন্তা ও চেতনা, প্যাসন ও ফ্যাশন এই গল্পগুলিতে নিবিড়ভাবে প্রতিফলিত এবং গভীর অনুভবে রূপায়িত। 'পশ্চিমের জানলা' দিয়ে দেখছি মরণকে উপেক্ষা করার প্রয়াস, কালের উপর জয়ী জীবনের হাতছানি। এতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে একটি অপরূপ মিছিল যাতে আছে সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, বেঁচে থাকার বাসনায় ব্যাকুল মধ্যবিত্ত, রক অ্যান্ড রোল মার্কা কিশোর কিশোরী, রূপের প্রতিযোগিতা, পথঘাটের মানুষ, এমন কি লেখকের কলেজ জীবনের সহপাঠিনী পর্যন্ত। এরা সকলেই তার জীবনকে নিবিড়তম মুহূর্তে স্পর্শ করে অতুলনীয় শিল্পরসে রূপদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)।

ইয়োরোপের প্রাণের স্পন্দন লেখক অনুভব করে গভীর অর্থে প্রাচ্য জীবনকেই বুঝতে চেয়েছেন (আনন্দবাজার)।

তাঁর রচনায় পশ্চিম আর পূব দিয়েছে পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে। এ দেশের রামুব ওদেশে দীর্ঘ প্রবাসের মধ্যে শুধু অপরূপা প্রেমের কাহিনী রূপায়িত হয়নি, বিশ্লেষিত হয়েছে ওদেশের আধুনিককালের সমস্যাও। দর্শনের গভীরতা ও প্রদর্শনের অসামান্য নিপুণতাই তাঁর লেখনীকে করেছে সার্থক (যুগান্তর)।

কবিতার জগতেও বিচরণ করেছেন দেবেশবাবু। ছাত্রজীবনে শিলং-এ বেড়াতে গিয়ে একটি সরকারী বাড়ির অঙ্গনে উইলো গাছের লতানো শাখার নিচে বসে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি তাঁর স্কুলের ম্যাগাজিনে ছাপানো হয়েছিল। চাকরিজীবনের শুরুতে তিনি তাঁর নব-পরিণীতা স্ত্রী শ্রীমতী কমল দাশকে নিয়ে যে বাড়িতে উঠলেন তারই আঙিনায় উইলো গাছের তলায় বসে তিনি তাঁর প্রথম কবিতা লিখেছিলেন। এরপর তিনি স্থির করলেন প্রশাসনের কাজ করার সঙ্গে তাঁকে কবিতাও রচনা করতে হবে; দুটোই তাঁর ধর্ম, কোনোটাই বাদ দেওয়া চলবে না।

দেবেশ দাশের প্রথম কবিতার বই 'প্রেমরাগ' নামে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরে এই বইটিই 'প্রথম ধরেছে কলি'—এই নতুন নামে প্রকাশ করেন 'মিত্র ও ঘোষ' ১৯৬১ সালে। এই কাব্যপুস্তক সম্বন্ধে কবি-পরিচিতি লেখেন সু-কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তিনি লেখেন, "বৃহত্তর বঙ্গের সুদূর উত্তর-পশ্চিম দিক্‌দেশে সমুদিত একজন নূতন কবিকে আজ আমরা বঙ্গসরস্বতীর কাব্যকুঞ্জে স্বাগত অভিবাদন জানাইতেছি। ...রবীন্দ্রোত্তর যুগের এত অল্পকাল মধ্যে কাব্যসৃষ্টির মৌলিক সফলতা যে কোনও কবির পক্ষে অসাধ্য না হইলেও অতিশয় দুঃসাধ্য। তাই আশার ও মৌলিক সৃষ্টিকুশলতার আলোক দেখিতে পাইলেই আমরা আনন্দিত হইয়া উঠি এবং সেই কবিকে শুভ সম্মান জানাইবার যে স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মে তাহা তাঁহার কবিধর্মের একাগ্রতা ও তপস্যানিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনেরই স্বরূপ। এ যুগের অনেক নূতন কবির রচনায় কষ্টকল্পনা ও কৃত্রিমতা দোষের আধিক্য দেখিয়া যেমন দুঃখ ও নৈরাশ্য জাগিয়া উঠে, বর্তমান কবির রচনায় সেইরূপ স্বচ্ছ আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সেই পরিমাণে উল্লসিত হইয়া উঠি এবং সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে দ্বিগুণতর উৎসাহে বরণ করিয়া লইতে চাই। কারণ জানি আন্তরিকতাই কবি-প্রাণের সত্যকার পরিচয় এবং কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতো সেই প্রকৃতিগত পরিচয় যে কবি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, বাণীকুঞ্জে তাঁহার অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার আছে।" বইখানির ভূমিকায় কবিশেখর কালিদাস রায় লেখেন, "কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় যেন নিদাঘ মধ্যাহ্নে গৃহবলভির সুখনীড়ে সদ্যোজাগরিত কপোত-কপোতীর স্বতঃউৎসারিত কলকূজন শুনিতেছি। ইহাতে মিলনের মাদকতাও নাই, বিরহের হাহাকারও নাই। ইংরেজিতে যাহাকে বলে intellectualisation of emotion, কবির তাহাই বৈশিষ্ট্য। ...(তাঁহার কবিতায়) শব্দের পল্লবজালে কোথাও ভাবের কুসুম সমাচ্ছন্ন হয় না। ...রবীন্দ্রোত্তর কবিদের পক্ষ হইতে এই বর্ষীয়ান্ সতীর্থটিকে পরম সমাদরে বাংলার কাব্যতীর্থে আমরা বরণ করিয়া লইতেছি।" তাঁর আর একটি কাব্যগ্রন্থ 'সুদূর বাঁশরীও কবিমহলে অনেক প্রশংসা লাভ করেছিল।

১৯৭৭ সালে বেরুল তাঁর 'জীবনের চেয়ে বড়' গ্রন্থখানি। এই বইটিতে আছে মানবতার দৃষ্টিতে দেখা মানুষের কথা। ব্যথা, অসহায়তা, আনন্দ আস্বাদের কথা। সাহিত্যের ময়ানে রূপান্তরিত সত্য কাহিনী। অন্যান্য গ্রন্থের মতো এখানিও সুধী সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করল।

তিন বছর পর প্রকাশিত হল 'প্রেম আগ্রা স্টাইল'।

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পড়াশোনা এবং গবেষণা করে একটি অনবদ্য বই লিখলেন তিনি, 'বৃহত্তর বাঙালি'। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪ সালে। "নিজেদের সমসাময়িক ভৌগোলিক সীমার বাইরে বাঙালিরা কী

অবদান নিয়ে গিয়েছিলেন, বিনিময়ে নিজ উৎপত্তির উৎসকে কী উপহার দিয়েছিলেন'' তাই তুলে ধরেছেন তিনি এই বইটিতে। আশা পোষণ করেছেন, ''আজকের আত্মবিস্মৃত আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালির অন্তরে এই বীজমন্ত্র ('বৃহত্তর বঙ্গ নয়, বৃহত্তর বাঙালি') চিরকাল ধ্বনিত হতে থাকুক।''

দেবেশ দাশের শেষ উপন্যাস 'ভিনদেশী বঁধূ' প্রকাশিত হল ১৯৯৬ সালে। এটি একটি ভিন্ন স্বাদের বই। উপন্যাসটি ''আন্তর্জাতিক ডিপ্লোম্যাটিক পটভূমিকায় রচিত প্রথম মৌলিক কাহিনী। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছাড়াও এর মানবিক মূল্য অসীম। উৎসব-চঞ্চল ভিনদেশী অন্তরের লীলা, চারুশিল্পের সাবলীল কলা, হিস্পানী বেদেনীর ভবিষ্যৎ ও গণনা, এমনকি সাগর স্নানের মধ্যে লাবণ্যের বন্যায় আনন্দের স্পন্দনে রমণীয় সীমানায় এসেও সংযমে সুন্দর পরিণতি অতুলনীয়।'' এই বইখানিই তাঁর শেষ প্রকাশিত বই। আর একখানি উপন্যাস 'ভালোবাসার ধন' ছাপা হচ্ছিল, কিন্তু তা এর আগে প্রকাশিত হয়নি।

দেবেশবাবুর গ্রন্থ-পরিচিতি সম্পূর্ণ হবে না আর একখানি কিশোরদের জন্য লেখা বই-এর কথা না বললে। বইখানির নাম 'রাজার কুমার পক্ষীরাজে', ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন স্বয়ং দলাই লামা। বইখানি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের সুললিত জীবনী। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। ''রাজার কুমার'' বৃহত্তর ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজবংশের পুত্র অতীশ দীপঙ্কর, যিনি লেখকের মতে প্রথম বাঙালি বিশ্বমানব (ইউনিভার্সাল ম্যান)। রাজা রামমোহন রায়ের প্রায় হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম হয়।

নিজের লেখা সাহিত্য সম্বন্ধে দেবেশবাবু অল্প কিছু লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন, 'আমি ও আমার জীবনী।' যতদূর জানা যায় লেখাটি কোথাও প্রকাশ হয়নি। ওঁর মেয়ে অনুরাধা কিছু কাগজ আমাকে দিয়ে গিয়েছিল, পাণ্ডুলিপিখানি তার মধ্যেই পেয়েছি। লেখাটি বেশ চিত্তাকর্ষক। আরম্ভ করেছেন, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে, তোমারে করেছি রচনা' দিয়ে। তারপর লিখছেন, 'সেই সাহিত্য হচ্ছে তুমি, সাহিত্যিকের সৃষ্টি। সাহিতিক্যের দৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্যিকের নিজের ছায়া অনেকখানি হলেও, কায়া নয়। কারণ কায়া হচ্ছে ছায়ার চেয়ে অনেক বেশি ধরা ছোঁয়ার জিনিস। মায়ার মত মিলিয়ে যাবার স্বাধীনতা তার নেই। আত্মজীবনী হচ্ছে কায়া, বাস্তব, সত্যাশ্রয়ী। উপন্যাস হচ্ছে কথা, কল্পনায় রাঙানো, স্বপ্নে জড়ানো। দুটোর মধ্যে তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। এবং সম্ভবতঃ না থাকলে চলবেও না। এই ধরুন, আমাদের বাঙালি জগতে সাহিত্যিকের সাধারণ জীবন। কোথায় এবং কতটুকু তার বৈচিত্র্য, তার বিস্ময়, তার আকাশ-ছোঁয়া আকৃতি, পাতালমুখী অধোগতি? দূর বিদেশে আকৈশোর কাটিয়েছি বাঙালি জীবনের গতানুগতিকতার বাইরে, আটপৌরে পরিধির ওপারে। তবুও যতখানি যতটুকু সুযোগ পেয়েছি বাঙালি সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যাকুলভাবে মিশেছি, আন্তরিক হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছি। এমনকি রবাহূত, অনাহূত হয়েও। যে জীবনের ছবি দেখেছি, ধ্বনি শুনেছি তার মধ্যে উপন্যাসের মালমশলা কতটুকু হতে পারে? কিন্তু মানুষের মন জীবনকে ছাড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে জীবনাতীত হয়ে। সেখানেই সাহিত্যিকদের জয়, সাহিত্যিকের পরমায়ু। তাই বাঙালি জীবনের সীমা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও বাঙালি সাহিত্যিকের উপন্যাসে তার আত্মজীবনী না হোক, আত্মজীবনীর অভিজ্ঞতা অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যাবে। সম্ভবতঃ সেই সীমা তার সেই সঙ্কোচের জন্যই নিজের জীবনের আলো আর ধোঁয়া তার লেখনীকে দীপ্ত অথবা লিপ্ত করে তুলতে বাধ্য। আমি যদি কুমারটুলির বাসিন্দা শিল্পী হই, মূর্তি গড়ব কাদামাটি দিয়ে। জয়পুরী মর্মর বা বোলপুরী রক্তপ্রস্তর দিয়ে নয়। তবে একটা উপন্যাসে একটি আত্মজীবনীর সমস্ত অথবা একটা জীবনের সমস্ত কথা উপন্যাসে রূপ পায় কি না তা প্রত্যেক সাহিত্যিক নিজের জবানীতে বলতে পারবেন। আমেরিকার কবিশ্রেষ্ঠ হুইটম্যানের লিভস অব গ্রাস, পর্ণপত্র, কাব্যের মধ্যে কবির একটি জবানী আছে যে এই বইটি ছুঁবে সে একটি মানুষকে ছুঁবে। আত্মজীবনী প্রসঙ্গে এই কথাটি হঠাৎ মনে পড়ল। সত্যই ত। সত্যকার রচনার মধ্যে স্রষ্টার তপ্ত রক্ত মেশানো রয়েছে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস, আত্মার আকুলি ব্যাকুলি। কাজেই সত্যকারের উপন্যাস লেখকের আত্ম-আরোপ বা আত্ম-বিন্যাস কিছুটা আশা করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের আটপৌরে জীবনে এত কিছু ঘটেনা যা অবলম্বন করে বারবার সাহিত্য রচনা সম্ভব। কিন্তু সে জীবনে বিশেষ যা কিছু ঘটেছে এবং মনে যা কিছু ভাবের উদয় হয়েছে তা কোনও না কোনও রচনাতে প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে এই সন্ধান বেশিদূর চালালে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার উদয় হতে পারে। ধরুন, কোনও সাহিত্যিক শুধু দেহের পিপাসা নয়, দেহের অনুশীলনের তীব্র ও বিস্তৃত চিত্র তার উপন্যাসে প্রকাশ করলেন। অথচ তাঁর নিজের জীবনে হয়তো সেই অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তা বলে কি তিনি রচনাকালে তাঁর লেখনীকে তাঁর জীবনের মধ্যে সীমিত রাখবেন? অন্য পক্ষে,

কোনও নিতান্ত চূড়ান্ত অভিজ্ঞতাকে স্বরূপে প্রকাশ করার মত দুঃসাহস দেখাবেন? প্রবন্ধাকারে ও গ্রন্থাকারে আমি আত্মজীবনী প্রকাশ করিনি। জীবনে পরিপূর্ণতা ও পরিণতির মোহনায় এসে না পৌছান পর্যন্ত আত্মজীবনী প্রকাশ সম্ভবতঃ সার্থক বা সম্পূর্ণ হতে পারে না। তবে জীবনকে কে-ই বা পরিপূর্ণভাবে বা পরিণতির মধ্যে অনুভব করবার সময় পায়? "হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা"? জীবন যে সমস্ত গগনে ছড়িয়ে থাকে, জীবনীর সীমানাকে এড়িয়ে। তবুও সে গগনের হাতছানি ক্ষণে ক্ষণে লেখনীতে উকি মারে। এর ফলে আমার প্রত্যেকটি ছোট গল্পের মধ্যে সত্য ঘটনা, নিজের অভিজ্ঞতা ও একান্ত অনুভবকে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছি। শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতো। অনেক সময় লেখা শুরু করবার সময় বুঝতেও পারিনি লেখার তরী কেমন করে অজানা থেকে জানার পানে পাল মেলে এগিয়ে এসেছে। জ্ঞাতসারে নয় অনেক সময়। কিন্তু কুলায় প্রত্যাশী পাখির মতো ঘটনা বা অনুভব সত্যের মধ্যে, সত্য ঘটনা বা অনুভবের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে।

আবার জীবনের প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্প (বসন্ত বেদনা : শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা) আমার চেনা আমারই সরকারী অফিসে তরুণী কর্মচারীর নিবিড় আত্মকথা। পাঞ্জাবী সাহসিনী তরুণীর প্রতি বিবাহিত সহকর্মীর আকর্ষণ ও প্রণয়-নিবেদনকে শুধু পরিবেশ ও শহর পরিবর্তন করে দেখিয়েছি। ঘটনা সত্য, নায়ক নায়িকা সত্য এবং নায়কের মনের ব্যর্থ ক্রন্দনও বহু স্বামীর দুঃখ-বেদনার সত্য প্রতিফলন। গল্পটি আত্মঘটনা নয়, আত্মজীবনও নয়। কিন্তু আত্মজীবনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একটি পরস্মৈপদী অভিজ্ঞতা। সাহসিনী তরুণী চন্দ্রাহত যুবককে পরিহাস করে চাঁদের আলোর মতো মায়ায় ভরে আশার সাগরে ভাসিয়ে নয়, ডুবিয়ে দিয়ে গেল। আর উপরওয়ালা লেখককে জানিয়ে গেল। তার জীবনে আর একটি ঘটনা যোগ করে দিয়ে গেল। তরুণীর সত্য কাহিনী; কিন্তু সাহিত্যিকের সত্য সংবাদ।

কিন্তু আমার দ্বিতীয় প্রকাশিত গল্পটির নায়ক লেখক নিজেই। ভেনিসের সাগর কিনারে চাঁদনী রাতের মায়ার সুযোগ নিয়ে সদ্য পরিচিত এক ইটালিয়ান নিজের সম্বন্ধে এক হতাশ প্রেমিকের কল্পিত কাহিনী বানিয়ে লেখককে বোকা বানিয়ে গেল। নিজে বোকা বনার বেদনা ঢাকতে গিয়ে বিশ বাইশ বছরের তরুণ লেখক, নিজে স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত এবং অন্যান্য লোকেরাও স্বপ্ন দেখে থাকে এই সান্ত্বনায় আশ্বস্ত তরুণ লেখক যে কাহিনী রচনা করলেন তাকে আত্মজীবনী বলবেন? অথবা সম্পূর্ণরূপে নিজের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি কাহিনী মনে করবেন?

ধরুন আমার আর একটি ছোট গল্পের কথা। রোম থেকে রমনা গল্পটি "যুগধর্ম" নামে একটি বিশ্ব বিখ্যাত জার্মান "লিটারারী ডাইজেস্ট" মিখাইল "কোয়ায়েট ফ্লোজ ডি ডন" উপন্যাসখ্যাত মাইকেলএ শলোকভ ও অন্যান্য নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত লেখকদের রচনারও উপরে স্থান পেয়ে সম্মানিত প্রথম গল্প হিসাবে আসন লাভ করল। বিশ্বের বিচারে গল্পটি নিঃসন্দেহে অতুলনীয় সম্মান পেয়েছে। সমগ্র জার্মানী থেকে নির্বাচিত সম্পাদক মণ্ডলী এই গল্পটি সম্বন্ধে একটি বিশেষ ভূমিকায় লিখেছিলেন।

"সাম্প্রতিককালে ভারতের যেসব বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তিনি তার কেন্দ্রস্থলে নিজেই ছিলেন।" অর্থাৎ তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন বা লেখকের কর্মজীবনের একটি বিশেষ পরিবেশ বা ঘটনা বা উপলব্ধি স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্যদান হিসাবে বাংলাদেশ বিভাগের বেদনার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। লেখক পূর্ববংগীয় বংশের সন্তান—যদিও কর্মক্ষেত্র আজীবন বাংলাদেশের বাইরে এবং শিক্ষার শেষ অংশ ভারতবর্ষের বাইরে। কিন্তু গল্প-রচনাকালে ঢাকায় দাঙ্গার ফলে লেখকের পিতা নিজে বিপদের মধ্যে আটকিয়ে পড়েন এবং পূর্ববঙ্গব্যাপী হিন্দুদের ত্রাস ও দুর্দশা লেখককে গভীরভাবে চিন্তিত ও ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত চিন্তা ও ব্যক্তিগত ব্যাকুলতা সরকারী কর্মে সীমিত পরিবেশের মধ্যে, বিশেষ করে সেই সময়ে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার স্বাধীনতা লেখকের ছিল না। তাই তিনি দেশ থেকে পলায়নের সময় অন্ধকারে অপহৃতা তারই নিজের দেশের রমনার তরুণীর কাহিনী যুদ্ধবিধ্বস্ত ও বিদেশী যাত্রার সৈন্যের অধিকৃত রোমের একটি নিগৃহীত তরুণীর মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। আত্মজীবনীকে এইরূপভাবে পরস্মৈপদী রূপান্তরে প্রকাশ করা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল। সেই জন্যই জার্মান সম্পাদক মণ্ডলী লিখেছিলেন—

"এই গল্পটিতে দেবেশ দাশ গত যুদ্ধের পরে রোমের অবস্থার সঙ্গে ভারত বিভাগের মর্মান্তিক অবস্থার পরম নিপুণভাবে গ্রথিত করতে পেরেছেন। ফলে পাঠকের মনে এমন একটি করুণা সঞ্চারিত করতে

পেরেছেন যা আরও সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে দেখালে সম্ভব হতনা।"

আর একটি গল্পের কথা ধরুন। "সেই চিরকাল" গল্প গ্রন্থে বাল্মীকি নামক গল্পে লেখক নিজের প্রথম জীবনে এস.ডি.ও. পদে কাজ করার সময় একটি তরুণীর প্রেমে পড়ে তার বিবাহের দিন প্রেমিক যুবকের আত্মহত্যার সত্য ঘটনা প্রকাশ করেছেন। নাম, কাল ও পাত্রের পরিবর্তন করা হয়েছে। লেখক রিটায়ার করবার সময় বিদায় সংবর্ধনার সময় এই কাহিনীটি স্মরণ করেছেন এমনভাবে ঘটনাটির অবতারণা করা হয়েছে। লন্ডনের সোহো নামক বোহেমিয়ান আন্তর্জাতিক পল্লীতে বা বিশ্বের পিয়ারী প্যারিসের নগ্ননৃত্যশালা 'ফলি বারজেয়ারে' তাঁর আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা নির্ভেজালভাবে তিনি লেখনির মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন।

নির্ভেজালভাবে? পাঠক নিশ্চয়ই এখানে আশ্চর্য হয়ে থেমে যাবেন ও জিজ্ঞাসুদৃষ্টি আমার দিকে মেলে দেবেন। আর সমালোচক অবশ্যই অনুকম্পার মৃদু হাসি দিয়ে তাঁর অবিশ্বাসের ওপর একটা ভদ্রতার আবরণ টেনে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা নামক রঙের ভাণ্ড ও শিল্পনামক রসের নাগরীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কিন্তু সেখানেই আমি বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করব যে আমি এ বিষয়ে সুদুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছি। কর্মজীবনের সীমারেখার এপারে এবং ওপারে দুই জগতেই আনাগোনার ও ভারত সরকারের দূত অথবা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে দেশে ও বিদেশে যে সুযোগ পেয়েছি সাধ্যমতো সেই সুযোগকে সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছি। সেই সুযোগ কবিগুরুর ভাষায় যেখানেই "এতটুকু ছোঁয়া লাগিয়েছে সেখানেই রঙে রসে ফাল্গুনী" রচনা করেছি। সেই রঙ ও সেই রস তো ভেজাল নয়। তারাই তো রোজনামচা ডায়েরিকেও নিত্যকালের সাহিত্যে পরিণত করে।

তারই কল্যাণে আমি নিঃসংশয়ে আত্মজীবনের বহু ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে বিনা দ্বিধায় গল্প ও উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছি। সম্ভবতঃ অন্যান্য বহু বাঙালি লেখকের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে। আমার সর্বদা এই ভরসা থেকেছে যে যা লিখছি অর্থাৎ রচনা করছি তা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। এবং আন্তরিকতার ভিত্তি তার অন্তরে আত্মস্থ হয়ে আছে। কত বেশি পরিমাণে আছে তা খতিয়ে দেখাব প্রয়োজন এ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু এখন রচনাগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখছি এবং আশ্চর্যের সঙ্গে আবিষ্কার করছি যে আমার সব রচনাই আত্মজীবনী ঠিক নয়, কিন্তু আত্মজীবন থেকে আহরণ করা।

ধরুন, ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রকৃত সামরিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস বলে স্বীকৃত রক্তরাগের কথা। তার ভূমিকাতে লেখক স্বীকার করেছেন কিভাবে নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত সীমান্তে আসাম মণিপুর আক্রমণের সঙ্গে তিনি বিজড়িত ছিলেন আর সামরিক পরিবেশ ও ঘটনার সঙ্গে তার নিজের জীবন চাকুরি সূত্রে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কমিশনার হিসাবে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক সীমান্তে ঘোরাঘুরি করে তিনি যা দেখেছেন ও শিখেছেন তা এই উপন্যাসে ভৌগোলিক পটভূমিকা দিয়েছে। সেক্রেটারিয়েটে যে সব সামরিক খবর ও নিয়মকানুন ঘেঁটেছেন তা দিয়েছে রচনার মালমশলা। আর সারা ভারতের আন্তরীণ "অ্যাকসিস ইন্টারনী" অর্থাৎ জার্মান ইটালীয়ান জাপানী যুদ্ধবন্দীদের ক্যাম্প পরিচালনা করে যা অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তা যুগিয়েছে মানবতার দৃষ্টিতে দেখা মানুষের কথা। সম্ভবতঃ এত সত্যমূলক ও আন্তরিকতায় ভরা বলেই এই উপন্যাসটি হয়েছে একমাত্র ভারতীয় উপন্যাস যা বিশ্ব-পুস্তক প্রদর্শনীতে জার্মান ভাষায় প্রদর্শিত হয়ে সম্বর্ধিত হয়েছে।

কাজেই এই উপন্যাসটি আমার পূর্ণ আত্মজীবনী না হলেও অসামরিক ভেতো আর ধুতো বাঙালি জীবনের অখণ্ড উদগ্র সামরিক বাসনা বিকাশে ভরা আত্মমানসের একটি প্রকাশ। ঔপন্যাসিক হিসাবে বলব যে আত্মআরোপ রচনার অন্তরায় হয়নি। বরং আন্তরিকতা দিয়েছে। রচেনি ব্যবধান, দেয় নি বন্ধন।

সম্ভবতঃ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সম্মানিত ওয়ার এন্ড পিস উপন্যাসের অমর রচয়িতা টলস্টয়ের আত্মজীবনী নয় এ মহৎ উপন্যাস। কিন্তু সেবাস্তোপল যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বহু সামরিক অভিজ্ঞতাই তাঁর হয়েছিল। সাধারণত সফল সাহিত্যিকের কাছে সৃষ্টি হচ্ছে অর্ধেক মানব আর অর্ধেক কল্পনা। সাধারণ সাহিত্যিকরা হয়ত অর্ধেক মানবও থাকে না। থাকে বেহিসাবী বেপরোয়া অবাস্তব কল্পনা। তার সঙ্গে কিছু কান্না, কিছু বেদনা আর শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেশাতে পারলেই পাঠকের মন পাওয়া যায়। কিন্তু টলস্টয় প্রমুখ চিরকালের সাহিত্যকরা তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ান, কিন্তু পা থাকে মাটিতে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় শ্যামলতা অনুভবের রসের স্নিগ্ধ মাটিতে।

আমার শেষ কথা হচ্ছে এই যে শুধু বাস্তব ঘটনা বা আত্মজীবনের পাতা নিয়ে উপন্যাস সৃষ্টি করা যায়

না। আমার সৃষ্ট একটি চরিত্রের পিছনের আসল মানুষ, একজন মণিপুরী শিল্পী ও মণিপুর রাজ্য শাসনের অধিকারী বহু বছর আগে আমায় প্রশ্ন করেছিলেন—ঐ সব সোহো আর ফলি বারজোয়ার, বখা আর বোকা ওরা আপনার লেখায় এল কোথা থেকে? শুধু ত কল্পনা নয় এগুলো। তবে?

উত্তরে বলেছিলাম যে ওরা ফটোগ্রাফি নয়। রঙ দিয়ে পেন্টিং করা। ছবি তোলা যায় ছবির মতো সাজানো। সাহিত্যও শুধু বাস্তবের ছবি নয়। সৃষ্টি হচ্ছে আমার নিজের স্বপ্নের রূপায়ন। আমার আত্মজীবনও এমনিভাবে আমার সমস্ত গল্প উপন্যাসে ছড়িয়ে পড়েছে। চাকুরি জীবনে বাঁধাধরা ছকের সীমানা সত্ত্বেও যে বৈচিত্র্য জীবনের মরুকে অবিচ্ছিন্নভাবে মায়ায় ভরিয়ে দিয়েছে সেই বৈচিত্র্যই আমার জীবন। তারই প্রসাদে আমার জীবনে সত্যগুলি রসের ময়ানে রূপান্তরিত সাহিত্য।

এই তো গেল দেবেশবাবুর লেখা বইগুলির কথা। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে, তাঁদের অবদান এবং তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা কিরকম ছিল তা দেখা যাক।

তিনি বলেছেন, "সাহিত্যিকরাই সত্যদ্রষ্টা। তাঁরাই জাতীয় সংস্কৃতিতে রূপ দেন, প্রেরণা দেন। অতীতের মহাগাথা শোনান তাঁরা। বর্তমানের ঝড়ের রাতের অভিসারে তাঁদেরই কলম থেকে ঝরে বিদ্যুতের মতো আলো। তাঁরাই দেন ভবিষ্যতের সন্ধান। বাঙালি তাই তাঁদেরই দিকে তাকিয়ে থাকে। বাঙালির যখন বলতে গেলে প্রায় সবই গেছে, তখনও তার সাহিত্য আছে, সাহিত্যের পিপাসা আছে।

আমাদের মনীষীদের একটা বিশেষ কর্তব্য এসে পড়ে। আন্দোলনে যেটুকু গঠনমূলক ও গ্রহণযোগ্য তাছাড়া বাকিটুকুকে বর্জন করার কথা সাহস করে বলতে হবে। নির্ভয়ে বলে দিতে হবে জীবনের রাজপথ হওয়া উচিত কোন্ ভাবধারার মিছিল, কোন্ আদর্শের শোভাযাত্রা। শুধু ঘরে বিতর্ক আর বাইরে বিক্ষোভ এই মূলধনে জাতীয় জীবন গড়া যায় না। আজ মুখরিত ভাঙ্গনের পারে দাঁড়িয়ে বুঝতে হবে যে, পিছনে ফিরবার পথ নেই, তার চারদিকে রয়েছে চোরাবালি। এরই মধ্যে পথ খুঁজে এগিয়ে যেতে হবে। সর্বহারা ছন্নছাড়া জীবনে আবার প্রাণকেন্দ্র ঠিক করে নিতে হবে। মুখ উঁচু করে মাথা তুলে বলতে হবে আবার আমরা বাঁচার মত করে বাঁচতে চাই।

ঘর ভেঙ্গেছে বলে বাঙালি কোনোদিন ভাঙ্গা ভিতটুকু আঁকড়িয়ে বসে থাকেনি। মহাকাল চিরকাল যার কপালে ঝড়-ঝাপটার পঙ্কতিলক এঁকে দিয়েছে সেই বাঙালি মেঘনায় মেঘ নামলে কর্ণফুলিতে ইরাবতীতে নৌকা ভাসিয়েছে। দুই তীরই যখন ভেঙ্গেছে তখন বন্যার বুকেই বাসা বেঁধেছে। ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মেতে সে যখন বাবা-পিতামহের ভিটে থেকে উৎখাত হয়েছে, তখন সে ইতিহাসের ভবঘুরে ইহুদি হয়ে যায়নি। সে কখনও বেঁচে মরে থাকতে চায়নি; মরতে যখন হয়েছে এমনভাবে মরেছে যে, তার হাড়পাঁজরা দিয়ে দেশের মাটিতে নতুন করে সার ঢেলে দিয়ে গেছে। সে হয়নি ইহুদি, হয়েছে দধীচি।

পথনির্দেশ পাচ্ছে না বলে আজ বাঙালি রুদ্ধ আবেগ ও ব্যর্থতার তাড়নায় রাশছেঁড়া ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। সাহিত্যিককে সেখানে শুধু সেই নিরাশায় উদ্দমতাকে রূপ না দিয়ে গঠনমূলক প্রণালীকে পরিচালিত করতে হবে। বাংলার কৈশোরের যৌবনের এই প্রাণচঞ্চলতা ভরা বর্ষার বন্যাস্রোতের মতো উপচিয়ে অপচয় হয়ে যাচ্ছে। বছর বছর দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের মহাদুর্দশা হত। আজ তাতে শুধু বাঁধ দেওয়া নয়, তার জলকে প্রয়োজনমত খাল কেটে নিয়ে যাওয়া, তা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে কলকারখানায় কাজে লাগানো এ সবেরই বন্দোবস্ত হচ্ছে। আর সেই দেশে, সেই সোনা ফলানোর উপযুক্ত মনের জমিতে ভাব দামোদরের বন্যাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে আসবে না কি বাংলা সাহিত্য?

জানি যে সে কাজ সহজ নয়। তবু মনীষার অসাধ্য কিছু নেই। বাংলার সাধনার পথ সংগ্রামে নয়, শান্তিতে; সংহারে নয়, সংহতিতে।

মানুষ যদি সাহিত্যকে না চায়, তবে সাহিত্যও তাকে বাঁচায় না। সাহিত্যিক হাওয়া খেয়ে থাকতে পারেন না। মাথা তার আকাশে, কিন্তু পা দু'খানা তার এই মাটিতেই।

সেই অতীতের ধনধান্যভরা সোনার বাংলার ভাঙ্গা দেউলের আঙ্গিনায় আমরা আজ ভিখারির মতো বসে আছি বলেই কি আমাদের সাহিত্যও ভিখারি হয়ে যেতে পারে? গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনার ত্রিস্রোতার ধারা আজ আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে না বলে কি সাহিত্যের ধারাও ক্ষীণ হয়ে আসবে! সে কি হবে শুধু সুদিনের সম্পদের প্রিয়সখা? দুর্দিনের বিপদের প্রেরণা নয়?

তাই আজ সাহিত্যকে নিছক মনের আনন্দের রঙের সঙ্গে সংসারকে নতুন করে গড়ে নেওয়ার সঞ্জীবনী রস মিশিয়ে নিতে হবে। মানসের আসরে জীবনের সঙ্গে বাসর জাগতে হবে। জ্বালাতে হবে ছাদের উপর দীপমালার সঙ্গে ঘরের কোণে মশাল—তার আলোয় সব ফাটল খুঁজে খুঁজে বোজাবার জন্য। দরকার মত ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়বার জন্য।

এতদিন আমরা মধ্যবিত্ত সমাজের নরম গরম আরামে আমেজে নিজেদের নিয়ে নিজেরা খুশি থেকেছি। সে আত্মপ্রসাদ ভুলে আমরা যে নতুন জাগা প্রতিযোগিতায় সব জায়গাতেই ক্রমশ হটে যাচ্ছি সেটা ভাল করে বুঝতে হবে। স্বীকার করতে হবে নিজেদের উন্নততর করবার প্রয়োজনকে। মানতে হবে যে আমাদের সমাজে সামঞ্জস্য নেই একেবারে। একটা জাতিকে যদি একটা দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে বলতে হবে যে আমরা শুধু মাথা মুখ ও হৃদয় নিয়ে এত দিন চলবার চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু শুধু বুদ্ধি, বক্তৃতা ও দরদ দিয়ে ত জীবন চলে না।

আমাদের যা কিছু গায়ের জোরের প্রমাণ সে কি শুধু ছেলেবেলার গলির মোড়ে দমকা বীরত্বের সাধনাতেই শেষ হয়ে যাবে? আমরা কি জমাট মৌতাত-ভরা ফুটবলের মাঠে অন্য লোকের পায়ের কেরামতি দেখেই খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এসে হজমীগুলি খাব! আমাদের বামঘেঁষা উপন্যাসের নায়কের জন্য খুঁজতে হবে পশ্চিমের শ্রমিক? ডানঘেঁষা কবিতার নায়িকার শ্রী-অঙ্গে চড়াতে হবে দক্ষিণী শিল্পপ্রসাধন? বিশ্বভোজের সভায় আমরা কি হয়ে যাব শুধু টিকিট কেনা দর্শক বা বড়জোর পান্তাভাতের প্রার্থী? হব না সে উৎসবে বাজার ও রান্না করা থেকে প্রথম সারিতে তাড়াতাড়ি পাতা পর্যন্ত সব কিছুতে আগুয়ান আর বরীয়ান?

আজ তাই সাহিত্য শিক্ষাভিমানী মস্তিষ্কজীবী ভদ্রলোককে আশ্বাস দেবে যে পরের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে কুলিমজুরের কাজ করলেও তার মর্যাদা যাবে না, গঙ্গাতীরে ঠাঁই না মিললে আন্দামানই সই, চাকরি দেবীর সঙ্গে বিয়ের আশায় দিন না গুনে সামান্য ব্যবসার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফুটপাতে ঘুরে বেড়ালেও যৌবন-স্বপ্নের সার্থকতা হবে। সাহিত্যই বেকার বাঙালিকে ভরসা দেবে যে তার কৃষ্টি আর ভদ্রতা তথাকথিত ভদ্রলোকত্বের উপর নির্ভর করছে না। তার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার জীবনে, জীবিকায় নয়।

আমরা সেই নতুন পথের সন্ধানে বের হবার জন্য তৈরি হয়ে আছি। একদিন সাহিত্য আমাদের মুখে দিয়েছিল ভাষা, বুকে ভরসা। দেহের অণুপরমাণুতে জাগিয়েছিল বিশ্বময় রাজসূয় যজ্ঞের আহ্বান। একথা আজ মানব না যে এই দুর্দিনেও আমাদের সাহিত্যে চালু থাকবে শুধু একদিকে দীন জীবনের অসহায় কান্না বা দলাদলির মামুলি বুলি, অন্য দিকে নকল ঐশ্বর্যের ক্ষণিক চমক বা মন-দেয়া-নেয়ার জোলো কারবার। শুধু আটপৌরে জীবনের বাঁধিগতের বা দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানির মধ্যেই সাহিত্য সীমাবদ্ধ থাকলে আর চলবে না। সাহিত্যের তো সীমানা নেই।

সেই জীবন-সমস্যার সমাধানের শুরু হোক। সাহিত্য দিক আমাদের নতুন প্রাণ, নবীনতর প্রেরণা। তারই ভরসায় এতদিন সাহিত্যে সব দৈন্য সব আবর্জনাকে উদঘাটিত হতে দিয়েছি। আশা করে এসেছি যে সে-সবকে একদিন ধুয়ে নিয়ে যাবে বাংলা সাহিত্যের প্রাণবন্যা। কারণ তার অন্তরের সাধনা হচ্ছে শাশ্বত, সাময়িক নয়।

তারই আশায় আমরা পূর্বতোরণে আলোর জন্য তাকিয়ে আছি। থাকুক জীবনে শত জ্বালা, শত ব্যথা, ব্যর্থতা, পরাজয়। সব ছাপিয়ে, সব কিছুর উর্ধ্বে বিরাজ করছে জীবনমন্থন করা বিষে নীলকণ্ঠ বা বাঙালির অমৃত-পিপাসা।"

১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসে স্থানীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে পাটনা রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ চিন্তনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন দেবেশ দাশ। তিনি বলেন, "দেশের রাজনীতি, অর্থনৈতিক কোনও পন্থায়ই আর বাঙালির কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। যাহা কিছু এখনও গর্ব করিবার আছে, ইহা একমাত্র বাংলা সাহিত্য। কিন্তু বর্তমান যুগে বাঙালি সাহিত্যকরা সেদিক দিয়াও খুব বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। যদি সাহিত্য সবল এবং সুস্থ না হয়, তবে বাঙালি জাতি হিসাবেও শেষ হইয়া যাইবে। জীবনে প্রেরণা যোগাইবার জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি। আজিকার বাংলা সাহিত্যে সেই প্রেরণা জাতি খুঁজিয়া পাইতেছে না। সাহিত্যে সমস্যা আছে, তাহার সমাধান অথবা সমাধানের ইঙ্গিত নাই। একঘেয়ে দুঃস্থ, যক্ষ্মাক্রান্ত শীর্ণদেহ বাঙালি কেরানি জীবনের আলেখ্য দেখিতে দেখিতে এবং পড়িতে পড়িতে বাঙালি জাতি আজ পরিশ্রান্ত। এই চিত্রাঙ্কন বাঙালি সাহিত্যিকরা সুনিপুণভাবে

করিয়া যাইতেছেন— বছরের পর বছর ধরিয়া। কিন্তু উহা সমাজ জীবনের ফটোগ্রাফ মাত্র, সুনিপুণ শিল্পী-হস্তের অঙ্কিত চিত্র নয়। ফটোগ্রাফ এবং চিত্রাঙ্কনের সহিত যে পার্থক্য সেই পার্থক্যই এই স্থানেও পরিলক্ষিত হয়। শুধু জনগণের দুঃখের চিত্র আঁকিলে তাহা ফটোগ্রাফ মাত্র হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে নবসৃষ্টির সঙ্কেত ও নবপথের সন্ধান না থাকিলে সে চিত্র শিল্প হইয়া উঠে না। সেই জন্যই গত বিশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যে রুশ সাহিত্যের অনুকরণে দুঃস্থ মানবতার বাস্তব চিত্র দেখানো সত্ত্বেও তাহা জাতিকে প্রেরণা দিতে পারিল না, প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারিল না।

গত দশ বছরে বাংলার উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহার বর্ণনা আছে, কিন্তু কি করিয়া যে নবজীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে, নূতন আশার আলোক কি করিয়া ছিন্ন মেঘের ফাঁকে এই জীবনের উপর আসিয়া পড়িবে, তাহা কোথায়ও বলা হয় নাই। বাংলা সাহিত্য কি শুধু যক্ষ্মা রোগীর আর্তনাদেই মুখরিত হইয়া থাকিবে? আরোগ্যের, নবজীবনের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? জাতি যদি সাহিত্যে পৌঁছিবার সন্ধান না পায়, তবে সে সাহিত্যেরও বাঁচিবার সম্পদ মিলিবে না।'' বাংলা সাহিত্যিকগণকে তিনি সেই সন্ধান দিবার ও আশা-আনন্দ ও 'অ্যাডভেঞ্চারে'র সন্ধান দিবার জন্য আবেদন জানান।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টবিংশতিতম অধিবেশন কটকে হয়। সেখানে তিনি বলেন, ''বৃহত্তর ভারতের পটভূমিকায় বাঙালি কোথাও প্রবাসী নয়। যেখানে তার দিবার কিছু আছে, নিবার কিছু আছে, যেখানে সে নিজের নতুন শিকড় গেড়ে লতাপাতা মেলে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সেটাই তার আপন ঠাঁই। বোধিদ্রুমের যে শাখা সিংহলে রোপিত করলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র, সে শাখা সিংহলে গিয়ে প্রবাসী হয়ে যায়নি। সিংহলের মাটি, জল, আকাশ সবাই মিলে তাকে দিয়েছে পুষ্টি। সে প্রতিদানে দিয়েছে অমিতাভের আশা, বিশ্বাসের ভাষা, দুঃখতাপের রৌদ্রদগ্ধ দিনে শান্তির সুশীতল ছায়া। আবার মূল বোধিদ্রুমের সেই শাখারই শাখা সাঁচীতে স্বদেশে এনে বসানো হয়েছে। তাকে আমরা আজ কেহ সিংহলে প্রবাসী বা বিদেশী বলে মনে করি না। সিংহল ও ভারত দুই দেশেই সেই বোধিতরুকে সকলে আপনার জন, পরমজন বলে গ্রহণ করেছে। প্রবাসী বাঙালি জীবনেরও পথের সঙ্কেত আমরা এই বোধিতরুর ইতিহাসে পাই। পরমত্ব যদি আমাদের কিছু থাকে, তবে আমরা কোথাও পর হব না।'' তদানীন্তন যুগসঙ্কটে বাঙালির দুরবস্থা, এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। বাঙালির যুগ-সমস্যাকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ''বৃহত্তর বঙ্গ একটা ভৌগোলিক সীমা নয়, বৃহত্তর বাঙালি একটা মনীষার প্রতীক। সে প্রতীক আজ আমাদের হারিয়ে ফেলার ভয় আছে। যাতে সেই পূর্বপুরুষের গচ্ছিত সম্পদ ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে দেউলিয়া করে না দেয়, সে দায়িত্ব আজ নিখিল ভারতীয় পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের।''

কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ—এই দুই মহাকবির প্রতি তাঁর অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রায় প্রতিটি লেখাতেই প্রকাশ পেয়েছে, এই দুই কবির লেখা থেকে উদ্ধৃতি প্রায়ই নজরে পড়ে তাঁর লেখায়। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ভাষণে, ''এই নর্মদা-সভ্যতা আর গাঙ্গেয় সভ্যতা থেকেই দুই শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সাহিত্যিকের উদ্ভব হয়েছে। বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতকে অক্ষয় আসন, অপরাজেয় সম্মান এনে দিয়েছেন কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ।''

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছিল কিনা প্রশ্নে, দেবেশবাবু বলেন, 'দেখা হয়েছিল, কিন্তু পরিচয় হয়নি। লোকে যেমন মন্দিরে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করে ঠিক তেমনি। ১৯২৮ সালে। রবীন্দ্র পরিষদে একটি সাহিত্য সভা গঠিত হয়। আমরা সবাই সাহিত্য রচনা করতাম, আলোচনা করতাম, কবিতা পড়তাম, প্রবন্ধ পড়তাম। বছরে একবার করে রবীন্দ্রনাথ আসতেন। সেই বছর তিনি তাঁর 'মহুয়া' কবিতার বইখানি সঙ্গে নিয়ে আসেন। তা থেকে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর আবৃত্তি শুনলাম।'' মাত্র একবারই তিনি শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর কথায় ''মানস-ভ্রমণ শান্তিনিকেতনে আমি বহুবার করেছি।''

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর একটি মজার অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসের

শেষ সপ্তাহে কলকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য দেবেশবাবুকে গৌহাটি সাহিত্য সম্মেলন তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। টাউন হলে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র সম্পর্কে তুলনামূলক একটি লেখা দেবেশবাবু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মঞ্চে উঠে তিনি দেখেন, শরৎচন্দ্র আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে হাজির রয়েছেন। তারপরের ঘটনা দেবেশবাবুর মুখেই শুনুন।

"আমি শরৎবাবুকে কিছুটা আক্রমণ করেছিলাম। কারণ, তিনি নারীদের প্রতি সুবিচার করেননি। আমি প্রথমেই একথা বলেছি যে শরৎচন্দ্র নারীপ্রেমিক এবং নারীর জন্য তিনি এত কিছু করেছেন, চোখের জল ফেলেছেন। চোখের জল ফেলেছেন—ঠিক কথা। কিন্তু শরৎচন্দ্র কী করেছেন? তিনি নারীকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখিয়েছেন; কাউকে বড় করে তোলেননি। উদাহরণস্বরূপ আমি বললাম যে কিরণময়ী কী অপরাধ করেছে, সে কেন পাগল হয়ে যাবে? তার তো নিজের কোনও অপরাধ ছিল না। বিরাজ-বৌ কেন সংসার থেকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে!? তার তো কোনও অপরাধ ছিল না। তার স্বামী তাকে কোন্ দোষে শারীরিক নির্যাতন করে? সেজন্য শরৎচন্দ্র তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেননি। তিনি তাকে ঘরছাড়া করে দিলেন। এরকম আরও উদাহরণ দিয়ে আমি বললাম, তিনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন, যা তাঁর করা উচিত ছিল না। মসি দিয়ে তিনি নারীর সপক্ষে অসি ধারণ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে নারীকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্যাতিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। ...অবশ্য এক জায়গায় তিনি (শরৎচন্দ্র) বলেছেন, 'বাঙালির মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে তোমরা আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তিলে তিলে মারবে, আমি তা হতে দেব না।' এছাড়া শরৎচন্দ্রের বইয়ের মধ্যে চোখের জল ছাড়া আর কোনও কথা নারী সম্বন্ধে নেই।

'শরৎচন্দ্র আমার পাশে বসা ছিলেন। আমি লিখিত ভাষণ পড়ে যাচ্ছি। আমার উপায় ছিল না এটা পরিবর্তন করে নরম করে কিছু বলার। আমি ভাবলাম, এই বুঝি আমার পিঠে কিছু পড়বে। সুখের বিষয় তা হল না; কেন তা জানি না। হয়তো আমি আই.সি.এস. অফিসার বলে আমার পিঠের উপর কিছু পড়েনি। যখন আমার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল, তখন শরৎচন্দ্র আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন : 'তুমি জয়ী হও বাবা, তুমি জয়ী হও।'

'তখন একটি কথা আমার মনে পড়ল। কয়েক বছর আগে আমি মধুপুর বেড়াতে গিয়েছি পূজার ছুটিতে। সেখানে অতিদূরে নির্জন জায়গায় আমার বাড়ি ছিল। সব চাইতে কাছে যে বাড়িটি ছিল সেখানে একজন লেখক এসে বাস করছেন। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুনে আমি খুব খুশি হলাম। ভাবলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। অথচ অত বড় নাম-করা লেখক, তাঁর কাছে আমি একজন কলেজের ছাত্র হয়ে কী করে হাজির হই, সেই ভয় ছিল মনে। তবু একদিন সাহস করে চলে গেলাম। গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, আমি আপনার বই পড়েছি। উনি একটু বিস্মিত হলেন। বললেন, বই পড়েছ? কোন বই পড়েছ? আমি দু'চারখানা বইয়ের নাম করে গেলাম, যে বইগুলির একটিও তাঁর লেখা নয়। তখন আমি মনে করলাম, আর একজন শরৎচন্দ্র আছেন। বললাম, 'চাঁদমুখ' বলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি কাগজে। আপনি কি সেই অদ্ভুত বইটি লিখেছেন? তিনি বললেন, 'না'। বুঝলাম, আমি ভুল করেছি। সাহস করে অন্যের বইগুলি তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। কলকাতার বার্ষিক অধিবেশনে এই কথাগুলি তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, 'তুমি কি চিনতে পারলে কোন্ শরৎচন্দ্র আমি?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনিই বলুন, আপনি কোন্ শরৎচন্দ্র? উনি খানিক হেসে বললেন, 'চরিত্রহীন'। শুনে সবাই খুশি হলেন। শুধু তাই নয়, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে 'প্রভোক' (প্ররোচিত) করেছি বলে সবাই আমাকে ধন্যবাদ দিলেন।'

১৯৩৮ সালে গৌহাটিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিলং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে দেবেশবাবুকে এই অধিবেশনে পাঠানো হয়েছিল। এ সম্পর্কে তিনি বলেন : 'অধিবেশনে যোগ দিয়ে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে যাঁরা কলকাতায় আমার শরৎচন্দ্র-বিরোধী বক্তৃতা শুনেছিলেন তাঁরা চিনতে পারলেন। প্রথমেই তাঁরা বললেন, একে বক্তৃতা দিতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি তখন আন্ডার-সেক্রেটারী অব পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট। সম্ভবত সেই কারণে আমাকে বসিয়ে দেওয়ার সাহস কারো ছিল না। কেউ কেউ বললেন, তাঁকে বলতে দেওয়া হোক, তবে বুঝে

শুনে থামিয়ে দিতে হবে। আমি কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছিলাম। খুব ভালো করে পরিষ্কার গলায় আমি বক্তৃতা দিতে শুরু করলাম। শরৎচন্দ্রকে প্রশংসা করে আমি বললাম, তিনি নারীদের দাবি জানিয়েছেন। তাদের জন্য চোখের জল ফেলেছেন। এখন আমরা যদি নারীদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করি, সহানুভূতি না দেখাই সে দোষটা লেখকের নয়, দোষটা আমাদের। আমরা দোষী, আমরা পাপী। পুরুষের রচিত সমাজে, পুরুষশাসিত সমাজে আমরা শুধু পুরুষের কথা ভেবে এসেছি, নারীর কথা কেউ ভাবিনি। একজন যিনি নারীর কথা ভেবেছেন, তাঁকে আমরা উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছি না। একথা বলার পর শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং আরও একজন কর্মকর্তা আমার বক্তব্য সহ্য করতে না পেরে আমাকে থামতে বললেন। আমি থামলাম না। কারণ, আমি দেখলাম শ্রোতারা আমার বক্তৃতা পছন্দ করছে। শেষ পর্যন্ত যখন আমার বক্তৃতা শেষ হল তখন আমি সগৌরবে মঞ্চ থেকে 'ডেলিগেট'দের মাঝে নেমে এলাম। সবাই আমাকে ঘিরে ধরলেন। সভার কথা কেউ শুনতে পেলেন না। প্রমথবাবু আমাকে বারবার অনুরোধ করেন, 'আপনি মঞ্চে ফিরে আসুন অনুগ্রহ করে, না হলে আমাদের সভা ভেঙ্গে যাচ্ছে।'...শরৎচন্দ্রের প্রতি কলকাতায় যে অবিচার করেছিলাম, এই সুযোগে আমি তার খানিকটা প্রতিবিধান করলাম। ভুল স্বীকার করার সৎসাহস আমার আছে।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কোনও শাখা বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করেনি। ১৯৪৪ সালে দেবেশবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে আহ্বায়ক ও সেক্রেটারি হিসেবে নয়া দিল্লিতে অধিবেশনের আয়োজন করেন। সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার বিদেশী প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হয়ে বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি হিসেবে দেবেশবাবু কটকে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। সেই অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন, অতঃপর বৃহত্তর বঙ্গ শাখা বৃহত্তর বাঙালি শাখা হিসেবে পরিচিত হবে। এই অধিবেশনে তিনি প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। পরপর ২০ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর বাসস্থান নয়া দিল্লি থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্যই তিনি সম্মেলনের সভাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কটক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠানটির নাম থেকে 'প্রবাসী' শব্দটি বাদ দিয়ে 'নিখিল ভারত' শব্দ দুটি সংযোজিত হয়।

১৯৫৪ সালে দেবেশবাবুর উদ্যোগে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ভারত সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিরা অর্ধেক ভাড়ায় রেলভ্রমণের সুবিধালাভ করেন।

১৯৫৬ সালে আগ্রা শহরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সে বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'ইউনেস্কো' সম্মেলন যোগদানকারী প্রতিনিধিদের আগ্রা অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে 'ইউনেস্কো' আগ্রায় একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'ইউনেস্কো'র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল রেনী মেহু (Rene Maheu, Later Secretary-General, UNESCO) সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন 'ইউনেস্কো'র সহযোগী সদস্যের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৬০ সালে জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের উপর ইউরোপের প্রভাব' শীর্ষক একটি সুচিন্তিত নিবন্ধ পাঠ করেন। এই নিবন্ধে তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' বইটির সঙ্গে দেবেশ দাশের 'ইয়োরোপা' বইটির তুলনামূলক আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বইটির সঙ্গে 'পথে প্রবাসে' বইটির সমাপ্তি-প্যারা উল্লেখ করেন। অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন : 'দিনের পর দিন যায়। ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। 'সত্যি কি কোনও কালে ইউরোপে ছিলুম?' অপর পক্ষে পাঁচ বছর পরে ইয়োরোপ ভ্রমণ করে দেবেশ দাশ লিখেছেন : 'আমার পূর্বাচল পশ্চিমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রইল'। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'ইয়োরোপা' বইটির সবিশেষ প্রশংসা করেন।

১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারি বম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) শহরে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জার্মানি, স্পেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,

আইসল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্যসহ মোট ৩০টি দেশের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ব পি.ই.এন-এর প্রেসিডেন্ট আল্‌বার্তো মোরাভিয়া (Alberto Moravia)।

কর্মজীবনে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দেবেশবাবু তৎকালীন আসাম সরকারের স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে আন্ডার সেক্রেটারি পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪০ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে তিনি আন্ডার সেক্রেটারী পদে নিয়োজিত হন। পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৬৭ সালে ভারত সরকারের কেবিনেট সেক্রেটারি পদে উন্নীত হন। পুরো ৩৫ বছর সরকারি চাকরি করার পর ১৯৬৯ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ভারত সরকার প্রেরিত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে তিনি বহু দেশ সফর করেন। কিছুকাল তিনি 'ইউনিসেফ'-এ কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া অক্সফোর্ড, পেনসিলভেনিয়া, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক এবং প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ভাষণ দান করেন।

দিল্লির কর্মজীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সরকারি অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর আড়ালে সমালোচনা করে বলতেন, দেবেশ দাশ সাহিত্যচর্চা করে সময় কাটান; অফিসের কাজ কখন করেন? আর যাঁরা শুধু সাহিত্যিক ছিলেন তাঁরা বলতেন, অফিসের কাজ করার পর তাঁর সাহিত্যচর্চার সময় কোথায়? দেবেশবাবু বলতেন, যে কথাটা এঁরা কেউ ভেবে দেখেননি তা হল—ক্লাবে বসে পানাহার করে যে সময় ব্যয় হয় তা চিন্তাভাবনা ও লেখাপড়ার কাজেও ব্যয় করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কমল দাশ ঢাকার বারদি নাগ বংশের জাস্টিস কে.সি.নাগের কন্যা ছিলেন। তিনি কনভেন্ট স্কুল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। দেবেশবাবু আই.সি.এস. পরীক্ষা পাশের পর দেশে ফিরে তাঁর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। পরিণত বয়সে কমল দাশ লিখতে শুরু করেন এবং সাহিত্যিক হিসেবে তিনিও প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস "অমৃতস্য পুত্রী" ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যে বইটির অনেকগুলি সংস্করণ ছাপা হয়। তিনি মোট ৩টি ভ্রমণকাহিনী, ৭টি উপন্যাস, এবং বেশ কয়েকটি ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর অনেকগুলি বই-ই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১৭ই মার্চ কমল দাশ লন্ডনে পরলোক গমন করেন।

দেবেশ দাশ এবং কমল দাসের একমাত্র কন্যা অনুরাধা পারিখ পেশাগতভাবে ব্যারিস্টার। তিনি লন্ডনে বসবাস করেন।

১৯৯৮ সালের ৩১শে আগস্ট দেবেশ দাশ বার্ধক্যজনিত কারণে লন্ডনে পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুর প্রায় এক বছর আগে থেকে দেবেশবাবুর যেন একটা অনুভূতি, ইংরেজিতে যাকে বলে premonition হয়েছিল যে উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। শেষদিকটা থাকতেন লন্ডনে মেয়ে অনুরাধা এবং জামাই ভরতের কাছে। মাঝে মাঝেই ফোন করতেন, বলতেন আর বোধহয় কলকাতায় আসতে পারবেন না এ জীবনে, তাঁর প্রিয় বাংলার মাটিতে বাঙালিদের মধ্যে বোধহয় তাঁর শেষ শয্যা গ্রহণ করা হবে না। যতই উৎসাহ দিতাম ওসব কথা না ভাবার জন্য, বিষাদের সুরটি যেন মুছতো না। বিদায়ের সুরটিই ফিরে আসতো বারে বারে।

দেবেশবাবুর প্রয়াণের পর অনুরাধা ও ভরতের সৌজন্যে একটি লেখা পাই। ওঁর নিজের হাতের লেখা। পড়ে মনে হল এ যেন আমার আগে বলা premonition-এর সাক্ষ্য। একটি epitaph-এর মতো লেখা, ইংরেজিতে :

"Out of the dust of this earth
Love bestows immortality on death
And leaves an undying message
In desolation though it's beyond help
On the heart of marble masses
I leave behind in moonlit letters
My own life's private signature,
On the scroll of this eternity."

ভূমিকা

দেবেশচন্দ্র দাশ বাংলা সাহিত্য জগতে অনেক খ্যাতি পেয়েছেন। কর্মজীবনে পেয়েছেন অনেক সম্মান। পাঠকদের কাছে পেয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। জীবনের শেষ লগ্নে প্রবাসে থাকাকালীন একটি ক্যাসেট তিনি আমাদের উদ্দেশে রেখে গেছেন। অনুরাধার সৌজন্যে এটি জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে তিনি বলেন, "সেই চির-সুন্দরের দেশে অস্তাচলের শেষ রশ্মিটি মিলিয়ে যাবার আগে আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই আমার শেষ কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার...।"

সবশেষে তাঁরই একটি কবিতা 'প্রথম ধরেছে কলি' থেকে উদ্ধৃত করি :

"জীবন যবে বিদায় নিবে ধরণীবক্ষ হ'তে
আঁখির পরে আঁধার যবনিকা
মৃত্যুকালিমা ঘনায়ে আসি নামিবে ইন্দ্ররথে
পরাবে ভালে তাহারি রাজটীকা

সমুখে আলো উদিবে ধীরে
আমারে হাসি স্মরিল কিরে?
চাই যে আমি বাসিতে ভালো
তাহাকে তারি তরে।"

এবার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাবার পালা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবদুল মতিন সাহেব দেবেশচন্দ্রের তিরোধানের পর "শৈলী" পত্রিকায় একটি সুন্দর তথ্যপূর্ণ নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেখান থেকে আমি অনেক তথ্য ব্যবহার করেছি। তাঁকে জানাই আমার ঋণ ও কৃতজ্ঞতা। অনুরাধা আমাকে অনেক কাগজপত্র দিয়ে বিশেষ সাহায্য করেছে। আর তারই দেওয়া পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, মাসিক বসুমতী এবং আরও অনেক পত্র-পত্রিকা ও দেবেশবাবুর স্বহস্তে লেখা কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমাকে এই লেখায় বিশেষ সাহায্য করেছে। আর 'মিত্র ও ঘোষ'-এর কর্ণধার আমার অনুজোপম শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছেন এবং আমাকে এই লেখাটি লিখতে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো কি ঠিক হবে? আশা করি এ গ্রন্থাবলীটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

রাজোয়ারা

উৎসর্গ

মোমবাতি হাতে নিয়ে অম্বরের অন্ধকার শিশমহলে ঢুকেছি। দেয়ালের স্ফটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি অতীতের ছবি। কিন্তু এক দুষ্টুমিভরা মুখের হাসি ঝিকমিকিয়ে উঠল সেখানে; অনুরাধা কত্থকের ছন্দে নেচে চলেছে...

সেই অনুরাধাকে—

এক

সুন্দর সুঠাম চরণ একখানি বিরাট হাডসন গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

নয়া দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে ময়দানের নির্জন অন্ধকারে শুয়ে ছিলাম। তৃণশয্যার সুকোমল আরামে। সেই তৃণের শয্যায়, যা এই মরুর মতো শহরের বুকে গজাতে ও বাঁচাতে যা খরচ, তা আমার বিছানার দামের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রতি সন্ধ্যাতেই কাজের শেষে দিনের অবশেষে এইখানে নিরিবিলি কোণে আমি একটু শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসি। সারাদিন সরকারী দপ্তরের (সেক্রেটারিয়েটের) হাত থেকে রেহাই নেই। স্বাধীনতা হওয়ার পর পরিভাষায় পণ্ডিতরা আবার নাকি ওই বিশাল পাষাণ দুর্গ দু'খানার নাম দিয়েছেন মহাধিকরণ। তা দিন, ক্ষতি নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে, নাম পালটানোর ফলে কাজের কোনও সুরাহাই হয় নি। ওই পাষাণ দুর্গ দু'খানা ইংরেজিতে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক নাম বহন করে বুকের উপর সমানভাবেই জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে আছে।

যুদ্ধের সময়ের কাজের চাপ আর তার পরের বছরটা নেতা ও রাজনীতিকদের আনাগোনা আলাপ-আলোচনা সরকারী দপ্তরকে দিশেহারা করে তুলেছিল। তার ঠিক পরেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এল বিপুল উদ্বাস্তু সমস্যা। সব সরকারী দপ্তরকেই তা ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এমনই কাজের চাপ বাড়ল যে বাইরে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না।

এমনই কাজের চাপ বাড়ল যে কেউ বসে কাজ করতে সময় পায় না। শুধু সময় পায় সেই তাড়াহুড়ো অবস্থাটা বাইরের লোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে। একদিন পূর্ব বাঙলার এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোককে একজন সেটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন,—ভাগ্যিস মশাই, পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। মাথায় দাঁড়ালে যে রকম মাথায় সব রক্ত উঠে পড়ে, পায়ে দাঁড়ালে সে রকম হয় না।

কিন্তু ভদ্রলোক নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় ব্যাকুল। ফস করে উত্তর দিলেন—ভয় নেই, ভয় নেই মশায়। আপনার পা দু'খানি তো আর শূন্য নয়।

এই বলেই তাঁর মাথার দিকে অর্থপূর্ণ একটা চোরা চাহনি হানলেন।

কারও সঙ্গে অফিসে দেখা হলেই চোখে ব্যস্ততা ও মুখে ত্রস্ততার ভাব ফুটিয়ে বলে বসবেন,—দাঁড়ান মশাই, মরতে সময় পাচ্ছি না।

উনি মৃত্যুশয্যায় শেষ শয়ন করতে সময় পাচ্ছেন না বলে ইনি যে কেন দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবেন তার অবিশ্যি কোনও সদুত্তর নেই।

ইনি তখন ওনার সমান বা তার চেয়ে বেশি কাজের চাপ প্রমাণ করবার জন্য গত মহাযুদ্ধের দান, হাতাহীন বুশ-শার্ট অর্থাৎ ঝোপ কামিজ বা শার্ট ও কোটের কম্বিনেশন আউটফিটখানার কলার দু আঙুলে দুমড়াতে দুমড়াতে বলে উঠবেন,—আর বলবেন না মশাই। জন্তু (জয়েন্ট) সেক্রেটারির যে মেজাজ, সকালে বিকালে দু'বার করে ফাঁসি এই দেয় কি এই দেয়।

সকালে ওই শেষ কর্মটি একবার সেরে রাখলে বিকেলে আবার কি করে সেটা নতুন করে করা সম্ভব তার হিসাব চাওয়ার আর সময় হয় না।

তবু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ওঁরা এক-আধটা রসিকতা করবার সময় খুঁজে নেন। রসিকতা নয়, সঞ্জীবনী রস।

ভায়া, একটা বড় আবিষ্কার করেছি।

কি রকম? শিগ্‌গির পেটেন্ট নিয়ে ফেলুন। এখনও বাজার গরম আছে। টু পাইস মিলে যেতে পারে।

না, সে রকম নয়। জানেন, আইবুড়ো আর বিবাহিতের তফাতটা?

কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ে উনি বললেন,—কি রকম?

ইনি হাসলেন—আইবুড়োর কোটে বোতাম থাকে না আর বিবাহিতের ছাই, কোটই থাকে না।

নিজের বাড়িতে বালখিল্য রেজিমেন্টটির কথা স্মরণ করেই বোধ হয় উনি বললেন—এবার বুঝেছি কেন আমার শার্টেরও শর্টেজ হতে আরম্ভ হয়েছে। তা ভায়া, বেঁচে থাকুক আমাদের বুশ-শার্ট।

ইনি সায় দিলেন—সেটাই তো বলতে চাই। শার্টও নয় কোটও নয়, তবু কিছু একটা গায়ে চাপিয়ে ফাইলের জঙ্গলে ঢুকতে হবে তাই এটির নাম হয়েছে বুশ-শার্ট। মশাই, যে এ জিনিসটা আবিষ্কার করেছে আর এই নাম দিয়েছে সে মহাশয় ব্যক্তি। যেমন তার দরদ তেমনি রসবোধ।

এই ঘন-ঘোর জঙ্গলের মধ্যে সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য পাল্লা দিয়ে প্রাণ দিচ্ছে অর্থাৎ দিতে প্রস্তুত অর্থাৎ দেবার যখন সুযোগ নেই তখন বদলে মেহনত দিচ্ছে এমন একখানা ভাব সকলেরই। যত না কাজ তার শতগুণ মহড়া, যত না সিদ্ধান্ত তার হাজার গুণ পাঁয়তারা প্রাণ সংশয় করে তুলেছে। দেশের জন্য যদি প্রাণ দিতেই হয় তাহলে সাদামাটা গোবেচারা জীবনে এই একটা নতুন পথ দেখা দিয়েছে।

আমিও সে হিসাবে নিত্য দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছি। রোজই। মায় ছুটির দিনগুলিতেও। কিন্তু সেদিন যে, ছাই, আর পাঁচজনও অফিসে গিয়ে হাজির হয়।

কেন? আমাদের দিনের পর দিন সামান্যতার মধ্যে অসি ঘোরে না বলে কি আমরা পেট্রিয়ট নই? জানেন, মসী আমরা কত চালাই রোজ?

অতএব কোমর বেঁধে দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সবাই। একেবারে কলম উঁচিয়ে।

দুঃখের বিষয় কেউ কেউ বিদেশী ট্রাউজার ছেড়ে স্বদেশী চুড়িদার ধবাতে কোমর বাঁধার অর্থাৎ কোমরে ট্রাউজারের বেল্ট বাঁধার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। (ভেবে দেখুন, টাইটেন ইয়োর বেল্ট কথাটিব মধ্যে কত গভীর তথ্য লুকানো আছে।)

অবশ্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁরা নয়া হিন্দুস্থানের পোশাক আচকানে গলা বাঁধা দিয়েছেন।

অফিসে এইরকম কাজের তোড় আর অফিস থেকে বের হলেই পাঞ্জাব সিন্ধু থেকে পালিয়ে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর স্রোত। দিল্লির পথে পা ফেলবাব উপায় নেই। ভিড় থেকে দূরে সযত্নে সাজিয়ে রাখা নয়া দিল্লির আভিজাত্য আর বজায় বইল না। কাজেব শান্তি যদি বা হয় সন্ধ্যায়, শহরে স্বস্তি বা শান্তি নেই সাবা দিন ও সারা রাতে।

কাজেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই নিরালা তৃণশয্যায় এসে বসি একটু দম নেবার জন্য। গায়ের জামাটা খুলে পাশে রেখে দিয়ে মনে মনে প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়ালপোলের মতো বলি—এইখানে রইলেন সরকারী চাকুরে মহাশয়।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেক্রেটারিয়েটের বিরাট যন্ত্রটা এমনভাবে আমার মতো সামান্য একটা পেরেক বা ইস্ক্রুপকে পর্যন্ত পাকড়িয়ে রেখেছে যে, এই নিরিবিলি অন্ধকারে শুয়ে থাকলেও সাউথ ব্লক সেক্রেটাবিয়েটের ছায়াটা চোখের সামনে থেকে সরে যায় না।

এ-হেন-প্রাণ দিতে প্রস্তুত পৈতৃক দেহ-পিঞ্জরের একেবারে গা ঘেঁষে মাঠের উপর এসে থামল সুদীর্ঘ একখানা হাডসন মোটরকার। তার কোনও বাতিই জ্বালানো নেই। দূবে দুখানা আলোর বিন্দু হঠাৎ নিভে গিয়েছিল—অন্ধকার আকাশে দুখানা অজানা তারা হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়াব মত।

তারপর কি হল, তা কে লক্ষ্য করে?

ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে এই মোটরখানা নিঃশব্দে এসে আমার পাশে দাঁড়াল। কোনোমতে চাপা পড়তে গিয়ে বেঁচে গেলাম। বেঁচে যখন গেলামই, তখন আর তা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ কি?

আর অপর পক্ষও তো পাল্লা দিয়ে তেড়ে আসতে পারে যে, নির্জনে অন্ধকারে যে গা ঢাকা দিয়ে মাঠে শুয়ে থাকে, হাডসনেব তলাতেই যদি তার গতি হয় তাতে দোষটা কার? যে চাপা দেয় তার? না, যে চাপা পড়ে তার?

কিন্তু কোনও কথাই ভাবার সময় হল না। কারণ সুন্দর সুঠাম চরণ একখানি গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বাকি দেহবল্লবীও বাইরে আসার আশায় উৎসুক। কৌতূহলে আমিও উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দেখি, কি হয়।

নিঃশব্দে, কোন্ অলক্ষিত দিক থেকে এগিয়ে এল সাইকেল হাতে এক যুবক। মোটরের কাছে সাইকেল রেখে দুজনে বসল তৃণশয্যায়। মোটরে ঠেস দিয়ে।

যে ঘাসের উপর আমি শুয়ে আছি, সেই ঘাসের উপরে। এপারে আমি, মোটরের ওপারে ওরা। আর চারপাশে নয়া দিল্লির নির্জন সন্ধ্যা।

প্রথমেই ইচ্ছা হল উঠে পড়ি, সরে পড়ি এই যুবক-যুবতীর নিভৃত ও নিঃসন্দেহ আলাপনের মাঝখান থেকে। কিন্তু ততক্ষণে যবনিকা উঠে গেছে। নায়ক-নায়িকা মঞ্চের মাঝখানে । অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেছে

রীতিমতো। আমি যদি যবনিকা পাত করে উঠে পড়তে চাই আর ওরা টের পেয়ে লজ্জা পেয়ে যায় তাহলে ওদের এই দুর্লভ সন্ধ্যাটির যা যতিভঙ্গ হবে, তা ফিরে আসবে কিনা কে জানে।

ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ বধ করেছিল বলে জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হল না, কিন্তু ভাবের আবেগে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়ে গেল। আমি কি সেই ব্যাধের মতো শাপমন্যি কুড়োব?

তার চেয়ে বরং থাকুক না এই ক্রৌঞ্চমিথুন বিনা ব্যাঘাতে বিনা সন্দেহে তাদের নিভৃত স্বপ্নরাজ্যে। লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা পাপ? তা কত পাপই তো করে মানুষ কত সময়। আজ এদের সুবিধার জন্য আমার একটু পাপই না হয় হল। মহাভারত নিশ্চয়ই অশুদ্ধ হবে না।

হাডসন মোটরকার ও সাইকেল।

মোটরকারে নাম্বারপ্লেটের মধ্যবিত্ত মার্কার বদলে শোভা পাচ্ছে টকটকে লাল রঙের একটি প্লেট। বোঝা শক্ত নয় যে, কোনও দেশীয় রাজার নিজের গাড়ি। অন্ধকারে নামটা পড়া গেল না, কিন্তু কৌতূহল চোখ মেলে রইল।

আর সাইকেল? বড় জোর দিল্লি মিউনিসিপ্যালিটির একটা গোল চাক্তি লাগানো থাকবে। সাইকবিহারী যুবক সে খরচটাও বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টায় হয়তো বা টিকিটই নেয়নি। কে তার খবর রাখে?

দুজনেই যেন একটু নিস্তব্ধ।

আমিও তাই নিস্পন্দ।

আস্তে আস্তে যুবকই নীরবতা ভাঙল। সারারাত্রির গহন অন্ধকারের পর যেন প্রথম উষার একটুখানি আলো মহাসাগরের ঢেউয়ের দোলার উপর একটুখানি চিকমিক করে উঠল।

তাহলে তুমি সত্যি সত্যিই দিল্লি ছেড়ে চললে?

একটুখানি চুপ করে থাকার পর যুবতী উত্তর দিল—হ্যাঁ, তাই তোমায় আজ এখানে আসতে বলেছি।

এ যে রীতিমতো নাটক দেখছি। এবং একেবারে পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা উঠেছে।

ভাবলাম, উঠে পড়ি। কি হবে এসব যুবক-যুবতীর নিভৃত আলাপন গোপনে শুনে। "বয় মিট্স গার্ল"—এ তো নিত্য-নৈমিত্তিক কাহিনি। নতুনই বা আর কি হবে?

কিন্তু বেচারিরা যে টের পেয়ে যাবে। ওদের নিজেদের দিক থেকে সেটা আরও লজ্জার কথা। বরং রাত্রি আরও একটু ঘন অন্ধকার হয়ে এলে চুপিসাড়ে সরে পড়বার চেষ্টা করব।

কিন্তু ব্যাপারটাও ততক্ষণে একটু ঘন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করো না। জান তো সব অসুবিধা।

কেন? অন্তত চিঠিও লিখতে পারব না? এ পর্যন্ত অবশ্য দরকার হয় নি। কিন্তু এখন থেকে না লিখলে তোমার খবরও যে পাবো না। ধর না, যদি একটা ছদ্মনামে "পোস্ট রেস্টান্টে" করে চিঠি পাঠাই। ডাকঘরে এসে চিঠি জমা হয়ে থাকবে, আর তুমি সেখান থেকে নিজে হাতে নিয়ে আসবে।

না, না, সেটা তো দিল্লি শহর নয়। পরিচয় প্রকাশ না করে কে ছদ্মনামে চিঠি আনতে পারবে? আমরা কত পর্দানশীন তা জানো না?

কিন্তু থাকবো তাহলে কি নিয়ে?

এই রে। আবার সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠলে। দেখ বাপু, আমার সেন্টিমেন্ট ভালো লাগে না।

জানি, কিন্তু মানি না। এটা শুধু তোমার একটা পোজ।

পোজ? ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের জীবনে পোজের জায়গা নেই। চারদিকে সব মেয়েকেই দেখছি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে পর্দাব পিছনে চলে গেল। যেন পৃথিবী থেকে ধুয়ে-মুছে গেল। স্বামীর বিনা হুকুমে ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হবে না। না হল শিক্ষা, না মনুষ্যত্ব। যে জীব হয়ে জন্মেছিল তার উপরে উঠবার সুযোগ এ জীবনে আর হল না।

আমাদের মুখে হলিউডের হালফ্যাশানের 'প্যান কেক' মেক-আপ যদি দেখতে পাও, জেনো যে সেটা হচ্ছে পতি-দেবতার আধুনিকতা ও বাহাদুরিরই জয়পতাকা। ঠিক গা-ভরা জরি-জহরতের মতই। ওটা শুধু মুখের মেক-আপ, মনের কোনও ছাপ তাতে নেই। সফিস্টিকেশন হচ্ছে সভ্যতার ভেজাল। সেই মজাদার ভেজালের স্বাদ সে পায় না কখনও। এমন কি রাওয়ালার* চোখের জলেও ভেজাল নেই।

---

*রাওয়ালা = রাজ-অন্তঃপুর

তোমার চোখে জল ফোটাব অন্যরকমভাবে—নিজের উপর বিশ্বাসের ভাব দেখিয়ে বললে যুবক।

তোমার এই দৃঢ়তা দেখে চমৎকৃত হলাম—যুবতীর কণ্ঠেও একটু ব্যঙ্গের ভাব ফুটে উঠল—আশা করি এই দৃঢ়তা তোমায় শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগের হাত থেকে রক্ষা করবে।

তুমি, ওঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর হতে পার। দাও, তোমার হাতখানা আমার হাতে একটুখানি রাখি। তাও ভালো লাগবে। পদ্মা, পদ্মা।

হাতখানা হাতে রাখল কি না অন্ধকারে টের পেলাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মিছে বলেন নি যে আঙুলে আঙুলে কথা বিনিময় সবচেয়ে বড়, তা পুরোপুরিই টের পেলাম। শুনতে পেলাম মেয়েটি ঠাট্টায় গলে যাওয়া সুরে বলছে—এখন তুমি কি কৃতজ্ঞ বোধ করছ?

একটু একটু আরম্ভ করেছি।

আরম্ভ করেছ? তোমার এই ঔদ্ধত্য—ঠাট্টায় পাতলা স্বর রাগে গাঢ় হয়ে এল—তোমার এই ঔদ্ধত্য আমি পছন্দ করি।

জয়ের হাসি হেসে যুবক বলল—আমি জানি তা।

কিন্তু এ জয় নয়, পরাজয়। প্রমাণ এল হাতে হাতেই।

আচ্ছা, তাহলে তোমায় চিঠি লিখব কিন্তু, মনে রেখো, পদ্মা।

কোথায়? কোন্ ঠিকানায়? তুমি আমার কতটুকু জানো? Love by the wayside, তাকে কতটা টেনে আনতে চাও?

শোন, দুটো আলাদা কথা হল। আমি তোমার সবটুকুই জানি। অবশ্য তোমার ঠিকানা জানি না। তবে সেটা গৌণ। তোমায় জানাই আসল জানা।

হাউ ইমপসিবলি রোমান্টিক। জয়, তোমাকে দিয়ে কোনও আশা নেই।

ভরসাও নেই তোমার, পদ্মা। তোমায় আমি খুঁজে বের করবই। ছিঁড়ে ফেলব, টেনে ছিঁড়ে ফেলব this shroud of mystery (এই রহস্যের আবরণ)। দেখব তুমি রাজস্থান না সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, না কোথাকার কোন্ রাজার মেয়ে। ঠিক করে জানতে দাও নি কিছুই। শুধু রহস্যের পর রহস্য বাড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু এবার বের করে নেবো। তোমার এই মোটরের নাম্বার প্লেট থেকেই আমার প্রথম সন্ধান শুরু হবে।

থাক, থাক, জয়, আর বাহাদুরি করতে হবে না। আমায় জ্বালিয়ো না বলছি। কলেজে আমার নাম পদ্মা রাখা হয়েছিল সুবিধার জন্য। আমার আসল ঠিকানা ও নাম আমার পিতাজীই হোস্টেলে লেখান নি। কারণটা আন্দাজ করে নিয়ো। আর এ গাড়ি আমাদের স্টেটের নয়, তাও তোমায় জানিয়ে রাখলাম। আমার স্থানীয় অভিভাবকের কাছ থেকে এনেছি। যেমন মাঝে মাঝে নিয়ে আসি সন্ধ্যাবেলা একা ড্রাইভের জন্য! বলা বাহুল্য, তুমি তার কাছ থেকে আমার ঠিকানা পাবে না। সরি জয়, ভেরি সরি, কিন্তু আই কান্ট হেলপ্।

একটু যেন নমনীয় হয়ে এল যুবতী। পদ্মার হৃদয়পদ্ম কি তাহলে বিকশিত হবে?

না, তা হবার নয়। পদ্মা ওকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল যে, ভালোবাসা বড় সেকেলে কথা। ওর প্রপিতামহীর পিতামহীরা যখন আগুনে পুড়ে জহর-ব্রত করতে যেত, তখনও সে আগুনে ভালোবাসার শিখা লকলক করে জ্বলে উঠত বলে পদ্মা মনে করে না। হয়তো কোনও দিন ভুলে একটু ভালোবাসা গজাত, এই দিল্লির প্রান্তরে যেমনভাবে মনের ভুলে বর্ষার সময় ঘাস গজায়। কিন্তু আসল রূপ তার এই রসহীন ধূসর ধূসরতাতে।

বরের বাড়ির দাসীর ইন্সপেক্‌শন আর সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে বংশ-কৌলীন্যের সঙ্গে সোনা-রুপোর ওজন্ যাচাই করে যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হত, বাই জোভ, তার আবার ভালোবাসাবাসি কি?

রাজোয়ারার রাওয়ালাতে (রাজস্থানের রাজ-অন্তঃপুরে) মেয়েদের জন্যে আছে শুধু স্বামীর বংশের জন্য সন্তান ধারণ, স্বামীর সম্মান বা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আত্মত্যাগ। তা সে আত্মহত্যা করেই হোক বা আত্মসম্মান পকেটস্থ করেই হোক্।

ছোঃ, এই দেশে আবার ভালোবাসা! পর্দার আড়ালে পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে ঢেউহীন জাবরকাটা জীবনে যেখানে একটু বাইরের মনমাতানো বাতাস বা পরকীয় কটাক্ষ পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে না, সেখানে কোথায় ভালোবাসা? সাধে কি এই দেশে কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই, থাকতে পারে না। থাকা উচিত হবে না।

অন্ধকার আকাশটা যেন একটু আগে লালচে হয়ে উঠল।

আমিও শিগগিরি রাজস্থান যাচ্ছি। জীবনে এই প্রথম দেখতে পাবো সে দেশকে, যে দেশে বইয়ের পাতার ভিতর দিয়ে তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ তো বড় সুন্দর ভূমিকা হল তার। বহু অজানা ও অভাবনীয় আবিষ্কারের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু, তুমি, তুমি তো আমায় ভালোবাসো! গদ্‌গদ রুদ্ধকণ্ঠে বলল জয় নামে এই অজানা সাধারণ কোনও ঘরের যুবক।

ষষ্ঠীর রাতে রেড়ির তেলের আধো-অন্ধকারে চোখে কাজল পরাতে পরাতে জয়কুমার, কি জয়চাঁদ, কি রামজয় এইরকম কোনও নাম বোধ হয় মা ঠাকুমা দিয়েছিল। তারার আধো-আলোর মায়ায় সে নাম হয়ে গিয়েছে শুধু জয়। যেন ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে রূপকথার এক রাঙা রাজকুমার। এনে দিয়েছে কাছে কোন সুগোপন অভিজাত রাজপুত বংশের ছদ্মনামী পদ্মাকে। মুছে দিয়েছে দেশ বংশ সংসার ও অপরিচয়ের আড়ালকে অভিসারের নীল নিচোলের নিচে।

শুধু জয় ও পদ্মা। মানবতার রঙ্গমঞ্চে এইটুকুই যথেষ্ট।

কিন্তু অবোধ জয়ের পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নয়। সে চায় পরিচয়। সে চায় প্রণয়, এমন কি পরিণয়ও হয়তো ভবিষ্যতে।

আবার বিমুগ্ধ স্বরে সে বলল, কিন্তু তুমি তো আমায় সত্যিই ভালোবাসতে। এখন দেশে চলে যাবে, তাই পরিচয় না জানিয়ে চলে যেতে চাও। তাই বোধ হয় সে কথা অস্বীকার করছ।

It was a great fun Jay, darling সে ভারি মজা ছিল, জয় ধন।

Don't try to kid me now. আহত স্বরে জয় তাকে নিয়ে এরকম ছেলেখেলা করতে বারণ করল। তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে, এখনও বাসো।

তুমি ভ-া-া-রি মিষ্টি, জয়। অনুমান করা শক্ত হল না যে, কৌতুকে এমন কি ব্যঙ্গে পদ্মার পদ্ম আঁখি প্রস্ফুরিত হয়ে উঠেছে।

বেচারা অবোধ জয়। সহজ সরল জয়।

সে আবার বলে উঠল, তুমি তো কিছু বললে না এ কথাতে। তুমি কি আমায় ভালোবাসতে না?

একটুখানি মৌনতা। একটুখানি হয়তো মনে মনে কথা কওয়া, একটুখানি বুক চাপা দীর্ঘশ্বাস।

ভালোবাসা? সেটা তো বড় বড় কথা হয়ে গেল, জয়। দেখ, তুমি মুখ নীচু করে আছ আর মাথার সব চুলগুলি ঝুলে পড়েছে। কবি-প্রতিভার অগ্নিশিখা। দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে নিচের দিকে ঝুলে আসছে। হাউ ফানি!

অগ্নিশিখাগুলি হয়তো মনের আগুনে গরম হয়ে আবাব মাথাব উপবে স্বস্থানে ফিরে এল। জয় কিন্তু গুম্‌ হয়ে রইল।

বুঝেছি। নিরাসক্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল পদ্মা। বুঝেছি এখন আমায় গুন্‌গুন্‌ করে রবিবাবুর ওই বাঙলা গানটা শুনিয়ে দিতে হবে। কে না তোমার বন্ধু, যে ওটি হিন্দিতে অনুবাদ করেছিল? ধূর্জটিরাম ছিল তার নাম। তাকে বলো যে, ও গানটা যেন তার নিজের ঘরানার জন্য তুলে রাখে। কোনও একাকিনীকে শোনালে ফল হবে না।

না ভুলাওঁ রূপে সে
জীতুঁ তুম্‌হে মৈ প্রেমসে।
হৃদয় পট না হাথ সে
পর খোলুঁ সঙ্গীত সে।
(রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব;
হাত দিয়ে দ্বার খোলাব না
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।)

গশ্‌, হাউ ইম্‌পসিবল্‌, জয়। এ গীতি নাকি আবার কারও কানে গুন্‌গুন্‌ করে গেয়ে শোনাতে হয়।

চুপ করে রইল জয়। হয়তো আহত অভিমান। হয়তো আড়ষ্ট অনুযোগ। কিন্তু সে চুপ করেই রইল।

নীরবতা ভেঙে পদ্মাই আবার বলল, জানি আমার সঙ্গে দেখা হবে না বলে তোমার মনে কষ্ট হবে। কিন্তু সে তো হাতের কনিষ্ঠ আঙুল থেকে একটা হীরের আঙটি পড়ে যাওয়ার মতো। অনামিকা তা জানতেও পারবে না।

চুপ কব পদ্মা, তুমি বড় ক্রুটাল। যে অনুভব তোমার নিজের নেই, তার প্রতি এত বিদ্রূপ করা তোমার উচিত নয়। যা তোমার নেই তাকে নিন্দা করে উড়িয়ে দিতে পারো না।

বোধ হয় পদ্মা বিদ্রূপে মুখখানা হাসি-হাসি করেই বসে রইল। কথাটা ওর কাছে এত তুচ্ছ যে উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না।

জয়ই আবার বলল, তবে শোন। এটাও তোমার একটা পোজ। প্যালেসেব বিলাস ও কলেজ হোস্টেলের পালিশ তোমার মনের উপর ছাপ মেরে দিয়েছে। তাই তুমি নিজের মনের ব্যথাকে ঢাকবার জন্য একথা বলেছ। তাই তোমার প্রেমস্বপ্নকে শুধু 'ফান' বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছ।

আমার প্রেমও ছিল না, স্বপ্নও ছিল না কোনোদিন। ভালো লাগত, মজা লাগত। ঠিক কেওড়া শরবত যেমন। একটু আরাম লাগে, আমেজ লাগে। বাস্ তার পর আর কিছু নেই। জিন-মেশানো গিমলেট খেয়ে ঘরে গিয়ে নেশায় মাথা ভার করে পড়ে থাকবার লোক আমি নই।

তবে কেন আমায় নিয়ে নাচালে? কেন আমায় এ নেশা ধরালে? জয়ের কণ্ঠে ব্যাকুল ভর্ৎসনার সুব।

কেন? আমার মজা লাগত বলে। ইচ্ছা হয়েছিল বলে। আমার দেশের বংশের ধারার বীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবতে চেয়েছি বলে। আরও শুনতে চাও?

জয় হয়তো কানে বা ঠোঁটে আঙুল দিয়েছিল। তার নীতিবাগীশ মন সংকুচিত হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে শুধু খুব নিচু স্ববে বলল—ভালো না বেসেই?

অসহিষ্ণু হয়ে পদ্মা বলে—আঃ, তুমি কেন খালি খালি এর মধ্যে ভালোবাসা আমদানি কবছ বুঝি না।

বোকা, আমি মহা আহাম্মক। এই বলে চুপ কবে রইল যুবক।

চারদিক এত নীরব হয়ে এসেছে যে মোটরের ঘড়িটার টিক্‌টিক্ শোনা যাচ্ছে। আমার নিজেব নিশ্বাস স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। আর যুবক যদি একটা নিরুদ্ধ কান্নার উচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে তার ঢেউ এসে ওই যুবতীকে বোধ হয স্পর্শ কবে যাবে।

কি, এখনও প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? মৃদু সহানুভূতি সুরে প্রশ্ন করল পদ্মা।

একটু পরে যুবক বলল—না। আমি শুধু ভারছি যে তুমি চলে যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে আর দেখা হওয়াবও পথ রাখলে না।

বরং তার জন্য দুঃখ করতে পারো। কিন্তু আমি বলি যে, তাও করা ঠিক হবে না। এই যে কয়েকমাসের মধ্যে হঠাৎ সম্পূর্ণ অচেনা মিস্টিরিয়াসভাবে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, এই কি যথেষ্ট নয়? তুমি রোম্যান্টিক টাইপের লোক। এটুকুর মধ্যেই যা রোম্যান্স তুমি পেয়েছ, বেশি পরিচয় হলেও তার চেয়ে বেশি পেতে না।

বলতে বলতে পদ্মার কণ্ঠে আবার ব্যঙ্গ ফুটে উঠল—একটা সোনার স্বপন, কি বল? না হয, ধর, সাঁঝের অস্তরাগ। বেশ কবি কবি হল, নয়? কিন্তু দোহাই তোমার! ভয় হচ্ছে, এখনই তুমি বলে বসবে যে আরাবলী শৈলমালার পিছনে তোমার জীবনের আলো অস্ত যাচ্ছে। হ্যাঁ—গুড্ বাই বলতে পারো, কিন্তু সানসেট্ বলো না। ওসব সেন্টিমেন্টালিটির স্থান নেই পৃথিবীতে।

অ রিভোয়া (পুন দর্শনায় চ) পর্যন্ত নয়? ক্ষীণ প্রশ্ন করল জয।

আবার জ্বালালে তুমি তোমার মিন্‌মিনে প্রেম নিয়ে। পদ্মা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

আমি শুধু মানুষ। তোমাকেও শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তুমি নারী। শেষ প্রতিবাদের চেষ্টা করে বলে উঠল জয়।

এবার আবার রবিবাবুর তর্জমা আবৃত্তি কর। আছে তো তোমার কবিতার বইয়ের খাতা।

"মানুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হতে।"

মনুষ্য নে তুম্‌হারে নির্মাণমে
আপনে অন্তস্তলসে সৌন্দর্য
সঞ্চারিত কর্ দিয়া হ্যায়।

তা ভালোই করেছো বাপু। আমার আপত্তি নেই। তবু একটু আধুনিক হবার চেষ্টা করো। বোকামিটাও আধুনিকভাবেই করা ভালো।

যথা?

যথা, এই ধর আমার রক্ততিলক মাখা রাজোয়ারার খাঁটি সূর্য চন্দ্র, না হয় হরবংশের প্রপিতামহীর বিয়ের সময় বর এল বীরবেশে। ঘোড়ায় চড়ে, তলোয়ার ঝুলিয়ে। সঙ্গে সৈন্যদল। পথের মধ্যে যৌতুকের মণিমুক্তা, সোনারুপোর গয়না এমন কি দিবাধারীদেরও (কনের সখীদের) কোনও হতাশ নাগর লুটে নিয়ে যেতে পারত। আমার মার বিয়েতে বাবা এলেন নির্ভয়ে ট্রেনে চড়ে। স্টেশনে তৈরি ছিল মোটর, যদিও সভায় এসে নামলেন ঘোড়া থেকে। আর আমি যদি বিয়ে করি, আদালতে থাকবে নোটিশ টাঙানো। সেটা হবে রাজপুত বিয়ের শ্রীফল (নারিকেল) পাঠানোর শামিল। এরোপ্লেনে করে উড়ে এসে নামব সেখানে। আর চাই কি তোমাকেই নিমন্ত্রণ করব আমাদের বেস্ট ম্যান হতে। পারবে তো?

হালকা ঠাট্টার সুরে তার কণ্ঠ জলতরঙ্গের বাজনার মতো বেজে উঠল। তারায় তারায় যেন হচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। আকাশ হয়ে রয়েছে হতাশায় নীল। কিন্তু চাঁদের তাতে কি বা আসে যায়?

না, এবার উঠে পড়তেই হবে। কার্তিকের দিল্লির রাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্রমশ। আর দেবি করা চলে না। নয়া রাজস্থানের নবীনা আধুনিকা একজনের মন ভালো করেই জানা গেল। একেবারে মর্মের ভিতর থেকে, অন্তরের অন্তর্লোক হতে। ক সপ্তাহ পর থেকেই তো তার যাচাই শুরু হবে।

খুব চুপিসাড়ে উঠে আসবার সময় শুনতে পেলাম—তবে এও বলে রাখি যে, আমার ওই মনোপ্লেনে শুধু একজনের ঠাঁই কোনোরকমে যদি বা হয়, তোমার ওই সেন্টিমেন্টের বোঁচকাবুঁচকি বা কটেজ পিয়ানোর তাতে স্থান হবে না।

দুই

শেষ রাত্রির তরল অন্ধকারে মাটির মায়া ছেড়ে উড়ে যাচ্ছি। ক্লান্ত ঘুমেভরা চোখে একে একে একুশজন যাত্রী ওভারকোট মুড়ি দিয়ে হাতে 'রাগ' ঝুলিয়ে টাটা কোম্পানির এরোপ্লেনে এসে ঢুকল। দবজাব সামনে নাম ডাকা হচ্ছে আর সে ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেকে ঘোষণা কবে ঢুকতে হচ্ছে। সবারই ঢুলু ঢুলু চোখ।

কিন্তু কান সজাগ রাখলাম।

হিজ হাইনেস দি মহারাজ অব—

রাওৎ সাহেব অব—

হার হাইনেস অব—

রাজা ওঙ্কারনাথজী—

প্রভৃতি। যাদের নাম খবরের কাগজে দেখেছি তাদের নাম আর নাই করলাম।

হঠাৎ তার মধ্যে নিজের সাধারণ অতি পরিচিত মধ্যবিত্ত নামটা চিনে নিতে দ্বিধা হল।

আমিই না কি? সত্যি?

ওই সব হিজ হাইনেস ও হার হাইনেসের হীরা মুক্তা চুনি পান্না খচিত উপস্থিতির মধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা?

আবছা অন্ধকারে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে। না, ওরা কেউ জরি-জহরতে মোড়া দরবারী পোশাকে আসেন নি। আমারই মতো সাধারণ পোশাকে লম্বশাটপটাবৃত। প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকটা বদলিয়ে নিয়ে নিজের মনে মনে বললাম—

লম্বস্যুটপটাবৃত।

তা হোক না কেন সে স্যুট লন্ডনের বন্ড স্ট্রীটের বানানো বা নয়া দিল্লির ফেল্‌প্‌স্‌ কোম্পানির তৈরি।

এই শ্লোকের বাকি চরণটুকুও মনে এসে পড়ল। যাক, সুধীজনকে আর সে কথা মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

আরাবলী পর্বতশ্রেণীর একটি শেষ রেখা এলোমেলোভাবে দিল্লির চারপাশের পাহাড়ি চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে এরোড্রোমের কাছেই ছড়িয়ে রয়েছে। চঞ্চলভাবে নিচের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম একবার। মাটির মায়া মনকে নিচে টানল।

কিন্তু কোথায় মাটি?

এ তো শুধু উঁচু নীচু পাহাড়িয়া মালভূমি। যা আনন্দ দেয় কিন্তু আকর্ষণ করে না। রসসিক্ত নয়, রুক্ষ রিক্ত।

আর মাটির মায়া রইল বা কোথায়? স্বাধীনতা পাওয়ার সময় থেকে এই ক মাসের মধ্যে মানুষ দেশের নামে, ধর্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার করেছে। মাটির মায়া ছেড়ে লোক দলে দলে, না হলে একা ঘর ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়েছে। প্রিয়জনকে ছেড়ে, বাপের ভিটেমাটি ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে। পালিয়েও অনেক সময় বাঁচতে পারে নি। দানবের হাতে মানবতা লোপ পেয়ে গেছে। মৃত্যু এসেছে হত্যার রূপ নিয়ে। সংসার এঁকে দিয়েছে শুধু সংহারের চরম চিত্র।

দিল্লির রেল স্টেশনে হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুরুষ শিশু পাঞ্জাবে তাদের মাটি আর সংসার থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দিল্লি শহরের ঠিক পাশেই পাঞ্জাবের জেলা গুরগাঁও। সেখান থেকে দিল্লি আসার চওড়া পিচঢালা রাস্তায় এতদিন বুক ফুলিয়ে মিলিটারি আমেরিকান ট্রাক দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত।

এখন সে পথ দিয়ে ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার রাশির মতো উদ্বাস্তুরা হাতে-পিঠে যথাসম্বল বিছানা. প্যাঁটরা ও কম্বল নিয়ে কোনও মতে দেহের ও মনের বোঝা বয়ে পায়ে হেঁটে দিল্লির দিকে আসছে। কাতারে কাতারে আসছে। পথের দুধারে ভিড় করে গাছের নিচে দিন কাটাচ্ছে।

সে পথ দিয়ে বহুবার পালাম বিমানঘাঁটিতে গেছি বন্ধুবান্ধবদের ইয়োরোপ আমেরিকা যাত্রার সময় হাসিমুখে বিদায় দিতে। ওরা যখন সুন্দর ছিমছাম প্লেনের ভিতর ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে তখন আমি রেশমী রুমাল উড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছি। আজকাল সেই বিমানঘাঁটিতে দেখছি যে প্লেন থেকে অনবরত নামছে অগণিত নরনারী,—ছোট টিনে বিলেতী সার্ডিন মাছ যেমনভাবে গাদাগাদি করে রাখা হয় সেরকম অবস্থায়। হাতে তাদের ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি, গায়ে শেষ সম্বল চাদর ও শাড়ির বা শালোয়ারের টুকরো। তার দুর্দশা আমার ওই রেশমী শৌখিন দোলার ছবিকে আজ ঢেকে দিয়েছে।

দাঁতের বদলে দাঁত তুলে নেওয়ার নিয়ম পৃথিবীর প্রথম থেকে চলে আসছে। এখানেও তার অন্যথা হয় নি। তাই রাজস্থান থেকে দিল্লির মধ্যে বহু জায়গায় মানুষ উৎখাত হয়ে গেছে। এমনভাবে যে, দিল্লির দশ মাইলের মধ্যে, এমন কি দিল্লি শহরের মধ্যেও খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। অনেক গ্রামে রাজপুত মুসলমান (মেও), আর হিন্দু জাঠদের মধ্যে যুদ্ধে শুধু বর্শা ও তলোয়ার নয়, বন্দুক রিভলবার স্টেনগান চলেছে বহু।

আর সে ধ্বংসকাণ্ডে যাতে ভারত সরকার সহজে বাধা না দিতে পারে সেজন্য লোকে লোহার রেল-লাইনও উপড়িয়ে নিয়েছে। রাজপুতনা যাবার ট্রেন এখন আর চলে না।

আজ তাই সদ্য খোলা বিমানপথে চলেছি রাজস্থানে। বিপন্নদের উদ্ধার করে আনবার জন্য ভারত সরকার যতদূর সম্ভব দেশের প্রায় সব ও বহু বিদেশী প্লেন ভাড়া করে পাকিস্তানে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেছেন। তাই রাজস্থানের রাজারা প্লেন নিজেদের জন্য 'চার্টার' করে দেশে ফিরতে পারছেন না। টাটা কোম্পানির সদ্য খোলা প্লেন-পথে তাঁরা চলেছেন সাধারণ যাত্রিবাহী প্লেনে। আমিও চলেছি। আমাদের সবারই প্রথম গন্তব্যস্থল হচ্ছে জয়পুর।

বহু নিচে রুক্ষ আরাবলী পাহাড়গুলির চূড়া থেকে মন ও নয়ন সরিয়ে আনলাম এরোপ্লেনের মণিকোঠার মধ্যে। মণিকোঠা নয়তো কি? এতগুলি হিজ হাইনেস আর রাও রাজা রাওৎ প্রভৃতি আর তার চেয়ে বড় কথা, একজন জীবন্ত হার হাইনেস যেখানে ঠিক আমারই মতো সাধারণভাবে বসে আছে, সেটা মণিকোঠা ছাড়া আর কি? নিজেদের কোটে অর্থাৎ এলাকায় এঁদের সামান্য নিশ্বাসপ্রশ্বাসেই অসামান্য ঝড় উঠে যায়। এতই মূল্যবান এরা।

চারপাশে—না, ঠিক চারপাশে নয়, কারণ আমি নিজেই জানলার পাশে বসে আছি।—এতগুলি রাজরাজড়া। সবাই চলেছে রাজস্থানে। স্বভাবতই মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে রাজপুতানার বীরত্বকাহিনি—বীরের মতো মরণকে বরণ করার কাহিনির পর কাহিনি।

প্রাণ, শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা মানুষের যে জীবন্ত শবযাত্রা এতদিন দিল্লির আশেপাশে দেখে এসেছি তার ছবি মন থেকে মুছে গেল।

আমার চারপাশে এখন রূপ নিয়ে দাঁড়াল অতীতের বীরদের শোভাযাত্রা—যাদের চন্দ্র সূর্য থেকে নেমে আসা চিরউজ্জ্বল বংশের শেষপ্রায় মোমবাতিগুলির কয়েকটি এখানে আমার সহযাত্রী হয়ে চলেছে।

এই মোমবাতিগুলিও ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেবার জন্য প্রবল দাবি জানাচ্ছে তাদেরই প্রজার দল।

ত্রিশ বছর আগে মন্টাগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে লেখা হয়েছিল যে, "আশা আর আকাঙ্ক্ষা রাস্তার ওপারের আগুনের ফিন্‌কির মতো সীমান্ত পেরিয়ে আসতে পারে।" হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা ঘোষণা হবার পরের ঘটনাগুলি সে কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে।

যে গণতন্ত্রের ঢেউ ও সারা হিন্দুস্থানের সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছার ঢেউ দেশীয় রাজাদের সিংহাসনে এসে ধাক্কা দিচ্ছে সে ঢেউকে না মেনে নিলে সিংহাসনই ভেসে চলে যাবে।

১৯৪৭ সনের ২৫শে জুলাই অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের ঠিক কুড়ি দিন আগে শেষ ব্রিটিশ সম্রাট-প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে রাজন্যসভায় (চেম্বার অব প্রিনসেস) ঘোষণা করলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ রাজছত্রের (মুকুটের) কোনও সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁরা আইনত স্বাধীন হয়ে যাবেন। কিন্তু দেশরক্ষা, যাতায়াত আর বৈদেশিক সম্বন্ধ এ তিনটি ব্যাপারে সব সুবিবেচক রাজা যেন নিশ্চয়ই হিন্দুস্থান সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নেন।

অনেকেরই একান্ত অনিচ্ছা ছিল। তবু উনিশ দিনের দিন কেমন করে তাঁরা প্রায় সবাই মিলে অন্তর্ভুক্তির (অ্যাক্‌সেসনের) দলিলে সই করলেন তা দিল্লিতে আমার খুপরিতে বসে দেখেছি। দেখেছি আর ভবিষ্যতের রূপ চিন্তা করেছি।

চিন্তা করবার কারণ যথেষ্ট ছিল।

লোকে লক্ষ্য করতে ভুল করেনি যে, ১৪ই আগস্ট অনেক রাজাই ইচ্ছা না থাকলেও কুইনিন মিকশ্চার খাবার মতো মুখ করে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার দলিলে সই করেছিলেন। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব তাঁরা সবাই হয়তো বুঝতে পারেন নি।

এত তাড়াতাড়িতে সব হয়ে গেল যে, অনেকে হয়তো ভাববারও সময় করে উঠতে পারেন নি। অনেকে হয়তো মনে মনে দ্বিধা ও মানসিক রিজারভেশন পোষণ করেছিলেন।

একজন ছোট রাজা পুরো দরবারী ধড়াচূড়া পরে পাশে ঝোলানো ঝকমকে তলোয়ারে ঝনঝন আওয়াজ তুলে সিঁড়ি দিয়ে দিল্লি সেক্রেটারিয়েটের দোতলায় উঠে এলেন। খুব গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন যে, ব্রিটিশের অধীনস্থ রাজা থাকা অবস্থায় তিনি স্বাধীন ভারতের দলিলে সই করতে চান না। সেটার মাহাত্ম্য তত বেশি হবে না। অতএব যখন ব্রিটিশ রাজমুকুটের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাবেন তখন তিনি তাঁর স্বাধীন কলম দিয়ে সই করবেন। অতএব আজকের সই করার কারবারটা মুলতুবি থাকুক।

চারপাশে লঘু পরিহাসের গুঞ্জনে তাঁর এই গুরু প্রস্তাবকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বলা হল, ইয়োর হাইনেস, আপনি 'হাই' থাকতে থাকতে এই সামান্য কাজটা সেরে নিন. আপনি কাল সকালে যখন স্বাধীন 'ইয়োর ম্যাজেস্টি' হয়ে যাবেন, তখন সদ্য প্রমোশন-পাওয়া আপনাকে এরকম অনুরোধ করবার মতো ধৃষ্টতা আর আমাদের থাকবে না।

অগত্যা হীরের আংটিতে ভরা একটি হাত খাপে-ঢাকা তলোয়ারের বাঁট থেকে সরে এসে সামান্য কলমে গিয়ে ঠেকল।

কিন্তু তাঁর হৃদয়ের ক্ষতস্থানে মলম পড়ল কি?

অথচ অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

জার্মানির সব ছোট ছোট রাজ্য এক করে নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিশ্বকর্মা বিসমার্কের কাহিনি রাজারা নিশ্চয়ই জানতেন। ইংরেজ সৈন্য জার্মানি আক্রমণ করতে পারে একবার এরকম একটি কথা শুনে তিনি বলেছিলেন,—কি? এত বড় স্পর্ধা? আমি পুলিশ পাঠিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে আনব।

রাজারা এটাও জানতেন যে, নবভারতের বিসমার্ক সর্দার প্যাটেলও মাত্র পুলিশ পাঠিয়েই তাঁদের রাজত্ব দখল করে নিতে পারবেন।

কি করে?

দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ভোলে নি যে, নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে ১৯৩৮-এ হরিপুরার অধিবেশনে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে পূর্ণ স্বরাজ আমরা চাই সমস্ত ভারতের জন্য। দেশীয় রাজ্যগুলিও তার পূর্ণ ভাগীদার হবে। সেই স্বাধীনতা ব্রিটিশ ভারতে যখন এসেছে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার প্রজারা কি তা নিজেরাও না

পেয়ে ছাড়বে? আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়াই কি তাদের না দিয়ে ছাড়বে?

তবু ১৫ই আগস্ট হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, আর জুনাগড় ভারতের সঙ্গে যোগ দিল না।

কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এখন এই রাজারা কি করবেন? তাঁরা কি এই মিলন ও আত্মবিলোপকে মেনে নিয়ে সত্যিই আমাদের সঙ্গে মিলে যাবেন?

রচিত হবে কি নবতর বৃহত্তর ভারত?

এ দেশে ছোট ছোট জমিদারির মতো জায়গাটুকুতে বসে একদিন-কা সুলতানরা তাঁদের স্তাবক সভাকবিদের বা মোসাহেবদের মুখে রোজ নিজেদের কীর্তন শুনতেন। তাঁরা হচ্ছেন সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। পাতালে বাসুকি কাঁপে তাঁদের সেনাদলের পদভরে। আকাশে সূর্যগ্রহণ হয়ে যায় তাঁদের বাহুবলের ভয়ে। এই কূপমণ্ডুক ও স্বল্পে সন্তুষ্ট দেশে আজ বিরাটের মহতের স্বপন দেখবে কি এক হয়ে অনন্যহৃদয় হয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, পশ্চিম মরুপ্রান্তর থেকে পূর্ব পার্বত্য প্রান্ত? অশোকচক্রশোভিত, ত্রিবর্ণ পতাকাতলে পাশাপাশি দাঁড়াবে কি কাশ্মীরী পণ্ডিত ও মালয়ালী মেনন, যোধপুরী রাঠোর ও নাগা মণিপুরী? দেবে কি ঢেলে দেহের রক্ত ও হৃদয়ের ভক্তি একসঙ্গে এক মত এক প্রাণ হয়ে? গাইবে কি মিলিত কণ্ঠে জনগণমন অধিনায়ক? ধ্বনিত করবে কি একমন্ত্র বন্দেমাতরম্?

সার্থক হবে কি আমার রাজস্থান অভিযান? অতীতের রাজস্থানের বীরত্বের কাহিনি, গৌরবের গান শুনতে শুনতে কি লক্ষ করতে পারব ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভারতের নব গৌরবের প্রথম অঙ্কুরটিকে?

বীরত্বে যাঁরা এত বড় ছিলেন আত্মোৎসর্গে কি তাঁরা হতে পারবেন আরও বড়?

এতদিন ধরে শুনে এসেছি রাজন্য ভারত ব্রিটিশ ভারতের চেয়ে অনেক অন্য রকমের। রাজারা ভারতের সঙ্গে হাত মিলাতে চান না। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের একটিমাত্র সম্বন্ধ ছিল---সেটা হচ্ছে দমন।

সেখানকার লোকও নাকি নিজেদের আমাদের থেকে এত বেশি পৃথক মনে করে যে, তারাও চাইবে না আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে। এত খাজনা দিতে, এত জটিল শাসনতন্ত্রে পিষে মরতে, ইনকাম ট্যাক্সের দোহন সহ্য করতে।

প্রায় কোনও দেশীয় রাজ্যেই ইনকাম্ ট্যাক্সের বালাই ছিল না।

মনে পড়ল, প্রায় বিশ বছর আগে আমেরিকা থেকে এসে মিস মেয়ো ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে এত কুৎসা লেখেন যে, গান্ধীজী সে বইকে নর্দমা পরীক্ষকের রিপোর্ট বলে আখ্যা দেন। সেই বইয়ে মিস লিখেছিলেন যে একটি মহারাজা নাকি বলেছেন যে, ব্রিটিশ যদি ভারত ছেড়ে চলে যায় তাহলে এই বীরপুরুষের সৈন্যরা এত তৎপর হয়ে উঠবে যে, সুদূর বাঙ্গালা দেশে একটি কুমারী বা একটি টাকাও বাকি থাকবে না। কে মিথ্যা কথা বলেছিল বলে আজ ধরা পড়বে? ওই বিদেশিনী লেখিকা, না এই স্বদেশীয় মহারাজা?

১৯৪৭-এর আগেকার ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার জনগণ জেগে উঠে সমানভাবে এই প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। তারা নিঃসন্দেহ যে, কোনও রাজাই এই নবভারতের লোক হয়ে এমন কথা ভাবতে বা বলতে পারেন না।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার অর্থাৎ রাজন্যদের এলাকার ভারতীয়রা রাতারাতি নিজেদের একই ইন্ডিয়ার লোক বলে ভাবতে শুরু করেছে। আজ যদি রাজাদের মধ্যে কেউ প্রজাদের জনমত উপেক্ষা করে নিজেকে স্বাধীন বলে জাহির করতে চান বা ব্রিটিশ রাজছত্রের ছায়ায় আশ্রয় পেতে চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর সুপ্রাচীন রাজবংশ যে বিনা যুদ্ধে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে সে কথা শুধু আমাদের রাজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল নন, যে-কোনও ভারতীয় বুঝতে পেরেছে।

কে করবে ওই রাজাদের পক্ষে যুদ্ধ?

প্রজারা? না। তারা আজ সমগ্র ভারতের ভারতীয়।

সৈন্যরা? তাদেরও মনে সে চিন্তার ঢেউ এসে লেগেছে। তা ছাড়া তারা জানে যে, ইংরেজদের নিজের হাতে শিখিয়ে দেওয়া ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দেওয়া ভারতীয় সেনার কাছে দেশীয় রাজ্যের সেনারা ঝড়ের মুখে পাতার মতো উড়ে যাবে।

রাজারা নিজেরা? না। তারাও না। কারণ দিল্লি ব্রিটিশ যুগেও তাদের একত্রিত হয়ে সম্মিলিত দাবি

জানাবার পথ দেয় নি। আর এই ভারতীয় যুগেও দিতে প্রস্তুত নয়। সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশের হাত থেকে এসেছে ভারতীয় হাতে। কাজেই কোনও আন্তর্জাতিক আদালত বা ইউ. এন. ও. রাজাদের দাবি শুনতে অধিকারী নয়।

এঁরা জানেন যে, এঁদের প্রজারা আজ ডিভাইন্ রাইট্ অব দি কিং অর্থাৎ রাজাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে বিশ্বাস করে না। তারা সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ বা হরবংশ কোথায় জন্মেছেন সে নিয়েও মাথা ঘামায় না। কাজেই রাজাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু ওঁরা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

আমার সহযাত্রীদের প্রত্যেকের মুখেই এক একটি প্রশ্ন চিহ্ন দেখতে লাগলাম।

গ্রীক পুরাণে স্ফিংক্সের গল্প আছে। মুখ তার নারীর, আর দেহ সিংহীর। তার মুখে মাখানো একটা চিরন্তন প্রশ্ন, যার উত্তর কেউ দিতে পারে না। এই রাজাদের মুখেও আজ সেই উত্তরের সংকেতহীন প্রশ্ন মাখানো রয়েছে।

হিজ হাইনেস অব...।

ভোররাত্রির অন্ধকারের মায়া তাঁর মুখের উপরে পড়ে অতীত ও বর্তমানকে কি রকম যেন মিশিয়ে দিতে লাগল। তার মধ্যে থেকে রূপ নিয়ে উঠে এল তাঁর বংশের এক পূর্বপুরুষের ছবি। রাঠোর বংশের কোনও একটা কনিষ্ঠ শাখার সন্তান ইনি। দেড়শ বছর আগে মালপুরার যুদ্ধে রাঠোররা ভয়ানক রোমাঞ্চকর বীরত্ব দেখিয়েছিল। সে যুদ্ধের কথা রক্তাক্ত অক্ষরে রাজস্থানের ইতিহাসে লেখা থাকবে। তাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস্ স্কিনার। তিনি বর্ণনা করেছেন :

"দূর থেকে রাঠোরদের এগোতে দেখা গেল। তাদের বিরাট ও শ্রেণীবদ্ধ দেহগুলির পদক্ষেপ যুদ্ধের গর্জন ছাপিয়ে বজ্রনিনাদের মতো ধ্বনিত হল। প্রথমে তারা মন্থর লম্ফ গতিতে এল, তারপর যত এগোতে লাগল ততই গতিবেগ বৃদ্ধি পেল। আমাদের ব্রিগেডের সুসজ্জিত কামানগুলি তাদের ঘনসন্নিবেশের উপর ছর্‌রা গুলি চালিয়ে প্রত্যেক ছর্‌রাতে শত শত জনকে মেরে ফেলতে লাগল। কিন্তু তাদের অগ্রগতি এতে একটুও ব্যাহত হল না। আমাদের ব্রিগেডের কামানে নিহত হতে হতে নিজেদের পনেরো শত মৃতদেহের উপর দিয়ে তারা ঝড়ের মতো এগিয়ে এল। বন্দুকের মারাত্মক গুলিক্ষেপ বা শ্রেণীবদ্ধ সঙ্গীনের খোঁচা কিছুতেই তাদেব টলানো বা বাধা দেওয়া গেল না। বন্যাস্রোতের মতো তারা ব্রিগেডের উপর বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল ও মুড়িয়ে দিয়ে গেল। ব্রিগেডের চিহ্নমাত্র রইল না।"

সংগ্রামে আত্মোৎসর্গে এরা এত বৃহৎ ছিল। শান্তিতে আত্মত্যাগে কি মহৎ হতে পারবে?

না, আবার সংগ্রামের পথে শান্তির, সংহারের পথে সংহতির সন্ধান করতে হবে—এ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যুগে যুগে যার অভিনয় দেখা গেল?

কিন্তু আমরা যে নবভারতের নবতর ইতিহাস সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ভারতের ভাগ্যবিধাতার জয়গানের জন্য উৎসুক কর্ণ ও উন্মুখ কণ্ঠ আমাদের।

তাই ভালো করে আবার সহযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

হিজ হাইনেস অব...।

ভালো করে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিলাম এই উচ্চবংশীয়কে। ইনি যে রাজপুত গোত্রের, সেই গোত্রেরই একজন রাজার মজার কাহিনি চল্লিশ বছর আগেকার এক প্রতাপশালী ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর স্ত্রী লেডী মিন্টো নিজের ডায়েরিতে লিখে গেছেন। সেই রাজাবাহাদুর সম্পূর্ণ নিজস্ব "নিগ্রো" ইংরেজিতে মনের কথা কোনোরকমে ফুটিয়ে তুলে ব্রিটিশ কর্তাদের মেজাজ শরীফ করতেন। ভোজের পরেই মজা। 'আফটার ডিনার টকে'র সময় অম্লমধুর টক মাখানো এসব কথা কত হাসির হুল্লোড়ই না বইয়ে দিয়েছে।

তিনি একবার বলেছিলেন—

"Viceroy he good pedigree; why for sending (to India as his successor) man no pedigree? ...Why Government not taking me. Rajput long long pedigree ; going with soldier, killing Bengali Babu ; That very good."

(ডায়েরির ৩৬৩ পৃষ্ঠা).

অর্থাৎ

"ভাইসরয় তিনি ভালো বংশ; কেন পাঠানর জন্য (ভারতে তার বদলে) মানুষ বংশমর্যাদাহীন? ...কেন

সরকার আমায় না নেন? রাজপুত দীর্ঘ দীর্ঘ বংশমর্যাদা, সৈন্য নিয়ে যেতে, বাঙালি বাবু মারতে? সে বড় ভালো।''

বাঙালি সবার আগে ইংরেজি ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিখেছে। সেই গুরুমারা বিদ্যা দিয়ে সে ব্রিটিশের সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে দাঁড়িয়েছে। এদেশে রাজ্য চালানোর দরকার মতো শিক্ষা দেওয়া যখন হয়ে গেল তারপর সে শিক্ষার বন্যাকে আর ঠেকানো গেল না। তার ফলে এল স্বাধীনতার জন্য আকুলতা, দেশসেবার জন্য আহ্বান।

তারপর বাঙালির প্রতি আর কোনও স্নেহ বা সহানুভূতি ব্রিটিশের থাকতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মে সে হয়ে গেল ব্রিটিশের চক্ষুশূল। হয়ে গেল হিংসা আর নিন্দার পাত্র। ভালো বাঙালি ছাত্রের নাম হল মুখস্থবাজ। ইংরেজের সঙ্গে বড় চাকরির চেষ্টায় পাল্লা দিলে তার নাম হল শুধু পরীক্ষা পাশের ওস্তাদ বলে। ইংরেজের সদাগরী অফিসে ছোট চাকরি নিলে তাকে বলা হল বাবু।

একটি ভদ্র কথা বিদ্রূপে পরিণত হল। একটা শিক্ষিত জাতি ইংরেজ ও তার 'জী হুজুর' মহলে হাসি-ঠাট্টার খোরাক জোগাতে লাগল।

কিন্তু এই বাঙালি বাবুই ভারতের জনসাধারণের মুখপাত্র। সবার আগে সে স্বাধীনতার পতাকার তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। সবার আগে বুকের রক্ত ঢেলেছে। ঠিক যেমনভাবে ওই হাইনেসের পূর্বপুরুষেরা পাঠান মোগলের বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছেন। সেই রাজপুতদের সঙ্গে বাঙালির আত্মার যোগ অনুভব করে এই অশিক্ষিত রাজপুত রাজার বুদ্ধিহীনতা ও অবিবেচনা ভুলে যেতে কোনও বাধা বোধ করলাম না।

রাওৎ সাহেব অব্...আমার পাশের আসনটি দখল করে অস্বাচ্ছন্দ্যে এপাশ-ওপাশ করছেন। যেন অশান্ত সমুদ্রের মাঝখানে একটা জাহাজ মোচার খোলার মতো অসহায়ভাবে দোলা খাচ্ছে। কারণটা কি? মহিমান্বিত রাওৎ মহাশয়ের পকেটে এমনই একটি সুগন্ধময় হাভানা চুরুট বিরাজ করছে যার সুরভি তাঁকে চঞ্চল করে রেখেছে মৃগতৃষ্ণিকার মতো। কিন্তু সে স্বাদে তিনি বঞ্চিত থাকবেন, যতক্ষণ না প্লেন থেকে তিনি বাইরে আসতে পারেন। কারণ এই প্লেনে ধূমপান বারণ। তাতে আগুন লাগার ভয় আছে।

যাক তবু ভালো। আমি তো ভাবছিলাম, এতগুলি হিজ হাইনেসের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার অজানা ও অনুচ্চ সঙ্গ পেয়েছেন বলে হয়তো অস্বস্তি অনুভব করছেন।

অথবা ঠিক সামনের সারির আসনে যে হার হাইনেস বসে আছেন তাঁর সুবাসিত সঙ্গ—যথেষ্ট পরিমণে নিকট অথচ সুদূর সঙ্গ—রাওৎ মহাশয়কে ট্যান্টাল্যাসের মতো আকুলি ব্যাকুলি করে তুলেছে।

এরোপ্লেন কোম্পানি এ বিষয়ে বিমানযাত্রীদের বড় রসালভাবে সদুপদেশ দিয়ে রেখেছে। সুন্দরভাবে ছাপানো ও মজাদার ছবিতে রাঙানো বিজ্ঞাপনটিতে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, রোমান্স তারা খুবই পছন্দ করে। এমন কি, ঢলাঢলিতে তাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু প্লেন যখন উল্লাসে উতরোল হয়ে দে দোল দোল ছন্দে নাচবে, তখন সবাই যেন কোমরবন্ধে চেয়ারের সঙ্গে নিজেকে এঁটে বসে থাকে এবং সে সময়টিকে যেন মধ্যযুগের নাইটদের মতো আচরণের জন্য বেছে না নেয়।

আচ্ছা, যদি নিত তাহলে এই মরুপ্রান্তরের আকাশে, পদ্মিনী কর্ণদেবীর বীরত্ব-কাহিনির দেশে যেখানে মেয়েরা নিজেরাই বিপদের মধ্যে অসম সাহসে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নিতেন সেখানকার আধুনিকারা এরকম অবস্থায় কি করতেন তা জানতে আগ্রহ হল।

এ অবস্থায় বাঙালি একালিনীরা কলকাতার ট্রামে বাসে যা করেন তার সঙ্গে আধুনিকা রাজপুতানী যা করবেন, তা তুলনা করে দেখতে ইচ্ছা হল।

সে কথা আরও ভাববার আগে রাওৎ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—সুপ্রভাত, ভোর হয়ে এল না কি?

সকৌতুকে বললাম,—কেন বলুন তো? ভোরের কিছু বাকি আছে না কি?

একটা হাই তোলা হাতের চেটো দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে তিনি বললেন,—তা তো বটে। কিন্তু আজ রাতের ঘুমটা আমার আরম্ভই করা হয় নি।

বুঝতে পারলাম না।

বললাম,—কেন? যদিও এখন শীতকাল, আর প্লেন খুব ভোরেই ছেড়েছে, রাতে ঘুমিয়ে নেবার সময় তো যথেষ্ট ছিল।

তিনি স্বীকার করলেন না। কই আর ছিল? সন্ধ্যা গভীর হতে না হতেই প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে এল।

তা অবশ্য বটে। পরিশ্রমের দুঃখ যারা পায় নি বিশ্রামের সুখ থেকেও তারা বঞ্চিত। ঘুম তাদেরই হয়, ঘাম যাদের ঝরাতে হয়। সোনা পান্নায় সাজানো, সুরা ও নারীতে জড়ানো সন্ধ্যা যে এদের অনেকেরই জাগরী নিশীথিনীকে নূপুর নাচনের ঝুনঝুন্ মিঠে আঘাতে উষার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তারপর উষা প্রভাতের বুকে ঘুমভরা চোখে মুখ লুকোতে লুকোতে কখন যে দুপুরের দিকে ঢলে পড়ে তা আমরা, যারা তখন কাজ করতে করতে হয়রান হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকি, সেই অভাগা আমরা কি করে জানব?

ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভালো করে দেখলাম। অনিদ্রার অতৃপ্তির কালো রেখা তাঁর বলিষ্ঠ মুখে অত্যাচারের বহু চিহ্ন রেখে গিয়েছে। যাদের জীবন অভাবের ও ভাবনার বহু দূরে নদীর উপর পালতোলা নৌকার মতো বয়ে যায় তাদের মুখে সে সব চিহ্ন থাকার কথা নয়। কিন্তু শত মণিমুক্তার চাকচিক্য রঙিন রেশমের পাগড়ির ঝলমলে রঙ এর মুখের বিকৃতির চিহ্ন লুকোতে পারবে না।

একটু অকারণ সহানুভূতি হল।

বললাম,—আশা করি, কাল রাতে একটু অন্তত ঘুমোতে পেরেছিলেন।

বন্ধুত্ব করতে উৎসুক ও রসালাপে সুপটু বলে রাজন্য সমাজে নামডাক আছে রাওৎ সাহেবের। ভোরের তরল অন্ধকারের উপর উষার একটুখানি আলোর ঝলকের মতো হাসি সেই বলিরেখা-কুঞ্চিত মুখে টেনে আনবার চেষ্টা করে তিনি উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু স্বপ্ন দেখলাম যে ঘুমাই নি।

কিন্তু মহানিদ্রার কোলে ঢোলে পড়তে একটুও দ্বিধা এদের পূর্বপুরুষরা করতেন না। এই রাওৎ সাহেব যে রাজ্য থেকে আসছেন বলে মনে হল সেখানকার রাজবংশের এক পূর্বপুরুষের কাহিনি মনে পড়ল।

সে প্রায় সাড়ে ছয় শ বছর আগেকার কথা। বছরের পর বছর তিনি সুলতানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজের দুর্গ রক্ষা করে এসেছিলেন। কিন্তু একদিন দেখা গেল যে, দুর্গের পতন হবেই এবং মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। সেই মহামরণের আগের রাত্রিতে দুর্গে মহা উৎসব হল। পুরনারীরা ও রাজমহিষী সোহাগ-সিঁদূর পরলেন সীমন্তে, বিদায় নিলেন তাঁদের প্রিয়জনের কাছ থেকে। সেই রাত্রিতে তরবারির মুখে ও অগ্নিগহ্বরে চব্বিশ হাজার নারী আত্মোৎসর্গ করলেন। রাত্রিশেষে দুর্গে অবশিষ্ট চার হাজার যোদ্ধা জাফরানী রঙের কাপড় পরে, মাথায় মৌর পরে খোলা তলোয়ার হাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন।

রাজপুত ক্ষত্রিয়রা জীবনে দু'বার মাথায় মৌর পরতেন—বিবাহবাসরে ও শেষনিদ্রার সঙ্গে অভিসারে। এবং এই দ্বিতীয়বারে তাঁরা পরতেন গৈরিক কাপড়। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ার মতো সংসার ছেড়ে মৃত্যুপণ নিতেন সে সময়ে। কোনও বন্ধন তাঁদের বাকি থাকত না। উদ্দেশ্য থাকত একমাত্র শত্রুকে মেরে মরা। তাই 'জরদ কাপড়াওয়ালা' রাজপুত সৈন্য ছিল শত্রুর কাছে বড় ভয়ের ব্যাপার।

হার হাইনেসের এলায়িত বাহু সুললিত ছন্দে একটুখানি নড়ে উঠল। ভোরের আবছা আলোতে শুধু তাঁর মুখের ডৌলটুকু পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। যেন মিশরের রানি ক্লিওপ্যাট্রা।

মার্কিন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের তৈরি একটা "কম্প্যাক্ট" থেকে একটু পাউডার নিয়ে মুখটি চুনকাম করে নিলেন। তারপর একটি খুব ছোট্ট সুনীল শিশি থেকে পুষ্পসার (সেন্ট) নিয়ে কানের নিচে ও চিবুকে একটু হালকাভাবে লাগিয়ে দিলেন। সুরভি ছড়িয়ে পড়ল সমস্তটা কেবিনে। ঠিক যেমন করে খুশি ছড়িয়ে পড়ে সমস্তটা মনে। কোথায় তার উৎস আর কী-ই বা তার প্রেরণা তার সন্ধানের প্রয়োজন নেই।

ঠিকমতো এবং সময়োপযোগী সেন্ট বেছে নেওয়া একটা সূক্ষ্ম সুকুমারশিল্প। পদ্মিনীর দেশে নিশ্চয়ই এই শিল্পকলার বিকাশে কোনও ত্রুটি হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে দেশের চারণীদের সংগীতে সুরভি বিশেষ স্থান পায় নি। কিন্তু একালিনী পদ্মিনীকে সে বিদ্যাও আয়ত্ত করতে হয়েছে নিখুঁত আয়োজনে এবং নিজেরই প্রয়োজনে।

আজ যে তার পতিদেবতার মরণের সঙ্গে অভিসার বন্ধ হয়ে গেছে। বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত ও বহু পূর্বপুরুষদের পুরুষকারে অর্জিত প্রাণশক্তি ব্রিটিশ যুগের নিশ্চিন্ত ও দায়িত্বহীন অস্তিত্বের মধ্যে প্রকাশের পথ পায় নি। ফলে স্বামী যদি হয়ে ওঠে বল্গাহীন অশ্ব?

তাই রাজার ঘরনীকেও হতে হয়েছে নবযুগের মোহিনী। এই নিষ্ঠুর যুগ তো কাউকে ক্ষমা করে না। অন্তঃপুর বা কুলধর্ম বা বংশের প্রথা অর্থাৎ ট্রাডিশন কিছুই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি। কাজেই শাস্ত্রে যিনি সহধর্মিণী, তিনি বাইরের জগতে সহকর্মিণী, বা অন্দরে মহলে সমসুখ-দুঃখভাগিনী না হলেও তাকে

বাইরের মোহিনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবেই, অন্তঃপুরের নিভৃত কোণটিতে বসে থাকলেও।

ঠোঁটের সিঁদুর, নখের আলতা, চোখের ছায়া (কাজল বা সুরমা বড় সেকেলে জিনিস) এ সবই হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। গন্ধসার অর্থাৎ সেন্টও তেমনি একটি অস্ত্র। মানসীকে হতে হবে দশপ্রহরণধারিণী।

এ সম্বন্ধে ফ্রান্সের মন দেওয়া-নেওয়ার ওস্তাদ ব্যক্তিরা কি বলে, তা রাওৎ সাহেব চুপি চুপি আমায় কানে কানে কইলেন।

এক নজরেই তিনি বুঝে নিয়েছেন যে, হার হাইনেস এই কুহকবিদ্যায় কুশলিনী। তিনি নিশ্চয়ই সকালে একটা হালকা মনমাতানো সুরভি ব্যবহার করেন। আর ব্রিটিশ রেসিডেন্সির টেনিসকোর্টে এমন একটু স্নিগ্ধ তাজা গন্ধ যা ধরা যায় না। সন্ধ্যায় এমন আর একটি সুরভি যা চটুল কপটতাময়, অথচ মোহে আর বিজয়-সংকেতে ভরপুর। আর ডিনারে ডান্সে এমন একটি বিশেষ বস্তু যাতে আছে মাদকতা ও রাত্রির রহস্যাতুরতা, যা রসিকজনকে নাকি আকর্ষণ করে, কিন্তু সন্ধান দেয় না।

সাবাস্!

হাসিমুখে বললাম—সাবাস, ইয়োর হাইনেস (যদিও রাওৎরা সাধারণত রাজা অর্থাৎ রুলিং প্রিন্স হয় না এবং ইনি শুধু একজন বড় জায়গীরদার না রাজা তা ঠিক জানি না, আর ডেমোক্রেটিক ইউরোপীয় পোশাক থেকে তা ধরবার উপায়ও নেই—এটা অন্তত বুঝেছিলাম যে, এই মোক্ষম সময়ে একে অন্য কোনও নামে অভিহিত করলেই সুরভিত আলোচনার ছন্দঃপতন হবে), আপনি দেখছি বিশেষ গুণী সমঝদার, বিশেষ মহাশয় ব্যক্তি। রিভিয়েরা আপনাকে আর নতুন কিছুই শেখাতে পারবে না।

সকৌতুকে রাওৎ সাহেব বললেন,—রিভিয়েরা সুরভি সম্বন্ধে কি জানে তা জানেন? বড় দুঃখের কথা যে, ওরা এ বিদ্যা সম্বন্ধে কোনোদিন যতটুকু জানতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশিই আমাদের গুণীরা এর মধ্যে ভুলে গেছে। এই পুরানো আমলের গুণীদের কাছ থেকেই 'রেসিপি' (প্রস্তুত-প্রণালী) সংগ্রহ করে আমরা ফ্রান্সে পাঠাই সম্পূর্ণ নিজস্ব ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সুগন্ধ বানাবার জন্য। অন্য কারও জন্য তা বানাবার বা বাজারে বিক্রি করবার অধিকার ওদের থাকে না।

বাঃ। এতে তো একটা জাতীয় শিল্প তৈরি হতে পারে আমাদের দেশে।

তবে শুনুন,—আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন তিনি। ওদের ভায়োলেট পুষ্পসারে ফুরিয়ে যাওয়া রোমান্সের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। আর আমাদের কস্তুরী সুরভি স্মরণকেই হরণ করে নিয়ে যায়, মনকে হার মানিয়ে দেয়। মিস্টিরিয়াস ইস্ট কথাটার সৃষ্টিই তো হয়েছে এ থেকে।

সুরভি শাস্ত্র আলোচনা শুনতে শুনতে আমিই হার মেনে গেলাম। উনি নাকি এমন একটা সেন্টের সন্ধান জানেন যার সুবাসে বিশ্বলুট মনোহরণ সম্ভব হয়। বাতাস নাকি তার ছোঁয়া পেয়ে মূর্ছিত হয়ে লুটোপুটি খায়।

আর?

কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম—আর?

—আর সহেলীদের তো কথাই নেই।

সহযাত্রীর অঙ্গভঙ্গি কৌতুকে কোনায় কোনায় ভেঙে পড়ল যেন। যে যবনিকা তুলে ধরল সে বাঁকা চাহনি, তার পিছনে আছে বহু অভিসারের ইশারা, অনেক দিবাস্বপ্ন আর নৈশ সংগীতের ইঙ্গিত।

ইংলন্ড ও কন্টিনেন্টে এটিকেট ও কালচার অধ্যয়ন হিজ হাইনেসের বৃথা যায় নি।

তিন

রাজস্থান বাঙালি সাহিত্যিকের আবিষ্কার। সেই রাজপুতানা—"বসুধা-বেষ্টিত যার কীর্তি-মেখলায়।"

ছেলেবেলায় রাজস্থানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল রঙ্গলালের কবিতার মধ্য দিয়ে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?"

এই প্রশ্ন ছেলেবেলা থেকে মনের ধিকি ধিকি আগুনের মতো সব সময় জ্বলে উঠেছে। যখনই

রাজস্থানের কথা মনে পড়েছে, বইয়ে পড়েছি বা দেখেছি কল্পনায় মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছি কত অমর কাহিনি। তারপর সারা কৈশোর ধরে স্বপ্ন দেখে এসেছি রাজপুতানার। সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। নিজের চোখে সেই স্বপ্নের ভূমি দেখে যাব। নিজের মন দিয়ে তাকে স্পর্শ করে যাব। সমস্ত মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে আনন্দ ঝংকার দিয়ে উঠল। আনন্দ, প্রায় অসহ আবেগময় আনন্দ।

তার উপর জয়পুর হচ্ছে বাঙালি স্থপতি-শিল্পীর সৃষ্টি। সে কথা মনে পড়তে জয়পুরের সঙ্গে আরও একটি নিকট-আত্মীয়তা অনুভব করলাম। পূর্বপুরুষের কীর্তি দেখে ছাতি ফুলে উঠবে না এমন নরাধম কে আছে?

রাজপুতানার প্রথম তোরণই যে বলতে গেলে জয়পুর। সেজন্য আরও বেশি সুখী হলাম। একটি দেশ দেখতে চলেছি। এ যেন একটা আবিষ্কারের যাত্রা। আর দেশে ঢুকতেই নিজেদের পূর্বপুরুষ কারও কীর্তি যেন দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করল—এস, এস, আমায় দেখবে এস। তোমার জন্যই যে আমি এতদিন অপেক্ষা করছি।

আমিও মনে মনে সাড়া দিলাম—এই যে এসেছি। অন্তরে তো তোমার কাছে সব সময়ই এসেছি এতদিন।

স্নেহভরা ভোরের নীলাভ দৃষ্টি দিয়ে আরাবলী পর্বতের চূড়াগুলি আমার দিকে তাকাল। আমায় কোলে তুলে নিল। এরোপ্লেন চারিদিকে আরাবলীর পাহাড়ে-ঘেরা সমতল ছোট্ট এরোড্রোমটুকুর মাঝখানে এসে থামল। একমুহূর্তে রাজপুতানার হয়ে গেলাম।

বাইরে সারি সারি সাজানো আছে লম্বা চকচকে আমেরিকান মোটরগুলি। প্রত্যেকটার নেমপ্লেটের লাল বুকে সাদা অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের রাজ্যের নাম। চট্ করে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিলাম কোন্ কোন্ রাজ্যের রাজা বা প্রতিনিধিরা এই প্লেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিতে এসেছে তাদের এ.ডি.সি. বা সর্দারের দল। জয়পুরের পক্ষ থেকেও এসেছে মহারাজার কয়েকজন এ. ডি. সি. ও কয়েকখানা অটো।

অটো অর্থাৎ মোটরকার। হাল ফ্যাশনের বাজারে আমেরিকান বা কন্টিনেন্টাল নামগুলি ব্যবহার করলে একটা আধুনিকতার গন্ধ ছড়ানো যায়। পেট্রল তো একেবারেই সেই মামুলী ইংরেজি ভাষার একটা কথা। তাকে বলুন গ্যাস; অমনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটু মৃদু গন্ধ পাবেন তাতে। বলুন তাকে জুস; অমনি সমস্তটা রিভিয়েরা এসে আপনার কাছে রূপে-রসে-ভরা কন্টিনেন্টের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে হাজির হবে।

সেই রিভিয়েরা, যার সোনালী বালুবেলায় হলিউডের চিত্রতারকা আর হিন্দুস্থানের মহারাজা সমানভাবে সকলের নয়নমণি হয়ে বিরাজ করে। অবশ্য প্রথম পক্ষরা পুরুষের কাছে, আর দ্বিতীয় পক্ষ পুরুষোত্তমাদের কাছে।

শুধু নয়নমণি নয়, পরশমণিও বটে। কারণ, এরা এত টাকা ছড়াতে পারেন সেখানে, এত বিলাস ও জাঁকজমকের ঘটা করেন যে, তাদের কাছাকাছি যে আসে সে-ই পরশমণি খুঁজে পায়। যা ছোঁও তাই সোনা হয়ে যাবে। হিন্দুস্থানের মহারাজারা তাই কন্টিনেন্ট ও আমেরিকার লোকের কাছে একটা সোনালী স্বপ্ন হয়ে বিরাজ করেন।

রাওৎ সাহেবের সেই সেন্ট রেসিপির কথা মনে পড়ল। যদি কোনও ফরাসী গন্ধসার ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেয় যে, সে একজন ইন্ডিয়ান মহারাজার গোপন প্রণালী নিয়ে একটা সেন্ট বাজারে ছেড়েছে, রাতারাতি কী বড়লোকই যে সে হয়ে যাবে তা ভাবতে গিয়েই নাকের সামনে মৃদু সুবাসের একটা ঢেউ বয়ে গেল।

হার হাইনেস পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

বিচিত্র রাজপুত পোশাক পরা রাজপুরুষরা বুকে হাত রেখে আধখানা অঙ্গ সামনে ষাট ডিগ্রি কোণায় হেলিয়ে তাদের প্রভু ও প্রভুর বন্ধুদের সম্মান দেখাতে লাগল। 'দরবার'রা অর্থাৎ হিজ হাইনেসের দল পরস্পরের কাছে সাময়িক বিদায় নিতে লাগলেন। শিষ্টাচারের ও মিষ্টালাপের কী বাহার!

আমাদের আটপৌরে জীবনে একটা দেখবার ও শিখবার মতো জিনিস। ইংরেজরাজ ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়েছে। তার ছেড়ে-যাওয়া জায়গা জুড়ে বসেছে কংগ্রেসরাজ। নিজেরা কতখানি জায়গা এরই মধ্যে দখল করতে পারবেন তা নিয়ে দিল্লিতে তুমুল আলোচনা করে এসেছেন রাজারা। কিন্তু এই সময়কার আদব-কায়দাকে সে ঝড়ের ঝাপটা একটুও ক্ষুণ্ণ করল না।

ঠিক যেমনভাবে শত শত্রুর ভয় ও বিপদও এদের বীরধর্মের পথ থেকে বিচলিত করত না।

কিন্তু সে একটা অন্য ইতিহাস। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে টডের পাতায়, রঙ্গলালের কবিতায়, বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনি'তে।

আর এখানে এই হাইনেসদের মধ্যে দেখছি অন্য একটা রাজস্থানের ছবি। এদের প্রাণপাখি সযত্নে পুরে রাখা হয়েছিল সার্বভৌম ব্রিটিশের সোনার কৌটোয়। তার ইচ্ছামতো উড়ে বেড়ানো বা পাখার ঝটাপটি নিয়ন্ত্রিত হত ব্রিটিশের আঙুল হেলানিতে, চোখের ইঙ্গিতে।

এঁদের পানপাত্র উপচিয়ে উঠত শ্বেত-অতিথি আপ্যায়নে, শিকার নাচ ও ভোজ পার্টির জাঁকজমকে। এঁরা তৈরি করেছেন একটা নতুন রূপকথা। বিংশ শতাব্দীর শ্বেত-অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিতা রাজপুতানার রূপকথা।

জয়পুর শহরে ঢুকবার অনেক আগে থেকেই নজরে পড়ে পাহাড়ের উপর চারদিকে ঘেরা বিরাট দেওয়াল। যেন পাহাড়ের মাথায় পাথরের মালা চড়ান হয়েছে। ওই দেওয়াল ভেদ করে কি শত্রু কখনও জয়পুরে ঢুকতে পারত?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অম্বরের তিনজন মহারাজার কথা। আকবরের সময় রাজা মানসিংহ মোগলের সেবা ও সহায়তা করে অম্বর ও মোগল সাম্রাজ্য পাকা করে যান। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের সময় মীর্জা রাজা জয়সিংহ অম্বরের প্রতাপ আরও বাড়িয়ে যান। তারপর সোয়াই রাজা জয়সিংহ অতুলনীয় বুদ্ধি ও বাজনীতি দিয়ে অম্বরকে আরও প্রভাবশালী করে তোলেন।

এই জয়পুর মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে নষ্ট হয়নি, পারসীক আফগানেব আক্রমণে লুণ্ঠিত হয়নি। এবং শান্তিতেই দিন কাটিয়েছে। তবুও গত দুশো বছর জয়পুর কেন এত নিস্তেজ নির্বীর্য হয়েছিল সে প্রশ্ন প্রথমেই মনে এল।

ভবিষ্যতের রাজস্থান গড়তে গেলে অতীতের এই ত্রুটিগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হবে এখনই।

উনিশ ও বিশ শতকের রাজপুত চরিত্র দেখে রাজপুতানাকে বিচার করলে সে ক্ষতি দেশেরই হবে। যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বাঙালি এ দেশকে দেখেছে সেটাই সত্য। সেটাই একমাত্র উপায়, যার সাহায্যে আমরা ভাবী রাজস্থানকে গড়তে পারব। সে পথেই এদের কাছ থেকে আমরা, সবচেয়ে ভালো যা এদেব দেবার আছে, তা আদায় করতে পারব।

আজ সারা ভারত বেছে বেছে সব প্রদেশের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি খুঁজে নিতে চায়। ছাই উড়িয়ে দিয়ে তার মধ্য থেকেও রত্ন খুঁজে নিতে উপদেশ দিয়েছেন সুধীরা।

আর সেই বুদ্ধিমান গুণগ্রাহী মন নিয়েই মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর 'তুজুক-ই- জাহাঙ্গীরী'-তে খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর অমর পিতৃপুরুষ ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর যা পারেন নি, হুমায়ুন যা করতে অক্ষম হয়েছিলেন, বিখ্যাত আকবর যা মাত্র আংশিকভাবে করতে পেরেছিলেন, সে কীর্তি জাহাঙ্গীর নিজে অর্জন করতে পেরেছেন।

অর্থাৎ পাঠান মোগলের চিরকালের শত্রু মেবারের (উদয়পুরের) শিশোদীয়া বংশের মহারাজা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্বীকার করেছেন।

এই উল্লাসের পিছনে ছিল বীরপূজা। এবং বীরত্বে রাজপুতের তুলনা ছিল না।

এই বীরত্ব শুধু যুদ্ধ ও আত্মবলিদানের মধ্যেই শেষ হয় নি। এর সঙ্গে জড়িত ছিল স্বামীধর্ম অর্থাৎ প্রভুভক্তি ও ধর্মযুদ্ধের আকর্ষণ। একজন পারসীক ঐতিহাসিক দতিয়ার মহারাজার এক পূর্বপুরুষ সুজন সিং বুন্দেলা সম্বন্ধে একটি গান লিখেছিলেন,

দো রোজ গূজর কর্দান অজ
মর্গ সাজা নিশ্‌ত্।
রোজেকে কাজা বশদ,
রোজেকে কাদা নিশ্‌ত্॥
রোজেকে কাজা বাশাদ্
কোশিশ্ না কুনাদ সুদ।
রোজেকে কাজা নিশ্‌ত্ দার্-উ
মর্গ রাওয়া নিশ্‌ত্॥

দু'রকমের দিনে মরতে কোনও দ্বিধা করো না—যেদিন তোমায় মরতে হবেই আর যেদিন তোমার মরা বিধির বিধানে নেই। কারণ, যেদিন তোমার কপালে মৃত্যু লেখা আছে, সেদিন কোনও চেষ্টাই তোমায় বাঁচাতে পারবে না। আর যেদিন কপালে মৃত্যু নেই সেদিন মৃত্যুর তোমার উপর কোনও অধিকার নেই।

তবে আর ভয় কি? মরবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে ভালো বিছানা রাজপুতের আর ছিল না।

শেক্সপীয়র যে লিখে গিয়েছেন,

ভীরু মরে মরণের আগে বার বার।
সাহসী তাহারে চাখে শুধু একবার॥

সে কথা এদের জীবনে সব সময়েই ফুটে উঠত।

ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে তা এরা জানত। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের বাইরে এর তুলনা খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

জয়পুররাজের নিজের অতিথিভবনের জমকালো বৈঠকখানার নিরালা কোণে বসে ঠাকুর সাহেব সে কথাই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি বললেন, দেখুন, আমি জয়পুরের কাহিনি বলব না, কারণ আমি নিজেই জয়পুরিয়া। মেওয়ারের কাহিনিও বলব না, কারণ বাঙালিরা মেওয়ারকে চেনে বাঙলাদেশের চেয়েও ভালো করে। আমি একটা অন্য বংশের ইতিহাসই না হয় বলি। যে সময় আপনাদের বাঙলাদেশে ইংরেজ ক্লাইভ নবাবের সেনাপতি ও সভাসদদের ভাঙিয়ে নিয়ে পলাশীতে নেমকহারামী যুদ্ধ করবার বন্দোবস্ত করছিল সে সময়কারই একটা উদাহরণ দিই।

ঠিক সে সময়ই দিল্লির বাদশার সেনাপতি সালাবৎ জঙ্গ রাঠোর রাজা রামসিংহের সঙ্গে লড়াই করেছিল। মাড়োয়ারের মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে ঘণ্টা কয়েক যুদ্ধ করবার পরই মোগল সৈন্য তৃষ্ণায় পাগল হয়ে যেতে লাগল। সত্যি সত্যিই লোক পাগল হয়ে যাচ্ছিল। রাজপুতদের দখলি জায়গাতে ছিল কুয়ো। কাজেই রাজপুতদের কোনও কষ্ট ছিল না। মোগলেরা কাঠফাটা রোদে প্রাণ যায় দেখে রাজপুতদের কাছে জল চাইল। রাজপুতরা কি করল জানেন?

সপ্রশংস সুরে বললাম,—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

পাগড়িটা একবার খুলে নিয়ে মাথার খুলিকে একবার হাওয়া খাইয়ে সেটা আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিলেন ঠাকুরসাহেব।

তারপর বললেন,—জানি, আপনি যখন ডি. এল. রায় , রমেশচন্দ্র দত্তের দেশের লোক আপনি তা বুঝতে পারবেন। তবু বলি শুনুন। রাজপুতরা তাদের জল দিল। যত জল চায় তত। তারপর বলল, যাও, এবার ফিরে যাও; কারণ তোমাদের সঙ্গে আজ আমাদের লড়াই আছে।

এ ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু মাখামাখি গলাগলি ভাব করে নিতে পারলে লাভের আশা আছে। অনেক কিছু যা বাইরের লোকের দেখা ও জানার বাইরে থেকে যায়, তা দেখা ও জানা যাবে। অতএব ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু রসাল ভাব করবার চেষ্টা করলাম।

বললাম—হ্যাঁ, সে কাহিনি আমি শিয়ার-উল্ মুতাক্ষরীণ বইতে মুসলমান লেখকের লেখাতেই পড়েছি। সত্যি এমন জাত নেই। তবে শুনুন। আপনাকে জয়পুরের নূরজাহানের গল্প শোনাব।

জয়পুরের নূরজাহান? সে তো মশায়, দিল্লি আগ্রার নূরজাহান। জাহাঙ্গীরের নূরজাহান?

হেসে বললাম—ওইখানেই তো মজা। জয়পুরের নূরজাহানের গল্প আমার কাছে শুনুন। জানেন নিশ্চয়ই, তবু শুনুন।

রসাল রহস্যের গন্ধ পেয়ে ঠাকুরসাহেব আরও একটু কাছ ঘেঁষে আরাম করে বসলেন।

দেড় শ বছর আগে আপনাদের জয়পুরের সবচেয়ে বড় দুর্দিন চলছিল। পনেরো বছর ধরে রাজা জগৎসিংহ জয়পুরের সিংহাসন অন্ধকার করে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন। এত অসম্মান, এত কথার খেলাপ কখনও কোনও রাজপুতের বোধ হয় হয়নি। জয়পুরের নাম হয়ে গেল 'ঝুটা দরবার', কারণ রাজা তাঁর কথা রাখতেন না। এমন কি, শরণাগতকে পর্যন্ত শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তবে সে কথাটা গৌণ, কারণ পরে যা বলব সেটাই আসল কথা। কাজেই জগৎসিংহের কীর্তির কথা শুনে গল্প শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করবেন না।

মহারাজা তো জয়মন্দিরের তোষাখানা খালি করে দিলেন। জয়সিংহের সুন্দর শহরের পাঁচিলগুলি আমীর খাঁ পিণ্ডারী ও মারাঠী লুঠেরারা বার বার অপবিত্র করল। কখনও এক দর্জি কখনও এক বেনে, এমন কি এক খোজা পর্যন্ত দরবারে সর্দারি করতে লাগল। জগৎসিংহ নিজে তাঁর রাওয়ালা অর্থাৎ অন্তঃপুরের অসম্মান করতে লাগলেন। রাসকাপুর (রসকর্পূরী) নামে এক যবনী বাইজীকে নিয়ে এত ঢলাঢলি করতে লাগলেন যে, নিজে তার সঙ্গে এক হাতিতে চড়ে বেড়াতেন। তাকে শেষ পর্যন্ত অর্ধ-রাজত্বের অধীশ্বরী বলেও ঘোষণা করে দিলেন। এমন কি ওর আত্মীয়দের টাকার খাঁই মেটাবার জন্য জয়সিংহের পুঁথিশালাব অমূল্য বইগুলিও বিলিয়ে দিলেন।

থাক্ থাক্ আর বলবেন না সে কথা। আমাদের মধ্যে এরকম আরও লজ্জার কাহিনি আছে। অন্তত বাঙালির মুখে সে কথা শুনতে চাই না—ক্ষুণ্ণ সুরে মাথা হেলিয়ে বললেন ঠাকুর সাহেব।

কিন্তু বাঙালির মুখেই আপনাদের খারাপ দিকটার কথাও জানতে হবে। কারণ আমবা নিরপেক্ষভাবে রাজস্থানকে যাচাই করতে চাই। যাক সে কথা। বাকিটি শুনুন।

রাসকাপুর কিন্তু নূবজাহানের মতো বহু বিদ্যা ও বাজনীতিতে ওস্তাদ ছিলেন বলে জানা যায় নি। জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ওয়াকৎ-ই-জাহাঙ্গীরীতে লেখা আছে যে, একটা অত্যাচারী বাঘকে বড় বড শিকারীরাও মাবতে পারছিলেন না। অথচ জাহাঙ্গীর নিজে হাতে শিকাব কববেন না বলে একটা প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন। তাই নূরজাহান সেবারে স্বামীর বন্দুকের এক গুলিতেই সেই বাঘ মেরে ফেলেছিলেন।

আব জয়পুরেব নূবজাহান শুধু একটি বাঘ মেরেছিল—সে হচ্ছে মহাবাজা জগৎসিংহ।

বাসকাপুরের নামে জয়পুরের টাকা পর্যন্ত ছাপানো হত। তবে এই ভালোবাসা এতই ঠুনকো ছিল যে, যখন রাজা দেখলেন যে, এসবের জন্য নিজেকেই সিংহাসন হাবাতে হতে পাবে তখন শত্রুপক্ষেব মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে পেয়ারের উপরানিকে জেলে পাঠাতেও ছাড়েন নি। আরও সুবিধা মতো তাব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফিরিয়েও নিয়েছিলেন।

তার পরে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর সাহেব।

তবে শুনুন, বাকি কথাটা শুনুন, ঠাকুর সাহেব। সেটাই আসল কথা। আপনাদেব মধ্যে একজন ঠাকুব চাঁদ সিং ওইসব অসম্মানেব দৃশ্য এড়াবাব জন্য দরবারে হাজির হলেন না। তাঁব জবিমানা হল তিন লাখ টাকা। চার বছরের খাজনা। তবুও না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঠাকুরসাহেব,—আর তখনকার দিনেব তিন লাখ টাকা। একটা জায়গীর কেনা যেত।

ঠাকুর সাহেব একজন বড় জায়গীরদার। তাই খাজনা ও জায়গীরের কথা তাঁব প্রাণে দাগা দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল যে, প্রাণও দিযেছিল কয়েকজন লোক এই উপলক্ষে। যেখানে বাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ হয়ে বসকর্পূরীকে বিটিয়া বলে ডাকতেন ও বাজা নিজে তাকে রাজমহিষীদেব সমান সম্মান দিয়ে বেড়াতেন সে অবস্থাতেও সাধারণ প্রজারা তার প্রতিবাদে প্রাণ দিতে দ্বিধা করে নি।

বললাম—শুধু জরিমানা তো সামান্য কথা। রাজা তাব চেয়ে অনেক বেশি দূরে এগিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণ রাজপুতেব রীতি-চরিত্র তার চেয়ে অনেক বড় ছিল। যখন বাধা দেবার ক্ষমতা নেই দেখেছে তখন তারা দূবে সরে থেকেছে। জয়মন্দিরের তোষাখানা রাজা বদ খেয়ালে এমন ভেবে উড়িয়ে দিচ্ছেন যে চোখের সামনে তা দেখা যায় না। যারা পুরুষানুক্রমে তোষাখানার শিল্লেদার ছিল তারা, বেচাবি সামান্য ট্রেজারি গার্ডরা, কইতেও পাবে না অথচ সইতেও পারে না। অসহ্য অবস্থায় পড়ে আত্মহত্যা কবে আত্মসম্মান বজায় রাখল। রাজপুত স্বামীধর্ম বজায় রাখল।

উল্লাসে ঠাকুর সাহেব বলে উঠলেন—ঠিক জাপানীদের মতো।

উল্লাসের উপর একটু ঠাণ্ডা জল পড়ল যখন বললাম,—না। বলুন আসল রাজপুতদের মতো। জাপানে যাবার দরকার কি? নিজেদের মধ্যেই খুঁজে দেখুন, এরকম অনেক গর্ব করবার ও লোককে শেখাবার জিনিস পাবেন। ভারতের জন্য রাজস্থানকে আবিষ্কার করুন।

জগৎসিংহের সময় সারা রাজোয়ারাতে মারাঠা বর্গীদের যে ভীষণ লুঠপাট ও অত্যাচার চলত তা মনে পড়াতে বাঙলাদেশে এখনো মুখে মুখে প্রচলিত একটা কথা মনে পড়ল।

"জন্ম মৃত্যু বিয়ে
তিন বিধাতা নিয়ে"

এরকম একটা কথা আমাদের মধ্যে চলতি আছে। কিন্তু রাজার ঘরে উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মানো তো সোজা কথা নয়। সে বেচারার জন্মসঞ্চার থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যে তোলপাড় চলতে থাকে। যেখানে রাজারা এখনও মাথায় মুকুট পরে থাকতে পারেন সেখানে এ যুগেও উত্তরাধিকারী হয়ে জন্মানো মোটেই সামান্য ব্যাপার নয়।

এই জগৎসিংহের জয়পুরে এমনই একটা তোলপাড় ঘটনা হল। রাজার ষোল জন বৈধ রানী ছিল কিন্তু বৈধ কুমার ছিল না একটিও। কাজেই ইনি যখন মারা গেলেন আর প্রভুভক্ত রাজপুতরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে অস্বস্তি আরম্ভ হল। রাজা মারা যায়, কিন্তু রাজত্ব তো মারা যায় না।

জগৎসিংহ মারা যাওয়ার সময় রাজত্ব চালাত তাঁর অন্তঃপুরের প্রধান খোজা মোহন নাজির। যেমন বুদ্ধিতে বিশারদ তেমনিই জোচ্চোরি বাটপাড়িতে ওস্তাদ। রাজা যখন মারা গেছেন, তখন এমন একজনকে গদিতে বসানো দরকার যার লম্বা নাবালক অবস্থার মধ্যে নিজের প্রভুত্ব বজায় থাকে। এদিকে গদিতে বসবার দাবি করতে পারে এমন লোকের তো অভাব নেই।

রাজা মারা যাওয়ার পরদিন ভোরেই মোহন নাজির পকেট থেকে বের করল এক ন বছরের ছেলে মোহন সিংহ। নিজের নামের সঙ্গে মিল ছিল বলেই যে বেচারার এ সৌভাগ্য হল তা মনে করবেন না। যদিও মাত্র এক শ' বছর আগেকার জয়পুরে তাও নেহাত অসম্ভব ছিল না। চলতি রীতি অনুসারে অম্বর রাজবংশের বারোটা "রাজাওৎ" শাখার মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিলেই চলত। কিন্তু তাতে অসুবিধা যে বড় বেশি। তাই প্রায় চৌদ্দ পুরুষ আগেকার সম্বন্ধের জের টেনে বের করা এই মোহন সিংহ শ্মশানে জগৎসিংহের মুখাগ্নি করতে শোভাযাত্রা করে যাবার জন্য সূর্যরথে চড়ে বসল।

নরের মধ্যে নাকি নাপিতই সবচেয়ে বেশি ধূর্ত। কিন্তু নাপিতরাও এই নাজিরের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারবে। মায় রাজনীতি পর্যন্ত।

বারা কোট্‌রি অম্বরকা অর্থাৎ অম্বরের বারো সর্দার বংশের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী সর্দার ছিলেন তিনি জগৎসিংহের আমলে রাজার নিজের ভূসম্পত্তির অনেকখানি ঠকিয়ে নিজের জমিদারিতে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। এখন নাজিরের দলে থাকলে কেউ আর সে সম্পত্তি ফিরে চাইবে না। অতএব তিনি ও নাজির চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেললেন।

শুধু তাই নয়। পুরোহিত, কুলগুরু, ধর্মভাই এসবের দলও নাজিরের হাতে হাত মিলিয়ে ফেলল। যদি রাজাওৎদের মধ্যে ভোটের কারবারের ফলে নতুন কোনও রাজা নির্বাচিত হয়, তাহলে কোথায় যাবে এসব অনুগৃহীতের দল? নতুন রাজার শুধু গবুচন্দ্র মন্ত্রীই যে আসবে তা নয়, আসবে নতুন গুরুপুরোহিত, ধাইমা, ধাই-ভাই, সভাপারিষদ। নাঃ, তার চেয়ে নাজিরের বাছাই করা নাবালক অনেক বেশি নিরাপদ।

যেসব সর্দারের সহায়তায় আকবরের সময় থেকে ঔরঙ্গজেবের বংশধরদের সময় পর্যন্ত রাজা মানসিংহ, মীর্জা রাজা জয়সিংহ বা সোয়াই রাজা জয়সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের খুঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন, সেই সর্দারবংশদের মধ্যে এক বাটপাড় সর্দার ছাড়া আর কারও পরামর্শ নেওয়া হল না। রানীরাও কেউ কিছু জানলেন না।

শ্মশানের শেষকৃত্য শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই নাবালক দ্বিতীয় রাজা মানসিংহ নাম নিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাজপুত রাজাদের প্রতিনিধি যাঁরা জয়পুর দরবারে ছিলেন তাঁদের কাছে এই রাজাকে স্বীকার করিয়ে নেয়ার জন্য নাজির চেষ্টা করতে লাগল। প্রায় আদায় করে এনেওছিল। কলকাতায় তখন ব্রিটিশ শক্তি বেশ কায়েম হয়ে বসেছে। দিল্লির ব্রিটিশ এজেন্ট ও কলকাতা থেকে কোম্পানিরাজ নাবালককে রাজা বলে স্বীকার করলেন। রাজপুত রাজাদের স্থানীয় প্রতিনিধিরাও এক রকম স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু স্বীকার করলেন না একজন রাজপুতানী। পদ্মিনী ও কর্ণদেবীর দেশ রাজপুতানার এক রানী। জগৎসিংহের রানী ও যোধপুরের মহারাজার ভগ্নী। তিনি এই রাজা নির্বাচন উপেক্ষা করলেন। আগুনের ফিন্‌কির সন্ধান পেয়ে প্রতিকূল বায়ুও বইতে লাগল। জয়পুরের জনমত আত্মপ্রকাশ করল। সর্দাররাও নড়ে চড়ে উঠে বসলেন।

অস্ত্রের ঝন্‌ঝন্ আওয়াজের সম্ভাবনা দেখে নাজির খুব ভালো একটা কূটনৈতিক চাল চালল। মেবারের

রাণাই তো রাজপুতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানে ও প্রতাপে। বারো বছর আগে একবার জয়পুর মহারাজার বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা হয়েছিল। এখন যদি রাণাকে লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক আর বিরাট জাঁকজমকময় একটা বিয়ের লোভ দেখানো যায়, রাণা নিশ্চয়ই বিয়ে করতে জয়পুরে আসবেন আর জয়পুরের সব সর্দার তাঁকেই অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসবে। এক ঢিলে দু পাখি মারার চমৎকার বন্দোবস্ত।

সব কিন্তু ভেস্তে গেল জগৎসিংহের এক রানী অন্তঃসত্ত্বা আছেন এই খবরে। কেউ কোনও প্রশ্ন করল না যে, কি করে রাজা মারা যাবার পরেও তিন মাস পর্যন্ত এই সুখবরটি সযত্নে গোপন ছিল। বিশেষ করে যেখানে রাজা নিঃসন্তান মারা গেছেন বলে এত গোলমাল এবং যেখানে রাজবাড়ির কেচ্ছাকাহিনি বাজারে সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। তার উপর আবার নাজির নিজেই রাওয়ালার (রাজ-অন্তঃপুরের) প্রধান খোজা ও কন্ট্রোলার অব্ হাউস হোল্ড।

ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা দরকার।

ষোলজন বিধবা রানী আর সব সর্দারের সর্দারনীরা রানী সত্য সত্যই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন কি না তা একসঙ্গে বসে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। আর জেনানা দেউড়ির বাইরে সর্দাররা সে পরীক্ষার ফলাফল প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। চার ঘণ্টা ধরে বিচার করবার পর সবাই নিঃসন্দেহ হলেন যে রানীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে। সবাই লিখে দিলেন যে, যদি কোনও পুত্রসন্তান হয়, সে-ই জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করবে।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বিধবা রানীও নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু আর সেদিকে কেউ নজর দিল না। মির‍্যাকল সংসারে শুধু একবারই হয়।

যথাসময়ে রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে রাজোয়ারার সবচেয়ে ধনী রাজবংশের সম্মান রক্ষা করলেন। নাবালক মোহন সিংহ অলক্ষিতে সিংহাসন ছেড়ে কোথায় যে সরে পড়ল তার খবর কেউ রাখল না।

ইতি নীলবর্ণ-শৃগাল কথা।

চার

একটি রাজকন্যার কাহিনির সঙ্গে আমার রাজস্থানে দেখা এখানে জড়িয়ে গেল। হাতে তার বিষের পেয়ালা। কিন্তু সে বিষ অমৃতে পরিণত হবে এই আশায় তার চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে বরের দল।

রাজকন্যা আত্মহত্যা না করলে তাদের আর উপায় নেই।

এই যদি মহাবীর রাজপুত রাজাদের দুরবস্থা ছিল, এদের ও অন্যান্য রাজাদের নতুন ভারতের মধ্যে এক করে নেওয়ার জন্য আমাদের এত ব্যাকুলতা কেন? কেন সমস্ত ভারত আগ্রহভরে তাকিয়ে দেখছিল যে রাজন্য ভারত কোন্ পথ বেছে নেয়! আসমুদ্রহিমাচল এক দেশ হয়ে যাবার স্বপ্ন কেন সুদূর বাঙলা ও কন্যাকুমারী পর্যন্ত একসঙ্গে দেখতে আরম্ভ করেছে।

এটা কি শুধু ভূগোলের খাতিরে?

না,—ইতিহাসের খেলা?

না,—রাজনীতির নেশা?

তার উত্তর দিয়ে গেছেন লর্ড ওয়েলিংটন। ইংলন্ডের ইতিহাসে যাকে বলা হয় আয়রন ডিউক, সেই নেপোলিয়ন-বিজয়ী বীর। তখন অবশ্য তিনি অত বিখ্যাত ছিলেন না। কিন্তু সামরিক কৌশলের জন্য তিনি তখনই খুব নাম করেছেন। এ দেশে বহু দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর আধুনিক রণনীতির প্রমাণ হাতে হাতে হয়ে গিয়েছে।

তিনি তাঁর বড় ভাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলিকে চিঠি লিখেছিলেন যে, রাজপুত শক্তির অস্তিত্ব এমন একটা জিনিস—যা হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তার কারণ হবে।

রাজপুতদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখলে এদের কারোরই বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না। এখনও নেই। কিন্তু এদের সবাইকে একসঙ্গে করে নিতে পারলে যে রাজস্থান একটা মহাশক্তিতে পরিণত হতে পারে সে কথা শুধু বিচক্ষণ ইংরেজ নয়, আমাদের দেশের তখনকার নেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন। মারাঠারা তখন

হিন্দুস্থানে সবচেয়ে বড় দেশীয় শক্তি। তারা অন্তত জয়পুর, উদয়পুর আর যোধপুরকে একসঙ্গে মিলিয়ে নতুন-ওঠা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। আর বার বার ঠিক এই চেষ্টা করেছে ইংরেজ কোম্পানিও। দু পক্ষই সমানভাবে রাজপুতদের চাপ দিয়েছে। দাবা-বোড়ের চালের চাপে রাজপুতনার নাভিশ্বাস এসে গিয়েছিল।

শুধু রাজাদের নয়, প্রজাদেরও শান্তি ছিল না।

বাঙলাদেশে বর্গীর অত্যাচারের পুরানো কথার গান শুনিয়ে বাচ্চাদের এখনও ঘুম পাড়ানো হয় কিন্তু যে যুগে এই অত্যাচার হত সে যুগে কারও চোখে ঘুম ছিল না।

খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এল দেশে;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেবো কিসে?

কিসে, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মারাঠা বর্গী ঘোড়সওয়ার অপেক্ষা করত না। উত্তর যুগিয়ে দিত তার তরোয়ালের খোঁচা। এবং সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যেত গ্রামকে গ্রাম ছারখার হবার পর আগুনের মধ্যে।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের রাষ্ট্রশক্তি ভেঙে গেল; কিন্তু লুঠপাটের প্রতি ভক্তি বেড়ে গেল। ক্ষমতা গেল, কিন্তু ক্ষতিকারকতা রয়ে গেল। রাজ্য গেল, কিন্তু উপরাজাদের অভাব হল না। উপদেবতার উপদ্রবে সমস্ত দেশ হাহাকারে ভরে গেল।

মানুষের এই জীবন্ত শ্রাদ্ধে পিণ্ড চড়াতে আসত পিণ্ডারীরা। এদের দেশ, জাতি, নীতি কোনও কিছুরই বালাই ছিল না। কিন্তু ধর্ম ছিল লুঠপাট ও মোক্ষ ছিল অত্যাচার। মাইনে করা লুঠেরাদের ছিল সিপাহীর বৃত্তি ও ডাকাতের প্রবৃত্তি। যখন হাতে মাইনে দেওয়ার টাকা থাকত না, সর্দাররা নিশ্চিন্ত মনে মাইনের বদলে লুঠপাঠের যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে দিত। তাদের মাইনের পিপাসা মিটে গেলে আবার সর্দারদের লুঠ শুরু হত।

পিণ্ডারীদের চেয়ে তৈমুর বা নাদিরশাহের সৈন্যরাও ভালো ছিল। কারণ তারা একবার মাত্র এসে লুঠপাট খুনখারাপি করে পিছনে মড়ক আর অগ্নিকাণ্ড রেখে নিজের দেশে ফিরে যেত। কিন্তু পিণ্ডারীরা যে এ-দেশেরই লোক ছিল। কাজেই যাবে কোথায়? তারা শুধু ফিরে ফিরে আসত।

বিদেশী আক্রমণকারী অজানা দেশে এসে যুদ্ধ জয় করে ধনরত্ন লুঠ করে নারী ও শিশুদের দাসদাসী বানিয়ে বন্দী করে নিয়ে যেত। কিন্তু পিণ্ডারী ছিল নরখাদক বাঘ। যেখানে মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পেয়েছে, সে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। সে আবার ছিল সর্বভুক। বছরে বছরে চলত তার যাতায়াত নতুন নতুন দাবি ও অত্যাচারের কলা-কৌশল নিয়ে। রাজা ও প্রজা দুজনকেই সমানভাবে শোষণ করত।

প্রায় দেড়শ বছর আগে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক ছিল পিণ্ডারী-সর্দার পাঠান আমীর খাঁ। আমীর খাঁর লুঠপাটের ইতিহাসই সে সময়কার রাজস্থানের ও মধ্য-ভারতের ইতিহাস।

বলতে গেলে হোলকারের রাজ্য সে-ই শাসন করত। সিন্ধিয়ার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তার ছিল। যোধপুরের মহারাজা আর ভূপালের নবাব তার হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। জয়পুর ও উদয়পুরের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে লক্ষ লক্ষ টাকাও আদায় করত আমীর খাঁ।

সবচেয়ে বড় কথা যে, ভারতের সবচেয়ে বেশি সম্মানী বংশ শ্রীরামচন্দ্রের সূর্যবংশের সন্তান মেবারের মহারাণার মেয়েকে কার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে তার বিধানও দিয়েছিল এই পিণ্ডারী আমীর খাঁ।

পাঠান হুকুম দিল যে, হয় কৃষ্ণকুমারীকে তার হাতের পুতুল যোধপুরের মহারাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, না হয় তাকে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে হবে। সেই রূপসী শিশোদীয়া বংশের রাজকুমারীকে, যার পূর্বপুরুষ মহারাণা প্রতাপ জয়পুরের রাজা মানসিংহ বোনের সঙ্গে মোগল সম্রাটের বিয়ে দিয়েছেন বলে তার সঙ্গে একসঙ্গে খেতে অস্বীকার করেছিলেন। সেই বংশের রাজকুমারীকে, বারের পর বার যাদের মেয়েরা জহরব্রত করে শত্রুকে পায়ের এক আঙুল দেখিয়ে হাসিমুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেই মহাবংশের রাজকুমারীকে হাতে তুলে নিতে হল বিষ—যে বিষ সমস্ত রাজস্থানের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিষ। নিজেদের খণ্ড ছিন্ন মনুষ্যত্বহীন বিক্ষিপ্ত অবস্থার বিষ। দুর্বল অসহায়তার বিষ।

জয়পুরের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়।

সিন্ধিয়া আর হোলকার দুজনেই মারাঠা। দুজনকেই যে ব্রিটিশরা যুদ্ধে হারিয়ে অধীন করে নিতে চায়

সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে কি তারা একসঙ্গে মিলে দুজনেরই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বেন এবং সেই উদ্দেশ্যে আরও অন্যান্য দেশী রাজাদের সঙ্গে মিলিত হবেন?

না—ভারতের ইতিহাসে সে রকম ব্যাপার ঘটার কোনও নজির নেই। শুধু আজই আমরা এক-মত এক-প্রাণ হয়ে নিজেদের এক ভারতের সন্তান বলে মনে করতে শুরু করেছি।

অতএব সিন্ধিয়া ও হোলকার দুজনেই পালা করে জয়পুরকে শাসাতে ও লুঠ করতে কোনও দ্বিধা বোধ করলেন না। বার বার লুঠপাটে অস্থির ও ফতুর হয়ে জয়পুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাবার জন্য সন্ধি করল।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে হোলকার শাসিয়ে দিলেন—রসো না, ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধির রস তোমায় ভালো করে খাইয়ে দিচ্ছি। এমনভাবে জয়পুর রাজ্য ছারখার করব যে ফিরিঙ্গিও আর তোমার দিকে ফিরে তাকাবে না।

ভয় পেয়ে জয়পুর ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু রেসিডেন্ট তো হোলকারের এই হুমকিতে বিশ্বাস করলেনই না, বরং পালটা নালিশ করলেন যে, যোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুর (মেবার) একজোট হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দল বাঁধছে। এদিকে হোলকারের সৈন্যরা ততদিনে জোর করে জয়পুর রাজ্যের সীমায় ঢুকে নিজেদের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করছে।

কিন্তু জয়পুরের রাজার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের রাজ্য কি করে যে মারাঠার হাত থেকে রক্ষা পাবে তার ঠিক নেই, কিন্তু তার সৈন্যরা উদয়পুরে পাট্টা গেড়ে বসে আছে যাতে কৃষ্ণকুমারী তার হাতছাড়া না হয়ে যায়। সৈন্যরা বিয়ের তত্ত্ব জোর করে মেবারের মহারাণার কাছে গছিয়ে দিল এবং তাঁকে তা নিতেও হল।

তাতে অবশ্য মহারাণার আর্থিক অবস্থার সুরাহা হয় নি। কারণ, প্রায় এই সময়েই সিন্ধিয়া জোর করে মেবারের কাছ থেকে যোল লক্ষ টাকা আদায় করে নেন। অছিলার অভাব হয় নি। মহারাণা হোলকারের আশ্রয় পেয়েছেন বলে সিন্ধিয়ার দুঃখ হয়েছে। কাজেই সিন্ধিয়া তাকে নিজের আশ্রয় দেবার জন্য এগিয়ে এসেছেন এবং এই বদমায়েস জয়পুরীয়ার হাত থেকে কৃষ্ণকুমারীকে বাঁচাবার জন্য তাঁর সদিচ্ছার অন্ত নেই। অতএব মহারাণাকে তার দাম দিতে হবে বৈকি?

রাজকুমারীর অসম্মানের এখানেই শেষ হল না। সিন্ধিয়া প্রস্তাব করে বসলেন যে, যোধপুর ও জয়পুর এই দুই পক্ষের গোলমালের মধ্যে উদয়পুরের যাবার কোনও দরকার নেই; সব সমস্যার সমাধান করবার জন্য সিন্ধিয়া নিজেই কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করে ফেলতে চান।

সূর্যবংশের কন্যা, মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশের কন্যা কৃষ্ণকুমারী ও "চাষার বেটা" সিন্ধিয়া।

মহারাণার অন্দরমহলের দরজা বন্ধ করে সবাই স্মরণ করতে লাগল যে, মাত্র কয়েক পুরুষ আগে সিন্ধিয়ার পূর্বপুরুষের হাতে যা শোভা পেত তা রাজদণ্ড নয়, এমন কি সামান্য তলোয়ারও নয়, শুধু চাষের হাল আর মহিষের রশি।

এদিকে কোম্পানি জয়পুরের কাছে নালিশ করতে লাগল যে, সে সন্ধির শর্ত অনুসারে মারাঠাদের বিরুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সহায়তা করছে না।

অন্যদিকে জয়পুরীয়া সৈন্য উদয়পুরের বুকের উপর গেড়ে বসে থাকাতে লুঠপাট চালানোর অসুবিধা বোধ করে সিন্ধিয়া কোম্পানিকে অনুরোধ করলেন যে, কোম্পানির বন্ধু জয়পুর যেন শীঘ্রই সৈন্য সরিয়ে নেয়। তা না হলে মারাঠা প্রভুর রাগ উদয়পুরের বদলে জয়পুরের উপর গিয়ে পড়বে। জয়পুর তাহলে ছারখার হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত সিন্ধিয়া জয়পুরের সৈন্যদের যুদ্ধ করে উদয়পুর থেকে ভাগিয়ে দেন। পাকা দেখা পাকা আর হল না। শঙ্খের বদলে কামানের আওয়াজ তাদের পিছু পিছু তাড়া করে চলল।

শুধু রাজনৈতিক অক্ষমতা নয়, নৈতিক নির্লজ্জতারও সীমা ছিল না সে যুগের রাজস্থানে।

যুদ্ধ করতে সাহস নেই বলে বিয়ে করতে উৎসাহ থাকবে না কেন? এ ব্যাপারে আরও এক শ বছর পরেও কি বৌকে খাওয়াবার পরাবার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঘরে ছোকরারা বিয়ে করছে না?

উদয়পুর থেকে সৈন্যরা পালিয়ে আসার পর জয়পুর বন্ধু কোম্পানির কাছে নিবেদন করল যে, এখন যেন জগৎসিংহ ও কৃষ্ণকুমারীর বিয়েতে সম্মতি দেবার জন্য কোম্পানি সিন্ধিয়াকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে শুভকার্যে সাহায্য করে। শুভকার্যে বিলম্ব করতে নেই এই মহাবাক্য স্মরণ করে জয়পুর লিখে পাঠাল যে,

আগামী বসন্তকাল থেকে বর্ষার প্রথমভাগের মধ্যে যেন প্রজাপতির কৃপা হয়।

কোম্পানি রাজনীতিতে বড় হুঁশিয়ার। প্রজাপতিকে উড়তেও দিল না, পাখাও কেটে দিল না। শুধু বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে বলল যে, এ সব অপকার্যে শক্তি অপব্যয় করার সময় এখন নয়।

এদিকে যোধপুরের মহারাজা মানসিংহের অবস্থাও সমান শোচনীয় ছিল। সর্দারদের সঙ্গে যোগসাজসে সিংহাসন পেলেও তার পথ নিষ্কণ্টক ছিল না। আর একজন সিংহাসনের দাবিদার জয়পুরের মহারাজার দলেই ছিল। জয়পুরের মহারাজা উদয়পুরে অপমানিত হওয়ার পর অনেক সৈন্য নিয়ে ও এই দাবিদারকে সঙ্গে নিয়ে চললেন মাড়োয়ারের দিকে। এত সৈন্য নাকি সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোনও রাজপুত রাজা জড়ো করেন নি কখনও।

কিন্তু হায়, উদ্দেশ্যটা কী ছোট, কী সামান্য তা ভাবলেও লজ্জা হয়!

ভীষণ যুদ্ধ হল। অনেক দিন ধরে চলল সে যুদ্ধ। যোধপুর দুর্গের ভিতরে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করলেন রাজা মান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা জগৎসিংহই কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন।

কোম্পানি বহুদিন থেকেই জয়পুরকে যোধপুরের সঙ্গে আপোস করতে, না হয় কোম্পানিকে সালিশ মানতে অনুরোধ করছিল। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষীর বিভাগের ব্যাপার জটিল হয়ে উঠছে দেখে কোম্পানি ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ল। অর্থাৎ এই পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে চায় না বলে সন্ধি ভেঙে দিল।

মানসিংহ এবার এমন একটি অপকার্য করলেন যাতে তাঁকে আর কেউ, এমন কি তাঁর পাত্রমিত্ররাও আর মানী লোক বলে মনে করতে পারে না।

তিনি পাঠান সর্দার আমীর খাঁকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের সিংহাসনের দাবিদারকে সরিয়ে ফেলার বন্দোবস্ত করলেন। পিণ্ডারী সর্দার দাবিদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে দরগায় গিয়ে পাগড়ি বদল করে প্রতিজ্ঞা করল যে, যোধপুরের গদিতে তাকেই বসিয়ে দেবে। সেখানে সেই দরগারই সামনে এ মিতালীর আনন্দোৎসব করবার জন্য শুরু হল নাচগান, চলল মদের পেয়ালা। এমন সময় তাঁবুর দড়ি কেটে দিল পিণ্ডারীরা। ঘেরাটোপে জড়িয়ে পড়ল সব রাজপুত। ছররা গুলির বৃষ্টিধারায় সব শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু রক্তের পিপাসা শেষ হল কি?

না। যে বিষের ধোঁয়া সমস্ত রাজস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার নিশ্বাস শুধু বাইরের জগতে সৈন্যসামন্ত রাজাদের মাঝখানে ছড়িয়েই কেন শেষ হতে যাবে? মায়ের মন্দিরের ধুপ যে এখনও চারদিকে গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাকে ছাপাতে না পারলে বিষের সাফল্য পূর্ণ হবে না।

ইতিমধ্যে জয়পুর যোধপুরের সঙ্গে যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে হোলকারের শরণাপন্ন হল।

কিন্তু রাম না হয় রাবণ একজন তো মারবেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ব্যাপারে রাম কেউ ছিলেন না। দুপক্ষই রাবণ।

হোলকারের শরণ নেওয়াতে সিন্ধিয়া চটে জয়পুর আক্রমণ করে লুঠপাট করে একেবারে ছারখার করে দিল। সিন্ধিয়ার শিবিরে বসে একজন ইংরেজ রাজদূত লিখে গিয়েছিলেন যে—সব শস্য নষ্ট করা হয়েছে। ঘরবাড়ির কড়ি বরগা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গিয়েছে। দরজা ও চৌকাঠগুলি উপড়িয়ে নিয়েছে। গ্রামগুলির ধ্বংসাবশেষ থেকে শুধু ধোঁয়া উঠছে।

বিষের ধোঁয়া।

সময় বুঝে বাজপাখির মতো ছোঁ মারতে নেমে এল পিণ্ডারী সর্দার। পনেরো লক্ষ টাকা দিয়ে জয়পুর সিন্ধিয়াকে শান্ত করল। কিন্তু পিণ্ডারীকে ঠাণ্ডা করে কি দিয়ে? কি আর বাকি আছে?

অবশ্য আমীর খাঁর নিজেরও কিছু ছিল না তখন। মাইনে-করা লুঠেরাদের মাইনে দিতে পারে নি বলে ওরা তাকে রোজ অনাহারে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত; জয়পুর শহরের পাঁচিলের বাইরে তাঁবুর বাইরে টেনে এনে পাইকারী দরে অপমান করত। জয়পুর পাঁচিলের ওপার থেকে সব দেখত।

তবুও এত অসহায় ছিল জয়পুর যে, এই আমীর খাঁকেই তখন ষোল লক্ষ টাকা নজরানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে উপায় ছিল না।

এর পর হিম্মত বেড়ে গেল পাঠানের। সে উদয়পুরে এসে কৃষ্ণকুমারীর ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্বন্ধে মহারাণাকে হুকুম পাঠাল। হয় পাঠানের আশ্রিত রাজা মানকে বিয়ে করতে হবে, না হয়—না হয় এই ষোড়শী

রূপসী রাজকুমারীকে পৃথিবী থেকে সরে যেতে হবে।

আর তা না হলে?

তা না হলে একটি রাজকন্যার ইজ্জতের জায়গায় মেবার বংশের সব পুরনারীরই ইজ্জত যাবে। অর্থাৎ লম্পট উচ্ছৃঙ্খল পাঠান পিণ্ডারীরা রাজপ্রাসাদে ঢুকবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

রাজোয়ারার রাওয়ালা* হচ্ছে একটি আলাদা জগৎ। সেখানে অজানা গলিপথে, অসংখ্য সুড়ঙ্গ দিয়ে ষড়যন্ত্র নিঃশব্দে আনাগোনা করে। তার মধ্যে এই কাহিনির আসল ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে। তবে এইটুকু ঠিক যে একজনের পর একজন বীরপুরুষ নারী হত্যা করতে অস্বীকার করে লজ্জায় ঘৃণায় পিছিয়ে গেল। তবু 'বাপোতা'র** সম্মান রক্ষা করবার জন্য সন্তানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলে এক হয়ে শত্রুকে তাড়াবার জন্য এগিয়ে এল না। শুধু মাথা নীচু করে সরে গেল।

যে জিভ এই শাস্তির আদেশ দিয়েছে সে জিভকে অভিশাপ দিতে দিতে মহারাণার খুড়তুত ভাই সরে গেলেন। নিজের ভাই এই মৃত্যুদণ্ড পালন করবার জন্য রাজি হলেন শুধু এই ভেবে যে, রাজকন্যার হত্যা শুধু রাজহস্তেই হওয়া উচিত। তিনি তলোয়ার হাতে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু স্বর্গের নিষ্পাপ একটি ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। হাত থেকে কৃষ্ণকুমারীর পায়ের কাছে পড়ে গেল তরোয়াল।

কিন্তু রাজকন্যার মুখে নেই বারণ, মনে নেই ভয়। প্রশান্তভাবে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সামনে পেশোলা হ্রদের বুকে জল ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

মহারানী মায়ের নিজের সন্তানকে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। তিনি শুধু কাঁদতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কোনও বীরপুরুষ অস্ত্রাঘাতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করতে রাজি হচ্ছেন না দেখে পুরনারীরা বিষ বানিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁকে বলা হল যে, এই পাত্র হচ্ছে তাঁর পিতার কাছ থেকে দান।

রাজকুমারী মাথা নিচু করে পিতার দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে একটি শেষ প্রণাম জানিয়ে পেয়ালাভরা বিষ এক চুমুকে শেষ করে দিলেন।

চোখ দিয়ে এক বিন্দু জলও ঝরে পড়ল না। মাথার মধ্যে বিষের ক্রিয়া হতে আরম্ভ করেছে, তবু তিনি মাকে অনুরোধ করলেন কান্না থামাতে। বললেন,—"কেঁদো না মা। আমি কি মরতে ভয় পাই? আমি কি তোমার মেয়ে নই? কেন আমি ভয় পাব? জন্ম থেকেই তো আমাদের আত্মবিসর্জনের জন্য তৈরি করা হয়। শুধু বেরিয়ে যাবার জন্যেই তো আমরা পৃথিবীতে আসি; আমি যে এতদিন বেঁচেছি, তার জন্য বাবাকে ধন্যবাদ দিই।"***

তখনও তিনি মরছেন না দেখে আবার নতুন পেয়ালা ভরে বিষ এল। তবু ফল নেই। একটু পরে আবার এক পেয়ালা। তবু রাজকন্যার জীবনদীপ নেভে না।

দুর্যোধনের রাজসভায় দ্রৌপদীর শাড়ি এমনভাবেই শেষ হচ্ছিল না, যত টানে দুঃশাসন ততই সে শাড়ি বেড়ে বেড়ে যায়। আজও শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন নাকি কৃষ্ণকুমারীর পাশে?

এদিকে রক্তপিপাসু পিণ্ডারী সর্দার আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। প্রাসাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে খোলা তরোয়াল আর ভরা বন্দুক হাতে পিণ্ডারীর দল। লালসা তাদের লুঠপাঠের লোভে ইন্ধন জোগাতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

আবার এল তাড়াতাড়ি আর এক পেয়ালা। স্নিগ্ধ কুসুম্ভ ফুল ও মূলের রস। স্নিগ্ধ শান্তিতে এবার হাসিমুখে ঢলে পড়লেন রাজকন্যা। বলে গেলেন—এবার এই ব্যাপার শেষ হোক। শেষ হোক।

রাজপুত চারণ ভাষার উচ্ছ্বাস ও বর্ণনার রঙ ফলানো বন্ধ করে এখানে শুধু বলেছেন—

"সে ঘুমাল"।

* * * *

---

*রাজস্থানের রাজ-অন্তঃপুর

**বাপের দেশের, Fatherland -এর

***বিয়ের পণের দায় এড়াবার জন্য রাজস্থানের শিশু মেয়েদের জন্মের পরেই অনেক সময় মেরে ফেলা হত।

কৃষ্ণকুমারীর বিষপানে নীলকণ্ঠ যে রাজস্থান তার মিলনের অমৃত পান করবার সময় কি এল?

সেদিন রাজস্থান ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাই সামান্য মারাঠা ও পিণ্ডারী সর্দারদের দস্যুতার বিরুদ্ধে পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে নি। এখন সমস্তটা দেশ তাকে দু হাত তুলে ডাকছে একসঙ্গে মিশে যেতে।

প্রজারা সাড়া দিয়েছে। রাজারা দেবে কি?

চন্দ্রমহল রাজপ্রাসাদের দোতলায় জয়পুরের আগেকার দিনের মহারাজাদের অয়েল-পেন্টিংগুলি জীবন্ত ভাব ধারণ করে তাকিয়ে আছে।

বাইরের পিচঢালা মসৃণ রাজপথে চলেছে প্রকাণ্ড এক প্রসেশন—রাজস্থানের জনসাধারণ। তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে তারা হিন্দুস্থানের সঙ্গে এক হয়ে যাবার জন্য দাবি জানাচ্ছে। দেশের ইতিহাস তৈরি করার মধ্যে এতদিন তাদের কোনও হাত ছিল না। তাদের কর্তব্য ছিল শুধু পিণ্ডারী মারাঠার লুঠপাট সহ্য করা, ব্রিটিশ রেসিডেন্সির দুর্দান্ত দাপট অনুভব করা আর ব্রিটিশ রক্ষিত দরবারের বিলাসব্যসনের ব্যয়ভার জোগানো। অন্য কিছুতেই তাদের ছিল না কোনও হাত।

রাজপুতরা যখন মরণপণ করে আশাহীন যুদ্ধে নামত, তখন মাথায় পরত হলদে পাগড়ি—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসের রঙের পাগড়ি। জরদ-কাপড়ওয়ালা তাদের সে মূর্তি শত্রুকে বুঝিয়ে দিত যে, মরিয়া হয়ে তারা মারতে নেমেছে।

আজ সেই রাজপুতরা সাদা গান্ধী টুপিতে মাথা ঢেকে নতুন যুদ্ধে নেমেছে।

এল মহাজন্মের লগ্ন।

পাঁচ

কাজেই একটু গতজন্মের খবর নিয়ে রাখা মন্দ নয়।

সে জন্মের রাজন্যসভাগুলির ভিতরের কাহিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি হয় নি। ভারতের জনসাধারণ বা রাজ্যের জনসাধারণের কোনও অংশ তাতে ছিল না। এমন কি গড়ের মাঠের ফুটবল খেলায় গাছের ডালে চড়া দর্শকের অংশটুকুও নয়।

এ দৃশ্যের যবনিকা তোলা হত শুধু সাহেব রাজপুরুষ বা রাজগোষ্ঠীর দর্শকের জন্য। দেশী যারা থাকত তারা শুধু ভাই বেরাদর রাজামহারাজা বা সভাসদ বা বিশেষভাবে অনুগৃহীত জনকয়েক।

এই জনকয়েকের আবার চোখ থাকত অতিথিদের উপর, হাত স্টেজের ড্রপসিন টানার দড়ির উপর ও কান হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের গ্রামোফোনের চোঙার উপর।

কানের উপর কর্ণধারের অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের অধিকার ছিল একেবারে একেশ্বর। হাসিতে কাশিতে উঠিতে বসিতে শয়নে জাগরণে শুধু যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি। হৃদিস্থিত 'দরবার' অর্থাৎ মহারাজ ডেকে আনতে বললে যদি বেঁধে না আনো, তাহলে পাল্লা দিয়ে যারা পারিষদি করে যাচ্ছে তারা আভাসে বুঝে নেবে ও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে যে, তোমার প্রভুভক্তির স্রোতের ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে।

কানাঘুষার সাগরবেলায় এ ভাঁটা কিন্তু একেবারে মারাত্মক। কোথায় যে আছে চোরাবালি, আর কোন্ দমকা স্রোতে যে অথৈ জলে তোমায় টেনে নিয়ে যাবে তার কোনও হদিস নেই। অতএব অনুগৃহীতের তৎপরতায় না ছিল বিশ্রাম, না বিরতি।

কাজেই রাজ-অতিথিদের সেবা ও মনোরঞ্জনে কোনও ত্রুটি বা অবহেলা কখনও হত না। হুকুম তামিলেও এত অনুরাগ ও ভক্তি অন্য যে কোনও মহত্তর কাজের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু সর্বদেবময় হচ্ছেন অতিথি, বিশেষ করে তিনি যদি সাগর পারের হন।

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার মতো রাজাদেরও দেবতার সংখ্যার লেখা-জোখা ছিল না। প্রতি শীতের মরশুমে ইয়োরোপ ও আমেরিকার মন ওভারকোটের ভার, কুয়াশার কালি ও বরফ-জমা শীত এড়িয়ে সাউথ সী আইল্যান্ডে দক্ষিণ সাগরের তাল-নারিকেল কুঞ্জে ছাওয়া প্রসন্ন সূর্যের দেশে হাওয়া বদলাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন শৌখিন চামড়ায় বাঁধাই পকেট বুক থেকে বের হয় বিভিন্ন সম্ভাবনার তালিকা।

সে তালিকায় অবশ্য সর্বদাই প্রথম স্থানের গৌরব পেয়ে থাকে ইন্ডিয়া। কারণ, এত হরেক রকমের

চমৎকার দৃশ্য আর মজা অন্য কোথায় পাওয়া যাবে? সেখানে আছে সাপুড়ে ও সাধু, বাঘ ও বেনারস, "হিমালয়া", তাজ আর শিকার পার্টি। অবশ্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছেন হিজ হাইনেস অব...।

সেই যে, সে বছর রিভিয়েরায় সাগরপাবে বা লন্ডন বা হলিউডের হোটেলে বা ইন্ডিয়া ক্লাবের পার্টিতে হিজ হাইনেস দি মহারাজা বা যুবরাজ বা তাঁদের কর্ণধার তাঁকে খোলা নেমন্তন্ন জানিয়ে রেখেছিলেন,—যে বছর খুশি, নিশ্চয়ই এসো। আমার রাজ্যের সবরকম আতিথ্য তোমার জন্য দরাজ হাতে খোলা বইল। অন্যান্য রাজ্যেও তোমার রাজঅতিথি হবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে।

অতএব প্রতি শীতকালে মানস-সরোবরের শুভ্র বলাকার চঞ্চল দলের মতো চলে আসেন শ্বেতাঙ্গ বিদেশবিহাবী নরনারীর দল। 'ডুয়িং ইন্ডিয়া', ভারতবর্ষ করছি বা সারছি এ কথাটাই পাশ্চাত্ত্য সমাজে একটা বুক ফুলিয়ে কইতে পাবাব মতো কথা। তার উপর হিজ হাইনেস অব অমুকেব অতিথি ছিলাম। সমাজের স্তরে আমার আসন কতখানি উঠে গেল, লোকে আমায় কত বেশি 'ইন্টারেস্টিং' বলে মনে কবতে লাগল এব পর—তার হিসাব, তোমরা আমাদের রোমাঞ্চকব শিকার পার্টির বোবা জঙ্গল-পিটিয়ের দল, তোমরা কি করে বুঝবে?

এই প্রশ্ন করে ইন্ডিয়ান স্টেস্টস্ পিপলস্ কংগ্রেসের একজন পাণ্ডা ব্যক্তি আমাব দিকে কৌতুকে ও আঘাতে ভরা একটা চাহনি হেনে চুপ করলেন। মির্জা ইসমাইল এভেনিউয়ের নূতন ঝকঝকে রাস্তায়—না, না, রাজপথে—ক্যামেরার দোকানে ছবি তোলাব সাজসরঞ্জাম কিনতে গিয়েছিলাম। আলাপী ব্যক্তি। চট কবে আমার সঙ্গে তিনি আলাপ জমিয়ে নিয়ে এই বিষয়ের কথা পেড়ে বসলেন।

বললেন,—মশাই, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধুর দেশের লোক আপনি। রাজস্থান দেখতে এসেছেন, শুধু রাজাদের কীর্তি না দেখে প্রজাদের কথাটাও একটু শুনে যান।

খদ্দরেব টুপিটা একটু মজাদার ভঙ্গিতে নাচিযে তিনি বললেন,—আহা, চিরজীবী হোন মহাবাজা শ্রেণী। তাদের মতো উৎকৃষ্ট মহাশয় ব্যক্তি দুনিয়ায় দেখা যায় না। তাদেব এই বাজ্যগুলি যে কংগ্রেসের আন্দোলন থেকে দূরে সবিয়ে জিইয়ে রাখা হয়েছিল এতেই ব্রিটিশবাজেব বুদ্ধিব সবচেয়ে বড় পবিচয পাওযা যায়। সিপাহী যুদ্ধের পব বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখেছিলেন যে, এই ঢেউয়ের চোটেই ইংরেজ বাজত্ব সাবাড় হযে যেত যদি আমাদের মহারাজাবা সমুদ্রেব বাঁধের মতো সে ঢেউ না সামলাত। বিশ্বাস না হয এলফিনস্টোনেব লেখা পড়ে দেখবেন। তিনি লিখেছেন যে, নিজাম, সিন্ধিয়া, শিখ এরা সব না থাকলে ১৮৫৭-তে আমবা কোথায় থাকতাম?

একটু ইতস্তত করে বললাম—সে সব হচ্ছে বড বড় পলিটিক্সেব কথা। আমি দেশ বেড়াতে এসেছি। আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবরে আমার দরকাব কি?

গরম জবাব দিলেন তিনি। দরকার আলবাত আছে। সাধাবণ লোকের মনেব ভাবটাও আমায় জানতে হবে। আদার ব্যাপারি যে আদার সঙ্গে কাসুন্দিরও খবর নেয় কিছু কিছু। এই দেশীয় রাজ্যগুলির মতো একটা চমৎকার প্রতিষ্ঠান না থাকলে পৃথিবী থেকে একটা রোমান্সই লোপ পেয়ে যেত।

রাজআতিথ্য অর্থাৎ স্টেট গেস্ট হিসাবে বড় বড় অতিথিকে আপ্যায়ন করার ধর্ম তিনি বোঝেন খুব ভালো কবে। এটা হচ্ছে নিতান্তই একটা প্রপাগান্ডা, নিছক একটা প্রচার। রাজাদের অস্তিত্ব বক্ষার সপক্ষে একটা নীরব ওকালতি। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তাদের খোশমেজাজে বাখবার একটা কৌশল। অবশ্য কর্তাবাও নিজেদের বিলেতী রাজ কায়েম রাখবার এত সুবিধাজনক যন্ত্রটি ঠিকমতো চালু রাখতে কসুব করেন নি। তাদের নিজেদেরই দবকাব ছিল।

কিন্তু আমার চোখে রয়েছে বাজপুত আতিথেয়তার স্বপ্ন। ছেলেবেলা থেকে তার উদারতা ও মহিমার কথা শুনে এসেছি।

হাতের একটা দোলানিতে ভদ্রলোক এই মনোভাবকে বাতিল করে দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন,—সেই বিশাল হৃদয় ঐতিহাসিক আতিথেয়তার কোনও ছাপ আমি এর মধ্যে খুঁজে পাই না। আর যদি বা তা থেকেও থাকে, এই জনজাগরণের যুগে সাধারণের সামান্যতাই রাজারাজড়ার আতিথ্যের জাঁকজমকের চেয়ে অনেক ভালো। এটা হচ্ছে ইনকিলাবের যুগ।

এইখানেই তিনি থামলেন না। বললেন—ওই যে সব ব্রিটিশ নাইট আর মার্কিন মিলিয়নেয়ারের দল, যারা এসব রাজ্য ঘুরে আতিথ্য চেখে গিয়েছে তারা সবাই চেঁচাচ্ছে যে, ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার আওতায়

রাজাদের টেনে আনাটা একটা অন্যায় অত্যাচার। এই যে আজ রাতে এখানে একজন ইংরেজ লর্ডকে বিদায়ভোজ দেওয়া হচ্ছে, উনি যদি সবাইকে বলে বেড়ান যে মধ্যযুগের ওই রাজমহিমাগুলি অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত, তাহলে কি আশ্চর্য হবেন কিছু?

খবরের কাগজ দেখলেই জানতে পারবেন, এদের জন্য কত লর্ড আর লেডির দল এরই মধ্যে সাগরপারে অশ্রুপাত করতে আরম্ভ করেছে। কেউ কেউ এ কথাও বলছে যে, কংগ্রেস নিরীহ রাজাদের বাগে পেয়ে "অ্যাক্‌সেশন" (ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার শর্ত) সই করিয়ে নিয়েছে। এর পরে আরও কত কি যে করবে ক্রমে ক্রমে তার ঠিক নেই।

একটু বাধা দিতে বাধ্য হলাম। ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দিতে হল যে, অনেক রাজা নিজে থেকে ভারত সরকারে অন্তর্ভুক্তি করতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের মনে দেশের জন্য টান প্রজাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। আর লর্ড মাউন্টব্যাটেনও এই "অ্যাক্‌সেশন" পর্বে খুব সহায়তা করেছেন।

এর উত্তরে ইতিহাসের পাতা খুলে ধরলেন ভদ্রলোক। বললেন, দেশপ্রীতি না হয়ে যায় কোথায়? ইংরেজরা কি কম "দাবাও" (প্রভাব) খাটিয়েছে ওদের উপর? ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক একটার পর একটা রাজ্য দখল করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তৈরি করেছিল। যাদের নেহাতই নাবালক বা নিরীহ বলে মনে হল শুধু তাদেরই নেটিভ স্টেট বানিয়ে রেখে দেওয়া হল। পাঞ্জাব আর সিন্ধু দেশ ওরা দখল করেছিল, যুদ্ধ জয় করে বড় রাজা ছোট রাজত্ব দখল করে বসে এই নিয়ম অনুসারে। রাজার ছেলে নেই অজুহাতে সাতারা, নাগপুর, ঝান্সি দখল করল "ডকট্রিন অব ল্যাপ্স" দিয়ে। খারাপভাবে শাসন চালানো হচ্ছে এই অছিলায়, দক্ষিণে কুর্গ আর উত্তরে অযোধ্যা দখল করল।—স্রেফ মোগলাই খুশির বশে। বেচারা অযোধ্যার নবাব এত বেশি আকাট প্রভুভক্ত ছিল যে, ওকে ঠকাবার কোনও অজুহাতই লর্ড ডালহৌসি পায় নি। শেষ পর্যন্ত এই লিখে সাফাই গেয়েছিল যে, লাখ লাখ লোকের দুর্দশার কারণ যে শাসনযন্ত্র তার সাক্ষী থাকলে ব্রিটিশ সরকার মানুষ আর ভগবানের চোখে নাকি দোষী হবে। হাঃ হাঃ। এর চেয়ে বাজে ভণ্ডামির কথা আর শুনেছেন কোথাও।

সস্মিয়ে একমত হলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমায় পাকড়িয়েছেন ভালো করে। ছাড়লেন না।

বলে চললেন,—ভেবে দেখুন, সেই ১৮৫৩ সালে লন্ডনের টাইমস কাগজে এডিটোরিয়ালে লিখল যে, এই নির্বীর্য নিরর্থক রাজপাটগুলিকে ইংরেজরা ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজমের (প্রাচ্য স্বৈরাচারতন্ত্রের) যে অনিবার্য ভাগ্য তা থেকে মুক্তি দিয়েছে। অর্থাৎ প্রজাবিদ্রোহে ওরা কোনোদিন শেষ হয়ে যেত; কিন্তু ব্রিটিশরা ওদের রক্ষা করল। ওদের ক্ষমতা, দোষ, পাপ এসব সত্ত্বেও ওদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে, যদিও দায়িত্ব দেয় নি। ওদের এমনভাবে জিইয়ে রাখার ফলে রাজকোষের টাকাগুলি কোথায় যাচ্ছে, মশায়?

বলেই ভদ্রলোক এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমিই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দায়ী।

আবার আরম্ভ করলেন তিনি। যেন কাইজারের জার্মান সৈন্যদলের 'বিগ বার্থা' কামান চল্লিশ মাইল দূর থেকে প্যারিসের উপর অনবরত গোলা দেগে যাচ্ছে।

বললেন,—টাইমস্, মশায়, ভদ্রলোকের কাগজ। হ্যাঁ, একটু ইম্‌পিরিয়ালিস্টিক বটে আর বুর্জোয়াও বটে। তবু ওরই মধ্যে সাধারণ লোকের কথাও কখনও কখনও ভাবে। টাইমসে ওরা লিখেছিল যে, জন বুল *স্বীকার করে নিয়েছে যে গভর্নমেন্ট প্রজাদের নয়। প্রজারাই রাজার জন্য।* আর ব্রিটিশ সরকার রাজাদের *রাজকর্মহীন বেকার রাজাগিরি বজায় রাখলেই এই দেশীয় রাজাগুলির প্রজাদের প্রতি ব্রিটিশ সম্রাটের কর্তব্য* পালন হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের সুর একটু নরম করানো দরকার হয়ে পড়েছে। না হলে লোকে কি ভাববে। বললাম—এখন তো ভারত সরকার সেই সার্বভৌম ক্ষমতার দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। সবই এবার ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আর এত ভাবছেন কেন?

সত্যিই তো। ভদ্রলোকের হঠাৎ মনে পড়ল এতক্ষণে যে তিনি আর ১৯৪৭ সনের আগের রাজস্থানে নেই। যে পালে হাওয়া লাগিয়ে তিনি সভাসমিতি ও রাজনীতি করে এসেছেন এতদিন—সে পালও নেই, সে হাওয়াও নেই। দেশের বিরাট পরিবর্তনে তার পাল থেকে সব হাওয়া সরে পড়েছে। তার মেঘমালার ভিতর থেকে বজ্রের আওয়াজ চুরি হয়ে গেছে।

ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু অতি চমৎকার ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব মন থেকে যায় নি।

এদিকে যে রাজকীয় আতিথ্যের কথায় তাঁর এই একমাত্র শ্রোতার জন্য বক্তৃতা শুরু হয়েছিল তার খেই আবার তুলে নিলেন।

গলায় একটু বিশ্বস্ত ভাবের সুর এনে তিনি বললেন,—রাজকার্যের মধ্যে আতিথ্য পর্বকেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হত। প্রমাণ চান? খবর নিয়ে দেখবেন সব রাজ্যেই একজন মিনিস্টার অব এন্টারটেনমেন্টস (বিনোদন বিভাগের মন্ত্রী) আছেন এবং তিনি সেখানকার সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর প্রভাবশালী মন্ত্রী। সম্ভবত সবচেয়ে সম্পত্তিশালীও।

ভদ্রলোকের কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত যেন ধারালো ছুরির মতো চকচক করে উঠল।

কিন্তু অতিথিরা বলবেন যে, রাজাদের বন্ধুত্ব করতে উৎসুক উদার মনের পরিচয় হচ্ছে এই আতিথ্য। আর বিনোদনের মধ্যেই আতিথেয়তার সার্থকতা। না হলে শুধু বাইরে বাইরে হোটেলে বিরাজ করে, প্রাসাদের বাইরেটা ও মন্দিরের ছত্রীটা দেখে, বাজারের খেলনা ও ফুলদানি, গুটিকয়েক পাথরের মূর্তি বা কার্পেট কিনে চলে যেতে হয় তাহলে যে ভ্রমণ হবে, সেটা তো ঘরে বসে গাইড বুক বা ভ্রমণকাহিনি পড়েই শেষ করা যায়। তাকে তো "ডুইং ইন্ডিয়া" বলা চলে না। তার জন্য চাই শিকাব পার্টি, দরকারি নাচের আসর, হাতি আর উটের পিঠে চড়ে অভিসারেব মতন মনমাতানো সফব, জরি-জহরতে মোড়া মহারাজার সঙ্গে একসঙ্গে ফটো তোলা, পথ যেতে কোনও সাপুড়ে বা সাধু, বরযাত্রীর দল দেখলে নেমে পড়ে তাদের সঙ্গে দুযেকটা মিঠে ভদ্রতা। এবং তারপর আবার ফটো তোলা।

তা না করে কি সম্মানিত সাগরপারেব অতিথিরা শুধু হোটেলের বাবান্দায় সাবি দিযে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের বেসাতি দেখে দিন কাটাবেন? শুধু তাদের নমুনা হিসাবে কানের কাছে আলগোছে লাগিয়ে দেওয়া "সাজাহান চামেলী" আতরের গন্ধ শুঁকে "বোর্‌ড" হযে পুবানো তরোযাল, টোল খাওয়া ঢাল আর ভাঙা মূর্তির দবদাম কববেন? দেখুন না ভেবে কি রকম হৃদয়বিদাবক ব্যাপাব হবে সেটা।

আমার পাশের ঘরের বাসিন্দা একজন ফরাসী ভ্রমণকারী (বারণ করেছিলেন নাম প্রকাশ কবতে) বহু শীতের মরশুমেই, এ দেশের আতিথেয়তা চেখে দেখে গিয়েছেন। তিনি প্রথম একবার দেখলেন যে, ঝুটা জহরৎ ও জেল্লাহীন পাথরের রাশি লম্বা লম্বা টিনের তোরঙ্গের পাশে সাজিয়ে সাদা রাজপুত দাড়ি ছড়িয়ে বুড়ো ব্যবসায়ীরা বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে।

তাদের দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে দল বাপ তাদের মরা বাচ্চাদের দেহ সাজিয়ে শোকে দিশেহারা হয়ে আছে। না কয় তারা কথা, না চেষ্টা করে সেগুলি জোর করে গছাতে। সসম্মানে মৌন গাম্ভীর্যে তারা অপেক্ষা করছে কখন প্রভুরা তাদের বেসাতির প্রতি আকৃষ্ট হবেন। এমন কি কলকাতার 'হগ' মার্কেটের মতো হল্লা করে জিনিস গছাবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই।

ছিঃ, এই কি সময় কাটানোর উপায় নাকি? তার চেয়ে "বাথসল্টে" স্নিগ্ধ স্নানের পর গায়ে চড়ানো মিড-নাইট-ব্লু (নিশুতি রাতের মতো নীলবর্ণের) ডিনার জ্যাকেট। তাতে খুলুক চাঁদেব আলোর মতো ধবধবে শার্টের জৌলুস। রঙিন সন্ধ্যায় মহারাজার ক্লাবে সভাসদ ও মন্ত্রিপরিষদ সবার সঙ্গে দেখা হবে। আলাপ হবে ককটেল সেবনের ঘন অন্তরঙ্গতার মধ্যে।

শুধু তাই নয়। আগামী দিনের শিকার পার্টির জন্য আমন্ত্রণ তার মধ্যেই উঁকিঝুঁকি মারছে। সেই ভালো। অমর সিংহ, চন্দ্র সিংহ, রঞ্জিত সিংহ আরো কত কি। সবাই নরসিংহ সেখানে।

এবং সাগর পারেব অতিথি হচ্ছে সিংহরাজ।

এই শিকার পার্টিগুলিকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন না। তাহলে কিন্তু ভুল হবে। এগুলি শুধু রাজা বা রাজপুরুষদের অবসর বিনোদনের বা যুদ্ধের অভাবে অন্য পথে বীরত্ব খাটানোর ক্ষেত্র হিসাবে দেখলে ঠিক হবে না।

রাজস্থানের বালুরাশির মধ্যেও জঙ্গল ও মানুষের বা শস্যের শত্রু জন্তুর অভাব নেই। জঙ্গলের ধারে কাছে যারা থাকে তারা প্রতি বছর এই শিকারগুলির প্রত্যাশায় থাকে। তখনই তারা নূতন কোনও বাঘ বা হায়েনা বা অন্য কোনও পশুর অত্যাচার থেকে বিনা পরিশ্রমে মুক্তি পাবে। শিকারী বীররা সভ্যতা থেকে দূরে জঙ্গলের কিনারায় এই লোকগুলির প্রতি দরদ দেখিয়ে সেখানে অনেক খরচ করে। তাদের মধ্যে কিছুদিনের জন্য একটা উল্লাস ও বৈচিত্র্য ছড়িয়ে দিয়ে যায়। তাদের আনন্দ উদ্দীপনাহীন জীবনের মধ্যে এ সবের দাম

শুধু টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে কষা যাবে না। অবশ্য জঙ্গল পিটিয়ের দল, এমন কি প্রান্তবাসী গ্রাম্য নারী ও বালিকারাও সফল শিকারের সময় বেশ ভালোই বকশিশ পায়।

তার ফল দেখতে পাই আমরা খান্দেশের জেমস উটরামের স্মৃতিতে। একশ বছরের অনেক বেশি হয়ে গেছে। মাত্র দশ বছর তিনি সেখানে শাসনভার পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তখনকার দিনের সাধারণ এক গাজিদাগা বন্দুকের সাহায্যই দুশো ছটি বাঘ ও চিতা, পঁচিশটি ভালুক ও বারোটি বনমহিষের হাত থেকে অসহায় আদিবাসীদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, বছর বছর তিনি শিকারে যেতেন, এই মহারাজাদের মতোই পারিষদ ও অতিথি পরিবৃত হয়ে। কিন্তু আদিবাসীরা দেবতার মতো তাঁকে আজ ভক্তি করে। তারই ফলে তারা সভ্য শাসনযন্ত্রের কাছে খুশি মনে মাথা নুইয়ে প্যাক্স ব্রিটানিকার পতাকা বয়ে এসেছিল।

মাড়োয়ারে আদিবাসী মের জাতিও এমনভাবেই পশুশত্রুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। যখন সোয়াই মাধোপুর বা চিতোরের বনাঞ্চলে মহারাজার শিকারের তাঁবু পড়ে, তখন শুধু যে দূর অঞ্চলের প্রজার সঙ্গে নূতন করে সংযোগ হয় তা নয়। রাজ্যের প্রধান কর্তব্য সিকিউরিটি অর্থাৎ নিরাপত্তা সাধনটাও সম্পন্ন হয়। আজ ডেমোক্রেসির যুগে মনার্কির ভালো দিকটা ভুলে গেলে ঠিক হবে না।

এই শিকারগুলির সার্থকতার একটা উদাহরণ দিই। এ কাহিনি লিখবার সময় অর্থাৎ বাজস্থানের ভারতীয়করণের পরের একটা ঘটনা।

একটা এলাকায় বাঘের অত্যাচার বড় ভীষণ হয়ে দেখা দিল। গরু মহিষ মানুষ কারও রক্ষা নেই। গ্রামের আশেপাশে যেসব শিকারী ছিল তারাও হার মেনে গেল। এ যুগের প্রজাসাধারণের মুখপাত্র হচ্ছেন বিধানসভার সভ্যরা, রাজা নন। আর তাঁদের চেষ্টায় রাজস্থান সরকার এ সম্বন্ধে কিছু করতে রাজি হলেন। কিন্তু তাদের বকশিশের ঘোষণায় ও শিকারীদের কাছে ছাপানো আবেদনে বাঘ মহারাজ মরল না।

তখন রাজস্থান সরকার সেখানকার সামন্ত রাজাকে ওই বাঘটি মেরে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু এখন তার আর প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার বা সম্মান ও কাজ পাবার প্রত্যাশা নেই। বাজারা পাচ্ছেন শুধু বাঁধা মাসোহারা এবং সব জায়গীরদারদেরই অবস্থা খারাপ আর ভবিষ্যৎ টলমলে। কাজেই বাঘ বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সামন্ত রাজা তাঁর বন্দুক রাইফেলগুলি বিক্রি করে দেবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। আর সরকারি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্দুকেব বার্ষিক লাইসেন্সের টাকা সবটা আদায় করা হয়েছে কিনা তা রেজিস্টারি দেখে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত রইলেন।

বাঘ নিশ্চিন্ত মনে তার কাজ করে যেতে লাগল।

আগেকার দিনের সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টাগু যখন এদেশে নতুন শাসনসংস্কার দেবার জন্য ১৯১৭-১৯১৮ সালে এসেছিলেন, তখন যে রোজনামচা লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায় বহু উইকএন্ড-এ অর্থাৎ শনি রবিবারের ছুটিতে তিনি দিল্লি থেকে কোনও রাজপুত রাজার এলাকায় বিশ্রামের জন্য চলে আসতেন। বিশ্রাম ছিল শিকারের জন্য পরিশ্রমে, কারণ বীরজাতির বিশ্রামেব ব্যাপারই আলাদা।

শাকচচ্চড়ি চটকানোর পর এক ঘুম দিয়ে উঠে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে তাসপাশার মধ্যে যে বিশ্রাম, তা দিয়ে বীরপুরুষ বা সাম্রাজ্য তৈরি করা যায় না.

মন্টাগুকে মাথা আর কলম চালাতে হত উদয়াস্ত। ঠিক আরও অনেক সরকারি বড় কর্মচারীরই মত। এমনকি তাদের চেয়ে বেশিই। কিন্তু তাঁর বিশ্রামের শখ ছিল এমন একটি ব্যাপারে, যাতে নিজের মন ও শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গরিব প্রজারও উপকার হয়। সুদূর মফস্বল গ্রামাঞ্চলে ব্রিটিশ কর্মচারীদের নিজের জনপ্রিয়তা ও নিজের জাতির শাসন কায়েম রাখার পক্ষে এই ধরনের আমোদ অবসর কাটানো যে খুব লাভজনক ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তাদের চেয়ারে আজ যে দেশীয় কর্মচারীরা বসেছেন তাঁদের অনেকেই এ বিষয়ে একেবারে বৈষ্ণব আর গোবেচারা।

আমাদের শাসনযন্ত্রটা ঠিক আগেকার দিনের যন্ত্রই বটে। কিন্তু যারা সে যন্ত্র চালাবে, তাদের ব্রিটিশ যন্ত্রীদের গুণগুলি নিতে হবে। তা না হলে যন্ত্র ও যন্ত্রী দুই-ই যদি খাঁটি থাকে, তবুও পাওয়া যাবে না লুব্রিকেটিং অয়েল। তেলের অভাবে কল ক্যাচকোচ করে গোঙাবে।

মন্টাগুর এই শিকার পার্টিগুলিতে ইংরেজ শিকারীদের মধ্যে কে আগে বাঘ মারবে, কে আগে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে, সে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কারণ বাঘ যার হাতে মারা যাবে তারই সম্পত্তি হবে।

শিকারে চিরকালই এ নিয়ম। এজন্য পাল্লা দিয়ে বাহাদুরি দেখানোর ঘটনা রাজপুত শিকারে বহুবার ঘটেছে।

কিন্তু দেশের চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখার ফলে বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা শুধু বীরত্ব নয়, বিরোধও এনে দিয়েছে। মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে আকবর শুধু যে সব বড় বড় রাজপুত রাজাকে দাঁড় করিয়েছিলেন তা নয়, তার নিজেরই ভাই শক্তসিংহকে যুদ্ধ করিয়েছিলেন। চারণের গান বলে যে দুই মহাবীর ভাইয়ের এই মারাত্মক ঝগড়া শুরু হয় এই শিকারে। দুজনে একসঙ্গে চলেছেন ঘোড়া ছুটিয়ে; কে বড় ওস্তাদ সে নিয়ে শিকার করতে করতেই ঝগড়া হয়ে গেল।

কিন্তু ঝগড়া করে লাভ কি? ছাদের উপর ঘুড়ি উড়াতে উড়াতে বেপাড়ার ঘুড়িকে আমাদের দু' ছাদের কোন্ ছোকরা গোত্তা টান মেরে সুরুৎ করে ভোঁ-কাটা কেটে দিয়েছিল, তা ঠিক করতে না পেরে হাড্ডিসার টিঙটিঙে বাঙালি ছোকরা আমরা তুমুল ঝগড়া করেছি বহুবার। সে ঝগড়া মোগল রাজপুতে লড়াইয়ের মতো ক্ষমাহীন। শেষ পর্যন্ত পাড়ার মোড়ে হাতের গুলি ফুলিয়ে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আমরা অন্য দলের ছোকরাদের শাসিয়ে শাসিয়ে হেঁকেছিলাম, হাত থাকতে মুখ কেন? চলে আয় একবার অলপ্পেয়ে।

অলপ্পেয়ে অর্থাৎ অল্পায়ুর দল তখন গালি ও তর্কাতর্কির বদলে শুধু দুয়েকটা গাট্টা ও ঘুষি চালিয়ে থাকে। কিন্তু তার ফলে আখড়ায় গিয়ে ডন বৈঠক দেবার কথা আমাদের কারও মনে হয় নি। শুধু গুরুজনরা ভালো ছেলে হবার পথে এমন সব বাধা এসে পড়েছে দেখে একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তাও মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

এই দুই রাজভ্রাতা ঠিক করলেন যে, কে বেশি বাহাদুব সেটা প্রমাণ হয়ে যাক লড়াই করে। দ্বৈরথ যুদ্ধ অর্থাৎ ডুয়েল শুরু হল বর্শা দিয়ে।

মহা সর্বনাশের ব্যাপার। প্রতাপ ও শক্ত এই দুজনেই তাদের বাপের চব্বিশ জন বেটাব মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও যুদ্ধে ওস্তাদ। মেবারে পাহাড়গুলির ঠিক ওপারেই মোগল সৈন্য দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এদিকে শিকারের বদলে এ যে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হল।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের যেসব পাঁয়তারা কষার আর সহবৎ দেখানোর নিয়ম আছে, সেগুলি শেষ হল। দুই ভাই পা মেপে মেপে যতখানি জায়গা দূর থেকে বর্শা হাতে তেড়ে আসতে হবে, তা ঠিক করে নিয়েছেন। সামন্তরাজারা নিশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছেন কি হয় কি হয়। লড়াই থামাবার উপায় নেই। বীরধর্মে নাকি ক্ষমা নেই এ মুহূর্তে।

এমন সময় দু ভায়ের মধ্যে এসে পড়লেন রাজপুরোহিত। ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করলেন তাদের থামতে। কিন্তু মাথায় তখন লড়াইয়ের নেশা চেপেছে। এক ভাইকে মরতে হবেই।

উপায় না দেখে পুরোহিত নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ব্রহ্মহত্যাতে রাজরক্তের পিপাসা শান্ত হল।

কিন্তু শক্তকে মেবার ছেড়ে চলে যেতে হল। এবং তিনি গেলেন কোথায়?

ভাই ও দেশের শত্রু আকবরের শিবিরে।

এই ইংরেজ-শিকারীদের মধ্যে শিকারের সম্মান আর কার হাতে শিকার মরেছে সে নিয়ে একবার একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা হল। বিচক্ষণ মন্টাগু হেসে রায় দিলেন—'টস' করে নাও। টাকা বাজিয়ে যার জিত হবে, এই সম্মান তারই পাওনা হবে।

হাসিমুখে দুজনেই স্বীকার পেল। স্পোর্ট একেই বলে।

ব্যক্তিগত বীরত্বে আমরা কোনোদিন কারও চেয়ে কম যেতাম না। কিন্তু আমরা ছোট ছোট টুকরো রাজত্বে দেশ ভাগ করে রেখেছিলাম। বাইরের আক্রমণকারীরা একটাকে যখন আক্রমণ করত, তখন অন্যগুলি নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাত। এমনভাবেই বিদেশীরা একে একে সহজে সেগুলি গ্রাস করেছিল।

আর ইংরেজরা করল সসাগরা ধরণীতে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সূর্য যার উপর অস্ত যেতে সময় পেত না।

ইতিহাসের সে শিক্ষা কি আমাদের হয়েছে?

সেই শিকার পার্টিটার কথা ভুলব না কখনও।

সেই সময় রাজস্থানের যে অঞ্চলে ছিলাম, সেখানে বাঘ [illegible] বাঙলাদেশের গ্রামে ওলাবিবির দয়ার মতো। তার হাত থেকে কারও রক্ষার আশা নেই।

মাত্র একটি বাঘ, কিন্তু চার শ' জন মানুষের যে কেউ যখন খুশি তার কবলে পড়ে শেষ হয়ে যেতে পারে। ত্রিশটি মহিষের কঙ্কাল ও বাঁকানো শিঙ্ জঙ্গলের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে থেকে তাদের সে কথা রোজ মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমরা চলেছি ছোট্ট একটি নড়বড়ে মোটরে। কোনও পথ নেই সেখানে। শুধু আছে পায়ে-হাঁটা পথের একটা রেখা। কখনও মোটর আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়, কখনও বা আমরা তাকে ঠেলে তুলি। এ পথে চাষা-ভুষোর মহিষের গাড়ি কখনও কখনও কষ্টেসৃষ্টে চলে থাকে, কিন্তু ইংলন্ডে বা আমেরিকায় যারা মোটর বানায় তারা এ পথে তাদের হাতের সৃষ্টি এভাবে ব্যবহার করা হবে জানলে বোধ হয় মোটর বানানো ছেড়েই দিত।

অথবা তাড়াতাড়ি মোটর বদলানোর ফলে চাহিদা বেড়ে যাবে সেই আশায় আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠত?—আমায় উত্তর দিলেন, আমার সুরসিক নিমন্ত্রণকর্তা।

জঙ্গল পিটিয়ে দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে শিকার করার মধ্যে তেমন বাহাদুরি নেই—এই হচ্ছে তাঁর মত। তার চেয়ে অনেক বেশি আমোদ ও বাহাদুরি আছে মাচান-সাধনায়। সুগোপনে গা-ঢাকা দিয়ে বাঘের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। খাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে দেবতার মতো তাকে আবাহন করতে হবে। যদি তিনি সে দান গ্রহণ করতে হাজির হন, তবেই তাঁর সঙ্গে মোলাকাত হবে।

আর পূজার ঘট কোথায় বসাতে হবে? যেখানে তিনি আগে দয়া করে আবির্ভাব হয়েছিলেন তারই কাছাকাছি। সম্ভব হলে যাকে দয়া করেছিলেন তারই ছিটে-ফোঁটা যা অবশিষ্ট আছে, তা দিয়েই ঘট বানাতে হবে।

গত তিন মাস ধরে শের সিংহ (রাজপুতের দেশে বাঘকেও সিংহ বলে ডাকতে সাধ হয়) রোজ অথবা দুই-একদিন বাদে একটি করে মহিষ সৎকার করছেন আর গত দুদিন, থুড়ি দুরাত্রি ধরে আমরা তার সৎকারের আশায় বনবাসী হয়ে আছি।

তরুতলে বাস নয়। তরুশিরে।

নেহাতই অনভ্যস্ত। তাই অসহিষ্ণুভাবে একটি গাছের আবডালে কোনও রকমে মাচান আঁকড়িয়ে আছি আমি। সঙ্গে আছেন রাও কিষণলালজী। ছেলেবেলা থেকে গুরুজনরা আমায় জ্যাঠামি ও গুণ্ডামি থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন। হাঁচি টিকটিকি বাঁ চোখ নাচা দিয়ে তৈরি হয়েছিল লক্ষ্মণের গণ্ডিরেখা। তবু সে সব বিধিনিষেধ ভাঙতে সবসময়ই মনে মনে উৎসুক ছিলাম। অবশ্য প্রায়ই পেরে উঠিনি। আমার সেই তেলেজলে সযত্নে পুষে রাখা ডাল-ভাত-চচ্চড়ির জীবনে এমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের যে সুযোগ আসবে তা কে ভেবেছিল?

একটা দোনলা আধুনিক বন্দুক অবশ্য মাঝে মাঝে হাতে শোভা পায়। কিন্তু তার সার্থক ব্যবহার যে কোন দিন হবে তা ধর্মতলা স্ট্রীটের সেই নিরীহ বন্দুক ব্যবসায়ী বা তার কলমধারী ক্রেতা কেউই বোধ হয় ভাবে নি। এমন কি বন্দুকটি যে বন্ধু রাইফেলের সহযাত্রী হয়ে এই শিকারের অন্যান্য অভিযাত্রীদের মতো পর পর দু রাত্রি ব্যাঘ্র মহারাজের অন্বেষণে এসে ফিরে যাবার মজা অনুভব করবে, তাই বা কে ভেবেছিল?

আমাদের পার্টি এর মধ্যে দু রাত্রি এসে ফিরে গেছে; কারণ মহারাজ দর্শন দেননি। এবং আজই শেষ চেষ্টা হবে। আমার নিমন্ত্রণকারী তা না হলে ভীষণ একটা কিছু করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেটা যে কি, সে সম্বন্ধে তুমুল বাদানুবাদ হয়ে গেছে সহযাত্রীদের মধ্যে।

মনে পড়ে গেল—

> জলস্পর্শ করব না আর
> চিতোর রাণার পণ,
> মাটির 'পরে বুঁদির কেল্লা
> থাকবে যতক্ষণ।

কিন্তু মাটির পরে বাঘের বাচ্চা চরবে যতক্ষণ ততক্ষণ আমাদের আর মাটি স্পর্শ করা চলবে না। একেবারে ছেলেবেলাকার পাড়ার গলিতে গুলি খেলার নট্ নড়ন-চড়ন নট্-কিচ্ছু হয়ে গাছ আঁকড়িয়ে মাচান লেপ্‌টে থাকতে হবে।

নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের কথা কাব্যে সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় পড়েছি। রাত্রির অন্ধকারে কিন্তু আমরা শুধু ওইরকম নয়, একেবারে সম্পূর্ণভাবে নিবানো প্রদীপের মতো বসে আছি। গাছের সবচেয়ে উঁচু গোটাকয়েক ডালে লতাপাতা বাঁশের চাঁচি দিয়ে বানানো কোটর—তাকে ভেলা বললেও চলে—সেখানে বসে আছি নিঃশব্দে। নিশ্বাসও যেন না পড়ে এরকম ভাবে।

বসে বসে সেই প্রতীক্ষা করার সঙ্গে অন্যান্য যে সব প্রতীক্ষার কথা বইয়ে পড়েছি তাদের সঙ্গে তুলনা করতে লাগলাম।

সামনে বাঁধা রয়েছে বেচারি মহিষ—বুঝতে কি পারছে না কেন তাকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে? জানে না কি সে, কি হতে পারে তার অসহায় পরিণাম? কাদের খেলার জন্য বা কাদের বাঁচাবার জন্য তার এই অনিচ্ছুক আত্মবলিদান? তাদের কাছে সে কি নীরব মিনতিভরা চোখে ব্যাকুলভাবে প্রাণভিক্ষা করছিল আজ সন্ধ্যাবেলা, যখন তার মাথার উপরে বসা কাকগুলি বাঘের জন্য রাখা জলের গামলা থেকে শেষবার জল পান করে কা কা করে আকাশকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল?

নাঃ। শবরীর প্রতীক্ষার মধ্যে এত অসহায়তা ছিল না। কারণ মনের মধ্যে তো বিরাজ করছিলেন একজন, যিনি কবে বাইরের জগতে দর্শন দেবেন মাত্র সেইটুকুই ছিল প্রতীক্ষার বিষয়।

উমার তপস্যার মধ্যেও না। চোখের সামনেই শোভা পাচ্ছিলেন দেবাদিদেব। তিনি চোখ খুলুন আর না-ই খুলুন, উমা তো নয়নভরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন। মনে আশা ছিল যে কখনও-না-কখনও ধ্যানভঙ্গ হবেই।

আর এই বেচারি মহিষ! মৃত্যুর দুয়ারে উৎসর্গীকৃত হয়ে রাত্রির পর রাত্রি বাঁধা থাকছে। যে পথে তার আগে আরও ত্রিশটি মহিষ গিয়েছে সে পথে পা বাড়াবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আত্মরক্ষা বা পলায়নের চেষ্টা মাত্র করবার পথ নেই। তার নিজের কি ইচ্ছা তাও জিজ্ঞাসা করবে না কোনও মানুষ, এমন কি কোনও মহিষ।

দূরের শেষ কাকটা কা কা স্বরে অন্ধকারের আগমনী ঘোষণা করে পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। মিশিয়ে রইল রাতের সঙ্গে অন্ধকার গায়ের রঙ ও ততোধিক অন্ধকার মন নিয়ে ওই বেচারি মহিষ। শুধু তার চোখের কোনার সাদা অংশগুলি যেন সে অন্ধকার ভেদ করে ব্যাকুলভাবে মাচানগুলির দিকে চেয়ে নীরবে প্রাণভিক্ষা করছে।

নাঃ। আমার দ্বারা শিকার হবে না কখনও।

মাচানে প্রথম কয়েক ঘণ্টা মন্দ কাটে না। কি করে পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে আওয়াজ না জাগিয়ে পা দুখানা ছড়িয়ে বা গুটিয়ে নেওয়া যায়, কি করে নিঃশব্দে থার্মফ্ল্যাস্ক খুলে চুক্‌চুক্ শব্দ না করেই কফিতে গলা ভেজানো ও মন চাঙানো যায়, সে সব কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে নিলাম। শেয়ালের ঐকতান বাদনের প্রতি কানটা প্রাণপণে সজাগ রাখলে যে কাশি আসার সম্ভাবনা কম হয়, সেটাও বুঝতে পারলাম।

তারা গুনতে গুনতে কত রাত্রি পর্যন্ত কাটানো যায়, কড়িকাঠ গোনা তার চেয়ে সহজ না শক্ত, সেসব সমস্যাতেও খানিকটা সময় কাটল। কিন্তু চোখ একেবারে জড়িয়ে আসছে ঘুমে। সেলাই করে দিচ্ছে যেন কে।

ছেলেবেলায় কলকাতার শহরতলিতে একবার এক সারারাত্রিব্যাপী যাত্রা দেখেছিলাম। কংসবধ কি কালীয়দমন এই জাতীয় একটা কিছু। তখন কি কৌশলে ঘুমকে ফাঁকি দিয়েছিলাম, তা মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেটা তো ছিল একটা শেয়াল-তাড়ানো যাত্রা। আর এটা হচ্ছে বাঘমারা যাত্রা—অনেক বেশি মূল্যবান, অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। তবুও পারছি না কেন?

মনে মনে সব বন্ধুকেই চিঠি লিখে ফেললাম—শৃন্বন্তু বিশ্বে আমার সব মিত্রাঃ। চিঠির শিরোনামা ও সম্বোধন তো ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু লিখব কি? এমন একটা কিছু লিখতে হবে, যা শরৎবাবুর শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের মতো জমজমাট হয়।

এমন সময়—এমন সময়—কি যেন একটু নড়ছে না? হ্যাঁ, একটা নিশ্বাস বুকের মধ্যে সমাধি পেয়ে গেল।

হ্যাচ্চোঃ। হ্যাচ্চোঃ। রাও কিষণলালজী সামলাতে পারলেন না এবং তাঁর নাসিকা ও বদনবিবরের এই যুগপৎ ধ্বনিটি মাচান থেকে মাচানান্তরে, বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা শেয়াল হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। মহিষ শুধু অবিচলিত।

পাশের গাছের উপর লতা-পাতা-ডালে ঢাকা আর একটা মাচান থেকে খুব চাপা অথচ ক্ষীণ স্বরে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা হাঁক দিলেন—উল্লুকো সামাল্‌হো।

পলায়মানা হরিণীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় বাঘও এমন নির্মম হুঙ্কার দেয় না। মনে পড়ল আবার সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা।

মাটির 'পরে বাঘের বাচ্চা
চরবে যতক্ষণ।

জানি না কাল ভোরে রাওজীর কপালে কি আছে।

এদিকে আমার রক্ত ভীষণ দ্রুততর চলাচল আরম্ভ করেছে। মনের মধ্যে একটা উল্লাসও বাঁধন ছিঁড়ে দাপাদাপি শুরু করেছে।

নিচের গামলাতে একটা জন্তু জল খাচ্ছে আর মহিষ বেচারি প্রাণভয়ে মাটিতে পা আঁচড়াচ্ছে, সজোরে হাঁস-ফাঁস করছে। অতি নিঃশব্দে রাইফেলটি হাতে নিয়ে গাছের পর্দা একটুখানি সরিয়ে দিলাম।

মহিষ ততক্ষণে আর হাঁস-ফাঁস করছে না। দড়িতেও আর টানাটানি করছে না। ভয়ে বোধ হয় পাথর হয়ে গেছে।

এদিকে সশব্দে জল খেয়ে উদ্দাম উল্লাসে ব্যাঘ্র মহারাজ নাকের ভিতর থেকে ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌ করে জল বের করতে লাগল। পরশুরামের গল্পের সেই বিশেষ প্রিয় কথাটা—সৃক্কণী পরিলেহন, সে কথাটা উত্তেজনায় মনেই এল না।

হঠাৎ অন্ধকারের বুক চিরে বিশাল শক্তিশালী টর্চের আলো ছড়িয়ে পড়ল বাঘের উপর। আমার বৃক্ষসঙ্গী বহু শিকারে অভ্যাস-করা হাতে রাইফেল চালালেন। বিপুল গর্জনে মহারাজ চকিতে অন্তর্হিত হবার জন্য লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাছের মাচান থেকে আর একটি বিদ্যুৎরেখা বের হয়ে এল। বিপুলতর গর্জনের শুধু আরম্ভটুকু শোনা গেল। একটুখানি বুক ফেটে বেরোন ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌ শব্দ। তার পরেই সব নিস্তব্ধ।

সেই শেষ রাত্রেই একটু গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। পর্ণশয্যায় সে নিদ্রার মধ্যে দেবী অপর্ণা প্রসন্ন বরাভয় দেখিয়ে গেলেন। পাঁচ শ বছরের যবনিকা উঠে সরে সরে মিলিয়ে যেতে লাগল। আমি এখনও অদেখা আর একটি রাজপুত রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

তখন ফাল্গুন মাস। রাজপুতের বসন্ত উৎসব ফুলহার বা রঙঝারিতে সমাপ্ত হয় না। সে কথার উল্লেখ করে মেবারের মহারাণা হেসে বললেন, চল আজ তোমায় নতুন বসন্ত উৎসবে দীক্ষা দেব।

দেশে গিয়ে তোমাদের কবি জয়দেবকে বলো শুধু "রণছোড়" কান্‌হাইয়ার গীত না লিখে যেন এবার গীতগৌরী লেখে। তুমি না পরীক্ষার জন্য ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলে? ওঠ এই পাহাড়িয়া ঘোড়ায়, আহেরিয়া উৎসবে যাবে বলে।

পণ্ডিত দৈবজ্ঞ শুভক্ষণ গণনা করে দিয়েছিলেন। মহারাণা সব সামন্ত ও সঙ্গীদের সবুজ রঙের পোশাক উপহার দিয়েছিলেন। সে পোশাক পরে কপালে হরিদ্রাবর্ণের চন্দনপঙ্কের মাঝখানে রক্তচন্দন তিলক নিয়ে বসন্ত পুষ্পাভরণা প্রকৃতির রাজ্যে আমরা সবেগে ঘোড়া চালিয়ে চলেছি মুহুরৎ কা শিকারে। গৌরী দেবীর পদতলে উৎসর্গ করা হবে বন্য শূকরকে। আজকের শিকারের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে সম্বৎসরের ভাগ্যের ইঙ্গিত।

কোনও রাজপুত যোদ্ধাই আজ তাই চেষ্টার ত্রুটি করবে না। উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াবে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কারও বর্শা যদি হঠাৎ শূকরের বদলে শিকারীব গায়ে এসে বেঁধে, তার জন্য কেউ মহারাণার দরবারে এসে অভিযোগ করবে না। কেউ করবে না ভুল করেও কোনও অনুতাপ। গুপ্তঘাতক যদি এ কাজ করে থাকে, তার হত্যার কথা গোপনই থেকে যাবে।

এক-একটা রাজপুত গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের বংশানুক্রমিক শত্রুতা থাকে অনেক সময়। সে শত্রুতা চিরকাল শুধু নিজেদের নয়, রাজ্যকেও দুর্বল করে রেখেছে। কিন্তু আহেরিয়ার শিকারে যদি কোনও শর ভুলে

শত্রু-বংশের কারও গায়ে এসে বেঁধে, তার মধ্যে প্রতিহিংসার গন্ধ কেউ খুঁজবে না।

আর অশ্ব যদি পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে না গিয়ে পর্বতের চূড়া দিয়ে ছুটতে গিয়ে কোনও গহ্বরে শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে পড়ে, সে মৃত্যুর জন্য উপহাসও কেউ করবে না।

ওই তো ঘোড়া উড়িয়ে পার্বত্য নদী পার হয়ে সংকীর্ণ গিরিপথে ছুটে চলেছে সালুম্বরের চন্দাবৎ রাওৎ, বেদলার চৌহান রাও, বেদনোরের রাঠোর ঠাকুর, সদরির ঝালারাজ। ওরাই তো মেবারের মহারাণাদের সংগ্রামের সাথী, সন্ন্যাসের সঙ্গী। স্বাধীন জীবনের দীন দুঃখ ও সুদিন সুখের ভাগী সামন্ত সর্দারদের অভিজাত দল। বীর্যে ঝলমল, উল্লাসে উতরোল। যাদের

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

আর তাদের সঙ্গে সমান বেগে সমান বেহিসাবী বেপরোয়া বীরত্ব দেখিয়ে আর কে চলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে? আর কার অশ্বখুরের আঘাতে প্রস্তরবন্ধুর পথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জেগে উঠছে? আর কার কপালে শোভা পাচ্ছে যুদ্ধ করতে, মৃত্যু বরতে উৎসুক মানবতার জয়পতাকা, হরিদ্রারক্ত চন্দনরেখা?

শত্রুর কাছে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে সে কি ঘুমায় আরাবল্লীর গিরিগুহায়? না, গঙ্গা-মেঘনার উদাস বালুচরে?

চোখে তার সোনার স্বপ্ন, মুখে প্রসন্ন প্রশান্তি।

পাশের পর্ণশয্যা থেকে সবেগে ধাক্কা দিয়ে নাড়ানাড়ি করতে করতে ঘুম ভাঙালেন রাও কিষণলালজী।

উঠুন, উঠুন। আর কতক্ষণ ঘুমাবেন? সবাই তাঁবুতে জমায়েত হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

রাওসাহেব কিন্তু ছাড়লেন না। বলুন তো খুলে, মুখে এত হাসির ফোয়ারা ছুটছিল কেন ঘুমের মধ্যে? বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন বুঝি স্বপ্নে?

বললাম তাকে স্বপ্নের কাহিনিটা। বাড়ি ফেরা নয়। ঘরছাড়া বিপদরাঙা পথে মৃত্যুর সঙ্গে হয় যে অভিসার স্বদেশের জন্য, শত্রুজয়ের জন্য—যে অভিনয় আরাবলীর চূড়ায় চূড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রকাশিত হবার স্বপ্ন আমরা গঙ্গা-মেঘনার তীরে তীরে বসে দেখেছি এতদিন। যার দীপ্ত আহ্বানে বাঙালির হাতের কলম কামানের মতো অগ্নি-উদ্‌গীরণ করতে চায় তার দিব্য কথা।

আপনাদের বাঙালিদের তুলনা নেই তামাম ইন্ডিয়াতে—সশ্রদ্ধ হাসি মুখে ফুটিয়ে বললেন রাওসাহেব। তবে শুনুন আমার দুর্ভাগ্যের কথা। আপনি যখন আহেরিয়ায় অশ্বারোহণের মজা মারছিলেন, তখন আমার কি অবস্থা।

মাচানের সেই হাঁচির কথা মনে আছে তো? ঠিক তেমনই একটা হাঁচি আমার এসেছিল ত্রিশ বছর আগে। তখন সবে এক দরবারের চাকরিতে ঢুকেছি। হিজ হাইনেসের যা প্রতাপ আর যা মেজাজ, তাতে রেসিডেন্ট বাদে আর সবারই মাথা হাতে কাটতে পারেন। প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে বাঘ শিকারে গেলাম, হঠাৎ মাচানের উপর থেকে বাঘ দেখে প্রকাণ্ড এক হ্যাঁচ্চো। প্রাণপণে মুখের মধ্যে গুঁজে দিলাম পাগড়ির ঝুলটি।

কিন্তু পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল প্রাণটা। কারণ আওয়াজখানা কামানের আওয়াজের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিক। হিজ হাইনেস তার চেয়েও বেশি হুঙ্কারে দিলেন একটা কড়া হুকুম। ঠিক মৃত্যুর পরোয়ানার মত।

ফেঁক দো উসকো পেড়সে।

সত্যিই কিন্তু তখন সবাই আমাকে গাছ থেকে নিচে ফেলে দিতে মনে মনে তৈরি ছিল। স্টেটের বাইরের লোক আমি। নতুন এসেছি সরকারের বড় চাকরি নিয়ে। আমাকে চেনেও না বিশেষ কেউ। যদি যাই বাঘের পেটে, মুলকী অর্থাৎ দেশের মধ্যেকার কোনও লোক আমার চাকরিটা দখল করে মনে মনে বাঘকে আশীর্বাদ করবে।

আর মেজাজের মাথায় হিজ হাইনেস যা বলেছেন, তা সত্য বলে মেনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তামিল করে ফেললে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

পরদিন তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা হলে তিনি নিজেও কাউকে দোষ দিতে পারতেন না। মাচান থেকে পড়ে বাঘের পেটে গিয়েছি বলে বৌকে একটা মাসোহারা নিশ্চয়ই দিতেন। কিন্তু তাতে আমার কি?

শুনতে মজা লাগছিল খুব। কিন্তু দেখলাম যে, আতঙ্ক এখনও রাও সাহেবের মুখে অঙ্কিত হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় ঠিক ওই ত্রিশ বছর আগেকার মতই। বুঝলাম যে, যদিও হয়নি কোনও ক্ষতি, ক্ষত হয়েছে বড় গভীর।

এখন আপনার হাসি পেতে পারে, কিন্তু পরের দিন মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর হিজ হাইনেস খবর নিয়েছিলেন যে, তাঁর হুকুম সত্যি সত্যি তামিল করা হয়ে গিয়েছে কিনা।

কসম খেয়ে এই আমি বলছি যে সেই হুকুমের স্বপ্ন এখনও আমি মাঝে মাঝে দেখি। আর তখন নির্ঘাত জীবন্তে মরে যাই। ইয়া গালপাট্টা দাড়ি-গোঁফের ভিতর থেকে আগুনভরা সেই হুকুম যমদূতের মতো আমায় চারিদিকে তেড়ে বেড়ায়।

ইতিমধ্যে সবাই আমার নিমন্ত্রণ-কর্তার গতরাত্রির সাফল্যকে অভিনন্দন করতে শুরু করেছে কাচের গ্লাসের মধ্যে বরফের ঠুনঠুন আওয়াজ করে কপাল পর্যন্ত গ্লাস তুলে সম্মান দেখিয়ে।

সে গ্লাসকে এই মহামান্য পরিবেশে স্ফটিকাধার না বললে উপযুক্ত সম্মান করা হবে না। রাজপুতের কাছে সে পানপাত্র হচ্ছে মনোয়ার পিয়ালা অর্থাৎ আমন্ত্রণপত্র।

তিনিও জলস্পর্শ করেছেন তাঁর শপথ রক্ষার উৎসবে।

সে জল হচ্ছে সাগরপারের সোনালি আমদানি।

সাত

প্রথম প্রেমের কথা হচ্ছিল।

এ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন কাল রাত্রির সেই হিজ হাইনেস। শুনেই লোকে ভাবে যে, সন্ধ্যার পরে খুব আরামে রক্তবর্ণ রেশমী ট্যাপেস্ট্রির নীল সোনালি লতাপাতা আঁকা কাপড়ে মোড়া বৈঠকখানার সোফায় গা এলিয়ে শেরির গ্লাস হাতে তুলে অলস আড্ডা হচ্ছিল।

রাজা-রাজড়ারা এ ছাড়া আর কিভাবে প্রথম প্রেমের আলোচনা করতে পারে?

অতএব তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা ঠিক সেই রকম আবহাওয়াতেই এরকম একটা জমাট বিষয় নিয়ে আড্ডা দেবে।

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। শিকারের সাফল্যে আমাদের পার্টির সবারই মন খুব দিলদরিয়া হয়ে গিয়েছিল। নেশা, বিশেষ করে কোনও প্রিয় নেশা পরিমাণমাফিক হলে দিল দরিয়া হয়ে যায়। স্ফূর্তির সাগরে মন তখন লাল ডিঙি চড়ে বেড়ায়, এরকম একটা কথা আছে।

কিন্তু নেহাত মামুলি বাঁধাধরা, সাদামাঠা জীবনে লোকের সামনে জাহির করতে পারার মতো যে কোনও নেশা থেকেই বঞ্চিত আমি। তাই হায়, সেই দরিয়ার পারে দাঁড়িয়ে কত ডিঙি, কত পানসিকেই হেলেদুলে হেসে খেলে ভাসতে দেখলাম। সমঝদার বন্ধুদের দেখে কতবার মনে হয়েছে যে, রসের সায়রে সোনার তরী বেয়ে হেসে খেলে পাড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু মাঝিকে হেঁকে ডাক দিয়ে বলা হল কই—

সকলি মধুব হেরি থরে বিথরে—
এখন আমারে লহো করুণা করে।

যাহোক, আমার একটুও আপসোস নেই সেজন্য। বরং একটা বড় সান্ত্বনা আছে। ব্রাউনিং কবির শিষ্য আমি। তিনি বলে গেছেন যে, যা মন থেকে করবে যা খুশি হয়ে নেবে, তাই সার্থক। তাই অনুশোচনা নেই কিছুতেই।

কি পাইনি তার হিসাব করে কি হবে? যা পেয়েছি, তাতেই যে মন ভরে রেখেছি।

অন্য একটা দিক দিয়ে দরিয়ার মতো দিলের কবি ওমর খৈয়ামও যা পেয়েছেন, তাতেই মন ভরে রেখেছিলেন। তাঁর অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্ত ছিল স্ফূর্তির মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু এত আশ্বাস তিনি কোথায় পেলেন? তা খুঁজতে গেলে তাঁর একেবারে প্রথম রুবাইটি মনে রাখতে হবে। সে রুবাইটি গোলাপ আর বুলবুল, সাকী আর পেয়ালায় ভরা রুবাইগুলির ভিড়ে আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেছে। তিনি প্রথমেই বলেছেন—

যদি গাঁথি নাই মুকুতার হার তোমার সেবাতে, প্রভু।
অন্তত মোর মুখ হতে পাপ-ধূলি মুছি নাই কভু।
সে কারণে আমি তব করুণায় আশাহীন নই, নই।
কখনও বলিনি ঈশ্বর দুই হতে পারে এক বই।। (ক)

সেই আশায় নিশ্চিন্ত মনে ওমর খৈয়াম গেয়েছেন—

ওঠো, আমায় দাও মদিরা, কথার সময় নেই।
রাতের আশা মিটবে তোমার ছোট্ট বদনেই।।
দাও মদিরা গোলাপ গালের আভায় ভরানো।
সেই তো প্রায়শ্চিত্ত, কোঁকড়া কেশেই জড়ানো।। (খ)

এমনভাবে ইহকালের মধ্যেই সব আনন্দের সন্ধান যে পেয়েছে, পরকালের কথা ভেবে তার মন ভারী হয়ে উঠবে কি করে? তাই তিনি গাইলেন : ...

বর্ চেহ্রায়-এ-গুল নাসিম-ই-নওরোজ-খুশ অস্ত্।
দর্ জের-এ-চমন রু-এ-দিল ফারোজ খুশ্ অস্ত্।।
গোলাপের মুখে বসন্ত বায় মধুরে বহিয়া আনে।
কুঞ্জ ছায়ায় কত মধু হায় প্রেয়সীর বয়ানে।।

আমরাও শিকার থেকে ফিরবার পথে মনে মনে অনুভব করলাম যে, মহুয়ার বনে বসন্ত বায় বইতে শুরু করেছে। ফাল্গুনের প্রথম পরশে মহুয়ার শাখায় শাখায় আগুন-জ্বালা জেগে উঠছে। লালে লাল হয়ে গেছে আকাশের একটু একটু টুকরো এক-এক জায়গায়।

মহুয়াকে রাজস্থানের এ অঞ্চলে কেশোলা বলে। কৈশোরে কলকাতায় থিয়েটারে গান শুনেছিলাম, বুনো পাহাড়ি যুবক-যুবতীরা নেচে নেচে গাইছে—

কে দিলো খোঁপাতে মহুয়া ফুল লো।

কে পরালো ফুল, সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন উঠেছিল মনে। সে কি সখীরা? না সখারা? না, অশরীরী প্রকৃতি গাছের ডাল থেকে ঝুপ ঝুপ করে মাথার খোঁপায় মহুয়ার ডালি উজাড় করে দিয়েছিল?

কৈশোর যায়-যায়, এমন সময় মনে আর প্রশ্ন রইল না কোনও। কবির চোখ দিয়ে তার উত্তর দেখতে পেলাম—

প্রিয়ারে যেদিন পাব
ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

আর আজ চারদিকে মহুয়ার মাতাল করা রঙঝারি যেখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে লাল রঙ, সেখান দিয়ে কি শুধু চোখ মেলে চলে যাব? আর কিছুই নয়? যা মনকে এত নাড়া দিচ্ছে তা সাড়া নিশ্চয়ই জাগাবে। অন্তত মনে মনে গুন-গুন করে একটা গানের প্রথম কলিও তৈরি করবার চেষ্টা করব। এই যেমন—

কেশোলা পরাব তব কেশে?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাই প্রথম কলিই হল শেষ কলি। পুরানো মোটরের আরও পুরোনো টায়ার ফাটল। হিজ হাইনেসের মন এত খুশি ছিল যে, তিনি মোটেই বিরক্ত হলেন না। ড্রাইভার প্রভৃতি লোক যারা সাহায্য করতে পারত, তাদের সবাইকে আগে একটা স্টেশন-ওয়াগনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের খবর পাঠাবার

(ক) গর্ গহরে তাহ্‌তে তাৎ নফস্তাম হরগিজ।
গরদ গুণাহ্ আজ চেহরে নেরফ্ তম্ হরগিজ।।
বা ইন্ হামা নোমিদ্ নীম্ অস্ করমাৎ।
জান্ রু খে ইয়াকেরা দো নগুফত্‌ম্ হরগিজ।।

(খ) বর্ ঘেজ ব্ৰা বাদাহ্ চে জায় সকুনস্ত্।
কমা শাবদহেন, তনক্ তু রেজিয়ে মনস্ত।।
মারা চু রুখ্ ক্কে শ ম্যায় গুলগুন্ দহ্।
কী তোবা-এ-ম্যাঁ চু জুল্‌ফ তু পুরশ্ কনস্ত।।

বন্দোবস্ত করে আমরা পাঁচজন একটা ফুলন্ত কেশোলার তলায় বড় একটা পাথরের ছায়ায় এসে বসলাম।

প্রস্তাবটা এল আমার নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকেই। তিনি বললেন যে, আমি যখন একমাত্র বাইরের লোক, পরদেশী, তখন আমাকেই ঠিক করতে দেওয়া হল যে, এই সময়টুকু কি করে ভালোভাবে কাটানো যায়।

মনে মনে প্রমাদ গণলাম।

কি বলা যায় এ অবস্থায়? মোল্লার দৌড় থাকে মসজিদ পর্যন্ত। আর বাঙালির মাত্র আড্ডা পর্যন্ত। তা-ও পাড়াগাঁয়ের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ লোপাট হয়ে যাবার পর ওরকম বা ওর বদলি আর কোনও 'ন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়ে ওঠেনি এখানে।

পড়ার তাড়া আর মাস্টার মশায়ের শাসানি—তা-ও আজকাল তিনি শাসান না, আমরাই শাসাই—এই দু' দুশমনের হাত এড়িয়ে যে সময়টুকু হাতে থাকত, তা-ও কেটেছে পাশের বাড়ির বিনা ভাড়ার রোয়াকে, না-হয় গলির মোড়ে পাড়ার পাইকারি পার্কে। যে পার্ক একেবারে ন্যাড়া। ঘাসের টিকিটুকু পর্যন্ত সেখানে গজাতে পারে না।

সেখানে রসাল কোনও কিছু গজাবে কোথা থেকে?

আমাদেরই মধ্যে যারা একটু বেশি ওস্তাদ ছিল, তাঁরা খেলেছে তাস-পাশা, দেখেছে সিনেমা-থিয়েটার। অবশ্য বাপের পয়সায়। কিন্তু জমাট প্রাণভরা এমন কিছু তাদের জীবনে ঘটেনি যা স্মরণ করে এই গাছতলার আড্ডায় নিবেদন করতে পারি।

আজই প্রথম বেদনার সঙ্গে অনুভব করলাম যে আমাদের অবসরের সময়টুকু শুধু হেলায় কাটিয়েছি। খেলায় ভরে তুলিনি, মেলামেশায় রাঙিয়ে তুলিনি।

আমাদের দুর্লভ ছুটিটুকুতে থেকে যায় বড় ফাঁক। ফাঁকি পড়েছি তাতে নিজেরাই।

এদিকে সবাই পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন যে, তাঁরা এ সময়টুকু বাঙালি ঢঙে কাটাতে চান। নতুন একটা স্বাদের আশায় ব্যাঘ্র-শিকারীরা উৎসুক হয়ে উঠলেন।

রাও কিষণলাল কানে কানে বললেন—শিগ্‌গির শুরু করুন যাহোক কিছু। ফ্লাস্কের চা তা না হলে আপনার ভাগে আর কিছু বাকি থাকবে না।

সতৃষ্ণ নয়নে দেখলাম যে, সবাই অপেক্ষা করতে করতে ফ্লাস্কগুলি খালি করে এনেছে। চা যে কত মিষ্টি, তা এই ভরদুপুরে—যখন আমরা চা চাই না—এই প্রথম প্রাণ ভরে অনুভব করলাম।

চা মিষ্টি—চুমোর চেয়ে মিষ্টি—ঘোষণা করেছিল নিত্যানন্দ নীলকণ্ঠ কেবিনের বিষ গিলতে গিলতে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ চুমুকে তলানিটুকু মেরে দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেটে শেষ ফোঁটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে সে আরও বলেছিল,—এমন-কি, প্রথম প্রেমের চেয়েও।

বাস্‌। প্রেরণা পেয়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত ওই আড্ডার স্মৃতিই আমার কাছে এল। আমি খুব ভনিতা করে ঘোষণা করলাম যে, প্রত্যেককে তার নিজের জীবনের আদি ও অকৃত্রিম প্রথম প্রেমের কাহিনি বলে যেতে হবে। অল রাইটস রিজার্ভড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অর্থাৎ বাড়ি ফিরে গিয়ে বন্ধুর গৃহিণীর কানে তুলে দিতে পারবে না কেউ। কি শুনেছি তা ভুলে যাব এই মহুয়া তলাতেই।

রাজপুত গালপাট্টার ভিতর থেকে হাসি উপচিয়ে উঠল। হিজ হাইনেস পরম পুলকে বিগলিত হয়ে এই প্রস্তাবের নুতনত্বের তারিফ করলেন।

সবাই মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

কারণ বোধ হয়, সায় না দিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু আমি আদার ব্যাপারি। জাহাজের খবরে এখন আমার দরকার কি? সে যখন বন পেরিয়ে বন্দরে পৌঁছব, তখন দেখা যাবে। মোটকথা, সবাই খুশি হয়ে সায় দিল। সন্দেহ নেই যে, রাজাবাহাদুরের সমর্থনের জোর পিছনে না থাকলেও দিত।

এখন কে প্রথম তার মনের মণিকোঠা খুলে বাকি সবাইকে দেখাবে?

প্রেমে পড়ার চেয়ে সেটা স্বীকার করা যে অনেক বেশি শক্ত।

কিন্তু রাজপুতের পক্ষে নাকি প্রেমে পড়াই সবচেয়ে বেশি শক্ত। প্রেমে পড়েছি, এ কথা মনে হলেই নাকি রাজপুত শরমে শিহরিয়ে ওঠে। সেটা লজ্জার পুলকে না ঘরনীর ডরে, সেটা বুঝতে চেষ্টা পর্যন্ত করবার ইচ্ছা

হয় না তার। সে শুধু ভাবে—ছিঃ, শেষ পর্যন্ত আমিও নাকি?

একথা বললেন ঠাকুর করণ সিং। পাগড়িটা খুলে মাথায় একটু হাওয়া বুলিয়ে তিনি আমাকেই প্রথম প্রেমের গল্পটা বলতে অনুরোধ করলেন।

বললেন, আমরা, রাজপুতরা, প্রেম করলাম কখন? ঘোড়া চড়তে বলুন, জান দিতে বলুন, গায়ের জোরে অন্য জায়গীরদারের খানিকটা জায়গীর দখল করতে বলুন, পাঁচটা নারীঘটিত কারবার বলুন, তাতেও আছি। কিন্তু তা বলে প্রেম?

সবাই যেন বেঁচে গেল এ কথাতে। সবাই হৈ হৈ করে সায় দিল। ছিঃ, রাজপুতের পক্ষে প্রেম? তার চেয়ে প্রাণ দেওয়াও ভালো।

কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। বললাম—উঁহু, তাতে হবে না। এহেন পুরুষ নেই যে প্রেমে পড়ে নি; অন্তত পড়েছে বলে মনে করে নি। আপনাদের পৌরুষে বাধছে না এ কথা বলতে?

পৌরুষের কথায় হিজ হাইনেস অত্যন্ত বিচলিত হলেন। যেন গোটা রাজস্থানের মান রক্ষার ভার তাঁর ঘাড়ে এসে পড়ল।

তিনি বললেন—প্রেম যদি করতে হয় তো—সেই সেবার বড়দিনের সময় ভাইসরয় সাহেবের ঘোড়দৌড়ের জন্য কলকাতায় গিয়ে বুঝেছি যে, বাঙলা মুলুকেই যাওয়া দরকার। সেখানে মেয়েরা বেণী দুলিয়ে কলেজে যায়, ট্রামে-বাসে একা ঘোরাফেরা করে, এমন কি, সিনেমাতেও একা যেতে ভয় পায় না। রাজস্থানের কোনও শহরে কি আপনি মেয়েদের বাইরে বেড়াতে দেখেছেন? এ মরুভূমিতে ঘাসই গজায় না, তার প্রেম।

আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। বললাম যে, মেয়েরা রাস্তায় বের হয় না, কিন্তু জানলায় তো আসে বটে। খোলা মুখ দেখা যায় না বটে, কিন্তু ঘোমটার আড়ালে তো দেখা যায়। যাকে ভালো করে দেখি নি, সে-ই বেশি সুন্দর। যে দুধটা দূরে, সেটাই বেশি ঘন। প্রেমের প্রথম ভাগে এই লেখা আছে। একেবারে শাস্ত্রের বচন।

অতএব?

কপট কোপ দেখিয়ে আমার নিমন্ত্রণ-কর্তা বললেন—অতএব আমরা প্রেম করে থাকি?

যদি না করে থাকেন তবু বলব যে করা উচিত ছিল। পর্দার মুলুকে প্রেম—ওঃ, ভাবতেই মনটা আনচান করে ওঠে। বোঝেন না—যত বাধা, ততই রাধা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন বাঁশরিয়ার জন্য।

কিন্তু তিনি সে পথ দিয়ে গেলেনই না। বললেন—ওসব হচ্ছে বাঙালি কবিদের কথা। আমাদের দেশে মেয়েই দেখা যায় না, তার প্রেম? আমরা তাদের ইজ্জতের জন্য লড়ি বটে, কিন্তু প্রেমে পড়ব তা বলে? সেটা অশাস্ত্রীয়।

এবার হাতে হাতে মেয়ে কোথায় ও কি করে দেখা যায়, সে পথ দেখিয়ে দিলাম।

বললাম—আপনাদের দেশে প্রায় সব জায়গাতেই বড় চমৎকার বিয়ের প্রথা আছে। মনে করে দেখুন—উদয়পুরে বিয়ের যে তোরণ-তোরণার প্রথা আছে, সেটার মধ্যে প্রেমে পড়বার কত সুন্দর সম্ভাবনা আছে। আর কি চাই এর পরে?

বিয়ের সময় কনের বাড়িতে তোরণ তৈরি করা হল। দুধারে কাঠের খুঁটি দাঁড় করিয়ে তার মাথায় তৃতীয় খুঁটি বেঁধে একটা ত্রিভুজ (ট্রায়াঙ্গাল) করা হল। না, না, আমি এর মধ্যে কোনও 'এটার্নাল ট্রায়াঙ্গালে'র সন্ধান এখনি শুরু করছি না। সেটাকে নানা রঙের কাগজ বা রেশমী কাপড় দিয়ে মুড়ে তার চূড়ায় একটি ময়ূরের মূর্তি বসানো হল। তারপর তোরণটি এনে সাজান হল কনের ফটকের সামনে।

ঘোড়ায় চড়ে টগবগ করে বর্শা হাতে লড়াই করতে এল বর বীরবেশে। তোরণ ভেঙে তবে অন্তঃপুরের কনেকে লাভ করতে হবে। কিন্তু ওই যে ইংরেজিতে বলে—বীর ছাড়া কেহ সুন্দরীকে পায় না। এখানেও লড়াই করতে হবে বৈকি?

কনের পক্ষের মেয়েরা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসবে দলে দলে। তারা রক্ষা করবে তোরণ। তাই চরণে বাজছে রুনুরুনু—নূপুররণে আগুয়ান হবার জন্য উৎসাহ দিয়ে। পরনে তাদের রঙের ফোয়ারা ছোটানো লেহঙ্গা (ঘাগরা), ওড়না, কুর্তি (কোমর পর্যন্ত লম্বা ব্লাউজ), আর চোলি (কাঁচুলি)।

মনে মনে ওই ছবি এঁকে নিলেই বসন্তের কোকিল যেন চারিদিকে গেয়ে ওঠে।

আর অস্ত্র? সে নানা রকমের অস্ত্র। একেবারে মারাত্মক, কারণ মরমে মেরে দেবার মতো সাংঘাতিক। বিশেষ করে পলাশ ফুলের রেণু। মুঠো মুঠো রেণু ছড়িয়ে তারা বরের আগমনকে করে তোলে সুবাসিত, ভরে তোলে মধুরের স্বপ্নে। আর গান গায় কিশোরীরা রুপালী কণ্ঠে সোনালি সুরে।

তোরণ আয়া রহি বর
থারা রারা কাঁপে রাজ॥
নেগাঁকা নগ্ চুকাসা।
তব্ ম্যয় আগ্ আঁসাঁ॥

তোরণে এসেছে বর, কিন্তু সে রাজাটি ভয়ে থরথর কাঁপছে। আমাদের যার যা পাওনা আছে, তা সব মিটিয়ে দিয়েছে। তবেই তো আমরা এগিয়ে এসেছি। অর্থাৎ, গানে গানে সখীরা বুঝিয়ে দিল যে, তাদেরই জয় হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত চারদিকে হৈ-হল্লা ও স্ফূর্তির ফোয়ারার মধ্যে তোরণ ভাঙা হয়ে গেলে মেয়েরা বরের পথ ছেড়ে দেয়।

এই বিয়ের প্রথা উল্লেখ করে বললাম—এবার বলুন তো, ইয়োর হাইনেস, এই রকম সুন্দর একটা প্রথার মধ্যে প্রেমে পড়বার কত সুযোগ রয়েছে। অবশ্য আজকাল এতটা হয় না। তবু যা হয়, তা-ই বা কম কি?

কম, বড়ই, কম, মশায়। শুধু ওদের দেখেই প্রেমে পড়ে যাব, এত দুর্বল আমরা রাজপুতরা নই। বিশেষ করে যখন তোরণ-তোরণার গানে অনেক সময় দুরকম মানে থাকে ভিতরে।

বিশ্বাস করতে পারলাম না। আপনাদের রানি পদ্মিনীর সখীদের বর্ণনাতে কবি বলেছিলেন যে, ওদের কালো বিলোল কটাক্ষের আঘাত পেলে লোকে ছুরিকাহত হয়।

জা সউঁ বেই হেরহি চখু নারী।
বাঁকা নয়ন জনু হনহিঁ কটারী।*

রাজোয়ারার যেটুকু আমি দেখেছি তাতেই বুঝেছি যে, সে কথা মোটেই মিছে নয়।

হেসে বলে উঠলেন আমার নিমন্ত্রণ কর্তা যে, আমি যখন এতই প্রেমে পড়ার পথের, এমনকি, অলি-গলিরও সন্ধান পেয়েছি তখন আমিই ওদের এখন গল্প শুনিয়ে দিলে ঠিক হয়। তবে সেটা প্রথম প্রেমের গল্প হওয়া চাই এবং গল্প হলেও সত্যি হওয়া চাই।

বলে তিনি বিশেষ আত্মপ্রসাদ বোধ করে গোঁফে একটু ভালো করে চাড়া দিলেন। তাঁর অনুচররা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে দেরি করলেন না।

সকলেই চেপে ধরলেন যে, আমাকেই একটি প্রথম প্রেমের গল্প বলতে হবে।

ভেবে দেখলাম যে, ওঁদের প্রস্তাবটা অসঙ্গত নয় মোটেই। আমি ওঁদের অতিথি। পুরোপুরিভাবে ওঁরা অতিথি-সৎকার করেছেন, মায় শিকার পার্টি পর্যন্ত। আমার তো তার বদলে অন্তত এটুকু করা উচিত।

বিশেষ করে যখন ওরা বাঙালিকে প্রেম সম্বন্ধে স্পেশ্যালিস্ট বলে মনে করে।

তবে রফা হল যে, অন্য কোনও লোকের প্রথম প্রেম হলেও চলবে। শুধু জীবন্ত জ্বলন্ত প্রেম হওয়া চাই।

শুনুন তবে। একেবারে জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা। এক যে ছিল রাজপুত্র।

আপনাদের 'লেগ পুল' করছি বা ঠাট্টা করছি মনে করতে পারেন, কিন্তু আমি যার প্রথম প্রেমের গল্প বলব, তার নামটা আপাতত গোপন রাখছি। এই রাজপুত্রটির পাঁচ বছর বয়েসে বিয়ের 'এনগেজমেন্ট' হয়। তিনি সে সময় তাঁর খুড়ো অন্য এক রাজার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে দু'পক্ষেরই বাপ-মায়েরা বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করে ফেললেন। সম্পর্কে খুড়ো; তাঁর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যে রাজরাজড়াদের মধ্যে অচল নয়, সে তো আপনারা জানেন।

তার পর ভাবী বর আর ভাবী বধূতে দেখাসাক্ষাৎ নেই। হবার কথাও নয়। তার উপর রাজপুত্রের

---

*চারশ বছর আগেকার হিন্দি; পদ্মিনীর কাহিনি। মনে হয় যেন বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী পড়ছি—লেখক।

সিংহাসন আবার বড় টলমলে। বাপও এদিকে মারা গিয়েছে আর চারিদিকে বড় গোলমাল, বড় অনিশ্চয়তা। পাঁচ বছর বয়সের সম্বন্ধের কাছে এ অবস্থায় কি আর প্রেম আশা করা যায়?

রাজপুত্রের এদিকে বয়স হল সতের। রাজকন্যাও পঞ্চদশ বসন্তের এক গাছি মালা হয়ে ফুটে উঠেছেন। কন্যাকেই যেচে আসতে হল বরের বাড়ি। যদিও শাস্ত্রে বলে যে মেয়েরা জন্মেছে বিয়ের প্রস্তাবের বাণী শুনতে, শোনাতে নয়। কিন্তু কি করা যায়? দিনকাল খারাপ।

অভিসারে যখন এল না তার বর, উপযাচিকা হয়েই এলেন বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা তার কাছে।

বিয়ে হয়ে গেল, কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটল না। অন্তত তার খুসবুই ছড়াল না বরের চারদিকে। বরের মনে হতে লাগল যে, কনের উপর টান আছে, কিন্তু তার প্রতি মন নেই। টান আছে, কিন্তু মন নেই এ কেমন কথা? কিন্তু সত্যি তাই। ভালো লাগে, তবু ভালোবাসা জাগে না।

এ কি লজ্জা, না সাহসের অভাব তা রাজপুত্র নিজেই বুঝতে পারেন না। প্রথম প্রথম দশ পনেরো বা কুড়ি দিন পরে পরে দুজনে দেখা হয়। পরে অদর্শনের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। (ইতিমধ্যে রাজপুত্র নিজেই রাজা হয়ে রাজ্যভার নিজের মাথায় নিয়েছেন)। রাজমাতা তো খেপে আগুন। ছেলের লজ্জা বেড়ে যাচ্ছে আর টান কমে যাচ্ছে দেখে ছেলেকে চৌদ্দপুরুষের মতো ভূত ছাড়িয়ে জোর করে বৌ-এর কাছে পাঠাতে লাগলেন। তাও মাসে দেড় মাসে একবার।

যেন চোর চলেছে জেলখানায়। বাসরে দোসর নয়।

এমন সময় তার জীবনে এল বাবুরী। সাধারণ ঘরের সন্তান, সামান্য তার ব্যক্তিত্ব। লোকে তাকে পথের ধারে দেখে ঘেঁটু ফুলের মতো উপেক্ষা করে চলে যাবে। কিন্তু রাজার জীবনে সে চম্পা চামেলীর রূপ রস সুবাস নিয়ে এসে দাঁড়াল।

আশ্চর্য ব্যাপার। প্রথম দর্শনের পরই রাজা ফিরে এসে নিজের ডায়েরিতে কবিতায় লিখলেন—আমি অদ্ভুত আসক্ত হয়েছি এর প্রতি। শুধু তাই নয়। সত্য কথা বলতে কি, আমি এর জন্য পাগল দিশেহারা হয়ে গেছি।

এর আগে তিনি ঘরে পঞ্চদশী রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার জন্য 'প্যাশন' অনুভব করেন নি। এমন-কি কেমন করে প্রেম বা কামনা প্রকাশ করতে হয় তাও শোনেন নি বা দেখেন নি। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর নিজের জীবনে এত চাঞ্চল্য ও অশান্তি চলছিল যে এদিকে মনও ছিল না। কিন্তু এখন তিনি নিজেই কবিতায় হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করে ফেললেন। লিখলেন : —

পাগল হইনু প্রেমাবেশে,
মতি স্থির না রহিল হায়।
মধুর মু'খানি ভালোবেসে
কে জানে পড়িব এ দশায়॥

একদিন বাবুরী তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে যাকে এত ভালোবাসতে আরম্ভ করেছেন লজ্জায় তার মুখের দিকে সোজা তাকাতে পর্যন্ত পারছেন না। এ অবস্থায় কেমন করে আর তাকে খোশ-গল্পে আলাপে খুশি করবেন বা নিজের মাতাল-করা প্রেমের কথা খুলে জানাবেন? মনের ভিতরটা এত এলোমেলো হয়ে গেল, আনন্দ এত মাতিয়ে দিল যে রাজা তাকে তাঁর কাছে আসার জন্য ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

না পারলেন সে চলে যাবার সময় একটু অভিমান বা অনুযোগ করতে।

চলে যাবার পর তাঁর মন হাহাকারে ভরে গেল। তাঁর রাঙা অতিথিকে এতটুকু ভদ্রতা দেখিয়ে, এতটুকু অভ্যর্থনা করে তাঁর ঘরে চরণ দুখানি পাতবার জন্য আবাহন করতে পর্যন্ত পারেন নি। মন তাঁর এতটুকু পর্যন্ত নিজের বশে ছিল না।

রাঙা অতিথি চলে গেল তাঁর মনকে রাঙিয়ে দিয়ে।

রাজা ঘরে ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন। এই ভাবনাই তাঁর একটা কবিতায়—হ্যাঁ, যখনই আবেগ অসহ্য হয়ে উঠত তখনই তিনি দু-চার লাইন কবিতা রচনা করে নিজের মনের ভার হালকা করে নিতেন—ফুটে উঠল—

ভালোবেসে এত দুঃখী, এত আত্মহারা,
এত তুচ্ছ হয়নি ক' কেহ মোর পারা॥

কারও প্রিয়া যেন, ওগো, তোমার মতন।
উদাসীনা নাহি হয় অথবা নিঠুরা।।

একদিন তিনি কয়েকজন পরিষদের সঙ্গে একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাবুরী তাঁর চোখের সামনে পড়ে গেল। এমনভাবে মুখোমুখি হয়ে রাজার মনের এমন অবস্থা হল যেন তিনি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাচ্ছেন। তার চোখের দিকে তাকাতে পারলেন না। না পারলেন মুখের একটা সামান্য কথা প্রকাশ করতে। মাথার ভিতর কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। শরমে জড়িত চরণে নিজে সরে গেলেন সেখান থেকে। ফারসী কবি মুহম্মদ সালির কবিতা স্মরণ করলেন তিনি :—

প্রিয়ারে হেরিলে শরমে মরিয়া যাই।
বন্ধুরা সবে চাহে মোর পানে,
আন পানে আমি চাই।। (গ)

ভাবলেন যে, তাঁর নিজের অবস্থার সঙ্গে এই কবিতার বর্ণনা হুবহু খাপ খেয়ে যাচ্ছে।

'প্যাশন' এই ইংরেজি কথাটাই ব্যবহার করছি, কারণ আমাদের কোনও দেশীয় ভাষায় এই কথাটার সমস্ত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় বলে জানি না। তার কারণ সম্ভবত এই যে—আমরা প্রেম করি, কামোন্মাদনাও অনুভব করি, কিন্তু প্যাশনে যে রক্তাক্ত আধো-আলো আধো-আঁধারি পাগল-করা ভালোবাসার অনুভব আছে তা প্রকাশ করার কোনও পথ নেই আমাদের ক্ষীণরক্ত (অ্যানিমিক) সভ্য ভব্য সামাজিক জীবনে। আর সংসারে যা প্রকাশ করা অশোভন, সাহিত্যে তাকে বিকাশ করব ভাষা কোথায়?

যাক্ সে কথা।

প্যাশনের উল্লাসে যৌবনে উচ্ছ্বাসে রাজপ্রাসাদ আর রাজপোশাক ছেড়ে রাজা পথে পথে কুঞ্জবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বন্ধুবান্ধব ও রাজকার্যে রইল না মনোযোগ। না রইল নিজের প্রতি অন্যদের অবহেলার জন্য কোনও অনুযোগ।

অথচ সে সব কথাই তিনি বুঝতেন। এমন নয় যে প্রেমে পাগল হয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন। একদিন নিজের ডায়েরিতে তিনি একটি গজল লিখেছিলেন—

গোলাপের কুঁড়ি মোর হিয়া;
দলগুলি মাখা রক্তধারে;
হাজার বসন্ত পরশিয়া
ফুটাইতে পারিবে কি তারে (ঘ)

মাঝে মাঝে পাগলের মতো একা পাহাড়ে চড়ে, মরুভূমিতে ঢুকে ঘুরে বেড়াতেন। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরে বেড়ানোর নেশা তাঁকে পেয়ে বসল। অথচ বাবুরীর সন্ধানে নয়। এমনি। শুধু এমনি।

একদিন ডায়েরিতে তিনি লিখলেন,—

যেতে নাহি পারি, অথবা রহিতে নারি;
এ কি দশা হায়
করেছ আমায়,
হে হৃদয়, আমারি। (ঙ)

বিকেল গড়িয়ে এল। মহুয়ার মাতাল-করা রঙ যেন এই রাজারই প্রেমের নেশার প্রতিচ্ছবি হয়ে আকাশে ফুটে রইল। সে নেশার আমেজ, সে রঙের ছোঁয়া সবারই মনে।

হিজ হাইনেস মাথা থেকে পাগড়িটা নামিয়ে রেখেছেন ততক্ষণে। আমি একটু চায়ের রসে মন দিলাম।

(গ) শোম্ শর্‌মিন্দা হর্‌কে এ ইয়ার খুদরা দর্ নজরে্ বিনম্।
রফিকান্দ সুয়েমন্ বিনন্দ্ মন্ সুরে দিগর্ বিনম্।

(ঘ) মাপনীক কাউন কলোম্ কেহ্ গুল নেক গুনচে সিবেক কানদুর্।
অগর্ য়োজামিনিক বাহায় ওপ্সা ওহিল্ ম্যাগি নে ইম্‌কান্ দৌর।।

(ঙ) নী বার্‌য় দর্‌-গাব কুয়াতাম বার্ নি তু রা রাগে তাকেতম্।
বে জানিন্ বু হালত গেহ সিন কব্‌লত্ নবাক্ গ্রিফ্‌তারিয়েকো মকল।

চায়ের সোনালি রঙে যেন একটু নেশার ছোপ পড়েছে।

সবাই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন—তারপর কি হল? তারপর কি হল?

একজন শুধালেন—এতই যদি প্রেম, রাজা তাকে বিয়ে করলেন না কেন? না হয় ধীরে ধীরে মনকে শক্ত করে মাথা ঠিক করে তার সঙ্গে একটু ভালো করে সাংসারিক হিসাবে প্রেম করলেও এরকম দেওয়ানা ভাবটা কেটে যেত।

রাও কিষণলালজী একটা মহুয়ার ফুলন্ত শাখার দিকে চোখ রেখে দার্শনিকের মতো বলে উঠলেন—এহি হ্যায় দুনিয়া। আচ্ছা, মাশাহ্, তার পর কি হল বলুন এবার।

মাশাহ্ 'অর্থাৎ মহাশয়।

তারপর কি হবে? রাজার জীবন থেকে বাবুরী মুছে গেল। শুধু ডায়েরিতে অক্ষয় অক্ষরে এই সোনার কাহিনি—যতখানি আমি এখানে আপনাদের কাছে বললাম হুবহু ঠিক ততখানি—জ্বলজ্বলে ভাষায় তিনি লিখে রাখলেন। আর কী-ই বা করতে পারেন?

কেন, বেচারি বাবুরী রাজবংশের নয় বলেই কি এতই তাচ্ছিল্য করতে হবে যে তাকে বিয়েও করা চলবে না? একেবারে ভুলে যেতে হবে?

বললাম যে ঠিক তা নয়। রাজা তাকে কখনও ভোলেন নি। এই প্রেম হঠাৎ ধূমকেতুর মতো তাঁর জীবনে উদয় হয়েছিল; উল্কার মতই তাঁর আকাশ থেকে সরে গেল অলক্ষিতে। কিন্তু পাঁচ বছর পরে রাজা একটা নতুন হাতের লেখার স্টাইল তৈরি করে তার নাম দিয়েছিলেন বাবুরী ছাঁদের লেখা।

কিন্তু তাকে বিয়ে করলেন না কেন? কেমন হিম্মৎ সে রাজার যে এত দেওয়ানা হয়ে যায় তবু বিয়ে করতে পারে না?

খুব গম্ভীরভাবে বললাম—সেটা সম্ভব ছিল না। বাবুরী ছিল পুরুষ।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সবাই হতভম্ব হয়ে উঠলেন। কেউ কিছু আর বলতে পারলেন না।

খানিক পরে আমার নিমন্ত্রণকর্তাই প্রশ্ন করলেন—বলুন তো কোন্ রাজা এরকম অদ্ভুত প্রেম করেছিলেন। তাকে নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারব। অবশ্য আপনার যদি মানা থাকে তাহলে বলবেন না। তবে পাহাড় মরুভূমি এসব জায়গার কথা যখন বলছেন আমাদের রাজস্থানেরই কেউ হবে হয়তো।

না। রাজস্থানের রাজা নয়। এ কালের কোনও রাজাও নয়। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানে ফরগনার চাঘ্‌তাই তুর্কী রাজা বাবরের কাহিনি এটা। আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগেকার ঘটনা। প্রাচীন তুর্কী রক্তের উন্মাদনা আধুনিকতম কাব্যের রোম্যান্সের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলে নিজের হাতে বাবর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন।

বাঃ! আপনি দেখছি রাজস্থানে এসে তার দুশমনেরই গল্প করে গেলেন—প্রতিবাদ করে বললেন তিনি।

স্বীকার করলাম সে কথা। এ-কথাও বললাম যে, রাজস্থানে এসে তার দুশমনদের কথাই সব চেয়ে বেশি মনে পড়ছে। ভাবছি যে, কেন রাজস্থান হিন্দুস্থানের ইতিহাস পালটে দিতে পারল না। এই বাবরকে হারাতে পারলেই রাজপুতরা অন্যরকমের ইতিহাস তৈরি করতে পারত।

আমাদের নিজেকে যাচাই করা উচিত শত্রুর চোখ দিয়ে।

সে যুগে, সে দেশে, সে সমাজে নারীর স্থান ছিল খুব নিচে ও ছোট। বিয়ে ছিল একটা সাংসারিক দরকার বা রাজনীতিক সুবিধা। আর প্রেম ছিল শুধু একটা অপ্রয়োজনীয় বিলাস বা বড় জোর পৌরুষের পরিচয় মাত্র। সে সময়কার পরিবেশেই এই কাহিনিকে যাচাই করে দেখতে হবে। অস্বাভাবিক বলে মুখ ফিরিয়ে গেলে এর কাব্য-সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করা হবে।

এ যুগে অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা 'ডোরিয়ান গ্রের ছবি' বইখানিতে পুরুষের প্রতি পুরুষের আকর্ষণের কাহিনি আছে। কিন্তু এ দুই কাহিনির তুলনা করলে হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর, অসি হাতে যার জীবন কেটেছে, তার মসীকে অতুলনীয় বলতে হবে।

অসি দিয়ে তিনি রচনা করলেন ইতিহাস, আর মসী দিয়ে কাব্য।*

---

*ফারসী ও তুর্কী কবিতার ধ্বনির লালিত্য যে কতখানি আর এই ভাষা দুটি না জানলেও পদগুলি যে কত মিষ্টি লাগে, তা এই রুবাইগুলির মূল পদে পাই। এই বইয়ের সবগুলি কবিতার অনুবাদ লেখকের।

আট

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মুখে একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

এই একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। পরাক্রমশালী অম্বর বংশের ভাবী রাজাকে বিনা যুদ্ধে বিনা হাঙ্গামে অঙ্কুরে শেষ করে দিই এখন।

হাত দুখানা তার নিশপিশ করে উঠল।

এই অম্বর রাজবংশটাই বড় খারাপ, বড় নেমকহারাম—তাঁর মতে। নির্বোধ প্রপিতামহ আকবরই ওদের বাড় বাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। মানসিংহকে সমস্ত বড় বড় যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠাবার তাঁর কি দরকার ছিল। আসাম উড়িষ্যা থেকে কাবুল পর্যন্ত? কেনই বা তাকে সুবে বাঙলা বিহার উড়িষ্যা মায় দক্ষিণাপথ পর্যন্ত সুবেদাব কবে পাঠানো? সেই তো শেষ পর্যন্ত এত বেশি বাড় বাড়তে দেওয়ার ফলে মানসিংহকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করতে হয়েছিল।

বুঁদির ইতিহাসে বলে যে, আমার নির্বোধ প্রপিতামহ আকবব একটা মাজুম (মাদক মিঠাই) তৈরি করে খানিকটাতে বিষ মিশিয়ে রাজা মানকে খেতে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেই ভুল করে বিষ মেশানো মিঠাই খেয়ে মারা গিয়েছিলেন। এ হেন কথা অবশ্য আমার দরবারের বাক্যনবীশরা লেখে নি। তবু ওই চালটা আমাদের কাছে এমন কিছু নতুন নয়।

তা ছাড়া রাজা মান তো আমার ওযাদিল-উল্-বল্দ্ (দাদু) সেলিমকেই প্রায় তখ্‌তেতাউস হারা করে ছেড়ে দিয়েছিল। ভাগ্যিস ওই রাজপুতানীর বাচ্চা খসরু দিল্লির মসনদে বসতে পায় নি। না হলে কি সাংঘাতিক কাণ্ডটাই না হত। আমাদের এই পবিত্র চাঘ্‌তাই তুর্কীবংশ। তৈমুর আর চেঙ্গিস খান দুজনেরই রক্তেব ধারায় পবিত্র বংশ।

আওরঙ্গজেবের মুখের উপর মেঘ ঘনিয়ে এল।

বোকা আকবরকে জ্বালিয়ে মারল মানসিংহ। কিন্তু তস্য বোকা শাহ্‌জাহানকেও কি কম কষ্ট পেতে হয়েছে এই রাজপুত তোষণের জন্য? এমন কি শাহানশাহ্ তামাম হিন্দুস্থানের মালিক আমাকেও একদিন যন্ত্রণা পেতে হয়েছে কাব জন্য?

ওই মীর্জা রাজা জয়সিংহ। ওঃ, ওর কথা ভাবলে নিজেরই দাড়ি পটাপট উপড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে এখনও। আমার বাবার সময় দরবারে ওর কি জমজমাট ইনামদারি। শয়তানটা কাফের দারাকে সাহায্য করতে গিয়েছিল। মসনদের জন্য লড়াইয়ের সময় এক ওকেই আমার যা কিছু ভয় ছিল। ভাগ্যিস, খোদা হাফিজ, মীর্জা রাজা শেষ পর্যন্ত আমাব বিরুদ্ধে লড়ে নি। চালাকি করে আসল লড়াইয়ের সময় আপনা বাঁচিয়ে সরে পড়েছিল।

তবু কি কম শয়তান? ওই মারাঠা মূষিক শিবাজী যে আমার হাত এড়িয়ে পালাতে পারল—সে তো ওরই যোগসাজসে না হোক, অন্তত কারসাজিতে।

মুখের ওপর মেঘ কালো হয়ে এল।

শুধু কি তাই? মীর্জা রাজা জয়সিংহের পিছনে বাইশ হাজার সোয়ার আর বাইশ জন সর্দার আছে বলে সে সারা দুনিয়াটাকে ছোট মনে করে। হিন্দুস্থানের বাদশা ওর কাছে কিছুই না। যদিও আমি তাকে ছ'হাজারী মনসব দিয়েছি।

অম্বরের দরবারে বসে সেই নেমকহারাম ছ'হাজারী মনস্বদারটা কিনা দু'হাতে দুটো কাঁচের গ্লাস নাচায়। নাচাতে নাচাতে বলে, ওই ওটার নাম সাতারা আর এই এটার নাম দিল্লি। দিলাম ওই ওটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে টুকরো টুকরো করে, আর রাখলাম এই এটাকে আমার বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে। যখন খুশি নাচাব আর খেলাব, খেলাব আর ফেলব।

মুখের ভিতর দাঁতের কিড়মিড়িতে বাজ ডেকে উঠল।

ভাবতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক লহমাও সময় লাগে না। বহুত ঠিক হ্যায়। মীর্জা রাজা জয়সিংহের ছোট ছেলেকে অম্বরের গদির লোভ দেখিয়ে বাপকে বিষ খাওয়াব। কিন্তু বড় ছেলেকেই শেষ পর্যন্ত গদিতে বসাব, যাতে বাপের দশা রোজ মনে করে রেখে নিজেকে সামলিয়ে রাখে। আর ছোটটাকেও অম্বরের একটা

টুকরো দিয়ে দেব—যাতে দু ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা বেঁধে থাকে। তাতে দুজনেই কমজোরী হয়ে থাকবে। তাহলে মোগলের আর কোনও ভয় থাকবে না।

আর হাতের মুঠোর মধ্যে ঝুলছে এই অম্বর বংশের বাচ্চা—এটাকে এখনি দিই যমুনার জলে ডুবিয়ে। কাছোয়ার বাচ্চারা (কুশধ্বজ বংশধররা) আর কোনোদিন দিল্লির মসনদের কাঁটা হতে পারবে না।

ক্রুর হাসি ফুটে উঠল সম্রাটের মুখে। মেঘ ও বজ্রনিনাদের বদলে তাতে শোভা পেতে লাগল শুধু বিদ্যুৎ।

আগ্রার কেল্লার ছায়ায় যমুনার নীলজলে বজরায় সান্ধ্যবিহারে ভাসমান ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। সঙ্গে বিশেষ খয়ের খাঁ ওমরাহ মাত্র কয়েকজন, আর পেয়ারের অম্বর রাজপুত্র বালক জয়সিংহ।

বালককে তিনি আরও বেশি পেয়ার দেখিয়ে দুহাতে তুলে নিয়ে জলের উপর ঝুলিয়ে দোলা দিতে লাগলেন। বললেন,—আচ্ছা বৎস, তোমায় যদি এখন হাত থেকে ছেড়ে দিই তা হলে কি হয়?

বৎসের অবশ্য মৎস্যের মতো জলের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। অবলম্বন ছিল শুধু শূন্যে লম্বমান দুখানি সবল কিন্তু অবিশ্বাসী হাত, আর নিচে বয়ে যাচ্ছিল যমুনার কাল জলস্রোত।

বৎস বলে বসলেন,—শাহান্‌শাহ্‌, আমরা যখন সাদী করি একটা হাত থাকে দুল্‌হিনের (বধূর) হাতে, আর সংসারের সব ঝামেলার হাত থেকে সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। কিন্তু একখানা হাতের জায়গায় আমি আশ্রয় নিয়েছি দু দুখানা হাতের। আর কার হাত? স্বয়ং যিনি দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। আমার আর ভাবনার কি আছে।

নিমেষে বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হল সম্রাটের মুখ থেকে। মোগলের মনে বীর মহিমাবোধ, যাকে বলা যেতে পারে শিভ্যালরি, জেগে উঠল।

বালককে জলের উপর দোলাতে দোলাতে সম্রাট বললেন,—তুমি তো বাচ্চা নও বৎস, তুমি গোটা মানুষের চেয়ে চার আনা বেড়ে গেছ এরই মধ্যে। শুধু জয়সিংহ নও, সোয়াই জয়সিংহ।

সেই থেকেই জয়পুরের সব মহারাজারই নামের আগে থাকে সোয়াই। সেদিনকার প্রথম সোয়াই জয়সিংহ, আর এদিনের রাজস্থানের রাজপ্রমুখ সোয়াই মানসিংহ।

গল্পটা সত্যি নাকি? মহা কৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম অধ্যাপক বন্ধুকে। তিনি একজন আসল জয়পুরীয়া। বংশানুক্রমে এখানকারই বাসিন্দা ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অবশ্য ইতিহাসের নন।

তাই বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হেসে বললেন, বাঃ, আপনি দেখছি অঙ্ক কষে ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করতে চান। জানেন তো আমরা এখানে যে নিকষ (এগ্‌জাক্ট) শাস্ত্রের আলোচনা করতাম সেটা হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র নয়।

কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যাতেও তো অঙ্কের প্রয়োজন খুব বেশি।

তা হোক। কিন্তু মহাশয় তাতে নীলাকাশে বাধাহীনভাবে চরে বেড়াবার সুযোগ আছে—আশ্বাস দিয়ে বললেন এই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। এই আকাশে অনেক কাহিনি, অনেক চারণের গান ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলিই রাজস্থানের সত্য ঘটনা। একটা জাতির মনের পরিচয় যাতে আছে সেটাই তো আসল ইতিহাস।

যাহা ঘটে তাহাই একমাত্র সত্য নহে। ঠিক বলেছেন বন্ধু।

এমনই একটা সুবিধাজনক দার্শনিক মনোভাব নিয়ে সোয়াই রাজা জয়সিংহ তাঁর সময়কার নানা রকম অশান্তির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দূরে সরে থাকতে পেরেছিলেন। আঠারো শতকের হিন্দুস্থানে কোথাও শান্তি ছিল না। কোনও রাজ্যেই লোকে নিরাপদে মনের খুশিতে দিন কাটাতে পারত না। রাজা-প্রজাতে খুব বেশি প্রীতি বা সহানুভূতির সম্বন্ধ ছিল না।

রাজাদের নিজেদের মধ্যেও ছিল শুধু একটা সম্বন্ধ— সেটা হচ্ছে চক্রান্ত করে অন্যকে ঠকানো বা তার রাজ্য জয় বা লুঠ করা। হিন্দুস্থানের ভিতরে এমন কোনও শক্তিশালী রাজ্য ছিল না যার সার্বভৌম ক্ষমতা অন্যদের রক্ষা করতে পারে। মোগল বাদশাহি ছিল নিভন্ত প্রদীপ, আর মারাঠা শক্তি ছিল ঘর-জ্বালানো আগুনের শিখা। ভ্রাতৃযুদ্ধ বা আত্মীয়-বিরোধ ছিল বড় বড় রাজপরিবারের অভ্যস্ত ফ্যাশান। আর বাইরে থেকে বার বার বিদেশী লুঠেরা রাজারা এসে উত্তর ভারতকে ছারখার করে দিত। এই পটভূমিকায় শাস্ত্র বা শিল্পচর্চার সময় বা সুযোগের কথা কে ভাবে?

কিন্তু ভাবতেন একজন। তিনি সোয়াই রাজা জয়সিংহ। মারাঠা বর্গীর লম্ফঝম্প, নাদিরশাহী ঝড়ঝাপটা তাঁর মানস সরোবরে কোনও টলমলে ঢেউ জাগাতে পারে নি। তিনি জয়পুর রাজ্যকে সে সব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে, নিজে রাজহংসের মতো সে সরোবরে ভেসে বেড়িয়ে নানা শাস্ত্রচর্চা, সমাজসংস্কার, বিদ্যার গবেষণা, শিল্পের সহায়তা করে সময় কাটিয়েছেন। অথচ সাংসারিক রাজনীতিতেও তিনি কম ধুরন্ধর ছিলেন না।

যে বিরাট গিরিদুর্গ ও প্রাসাদ আমরা এখন অম্বরে দেখি ও যে আধুনিক জয়পুর শহরের শোভার আমরা প্রশংসা করি তা প্রকৃতপক্ষে সোয়াই রাজা জয়সিংহের কীর্তি। জয়পুর, দিল্লি, মথুরা, কাশী ও উজ্জয়িনীতে যে মানমন্দির তৈরি হয়েছিল সেগুলি তাঁরই কীর্তি। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ সেগুলি অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেছেন। এই বিদ্যার যে সিদ্ধান্তধারা তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন আজও সব ভারতীয় পঞ্জিকা ও জ্যোতির্বিদের গণনা তার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

গ্রীক জ্যামিতিক ইউক্লিডের গণনা থেকে আরম্ভ করে বহু পাশ্চাত্ত্য গাণিতিকের তথ্যই তিনি সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন। সমরখন্দের রাজজ্যোতির্বিদ উলুগ বেগের গণনা সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই সাত বছর ধরে নিজে পর্যবেক্ষণ করে স্বতন্ত্র গণনা সিদ্ধান্ত তৈরি করেছিলেন। সে যুগের মতো অন্ধকার যুগে, যখন কালাপানি পার হওয়া আর বিধর্মী হয়ে যাওয়া সমান ছিল, তিনি পোর্তুগীজ রাজা ইম্যানুয়েলের সভায় শিক্ষার্থী পাঠিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে জ্যোতির্বিদ আনিয়েছিলেন।

দৈনন্দিন সাধারণ জীবনের বাহিরের বিশুদ্ধ (পিওর সায়েন্স) শাস্ত্র চর্চাতেই তিনি জীবন কাটান নি। অনেক প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি খুব চেষ্টা করেছিলেন। আজ আমরা ব্রিটিশের লেখা ইতিহাসে জানি যে সার উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ ও বালিকাবধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্রিটিশেরও আগের সংকীর্ণ, গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত খণ্ড খণ্ড রাজ্যমালার যুগে এই সোয়াই পুরুষ শুধু অম্বরের রানা হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র রাজপুতানায় সতীদাহ নিবারণ করবার জন্য নীতিশাস্ত্র তৈরি করে তা প্রচলন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

অসম্ভব রকম বিয়ের পণের অত্যাচারে রাজপুতরা শিশুকন্যা জন্মের পরেই হত্যা করে ফেলত। সেই বিয়ের প্রথারই আমূল সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব যে মহাঘৃণিত জিজিয়া কর হিন্দুদের উপর বসিয়ে গিয়েছিলেন তা তাঁরই চেষ্টা ও প্রভাবে মোগলসম্রাট উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন. নবজাগ্রত মারাঠা শক্তি তাঁরই সহায়তায় উত্তর ভারতে প্রথম পদক্ষেপ করতে পারে।

বহু বিদেশী ও বিধর্মীর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও সোয়াই রাজা মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন। এবং অন্যের মতো ও অন্যের জ্ঞানের মধ্যে ভালো জিনিস খুঁজে পাওয়ার যে ক্ষমতা হিন্দুর ছিল তা হারান নি। জৈন মুসলমান খ্রিস্টান তাঁর চোখে সমান ছিল। সকল ধর্মে ছিল অনুরাগ। সকল শাস্ত্রের ভিতরের সত্য ও তথ্য তিনি সব সময় খুঁজে দেখেছেন। প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণই এই।

ইয়োরোপে তখন শহর পরিকল্পনা মাত্র আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তিনি বাঙালি বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের পরিকল্পনায় এমন একটি নূতন শহর বানালেন যার পথের পরিধি ও সমান্তরাল রেখার প্ল্যানের চেয়ে বেশি সুন্দর কিছু কখনও পশ্চিমে টাউন প্ল্যানিংয়ে দেখা যায় না। জয়পুরের হালকা গোলাপী বর্ণের অনুকূল গঠনপ্রণালী ও স্থাপত্য এখনো পৃথিবীর প্রশংসা পায়। শহরের বাজার অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে হাওয়া মহলের কারুকার্য একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজপুতের শাড়ি ও পাগড়ির রঙের বাহার এবং পিলে ও অন্যান্য ধাতুর বস্তুর কারুকার্য এই সময়েই প্রথম খ্যাতি লাভ করে। জয়পুর অঞ্চলের মর্মর শিল্পের প্রতিষ্ঠা বহু আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তাঁর সময়ে অম্বরের দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের যে বিস্তার হয়েছিল ও জয়পুরের নূতন শহরের যে পত্তন হয়েছিল তার ফলেই এই মর্মরশিল্পের প্রসার অনেক বেশি বেড়ে যায়। একটা বিশিষ্ট জয়পুরীয়া শিল্পধারা গড়ে ওঠে।

জয়সিংহের বহুদূরদর্শী রাজনীতিক প্রতিভার যে কাহিনি অধ্যাপক বন্ধু শোনালেন ঠিক সে রকম বুদ্ধির আর একটি ঘটনা সোয়াই রাজার রাজ্যকালের প্রথমেই ঘটেছিল।

মোগল সর্বদাই হিন্দুর সঙ্গে যুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে ভেদনীতি। হিন্দুও নিজের জাতীয়তাবোধের অভাব দিয়ে শত্রুকে সাহায্য করেছে। তার উপর বহু-বিবাহের ফলে বহুবার সিংহাসন নিয়ে

বৈমাত্র এমন কি সহোদর ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ হয়েছে। এই দুইয়ের ফলে অনবরত রাজপুত রাজাদের অক্ষম বা দুর্বল হয়ে থাকতে হত। সোয়াই রাজার ক্ষেত্রেও সেই কূটনীতির প্যাঁচ কষেছিল মোগল মসনদ।

জয়সিংহ আর বিজয়সিংহ ছিলেন বৈমাত্র ভাই। ছোট ভায়ের সাম, দান, দ্বন্দ্ব ও ভেদ—চাণক্যের শেখানো এই চার কূটনীতির সঙ্গেই ভালো পরিচয় ছিল। এই মহাবিদ্যা খাটিয়ে বড় ভাইকে পথে বসিয়ে নিজেই সিংহাসন পাবার চেষ্টা করলেন।

মোগল সম্রাটদের উত্তরাধিকার-পর্বের এই উদাহরণ বিজয়সিংহ শিখে নিয়েছিলেন। কাজেই সম্রাটের দরবারে বিজয়সিংহ দান নীতির আশ্রয় নিয়ে উজির-সাহেবকে মাত্র জহরৎ দান করেই অম্বর রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ও সবচেয়ে উর্বর তৃতীয়াংশ দাবি করে বসলেন। সোয়াই রাজা অন্য উপায় নেই দেখে হুজুরের উজিরের মর্জি তামিল করতে রাজি হলেন। তখন আরও পাঁচ কোটি টাকা ও পাঁচ হাজার ঘোড়সোয়ার সৈন্য উপহার দিয়ে—সুধী পাঠক অবশ্যই এই দাননীতিকে হালফিলের ঘুষ এই বদনামটা দেবেন না—বিজয়সিংহ গোটা অম্বরই দাবি করে বসলেন ও মোগল দরবারে সনদ তৈরি হতে লাগল।

জয়সিংহ তো শুধু একটা গোটা মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন সোয়া মানুষ। সহজাত বুদ্ধিতে ধরে ফেললেন, যে, দানের উত্তরে দান দিলে পাশার দান ঠিকমতো পড়বে না। এবার চাই চাণক্য ঠাকুরের আর একটি মন্ত্র অর্থাৎ ভেদনীতি।

তিনি সব সর্দারদের আমন্ত্রণ করে বললেন যে, তাদেরই ইচ্ছাতে তিনি গদিতে আরোহণ করেছেন, কিন্তু সম্রাটের উজীরের ইচ্ছাতে ভাই সে গদি থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে চলেছে। অতএব এখন কর্তাদের ইচ্ছায়ই কর্ম হোক। সোয়াই রাজার তাতে আপত্তি নেই।

জয়সিংহ যে বিজয়সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ ঠিকই ছেড়ে দেবেন এই আশ্বাস পেয়ে বারা কোট্‌রি অম্বর কা অর্থাৎ অম্বরের বারো জন সামন্তবংশ দিল্লিতে বিজয় সিংহকে আমন্ত্রণ পাঠালেন। এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, যদি জয়সিংহ নিজের কথা রক্ষা না করেন তাহলেও তাঁরা নিজেরা বিজয়সিংহকেই অম্বরের গদিতে বসিয়ে দেবেন।

মোগলের শৃগালবুদ্ধি উজীর অত সহজে ভোলবার পাত্র নন। তবুও শেষ পর্যন্ত অনেক সৈন্য সঙ্গে দিয়ে বিজয়সিংহকে এক-তৃতীয়াংশ দখল করতে পাঠিয়ে দিলেন। সর্দাররা চাইলেন যে, এই সুযোগে দুই ভাইয়ে সত্যিকারের মিলন হয়ে যাক। বিজয়সিংহের তাতে সম্মত না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ মহানুভবতার প্রত্যুত্তরে মহানুভবতা দেখাতে হবে এটা হচ্ছে রাজপুত ধর্ম।

কিন্তু তা বলে তো আর সিংহের গহ্বরে গিয়ে সোয়াই সিংহের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ্য করা চলে না। অতএব কয়েক মাইল দূরে আর একটি গিরিদুর্গের কাছে বিজয়সিংহ তাঁবু পাতলেন।

জয়সিংহ যখন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হচ্ছেন, তাঁর নাজির এসে হাতে একখানা চিঠি তুলে দিল। কি? না, রাজমাতা নিবেদন করছেন যে, তিনি এই দুই লালজীর (রাজার বাছাদের) মিলন ও শান্তি স্থাপন স্বচক্ষে দেখে নয়ন সার্থক করতে চান।

ছলছল নয়নে সোয়াই রাজা সামন্তদের পানে তাকালেন। চোখের জলে ধরা গলায় তাঁরা সমস্বরে এই সাধু প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সোয়াই রাজার নাজির তখন সাজাতে শুরু করলেন মহাদোল। রাজমাতার সখীবাহিনী তো কম নয়। তাদের জন্য সাজানো হল তিনশো রথ—ঘেরাটোপে ঘেরা। কুললক্ষ্মীরা সব চলেছেন দু-দু'জন একটি রথে। দীর্ঘ ছ মাইল পথের দুধারে অগণিত পুরবাসী জমা হয়েছে। ভ্রাতৃবিরোধ শেষ হয়ে আসছে এই আনন্দে তাদের কণ্ঠে সম্মিলিত জয়ধ্বনি। সে ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠছে পাহাড়িয়া পথে পথচারী পুরবাসীর জন্য হরিলুটের বাতাসার মতো রাশি রাশি টাকার রুপালি ঝন্‌ঝনা। অম্বর রাজবংশের ইতিহাসে এত বড় আনন্দের দিন আর কখনও আসে নি।

রাজপুরীর দূত এসে আভূমি নত হয়ে বুকে হাত চেপে নিবেদন করল যে, রাজমাতা দুর্গপ্রাসাদে এসে পৌঁছেছেন। রাজা ও সামন্তরা ঘোড়ায় চেপে বসলেন সেখানে যাবার জন্য। দুই রাজভ্রাতা চোখের জল মুছতে মুছতে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। জয়সিংহ ভাইয়ের হাতে এক-তৃতীয়াংশের সনদ তুলে দিবার সময় আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—ভাই, যদি চাও তুমি অম্বরের সিংহাসন নাও। আমার জন্মস্বত্বের বদলে দিয়ো শুধু তোমার এই পরগনাটুকু।

কোনও রাজপুতই বদান্যতার প্রতিযোগিতায় পিছপাও হবার নয়।

বিজয়সিংহ সমান উদারতা দেখিয়ে বললেন, না দাদা, আর দুঃখ দিয়ো না। আমার অভাব হয়েছে পূর্ণ, সব অভিযোগ হয়েছে চূর্ণ। আমায় এবার ক্ষমা কর শুধু।

এখন বিদায়ের সময় হয়ে এল। এমন সময় নাজির এসে সংবাদ দিল যে, এখন যদি সামন্তরা চলে যান রাজমাতা দুই ভাইকে এসে আশীর্বাদ করে যাবেন। অবশ্য তাঁরা ইচ্ছা করলে তাঁর অন্দরমহলে সরে এসে প্রতীক্ষা করতে পারেন।

জয়সিংহের চোখ এখনও চোখের জলে ভারী হয়ে আছে। বললেন—বারা কোট্‌রি অম্বরকা যা আদেশ করবেন তাই তাঁর শিরোধার্য।

ভ্রাতৃমিলনের আনন্দে রাজা এখনও শুধু যে বিহ্বল তা নয়; দশের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। রাজাই এখন দেশের প্রজা, বারা কোট্‌রীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন।

তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, রাজমাতার কাছে গিয়ে দু ভাই দর্শন দিলে ভালো হয়। নিজেরা হাত ধরাধরি করে খুশি মনে তাঁরা অন্দরমহলে চলে গেলেন।

রাজমাতার দেউড়ির সামনে এসে জয়সিংহ সৌভ্রাত্র ও মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে বললেন—মাতৃদর্শনে যেতে এটার আর প্রয়োজন কি? বলেই কোমরবন্ধ থেকে তরবারি খুলে একটা খোজার হাতে তুলে দিলেন।

বিজয়সিংহই বা কম যাবেন কেন? তিনিও পূর্ণ বিশ্বাস দেখিয়ে ভাইয়ের উদাহরণ অনুসরণ করলেন।

তাঁদের পিছনে নাজির অন্তঃপুরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

রাজমাতা ও দুই ভ্রাতা।

দুই ভায়ের ঝগড়া শেষ হয়ে গিয়ে হচ্ছে পুনর্মিলন—মায়ের মন্দিরে, মায়ের পায়ের তলায়।

রাজা রামচন্দ্র থেকে অবতীর্ণ কুশধ্বজবংশের বিপুল ঐতিহ্যময় রাজপরিবারে সব ঝগড়া মিটে যাবে।

ঘটনার গুরুত্বে অভিভূত হয়ে সামন্তরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে রাজমাতা ছয়শত সখীর সঙ্গে মহাদোলে চড়ে অম্বরে ফিরে চললেন।

রাজমাতা নয়; তাঁর ছদ্মবেশে মল্লবীর রাজসেনাপতি। কুললক্ষ্মীরা নয়; তাদের পরিবর্তে পুররক্ষীরা। আর রাজমাতার চৌদোলে সেনাপতি ছাড়া দ্বিতীয় আসনে হাত পা কষে বাঁধা বন্দী বিজয়সিংহ। বিশাল-বপু এই মল্ল এক নিমেষে নিরস্ত্র বিজয়সিংহকে মাটিতে পেড়ে ফেলে রাজ-অন্তঃপুরে বন্দী করে ফেলেছিলেন।

বন্দীকে অম্বর গিরিদুর্গের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার খবর পৌঁছানোর পর জয়সিংহ একা এসে দেখা দিলেন সামন্তরাজাদের সামনে। কোথায় গেলেন বিজয়সিংহ? কোথায়? সকলের সন্দেহহীন মুখে একই প্রশ্ন।

"মেরা পেটমে"—উত্তর দিলেন জয়সিংহ, আমরা স্বর্গত মহারাজার দুই ছেলে। আমিই বড়। আপনারা যদি মনে করেন যে বিজয়সিংহের রাজা হওয়া উচিত এই আমি তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমায় তাহলে আপনারা বধ করুন।

সামন্তরাজগণ এর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। তবু বিশ্বাসঘাতকতার এই কারবারে অস্বাচ্ছন্দ্যে অস্থিরতায় তাঁদের মন বিভ্রান্ত হয়ে রইল।

তা বুঝতে পেরে জয়সিংহ আবার বললেন, আপনাদের জন্যই আমি নিজে পাপ করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। বিজয়সিংহ রাজা হলে ওর সঙ্গে এই যে মোগল উজীরের পাঠানো ছ হাজার মনসব এসেছে ওরাই সব লুটেপুটে খেত। শুধু আমি নয়, আপনারাও সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যেতেন।

অবস্থা বুঝে সামন্তরাজাদের ঘরে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

বাস্তবিক পক্ষে এমন একাধারে রাজনীতিক, আইনকর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকের তুলনা সে যুগে পাওয়া যায় না।

হিন্দু শুধু দার্শনিকতায় ডুবে থাকে। সাংসারিক জীবন তার তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও শত্রুর হাতে বার বার পরাজয় হয়েছে। বিদেশী বিজয়ীর শাসন মাথা পেতে নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। এ সবের মূলে অনেকখানি আছে দার্শনিকতা, যা নিষ্ঠুর সত্যকে সহনীয় করে রাখে। কিন্তু সেই দার্শনিকতাতে তিনি মিশিয়েছিলেন সংসারের প্রয়োজনীয়তাকে।

তাই হিন্দু যদিও ইতিহাস লিখত না তিনি উল্লেখযোগ্য সব কিছু ঘটনার ডায়েরি রেখে গিয়েছেন

কল্পদ্রুম বইখানিতে। একশ ন' গুণ জয়সিংকা বইতে তিনি নিজের একশ নয় কাহিনিতে সে সময়ের বহু ঘটনার ইতিহাস রেখে গিয়েছেন।

ইতিহাস এসে সেখানে উপন্যাসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সাংসারিকতা মিশে গেছে দার্শনিকতার সাগরসঙ্গমে।

তিনি যখন মারা গেলেন তিনজন সহধর্মিণী ও বহু উপপত্নী পর্যন্ত তাঁর চিতায় সহমরণে গেলেন।

কিন্তু রাজস্থানের কেউ লক্ষ করে দেখে নি যে সেই সঙ্গে বহু বিদ্যাও সহমরণে গেল।

নয়

অম্বরের সঙ্গে বাঙালির একটা অন্তরের যোগ আছে।

বোধ হয় সে জন্যই রাজপুতেরা একে আমের বলে ডাকলেও বাঙালিরা অম্বর ছাড়া অন্য কোনও নামেই একে দেখতে চায় না।

মোগল যুগে বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে টুকরো-করা বাঙলাদেশে এমন কোনও ব্যক্তি জন্মান নি যিনি সবাইকে মিলিত করে পলায়মান পাঠানশক্তি বা উদীয়মান মোগল শক্তিকে দূরে হঠিয়ে দিয়ে বাংলাকে স্বাধীন করতে পারেন। যেখানে বাঙালি সেখানেই দলাদলি। এবং বাঙালি শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই বিশ্বাস করে। এই নীতি ঠিক আজকের মতই সেদিনও বাঙালিকে দুর্বল করে রেখেছিল।

মোগল পাঠানের শক্তি-পরীক্ষার যুগে বিক্রমশালী বাঙালি ভুঁইয়ারা একে একে পৃথকভাবে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করে সবাই পরাজিত হন। প্রতাপাদিত্যও এমনিভাবে পরাজিত হন এবং তাঁর কুলপ্রতিমা যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ অম্বরে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্য একটি কিংবদন্তী বলে যে, রাজা মানসিংহ প্রথমবার যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের হাতে হেরে যাবার পর স্বপ্ন দেখেন যে, কালিকা দেবী কাছেই মাটির নিচে অবস্থান করছেন। তাঁকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করলে মানসিংহ শত্রু জয় করতে পারবেন। সে স্বপ্ন অনুসারে তিনি কাজ করেন এবং জয়ী হন। বাংলা বিজয়ের পর তিনি এই প্রতিমা এনে অম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, মূর্তিটি ছিল কেদার রায়ের।

এখানে কিন্তু প্রতিমার নাম শিল্লাদেবী, যশোরেশ্বরী নয়।

তবু একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রতিমার সঙ্গে এসেছিল বাঙালি পূজারী ও তাদেরই বংশধররা এখনও পুরুষানুক্রমে এই অপরূপ সুষমাময় গিরিদুর্গের মন্দিরে প্রতিদিন পূজা করে। এ মন্দির অম্বরের এমন প্রধান দ্রষ্টব্য যে, অম্বরকে বলা যায় গিরিদুর্গও বটে, গিরিমন্দিরও বটে।

একজন সত্যকারের বাঙালি ও তাঁর সহধর্মিণী মন্দিরের সামনে আভূমি প্রণত হয়ে বিদেশে বাঙালি প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করছিলেন। দুজনেরই পরনে গরদ, হাতে তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন ও রক্তজবা। মুঠো মুঠো রাঙা জবা পায়ের কাছে পেয়ে, খাঁটি বাঙালির বেশে পূজারী পূজারিণীর প্রণাম পেয়ে মায়ের আমার কি শ্যামলা বাংলার কথা মনে পড়ল একটিবার?

ইচ্ছা হল মনে মনে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু মন্দিরের দরজার দেওয়ালে মর্মরে গড়া সবুজ কলাগাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

যুদ্ধের ফলে বিগ্রহ সংগ্রহের আরও একটি কাহিনি জয়পুরের ইতিহাসে আছে।

সোয়াই রাজার প্রধান দুর্বলতা ছিল পানদোষ। অম্বরের রাজকাহিনিকাররা তাঁর প্রিয় মদগুলি কেমন করে বানানো হত তার বর্ণনা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। ঠিক অন্যান্য সব সুকুমার কলার মতই।

প্রায় হাজার বছর আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু বিদ্যায় মহাপণ্ডিত ও গুণী মনীষী আলবেরুনী হিন্দুদের এইসব বিদ্যা লুকিয়ে রাখার ইচ্ছার সমালোচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে বিদেশী (আলবেরুনী কথার অর্থ বিদেশী; তিনি হিন্দুস্থানে বিদেশী এই আখ্যাই পেয়েছিলেন) বলে তাঁকে তো হিন্দুরা কিছু জানাবেই না, এমন কি নিজের জাতের বাইরেও তারা কাউকে কিছু জানাতে চায় না এই ছিল তাঁর দুঃখ।

যাই হোক, সোয়াই রাজা এমন মদ খেতেন যার মতো উত্তেজক মদ নাকি রাজপুতানাতেও পাওয়া যেত না। চালের আরক্ বা মধুর গাজানো রস যা দিয়েই সে মদ তৈরি হোক না কেন, এমন নেশা নাকি

ভবিষ্যতেও কেউ বানাতে পারবে না। রাজা যখন তাতে মশগুল থাকতেন, তখন তাঁর কাছে কোনও কাজকর্ম নিয়ে আসা একেবারে বারণ ছিল। বহুবার প্রার্থীরা এসে তাঁর কাছে নিবেদন করেছে যে, তারা মাতোয়ালা নয়, মতিস্থির রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করে।

From Philip drunk to Philip sober আবেদন করার কাহিনি সর্বদাই মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। কিন্তু From Philip sober to Philip drunk আবেদনের একটা কাহিনি এখানে খুব মুখরোচক হবে।

এমনই মাতাল অবস্থায় যখন রাজা অম্বরের শিশমহলে বসে চারদিকে কাঁচের টুকরোয় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে নিজের সঙ্গে মশগুল হয়ে বসে আছেন, তখন এসে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল বিকানীরের রাজা ভক্তসিংহের দূত। সে সময় কারও তাঁর কাছে আসার অধিকার নেই। কিন্তু বাঙালি প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাধরের প্রভাব ছিল অসীম এবং তারই সহায়তায় দূত শিশমহলে মদে বেসামাল সোয়াই রাজার কাছে নিবেদন করবার সুযোগ পেল। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কথা নিবেদন করে যাবে।

নিবেদনটি ভক্তসিংহের চিঠিতেই লেখা ছিল। মাড়োয়ারের মহারাজা অভয়সিংহ ও বিকানীরের রাজা ভক্তসিংহ দুই ভাই এবং বিকানীর হচ্ছে মাড়োয়ারের ছোট তরফ। আমাদের বাঙালী জমিদারদের মধ্যে দুই ভাইয়ের দুই তরফের মামলা লাঠালাঠিতেই নিষ্পত্তি হত এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। কাজেই রাজপুতের দেশে রাজাদের মধ্যেই বা তা না হবে কেন—যদিও দুই ভাই, একই বাপের সন্তান ও একই রাঠোর বংশের রাজা?

বিকানীর থেকে ভক্তসিংহ মাড়োয়ারকে তেমন সম্মান দেখাচ্ছেন না। অতএব অভয়সিংহ ভাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করে বিকানীর অবরোধ করেছেন—তাঁর কর্তৃত্বের অধিকারে।

ভক্তসিংহ কিন্তু নিবেদন করছেন সোয়াই রাজার কাছে যে, তিনি জয়পুরের "ভগতীয়া" অর্থাৎ ভক্ত রাজা জয়সিংহের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই মাথা নোয়াবেন না। অতএব ভক্ত রাজা যেন ভক্তসিংহের সাহায্যে এখনি আসেন। তিনি কি আসবেন না?

মদ ও অহঙ্কার উত্তর যুগিয়ে দিল। সোয়াই রাজা পানপাত্র ছেড়ে মসীপত্র নিয়ে বসলেন। অভয়সিংহকে শীঘ্র বিকানীর অবরোধ উঠিয়ে নিতে লিখলেন। পানপাত্র আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে সম্মান পেতে লাগল।

দূত করজোড়ে বলল,—মহারাজ, আর মাত্র একটুখানি লিখে দিন। শুধু লিখে দিন যে—নতুবা আমার নাম জয়সিংহ।

আবার পানীয় মাথায় দিল নাড়া। আবার জয়সিংহ গোঁফে দিলেন চাড়া।

অভীষ্ট সিদ্ধ করে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দূত দ্রুততম উট ছুটিয়ে অম্বরের সীমা ত্যাগ করে গেল।

অমনি তড়িৎসম গতিতে উত্তর ছুটে এল।

তোমার কি এক্তিয়ার আছে যে আমায় হুকুম করতে চাও? যে আমার ও আমার তাঁবেদারের মাঝখানে মাথা গলাতে চাও? তোমার নাম যদি জয়সিংহ হয়, আমারও নাম অভয়সিংহ।

ব্যাস্।

কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল, তুমুল রবে অম্বরে, মাড়োয়ারে, বিকানীরে। অভয়সিংহ জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বিকানীর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

সবচেয়ে মজা হল তারপরে লড়াইয়ের সময়। জয়সিংহকে তেড়ে লড়াই দিতে এলেন কে? না, ভক্তসিংহ নিজে। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ রাজপুত গোত্রগুলির ভাইবেরাদরি আর যে কোনও একতার বাঁধনের চেয়ে বেশি। রাঠোর রাঠোরে ধুল পরিমাণ। কচ্ছোয়া জয়পুর যখন রাঠোর মাড়োয়ারকে আক্রমণ করছে তখন রাঠোর বিকানীর,—এক বাপের বেটা বলে নয়, এক গোত্রের লোক বলে—মাড়োয়ারের সাহায্যে না এসে কি থাকতে পারে?

কাজেই রাঠোরের অপমানের সম্ভাবনায় ভক্তসিংহের ভাইয়ের প্রতি প্রীতি উথলিয়ে উঠল। তিনি অভয়সিংহের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন যে জয়পুরের ভয়ে মাড়োয়ার যেন বিকানীরের অবরোধ উঠিয়ে না নেয়। শুধু তাই নয়, ভক্তসিংহ নিজেই একা বিকানীরী সৈন্য নিয়ে জয়সিংহকে পিতৃপুরুষের মাড়োয়ার থেকে ভাগিয়ে দিয়ে আসতে চান। তিনি প্রমাণ করে দেবেন যে, একজন রাঠোর লড়াইয়ে একশ জন কচ্ছোয়ার সমান।

ষড়যন্ত্রে অভয়সিংহও কম যাবার পাত্র নন। তিনি সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু ভাই ভক্তসিংহ রাঠোরের ইজ্জত রক্ষা করতে চাচ্ছেন, কাজেই তিনি কি করে তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারেন? নিজে থেকে ভক্তসিংহ জয়পুরের সঙ্গে যুদ্ধের সব চাপ ও দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিচ্ছেন; এখন অভয়সিংহ বাধা দিলে আর একজন রাঠোরের কর্তব্যে বাধা দেওয়া হবে যে!

মহামুনি কৌটিল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন—কণ্টকেনৈব কণ্টকম্। সে কথা মনে রেখেই যে অভয়সিংহ এই প্রস্তাবে মত দিলেন এহেন সন্দেহও যেন কোনও দুষ্ট লোকে না করে।

রাজপুতের যুদ্ধযাত্রার একটা সুন্দর নমুনা এ কাহিনিতে পাওয়া যায়। মাত্র দুশো বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু রাজপুত ইতিহাসের প্রথম থেকে তাদের যোদ্ধা-জীবনের শেষ পর্যন্ত এমনভাবেই যুদ্ধযাত্রা হয়েছে।

প্রকাণ্ড তোরণের উপর বেজে উঠল কাড়ানাকাড়া। ঘোষণা করা হল "খের" অর্থাৎ সমবেতভাবে যুদ্ধের আহ্বান। তোরণের পাশে এসে দাঁড়ালেন ভক্তসিংহ। দুধারে দুই বিরাট তাম্রপাত্র, একটিতে জাফরানী জল আর একটিতে আফিমের আরক। তোরণের নিচে গিয়ে যত রাজপুত বেরিয়ে এলে প্রত্যেককে ভক্তসিংহ নিজের হাতে দিলেন আফিমের আরক আর প্রত্যেকের বুকে দিলেন ডান হাত দিয়ে জাফরানী জলের ছাপ। আট হাজার মরণপণ- করা রাজপুত যোদ্ধা জড়ো হল।

তখন ভক্তসিংহ বললেন,—যারা মরতে ইতস্তত করবে তাদের আমি অলক্ষিতে ফিরে যেতে এখনও সুযোগ দিচ্ছি। সামনের ঐ বড় বাজরার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করব। যে না জিতেই ফিরে আসতে চায় সে ওই সময় বাজরার লম্বা লম্বা শিষের আড়ালে পিছনে থেকে যেয়ো। কেউ জানবে না। আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখে নিতে চাইব না।

পাঁচ হাজারেরও বেশি রাজপুত মরতে এগিয়ে এল।

কেউ কিন্তু সে যুদ্ধ থেকে ফেরে নি।—মাত্র কয়েকজন বাদে। ভক্তসিংহ দেখলেন যে, তিনি নিজে সেই অবশিষ্টদের মধ্যে একজন। যে বেপরোয়া বীর বার বার আত্মবিসর্জনের জন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করেও মরতে পারেন নি। তিনি তখন চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

ভক্তসিংহের শেষ বীরত্বের বর্ণনা শত্রুপক্ষের চারণের গানেই পাওয়া যায়। জয়সিংহের সভাচারণ রাজস্থানী ডিংগল ভাষায় যা গেয়েছেন তার বাংলা অনুবাদ এইরকম দাঁড়ায়—

এ কি রণ-নির্ঘোষ কালিকার?
এ কি হনুমন্তের হুঙ্কার?
এ কি শেষনাগের নিশ্বাস?
কপিলেশ্বরের রোষপাশ?
নৃসিংহ অবতার এল কি?
অথবা রবিরশ্মি নিরখি?
ডাকিনীর মৃত্যুদায়িনী দৃষ্টি?
শিবের ত্রিনেত্রানল বৃষ্টি?
রোধিবে কে আগ্নেয় উদ্গার
ভক্ত হানিলে কাল তরবার?

যেমনি সুযোগ্য শত্রু তেমন তার উপযুক্ত অন্যপক্ষের চারণ। বীরত্বের সম্মান এমনভাবে দেওয়াই বীরধর্ম।

শত্রুর দ্বারা প্রতিপক্ষের বীরত্বের বর্ণনার আর একটি কাহিনি এখানে আপনা থেকেই মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এটাও রাজপুত বীরত্বের বর্ণনা—রচনা করে গেছেন রাজপুত জাতির আশা ভরসা যিনি সমূলে উন্মূল করেছিলেন সেই মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর।

ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে মেবারের রাণা সঙ্গের অধিনায়কতায় সম্মিলিত রাজপুত সৈন্যরা যখন মোগল দলকে ঘিরে ফেলেছে সে সম্বন্ধে বাবর তুর্কী ভাষায় তাঁর আত্মজীবনীতে যে কবিতা লিখেছিলেন তার বাংলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়াবে—

মৃত্যু-সন্ধ্যা সম শত্রুর দল।
ঘৃণ্য পিশাচ তারা নিশাসম কালো।।
তারকার চেয়ে বেশি সংখ্যার বল।
লেলিহান অগ্নির শিখা ছড়ালো।।
অথবা ধূম্রকুণ্ডলী সম অরি।
নীল অম্বরে হিংসায় তোলে শির।।
পিপীলিকা সম দক্ষিণে বামে ভরি'।
অশ্বপদাতি হাজারে হাজারে ভিড়।।

গদ্যে লেখা এই আত্মজীবনীতে যেখানে ভাবের আবেগ এসে গেছে সেইখানেই বাবর কবিতায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারসী রুবাই অর্থাৎ চৌপদী কবিতায়, নিজের মনের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই যুদ্ধের বর্ণনা করতে করতে আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : —

বিজয়ী ব্যূহের বারিধি গর্জনে,
বিপুল বাত্যা গভীর নিঃস্বনে,
কুম্ভীর যত সাগরে বিক্রমী;
অম্বরে ধূলি চতুর্দিকেতে ভ্রমি,
ঘন মেঘ প্রায় ছাইল রণস্থলী;
অসি-বিদ্যুৎ দ্যুতিমান মহাবলী।
দামিনীর প্রভা ঢেকে মুছে হল সারা।
রবির বদন আঁধারিল আলোহারা।।

কিন্তু এই বর্ণনায় শত্রুর বীরত্বের নিছক নির্ভেজাল প্রশংসার চেয়ে যে যুদ্ধে নিজের জয়লাভ হয়েছে সে যুদ্ধের ভীষণতার সুরই যেন বেশি পাওয়া যায়।

রাজপুত ও অন্য জাতির শিভ্যালরি বোধ এখানেই তফাত। যতই ক্ষমাহীন ক্ষান্তিহীন শত্রুতা থাকুক না কেন, রাজপুত শত্রুকেও যখন দেয় আপনাকে ঢেলে দেয়, উজাড় করেই ঢেলে দেয়। তার মধ্যে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ এরকম কোনও মানসিক রিজার্ভেশন রাখে না।

শিভ্যালরি''র সেরা প্রতিযোগিতায় রাজপুত প্রথম হবে। ইয়োরোপও কোনোদিন তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

সোয়াই রাজার কথায় ফিরে আসা যাক। তিনি সে যুদ্ধে ভক্তসিংহের একটি রাঠোর দেবমূর্তি হস্তগত করেছিলেন—ঠিক যেমনভাবে রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী হস্তগত করেছিলেন বলে কথা আছে। তারপর অম্বরের একটি দেবী প্রতিমার সঙ্গে সে মূর্তির বিয়ে দিয়ে বহু উৎসবে ও বহু উপহার দিয়ে মূর্তিটি তিনি ভক্তসিংহকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

রাজপুত হৃদয়ের এই মহানুভবতা জয়সিংহের রাজনীতির মধ্যেও বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। স্বদেশপ্রীতি মানুষকে খানিকটা সংকীর্ণ করে রাখে। সেজন্যই অম্বর বংশের স্বদেশপ্রীতি অম্বর রাজ্য ছাড়িয়ে সমগ্র ভারত বা সমগ্র রাজপুতানায় ছড়িয়ে পড়ে নি। সেজন্যই অম্বর কখনও মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাজপুতানার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে নি। দিল্লি থেকে মাত্র দেড়শ মাইল দূরে আরাবলী পর্বতমালার আড়ালের বাইরে প্রবল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জয়পুর আর কি করতে পারত?

প্রজামত যেখানে রাজশক্তির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা নয়, ভুঁইয়াতন্ত্র অর্থাৎ ফিউডালিজম যেখানে সিংহাসনের একমাত্র অবলম্বন, সেখানে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা আশা করা যায়।

মোগলের পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে তুলে ধরে রাখার শক্তি জয়সিংহের ছিল না। নাদির শার মতো বহিঃশত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা বা দূর করে দেবার মতো সৈন্য বা সব রাজাদের সম্মিলিত করে যুদ্ধ করবার প্রভাব তাঁর ছিল না। মারাঠারা উদীয়মান শক্তি হিসাবে নূতন উৎসাহে উত্তর ভারতে লুঠপাটের আশায় ছুটে আসছিল। তাদের বাধা দেওয়া বা দক্ষিণাপথের মধ্যে আটকিয়ে রাখা অসম্ভব হত।

কাজেই এই তিন বিপদ থেকে জয়পুরকে দূরে রেখে ও নিজের রাজনীতিক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উদাহরণ দেখিয়ে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলিকে রক্ষা পেতে সহায়তা করে তিনি রাজস্থানের রাজ্য ও প্রজা

দুই পক্ষেরই যে উপকার করে গিয়েছিলেন তার জন্যই তিনি যোদ্ধা না হয়েও খুব বড় বীর ছিলেন বলতে হবে।

একমাত্র যুদ্ধেই যে জয় হয় তা তো নয়। হিসাব করে চললে শান্তির পথেও জয় কিছু কম হয় না।

অম্বর গিরিদুর্গের প্রাসাদের ভিতরের অপরূপ চিত্রাঙ্কন ও মর্মর কারুশোভা দেখতে দেখতে আবার সোয়াই রাজার কথা মনে পড়ল। এক হাতে তিনি 'প্রাচীন অম্বরকে শিল্পীর নিপুণতা দিয়ে সাজালেন, অপর হাতে নবীন জয়পুরকে স্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে গড়লেন। একদিকে প্রাচীন প্রাচীন বিদ্যাগুলির লুপ্তোদ্ধার করলেন, অপরদিকে পশ্চিমের নবীন বুদ্ধি ও আবিষ্কারের দিকে জয়পুরের জানালা খুলে দিলেন। আজকের দিনের মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, অস্ত্রশালা, পুঁথিশালা এ সবেরই বীজ তিনি বপন করে গিয়েছিলেন। সোয়াই রাজা জয়সিংহ। সত্য সোয়াই, মাত্র একজন মানুষ নয়।

কিন্তু বিজয়সিংহের কি হয়েছিল?

কেউ জানে না।

অম্বর গিরিদুর্গেরও উপরে পাহাড়ে ওই যে একটা ভীমদর্শন দুর্গ দেখতে পাওয়া যায় ওটা কি? ওখানে কি রাখা হত? কাদের দীর্ঘশ্বাসে বিজড়িত, কাদের কারাবাসের শৃঙ্খলে ঝঙ্কৃত, কাদের রাজপ্রাসাদচ্যুত নূপুর-নিক্কণে ক্রন্দায়িত হত এই দুর্গের মৃত্যুশীতল পাষাণ-প্রাকার?

কেউ জানে না।

ইংলন্ডেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ হিসাবে জয়পুরে একবার বেড়াতে এসে ওই শিলাদুর্গের ভিতরে যেতে চেয়েছিলেন। মহারাজা এমন পরিষ্কার দৃঢ়ভাবে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন যে, সপ্তসাগরা ব্রিটানিয়ার ভাবী অধীশ্বর আর দ্বিতীয়বার সে কথা পাড়বার সাহস পেলেন না।

জয়পুরের চারধারের গিরিমালার সব চূড়া ঘিরে যে বিশাল প্রাকার শোভা পাচ্ছে তার পিছনে সূর্য আগেই অস্ত গিয়েছে। বানরের দল গাছের তলার বিহারস্থান ছেড়ে কোথায় জানি আশ্রয় নিয়েছে। বিরাট গিরিদুর্গের উপর ছড়িয়ে পড়ছে চিন্তামগ্ন অপার অন্ধকার।

যশোরেশ্বরীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঝাঁঝর বেজে চলেছে। একেবারে বাংলা দেশে এসে পড়লাম সে বাজনা শুনতে শুনতে, সেই কালিকা মন্দিরের আরতি দেখতে দেখতে। শ্যামল বাংলাদেশে যশোরে ইছামতী নদীর তীরে সে আরতির ধ্বনি কি কোনোদিন বাতাসে বয়ে ফিরে আসে?

কিন্তু সে কথা ভাববার সময় পেলাম না।

অম্বরের আকাশে আলোর শেষ ছায়ার মাথাটুকুও অবশিষ্ট নেই যে। তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হবে। পাহাড়ী জঙ্গলের কোথায় যেন গলায় ঘণ্টা বাঁধা একটা গৃহপালিত হরিণীকে বোধ হয় বাঘ তাড়া করেছে—তার তীক্ষ্ণ অসহায় আর্তনাদ ত্বরিতগতিতে দূরে মিলিয়ে গেল। ঠিক তেমন করে ওই শিলাদুর্গ আকাশে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে অম্বরের অতন্দ্র পাহারায় রত হল শুধু মৃত্যুরহস্য-সঞ্চারী শৃগালদল।

দশ

রাঁধো বিনা নুনে,
সাজো বিনা চুনে পান,
টাকা বিনা বিয়ে করে
করো নাচ গান।

কোথায় যেন শুনেছিলাম ছড়াটা বহুদিন আগে। খুব মনে ধরেছিল। আর আমার কাছ থেকে শুনে একজন বন্ধুর আরও এত বেশি ভালো লেগেছিল যে, তিনি ওটাতে গানের সুর লাগাবার চেষ্টাও করেছিলেন।

বাস্তবিক এর চেয়ে বড় গান করবার মতো জিনিস আর কি হতে পারে? পৃথিবীটা জয় করতে বের হতে বলছে না। আলাদিনের ভেল্কিবাজির পিদিমের সাহায্যও চাইছে না। এমন কি, একটা শক্ত অঙ্ক কষতেও বলছে না। শুধু নিজের অভাব ও অসুবিধাগুলিকে ভুলে থেকে একটু ফাঁকতাল্লায় স্ফূর্তি করে নিতে বলছে।

আমাদের সাদামাঠা গরিবের জীবনে এর চেয়ে সহজ আরামের উপদেশ আর কি হতে পারে?

পাড়ার রোয়াকে বসে খবরের কাগজের কর্মখালি পাতাটার উপর চোখ বুলোতে বুলোতে শেষ বিড়িটাতে একটা সুখটান দিয়ে সবাই একমত হয়ে আমার এমন দরদঢালা সুবিবেচনার কথায় সায় দেবে। এমন কি, এই স্লোগানটা যদি ভালো করে চালু করে নিজের ফতোয়া বলে কোনও মেম্বার ভোট যুদ্ধে নেমে পড়ে তার জয় নিশ্চিত, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

বিনা ভাবনায়, বিনা দায়িত্বে আরাম কে না চায়?

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়াদের মাথার মুকুট কতদিন টিকবে, সে মাথা রাজছত্রের তলায় না শত্রুর হাতের বর্শার ডগায় শোভা পাবে, তার কোনও ঠিক থাকত না। কজেই রাজারা সময় পেলেই প্রাণভরে স্ফূর্তি করে নিতেন। আমরা, সাধারণ লোকেরা, প্রায়ই মনে করি, 'হেসে খেলে নাও, দুদিন বৈ তো নয়।' যারা একটু বেশি বাহাদুর লোক, তারা ওমর খৈয়ামের ভাষায় বলেন (আসলে এটি নাকি কবি হাকিম তাবাতাবাই লিখেছিলেন কিন্তু রসিকরা ওমর খৈয়ামের নামে রুবাইটি চালিয়ে দিয়েছেন)—

"রোজেঁ কি গুজিস্তা অস্ত আজো ইয়াদ্ মাকুন।
ফর্দা কে নে আম্দা অস্ত ফরিয়াদ মাকুন॥
ওজে আম্দা ও বর্ গুজিস্তা বুনিয়াদ মিনে।
হালে খুস্বাশ্ ও উমর বরবাদ মাকুন॥"

কি লাভ হবে যে দিন গেল তাহার স্মরণে।
কিংবা যে দিন আসবে, ওগো, তাহার বরণে॥
অতীত ও ভবিষ্যতের ভিত্তি কিছুই নাই।
আজই যখন মধুর, মিছে কালের ভাবনাই॥

আর রাজা-রাজড়াদের দল?

তাদের আমোদ-আহ্লাদ করবার ক্ষমতাও অনেক বেশি আর মনের বাসনার রঙ আকাশের উঁচুতে উঠে রামধনু রচনা করতেও পারত। অথচ নিশ্চিন্ত থাকতে পারার মতো সময় খুব কম। কাজেই উত্তর কলকাতার আড্ডায় ভাষায় চুটিয়ে সুখ করে নেওয়ার ইচ্ছা তাদের হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।

সব রাজসভাতেই নাচ-গান বিলাসের যে বাঁধাধরা নিয়ম থাকত, তার মানসিক কারণটি বোধ হয় এখানেই।

ভবিষ্যতের উপর ভরসা যার যত কম, বর্তমানকে সে তত বেশি খাবলিয়ে কামড়িয়ে ধরতে চায়। তাই হাতের কাছে সব সময়ই হাজির থাকত আমোদের বন্দোবস্ত আর সুখের পায়রা। অর্থাৎ মোসাহেব পারিষদের দল।

ওই যে বিনাপণে বিয়ে করে নাচগান করার কথা হচ্ছিল।

তারই একটা আধুনিক অর্থাৎ এই শতাব্দীর উদাহরণ খুব কাছে থেকে পেলাম সে দিন। কোন্ দরবারে সে খবরটা বড় কথা নয়।

সেকালের রাজা-রাজড়ারা জানতেন যে, হেসে নাও, দু দিন বৈ তো নয়; অতএব সময় থাকতে হেসে খেলে নেওয়া দরকার।

একালের রাজারা কিন্তু জানতেন যে, যতদিন ব্রিটিশরাজ আছে (এবং কেন চিরকাল থাকবে না, কাইজার হিটলার প্রভৃতি দুশমনরা যখন কিছুই করতে পারল না ওদের?) ততদিন তাঁরা ও তাঁদের বংশধররা নির্ভাবনায় মসনদে বহাল তবিয়তে বজায় থাকতে পারবেন।

শুধু ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বা পলিটিক্যাল এজেন্টকে বাঁচিয়ে চলতে হবে।

তবে তারা মহাশয় ব্যক্তি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের পাশ, বড় সরকারি চাকরির শৃঙ্খলায় পোষ মানানো। তার উপর ইংরেজের সহজাত ডেমেক্র্যাটিক আবহাওয়ায় মানুষ। কাজেই ওদের পথে ছায়া না ফেললে রাজাদের নিজেদের ছায়া ক্ষীণ হয়ে যাবার ভয় নেই। তোমার ছায়া যেন কখনও না কমতে থাকে, পাখতুনিস্তান সীমান্তে লোকে এই বলে শুভেচ্ছা জানায়। অর্থাৎ তোমার বরবপু যেন রোগা হয়ে তনুলতায় না দাঁড়ায়।

সেই হিসাবে রাজাদেরও কলেবরের ছায়া কমে যাবার কোনও কথা ছিল না।

কাজেই ওই আগেকার দিনের নাচগান স্ফূর্তির ঢেউ সমানভাবেই দরবারে বয়ে যেত। তার মধ্যে অনেক সময় সত্যকারের গুণী ব্যক্তিরাও আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। বড় বড় ওস্তাদ, যাদের গান বাজনা নাচ আমরা কলকাতা বোম্বাইয়ে সস্তার টিকিটে মিউজিক কনফারেন্সের পিছনের বেঞ্চিতে বসে উপভোগ করে আসি তারা অনেকেই কোনও না কোনও দরবারে আশ্রয় না পেলে শুধু সাধারণের রসগ্রাহিতার উপর নির্ভর করে এমন আত্মভোলা ভাবে ললিতকলার চর্চা করতে পারতেন না।

আকবরের নওরতন সভার তানসেন থেকে একালের ছোট্ট স্টেট মাইহারের সভা-ওস্তাদ বাঙালি আলাউদ্দিন খান পর্যন্ত বহু গুণীই বড় হয়েছেন দরবারের আশ্রয়ে।

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় নাচগানের টিউশনি করে পেট চালানোর বন্দোবস্তে কলাবিদ্যা খুব বেশি বাড়তে পারে না। সংসারের চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ সুরেলা যন্ত্রের রিনঝিনকে ছাপিয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। আর বাংলাদেশের ভদ্রসমাজে, শিক্ষিত পরিবারে এসব বিদ্যার আলোচনাও মাত্র গত ত্রিশ চল্লিশ বছরের সৃষ্টি। বাংলার বাইরে বহু প্রদেশেই এখনও সে রেওয়াজ কায়েম হয়ে চালু হয় নি। তার আগে গুণীদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার পথ হিসাবে সরু গলিটুকুও ছিল না।

সেখানে চৌরঙ্গির মতো চওড়া আসর পেতে দিয়েছিল রাজা-রাজড়াদের দরবার।

মুসলমান বাদশারা হিন্দু রাজাদের চেয়ে এ হিসাবে আরও বেশিই দিয়ে গেছেন দেশকে। বিশেষ করে যখন আমরা ভেবে দেখি যে মুসলমান শাস্ত্রে এসব ললিতকলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, তখন ওইসব ললিতকলার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাদের বাহাদুরি আরও বেশি বলতে হবে।

তবে মুসলমান হিন্দুতে তফাত হচ্ছে মূলগত। পৃথিবীটাকে হিন্দু বিচার করেছে মস্তিষ্ক দিয়ে, মুসলমান বরণ করেছে হৃদয় দিয়ে। হিন্দু মনে রেখেছে পরকালের আশা, মুসলমান চোখে দেখেছে ইহকালের নেশা। হিন্দু বেছে নিয়েছে শাস্ত্র, মুসলমান তুলে নিয়েছে অস্ত্র।

এই পার্থক্যের ফলে হিন্দু তিলে তিলে একটা একটা করে শ্বেতপাথরের সূচিসূক্ষ্ম জালির ও প্রতিমার কাজ করে দিলোয়ারা মন্দির তৈরি করেছে। মুসলমান তৈরি করেছে মনমাতানো রঙবেরঙের পাথর ও মিনার কাজে ভরানো রঙমহল। সে জন্যই আমরা হিন্দু যুগে পাই বৈভব, মুসলমান যুগে বিলাস।

সেই একই কারণে বিদেশী টুরিস্ট এ দেশে বেড়াতে এসে দাক্ষিণাত্যে দেখতে যায় মন্দির আর গোপুরম্। উত্তর ভারতে, যেখানে হিন্দু যুগের স্থাপত্যের চিহ্ন কমে গেছে, সেখানে দেখতে আসে দিল্লির কেল্লা ও তাজমহল।

রাজস্থান দিল্লি আগ্রার এত কাছে ও নানা সম্বন্ধ দিয়ে জড়ানো যে, রাজোয়ারা দরবারগুলিতে জীবনকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ খুব ভালো করেই ফুটে উঠেছে বার বার—হিন্দুয়ানি ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করা সত্ত্বেও।

কাজেই আশ্চর্যের কথা নয় যে, দক্ষিণে হিন্দু রাজাদের সভায় আদর হল ভারতনাট্যমের, কথাকলির। সে অঞ্চলে শাস্ত্রের নিয়ম, সূক্ষ্ম মুদ্রা আর স্পষ্ট রূপক দিয়ে নাচের মর্মকথা ফুটিয়ে তোলা হত। কিন্তু উত্তরে অর্থাৎ যেখানে মুসলমানী প্রভাব ভালো করে ছড়িয়েছে সেখানে কথকের মতো নাচের সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় চলতে লাগল নাচওয়ালীর নাচ। রামায়ণের রূপক দিয়ে কি আর কামায়নের রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়? চরণামৃতে কি নেশা হয়?

বাঙলায় তাকে আমরা বলতাম খেমটা নাচ। কিন্তু রাজদরবারের ঝলমলে আলোতে ঝকমকে গহনার জৌলুস ছড়াতে ছড়াতে বাইজীরা যখন নাচে তখন তাকে অত সামান্য একটা নামে মানায় না।

যাক, সোজাসুজি হিজ হাইনেসের নাচের নিমন্ত্রণে চলে আসা যাক। নাম আর ধাম দিয়ে কি হবে? নাচটাই আসল।

তখনও তাদের খানাপিনার পর্ব শেষ হয় নি। পাত্রমিত্ররা তখনও টেবিলের দুপাশে সারি সারি বসে আছে। মাথায় সবারই রঙবেরঙের চটকদার পাগড়ি। ঝকমক করছে তাদের কারুকার্যে ভরা পোশাক। একটু হেললে দুললে পাগড়ি কি পোশাকের কোনও একটি অলক্ষিত কোনা থেকে হীরা জহরতের হাসি ঠিকরিয়ে বেরিয়ে আসে।

হীরের হাসি,—সে শুধু কল্পনাই করা যায়। এদের পূর্বপুরুষরা যখন লড়াইয়ে যেতেন তখন

তলোয়ারের হাসি বিদ্যুতের মতো খেলে বেড়াত। সে কথা ওদের চারণ কবিরা বলে গেছেন।

কিন্তু এদের মণিমুক্তার হাসি বোধ হয় এটম বমের চোখ ধাঁধানো আলোকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু ওসব ভীষণ ভীষণ কথার চিন্তা এখন দূরে থাকুক। মনে মনে নিজেকে সমঝিয়ে নিয়ে বললাম—রঙমশালের আলো ছড়িয়ে দেয়।

অবশ্যই রঙমশালের আলো। কারণ যে টেবিলে বসে ওদের খানাপিনার শেষ পর্বটি এখনও চলছে তার নিচের কার্পেটে রঙের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। জাফরানী হলদে বা আবীরের মতো লাল বা টকটকে সোনালির সঙ্গে মুক্তার মতো সাদা রঙ মিশ খেয়ে কত কিছুই না নক্‌শা সৃষ্টি করেছে সে কার্পেটে। আর তার উপরে শোভা পাচ্ছে সারি সারি মণিমুক্তায় ভরা বুক আর পাগড়িতে ঘেরা মুখ।

বোধ হয় উৎসাহের চোটে একটু আগেই এসে পড়েছিলাম। তবে প্রভুভক্তির ভারে নুইয়ে পড়া কয়েকজন সর্দার তার আগেই এসে গেছেন। কিন্তু কথা কয় না কেউ। পাশের ঘরে যে হিজ হাইনেসের দল এখনও গুরুগম্ভীর হয়ে বিরাজ করছেন। দি মিস্টিরিয়াস ঈস্টের মিষ্টি রস তো এখানেই। ইষ্টদেবতা ইচ্ছা না করলে কারও হাসি ঠাট্টা করবারও পথ নেই।

মনে মনে যাচাই করে নিলুম ইয়োরোপে এ অবস্থায় কি হত। ছোট্ট ছোট্ট ঠাট্টা, হাসি ইয়ারকি, বানানো মজার গল্পের গুঞ্জনে পায়রার খোপে পরিণত হত প্রকাণ্ড হলটা। সবাই পরস্পরের খুব কাছে এগিয়ে আসত যে সময়টুকুতে। হয়তো একপাশে, কিংবা সৌভাগ্য বেশি হলে দুপাশেই, আলো করে বসতেন কোনও মহিলা। তার মন জুগিয়ে মুখে হাসি ফোটাবার জন্য অনেকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। যার পারসোন্যালিটি যত ইনটারেস্টিং, এই কথাবার্তার পাল্লায় সে তত বেশি জিতে যাবে।

এর সঙ্গে তা বলে জড়িয়ে যাবে না কোনও কলঙ্কের আভাস বা চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত বা মন দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে ইশারা।

নিছক ফুল ফোটাবার খেলা বলা চলে না এই কথাবার্তাকে।

হীরের ফুল দু কানে দোলাতে দোলাতে হিজ হাইনেস এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে আরও কয়েকজন নাচ দেখতে নিমন্ত্রিত লোক এসে গেছেন।

অতিথি যাঁরা খাবার টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছিলেন তাঁদের নাম পাশাপাশি বসালে রাজোয়ারার একটা ছোটখাট ম্যাপ সাজানো যায়।

কফি আর লিকিওর (ডিনারের পরে খাবার জন্য হালকা মদ) নিয়ে খালি পায়ে পাগড়ি মাথায় বাটলারের দল আনাগোনা করতে লাগল। এদিকে সেদিকে কয়েকজন খোশগল্প শুরু করলেন। বুঝলাম ইংরেজিতে যাকে বলে বরফ ভাঙা, তাই হচ্ছে। ভোজের টেবিলে ফর্মালিটির যে বরফ জমাট হয়েছিল তা গলতে শুরু হয়ে গেছে। এবার নাচের ঢল নামার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কত অসম্ভব খরচই না হয়েছে এই ঘরটি সাজাতে। যে বিলিতি ডেকরেটারদের অর্ডার দিয়ে সাজানো হয়েছে তাদের রুচির প্রশংসা করলাম। দেওয়ালে সুন্দর রঙিন সব ছবি—শিকারের, ঘোড়দৌড়ের, দিল্লি দরবারে হাতির পিঠে চড়া আগেকার রাজার। ম্যান্টল পীসে, টেবিলে, কাঁচের আলমারিতে নানারকম মার্বেল পাথরের ও চীনা জেড পাথরের মূর্তি। অনেকগুলি তার মধ্যে নগ্নিকা।

ইতিমধ্যে ডাইনিং রুমের লম্বা টেবিলটি সরে গেছে। সাদা চাদরে ঘরটি মুড়ে দেওয়া হয়েছে আর দেওয়ালের আশেপাশে ছোট ছোট ভেলভেটের গদি-আঁটা গিল্টি-করা চেয়ার বসানো হয়েছে।

হিজ হাইনেস একজন সাহেব অতিথির স্ত্রীকে আদর করে পাশে এনে বসালেন। আরও দু-তিনজন হাইনেসকে যেচে ডাকলেন কাছাকাছি বসতে। বাকি সব যে যার সিট বেছে নাও।

দেশীয় রাজার দরবারের ক্ল্যাসিক্যাল অনুষ্ঠান হচ্ছে নাচ।

টুক টুক করে আলতারাঙা পায়ে ঢুকল নাচওয়ালীর দল। জন পনেরো ষোল হবে। গায়ে দামী শাড়ি বা সালোয়ার, পায়ে ঝমঝমে ঘুঙুর আর চোখে হরিণীর ভীতচকিত চাহনি। সাদা চাদরের এক প্রান্তে এসে তারা বসল। পাশেই বসেছে বাজনাদারের দল। উসখুস করতে করতে তারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে একটু-আধটু কথা বলছে।

একটি নর্তকী চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে হিজ হাইনেসের কাছে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল।

আমার কানে কানে একজন সর্দার বললেন—এই হচ্ছে এখনকার পাটরানি।

অর্থাৎ সবচেয়ে পেয়ারের বাইজী! অবশ্য যতদিন বড়র পিরীতি টেকে। কথাই আছে—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।

তবে পিরীতির বাঁধ যতদিন টেকে বাইজী তারই মধ্যে যে অনেক বালির কেল্লা বানিয়ে নিচ্ছে তা বুঝতে কোনও ভুল হয় না। গায়ের গয়না, পরনের সাজেই তার প্রমাণ।

অব্যর্থ প্রমাণ। তা না হলে আর হিজ হাইনেস ওর সঙ্গে এমন দিলখোলা উড়কো রসিকতা করছেন আর হোহো করে গড়িয়ে যাচ্ছেন?

অট্টহাসি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। বিরাট দেহটা হেসে গড়িয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট গিল্টি করা চেয়ারে আর আঁটছে না। কালিদাসের বর্ণনায় শকুন্তলার কথা মনে পড়ল। অতিশিনদ্ধ বল্কলে যৌবন-ভারাবনতা আশ্রম-পালিতার দেহ আর আঁটছে না।

হঠাৎ এই উপমাটি মনে পড়ে গিয়ে নিজেরই বিশ্রী লাগল। যেন পূজার সাত্ত্বিক প্রসাদ মুখে দিতে গিয়ে হঠাৎ এক টুকরা মাংস বা হাড় হাতে ঠেকল। কোথায় কণ্বমুনির তপোবন আর কোথায় স্বৈরতন্ত্রেব দেশের এক রাজসভা। সামনে দেখছি যে খুশিতে উপচিয়ে উঠে হিজ হাইনেসের পা দুটো কার্পেটের ফুলগুলিকে মাড়িয়ে দিচ্ছে আর একটা হাত পাশের একজন হাইনেসের কাঁধ আঁকড়িয়ে ধবল। মনে হল যেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মাই ডিয়ার ভাব দেখানো।

অথবা হয়তো তাল সামলানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

এদিকে ততক্ষণে নাচ শুরু হয়ে গেছে। নাচ নয় শুধু। তার সঙ্গে গানও চলছে তাল রেখে। একটার পর একটা। প্রায় আধঘণ্টা নাচল একজন। সঙ্গে সঙ্গেই গান চলেছে—

ইযে হরদম কৈসী হোরি।
ভর পিচকারি
মুখ পর ডারি
ভিঙ্গ গয়ী চুনর শাড়ি।
ইয়ে হরদম কৈসী হোরি।

শেষ পর্যন্ত হিজ হাইনেস হাত ঝাঁকি দিয়ে এই হরদম হোবির নাচ থামিয়ে দিলেন।

কত হরেক রকমের নটী। নানা প্রদেশ থেকে বেছে এনে ফুলের মালা গাঁথা হয়েছে যেন। হিমাচলেব তনুমধ্যা পাহাড়িনী, কাশ্মীরের চটুলনয়নী যবনী, ক্ষীণকায়া পুষ্পিতকবরী দক্ষিণী।

লাংকা শাড়ি ও চেলিপরা মাথায় ফুলের মালা বাঁধা এই দক্ষিণীর নাচ শেষ হলে শুরু করল কাশ্মীরী। পরনে সাটিনেব চুড়িদার সালোয়ার, অঙ্গে ভেলভেটের কুর্তি, কাঁধের উপর ছড়ানো রেশমী দোপাট্টা মাথায় জড়ানো সোনার পেচী আর সুরেলা কণ্ঠে উর্দু গজল—

দেওয়ানা বানানা হ্যায়
তো পেয়মানা বানা দে;
ম্যায় ঢুণ্ডু রহি সারি বনোয়া,
মেরা শ্যাম কাঁহা হ্যায়।

শুধু সারা বন কেন, সারা দুনিয়াতে শ্যাম যে কোথায় লুকিয়ে আছেন তার সন্ধান কে জানে। কিন্তু পেয়মানা বানা দে'র মাতাল করা আহ্বানে নাচের আসরে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। ঘুর ঘুর ঘুর। চটুল রসে সবার মাথা ঘুরে যাচ্ছে না কি?

পিছন থেকে খুব সন্তর্পণে বাটলাবের দল পেয়মানা বানিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয় ছোট ছোট লিকিওরের গ্লাস নিয়ে হাজির হল।

ততক্ষণে এক রাজপুতানী আসর দখল করেছে। রঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে উড়ছে তার লেহঙ্গা, ঘুরছে তার আঙ্গি (চোলি), ছড়িয়ে যাচ্ছে তার ওড়না। হাতে হাতির দাঁতের চুড়ি, মাথায় বোর্‌লা আর রাখ্‌রি, গলায় সোনার টেওটা, কানে হীরের ঝুমকো আলোর ঝিলিক হেনে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আর সবচেয়ে শোভা পাচ্ছে তার পা দুখানি।

পায়ের আঙুলগুলি প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে রুপার বিছিয়াতে। তার উপরে গোড়ালি থেকে শুরু হয়েছে কত গহনা একেবারে থরে থরে। একটার উপর আর একটা। কারুলা, আওলা, নেঁওরী, টংকা, পাঁয়জোর। এত সব অলঙ্কার আর নূপুরের মিঠে বুলি।

কিন্তু গানের ভাষায় তখন শ্যাম রাধার হাত চেপে ধরে রেখেছেন, পানিয়া ভরণে যেতে দিচ্ছেন না। তাই রাধা নাচছেন ঠুংরী গানের সঙ্গে সঙ্গে—

রোকে মোর গেল্; কৈসে ভরুঁ পানি রে।

* * *

এসোরি নিডর ঝকাজোরি মোরি বইয়া রে॥

রোকে মেরা গেল্ অর্থাৎ আমার পথ রুখে রেখেছে। ডরহীন নন্দদুলাল জোর করে হাত ধরে ফেলেছে। কেমন করে জল ভরে নিই? কেমন করে যাই আমি, ওগো?

রাধা তো যেতে পারছেন না। তাই একটানা নেচে চলেছেন।

কিন্তু ততক্ষণে নিমন্ত্রিত প্রায় সকলেই দেখি আমার মতো উসখুস করছেন উঠে পড়বার জন্য। কিন্তু দরবার স্বয়ং না উঠে গেলে নিমন্ত্রিতরা কেউ উঠতে পারবে না এই হচ্ছে নিয়ম।

এদিকে আমার মতো নিরেমিষ নিমন্ত্রিত একটানা আর কত নাচ দেখতে পারে সাদা চোখে ও মন না রাঙায়ে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাজনা থামল। ঐকতানেব গম্‌গম্ করা রেশ নূপুরের রিনঝিন আর হাতের ও পায়ের অলঙ্কারের মিঠে ঝুনঝুন ধ্বনিকে হলঘরের চারিদিকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

কখন জানি হিজ হাইনেস অলক্ষিতে সরে পড়েছেন আসব থেকে। তাই দেখে এখন সবাই বিদায় ও ধন্যবাদের পালা সারবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠল। ইংরেজি প্রথায় আমরা হাতে হাত ঝাঁকি দিয়ে বিদায় নিলাম। দূর থেকে আলগোছে নর্তকীদের দিকে দিলাম একটি পাইকারি নমস্কাব। ওবা রাজপুত প্রথায় সুন্দব ভঙ্গিতে বুকে হাত দিয়ে মাথা নুইয়ে বিদায় জানাল।

হঠাৎ তার মধ্যে যে ছন্দ ও সুরের স্পন্দন পেলাম এতক্ষণের নাচের মধ্যে তা পাই নি।

কিন্তু নাচের বর্ণনা কোথায়? এ তো হল গিয়ে শুধু নাচের আসরের বর্ণনা। কিন্তু, সুধী পাঠক, ওইটুকুই এর মধ্যে সব চেয়ে মনোহর অংশ। তবু যদি জানতে চাও তাহলে সেই ঝকমকে নতুন অয়েল-পেইন্টিংটির কথা মনে করিয়ে দেব। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই পরিচিত প্রশ্ন ও উত্তরটি।

ছবিটা কেমন সুন্দর হয়েছে, না?

অনেক ভেবেচিন্তে গা বাঁচিয়ে উত্তর এল—অবশ্য, অবশ্য, বাঁধাইটা ভারি চমৎকার।

"সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী"

আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম না, হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

এগারো

দরবারের নাচে মন ভরল না।

মনে হল যেন ঝুটা মণিমুক্তার চমকানি দেখে ফিরে এসেছি। জহুরি যদিও নই এটুকু বুঝতে পারা শক্ত হল না।

শুধু আমি কেন? যারা এদেশী নাচের কিছু বোঝে না, যারা শুধু বলড্যান্সের সাধারণ পাঁয়তারা কষে, তার সামাজিকতার আনন্দটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে, তারাও এ সহজ কথাটা বুঝতে পারত।

কি জানি। সুচিরপ্রবাসী আমি বাঙলাদেশের রিনায়সেন্স অর্থাৎ নবজাগরণের যুগের কালচারের রস নিজে তেমন আস্বাদ করবার সুযোগ পাই নি। তবুও বহু লোককে তা উপভোগ করতে দেখেছি বলেই এ নাচে মন ভরল না। হয়তো আধুনিক সভ্যতার পালিশে চকচকে হালকা নাচ দেখার পর এসব পুরানো রাশভারী নাচ আমাদের অনভ্যস্ত চোখে ভালো লাগে না। ঠিক যেমন ফিউচারিস্ট ডিজাইনের হালকা সোনার পাতের ব্রেসলেটের পর সাবেকী আসল সোনার ভারী বাজুবন্দ আর পছন্দ হয় না।

নাইলনের হাওয়াইয়ান হাওয়া শার্টের পর আর কি গরদের সাবেকী ছাঁটের পাঞ্জাবিতে মন ওঠে?

কিন্তু আসল মাল কোন্‌টা?

মনের মধ্যে প্রশ্নটা জেগে রইল। কিছুদিন পর পরই খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দেয় যে, ওটাকে চাড়া দেওয়া চলবে না।

মনে পড়ল বছর ত্রিশেক আগে ইংরেজ যুগের সেক্রেটারি অব্‌ স্টেট মন্টাগু এই নাচের কথা নিজের গোপন রোজনামচায় লিখে গিয়েছিলেন। কেউ ভবিষ্যতে ছাপার অক্ষরে পড়বে, সে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই ডায়েরি লেখেন নি। বারো বছর পরে তাঁর স্ত্রী সেগুলি বই করে ছাপিয়েছিলেন। কাজেই এতে অনেক কথা ও অনেক মত মন্টাগু খুব খোলাখুলিভাবে লিখে যেতে পেরেছিলেন।

মামুদাবাদের রাজা তাঁকে একবার দরবারি নাচ দেখিয়েছিলেন। সেখানে নর্তকীদের নাচ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে "কুৎসিত মেয়েরা কিম্ভুত পোশাক পরে, শিয়ালের মতো হল্লা করে মৃগীরোগীর মতো হাত পা ছুঁড়ছিল বার বার। ওরা (ভারতীয়রা) বলে যে, আমাদের গীতবাদ্যও ওদের কাছে সমান দুর্বোধ্য। আমার কাছেও অবশ্য তাই। তবু এইটুকু বুঝি যে, আমাদের গানের কোথাও একটা শুরু হয় আর শেষও একরকম হয়। তাছাড়া প্রাণবন্ত ও কাঁদুনে, ভারী ও হালকা মিউজিকের তফাত আমি বুঝতে পারি।"

আমারও সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞান তার চেয়ে বেশি মোটেই নয়।

তবুও মহাজনের মতটা মনে করে একটু সান্ত্বনা পেলাম যে, যারা এই রকম সরকারি নৃত্যরসের অনুরাগী তারা আমায় বড় জোর বেরসিক মনে করতে পারেন, কিন্তু মনুষ্য সমাজের বাইরে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য রায় দেবেন না।

মনুষ্যসমাজের মধ্যে বসে এ কথা হচ্ছিল। পুরানো রাজোয়ারার গা ঘেঁষেই যে নতুন বাজস্থান গড়ে উঠেছে সেখানে। বাঙালি বিদ্যাধর ভট্টাচার্যের গড়া মহারাজার জন্য তৈবি গোলাপী শহরেব ঠিক বাইরে রাজাও নয় সামন্ত-সর্দারও নয়, এমন যে নতুন প্রভাবশালী জাত গড়ে উঠেছে তাদের জন্য তৈরি নয়া শহব।

জয়পুরের 'ল্যান্ডমার্ক' হচ্ছে তার সুন্দর মিউজিয়ামের বাড়ি। ঠিক তার কাছেই রাজপুতানা ইউনিভার্সিটি নতুন তৈরি হচ্ছে। দেশের চারদিক থেকে জড়ো কবা হয়েছে পণ্ডিত অধ্যাপকের দল। নতুন বিদ্যার আলো তাদের মুখে, সদ্য বিলেতী মার্কিনী ডিগ্রির ছাপা নামাবলী তাঁদের নামে। যে সব সাধাবণ অবস্থার ছেলেরা রাজপুত্রদের জন্য মার্কামারা মেয়ো কলেজে স্থান পেত না, তাদের এখন থেকে ভালো প্রফেসারের কাছে পড়তে হলে দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ ছুটতে হবে না। ঘরের খেয়েই বাইরের বিদ্যা তারা এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবে।

সেই বিদ্যাদানের বর্তমান কর্ণধার হচ্ছেন ডক্টর মহাজনি।—জাতিতে মারাঠী, বিদ্যায় ব্রাহ্মণ ও যশে ইন্টারন্যাশনাল। বাঙালি শ্রীভূপতিমোহন সেনের মতো দুয়েকজন ছাড়া এদেশে এঁর মতো অঙ্কশাস্ত্রে কেম্ব্রিজের এত বড় র‍্যাংলার আর কেউ নেই। তিনি রাজি থাকলে শিক্ষাবিভাগের যে কোনও বড় পদ যেচে তাঁর পদপ্রান্তে আসত, কিন্তু এ পর্যন্ত শুধু পেটভাতায় তিলক গোখলে প্রভৃতির মতো নিঃস্বার্থভাবে ডেকান এডুকেশন সোসাইটির প্রফেসার সভ্য হিসাবে পুণার ফার্গুসন কলেজে পড়িয়ে এসেছেন। এখন নতুন রাজস্থানের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে এসেছেন। তিনি এখানকার ভাইস-চ্যান্সেলার।

মনে পড়ে গেল যে, এই রাজস্থানে, বিশেষ করে এই জয়পুরে মারাঠা আসত লক্ষ লক্ষ টাকা চৌথ আদায় করতে। অত্যাচারে ও শোষণে বছরের পর বছর দেশকে শেষ করে যেত। আজ সেই মারাঠা একজন এসেছেন নতুন রাজস্থান গড়তে সহায়তা করতে। বন্দুকের বদলে এনেছেন বিদ্যা। আদায়ের পরিবর্তে করবেন দান। যা জোর করে অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। সেই দান, যা, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই তুলনার মধ্যে লুকানো দেশের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে দেখতে মহাজনি মহাশয়ের চায়ের টেবিলে বোধহয় একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

শ্রীমতী মহাজনি শিক্ষার সঙ্গে সুরুচির সুন্দর একটা সমন্বয় করেছেন নিজের গৃহস্থালিতে। স্বামী ডাকসাইটে ডাকাত নয়, পণ্ডিত। মেয়ে আমেরিকান ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ নিয়ে মার্কিন দেশে শীঘ্র যাবেন পড়বার জন্য। কিন্তু ধরাকে সরা জ্ঞানও করেন নি আর নিজের হাতে সংসারের সবকিছু করতে দ্বিধাও নেই। তাঁর তৈরি মিঠাই আমার হাতের মধ্যে থেকে মুখের ভিতর বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ নিজের

অজান্তে হাত ও মুখ দু-ই হাত গুটিয়েছে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন যে, আজ আমি সকালে তাঁর বাড়ির বাগানে ময়ূরের নাচ দেখেছি বলে বোধ হয় মনটা ভরে আছে। তাই খাবার কথা মনে হচ্ছে না। আমি নিশ্চয়ই কবি, কারণ বাঙলাদেশের মাটিতে যে শুধু বোমারু আর কবি জন্মায় সে সবাই জানে।

মন অবশ্যই ভরেছিল। কলকাতায় ময়ূরের নাচ চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখতে হয়। বাঙলাদেশের কোনও গ্রামে নিরামিষ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একঝাঁক ময়ূরের পেখম মেলে নাচ যে দেখতে পাব সে সম্ভাবনা নেই। অথচ বর্ষার কবিতা বাঙালির মতো এত আর কোনও জাতি লেখে নি।

বর্ষার মেঘ জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি কবিকঙ্কণ প্রভৃতির আকাশ ছেয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যেমনভাবে বাংলা কাব্যকে শ্যামল সরস করে তুলেছে এমন আর কোনও দেশে হয় নি। কাজেই শুধু কবিতা পড়তে অভ্যস্ত আমি বা আমার শ্রীমতী কেন, ও রসে এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত আমাদের বালিকা কন্যা অনুরাধা পর্যন্ত বাড়ির বাগানে চোখের সামনে ময়ূরের পেখম মেলে নাচ দেখে আত্মহারা। আমেরিকার কলেজে ঢুকবার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন মহাজনি কন্যা। এই নাচের আসরে সে ও অনুরাধা এক রসের রসানে সমবয়সী হয়ে গেল। কাজেই আমিও যদি তাদের ছোঁয়া পেয়ে থাকি আর ভাবি যে—

একটুকু ছোঁয়া লাগে
একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে
রচি মম ফাল্গুনী।

তাহলে জয়পুরের পক্ষে অস্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্য কিছুই হয় না। এই গোবিন্দজীর দেশে বাড়ির বাগানে ময়ূরের নাচ থেকে আরম্ভ করে মূর্তি-মহল্লায় যে ভক্তশিল্পীর হাতে শ্বেতপাথরের মধ্যে তার মনের গোপালমূর্তি আকৃতি নিয়ে উঠেছে, সেই শিল্পসৃষ্টি পর্যন্ত সর্বত্র সেই একজনের কথা বার বার মনে পড়িয়ে দেয়।

তাই শ্রীমতী মহাজনি যে ময়ূরের নাচের কথা তুলবেন সেকথা অস্বাভাবিক নয়।

একটু কিন্তু অপ্রস্তুত হলাম। কি করে বলি যে মারাঠার সে যুগের ক্ষত্রবৃত্তির ও এ যুগের ব্রাহ্মণবৃত্তির কথা ভাবছিলাম? ময়ূরের নাচের কথা ওঠায় বেঁচে গেলাম।

বললাম তিন বছর আগেকার এক দরবারি নাচের আসরের কাহিনি। যে নাচ ছিল চটকদার, কিন্তু চমৎকার নয়। যার প্রেরণা আসে নি ওই ময়ূরের নিজের মনের আনন্দে নেচে যাওয়ার মধ্য থেকে। যা ময়ূরীর মতো দর্শকদের মনে নাচের ঢেউ তুলতে পারে নি।

অবশ্য যাঁরা দরবারি রসে ডুবে আছেন এমন একখানা ভাব দেখানো উচিত বলে মনে করেন, তাঁরা সে নাচের ঢেউয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু বহু রসের রসিক মহাশয় প্রাণী তাঁরা। একেবারে অন্য আসমানের চিড়িয়া।

আর আমরা যারা এই নিরামিষ চায়ের টেবিলে জড়ো হয়েছি, আমাদের কথা আলাদা। টেবিলে বসেছেন ডক্টর মুকুটবিহারী। যাকে বলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত। বয়সে নবীন কিন্তু প্রবীণের মুকুট পরেছেন মাথায়। সে প্রবীণতার প্রমাণ হচ্ছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড় উপাধিতে।

বসেছেন অধ্যাপক গুপ্ত। মনেপ্রাণে জয়পুরী কিন্তু বিশ্বপুরী ঘুরে এসেছেন জ্ঞানের সন্ধানে। হাসিতে খুশিতে উপচিয়ে পড়ছেন চারিদিকে। মনের বাতায়ন যেন খুলে দিয়েছেন হাসি-ভরা দুই নীলাভ চোখের মধ্যে দিয়ে।

নীলাভ চোখ? হ্যাঁ, ঠিক তাই। রাজপুতের আদিম পূর্বপুরুষরা ছিল আর্যের সঙ্গে শক হূন প্রভৃতি যোদ্ধা জাতির পাঁচমিশেলীর ফল। তাদের আদিম ইতিহাসে, আচার ব্যবহার ধর্ম এসব বিচার করলে রাজপুতের সঙ্গে প্রাচীন জার্মান স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের লোক যথা, গথ, কেল্ট, গ্যাল প্রভৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়।

তাতার ও মোগলদের ঐতিহাসিক আবুল গাজী লিখেছেন যে, তাতারদের উপর আমাদের যে একটা বিরাগ আছে সেটা থাকত না যদি আমরা ভেবে দেখতাম যে, তাতার দেশ অর্থাৎ উত্তর-মধ্য এশিয়া থেকেই ফ্রাংক হূন প্রভৃতি জাতিরা বাকি এশিয়া ও ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদেরই তো লোকে আর্য বলে।

হিটলার তাই উত্তর ইয়োরোপের সুইডিশ প্রভৃতি নর্ডিক জাতিকে আর্যদের মধ্যে সবচেয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন।

সেই কুলীন ব্রাহ্মণদের পরিচয় তাদের উপবীত নয়, কারণ, চেনা বামুনের তো পৈতার দরকার নেই। সে পরিচয় আছে তাদের সোনালী চুল, নীলচে চোখ আর উজ্জ্বল গায়ের রঙে। রোদে যা মলিন হয়ে যায় নি। গরম হাওয়ায় যা তেতে পুড়ে যায় নি।

কিন্তু সেই নর্ডিকদের গুটিকয়েক প্রতিনিধিকে হিন্দুস্থানের খোলামেলা সূর্যের আলোয় কয়েক বছর রেখে দিলেই গয়ের রঙ যে তামাটে ও চোখের রঙ ঘোলাটে হয়ে আসতে পারে তার প্রমাণ আমরা মফঃস্বলের বহু খাঁটি ইংরেজ চাকুরের এক পুরুষের জীবনের মধ্যেই দেখে এসেছি।

অবশ্য রঙ পাকা হতে সময় লাগে। হিন্দুস্থানের খাঁটি আর্যদেরও লেগেছে হাজার হাজার বছর।

এখন হঠাৎ সেই হাজার বছরের যবনিকা তুলে বেরিয়ে এল অধ্যাপক গুপ্তের দুটি নীলাভ চোখ। মাথার চুলের ডগা আমাদের মতো ঠিক অতটা কালচে এখনও হয় নি। কোঁটের কলারের নিচে ঘাড়ের কাছে রঙ ও মুখের রঙের তফাত দেখে অনুমান করা শক্ত নয় যে যত শতাব্দী ধরে তার বংশের রঙ পাকা হয়েছে ঠিক তত শতাব্দী যদি সূর্যের আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে ঠাণ্ডা দেশে তার বংশধরদের রাখা যায় তাহলে ধোপে ধোপে সাফ হতে হতে আবার আদি ও অকৃত্রিম রঙটি ফিরে আসবে।

বহু ক্ষত্রিয় রাজপুতের ক্ষীণ কটিতট ও অধর, সরল সুঠাম দেহ ও নাসিকা দেখে সে কথা বহুবার মনে হয়েছে। কথায় কথায় কোনও গ্রাম্য ঠাকুর সাহেব বা জায়গীরদারকে সে কথা বললে তার মনে কষ্ট বা আনন্দ কোন্‌টা বেশি হবে তা বলা শক্ত। কিন্তু গুপ্তজী যে এই জাতিতত্ত্বের প্রমাণ নিজের গায়ে মেখে রেখেছেন তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না।

আর টেবিলে বসেছেন অধ্যাপক রুচিরাম। বয়সে তরুণ কিন্তু চোখ তুললেই শরমে অরুণ হয়ে উঠছেন ক্ষণে ক্ষণে। একসঙ্গে স্ত্রী পুরুষে মিলে বসা, খুশি মনে হাসা, হালকা রসালাপে ভাসা এখনও তেমন রপ্ত হয় নি।

খাঁটি মেবারী তিনি। খাস উদয়পুরের পর্দাঘেরা অন্তঃপুর থেকে আমদানি। আরাবলী গিরিমালার ঘোমটায় ঢাকা মেবার থেকে এসেছেন, যেখানে এখনও সাধারণ ক্ষত্রিয় ঘরের মেয়ে পুরুষেব চোখেব সামনে দিয়ে পথে পদ্মফুল ফুটিয়ে হাঁটে না। পায়ের নূপুরে রিনিঝিনি মিঠে সুর তুলে সন্ধ্যাবেলা পানিয়া ভরণে বের হয় না। বাইরের কাজগুলি শিভ্যালরিতে শিক্ষা পাওয়া পুরুষসমাজের প্রাচীনপন্থী শাসন মেনে মেয়েদের বদলে নিজেরা করে নেয়।

মিছেই এরা রাধাকৃষ্ণের ঝড়ের রাতের অভিসারের গান গেয়ে বেড়ায়। হায়! জীবনে তো সে গান প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে না কখনও।

চারদিকে মেয়েদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা ও সব কাজে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ানোর উদাহরণ দেখা সত্ত্বেও গ্রামে এমন কি শহরেও বনেদী রাজপুতরা ঘরে বাইরে নারী ও পুরুষের মধ্যে ডিভিসন অব লেবার একেবারে কড়াক্রান্তিতে ভাগ করে রেখেছে। এটাতেই তাদের মান রক্ষা হয়।

জান কবুল, কিন্তু মান যাবে না।
পথি নারী? নৈব নৈব চ।

সে সব অশাস্ত্রীয় কার্য মেবারী ঘরানা রাজপুত কখনও করে না। করার কথা কল্পনাই করে না।

প্রথম প্রথম গুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুরা রুচিরামকে স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। নিমন্ত্রণ পার্টিতে তিনি আসতে পারলেন না কেন তা জিজ্ঞাসা করে 'হোস্টেস' তার অসুস্থতার কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করতেন। এখন সবাই জানে যে, তিনি স্ত্রী-পুরুষের মিশেলী নিমন্ত্রণের দিনে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তবু নিমন্ত্রণকর্ত্রী একবার তাঁর সন্ধান নেবেন, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত ভাব দেখাবেন। শ্রীমতী মাথুর প্রভৃতি সকলেই সেজন্য সহানুভূতিতে বিগলিত হবেন। এটা এই সমাজে নতুন নয়, আশ্চর্যও নয়।

কিন্তু রুচিরামের কাছেও এটা গা-সহা হয়ে গেছে কি? না, তাঁর নিজের মধ্যে শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য নয়, এমন কি একটু বিদ্রোহও জেগে ওঠে কখনও কখনও?

আর ওই যে গৃহপালিত হরিণী—যাকে অন্তঃপুর দাবানলের মতো ঘিরে রেখেছে ছেলেবেলা থেকে—তার কি খবর? অন্দরের আগল খুলে বেরিয়ে আসবার জন্য তার কাঁকন-পরা হাত দুখানি কি নিশপিশ করে

ওঠে না কখনও?

ঘরে শ্রীমতী রুচিরাম নিশ্চয়ই গৃহিণী। কিন্তু সচিব কি না কে জানে? বাইরের হানাহানির সংসারের তাপে জর্জরিত হয়ে স্বামী যখন ঘরে ফিরে আসেন, তখন শ্রীমতী কি শুধুই গৃহিণী সেজে সামনে আসেন, না সখার মতো সব সুখ-দুঃখের ভাগী হন? সচিবের মতো বুদ্ধি দেন? একজনের চেষ্টাকে আরেক জনের চোখ দিয়ে যাচাই করে দেখে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমিয়ে দেন? বাইরের জগতে নানা ললিতকলার বিকাশ হচ্ছে; তার আভাস নিয়ে কি স্বামী ফিরে আসেন ঘরের প্রিয় শিষ্যাকে তাতে দীক্ষা দিয়ে অন্তত নিজের রুচিকে চরিতার্থ করতে? মনের মানুষকে রঙিন ফানুসের আলোটা দেখতে কি পান তার ফলে? সেই আলো—

সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে?

বিবাহবাসরের পর কি সাজানো শুরু হয়েছে দুজনের মানস আসর? না বাসরশয্যা শুধুই রয়ে গেছে দাম্পত্যশয্যা? ললিত সজ্জায় ময়ূরের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে নি?

অধ্যাপক রুচিরামের আনত নয়নের দিকে তাকিয়ে বার বার সে কথাই মনে হতে লাগল।

আর মনে পড়ল নয়াদিল্লির ময়দানে অন্ধকারে দেখা সেই অজানা রাজকন্যা পদ্মার কথা। বনেদী ঘবানা বিদ্রোহিনী পদ্মাই বা পুরানো সমাজ আর অনড় সংস্কারের সঙ্গে কেমন করে বোঝাপড়া করে নিয়েছে কে জানে?

কিন্তু এদিকে ওই যে ময়ূরের নাচের কথা হচ্ছিল।

গুপ্ত বললেন, ময়ূর আমাদের এখানে নাচের মধ্যে অনেক প্রেরণা দিয়েছে। কাজেই আপনি যে সকালে ময়ূরের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নাচ যদি প্রকৃতির মাঝখান থেকে উঠে আসে তাহলেই স্বাভাবিক হয়। দববারে যে নাচ দেখেছিলেন তা হচ্ছে কৃত্রিম শিক্ষাব ফল। সিনথেটিক নাচ—

বললাম যে, অতশত আমি বুঝি না। শুধু যেটা চোখে ভালো লাগবে, কানে যা ভালো বাজবে, মনে যেটা ধ্বনি তুলবে সেটাকেই ভালো নাচ বলে মনে করতে প্রস্তুত আছি। ময়ূরীকে কি কেউ ভারতেব নাট্যশাস্ত্র শিখিয়েছে? কিন্তু ময়ূর যখন নিজের মনের খুশিকে পেখম মেলে ঠিকমতো ছড়িয়ে দিতে পারল, তখনই ময়ূরী নিজে যেচে সাড়া দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে নেচে গেল।

মহাজনি-কন্যা বললেন,—তা আপনি যখন দেশ বেড়াতে এসেছেন, তখন নতুন যা দেখবেন, তাই ভালো লাগার কথা। তা না হলে ট্যুরিস্ট কেন? কাজেই ময়ূরীর মতো আপনার মন নিশ্চয়ই সাড়া দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছে। পোশাকী রাজপুত নাচও আপনার কম ভালো লাগবে না।

আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় হল না যখন আমার শ্রীমতীও বিপক্ষ দলে যোগ দিলেন।

তিনি বলে বসলেন,—ওর কথা আর বলবেন না। উনি রাজস্থানে আসাতক হন্যে হয়ে কালচার সন্ধান করছেন।

টোডরমলের কটা ছিল হাতি,
শাজাহানের ছিল কটা নাতি।

এসব দামী ও দরকারি খবর নিয়েও সন্তুষ্ট নন। এখন আবার প্রত্যেকটা ভাঙা পাথরের টুকরোর মধ্যে রাজপুত আর্ট, মরচে-ধরা তলোয়ারের মধ্যে তার বয়স, টোল-খাওয়া গণ্ডারের চামড়ার ছালের মধ্যে হলদিঘাটের ইতিহাস—এসব বহুমূল্য তথ্য খুঁজতে শুরু করেছেন।

নতুন একটা আক্রমণ এল অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। একেবারে মোক্ষম মার। রুচিরাম মাথাটি মেঝের দিকে নামিয়ে রেখেই কথা পাড়লেন,—তা আপনি ময়ূরের মধ্যে নাচের ইতিহাস যখন পেয়েছেন, ময়ূরপঙ্খী পোশাক-পরা নর্তকীদের মধ্যে সে নাচের বিকাশ আপনিই খুঁজে বের করুন। না হলে রাজোয়ারার প্রতি একটি ঘোর অবিচার করে যাবেন।

বিশেষ করুণ একটা সুর গলায় আনবার চেষ্টা করে উত্তর দিলাম—কিন্তু আমার প্রতিই যে অবিচার হয়ে যাচ্ছে এবার।

সমস্বরে প্রতিবাদ উঠল সব দিক থেকে। যেন সপ্তরথীর ব্যূহে ধরা পড়েছে অভিমন্যু। সবাই আমার পা টানার অর্থাৎ 'লেগ্ পুল' করবার চেষ্টায় নাচ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলেন।

সত্যিই তো। ওরা শুধু নাচের তথ্যই জানতে চেয়েছেন; নিজেকেই যে নেচে দেখাতে হবে এ হেন কথা তো বলেন নি।

অপরাধ কবুল করলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর্জি পেশ করলাম যে রাজোয়ারায় আমরা অতিথি। কোথায় খাঁটি নাচ দেখতে পাব তার সন্ধান দেবার, এমনকি দরকার হলে নিজেরাই নেচে দেখিয়ে দেবার ভার হচ্ছে রাজস্থানীদের। এতজন রাজস্থানী যখন চারদিকে বসে আছেন তখন অবশ্যই আসল নাচ না দেখে জয়পুর থেকে এবার অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ফিরে যেতে হবে না।

শ্রীমতী মহাজনি চট করে এই ভীষণ দায়িত্বের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, আমরাও এ জায়গায় নতুন লোক। গুপ্তজী, মাথুরজী এঁরা নিশ্চয়ই অতিথি সৎকারে পেছ-পা হবেন না। আমরাও দেখতে চাই আসল জয়পুরী নাচ।

আমার ধনুক থেকে আর একটি শর নিক্ষেপ করলাম।

বললাম যে, কথক নাচ নাকি জয়পুরের খুব নাম করা নাচ অথচ ঠিক কোথায় যে খাঁটি কথক দেখতে পাওয়া যাবে তার সন্ধান পেলাম না। গুপ্তজী যখন জয়পুরীয়া তাঁকেই এ কাজটি করে দিতে হবে।

রাজপুত সোয়ার যেন রেকাবিতে পা না দিয়েই ঘোড়া চড়ে বসল। তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি বললেন—ইউরেকা। আমি পেয়েছি। গাঙ্গোরী দরওয়াজার কাছে গলি দিয়ে যেতে যেতে একদিন আমি কথকের বোল শুনতে পেয়েছিলাম। ময়ূরের আওয়াজের মতো। ময়ূর নৃত্যই হবে বোধ হয়।

মহা উৎসাহে উঠে পড়লাম। চললাম দুজনে কথক নৃত্যের সন্ধানে। মন তখন ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে।

বারো

মাথার উপর লকলকে ছোরাটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল তবল্‌চী।

কলিজার মধ্যে প্রাণপাখি আমার ততক্ষণে ছটফটানি থামিয়ে ছোরা খাবার জন্য লুটিয়ে পড়েছে।

হীরাবাঈয়ের মুখ থেকে একটু আধো চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। নাচের আসর জমে ওঠার পর ঝগড়াঝাঁটি মন কষাকষি এরকম অনেক কিছু হয়। কিন্তু চোখের সামনে মানুষ খুন হয়ে যাবে, তা যে কখনও ভাবতে পারে নি।

হীরাবাঈয়ের ঘরে তিন দিন লুকিয়ে রইলেন মাস্টারজী সোহনলাল। নিচে নেমে এলেই ওই ছোরা তাঁর বুকের মধ্যে বসিয়ে দেবে, এমন একটা ভীষণ শাসানি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল তবল্‌চী সে রাত্রিতে। শুধু ধুতি ও বাণ্ডী (তুলোভরা ছিটের গরম হাফ-হাতা কোট) পরে বাঈজীর আসরে নাচ দেখাতে এসেছিলেন সোহনলাল। তারপর বাঈজীর শাড়ি পরে তিন-তিনটে রাত সেখানে কাটিয়ে দিতে হল।

এই দুর্ঘটনা অর্থাৎ মিস-অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি বলতে বলতে সোহনলালের মনে কোনও ভয়ের স্মৃতি ফুটে উঠল না। যে স্মৃতি তাঁর মনে জাগল তা হচ্ছে বেপরোয়া বাহাদুরি। তাঁর জীবনে নাকি এমন বাহাদুরির ব্যাপার আর কখনও হয় নি। এমন নাচই মাস্টারজী নেচেছিলেন সে রাতে যে, তার সঙ্গে ঠিকমতো তাল দিতে না পেরে মরিয়া হয়ে তবল্‌চী তাঁকে খুন করে ফেলবে বলে শাসিয়েছিল।

বলতে গেলে—শাসিয়ে দিতে একরকম বাধ্যই হয়েছিল। নাচ ও তবলার পাল্লা আমরা বাইরে থেকে খুব উপভোগ করি। কিন্তু তার মধ্যেকার প্রসন্ন রেষারেষিতে ওস্তাদদের মধ্যে নাকি এমন ব্যাপারই হয়। মারাত্মক নাচ হবে সেটা তাহলে।

কন্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলতে খেলতে স্বামী-স্ত্রীতে মুখ দেখাদেখি বন্ধের ব্যাপার চোখে দেখেছি। বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত আদালতে পেশ হয়েছে, এমন কথাও শুনেছি। কিন্তু নাচের আসরে এমন খুন-খারাপির ব্যাপার একেবারে আশ্চর্য।

মাস্টারজীর অল্প বয়সে এ ব্যাপারটি হয়েছিল।

লম্বা একহারা হাড়ে-মাসে গড়া দেহ। ঘন শ্যামবর্ণের ভিতর দিয়ে টিপিক্যাল রাজপুত গড়ন ফুটে উঠেছে। সে শরীর যেন কথকের জন্যই তৈরি। রাধাকৃষ্ণের লাস্য বা শিবের তাণ্ডব নাচ ও লড়াইয়ের সময়ের নৃমুণ্ডমালিনী নাচ—দুয়েতেই সমানভাবে পটু। হাতের পায়ের আঙুল দেখে বুঝতে দেরি হল না যে, সেগুলি

দিয়ে নাট্যশাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা দুইয়েরই সাধনা সমানভাবে করা সম্ভব।

পাতলা মলমলের পাঞ্জাবির আস্তিন তুলে সেই লম্বা কলার মতো আঙুলের মুঠি দিয়ে নমস্কার করে গাঙ্গোরী দরওয়াজার মাস্টারজী শতরঞ্জিতে আরাম করে বসতে অনুরোধ করলেন। শতরঞ্জিকে পশ্চিমে দর্‌রি বলে। কেন তা জানি না, কারণ রাজস্থানে যেসব শতরঞ্জি তৈরি হয়, তা সুন্দর রঙিন নক্‌শার জন্য এই নামটাই খুব মানানসই। দর্‌রি বললে কিছুই বলা হয় না।

অবশ্য নামকরণে বাঙালি এখনও হিন্দুস্থানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। জুতোর দোকানের নাম শ্রীচরণেষু, খাবারের দোকানের নাম মিষ্টিমুখ, আর মুদীখানার নাম পণ্যশ্রী, এ শুধু বাঙলা ভাষাতেই সম্ভব।

বাঙলার মাটিতে ধানক্ষেতের শিষে কবিতা গজায়। গাঙের উপর দিয়ে ভেসে-আসা বাতাসের স্নেহস্পর্শ তাতে একটু হাত বুলিয়ে গেলে দুলে দুলে সে ধানের সারির ঢেউ অপ্সরাদের নাচের ভঙ্গি দেখিয়ে যায়। দুটো দোয়েল পাপিয়া হঠাৎ কোথা থেকে গান গেয়ে উঠে মনে করিয়ে দেয় যে, গাঁখানার নাম মধুবাণী বা বনস্থলী বা নয়নজোড়। কাজেই যদিও একটা গালিচা এদেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে নাম পেল দর্‌রি, রসকষহীন ব্যবসায়ীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে সে জিনিস যখন বাঙালি গৃহিণীর মিঠে হাতে পৌঁছাল তখন তার নতুন নামকরণ হল শতরঞ্জি।

শেক্‌সপীয়র অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন যে, নামে কি আছে? আমরা কিন্তু মনোহরা ও রসকদম্ব অতি মোলায়েমভাবে চাখতে চাখতে পয়োধি নামের দইটুকুর দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিহি গলায় উত্তর দিই যে, নামেই তো সব। সুঠাম ক্ষীণ বৃন্তের উপর শিথিল সাজে দাঁড়ানো চামেলিকে কি রোডোডেনড্রন বলে ডাকলে মানাবে? না, তার গন্ধটুকুর কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে?

ভেবে দেখুন, পাশাপাশি দুটো দোকান দাঁড়িয়ে আছে। একটিতে হরেক রকমের ফিউচারিস্ট আর্টের নমুনা দেখিয়ে (দুষ্ট লোকে বলে, দোকানের ভবিষ্যৎ নেই বলে) সাইনবোর্ড টাঙানো। নাম—মনোহারী। অপরটিতে সোজা কালো রঙের মোটা অক্ষরে লেখা—শপ অব হাকিমৎ রায়। আর তার নিচে গোটা গোটা অক্ষরে যোগ করা আছে—ব্রাদার ফেইলড্ বি এ।

আপনি এখন কোন্ দোকানে পদধূলি দেবেন বলুন তো? এই এলোমেলো করে সাজানো কম মালের ও খদ্দেরের প্রতি আরও কম মনোযোগ দিতে অভ্যস্ত কলকাত্তাই বিপণিতে? না, এই ঝকমক করা মাল ও মোলায়েম অভ্যর্থনার বোঝাই পেশোয়ারী দোকানে? বলা বাহুল্য, প্রথম দর্শনে প্রেম আপনার 'মনোহারী'র প্রতিই গজাবে।

তবু প্রশ্ন করলাম সোহনলালকে। এত নাম যে নাচের, তাকে আপনারা কথক বলেন কেন? পেশোয়ারেরও ওপারে ফ্রন্টিয়ার আর আফগানিস্থানের মাঝখানে যেসব পাঠান উপজাতি থাকে, তাদের মধ্যে খটক বলে একটা নাচের চলন আছে। তার মধ্যে বলতে গেলে রৌদ্ররসই একমাত্র নজরে পড়বার মতো রস আর খটক নাম না দিয়ে খটাখটি নাম দিলেও বেমানান হয় না। তরোয়াল এমনই কারদানি করে নাচে যে, ওই লম্বা সুগঠিত মানুষগুলির অঙ্গভঙ্গির বদলে তাদের তরোয়ালের রাগরঙ্গই দেখতে হয় সমস্তটা সময়।

না। কথক সেরকম খটাখটির ব্যাপার কিছু নয়। যদিও এতে পরিশ্রম আর প্রাণশক্তি এত লাগে যে আমাদের পূর্ব্বদেশের নরম শরম 'চরণে জড়িত লজ্জা' টাইপের নাচে যারা অভ্যস্ত, কথক নাচা তাদের কর্ম নয়।

সুচারু চরণক্ষেপের ছন্দে একটি কথা অর্থাৎ কাহিনিকে প্রকাশ করা হয় বলে এই নাচের নাম কথক। পায়ের এই কারিকুরির নাম হচ্ছে বোল। যে এই কথা নাচের মধ্য দিয়ে দেখায়—থুড়ি বাঙালি আমি, আমার লেখা উচিত রূপায়িত করে—তাকেও বলে কথক।

প্রধানত পায়ের কাজের মধ্যে একটা কথাকে ফুটিয়ে তোলা নিশ্চয়ই খুব শক্ত কাজ। বিশেষ করে যখন একই লোক শুধু গতির ছন্দে রাধা ও কৃষ্ণের বা শিব ও পার্বতীর নাচ একই সঙ্গে রূপায়িত করে। এমনভাবে তা করতে হবে যে দর্শকের বুঝতে একটুও বাকি থাকবে না যে, কে কখন নাচছে। সেই গতির ছন্দে শুধু ভাব নয়, ভাষাও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ভঙ্গি আর মুদ্রার মাধ্যমে একটা কথা ফুটিয়ে তোলা বরং সহজ হত। কিন্তু প্রধানত সাবলীল চরণক্ষেপের কারিকুরিতে কি করে একটা কথা ফুটিয়ে তোলা যায়?

ভারত-নাট্যমে রূপক ও ভঙ্গি দিয়ে নাচের বিষয়বস্তু ফোটানো হয়। কথাকলি প্রধানত প্রকাশ করা হয় হাতের মুদ্রা আর মুখের ভঙ্গি দিয়ে। মণিপুরী হচ্ছে সমস্ত দেহের ছন্দের বিকাশ।

সোহনলাল বললেন—আপনিই বিচার করে.দেখুন এবার, কোন্ নাচের ভিতর দিয়ে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা সবচেয়ে শক্ত, সাধনাসাপেক্ষ?

শুধু তাই নয়। সোহনলালের মতে সব ভারতীয় নাচেরই আদি কথা হচ্ছে কথকে। কারণ এই নাচের মধ্যে গতির ছন্দের শিক্ষা পাকা করে নেওয়ার পরই অন্যান্য সব নাচ নিখুঁতভাবে শেখা আর ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। ঠিক যেমন ক্ল্যাসিক্যাল গানের জন্য গলা তৈরি করে নেওয়ার পরই আধুনিক গান গাওয়া ভালো হয়।

তাঁর মতে উদয়শঙ্করের বিশ্ববিজয়ী নাচের উৎকৃষ্টতার উৎসও হচ্ছে এখানে। রাজস্থানে জন্ম বলে তাঁর প্রতি রাজস্থানীদের আকর্ষণ ও তাঁর জন্য গৌরববোধ বাঙালির চেয়ে বোধ হয় কম নয়।

উদয়শঙ্করের পায়ের নূপুর ছিল রাজস্থানী জাঁকজমকের ছন্দে বাঁধা। কিন্তু মাথা ছিল বাঙলাদেশের রিনায়সেন্সের (কৃষ্টির নবজাগরণের) প্রসাদে পুষ্ট আর চোখ ছিল সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের রুচি ও রূপসাধনার উপর।

বিশ্ব জুড়ে ফুলের তোড়া আর প্রশংসার মালা উদয়শঙ্কর আহরণ করেছিলেন নৃত্যভারতীর জন্য। তাঁর প্রথম গোড়াপত্তন হয়েছিল রাজস্থানী কথক নৃত্যে। তিনি যে এই কথক নাচের শাস্ত্রের শেষ পর্যন্ত দেখেন নি, এই ভিত্তির উপরে নানা ঢঙের নানা দেশের নৃত্য পরিচালনার পাঁচমিশেলী ইমারত গড়েছিলেন, সেজন্য এখানকার শিল্পের পিউরিস্টরা অভিযোগ করে।

কিন্তু আমি পাণ্ডাও নই, পণ্ডিতও নই। কাজেই স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রতিভা শাস্ত্রের কোন্‌খানে বা কতটুকু বদলিয়েছে বা অস্বীকার করেছে, তার বিচারে আমাব কি দরকার? একটা সুন্দর হীরের গহনাকে সিন্দুকে সযত্নে অক্ষুণ্ণভাবে রাখা বেশি বাহাদুরি, না তাতে নতুন কারুকার্য করে নতুন রূপ দেওয়াতেই খাঁটি জহুরির পরিচয় সে তর্ক তুললাম না।

নাচের কিছু বুঝি না, জানি না সে কথা সত্য। তবু মনে হয় যে, কথকরা দিয়েছেন ব্যাকরণ আর উদয়শঙ্কর তৈরি করেছেন কাব্য। এ দুইয়ে তো তফাত থাকবেই।

মনে মনে বললাম যে, উদয়শঙ্কর যা করেছেন তাকে বলা যায়, সুন্দরভাবে ভোল বদলানো। কিন্তু ভোল বদলানো ও ভুল বা ভেজাল তো এক জিনিস নয়।

একটা হচ্ছে সৃষ্টি। অপরটা হচ্ছে নষ্ট করা। উদয়শঙ্কর কি করেছিলেন তার প্রমাণ দিয়েছে সারা পৃথিবীর করতালি।

কিন্তু সে করতালি ও প্রশংসার ঝাঁপতাল থেকে দূরে এক কোণে অনাড়ম্বরভাবে রয়েছে এদেশের গুণীরা, যারা কথক শিল্পকে এখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখতে চায়। স্টেজের ফুটলাইট তাদের চোখ ধাঁধায় না। সিনেমার স্পট লাইটের সামনে আসতে তাদের কোনও ব্যাকুলতা নেই। কিন্তু গুণী সমঝদারদের এনকোর-ধ্বনি এখনো তাদের বার বার দর্শকদের সামনে এনে দাঁড় করায়।

সোহনলাল সেই মুষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে একজন। সংখ্যা এদের ক্রমশই কমে আসছে। কিন্তু কোনও সংশয় নেই যে, কথক শিল্পের ভবিষ্যৎ এদেরই হাতে। আর দেশও সে কথা ক্রমশ স্বীকার করছে।

উত্তর ভারতে তিনটি কেন্দ্রে কথক নাচের বিস্তার হয়েছিল, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি আর জয়পুর। পাঠককে বলে দিতে হবে না যে, লক্ষ্ণৌ-ই-কথক আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সবচেয়ে বেশি মিঠেও বটে। লক্ষ্ণৌ-এ সব কিছুই মিষ্টি হয়ে ওঠে। এখানকার উর্দু বড় ভদ্র, আদব-কায়দা খুব মোলায়েম, শিষ্টাচার অতি সরস আর প্রিয়ার দিঠি নাকি সবচেয়ে মিঠে।

পরখ করে দেখবার জন্য পাঠকরা আছেন।

মিহি ও মিঠের সাধনায় লক্ষ্ণৌ এত এগিয়ে গিয়েছিল যে, এক বিখ্যাত উর্দু কবি নাশিক তো আবেশে দিশেহারা হয়ে প্রিয়াকে উদ্দেশ করে লিখে ফেলেন যে—

দে দোপাট্টা তু আপনা মলমল কা।
না তবা হুঁ কফ্ন্ ভি হো হাল্কা।।

অর্থাৎ আমি এতই অবলা হয়ে গেছি যে, তোমার মলমলের হালকা দোপাট্টার (উড়ানি) চেয়ে ভারী কিছু আমার কফিনের উপর সইবে না।

গানবাজনার চর্চা লক্ষ্ণৌতে যত বেশি ও যত ভক্তিভরে অর্থাৎ রিলিজিয়াসলি করা হয়েছে তত সারা ভারতে আর কোথাও হয় নি। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব গিয়েছে একশ বছরের উপর হল; কিন্তু নবাবী মেজাজ যায় নি। বিলাস গিয়েছে কিন্তু বিলাসী মন যায় নি। কাজেই শিল্প-রসিকরা শিল্পকে জিইয়ে রেখেছে সযত্নে পুরুষানুক্রমে। একজনের পর একজন বড় কথকের ওস্তাদ লক্ষ্ণৌ-এ এই নাচকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন।

প্রথমে রাধা-কৃষ্ণ শিব-পার্বতী বা সীতা-রামের উপাসনাকে রূপ দিত এর নাচ। হ্যাভলক্ এলিস্ বলেছেন যে, দার্শনিকের চিন্তা পর্যন্ত ছন্দে ছন্দে নেচে চলে। শিশু যে ছন্দে মনের আনন্দে নেচে চলে তা কোন্ মা না লক্ষ করেছে? ভক্ত যে ভাবের আতিশয্যে অমনভাবেই নেচে উঠবে তা আশ্চর্য নয়। মনের আবেগ দেহের আবেশে দেবতার আরাধনায় ফুটে উঠল।

আমাদের দেশে বৈরাগী ও বাউল হাততালি দিয়ে একতারা বাজিয়ে খঞ্জনীর ঝঙ্কারে নেচে নেচে নামকীর্তন করে সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায়। উত্তর ভারতেও ভাবের বন্যা অমনভাবেই বয়ে গিয়ে কথক নাচের সৃষ্টি করেছিল কিন্তু কালক্রমে দরবারে আর হারেমে গিয়ে ঢুকল এই নাচ। ভক্তিতে যখন ভাটা পড়ল, সৌভাগ্যক্রমে আসক্তিই তখন এই নাচের জোয়ার বাঁচিয়ে রাখল।

তবু বিন্দাদীন নামে একজন গরিব ভক্ত দরবারে আশ্রয় না নিয়ে শুধু কৃষণ্ ভগবানের শরণ নিয়ে সারা জীবন তাঁরই জন্য নেচে গিয়েছেন। সে সব নাচের অসংখ্য ঠুংরিব বোল বচনা করে গিয়েছেন। সেইগুলিই বোধ হয় কথকের সবচেয়ে বড় আদরের ধন। লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন মহারাজের নাম এখনও সব নৃত্যরসিকের মুখে চলে আসছে।

রাজদরবারের দৌলতেই জয়পুরের কথক নাচ বেঁচে ছিল এবং বেশ ভালোভাবেই বেঁচে ছিল। আর উত্তর প্রদেশে অচ্ছন মহারাজ যেমন এই নাচে একেশ্বর সম্রাটের মতো নাম করেছিলেন জিয়ালালও জয়পুরে তেমনি সম্মান পেয়েছেন।

এই জিয়ালালেরই সাক্ষাৎ ছাত্র সোহনলাল।

কল্পনা করে নেওয়া যাক্ একটা কথক নাচের আসর। চুড়িদার চুস্ত পায়জামা পরনে, মাথায় টুপি ও গায়ে অঙ্গরাখা পরে নামল কথক। সারেঙ্গী ও তবলা চলবে সঙ্গে সঙ্গত করে। এক একটা খণ্ডে ভাগ করা আছে তবলার বোল আর কথকের কথা। সঙ্গত শুরু হয়ে গিয়েছে, কথক এসে দাঁড়িয়েছে আসরের মাঝখানে। ঝক্‌মক্ করছে তার পোশাক। ঝম্‌ঝম্ করছে তার পায়ের নূপুর তবলার তালে তালে। সবাই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি।

কথক প্রথমে তার বোলটি আবৃত্তি করবে। হয়তো খানিকটা গানের কলিও আবৃত্তি করবে। তারপর শুরু হবে নাচ। শিবের তাণ্ডব দেখানো হচ্ছে এখন (মূল সংস্কৃত স্তোত্র ভেঙে নিয়েছে কথক)

জটাট্ ভিগ্ গলে জ্বলে
প্রবাহ পাত তস্থলে।
গলে বিলম্বি লম্ব তুঙ্গ
ভুজঙ্গ মুণ্ড মালিকা।।
ভুজঙ্গ মুণ্ড মালিকা।।

ডমড্ ডমড্ ডমট্ ডমট্
নিনাদ বৃট ব্রিমমু
চিকার্‌ তাণ্ড তাণ্ডব
শিব শিব তুম্‌হে।

গুরুজী জিয়ালালের কথা বলতে বলতে সোহনলাল একেবারে আত্মহারা। এত প্রহার ও এত আদর নাকি কোনও গুরু কখনও দেয় নি। প্রহারের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে সব বিদ্যা শিখিয়েছে নিজের লাভের কথা না ভেবে।

রাজপুত এমনভাবেই উজাড় করে ঢেলে দেয়।

অবশ্য যোগ্য পাত্র না হলে দেয় না।

একবার উড়িষ্যার একজন রাজা জিয়ালালকে নিজের দরবারে এনে রাখেন কিছুদিন। রাজাটির নিজেরও কথকে খুব ভালো হাত ছিল এবং অচ্ছন মহারাজ প্রভৃতি বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জিয়ালাল খুব আরামে সেখান রইলেন। রোজ নাকি দু'বেলায় দশ সের দুধ জ্বাল দিয়ে রাবড়ি খেতেন ও এক প্রিয় শিষ্যকে খাওয়াতেন। রাবড়ির প্রেরণায় না শিক্ষার গুণে বলা শক্ত, কিন্তু ওই শিষ্য, কার্তিক ছিল তার নাম, অসম্ভব ভালোভাবে নাচ শিখে নিল।—থা—তেই—ই—তা, এটুকু বোলের মধ্যেই সে নাকি সাতাশ চক্কর দিতে পারত।

কথকের মূল গোপন তথ্য হচ্ছে তার বোলে। ওস্তাদের 'তারিকা' অর্থাৎ বাতানেকা ঢঙ হচ্ছে তার জীয়নকাঠি মরণকাঠি। অন্য লোকের কাছ থেকে সযত্নে গোপন রাখতে হলে ওস্তাদ এমনভাবে নিজে তবলা বাজাবে যে তার সঙ্গে নাচিয়ে খুব ভাল নিখুঁতভাবে নাচলেও গৎ ধরে ফেলতে পারবে না। জিয়ালাল সেই গোপন গৎও কার্তিককে শিখিয়েছিলেন।

শাগরেদের বাহাদুরিতে ওস্তাদের গৌরব। দরবারের সৌষ্ঠবে রাজার। কাজেই একটি মুলতানী গাই, একটা গোটা গ্রাম ও এক থালা টাকা প্যালা পেয়ে জিয়ালালের মনের সুখ অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। নতুন নতুন গৎ সৃষ্টিতে নতুন গতের রেওয়াজে তাঁর দিন বর্ষার নদীর মতো দু কূল ছাপিয়ে সুখে ভরে উঠতে লাগল।

এমন সময় রাজাসাহেব পলিটিক্যাল এজেন্টকে নিজের রাজ্যে নিমন্ত্রণ করলেন। সরকারি সেক্রেটারিয়েটে পি. এ. কথার অর্থ হচ্ছে পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। সে হচ্ছে কৃতী কর্মচারীর কর্ণধার। অফিসে টেবিলে স্টেনোগ্রাফার, অফিস আলমারির পাহারাদার এবং অন্যান্য সর্বকর্মে সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

কিন্তু ব্রিটিশ আমলের পলিটিক্যাল দপ্তরে পি. এ. বলতে বোঝাত পলিটিক্যাল এজেন্ট। এক একটা রাজ্যগোষ্ঠীর মধ্যে একজন এজেন্ট। একবারে খাঁটি সাহেব; হয় আই সি.এস., না হয় আর্মি অফিসার। ব্যবহার যখন সিভিল মন তখনও মিলিটারি। একেবারে সপ্তম সুরে বাঁধা। কারণ রাজন্যদের একটুও বেসুরো চেঁচাতে দেওয়া চলতে পারে না।

দেশের মানচিত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির এলাকাগুলির হলদে রঙের ঠিক পাশে পাশেই লাল রঙের এলাকাগুলিতে জাতীয় কংগ্রেসের দাবি একেবারে বিপদের লাল নিশান উড়িয়ে রেখেছিল। প্রায় দশ বছর পরেই এক-একটা আন্দোলন শুরু হত, আর দেশে ব্রিটিশ বনিয়াদের নিচে এক-একটা ভূমিকম্পের ধাক্কা এসে লাগত।

কিন্তু সে ধাক্কা থেকে অন্তত হলদে টুকরোগুলি যেন রক্ষা পায়, সেজন্য পলিটিক্যাল এজেন্টরা অত্যন্ত যত্নবান থাকতেন। শ্বেত জাতির পবিত্র গচ্ছিত ধন কি খদ্দরধারীদের অভদ্র চিৎকারে ফুৎকারের মতো উড়ে যেতে দেওয়া যায়?

তাই এজেন্টরা বিশেষ হুঁশিয়ার। আর এই মধ্যযুগের উপযোগী সীমাহীন ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার দরাজ হাতে তাদের দিয়ে এসেছিল। হীরা-পান্না-জড়িত পাগড়িটি সিংহাসনের উপর নিশ্চিতভাবে শোভা পাওয়া নির্ভর করত সম্পূর্ণ পি.এ.-র ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর। তারই অঙ্গুলি হেলনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হত ব্রিটিশ সিংহের লাঙ্গুলের প্রীতি বা বিরক্তি।

এ যে একেবারে বাজার রাজা। যদিও ডেমোক্রাটিক ব্রিটেনের মার্জিত শিক্ষা ও ভদ্রতা এজেন্টকে ঘিরে রাখত, তারই মধ্যে লুকানো থাকত ধ্যানমগ্ন মহাদেবের প্রসন্ন কপালে প্রসন্ন আগুনের শিখা। দরকার মতো তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠতে পারত যে কোনও সময়।

'মা বাপ' গভর্নমেন্টের এই প্রতিনিধি কোনও স্টেটে এলে সমারোহের কোনও সীমা থাকত না। এই রাজ-স্টেটেও উৎসব লেগে রইল কদিন ধরে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। ভোজ, শিকার, দরবার সবই হল যথারীতি।

শেষ দিন ছিল নাচ। রাজাসাহেব বিশেষ উদারতা দেখিয়ে জিয়ালালকে এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিয়ালালের জীবনে অনেক বুক ফুলে ওঠার মতো ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এমনটি আর কখনও হয় নি।

কার্তিকের নাচে ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। এজেন্ট সাহেবের মেমসাহেব সেই সুদর্শন কিশোরকে কাছে ডেকে এনে বিশেষ সাধুবাদ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কৃতার্থ-করা হাসি হেসে রাজা সাহেবকে বললেন—আপনি তো, ইয়োর হাইনেস, বিশেষ গুণের সমঝদার। একে এই অদ্ভুত নাচের শিক্ষা দিয়েছে কে?

স্বয়ং ব্রহ্মা যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে বলতেন—বৎস, যা বর চাও তাই দেব তাহলেও এত আনন্দের কারণ ঘটত না। আর এ তো অদেখা স্বর্গের অজানা ব্রহ্মা ঠাকুর নয়, স্বয়ং পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেবের মেমসাহেব।

আহ্লাদে ডগমগতনু হয়ে নৃত্যরসিক রাজাসাহেব বাটলারদেব ইঙ্গিত করলেন আরও শ্যাম্পেন আনতে। মনটা হয়ে গেছে হালকা, উড়ছে সপ্তম স্বর্গে। এখন কি, শ্যাম্পেন, টলটলে সোনালি শ্যাম্পেন ছাড়া মানায়?

জিয়ালালের শিষ্যের মুখে শম্পানীর এই নাম শুনে বুঝতে ভুল হল না যে, যে মদ এখন নাচের আসরে পরিবেশন করা হয়েছিল তা শ্যাম্পেন ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু মনটা একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল। শিরাজী হাতে কি এসে হাজির হল বেহেশ্‌তের হুরীরা বা ইহকালের সাকীরা? সেই শিরাজী, যার সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম লিখেছেন :—

মে লাল মুজা বস্‌ত ও সুরাহি কান্ অস্ত।
জেগাব্ অস্ত্ পিয়ালা ও শরাবাস জান্ অস্ত॥
আন্ জানে বালাভরিন্ কে জামায় খানদান্ অস্ত্
আশক-ই-অস্ত্ কে খুন দিলদারে-এ উ পিনহাক্ অস্ত্॥

ফারসী কবিতা যেন নূপুরের শিঞ্জনের মতো ঝঙ্কার তোলে মনের মধ্যে। শুনতে শুনতে মনের তারে দিলরুবার তারের মতো আনন্দে বেদনায় টনটন করে মূর্ছনা জেগে ওঠে। মনে মনে বাংলায় তার একটা অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিলাম। না করে উপায় ছিল না, এমনই মোহময় সে রুবাই!

মদিরা-গলানো চুনি:
পেয়ালা তাহার খনি;
পানপাত্র যেন দেহ, পরান পানীয়।
যে স্ফটিক পেয়ালায়
উচ্ছ্বসিত মদিরায়
লুকানো হৃদয়-রক্ত; তারে অশ্রু মেনে নিয়ো।

আমায় অন্যমনস্ক দেখে সোহনলাল বললেন—কি সাহেব, বিশ্বাস করতে পারছেন না তো কি বলতে যাচ্ছি এবার?

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম,—না, না। তা কেন হতে যাবে? বলুন আপনার গুরুজীর গল্প।

স্ফটিকাধারে ফরাসী সুরা টলমল করে উঠল অশ্রুবিন্দুর মত। রাজাসাহেব তাতে মন ডুবিয়ে যেন স্বগতভাবে বলে ফেললেন—আমিই এই নাচের গৎ তৈরি করে কার্তিককে শিখিয়েছি।

কাছেই মাথায় শিরোপা পরে বসেছিলেন জিয়ালাল। কান তাঁর লাল হয়ে গেল। আর মন আগ্নেয়গিরির আগুন-জ্বালা উদ্গার করা শেষ হয়ে গেলে যে বিবর্ণ লাভা পড়ে থাকে তার মত। ধীরে ধীরে শিরোপা নামিয়ে তিনি অলক্ষিতে আসর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায়, তা কেউ জানতে পারল না।

ততক্ষণে পেয়ালায় আরও শ্যাম্পেন ঢালা হয়েছে। হায়, বেদনায় যে ভরে গিয়েছে আরেক জনের পেয়ালা সে কথা ভাববার বা বুঝবার তাদের সময় কোথায়?

ইংরেজিতে বলে 'অন উইথ দি মিউজিক'—সংগীত চালিয়ে যাও। কারণ সেইটুকুই সত্য। জীবনের সংগীত—যাতে হাসি-কান্নার চুনী-পান্না সমানভাবেই জড়ানো আছে।

জিয়ালাল পরে আবার নতুন করে নাচের মহড়া দিতে লাগলেন। এবার কার্তিকের চেয়ে আরও বড় শাগরেদ বানাতে হবে এবং এবার আর কিশোর নয়, কিশোরী হবে তাঁর নাচের আধার। লাস্যে, হাস্যে, যৌবন-সুষমায় সেই কিশোরীর নাচ নদীর তরঙ্গের উপর লাবণ্যের ফেনার মতো যেন ভেসে ভেসে যায়। তুলনায় যেন কার্তিককে মনে হয় ঢেউয়ের নিচের নিশ্চল জলরাশির মত। তাঁর নতুন সৃষ্টি জয়কুমারী কার্তিককে ময়ূরহারা করে ছেড়ে দেবে এই হল তাঁর পণ।

ললিতকলাকে যে একবার ভালোবেসেছে সে কখনও তাকে ছাড়তে পারে না। মানুষের প্রেমে আদি আছে, অন্ত আছে। শিল্পীর প্রেমে শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। তার হৃদয় ক্ষত হয়, ক্ষতিতে ভরে যায়, আহত হয়, কিন্তু হত হয় না। ওই আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রেমিক কবি ওমর খৈয়ামেরই মতো—

এ ভয় ববন্দ দিলকে দার উসোজি নিশ্‌ত্‌।
সুদ অজ্ দেহে মেহের-এ দিল ফারোজে নিশ্‌ত্‌॥
রোজে কে তু বে ইশ্‌ক বসর্ খ্যায় বুরুদ্।
জায়তার্ আজ্ আন্ রোজত্‌রা রোজে নিশ্‌ত্‌॥

মিছে সে হৃদয় যাতে নেই ভালোবাসা,
খুশিতে রয় না ভরে বাসনার বাসা;
হৃদয়ের প্রেম বিনে
কাটাইবে যেই দিনে
হাহাকারে রয় ঘিরে সে দিনেব আশা।

তাই জিয়ালাল আবার নবীন উৎসাহে নতুন নতুন নাচেব গৎ ঠিক করতে লাগলেন।

কিন্তু হায! হৃদয় তার ভরল না।

জয়পুরে বর্ষা একটা বিশেষ সমারোহের ব্যাপাব। কারণ বৃষ্টি হয় বছরে মাত্র কয়েক হাজার ফোঁটা। অথচ চাবিদিকে ঘিরে বেখেছে ছোটছোট লতাগুল্মে-ভরা পাহাড়ের সারি—যারা বর্ষাব জল পেলে ওই ময়ূরেব মতই পেখম মেলে নবশ্যাম শোভায় সেজে নেচে উঠতে চায়। তাই জিয়ালাল একবার ঝুলন পূর্ণিমায নতুন নাচেব আসব পাতবার জন্যে বর্ষার বোল তৈরি কবতে লাগলেন। গোবিন্দজীর ভক্তদেব শহবে ঝুলনেব নাচ হবে।

তিনি বচনা কবলেন . —

উমণ্ড ঘুমণ্ড ঘটা, উমণ্ড ঘুমণ্ড ঘটা
ধরিয়র্ ধরিযব্ গরজবিযো।
না দিগ্‌দিগ্ না দিগ্ দিগ্
যো দিগ্ দিগ্ যো দিগ্ দিগ্
বুনে কি আটা পাটা, বুনে কি আটা পাটা
ইন্ ঘিনে ইন্ ঘিনে ও সরিয়ো।
পড়ত বুঁদ পড়তাল, যাপড় তর তব
হর সাগর তট ভরিয়ো।
থরর্‌র্ তট্।

থবব্‌ব্ তট্ এই গতের সঙ্গে তাল রেখে ময়ূরের পেখমের মতো পেখম মেলে জয়কুমারীকে ঘুরে যেতে হবে।

কিন্তু হায! কোথায় জয়কুমাবী?

জবরদস্ত ওস্তাদের কড়া শাসন ও রেওয়াজের ধাক্কা সামলাতে না পেরে জয়কুমারী গুরুজীকে ছেড়ে গোপনে সবে পড়েছে। ঝুলনেব বাতে সেবার বর্ষার বোল তালে তালে আর দর্শকের মনে মূর্ছনা জাগাল না।

শুনতে শুনতে সেই অদেখা অতৃপ্ত জিয়ালালের জন্য একটি করুণ সমবেদনা অনুভব করতে লাগলাম। এই তো মাত্র চার-পাঁচ বছর আগেও জিয়ালাল আপনভোলা মন নিয়ে একটার পর একটা নূতন কথক নাচ রচনা করে গিয়েছেন।

করুণ উপসংহারে সিনেমার গল্প বা প্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকদের রচনা শেষ করা চলে। কিন্তু রোজকার আটপৌবে জীবন তাতে বড় ভারী হয়ে ওঠে। তাই উৎসুকভাবে সোহনলালের নিজের জীবন কাহিনি জানতে চাইলাম।

তিনি হেসে বললেন—আপনারা ময়ূরের নাচ দেখে খুশি হয়েছিলেন। আমার ময়ূর নাচের কাহিনিটি তাহলে আপনাদের শোনাই।

জিয়ালালজীর মতো আমিও একটা বর্ষার বোল রচনা করেছিলাম।

উমগু ঘটা ঘন ঘোর;
দামিনী মোর
মচায়ে শোর;
দামিনী ধময়েক থরর্র্র্ ছ্যাক্।

থরর্র্র্ ছ্যাক্ বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চারবার ময়ূরের মতো ঘুরে যেতে হবে। তার সঙ্গে তাল দিতে যাওয়া তবলচীর পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন হীরাবাঈ নাগরীর আসরে আমি যখন ছেলেবয়সে নাচ দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে এলাম, তবলচী ওই থরর্র্র্ ছ্যাক্ আওয়াজ কিছুতেই তবলায় তুলতে পারছিল না।

আমি হঠাৎ দয়া করে তাকে বললাম—আর এ বোল তুমি তবলায় আঙুল দিয়ে তুলতে পারবে না ওস্তাদজী; ছুরি দিয়ে তবলার চামড়া কেটে আওয়াজ তুলতে হবে।

লজ্জায় লাল হয়ে তবলচী আমার নাচের সঙ্গে তাল সামলাতে গিয়ে সত্যিসত্যিই ছুরি দিয়ে তবলার চামড়া গোল করে কেটে ফেলে ওই আওয়াজ ফুটিয়ে তুলল। বাহবা বাহবা ধ্বনিতে আসর ভরে উঠল।

আমারও রোখ চেপে গিয়েছিল। নাচের পুনরাবৃত্তি করলাম চৌতালের বদলে আটতালে আটবার ঘুরে গিয়ে। থরর্র্র্র্র্র্ ছ্যাক্।

রেষারেষিতে হার না মেনে হাতের কাছে দ্বিতীয় তবলাটার চামড়া ঘুরিয়ে কেটে ফেলে তবলচী এবারও পাল্লা দিয়ে গেল।

বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, তবলাওয়ালে।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। সাবাস শেষ পর্যন্ত কে পায় তা দেখে নিতে হবে। আবার ঘুরে নাচতে নাচতে ওই জায়গায় এলাম। নাচের বেগ বাড়িয়ে দিয়ে মাতাল করা আবেগে দিলাম চড়িয়ে ষোল মাত্রা। হা-হা-হা ধ্বনিতে আসর ভরে গেল।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে তবলা ছেড়ে উঠে পড়ল তবলচী। হাতে মুঠো করে ধরা সেই ছুরি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শুধু বলল—নিচে রাস্তায় নেমে এস, এবার আর চামড়া না কাটলে আর তাল সামলান যাবে না।

মাথার উপর লকলকে ছোরাটা একবার ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল তবলচী।

নগ্‌মার (কথক নাচের সঙ্গে বাজনার) সঙ্গত থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আর তবলচীর তাল সামলাবার জন্য সোহনলাল বাঈজীর শাড়ি পরে তিনদিন তিন রাত্রি সেখানেই কাটিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর সোহনলাল যে নাচ দেখালেন, তাতে ময়ূর-নৃত্য দেখা আমাদের সার্থক হল।

তেরো

হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাংলা বাউল গান। সঙ্গে বাজছে মিঠে সুরে একতারা।

এই সুদূর চিতোরগড়ে ভর সন্ধ্যাবেলা। জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এমন কি, আমার টোঙ্গাওয়ালাটা পর্যন্ত ধারে কাছে নেই। টোঙ্গার ঘোড়াটাও নিশ্চয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে অনেক দূরে একমনে। এমন সময় বাংলা বাউল গান! থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ারই কথা।

না। চিতোরের অগণন বীরত্ব আর জহরব্রতের স্মৃতির লেলিহান শিখার মধ্য থেকে উঠে আসা কোনও মায়ার খেলা নয়। সত্যিকারের জীয়ন্ত মানুষের গলা। বাংলা গান। যদিও আজ সারাদিনের স্মৃতির সাগরে দোল-খাওয়া মনের কাছে সবটাই অলৌকিক বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।

রূপসায়রের ঘাট বড় পিছল,
ঘাটে নামতে গা করে টল্‌মল
রে,
রে-এ-এ

এর সুরের রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। আমি খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে গেরুয়া-পরা বাউল ঠাকুরের কাছে এসে বসলাম। গেরুয়াবসনা সন্ধ্যা চিতোরের ধূসর গিরিচূড়ায় অনেক আগেই এসে গেছে।

সসংকোচে বাউলকে বললাম—ঠাকুর, আপনি বুঝি বাঙলা থেকে আসছেন?

উদাস-করা সুরগুঞ্জন শেষ হয়ে গেছে ততক্ষণে। তিনি উদার স্বরে বললেন—বাঃ আপনিও দেখছি বাঙালি। কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা?

উত্তর দিলাম—না, আমি দিল্লি থাকি। অবশ্য পুব বাংলার লোক।

দিল্লি? পুব বাংলা?

কথাটা বাউলের মনে তোলপাড় এনে দিল। ভাবসমুদ্রে তিনি ডুব দিলেন যেন। শুধু অন্যমনস্ক আঙুলগুলি থেকে থেকে একতারাতে অস্ফুট ঝঙ্কার তুলতে লাগল।

সেই ঝঙ্কারের দোলার সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে পদ্মিনীমহলের সরোবরের জল সন্ধ্যার হাওয়ায় ঢেউ তুলতে লাগল।

পদ্মিনী সায়র। সামনে টলটলে জলের উপর আলো-আঁধারি লাবণ্য বয়ে যাচ্ছে। রূপসায়রের ঘাট সত্যিই বড় পিছল। মনের ধাপ বেয়ে বেয়ে তাতে ডুব দিতে চাইলাম। পদ্মিনী সায়রের পারে টলমল করে উঠল সারাটা মন।

যেন ঘুম থেকে উঠে এলেন বাউল। তিনি বললেন—পুব বাঙলার কথা থাক। যা গেছে তার কথা যাক। পদ্মিনীর মতো রূপের জোয়ার ডাকা দেশ আমার। কবির দলে পালা গান করে সারা দেশ ঘুরে ঘুরে দেশকে ভালোবেসেছিলাম। সেখান থেকে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসব তাও সম্ভব হল না। পালিয়ে বাউলের বেশে বেরিয়ে আসতে হল। তারপর থেকে সত্যি সত্যি বাউল হয়েই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু চুপ কবে শুধু শুনতে লাগলাম।

তিনি বললেন,—কিন্তু বাবুমশাই, কুতুবমিনারেব পাশে যে আলাউদ্দিনের মিনার আছে তাব ইটপাথরের স্তূপ দেখার পর এই পদ্মিনীমহল দেখে আপনার কি বকম লাগছে বলুন তো? দিল্লি আর চিতোর দুই তো দেখলেন।

দিল্লি আর চিতোর।

আলাউদ্দিন আর পদ্মিনী।

লালসা আর লাবণ্য।

ভাবতে ভাবতে টলমল করে উঠল সারাটা মন। ঠিক যেমন ভাবে সায়রের বুক টলমল করে উঠেছিল পদ্মিনীকে দেখে।

সরবর তীর পদুমিনী আই
খোপা ছোড়ি কেস মুখ লাই॥
সসিমুখ অংগ মলয়-গিরিরাণী
নাগিনী ঝাঁপি লীন অরঘানী[১]॥
ঔনএ[২] মেখ পরীজগ ছাঁহা
সসি কই গরন লীন জনু রাহা॥
ছপি গই দিনহি ভানু কই দসা
লেই নিসি নখত চাঁদ পরগসা[৩]॥

পদ্মিনীর রূপ চৌপাই কবিতায় এরকমভাবে বর্ণনা করে কবি মালিক মুহম্মদ জৈসি দোহা কবিতায় লিখলেন—

সরবর রূপ বিমোহা হিয়ই
হিলোর করেই।

১. অরঘানী = আঘ্রাণ = সুগন্ধ।
২. ঔনএ = আনত হয়ে।
৩. পরগসা = প্রকাশ।

পাউ ছুয়ই মকু পাবই এহি মিস
লহরই দেই॥

পদ্মিনীর নয়ন দু'খানির ছায়া যেখানে খঞ্জনা পাখির মতো খেলা করত সে জলরাশি দেখতে দেখতে পাহাড়ের সানুদেশে বসে আমার সারা মন টলমল করতে লাগল।

চিতোরে আসবার আগে আমার একজন ঐতিহাসিক বন্ধু—তিনি ঐতিহাসিক ও তাঁর বন্ধুত্বও ঐতিহাসিক, কিন্তু সে অন্য এক কাহিনি—রেগেমেগে অনুযোগ করেছিলেন যে, পদ্মিনী কাহিনির মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য নেই। যে কথা কোনও মুসলমান লেখকের বইয়ে নেই, সেটাকে এত করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাজপুতরা চালু করেছে শুধু আলাউদ্দিনের নামে কলঙ্ক দেবার জন্যই।

সবিনয়ে তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি তো ইতিহাস যাচাই বা রচনা করবার ধৃষ্টতা রাখি না এবং কেবল মনগড়া গল্পেও বিশ্বাস করে ঘুরে বেড়াই না। কাজেই আমায় এ অনুযোগ করা অনর্থক।

রাজোয়ারা হচ্ছে রূপকথার দেশ। সে রূপকথার মধ্যে সত্য ও সৌন্দর্য, ইতিহাস ও রূপকথা এমনভাবে মিশিয়ে আছে যার ভিতর থেকে রাজহংসের মতো দুধের মধ্যেকার জল বাদ দিয়ে শুধু ক্ষীরটুকু বেছে নেবার চেষ্টা করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। দুধকে দুধ বলেই গ্রহণ করতে হবে; কত ভাগ জল তার মধ্যে আছে সেটা বিচার করতে হবে তার স্বাদ দিয়ে, ল্যাক্টোমিটার নামে দুধ যাচাইয়ের যন্ত্র দিয়ে নয়।

আরাবলীর চূড়ায় চূড়ায় যে নীলাভ মায়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে তা দিয়ে নথিপত্র লিখবার নীল কালি তৈরি করা চলে?

কিন্তু তা বলে সেই আরাবলীর মায়া তো শুধুই মায়া নয়, স্বপ্ন নয়। সে একটা মোহন রূপ, মধুর রসের অতীন্দ্রিয় প্রকাশ। বাউল ঠাকুর ঠিকই গেয়েছিলেন—রূপসায়রের ঘাট ছিল পিছল। অঙ্কশাস্ত্র ও মাপের ফিতে দিয়ে রূপের পরিমাপ করা যায় না।

জিয়াউদ্দিন বরনীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে শুধু বহুদিন ধরে চিতোরের অবরোধ আর সেজন্য অনেক সৈন্যহানির কথা লেখা আছে। কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করবার জন্য সে যুদ্ধ করা হয়েছিল কিনা সে কথার উল্লেখ নেই।

অপর পক্ষে একথা বলা যায় যে, ব্যাপারটা এতই লজ্জাজনক যে, পদ্মিনী কেন, চিতোরের রাণার পর্যন্ত নাম এই ইতিহাসে উল্লেখ নেই। অবশ্য এই যুদ্ধের কিছুদিন পরে দেবগিরির রাজা বামদেবের স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিদের বন্দী করে আনা ও পরে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার কথা এই ইতিহাসে আছে।

সমসাময়িক কবি আমীর খুসরোর লেখাতেও চিতোর বিজয়ের কথা মাত্র এক কলমের খোঁচাতে সেরে দেওয়া হয়েছে, যদিও শাহাজাদা খিজির খাঁ ও দেবলাদেবীর প্রেমকাহিনি নিয়ে অর্ডারী মাল হিসাবে অতি সুন্দর কাব্য তিনি লিখেছিলেন। এই কাহিনিতে কিন্তু দেবলাদেবীকে প্রেমে পড়তে দেখানো হয়েছে। কাজেই সে ঘটনা ও পদ্মিনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে চিতোর আক্রমণ এ দুয়ের তফাত আছে খুব বেশি।

প্রথম মুসলমান যিনি পদ্মিনী কাহিনি রচনা করেন তিনি হচ্ছেন ধর্মগুরু মালিক মুহম্মদ জৈসী।

সম্রাট শের শাহের অনুগৃহীত সভাকবি ও বিখ্যাত মুসলমান ধর্মগুরু নিজামুদ্দীন আউলিয়ার বংশগত শিষ্য মালিক মুহম্মদ অকারণে একজন মুসলমান সম্রাটের নামে কলঙ্ক হতে পারে এমন মিথ্যা কাহিনি নিশ্চয়ই রচনা করতেন না। তিনি ছিলেন খুব বড় কবি ও পণ্ডিত। শুধু তাই নয়। ভারতীয় দেশজ ভাষায় প্রাচীনতম সঠিক লিখিত রচনা হচ্ছে তাঁর কাব্য 'পদুমাবত'।

এর চেয়ে আরও প্রাচীন কবিদের লেখার মধ্যে পাই আমরা বাংলার কবি বিদ্যাপতির রচনা ও রাজস্থানী কবি চাঁদ বরদাইয়ের মহাকাব্য। কিন্তু তাঁদের রচনার মূল প্রতিলিপি নেই কোথাও। মুখে মুখে বদলিয়ে গিয়েছে তাঁদের ভাষা ও তাঁদের আদি রচনা।

কিন্তু জৈসী লিখেছিলেন ফারসী অক্ষরে, কাজেই তাঁর লেখার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত অনুকরণে বদলানো হয়নি। ঠিক যেমনভাবে তখনকার দেশজ ভাষায় বানান ও উচ্চারণ করা হত সেটাই অবিকল পাই। আর মুসলমান পীরের রচনা পুঁথি ধার্মিক লোকেরা সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিল। সেই 'পদুমাবতে' আমরা পাই পদ্মিনী কাহিনি।

কবি ধর্মগুরু জৈসী "অসতুতি খণ্ড" অর্থাৎ ভূমিকায় লিখেছেন যে, ঠিক যে কাহিনি লোকে জানত তাই আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত লোকের ভাষায় কবিতায় তিনি রচনা করেছেন—

"আদি অংত জস্ গাথা অহী
লিখি ভাখা চৌপাই কহী॥

কি গাথা তিনি লিখেছেন?

"সিংঘল দীপ পদুমিনী রাণী
রতন সেন চিতউর গঢ় আনী॥ [১]
আলউদীন দেহিলী সুলতানু
রাঘবচেতন কীন্‌হ বখানু॥ [২]
সুনা নাহি গঢ় ছেঁকা আই
হিন্দু তুরুকন্‌হ ভই লরাই॥"

চিতোরের রানি পদ্মিনীকে ঘিরে হিন্দু ও তুরুকে এই লড়াইয়ের কাহিনি আছে রাজস্থানী ডিংগল ভাষায় লেখা 'খোমান রাসো' বইয়ে। বীরত্বের ঝঙ্কারে ভরা এই রাজস্থানী বই ছাড়াও আরও কয়েকটি ফারসী ভাষায় লেখা বইয়ে পদ্মিনীর কাহিনির সত্যতা প্রমাণ হয়। হুসেন গজনবী নামে একজন লেখক লিখেছিলেন 'কিসৈ পদ্মাবত।' তুলকাতু-উল-কুলুব নামে আর একটি গদ্য বইয়ে পদ্মিনীর গল্প আছে। এমন কি, শ' দুই বছর আগে মীর জিয়াউদ্দিন ইব্রাৎ ও গুলাম আলি ইশারাৎ নামে দুজন লেখক পদ্মিনীর এই কাহিনি লিখে উর্দুকাব্য রচনা করেন।

বিপক্ষের রাজ্য জয় করে তার স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতি দখল করা ইতিহাসে নূতন কথা নয়। কিন্তু বিপক্ষের রানীর রূপের কথা শুনে শুধু তাকে লাভের জন্য সর্বস্ব পণ করে একাধিকবার যুদ্ধ করা ইতিহাসে বিরল।

দিনের পর দিন যুদ্ধ চলে—ক্ষমাহীন, বিরামহীন। চিতোরের বিরাট গিরিদুর্গের পতন তো দূরের কথা, হয়রান হয়ে যাওয়ারও কোনও লক্ষণ নেই। রাজপুত বীরেরা কি রক্তবীজের বংশ?

নিষ্ফল আক্রোশে আলাউদ্দিন রোজ গাম্ভেরী নদীর তীবে শিবিরে বসে জলের মধ্যে চিতোর দুর্গেব অপরাজিত ছায়া দেখে চলেন। বাজপাখির মতো শিকারী চোখ দিয়ে দুর্গের চারিদিকেব দুর্জয় পাঁচিলগুলি দেখেন। কোথাও তো চিহ্ন নেই পদ্মিনীকে পাওয়ার আশার।

সেই পদ্মিনী যার নয়ন দুটি কবির ভাষায় (দোহা কবিতায়)—

সুভর সমুঁদ অস্ নয়ন দুই
মানিক ভরে তরংগ।
আবহি তীর ফিরাবহীঁ
কাল ভবঁর তেহি সংগ॥

আঁখি দুটি যেন দুধের সমুদ্র, রতন আর তরঙ্গে ভরা। প্রত্যেকটিতে আছে নিকষ কালো ঘূর্ণি—যার তীরে যে আসবে তাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই পদ্মিনী যার অধর দুটি—

অধর সুরঙ্গ অমীরস ভরে।
বিম্ব সুরংগ লাজ্জি বন ফরে॥
ফুল দুপহরী জানউ রাতা।
ফুলঝরই জো জো রহ বাতা॥

* * *

অমী অধর অস রাজা সব
জন আস করেই।
কহি কহ কঁবল গিবাসা কো
মধুকর রস লেই॥

এমনই সে অধরের রস, হে রাজন, যে সমস্ত পৃথিবী শুধু তারই প্রত্যাশা করছে। কার জন্য সে পদ্ম বিকশিত হয়েছে? কোন্ ভ্রমর তার মধু পান করবে?

১. রাঘবচেতনের কাছ আলাউদ্দিন পদ্মিনীর অতুলনীয় রূপ লাবণ্যের কথা শোনেন।
২ রাজপুত কাহিনি অনুসারে চিতোরের রাণা ছিলেন লক্ষ্মণ সিংহ, আর তার জেঠা ভীম সিংহ ছিলেন পদ্মিনীর স্বামী।

আলাউদ্দিন আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। যে প্রাপ্তির অতীত তাকে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখে যেতে চাই। তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন—শুধু একবার পদ্মিনীকে দেখে যেতে চান দূর থেকে। তার রূপ-পিপাসা তাতেই মিটে যাবে। তারপর তিনি দুর্গ অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবেন।

কোনও রাজপুত দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতেও এমন প্রস্তাবে রাজি হবে না। কিন্তু পদ্মিনী শুধু রূপসী নন, রাজনীতিকও বটে। মেবারের শ্রেষ্ঠ বীর বংশগুলি একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুর্কী সৈন্যদল বাইরে থেকে আরও সৈন্য আনাতে পারে, কিন্তু অবরুদ্ধ চিতোরের সে উপায় নেই। দেশের মুখ চেয়ে পদ্মিনী দর্পণে মুখ দেখাতে রাজি হলেন।

আলা চললেন চিতোরে। নিরস্ত্র, কিন্তু নিঃশঙ্ক। জানেন যে হিন্দুর কথার খেলাপ কখনও হয় না। টগ্‌বগ্‌ করে পাষাণ সোপান বেয়ে উঠে চললেন দুর্গের ভিতরে। কোমর ঢিলা করে নিলেন বাদশা।

পাতসাহি ঢিলী করত কত,
চিতউর মই আব।
দেখি লেহি পদুমাবত
হিয় ন রহে পছিতাব॥

আয়নার পর আয়নার ভিতর দিয়ে বার বার ঘোরান প্রতিবিম্ব শুধু দেখলেন আলা।

বিহসি ঝরোখে আই সরেখি।
নিরখি সাহি দরশন মই দেখি॥
হোতহি দরস পরস ভা লোনা।
ধরত সরগ ভযউ সব সোনা॥

নব তারকার মতো হেসে বাতায়নে
এল বানি, শাহতাবে হেরি দবপণে
চমকিত হল, যদি পেত পরশন
সরগ মরত হত সোনার মতন।

আলা ধীরে ধীরে দুর্গ বেয়ে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলেন ভীমসিংহ। অতিথিকে যে দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে বিদায় দিতে হয়। আলা ভীমসিংহকে মিছে এত কষ্ট করতে বাবণ করলেন কিন্তু হিন্দু কি শত্রুকে বিশ্বাস করার বিষয়ে তুর্কীব চেয়ে কম যাবে? দুর্গের দুয়ারের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভীমসিংহ।

অমনি দুর্গের দুয়ারের দু'পাশে লুকানো পাঠান সৈন্যদল নিরস্ত্র ভীমসিংহকে ঘিরে বন্দী করে ফেলল। তাঁকে নিয়ে হাজির করল একেবারে তুর্কী শিবিরের মাঝখানে। এইটুকুর জন্যই আলা নিজের উপর ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর উপর বিশ্বাস দেখিয়ে দুর্গের মধ্যে গিয়েছিলেন।

ইতিহাসের চিরকালের নিয়ম অনুসারেই মুসলমান কূটবুদ্ধির জয় হল।

হ্যাঁ; ভীমসিংহের মুক্তির একমাত্র পথ আছে। পদ্মিনীকে যদি আলার হাতে তুলে দেওয়া হয়, শুধু তবেই তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেওয়া হবে। পদ্মিনী সে শর্তে রাজি হলেন। হিন্দু নারীর কাছে স্বামীই যে সর্বস্ব।

হ্যাঁ, তবে আলাউদ্দিনকে তার আগে দুর্গ থেকে অবরোধ উঠিয়ে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। আর পদ্মিনী আলার কাছে আসবেন রানীর মত, যথাযোগ্য সম্মান ও সমারোহের মধ্যে দিয়ে। বন্দিনী বা পরাজিতার মতো নয়। সঙ্গে আসবে সখীদল যারা দিল্লি পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যাবে। আসবে বিদায়প্রার্থিনী পুরনারীরা—যারা তুর্কী শিবিরে পর্যন্ত এসে তাঁকে শেষ সম্ভাষণ জানিয়ে যাবে। সাত শত শিবিকার ঘেরাটোপে আসবে এই অবগুণ্ঠিতা অন্তঃপুরিকারা। তাদের শ্লীলতা ও মর্যাদার যেন কোনও ব্যাঘাত না ঘটায় কৌতূহলী পাঠান সৈন্যরা।

অবশ্য অবশ্য। বাহুবলে যা জয় করতে পারেন নি, কৌশলে তা হাসিল করেছেন এই আনন্দে সুলতান সব শর্তেই রাজি হয়ে গেলেন। সত্যিই তো পদ্মিনী যে সৃষ্টির পরমা নারী; তিলোত্তমা। তার আগমন তো শুধু আসা নয়। সে যে হবে আবির্ভাব।

আবির্ভাব হল বৈকি। রাজার তাঁবু ঘন কানাতে ঘেরা। তার মধ্যে ভীমসিংহ ও পদ্মিনীতেই এই জন্মের মতো শেষবার সাক্ষাৎ হচ্ছে। সুলতান মনের উল্লাসে আধ ঘণ্টার সাক্ষাৎ মঞ্জুর করেছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে

আছে সাতশ চৌদোলা, প্রতিটি চৌদোলা বয়ে এনেছে ছয়জন করে পালকিবেহারা। তারা শেষ পর্যন্ত পদ্মিনীকে রেখে ভীমসিংহকে তার বদলে চৌদোলায় তুলে নিয়ে দুর্গের পথে ফিরে চলল।

কিন্তু ভীমসিংহকে মুক্ত হয়ে ফিরে যেতে দেবার কোনও সদিচ্ছা আলার ছিল না। ইতিমধ্যে ভীমসিংহ যে তার মুঠোর মধ্যে এসে পড়া পদ্মিনীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে দর্শনের সৌভাগ্য পেয়ে যাচ্ছেন তাতে নিজের হিংসাও খুব হতে লাগল।

এমন সময়ে আবির্ভাব হল সখীদের বদলে সৈন্যদের। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরেরা দলে দলে পালকি থেকে বের হয়ে ভীমসিংহের ফিরে যাওয়ার পথে বাধাদানকারী পাঠানদের আক্রমণ করল। আলা সমস্ত সৈন্যদের আক্রমণ চালাতে হুকুম দিলেন। দুর্গের দুয়ার পর্যন্ত তুমুল লড়াই হল। মেবারী বীরবংশগুলির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা রানীর সম্মান ও রাজার স্বাধীনতার জন্য আত্মবিসর্জন করলেন। প্রায় কেউই ফিরলেন না। শুধু ফিরে গেলেন আলা দিল্লিতে। রাজপুতের বাহুবল ও পদ্মিনীর কূটবুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে।

দুর্গের মধ্যে বারো বছরের বীর বাদলকে তার খুড়ী প্রশ্ন করলেন—বল তো বাছা, আমি তোমার কাকার সঙ্গে মিলিত হতে যাবার আগে বল তো, তিনি কেমন কাজ করেছিলেন।

বাদল বলল,—যুদ্ধের ক্ষেতে তিনি ধান কেটে চলেছিলেন। আমি শুধু তার তরবারির কাটা ধান বোঝাই করতে করতে তার পিছু পিছু চলেছিলাম। সম্মানের রক্তমাখা শয্যায় তিনি মৃত শত্রুর গালিচা পেতে দিয়েছিলেন। একজন যবন রাজপুত্র হল তার মাথার বালিশ. চারিদিকে শত্রু বিছিয়ে কাকা আমার ঘুমোচ্ছেন।

গোরার সহধর্মিণী আবার প্রশ্ন করলেন—বল তো বাছা, আমার প্রিয়তম কেমন আচরণ করেছিলেন।

বাদল উত্তর দিল—মাগো, কেমন করে আর আমি সেকথা বলব? তাকে ভয় বা তারিফ করবার জন্য কোনও দুশমনই তো আর বাকি ছিল না।

হাসিমুখে গোরার সহধর্মিণী বাদলের কাছে বিদায় নিলেন। বললেন—স্বামী আমার দেরি হলে কি ভাববেন।

সতী চিতায় আগুনের পরশমণি জ্বলে উঠল।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার তারিখ অনুসারে আজ থেকে ঠিক সাড়ে ছ' শ' বছর আগে বিরাট নতুন সৈন্যদল নিয়ে আলা আবার ফিরে এলেন। কিন্তু মেবারে আর কত বীরই বাকি ছিল? তবু তারা আমরণ লড়াই করল। এবার আলা আরও বেশি সৈন্য এনেছেন, আরও বেশি মরিয়া হয়ে চিতোরের উপর হানা দিচ্ছেন। তাঁর এই তীব্রতর শত্রুতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে কে? পদ্মিনীর রূপরাশি? না, তার কাছে পরাজয়ের স্মৃতি?

হায়! ইংরেজ কবি টেনিসন 'রূপসীদের স্বপ্ন' কবিতায় ঠিকই লিখেছেন যেন—

রূপ ও রোদন হায় যায় এক সনে,
নেমে যায় মরণ বরণে।

রাজস্থানের রূপকথা এখানে একটি অলৌকিক কাহিনি অবতারণা করেছে।

রাণা একদিন ভীষণ পরিশ্রমের পর রাত্রে একা শুয়ে আছেন। চিতোরের পতন অবশ্যম্ভাবী দেখে কি করে রাজবংশের রক্ষার জন্য অন্তত একটি ছেলেকে বাঁচাতে পারেন সে চিন্তা করছেন, এমন সময় দৈববাণী কানে ভেসে এল—ম্যয় ভুখা হুঁ। চমকিয়ে উঠে রাণা সামনের দিকে তাকালেন। দেখলেন যে, কালো পাথরের থামগুলির মাঝখান দিয়ে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকার আবির্ভাব হয়েছে।

আর্তকণ্ঠে রাণা নিবেদন করলেন—মা গো, আমার আট হাজার রাজবংশের লোক তোর চরণে আত্মবলি দিয়েছে এই যুদ্ধে। তবু তোর পিপাসা মিটল না?

কালিকার বাণী এল—না, রাজবংশের রক্ত নয়, রাজরক্ত চাই। চিতোরের রাজমুকুট পরা বারোজনের রাজরক্ত চাই। না হলে এ রাজ্য এই বংশের হাতে থাকবে না।

রাণার স্বপ্ন টুটে গেল। কোথায় কালিকা মূর্তি? কোথায় দেবীর দয়া? কিন্তু রাজরক্ত চাই। চাই। চিতোরেশ্বরী যে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—ম্যয় ভুখা হুঁ।

সকালে সামন্তরা এই স্বপ্নকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। বললেন যে, চিন্তাক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত মনে এরকম মতিভ্রম হয়েই থাকে। কিন্তু রাণার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই ঘটনা অলৌকিক হলেও অলীক নয়। সামন্তদের সবাইকে রাত্রি নিশীথে তাঁর সঙ্গে এবার থাকতে বললেন।

আবার দেবীমূর্তির আবির্ভাব হল। আবার তিনি রাজরক্ত দাবি করলেন। হাজার হাজার যবনের দেহ মাটিতে ছড়িয়ে আছে কিন্তু সে রক্তে দেবীর পিপাসা মিটছে না। তিনি চান সূর্যবংশের রাজরক্ত।

প্রত্যেক রাজাকে কিরণিয়া (বংশের রাজপ্রতীক সূর্যকিরণের ছটার চিহ্ন), রক্তবর্ণের রাজছত্র, আর চামর দিয়ে অভিষেক করতে হবে। তিন দিন তিনি থাকবেন একেশ্বর রাজা। চতুর্থ দিন তাঁকে নিজে যুদ্ধে গিয়ে আত্মবিসর্জন করতে হবে। তবেই চিতোরেশ্বরী শিশোদীয়া বংশে থাকবেন।

বারো ভাইয়ে পাল্লা দিয়ে আগে প্রাণ দিতে চাইলেন। সবাই রাজপুত্র, সবাই দেশের জন্য সব দিতে প্রস্তুত।

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

রাজবংশ ক্ষয় হয়ে গেল, কিন্তু অক্ষয় হয়ে রইল তাঁদের কীর্তি। সে কীর্তিই সংসারে একমাত্র টিকে থাকার ধন, যা মানুষ লিখে রাখে মনের মণিকোঠায়, সোনার অনির্বাণ অক্ষরে।

শেষ রাজপুত্রের বদলে প্রাণ দিলেন রাণা নিজে। কিন্তু রাজপুত্রই বা তাঁর এগারো ভাইয়ের পিছনে পড়ে থাকবেন কেন? কিন্তু রাণার আদেশ যে, যুবক রাজপুত্রকে বাঁচতেই হবে ভবিষ্যতের জন্য। শুধু বংশরক্ষা নয়, চিতোরের পুনরুদ্ধারের জন্য। দেবী দাবি করেছেন বারোজন রাজার রক্ত; দ্বাদশ রাজা হবেন তাই রাণা নিজে।

রাজার আদেশ অনিচ্ছুক মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হয়ে কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্র পাঠান সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে চিতোর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু চিতোরেশ্বরীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়েছিল কি?

হ্যাঁ, দেবী তাঁর কথা রেখেছিলেন বৈকি। এই রাজপুত অজয়সিংহ একেবারে অসহায় হয়ে আরাবল্লীর দূর কোনায় গিয়ে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে রইলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর রক্ষা ছিল না। শত্রুরা, স্থানীয় পাহাড়ী সর্দাররাও তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। একজন সর্দার তো তাঁর আশ্রয়ের গ্রামটি আক্রমণ করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রাজপুত্রের মাথায় বর্শা চালিয়ে দিল। তাঁর চৌদ্দ-পনেরো বছরের দুই ছেলে—যারা রাজপুত যোদ্ধা হিসাবে এই বয়সেই সাবালক হয়ে গেছে এই প্রমাণ দেওয়ার কথা—এই বিপদে কিছুই করতে পারল না। দেবীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোনও ভরসাই দেখা গেল না।

কিন্তু, না। দেবী তাঁর কথা রেখেছিলেন।

অনেকদিন আগে অজয়সিংহের বড় ভাই অরিসিংহ একবার এই অঞ্চলে পাহাড়ি জঙ্গলে শিকারে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল সমবয়সী তরুণ সর্দারপুত্রের দল। একটা বুনো শুয়োর তাড়া খেয়ে ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকে লুকিয়ে রইল, আর শিকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়ল। কোথাও শুয়োরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মেবারী শিকারীদের মান বজায় থাকে না। এমন সময় এক বনবালা বেরিয়ে এসে ভুট্টার এক লম্বা কাঠি তুলে শুয়োর কোথায় লুকিয়ে আছে তা দেখিয়ে দিল। শুধু তাই নয়। সে নিজেই শুয়োরকে শিকার করে রাজপুত্রের কাছে এনে দিয়ে চলে গেল।

রাজপুতেব কাছে রাজপুতানীর পরাক্রম নতুন কথা নয়। তবু এমন শিকারী হাত ও উদাসীন হৃদয় তাদের নজর এড়াল না। রাজপুত্রের দল একটা ঝরনার ধারে খেতে বসে এই কোমল কিন্তু কঠোর বাহুবল্লবীর আলোচনা করছে এমন সময় একটা গুলতির ঢিল এসে রাজপুত্রের ঘোড়াকে জখম করে দিল। এই বনবালাই ক্ষেতের মধ্যে উঁচু মাচানে দাঁড়িয়ে পশু তাড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল আর এই গুলতির ঢিল ছিল তারই কীর্তি। সে এসে এই লোকসানের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু আবার ভাগ্য তাদের এক জায়গায় এনে দিল। দিনের শেষে রাজপুত্র বন্ধুদের নিয়ে ফিরে চলেছেন এমন সময় আবার পথে যেতে যেতে দেখা হল বনবালার সঙ্গে। মাথায় দুধের কেড়ে, দুহাতে চালিয়ে নিয়ে চলেছে দুই প্রকাণ্ড মহিষ। তরুণী চলেছে গমকে গমকে, ঠমকে ঠমকে। কিন্তু চমক লাগল রাজকুমাবের মনে।

তাঁর একজন সঙ্গী মজা করবার জন্য ঘোড়া ছুটিয়ে চলল বনবালার একেবারে গা ঘেঁষে। কিন্তু তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। একান্ত অবহেলায় তরুণী একটি মহিষের ঠ্যাং ঘোড়ার পায়ে লাগিয়ে ঘোড়াসুদ্ধ ঘোড়সওয়ারকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। আরও চমক লাগল রাজকুমারের মনে।

তিনি সন্ধান নিয়ে জানলেন যে, এই বনবালা হচ্ছে একজন গ্রাম্য গরিব রাজপুতের মেয়ে। গ্রামে গিয়ে তাকে ডাকালেন। রাজপুত এসে অত্যন্ত আত্মসম্মান বজায় রেখে মাথা উঁচু করে রাজপুত্রের একেবারে পাশে বসল। অবিনীত অমার্জিত ব্যবহার দেখে সঙ্গীরা হেসে গড়িয়ে গেল। কিন্তু রাজপুত্র?

রাজপুত্র সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই গেঁয়ো রাজপুতের বুনো মেয়ের পাণিপ্রার্থনা করলেন।

আরও বেশি অবাক করে দিয়ে এই গেঁয়ো রাজপুত সেই প্রার্থনা না-মঞ্জুর করল।

চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিজে যেচে এসে মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে, আর এক গ্রাম্য নগণ্য রাজপুত সে প্রস্তাব কানেও তুলছে না। এত আত্মমর্যাদা যাদের মধ্যে সম্ভব তারা সত্যই রাজপুত।

যাই হোক, মেয়ের-মায়ের সম্মতি থাকাতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু রাজা দুষ্মন্তের মতই রাজপুত্র অরিসিংহও বনবালাকে বনেই ফেলে চিতোরে ফিরে গেলেন। তাদের সে বিয়েয় যে ছেলে হল, সে গ্রামের ছেলে হয়ে গ্রামেই মানুষ হতে লাগল।

সত্যিই মানুষ হয়েছিল এই ছেলে হামীর। অজয়সিংহের ছেলেরা যখন মেবার বংশেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশা সৃষ্টি করল তখন এই হামীর তার পুরানো শত্রু পাহাড়ি সর্দারকে লড়াইয়ে হারিয়ে তাকে বধ করলেন। সেই শত্রুর রক্ত দিয়ে অজয়সিংহ হামীরের কপালে রাজটীকা পরিয়ে দিলেন।

চিতোরেশ্বরী এই হামীরকে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কবেছিলেন। আলাউদ্দিন চিতোর জয় ও ধ্বংস করার মাত্র তেরো বছর পবে হামীর চিতোরে আবার বাপ্পা রাওয়ের রাজবংশের রক্তপতাকা ওড়ালেন।

কিন্তু সে হচ্ছে পরের ইতিহাস।

এদিকে আলাউদ্দিন চিতোর প্রায় দখল করে ফেলেছেন। শেষবারের মতো দুর্গরক্ষাব চেষ্টা করতে গিয়ে সব রাজপুতই এবার নিঃশেষে মারা যাবে। কিন্তু চিতোরেব পুরনারীরা? তাঁরা কি কববেন? শত্রুব সঙ্গে যুদ্ধ তাঁরা করতে পারতেন যাতে শত্রু মারতে মারতে নিজেরা মবতে পাবেন। কিন্তু যেখানে শত্রু শুধু রাজ্যজয় নয়, পদ্মিনীকে লাভ করবার জন্য যুদ্ধ করছে সেখানে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তারা সাজালেন জহরব্রতের চিতা।

পদ্মিনীমহলের চারধার ঘিরে যে সরোবব আছে তার বুকে শেষবারের মতো রূপকমলেব অপরূপ প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল। তার আশে পাশে কামনার কাল সর্প বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলে ঢেউ তুলতে লাগল। না, এবার সে রূপকমলকে আত্মবিসর্জন দিতে হবে।

বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠল। চিতোরের পুরনারীরা দলে দলে আগুনে আত্মাহুতি দিতে চলেছেন। পদ্মিনী চোখ বুঝে এগিয়ে চলেছেন সেই আগুনের দিকে যাব লেলিহান শিখা তাঁকে আরতি কববার জন্য বাহু মেলে আবাহন করছে। তিনি যাচ্ছেন বলতে বলতে—

এক যো বাজা ভয়ো বিবাহু
অব দুসরে হৈ ঔর নিবাহু

যখন আমাদের বিয়ে হয়েছিল, তখন একবার বাজনা বেজেছিল আব আবার বাজনা বাজছে যখন প্রাণদীপ নিবিয়ে দিচ্ছি।

আজ সুর দিন অয়য়ো
আজ রয়তি শশি বুড়।
আজ নাথ জিয় দীজিয়ে
আজ অগিন হোম জুড়॥

আজ দিনের বেলায় সূর্য অস্ত গিয়েছে, আজ রাতেই চন্দ্র নিবে গিয়েছে। আজ আমরা আগুনে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই সব জ্বালা জুড়াব।

চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করে চলতে চলতে আগুনের আলোয় উজ্জ্বল মুখে পদ্মিনী বলে চললেন— একদিন আমরা এমনই সপ্তপদী প্রদক্ষিণ করেছিলাম যখন আমাদের বিয়ে হয়েছিল, আজ আবার আমরা প্রদক্ষিণ করছি কারণ আমরা আর দেহ ধারণ করব না।*** আমাদের বিয়ের সময় যে হৃদয়ের মিলন হয়েছিল, ওগো, সে বন্ধন কখনো খুলে যায় নি। চিরকাল আমাদের সে মিলন অটুট থাকবে। যা সত্য আর নিত্য এমন কিছুই এ সংসারে চিরকাল থাকে না। আমি পৃথিবীতে তোমার সঙ্গে ছিলাম। পরকালেও তোমারই সঙ্গে থাকব।

য়হ জগকাহ জো অথহি ন যাথী
হমে তুম নাহ্ দোহু জগ সাথী॥
লাগি কণ্ঠ দৈ হোরী।
ছার ভই জর অঙ্গ ন মোরী॥

তারপর বরতনু জহরব্রতের চিতার আগুনে হোলির রঙে জ্বলে উঠল।

সেই আগুনের হোলির আবিরে রাঙা চিতোর দুর্গ তখনও জ্বলছে, এমন সময় আলাউদ্দিন ও তার পাঠানরা তাদের জয়ের মালা পরাবার জন্য দুর্গের চূড়ায় পদ্মিনী মহলের কাছে ছুটে এল।

কিন্তু সে স্বর্গীয় ফুল চলে গেছে স্বর্গে—যে ফুল ফোটে শুধু প্রেমের অভিষেকে। কাম দিয়ে যাকে পাওয়া যায় না। বাহুবলে করা যায় না জয়।

দাউদাউ করে তখনও জহরব্রতের চিতা জ্বলছে। অগ্নিশিখা কি শুধু সব পাপকে সরিয়ে, সব দুঃখকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েই ক্ষান্ত হবে? শুধু কি রেখে যাবে সে দহনজ্বালা? গহন অন্তরে ফোটাবে না সে অনির্বাণ আলোর মালা? ফুটিয়ে তুলবে না আবার সৃষ্টির মানসপদ্ম?

সন্ধ্যাসূর্য সেদিন আকাশে চিতা সাজিয়ে রোষরক্ত আঁখি দিয়ে পরাজিত আলাউদ্দিনকে চিতোর গড়ে ব্যর্থতার নিগড়ে বন্দী দেখে অস্তাচলে ঢলে পড়েছিল।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাসূর্য আজ আকাশকে রাঙিয়ে চিত্তের মন্দিরে ফুটিয়ে তুলল আবার সেই রূপকমলকে—যাকে হাত দিয়ে পরশ করা যায় না, হৃদয় দিয়ে দরশ করতে হয়। আলোর কমলকে রাত্রির তিমির তো চিরকালই এমনই করে কুয়াশার জাল ছড়িয়ে ঢেকে দিয়ে যায়। নিশির শিশির ঝিল্লীর কান্নাভরা সুরের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুজলের মতো ঝরে পড়ে সে বেদনায়। তুব তো রূপের পূজারী কবি বার বার তার রূপচ্ছবি রচে যায়, বাঁশরি বাজিয়ে একান্তে অদেহী গাথা গায় বেদনা ভুলবার জন্য।

তাই তো এ সংসারের আলাউদ্দিনরা চিরকাল চিতোরের যুদ্ধে জিতেও হেরে যায় আর প্রেমের বাউলরা হেসে হেসে সব হারিয়েও সব ফিরে পায়। এই তো সংসারের বাইরের হার-জিতের হিসাব।

পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলা লাগা পদ্মিনী পুব বাংলা হারিয়ে-আসা এই বাউলও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তাঁর একতারাতে আবার ঝঙ্কার উঠল।

চৌদ্দ

বাংলাদেশ থেকে রাখীবন্ধনের পালাটা প্রায় উঠেই গিয়েছে। অমুক ঝাণ্ডার দিবস, অমুক শহীদ সন্ধ্যা এসব করে আমরা এত হাঁপিয়ে পড়ি যে, রাখীবন্ধনের দিনটার কথা আর মনেই থাকে না। ভাগ্যিস পঞ্জিকার পাতায় ওটা লেখা থাকে। তা ছাড়া পশ্চিমা লোকদের দোকানেও রাখী রাখীপূর্ণিমার দুই-এক দিন আগে থেকে বিক্রি হয়।

আর মাড়োয়ারি মহলে এখনও রাখীর কদর আছে।

কিন্তু এই বাংলাদেশেই মাত্র বছর পঞ্চাশেক আগে এমন সময় ছিল যখন রাখীবন্ধন একটা জাতীয় অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজ সরকার বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দিল। কিন্তু বাঙালি তা মেনে নিয়ে ভাই ভাই আলাদা হয়ে যেতে অস্বীকার করল। মায়ের ডাকে এক হয়ে সব বাঙালিই পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে এক বাঙালি এক হৃদয় হয়ে গেল।

সে ছিল একটা ভাবের বন্যার যুগ। স্বদেশী যজ্ঞের আসনে বসে বাঙালি পৃথিবীর সব জায়গার ইতিহাস থেকে বেছে বেছে স্বাধীনতার মন্ত্রগুলি আহরণ করল। যেখানে যত স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনি ছিল, সব মন দিয়ে পড়ল। ইটালির ম্যাটসিনি গ্যারিবাল্ডি থেকে রাজপুত মারাঠা বীর সবাইকে বাঙালি পূজার আসনে বসাল। গোটা ভারতবর্ষের বীরদের খুঁজে আবিষ্কার করল বাঙালি। আমাদের রাখীবন্ধনে হাতবাঁধা শুরু হল তখন থেকে।

রাজস্থানে কিন্তু রাখীবন্ধনের একটু অন্যরকম মানে ছিল।

মানুষ যে চিরকালই শিভ্যালরির ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছে রাখী তারই আর একটি উদাহরণ। যে দেশে যে যুগে স্ত্রী-পুরুষে বেঁধে দেওয়া ছিল শুধু একটি সম্বন্ধ, যে শাস্ত্র অনুসারে ঘি আর আগুনের কথা মনে রেখে

স্ত্রী আর পুরুষকে তফাত রাখাই ছিল সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ, সেখানে রাখী এনে দিল একটা রোমাঞ্চকর নতুন রকমের সম্বন্ধ।

সখাকে সখা হিসাবে স্বীকার করতে না যদি দেয় সমাজ, রাখী তাকে অন্তত ভাই হিসাবে মনের কাছে এনে দেবে। সম্পূর্ণ অলক্ষ্য থেকে যার কাছে রাখী পাঠিয়েছিল কোনও পুরনারী, সে যদি বীর হয় তাহলে বিনা দ্বিধায় বিনা বিচারে চোখে না দেখা নারীর পক্ষ নেবে। তাকে বিপদে করবে রক্ষা, সম্পদে দেবে সম্মান।

হোক না রাখী সামান্য সুতোর তৈরি, নাই বা রইল তাতে চকচকে জিনিসের আভিজাত্য—রাখীবন্ধ ভাইয়ের কাছে সেই রাখীর চেয়ে দামী কিছু থাকত না। রাখী সে হাতে তুলে নিয়ে বোনের জন্য পাঠাত একটি কাঁচুলি। যে বুকে আমার জন্য ভাইয়ের ভালোবাসা তুমি স্বীকার করেছ, ওগো বোন, সে বুক তোমার এই কাঁচুলি দিয়ে বর্মের মতো ঢেকে রেখো। আমি রইলাম তোমার ভাই, সব বিপদে তোমার কাছে আছি; তোমার সব সুখে হব মনে মনে সুখী। দূর থেকে চোখের দেখাও তোমার সঙ্গে হবে না কখনও। তোমার মুখের এক ফোঁটা হাসিও আমায় কখনও পুরস্কার দিতে আসবে না। তবু দূর থেকে আমি রইলাম তোমার রাখীবন্ধ ভাই।

এই মধুর সম্পর্কের রহস্য ইউরোপের মধ্যযুগের নাইটরা কখনও আস্বাদ করে নি। ওদের বড় বড় পরবে তরোয়াল খেলা বা ঘোড়ায় চড়ে দেখনসই লড়াইয়ের সময় কোনও রাজকন্যা বা নাম করা সুন্দবীর হাতের রুমাল বা দস্তনা বকশিশ পেলে প্রাণ দিয়ে সে খেলা খেলে যেত। কারণ সুন্দরীর মন রক্ষার ভার পড়েছে তার উপরে। সেই শিভ্যালরিতে ছিল রোমান্সের রামধনু, ছোট অদেখা বোনটির বিপদে রাঙানো রাখী নয়।

এমনই একটি রাখী পাঠিয়ে দিলেন রাজমাতা কর্ণ দেবী দিল্লির বাদশা হুমায়ুনের কাছে।

চিতোরের তখন বড় দুর্দিন। রাণা সঙ্গ মারা গিয়েছেন। তাঁর তৃতীয় ছেলে রত্নসিংহ সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হবার আগে লুকিয়ে প্রেম করে অম্বরের রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। তাও নিজে এসে সশরীরে বিয়ে করেন নি। গোপনে গান্ধর্ব মতে বিয়ের ব্যাপার সারবার জন্য নিজের প্রতিনিধি হিসাবে দু দিকেই ধার দেওয়া তরোয়াল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কেউ জানত না এই গোপন প্রেম আর গোপনতর বিয়ের কথা। রত্নসিংহ সিংহাসনে বসেও দাবি করলেন না তাঁর বধূর হাত, আনলেন না তাকে তাঁর নিজের ঘরে। এদিকে তাঁরই বন্ধু আর শালা বুঁদির রাজা এই রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাইলেন। অম্বর রাজবংশ বুঁদির মহাবীর হরবংশের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে রাজকন্যাকে জপিয়ে নিল। যে হাত বিয়ে করবার জন্য তরোয়াল পাঠিয়েছিল সে হাত তো পাণিগ্রহণের জন্য এগিয়ে এল না। নিরুপায় হয়ে রাজকন্যা হলেন রাজি। ভাঙলেন না গোপনে গান্ধর্ব বিয়ের কথা। নতুন করে বিয়ে হয়ে গেল বুঁদির সঙ্গে।

কিন্তু তরোয়াল সে কথা ভুলল না।

বাপের বেটা রাণা রত্নসিংহ বাবরকে রাজস্থান থেকে দূরে হঠিয়ে রেখেছিলেন। মেবারের এক ফোঁটা মাটিও শত্রু ছুঁতে পারে নি। কিন্তু সেই রত্নসিংহ তাঁর নিজের শালা আর গোপন বধূব স্বামী বুঁদিরাজের সঙ্গে বসন্তকালে বনে গেলেন আহেরিয়ার শিকার উৎসবে। বন থেকে দুজনের কেউ ফিরে এলেন না।

তরোয়াল নিজের সম্মান ভুলতে চায় নি।

তারপরেই এল চিতোরের দুর্দিন। ভাই বিক্রমজিৎ না পারলেন সামলাতে সিংহাসন, না বশে রাখতে সর্দারদের। সুবিধা বুঝে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ, মেবার আক্রমণ করলেন। চিতোব সৈন্য না পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল, দিতে চাইল শুধু টাকা ও নজরানা নয়, আগে যুদ্ধ জিতে নেওয়া মালবদেশ পর্যন্ত। এদিকে ঘরভেদী এক মেবারী বিভীষণ, রাণার নিজের ভাইপো, মেবারের সৈন্যদের দুরবস্থার কথা বাহাদুর শার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। কাজেই তিনি সন্ধি করতে রাজি হলেন না। চাই চিতোরগড়, পৃথিবীতে সবচেয়ে দেমাক-ভরা দুর্ধর্ষ গড়। চিতোর চাই।

সামসাময়িক ইতিহাস তারিখ-ই-বাহাদুর শাহীর মতে এমন সম্পূর্ণভাবে চিতোর অবরোধ এর আগে কখনও সম্ভব হয় নি।

বাহাদুর শার সঙ্গে ছিল কামান, ছিল পোর্টুগীজ গোলন্দাজ (সম্ভবত ভাসকো-ডা-গামার কিছু অনুচর) আর রোমক অর্থাৎ এশিয়া মাইনরের লোক সেনাপতি রুমি খান।

রাজপুতরা ইতিহাসের শিক্ষা কখনও নেয় নি। তাই পৃথ্বীরাজ ঘোরীর "নল গোলা"র' (চাঁদ বরদাই

কামানের এই নাম দিয়েছিলেন) সামনে হেরে গেলেন। এক শ বছর পরে আলাউদ্দিন "মঞ্জনিক" অর্থাৎ গোলা ছুঁড়ে মারার যন্ত্র দিয়ে চিতোরের দেওয়াল ভেঙে যুদ্ধ জিতেছিলেন। তারও প্রায় সোয়া দু'শ বছর পরে বাবরের কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল রাণা সঙ্গের ঘোড়সওয়ার রাজপুত সৈন্যদল। তার আট বছর পরে আবার কামান এসে চিতোরের পাঁচিলে গোলা দাগতে লাগল। রাজপুতের হাতে তবু শুধু সেই বর্শা আর তরোয়াল।

শুধু বীরত্ব আর বুকের রক্ত দিয়ে দেশরক্ষা করা যায় না। রাজনীতিতে যখন রোমান্স ছিল তখনও নয়, আর এই অ্যাটম-হাইড্রোজেন বোমার যুগে তো নয়ই।

রাজমাতা কর্ণবতী বিপদ দেখে হুমায়ুনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটি রাখী।

হুমায়ুন ছিলেন কবি, প্রেমিক আর দার্শনিক। সংসারের বুদ্ধিমান লোকেরা এদের মুখে না হলেও মনে মনে পাগল বলে থাকে। হুমায়ুনকেও বাজারের নিক্তির ওজনে বিচার করে দেখতে গেলে অকেজো বলে অনেকে একটু অনুকম্পাই করবে।

তার নিজের চারদিকে ঘোর বিপদ চলছে। আগ্রার দরজায় তখন শত্রুরা হানা দিচ্ছে। হুমায়ুন সশরীরে বাংলাদেশে বসে তাদের প্রাণপণ সামলাবার চেষ্টা করছেন। অথচ নিজের ভাইরাও বশে নেই। এদিকে মুসলমান ও বন্ধুস্থানীয় সুলতানের বিরুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য রাখী পাঠিয়েছেন এক বিধর্মী হিন্দু রানী। তেরোস্পর্শের গেরো এর চেয়ে অনেক সোজা ব্যাপার।

আজ আমরা ইতিহাসের সুবিধামাফিক দূরত্বে চেয়ারে বসে সিগারের ছাই মেঝেতে ঝাড়তে ঝাড়তে সমালোচনা করি যে হুমায়ুন কর্ণবতীর রাখীর পুরোপুরি সম্মান রাখেন নি। সোজা চিতোরে দলে দলে ছুটে না এসে শুধু গোয়ালিয়র পর্যন্ত গিয়ে দুমাস চুপচাপ বসেছিলেন। কিন্তু সেই যুগের লোকের মনের ভাব আর হুমায়ুনের নিজের অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের যাচাই করতে হবে যে, হুমায়ুন যা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অন্যায় হয়েছিল কি না। না তাতে সাপও মরেছিল, অথচ লাঠিও ভাঙে নি।

মেবার কাহিনি বলে যে রাজমাতা কর্ণবতী হুমায়ুনের কাছে রাখী পাঠিয়েছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকরা সে সম্বন্ধে খোলাখুলি কিছুই লেখেন নি। তবে এটা ঠিক যে, হুমায়ুন গোয়ালিয়র পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াতে বাহাদুর শাহ সন্ধি করে পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে চিতোর অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন। (মার্চ, ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

ইতিমধ্যে বাহাদুর ও হুমায়ুনে অনেক চিঠি লেখালেখি হয়। ঐতিহাসিক আবদুল্লার গুজরাটের আরবী ইতিহাসে আর মিরাত-ই-সিকন্দরী নামে ইতিহাসে এই চিঠিগুলি পাওয়া যায়।

একটা চিঠিতে বাহাদুর লিখেছিলেন (নিজে লেখাপড়া জানতেন না বলে মোল্লাদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন)—"আমরা ধর্মবিশ্বাসের রক্ষাকর্তা আর ন্যায়দাতা। অতএব পয়গম্বরের বচন অনুসারে তোমার ভাই যদি অত্যাচারী বা অত্যাচারিত হয়, তাকে সাহায্য করা উচিত।" অর্থাৎ চিতোর অবরোধের সময় বাহাদুরের জয়ের পথে ছায়া ফেলা হুমায়ুনের একান্ত অন্যায় কাজ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত চিঠিতে একটি কবিতাও ঝেড়ে দিয়েছিলেন :

তব তরবারে যদি-না রহে রসনা
শুধু দম্ভে রসনারে অসি করে বস' না।
বাছা, অসি ঝকমক্ নাহি যদি করে
পিতৃবংশ লয়ে দম্ভ করো না বেঘোরে।
বামন হইলে পায়ে রণ-পা বেঁধো না—
শিশুর চোখেতে লম্বা সাজার সাধনা।

ফেরিস্তার ইতিহাসে হুমায়ুন আর বাহাদুরের মধ্যে চিতোর নিয়ে একটি কবিতার উল্লেখ আছে। হুমায়ুন লিখেছিলেন :

ওরে, ওরে তুই চিতোরের দুশমন,
কাফেরে কব্জা করিবার সাধ তোর;
শিরে তোর আসিয়াছে রাজা একজন;
গেড়ে বসেছিস্ তবু চাস্ সে চিতোর।

বাহাদুর জবাব দিয়েছিলেন :

সাঁচ হ্যায়, হাম্‌, চিতোরকা দুশমন.
কাফেরে ধরিব করিয়া গায়ের জোর;
পাকড়াব তাঁরে, জানিস বিলক্ষণ;
যে জন আসিবে রক্ষিতে এ চিতোর।

এ সব চিঠি লেখার আর কবিতা চালাচালির পালা শেষ হতে হতে হুমায়ুন চিতোরের আরও একটু কাছে বাহাদুরের নতুন পাওয়া মালবে এসে পৌঁছালেন।

বিশেষ একটা কারণ ছিল। হুমায়ুন যাই ভাবুন না কেন, বাহাদুর হিন্দু রাজাকে কখনও শাস্তি দেবার পাত্র ছিলেন না। তাই সন্ধি করা ও অনেক টাকা, অনেক নজরানা ও গোটা মালবদেশ চিতোরের কাছ থেকে পাওয়া সত্ত্বেও মাত্র উনিশ মাস পরে ফিরে এসে আবার বিনা অজুহাতে চিতোর আক্রমণ করলেন।

এদিকে হুমায়ুন কি করলেন?

শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এ ছিল শ্রীরাধার প্রতিদিনের সমস্যা। সংসারের অতীত জগতে আমরা যা করতে চাই বা করা উচিত বলে মনে করি তার বিচারের মধ্যে মিশে থাকে নিজের মনের রঙ। মনের চেয়ে বড় মনিব কেউ নেই সেখানে। কিন্তু রাজনীতিতে তো মনের ঠাঁই নেই। না মনের, না মানবতার।

তাই হুমায়ুন চিতোরের দিকে এগিয়ে গেলেন না। এগোতে লাগলেন মালবের ভিতরে বাহাদুরের রাজ্যের দিকে। কিন্তু বাহাদুর তাতে একটুও ঘাবড়ালেন না। বিচক্ষণ মন্ত্রী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আর যাই করুন হুমায়ুন, হিন্দুর হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বেন না। মন্ত্রীর এই বিবেচনা বিচার খুবই ঠিক হয়েছিল। অবশ্য বাহাদুরের গুজরাট থেকে সৈন্য বা সাহায্য আনার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

এদিকে কর্ণবতী কি করলেন? রাজা যেখানে অপদার্থ সেখানে রাজমাতা নিজের হাতে তুলে নিলেন সব দায়িত্ব। সব বিগড়ে-যাওয়া সর্দারদের তিনি পথে আনলেন। বোঝালেন যে, রাজার বিরুদ্ধে তাঁদের নালিশ থাকতে পারে, কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে নয়। রাজা তো শুধু সিংহাসনে বসেন; কিন্তু দেশ যে জুড়ে আছে হৃদয়-সিংহাসন।

রাজা ও ভবিষ্যৎ রাজা উদয়সিংহকে চিতোর থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু চিতোর রক্ষা করবার অধিকারী হচ্ছেন শুধু চিতোরের রাজা। তাই দেওয়ালিয়ার সামন্ত রাওৎ বাঘসিংহকে অভিষেক করা হল রাজা বলে। তাঁর মাথার পিছনে দাঁড় করানো হল চাঙ্গি অর্থাৎ সোনার সূর্যচক্র। মেবারের রাজসিংহ আর মৃত্যুর সপ্রেম আমন্ত্রণ।

পৃথিবীতে আর কোথাও কি লোকে হাসিমুখে রাজা সেজে বসেছে, শুধু সঙ্গে সঙ্গেই মরবার অধিকারটুকু পাবার জন্য?

ফিরিঙ্গির কামান চিতোরের দেওয়ালের অনেকখানি ভেঙে দিল। মাটির নিচে গোপন লম্বা গর্ত খুঁড়ে সেখানে বারুদ দিয়ে ফটক উড়িয়ে দিল। কিন্তু যারা মরতে ভয় পায় না, তাদের না মেরে পথ করবার পথ কোথায়?

চিতোরের বাকি বীরদের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ যুদ্ধে চলেছেন রাজমাতা নিজে। বর্মে ঢাকা তাঁর বপু, ধর্মে উজ্জ্বল তাঁর পরলোক।

খ্যাৎ অর্থাৎ রাজপুত গাথা বলে যে, বত্রিশ হাজার বীর এই যুদ্ধে মারা গেলেন। আর জহরব্রতে আত্মদান করলেন তেরো হাজার পুরনারী।

হুমায়ুন সারাজীবনের মধ্য দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছিলেন। আর হোঁচট খেয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যান। সেই শেষ পর্যন্ত চিতোরের পতনের এক মাসের মধ্যে বাহাদুরের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হল। বাহাদুর শাহ বেধড়ক হেরে রাজ্য ছেড়ে বেমালুম পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আর সেই বছরের মধ্যেই হুমায়ুন রাণা বিক্রমজিৎকে এনে চিতোরের সিংহাসনে বসান।

শেষ পর্যন্ত রাখীর সম্মান রক্ষা হল।

দিল্লি আর চিতোরে চিরকাল শত্রুতা আর লড়াই চলা সত্ত্বেও এই রাখীর সম্মান কিন্তু সব সময় বজায় ছিল। সেকালে রাজনীতিতে ছিল রোম্যান্স আর রাজাগিরিতে ছিল রাজসিকতা। এ যুগে তাড়াহুড়ো করে দুশমনকে একটা বোমার ঘায়ে সাবড়ে দিতে না পারলে চাচা আপনা বাঁচা বলে লেজ গুটানোর পর্যন্ত সময়

মেলে না। ব্লিৎসক্রীগ অর্থাৎ বেমক্কা হামলা যেখানে লড়াইয়ের প্রথম পাঠ, সেখানে শিভ্যালরির ঠাঁই নেই।

কাজেই আজকাল আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত যে, যে-আকবর, নিজের বাপ রাখীকে এই সম্মান দেখানো সত্ত্বেও মাত্র বত্রিশ বছর পরে চিতোরকে (এই তৃতীয় ও শেষবার চিতোর ধ্বংস হল) চুর চুর করে ধ্বংস করেছিলেন, তিনিও মেবারের সঙ্গেই রাখীবন্ধন সম্বন্ধকে খুব সম্মান দেখাতে ভালোবাসতেন।

জাহাঙ্গীর আর শাহজাহানের মায়েরাই তো ছিলেন রাজপুতানী। কাজেই ওঁরা যে রাখীকে মাথায় তুলে রাখবেন, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

এমন কি আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মেবারের রাজমাতাকে প্রিয় ও সুশীলা বোন বলে সম্বোধন করে খুব সম্মান দেখিয়ে দুখানা চিঠি লিখেছিলেন। অবশ্য সে চিঠি দুটিতে মুন্সিয়ানা এত পাকা ছিল যে, লোকে এই বোন ডাকার মধ্যে রাখীর কোনও রঙ খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ।

চিতোরগড়ের বিরাট প্রথম পোল অর্থাৎ ফটক পিছনে রেখে বেরিয়ে এলাম। সামনে সমস্তটা রাজোয়ারা আমায় বাহু তুলে আহ্বান করে নিল।

বুঝলাম যে, আমাদের অগ্নিযুগে বাংলার সঙ্গে রাজস্থানের যে অদৃশ্য রাখীবন্ধন হয়েছিল, তার কথা আমরাও ভুলব না, রাজস্থানও নয়।

বাইরে থেকে ব্যাপারটা খুবই সামান্য। কিন্তু মনের দিক দিয়ে তা হয়ে রইল অসামান্য। এই তো হল আমার রাজোয়ারার সঙ্গে সবচেয়ে বড় পরিচয়।

মহারাণা প্রতাপের বংশধরের সঙ্গে আলাপ করবার মনে মনে লোভ ছিল। না না, দরবারের দেখা দেখা নয়। সে তো হবে কেতাদুরস্ত নিয়মমাফিক মামুলী ভদ্রতা আর ওজন করে কথা বলা মাত্র। লোভ ছিল তার চেয়ে বেশি কিছু, বেশি কাছের জিনিস। কর্নেল টডের প্রথম মেবার দরবারে যাওয়ার মতো ঐতিহাসিক কিছু অবশ্যই নয়। শুধু মনের একটুখানি কৌতূহল মেটাবার ও মন খুলে কথা কইবার মতো সুবিধা।

চিতোরে সেই সুযোগ এসে গেল হঠাৎ। মহারাণা উদয়পুর ছেড়ে শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন চিতোর অঞ্চলে। এখন তিনি চিতোরের গ্রামে সমতল ভূমিতে তাঁর যে প্রাসাদ আছে, তাতে কয়েক দিনের জন্য এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ইচ্ছা জানিয়েছিলাম। মহারাজা সময় দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

সন্ধ্যা—মেবারের নিজস্ব স্বাধীন জীবনের সন্ধ্যা, যার সঙ্গে জড়িয়ে গেল ভারতের সম্মিলিত স্বাধীন জীবনের উষা।

কিন্তু চিতোরের আকাশে সন্ধ্যাসূর্য যে জহরব্রতের আগুনজ্বালা ছড়িয়ে দেয় প্রতিদিন—তার আড়ালে কোথায় যে সন্ধ্যা মিলিয়ে গিয়েছিল তা খেয়াল হয়নি। দিনের পর দিন দেখেছি সে সন্ধ্যাকে, রেখেছি জ্বালিয়ে মনের মধ্যে স্মৃতির শত দেওয়ালী। ভুলেছি আজকের দিনের আগামী অন্ধকারকে।

আজও তাই হল।

তাই মহারাণার সঙ্গে দেখা করবার সময় পেরিয়ে গেল। মনে মনে যেমন লজ্জা, তেমনি ব্যথা পেলাম।

খুব মাপ চেয়ে আর আফসোস জানিয়ে চিঠি লিখছি, এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়ল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক রাজপুত বীর।

জেনারেল মনোহর সিং।

মহারাণার সৈন্যদলের সেনাপতি। বেদলার চৌহান রাও। এঁর পূর্বপুরুষ হলদিঘাটে দেহের রক্ত ঢেলেছেন উজাড় করে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়-পরাজয়ে পুরুষানুক্রমে মেবারের বিশ্বাসী সামন্ত। তাঁর কৌলীন্যের বিচার হয়েছে জায়গীরের বহর দিয়ে নয়, হাতিয়ারের হিম্মৎ দিয়ে।

মৃদু হেসে রাজপুত ঢঙে নমস্কার করে বললেন যে, আমরা যে গড় দেখতে গিয়ে আত্মহারা হয়ে সময় ঠিক করতে পারব না, সে সম্ভাবনার কথা মহারাণা ভোলেন নি। তাই যদি আমরা অসুবিধা বোধ না করি, তাহলে এখন তাঁর কাছে আসতে পারি।

মহারাণার সুবিবেচনা আর বিচক্ষণতার অনেক কাহিনি শোনা ছিল। হাতের কাছে এই সামান্য ঘটনাতো তারই আর একটি দৃষ্টান্ত পেয়ে মনটা খুবই খুশি হল।

এ পর্যন্ত শুধু শিশোদিয়াদের যুদ্ধে বীরত্ব ও মৃত্যুকে নির্ভয়ে বরণের কথা শুনেছি। কিন্তু শান্তির মধ্যে

বীরত্ব ও জীবনকে হাসিমুখে গ্রহণ করার উদাহরণ পেলাম শ্রীভূপাল সিংহ মহারাণার মধ্যে। প্রথম যৌবনে ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিসে পঙ্গু হয়ে গেলেন। অথচ চোখের সামনে বয়ে যাচ্ছে জীবনকে ভোগ করবার সব উপকরণের বন্যা। বর্ষার স্রোতের মত। তাঁর যৌবনকালে বহু রাজমুকুট ও মুকুটের ভাবী অধিকারী সে স্রোতে ভেসে গেছে।

পূবে হাওয়া বয়, বাধা নেই কেউ,
যৌবন ভরি' উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে সুখে মিশি সুখ ছলছল উঠে বাজি রে।

যে কোনও সাধারণ লোকও চোখের সামনে সর্বদাই এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হয় সংসারে বিরাগী, নয় সমাজবিদ্বেষী হয়ে যেত।

দেশে দেশে যুদ্ধে থাকে ক্ষণিকের বীরত্বের স্বদেশপ্রেমের মাদকতা। কিন্তু প্রতিদিনের প্রতি রাত্রির যুদ্ধে, জীবনের সঙ্গে একতরফা যুদ্ধে নেই কোনও চমক, কোনও হাততালি। হাসিমুখে পঞ্চাশ বছর ধরে শ্রীভূপাল সিংহ সেই নীরব নিষ্কাম বীরত্ব দেখিয়ে এসেছেন। তবু মাথা তাঁর ঠাণ্ডা, মন তাঁর শান্ত, আর বিচার-বিবেচনার নেই অন্ত।

এও জানতাম যে, যদিও যুদ্ধ করবার আর সুযোগ ছিল না দেশীয় রাজাদের, তবু মেবার বংশ যুদ্ধে যাবার মতো মানসিকতা পুরোপুরি বজায় রেখে এসেছে। ১৯১১-এ দিল্লির দরবারে সব দেশীয় রাজাদের ডাক পড়ল ইংরেজ সম্রাটের কাছে মাথা নোয়াতে আসবার জন্য। না আসবে আর কুর্নিশ করে মাথা নিচু না করবে এমন সাধ্য কার? এই তো হল এ যুগের রাজসূয় যজ্ঞ।

কিন্তু এলেন না মহারাণা ফতে সিংহ।

চারদিকে মহা হৈচৈ। ব্রিটিশ সিংহের কেশর তখন পতপত করে সগৌরবে সসাগরা ধরণীর চারিদিকে ফুলে ফুলে নেচে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে। তার লেজের সামান্য নাড়াচাড়াতেই মাথা থেকে মুকুট খসে পড়ে। তবু কিনা উদয়পুর আসতে চায় না দিল্লিতে। এবার গেল বুঝি রাণা প্রতাপের বংশ ফতে সিংহের সঙ্গে ফৌৎ হয়ে।

অনেক করে বোঝালেন ডাকসাইটে ভাইসরয়ের এজেন্ট জেনাবেল স্যার ইলিয়ট কলভিন। রাজি হলেন ফতে সিং। উঠে বসলেন স্পেশ্যাল ট্রেনে।

চিতোরের কাছে এসেছে ট্রেন। এমন সময় হুড়মুড় করে তাতে উঠে পড়লেন এক রাজপুত চারণ। সবাই উঠল হৈহৈ করে। কিন্তু কে ঠেকাবে এই রণসাজে তৈরি চারণ বুড়োকে? তিনি ঝাড়তে লাগলেন এক চারণ কবিতা।

হে মহারাণা, তোমার পিতৃপুরুষবা কখনও দিল্লির কাছে মাথা নোয়ায় নি। আর আজ তুমি চলেছ সেই উঁচু মাথা নিচু করতে! তুমি বলে যাচ্ছ যে, যখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করেছিল তোমার পূর্বপুরুষ (জাহাঙ্গীরের সঙ্গে অমরসিংহ সন্ধি করেন) তখনও রাণা নিজে কখনও দিল্লিতে যান নি, গিয়েছিলেন তাঁর যুবরাজ এবং সে জন্যই মেবারের যুবরাজের আসন হচ্ছে তাঁর ষোলজন সামন্তের নিচে।

তুমি আজ সেসব কথা ভুলে যাচ্ছ?

ট্রেন এগিয়ে চলেছে চিতোরের দিকে। সেই পূর্বপুরুষের চিতোর, মহারাণারা যাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়েন নি।

ট্রেন ফিরে গেল উদয়পুরে। না, মহারাণা দিল্লিতে যাবেন না।

ভাইসরয়ও নাছোড়বান্দা। সার্বভৌম সম্রাটের দরবারে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত মেবার দেশের রাণা আসবেন না? তাহলে ইতিহাস কি বলবে পরে? বড়লাট নিজে জরুরি টেলিগ্রাম করলেন।

শেষ পর্যন্ত বন্দোবস্ত হল যে, মহারাণা আসবেন। কিন্তু দরবারে নয়, এমন কি দিল্লিতেও নয়। দিল্লির বাইরে একটি বিশেষ তাঁবুতে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে শুধু পরিচয় করেই তিনি ধুলো পায়ে ফিরে যাবেন।

সেই মেবার বিনা দ্বিধায় নিজে যেচে বৃহত্তর রাজপুতানা ইউনিয়ন গড়ে ভারতের সঙ্গে এক হয়ে আত্মবিলোপ করবার জন্য এগিয়ে এল। গোটা ভারতের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই হবে মেবারের নতুন যুগের মেবারের নতুন রকমের স্বাধীনতা।

এর পরে রাজোয়ারায় টুকরো টুকরো যে সব ইউনিয়ন তৈরি হচ্ছিল, সেগুলি সব মিলে একটা বড় ইউনিয়ন হয়ে "পার্ট বি স্টেট" হয়ে যাওয়ার পথে কোনও বাধা রইল না। আর কোনও স্বতন্ত্র দেশীয় রাজাই এর পরে সারা ভারতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে কোনও বাধা বোধ করলেন না। না রাজনৈতিক না মানসিক।

এ হেন বীরত্ব যিনি দেখিয়েছিলেন, তাঁকে দেখতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মাত্র কয়েক মিনিট পাশের ঘরে বসতে হয়েছিল। সেজন্য প্রথমে তাঁর সর্দাররা ও পরে তিনি নিজে যেভাবে ক্ষমা চাইলেন, তাতে বুঝলাম যে, যে নিজে বীর তারই মাথা আপনা থেকে নুয়ে আসতে পারে। যে ভীরু, যে উদ্ধত—তারই দরকার মাথা উঁচু বিজ্ঞাপনের।

শ্রীমতী ও আমার সঙ্গে মহারাণার অনেকক্ষণ আলাপ হল। এখানে তার মধ্যে যে কথাটুকু খাপ খাবে, শুধু সেইটুকুই এখন বলা যাক। তিনি নিজেই বললেন, কর্নেল টড্ ছাড়া একমাত্র বাঙালিই পৃথিবীর সামনে রাজস্থানকে দাঁড় করিয়েছে। রাজপুত বাঙালির চোখ দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। সেজন্য রাজোয়ারা বাঙলা সাহিত্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

তিনি আরও বললেন যে, রাজোয়ারার ইতিহাসকে সামনে রেখে বাংলা ও পরে সারা ভারত যে স্বাধীনতার জন্য দেহের রক্ত ও জীবনের শান্তি উৎসর্গ করেছিল সেজন্য রাজোয়ারা ও বাংলার রাখীবন্ধন হয়ে গেছে।

এই নবযুগের রাখীবন্ধনের পিছনে ছিল না কোনও আত্মরক্ষার আকুতি বা অসহায়ের আবেদন। ছিল শুধু একটা ইতিহাসের ঘটনা। অথবা হয়তো তাও না—শুধু একটা আষাঢ়ে গল্পকে নতুন করে জীবন দিয়ে মন্ত্র গড়ে নেওয়া।

সে মন্ত্র গড়লাম আমরা। শুধু বাংলা ও রাজোয়ারা নয়: ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ সে-মন্ত্রে বাঁধা পড়ল। ইতিহাসে এই প্রথম সারা ভারত মিলে আমরা এগিয়ে গেলাম খালি হাতে খোলা গায়ে নতুন রকমে এক যুদ্ধে।

হল ভারতের জয়।

পনেরো

অসি আর বাঁশি, শক্তি আর ভক্তি এই দুয়েরই পাশাপাশি সমাবেশ পেলাম চিতোর গড়ে। মেবারের প্রাচীন রাজধানী পবিত্র চিতোর গড়ে। শুধু রাজোয়ারা নয়, সমস্ত হিন্দুস্থানে এমন একটি বিপরীত ধর্মের লীলা একই জায়গাতে দেখা যায় না।

গুজরাটে ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ী রাণা কুম্ভের স্মৃতিচিহ্ন অতুলনীয় জয়স্তম্ভের ছায়া প্রতি সন্ধ্যায় এসে পড়ে মীরার প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরে। কুম্ভের প্রতিষ্ঠিত বিরাট শিব মন্দিরের পাশে একই অঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে ছোট কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুন্দর মীরার সেই মন্দির। একটি বিজয়ী মহারাণার দম্ভে তৈরি, আর একটি বিধবা রাজকুলবধূর প্রেমে ঘেরা। কিন্তু দুটি প্রতিষ্ঠানেই এসে মনের মধ্যে ব্যথা জেগে ওঠে। দু জায়গাতেই "শূন্য মন্দির মোর"।

মন্দিরে মূর্তি নেই। মীরার চোখের জলে স্নান করানো মূর্তিটি এখন আছে উদয়পুরে জগদীশ মন্দিরের কোণে ছোট একটি মন্দিরে।

কিন্তু মীরা সারা ভারতে মানুষের হৃদয়মন্দির ভরে দিয়ে গেছেন। গানে গানে সুরে সুরে গিরিধারী গোপালের আসন মানুষের মনে গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন। প্রেম দিয়ে ভগবানকে পাবার যে ব্যাকুল বাসনা মধ্যযুগে মানুষের মনে জেগে উঠেছিল মীরা তাকেই আনন্দে বেদনায় দিন-রজনীর চেতনা ও স্বপন দিয়ে গড়ে রূপ দিয়েছিলেন।

তাঁর সেই রূপসৃষ্টির ফলে শুধু রাজস্থান, ব্রজভাষা ও গুজরাটিই নয়, হিন্দি ভাষাও প্রথমে গড়ে উঠবার যুগে নূতন গতিবেগ পেয়ে গেল। আজ যে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, তার সৃষ্টির মূলে মীরার ভজনের দান সামান্য নয়। ধর্ম আর সাহিত্যের এই যোগ বাংলাদেশের শূন্য পুরাণ, মনসামঙ্গল আর বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা ভালো করেই পেয়েছি।

সে যুগের উত্তরভারতে একদিকে রাজ্যে রাজ্যে নিত্য হানাহানিতে জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল। আর

একদিকে আশা ও আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে সমুদ্রমন্থন থেকে লক্ষ্মীর মতো উঠে এলেন মীরা।

তিনি একা নন। সেই দুর্যোগের যুগে আমরা পেয়েছি পূর্বে বাংলায় শ্রীচৈতন্য থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাবে নানক পর্যন্ত অনেকের প্রেমধর্মের বাণী। তা না পেলে সাধারণ মানুষ টিকতে পারত না। নানক পাঞ্জাবে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের গান গাইলেন—

কাহে রে বন খোজন জাই।
সর্ব বিরাগী সদা অলেপা তোহী সঙ্গ সমাই॥

* * *

বাহর ভীতর একৈ যানো রহ গুরু জ্ঞান বতাই।
জন নানক বিন আপ চীহ্নে মিটৈ ন ভ্রম ভাই॥

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি গড়লেন নতুন শিখ সমাজ।

নিরক্ষর জোলা কবীর সৃষ্টির মধ্যে এক অপরূপ লীলার সন্ধান পেয়ে বললেন—

জল মেঁ বসৈ কমোদিনী, চন্দা বসৈ আকাশ।
জা হৈ জাকো ভাবতা, সো তো হি কে পাস॥
প্রিতম কো পড়িয়াঁ লিখুঁ, জো কহুঁ হোয় বিদেশ।
তন মে মন মে নৈন মে, তা কি কহা সন্দেশ॥

দক্ষিণে রামানুজ জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করলেন। তুলসীদাস এমন এক রামায়ণ রচনা করলেন যার সুর করে পড়ে যাওয়া চিরকাল হিন্দিভাষাকে প্রতিদিনের প্রেরণা, প্রতি রাত্রির শান্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান সুফীরা তখন ঈশ্বরের রহস্যময় রূপের আরাধনা করছেন আর চিস্তীরা প্রেমিক বিশ্বপতির কল্পনা করছেন।

যে সময় এদেশের পূর্ব প্রান্তে শ্রীচৈতন্য নেচে নেচে এমন প্রেমভক্তিতে দেশকে ভাসিয়ে দিলেন আর পশ্চিম প্রান্তে মীরা গান গেয়ে উঠলেন—

সখী রী মৈঁ তো গিরধরকে রংগ রাতী।
পঁচ রঁগ মেরা রঁগা দে; মৈঁ ঝুরমুট খেলন যাতী॥

সখী, আমি গিরিধরের রঙে রঙিয়ে আছি। আমার শাড়ি পাঁচ রঙে রাঙিয়ে দাও, আমি ঝুটমুট অর্থাৎ রাস খেলতে যাই।

কিন্তু হায়, যেমনভাবে বাংলাদেশে সবাই শ্রীচৈতন্যের জন্য প্রেমানন্দে নেচে গেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে এগিয়ে এসেছেন সেভাবে রাজস্থান তার সে খেলায় যোগ দিতে এগিয়ে এল না। মীরার যুগে রাজস্থানের ইতিহাসে তাই মীরার বিশেষ স্থান ছিল না।

সে স্থান খুঁজে পেতে গেলে আমাদের পড়তে হয় নাভাদাসের রচিত ভক্তমাল (রচনাকাল ১৫৮৫-১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ) আর তাঁর শিষ্যা প্রিয়াদাসের টীকা। কিন্তু মীরার মন্দিরের সোপানে বসে যখন খালি মনের ভিতর থেকে গুন গুন করে উঠছে যে।

মীরা ব্যাকুল বিরহিণী
সুধ বুধ বিসরানী হো।

তাই কে যায় খোঁজ করতে যে মীরা রাণা কুম্ভের স্ত্রী ছিলেন কিনা; আকবর তাঁকে ছদ্মবেশে দেখে গিয়েছিলেন কিনা, অথবা তুলসীদাসের সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখালেখি হয়েছিল কি না।

আমি তো ইতিহাসের পুরানো পাতাগুলির পাঠোদ্ধার করতে আসি নি, অমৃতঝরানো ভজনগুলিই আমার জন্য যথেষ্ট।

ষোল শতাব্দীর প্রথম দিকে সম্ভবত ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে মীরা এক পরমবৈষ্ণব রাঠোর বংশে জন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় কোনও পাড়াপড়শির বাড়িতে একটি মেয়ের বিয়ে দেখতে গিয়ে বালিকা মীরা তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মা, ওই বর তো এই মেয়ের স্বামী। কিন্তু আমার স্বামী কে?

ছেলেমানুষের এই ছেলেমানুষী প্রশ্নে সবাই হেসে উঠল। খেলাচ্ছলে গৃহদেবতার মূর্তি দেখিয়ে দিয়ে মা বললেন—"এই গিরিধারীলাল তোমার স্বামী।"

অলক্ষ্যে ভগবানও হেসে উঠলেন।

আর একদিন, তখনও মীরা ছেলেমানুষ, একজন সন্ন্যাসী এসে অতিথি হল। সঙ্গে তার নারায়ণের শিলামূর্তি। চার বছরের কচি মেয়ের আনন্দের অন্ত নেই। সেই মূর্তিটি সে ধ্যান করতে লাগল। সন্ন্যাসী যখন ঘর ছেড়ে চলে যাবে, তখন মীরা সেই মূর্তিটি নেবার জন্য বায়না ধরলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কেন তার নিজের উপাস্য মূর্তি দিতে যাবে? চটে মটে তাড়াতাড়ি একেবারে পরগনা ছেড়ে উধাও। এদিকে মেয়ে আরম্ভ করলেন উপবাস। যতদিন আমার উপাস্য মূর্তি না পাব, ততদিন আর কিছু খাব না। নারায়ণ হয়ে উঠলেন চঞ্চল। স্বপ্নে এসে সন্ন্যাসীকে আদেশ দিলেন—যে আমায় প্রকৃতই পূজা করবে তাকে মূর্তি দিয়ে দাও।

আসল ভক্তের হাতের পূজা—তাতেই যে ভগবানের লোভ।

এদিকে মেয়ের রূপের খ্যাতির অন্ত নেই। গুণ হচ্ছে অন্তরের, কিন্তু রূপ হচ্ছে বাহিরের। সুগন্ধের মতো বাতাসে বাতাসে তার বার্তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। মেবারের রাণার কানে পৌঁছল সে রূপের খ্যাতি। মেবারের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী রাণা "হিন্দুপৎ" অর্থাৎ হিন্দুদের প্রতিনিধি সংগ্রামসিংহের ছোট ছেলে ভোজের সঙ্গে মীরার বিয়ে হল। মীরা এলেন শ্বশুরবাড়ি—সঙ্গে শিলামূর্তি—

"মীরাকে প্রভু
পূরব জনমকে সাথী।"

চিতোরের রাণারা পরম শৈব। তাঁরা মেবার শাসন করেন একলিঙ্গ শিবের দেওয়ান হিসাবে। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম পা দেবার সময় আগে যেতে হবে গৃহদেবতাকে প্রণাম করতে। মীরাকে রাজপরিবারে সবাই প্রথমেই নিয়ে গেলেন শিব মন্দিরে। কনের নিজের পায়েতে বাজছে নূপুর; কিন্তু তিনি কানে শুনছেন কার নূপুরধ্বনি? সে কি তাঁর জীবনমরণ কী সাথী, সেই চিদানন্দ, যাঁর সামনে তিনি নাচেন? যাঁকে নেচে নেচে আনন্দ দেন, নিত্য প্রেমভিক্ষা করেন যাঁর কাছে? যাঁকে তিনি রোজ নিবেদন করেন যে,

প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা
সুরতকী কহনী কাছুংগী

বৈষ্ণব কাহিনি বলে যে মীরা গৃহদেবতাকে প্রণাম করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু যিনি গেয়েছিলেন যে,

তেরে ভুবনবৃন্দাবন মেঁ সাঁওলিয়াকে
স্থর বাজে

তিনি নিশ্চয়ই শিবের মূর্তির মধ্যেও গিরিধারীকে দেখতে পেয়েছিলেন।

আর এই পরীক্ষা তো সাধকের পক্ষে নতুন বা একটিমাত্র পরীক্ষা হতে পারে না। মীরার গুরু রবিদাসের আর একজন শিষ্য ছিলেন কবীর। কবীর বলে গেছেন যে, সাধকের সাধনা সতীর সাধনার চেয়ে কম নয়। সে কথার সত্যতা মীরার জীবনে বার বার ফুটে উঠেছে।

কিন্তু মীরাকে তার প্রভু বেশিদিন সংসারে রাখলেন না। বিয়ের দশ বছরের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু হল। পৃথিবীর সম্বন্ধে যিনি স্বামী ছিলেন তাঁকে হারালেন, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে যিনি চিরকালের স্বামী সেই প্রভু গিরিধর নাগর তো রয়ে গেলেন সঙ্গেই।

আওয়ন আওয়ন কহি গয়ো
হরি আওয়ন হী কি বাত

হরি তো বার বার আসবার কথাই বলে গিয়েছেন। কাজেই মীরা তো স্বামীহীনা নন।

মেবারের আকাশ তখন অন্ধকার হয়ে আছে। সাংসারিক শৌর্য বা মানবিক ঐশ্বর্য কোনও দিকেই মেবারের দিন ভালো যাচ্ছিল না। রাণা সঙ্গের পরাজয় আর মৃত্যুর পর শিশোদিয়ারা বাইরের সব কিছু বড় জিনিস থেকেই নজর সরিয়ে এনে শুধু ঘরের দিকেই তাদের চোখ খোলা রেখেছিল। তাই দেওর রাণা বিক্রমজিতের নজর এড়াল না যে, মীরা ভজন আরাধনে ও সাধুসন্তের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছেন। রাণা এই ধরনের জীবনের উপর অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে গেলেন আর মীরাকে নানারকমে বাধা দিতে ও পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেক নির্যাতন তাঁকে সইতে হল। কিন্তু যিনি তারা গুনে গুনে রাত প্রভাত করে দেন আনন্দক্ষণের প্রতীক্ষায়, যিনি জানেন যে

"মিলতে বিছুড়ন জাবে"

তোমায় পাওয়া হলে সব বিরহ দূর হয়ে যাবে—তাঁকে দুঃখ দেবে সংসারের কোন্ শক্তি?

ননদিনী উদাবাঈ এসে অনেক করে বুঝালেন। বললেন—ওগো ভাভী (বৌ), আমাদের রাজকুলে কলঙ্ক লাগছে। নগরে সবাই তোমার নিন্দা করছে এই সব সাধুসঙ্গের জন্য। তুমি এ সব ছাড়।

মীরার কাছে "তুম বিন সব জগ খারা"—তুমি ছাড়া সমস্ত পৃথিবী বিস্বাদ। তাই তিনি উত্তর দিলেন যে "হুম সে রহে চিত চোরী"—সে রসে আমি ডুবেছি। আর আমার কিছুই চাই না।

উদা সংসারের বহু সুখের লোভ দেখালেন। বললেন,—মণিমুক্তোর অলঙ্কার পর, সুখ ভোগ কর। সন্ন্যাসীর জীবনে কত দুঃখ; সে দুঃখ সহ্য করে লাভ কী?

মীরা উত্তর দিলেন—

"য়ো সংসাব সকল জগ ঝুঁটা
ঝুঁটা কুলরা নাতী।"

এ সবই মিথ্যা। সত্য শুধু আমার "জনম মরণ কে সাথী", যাকে "নহি বিসরু দিন রাতি"।

উদা অনেক ভয় দেখালেন, অনেক রাগ করলেন। নানা রকম অত্যাচার হল মীরার উপর। মৃত্যুর ভয়ও বাদ গেল না। কিন্তু মীরা গাইলেন,—

জব সে মোহি নন্দনন্দন দৃষ্টি পড়্যো মাই
তব সে পরলোক লোক কছু না সোহাই॥

সন্ত-কাহিনিতে বলে রাণা নাকি এর পরে মীরার কাছে হরিচরণামৃত বলে বিষের পাত্র পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে বিষ মীরার হাতের স্পর্শে অমৃত হয়ে গেল।

সে যাই হোক, সংসারের বিষপানে মীরা হলেন নীলকণ্ঠ। কিন্তু সে নীলিমা বিরহ- বেদনার রঙে রাঙানো। প্রিয় বিনা হোলি তাঁর ভালো লাগে না। তিনি ছাড়া মীরাব ঘরের অঙ্গন শোভা পায় না। মীরা দীপও জ্বালাতে চান না; কারণ প্রিযতম যে দূরে। শূন্য শয্যা বিষেব মতো লাগে। যেন বিষ শুষে শুষে প্রাণ শেষ করে নিচ্ছে।

আরও গল্প আছে যে এবকম অবস্থায় মীরা কী করবেন তা ঠিক করতে পাবেন নি। তিনি তাই তুলসীদাসকে লিখেছিলেন, আমি আপনার মেয়ে, এই বিপদে আমার কি করা উচিত তা আমায় জানান। তুলসীদাস নাকি তাঁকে উত্তরে লিখেছেন যে, যে-গৃহে হরির অপমান হয় সে গৃহ প্রিয় গৃহ হলেও তাকে ছেড়ে আসতে হবে। প্রহ্লাদ পিতাকে ছেড়েছিলেন। বিভীষণ ছেড়েছিলেন ভাইকে, আব ভরত মাকে। তুমিও ঘর ছেড়ে এস।

"জাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী
তজিয়ে তাকি কোটি বৈরী সম, যদ্যপি পরম সনেহী॥"

তুলসীদাস অবশ্য ইতিহাসের বিচারে মীরার অনেক পরে এসেছিলেন, কাজেই তাঁর কোনও শিষ্য বোধ হয় গুরুর মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টায় এই কাহিনি নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। যাই হোক, মীরা মেবার ছেড়ে চলে এলেন।

হায়! পরীক্ষা যে তবুও শেষ হয় না। শ্বশুরবাড়িতে হল না ঠাঁই, না মিলল আশ্রয় বাপের বাড়িতে। যে খুড়তুত ভাই রায়মল্ল তাঁরই মতো হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে একসঙ্গে বড় হয়েছিলেন সেই রায়মল্লও আকবরের চিতোরগড় আক্রমণের সময় খুব বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মোগলের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। একে একে মীরাব সব বন্ধন খসে গেল—না রইল আত্মীয়স্বজনের বাধা বা লোকলজ্জার দ্বিধা। তিনি গাইলেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসর ন কোঈ।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহিঁ কোঈ॥

ত্যাগের পর শুরু হল আরও কঠিন সাধনা। আরও দুঃখের আগুনে জ্বলে তিনি খাঁটি সোনা হয়ে উঠলেন। আগুনের পরশমণি প্রাণে জ্বালাবার জন্য কি সে আকুলতা! তিনি গাইলেন—

মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝুটে ধংধাঁসুঁ মেরা ফংদা ছুড়াও॥

হায়, আমার বশে কিছুই নেই। ধর্মের উপদেশ সর্বদা শুনেছি, পাপকে ভয় করছি, মনকে পাপের হাত

থেকে রক্ষা করছি। সাধুসেবা করছি, তোমার স্মরণে ধ্যানে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি। এবার তুমি দাসীকে মুক্তির পথ দেখাও। হে মীরার প্রভু, মীরাকে তোমার প্রকৃত দাসী করে নাও।

তিনি গাইলেন—তোমার জন্য হে প্রভু, আমি তো সব সুখই ছেড়েছি, তবে কেন আর দুঃখ দিচ্ছ। দীপ নেই বলে মন্দির যে এখনও আঁধার।

"মন্দিরিয়ামাঁ দিওয়াড়া বিনা আঁধিয়ারুঁ।।"

তিনি গাইলেন—

হে রী মেঁ তো প্রেম দিওয়ানী।
মেরা দরদ না জানে কোঈ।।

বিরহের অসহ্য বেদনায় ব্যাকুল হয়ে গাইলেন—

প্যারে দরসন দীজ্যো আয়।
তুম বিন রহিয়ো ন জায়।।
জল বিন কঁমল, চংদ বিন রজনী
ঐসে তুম দেখাঁ বিন সজনী।

তাই তিনি—

আকুল ব্যাকুল ফিরু রৈণ দিন
বিরহ কলিজো খায়।

বৃন্দাবনের পথে চললেন মীরা। পথে রাজস্থানের বানস নদীর তীরে এক আশ্রমে তাঁর সাধনায় শান্তি এল। দেবতার পদধ্বনি তাঁর কানে এসে পৌছল।

সুনী মৈঁ হরি আওয়ন কি আওয়াজ।

তাঁর পৃথিবী "ধরতী রূপ নবা নবা ধরিয়া" হয়ে উঠল।

তাবপর যে বাদল ছেয়ে রইল তাঁর আকাশে তা বিরহের কালো বাদল নয়, কারণ—

মেহা বসরব কররে,
আজ তো রমিয়া মেরা ঘররে।

নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে তিনি আজ তাঁকে পেয়েছেন। তবু—তবু ভয় আছে তাঁকে হারাবার। তাই প্রার্থনা করলেন,—

"বহুত দিনপৈ প্রীতম পায়ো
বিছুড়ন কো মোহিঁ ডররে"

তিনি গাইলেন—

"সাঁওরিয়াকে দরসন পাওঁ কুসুম্ভ সারী।"

তবু মীরার মনে ভয়, তাই তিনি নিজেকে বলেছেন,—

মীরাকে প্রভু গহর গম্ভীরা, হৃদ রহো জী ধীরা।
আধী রাতে প্রভু দরসন দৈ হে প্রেম নদীকে তীরা।

তাই সব সন্দেহ দূর করবার জন্য মীরা নিজের মনকে অগম দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত করলেন। সেখানে মহাকাল পর্যন্ত যেতে ভয় পায়। কিন্তু প্রেম সায়রে হাঁস হয়ে মন ভেসে ভেসে চলে যাবে সেই দেশে। লজ্জা হবে অভিসারিকার ওড়না আর ধৈর্য হবে তার বসন।

এই অভিসারিকাই হচ্ছে সংসারের অতীত তীরের নববধূ। মীরা মনে মনে হয়ে রইলেন সেই নববধূ।

রাজস্থানে বিয়ের সময় বর আসে ঘোড়ায় চড়ে—তা সে রাজরাজড়ার ঘরেই হোক আর সাধারণ প্রজার ঘরেই হোক। সে পরবে লাল, না হয় হলদে কাপড় আর মাথায় পরবে মুকুট যার উপরে সাজানো থাকবে পেঁচ আর কলংগি।

এদিকে কনেকে সাজিয়ে দেবে সখীরা। আর তার গায়ে মাখিয়ে দেবে হলুদ আর নধর হাত দুটি রাঙিয়ে দেবে মেহেদী দিয়ে। মাথায় পরাবে বেঁদী আর গলায় পরাবে হার। চরণে বাজবে ঘুংঘট আর পরনে থাকবে রঙ-বেরঙের চুনরী শাড়ি। যার বিশেষ নাম হচ্ছে কুসুম্বী। এই কাপড় মাড়োয়ারে খুব যত্ন করে ছাপানো আর রাঙানো হয়। সুগন্ধি কুসুম্বী ফুলের রঙ দিয়ে রাঙানো বলে নাম তার কুসুম্বী।

লেহ্ঙ্গা চোলি আর কুসুম্বী পরানো হয় কনেকে।

এর পরে হবে ফুলসাজ। হাতে পরিয়ে দেবে কাঁকন—শিরীষ ফুলের কাঁকন। তা ছাড়া চুড়া নামে একরকম চুড়ি। সেটা হচ্ছে বধূর সৌভাগ্যের চিহ্ন। মাথায় জড়িয়ে দেবে মোতি আর কুন্দ ফুল দিয়ে বানানো একটি গোল লটকন। সঙ্গে সঙ্গে গাইতে থাকবে মঙ্গলগীতি।

কনেকে আরও বেশি মোহিনী করে তুলবার জন্য চোখে পরিয়ে কাজল দেবে না হয় সুরমা। সঙ্গে সঙ্গে কপালে না হয় চিবুকে এঁকে দেবে ছোট্ট একটি কালো তিল।

পাঁচশ বছরের পুরানো এই প্রসাধনের প্রথা এখনও প্রায় সেরকম ভাবেই চলে আসছে। আধুনিক রাজপুতানী ফরাসি বা আমেরিকান 'মেক আপে'র অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে পারবেন বটে, কিন্তু এই সাজের চেয়ে বেশি রোম্যান্টিক সাজ আর পাবেন কোথায়?

আর কোথায় পাবেন তাঁরা ষোল রকম শৃঙ্গারের সাজ? যখন যে রকম করে মনের ভাব আর সন্ধ্যার আবেগ ফুটিয়ে তুলতে হবে ঠিক সেটি বুঝে নিয়ে নিপুণ শিল্পীর মতো সাজতে জানত রাজপুতানী অভিসারিকা। রোম্যান্সের রামধনু রাঙিয়ে রেখেছিল তাদের চোখ।

এমনই সুন্দর মনোহর বধূবেশে মীরা নিজেকে সাজালেন হৃদয়ের সব প্রেম, সব আন্তরিকতা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে। রসে বিভোর হয়ে তিনি প্রিয়তমের সঙ্গে খেলতে গেলেন ঝুরমুট অর্থাৎ সেই আনন্দলীলা যার পরম বিকাশ হচ্ছে রাসলীলা। এই খেলার মধ্যে তিনি পেলেন পরম আশ্বাস।

ঝুরমুটমে মেরা সাঈ মিলেগা
খোল মিলি তন গাতী॥

* * *

সুরত নিরতকা দিওয়লা সঁজোলে
মানসাকী কবলে বাতী।
প্রেম হোটীকো তেল মঁগালে
জলা করে দিন রাতী॥

কারণ—কারণ—'মীরা হরি রংগ রাতী'—মীরা যে হরির রঙে রাঙিয়ে আছেন। সেই শ্রীহরি, যিনি পরমপুরুষ। যিনি ছাড়া আর কোনও পুরুষ নেই।

বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী মীরাকে দেখা দিতে রাজি হলেন না। বললেন,— আমি মেয়েদের সঙ্গে দেখা করি না।

মীরা উত্তর পাঠিয়ে দিলেন,—গিরিধারীলাল ছাড়া আর কোনও পুরুষ আছে বলে তো আমি জানি না।

নিজের ভুল স্বীকার করে গোস্বামী ঠাকুর মীরার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

জীবনের শেষ দিকে মীরা বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকায় চলে আসেন। এদিকে নানা দিকে ধাক্কা খেয়ে রাজপরিবারের মধ্যে ঝগড়া আর গুপ্তহত্যা প্রভৃতি অনেক দুঃখের ব্যাপার হওয়াতে মেবার বুঝতে পারল যে, মীরার সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। তখন তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য মেবার থেকে ব্রাহ্মণরা গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করল। কিন্তু সংসারের সব বাঁধন যাঁর টুটে গেছে তিনি কি আবার নতুন করে বাঁধন স্বীকার করে নেবেন?

তিনি রণছোড়জীর মন্দিরে গাইতে লাগলেন—হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ মনে কর, তাহলে আমায় বুকে তুলে নাও, তোমার কোলে ঠাঁই দাও।

"মীরা কে প্রভু গিরিধর নাগর
মিলি বিছুড়ন নহি কীজো হো।"

একবার মিলিত হয়েছি, আমায় আবার ছেড়ে যেও না, ছেড়ে যেও না, প্রভু।

মীরার প্রভু তাঁর এই আবেদনে সাড়া দিলেন। মীরার আত্মা রণছোড়জীর মূর্তিতে মিলিয়ে গেল। বিরহের বেদনা মিলিয়ে গেল মিলনের পরমানন্দের মধ্যে—যার পরে আর বিরহ নেই।

কিন্তু মীরার প্রেমগাথা?

তা যে গাঁথা রইল অমর হয়ে মানুষের অন্তরে। যে ব্যাকুলতা, যে প্রেমবেদনা, যে প্রেমানন্দ আমাদের চিরকালের স্বপ্ন আর সাধনা তা ফুটে রইল মীরার গানে গানে। তাকে আমরা খুঁজে পেলাম দেশের এক প্রান্ত

থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত; মেবার মাড়োয়ারের মরু থেকে আরম্ভ করে শ্যামল বাঙলার নদীপ্রান্তরে অফুরান ঐশ্বর্যে। মীরা গাইলেন একদিকে—

তেরা কোই নহী রোকনহান, ভগত মীরা চলী।
লাজ সরম কুলকী মরজাদা, দিবসে দূর করী॥

অন্যদিকে চণ্ডীদাস গাইলেন—

কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনিল ভেজাই ঘরে।

মীরা গাইলেন—

আউঁ আউঁ কর গয়া সাঁওয়রা, কব গয়া চেলি অনেক।
গিণতে গিণতে ঘস্ গই উংগলী, ঘস্ গই উংগলী কী রেখ॥

এদিকে চণ্ডীদাস গাইলেন—

সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
ভুলিল—পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু'আঁখি হওয়ল অন্ধ।

জ্ঞানদাস গাইলে—

মাধব, কৈছন হচন তোহার।
আজি কাল করি দিবস গোঁয়াইতে
জীবন ভেল অতি ভার।
পন্থ নেহারিতে নয়ন অন্ধাওল
দিবস লখিতে নখ গেল।

গোবিন্দদাস গাইলেন—

পরাণ পিয়া সখি হামারি পিয়া
আবহুঁ ন আওযল কুলিশ হিয়া।
নখর খোসরালু দিবস লিখি লিখি
নয়ন অন্ধাওলু পিয়াপথ দেখি।

পশ্চিম ভারতের সাহিত্যের ধারা বেয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বর্তমান হিন্দি সাহিত্যের মধ্যেও মীরার রেশ কানে বাজল। খুলে দেখলাম—আধুনিকা মহিলা কবি মহাদেবীর কাব্যের পাতা। ভগবানকে আমরা যারা পাই না বা চাই না সেই আমরাও ব্যাকুলভাবে সংসারের কোনও একজনকে হৃদয়ের সব বেদনা নিবেদন করতে চাই। যার পরিচয় পর্যন্ত পাওয়া হয়ে ওঠে নি সেই প্রিয়তমের বিরহে মহাদেবী লিখেছেন—

কৈসে সন্দেশ প্রিয় পহুঁচাতী,
দৃগজল কী সিত মসি হৈঁ অক্ষয়,
মদি প্যালী ঝরত তারকদ্বয়।

আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মৈথিলীশরণও রাধার মধ্যে সেই বিরহের উন্মাদনা অনুভব করে লিখলেন—

সখে লৌট আয়ে গোকুল সে
কহো রাধিকা কৈসে।

সে সব কথা ভাবতে ভাবতে মুছে গেল মনের মধ্যে মেবার আর বাঙলার মাঝখানের দূরত্ব আর বিভিন্ন ধারার ইতিহাস। মুছে গেল চিতোর গিরিদুর্গের দরজায় আক্রমণকারী সৈন্যদলের চিৎকার আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। কোথায় নিভে গেল জহরব্রতের অগ্নিশিখা। রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের ছায়া পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। তারা-

ভরা সমস্তটা আকাশ জুড়ে রইল শুধু মীরার গানের অনন্ত আকুলতা।

সারা সংসারের উপরে সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য।

ষোলো

থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় বহুদিন পর মাত্র কয়েক দিনের ছুটিতে এসেছি। বাংলাদেশের যা সব চেয়ে ভালো, কলকাতার যা সব চেয়ে বেশি উপকার করবার মতো তা সবই একবার চেখে দেখে যেতে হবে। পুরোনো স্বাদকে নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হবে। নতুনকে নব প্রণয়ের আবেগ দিয়ে আবাহন করতে হবে।

খুব ছেলেবেলায় দেখতাম একটা সস্তা বাঙলা দৈনিকে বড় বড় করে লেখা থাকত—এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ। এখন তো সত্যি সত্যিই ভঙ্গ। মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ কোনও রকমে সন্ধ্যাবেলার পিদিম জ্বালিয়ে অন্ধকারকে আবও বাড়িয়ে তুলছে।

তবু সেই অন্ধকারের ঘোমটা সরিয়ে একবার কলকাতাকে দেখে নিতে চেষ্টা করি। সকালে লাখ লাখ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর থেকে নারকেল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সূর্যোদয় দেখি। সন্ধ্যায় দেখি গঙ্গার পারে বসে চিমনীব নিশ্বাসের আড়ালে রঙিন সূর্যাস্ত। ইলিশ মাছ আর দই-সন্দেশের সদ্ব্যবহার করি শিল্পীর রসনা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যে পশ্চিমে গলদা চিংড়ি দিন দিন দুর্লভ হয়ে উঠছে।

থিয়েটারটাকেও আমার সেই ক্ষণকালের ছুটি উপভোগের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে ধরে নিই। যদি কোনও সাহিত্যবাসর না থাকে, অন্তত থিয়েটার যদি থাকে তো কলকাতার সন্ধ্যাটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পশ্চিমে থিয়েটার বলতে গেলে নেই। পূর্বে মণিপুরে ইম্ফলের পর পশ্চিমে করাচী পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও রীতিমতো থিয়েটার নেই।

সেই থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম।

শাজাহান নাটক হচ্ছে।

মাড়োযারেব রাজা যশোবন্ত সিংহ শাজাহানের ছেলেদের মধ্যে যে ভ্রাতৃযুদ্ধ হচ্ছে তাতে লড়তে গিয়েছেন। স্বামীর চিন্তায় কাতর রানীকে চারণীরা গান গেয়ে প্রবোধ দিচ্ছে আর উৎসাহিত করছে। যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে তারা গানের মধ্যে দিয়ে বোঝাচ্ছে যে, 'মথিতে অমর মরণ সিন্ধু সেথা গিয়াছেন তিনি।' যদি যুদ্ধে জিতে স্বামী ফেরেন তাহলে তাঁর কীর্তিময় ভবিষ্যৎ রানী একসঙ্গে ভোগ করবেন। যদি তিনি মারা যান তাহলেও তাঁর অক্ষয় কীর্তি থেকে যাবে। অতএব মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। যুদ্ধের ফলের জন্য ভাবনার কিছু নেই।

সধবা অথবা বিধবা
তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল
মোছ এ অশ্রুনীর।

গানের উন্মাদনায় রানীর মন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এমন সময় খবর এল যে, লড়াইয়ে খুব বীরত্ব দেখিয়ে, নিজের দশ হাজার সৈন্য মারা যাবার পর পিঠ দেখিয়ে অর্থাৎ পালিয়ে রাজা ফিরে এসেছেন আর কেল্লায় ঢুকতে চাচ্ছেন। রানীর কাছে এই অসম্মান অসহ্য মনে হল। যদি মারা যেতেন দুঃখ ছিল না। যদি তিনি যুদ্ধে জিতে ফিরে আসতেন তাহলে আনন্দের কোনও সীমা থাকত না। কিন্তু পিঠ দেখিয়ে? নৈব নৈব চ।

রাজপুত হয়ে ঢাল পিঠে বয়ে ফিরে আসবে, না হয় ঢাল তাকে অর্থাৎ তার মৃতদেহকে বয়ে ফিরে আসবে। ঢাল ফেলে চলে আসার অগৌরবের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

অতএব রানী হুকুম দিলেন যে, কেল্লার দরজা বন্ধ রাখ। তাঁর চোখে রাজা মরার সামিল। তাঁকে কেল্লায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। মোগল ঐতিহাসিক ফেরিস্তা এই ঘটনার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। ফরাসি ভ্রমণকারী বার্নিয়ার লিখেছেন যে, এই হুকুম দেওয়ার পর রানী সহমরণে যাবার জন্য চিতা সাজাবারও হুকুম দিয়েছিলেন। ইটালিয়ান ভ্রমণকারী মানুচ্চি বলেন যে, এর পরে রানী ও রাজাতে কোনও দিন আর ভাব ফিরে আসে নি।

চারণীরা আবার গান গেয়ে বীর নারীর মনে প্রেরণা জোগাতে লাগল।

এই চারণ ও চারণীরা রাজপুতানাকে দিয়েছে প্রেরণা, যুগিয়েছে প্রাণ। ডি এল রায়ের নাটকে আমরা বার বার চারণদের উন্মাদনাময় গান শুনেছি। যখনই মেবারের দুরবস্থা হয়েছে বা অসহ্য দুর্দশা আত্মসমর্পণের জন্য লোভ দেখিয়েছে, তখন চারণের গান রাজপুতের মনুষ্যত্ব বজায় রেখেছে। তাই মেবার-পতন নাটকে আমরা চারণের গান শুনি—

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই
আবার তোরা মানুষ হ।"

পরাধীন দেশের জীবনে এর চেয়ে বড় কথা আর নেই।

এই রাজস্থানী চারণদের গানের মধ্যেই হিন্দি প্রথম জন্মগ্রহণ করে এ কথা বলা যায়। চারণকাল অথবা বীরগাথাকালই হিন্দি সাহিত্যের চার যুগের প্রথম যুগ।

অবশ্য এখানে হিন্দি বলতে নিছক হিন্দির কথা বলছি না। উত্তর ভারতে অনেকটা একই রকমের যে সব আলাদা আলাদা অঞ্চলের ভাষা ছিল সেগুলি সবাইকে মিলিয়ে যাকে হিন্দি বলা হচ্ছে সে ভাষার কথা বলছি।

উত্তর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের মালমশলাও আমরা পাই এই চারণদের গান থেকে। এই কবিরা রাজসভার আশ্রয়ে থাকতেন আর শুধু দেশ ও রাজ্যরক্ষার জন্য গানে গানে প্রেরণা দেওয়া ছাড়াও রাজবংশের অতীত কীর্তি প্রভৃতির গাথা গাইতেন।

সেই সব গাথার মধ্যে কল্পনা আর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অতিরঞ্জন বেছে বেছে বাদ দিলে ইতিহাস তৈরি করে নেওয়া যায়। রাজপুতানাব ইতিহাস এভাবেই প্রথমে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। টডের রাজস্থানের আখ্যান ও কাহিনির ভিত্তিও প্রধানত এই চারণের গান। সমসাময়িক মুসলমান লেখক বা কোনও বিদেশী পর্যটকের লেখায় কোনও চারণের কাহিনির উল্লেখ না থাকলেই তাকে ইতিহাসের পাতার বাইরে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না।

চারণ আর ভাটদের নাকি প্রথম জন্ম হয়েছিল মহাদেবের ষাঁড় চরাবার জন্য একজন উপযুক্ত লোকের দরকার হওয়াতে তাঁর কপালের ঘাম থেকে। রূপকথা এ সম্বন্ধে যাই বলুক এরা যে রাজস্থানের রূপকথা তৈরি করেছিল আর চালু রেখেছিল তার জন্য পৃথিবী এদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সে নিজের অতীত ভুলে গেছে, তার পক্ষে বর্তমান উদাসীন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। রাজপুতের চারণরা অতীতকে জাগিয়ে রাখত, উজ্জ্বল করে তুলে ধরত। উৎসবে ব্যসনে চৈব আর রাষ্ট্রবিপ্লবে।

মহাদেবের গরু চারণ করতে করতে এদের নাম হল চারণ। কিন্তু এদের যে সম্মান দেওয়া হয় পৃথিবীতে অন্য কোথাও জাতি হিসাবে কবিদের সে সম্মান দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। দেবী ভবানী অর্থাৎ মাতাজীর সুতো নামে এক রকমের কালো পশমী সুতো গলায় পরে হলদে শাড়ি পরে চারণীরা এখনও গ্রামে গ্রামে সসম্মানে গেয়ে বেড়ায়। পুরুষেরা গেয়ে বেড়ায় সভায়, দরবারে।

রাজা অত্যাচার ও অন্যায় করতে পেছপা হতেন, পাছে সভাচারণ সে কাহিনি গানে গানে ভবিষ্যৎ বংশের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রজা দেনা করে শোধ দিতে অস্বীকার করতে পারত না, পাছে দেনা শোধ না দেওয়ার জন্য তার দেনার জামিন চারণ নিজের রক্তপাত করে বসে। মাড়োয়ার আর যশলমীর রাজ্যে একাধিকবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে চারণরা নিজেদের চেষ্টায় রক্ষা করেছিল। তারা ছিল শুধু রাজকবি নয়, রাজসিংহাসনের বসাবার কর্তা অর্থাৎ কিং মেকারও বটে।

একটি চারণ গাথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

রাজস্থানের সবচেয়ে বড় গর্ব ও গৌরব ছিলেন যে মহারাণা প্রতাপ, তাঁকে এই বীরগাথার প্রেরণাই সবচেয়ে অসহায় সময়ে একবার বাঁচিয়েছিল। হলদিঘাটের যুদ্ধের পর বিপদের পর বিপদে, পরাজয়ের পর পরাজয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে দিন কাটাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি নিজে, অন্তত তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মোগলের হাতে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

এমন সময় একবার তাঁর সংকল্প থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। পাহাড়ের গুহাগুলি পর্যন্ত পলাতক মেবার রাজবংশের জন্য নিরাপদ ছিল না। নেকড়ে বাঘের ও তাদের চেয়ে চতুর মোগলের হাত থেকে লুকিয়ে অসভ্য ভীলরা বেতের টুকরীতে প্রতাপের পরিবারকে গাছে টাঙিয়ে রাখত। খেতে দিত বনের

ফলমূল। তবু রক্ষা ছিল না। শত্রু এসে ধরে ফেলবে এই ভয়ে অন্তত পাঁচ পাঁচ বার প্রতাপের পরিবারকে এই সামান্য খাবার পর্যন্ত ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। তবু প্রতাপ মোগলের কাছে মাথা নোয়াবেন না এই সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন।

কিন্তু ইংরেজি প্রবাদের শেষ খড়ে যেমনভাবে উটের পিঠ ভেঙে গিয়েছিল, সেভাবে প্রতাপেরও প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল। মাথা হয়ে এল নিচু।

মহারানি ও যুবরানি জঙ্গলে লুকিয়ে ঘাসের বীজের আটার রুটি বানিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের সবাইয়ের র‍্যাশন মাত্র একখানা করে রুটি। তারও আধখানা খাবে এখন, আর বাকি আধখানা তুলে রাখবে পরের জন্য। কারণ পরে আবার কবে রুটি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। প্রতাপ পাশে শুয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর মেয়ের চিৎকারে চিন্তার জাল ভেঙে গেল। বেচারি রাজকুমারীর রুটি বুনো বিড়াল নিয়ে পালিয়ে গেছে। মোগলের শত্রুতা, নিকট-আত্মীয়দের আর নিজের ছেলেদের যুদ্ধে মরণ, ভাগ্যের মার যা করতে পারে নি, রাজকুমারীর কান্নায় তা করে দিল। শত্রুতা? মৃত্যু? রাজপুত তো এ সবের জন্যই জন্মায়। কিন্তু তা বলে উপোসী মেয়ের চোখের জল?

নিজের চোখে জল নিয়ে প্রতাপ আকবরের কাছে সন্ধি করতে চেয়ে চিঠি লিখলেন।

চিঠি পেয়ে আকবর আনন্দে আত্মহারা। তাড়াতাড়ি সর্বজনীন আমোদ-আহ্লাদের বন্দোবস্ত হল। দেওয়ালি করা হল রাত্রে। বাজি পোড়ানো হল। আগ্রার পথে পথে আনন্দ উল্লাস। রাজপুত সিংহ অবশেষে শিকারে ধরা পড়েছে।

আনন্দে আবেগে আকবর চিঠিখানা বিকানীরের রাজার ভাই পৃথ্বীরাজকে দেখালেন। পৃথ্বীবাজ ছিলেন সাহসী, বীর ও রসিক কবি। অসি আর মসী দুইয়েতেই সমান হাত ছিল তাঁব। কিন্তু বিকানীর রাজ্য আকবরের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। তাই তাঁকে মোগল রাজসভায় সভাসদ হয়ে থাকতে হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, নারীর সবচেয়ে বড় যে অসম্মান তার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁর সহধর্মিণী কিরণময়ীকে।

নববর্ষের মতো নওরোজ ছিল ন'দিন ধরে একটি বিশেষ উৎসবের ব্যাপার। আকবর তার মধ্যে খুশরোজ বলে একটা আনন্দের দিন চালু কবেন। সেদিন দরবারের সব শ্রেণীর আমীর ও পারিষদদের উপস্থিত হতে হত। সুলতানাও তার দরবার করতেন সব অমাত্য ও রাজকীয় সভাসদদের স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে।

খুশবোজের বিশেষত্ব ছিল যে, রাজপ্রাসাদের ভিতর শুধু মেয়েরাই বেসাতি সাজিয়ে বসত। কোনও ওমরাহের যদি সুন্দরী মেয়ে থাকে তবে তার মা নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে যাতে বাদশা ও তাঁর বেগমদের নজরে সে পড়ে যায়।

বার্নিয়ার লিখে গেছেন যে, বাদশা শাহ্‌জাহান এক পয়সার জন্য পর্যন্ত ছেলেমানুষের মতো দামদস্তুর করে মজা করতেন। শেষ পর্যন্ত রূপসী হয়তো তাঁকে মিঠেকড়া কিছু শুনিয়ে হাঁকিয়ে দিতেন। বলতেন—যাও যাও জাঁহাপনা, আমার মালের যোগ্যই তুমি নও। জাঁহাপনা প্রাণপণে দাম কষাকষি ও মন কষাকষি দুই-ই করে শেষ পর্যন্ত রুপোর টাকা দিতে গিয়ে যেন মনের ভুলেই সোনার মোহর হাতে গুঁজে দিয়ে পসারিণী বা তার কন্যার রূপের নজরানা দিতেন।

রূপের প্রতি সম্মান সংসার চিরকালই দেখিয়ে এসেছে। কবি তার পূজারী আর কামুক তার পসারী।

কে রূপ নিয়ে করবে পূজা আর কে করবে বাজার তা নির্ভর করছে শুধু মানুষের নিজের উপর।

আকবরের নবরত্ন সভার একটি বড় রত্ন ও তাঁর বন্ধু ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে, এই রূপের হাটে যেখানে সেই পর্দাপ্রথার দিনেও শুধু নারীরাজ্য জমেছে বলে সুন্দরীদের বেচাকেনার হৈ-হল্লার আমোদের মধ্যে মনে থাকত না বাঁধন আর বসনে থাকত না শাসন, সেখানে, "আকবার বাদশাও ছদ্মবেশে থাকেন। এইভাবেই তিনি দ্রব্যসামগ্রীর দরদাম জানতে পারেন, সাম্রাজ্য সম্বন্ধে লোক কি বলে তা এবং সরকারী কর্মচারীদের রীতিচরিত্র সম্বন্ধে কথা শোনেন।"

এমনই একটি নওরোজ থেকে পৃথ্বীরাজের স্ত্রী ফিরবার সময় বাঁদী এসে খবর দিল যে, তাঁর পালকি একটা আলাদা দরজায় অপেক্ষা করছে। কিরণময়ী আশ্চর্য হয়ে ও অনেক ইতস্তত করে সে পথে গেলেন।

কিন্তু নানা কামরার গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে এমন এক কামরায় দেখতে পেলেন, যেখান থেকে বাইরে যাবার আর কোনও পথ নেই। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছেন, সেখান দিয়ে ফিরে যেতে গিয়ে দেখেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—কে?

শাহানশাহ্ আকবর।

মেবারের শিশোদিয়া বংশ অবশ্য এখনও পর্যন্ত মোগল সম্রাটের কাছে মাথা নিচু করে নি। কিন্তু তাঁদের বংশের সম্মান তো এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। এবার কোথায় আছ, কোন্ জঙ্গলের ভীল আর বাঘ-শিয়ালদের মধ্যে লুকিয়ে আছ, মহারাণা প্রতাপ, এস তোমরা উচ্চবংশের রাজকন্যার সম্মান রক্ষা করতে এস।

রক্ষা করতে এল বুকের পাশে, কাঁচুলির মধ্যে লুকানো ছোরা। শিশোদিয়া বংশের মেয়ে, রাঠোর বংশের বৌ কিরণময়ী বিদ্যুতের মতো সে ছোরা গোপন স্থান থেকে বের করে, নিজের নয়, আকবরের বুকে ছুঁইয়ে ফেললেন।

হঠাৎ বাজ পড়লেও মোগল বীর এত অসহায়ভাবে চমকে উঠতেন না। যে দরজা নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেই দরজায় পিঠ পেতে পালানোর পথহারা আকবর সামনে উঁচানো ছুরির তলায় বুক রেখে প্রাণভয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

কিরণময়ী শুধু নিজের সম্মান রক্ষা করে ক্ষান্ত হলেন না। আকবরকে দিয়ে শুধু নিজেকে মা সম্বোধন করিয়ে ছেড়ে দিলেন না, তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনও রাজপুতানীর সতীত্ব নাশ করতে তিনি এগিয়ে আসতে পারবেন না।

সিংহবাহিনী মাতার ছুরিকা ধীরে ধীরে আবার বুকের পাশে এসে আশ্রয় নিল।

সেই কিরণময়ীর স্বামী কবি পৃথ্বীরাজকে আকবর মহা উল্লাসে রাজপুতের শেষ আশা ও গর্ব প্রতাপসিংহের পোষ মানার এই চিঠি দেখালেন। মনের দুঃখে নিরাশায় পৃথ্বীরাজের মুখ কালো হয়ে গেল।

শেষ দুঃসাহসিক সরলতা নিয়ে তিনি আকবরকে বললেন যে, তিনি এই চিঠি সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না। প্রতাপ মোগলের সাম্রাজ্যের বিনিময়েও মাথা নিচু করবেন না। কাজেই কেউ শত্রুতা করে এই জাল চিঠি পাঠিয়েছে কি না, তা প্রতাপের কাছে নিজে চিঠি লিখে উত্তর জানিয়ে ঠিকমতো যাচাই করে নিতে চান।

উল্লাসে আত্মহারা আকবর গোঁফে চাড়া দিয়ে রাজি হয়ে গেলেন।

প্রাণভরা প্রেরণায় মন-মাতানো কবিতায় পৃথ্বীরাজের সমান কবি সে যুগে জাত-চারণদের মধ্যেও কেউ ছিল না। সমস্ত চারণদের কবি সম্মেলনে এই রাঠোর বীরই জয়মাল্য পেয়েছিলেন। কিন্তু খোলাখুলি প্রতাপকে স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য উদ্দীপনা তো আর দরবার থেকে দেওয়া যায় না। বুঝে শুনে তাঁকে অনেক ঘুরিয়ে লিখতে হল।

আকবরের সভার কোনও ঐতিহাসিকের লেখাতে পৃথ্বীরাজ ও কিরণময়ীর কাহিনির সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য তা পাবার কথাও নয়।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের এই চারণ কবিতাটি সত্যিই সেকালের।

পৃথিবীতে বীরপূজা যতদিন থাকবে, পৃথ্বীরাজের এই বীরগাথাও ততদিন বাঁচবে। রাজস্থানী চারণ কবিতার ভাষা ডিংগলে এই কবিতার ডিম ডিম ডমরুধ্বনি একটুখানি শোনা যাক—

আকবর সমদ অথাহ, তিহং হিন্দু তুরক।
মেবাড়ো তিড় মাহং, পোয়ণ ফুল প্রতাপসী॥
অকবরিয়ে ইক বার, দাগল কী সীরা দুনী।
অণদাগল অসবার চেটক রাণ প্রতাপসী॥
আকবর ঘোর অংধার, উংঘাণাং হিন্দু অবর।
জাগৈ জগদাতার, পোহরে রাণ প্রতাপসী॥
হিন্দুপতি পরতাপ, পত রাখো হিন্দুয়াণরী।
সহো বিপত সন্তাপ, সত্যসপথ করি আপনী॥
চম্পা চিতোড়াহ, পোরস তণো প্রতাপসী।
সৌরভ আকবর সাহ, অলিয়ল আভরিয়া নহী॥

পাতল জো পাতসাহ, বৌলৈ মুখহুতা বয়ণ।
মিহর পছম দিস মাংহ উগে কাপস রাবরত।।
পটকুং মুছাং পাণ, কৈ পটকুং নিজ তন করদ।*

আকবররূপী সমুদ্রে হিন্দু তুর্কী সবাই ডুবে গিয়েছে; কিন্তু মেবারের রাজা প্রতাপসিংহ তার মধ্যে পদ্মের মতো হয়ে আছেন। আকবর একবারই সমস্ত পৃথিবী কলঙ্কিত করেছেন; কিন্তু চৈতক ঘোড়ার সওয়ার প্রতাপসিংহ নিষ্কলঙ্ক। আকবররূপী অন্ধকারে সব হিন্দু ঢেকে গিয়েছে; কিন্তু জগতের দাতা রাণা প্রতাপ আলোর উপর দাঁড়িয়ে আছেন। হে হিন্দুপতি প্রতাপ, হিন্দুর লজ্জা রক্ষা কর; আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সব কষ্ট সহ্য কর। চিতোর হচ্ছে চাঁপা ফুল, আর প্রতাপ তার সুগন্ধ; আকবররূপী ভ্রমর তার উপর বসতে পারে না।** প্রতাপ যদি বাদশাকে আপন মুখে বাদশা বলে ডাকেন, তাহলে কশ্যপের সন্তান ভগবান সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় হবে। হে (একলিঙ্গ মহাদেবের) দেওয়ান*** নিজের গোঁফের উপর হাত রাখব (অর্থাৎ বীর হয়ে থাকব), না নিজের শরীর তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলব, শুধু দুটি কথার মধ্যে একটি লিখে দাও।

এই চরণগাথা রাণা প্রতাপের কাছে দশ হাজার সৈন্যের কাজ করল। সমস্ত দেশের চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, এই বুঝে তিনি ক্ষণিকের হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি উত্তর পাঠালেন—

তুরুক কহাসো মুখ পতো ইণ তনুসুৎ
ইকলিংগ
উগৈ জাহী উগসী, প্রাচী বীচ পতংগ।।

ভগবান্ একলিঙ্গের শপথ, এই শরীর থেকে (অর্থাৎ প্রতাপের মুখ থেকে, বাদশাকে শুধু তুর্কী এই বলেই ডাকা হবে আর সূর্য যেদিক থেকে উদয় হয় সেই পূর্ব থেকেই উদয় হতে থাকবে।

মহারাণা প্রতাপেব মতো তাঁর ছেলে মহারাণা অমরসিংহও একবার এই রকমভাবে পবাজয়ের পর পরাজয়ে অস্থির হয়ে হার স্বীকার করবেন, না লড়াই করে যাবেন তা ঠিক করতে পাবলেন না। চাবণ কবিতায় আমরা পাই যে, সে সময় তিনি তাঁর বন্ধু খানখানানের (বৈরাম খানের ছেলে আর নওরতনেব একটি রত্ন) কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠান। এই মুসলমান সেনাপতির সভায় হিন্দি, পারসী, আরবী, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার পণ্ডিত আর কবিরা থাকতেন। সে সভায় খানখানান্ অমরসিংহের চিঠি পড়লেন—গৌড়, কচ্ছোযা, রাঠোর—এরা জানলায় বসে আরাম করছে—আর আমি কি একা বনে বনে ঘুরে বেড়াব?

খানখানান্ উত্তব লিখে পাঠালেন—

ধর রহসী রহসী ধরম, খপজাগী খুরসাণ
অমর বিশংভর উপরাং, রাখো নহচো রাণ।।

হে রাণা অমর, তুমি ভগবানে ভরসা রাখ। সংসার আর ধর্মই টিকে থাকবে, আর খোরাসান অর্থাৎ মোগল চলে যাবে।

এর পরে কি করা উচিত হবে, তা বুঝে নিতে মহারাণা ভুল করলেন না।

কিন্তু শুধু বীরগাথায় নয়, চারণরা গীত-কবিতাতেও কম যেতেন না। রাঠোর রাজা যশোবন্ত সিংহ তো যুদ্ধে হেরে ফিরে এসে কেল্লায় ঢুকতে পেলেন না। কিন্তু তাঁর এক সামন্ত রাজা রতনসিংহ খুব বীরত্ব দেখিয়ে সে যুদ্ধে মারা যান। তাঁর রানি যখন সহমরণে যাচ্ছেন, তখন তার যে বর্ণনা চারণ 'বচনিকা রা রতনসিংজী রী মহেসদাসৌত রী' নামে কাব্যে দিয়েছেন তা অতি সুন্দর। রানি তিনবার স্বামীর দেহ প্রদক্ষিণ করে এসেছেন—

কটি সিংহ নিতম্ব জংঘা কদলী।
চিত নিত্য প্রবিত্ত মরাল চলী।।

---

*কর্নেল টডের কাহিনিতে পৃথ্বীরাজের অন্য একটি কবিতা উল্লেখ কার হয়েছে।

**চাঁপা ফুলের তীব্র সুগন্ধ নাকি ভ্রমরকে দূরে রাখে।

***মেবারের মহারাণা একলিঙ্গের দেওয়ান হিসাবে রাজ্য শাসন করেন।

তন রম্ভহ খম্ভ কনংকে তিগী।
জৈপে গিরি নগিন্দ্র বেণি ইগী॥
বণিতা মুখ পুলিম চন্দ্র বনী।
ভৃংগ ভ্রংন চমা মৃগ ভনী॥
কণ্ঠ কোকিল দন্ত অনারকলী।
অগ্র নক্কা অলক্ক কলা উজলী॥

এহেন চারণ কবিতা চারণদের মুখ থেকে না শুনতে পেলে রাজস্থান দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইংলন্ডে গিয়ে যদি শেক্সপীয়রের নাটক না দেখি, বাংলাদেশে এসে যদি রবীন্দ্র-সংগীত না শুনে চলে আসি সেটা কেমন হয়?

তার উপর বিদেশীরা পর্যন্ত বলে গেছে, বাংলাদেশের মাটিতে কবি গজায়। এহেন দেশের লোক হয়ে রাজস্থানের কবিদের খবর না নিয়ে ফিরে যাই কি করে?

কিন্তু কোথায় পাই এই বিশ শতকের মাঝামাঝি চারিদিকে এই ডামাডোলের বাজারে পুরানো কালের প্রতীক সেই চারণ কবি? কে দেয় তার সন্ধান?

দিনগত পাপ-ক্ষয়ে ব্যস্ত বা রাজমুকুটগুলির লোপ পেয়ে যাওয়া নিয়ে উৎকণ্ঠিত লোকসমাজে চারণের খোঁজ আর কেউ রাখে না আজকাল। তাঁরাও নাকি আগেকার মতো সেই সম্মান আব সাংসারিক সুবাহা এই বৃত্তিতে নেই বলে কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়।

বাংলাদেশে কাব্যচর্চা এই সেদিনও ছিল। কিন্তু এই কয়েক বছরেই কবিতা পড়ার প্রতি লোকের উদাসীনতা কতখানি বেড়ে গিয়েছে তা ভেবে চারণদের খুঁজে না পাওয়ার জন্য যদিও একটু ক্ষোভ হল তাঁদের অনুযোগ দিতে পারলাম না।

এমনকি, একালে বাঙালির লেখা রাজপুতানার ভ্রমণ-কাহিনিতেও চারণের কোনও অস্তিত্ব বা সম্মান নেই। ভাগ্যিস টড সাহেব তাঁদের কথা লিখে গিয়েছিলেন।

তবু একবার ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

কোথায় পাব খোঁজ?

কে দেবে ঠিকানা? লুপ্তপ্রায় কবিকুলের ঠিকানা কি আর সংসার বা 'সোসাইটি' রাখে?

গেলাম উদয়পুর শহরের সব বইয়ের দোকানে। কবিদের খবর প্রকাশকরা হয়তো রাখতে পারে। কিন্তু তারা এই প্রশ্ন শুনে অবাক, এমন-কি, হতভম্ব হয়ে গেল। দুয়েকখানা চারণ কবিদের বই তারা অবশ্য ছাপিয়েছে, কিন্তু সে হচ্ছে নেহাত প্রাচীন কবিতার সংকলন অথবা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে চারণ কাব্যের নমুনা হিসাবে।

কিন্তু তা বলে জলজ্যান্ত চারণের সন্ধান? না। এসব অশাস্ত্রীয় কার্য এখানে হয় না।

খোঁজ করলাম দুয়েকজন পুরানো পণ্ডিত ও নবীন অফিসারের কাছে। তারাও প্রশ্নের ইম্পসিবিলিটি অর্থাৎ অসম্ভাব্যতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, গ্রামে খোঁজ করলে—যথা, ওই ফতে সাগরের ওপারে, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেখান থেকে গোটা পাঁচেক ডাল ভাঙা ক্রোশ পায়ে ভাঙতে পারলে—যে গ্রাম পাওয়া যাবে, সেখানে এক ঘর চারণ ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু তারা এখনও আছে কিনা তা হলফ করে কেউ বলতে পারে না।

ফিরে এলাম মহারাণার নিজের গেস্ট হাউস, লক্ষ্মীবিলাস প্যালেসে। মহারাণার পক্ষ থেকে অতিথিদের দিকে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন ঠাকুর উম্মেদ সিং। একজন দূর-বিদেশীকে নিজের দেশের কবি ও কাব্য সম্বন্ধে খোঁজ করতে দেখে এই সুঠাম-দেহ প্রৌঢ়ের উজ্জ্বল চোখ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল।

কিন্তু হায়! গেস্ট হাউসের ম্যানেজার হিসাবে তিনি রাজঅতিথিদের পেশোলা হ্রদে নৌকাবিহারে, গাঙ্গোরী উৎসবের জলযাত্রায়, রাজপ্রাসাদের বা রাজসমন্দে জয়সমন্দে নিয়ে গেছেন। এমনকি, কেউ কেউ হলদিঘাটের দুর্গম যুদ্ধক্ষেত্রও দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু তা বলে চারণের গান কোথায় পাবেন ঠাকুরসাহেব?

তবে হ্যাঁ। মহারাণা যখন উদয়পুরে থাকেন, তখন কোনও কবিসভা বসালে চারণরা দলে দলে আসে দূর গ্রাম থেকে। তারা সিধা পায়, সম্মান পায়, নিজেদের রচনা করা বা পূর্বপুরুষদের রচনা করা কাব্য পাঠ করে—ডিংগল ভাষায় গলায় ডমরুধ্বনি তলে রৌদ্র-রসের আমদানি করে। বীরত্বের জোয়ারে চারদিক

ছুটতে থাকে তখন। কিন্তু মহারাণা গেছেন শিকারে। কাজেই চারণরাও এখন আর শহরে আসবে না। কবির সম্মান মহারাণা ছাড়া আর কারও কাছে বিশেষ নেই আর আজকাল।

তবু অনেক খোঁজ করে ঠাকুরসাহেব একটা ঠিকানা বের করলেন। তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে গেলাম শহরের সবচেয়ে ঘিঞ্জি এক বাজারে। দিল্লির চাঁদনী চকের চওড়া রাস্তার ভিড়ের মধ্যে যেমন হঠাৎ এক-একটা অলক্ষিত লোহার ফটক দেখা যায়, ঠিক তেমন একটা ফটকের সামনে এলাম। মনে হল দুর্গের মধ্যে একটা উপদুর্গের ফটক। কিন্তু তা নয়।

এটা হচ্ছে প্রাচীনকালের, অর্থাৎ 'প্যাক্স ব্রিটানিকা'র (ব্রিটিশ শান্তির) আগেব যুগের বন্দোবস্ত। একটা ফটকের দরজার পিছনে ও ভিতরে একটা গলি। তার দু'পাশে আবার অসংখ্য বাড়ি ও অসংখ্য বসতি। গোলমালের সময় ফটক বন্ধ করে দিয়ে আত্মরক্ষা করা সহজ। তার উপর গলির দু'পাশে ছোট ছোট ঘুলঘুলির মতো খিলান। সেখান থেকে তরোয়াল বা বন্দুক দিয়ে একজন লোকই অনেকক্ষণ একটা শত্রুর দলকে রুখে রাখতে পারে।

এমনই একটা ফটকেব পিছনের গলিতে ঢুকলাম ঠাকুর সাহেবেব পিছনে পিছনে। দুপাশে সরু নালা আর ছোট ছোট জানালা। কৌতূহলী রাজপুতানীরা হঠাৎ এই বিদেশীকে ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে একচোখ দেখেই সরে পড়ছে। একটা শ' দুই বছরের পুরোনো বাড়ির সামনে গিয়ে অনেক ধাক্কা দেওয়ার পব একজন এসে দরজা খুলে দিল। বুঝতে পারলাম যে, দোতলা থেকে ঠাকুরসাহেবেব পাগড়িটা দেখতে পাওয়াতে ওপেন সিসেম জাদুমন্ত্রের কাজ হল এতক্ষণে।

না। কবি এখন শহবে নেই। গ্রাম থেকে কবে ফিরবেন তাবও ঠিক নেই। এদিকে আমায় আজই সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যেতে হবে। আজ বাজপুতানার মাটিতে আমার শেষ দিন।

সংকোচ কাটিয়ে কবির ছেলেকে বললাম—আপনিই তাহলে আপনার মহামান্য পিতার কিছু কবিতা শুনিয়ে দিন। তাঁব কোনও প্রকাশিত বই, বা লেখা পুঁথি বা মুখে মুখে আবৃত্তি করা কবিতা নিশ্চযই আপনার জানা আছে।

মাথার বাবরি চুল ও মুখে ছাঁটাই করা গোঁফেব প্রান্ত দিয়ে কবিপুত্র হেসে জিজ্ঞাসা কবলেন —কবিতা?

প্রশ্নের ভিতরের ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে বললাম—হ্যাঁ, আপনার পিতাজীর চারণ কবিতা।

যে উত্তর পেলাম তা রাজস্থানের মরুভূমির বালির সমুদ্রে চিরকালের মতো ডুবে যাক। পুত্রবর নটবর ভঙ্গিতে পালটা প্রশ্ন করলেন—রেসের ঘোড়া নিয়ে তিনি কারবার করেন; কবিতার খবরে তাঁর কি দবকাব?

আবার ফিরে এলাম।

হঠাৎ মনে হল—তাই তো একবার রাজাধিরাজ আছ্‌ড়োলকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করে দেখলে তো হয়। মহারাণার বড় মহারানির ভাই ও মহারানির রাজত্বের আমলের উদয়পুবের হোম মিনিস্টাব এই রাজাধিরাজের যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মধুর ব্যবহার। হয়তো একটা বন্দোবস্ত কবতে পারেন। উদযপুবে তাঁর মিষ্টি ব্যবহার ও আপ্যায়ন খুব আনন্দ দিয়েছে। বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁব জ্ঞান ও উৎসাহ আছে প্রচুর। তিনি কি আমার মনের এই বাসনা পূর্ণ করবার চেষ্টা করে দেখবেন একবার?

টেলিফোন করা মাত্র তিনি রাজি হলেন চেষ্টা করতে। তবে আমার হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে; এর মধ্যে কোনও জলজ্যান্ত কবিকে জোগাড় করা খুব শক্ত। কিন্তু একজন বাঙালি কবিকে বাজস্থানী কবিতা শোনাতে পারলে তিনি নিজে খুব সুখী হবেন।

হরি, হরি! বাঙালি কবি? রাজাধিরাজ বলেন কি?

কিন্তু কোনও কবির সন্ধান বোধহয় পাওয়া গেল না। সে আশা ছেড়ে দিয়ে মোটঘাট সব গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দিলাম স্টেশনে। আর কয়েক মিনিট পরেই আমরাও রওনা হব।

জীবনে কত সাধই তো অপূর্ণ থেকে যায়। আর এ শুধু রাজস্থানের মাটিতে বসে চারণের নিজের মুখে গান ও কবিতা শোনা।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় সামনের ঘরের দরজায় লম্বা একটি ছায়া এসে পড়ল। প্রথমেই নজরে পড়ল, একজোড়া সুন্দর কাঠের নাগরা-পরা পা। লম্বা সাদা আঙরাখায় ঢাকা এক বৃদ্ধ বীর। কোমরে ঝুলছে তরোয়াল, মাথায় শোভা পাচ্ছে উদ্ধত পাগড়ি। গালপাট্টা দাড়ির সাদা ঢেউ থুতনির দুদিক থেকে পাল তুলে মুখের দুপাশে উড়ে যাচ্ছে। মহারাণার দরবারের কোনও সম্মানিত সর্দার হবেন।

না। শ্রীউজ্জ্বল বিজয়করণজীকে রাজাধিরাজ পাঠিয়েছেন আমার কাছে চারণ গাথা শোনাবার জন্য। বিজয়করণজীর পিতা কবি শ্রীউজ্জ্বল ফতেকরণজী মেবারের জাতীয় চারণ হিসাবে সম্মান পেয়েছিলেন শুনলাম। ঘোড়ায় চড়া, হাতিয়ার চালানো, শিকার করা রাজপুতের এ সব স্বাভাবিক ওস্তাদিতে তাঁর হাত ছিল কবিতার কলমের মতই পাকা। বিজয়করণজী নিজেও কবি। কিন্তু সসম্মানে ঘোষণা করলেন যে তাঁর পিতাজী তাঁর চেয়ে অনেক বড় কবি ছিলেন।

ট্রেনের তাড়ার কথা ভুলে কবির হাত দুটি ধরে এনে তাঁকে বসালাম। উৎসাহী শ্রোতা নিশ্চয়ই সমঝদারও হবে এই আশাতে কবিও আসন জাঁকিয়ে কবিতা শোনাতে বসলেন। ডিংগল ভাষায় আবৃত্তি বোঝা খুব শক্ত নয়। ভাষা যেখানে কানে এসে আটকিয়ে যায়, ভাব সেখানে এসে মনের দরজা খুলে দিয়ে যায়। এমনভাবে বোঝা না বোঝার আলো অন্ধকারে চারণ গাথার বীররস গম্‌গম্‌ করে সমস্তটা ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াতে লাগল।

বীররসের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি কোমরের তলোয়ারখানা খাপ থেকে টেনে খানিকটা বের করে আবেগ দিয়ে আবৃত্তি করলেন—

বীর পিযো পয় মাতুকো,
পিয়ো অধর রস বাম
অব শোণিতারিয়ন্‌ পিয়ত,
তোহি পিয়নকো কাম॥

হে বীর, তুমি মায়ের দুধ পান করেছ, রমণীর অধর-রস পান করেছ। এখন শত্রুর শোণিত পান কবছ। পান করাই তো তোমার ধর্ম।

হলদিঘাটের যুদ্ধ বর্ণনা শুনতে চাইলাম। কবি সে কাহিনিরও খানিকটা মনে করে আবৃত্তি করে করে গেলেন। বিরাট ঘরখানার দেওয়াল জুড়ে টাঙানো ছিল হলদিঘাটের যুদ্ধের ছবি—ঘটনার পর ঘটনা বহু রঙে রাজশিল্পীর জীবন্ত তুলিতে আঁকা। এই ছবির সমস্ত অংশগুলি একটার পর একটা ভালো করে খুঁটিযে দেখে আমাদের বালিকা-কন্যা অনুরাধা এই কদিন রোজই আমায় প্রশ্ন করেছে যে, হলদিঘাটে যদি প্রতাপসিংহ ও মানসিংহ একসঙ্গে দেশের জন্য যুদ্ধ করতেন তাহলে কি হতে পারত।

চারণের সুর করে পড়া কবিতা শুনতে শুনতে সেই আধো-অন্ধকার সন্ধ্যায় সে ছবির নায়করা যেন মনে হতে লাগল নতুন রূপ ধরে নেমে আসছে ছবির ভেতর থেকে, ইতিহাসের পাতার মধ্য থেকে –ভিড় করে আমার চারপাশে।

হলদিঘাটের গিরিসঙ্কটে মোগল-রাজপুত মারামারি ঠেলাঠেলি করতে করতে কোথায় হলুদ রঙের ধূলিরাশিতে মুছে গেল, মিশিয়ে এল। মানসিংহ সেলিমের শিবির থেকে বেরিয়ে এসে যেন অতীতকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতাপের হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেলেন। চৈতকের পাশে দাঁড়িয়ে শক্ত আর প্রতাপ দুভাই ঘরশত্রুর বদলে পরমমিত্র হয়ে পরস্পবকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা জলের ভিতর দিয়ে সম্মিলিত সমগ্র রাজোয়ারা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। এক হয়ে যাওয়া সমস্ত ভারতের মধ্যে এসে রাজোয়ারাও এক হয়ে গেল।

এসেছিলাম নয়া রাজস্থান কেমনভাবে বদলিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে নিজেকে নয়া হিন্দুস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তা যাচাই করে দেখবার জন্যে। কিন্তু চিরকালের রাজোযারা আমায় হাতছানি দিয়ে কোথায় যে টেনে নিয়ে গেল তার হিসাব কষে দেখিনি একবারও। আর না-ই বা করলাম তার হিসাব। নিজের মনের কাছে তো আমি ঠকিনি একটুও।

চমক ভাঙল যখন চারণ কবি বিদায় চাইতে গিয়ে মনে করিয়ে দিলেন যে, আমার ট্রেন বোধ হয় এতক্ষণে ছেড়ে যাবে।

সত্যিই তো মনের ট্রেন আমার অতীত হতে দূর অতীতে, জন্মান্তর থেকে জন্মান্তরে পিছনে টেনে নিতে নিতে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল—এতদিন পরে সেখান থেকে আবার সামনের দিকে, নিষ্ঠুর সামনের দিকে দিল্লির ট্রেন আমায় নিয়ে যাবার জন্য ফোঁসফোঁস করে গজরাচ্ছে। সামনের দিকেই টেনে নেবে। শুধু সামনের দিকেই। এই চোখের জলে ঝাপসা ছবিটিকে সেই সামনে নিয়ে যেতে পারব কি সঙ্গে করে—সযত্নে সাবধানে, যেন রূঢ় বর্তমানের অসত্য স্পর্শে সে ছবিটিতেও এতটুকুও আঁচড় না লাগে?

কবি শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে স্টেশনে এলেন। খুশিতে ভরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম,—আপনি আমায় যা দিলেন সে অমূল্য ধনকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে মন চাইছে না।

মৃদু হেসে কবি, খরখরে নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে রৌদ্ররসের ঢল নামা কবি, কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম করে বললেন,—না, না, বাংলাদেশের একজন সাহিত্যিককে যে আমি চারণ গাথা শোনাতে পেরেছি এটা আমারই ভাগ্য। আমবা জানি ডি এল. রায়ের পত্রিকা ভারতবর্ষে পদ্মিনী রানির উপর আপনি একটি কবিতা লিখেছেন। উদয়পুরের বাঙালিরা আমাদের সে কবিতার অনুবাদ করে শুনিয়েছে। আপনাকে গাথা শোনানোর জন্য চারণ সম্মেলনে আমার আসন এগিয়ে যাবে।

ট্রেন এগিয়ে গেল একটা ধাক্কা দিয়ে। মনের মধ্যে একটা বিরাট নাড়া অনুভব করলাম। বাংলাদেশকে ও তার সাহিত্যকে চারণ কবি এই যে সম্মান দিলেন তার প্রতিদানে জানালা দিয়ে মুখ বার করে দিলাম শুধু ছোট্ট একটা নমস্কার।

নমস্কার তোমাকে হে চারণকবি, হে অমর বীরগাথা, হে রূপকথার রাজোয়ারা।

রাজোয়ারা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

"শ্রীযুক্ত দাশ যেন বাঙালির প্রতিনিধি ও সাংস্কৃতিক দূত হয়ে রাজস্থান ভ্রমণ করছেন এবং তারই বৃত্তান্ত মনোবম ভাষায় লিখেছেন। . .বর্তমান রাজস্থানের নিবিড় পরিচয় পাচ্ছি। 'রাজোয়ারা' গল্পের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, এতে রাজপুত নরনারীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।"

—শ্রীরাজশেখর বসু

"অনন্যসাধারণ দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পেলুম...বঙ্গসাহিত্যের একটি অভিনব সম্পদ...তিনি সমগ্র রাজোয়ারার প্রাণ-মন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশ করেছেন....প্রত্যেকটি কাহিনি তার নিজস্ব রসব্যঞ্জনা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে।...ভাষা রচনায় যেমন অস্ত্র-ঝঞ্ঝনার আওয়াজ শুনেছি বাক্য প্রয়োগে তেমনি সার্থক লেখকের সুকুমার লেখনী সঞ্চালন।"

—শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল, কথাসাহিত্য

"রাজোয়ারার লেখকের অবদানে বাঙালির অন্তর ধর্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। . ভাবতের সংহতির মূল সূত্রটি তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন। বাঙলার সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিনব মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

—দেশ

"রাজস্থানের বেদনাকরুণ ঐশ্বর্যময় দ্বিপ্রহরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

—আনন্দবাজার

"Glowing canvas...Rajasthan both old and new, pulsates with the quivering intensity of our new-born freedom."

–Hindusthan Standard

"Epoch making literary masterpiece."

–Amrita Bazar Patrika

"পেলাম ব্যাপক অনুভব, বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার, ওজস্বী মেধা আর রসসমৃদ্ধি। ...বর্ণনা শৈলীর আকর্ষণ সম্মোহক। এ তো রচনা নয়, তপস্যা।"

—অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো

রাজসী

মনোজ বসু
সুহৃদ্বরেষু,

বাংলা সাহিত্যের সেবায়
রাজসী
হয়েছে যাঁর লেখনী

এক

"আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি।"

মনে মনে সারাদুপুর গুনগুনিয়ে উঠেছে গানের কথাগুলি। আমার সোনার বাংলা। সোনার বাংলা! তোমায় যে কত ভালোবাসি তা বুঝি এই রোদে-পোড়া মরুভূমির দেশে আসার আগে কখনও এমন করে বুঝতে পারিনি।

সিরোহি থেকে মাড়োয়ারের দিকে চলেছি। যত দূর দেখা যায় খালি ধু-ধু করছে সমুদ্র। নোনা জলের নয়, নুনের মতো গুঁড়ো বালির সমুদ্র। ট্রেনের কাঁচের শার্সির মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। এক-একটা দমকা হাওয়া আসছে। সঙ্গে সঙ্গে মণ খানেক বালি যেন নতুন প্রাণ পেয়ে আহ্লাদে লুটোপুটি খেয়ে বেড়াচ্ছে। একটা আঁধি ধেয়ে আসছে আর মনে হচ্ছে যে, আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যটা বোতল থেকে ছাড়া পেয়ে তেড়ে আসছে। আকাশ জুড়ে তার আনাগোনা, দীর্ঘশ্বাস, তার আকুলি-বিকুলি।

দিন-দুপুরে এই আঁধি আঁধার করে তুলছে চারদিক। তার মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ফোঁস ফোঁস করে গর্জে এগিয়ে যাচ্ছে। কামরার মধ্যে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী কোনও রকমে মরুভূমির গরম মাথায় করে চলেছি। এঁটে বন্ধ-করা দরজা জানালার মধ্যে দিয়ে খোলাখুলি ঢুকতে পারছে না বলেই বোধ হয় আঁধির দৈত্য বার বার শাপমন্যি দিয়ে আগুনের হলকা ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

নাঃ। এর চেয়ে কালবৈশাখী অনেক ভালো। আসে মাতালের মতো হাওয়া, পাগলাঝোরার মতো হুড়মুড় করে। কালো মেঘ নামে মেঘনাতে। খুশিতে ডগমগ হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে যায় আকাশ। গাছ-পালার ভিতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে জলদ রাগিণী বেজে ওঠে। ডাল-পালা শুরু করে তালে তালে নাচন। বাদল হাওয়ায় যদি কোনও দৈত্য থাকে সে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে যায় না, দিয়ে যায় মুঠি মুঠি ছেঁড়া পাতাঝরা ফুলের উপহার। তারপর নামে বরষা। দেহের জ্বালা আর মনেব অস্বস্তি ধুয়ে-মুছে দেয়। সদ্য-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধটুকুও কত ভালো লাগে। তামাম ফরাসী মুলুকের সেন্টের মধ্যে নেই তার তুলনা।

বাংলার কালবৈশাখীর সঙ্গে কি হয় মরুভূমির আঁধির তুলনা?

ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল যে, মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায় হেরে যেতে যেতে কোনও রকমে কারসাজি করে সামলিয়ে নিয়ে শের শাহ বলেছিলেন—এক মুঠো ভুট্টার জন্য আমি হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলাম।

কিন্তু সেই এক মুঠো ভুট্টার দেশের লোকরাই আমাদের সোনার বাংলায় এসে মুঠো মুঠো সোনার সন্ধান পেয়েছেন।

সে সন্ধান আমরা দু'পাতা কেতাব পড়া মাথার অভিমানে এই দু'শো বছরেও পেলাম না। মা সরস্বতীর রাজহাঁসটির ঠোঁটের ঠোক্করে চোখ দুটি প্রায় যায় যায় বলেই কি দৃষ্টিকানা হয়ে গেলাম?

তবু—তবু যতই অকেজো হই না কেন, অযোগ্যেরও ভালোবাসার অধিকার আছে। এই অধিকারের সাফাই মনে মনে গাইছিলাম। তার চোটেই বোধ হয় গুনগুনানিটা একটু বেশি জোরে হয়ে গেল হঠাৎ—

আমার সোনার বাংলা...।

সামনে বসা সঙ্গীর মুখে একটু হাসি খেলে গেল। পরিষ্কাব বাংলায় বললেন—নমস্কার, আপনি নিশ্চয়ই বাংলা মুলুক থেকে আসছেন?

বলা বাহুল্য, উনি আসছেন মাড়োয়ার মুলুক থেকে। যেখান থেকে বছর বছর নতুন নতুন লোক ভাগ্যের সন্ধানে বাংলা দেশে যান। যে ধন আমাদের চার পাশেই ছড়ানো পড়ে আছে অথচ আমরা খুঁজে পাই না, সেই ধন ওঁরা একেবারে যাকে বলে পথ থেকে কুড়িয়ে তুলে নেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় একটা নতুন কথা তিনি ভালো করে পেড়ে বসলেন। যদি রাজপুতানার ব্যবসায়ীরা বাংলা দেশ ছেঁকে না বসতেন তাহলে আরও অনেক বেশি টাকা বিদেশী বণিকদের হাত দিয়ে বিদেশে চলে যেত। ক্লাইব স্ট্রীটের শোষণকে রুখে দেশের টাকা দেশেই—হোক না কেন অবাঙালির পকেটে—রাখতে সাহায্য করেছে একমাত্র বড়বাজার, বাঙালির কলেজ স্ট্রীট নয়।

ভদ্রলোক শুনতে চাইলেন বাংলার অতীত দিনের সম্পদের কথা—যে সময় তাঁর দেশের লোকেরা ভাগ্যের খোঁজে লোটা ও কম্বল মাত্র সম্বল করে দেশের পশ্চিম কোনা থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত দলে দলে চলে আসা শুরু করেনি।

ভদ্রলোকের কথাটা খুব মনে ধরল। জাঁকিয়ে বসলাম তাঁকে বাংলা দেশের রূপকথা শোনাতে। বার বার এসেছি এঁর দেশে রাজস্থানী রূপকথার সন্ধানে। তন্ন তন্ন করে দেশটা দেখেছি প্রত্যেক বারেই। মনের জানলাটা খোলা রেখেছি সব সময়ই। যাতে গ্রীষ্মে বাদলে শীতে সর্বদাই সব কিছু দেখতে পাই। রাজপুতদেরই অতিথি হচ্ছি বার বার। বেড়াচ্ছি থাকছি, এমন কী স্বপ্নও বোধ হয় দেখছি তাদের সঙ্গে। এমন সময় যদি কেউ বলে,—এবার একটু বলুন আপনার নিজের দেশের কথা, তাহলে মনটা খুশিতে নেচে ওঠে বই কি।

না, আমি বাঙালির লেখা বই থেকে সে সোনার বাংলার পরিচয় দেব না। এমন কি, কোনও ভারতীয়ের লেখা থেকেও নয়। নিছক বিদেশী যাঁরা, যাঁদের বাংলা দেশকে ভালোবাসার কোনও কারণ বা দরকার ছিল না, তাঁদের কথা নিয়েই এদেশের পরিচয় দেব।

বেশি মনোযাগ দিয়ে শুনবার জন্য মাড়োয়ারি ভদ্রলোক মাথাটা একটু হেলিয়ে বসলেন। তাঁর দু'কানে দুটো বড় বড় হীরে সোনার বাংলার ধনের পরিচয় দিয়ে ঝকমকিয়ে উঠল।

ইউরোপ তখন হিন্দুস্থানের লেখাজোখা নেই এমন সোনার স্বপ্ন দেখছে। আগে ইউরোপ মিশরকেই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আর রত্ন-প্রসবিনী দেশ বলে মনে করত। কিন্তু দু'দু-বার বাংলা দেশকে তন্ন তন্ন করে দেখে বার্নিয়ের স্বীকার করলেন যে, মিশরকে যে সম্মান দেওয়া হয় সেটা আসলে বাংলারই প্রাপ্য।

সত্যি কথা বলতে কী, ফ্রান্স থেকে বার্নিয়েরকে যে-কটি বিশেষ প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার মধ্যে একটিতে বাংলা দেশ কত সুন্দর, উর্বর ও ধনী তার হিসাব চাওয়া হয়েছিল।

তখন বাংলা মোগল-সাম্রাজ্যের পনেরোটা সুবার মাত্র একটা সুবা ছিল। তবুও তার ধন ও সৌন্দর্যের খ্যাতি লোকের মুখে মুখে যে ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল, সেটা নেহাত সামান্য কথা নয়।

আজ বাংলা দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষের, চালের র‍্যাশন আর আগুনের মতো দামের দিনে কী করে বিশ্বাস করব যে, এই দেশেই এত চাল হত যে, শুধু কাছাকাছির প্রদেশগুলিকেই যে খাওয়াত তা নয়, তা নদীপথে বিহার আর সমুদ্রপথে দক্ষিণভারতের শেষ কোনা, এমন কি সিংহল আর ভারত মহাসাগরের মালদ্বীপে পর্যন্ত রীতিমতো চালান যেত? আমাদের পূর্বপুরুষেরা জাভা বা উত্তর-প্রদেশের চিনির মুখ চেয়ে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ভোরে বসে থাকত না। তারা নিজেরাই চিনি পাঠাত শুধু দাক্ষিণাত্যে বা বোম্বাই অঞ্চলে নয়, সেই সুদূর আরব, পারস্য পর্যন্ত।

আর মিঠাই? তার কথা বলতে এই মিঠাইয়ের রাজা কলকাতার বুকের ছাতি এখনও ফুলে উঠবে। দক্ষিণ আর পূর্ব-বাংলার মিঠাই নিয়ে পোর্তুগীজরা দেশ বিদেশে ভারত হতে রপ্তানি কারবার করত। মধু ছিল একটা বড় চালানি মাল।

এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের কপালে যথেষ্ট ভাত জোটে না বলে সরকারি র‍্যাশনে তার বদলে কিছু কিছু আটার বন্দোবস্ত হয়েছিল। তাতে আমাদের আপত্তি আর সে আটা খেয়ে পেটের বিপত্তির সীমা নেই। পেট-রোগা বাঙালির কাঁকরমণি চালই সই, তবু আটা চলবে না। অথচ সে যুগে আমরা শুধু যে প্রচুর গম জন্মাতাম তা নয়, এত চমৎকার আর সস্তা বিস্কুট তৈরি করতাম যে, ইংরেজ, পোর্তুগীজ, ডাচ, সব বিদেশী জাহাজেই সে বিস্কুট বাবে বরে চালান যেত।

আর এবার তৈরি হোন মোগলাই আর খ্রিস্টানি খানার জন্যে। সেকালের বাবুর্চি জানত যে ফিরিঙ্গি মনিবের জন্য টাকায় মাত্র গোটা কুড়ি পঁচিশ মুরগি কিনে আনলেই তিনি কেল্লা ফতে বলে খুশিতে নেচে উঠবেন। হাঁস পায়রা ভেড়াও ছিল তেমনি সস্তা। হরেকরকম মাংস নুনে জারক করে নিয়ে বিদেশী জাহাজে চালান দেওয়া হত। তাজা বা নুনে জারানো মদেরও চালান হত প্রচুর।

এত সুখ, খেয়ে বেঁচে থাকার সুখ দলে দলে বিদেশী আর মিশেলী জাতের লোকদের বাংলা দেশে টেনে আনত। যার অন্য কোথাও ঠাঁই জুটত না সেও এদেশে এসে আশ্রয় পেত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী সুধায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া।'

সব বিদেশী ভ্রমণকারীই লিখেছেন যে, আর কোনও দেশে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য এত

হরেক রকমের জিনিস তৈরি হত না। তুলো আর রেশমের জিনিসের জন্য বাংলা শুধু মোগল সাম্রাজ্য বা হিন্দুস্থানের নয়, এশিয়ার অন্যান্য সমস্ত দেশ এমন কি ইয়োরোপের ভাণ্ডার ছিল। মোটা ও মিহি, সাদা ও রঙিন সুতি কাপড় এত তৈরি হত যে, তার তুলনা নেই। সে যুগে দুর্গম জাপান পর্যন্ত তা চালান যেত। রেশমী কাপড়-চোপড়েরও সমান সুদিন ছিল বাংলা দেশে। কত প্রচুর রেশমী জিনিস যে নানা দেশে চালান যেত তার কোনও হিসাব ছিল না। আর যেমন সুন্দর জিনিস তেমনি দামে সস্তা।

সোরা আর অন্যান্য খনিজ জিনিসও খুব ভারী হাতে বিদেশে চালান হয়ে বাংলাকে সোনায় মুড়ে দিত। মোম, গালা, মরিচ এ সবের কথাই নেই।

এমন কি আজ যেখানে আলিগড় থেকে মাখন আর বিহার থেকে ঘি না এলে বাঙালিকে ঘি মাখন ছাড়াই জীবন কাটাতে হবে, সেখানে সেই সোনার বাংলায় এত প্রচুর ঘি হত যে সমুদ্র দিয়ে তা চালান করা হত জাহাজ জাহাজ।

ইটালিয়ান ভ্রমণকারী মানুচ্চিও সেই সময়ে ভারতবর্ষে এসে সারা দেশ দেখে বেড়িয়েছিলেন। তিনিও লিখে গেছেন যে, ঢাকার চার দিকে পূর্ব বাংলায় অসম্ভব রকম আর প্রচুর পরিমাণে সুন্দর সুতি আর রেশমী কাপড় তৈরি হয় আর ইয়োরোপে ও অন্যান্য দেশে জাহাজে জাহাজে সে সব চালান যায়। পশ্চিম-বাংলায় রাজমহল অঞ্চলেও খুব মিহি কাপড় আর প্রচুর চাল হয়।

দুশো বছরেরও আগে কলকাতায় বসে "মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি ঐতিহাসিক টুকরো" বই লিখেছিলেন রবার্ট অর্ম। বাংলা দেশে তখন সুতি কাপড় তৈরি ছিল একটা জাতীয় শিল্পকলা। প্রায় প্রত্যেকটি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে তাঁত চালাচ্ছে না এমন গ্রাম তখন বাংলা দেশে খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। বিলাসীদের চূড়ামণি মোগল সম্রাট আর তার বেগম-পরিবারদের জন্য ব্যবহারের সমস্ত কাপড় তৈরি হত ঢাকাতে। এত মিহি বুনন ছিল তাদের যে, ইয়োরোপীয় বা অন্য যে কোন লোকের জন্য যা কাপড় তৈরি হত তার দশ গুণের চেয়ে বেশি দাম হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ধারাই চলে এসেছিল।

জগতের আলো নুরজাহান ঢাকাই মস্লিনের এত ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর সময় থেকে মোগল বাদশার হারেম আর আমিরদের ঘরে এই কাপড়েরই জোর বেওয়াজ হয়ে গেল। সে যুগের টাকার হিসাবে এক্টুকরো দশহাত লম্বা আর দু হাত প্রস্থ আর ওজনে মাত্র নশো গ্রেন বা পাঁচ সিক্কা আব-ই-রাওয়ান অর্থাৎ জলের ধারা প্যাটার্নের মসলিনের দাম হত চারশো টাকা। এ যুগের হিসাবে ধান-চালের দামের নিরিখে অন্তত তিন হাজার টাকা।

সম্রাট আওরঙজেব এক টুকরো জামদানী মসলিন অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। দাম দিয়েছিলেন তখনকার সময়ে আড়াই শো টাকা।

শেঠজী ততক্ষণে তাঁর মিহি ধুতিখানার খুঁটে আঙুল বুলোচ্ছেন। দেখে আমার সন্দেহ হল যে, হয়তো তিনি বাংলা দেশের শুধু মিহি আর মোলায়েম সম্পদের ইতিহাস শুনতে শুনতে একটু হয়রান হয়ে পড়েছেন। তাই এবার অন্য রকমের কথা পাড়লাম।

মনে করবেন না যে, বাংলা শুধু ভাত-কাপড়েরই বন্দোবস্তে ব্যস্ত থাকত। এই দেশ থেকে যে এত সোরা চালান যেত তা কিসের জন্য জানেন? বারুদ তৈরি হবার জন্য। আমরা যদি সোরা না পাঠাতাম, তাহলে যুদ্ধবিদ্যায় কোনও আধুনিকতা, কোনও নতুন আবিষ্কারই সহজ হত না। ইয়োরোপীয়রা তো এদেশে পাট গেড়ে বসল এই বারুদেরই কল্যাণে।

আর যুদ্ধ জাহাজ? সে-ও এখানেই তৈরি হত। যুদ্ধের জাহাজ আর বাণিজ্যের জাহাজ এখান থেকে হিন্দুস্থানের সর্বত্র, মায় পারস্য, আরব, চীন, দক্ষিণ সাগরে ঘুরে বেড়াত। ইংরেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন টমাস বাউরি এদেশে দশ বছর কাটিয়ে তার "বঙ্গোপসাগরের চারি দিকের দেশগুলির ভূগোল" কাহিনিতে সেকথা লিখে গেছেন।

বাঙালির নৌ-যুদ্ধে বিক্রমের কথা শুধু কাহিনি নয়, ইতিহাসও বটে। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে লিখে গেছেন, কেমন করে বাঙালির নৌ-বল জৌনপুর পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে লড়ে গিয়েছিল।

শেঠজীর চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। য়্যাঁ, মশায়, আপনারাও লড়াই করতেন না কি?

হেসে তার ভুল ভাঙিয়ে দিলাম—বাংলার ইতিহাস আমাদের দেশে ঠিক মতো পড়ানো হয় না। না

হলে সবাই জানতে পারত যে, বাঙালি কখনো বেশি দিন দিল্লির কাছে মাথা নিচু করে থাকেনি। সর্বদাই মাথা উঁচু করে উঠেছে। সবচেয়ে নামকরা মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'-তে এ জন্যেই লিখেছিলেন যে, চতুর আর ওয়াকিবহাল লোকরা লক্ষ্মণাবতীর নাম দিয়েছে বুলঘাকপুর অর্থাৎ লড়াইয়ে শহর। স্বাধীনতার জন্য আবেগ বাংলা দেশের মাটিতেই গজায়। তাই দিল্লি থেকে যে সব সুবাদার পাঠানো হত তারা সেখানে গিয়েই বাংলার স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে দাঁড়াত। অন্য উপায় ছিল না। কারণ তা না হলে অন্য লোকেরা তাদের হঠিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

রাজোয়ারার চেয়ে বাংলা তাহলে কম কিসে? শুধু কর্নেল টডের মতো অতীতকে নতুন করে গড়ে দেখাবার লোক নেই বলে।

কিন্তু লড়াইয়ে আমরা ধর্মযুদ্ধের নীতি মানতাম। সিলভিয়েরা ছিল একজন পোর্তুগীজ জলযোদ্ধা। বাংলা দেশ থেকে গুজরাটে যে সব জাহাজ যাচ্ছিল সেগুলি পথে আটক করে মাঝিমাল্লাদের তাদের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে জোর করে বেগার খাটাতে চেয়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পোর্তুগীজ জলদস্যুরা বিনা ঝঞ্ঝাটে একরকমভাবে ডাকাতি করে বন্দীদের খুশিমতো খাটিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা প্রথম বাধা পেল এই বাঙালিদের কাছে।

আর বাঙালি সমাজ? তখনকার সভ্য বাঙালি সমাজ আর বাংলার রাজদরবার পোর্তুগীজদের এজন্য খুব ছোট বলে মনে করত। পৃথিবীর এক কোনায়, হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্যের একটেরে থাকলেও বাংলায় 'ইন্টারন্যাশন্যাল ল' মেনে চলাই রীতি ছিল।

শুধু ধানে নয়, ধনেও ভরা ছিল সোনার বাংলা। আওরঙজেব যখন যুদ্ধের পর যুদ্ধে ফতুব হয়ে গিয়েছিলেন তখন বাদশার বিরাট অন্দরমহলের আর সেনাদলের খরচ চালনার একমাত্র উপায় ছিল বাংলা দেশেব টাকা। আঠারো শতকের প্রথম চল্লিশ বছর দিল্লির মসনদ দাঁড়িয়েছিল শুধু বাংলার সোনার বনিয়াদের উপর।

কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল স্ট্রেনশাম মাস্টাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে লিখেছিলেন যে, পনের বছর বাংলার সুবেদারি কবে শায়েস্তা খান যা টাকা করেছিলেন, পৃথিবীতে আর কোথাও কেউ তেমন কবতে পারবে না। তাঁব মোট টাকা তখন ছিল সে যুগের আটত্রিশ কোটি টাকা, আর দৈনিক আয় ছিল—এমন কিছু নয়—মাত্র দু লাখ টাকা।

শেঠজীর মুখখানা হাঁ হয়ে যাচ্ছে দেখে বলে ফেললাম—না, না, ভয়ের কিছু নেই। শায়েস্তা খানকে হিসেব লুকোতে হয়নি। ইনকাম ট্যাক্স ছিল না সে সোনার যুগে। অবশ্য সিধেটা ভেটটা পাঠাতে হত।

'মাসিব-উল-উমরা' নামে মোগল ওমরাহদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বইয়েতেও এমনই অবিশ্বাস হবার মতো ধনরত্নের কথা লেখা আছে।

আওরঙজেবের নাতি বাংলার সুবেদার আজিমকে লেখা বাদশাহী চিঠিতে আছে, কেমন করে বাংলার উদ্বৃত্ত নগদ টাকা আওরঙজেবের কাছে গাড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে চালান যেত। এত টাকার হুণ্ডি দেবে পৃথিবীতে কোন্ শেঠ বা কোন্ ব্যাঙ্ক? তাই সেই রেল-স্টিমার-হীন যুগে চালান যেত কাঁচা টাকা গাড়ি গাড়ি বোঝাই।

তার পরে যখন মোগল মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি চলতে লাগল, প্রত্যেক নতুন বাদশাহেবই তখন একমাত্র ভরসা ছিল বাংলা দেশ। বাংলার সোনা যার হাতের মুঠোয় তারই কেল্লা ফতে। ফরোখশায়ার এরই জোরে দিল্লিতে সম্রাট হয়ে বসেছিলেন।

আমাদের ট্রেন মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এক মনে চলেছে। ধু-ধু করছে শুধু বালি আর শুধু বালি। এমন কি, এদিকে ওদিকে কাঁটার ঝোপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। শুধু সোনালি বালি। ভাবতে লাগলাম, বাংলার মাটিতে সত্যিই সোনা বিছানো ছিল। কোথায় গেল অত জমানো সোনা?

তার উত্তর পেলাম ক্লাইভের জবানবন্দীতে। পার্লামেন্টে সিলেক্ট কমিটিতে। বাংলায় অসম্ভব লুঠের জন্য আসামি লর্ড ক্লাইভ নিজেকে বাঁচাবার জন্য সাফাই গাইলেন—"পলাশীর জয়ের ফলে আমি কী অবস্থায় পড়লাম তা বিবেচনা করে দেখুন। একজন বড় রাজা আমার মর্জির উপর নির্ভর করছে। আমার পায়ের তলায় একটি মহাধনী শহর। শুধু আমার সামনে খুলে দেওয়া হল মাটির নীচের তোষাখানা, তার দু'পাশে সোনা আর মণি-মাণিক্য স্তূপ করে রাখা হয়েছে—আমি চললাম তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে। মিস্টার চেয়ারম্যান,

এই মুহূর্তে আমি আমার নিজের সংযমের কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।''

সত্যিই তো? যে সময় টাকায় চার মণ চাল পাওয়া যেত, সে সময় ক্লাইভ হাতিয়েছিলেন মাত্র চল্লিশ লাখ টাকা।

পকেটের সুতির রুমালটা চোখ থেকে পকেটে ফিরে যাবার সময় মনে পড়ল ইংরেজ কুঠিয়ালদের রুমালের কারবারের কথা। ওরা একবার বালেশ্বরে বারো হাজার রেশমী রুমাল মাত্র সাড়ে তিন টাকায় কিনে নিজেদের দেশে চালান দিয়েছিল।

কিন্তু কোথায় গেল বাংলার সেই রপ্তানি বাণিজ্য—যাতে ভারে ভারে বিদেশী টাকা আসত এদেশে? যার ফলে বার্টার অর্থাৎ জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে কেনা-বেচা করার নিয়ম বাংলা থেকে সে যুগে একেবারে উঠে গিয়েছিল।

কোথায় গেল টমাস বাউরির হিসাবে লেখা চিনি, সুতির কাপড়, গালা, মধু, মোম, ঘি, তেল, ডাল, রেশম আর চালের জাহাজ-ভরা চালান?

বাংলায় ফলের দোকানে গিয়ে আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় আজকাল। যেমন দাম, তেমনি কম মাল। আর গ্রাম দেশে তো মরশুমের সময় ছাড়া কোনও ফল চোখেই পড়ে না। এমন দামের গরম যে ফল জিনিসটা আজকাল শুধু কবিতা লিখে হা হুতাশ করবার মতো জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বাংলা দেশের আদি ও অকৃত্রিম ফল কলাকে পর্যন্ত কলা দেখিয়ে সিঙ্গাপুরী কলা বাজার মাত করে রেখেছে। অথচ বাংলার কলা সম্রাট বাবরের সময়েও সব চেয়ে মিঠে বলে নাম ছিল।

এখানে সাড়ে তিনশ' বছর আগেকার একটা ঘটনা বলি। জাহাঙ্গির আর শাজাহানের সময়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম অঞ্চলে মোগলদের যুদ্ধের ইতিহাস 'বাহারিস্তান-ই-ঘাইবি' বইতে সোনার বাংলার গ্রামাঞ্চলে মোগল সৈন্যদের তন্ন তন্ন করে ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। এক দিন রাত্রে এক গ্রামে শাজাহান তার আমীরদের বিশেষ পেয়ার দেখাবার জন্যে কি উপহার দিলেন তা একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন আজ। না, কিছুতেই ঠাহর করতে পারবেন না। বাজি রেখে বলতে পারি।

সিঙ্গাপুরী আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের এঁচোড়েপাকা চালানি কাঁচা-পাকা কলা খেতে অভ্যস্ত জিভ নিয়ে ভেবে দেখুন বিলাসী ও শিল্পরসিকের সেরা সম্রাট শাজাহান তাঁর সভাসদদের অনুগ্রহ করলেন বাদশাহী খানার অংশ থেকে মর্তমান কলা দিয়ে। তার পর মনে পড়ল যে বিশেষ গোলমেলে ওমরাহ শিতাব খানকে তার জন্য বেছে রাখা কলাগুলি দেওয়া হয়নি। সেগুলি মহলে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছিল, ডাক, ডাক, খোজাদের কলাগুলি নিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু অনেক ডাক-হাঁকের পর বেচারারা মাত্র দুটি কলা এনে হাজির করল। ব্যাপার কি?

সুলতান আওরঙজেব অমন কাঁচা সোনার বরণ আর পাকা সৌরভে ভরা মর্তমানের অমৃত লুকিয়ে চাখতে চাখতে আনমনে প্রায় সবগুলিই সাবড়ে দিয়েছেন। অপকর্মটা যে কতখানি হয়েছে তা খেয়ালে এল যখন মাত্র আর দুটো বাকি আছে।

রাম রাম! ইস্ লিয়ে আপলোগ বঙ্গালমে মর্তমানকো সবড়ি কেলা বি কহতে হ্যাঁয়! ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মহা একটা আবিষ্কার করে ফেলার বাহাদুরি অনুভব করতে করতে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। উচ্ছ্বাসের চোটে মুখ থেকে পরিষ্কার বাংলার বদলে একেবারে খাস রাষ্ট্রভাষাই বেরিয়ে এল।

সাবাশ শেঠজি, আপনার যে রকম রসবোধ আছে, তাতে বাংলা দেশে বাস করা সার্থক হয়েছে।

সে কী কথা বললেন সার? আজকাল তো অনেক বাঙালি মনে কষ্ট পায় যে, অবাঙালিরা এসে বাংলার ধন সব লুটে পুটে খাচ্ছে।

শেঠজির কথার মধ্যে কোনও জ্বালা ছিল না, কিন্তু মুখে ছিল হাসি।

আমিও হাসি বজায় রেখেই বললাম—তা আর কী করা যায় বলুন? যে দেশে যত ধন রত্ন আছে সে দেশেই তত বিদেশীর আমদানি হবে—যদি সেখানকার লোকেরা নিজেদের কোট নিজেরা সামলাবার মতো হিম্মত না রাখে। কই, আপনারা তো সোনার বাংলার যুগে আমাদের ওখানে তেমন পাট্টা গাড়তে পারেননি? এই ধরুন না, এই সেদিনও পাকিস্তান হবার আগে ঢাকা শহরের কারবারে তো আপনারা জুৎ করতে পারেন নি?

প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে এই। সে কোনও জায়গাই খালি রাখতে দেয় না। যেখানে একটুখানি ফাঁক

আছে, সেটাকে ভরে ফেলবার জন্য বাইরে থেকে চাপ আসবেই। বিশেষ করে যদি ঘরের লোক অকেজো হয়।

আরও বিশেষ করে—যদি সে ঘরে এত কিছু পাওয়ার মতো জিনিস থাকে।

বাংলা দেশ যে শুধু ধনধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল তা নয়, এখানকার মেয়েরা ছিল এত সুন্দরী আর মিষ্টি স্বভাবের যে,—যদিও আজকাল ইয়োরোপীয়ান মেয়েদের দিকে গোটা পৃথিবী সতৃষ্ণ চোখে তাকায়—সে যুগে অর্থাৎ যখন সাদা রঙের মহিমা সাদা-রাজের কল্যাণে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি, তখন ইয়োরোপীয়রাই এই শ্যামল দেশের শ্যামা মেয়েদের অপরূপ রূপসী মনে করত।

সে যুগে পোর্তুগীজ, ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে খুব চলতি একটি কথাই ছিল যে, বাংলা দেশে ঢুকবার একশ'টা পথ আছে, কিন্তু ফিরে যাবার পথ একটিও নেই।

এ কথা তারা বলত কারণ বাংলা দেশ খুবই সুখে সহজে ও আরামে থাকবার দেশ ছিল। কিন্তু এই মরুভূমির দেশে ঢুকে একবার পাঠান সম্রাট শের শাহও ভেবেছিলেন যে, মাড়োয়ার থেকে বেরিয়ে যাবার পথ একটাও নেই। অবশ্য, সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

ইতিহাসের সেই সত্য কাহিনিটা এই মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে শোনাতে শোনাতে বাকি পথটুকু শেষ করে দিতে পারলে মন্দ হয় না।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি, এটা হয়ে দাঁড়াল মাড়োয়ারের রাজা মালদেবের সমস্যা। মোগল-পাঠানের টলমলে টালবাহানার মাঝখানে পড়ে নতুন একটা পরিস্থিতি হাজির হল। এত দিন ধরে খুব বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতো তিনি আস্তে আস্তে মাড়োয়ারের বড় হবার পথ তৈরি করে আসছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, রাজপুতদের মধ্যে এত ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান বিশেষ দেখা যায় না।

পলিটিশিয়ান কথাটাই ব্যবহার করলাম। কারণ, এই কথাটার মধ্যে যতখানি ছল চাতুরী আর ক্ষুরের মতো ধারালো বুদ্ধির ইঙ্গিত আছে, বাংলা প্রতিশব্দ রাজনীতিকের মধ্যে তার এককণাও নেই। দুটোর মধ্যে তফাত অনেকখানি। এই ধরুন, চাণক্য হলেন রাজনীতিক, আর কৌটিল্য বলতে বুঝায় পলিটিশিয়ান।

এ হেন মালদেব চোখের সামনে চিতোরকে বাহাদুর শার হাতে ছারখার হয়ে যেতে দেখলেন। দেখলেন, কেমন করে হুমায়ুন সাপ মারলেন অথচ লাঠিটাও ভাঙতে দিলেন না। থুড়ি, সাপ তাড়ালেন অথচ লাঠিটা চালালেন না পর্যন্ত। মনের নোটবুকে সে শিক্ষাটা ভালো করে টুকে রাখলেন মালদেব।

রাজনীতিতে যিনি গুরুজী তাঁর দিনও ঘনিয়ে এল। এবার সাকরেদের পালা—বিদ্যার দৌড় কত দূর এগিয়েছে তার মহড়া দিতে হবে।

বাংলা বিহারে যখন হুমায়ুন আর শের শাহে লড়াই চলছে, তখন মালদেব নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন। তিনি মেবারের পতনের পর মাড়োয়ারকে সব চেয়ে বড় রাজপুত রাজ্যে দাঁড় করালেন। মাড়বারি চারণ কবির ভাষায় তিনি রাজ্যের চারিদিকে আর নতুন জিতে নেওয়া দেশগুলিতে বেশ গুছিয়ে রাঠোরবংশের বীজ পুঁততে লাগলেন। রাজপুতদের মধ্যে বংশের টানই সব চেয়ে বড় টান। তাই শুধু রাঠোরদের মধ্যে থেকেই কমসে কম পঞ্চাশ হাজার সৈন্য তৈরি করে রাখলেন।

কাল সন্ধ্যের দোস্ত যদি আজ ভোরে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, তাহলে রাজনীতির খেলায় রাতারাতি সে দুশমনে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠিক এমনই করে চৌদ্দ বছর আগে বাবর রানা সঙ্গের দুশমন হয়ে গিয়েছিলেন। এত দিন মালদেব মোগল-পাঠানের লড়াইয়ে মোকা পেয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু সে লড়াই বেশি দিন চলল না। হুমায়ুন হেরে রাজপুতানায় পালিয়ে এলেন। কাজেই মালদেব তাকে আবার ঠেকা দিয়ে তুলে ধরে দিল্লির তখ্‌তে বসাবার প্রস্তাব পাঠালেন।

কিন্তু একেবারে পাকাপাকিভাবে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এনে ফেলা ওস্তাদের খেল নয়। শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিজে হেরে গেলে বেচারি হুমায়ুনের আর নতুন লোকসান কী হবে? কিন্তু নিজের যে সবই যাবে। কাজেই মালদেব শেরশাহের সঙ্গেও সন্ধির কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

এদিকে হুমায়ুনেরও মনে সন্দেহের অন্ত নেই। মালদেব কেন নিজে এসে হাজির হলেন না হুমায়ুনকে দু'হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার জন্য? কেন শুধু কিছু ফলমূল আর সোনার আশরফি দিয়েই সিধা পাঠানো শেষ করলেন? কেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাস্তায় লাল শালু পাততে পাততে এগিয়ে এলেন না?

এদিকে শের শাহের দূতও মাড়োয়ারের রাজসভায় এসে হাজির হয়েছে। 'তবাকত-ই-আকবরি'তে

প্রমাণ আছে যে, হুমায়ুনকে বন্দী করে শের শাহের হাতে গছিয়ে দিলে মালদেবকে অনেক কিছু ভেট দেওয়া হবে, এমন আশাও পাঠান সম্রাট দিয়েছিলেন। আর মালদেব নাকি তাতে অরাজিও ছিলেন না।

কিন্তু দেখা গেল যে, খাঁটি রাজপুত মালদেব হুমায়ুনকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও শের শাহের হাতে ধরিয়ে দেবার কোনও চেষ্টা করলেন না।

এদিকে শের শাহ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন মাড়োয়ারের মধ্যে—হয় নিজেই হুমায়ুনকে আশ্রয় থেকে বের করে দাও, না হয় পাঠানদের সে কাজ করতে দাও। অর্থাৎ লড়ে যাও আমার সঙ্গে।

হুমায়ুনের দূত শেষ পর্যন্ত বিনা নোটিশে মালদেবের রাজধানী ছেড়ে সটকে পড়ল। আর মালদেবও যেন মোগলদের পাকড়াবার জন্যই টেনে ঘোড়সোয়ার সৈন্য পাঠালেন। নেহাত কম নয়। একেবারে পনেরো শ'।

কিন্তু এদের মধ্যে যারা বেশি এগিয়ে এসেছিল, তাদের তাক করে হুমায়ুনের মাত্র এক শ' জন সৈন্য তীর ছুঁড়ল। দু-দুজন রাজপুত সোয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে গেল একেবারে সেই মরুভূমির বালির উপর। বাকি সবাই মনে হল যেন হার মেনে পালিয়েই গেল।

শের শাহ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ মাড়োয়ারের সঙ্গে লড়াই করার মতো অবস্থা তখনও দিল্লির ছিল না। নিজেরই তখত যে টলমলে। আর মালদেবও খুশি হলেন যে, কূটনীতির চালে তিনি শের শাহকে কাত করে ফেরত পাঠাতে পারলেন।

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি একেই বলে—পুব-বাংলায় পাটের কারবারী মাড়োয়ারি ভদ্রলোক খুশি মনে বলে উঠলেন।

না, না, অত খুশি হবার মতো ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হয়নি শেঠজী! শুনলে কষ্ট পাবেন, কিন্তু আমরা চিরকালই রাজনীতিতে একেবারে নাবালক—প্রতিবাদ করে বললাম আমি।

মনে পড়ল যে, রাজপুত বীরদের মুখের শোভা গোঁফ-জোড়াকে বীরত্বের নিশানা বলে মনে করা হত। তাই আরও একটা কথা যোগ করে দিলাম—শুধু যে নাবালক তা নয়, জন্ম-মাকুন্দো। গোঁফ জোড়া কোনোদিনই গজাবে না।

এ হেন টিপ্পনী শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেল শেঠজির। বোধ হয় ভাবলেন যে, যারা রাজনীতিতে এত কাঁচা তারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের নীতি তৈরি করতেও এত কাঁচা বুদ্ধি দেখাবে যে, তার পাটের রপ্তানিতে পাকা মুনাফা না-ও থাকতে পারে।

যাই হোক, আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরে কাজ কি? শের শাহ কেমন করে চতুরালিতে মালদেবকে কাত করেছিলেন সোজাসুজি সে কাহিনিতে চলে এলাম।

ঝগড়ার কোনও নতুন কারণ গজায়নি। কিন্তু দিল্লির মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর পর্যন্ত রাঠোর মালদেবের রাজত্ব এসে পড়েছে, এটা কি করে সহ্য করা যায়? কাজেই বছর দেড়েকের মধ্যেই সৈন্য সাজিয়ে মারি ত গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার এই মন্ত্র জপতে জপতে শের শাহ চললেন মাড়োয়ারে। এত বেশি সৈন্য আর জীবনে কখনও তিনি নিয়ে যাননি কোথাও। কিন্তু রাঠোর যে সব চেয়ে বড় প্রতাপশালী বীর! শুধু যে গণ্ডারের মতো সইতে পারে তা নয়; বাঘের মতো লড়েও যায়। আর হাতির পিঠে চড়াও শত্রুরও তোয়াক্কা করে না। রাঠোরের লড়াই, না হাতির লড়াই।

কিন্তু মালদেব আফগান সৈন্যদের এমন বেকায়দা জায়গায় পাকড়াও করলেন যে, শের শাহ প্রমাদ গনলেন। যতই না কেন খান্দাক (আজ কালকার যুদ্ধের ট্রেঞ্চ) বসান, বস্তার দেওয়াল দাঁড় করান, আর কামান হাতি আর বন্দুক সাজান, রাঠোর ঘোড়সোয়ারদের এঁটে উঠবার ক্ষমতা রইল না একটুও। মালদেবের সৈন্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার আর শের শাহের আশী হাজার। কিন্তু ঐতিহাসিক বদাউনির ভাষায়—শের শাহ "মূর্খ, শূয়োরের মতো স্বভাবের খচ্চর হিন্দুদের" বিরুদ্ধে সৈন্যদের এমন ঘোর বিপদে ফেলতে রাজি হলেন না।

অথচ কোনও ফাঁকই নেই পালাবার। এ যে মহা বিপদ হল!

আচ্ছা, নিজের ছায়াকেই ভূত মনে করে যাতে মালদেব পালান, সে রকম কৌশল একটা আঁটা যাক। 'বলং বলং' তো 'বাহুবলম্' নয়। 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'—এ যে শাস্ত্রের বচন।

লিখলেন অনেকগুলি জাল চিঠি। যেন মালদেবের সর্দাররাই লিখছেন শের শাহের কাছে। পাঠালেন

সেগুলি মালদেবের উকিলের তাঁবুর সামনে। উকিল সেগুলি মাটিতে পড়ে আছে দেখে রাজার কাছে পেশ করলেন। শেরশাহের মতলব হাসিল হল।

মহা সর্বনাশের কথা! এতগুলি সর্দার যদি লড়াইয়ের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে আফগানদের দলে এসে ভিড়ে যায়, তাহলে মালদেব যাবেন কোথায়? তাঁবু তুলে প্রাণ নিয়ে পালানোই এ অবস্থায় একমাত্র পথ।

সর্দাররা এসে এই মিথ্যা সন্দেহ ভাঙতে চাইলেন। শপথ করলেন নিজেদের সম্মানের নামে, ভগবানের নামে। কিন্তু হায়! ভাঙা কাঁচ আর ভাঙা মন জোড়া লাগে না। মালদেব রাতারাতি যোধপুরে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু পালালেন না জয় চন্দেলা আর কুম্ভ নামে দুজন সর্দার। তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়েই নাম রক্ষা করবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁরা শের শাহের আশি হাজার সৈন্যের উপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘোড়া চড়ে শত্রু মারতে খুব জুত হচ্ছে না দেখে তাঁরা ঘোড়া থেকে নেমে বর্শা আর তরোয়াল নিয়ে ছুটে চললেন। শের শাহ হুকুম দিলেন, যেন পাঠানরা রাঠোরদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এগিয়ে না যায়। সেটা আত্মহত্যার সামিল। তাই তাঁর সৈন্যরা সামনা-সামনি তরোয়াল নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করলে তাদেরই গর্দান নেওয়া হবে এই হুকুম দিলেন।

সামনে এনে দাঁড় করানো হল হাতি-চড়া পলটন, কামান-চালানো গোলন্দাজ আর পিছনে রইল সারি সারি খোরাসানি তীরন্দাজ। বারো হাজারের একটি রাঠোরও প্রাণ নিয়ে ফিরে গেল না। সেখানে রাশি রাশি শত্রুর মৃতদেহের মাঝখানে তাদের দেহ পড়ে রইল। অসংখ্য ঝরাপাতার মাঝখানে যেমন করে পড়ে থাকে ঝরা ফুলের রাশি।

আহাম্মক! নেহাতই আহাম্মক! দুশো বছর পরে মোগল সম্রাট আওরঙজেবও রাজপুতদের আহাম্মক বলেই নিন্দা করেছিলেন। তিনি তুরাণি সিপাহীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, ওরা অন্য কোনও জাতের চেয়ে বেশি ওস্তাদ লড়াইয়ে। ছল-চাতুরীতে, দুশমনের উপর তেড়ে হামলা করতে ওরা ওস্তাদ। তবে দরকার মতো লড়াইয়ের মাঝখানে হঠাৎ সটকিয়ে পড়তেও ওদের কোনও দ্বিধা বা লজ্জা হয় না। জান দেওয়া-নেওয়ার কারবারে সমান বাহাদুর হলেও এই হিসেবে ওরা হিন্দুস্তানীদের পাঁড় আহাম্মকির চেয়ে একশ ধাপ দূরে। হিন্দুস্থানীরা মাথা দিয়ে দেবে, কিন্তু নিজেদের কোট ছেড়ে দেবে না। এমনই আহাম্মক।

কিন্তু শের শাহ এই লড়াইয়ের শেষে মৃতদেহের জঙ্গল আর তার উপরে ধু-ধু করা মরুভূমির বালি দেখে মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন যে—এক মুঠো বাজরার জন্য আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহী হারাতে বসেছিলাম।

সেই এক মুঠো বাজরার দেশের দিকে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করতে লাগল। আবার সেই সুতির রুমালটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল। রেশমী রুমাল নয়—যে রুমাল তিনশ বছর আগে বাংলা দেশ মাত্র সাড়ে তিন টাকায় বার হাজার খানা দিতে পারত, সে রুমাল নয়। সে কথা ভাবতে চোখ আরও জ্বালাই করতে লাগল। বেরিয়ে এল এক ফোঁটা জল।

সে জলের মধ্যে দিয়ে আবছা একটা ছবি ফুটে উঠল। সত্যিই তো। চোখের জলে কী কিছু ঢেকে দিতে পারে? ঢাকাই মসলিনে কি সম্রাটনন্দিনী জেব উন্নিসার অঙ্গসৌষ্ঠব ঢাকা পড়েছিল? আওরঙজেব ঢাকাই মসলিন পরা আদরিণী মেয়েকে তার বে-আব্রু পোশাকের জন্য বকেছিলেন। উত্তরে জেবউন্নিসা তাঁর সম্রাট পিতাকে বলেছিলেন, বাবা, তবু তো আমি মসলিন আট ভাঁজ করে পরে আছি।

না। চোখের জল ইতিহাসের আত্মীয়তা, ভূগোলের নিকটতা ঢেকে রাখতে পারে না। মোটে পনেরো শ' মাইলের দূরত্ব বাংলা আর রাজোয়ারাতে। এই তো শ' দুই তিন চার বছর আগেকার কথা। এই মরুভূমির বালির মধ্যে ট্রেনের বদলে জল ভরা নদীর ধার দিয়ে নৌকোয় চলেছি। সবুজ সবুজ হরিতে-হরিতে ঢাকা সেই গ্রাম। সেই বটতলা। সেই শিরশিরে বাতাস-বওয়া ধানক্ষেত। সেই মেঘে-ঢাকা মেঘ-ডাকা আকাশ। নদীর এক একটা বাঁক সিনেমার ছবির মতো ভেসে উঠছে নতুন দেখা পাড়া, নতুন খোলা গঞ্জ। শিলেট থেকে চলেছি সোনারগাঁও—পনেরো দিন ধরে নৌকোয়। চলেছি গ্রাম আর ফলের বাগানের সারির মধ্যে দিয়ে। পাড়ে পাড়ে জল তোলার যন্ত্র, ফলের বাগান, ডাইনে-বাঁয়ে হেসে উঠছে গ্রামগুলি।

না, না। সে আমি নই, আমি নই। সে সোনার বাংলা দেখবার সৌভাগ্য তো আমার হয়নি। সে দেখেছিল ছ'শো বছর আগে মিশরের ইবন বটুতা।

দুই

মহারানির নেমন্তন্ন।

সুধী পাঠক, আমার পক্ষে কেমন একটা মহা ব্যাপার তা ভেবে দেখ। বিকেলের চায়ে নয়, সন্ধ্যা বেলার এক কাপ কফিতে নয়, ঢালাও দরবারি রিসেপশনে নয়, একেবারে প্রাইভেট লাঞ্চ পার্টিতে নেমন্তন্ন।

সেই দূর মেঘনার পারে, পুব-বাংলার টিনে-ছাওয়া ছোট্ট কুটির থেকে মরুভূমির মাঝখানে এক মহারানির মার্বেল প্যালেস। তুমি গরিব হতে পার, কিন্তু ভক্তি থাকলে ভগবানকে পাবার আশা আছে। তুমি সামান্য হতে পার, তবু মাথার জোরে কোন্ না কোন্ হিটলার রকফেলার বনতে পার। কিন্তু মেঘনার পার থেকে মহারানির খাস দরবার? নাঃ। এ হেন তাজ্জব কারবারের একটু-আধটু নমুনা স্বাধীন হিন্দুস্থানের রাজভবনে, রাষ্ট্রপতি-ভবনে শুরু হয়েছে বটে। কিন্তু মহারানিদের শাস্ত্রে এখনও লেখে না।

আর যে সে মহারানি নয়। খাস যোধপুরের রাঠোর মহারানি। তাও শুধু মহারানি নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি। রাজমাতাও নয়, নাবালক মহারাজার ঠাকুমা দিদাজী বাই। তাঁর স্বামী আর ছেলে দুজনেই রাজত্ব চালিয়েছেন তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁর ছোট নাতীটিও যদি রাজপাটে উঠতে পারতেন, তাহলে তাঁরই বুদ্ধির জোরে চালাতে হত মাড়োয়ার।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার কল্যাণে সব রাজপাট লোপাট হয়ে গেছে। তবু 'রণ বংকা' অর্থাৎ যুদ্ধে ওস্তাদ রাঠোর রাজবংশের অনেক কিছু বলতেই বোঝায় মহারানিকে। নেহাত পোড়া কপাল টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি না হলে, কোন্ না কোন্ মেরিয়া তেরেসা বা চাঁদ সুলতানার নতুন সংস্করণ হয়তো দেখতে পেতাম মহারানির মধ্যে। এই সাদা চোখেই।

এ হেন মহারানি নেমন্তন্ন পাঠালেন আজ ভোরবেলা। শুধু তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা আর কয়েকজন অন্য রাজ্যের অতিথি মহারানিরা থাকবেন। আর আসবেন আমার নতুন চেনা রাজাসাহেব আর তার ভাই ঠাকুর সাহেব। রাজাসাহেবের 'ঠিকানা' অর্থাৎ জায়গীর হচ্ছে মাড়োয়ারের সীমানায়। বার বার মোগল-পাঠানকে, জয়পুর বা মারাঠাকে এই রাজ্যে ঢুকতে হয়েছে তার ঠিকানাতেই প্রথম রক্তটীকা পরে। রাঠোরের প্রথম দেউড়ি হচ্ছে কুঁচামন।

সেখানকার কেল্লায় থরে থরে ছড়ানো আছে তাদের বংশ পরিচয়। রক্ত দিয়ে তা লেখা, জান দিয়ে তা কেনা। দুশমনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পাগড়ি, পোশাক আর পতাকা। হরেক রকমের হাতিয়ার।

আর তার পাশে আমার হাতিয়ার বলতে এক হাজির করতে পারি এই কলমখানা। এটি নিয়ে নাড়া-চাড়াই রাজস্থানে আমার পরিচয়। তবে বাঙালির কলমের উপর রাজপুতের শ্রদ্ধা আছে। সে কথাই মহারানি স্মরণ করেছেন তাঁর চিঠিতে। মাথা উঁচু হয়ে উঠল তা পড়ে। রাজপুতরা তাদের বীরত্বের বাহাদুরি দেখাত গোঁফে চাড়া দিয়ে। স্বীকার করছি গোপনে যে, এতদিন পরে গোঁফের অভাবটা অনুভব করলাম।

কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে এল বাংলা সাহিত্যের প্রতি এই সম্মানে। আমার মাটির মা। কিন্তু কলমে সোনা ঝরায়।

এমন সময় মালী ঘরে রেখে গেল এক গোছা গোলাপ। হ্যাঁ, মরুভূমিতে গোলাপ।

এগিয়ে এসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলাম। গোলাপের মিঠে গন্ধ মনকে আরও উতলা করে তুলল। মনে পড়ল আরেকটা মরু দেশের কথা। আরবের খলিফা অল-মুতাওক্কেল বলেছিলেন—আমি হচ্ছি সুলতানদের সেরা, আর গোলাপ হচ্ছে ফুল-বাগিচার রানি। অতএব আমরা দুজনে হচ্ছি দুজনার সবচেয়ে উপযুক্ত সাথী।

আজ আমিই বা ওই খলিফা বাদশার চেয়ে কম কিসে?

হ্যাঁ। আমার চেয়েও অবশ্য বড় বলা যায় ওই আরব দেশেরই এক তাঁতিকে। অল-মাসুম খলিফার সময় এক তাঁতি গোলাপের মরশুমে কাজ করাই ছেড়ে দিয়েছিল। ভোর থেকে সে শুরু করত শিরাজী আর গাইত, "ওরে গুলাবের সময় এল। এবার তুই যতদিন তার কুঁড়ি আছে আর ফুল আছে, শুধু শরাব পিয়ে যা।" যখন গোলাপের মরশুম ফুরিয়ে গেল, তখন কাজ আরম্ভ করবার আগে সে গাইত,—

"ওরে, খুদাতালা যদি আবার গুলাবের মরশুম আসাতক আমায় বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে আবার শরাব দিয়ে শুরু করব। কিন্তু তার আগেই যদি মরি, তাহলে বেচারা গুলাব আর শরাবের জন্য দু'ফোঁটা চোখের

জল রেখে যাচ্ছি।"

তবে খলিফাও কম খলিফা লোক ছিলেন না। গোলাপের সমঝদারিতে একটা জোলা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে? আচ্ছা, আমিও জানি গুণীকে কী করে কদর করতে হয়। ওকে গোলাপের মরশুমে দিলদরিয়া হয়ে ফুর্তি করবার জন্য বছরে দশহাজার দিরহম পেনসনের পরোয়ানা দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মহারানির নেমন্তন্ন। তাতে আসছেন আরও গুটি কয় মহারানি। এদিকে এসে হাজির হয়েছে এক গোছা গোলাপ। মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে সারা আরবীয়া। নাঃ! এ আমার কলমে পোষাবে না। শরণ নিলাম তাই কবি আমীর খুসরোর।

"মাতাল খুসরো ঢেলেছে কবিতা-দেবীর পেয়ালা মাঝে,
মধুর সুরারে. শিরাজীরে যাহা হার মানায়েছে লাজে।"

(ন্যু সিফির)

বহু গুণীজনের সকাল শুরু হতে দেখেছি বিয়ার দিয়ে। এ অধম আবার ও রসে বঞ্চিত। নেহাত কাব্য রসেই মাঝে মাঝে শুকনো গলা আর মরুভূমির মতো মন একটু আধটু ভিজিয়ে নিতে হয়।

তবু যদি আমার সপক্ষে উকিল দিতে হয়, তবে এই পেশ করছি হাফিজকে।

জহিদ শরাব-ই-কৌসর ও হাফিজ পিয়ালা খাস্‌ৎ।
তা দরমিয়ানাহ খাস্‌তা কির্‌দ্‌গার্‌ চীস্‌ৎ।

অর্থাৎ

ফকির চাহিল স্বরগের সুধা, হাফিজ পেয়ালা মাগে।
এখনও জানি না আল্লা কাহারে ঠাঁই দেন আগে ভাগে।

খুশি হয়ে কবিতার পর কবিতা মনে করতে করতে এক জায়গায় এসে বাস্তবের ছোঁয়া পেলাম। যেন মেঘনার অথৈ জলে পাড়ি দিতে দিতে বৈঠাখানা মাড়োয়ারের বালির চড়ায় এসে ঠেকে গেল। ভাবছিলাম—

হৃদয় আমার ময়ূরের মত
নাচেরে।

নাচছে যে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু পেখম মেলবে কেমন করে? মেলে ধরবার মতো কোনও পেখমই যে নেই সঙ্গে।

লাঞ্চ পার্টি। ডিনার জ্যাকেট যদি সঙ্গে থাকত তাতে চলত না। নয়া জমানার চুড়িদার আব শেরোয়ানীতে গলাখানা এখনও বাঁধা দিইনি। দেবার সদিচ্ছাও দেখা যাচ্ছে না। অচিরাৎ হবে বলে মনে হয় না। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাজা সাহেব আর তস্য ভ্রাতা ঠাকুর সাহেবের মূর্তি। ওরা নিশ্চয়ই প্রিন্স-কোট অর্থাৎ গলাবন্ধ কোট আর যোধপুরী পরে মহারানির সামনে মাথা হেলিয়ে কুর্নিশ করবেন। মাথায় রঙিন পাগড়ি ওই বীর বপুগুলিকে আরও রঙদার করে তুলবে। ছা-পোষা বাঙালি আমরা ওই প্রিন্স-কোটকেই সাদামাঠা ভাষায় গুজরাটি কোট বলে থাকি। এ অধমেরও অমন একখানা কোট আর পাতলুন সুটকেসের তলায় লুকোনো আছে বটে। কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে, মাথা আমাদের এমনিতেই না কি গরম। সে জন্যেই না কি বাঙালিরা মাথায় কিছু পরে না। পাশাপাশি একই রকম পোশাকে দু'রকম ছবি মনের-আয়নায় ভেসে উঠল। অমনি গলাবন্ধ কোট হল বাতিল।

তবে?

চিঠিখানা আবার ভালো করে পড়লাম। না, পোশাক সম্বন্ধে কোনও হদিসই দেওয়া নেই চিঠিতে। তবে শেষ পর্যন্ত একটা ইংরেজি ঢঙের লাউঞ্জ স্যুটই ভরসা হবে না কি?

হঠাৎ চিঠিখানাই কিনারা বাতলে দিল। নেমন্তন্নে যখন বাঙালি সাহিত্যিকের কথা লেখা আছে, তখন আসল বাঙালি পোশাকই মহারানি প্রত্যাশা করবেন। এ তো নয়াদিল্লির চাকুরিজীবী নয়। এ যে বাংলা দেশের সাহিত্যিক, রবিঠাকুরের দেশের লোক।

গুরুদেব, তুমি বাংলার বাইরে পৃথিবীর মাঝখানে আমাদের কত যে বড় করে গেছ, তা আমরা নিজেরাও এখনও ভালো করে জানি না।

তার পরের চিন্তা হল—পর্দা নিয়ে। মহারানি কি পর্দানশীন? না, সামনে আসবেন? সহজ ভাবে কথা কইতে পাব? থালায় দু-খানা পুরী নিজের হাতে তুলে দেবেন কী? এদিকে আমি পরম খুশিতে দশ দশটা

আঙুলে ওরিয়েন্টাল ডান্সের শঙ্খ মুদ্রা করে ফেলব? 'আর দেবেন না', 'আর দেবেন না' গোছের ভাব দেখাব একখানা। ও-দিকে হয়তো অন্য অতিথিরা তার মধ্যে একটা সাহিত্যসুলভ 'পোজ ডিস্‌কভার' করে পুলকিত হবেন।

পর্দার আবার নানারকম মাত্রা আছে। এই যেমন উদয়পুরের মহারানির পর্দা। সেখানে পুরুষের প্রবেশ একেবারে নিষেধ। এমন কী, মহারানির নিজের ভাই ও বোনেরা দেখা পান শুধু মহারানার হুকুম আছে বলে। তা-ও এই একজন পুরুষের বেলাই শুধু। কাজেই আমার মহারানির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাই উঠে না। গেলেন একা শ্রীমতী। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ফিরে এলেন মহারানী বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্ব দেখে। সত্যি সত্যিই মহারানার সহধর্মিণী। রাজ্যপাট দরকার হলে একাই চালাতে পারতেন। যা কিছু ঘটে, কেন ঘটে? আর না ঘটলে কি হবে? সব কিছু সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল। তাঁর চোখে যে দীপ্তি খেলে তা শুধু হীরে জহরতের নয়, বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধির। তবুও তিনি পর্দা!

এদিকে যে সন্ধ্যায় শ্রীমতী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সে রাতে তিনি তাঁর শুটিং বক্স থেকে এক গুলিতেই একটা বাঘকে মেরেছিলেন। এ হেন নারীর চোখকে কি আর সামান্য পর্দা ঢেকে রাখতে পারে?

মনে পড়ল মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কথা। একবার জাহাঙ্গির শপথ করেছিলেন যে আর শিকার করবেন না। এদিকে একটা বাঘের উৎপাতে সবাই তটস্থ হয়ে উঠেছিল। সব চেয়ে বড় বাহাদুর আমীর ওমরাহরাও বাঘটাকে মারতে পারলেন না। তখন রানি বেগম একটা রাতের চেষ্টায় এক গুলিতেই বাঘকে করেন খতম।

আবার হাফ-পর্দাও আছে। অরেকটা স্টেটের রাজমাতার গল্প। নাতনীর জন্ম-উৎসবে মহাধুমধাম হয়েছিল, আর হাফ-পর্দার কল্যাণে তিনি নাকি তাঁর সব কিছু আচারেই হাজির ছিলেন। কেমন ধারা প্রথা জানি না। তবে আর একটা উৎসবে তার নমুনা দেখলাম স্বচক্ষে। একটা বড় বৈঠক বসেছে প্রাসাদে আর বাজনা বাজছে ভারি মিঠে। রাজমাতার কাছে এসে শোনার সাধ হল। একটা পর্দার আড়াল তৈরি করা হল। তার পেছনে তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে ঠাঁই নিলেন। কিন্তু বাজনা বাজ্‌ছে ভারি মিঠে। আরও কাছে না এলে চলে না। নিজেই উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেন আরও একটা পর্দা আছে বাজনাদারদের কাছে। দুটোর মাঝখানে তৈরি করা হল গোটা দুই চেয়ারের আড়াল। পাঁচজনের চোখের সামনে দিয়েই দে ছুট কাছের পর্দাটার পেছনে। দৌড়োদৌড়ি করে কার্পেটে বসে পড়তে না পড়তেই ক্ষিদে পেয়ে গেল। ঝক্‌ঝকে রুপোর থালার মিঠাইগুলো নিঃশেষ হওয়ার পর, থালাতে ঘোমটার ভেতরে থেকে রাজমাতার তৃপ্তির ছায়া কেমন ফুটে উঠেছিল, সে খবরটা অবশ্য আমাদের অজানাই রয়ে গেছে।

নলচের আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া একেই বোধহয় বলে।

আহা! টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি। আর পর্দার চেয়ে হাফ-পর্দা। কেমন একটা আলো-আঁধারি ভাব। শোনা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। দেখা যায় তো ছোঁয়া যায় না। যা যায়, তবু সব যায় না। সংসারের সবসে সেরা রোম্যান্স।

বিশ্বাস না হয় চলে এস আমার সঙ্গে শাজাহানের দিল্লিতে। বেগম সাহেবা অর্থাৎ জাহানারা তাঁর প্রাসাদ থেকে রওনা হয়েছেন দরবারে যাবার জন্য। অন্ত নেই জাঁক-জমকের; সোয়ার , সেপাই আর খোজাদের ঠমকের। খোজারাই বেগম সাহেবার সবচেয়ে কাছে থাকার কপাল নিয়ে জন্মেছে। তারা যে হাফপুরুষ! সামনের, ডাইনে-বাঁয়ের সবাইকে হঠিয়ে দিচ্ছে চেঁচিয়ে, ধাক্কা দিয়ে। দরকার হলে পিটিয়ে পর্যন্ত। তা সে যত মানী-গুণী লোকই হোক না কেন। পিছনে ছোটি-বেগমদের বয়ে নিয়ে চলেছে ঘেরাটোপ ডুলি। সামনে ছিটোচ্ছে গোলাপ-জলের ধারা। যাতে ধুলো উড়ে তাঞ্জাম পর্যন্ত না পৌঁছোয়। তাঞ্জাম মিহি সোনার ঝালর দিয়ে ঘেরা। তার উপর বসানো সোনার মিনা করা কাজ, এমন কী দামী জহরত। সোনার পাতে মোড়া হাত-পাখা, ময়ূরের পালকের। হাতি চলছে দুলকী চালে, ঠমকে গমকে। কিন্তু তাতারিনীদের হাতে ময়ূর পঙ্খ দুলছে আরও বিলম্বিত তালে। আকাশের চাঁদ দীন-দুনিয়ার মালিকের ঝিয়ারী তুলো-ধোনা মেঘের আড়াল থেকে দুনিয়াটা এই একটুখানি দেখে নিতে চান।

অমনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আমাদের মধ্যযুগের নাইট। শ'-দুই পা দূরে দাঁড়িয়ে হাত দুটি রাখল বুকের উপর, যতক্ষণ না বেগম-সাহেবা একেবারে সামনে পৌঁছচ্ছেন। তারপর করবে লম্বা এক কুর্নিশ প্রায় ভুঁয়ে ছুঁয়ে।

রাজকন্যা কী কিছুই নজর করেন নি? না। সবই তিনি দেখেছেন, নিজেকেও দেখিয়েছেন। যদি মেহেরবানি হয় তো দেবেন পাঠিয়ে জহরতের কাজ করা সোনার ব্রোকেডের বটুয়া। তাতে আছে পান আর তাম্বুল।

রৌশনারাও কম যেতেন না। জাঁকজমকে তিনি বড় বোনকে ছাড়িয়েই গিয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হাতির উপরে চড়ানো তাঞ্জামটার নাম ছিল পীতাম্বর। সোনা দিয়ে মোড়া ছিল তার আসন, আর চাঁদোয়াটা ছিল যেন একটা সিংহাসনের উপরে সাজান। দেড়শ জন রঙ-চঙে রসিকা তাতারিনি চলত তার পাশে পাশে। পিছনে চলত কত পালকি, তার লেখা জোকা নেই। কিন্তু সবারই ঢাকনা হচ্ছে শুধু ফিনফিনে জরির ঝালর। উড়ু উড়ু করে তারা। আর দুরু দুরু করে আরোহিণীর বুক।

এ হেন পর্দার আড়ালে যিনি আছেন, তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছি আর কী পাইনি, তার হিসাব কষে দেখতে যাবে পৃথিবীতে কোন্ আহাম্মক? কোন্ বেরসিক? কবি ঠিকই গেয়েছেন : —

নয়নে নয়নে যদি, হৃদয়ে হৃদয়ে
বালির বাঁধ রোধে কি হে
অসীম সলিলে?

পর্দা আর হাফ-পর্দার মধ্যেকার মিহি ওড়নার আলোটুকু মনে মনে নাড়াচাড়া করছি। মনে পড়ল আগের দিনের যোধপুরের ঢাই পাহাড়ি কেল্লাটার উপর থেকে দেখা রানি পাড়া। অবশ্য চমকে উঠেছিলাম রানি পাড়া নামটা শুনে। আমরা বাংলা দেশের গাঁয়ে ভুঁয়ে এমন কি শহরেও বামুন পাড়া, ধোবি পাড়া এ সব অঞ্চলের কথা শুনে এসেছি। কিন্তু তা বলে রানি পাড়া!

হ্যাঁ! ঠিক তাই। একজন মহারাজ হয় তো সাতাশজন রানি, আর সাতান্নজন উপ-রানি, থুড়ি, হাফ-রানি, আর তিনশো তেষট্টিজন নেক-নজরানি রেখে রাজপাটের মায়া কাটিয়ে ফেললেন। তা বলে তারপর যিনি গদিতে বসছেন বা দখল করছেন তিনি কেন এতজনের মোটা মাসোহারা গুনতে যাবেন? তাদের রাজবাড়িতে বা তার আনাচে-কানাচে ঠাঁই দিতে যাবেন? নয়া মহারানি, হাফরানি প্রভৃতিদের দাবিই তো তখন সকলের আগে। কাজেই চাঁদ অস্ত গেলে তার রোহিণী ভরণীদের আস্তানা হয় যেখানে, তার নাম হচ্ছে রানি পাড়া।

আজকের দিনে শ্রেণীহীন সমাজ অর্থাৎ ক্লাশলেস সোসাইটি গড়বার জন্য অনেকে আদা জল খেয়ে লেগেছেন। তাঁদের চুপি-চুপি জানিয়ে রাখি যে, এই নিভন্ত বাতির মিছিলেও এই শ্রেণী বিভাগের অবিচারটা কায়েম হয়ে বসে আছে।

একটা স্টেটে দেখলাম যে সেখানকার বাই-সাহেবার বিগত মহারাজার সঙ্গে ঠিক যে কতটুকু বিয়ে হয়েছিল তা কেউ জানে না। পাত্র মিত্রদের একটু আড়ালে-আবডালে শুধোতেই তারা ফিস-ফিস করে শুধু জানালেন যে, রাজরাজড়াদের হিন্দু বিয়েতে মাত্রা ভেদ আছে। ঠিক হোমিওপ্যাথি ওষুধের ডাইলিউশন ভেদের মতো আর কি।

একটু পরেই সে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি একলাটি পেয়ে ব্যাপারটা আরও একটু খোলসা করে দিলেন। শুধু রানি কেন, রক্ষিতাদের মধ্যে রকমভেদ আছে, রুপো রানি, সোনা রানি এমন কি হীরে রানির মতো সোনা ভাই হীরে ভাই আরও সব কত কি।

এ হেন শ্রেণী বিভাগে ভরা আবহাওয়ার মাঝখানে দিদাজী ভাই ছিলেন তাঁর স্বামী রাজপাটে একেবারে একেশ্বরী। ছিল না আকাশে কোনও অশ্বিনী ভরণী, কৃত্তিকা রোহিণীর আনাগোনা, কোনও হঠাৎ ঘটে যাওয়া চন্দ্রগ্রহণ। মহারাজা উম্মেদ সিংয়ের সুখে দুঃখে সমভাগিনী। সঙ্গিনী উৎসবে ব্যসনে চৈব।

একবার বর্ষাকালে হঠাৎ পাহাড়ি মরু নদীতে বান ডাকল; বড় সাধে গড়ে তোলা ছবির মতো যোধপুর শহর ভেসে যায় যায়। গহীন রাতে বাঁধ দেবার চেষ্টায় বেরিয়ে এসেছেন মহারাজা নিজে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কর্মীদের উৎসাহ দিচ্ছেন নিজে দিদাজী বাই। তখন তিনি নিজেই মহারানি। কিন্তু নেই তাঁর ঘোমটার আবরণ, পর্দার আব্রুর কোন চিন্তা। সত্যিকারের রাজপুতানী রাজসী।

তাঁর অতীত জীবনের মহারানিত্বের কাহিনিতে উৎসাহ দেখাচ্ছি দেখে দিদাজী বাইয়ের চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বলে চললেন একটির পর একটি অতীতের কাহিনি। যে স্বামী আজ নেই, যে রাজপাটও আজ নেই, তাদের কাহিনি। অতীতের এই রোমন্থনে ছিল না কোনও ব্যথা, কোনও অভিযোগ। যারা সত্যিসত্যিই

নিজেদের জন্য শাসন করতেন, তাঁদের যে কতখানি ছিল তার আর কতখানি গেছে তা মনে করে এই বীর নারীকে মনে মনে করলাম একটি নমস্কার।

সামনে খাঁটি রাজপুত ধড়া-চূড়া পরে দাঁড়িয়ে আছে বাটলার। হাতে তার তরমুজের রস। মহারাজকুমার অর্থাৎ মাত্র বছর কয়েক হল যে যুবক মহারাজা এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, তাঁর ছোট ভাই—অনুরোধ করছেন একটু তরমুজের রস খেতে। পরনে তাঁর যোধপুরী ব্রিচেস আর কোমরে বাঁধা একটা রাজপুত ছোরা আর বিরাট এক পিস্তল। পিস্তল আর ছোরা দুই-ই মহারাজার নিজের অস্ত্রশালায় তৈরি। কিন্তু আমি যে ছোরাটির দিকে তাকিয়ে আছি, তা সে কারণে নয়। এই তরমুজ আর এই ছোরা আর সোফার পাশে বসে রাঠোর মহারানি। বছরের পর বছরের পর্দাগুলি সরে যেতে লাগল।

শাজাহানের রাজত্বের শেষ কাল। চার ছেলেতে চলছে তুমুল লড়াই। যুবরাজ দারার পক্ষে লড়েছিলেন যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। নর্মদা তীরে হেরে ফিরে এসেছিলেন যোধপুরে। কিন্তু কেল্লার ফটক বন্ধ করে রাখলেন মহারানি মহামায়া। তাঁর চোখে স্বামী মারা গেছেন। রাজপুতানীর স্বামী যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে ঢাল বয়ে! না হলে ঢাল তাকে অর্থাৎ তার মৃতদেহকে বইবে। রাজপুতানী হয়ে মহারানা কী করবেন এ অবস্থায়?

এ হেন অবস্থা সম্বন্ধে চারণ কবিতায় আছে : —

খগ তো অরিয়াং খোসলী, পিউঘর আয়া ভাজ।
জিন খুঁটি খগ ঠাং তা, উন পর ঠাংকো লাজ॥

দুশমন তোমার তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছে, আর হেরে গিয়ে প্রিয় ঘরে পালিয়ে এসেছে। যে কুঁটিতে তলোয়ার টাঙিয়ে রাখত, সেখানে এখন নিজের লজ্জা টাঙিয়ে রাখতে হবে।

বীরনারী এখানেই ক্ষমা দেন নি।

পিউ কায়র হোতা মহল, হুঁ হোতী সিরদার।
হুঁ মরতী থে নংহ বলত, দুখ তো লায়ো লার॥

যদি আমার কাপুরুষ স্বামী স্ত্রী হত, আর আমি হতাম সর্দার, তা হলে নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিতাম। তার পর আমার মৃত্যুতে সে যদি সতী না-ও হত তাতে এমন আর বেশি কী আফসোস হত?

মহামায়া তাঁর স্বামী মারা গেছেন এই ধরে নিয়ে চিতা সাজাতে হুকুম দিয়েছিলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, আবার বীরের মতো যুদ্ধ করতে যাবেন বলে প্রতিজ্ঞা করে যশোবন্ত সিং সে যাত্রায় স্ত্রীকে সামলে নিলেন। কিন্তু হায়, ভাঙা কাঁচ আর ভাঙা হৃদয় তো জোড়া লাগে না।

একদিন মহারাজা ভোজনে বসেছেন : পাশে হাত-পাখা নাড়ছেন স্বয়ং মহারানি। দাসী এনে দিল এক টুকরো তরমুজ আর তা কাটবার জন্য একটা ছুরি। ছুরির মতো ধারালো ঠাট্টা করে উঠলেন মহারানি। সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও ছুরিটা তাড়াতাড়ি; মহারাজা আবার ছুরি-ছোরা দেখে মুচ্ছো যেতে পারেন।

ডাইনিং রুমে এসে বসলাম আমরা। এটা নীচের তলায় ব্যাংকোয়েট রুমের মতো বড় নয়। এখানে জাঁকজমক আর আদবকায়দার ভিড়ে দিশেহারা হয়ে হারিয়ে যেতে হবে না। তবুও এত ভালো আর দামী আসবাবে সাজানো ঘরে বসে খেলে আটপৌরে বাঙালি জীবনে এ খাওয়া হজম হবে কি না কে জানে। কিন্তু মহারানি টেবিলের 'হেড'-এ অর্থাৎ মাথায় বসে আমায় বসিয়েছেন নিজের ডান হাতে। খুব সহজ সরলভাবে আপনার জনের মতো করে নিচ্ছেন। ওঁদের নিজেদের একজন হয়ে গেলাম।

ওঁদের নিজেদের খাবার জিনিসগুলিই খেতে অনুরোধ করলেন বার বার। গত ক'দিন রোজ রাজপুত ভোজ খেয়েছি একটানা। কুচামনের হলদে মার্বেল পাথরে গড়া প্রাসাদে দোতলায় খুব আদর আপ্যায়ন করে রেখেছিলেন ওঁরা আমায়। আমাকে দেওয়া ঘরগুলির ঠিক পাশেই ওঁদের গোল কামরা। সেটি পেরিয়ে ওপারের মহলে ঢুকলেই সামনে সাক্ষাৎ হয়ে যেতে পারে রাজপুত মহিলাদের। কিন্তু সূর্য্যিমামা যদি তাদের মুখ দেখতে মোকা না পান, এ দীন আর কেন করবে সে চেষ্টা?

সেই মধ্যযুগের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে চক্কর মারতে মারতে নিচে নেমে এসে যখন খাবার ঘরে বসতাম তখন মনে হত যে, টেবিল-চেয়ারগুলি যেন সেখানে তেমন মানায় না। মানায় শুধু রাঠোর ধাঁচের পাগড়িপরা খানসামার পরিবেশন করা রাজপুত খানা। প্রাণপণে সেই ঘি মশলা আর মাংসের জাফরানি দরিয়ায় পাড়ি

দিয়ে যেতাম রোজ। বাঙালি পেট বলে ত্রাহি ত্রাহি। বাঙালি বুকের পাটা বলে—কভি নেহি। হার মানব—সে কভি নেহি। খেয়ে যাব রোজ, সেই গুরুভার রাজপুত খাবার। করি না তোয়াক্কা হজমের। বীরের দেশে এসে আর কিছু না পারি, নিদেন পক্ষে বীরের মতো খাব।

না খেয়ে উপায় কী? লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু আহমেদ আলি আজ করাচীতে। পাকিস্তান সরকারের একটা কেউকেটা ব্যক্তি ছিলেন। বড় দুঃখেই গোপনে বলেছিলেন একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনি। অমন মরমে-মরা কাহিনি তো সহজে ভুলে যেতে পারি না; বন্ধু আমার গিয়েছিলেন ফ্রান্টিয়ারে, তাঁর কলেজের এক শিনোয়ারী সহপাঠীর অতিথি হয়ে। কিন্তু যেদিন ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে গিয়ে পৌঁছোলেন, সেদিন ভোরেই তাঁর বন্ধু কাজে ঠেকে চলে গেল দূর একটা গ্রামে। ঘরে বেগমকে বলে গেল, যেন দোস্তকে খুব ভালো করে খাওয়ানো হয়। পর্দার আড়াল থেকে শ্রীমতী ইয়া গোটা দুম্বা থেকে আরম্ভ করে যা পর্বতপ্রমাণ খানা পাঠাতে আরম্ভ করলেন, তার প্রতি সুবিচার করা একটা কেন সাতটা আহমেদ আলির সাধ্যে কুলোয় না। পর্দার আড়াল থেকে এল বহু অনুনয়, শেষ পর্যন্ত আফসোস যে, বেগমসাহেবার পাঠানো খানা লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেবের মোটেই মর্জিমাফিক হচ্ছে না। তা না হলে সর্ব দেবময় যিনি অতিথি, আবার তার উপর স্বামীর বন্ধু, তিনি কিনা কিছুই খেতে পারছেন না। বেগমসাহেবা পর্দার ওপার থেকে আফসোসে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি অতিথির সামনে বেরিয়ে এলেন। নিজে সামনে থেকে অতিথি সৎকার করতে শুরু করলেন। আর আহমেদ আলি প্রাণভয়ে লুকিয়ে খেতে লাগলেন কাবুলী হজমী গুলি।

ইতিমধ্যে কর্তা গ্রাম থেকে ফিরে এসে মহাখাপ্পা। তাজ্জব ব্যাপার। বৌ এই দুদিনেই বনে গেছে বেহায়া, বে-আব্রু। পাঠানের শাস্ত্র আর সমাজ দুই-ই যে যায় জাহান্নমে।

পর্দার ওপার থেকে স্বামী-স্ত্রীর তকরার ভেসে আসতে লাগল কানে। আহমেদ আলি তো লজ্জায় দুঃখে মরমে মরে যেতে লাগলেন। তবু মরার উপর খাঁড়ার ঘা যে কী, তা তখনও বেচারা জানতেন না।

বন্ধুপত্নী চেঁচিয়ে মহল্লা মাত করে গজরাচ্ছেন। এই চিড়িয়া, তোমার ওই হিন্দুস্তানী দোস্ত, ও আবার পুরুষ হল কবে থেকে? একটু বুলবুলি যা খেতে পারে, তাও যে সামাল দিতে পারে না, তার সামনে বের হলেই কি বে-পর্দা হতে পারে কোনও আওরত?

গোঁফ ছিল না আহমেদ আলির। সরু কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে বললেন—আল্লাকে ধন্যবাদ, মাঝে মাঝে আমি কানে কম শুনি।

কুচামন আর তার বন্ধুদের সঙ্গে রোজ খেতে বসি আর আহমেদ আলির কথা মনে করি। প্রাণটা আইঢাই করে। নিদেনপক্ষে একটুখানি বিলিতি জোলো সুপ আর লড়াইয়ের সময় থেকে চালু করা তিন কোর্স ডিনার একদিন পেলে তবু তো ভেতো পেটটা একটু জিরোবার ফুরসত পায়।

এমন সময় একদিন হাজির হলেন মাস্টার সাহেব। রাজপুত স্কুলের হেডমাস্টার। বুড়ো হাড়, কিন্তু কচি মন। তার স্কুলে কেতাবি বিদ্যার সঙ্গে কেমন করে ভালো সৈনিক আর সামরিক অফিসার হওয়া যায়, তা শেখানো হয়। শুধু পড়ুয়া হলে তো আর জান দেওয়া-নেওয়ার কারবারে পাকা হওয়া যায় না।

এ হেন মাস্টার সাহেব আমায় বিরাট এক টুকরো মাংস আর পেস্তার পোলাওয়ের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। বাটলারকে পারলে দুঘা কষিয়েই দেন আর কী। তাঁর সামরিক স্কুলের সব বিদ্যাটাই কী নেহাত মাঠে মারা যাবে? ব্যাটা এত ফাঁকিবাজ যে রাজা সাহেবের অতিথিকে শুধু দেশী খানা খাওয়াচ্ছে। কেন? আজ একটু "পুলে পোলোনেজ" (পোলিশ কায়দায় রান্না মুরগি) নিজে বানিয়ে আনলে রাজা সাহেব তো খুশি হতেনই, তাঁর বিদেশী অতিথিরও মুখ বদল হত।

যে 'ব্যাটা' বাটলার শুধু বিলিতি বা কন্টিনেন্টাল কায়দায় মুরগি বানাতে জানে তাই নয়, তার পোশাকী ফরাসী নামও জানে, সে কি উত্তর দেয় তা শুনবার জন্য কান খাড়া রাখলাম। পাগড়ির হিমালয়খানা শুধু পুরোপুরি নুইয়ে তেন সিং ফিস ফিস করে জবাব দিল। রানিসাহেবা তাঁর অতিথির জন্য নিজে হাতে রোজ খানা রাঁধছেন; রোজ চার বেলা। কর্তার বাটলার বা সদরের বাতলানো মেনু দিয়ে বিদেশী অতিথির অসম্মান করা চলবে না।

সে কথা মনে পড়ল। দু পাশ দিয়ে বাটলারের দল থালি আর ডিস হাতে নিঃশব্দে আনাগোনা করছে। কারও হাতে দেশী খানা, কারও হাতে বিলেতি। কিন্তু বিলেতিগুলো চালান যাচ্ছে টেবিলের ওধারে। কুচামন

আর অন্যান্য পাত্রমিত্ররা সেদিকটা জাঁকিয়ে বসেছেন। এমন কী আমার ডান পাশে যে মহারানি অব—সারা ঘরটা আলো করে বসে আছেন, তিনিও ফরাসী আরদোভর (জলপাই, বীট, বিন, পীজ প্রভৃতি সুস্বাদু, সবজি, ককটেল, সসেজ, সার্ডিন, মাছ , ডিম সিদ্ধের টুকরো, আঞ্চোভি, হরেক রকমের ড্রেসিং-এ সব পাঁচমিশেলী দিয়ে তৈরি কন্টিনেন্টাল খানাবাহিনী অগ্রদূত) দিয়ে শুরু করেছেন। কিন্তু খাস স্বদেশী মাড়োয়ারী খানায় মশগুল হয়ে আছেন শুধু দিদাজী বাই নিজে। আর তিনি খুব যত্ন আত্যি করে সেই ভূরি ভূরি মাড়োয়ারি ভোজ নিজে হাতে পরিবেশন করে দিচ্ছেন আমার পাতে।

হায়! কোনও মহারাজা কি ইহজগতে কখনও এত সুখ পেয়েছেন খেতে বসে?

অবাক হবার মতো প্রশ্নই বটে। এত মালদার চব্যচোষ্য যাকে বলে সবই হাজির; তবু খেয়ে সুখ নেই! কিন্তু কেমন করে পাবেন তাঁরা নিশ্চিন্ত মন?

তাঁদের প্রত্যেক খানাই পরিবেশনের আগে এক জনকে চেখে দেখতে হয়। কি জানি যদি বিষ মেশান থাকে। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাজাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে ফেলার প্রথা খুব চালু ছিল। এশিয়াতে, এমন কী প্রাচীন গ্রীস রোমেও কৌটিল্য শাস্ত্রের এই নীতি সর্বদাই রাজা হলেও হতে পারি ওস্তাদরা গদীয়ান রাজাদের মনে করিয়ে দিতেন। সেজন্য সব দেশেই এক জন বা তার চেয়ে বেশি চাখনদার থাকত বাঁধা মাইনেতে। উদয়পুরে রাজ রান্নার ডিপার্টমেন্টে একটা লোহার ক্রশ মার্কা শিকলী দুটো থামের উপর দিয়ে ঝুলছে। সেটা জয়পুরের সোয়াই রাজা জয়সিংহ আড়াইশো বছর আগে মহারানাকে উপহার দিয়েছিলেন। রাঁধুনিশালায় খাবারে বিষ মেশান হচ্ছে কি না তা নাকি এই যন্ত্রে জ্যোতিষ বিদ্যায় ধরা যেত। তাতে নাকি নানা রকম তুক-তাক মন্ত্রও পড়া ছিল। এ যন্ত্রটা এখন আর কেজো অবস্থায় নেই। কিন্তু থাকলেও চাখনদারের চাকরিটা মারা যেত না।

দুই বিরাট খানার চুপড়ি বাঁকের দুধারে চাপিয়ে চলেছে রান্নাঘরের ভাঁড়ী। চুপড়ি দুটি ক্যাম্বিশে ঢাকা, দড়িতে বাঁধা আর শীলমোহর করা। পিছনে পিছনে চলেছে দরবারের চাখনদার। তা মহারানার অন্ন চেখে দেখার কাজটা ওর পক্ষে খুব জুতসই হয়েছে সন্দেহ নেই। কেমন হাসিখুশি, দিলদরিয়া। কেমন ভুঁড়িখানা উপচে উঠেছে। যেন সাগর বেলায় ঢেউ।

কিন্তু চাখনদারের কাজ অত নিশ্চিন্ত আরামের নয়। সম্রাট বাবরের খানায় একবার বিষ মেশানো হয়েছিল। তাঁর শত্রু ইব্রাহিমের মায়ের কারসাজি। বাবর তাঁব আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ''চাখনদারকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবার হুকুম দিলাম আর বাবুর্চিব গায়ের চামড়া জীবন্ত তুলে ফেলতে। একজন মেয়ে লোককে হাতির পায়ের তলায় ফেলে আর একজনকে কামানেব সামনে শেষ করে দিতে হুকুম দিলাম।''

কিন্তু আজ মহারাজারা হারিয়েছেন তাঁদের মুকুট। আব সঙ্গে সঙ্গে তাব হাজাব ঝামেলা দুশ্চিন্তা। ইংরেজিতে কথাই আছে, ''আন্ইজি লাইজ দি হেড দ্যাট উয়ারস দি ক্রাউন।''

'বাটিয়া' অর্থাৎ বাজরাব মোটা ঘি-চপচপে চাপাটি আর 'সইতা' অর্থাৎ মাংস আর বাজরার খিচুরির কোর্সটা শেষ করে কোমরের বাঁধনটা কী করে কৌশলে একটু ঢিলে করা যায় তা ভাবছি, এমন সময় এল রসোমালাই। কলকাতাই সাইজ নয়। একেবারে পর্বত প্রমাণ। অন্তত দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে কাজে লাগার মতো দশাসই।

মহারানি খুব খুশি মনে অন্তত একটু চ.খতে অনুরোধ করলেন। বললেন যে, যদিও কলকাতায় এ মিষ্টির জন্ম, এর ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ উন্নয়ন হয়েছে মাড়োয়ারে। নিজের মুলুকের জিনিস পছন্দ করব বলে তিনি এটা বিশেষভাবে আজ বানাতে বলেছিলেন।

চার দিকে মিষ্টি রসালাপ আর গয়না-পোশাকের জৌলুষ। হীরেমানিক দেখি, না রূপের ছবি দেখি৷ একবার কেন জানি না উপরে প্রকাণ্ড বেলজিয়ান কাটগ্লাসের ঝাড় লণ্ঠনগুলির দিকে তাকালাম। আজকের দিনের নিজের মুখের জায়গায় সেখানে ভেসে উঠেছে আমার কিশোর মুখের ছায়া।

সে কিশোর তখন লন্ডনে। সামান্য স্কলারশিপের টাকার ভরসায় ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। থাকে মামুলি এক বোর্ডিং হাউসে। সঙ্গী আছে আরও দুজন। একদিন সন্ধ্যাবেলা কলেজ থেকে ফিরে দেখে, এক জন চাটগাঁয়ের লোক একটি সুন্দর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে নিয়ে তার ঘরে বসে আছে। উদ্দেশ্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা। খাস চাটগেঁয়ে টান দিয়ে সে ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলে গেল, সে কেমন করে লস্কর হয়ে এদেশে এসে বিয়ে-থা করে সংসার পাতে। এখন আর পেট না চললেও মা ষষ্ঠীর কৃপা ঠিকই চলছে। অতএব...

বন্ধুদের মায়া পড়ে গেল লোকটার ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটির উপর। বেচারির তো কোনও দোষই নেই। অথচ তার শুকনো মুখখানা ভারতীয় অক্ষমতার ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। স্বদেশপ্রেমে মরিয়া হয়ে তিন জনেই তখনকার মতো যথাসাধ্য বেশ কিছু দিয়ে সাহায্য করল। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সের জন্য তখন অনেক স্বদেশীয় মহারথী লন্ডন জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে গুটি কয়েক জোরাল আবেদনও লিখে দিল তারা।

পরের সপ্তাহে আবার চাটগাঁ এসে হাজির, বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে। না, আর কোথাও সাহায্য মিলছে না। আর পরের সপ্তাহে আবার। তারও পরের সপ্তাহে। শেষ পর্যন্ত তিন বন্ধুতে ঠিক করল যে, ভিক্ষা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। চাটগাঁকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। অনেক খুঁজে শুধিয়ে জানা গেল যে, ঠেলা গাড়ি করে ফল বিক্রিই সবচেয়ে কম পুঁজিতে স্বাধীন ব্যবসার উপায়। কিন্তু কোথায় পুঁজি?

শেষ পর্যন্ত তিন বন্ধুতে মিলে নিজেদের মাসোহারার প্রায় সব টাকাটা একসঙ্গে করে চাটগাঁর হাতে তুলে দিল। নিজেদের পকেট অবশ্য হয়ে গেল গড়ের মাঠ, কিন্তু একজন স্বদেশবাসী তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তিন তিনটে কচি শুকনো মুখে রুটির বন্দোবস্ত হবে।

তার পর থেকে শুরু হল তিন বন্ধুর অনশন অর্ধাশনের তপস্যা। পরের মাসের প্রথম দিকে দেশ থেকে নতুন মাসের খরচের টাকা আসবে। সে পর্যন্ত তো চালিয়ে নিতেই হবে। বিলেতে আবার ধারে কারবার নেই। আর ধার যদি নেওয়াই হয় তাহলে আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগটা হল কোথায়? তাই সম্বল হল, শুধু শুকনো টোস্টের উপর সাজানো সস্তা সার্ডিন মাছ গুটি কয়। তাইতে ক্ষিধে যেটুকু মেটে। ও বয়সে আবার ছাই ক্ষিদেটাও হয় রাক্ষুসে। আর্দশের মুখ চেয়ে দিন কাটে কোনও মতে।

একদিন ভরসাঁঝে ওরা ফিরছে কলেজ থেকে। বাসের পয়সা বাঁচিয়ে শর্টকাট করছে। একটা তাড়িখানা থেকে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে টলতে টলতে বের হচ্ছে চাটগাঁ! কোথায় কভেন্ট গার্ডেনে ফলের ঠেলাগাড়ি আর কোথায় বা নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তিন বন্ধুর উপোস থেকে দান করা টাকাগুলো বোতলবাহিনীর পেটে গেছে। 'সার্ডিন অন টোস্ট' দিনের পর দিন খেয়ে যাওয়ার মধ্যে আর রইল না কোনও আদর্শ, কোনও সান্ত্বনা।

মহারানি আর রসোমালাইয়ের সামনে বসে মন মনে শুধু একটা কাতর অনুনয় করলাম আমার সেই কিশোর ছায়ার কাছে—ভুলো না, ভুলো না, সে দিনকার কথা যেন ভুলো না।

তিন

প্রবাসী বাঙালির কথা হচ্ছিল।

বাঙালি যখনই বাংলা দেশের বাইরে গিয়েছে বাংলার নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। নতুন দেশের মানুষকে বন্ধু করে নিয়েছে। তাদের শুনিয়েছে নতুন কথা, দেখিয়েছে নতুনের স্বপ্ন। এদেশে সবার আগে পশ্চিমের আলো পাওয়ার ফলে যে সুবিধা বাঙালি পেয়েছে, তা নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে একা ভোগ করেনি। একা তার মজাটুকু লুটে নেয়নি। মনের সম্পদে সে মনোপলি বসায়নি।

মেবারী বন্ধুরা এই প্রবাসী বাঙালির অনেক ভালো গুণের কথা বলছিলেন। নিজের দেশের লোকের গুণকীর্তন কার না শুনতে ভালো লাগে? বিশেষ করে এমন দূর মরুভূমির দেশে, যেখানে বাঙালি প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কোন্ কালে কাজের জন্য বাংলা দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাঙালির নিজের সম্বন্ধে সচেতন ভাবকে পেরিয়ে এসেছি। নতুন ভারতের পটভূমিকায় নিজেকে আগে বাঙালি না আগে ভারতীয়, কি মনে করা ঠিক হবে তা মনে মনে যাচাই করে দেখি। এমন একটা সময়ে রাজপুত নতুন বন্ধুরা আমায় ভালো করেই বাঙালির সম্বন্ধে সচেতন করে তুললেন। ভিতরে ভিতরে বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি যেন বেড়ে গেল বইকি।

আপনারও নিশ্চয়ই বেড়ে যাচ্ছে।

কারই বা না যেত? যাদের এত ছিল তাদের প্রত্যেকেরই এ রকম হবার কথা।

উদয়পুরের এক নামকরা বাঙালি বাড়িতে বিয়ে। বন্ধুদের মনে হল যে, আমায় আজ সন্ধ্যায় তারা সেই, অপরিচিত হলেও, বাঙালি বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন ছাড়াই নিয়ে যাবেন। তাহলে সন্ধ্যাটা সবচেয়ে ভালো

কাটবে। চেনা না হয় না-ই আছে। ওঁরা তাতে কোনও বাধা খুঁজে পেলেন না। আমিও পেলাম না। প্রবাসে নিয়মও যেমন নেই, এটিকেটের বালাইও তেমনি নেই।

রাজস্থানে এসে বড় হয়েছেন বহু বাঙালি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে উদয়পুরের শ্রদ্ধেয় চ্যাটার্জি মশায়ের কথা বাংলা দেশের লোক খুব বেশি জানে না। তাঁরই একটা গল্প এঁরা বললেন। শুধু গল্প নয়, 'ফেবল' অর্থাৎ নীতিকথার গল্প। আমরা এ কালে রোদে গলে গিয়ে, বাদলায় ছাতা মেরে, শীতে জবুথবু হয়ে যাবার ভয়ে বাঙ্গলা দেশের বাইরে কোথাও একটি পা-ও নড়তে রাজি নই। যেমন করেই হোক, নরম-সরম মোলায়েম আবহাওয়ার মধ্যে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে চিঁড়ের মতো চ্যাপটা হয়েই থাকব। তবু বেপরোয়া হয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলতে ভরসা পাই না। বরাতের সঙ্গে খালি হাতে লড়ে যাবার মতো বুকের পাটা নেই আর। ভুলে গেছি যে, এই মাত্র বছর পঞ্চাশ আগেও আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার দল সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়িয়েছেন। নিজেদের পথ নিজেরাই করে নিয়েছেন। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেননি, সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। সেই বাঙালির গল্প, সে তো শুধু গল্প নয়। সে হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের বচন। সুবচন।

চ্যাটার্জি মশায় তো এলেন উদয়পুরে। রাজ-সরকারে বড় কাজ নিয়ে। সে কাজটি তিনি পেয়েছিলেন বাঙালির বিদ্যা আর বুদ্ধির জোরে। কিন্তু বাঙালির আয়েসী স্বভাব যাবে কোথায়? মহারানা ফতে সিংহ যে সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও সেই মরু-দেশের গরমে দুপুর রোদ্দুর মাথায় নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে রোজ বুনো শুয়োর আর পাগলা হাতি শিকারে বেরোন, সে ব্যাপারটা চ্যাটার্জি মশায় ভালো করে তলিয়ে দেখলেন না। গরমের দিনে মাত্র একটু আরামে কাজ করবার জন্য অফিস কামরার দরজায়—ডেজার্ট কুলার নয়, এয়ার কন্ডিশনের মেশিন নয়—মাত্র একটি সামান্য খস্‌খসের টাট্টি লাগিয়ে নিলেন।

দুপুরে ঘোড়ায় চড়ে শিকারে বের হবার সময় দূর থেকে ফতে সিংহ ব্যাপারটা এক নজরে দেখে নিলেন শুধু।

পরের দিন ঠিক দুপুরে মহারানার কাছ থেকে এত্তেলা এল। ঠিক দুপুরে। রাজস্থানের রোদ অবশ্য মাঘের শীতেও মাথার চাঁদি ফাটায়। কিন্তু মহারানার দেখা দেবার সময় হল না। অত্যন্ত ব্যস্ত তিনি অন্যান্য কাজে। চ্যাটার্জি মশায় রইলেন গ্রীষ্মকালের সেই গরমের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে। বিকেল হয়ে এল, এমন সময় জানলেন যে, আজ আর মহারানার সময় হবে না।

এমনি করে পরের দিন আবার তলব পড়ল ঠিক দুপুরে। এমনই করেই বাইরে গরমে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু ভেট মিলল না। ফিরে এলেন ভদ্রলোক। ওদিকে অফিস কামরার দরজার খস্‌খসের ভিজে বেড়া মনের সুখে ঠাণ্ডা ছড়াচ্ছে।

আবার তার পরের দিন।

তারও পরের দিন।

শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জি মশায় তাঁর দু'একজন ঘনিষ্ঠ মেবারী বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ব্যাপারটা কী মশায়? রোজই মহারানা তলব করেন ঠিক দুপুরে, ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখেন বাইরে সেই বিকেল পর্যন্ত, কিন্তু দেখা করেন না। আবার তার পরের দিন তেমন করে ডাকেন কাজের জন্য, অথচ কাজটা হচ্ছে না। কী যে এমন জরুরি কাজটা তারও কোনও হদিস পাওয়া গেল না। বড় ঘোলাটে ব্যাপারই বটে!

সব সাফ হয়ে গেল—যখন একজন বন্ধু মাথা ঠাণ্ডা করে আবিষ্কার করলেন যে, সব অনর্থ হচ্ছে ওই খস্‌খসের পর্দা। যেখানে সবাই, মায় মহারানা পর্যন্ত, রাজপুতানার গরম মাথায় করে বেমালুম কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে কিনা নতুন এসেই এই ভদ্রলোক আয়েসের বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছেন? যারা নিজের মাথাটা দুশমনের মাথার মতই সস্তা মনে করে লড়াই করতে এগিয়ে যায়, তাদের মধ্যে এ রকম আয়েসের-আমদানি হলেই জাতটা গিয়েছে আর কী?

চোখ ফুটল চাটুজ্যে মশায়ের। সর্দার প্রভাস চ্যাটার্জি এর পর থেকে সব রাজপুতের সঙ্গে সমান তালে কষ্ট সইতে অভ্যাস করে নিলেন। যেখানে মহারানা নিজে কষ্ট সইতে পারেন, সমস্তটা দেশ যেখানে কষ্ট সইতে পারে, সেখানে আমি নরম মাটির দেশে গঙ্গার গা-জুড়ানো বাতাসে মানুষ হয়েছি বলেই সেখানকার আয়েস আমদানী করতে চাইলে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব কেন?

এই শিক্ষাই প্রবাসী বাঙালির গৌরবের ইতিহাসে প্রথম পাঠ। সবার সঙ্গে সমানে তাল ঠুকে নিজের হক দখল করতে হবে। সেই শিক্ষার সঙ্গে বইয়ের আর বুদ্ধির শিক্ষা মিলিয়ে প্রভাস চ্যাটার্জি মশায় উদয়পুরের

মিনিস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁরই বাড়িতে আজ বিয়ের উৎসবে মেবারী গণ্যমান্য সবাই নেমন্তন্নে চলেছেন।

প্রবাসী বাঙালির কৃতিত্ব আর সম্মানে নিজের বুকটিও ভরে উঠল।

প্রবাসী বাঙালি থেকে প্রবাসী রাজপুতের কথা এসে গেল। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারকে ওঁরা প্রবাসী রাজপুত বলে মানতে রাজি নন। কারণ, ওঁরা প্রবাসী নন, বিশ্ববাসী। তা ছাড়া রাজপুত বলতে এঁরা যা বোঝেন, ব্যবসাদার বলতে তা না কি বোঝায় না। বন্ধুদের মতে প্রবাসী রাজপুতের নমুনা হলেন মহবৎ খান।

মহবৎ খান ছিলেন খাঁটি মেবারী। রানা প্রতাপের বড় ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ। বাপের মতোই তিনি দেশকে ছেড়েছিলেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তাই তিনি ধর্মও ছেড়েছিলেন, আর দেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তবে তাঁর বীরত্ব যে শুধু রাজপুতের বিরুদ্ধেই প্রমাণ হয়েছিল তা নয়, স্বয়ং সম্রাট জাহাঙ্গিরকে—আর তার চেয়ে বড় কথা, বাদশাবেগম নূরজাহানকে পর্যন্ত তিনি বন্দী করে রেখেছিলেন। আর শুধু রাজপুত সৈন্যের সাহায্যেই এমন একটা অসম্ভব কাজ করতে পেরেছিলেন। মহবৎ খানকে নিয়ে রাজপুত কবি আর বীরদের বড়াইয়ের অন্ত নেই!

সম্মুখ যুদ্ধে হেরে রানা প্রতাপ তো আরাবলীর জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে লড়াই চালাতে লাগলেন। এদিকে মেবারকে বশে রাখা যায় কী করে? তাই তার বড় ভাই সাগরকে জাহাঙ্গির চিতোরে রানা বলে খাড়া করিয়ে দিলেন। সাত বছর ধরে মোগল সৈন্যরা তাঁকে ঠেকা দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাখল। কিন্তু কোনও মেবারীই এল না তাঁকে রানা বলে স্বীকার করতে। শেষ পর্যন্ত তিনি ভাইপো রানা অমর সিংহের কাছে চিতোর সঁপে দিয়ে, যাঁর ধন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে, মোগল দরবারে ফিরে গেলেন। সেখানে বাদশার সামনে খোলা দরবারে নিজের বুকে ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যা করলেন। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত কবলেন বিনা যুদ্ধে চিতোর ছেড়ে দিয়ে। আর মনিবের প্রতি নেমক-হারামির প্রায়শ্চিত্ত করলেন প্রাণ দিয়ে।

তাঁরই ছেলে মহবৎ খান। মোগল ইতিহাসে সবচেয়ে নজরে পড়ে এঁর কাহিনি, এঁর বুকেব পাটা আব মাথার কৌশল। মহবৎ মানে হচ্ছে প্রেম। মহবতের জীবনী হচ্ছে একজন বীরের স্বপ্ন।

যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোটা এঁর পক্ষে বড় কথা নয়। তেমন বীরত্ব তো আরও অনেকেই দেখিয়েছেন। আর সঙ্গে তেমন ভালো সৈন্যদল থাকলে ভালো সেনাপতির পক্ষে যুদ্ধ জেতাও সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু মহবতের বাহাদুরি হচ্ছে বুদ্ধির লড়াইয়ে। নূরজাহান, যাঁব চোখের চাহনিতে খেলত লাখো তরোয়ালের ঝিলিক, যাঁর পায়ের তলায় ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গির আব হাতের মুঠোয় ছিলেন শাহাজাদা খুরম, সেই নূরজাহানেব সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই, কৌশলের মারপ্যাঁচ।

মোগল দরবারের এই লড়াইয়ে মহবতের বাহাদুরির দৌড় কতখানি ছিল, তা বুঝতে গেলে আগে খোদ নূরজাহানকেই বুঝতে হবে। শত্রু যে কতখানি বড়, তা বিচার না করলে বীরত্বের ওজন ঠিক বুঝা যায় না। নেপোলিয়নের মতো শত্রু না হলে কী আর ডিউক অব ওয়েলিংটনের অত নাম-ডাক হত?

আগ্রার প্রাসাদে নওরোজের উৎসবে মেয়েরা সবাই মেতে উঠেছে। ফুলের মতো সুন্দর একটি ছোট মেয়েও সেখানে ছিল। কিন্তু একটু আড়ালে, এক কোনায়। তরুণ শাহজাদা সেলিম এসে তাঁর হাতে দুটো পায়রা জমা দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন সাবধানে রাখতে। যেন উড়ে না যায়।

ফিরে এসে সেলিম দেখলেন যে, মেয়েটির হাতে শুধু একটি পায়রা। দ্বিতীয়টি ছাড়া পেয়ে ছাদে বসে আছে। কী কববে, বাচ্চা মেয়ে। দুটো পায়রাকে ছোট হাতে সামলাতে পারেনি।

চটে-মটে লাল হয়ে সেলিম বলে উঠলেন, —বোকা কোথাকার, কী করে ছেড়ে দিলে পায়রাটাকে?

আরও লাল হয়ে ছোট মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিল,—তবে এই দেখুন শাহজাদা।

বলেই না হাত দুটি খুলে দিল বাকি পায়রাটিকে ছেড়ে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচে পায়রা তার সাথীর কাছে উড়ে চলে গেল।

কবির মন নিয়ে কাহিনিকার লিখেছেন যে, তখনই যুবরাজ সেলিম তার মনের সাথী খুঁজে পেলেন।

অবশ্য রোম্যান্সের মাল মশলা নূরজাহানের সময়ের বছর পঞ্চাশ পর থেকেই দানা বেঁধে ওঠে। শের আফগানকে খুন করে তার বিধবা মেহেরকে, বাল্য আর কৈশোরের প্রেমিকা মেহেরকে, হারেমে নিয়ে আসার কাহিনি সমসাময়িক কারও লেখাতেই নেই। মুসলমান বা বিদেশী খ্রিস্টান সে সময়কার কোনও লোকই এ ঘটনা লেখেন নি। তর্কের খাতিরে বলতে পারেন যে, দরবারের ঐতিহাসিক মোতামেদ খান, কামগার হুসেনি

আর লোহারি নূরজাহানের সতীন-পুত্র আর মহাশত্রু শাজাহানের হুকুমে ইতিহাস লিখলেও বাদশার পারিবারিক কুৎসাকে ঢেকে গিয়েছেন। কিন্তু বিদেশী পর্যটকরা কত অকথ্য কেচ্ছাই না লিখে গিয়েছেন। নূরজাহানের প্রথম জীবন, শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে, শেরের অপঘাত মৃত্যু, পরে জাহাঙ্গিরের সঙ্গে বিয়ে, জাহাঙ্গিরের উপর অসীম প্রভাব, সব কথাই বড় প্রেমসে তাঁরা লিখেছেন। কাজেই মেহেরকে পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানোর কথাটা সত্য ঘটনা হলে তা লিখবার লোভ যে তাঁরা সামলাতে পারতেন, তা মনে হয় না।

আসল কথা হচ্ছে যে, হকিন্স্, সার টমাস রো, এডোয়ার্ড টেরি এঁরা জাহাঙ্গিরের দরবারে এত অবাধে আসা-যাওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন যে, এমন একটা মুখরোচক ব্যাপার তাঁদেব অজানা থাকতে পারত না। উইলিয়াম ফিঞ্চ, পিয়েট্রো ডেলা ভাল্লে এ দু'জনও ওই সময় এদেশে ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলেতে লেখা ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠিতে মোগল দরবারের অনেক মজাদার ঘটনার বর্ণনা আছে। কেন থাকবে না শুধু মেহেরকে পাবার মতলবে শের আফগানকে হত্যা করার কথাটা?

যাই হোক, শেষকালে মহম্মদ সাদিক তাব্রেজী, কাফি খাঁ এঁরা দারুণ রঙ-চঙ দিয়ে এই রোম্যান্সটাকে সাজিয়েছিলেন। এ সব থেকে নূরজাহানের জাহাঙ্গিরের উপর যে কী অসীম প্রভাব ছিল তা খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়। যে রাজপুত মোগল দরবারে থেকেই এ হেন নূরজাহানের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে লড়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহবৎ খাঁ।

আমি কিন্তু রাজোয়ারাতে এসে রাজপুত চারণদের কবিতাতে এই প্রেম কাহিনি সম্বন্ধে কী পাওয়া যায়, তার দিকেই নজর দিলাম।

মরুভূমির মাঝখানে পালাধি নামে একটি ছোট জায়গীরে চারণদের খ্যাতা অর্থাৎ কবিতাতে এই কাহিনি পাওয়া যায়। বাল্যপ্রেম থেকে সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হওয়ার যে রসাল কাহিনি আমরা জানি, তার মোটামুটি সবটাই এতে আছে। মায় নূবজাহানের যুবরাজ খুরমের উপর নেক নজর পর্যন্ত। কবি সুরষমলের 'বংশভাস্কর' বইয়েতেও নূরজাহানের কাহিনি আছে।

যদি আপনারা তেড়ে শুধোন যে, এ-সব কবিতার কতখানি সত্যি, আমি শুধু করজোড়ে নিবেদন করব যে, আমি ইতিহাসের পাণ্ডাও নই, পণ্ডিতও নই। আমার অত শত বিচারে কাজ কী বলুন তো? আমি শুধু মোগলের কাহিনি রাজপুতের লেখা কবিতায় খুঁজে পেয়েছি বলেই খুশি হয়ে আছি। বাকি দায়িত্ব ঐতিহাসিকের।

মোট কথা, দেখা গেল যে, ততদিনে মেহেরের বাবা দরবারে খুব বড় ওমরাহ্ হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। ভাই-ও নেহাত কেউ-কেটা ব্যক্তি নয়। তবু শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরকে দেখা গেল জাহাঙ্গিরের হারেমে। সেখানে তিনি ছুঁচের কাজ করে, তুলি দিয়ে বঙিন নক্‌শা এঁকে কোনও রকমে নিজের খরচা চালান। বাদশার সঙ্গে কোনও ভাব বা দেখা সাক্ষাৎ নেই পুরোপুরি চারটি বছর ধরে। কেউ কারও খবরও করেন না কখনও। কেমনতরো প্রেম হল এটা?

তা বুঝতে পারা গেল বসন্তকালে। নওরোজের সময় সবাই যখন ফূর্তিতে মেতে উঠেছে তখনও মেহের সাদাসিধে কাপড় পরে বাঁদিদের মাঝখানে বসে কাজ করছেন। বাদশা দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে গেলেন।

শুধোলেন,—মেয়েদের মধ্যে যে সূর্য, সেই মেহের আর বাঁদিদের মধ্যে এরকম তফাত কেন?

চারদিকে জমকালো পোশাক পরে বাঁদিরা দাঁড়িয়ে আছে। রঙিন বিজলী বাতিগুলির মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আটপৌরে সাদা-কাপড়ে-ঢাকা সবিতা বুকে হাত রেখে জবাব দিল,—বাঁদিরা যাদের সেবা করে তাদের মর্জি মাফিক থাকে। এরা আমার বাঁদী। তাই আমার ক্ষমতায় যতদূর কুলোয় আমি ওদের সাজাই গোছাই। কিন্তু শাহান্‌শাহ্, আমি নিজে যার বাঁদি তার খুশি মতোই তো আমায় থাকতে হবে। নিজের খেয়াল অনুসারে নয়।

এই কথাবার্তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে লাভ কী? শুধু এটুকু আমি বলব যে, মেহেরের এই উত্তরের আন্তরিকতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় তারই রচনা করা কবিতা—যা লাহোরে তার কবরের উপর আছে :—

দীন আমি। জ্বালায়ো না মোর সমাধিতে
কোন দীপ, পতঙ্গেরে পুড়াইয়া দিতে;

দিয়ো না কুসুম মোর কবর উপরে
পাছে বুলবুল আসি সুখে গান করে।

রূপসী মেহের শুধু শিল্পী নন, কবিও বটে। এবং খুব উঁচু দরের রোম্যান্টিক কবি ছিলেন। মাখফি অর্থাৎ অপ্রকাশ বা পর্দানসীন এই ছদ্মনামে তিনি 'দিওয়ান-ই-মাখফি' (পর্দানসীনের গীতি কবিতা) লিখেছিলেন। (অবশ্য মাখফি এই ছদ্মনামে আরও কয়েকজন মোগল রাজকন্যার কবিতাও পাওয়া গেছে)। আর একজন ছদ্মনামা লোক, ঐতিহাসিক কাফি খাঁর 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব' বইয়েও নূরজাহানের কয়েকটি কবিতা তুলে দেওয়া আছে।

মেহের বাদশাহের কাছে বিচার চাইলেন—

তুরা নেহ্ তাকমে লাল্ অস্ত বরকবাই হরীর
সুদা অস্ত্ কৎরে খূন মিন্নতে গরিবাঁ গির
দিল বসুরৎ নদহম্ তা সুদাহ্ শিরৎ মালুম
বন্দে ইশ্ক্ ওয়ে হপ্তা দো দো মিল্লৎ মালুম

ফারসিতে লেখা এই মনগলানো কবিতা বাংলা অনুবাদে এই রকম দাঁড়াবে : —

তোমার রেশমী জামার বোতামে দেখিনু যে লাল মণি,
পীড়িতের খুন চাহিছে বিচার এই আমি মনে গণি;
আমি যে তোমারে দিয়েছি হৃদয়,—
সে শুধু তোমার মুখ হেরি নয়
আমি যে প্রেমের পূজারি—যদিও শত নীতিকথা জানি।

শুধু এই নয়। তারপরে তিনি কি বলেছিলেন বা ভেবেছিলেন, তাও মেহের কবিতায় লিখে গিয়েছেন : —

শেষের সে দিনে মোল্লারা ভয় করে:
দিয়োনাকো ভয় আমার এ অন্তরে
বিরহের দায়
তোমা হতে হায়—
কাটায়েছি কাল সে ভয়ের ভিতরে।

মনের মানুষটি একবার দেখার পরেই জীবনের মনিব হয়ে দেখা দিলেন।

এত প্রতাপ আর কোনও রাজমহিষীর কখনও হয়নি। ইতিহাসে এর তুলনা নেই।

নূরজাহান যে শুধু জাহাঙ্গিরকে জয় করলেন তা নয়। সব ওমরাহরা রইলেন তাঁর পায়ের তলায়। মুখের কথাটি, চোখের ইশারাটির অপেক্ষায়। জাহাঙ্গিরের নূরজাহানের প্রতি ছেলেবেলায় ভালোবাসার কথা বা তাকে যেমন করেই হোক পাবার জন্য শের আফগানকে খুন করানোর কথা কোনও সমসাময়িক বইয়ে লেখেনি। সে কাহিনি তাদের দু'পুরুষ পরে প্রথম লেখা হয়ে ইতিহাসের মধ্যে পর্যন্ত লতায়পাতায় বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা ঠিক যে, নূরজাহানের প্রতাপের কোনও তুলনা ছিল না। নিজের ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় রাখবার জন্য যখন যাকে খুশি, যখন খুশি নামিয়েছেন আর উঠিয়েছেন। সৎ ছেলে আর ভাইঝি-জামাই আর সব চেয়ে উপযুক্ত শাহজাদা ছিলেন খুরম (শাজাহান)—সুবিধা হবে বলে তার সঙ্গে একটি গোপন মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। সে কথা ইংরেজ রাজদূত সার টমাস রো লিখে গেছেন। শাজাহান নাকি "তাঁর পিতার নারীমণ্ডলীর মধ্যে হৃদয় হারিয়েছিলেন। নূরমহল (তখনও তিনি নূরজাহান আর রানি বেগম এই নামগুলি পাননি) ইংরেজি ফ্যাসানের ঘোড়ার গাড়িতে শাজাহানের সঙ্গে দেখা করে বিদায় দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন মুক্তো হীরে মণিতে ভরা একটা পোশাক, আর বদলে নিয়েছিলেন অন্য সব কাজ থেকে সরিয়ে তাঁর মন।"

তাই তার পরের দিন শাজাহানের দৃঢ় মুখটি হয়েছিল বড় চঞ্চল। ইংরেজ রাজদূত সে মুখে দেখলেন অনেক না-বলা কাহিনি, অসহ বেদনা। হৃদয় আমার হারালো, হারালো।

আর জাহাঙ্গিরের?

তিনি কি শুধু নূরজাহানের রাজ্য চালাবার আর লোক খাটাবার বুদ্ধি বেশি আছে বলেই তাঁর হাতে সব

ছেড়ে দিয়ে তাঁকে একেশ্বরী করে দিয়েছিলেন?

না। তা নয়। তাঁকে যে কতখানি ভালোবাসতেন, সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে চমৎকার একটা গল্প আছে। নূরজাহান রানি হয়েই তাঁর সতীন সুরাসুন্দরীর হাত থেকে জাহাঙ্গিরকে বাঁচাতে চাইলেন। বাদশা রাজি; এই শুধু ন' পেয়ালাতেই রাজি—যদি রানি বেগম নিজের হাতে সেগুলি হাতে তুলে দেন। রানি বেগম অবশ্যই রাজি হলেন আর মদ ভোলাবার জন্য গান-বাজনার বন্দোবস্ত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতে কি শানায়?

মুরগি-মুসল্লমের বদলে গাছপাঁঠার তরকারিতে কি চলে? আছেন আপনি রাজি—পাতে সাজানো ইলিশ মাছের পাতুরি ছেড়ে দিয়ে কুচো চিংড়ি চচ্চরি দিয়েই ভাতটুকু সাবড়ে নিতে?

কিন্তু রানি বেগম ন' পেয়ালার বেশি এক পেয়ালাও দেবেন না। যতই কাকুতি মিনতি, জেদাজেদিই করুন না কেন বাদশা। শেষ পর্যন্ত চটেমটে নূরজাহানের হাত পাকড়িয়ে তিনি খামচাখামচি শুরু করে দিলেন। পালটা জবাব দিলেন রানি কিল ঘুষি চালিয়ে। খাসকামরায় এমনতরো হল্লা শুনে বাজনাদাররা শুরু করে দিল কান্নাকাটি, ছুড়তে লাগল হাত-পা আর ছিঁড়তে আরম্ভ করল নিজেদের চুল, কাপড় চোপড়। ছুটে বেরিয়ে এলেন বাদশা আর তার বেগম ব্যাপার দেখবার জন্য। ওরা বুদ্ধি করেই এমন কাণ্ডকারখানা লাগিয়ে দিয়েছিল। এ ছাড়া যে স্বামী-স্ত্রীর মারামারি থামাবার উপায়ই ছিল না।

মারামারি তো থামল, কিন্তু রানির মান ভাঙবে কিসে? গোসাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রইলেন শুয়ে। মুখদর্শন পর্যন্ত করবেন না বাদশার, যদি না তিনি রানির পা ছুঁয়ে মাপ চান।

তোবা তোবা! 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।' তাঁকে ছুঁতে হবে একজন মানুষের পা! হোক না তা পৃথিবী আলো করা চরণ-কমল?

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলি যাত।
তাহাঁ তাঁহা ধরণী হই মঝু গাত।

কিন্তু নূরজাহানই বা কম কিসে? রইলেন তিনি গোসাঘরে ঘুষে। থাকো তুমি বাদশা, তোমার বাদশাহী নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত জটিলা কুটিলার দলই বুদ্ধি বাতলাল। অভিমানের সাপও মরবে অথচ সম্মানের লাঠিও ভাঙবে না। জাহাঙ্গির যদি ওপরে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়ান তার ছায়া এসে পড়বে নীচের বাগানে। নূরজাহান যদিও নীচে এসে দাঁড়াবেন তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়বে ওই ছায়া। ভুলিয়ে ভালিয়ে রানিকে আনা হল বাগানে। জাহাঙ্গির নিজের ছায়া তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়ে বললেন—দেখ, দেখ, আমার হিয়া তোমার পায়ের তলায় এসে লুটোচ্ছে।

এমন যে নূরজাহান—যিনি সবাইকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিলেন তিনিও একজন রাজপুত বীরকে বাগে আনতে পারলেন না। মুসলমান হয়ে মহবৎ নাম নিলে কি হবে, মেবারের মহারানার সৈন্যদের লড়াইয়ে লণ্ডভণ্ড করে পাহাড়ে জঙ্গলে ভাগিয়ে দিলে কী হবে, রাজপুত তো বটে তাই মোগল দরবারেও তাঁর মাথা নোয়ান নি কখনও। এমন কী নিজের মেয়ের বিয়ে দেবাব জন্য বাদশার কাছ থেকে যে মামুলি হুকুম নিতে হত তা পর্যন্ত নেননি। রাগে হিংসায় জ্বলছিল সব ওমরাহরা। এখন একটা অজুহাত পেয়ে তারা নির্দোষ জামাই বেচারাকেই হাত ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে সবার সামনে বেদম পেটাল আর কয়েদে পুরে রাখল। মহবতের দেওয়া সব যৌতুক গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। তুই দোষ না করে থাকিস তোর শ্বশুর করেছে।

নূরজাহানের নিজের ভাই, সবার সেরা ওমরাহ আসফ খাঁ ছিলেন এই দলের সর্দার।

কিন্তু তাতে কি ভড়কিয়ে গেলেন রাজপুত মহবৎ খাঁ? তা কি সম্ভব? মহীপৎ সিংহের কেশর কী বেড়ালের ল্যাজের মতো গুটিয়ে আসবে ব্যাপার সঙীন হয়ে উঠেছে দেখে?

কভি নেহি। জান কবুল, তবু মান যাবে না।

কাশ্মীর ফেরত জাহাঙ্গির চলেছেন কাবুলে। প্রায় সব সৈন্য, আমির ওমরাহ, ধনরত্ন ঝিলম পার হয়ে গেছে। বাকি শুধু বাদশার নিজের পরিবার স্বজন আর কিছু চাকর বাকর। এমন সময়ে ভোর বেলা মহবতের দু'হাজার রাজপুত ঘোড়সোয়ার নদীর পুল বন্ধ করে দাঁড়াল। দরবারের ঐতিহাসিক মোতামেদ খান 'ইকবাল-নামা' বইয়ে লিখেছেন যে, এমন চুপিসারে কাজ হাসিল হয়ে গেল যে, হামামে বসে বাদশা টেরও পেলেন না যে কি ঘটে গেল। খোজাদের কাছে খবর পেয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, দুয়ারে প্রস্তুত পালকি। আর

জোড় হাত করে সামনে দাঁড়িয়ে মহবৎ খাঁ হুজুরে আর্জি পেশ করেছেন যে, আসফ খাঁ প্রভৃতিরা তাকে নেহাতই বেইজ্জত করে মেরে ফেলবে এই ভয়ে বান্দার বান্দা মহবৎ সাহস করে শাহানশার পায়ের তলায় নিজেকে এনে হাজির করেছে। গোস্তাকি মাপ না হলে জাঁহাপনা তার গর্দান নিতে পারেন।

শুধু তাই নয়। মহবৎ আরও নিবেদন করলেন যে, তার পরে ঘোড়ায় চড়ে জাঁহাপনাকে বাইরে খেলতে যেতে হবে মহবতের সঙ্গে। যাতে সবাই বুঝতে পারে যে এমন বেয়াদবি কাজ শুধু বাদশার হুকুমেই করা হয়েছে। তিনি নিজেই এই সব বেইমান নেমকহারাম আসফ খান কোম্পানির হাত থেকে নিজের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখতে চান।

বেকায়দায় পড়ে জাহাঙ্গির শিকারে যাবার পোশাক পরবার জন্য তাঁবুতে যেতে চাইলেন। একবার নূরজাহানের সঙ্গে কথা কওয়া তো দরকার। কিন্তু মহবৎ তাতে রাজি হলেন না। কী আর করা যায়?

পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

এদিকে সেই ডামাডোলের মধ্যেই ছদ্মবেশে নূরজাহান উধাও হয়ে গেলেন নদীর ওপারে, যেখানে সবাই জমা হয়ে আছে। তাদের জড়ো করলেন লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু পুলটা যে রাজপুতদের দখলে। আর বাদশাও রাজপুতদের কবলে।

মহবৎ শুধু বেপরোয়া বীর নন। তিনি একাধারে চাণক্য আর চন্দ্রগুপ্ত দুই-ই। তাই দেখাতে চান যে, বাদশা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই তার আশ্রয়ে এসে উঠেছেন। ঠিক যেমনভাবে এককালে ব্রিটিশরা দেখাতে চাইত যে, তাদের আশ্রয়ে স্বাধীনতাটুকু বাঁচাবার জন্যই কালা আদমীরা যেচে এসে তাদের অধীন হয়ে থাকতে চাইছে। লড়াই হলে সে ভোল তো বজায় থাকে না। কাজেই জাহাঙ্গিরের হাতের মোহর মারা আঙটি ওপারে পাঠানো হল লড়াই না করবার জন্য। এদিকে পুলটাও রাজপুতরা পুড়িয়ে শেষ করে দিল।

লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে মোগলদের। ওরা ভোরবেলা নদী পার হয়ে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। সবার সামনে রানি বেগম নূরজাহান—হাতির পিঠে বসে, কোলে তার পেয়ারের নাতনী। সে লড়াইয়ে মহবতের কৌশলে আর সাহসে রাজপুতরা মোগলদের পদে পদে হারিয়ে হঠিয়ে দিল। ভয়ে যখন মোগলের হাতি রণসাজে গভীর জলে ভাসতে শুরু করল, তখন রাজপুতের ঘোড়া জলে তল পাচ্ছে না দেখে তরোয়াল হাতে রাজপুতরা সাঁতরে তেড়ে গেল। নূরজাহানের নাতনীর হাতে এসে বিঁধল রাজপুতের তীর। কিন্তু তিনি নিজে ঘাবড়ালেন না একটুও। বসে রইলেন বিনা আয়াসে—যেন দিল্লির গোলাপবাগে জলের ফোয়ারার পাশে বসে দিলরুবা বাজাচ্ছেন।

হেরে প্রাণ নিয়ে পালালেন আসফ খাঁ আর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন। রাজপুত তাকে প্রাণে মারল না। কিন্তু নূরজাহান যাবেন কোথায়? নিজে যেচে এসে বন্দী হয়ে রইলেন মহবতের আওতায়।

একদিন জাহাঙ্গিরকে বিজয়ী সেনাপতি কিছু বর প্রার্থনা করতে অনুমতি দিলেন। সেদিন বন্দী সম্রাটের প্রতি এই বিশেষ নেক নজরের কারণ ছিল যে, তিনি নূরজাহানকে সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্রীর পদ থেকে চ্যুত করবেন বলে ঠিক ছিল। সম্রাট ওমর খৈয়ামের কবিতার মতো একটি প্রার্থনা জানালেন—

'দাও আমায় সরাব আর সুলতানা।'

বুদ্ধিমান রাজপুত সেনাপতি দুটিই জাহাঙ্গিরের কাছ থেকে দূরে রাখলেন।

সরাব—কারণ, ইসলামে মদ বারণ।

সুলতানা—কারণ, নূরজাহান মদের চেয়ে অনেক বেশি মাতাল করা নেশা। এবং তার উপর ক্ষুরের চেয়ে বেশি ধারালো বুদ্ধি তাঁর।

মহবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, নূরজাহান শুধু যে হাতে-কলমে সাম্রাজ্য চালাতেন ও জাহাঙ্গির নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন তা নয়, জাহাঙ্গিরের সময়ের মোহরে লেখা থাকত 'বাদশা জাহাঙ্গিরের হুকুম—রানি বেগম নূরজাহানের নামের ছাপ পেয়ে সোনার জৌলুষ একশো গুণ বেড়ে গিয়েছে।' মহবৎ খাঁ ভোলেন নি যে, জাহাঙ্গির বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, নূরজাহানই সাম্রাজ্যের একেশ্বরী; তিনি নিজে শুধু 'এক সের মদ ও আধ সের মাংস' ছাড়া আর কিছু চান না। (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গিরী)

সমস্তটা দেশ এখন মহবতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। নামে বাদশা রইলেন জাহাঙ্গির, কিন্তু কলকাঠি নাড়েন মহবৎ। তিনি ভাবলেন বলেন, দেশকে বুঝতে দিতে হবে যে, সবই ঠিকমতো আগেকার মতই চলছে।

তাই কাবুল যাত্রাটা আবার শুরু হল।

এবার আরম্ভ হল খেলা চতুরে চতুরে। মহবৎ নালিশ করলেন যে, রাজ্যে সুশাসন হচ্ছিল না ঠিক মতো। একজন মেয়েলোকের নামে আর হুকুমে রাজ্য চালান—সেটাও বড় খারাপ দেখায়। কিন্তু বান্দা নিজে সত্যি সত্যিই বান্দা। বিশ্বাস না হয়, জাহাঁপনা, এই তুলে দিলাম আমার খোলা তরোয়াল আর এই পেতে দিলাম আমার খালি মাথা।

ছি ছি। তামাম হিন্দুস্থানের শাহানশাহ কি এমন ভুল কখনও করতে পারেন? লোক তিনি চেনেন খুব ভালো করেই। হাত ধরে তুলে নিলেন হাঁটু গেড়ে-বসা মহবৎকে। অভয় দিলেন পুরোপুরি। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এত সদুপদেশ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। নূরজাহানকে নিজের সঙ্গে একসঙ্গে নজরবন্দী হয়ে থাকার জন্য হুকুম দিয়ে নিজের ভালোমানুষির আরও হাতে হাতে প্রমাণ দিলেন।

খুশি হয়ে মহবৎ দিলেন প্রকাণ্ড এক ভোজ। তিনদিন ধরে চলল ফুর্তি হৈ-হল্লা। সব আমির-ওমরাহরা দেখে গেল মহবতের প্রতাপ, বাদশার সঙ্গে খাতির। রানি বেগম নিজের হাতে তাকে দিলেন অনেক খেলাত। ঘোষণা করলেন সবার সামনে যে, দুনিয়াতে মহবতের মতো এত পেয়ারের আর বিশ্বাসী ওমরাহ কেউ নেই। হয় নি, আর হতে পারেও না। সম্ভবত হওয়া উচিতও হবে না।

সেই দুর্দান্ত ঠাণ্ডা কাবুলে এসে রাজপুতদের মাথা হয়ে উঠল দুরন্ত গরম। মনে মনে মোগল আফগানরা এমনিতেই রাজপুতদের উপর চটে ছিল। এখন আবার তাদের খারাপ ব্যবহারের জন্য নালিশ করতে গেলে যেতে হয় মহবতের দুয়ারে। এ যে একেবারে অসহ্য ব্যাপার!

এ দিকে জাহাঙ্গির সময় পেলেই ইনিয়ে বিনিয়ে মহবৎকে বলতেন যে, নূরজাহানের আর তার ভাই বেরাদরদের দাপট নিজের কখনও সহ্য হত না। এমন একটা দুরবস্থা থেকে মহবৎ তাকে বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয় মহবৎকেই তিনি বিশ্বাস করেন পুরোপুরি। আর কাউকে নয়।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

না হয়ে উপায় কী? জাহাঙ্গির যে একদিন নিজে হাতেই ফরমান সই করে দিলেন যে রানি বেগমের গর্দান নেওয়া হোক। কারণ, রানি বেগম গোপনে গোপনে মহবৎকে দেখতে পারেন না আর খালি ষড়যন্ত্র করে বেড়ান। মহবৎ সেই ফারমান নিয়ে হাজির হলেন নূরজাহানের কাছে।

রানি বেগমের প্রাণদণ্ড? রানি বিশ্বাস করলেন। অবশ্য মোগল রাজত্বে সবই সম্ভব। তিনি মরতে তৈরি আছেন। তবে একবার স্বামীকে শেষ দেখা দেখে যাবেন। যে হাত থেকে অনেক কিছু তিনি পেয়েছেন সে হাতে শেষ একটি চুমু দিয়ে যাবেন।

মহাবীর মহবৎ তো এতে আপত্তি করতে পারেন না? স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসে রয়ে গেলেন পাকাপাকি ভাবে। মৃত্যু পরোয়ানার কথা সবাই ভুলে গেল। তরোয়ালের ধাঁধানো খেলা দেখা অভ্যস্ত চোখে ধরা পড়ল না যে মাকড়সার জাল তার নিজেরই চারদিকে বোনা হচ্ছে।

তবু মাঝে মাঝে জাহাঙ্গির মহবৎকে সাবধান করে দিতে লাগলেন যে, নূরজাহানকে বিশ্বাস করা যায় না। আর আসফ খানের বেটার (ভবিষ্যতে শায়েস্তা খান্) বৌ তো একটা খুন-খারাপির চেষ্টা করছে।

মহবতের তাঁবে মহা সুখে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাতে কাটাতে জাহাঙ্গির প্রায় রোজই শিকারে যেতে লাগলেন। যেতে লাগলেন পীরদের কাছে, দরগা মসজিদে। রাজপুত পাহারাদাররা সঙ্গে যায়। তাতে আর কী হয়েছে?

এদিকে আফগানরা বড় শয়তান আর হিন্দু রাজপুতদের দু'চোখে দেখতে পারে না বলে বাদশার মোগল সৈন্য আরও বাড়াতে হল। অথচ বাদশার চার দিকে বেশি সৈন্য পাহারাদার থাকলে লোকে পাঁচটা মন্দ কথা বলতে পারে। কাজেই রাজপুতদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিতে হল। তা ছাড়া এদিকে-সেদিকে নূরজাহানের চররা আরও ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিছক দেশ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই অবশ্য। কাবুল কান্দাহার মুলতান এসব অতি সুন্দর জায়গা।

কাবুল থেকে ফেরার পথে একদিন বাদশার খেয়াল হল ঘোড়সোয়ার সৈন্যদের দেখবেন। কিছু না, শুধু যত দূর লাইন চলে দু'লাইনে সার দিয়ে তারা দাঁড়াবে আর বাদশা তাদের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবেন। খবর পাঠালেন মহবৎকে যে, তার নিজের আসার দরকার নেই। তার সুশাসনে যেখানে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই সেনাপতির সব সময় বাদশার কাছে থাকার দরকার হয় না। তাছাড়া

পুরোনো সৈন্য আর নতুন সৈন্যরা এক সঙ্গে লাইন বেঁধে দাঁড়ালে ঝগড়াঝাটি, এমন কি খুনখারাবিও হতে পারে। কাজেই শুধু নতুন সৈন্যদেরই আজ দেখতে যাবেন বাদশা। মহবৎ খাঁ ততক্ষণে তাঁবু গুটিয়ে সে দিনকার মার্চটা শুরু করে দিতে পারেন।

তাই করলেন মহবৎ খাঁ। এ দিকে জাহাঙ্গির নতুন সৈন্যদের লাইনের মাঝখানে পৌছান মাত্রই তারা ওঁর চার দিকে ঘিরে দাঁড়াল। রাজপুতরা হতভম্ব হয়ে আলাদা পড়ে রইল।

পাশারদানে মহবৎ হেরে গেলেন। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। তাকে নূরজাহান দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহী সৎ ছেলে শাহজাদা খুরমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। কিন্তু রাজপুতের ছেলে মহবৎ রাজপুত মায়ের ছেলে খুরমের সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার দিল্লির উপর ক্ষমতা খাটাবার পথ করে নিলেন। শেষ পর্যন্ত খুরম বাদশা শাজাহান হয়ে বসলেন এবং মহবৎ খাঁ আজমীরে তাঁর প্রতিনিধি আর সবেচয়ে বড় সেনাপতি হয়ে রইলেন।

আজকের দিনেও রাজপুতরা মহবৎ খানের স্মৃতিকে প্রবাসী রাজপুত বীরের স্মৃতি বলে পূজা করে। হোন না তিনি ধর্মে মুসলমান, বীরধর্মে তিনি রাজপুত। তাই প্রভুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মারেন নি, শত্রুকে কবলে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। লড়তে গিয়েছেন প্রভুর আদেশে কাবুল পর্যন্ত, মরতে ফিরে এসেছেন রাজস্থানেই। বিপদে যখন সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন আশ্রয় নিয়েছেন মেবারের পাহাড়ে, হাতে হাত মিলিয়েছেন মেবারে শরণ-পাওয়া শাহজাদা খুরমের সঙ্গে। সত্যিই বীরত্বের জাঁকজমকে ভরা মোগল দরবারেও মহবতের মতো এমন রূপকথার সেনাপতি আর পাওয়া যায় না। শুধু বীরত্বে নয়, মহত্ত্বেও।

যার কাছে বুদ্ধির লড়াইয়ে তিনি হেরে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্যর একেশ্বর কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন, সেই নূরজাহানের পতনের দিনে তাঁর কোনও অনিষ্টের চেষ্টা করেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে নূরজাহানের জগতের আলো যেন হঠাৎ এক ফুঁয়ে নিভে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তার জন্য দুঃখ করল না কেউ, ফেলল না একটা দীর্ঘশ্বাস। অস্তগামী সূর্যের পূজা করা তো সংসারের নিয়ম নয়।

কবি হসরৎ শেরোয়ানী বড় দুঃখে তার কবরের উপর কবিতা লিখেছেন,—

জিসকি পাবোসি কি করতে আর্জু গুল হায়তার
খুশক্ কাঁটো কা পড়া হ্যায় ধের উসকি গোর পর।
শেজ পর পুলোঁ কি সোতী থীকভি কভী জো নাজনীঁ।
হায় উস্‌কী কবর পর এক পঙখড়ী তক ভী নহী॥

বিকচ কুসুমও স্পর্শ করিতে পারেনি যাহার চরণে
সে পীর-কবরে কণ্টকরাশি ঘেরিয়াছে আজ মরণে।
যে রাজকন্যা-শয়ন রচিত শুধু গোলাপের শয্যা
তার সমাধিতে শুষ্ক পাত্র নাহি আজ—এ কি লজ্জা।

মনে পড়ল সে কথা। ভাবলাম যে, সেই ক্ষমাহীন শত্রুতার যুগে, শোধ-প্রতিশোধের যুগে মহবৎ খাঁ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েও কেমন পরম উদাসীন রইলেন নূরজাহানের প্রতি।

মেবারী বন্ধুরা উল্লাস করে বললেন মহবতের কাহিনি। তারিফ করলেন তাঁর বুদ্ধির, বাহাদুরির, বীরত্বের। একজন প্রবাসী রাজপুত বিধর্মী শত্রুর দরবারে কত প্রভাব খাটিয়ে গিয়েছিলেন। বলতে বলতে ওদের বুক ভরে উঠল, মন খুশি হয়ে গেল।

আমারও তাই। রাজপুত চারণরা মহবতের কথা অনর্থক এত বড় করে গাননি। তিনি এত বড় বীর ছিলেন যে, রাজপুত না হয়ে যান না—এই বোধ হয় ছিল চারণদের মনের কথা। তাই তাঁরা ওঁকে মহারানা প্রতাপের ভাই সাগর সিংহের ছেলে মহীপৎ বানিয়ে ছেড়েছিলেন। টডও সেই কাহিনিই তাঁর বইয়ে লিখেছেন। অন্য পক্ষে মাসির-উল-উমরা নামে মোগল দরবারের ওমরাহদের সম্বন্ধে যে প্রামাণিক জীবনীর বই আছে তাতে লেখে যে, মহবৎ খান হচ্ছেন ইরানের শিরাজ শহরের লোক। আসল নাম তার ছিল জামানা বেগ। রাজপুতদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল শুধু রাজপুত সৈন্য নিয়ে লড়াই করার মধ্যে দিয়ে।

সে যাই হোক। আমি তো রাজোয়ারাতে এসে ইতিহাস লিখতে বসিনি। মেবারীদের মতো আমারও চোখে মহবৎ রাজপুতই বটে। পুরোপুরি, নির্ভেজাল, নিঃসন্দেহ।

যার বীরত্বে আছে চমক আর জীবনে আছে রোম্যান্স সেই রাজপুত।

চার

রাজকন্যাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় তুলে নিয়ে উল্কার মতো বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন রাজকুমার।

রাক্ষসের দল বড় বড় মুলোর মতো দাঁত আর থামের মতো হাত নিয়ে 'হাউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ' করে তেড়ে এল। রাজকন্যা আর রাজপুত্তুরকে ধরতেই হবে। পথে হল ভীষণ যুদ্ধ, কিন্তু ওদের ধরতে পারবে কে?

রাজকন্যার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ; আর তেমনি স্বয়ংবর করে নেওয়া বরের উপর টান! আর রাজপুত্তুর? তাঁর বীরত্বের সামনে যে দাঁড়াতে পারে এ হেন কেউ জন্মায়ই নি। আর তার উপর রাজপুত্তুর করছেন ধনুকভাঙা পণ—রাজকন্যাকে রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করবেনই। কাজেই শত্রুরা তার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

যদি পেরে উঠত, তাহলে ঠাকুরমার ঝুলির গল্পই হত না। শীতের ভর সন্ধেয় ঢুলু ঢুলু চোখে ঠাকুরমার লেপের তলায় রেড়ির তেলের বাতির আঁধারে খোকামণির গল্প শোনাটাই মাটি হত তাহলে। কাজেই রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে হবেই। রাজপুত্তুরকে রাক্ষসদের হারাতে হবেই।

এ তো আর বাংলা সিনেমার গল্প নয় যে, নায়ক নায়িকার মধ্যে অন্তত একজনকে—এবং দুজনকে হলেই আরও ভালো—চিতার আগুনে শুতে হবেই। সঙ্গে সঙ্গে তার ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরোবে গলা-ফাটানো সুরে পিলে চমকানো, থুড়ি, হৃদয়-গলানো গান। যতক্ষণ তা না হচ্ছে গল্প শেষ হতেই পারে না।

কিন্তু ঠাকুরমাব লেপের তলায় গরমাগরম আরামে এমনধারা বেয়াড়া উপসংহারে গল্প চলবে না। রাজকন্যাকে উদ্ধার কবে আনবে রাজপুত্তুর। রাক্ষসেরা লড়াইয়ে হেরে যাবে আর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হবে পক্ষীরাজের মাথায়। তবেই না নিশ্চিন্দি আরামে ঠাকুরমার কোল ঘেঁষে ঘুমিয়ে পডবে খোকামণি।

কিন্তু অন্তত একবার—
আমার গল্প ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো।

এমন একটা সুবিধাজনক উপসংহার হল না। নটে গাছটি বিষমাখানো কাঁটাগাছ হয়ে নতুন করে গজাল। উত্তুরে হাওয়ায় তার কাঁটা সোঁ সোঁ করে ছুটে এসে চার ধারে ছড়িয়ে পড়ল। আর সব জায়গাটা বিষের জ্বালায় জ্বলে গেল। রাজপুত্তুর আর রাজকন্যা দু'জনেই মারা গেল রাক্ষসের হাতে। রাজ্য গেল ছারকাবে।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার কাহিনি ঠিক সেই রূপকথারই গল্পের মতো রোমাঞ্চকর। সেই কাহিনির মতোই রাক্ষস সৈন্যদের হারিয়ে রাজপুত্তুর রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে বসবাস করতেন, যদি রাজকন্যার বাবা উত্তর থেকে শত্তুরের কাঁটা আমদানি না করতেন। কাজেই "এর পর তারা চিরকাল সুখেস্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল" এমন একটা আনন্দের পরিণতি তাদের কপালে ঘটল না।

অজয়মেরু অর্থাৎ অজমের শহরের সব চেয়ে বড় বীর ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহান। সোমেশ্বর চৌহানের রাজধানী ছিল আজমীরে আর অনঙ্গপাল তোমরের ছিল দিল্লিতে। কনৌজে সে সময় রাজা ছিলেন বিজয়পাল। বিজয়পাল দিল্লি আক্রমণ করলে অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের সহায়তা চেয়ে পাঠালেন। দুজনে মিলে সে সময়কার উত্তর-ভারতের সব চেয়ে বড় অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা বিজয়পালের হাত থেকে দিল্লি রক্ষা করলেন।

তার পর পৃথিবীর ইতিহাসে সব সময় যা হয়ে এসেছে তাই হল। অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহের শান্তি হল বিবাহে। অপুত্রক অনঙ্গপালের দুই মেয়ে ছিল। একজনের বিয়ে হল সোমেশ্বরের সঙ্গে আর ছোট জনেরও বিয়ে দেওয়া হল বিজয়পালের সঙ্গে। আগেকার দিনে বিয়েব মন্তর না হলে সন্ধির মন্ত্রণা ঠিক মতো জমত না।

কাজেই বিজয়পালকে ঠিক মতো ঠাণ্ডা করবার জন্য একটি মেয়ে তার হাতে সঁপে দিতে হল।

কাজে কাজেই পৃথ্বীরাজ আর জয়চাঁদ দুই ভায়রা ভাইয়ের ছেলে। সম্পর্কটা যখন এত কাছের, হিংসা-জ্বালা বেশি হতেই হবে। না হলে যে হিন্দুস্থানের হাওয়ার মান থাকে না।

তার উপর জয়চাঁদ বড় রাজ্যটার অধিকারী হলেও পৃথ্বীরাজই ছিলেন অনঙ্গপালের প্রিয়। আবার

পৃথ্বীরাজকেই তিনি দিল্লির রাজপাট দিয়ে গেলেন! এমনিতেই জয়চাঁদের মনে জমা ছিল অনেক অসন্তোষ। এবারে আগুনে পড়ল ঘিয়ের আহুতি।

পূর্বপুরুষের সেই ধারাটা কি আমরা এখনও ছাড়তে পেরেছি? এখনও যে আমরা সব সইতে পারি, পারি না শুধু আত্মীয়-স্বজনের উন্নতি।

জয়চাঁদও পারেন নি? পৃথ্বীরাজের মতো সুপুরুষ আর বীরপুরুষ রাজোয়ারাতে নাকি আর কখনও কেহ হননি। তাঁর সারাটি জীবন ছিল বীরত্বের একগাছা জয়মালা। পৃথিবীতে শিভ্যালরি যতদিন থাকবে, পৃথ্বীরাজের নামও থাকবে তত দিন। বীরগাথায় চৌহানদের আসন খুব উঁচু। কিন্তু সবার উপরে সিংহাসন পৃথ্বীরাজের।

চারণদের গানে গানে তাঁর বহু কাহিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাঁর রসিকতা, জীবনকে শিল্পীর মতো উপভোগ আর মরণকে বীরের মতো বরণ চারণদের বহু গানের মাল মশলা জুগিয়েছে। তাঁর সময়কার প্রত্যেক রাজার সভাতেই হত তাঁর গান। প্রতি বীরের মনে ছিল সে জন্য হিংসা। প্রতি রাজকন্যার নয়নে তাঁর স্বপ্ন। ইহলোকে রূপকথার রাজপুত্র যদি কেহ হয়ে থাকেন, তিনি হচ্ছেন পৃথ্বীরাজ।

সেই রূপকথার রাজপুত্রের গলায় স্বয়ংবর-সভায় মালা পরিয়ে দিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু রাজা জয়চাঁদের মেয়ে সংযুক্তা।

আগুন জ্বলে উঠল সমস্ত উত্তর ভারতে। জ্বলে উঠল জয়চাঁদের মন। এমন কি, স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রিত আর সংযুক্তার প্রত্যাখ্যাত সব রাজাদের মনে। সে আগুনের লেলিহান শিখায় ধরা পড়ল সমস্ত দেশের স্বাধীন হিন্দু রাজ্যগুলি। একে একে—রাজোয়ারা থেকে বাংলা পর্যন্ত।

দিল্লি ও আজমীর দুইয়েরই রাজা আর এত নাম-যশের অধিকারী পৃথ্বীরাজের সমৃদ্ধিতে জয়চাঁদের ঈর্ষার অন্ত ছিল না। তাই নিজেকে একচ্ছত্র রাজা বলে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য জয়চাঁদ রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। কোনও রাজা যদি সে যজ্ঞে এসে হাজির হতে দ্বিধা বোধ করেন, সে দ্বিধাকে দূর করবার জন্য দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল রাজকন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর।

সেই সংযুক্তা, যাঁর রূপের বর্ণনা হচ্ছে যে—

> কুট্টিল কেস সুদেস পৌন পরিচিয়ত পিক্ক সদ।
> কমল গন্ধ, বয়-সন্ধ, হংসগতি চলত মন্দ মন্দ॥
> সেত বস্ত্র সোহৈ সরীর, নখ স্বাতি-বুন্দ জস।
> ভ্রমর ভবহিঁ ভুল্লহিঁ সুভাব, মকরন্দ বাস রস॥
> নয়ন নিরখি সুখ পায় সুক যহ সুদিব্য মুরতি রচিয়।
> উমাপ্রসাদ হর হেরিয়ত মিলতি রাজ প্রথিরাজ জিয়॥

কুঞ্চিত কেশে সুন্দর মোতির (অর্থান্তরে, বেল ফুলের) মালা গাঁথা রয়েছে দেখা যাচ্ছে; কোকিলের মতো মিষ্টি তাঁর স্বর; পদ্মের গন্ধ তাঁর গায়ে। বয়ঃসন্ধি হয়েছে তাঁর। তিনি হংসগতিতে ধীরে ধীরে যাচ্ছেন। শ্বেত বস্ত্র গায়ে শোভা পাচ্ছে। নখ মুক্তার মতো চকচক করছে। ভ্রমর তাঁর অধরামৃতরস ও পদ্মগন্ধের জন্য ভুল করে চারদিকে গুঞ্জরন করছে। এ রকম রূপের ছটা দেখে শুকপাখি খুব আনন্দিত হল আর ভাবল যে, এমন অলৌকিক রূপসম্পন্ন মূর্তি যখন সৃষ্টি হয়েছে, হরগৌরীর প্রসাদ চাচ্ছি, যেন রাজা পৃথ্বীরাজকে ইনি স্বামীরূপে পান।

রাজস্থানী হিন্দি ভাষার আদিকবি ও মহাকবি চান্দ বরদাইয়ের 'পৃথ্বীরাজ রাসো' মহাকাব্যে এ রকম রসাল বর্ণনায় অনেক জায়গাতেই শুক সারী ডাকিনী যোগিনী বা নানা রকম অলৌকিক প্রাণী প্রভৃতির মুখ দিয়ে কথা বলানো হয়েছে। রাসো মহাকাব্যে সংস্কৃত ছাড়া আরবি ফারসি কথাও অনেক আছে। আর রাজস্থানী চলিত ভাষার তো কথাই নেই। প্রাচীন হিন্দি রচনার প্রথম পরিচয় আমরা পাই চাঁদের লেখনীতে। তিনি জন্মেছিলেন লাহোরে আর মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর বহু আলাপ-পরিচয় ও যাতায়াত ছিল। তিনি পৃথ্বীরাজের সভাকবি, অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ ছিলেন। প্রাচীন বাংলা কাব্যের সঙ্গে ভাষার মিল ও সাদৃশ্য যে কতখানি তা কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে না। শুধু বানানের সামান্য তফাতটুকুর পর্দা তুলে পড়ে দেখলেই বুঝা যাবে। প্রাচীন হিন্দির জায়গায় দরকার মতো স-র বদলে শ, জ-র বদলে য, ন-র বদলে ণ আর ঈ চিহ্নের বদলে হ্রস্ব ই পড়ে নিলেই কথার মানে বুঝে নেওয়া সহজ হবে।

শাস্ত্র মতো পদ্মিনী নারীর যে সব চিহ্ন থাকবার কথা তার সবই সংযুক্তার (রাসোর ভাষায় সংযোগিতা) ছিল। পৃথ্বীরাজও কম যেতেন না। "কেমন বীর মূরতি তার, মাধুরী দিয়ে মিশা" রবীন্দ্রনাথের এই কথার সার্থকতা পাওয়া যায় পৃথ্বীরাজের বর্ণনায়।

সংভরি নরেস সোমেসপুত।
দেবত্ব রূপ অবতার ধুত॥
সামন্ত সুর সব্বৈ অপার।
ভুজান ভীম জিমি সার ভার॥
জিহি পকরি সাহ সাহাবত্তীন।
তিহুঁ বের করিয় পানীপ হীন॥
সিংগিনি সুসন্দ গুণি চঢ়ি জঞ্জীর।
চুক্কই ন সবদ বেধংত তীর॥
বলি বৈন করণ জিমি দান পান।
সত সাহসী সীল হরিচন্দ সমান॥
সাহস সুকম্প বিক্রম জু বীর।
দানব সুমত্ত অবতার ধীর॥

সম্বর দেশের রাজা সোমেশ্বরের পুত্রের দেবতার অবতারের মতো রূপ। যেন কোনও দেবতা অবতারের রূপ নিয়ে নেমে এসেছেন। তাঁর বীর সামন্তের লেখাজোখা নেই। তাঁর বাহু খুব জোরালো আর লোহার মতো ভারী। তিনি তিন বার শাহাবুদ্দিন বাদশাকে শ্রীহীন করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পশুপক্ষীর আওয়াজ শুনেই শব্দভেদী বাণে তাদের বিদ্ধ করতে পারতেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে তিনি বলিরাজার মতো ছিলেন, কর্ণের মতো ছিলেন দাতা আর শীলতায় ছিলেন সহস্র হরিশ্চন্দ্রের মতো। ধীর আর বীর তাঁর মধ্যে সাহস শুভকর্ম ও পরাক্রম এত ছিল যে উন্মত্ত দানবের অবতার বলে মনে হত।

এই পৃথ্বীরাজ (রাসোর ভাষায় প্রথিরাজ) যিনি

"সহস-কিরণ ঝলহল কমল রতি সমীপবর বিন্দ"

তার সুখ্যাতি শুনে রাজকন্যার সমস্ত অঙ্গে রোমাঞ্চের তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল।

চাঁদ কবির আদি রাজস্থানী হিন্দি মহাকাব্য পড়তে পড়তে আদি বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর ধ্বনি এসে মুরজমন্দ্রে কানে বাজতে লাগল—

সুনন স্রবন প্রথিরাজ জস উমংগ বাল বিধি অংগ।
তন মন চিত চহুঁয়ান পর বস্যো সুতরহ রংগ।

সংযুক্তার তনু, মন ও চিত্ত প্রেমতরঙ্গে চৌহানের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল। কিন্তু চৌহান কোথায়?

তিনি স্বয়ংবর-সভায় এলেন না। তাঁকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে রাজারা আসবেন তাঁদের জয়চাঁদকে রাজচক্রবর্তী বলে মেনে নিতে হবে। দিল্লির অধীশ্বর বাদশারা পরের যুগে নিজেদের জগদীশ্বর ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতকে তখনও দিল্লির সে সম্মান হয় নি। অবশ্য মহাভারতের সময় থেকেই ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চলের গুরুত্ব সবাই বুঝতে আরম্ভ করেছিল। যুধিষ্ঠিরও এ জন্যই এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু তখনও 'দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' একথা মানবার মতো অবস্থা হয় নি।

রাগ করে জয়চাদ পৃথ্বীরাজকে এই রাজসূয় যজ্ঞে একটা ছোট কাজের ভার দিলেন। কাজেই তিনি- আসেন কী করে? এদিকে জয়চাঁদ অনুপস্থিত রাজার একটা সোনার মূর্তি তৈরি করে সভার দরজায় দারোয়ানের জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের দরজা পাহারা দিচ্ছিলেন যে মহারাজা তাঁর সোনার মূর্তি পাহারা দিতে লাগল কনৌজের রাজার রাজসূয় যজ্ঞের সভার দরজায়।

রাজকন্যা কাকে দেবেন মালা?

কত স্বয়ংবর সভার কথাই না কাব্যে পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু বরণমালা পরাতে এসে দেখলেন, দেবতারা নলের ছদ্মবেশ ধারণ করে বসে আছেন। নিজের বুদ্ধি আর ভালোবাসার

জোরে তিনি আসল প্রেমিককে খুঁজে বের করলেন। দেবতাদের দল তাকে ঠকাতে পারল না। সীতা বা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে কোনও মারপ্যাঁচ ছিল না। কারণ যিনি ধনুর্ভঙ্গ করতে পারবেন তিনি সীতাকে পাবেন। যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন দ্রৌপদী তাঁকেই দেবেন বরণমালা। কিন্তু সীতা বা দ্রৌপদী কাকেও তো পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে চোখে না দেখা, এমন কি গরহাজির, প্রিয়কে বরণ করতে হয় নি?

অপেক্ষাকৃত একালের সাধারণ রক্তমাংসের মানবী সংযুক্তাকে সেই বড় কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হল। মন যাকে চায় তাকে পাওয়ার নেই কোনও উপায়। না আছেন তিনি উপস্থিত, না পারবেন তিনি উপস্থিত হতে—তাকেই বরণ করা হয়েছে এ খবর পেয়ে। এমন কি তিনি স্বয়ংবরা সংযুক্তাকে গ্রহণ করতে চাইবেন কি না তা পর্যন্ত জানা নেই। যদি বা চান, বিপদ ও শত্রুতা তো কম হবে না তাতে?

একালিনী তরুণীরা বাপ-মায়ের অবাঞ্ছিত জনের প্রেমে পড়ে সেকালের স্বয়ংবর প্রথার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে করেন যে, হায়, হঠাৎ যদি কোনও মন্ত্রবলে স্বয়ংবর, গন্ধর্ব বিয়ে, এসব সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রথাগুলি ফিরে আসত, তাহলে কত সমস্যাই না সহজে মিটে যেত। কিন্তু সে পথেও যে কত বাধা, সে কমলেও যে কত কণ্টক, তা একবার একালিনী প্রেমিকারা বিবেচনা করে দেখুন।

আর প্রেমিকদের দিকটাও ভুললে চলবে না। একালে আইন জিনিসটা অত্যন্ত বেদরদী। তাকে বাঁচিয়ে না চললে যে বিরহ যাপন করতে হবে সরকারি রামগিরিতে, সেকথা হামেশাই মনে করে পা টিপে টিপে প্রেমের পথে এগোতে হয়।

হলপ করে প্রত্যেক সুরসিকা পাঠিকা বলে দেবেন যে, এরকম অবস্থায় কোন একালিনী অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত প্রেমিকের গলায় মালা দেবার জন্য ব্যাকুল হলেও সাধারণত হাতে-কলমে নিজেকে ধরা দেবেন না। শেলি আর রবিঠাকুরের কবিতা পড়ে, মেট্রো নিউ এম্পায়ারের পর্দায় নিজের মনের ছবি দেখে সন্ধ্যার পর লেকের পাড়ে নির্জনে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে বাড়ি ফিরে কোনও মতে দু'মুঠো খেয়ে নেবেন। বড় জোর পাতে ইলিশ মাছের পাতুরিটা অনাদরে পড়ে থাকতে পারে।

কিন্তু রূপকথার নয়, ইতিহাসের সংযুক্তা খাঁটি রাজপুতানী। সভা-ভর্তি রাজাদের বিস্ময় ও রাজচক্রবর্তী বাপের বিদ্বেষ পুরোপুরি অবহেলা করে তিনি এগিয়ে চললেন। রাজসভার সব উপস্থিত রাজাকে বংশ, রূপ ও গুণ বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন কবি। সে সব কানে না তুলেই চললেন দুয়ারের দিকে। হয়তো পিতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো দুয়ারের কাছে গ্যালারিতে বসা উপরাজা ও সামন্ত রাজারা তাদেরই কারও কপালে, থুড়ি গলায়, মালা এসে পৌছাবে—এই আশায় মাথা হেলিয়ে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু রাজকন্যাকে কেউ বাধা দিতে এল না। মনেও হয়তো কারও হয় নি বাধা দেবার কথা—এমনই আকস্মিক ব্যাপার একটা হল।

দুয়ার পর্যন্ত এসে সংযুক্তা চৌসর অর্থাৎ জয়মালা দিলেন দারোয়ান ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা পৃথ্বীরাজের স্বর্ণমূর্তির গলায়। এক রামায়ণে সীতার স্বর্ণমূর্তি নিয়ে রামের যজ্ঞ করার কথা আছে। কিন্তু সেখানেও রাম ও সীতার পরস্পরে ছিল প্রেম, ছিল দাম্পত্য সম্বন্ধ, ছিল ধর্মের বন্ধন। কিন্তু সংযুক্তার বেলায় ছিল শুধু পূর্বরাগের বেহিসাবী বেপরোয়া প্রেম। সংসারে যার কোনও স্বীকার নেই।

কিন্তু হায়, হৃদয়ের বন্ধন যে সবচেয়ে বড় বন্ধন। মন্ত্র দিয়ে যার হয় না হিসাব, মন্ত্রণা দিয়ে হয় না যাচাই, অথবা আইন বা সমাজ দিয়ে কোনও বিচার।

সংযুক্তা বললেন,—দেশ, জাতি ও গুণের বিচারে যে রাজা বরণীয়, তাঁকে আমি এই বরণ করলাম। চৌহানরাজ সোমেশ্বর-পুত্র যার বরনাম, মনে মনে বিচার করে আমি তার গলায় গান্ধর্ব মতে জয়মালা দিলাম। তিনি আমায় গ্রহণ করুন।

জয়চাঁদ চটে-মটে লাল। কোনোরকমে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন,—বাছা, তুমি ভুল করেছ। আবার রাজাদের মধ্যে ঘুরে এসে নিজের বর বেছে নাও। প্রথমবার স্বয়ংবর ঠিক হয় নি।

আবার ফিরে সমস্ত রাজাদের সম্বোধন করে খুব পরিষ্কারভাবে রাজকন্যা বললেন,—"আপনারা সবাই বিচার করুন। বহু যশ বহু গুণে যিনি শ্রেষ্ঠ, জাতিতে যিনি উত্তম, দেশ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি যাঁর উৎকৃষ্ট; তাঁর পরম নাম আমি গ্রহণ করলাম। দেবতারা জেনে রাখুন। আমি আবার তাঁর পাশে যাচ্ছি। সবার সম্মুখে তাঁর প্রশস্ত কণ্ঠে আবার মালা দিচ্ছি।'

আপত্তি করে জয়চাঁদ হেঁকে বললেন,—"বৎসে, তোমার ঠিকমতো পতি বরণ করা হল না। আবার

তুমি রাজাদের মধ্যে ঘুরে এসে স্বামী বেছে নাও।"

তৃতীয়বার রাজকন্যা সেই স্বর্ণমূর্তির কাছেই ফিরে এলেন।

তৃতীয়বার কবির দল সব উপস্থিত রাজাদের বংশ আর গুণাগুণ একে একে ব্যাখ্যান করে যেতে লাগলেন।

সংযুক্তার এই বরণমালা পৃথ্বীরাজের গলায় দু'দু-বার দেওয়াকে রাজারা খুব হিংসার চোখে দেখেছিলেন। তবু তাঁরা মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন যে, রাজকন্যার হৃদয়ে পৃথ্বীরাজই খুব গভীর আসন পেয়েছেন। এ দিকে সমস্ত লোকের চোখের সামনে সংযুক্তা চৌহানের সুঠাম কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন বরণমালা আর এমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর স্বর্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন ইন্দ্রাণী শচী ইন্দ্রকে উৎকণ্ঠ হয়ে দেখছেন।

আর জয়চাঁদ? তিনি না বারণ করতে পারলেন, না মেয়ের হাত টেনে আটকাতে পারলেন। রাগে গর-গর করতে করতে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় মুখ নিচু করে অলক্ষিতে গিয়ে অন্তঃপুর মুখ লুকালেন। ঘোষণা করেছিলেন যে, কন্যা স্বয়ংবরা হবে। সে নিজে বর বেছে নিয়েছে পিতার শত্রুকে, রাজসূয় যজ্ঞসভার দ্বারপালকে। নিজের প্রতিজ্ঞায় রাজা বাঁধা হয়ে আছেন। বাধা দিতে পারেন না; প্রত্যাদেশ করাও সম্ভব নয়। ক্ষত্রিয়ধর্মে বাধবে। রাঠোর যে ক্ষত্রিয়কুলের চূড়া বলে দাবি করে।

শেষ পর্যন্ত তিনি গঙ্গার তীরে একটা বাড়িতে মেয়েকে নির্বাসনে পাঠালেন। এক হাজার দাসী তাঁকে ঘিরে পাহারা দিতে লাগল। রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে রইলেন।

সবাই জানে যে, এ সংসারে কিং এডোয়ার্ডরাই মিসেস সিম্পসনদের জন্য সমাজ, সম্পদ, রাজপাট ছেড়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড মাথায় তুলে নেন। আমানুল্লারাই রানির জন্য রাজত্ব ছেড়ে রাজগীতে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী হয়ে যান। কিন্তু একজন রাজকন্যা যে প্রেমের প্রতিদান পাবেন কি না তা না জেনেই যে কোনও রাজার রানি হওয়ার আশা ছেড়ে শুধু সম্পদ ত্যাগ নয়, স্বাধীনতা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে সংবাদ ইতিহাস মনে রাখলেও আমরা মনে রাখি না।

এদিকে পৃথ্বীরাজের কানে খবর পৌঁছানমাত্র তাঁর শিভ্যালরি বোধ জেগে উঠল। তিনি সব সামন্তদের ডাকিয়ে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। কনৌজে গিয়ে স্বয়ংবৃতা বধূকে উদ্ধার করে আনা উচিত হবে কি হবে না, সে বিচার করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ বোধ করলেন একটা ব্যথা। একটা এমন ব্যথা তিনি আগে টের পান নি। এক সাহসিনী তরুণীর নীরব প্রীতি ঘন বনের অন্ধকারে একটি হঠাৎ পাওয়া গোলাপের সুরভি আর সৌন্দর্য মনের মধ্যে অনুভব করলেন—

> লগ্গি বান অনুরাগ উর
> মন্মথ প্রেরি বসন্ত।
> সহৈ নৃপতি অম্মৈ ন কছু
> খেদে রিদয় অসন্ত॥

খেদে অর্থাৎ প্রেম-বেদনায় হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠল; কামদেবের পাঠানো বসন্তের বাণ অনুরাগ ফুটিয়ে দিল তাতে।

কিন্তু অভিন্নহৃদয় কবি চাঁদ এসে বাধা দিলেন। বললেন যে, এতে মহা অশুভ হবে। রাজা তবুও কনৌজে যেতে চাইলেন। কিন্তু সামন্তরা সবাই এই বিবাদের মধ্যে যাওয়ার বিপক্ষে মত দিয়ে সভা ভঙ্গ করে চলে গেলেন। তারপর রাজা শিকারে গেলেন, শিবমন্দিরে গেলেন, অন্য দিকে মন ফেরাবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়! হৃদয় যে মানে না।

শেষ পর্যন্ত রাজা যখন আবার কবিকে নিজের ইচ্ছা জানালেন তখন কবি বললেন যে, গেলে ছদ্মবেশেই যাওয়া উচিত হবে। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বীর। তিনি কি যাবেন চোরের মতো? না, বীরের মতো? বরণ করে রেখেছেন তাঁকে যে বন্দিনী বধূ, তাঁকে উদ্ধার করে আনতে কি চোরের মতো যাওয়া যায়? তিনি চুপ করে রইলেন।

সামন্তরাও তাঁকে বারণ করলেন। দিনের পর দিন যায়। যাকেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সেই মানা করে।

এদিকে রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে আছেন।

এক বছর পরে আবার বসন্ত ফিরে এল। রাজা আবার কনৌজ যাবার কথা তুললে এবার নূতন

রাজমন্ত্রী বললেন যে, ছদ্মবেশে নয়, সময়োচিত বীরবেশেই রাজার কনৌজ যাওয়া ঠিক হবে। এমন ভাবে যেতে হবে যেন সমস্ত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থল লণ্ডভণ্ড করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হয়। একজন অমাত্য অবশ্য বাধা দিয়ে বললেন যে এটা ঠিক হবে না, কারণ, আঘাত হানবার জন্য শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিকটেই আছে।

চৈত্র মাসে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে কনৌজের দিকে চললেন।

কনৌজের কাছে এসে তিনি সৈন্যদের পিছনে রেখে শুধু চাঁদ কবিকে সঙ্গে নিয়ে ধনী বিদেশী যুবকের বেশে শহরে পৌঁছালেন। যেখানে সংযুক্তা নজরবন্দী ছিলেন, সেখানে গিয়ে আত্মপরিচয় দিবার আগেই কিন্তু কনৌজের সৈন্যদের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের তুমুল লড়াই হল।

এদিকে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে জানালা থেকে দেখতে পেলেন। তাঁরও রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল।

সুনি সুন্দরী বর বজ্‌জন চল্লী।
খিন অলপহ তলয়হ মুখ ঝল্লী॥
দেখি রঞ্জি সংযোগী সু ভল্লী।
ফুলি বাহ মুখ কুমুদহ কল্লী॥

দু'জনেই আকুল অবশ-চিত্ত হয়ে গেলেন।

রাজকন্যা জানালা থেকে সরে এসে ছবির ঘরে গিয়ে নিচে দাঁড়ানো ছদ্মবেশীর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের ছবি মিলিয়ে নিঃসন্দেহে হলেন যে এই সেই—সেই অদেখা অপরিচিত বর যার মূর্তির গলায় তিনি মালা দিয়েছেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখপদ্মের শোভা অপরূপ হয়ে ফুটে উঠল—

হিয় কম্প বিকম্প বিপত্থ পথং। মনু মত্ত বিরাজত কামরথং॥
কল কম্পিত কম্প কপোল সুভং। অলকাবলি পানি উচন্ত উচং॥

লজ্জায় পুলকে অরুণবর্ণা রাজকন্যা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে দাসীকে দিয়ে এই বিদেশীকে আরও যাচাই করে নিলেন। তারপর তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যে এখনই 'গাঁঠ বন্ধন" অর্থাৎ শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে যাক।

সখীরা ভাবল যে, যাদের মধ্যে আগে থেকেই মন বিনিময়, এমন কি প্রকাশ্যে স্বয়ংবর হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে নূতন করে বিয়ের আর প্রয়োজন কী?

তবু ক্ষত্রিয় আচারে দু'জনে গান্ধর্ব মতে বিয়ে হল। বিয়ের পর রাজা রাজকন্যাকে বললেন, তবে এবার দিল্লি চল। সে প্রস্তাবে ক্ষণমাত্র রাজকন্যার দ্বিধা হল। সেই দ্বিধা যা প্রত্যেক কুমারীর প্রথম বিয়ের পর স্বামীর ঘরে যাবার আগে হয়। বনবালিকা, আশ্রমপালিতা শকুন্তলার পর্যন্ত স্বামীর উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে এই দ্বিধা হয়েছিল। মন যেতে চায়, তবু চরণ চলতে চায় না।

এদিকে ভোরবেলা পৃথ্বীরাজের দলের লোকরা এসে খবর দিল যে আর দেরি করলে চলবে না; এখনই সৈন্যদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হবে। না হলে সমূহ বিপদ। পৃথ্বীরাজকে রওনা হতে দেখে সংযুক্তার খুব কষ্ট হল। কিন্তু উপায় কী? বিবাহরাত্রির পরই যে আসে কালরাত্রি।

সুখ এঁদের দুজনের জীবনে খুব অল্প সময়ের জন্যই এসেছিল। দিল্লি ফিরে গিয়ে সাহাবুদ্দিন ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে যাবার আগে পর্যন্ত অল্প সময়টুকু এরা যা সুখ ও শান্তিতে সময় কাটাতে পেরেছিলেন, তা চিরকাল নবদম্পতীদের স্বপ্ন হয়ে থাকবে। কবি চাঁদ বলেন যে, সংযুক্তা যেন সমুদ্র আর পৃথ্বীরাজ যেন হংস হয়ে সুখের সপ্তম স্বর্গে বিরাজ করেছিলেন।

এদিকে জয়চাঁদের সৈন্যদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ হল। রাত্রিতে চাঁদ কবি যেখানে ছিলেন, সেখানে দুজনে এসে পরদিন ভোরে দিল্লি যাবার জন্য তৈরি হলেন।

কিন্তু রাজা কি বীরত্বের কীর্তিতে মুগ্ধা স্বয়ংবৃতা বধূকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবেন চোরের মত?

ইংরেজিতে বলে "নন বাট দি ব্রেভ ডিজারভস দি ফেয়ার"। বীর ছাড়া কেহ বর নারী লাভের যোগ্য নয়।

তাই যাত্রার সময় পৃথ্বীরাজ কবি চাঁদকে জয়চাঁদের কাছে পাঠালেন। বলে পাঠালেন যে, এবার আমি তোমার কন্যাকে বিয়ে করেছি আর দিল্লি নিয়ে যাচ্ছি।

চাঁদ বাধা দিলেন। বললেন—আশা তোমার পূর্ণ হয়েছে ঘরে ফিরে চল। শত্রুতা বাড়িয়ে কী হবে?

কিন্তু রাজপুত রাজনীতি বুঝে না।

পৃথ্বীরাজ জোর করে চাঁদ কবিকে পাঠালেন জয়চাঁদের কাছে। বলে পাঠালেন,—আমি চোর নই। সিংহের গহ্বর থেকে সিংহের কন্যাকে নিয়ে চললাম, এই জানিয়ে যাচ্ছি। যার সাহস ও শক্তি থাকে, আমায় বাধা দিতে পার।

কবি এসে জয়চাঁদের সভায় নিবেদন করলে,—দিল্লিশ্বরী মহারানি সংযুক্তা আপন স্বামীর সঙ্গে নিজের ঘরে যাচ্ছেন এবং আপন পিতার আশীর্বাদের অপেক্ষা করছেন।

আর যায় কোথায়? নিজের মেয়ের স্বয়ংবরে রাজার মনে ব্যথার সীমা ছিল না। তবু সেটাকে অল্পবয়সী মেয়ের ছেলেমানুষী বলে কোনও রকমে সহ্য করা যেত। আর এ যে ব্যথার উপর অপমান! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। রেগে রাজা সব সৈন্য-সামন্তদের হুকুম দিলেন, যে যেমন করে পার পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তাকে জীবন্ত ধরে আনো। জীবন্তে ওদের আনা চাই।

সংযুক্তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পৃথ্বীরাজ বায়ুবেগে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কনৌজ থেকে দিল্লির পথে ঘোর যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে খুব বড় অংশ নিল জয়চাঁদের মুসলমান সৈন্যরা।

মুসলমান? হ্যাঁ। মুসলমান সৈন্য ও মুসলমান মীর অর্থাৎ আমীররা।

মত্ত মীর জম সম সরীর।
জই রুক্যৌ নৃপ অগ্‌গা॥

তারা পৃথ্বীরাজকে ঘিরে ফেলল; মহা যুদ্ধ হল তাদের সঙ্গে।

রাজ রুক্‌খে অরী।
সিংহ রোহং পরী॥
খজরং খোলিয়ং।
বীর সা বোলিয়ং॥

শাহাবুদ্দিন ঘোরীর দিল্লি বিজয়ের অনেক আগে থেকেই হিন্দু রাজারা তাতার সৈন্য ও সেনাপতি নিজেদের দলে মাইনে করে রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। তারা নিজেদের ও বিদেশী স্বধর্মীদের সুবিধা হবে বলে হিন্দু রাজাদের মধ্যে ঝগড়া জিইয়ে রাখতে সহায়তা করত। তাদেরই সুবিধা নিয়ে বার বার মুসলমান আক্রমণকারীরা হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে ও লুঠপাট করতে সাহস পেত। কিন্তু জেগে যারা ঘুমোত তাদের চোখ কখনও খোলে নি।

পৃথ্বীরাজ আর সংযুক্তা বিজয়ীর বেশে দিল্লি ফিরে এলেন।

চাঁদ কবি এখানে আরও একটি কাহিনি লিখেছেন, যার উল্লেখ অন্য কোনও বইয়ে নেই। কিন্তু রাজপুত চরিত্রের একটা বড় গুণ শরণাগত রক্ষার একটা সুন্দর উদাহরণ হিসাবে সে কাহিনিটির দাম আছে। শাহাবুদ্দিন ঘোরী নিজের এক পাঠান সর্দারের প্রেমিকার প্রতি মুগ্ধ হলেন। বিপদ বুঝতে পেরে সর্দার প্রেমিকাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজের আশ্রয়ে পালিয়ে এল। ঘোরী তাদের ফিরিয়ে দিবার জন্য দাবি করলেও যারা তাঁর কাছে শরণ নিয়েছে তাদের পৃথ্বীরাজ বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। ফলে ঘোরী কয়েকবার হিন্দুস্থান আক্রমণ করলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই পৃথ্বীরাজ তাকে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। ঘোরীর মনে পরাজয়ের অপমানের সঙ্গে প্রেমিকাকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা মিশে রইল।

গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে যে, শাহাবুদ্দিন ঘোরী ছয় বারের বার ভারত আক্রমণের সময় যুদ্ধে জেতেন। তার আগে প্রায় প্রত্যেক বারই তিনি হেরে যান এবং দিল্লির হিন্দুরাজা দু'বার তাঁকে বন্দী করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দু'বারই রায় পিথৌরা রাজপুতের চরিত্রগত উদ্ধত বীরধর্মের অহঙ্কারে তাকে মুক্ত করে দেন।

১১৯১ খ্রিস্টাব্দে ঘোরীর শেষ বার পরাজয়ের বর্ণনা প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবাকত-ই-নাসিরি'-তে খুব ভালো করে দেওয়া আছে। পৃথ্বীরাজের একজন সেনাপতি গোবিন্দ রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঘোরী রায়ের মুখে বর্শা ঢুকিয়ে দেন আর তার দুটো দাঁত ফেলে দেন। এদিকে রায়ের তরোয়ালের আঘাতে ঘোরীর হাতে এমন অসহ্য চোট লাগে যে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। নিরুৎসাহ হয়ে মুসলমান সৈন্যরা সবাই পালিয়ে যায় আর ভাঙা ভাঙা বর্শা দিয়ে খাটিয়া বানিয়ে তার উপর ঘোরীকে

শুইয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচায়।

পরের বছরই ঘোরী আবার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর এক লক্ষ কুড়ি হাজার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে জম্মু আর কনৌজের হিন্দুরাও যোগ দিল। (প্রমাণ—'তবাকত-ই-নাসিরি' ও 'আকবর-নামা')। শুধু তাই নয়। পৃথ্বীরাজের নিজের একজন বড় সামন্তও সুলতানের দলে এসে ভিড়ল।

পৃথ্বীরাজের দলে যোগ দিলেন চিতোরের রানা (তখন নাম ছিল রাওল) সমর সিংহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মেবারী বংশ মুসলমানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গেছে। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি সমরসিং (সমর সিংহ) সত্য সত্যই একজন রাজর্ষি ছিলেন। মহাদেবের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। সমস্ত রাজসিক ঐশ্বর্য ছেড়ে ভোগবিলাস ছেড়ে স্থির বুদ্ধি ও অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব নিয়ে রাজ্য চালাতেন। শুধু পদ্মবীজের মালা তাঁর গলায় শোভা পেত। মাথায় ছিল শিবের মতো জটা আর সবাই তাঁকে যোগীন্দ্র বলে ডাকত। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একসঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে বহুসম্পদ তিনি নিজের প্রাপ্য হিসাবে পেতে পারতেন। কিন্তু সে সবই তিনি সৈন্যদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

পবিত্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে তাবাইন (= নারায়াণ=তিরৌরি) গ্রামে তিনদিন ধরে যুদ্ধ হল। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উত্তরা যেমনভাবে অভিমন্যুকে রণসাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন, এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও সংযুক্তা তেমনি করে বীর পতিকে সাজিয়ে দিলেন। যে হাত দুটি দিয়ে পিতার শত্রুতা উপেক্ষা করে স্বর্ণপ্রতিমাতে মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সোনার বরণ করকমল দিয়ে শত্রুকে মারবার জন্য স্বামীর কোমরে তরোয়াল বেঁধে দিলেন। এই বলে বিদায় দিলেন যে, তুমি চৌহানসূর্য, তুমি এ জীবনে যশ আর সুখ দুই-ই যেমনভাবে পেয়ালা ভরে পান করেছ, তেমন আর কেহ করে নি।

গীতার কথা মনে করিয়ে স্বামীকে সংযুক্তা বললেন, জীবন হচ্ছে একটি পুরানো কাপড়। এখন যদি তাকে ফেলেই যেতে হয়, তাতে ক্ষতি কী? বীরের মতো মৃত্যুই হচ্ছে অমরতা।

বলতে বলতে সংযুক্তার হাত স্বামীর কোমরবন্ধ থেকে অজান্তে সরে গেল। তার গণ্ডারের চামড়ার বর্ণের আঙটাগুলিকে চাঁপার ফুলের মতো অঙ্গুলিগুলি আর খুঁজে পেল না। চাঁদের ভাষায়—ক্ষুধার্ত ভিখারি যেমন করে হঠাৎ একটা মোহর পেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনভাবে সংযুক্তার আঁখিতারা দুটি চৌহানের মুখচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষে অপলকে।

এ দিকে যুদ্ধভেরী বেজে উঠেছে ঘোর গর্জনে। এ কি শুধু যুদ্ধের, না মৃত্যুরও আহ্বান? সংযুক্তার বুঝতে ভুল হল না এ বাজনা কিসের আবাহন!

পৃথ্বীরাজ চলে গেলেন। সৈন্যদের সবার সামনে গিয়ে হাতিতে চড়ে এগিয়ে গেলেন। সামসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামি তাজুল মাসির বইতে লিখে গেছেন যে, "কাকের মতো মুখ নিয়ে হিন্দুরা হাতির পিঠে চড়ে সাদা জয়ঢাক (অথবা শঙ্খ?) বাজাতে লাগল; যেন নীল পাহাড়ের মুখ থেকে খর বেগে আলকাতরার নদী বয়ে যাচ্ছে।"*

যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন হিন্দু সেনাপতি বাঙালি বীর উদয়রাজ।

পৃথ্বীরাজ অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। চাঁদের ভাষায়—

বজ্রপাত নিরঘাত। ধরনি কৈ অম্বর তুট্টিয়।
দরিয়া দধি কিয় মথন। মন্ধি গিররাজ আহুট্টিয়॥

প্রাচীন বাংলা কবিতার ভাষা মনে রাখলে অর্থ বুঝতে কষ্ট হবে না।

উট্টিরাজ পৃথ্বীরাজ বাগ মনৌ লজ্জ বীর নট।
কড়ত তেগ মন বেগ লগত মনৌ বীজু ঝট্ট ঘট॥
থাকি রহে সুর কৌতিগ গগন রগন মগন ভই শোন ধর।
হ্রদি হরষি বীর জগুলে হুলসি হুরেউ রংগ নবরও বর॥

পৃথ্বীরাজ ঘোড়ায় উঠে এমনভাবে লাগাম নিয়ে ঘোড়া চালালেন যেন কোনও বীর অভিনয় করছে। মানসের মতো বেগে স্বচ্ছন্দে তরোয়াল খুলে চালাতে লাগলেন; যেন মেঘঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই কৌতুক দেখে আকাশে সূর্য থেমে গেল। রক্তে পৃথিবী লাল হয়ে গেল। বীরদের হৃদয় আনন্দিত ও উৎসাহিত

*কবি আমীর খুসরোও এক জায়গায় ভারতীয়দের কা কা ডাক দেওয়া কাকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

হয়ে উঠল আর তাজা রক্তের রঙ তাদের সঙ্গে স্ফুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু ঘোরীর সঙ্গে ছিল "নলগোলা" (চাঁদের ভাষায়) অর্থাৎ বন্দুক। কাজেই যুদ্ধের ফলাফল অনেকটা ওতেই স্থির হয়ে গেল।

এদিকে পৃথ্বীরাজ বিদায় নেবার পরই সংযুক্তার শুকনো চোখে গড়িয়ে এল এক ফোঁটা জল। মনে মনে তিনি বললেন, আমি সূর্যলোকে আবার তার দেখা পাব; কিন্তু যোগিনীপুরে (দিল্লিতে) আর নয়। প্রতিজ্ঞা করলেন যে স্বামীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত শুধু জল খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে স্বামীর পরাজয়, বন্দিদশা ও হত্যার খবর পেয়ে তিনি চিতার আগুনে আত্মদান করলেন।

এ সংসারে শুধু খারাপ ভবিষ্যৎবাণীগুলিই সম্ভবত সত্য হয়। ভালোগুলি কেমন যেন ফলতে চায় না। যোগিনীপুরে রাজকন্যার রাজপুত্রের সঙ্গে কখনও আর দেখা তো হল না। কিন্তু সূর্যলোক হয়েছে কি?

হাসান নিজামি বলেন যে, যুদ্ধজয়ের পর ঘোরী আজমীঢ় দখল করে মূর্তিপূজার মন্দির ও ভিত্তিগুলি ভেঙে ফেলে সেখানে মসজিদ ও মক্তব বসান। আজমীঢ়ের রায়কে প্রথমে শুধু বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তার শত্রুভাব কমে নি দেখে পৃথ্বীরাজের হত্যার হুকুম দেওয়া হয়। "সেই পরিত্যক্ত হতভাগ্যের দেহ থেকে মাথা হীরের মতো তরোয়াল দিয়ে খসিয়ে ফেলা হল।" মিনহাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পৃথ্বীরাজকে "নরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল।"

চাঁদ কবি কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের "লঙ্গোটিয়া মিত্র" অর্থাৎ জন্মকাল থেকে বন্ধু। তাঁর বন্দিদশা কবির সহ্য হল না। চোখের সামনে দেখলেন সংযুক্তার জহরব্রত, আজমীঢ়ের পতন ও আরও বহু অসহায় অত্যাচার। তাই তিনি পৃথ্বীরাজকে অনুসরণ করে গজনী পর্যন্ত গেলেন। সেখানে ঘোরীকে সন্তুষ্ট করে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা করলেন ও তাঁকে দিয়ে শব্দভেদী বাণ ছুঁড়িয়ে ঘোরীকে মারালেন। পরে কাটারি দিয়ে পরস্পরকে হত্যা করে শত্রুর হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন।

এই অংশটুকু ঐতিহাসিক না হতে পারে, কারণ চাঁদ কবি তো নিজে হিন্দুস্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘটনা লেখেন নি। কিন্তু কাব্যের দৃষ্টিতে এমনই একটা পরিণতি স্বাভাবিক হত।

সাংসারিক সত্যই তো একমাত্র সত্য নয়। তার বাইরে ও উপরে অনেক সত্য। অনেক সত্যের চেয়ে বড় তথ্য বিরাজ করে। সমস্ত জীবনের অমৃত সরস হয়ে ওঠে। সেই সত্যই আজমীঢ়ের রায় পিথৌরার জীবনে এনে দিয়েছিলেন সংযুক্তা। সেই সত্যই তিনি মরণকে দিয়ে গিয়েছেন জীবনমাধুরী দিয়ে ভরিয়ে।

তাই ইতিহাসের নিষ্ঠুর আলোতেও ঝলমল করে শোভা পাচ্ছেন এই রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা।

পাঁচ

পুরানো প্রেমের কবিতার পাতা ওলটাচ্ছিলাম। দেবলা দেবীর অমর প্রেমের বুকফাটা কাহিনি। তিনি ছিলেন গুর্জর রাজপুত বংশের পরম রূপসী রাজকন্যা।

সুলতান আলাউদ্দিনের বড়ছেলে খিজর খানের প্রতি তাঁর প্রেম আর তার প্রতিদান নিয়ে অমরকাব্য 'ইশকিয়া' রচনা করেছিলেন আমীর খুসরো। শাহজাদা দেবল রানির প্রতি তাঁর প্রেম সম্বন্ধে একটি কাব্য লিখতে খুসরোকে অনুরোধ করেন। যুবরাজ হৃদয়ের আবেগ নিজেই ভালো করে লিখে রেখেছিলেন। কবি খুসরো সেটিকে কাব্য-ছন্দে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

শাহজাদার আত্মপ্রেম কাহিনি পড়তে পড়তে কবি দেখলেন যে তাঁর মধ্যে বেশিরভাগ শব্দই হচ্ছে হিন্দি। হিন্দির তখন শৈশব চলছে। তবু কবি স্বীকার করলেন যে একটু ভেবে চিন্তে বিচার করলে দেখা যাবে যে হিন্দি ভাষা ফারসির চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ফারসিতে শব্দের ঐশ্বর্য খুব বেশি ছিল না। আরবি যথেষ্ট পরিমাণে না মেশালে চলত না। কিন্তু কবির মতে হিন্দি আরবির মতই পুষ্ট ভাষা ছিল। এর নিজের ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতি সবই ছিল। তিনি লিখেছেন যে, হিন্দির এই গুণ-গানে তার নিজের ভাই বেরাদররা আপত্তি করবে। কিন্তু, সেজন্য তিনি সত্যি কথা স্বীকার করতে পেছপা হন নি। কবির মতে যে গঙ্গা আর হিন্দুস্থান দেখে নি, সে-ই নীল আর তাইগ্রিস নদী নিয়ে অহঙ্কার করবে। "যে বাগানে শুধু চীনের পাপিয়া দেখেছে সে কী করে জানবে হিন্দুস্থানের বুলবুল কী?...যে খোরাসানী প্রত্যেক হিন্দুকেই বোকা মনে করে সে পানকেও ঘাসের চেয়ে বেশি দাম দেবে না। ...এবং যদি কেহ পক্ষপাতী হয়ে কথা বলতে চায় সে নিশ্চয়ই আমার (হিন্দুস্থানের)

আমকে (বিদেশী) ডুমুরের নিচে স্থান দেবে। ...তোমাদের হিন্দুস্থানকে স্বর্গস্থান হিসাবে দেখা উচিত।"

হিন্দিতে প্রাণ এনে দিল এক হিন্দু রাজকন্যার প্রেম আর মুসলমান কবির কলম। আমীর খুসরো হিন্দিতেও কবিতা লিখতেন। আর হিন্দি ও ফারসি মিশিয়ে যে নতুন উর্দু ভাষা তৈরি হচ্ছিল তার গোড়াপত্তন করে গিয়েছিলেন। জানতেন একদিন এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই এ ভাষা চল হবে, আর কাজ চালাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীতে খুব কম কবিই খুসরোর মতো এত বেশি কবিতা লিখে গিয়েছেন। কাব্যপ্রতিভার জন্য তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছিল বুলবুল-ই হিন্দ। তাঁর মতো কবির লেখনী নতুন গড়ে উঠা হিন্দির ঐশ্বর্য যে কত বাড়িয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

খুসরো তাঁর নতুন ভাষাতে যে সহজ সরল ঢঙ এনে দিলেন, তার ফলে হিন্দি সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার, রূপক, সমাস এসবের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। মনের কথা মুখের সহজ ভাষায় প্রকাশ পেল। হিয়া ভরা দরদ দিয়ে তিনি লিখলেন,—

সখী, পিয়াকো জো মৈ ন দেখুঁ
তো কৈসে কাটু অঁধেরী রতিয়াঁ।

যেন রাজেন্দ্রনন্দিনী শ্রীরাধার বিরহ আমাদের গাঁয়ের কোণের পল্লীবালার মধ্যে রূপ পেয়ে গেল।

এমনই সহজ সরল আবেগে খুসরো লিখলেন—

গোরী সোয়ে সেজ পর, মুখ পর ডরে কেস
চল খুসরো ঘর আপনে, রৈন ভই চহুঁ দেস।

আলাউদ্দিনের বিজয়বাহিনী তখন অক্টোপাসের বাহুর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ জয়ের নেশার সঙ্গে মিশেছে ধনরত্ন লুটের লোভ। তার আগের সুলতান একবার এমন লুটের সামগ্রী পেয়েছিলেন যে তার সৈন্যরা সে ধনরত্নের বোঝার ভারে দিনে এক মাইলের বেশি চলতে পারে নি। দক্ষিণ দেশে মাত্র একটা রাজ্য জয় করেই আলাউদ্দিন এত ঐশ্বর্য পেলেন যে তা একটা পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী ছিল। কবি প্রার্থনা করলেন যেন এই ভাগ্যবান রাজা "দিল্লিতে বসে থেকেই শুধু চোখের ভুরুর নাচনেই মালাবার দেশ ও সমুদ্রগুলি লুট করতে পারেন।"

মসনদ পাবার অল্প কিছু দিন পরেই আলাউদ্দিন গুজরাট আর সোমনাথ জয় করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। রাজা কর্ণরায়ের সমস্ত মণিমাণিক্য, স্ত্রী-পরিবার শত্রুর হাতে ধরা পড়ল। সে সবই সুলতানের কাছে ভেট হিসাবে এল। তার মধ্যে ছিলেন কমলা দেবী। রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন তাঁকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিলেন। কমলা দেবীর দুই মেয়ে ছিল। দুটিই কর্ণরায়ের সঙ্গে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বড়টি রাস্তায় মারা যায়, আর ছোটটি, দেবলা দেবী, বাপের সঙ্গেই পালিয়ে বেঁচে রইলেন।

এদিকে মাতৃস্নেহে অন্ধ কমলা দেবী মেয়েকে ছাড়া বাঁচা শক্ত মনে করলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে ধরলেন যে মেয়েকে তাঁর কাছে এনে দিতে হবে। আলাউদ্দিন তখন একেবারে কমলা দেবীর হাতের মুঠোয়। তার উপর এমন একটা প্রস্তাবে কোন্ পাঠানের মন নেচে না উঠবে?

আবার সাজল বিরাট সৈন্যদল। ভয় পেয়ে কর্ণরায় গুজরাট ছেড়ে মেয়ে ও সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় চাইতে গেলেন দেওগিরের (দেবগিরি, দৌলতাবাদ) রায়-রায়ান রামদেবের কাছে। রায়-রায়ান দেবলা দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজপুত রাজার কাছে এমন প্রস্তাব নূতন নয়। তিনি রাজি হলেন, কিন্তু রাজকন্যা নিরাপদ আশ্রয় পাবার আগেই পাঠান সেনা এসে হানা দিল। একটা তীরের ঘায়ে দেবলা দেবীর ঘোড়া গেল খোঁড়া হয়ে। তিনি ধরা পড়ে দিল্লিতে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেলেন।

এদিকে শাহজাদা খিজর খানের বয়স হল দশ। ফুটফুটে বালককে দেখতে একেবারে ঠিক দেবলা দেবীর ভাইয়ের মতো। সুলতান চাইলেন দুজনের বিয়ে দিতে। কমলা দেবীরও আপত্তি ছিল না, কারণ খিজর খানের দিকে তাঁর খুব টান হয়ে গিয়েছিল। দুটি বালকবালিকা একসঙ্গে হেসে খেলে বাড়তে বাড়তে পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলল। কবি লিখলেন : —

দো গুল বন্ দরেহ্ কে গুলসন শকরকন্দ।
ববূয়ে ইয়ক দীগর অজ দুরই খুরসন্দ॥
দো শামা শকর অফসান-ই-শাবে আফরোজ।
জে সোজে ইয়ক দীগর উফতাদেহ্ দর সোজ॥

দো বেদিল রুবারু আওয়ার্দা মুশ্‌তাক।
নজরহা জুফৎওয়া দুলহা জুফৎ ওয়ে তান্‌তাক॥

"দুটি গোলাপের ঝাড় বাগানে সুখে বিকসিত হল, তারা পরস্পরের সুরভিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করে খুশিতে ভরে গেল। দুটি বাতি রাতে চাঁদোয়ার তলায় জ্বলে উঠল, তারা পরস্পরের জ্বলে ওঠা আলো নিল। দুজন প্রেমিক প্রেমিকা যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসুক ছিল তারা শেষ পর্যন্ত মিলে গেল। যদিও তাদের চোখ আর অন্তর আলাদা ছিল, দুটি দেহ এক হয়ে গেল।"

কিন্তু হায়, প্রেমের পথ এত মসৃণ নয়।

খিজর খানের মার এই বিয়েতে মত হল না। তিনি চান তাঁর ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয়। ভাই আলপ খানেরও তাড়াতাড়ি এই শুভকর্ম সারার ইচ্ছা। কারণ শুধু যে তুর্কীর সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে বন্ধ হবে তা নয়, খিজর খানেরই যে পরে সুলতান হবার কথা।

অতএব রাজনীতি এসে প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে আলাদা করে দেওয়া হল। আলাদা জায়গায় তাদের থাকতে হবে। তবুও তাঁরা লুকিয়ে দেখা শোনা করতে লাগলেন, আর চারজন করে সখা-সখী তাঁদের গোপন প্রণয়বার্তা নিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল। যে প্রেম মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, তা ডালপালা মেলে চারার রূপ নিয়ে ফুঁড়ে বের হল।

সুলতানা এবার ঠিক করলেন যে দেবলাকে খিজরের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক করা হল যে লালপ্রাসাদে সুলতানের নিজের হারেমে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সে খবর পেয়ে খিজর খান পাগলের মতো হয়ে গেলেন। নিজের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেললেন, দুঃখ সহ্য করবার শক্তি রইল না। শেষ পর্যন্ত ছেলে পাগল হয়ে যাবে এই ভয়ে সুলতানা তাঁর মতলব বদলালেন। আস্তে আস্তে রাজপুত্র প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন, আর একদিন গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করলেন। ভাবের আবেগে সেদিন তাঁরা শুধু আত্মহারা নয়—জ্ঞানহারাও হয়ে গেলেন। বাজপাখির মতো দৃষ্টি থাকে তুর্কী নারীর। সুলতানার নজর এড়াল না।

আবার হুকুম হল লালপ্রাসাদের হারেমে যেতে হবে দেবলাকে। এবার যেতে হবেই। কোনও ওজর আপত্তিতে ফল হবে না। যাবার পথে একবার ক্ষণেকের তরে দুজনের দেখা হল। রাজপুত্র রাজকন্যাকে দিলেন নিজের চুলের একটি গোছা স্মরণচিহ্ন হিসাবে, আর পেলেন রাজকন্যার চাঁপা ফুলের মতো আঙুলের আঙটি।

মনে রেখো, রেখো মনে।

সংসারে এর চেয়ে বড় করুণ মিনতি আর কিছু নেই।

হায় রাজপুত্রদের এ সংসারে নিজের মনের মতো বিয়ে করার কোনও স্বাধীনতাই নেই। রাজতক্তে বসে বা বসবার ইচ্ছা থাকলে হৃদয়ের হিসাব কষা চলবে না। সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের খিজর খান—মায় এই শতকের অষ্টম এডোয়ার্ড পর্যন্ত।

মামা আলপ খানের মেয়ের সঙ্গে খিজর খানের বিয়ে হয়ে গেল। সে যুগের শাহজাদাদের বিয়ের উৎসবে তামাসার সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। বিজয়তোরণ তো তৈরি হলই। সে তো মামুলি ব্যাপার। নাচ, গান, দেওয়ালী, ভানুমতীর খেল—সে যা হল তার তুলনা নেই। মায় দড়ি দাঁড় করিয়ে তার উপর নাচা পর্যন্ত। সেই রোপ-ওয়াকিং যা এখন একবার দেখাতে পারলে এই আজকের মায়াহীন বিজ্ঞানের জগতেও গোটা আমেরিকাতে গোড়ালীর উপর ভর করে দাঁড় করিয়ে ফেলা সম্ভব হত। "যাদুকর জলের মতো একটা তরোয়ালকে গিলে ফেললে—যেন খুব তেষ্টা পেয়ে একজন শরবত খেয়ে ফেলছে। সে নাকের ভেতর দিয়ে একটা ছোরা বিঁধিয়ে দিল। ছোট ছোট কাঠের ছোট শরীরের ভিতর থেকে বড় বড় শরীর বের হতে লাগল। একটা জানালার ভিতর দিয়ে একটা হাতিকে, আর একটা ছুঁচের ভিতর থেকে একটা উটকে বের করা হল। বহুরূপীরা অনেকরকম ঠগবাজি দেখাল। কখনও দেবদূত, কখনও রাক্ষসের চেহারা তারা ধারণ করল। .. তারা এমন মন গলানো গান ধরল যে মনে হল যে কোনও মানুষ মারা যাচ্ছে। আর তার খানিক পরে আবার বেঁচে উঠল।"

এমনই জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে তো শাহজাদার বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে দেবলার দিন কাটে কী করে?

তিনি অনেক অনুযোগ করে চিঠি লিখলেন, কিন্তু যা উত্তর পেলেন তাকে অসহায়ের অজুহাত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? দুজনেই দুঃখে ব্যাকুল হয়ে অসহায়ের সহায় সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুলতানার মন গলল। মুসলমান শাস্ত্রে চারটি স্ত্রী রাখা যায় এটা তাঁকে বোঝানো হল। তিনি দেবলার সঙ্গে খিজরের বিয়েতে রাজি হলেন। আর আলাউদ্দিন তো আগেই মত দিয়ে রেখেছিলেন। লালপ্রাসাদ থেকে আনিয়ে দেবলার বিয়ে দেওয়া হল। এবার এত আনন্দ হল যে কবি লিখলেন—

সুলতানা সুখী অতি হরষে
ধমনীতে বেগে খুন নাচে
পরনে গহনা সম সরমে
হিয়া যেন চুনী সেজে আছে।
দুটি আঁখি হরষেতে ভরি
চকমকি ফুটে উঠে সুখে,
দুটি কানে মুকুতা লহরী
হেসে ওঠে যেন টুকটুকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। এই দুই নিরীহ দম্পতির প্রেমেও ছিল কারও অভিশাপ। এত ভালোবাসা ও বিরহ সহ্য করার পর মিলন হল, কিন্তু সুখ হল না।

সীমাহীন শারীরিক অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে আলাউদ্দিনের স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, আর মানসিক শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। তাঁর পেয়ারের ক্রীতদাস মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। খিজর খান বাপের সেরে ওঠার জন্য মানত করে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাচ্ছিলেন—! এমন সময় সুলতান একটু সেরে উঠলেন আর শাহজাদারও পায়ে পড়ল ফোস্কা। অনুচররা তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘোড়ায় চড়াল। এদিকে মালিক কাফুর রঙ চড়িয়ে খারাপভাবে এই অবিবেচনার ব্যাখ্যা করল। সুলতানের অপমান করেছেন শাহজাদা। সত্যি কথা বলতে কী—তাঁর আরোগ্য হওয়াই চান না তাঁর সুযোগ্য পুত্র।

ব্যস্।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের শালা আর ছেলের শ্বশুর আলপ খানের গেল গর্দান। তারপর ছেলের কাছে গেল নির্মম চিঠি—আমার দেওয়া রাজছত্র, 'দরবাম' জয়ধ্বজা, হাতি, ঘোড়া, মোটমাট যত খেলাত পেয়েছ সব দাও পত্রপাঠ ফিরিয়ে, আর আবার হুকুম না হওয়া পর্যন্ত আমার সামনে হাজির পর্যন্ত হয়ো না। থাক নির্বাসনে গঙ্গার ওপারে পাহাড়ি তরাইয়ে শুধু শিকার আর জংলি পশুদের নিয়ে।

এই ফরমান পাঠানো হল সবচেয়ে কদাকার এক দূতকে দিয়ে। চোখের জলে ভাঙা বুক নিয়ে শাহজাদা সব খেলাত ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই আর ধৈর্য ধরতে না পেরে তিনি বিনা হুকুমেই মরণোন্মুখ বাপের কাছে ফিরে এলেন। পিতা মার্জনা করলেন, কিন্তু রাজা মালিক কাফুরের ফন্দিতে অন্ধ হয়ে নিজে সেরে না উঠা পর্যন্ত খিজর খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। তাঁর মা মালিকা-ই-জাহানকে লালপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক হল যে যেন "একটা আত্মা দু-টুকরা হয়ে গেল।" কাফুরকে দিয়ে সুলতান শুধু শপথ করালেন যে শাহাজাদার প্রাণহানির চেষ্টা যেন না করা হয়। এর বেশি আর কিছু করার মতো মানসিক শক্তিও দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের মধ্যে বাকি ছিল না। "শুধু ছিল একটা ভারী হৃদয়, আর আহত আত্মা।"

আমির খুসরো ছবির মতো ভাষা দিয়ে সুলতানের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। শাহানশাহ হয়ে গিয়েছিলেন "নিমজান বা জান্‌লুরগম" অর্থাৎ বেদনায় ভরা শরীরে প্রায় আধমরা, আর "মান্দ নিম্ ই জান্ দর্‌হম্" অর্থাৎ দু-টুকরো করে কাটা শরীরের মতো।

সেইখানে, সেই শত ঐতিহাসিক হত্যার স্মৃতি আর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঘেরা গোয়ালিয়র দুর্গে দেবলারানি নিজে যেচে এই দুঃখময় কারাবাসের সঙ্গী ও সান্ত্বনা হয়ে স্বামীর সঙ্গে রইলেন।

আলাউদ্দিনের আর বেশি দিন বাকি ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর চটপট করে কাফুর সুলতানের একটা উইল বের করে সবাইকে দেখিয়ে পাঁচ বছর বয়সের সব চেয়ে ছোট শাহজাদাকে মসনদে বসিয়ে দিল। সঙ্গে

সঙ্গে গোয়ালিয়রে একজন অনুচরকে পাঠিয়ে খিজর খানকে অন্ধ করে দিল। কারণ তারই যে সুলতান হওয়ার কথা ছিল।

কবি দুঃখ করে লিখেছেন—

ব্যথা যাহা পেত সুর্মা পরশ মাখিতে
এ হেন দুঃখ কেমনে সহে সে আঁখিতে?
নার্গিস ফুলী আঁখি হতে খুন নিকালে,
সরাব উলটি করে যেন পাড় মাতালে।

কিন্তু আলাউদ্দিনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হল না। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে বাঘ আর তা ভুলতে পারে না। কাজেই কাফুর এখন আর একজন শাহজাদাকে অন্ধ করে ফেলবার জন্য নিজের নাপিতকে পাঠাল। তার পর আলার যত ছেলে বা ওয়ারিশ যে যেখানে ছিল, সবাইকে বন্দী করল, আর প্রাণে মেরে ফেলল শেষ পর্যন্ত। হাতের পুতুল হিসাবে সবচেয়ে ছোট নাবালক শাহজাদাকে তক্তে বসাল। আলাউদ্দিনের সুলতানার সব সোনারূপা জহরত কেড়ে নিল। এমনকি, তার ক্রীতদাসগুলিকে পর্যন্ত মালিক কাফুর মেরে ফেলল। কারণ ভবিষ্যতে তারাও হয়তো কোনোদিন তখ্‌ত দখল করে বসতে পারে। শাহজাদা কুতুবকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হল। সুবিধামতো তার বড় ভাইয়ের চোখের মতো তারও চোখ দুটি "ক্ষুর দিয়ে যেমন করে খরমুজা কাটে* তেমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলার মতলব তৈরি হয়ে গেল। কাফুর অবশ্য নিজেই অল্প দিনের মধ্যে খুন হয়ে যায়, আর তার প্রতি খিজর খানের অভিশাপ সফল হয়। তবু তিনি এত বড় শত্রুর হত্যার খবরেও দুঃখিত হয়ে ধুলোতে মাথা ঘষে ঘষে শুধু নিজের কষ্টের জন্য নয়, শত্রুর জন্যেও চোখের জল ফেলেছিলেন।

এর পর খিজরের ছোট এক ভাই কুতুবুদ্দিন বাপের আমলের পাইকদের কল্যাণে বাদশা হয়েই সুখের স্রোতে ভাসতে শুরু করলেন। মাত্র সাড়ে চার বছর রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু মদ খাওয়া, গান বাজনা শোনা, চরিত্রহীনতা আর স্ফূর্তি করা, উপহার বিলানো আর কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই হাত দেন নি।

শ' দেড়েক বছর আগে ইংলন্ডের ইতিহাসে রিজেন্সি বেকস্ নামে একদল লক্কা পায়রা রাজসিংহাসনের চারদিকে ঘুরঘুর করে নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ ও অপকীর্তি করেছিল। এজন্য তাদেব বদনামের অন্ত ছিল না। কিন্তু এই সময়ে দিল্লির সুলতানের চারপাশে যা চলছিল, তার তুলনায় বিলাতি কাণ্ডকাবখানা নেহাত নিরামিষ ব্যাপার।

খুশ্‌ক-ই-লাল, অর্থাৎ লাল-রাজবাড়িতে এমন কি লোকেব চোখেব সামনে পর্যন্ত সুলতান দিনে রাতে সমানভাবে ঢলাঢলি শুরু করলেন। মদ আর অন্যান্য নেশার দোকান এবং নারী বেচাকেনা প্রকাশ্যভাবে চলতে লাগল। রূপসী রমণীদের আর দেখতে পাওয়া গেল না। একটি কিশোর বালক বা সুন্দর খোজা বা রূপসী কিশোরী পাঁচশ বা হাজার বা বড়জোর দু হাজার টঙ্কাতে বিকাতে লাগল।

সেই সময়কার মাত্র তিনশো বছর আগে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ এদেশে যখন মুসলমানের হানা সবে শুরু হয়েছে, তখন গজনীর সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত আল বেরুনী (যদিও তিনি বিদেশী ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি ভালো করে এ দেশকে বুঝতে ও জানতে কোনও ভারতীয় সে যুগে চেষ্টা করে নি) দেখেছিলেন যে, হিন্দু মেয়েরা খুব শিক্ষিত ছিল। তারা খেলত, নাচত, ছবি আঁকত। সবরকম সর্বজনীন ব্যাপারে প্রকাশ্যে সক্রিয় অংশ নিত। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পাকাভাবে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তার মাত্র একশ বছরের মধ্যে দিল্লির সুলতানের নাকের সামনে অর্থাৎ অন্তত যেখানে লোকে সুশাসন আশা করতে পারে, সেখানে এভাবে লোকের জীবনযাত্রা শুরু হল। সারা শহরটাই যেন দৌলতখানা-ই-জৌলুষে পরিণত হল। বোতল বাহিনী থেকে আরম্ভ করে সবরকম পঞ্চমকার ও অস্বাভাবিক অপকর্ম পর্যন্ত লোকের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

এ হেন আবহাওয়ায় নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কুতুব দাদাকে হুকুম করলেন, দেবলাদেবীকে আমার হারেমে পাঠিয়ে দাও পত্রপাঠ।

---

*এই উপমাটা ঐতিহাসিক বেরুনীর।

খিজর খান, অন্ধ অসহায় খিজর খান এই সঙ্কটের সময়ে যে মনের জোর দেখিয়েছিলেন তা আরও আগেই দেখানো উচিত ছিল। মাথা উঁচু করে অন্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বের বিষ আর সাহস ঢেলে তিনি বললেন—

যতদিন আমার প্রেয়সী আমার কাছে আছে, বরং আমার মাথা কাটা যাবে সেও ভালো, আমি তাকে ছেড়ে দেব না।

আর দেবলাদেবী? তাঁর কী উত্তর হয়েছিল তা সেই অলিখিত পুরাকাল থেকে আজও সব হিন্দু নারী নিজের মর্মে মর্মে জানেন।

কুতুবুদ্দিন অন্ধ দাদা ও অসহায় বৌদিদির এই স্পর্ধার শাস্তি দিতে দেরি করল না। তার নিজেরই জীবনের উপর একটা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পর সে ভাবল যে এবার সিংহাসনের আর কোনও দাবিদারের সম্ভাবনাও রাখা ঠিক হবে না। এতে তার বন্দী ও অন্ধ ভাইদের অবশ্য কোনও হাতই ছিল না। তবে বিপদের জড় মেরে দেওয়াই ভালো। তাই সে নিজের দেহরক্ষীদের সর্দারকে (শিল্লেদার) তিনটি ভাইকেই হত্যা করবার জন্য গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দিল।

ঘাতকরা ঢুকল বন্দীর ঘরে। অন্ধের শেষ সহায় বাল্যের প্রণয়িনী, কৈশোরের পত্নী, বন্দীদশায় সঙ্গিনী দেবলাদেবী দুটি হাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। ওগো তোমায় মরতে দেব না, তোমায় আমার অবল অসহায় এই হাতদুটি আড়াল করে রাখবে সব বিপদ, সব আঘাতের হাত থেকে। ওগো, ওগো, আমার যে এই হাত দুটি ছাড়া আর কোনও বর্মই নেই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য।

দেবলাদেবীর সেই সুন্দর বাহু দুটি ঘাতকের তরোয়ালের আঘাতে স্বামীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেটে মাটিতে পড়ে গেল। যে হাত দুটি চার হাত এক সঙ্গে হয়ে যাবার পর স্বামীর কাছ ছাড়া হয় নি কখনও।

কিন্তু রক্তের ডাক এখনও শেষ হয় নি। কুতুবুদ্দিন নিজেও অসচ্চরিত্রতার শেষ সীমায় এসে এক নীচ বংশের তস্য নীচ পেয়ারের ক্রীতদাসকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রিয়পাত্র খসরু খানই শেষ পর্যন্ত কুতুবুদ্দিনকে এক রাতে নিজে গুপ্তহত্যা করে দিল্লির সিংহাসন দখল করে।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খিজর খানের হত্যার পর দেবলাদেবীকে জোর করে কুতুবুদ্দিনের হারেমে নিয়ে আসা হয়। আর পরে গুপ্তঘাতক সুলতান খসরু খান পর্যন্ত তাকে দখল করে। ঐতিহাসিক বেরুনী এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। মনে মনে প্রার্থনা করলাম যে, এই নারীত্বের যেন এমনভাবে তিলে তিলে অধম মৃত্যু না হয়ে থাকে।

কিন্তু অমর প্রেম?

যে প্রেমের গাথা কবিরা যুগে যুগে গেয়েছেন, যার মহিমা আমাদের দেয় আশা, দেয় ভাষা, দেয় সান্ত্বনা সেই প্রেমের কি এই হল শেষ পরিণাম?

খিজর খানের হত্যার পর তার আত্মা যেন দেবলাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। ইহলোকে যারা সব দুঃখদুর্দশার মধ্যে দিয়েও একসঙ্গে ছিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাদের মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ টেনে আনতে পারে নি। তাই তো দেবল রানি বলেছিলেন—

কে য়্যা জানে মন ও আশক-ই-জানম্
কে দর কারে তু শুদ জান-ও-জাহানম্॥
চো মন বেহেরৎ জে জান করদম জু দাই
মুবাররি জে আশনাইয়া আশ্নাই॥
বহার জায় কে খুন রান্দ্ ইন্ তনে পাক
গয়া মহর মাহিদ রস্তন অজ খাক॥
জো খুন-ও-মাকিম ইন রঙ্গীন গয়া জোয়ে
পাজান গো গর্দে সুর্খ ঈন্ কীমিয়া জোয়ে॥

পরানের প্রাণ ওগো পরাণ আমার
তব তরে বিসর্জিনু জীবন সংসার॥
শুধু তোমারই লাগি ত্যজেছি আত্মারে
ভুলো না আমার প্রেম ভুলো না আমারে॥

যেথাই আমার রক্ত পড়িয়াছে, মিতে,
প্রেমসম দূর্বাদল গজাবে নিভৃতে।।
খুঁজে দেখো মোর রক্তে রাঙা মাটি সনে
সৃজিবে রঙিন ধাতু প্রেম রসায়নে।।

এইটুকু বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের নেই আর কোনও সম্বল। দূর্বা ঘাস ছাড়া নেই কোনও মনে করানোর মতো ধন।

ছয়

আগে প্রেম না আগে বিয়ে, সে নিয়ে কৈশোরে অনেকবার তুমুল তর্ক হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য প্রেম বা বিয়ে কোনটাই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল না। 'বিবাহের চেয়ে বড়' বস্তুটা যে ঠিক কী, সে সম্বন্ধে পাকা ধারণা গড়ে ওঠে নি তখনও। তাতে তর্ক করাটা আরও বেশি নিরাপদ ছিল। নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা দিতে বসে এ নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি। আর গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিন মনে মনে দু-হাত তুলে বিয়ে আর প্রেম দুটি বস্তুকেই আশীর্বাদ করেছে।

বলুন তো মশায়, এমন একটা গরম বিষয় নিয়ে পাড়ার পাইকারি পার্কে বসে জমাট আলোচনা কী করে করব? গুরুজনরা আছেন। অন্তত দাদাশ্রেণীর মাতব্বরদের কান সজাগ হয়ে উঠবার ভয় আছে। তার পরই কত রাতে বাড়ি ফেরা হয়, অ্যানুয়াল পরীক্ষায় কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর জোগাড় করা গেছে, এসব অসুবিধের কথা সকলের মনে জেগে উঠতে পারে। কাজেই বেঁচে থাকুক নীলকণ্ঠ কেবিন।

তা দেখলাম যে বৈঠকখানা বদলাতে পারে, কিন্তু বৈঠক বদলায় না। না হলে কোথায় উত্তর কলকাতার বাহাত্তুরে গলি আর কোথায় উদয়পুরের মহারানার সহেলিয়োঁ কি বাড়ি! না, ওটা বাংলা দেশের মামুলি গেরস্ত বাড়ি নয়। রাজোয়ারাতে বাড়ি মানে হচ্ছে বাগান। সখীদের বাগান।

মন নেচে উঠল রোম্যান্সের গন্ধ পেয়ে। আহা, রাসলীলা করতেন না কি মহারানারা এখানে? সে কোন্ যুগে? কোন্ লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তলোয়ারের ঝন্ঝন্ আওয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে যেত শত সখীদের ঝুমুরের ঝুমঝুম? বর্শার বদলে ছোঁড়া হত ফুলঝারি? রক্তের বদলে ছড়িয়ে পড়ত রঙ আবির কুস্কুম? কাদের গায়ে?

মনের আবেগে একেবারে রাজস্থানের চাঁদ কবিকেই স্মরণ করে ফেললাম : —

বিগসি কমল মৃগ ভ্রমর বৈন খঞ্জন মৃগ লুটিয়া।
হ্যার কীর জরু বিম্ব মোতি নখল সিখ তাহি ঘুট্টিয়া।।

মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন সঙ্গের মেবারী মহোদয়রা। না,ওরা অত্যন্ত সচ্চরিত্র লোক। অন্যান্য অনেক দেশী রাজ্যের চেয়ে ওদের আচার আর রীতি-চরিত্র অনেক তফাত। বিয়ে ওঁরা করতেন শুধু বংশরক্ষা নয়, বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে। কারণ, প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই দেখা যেত যে, বংশে বাতি জ্বালাবার লোকের অভাব হয়ে যাবার দাখিল হয়ে গেছে। কাজেই বহু বিবাহেরও রেওয়াজ থাকত। আর নারী বা অন্যান্য পঞ্চমকারের মধ্যে ওরা না কি কখনও থাকতেন না। ঢলাঢলি বা ওই জাতীয় হালকা আমোদ-প্রমোদ যা উদয়পুরে কখনও কখনও কেউ করেছে তা অন্যান্য রাজরাজড়ার দরবারের তুলনায় নেহাতই নিরেমিষ কারবার।

দিল্লির দরবারের কাহিনিগুলি ভুলি নি। তাই শুধোলাম,—আপনারা কি প্রেমও করতেন না, না কি?

শিকার পার্টি থেকে ফেরার সময় মহুয়া গাছের তলায় বসে একবার একজন হিজ হাইনেস জোর গলায় রাজপুতের প্রেম করা অস্বীকার করেছিলেন। এঁরা তার চেয়ে একটুও কম গেলেন না। বরং একটু বেশিই এগিয়ে গেলেন।

বললেন,—আমরা একটু অল্প বয়সেই, অর্থাৎ সময় থাকতে আগেভাগে নিরাপদে বিয়ে সেরে রাখি। আর জানেন তো ইংরেজ দরদী কবিরা বলেছেন যে, বিয়ে হচ্ছে প্রেমের সমাধি। বিয়ে হলেই সব রোম্যান্স একেবারে হাওয়া হয়ে যায়।

বাধা দিলাম—অর্থাৎ আপনাদের জীবনে দক্ষিণের হাওয়া কখনও বয় না বলতে চান?

আরে রাম কহ! দিল্লির পুব হাওয়াতেই আমাদের উতলা করে রেখেছে সেই পাঠান আলাউদ্দিনের সময় থেকে। আমরা দখনে হাওয়ার সঙ্গে দোলা খেতে সময় পেলাম কখন?

তা অবশ্য বটে। দিল্লির পুবালি বায় উদয়পুরকে সব সময়ই যে দোলা খাইয়েছে তা হোরী খেলবার সময়কার হিন্দোলা নয়। পাঠান মোগলরা তেড়ে আসত লড়াই করতে। তরোয়ালের জবাব দিতে হত তরোয়াল দিয়ে। মেবার কখনও দিল্লিকে মেয়ে বা মোহর নজরানা দেয় নি। কিন্তু এই এবার দিল্লি যখন স্বাধীন সম্মিলিত ভারতের নামে গণতন্ত্রের হাওয়া বইয়ে দিল, তখন উদয়পুর কেন, সমস্ত দেশের মধ্যে কোনও রাজারই কোনও জবাব ছিল না। বিনা যুদ্ধে বিনা ঝড়-ঝাপটায় সব রাজাদের মাথার উপর থেকেই মুকুটগুলো খসে গেল।

তাই মহারানা এখন শুধু মহারাজ প্রমুখ।

মহারাজ প্রমুখের সেক্রেটারি রামগোপালজী বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক। বাংলা সাহিত্যের উপর খুব টান আছে। তিনি এ কথাও বললেন, ভেবে দেখুন একবার মোগল হারেমের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহেই তো পড়েছি যে, শাহজাদীরা প্রেম করতেন না।

তাঁরা বিয়েও করতেন না।

চট করে এমন একটা সাফ জবাব তাঁরা আমার কাছ থেকে আশা করেন নি। প্রতিবাদ করে বললেন— কেন? তাঁদের মধ্যে অনেকে তো বিয়ে করতেন?

বললাম—যাঁরা শাহজাদীর মতো শাহজাদী ছিলেন তাঁরা বিয়ে করতেন না, প্রেম করতেন। অন্তত যতদিন প্রেম করবার সাধ থাকত ততদিন বিয়ে করতেন না। আর যাঁরা বাদশাহের মতো বাদশাহ ছিলেন তাঁরা বিয়েও করতেন, প্রেমও করতেন। বিয়ে নামক সাংসারিক অপকার্যটি আগে-ভাগে সেরে রেখেছেন কি না অথবা ভবিষ্যতে করবেন কি না, সেসব অসুবিধাজনক কথা দরকার হলেই ভুলে যেতেন।

খোলা মেবারী তলোয়ারের মতো ঝকমক করে উঠল জেনারেল মনোহর সিংয়ের প্রতিবাদ। এঁর পূর্বপুরুষরা হলদিঘাটের যুদ্ধে গায়ের রক্ত ঢেলেছেন। পুরুষানুক্রমে এঁরা এমনিভাবে মাথা এগিয়ে দিয়েছেন দেশরক্ষার কাজে। আজ সহেলিয়োঁ কি বাড়ির ছায়ায় স্নিগ্ধ ফোয়ারা দিয়ে সাজান কুঞ্জে এমন কিছু একটা লড়াই হচ্ছে না। কিন্তু তা বলে কথাবার্তাতেই বা বেদলা জায়গীরের চৌহানরাও পেছনে পড়ে থাকবেন কেন?

আজকাল দেশের কংগ্রেসী সরকার রাজোয়ারার সব জায়গীর কেড়ে নিয়ে এই সব ঐতিহাসিক ভুঁইয়া সামন্তদের পথে বসাতে যাচ্ছেন। লোকে বলে যে, কোনও কোনও ছোট জায়গীরদার বা তাদের আশ্রিতরা এখন জমিহারা হবে বা সর্বস্ব যাবে, সেই ভয়ে গোপনে রাহাজানি প্রভৃতি নানারকম অপকার্য করছে বলেই রাজস্থানে এত গোলমাল চলছে। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে একটা যে বিরাট তোলপাড় হয়ে গেল, তার ধাক্কা তো দেশে কোনও না কোনও দিক দিয়ে আসবেই। রাজোয়ারাতেও তাই হয়েছে। জান দিতে যারা জানত, তারা শুধু পেটের জন্য বাটপাড়ি করবে, এটা কি একটা কথা হল?

সেই ভুঁইয়া সর্দারদের মধ্যে মহাকুলীন বেদলার রাও সাহেবও হার কবুল করবেন না। তাই ফস করে তিনি বলে উঠলেন,—আমি স্বীকার করছি না এ কথা। শাহজাদীরা প্রেমও করতেন না, আর বিয়েও করতেন না। অত কাঁচা কাজ করবার মতো চিঁড়িয়া তাঁরা ছিলেন না। আর বাদশারা প্রেমও করতেন, বিয়েও করতেন। আশক্ বা সাদী কোনটাকেই অপকার্য বলে মনে করার মতো ছোট নজর ওঁদের ছিল না।

আলবত—বলে উঠলেন ঠাকুরসাহেব—যদি ওঁদের কলিজা এতই ছোট হবে, তাহলে আমাদের সঙ্গে লড়বার মতো হিম্মতই ওঁদের হত না কখনও।

বলেই এমন ভাবে তিনি মাথার পাগড়ির ঝুলটা হেলিয়ে নাচালেন, যেন তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তিনি নিজেই ওই দু'টি মধুর অপকর্মের মধ্যে যে কোনও একটা—বা দরকার হলে দুটোই—করতে তৈরি আছেন।

আমরা যদি দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে শাক চচ্চড়ি চটকিয়ে কুচো চিংড়ির অম্বল খেয়েই জীবনে প্রেমের জন্য একটেরে একটুখানি আসন বিছিয়ে রাখবার স্বপ্ন মনে মনে পুষতে পারি, তাহলে হাতে অফুরন্ত সময় আর পেটে মোগলাই খানা পেয়ে শাহজাদীরা কেন প্রেমের খেলার কথা ভাবতে যাবেন না?

বিয়ে করাটা ওঁদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল। নৈকষ্য কুলীনের মেয়ের বিয়ের যে অসুবিধে তা তো ওঁদের ছিলই। তার উপর প্রেম আর পলিটিক্স মিশে যাওয়ার ভয় বিয়ের পথে কাঁটা দিয়ে রাখত। মসনদ নিয়ে শাহজাদা শাহজাদাতে লড়াই হামেসাই হয়ে এসেছে। তার উপর যদি জামাইও দাবিদার হয়ে বসে, তাহলে

ব্যাপার আরও জটিল হয়ে ওঠে। তাই সুলতান-কন্যার বিয়েতে অনেক বাপেরই উৎসাহ থাকত না।

মসনদ তো নয়, মরবার সনদ!

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা একটা পাণ্ডুলিপি 'রুকাওয়ৎ-ই-আলম-গিরি'-তে একটা খুব চমৎকার ফারসি কবিতা আছে : —

আরুস-ই মুল্‌ক্ না শাহজাদ মগব বা দামাদি
কিহ্ বোসাহ্ বার লব্-ই-শমশীর-ই-আবদার জানাদ॥

ধারালো তলোয়ারের ফলাতে চুমু না খেলে রাজবধূ কাউকে বুকে নেয় না।

সে জন্য শাহজাদাদেরও নজরে নজরে রাখতে হত। তাঁদের মতিগতি যাচিয়ে দেখতে হত যখন তখন। আপত্তি করলেই দরবার থেকে পুলিপোলাও চালান সেই সুবা দক্ষিণে বা তার চেয়ে মুশকিলের সুবা কাবুলে। এমন কি শুধু নির্বাসন নয়, বেকার হয়ে বসে থাকার ভয়ও ছিল। কাজেই বাদশাজাদারা মসনদের আশা বা বাদশার আয়ু সম্বন্ধে একেবারে স্পিকটি নট।

এ সম্বন্ধে একটা কাহিনি থেকেই ব্যাপারটা কত জটিল ছিল তা বুঝতে পারা যাবে। মোগল দরবারের কাহিনি। কিন্তু ওদের মহৎ দৃষ্টান্ত রাজস্থানেও কোনও কোনও দরবারে নকল করা হত কখনও কখনও।

আওরঙজেবের বাঁচবার আর বিরাট সাম্রাজ্য চালানোর ক্ষমতা উপভোগ করবার সাধ ছিল অসীম। তাই বুড়ো বাপ মরা পর্যন্ত তাঁর তর সয় নি। কিন্তু হাতে হাতে কর্মফল পাবার ভয়টিও তো আছে। কাজেই তিনি যে বুড়ো হলেও অক্ষম হন নি আর লড়াই করবার ইচ্ছা মজ্জার মধ্যে সজাগ আছে, তা দেখাবার জন্য কত কিছু ছলা কলাই না করতেন! তাঞ্জামে চড়ে চলেছেন সৈন্যদলের সঙ্গে। খুলে নিলেন তলোয়ার, ডাইনে বাঁয়ে চালিয়ে যেন বাতাসকেই টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলেন। শেষে নরম কাপড়ে তা মুছে নিয়ে সযত্নে খাপে ভরে রাখলেন। মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। তীর ধনুক নিয়েও সেই একই অভিনয়। বিশ্বজন দেখে রাখুক, আমি বিশ্ববিজয়ী আলমগীর আশিব কোঠায় পা দিলেও শক্ত-সমর্থ সম্রাট আছি।

এহেন আওরঙজেব তাঁর ছেলেদের শুধালেন—তোমরা কে সম্রাট হতে চাও?

কে না হতে চায়, বরং সে প্রশ্নটাই করা বিবেচনার কাজ হত।

শাহ আলম সবিনয়ে বললেন—জাহাঁপনা, যদি কখনও বিশ্রাম সুখ ভোগ করবার জন্য রিটায়ার করতে চান, তা হলে তখ্‌ত তাউস আমারই প্রাপ্য। এহেন সব সদ্‌গুণের অধিকারী বড় ছেলেরই তো রাজা হওয়া উচিত। তবে জাহাঁপনা যতদিন বেঁচে-বর্তে আছেন, ততদিন অবশ্য শাহজাদার চুপচাপ থাকাই কর্তব্য।

আজম তারা নিবেদন করলেন—আমি তো তখ্‌তে বসবার জন্যেই জন্মেছি। কারণ, আমার বাবা আর মা দু'পক্ষই মুসলমান আর রাজবংশের লোক।

আকবর উত্তর দিলেন—আমার জন্ম হয়েছিল শুভ লগ্নে। তারপর থেকেই তো পিতৃদেবের কপাল খুলেছে। জন্মের বছরেই তো তিনি অমুক অমুক যুদ্ধে জিতেছেন...ইত্যাদি। এর পর কি আব কারও তখতে হক জন্মাতে পারে?

আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কামবক্স। মোগল সাম্রাজ্য একমাত্র তারই হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহ। তিনিই হচ্ছেন সম্রাটের পুত্র। আর ভাইরা সবাই শাহজাদার পুত্র হয়ে জন্ম নিয়েছিল। তারপর আকাশে চোখ তুলে কামবক্স বললেন,—তবে অবশ্য আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এসব উত্তর শুনে আওরঙজেবের নিজের মনের কী ভাব হল, তা তিনি মোটেই ভাঙলেন না। শুধু তাঁদের জানালেন যে, তাঁদের চান্স আসতে এখনও অনেক দেরি। জ্যোতিষীরা বলেছে যে, বাদশা আলমগীর একশ কুড়ি বছর রাজত্ব করবেন। তাদের কথা একেবারে অভ্রান্ত। বলেই তেরচা চাহনিতে তিনি দেখতে লাগলেন, কোন্ ছেলের মুখে কী ভাব ফুটে উঠে। বা কেউ কোনও জবাব দিতে চায় কি না।

বেচারাদের যে কত আশাভঙ্গ হয়েছিল, তা এটুকু থেকেই বোঝা যাবে যে, বাপের মৃত্যু পর্যন্ত তর সয় নি কারও। আকবর বাপের জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহ করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাজপুতরা এমনভাবে তাঁর সহায়তা করেছিল যে, সুচতুর আওরঙজেব জাল চিঠি দিয়ে তাঁর রাজপুতদের উপর বিশ্বাস নষ্ট না করে দিলে, বিদ্রোহের ফল কী হত কে জানে? আর বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ভাই লড়াই করতে শুরু করেন।

কিন্তু এই প্রশ্ন আর উত্তর দেবার সময় সবাই ছিলেন চুপচাপ। তাঁদের চোখের সামনে ভাসছিল, আর

এক ভাই শাহজাদা মহম্মদকে কেমন করে বন্দী করে রেখে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিলেন তাদের স্নেহশীল পিতা!

রাজার ছেলে থাকাই এত বিপদ। তার উপর জামাই থাকলে যে আপদ বেড়ে যায় আরও।

কাজেই এশিয়াতে রাজার ঝিয়ারীর সঙ্গে প্রেম করতে অন্য পক্ষেরও বিপদ থাকত। এই প্রেম পুব দেশে আর পশ্চিমে লোকে কোনদিন এক রকম নজরে দেখে নি। ফ্রান্সে প্রেমে পড়লে লোকে মজা দেখত, হাসি মশকরা করত, তার পরে ভুলে যেত। কিন্তু মিশর থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত হারেমের প্রেম আর হাহাকার হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে।

শাজাহানের সময়কার মোগল দরবারের কথাই ধরা যাক। রাজোয়ারার কাহিনিতে দিল্লিকে টেনে না এনে উপায় নেই। বিশেষ করে এজন্য যে দিল্লি হারেমের সাচ্চা ঘটনা বহু লেখার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজপুতানার জেনানার কোনও খবরই কোথাও মেলে না। যুবরাজ দারা নিজে রাজা হতে পারলে অসীম ক্ষমতাশালী বোন জাহানারাকে বিয়ে করতে দিতে রাজি হবেন, এমন একটি ভরসা বোনকে দিয়েছিলেন। অনেকটা সেজন্যই সিংহাসন পাবার রক্তমাখা চেষ্টাতে বোন সহায় হয়েছিলেন। কিন্তু আগে তো সাত মণ ঘি পুড়ুক, তার পরেই না রাধার নাচবার ফুরসত আসবে।

তবে ততদিন কি রাধা পায়ের মল গুটিয়ে বসে থাকবেন?

না, শাহজাদীরা সে রকম দুঃখের জীবন কাটাবার জন্য জন্মান নি। হারেমে বন্দিনী অবশ্য। কিন্তু উঁচু পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটুকুর মধ্যেই সুখের নন্দনকানন সাজাতে বাধা কী? ফারসি ভ্রমণকারী আর শাজাহানের মাইনে করা ডাক্তার বার্নিয়ের দুটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন। এ দুটি যে একেবারে খাঁটি ঘটনা, রোম্যান্স বানাবার জন্য মনগড়া কথা নয়, তা তিনি বিশেষ করে বলেছেন।

কিছুদিন ধরে একটি সুন্দর কিন্তু সাধারণ ঘরের যুবক লুকিয়ে লুকিয়ে জাহানারার কাছে যাওয়া-আসা করত। বড় শক্ত ব্যাপার! চারদিকে রয়েছে জটিলা-কুটিলার দল, যাদের নিজেদের ব্যর্থ যৌবন হয়ে রয়েছে মরুভূমি। একে জাহানারার অসীম ক্ষমতা আর বাপের উপর প্রভাবের জন্য সবার হিংসা। তায় আবার চোখের সামনে একজনের জীবনে বসন্ত বায় বইবে আর বাকি সবাই উত্তুরে হাওয়ার হিমেল ঠাণ্ডায় কুঁকড়িয়ে থাকবে? কাজেই সময় মতো শাজাহানের কানে খবরটা তুলে দেওয়া হল।

রাতের অসময়ে মেয়ের শোবার ঘরে শাহানশার আসবার কথা নয়। কিন্তু সম্রাটকে ঠেকায় সাধ্য কার? লুকোবার শুধু একটা মাত্র ঠাঁই ছিল হাতের কাছে। নাগরকে চটপট লুকিয়ে ফেলা হল সেখানেই। এদিকে বাপ এসে চতুরা, রাজনীতিতে ওস্তাদ মেয়ের সঙ্গে নানারকম কথা আরম্ভ করলেন। মুখে নেই কোনও রাগের ছাপ বা আশ্চর্য হওয়ার আভাস। কথায় কথায় দুঃখ করে বললেন যে শাহজাদীর গায়ের সোনার বর্ণ যেন মলিন হয়ে যাচ্ছে, সম্ভবত ঠিকমতো গা ধোয়া হচ্ছে না আজকাল। বাপজানের প্রাণ মেয়ের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ানক রকম ব্যাকুল হয়ে উঠল। এখনই মেয়ের ভালো করে স্নান করা দরকার। তিনি খোজাদের ডেকে পাঠালেন সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত গরম জল হামামে তৈরি করে দেবার জন্য। চৌবাচ্চার নীচে জল ফুটাবার আগুন জ্বালানো হল। শাহানশা সেখানে বসে বসে মেয়ের সঙ্গে খোশমেজাজে আলাপ করে গেলেন যতক্ষণ না প্রেমের ফুটন্ত সমাধি হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে আবার প্রেমের ফুল ফুটল। নাজির খাঁ নামে একজন বিশেষ সুন্দর ও বুদ্ধিমান ইরানি ওমরাহকে জাহানারা নিজের খানসামা করে নিলেন। প্রেমের সঙ্গে মিশে রইল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর শাহজাদির নেকনজরের সঙ্গে তাল দিয়ে গেল গোটা দরবারের পেয়ার। বাদশার সম্বন্ধে জ্ঞাতি-ভাই আর একজন প্রধান সেনাপতি শায়েস্তা খান প্রস্তাব করলেন যে, নাজির খানের সঙ্গে বেগম সাহেবার অর্থাৎ প্রধান রাজকুমারীর বিয়ে দিলে মন্দ হয় না। এদের দুজনের গোপন প্রেম সম্বন্ধে শাজাহানের আগে থেকেই একটা সন্দেহ ছিল এ অবস্থায় কী করলে ঠিক হবে তা ভেবে নিতে শাজাহানের সময় লাগল না একটুও। একদিন ভরা দরবারে সবার সামনে তিনি এই ইরানি ওমরাহকে বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন হিসাবে পানের খিলি উপহার দিলেন। দরবারী আদবকায়দা অনুসারে সে খিলি সঙ্গে সঙ্গে বিনা সন্দেহে নাজির খাঁ কুর্নিশ করে চিবিয়ে খেয়ে নিলেন। ঠোঁট লাল করে সারা মুখে খোশবুই অনুভব করে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঞ্জামে চড়ে প্রেমিক ফিরে চললেন নিজের বাড়িতে। প্রাণ কিন্তু বাড়ি পৌঁছবার আগেই দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেল!

এ তো গেল বিয়ে না করে প্রেম করার কাহিনি। এবার ধরা যাক, বিয়ে করার পর আবার আর

একজনকে বিয়ে করতে চাওয়ার জন্য প্রেমের কাহিনি। যার মধ্যে বিয়ে আর প্রেম একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

বাদশা হুমায়ুন দিল্লি থেকে তাড়া খেয়ে সিংহাসন ছেড়ে পলাতক হলেন রাজপুতানার ও সিন্ধুর মরুভূমিতে। এখানে এসে তাঁর নতুন করে প্রেম জেগে উঠল, যদিও মাথা গুঁজবার ঠাঁই পর্যন্ত ছিল না। এ পর্যন্ত বলেই আমার সঙ্গীদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। তারা সবাই মরুভূমিতেও যে প্রেম গজায় তা অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন।

ওঁরা কিন্তু ততক্ষণে বিয়ে আর প্রেমের গল্পের মৌতাতে মজতে শুরু করেছেন। কেউ কোনও কথা বললেন না। শুধু বীরবর মনোহর সিং সুন্দর পাগড়িটা মাথা থেকে নামিয়ে রাখতে ওকে আরও বেশি আকর্ষণীয় অর্থাৎ ইন্টারেস্টিং দেখাতে লাগল। ওদের বংশগত জায়গীর বেদলা থেকে উদয়পুবের নগরপ্রান্তে ফতেসাগরের ঢেউয়ের দোলা দেখা যায়। তারই দোলা বোধ হয় জেনারেল সাহেবের মনে একটু-আধটু কাব্যের ছোঁয়াও দিয়ে যায়।

বাদশা হুমায়ুনের এই প্রেমকাহিনি যে সত্য সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর নিজের জলের কুঁজোর বাহক জওহর থেকে আরম্ভ করে আরও অনেকে এই ঘটনা লিখে গেছেন। মরুভূমিতে হুমায়ুনের সৎমা (সৎভাই হিন্দালের মা) একটা ভোজ দিলেন। সে ভোজে হামিদা বলে একটি ছোট্ট-মোট্ট ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ে এসেছিল। ষোল বছরের হামিদা আর তেত্রিশ বছরের হুমায়ুন --রাজ্যহারা, পাঁড় আফিমখোর আর অন্তত ছ'টি বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী।

হুমায়ুনের সৎবোন গুলবদনের লেখা থেকে জানা যায়, এই কমসে কম ছ'টি স্ত্রীর মধ্যে তিনটি শেরশাহের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালানোর সময় খোয়া গিয়েছিল। একটি শের শার হাতে পড়েন আর তাঁব কল্যাণে স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারেন এবং অন্য দুটি সম্ভবত পালানোর হিড়িকে নদীতে ডুবে মারা যান। অভাগাব ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বৌ মরে, এ তো চলতি কথাতেই আছে।

যাই হোক, ভাগ্যহীন হুমায়ুনের তখনও কয়েকটি বৌ বেঁচে ছিলেন। তবু দুর্ভাগ্য তো আর প্রেমকে ঠেকাতে পারে না। সে বস্তুটি মরুভূমির বালির মতো হৃদয়ের সব বন্ধ করা দরজা জানালার ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়ে কখন যে ভিতরে ঢুকে কায়েম হয়ে আস্তানা গেড়ে নেয়, অঙ্ক কষে তার হিসাব করা যায় না।

একেবারে প্রথম দর্শনেই প্রেম? না, না, শুধু বিয়ের বাসনা নয়, নিখাদ প্রেম। তার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

প্রথম দেখার পরেই হুমায়ুন বিয়ের প্রস্তাব পেড়ে বসলেন। সৎভাই হিন্দাল তো চটেমটে লাল। নিজেব চালচুলোর হিসেব নেই, তার উপর আবার নেই বয়সের গাছপাথর। তার আবার বিয়ে।

যেখানে ছেলেবেলাতেই বিয়ে হয়ে যায়, সেখানে তেত্রিশ নেহাত কম বয়স নয়। অবশ্য হুমায়ুন বলতে পারতেন যে মেয়েদের মতো রাজরাজড়ারও বয়স কখনও বাড়ে না।

বড় বড় মোল্লা-মৌলানারা বলল যে, নিজে তুর্কী সুন্নি হয়ে ফারসি শিয়া মেয়েকে বিয়ে? ছিঃ, জাত কুল মান সবই যাবে!

আত্মীয়-কুটুমরা বলল—ছ্যাঃ, প্রথম দর্শনেই বিয়ের সম্বন্ধ, সে যে সমাজে বারণ। তার ওপর দুলহিনের জন্য দেন-মোহর (কণের পণ) দেবার মুরদ নেই পর্যন্ত।

আর কন্যা? তার নিজেরই মত নেই এ বিয়েতে। শুধু বয়সে নয়, লম্বাতেও হুমায়ুন এত বড় যে, ছোট-মোট হামিদাকে সঙ্গে টুল নিয়ে ঘুরতে হবে যে!

কিন্তু হুমায়ুন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত সৎমা একটু ভরসা দিলেন। তাড়াতাড়ি ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। পাখের কলম দিয়ে হুমায়ুন লিখতে বসলেন,—যেমন করে পার ওকে রাজি করাও। আমার মাথা আর চোখ খাও। আমি সব কিছুতেই রাজি। ...আমার চোখ আশা করে পথের পানে তাকিয়ে আছে।

তার এত পীড়াপীড়িতে হিন্দালকেও শেষ পর্যন্ত এ বিয়েতে মত দিতে হল। মনে হল যে, এবার বুঝি বিয়ের ফুল ফুটবে।

খোশ মেজাজে হুমায়ুন হামিদাকে আবার দেখতে চাইলেন। কিন্তু কন্যা তখনও রাজি নন।

কেন আমি বাদশার সঙ্গে দেখা করব? যদি তাঁকে সেলাম করতে যেতে হয়, সে তো আমি সেদিন করেই সম্মানিত হয়েছি। বাদশাকে দু'বার করে সেলামের রীতি নেই।

রাজার মাথা সামান্য পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের এই প্রত্যাখ্যান নিচু হয়ে সহ্য করে নিল।

হুমায়ুন এবার নানা দিক থেকে হামিদার মন গলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক লোককে কাব্যের ঢঙ্-এ হংসদূত করে পাঠালেন। কিন্তু হামিদা মানেন না। বাদশাহকে একবার দেখাই আইন মাফিক; দ্বিতীয়বার দেখার নিয়ম নেই। আমি যাব না।

সৎমা এসে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলেন,—তোমায় তো বাপু বিয়ে করতেই হবে কাউকে না কাউকে। তা, বাদশার চেয়ে ভালো পাত্র আর কে হতে পারে?

না, তবুও না।

শেষ পর্যন্ত হামিদা বলে বসলেন,—বিয়ে আমি এমন লোককে করতে পারি যাঁর কণ্ঠে আমার হাত পৌঁছবে। যার শুধু কুর্তা পর্যন্ত হাত যায়, তাঁকে নয়।

এই আপত্তিটা জেনে হুমায়ুনের খানিকটা আশা হল।

তবু চল্লিশ দিন ধরে সাধ্যসাধনা করার পর হামিদা হুমায়ুনকে বিয়ে করতে রাজি হলেন।

সেই নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তার যুগে হুমায়ুনের ব্যাকুল মিনতিভরা প্রেমের কবিতা, রোম্যান্টিক যুগের যে কোনও প্রেমের কবিতার সঙ্গে তুলনায় কম যাবে না। তিনি লিখেছিলেন : —

ভিখারি মিনতি করে, প্রিয়ে,
করো দয়া, মোর পানে চাও।
গুণ্ঠন নামে মুখ বেয়ে,
দরশন বাহিরেতে যাও।
সুখ আর ক্ষুধার মাঝারে
কেন রচো এত ব্যবধান?
মিছে, রাণী, ঘোমটা বাহারে
কাঁদাও যে মোর হিয়াখান।
ঢাকে রূপ যবনিকা নব,
ঘোমটা তোমার হাতিয়ার,
ভিখ মাগি, জয় হোক তব
প্রিয়ে কাছে এস তো এবার।

বন্ধুরা ভাঙেন, কিন্তু মচকান না। বললেন যে, এ কাহিনিতে অবশ্য মরুভূমিতে প্রেম গজাবার উদাহরণ আছে, কিন্তু পাত্র-পাত্রীরা মরুভূমির 'ওয়েসিস' নন। মোগলরা যে হামেশাই প্রেমে পড়ত আবার হাবুডুবু খেয়েও উঠে পড়ত, তা আর কে না জানে?

তাদের মতে সায় দিতে পারলাম না।—এমন অবস্থায় যদি হুমায়ুনের মনে প্রেম জেগে উঠতে পারে, তাহলে আপনাদের প্রত্যেকেরই মনে প্রেম শুধু ঘাসের মতো গজাতে নয়, ওয়েসিস বানাতেও পারে—রায় দিলাম আমি।

এই মতের সঙ্গে যোগ দিলাম একটি করুণ কাহিনি। নিষ্ঠুর হারেমের মধ্যেকার করুণ কাহিনি। ফুল পাথরে না ফুটতে পারে, কিন্তু তার আনাচে-কানাচে যে ফোটে তারই উদাহরণ।

দারাকে হত্যা করানোর পর আওরঙজেব তাঁর দুই স্ত্রীকে নিজের হারেমে চলে আসতে হুকুম দিলেন। আর্মেনিয়ান সুন্দরী উদিপুরী এক কথাতেই রাজি হলেন। প্রিয় বেগম হয়ে হাতের মুঠোয় পেলেন অনেক ক্ষমতা, পায়ের কাছে অনেক ঐশ্বর্য। আর রাজপুতানী রানাদিল তাঁকে ডেকে পাঠাবার অর্থ শুধিয়ে পাঠালেন। জবাব এল যে, শাস্ত্র অনুসারে মৃত বড় ভাইয়ের স্ত্রী ছোট ভাইয়ের দখলে আসবার কথা। রানাদিল তখন প্রশ্ন করে পাঠালেন—আমার মধ্যে এমন কী আছে যার জন্য বাদশা আমায় কামনা করেন?

আওরঙজেব বলে পাঠালেন যে, তাঁর সুন্দর চুলের গোছা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। শুনে রানাদিল তখনই তাঁর সব চুল ফেললেন কেটে, ভেট পাঠিয়ে দিলেন আওরঙজেবকে। আর সঙ্গে ছোট একটি লেখা জবাব—যে সুন্দর চুল ভালো লেগেছে তা এই পাঠিয়ে দিলাম; এখন নিরিবিলি থাকতে দিন।

কিন্তু বাদশা তো শুধু সুচারু কেশের রাশি চাননি, চেয়েছিলেন তাঁকে। তাই এবার খোলাখুলি আহ্বান এল। —তুমি অপরূপ সুন্দর, তোমায় স্ত্রী হিসাবে চাই। ধরে নাও যে, আমিই তোমার দারা। দারার স্ত্রীর চেয়ে

বেশি সম্মান তুমি আমার কাছে পাবে। তোমায় করব পাটরানি।

রানাদিলের মনে ছিল না কোনও সংশয়, কোনও সম্মান-সম্পদের লোভ। এক সময়ে তিনি ছিলেন সামান্য এক নর্তকী। সম্রাট শাজাহানের হারেমের অসংখ্য রূপসী 'কাঞ্চনী'দের (পেশাদার নাচওয়ালী) মধ্যে একজন। তাঁর অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে যুবরাজ দারা মুগ্ধ হন। শাজাহানের কাছে গিয়ে দারা তাঁর মনের কথা খুলে জানালেন। চাইলেন এই নর্তকীকে রীতিমতো বিয়ে করতে। সম্রাট রাজি হলেন না। যুবরানির মনে দুঃখ হবে; তার আত্মীয়-স্বজনদেরও প্রতাপ খুব বেশি। নাঃ, এমন প্রস্তাবে বাজি হওয়া চলে না।

ব্যর্থ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে দারা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত হাকিমরা তাঁর জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ছেলেকে প্রাণে বাঁচাবার জন্য শাজাহানকে এ বিয়েতে মত দিতে হল। কাঞ্চনী রানাদিল মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরী।

সেই রানাদিল আওরঙজেবের চূড়ান্ত আহ্বান পেয়ে ঢুকলেন নিজের কামরায়। ছুরি দিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানা সম্পূর্ণরূপে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন। তারপর একটা কাপড়ে সেই তাজা রক্ত, রক্তিম রূপের আভায় ভরা রক্ত মাখিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাদশার কাছে। আমার যে মুখের সৌন্দর্য বাদশা কামনা করেন, সেই সৌন্দর্য এই কাপড়ে পাঠিয়ে দিলাম। এতেই যদি তাঁর কামনা তৃপ্ত হয়, আমিও তৃপ্ত হব। আর কোনও রূপ আমার বাকি নেই।

এই কাহিনি বলার পর খাস রাজপুত ঘরের প্রেমের গল্প শুনতে চাইলাম। বললাম যে, যতই আপনাবা লড়াই করে থাকুন, আপনাদের হৃদয়ে প্রেম থাকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো। বলুন এবার রাজপুতেব প্রেমের কাহিনি।

তর্কে হেরে গিয়ে বীরপুরুষবা করুণ নয়নে এ ওর দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন। যেন ওঁরা কোনও ডাকসাইটে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন; আর কড়া হুকুম হয়েছে যে, যাব কাছে যা কিছু টাকাকড়ি লুকোনো আছে বের করে দাও চটপট—নইলে জান গেল বলে।

কিন্তু রাজপুতের জান যায়, তবু মান মারা যায় না। রামগোপালজী বলে বসলেন—আমাদের এদেশে কোথাও কোথাও বিয়ে ছাড়াই প্রেম হয়ে গিয়েছে। তবে সেগুলি হচ্ছে অ্যাক্‌সিডেন্ট, নেহাতই দুর্ঘটনা। মানে সদাসর্বদা যা হয়ে থাকে তার বাইরের ব্যতিক্রম।

আমার চোখে কী প্রশ্ন ফুটে উঠেছিল, তা তিনিই জানেন। নদীতে ডুবে যাবার আগে লোকে যেমন খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়িয়ে ধরে তেমন ভাবেই উর্ধ্বশ্বাসে বললেন,—এই যেমন ধরুন রূপমতি আর বাজ বাহাদুরের কাহিনি।

রূপমতী ছিলেন মালবিকা। অর্থাৎ মালবদেশের রাজপুতানী মেয়ে। রূপে, নাচে গানে, কবিতা রচনায় তাঁর তুলনা সারা হিন্দুস্থানে একটিও পাওয়া যেত না। রূপমতীর রূপের কথা, কবিত্ব প্রতিভার কথা রাজোয়ারার লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। আজও নাকি মরুভূমিতে নীরব নিশীথিনী তার কান্নাভরা গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। শুধু দরদভবা কানেই নাকি সে গান ধ্বনিত হয়। প্রাচীন রাজপুত চিত্রের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী রোম্যান্স হচ্ছে রূপমতীর নিশীথ অভিসার।

এখনও মালব দেশে সবচেয়ে মনমাত না চোখজুড়ান প্রাসাদ হচ্ছে রূপমতীর মহল। ছবির মতো একটা রাস্তা উঁচু পাহাড়ের একেবারে চূড়া পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তার শেষে, পাহাড়ের খাড়াইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রূপমতী মহল।

আর তার প্রিয়তম বাজ বাহাদুরের মহল হচ্ছে তার নীচে রেবাকুণ্ডের পারে।

এই পাহাড়ে শিকারে এসে গেঁয়ো কিন্তু নাচে গানে রূপে অতুলনীয় রাজপুত মেয়ে রূপমতীকে দেখে শের শার পাঠান সামন্তের ছেলে বাজ বাহাদুর প্রেমে পড়লেন। কিন্তু রূপমতী তাঁর কথা কানেও তোলেন না। তাঁকে কাছে পর্যন্ত আসতে দেন না। বাজ বাহাদুরও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত রূপমতী একটি অসম্ভব শর্ত করলেন। রেবা নদীকে যদি পাহাড়ের উপর এনে দিতে পারে, তবেই পাঠান পাবে রাজপুতানীকে।

তাই, তাই সই।

কাহিনি বলে যে, রেবা নদীর দেবী স্বপ্নে বাজ বাহাদুরকে একটা গাছের শিকড়ের তলায় রেবার ঝরনাধারা খুঁজে পাবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেটা খুঁজে পেয়ে সেই জলকে রেবাকুণ্ডের বাঁধে আটকিয়ে তিনি রূপমতীকে পাবার দাবি করলেন। এখন আর তাঁর না বলবার উপায় রইল না।

কাহিনি যাই বলুক, ঐতিহাসিক কাফি খান বলেন যে, আকবরের নতুন গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যের সেনাপতি অধম খান মালব দখল করতে গেলে বাজ বাহাদুর হেরে পালালেন। কিন্তু যাবার আগে নিজের হারেমের সব মেয়েদের খতম করে দেবার হুকুম দিয়ে গেলেন। মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু মেয়েদের মতো জহর ব্রত বা সতী হবার নিয়ম নেই। তার উপর রূপমতী ছিলেন শুধু নর্তকী, বিবাহিতা স্ত্রী পর্যন্ত নয়। তবু পাঠানরা অনেককে জখম করল। আর অনেককে খুন। এমন সময় হাজির হল অধম খানের সৈন্যরা। ওরাও কিছু কম গেল না। সামসাময়িক ঐতিহাসিক বদাউনী নিজের চোখে দেখেছিলেন যে, ''ভগবানের সৃষ্টি মানুষকে শাক, শসা আর মুলো''র মতো মনে করা হয়েছিল।

রূপমতী সাংঘাতিকভাবে জখম অবস্থায় ধরা পড়লেন। কাতরকণ্ঠে বললেন—আমায় এবার মরতে দাও।

বাজ বাহাদুরকে শুনিয়েছিলেন তিনি নিজের রচনা করা গান : —.

আউর ধন জোরতা হ্যায়, রি মেরে
তো ধন প্যারেকে প্রীত পুঞ্জী।
আনে কে খতম কর্ রাখো মন ম্যেঁ
তু প্রতিত তারো দেখা হুঁ॥
ক্রিয়া কা না লাগে দৃষ্টা
আপনে কর রাখোগি কুঞ্জী।
দিন দিন বাঢ়ে গয়ায়ো
দূরহি খটন একো গুঞ্জী।
বাজ বাদুর কি স্নেহ্ উপর
নিছা চার করুঙ্গি জি আউর ধন॥

ওগো বন্ধু, অন্য লোকে তাদের ধন নিয়ে অহঙ্কার করুক। আমার ধন হচ্ছে প্রিয়ের ভালোবাসা। তাকে মনের মধ্যে যত্ন করে সবটুকুই তালা দিয়ে রেখেছি। অন্য কোনও মেয়ে সেখানে উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারবে না, কারণ চাবি আমার নিজের কাছে। দিনের পর দিন সে প্রেম বেড়ে যাচ্ছে; একটু কণাও কমে না। বাজ বাহাদুরের সঙ্গেই সুখে-দুঃখে এই জীবন কাটাব।

এখন সেই প্রেমিকেরই জল্লাদদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েও রূপমতী শুধু বললেন,—এবার আমায় মরতে দাও।

অধম খান তাঁকে আশ্বাস দিলেন,—আমরা তোমায় সারিয়ে তুলব। তুমিও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর। সেরে উঠলে তোমার প্রিয়তমের কাছে তোমায় পাঠিয়ে দেব।

রূপমতী ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন। রূপও জোয়ারের মতো ফিরে এল তাঁর সর্বাঙ্গে কিন্তু প্রেমিকের কাছে ফিরে যাবার সময় এল কি এবার?

খবর পাঠালেন অধম খান,—রূপমতী, এবার চোখের জল মুছে তৈরি হয়ে নাও। আমি নিজেই তোমার অনুগ্রহের ভিখারি।

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন রূপমতী। উত্তর পাঠালেন যে, তিনি শুধু একজনের বন্দিনী। অন্য কোনও পুরুষের খেলনা হতে রাজি নন।

বন্দিনী রূপমতী মনের দুঃখে গান করতেন,—

তুম বিনা জিয়রা রহত রহত মাংগত হৈ সুখরাজ।
রূপমতী দুখিয়া ভই বিনা বহাদুর বাজ॥

তোমার বিহনে হৃদয় বার বার সুখের জীবন আকাঙ্ক্ষা করছে। ওগো বাজ বাহাদুর ছাড়া যে রূপমতী দুঃখিনী হয়ে আছে।

কিন্তু যার হৃদয়ই নেই হৃদয় গলানো দুঃখের গানেও তার পাষাণ গলবে কী করে?

অনেক মিনতি করলেন রূপমতী।

থোড়ো রাখো মান, আলিজা, থোড়ো রাখো মান।
হাথী মাংগু, ঘোড়া মাংগু, পৈদল পাঁচ পচাস

রণজীত বালে নগারা মাংগু, উদয়পুরকে রাজ।
চাঁদী মাংগু, সোনে মাংগু, তাকে লড়তো তলাক।
বাঘ সারু বীরো মাংগু, চুড়িলা রী পতরাখ।

আমার সামান্য মান রাখো, আলিজা (অধম খান), শুধু মানটুকু বজায় রাখো। যদি আমি হাতি চাই, কী ঘোড়া চাই, কী পাঁচ কী পঞ্চাশ জন পদাতিক চাই; যদি আমি যুদ্ধের জয় ঘোষণা করার কাড়া-নাকাড়া চাই বা উদয়পুরের রাজপাট চাই, বা রুপো কি সোনা চাই তাহলে তুমি আমায় ভাগিয়ে দিয়ো। কিন্তু বাঘ মারতো যে বীর আমি শুধু তাকেই চাচ্ছি। ওগো, আমার চুড়ির মর্যাদা রাখো।

হায় রাজপুতানীর চুড়ির মর্যাদা! মল্লার রাগে রচা এই মিনতির গানেও আলিজার মন গলল না।

—আচ্ছা বেশ। স্বেচ্ছায় না হয়, জোর করে তোমায় আমার আপন করে নিতে আমি জানি।

অধম খানের হুকুম শুনে রূপমতী তাকে অভিসারের সময় দিলেন।

সাজলেন তিনি সব চেয়ে দামী পোশাকে, সুন্দর গহনায়। ফুলে ফুলে সুরভিতে দীপমালায় ভরে গেল মিলনকুঞ্জ। বাইরে বাজতে লাগল রূপমতীর নিজের রচনা করা গানের সুর। ফুলশয্যায় শুয়ে রূপমতী নিজের হাতে টেনে দিলেন মুখের উপর ঘোমটা। যা বাধা রচনা করে সাধকে দেয় বাড়িয়ে। এখনই যে আসবে বাসরশয্যায় নতুন প্রেমিক।

এলেন অধম খান। জলদে বাজতে লাগল গানের সুর। আরও যেন মদির হয়ে উঠল ঘরের মধ্যে দীপের মালা, ফুলের সৌরভ। আবেশে বিহ্বল হয়ে হাঁটু গেড়ে রূপমতীর মুখের উপর থেকে খসিয়ে দিলেন ঘোমটা নিজের অসহিষ্ণু হাতে। চকিতে যেন কালসাপ দংশন করল তাঁকে ফণা তুলে। মৃত্যুর বিবর্ণ ছায়ার কাল সাপ।

বিয়ে হয়নি রূপমতীর বাজ বাহাদুরের সঙ্গে। হয়নি কোনও মিলনের বেদমন্ত্র পাঠ বা কাবিলনামায় সাক্ষী রেখে সই। পুরুষ তাঁকে শুধু জন্ম দিয়েছিল নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাচওয়ালীর সাধারণ জীবন যাপন করবার জন্য। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন একনিষ্ঠার জীবন। বরণ করেছিলেন মরণকে শুধু একজন প্রেমিকের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বলে। মনোহরণের সবরকম ছলাকলায় নিপুণা একজন নর্তকী মাত্র। কোনও একটি পুরুষের প্রতি নিষ্ঠায় তাঁর ছিল না প্রয়োজন; না ছিল পুরুষের কাছ থেকে কোনও সহানুভূতির প্রত্যাশা।

তবু এই প্রেম এই পবিত্রতা নিষ্ঠার চিহ্ন হিসাবে তার তো' দরকার ছিল না হাতে কোনও লক্ষ্মীর লোহা, সীমন্তে কোনও সিঁদুরের ছোঁয়া। ঘরে ঘরে যাঁরা সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে যান, উলু দিয়ে শঙ্খধ্বনি করে স্বামী ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করেন, মনের গহনে তাদেরই এক জন হয়ে গেছেন নর্তকী মালবিকা রূপমতী।

উত্তর কলকাতার গলির মোড়ের নীলকণ্ঠ কেবিনের আড্ডা থেকে উদয়পুরের মহারানার সহেলী বাগে তর্কাতর্কি পর্যন্ত সব আলোচনা, সব মানসিক প্রশ্নের এখানেই শেষ হোক, শান্তি হোক।

সাত

ডাণ্ডা হাতে একদল বুনো মেয়ে হঠাৎ পথ রুখে দাঁড়াল।

আরে থামা, থামা, মোটর থামা। শশব্যস্তে খাঁটি বাংলায় হেঁকে উঠলাম আমি। ভুলেই গেলাম যে, এটা বাংলা নয়, রাজোয়ারা। শুধু রাজোয়ারাই যে তা-ও নয়। একেবারে ভীলোয়ারা অর্থাৎ ভীলদের দেশ। কে বা বোঝে বাংলা, কে বা বোঝে মেয়েদের হাতে ডাণ্ডা দেখে বাঙালির উৎকণ্ঠা।

হোলীর দিনে এ কি অঘটন রে বাবা!

নেমে এলেন সামনের সীট থেকে মাথার পাগড়ি হাতে দোলাতে দোলাতে ঠাকুর সাহেব। বিপদে তিনি ঘাবড়ান না; বীরত্বে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। ব্যাপারটার একটা ইতিহাস আছে। রাজোয়ারার সব জহরব্রত, গেরুয়া রঙের কাপড় পরে শত্রু মেরে মরা, জান দেঙ্গা তবু মান না দেঙ্গা, এসব অমর ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবার মতো একটা ইতিহাস। সে গল্পটা—থুড়ি, গল্প হলেও সত্যি—এখানে একটু বলে রাখি।

ঠাকুর-সিংহের ছিল প্রকাণ্ড একখানা জায়গীরদারি। নামটা না হয় না-ই ফাঁস করে দিলাম, কারণ তিনি

এ নিয়ে অনেক লড়াই করেছেন। অবশ্য বিশ শতকের হাতিয়ারহীন লড়াই। ভেবে দেখুন—সেই পূর্বপুরুষের সময় থেকে ভোগ করা জায়গীর। যার জন্যে বছরের পর বছর পনেরো জন ঘোড়সোয়ার মজুত রাখতে হত তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং তাঁকে নিজেকেও। যখন দরবারের হুকুম হবে, অমনি লড়াই করবার জন্য ছুটে আসতে হত। সামন্ত-তন্ত্র অর্থাৎ ফিউডালিজমের মজাই হচ্ছে এখানে। রাজা দিচ্ছেন জমি, নিজের রাজত্ব যাতে বজায় থাকে সেজন্য। যে পাচ্ছে তাকে সব সময় জমির বদলে দিতে হবে "জান"—যখনই দরকার পড়বে। নিজেদের জায়গীরের মধ্যে চুরি বা জুলুম করতে পারবে না, ব্যবসাদার ও বিদেশীদের রক্ষা করতে হবে। যত বড় জায়গীর সে অনুসারে লড়াইয়ের সময় দিতে হবে সিপাই। যদি লড়াই কখনও না-ই হল তো প্রাণের খাজনাটা আর দিতে হল না। কিন্তু সিপাই মজুত ঠিকই রাখতে হবে। দরবারও সামন্তদের যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন, আর বিপদে-আপদে রক্ষা করবেন। ঠিক যেমনভাবে সামন্তদের কাছে দরবার আশা করেন যে, তারা নিজের প্রজাদের সমান এবং প্রাণ রক্ষা করবেন।

এ হেন কর্তব্য ঠাকুর সাহেবের বাপ পিতামহরা ঠিকই করে যাচ্ছিলেন। তবে এই বিনিময়ের বন্দোবস্তে এ যুগে জায়গীরদারদের বেশ সুবিধাই হচ্ছিল। ব্রিটিশ শান্তি অর্থাৎ প্যাক্স ব্রিটানিকার দৌলতে নিজেদের মধ্যে মারামারি হানহানি তো আর ছিল না। কাজেই জায়গীরদার তোফা আরামেই ছিলেন। বেশি আরামে মাথাটা শূন্য হয়ে থাকলে. আবার নাকি তাতে ভূতও ঢুকে পড়ে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর সাহেব বলেছিলেন এ কথা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছিলাম আমিও। বেপরোয়া ভাবে দুরন্ত জীবন উপভোগ করার বাসনাকে ঠাকুর সাহেব ভূত মনে করেছেন। কিন্তু হায়, এই সাদামাঠা চার দিকে গণ্ডী কাটা সুশীল সুবোধ বাঙালি জীবনে একটি বার সেই ভূতের নৃত্য যদি ঘটে ওঠে তো মন্দ হয় না। খেটে খেটেই তো দিনগুলো কাটল। পরান বঁধুরে—বলে হেঁকে পায়ের উপর পা তুলে বসব, আরামের ভূতটাকে একটু পেয়ার করে নেড়েচেড়ে দেখব তার ফুরসতই মিলল না।

যাক সে নসীবের কথা! ঠাকুর সাহেব এদিকে বিপদে পড়লেন। পাশের জায়গীরদারের সঙ্গে জায়গীরের মালিকানা নিয়ে বাধল মামলা। তুমুল সে মামলা—একেবারে প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরই হার হল। এবার তিনি কী করবেন, আন্দাজ করতে পারেন?

ভেবে দেখুন "কথা ও কাহিনি"র সেই চমৎকার কবিতাটি। চিতোরের রানা কুম্ভ হারা (হর) বংশের বুঁদির রাজার কাছে মার খেয়ে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 'বুঁদির কেল্লা যতক্ষণ মাটির উপর থাকবে, ততক্ষণ আর তিনি জলস্পর্শ করবেন না"। এ দিকে বুঁদি যে কী চিজ, তার বিলক্ষণ প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। তাকে হজম করা তাঁর কর্ম নয়। অথচ প্রতিজ্ঞাটাও করে ফেলেছেন। আমাদের গলির মোড়ে পায়ে চলার রাস্তার কোণে মাটি খুঁড়ে গাব্বু বানিয়ে তাতে পাথরের গুলি বসিয়ে অন্য খেলুড়েদের যে রকমভাবে দিব্যি দিই—"নট নড়ন-চড়ন নট-কিচ্ছু", একেবারে ঠিক তাই। মুরদ নেই, কিন্তু দিব্যি দিয়ে ভাতের উপর রাগ করে বসে রইলেন রানা।

শেষ পর্যন্ত সর্দাররা নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার মতো একটা ব্যবস্থা বাতলালেন। রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল নকল বুঁদি-গড়। ছুটে এলেন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রানা কুম্ভ। এবার বুঁদির-গড় আর মাটির উপর মাথা তুলে থাকতে পারবে না।

কিন্তু রানারই আশ্রিত এক সামন্ত, বুঁদির হরবংশের বীর, শিকার থেকে ফিরে আসবার সময় ব্যাপারটা এক চোখ দেখেই বুঝে নিল। বুঁদির এত বড় অপমান! কখনও নয়, কখনও নয়। একজন হরবংশীও বেঁচে থাকতে কখনও নয়।

মহাবীর একা ধনুকবান নিয়ে রানার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে লেগে গেলেন। কানেও তুললেন না তাদের শাসানি আর চোখরাঙানি। প্রাণ দিয়ে বংশের মান রেখে গেলেন। বিনা রক্তপাতে নকল বুঁদি-গড়ও রানা মাটিতে লুটিয়ে দিতে পারলেন না!

এ হেন লম্বা পাগড়ির ঝুলওয়ালা হচ্ছেন আমাদের ঠাকুর সাহেব। তিনি আজ প্যাক্স ব্রিটানিকার যুগে খুশি মতো তরোয়াল চালানো আর প্রাণ নেওয়ানেয়ির কারবার নেই বলেই কি বিনা লড়াইয়ে জায়গীরখানা শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারেন? মামলায় না হয় হারই হয়েছে। কিন্তু বীরধর্ম তো একটা আছে?

এ দিকে যে জায়গীরদার মামলা জিতেছেন, তিনিও একই দরবারের জায়গীরদার। তাঁর বিরুদ্ধে

হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করাও যে স্বামিধর্মে বাঁধে। কি করেন এখন ঠাকুরসাহেব?

হায়! জোর যার মুলুক তার, সত্যযুগেরই সাধু নিয়মটা বাতিল হয়ে গেছে এই ঘোর কলিযুগে। এমন কি দরবারে ভালো করে ভেট আর সেলামি দিয়েই যে কাজ হাসিল করে নেওয়া যাবে, সে পথও বন্ধ। দুষ্ট লোকেরা সে জিনিসটাকে "ঘুষ" এই বদনাম দিয়ে রেখেছে। তার উপর আবার সাগরপারের প্রিভি কাউন্সিল একেবারেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইংরেজরা আবার সেলাম আর সেলামি কোনোটাতেই হুকুমের নড়চড় করে না, এমন একটা অখ্যাতি আছে।

কিন্তু এই শ্রদ্ধাহীন বেয়াড়া চালের ঠাট্টা মশকরা ছেড়ে দিন মশায়! এদিকে আমাদের ঠাকুর সাহেবের যে ধনও যায়, মানও যায়। সেই সেকালের কথায় লড়াইয়ের ফ্যাসানটা বজায় থাকলে প্রাণটা না হয় দিতে পারতেন। কিন্তু হায়, আদর্শের পথ থেকে নেমে এসেছে এই হৃদয়হীন বৈশ্যযুগ। তাই সে পথটাও খোলা নেই।

অথচ বংশের সম্মান যে কত বড় জিনিস, তা আমরা যারা থোড়-বড়ি-খাড়া জোগাড় করতেই প্রাণান্ত হচ্ছি দিনকে দিন, সেই আমরা বুঝব কী করে? বুঝেছিলাম শুধু তখন, যখন ঠাকুর সাহেব অণ্টালা কেল্লা দখলের কাহিনি আমায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর নিজের পূর্বপুরুষের বাহাদুরীর একটা সত্যি গল্প করছেন। অবশ্য যে দুই বড় সামন্ত বংশ এই গল্পের নায়ক তিনি তাঁদের কোন্ বংশের লোক, তা ফাঁস করলেন না আমার কাছে।

জাহাঙ্গির চিতোর দখল করে রানাকে মেবারের পাহাড়ে জঙ্গলে ভাগিয়ে দিলেন। কিন্তু তা বলে রানার সামন্তদেব বীবত্ব তো আর কমে যায়নি! না কমে গিয়েছিল তাদের বংশের সম্মান রক্ষার দিকে কড়া নজর। তাই হঠাৎ যখন অণ্টালা কেল্লা ফিরে দখল করবাব সুবিধা এসে গেল, তখন কোন্ বংশ সৈন্যদের আগে আগে লড়তে যাবে তা নিয়ে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। মহারানা সৈন্য সামন্ত নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। সমতল দেশটুকুর প্রান্তে এই দারুণ শক্তভাবে পাথরে-গড়া পাহাড়ী কেল্লাটা আচমকা আক্রমণ করে দখল করতে হবে। কেল্লার "পোল" অর্থাৎ ফটক মোটে একটি—তার গায়ে বড় বড় লোহার কাঁটা বসানো। হাতির শক্ত চামড়া পর্যন্ত ফুঁড়ে যাবে তাতে। কাজেই হাতির চাপ দিয়ে সে ফটক ভেঙে বা খুলে ফেলা সম্ভব নয়।

চন্দাবৎ গোত্র ববাবর মেবারের সৈন্যদলের সামনে থেকে লড়াই করে এসেছে এ পর্যন্ত। এটা তাদের পাওনা সম্মান। সবার আগে মরতে পারার অধিকাব।

কিন্তু শক্তাবৎ গোত্রও তো ফেলনা নয়! হালের বহু লড়াইযে তাদেব হাতিয়ারের হিম্মৎ নতুন এক হক তৈরি করে নিয়েছে। তার উপর এই কেল্লাটা তাদেবই এলাকায় ছিল। কাজেই চন্দাবৎরা প্রথম মবতে পাবে কিসেব অধিকারে?

লেগে যায় আর কি নিজেদের মধ্যে এখনই!

পুরানো কলকাতার এঁদো গলিতে ততোধিক পচা বীরত্বের অভিনয় আমরা করে থাকি। বড় রাস্তার মোড়ে গুণ্ডা দাঁড়িয়ে থাকলে, গলির মোড়ে নিরাপদ দূরত্বে কে আগে দাঁড়াবে, সে নিয়ে মারামারি নেহাত কম হয় না। কিন্তু এ যে বড় রাস্তায় আগে এগিয়ে এসে মার খাওযা। ফাঁকিঝুকির পথ নেই একেবারে।

বুদ্ধিমান রানা বললেন—যে গোত্র আগে অণ্টালায় ঢুকতে পারবে, সামনে এগিয়ে লড়বাব অধিকার হবে তারই।

অণ্টালা চলো। চলো অণ্টালা।

শেষ রাতে রওনা হল দু'দল। একই সময়ে। এত দিন তাবা পাল্লা দিয়ে এসেছে। কিন্তু কারা বড় বীর তার ফয়সালা হয়ে যাবে চূড়ান্ত ভাবে। সামনে শত্রু—দুর্ভেদ্য পাহাড়ি কেল্লার মধ্যে। পিছনে, পাহাড়ের ওপারে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে স্ত্রী পরিবার। বীরদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে তাদের চারণ দল। গাইছে তাদের গোত্রের পূর্বপুরুষদের বীরগাথা। জোগাচ্ছে নতুন বীরত্বের প্রেরণা।—

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

শক্তাবৎরা সোজা চলে এল দুর্গের দরজায়। ভোর তখনও হয়নি, শত্রু তখনও তৈরি নয়। কিন্তু দেওয়ালে তারা দাঁড়িয়ে গেল সারি সারি। শুরু হল তুমুল লড়াই।

চন্দাবৎরা এ এলাকায় বিদেশী। কাজেই পথ ঘাট ঠিক মতো জানা নেই। জলাভূমি পার হয়ে তারা পৌঁছাল একটু দেরিতে। কিন্তু বুদ্ধি করে সঙ্গে এনেছিল দড়ির মই। চন্দাবৎ সর্দার চট করে উঠে পড়লেন দেওয়ালের মাথায়, কিন্তু গোলার ঘায়ে তাঁর নিজের মাথা ফিরে এল দলের মাঝখানে। মেবারের সৈন্যদলের সবার সামনে দাঁড়িয়ে লড়তে যাওয়া তাঁর কপালে হল না।

দু'দলই বাধা পেয়ে গেল।

শক্তাবৎ সর্দারের সঙ্গে ছিল হাতি। কিন্তু ফটকের গায়ের লোহার কাঁটা বার বার হাতিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। সূচের মতো ধারাল কাঁটাতে হাতির চামড়া ফুঁড়ে যাচ্ছিল। চারদিকে গাছের পাতার মতো ঝরে পড়তে লাগল শক্তাবৎদের মৃতদেহ। ওদিকে চন্দাবৎদের তুমুল চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ওটা কি ওদেরই জয়ধ্বনি?

আর তো দেরি করা চলে না। শেষে কি চন্দাবৎরাই জিতে যাবে? তাদেরই থেকে যাবে সবার আগে মরতে এগিয়ে যাবার অধিকার? নেমে এলেন শক্তাবৎ সর্দার হাতিব পিঠ থেকে। দাঁড়ালেন পিঠ পেতে কেল্লার কপাটের লোহার কাঁটাতে। করলেন হুকুম মাহুতকে বুকের উপর দিয়ে হাতিকে ঠেলে দিতে। এবার আর হাতির গায়ে কাঁটা বিঁধল না। শক্তাবতের দেহই কাঁটাগুলিকে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কপাট আর কাঁটায় গাঁথা শক্তাবৎ সামন্তের দেহ ঢুকে পড়ল অণ্টালায়।

আর এ দিকে ততক্ষণে?

এ দিকে ততক্ষণে চন্দাবৎ সর্দারের মৃতদেহ অণ্টালায় ঢুকে পড়েছে। শক্তাবৎ সর্দার সেই জয়ধ্বনিই শুনে কপাটেব কাঁটাগুলিতে দেহ পেতে দিয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের গোলার ঘায়ে চন্দাবৎ সর্দারের দেহ কেল্লার দেওয়াল থেকে বাইরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার পরের নায়ক পাগড়ি দিয়ে সর্দারের দেহ বেঁধে নিলেন নিজের পিঠে। উঠলেন মই বেয়ে দেওয়ালের মাথায়। বর্শা দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন নিজের পথ। তার পর ঝাঁপিয়ে পড়লেন পিঠে বাঁধা শব নিয়ে কেল্লার মাটিতে। মুখে তাঁব জয়ধ্বনি। চন্দাবতের জয়। জয় চন্দাবৎ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কপাট মড় মড় করে ভেঙে পড়ে শক্তাবতের দেহ ঢুকিয়ে নিল কেল্লাতে। কিন্তু ততক্ষণে চন্দ্রাবতের সামনে দাঁড়ানোর অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

নিজের মান বজায় রাখবার জন্য যারা এমনি করে প্রাণ উজাড় করে দিত, সেই রাজপুত হয়ে ঠাকুর সাহেব এখন কী করেন?

সেই রূপকথার যুগের সহজ বিচারের পথ আব খোলা নেই। অসির বদলে রসনা যত দুর লড়াই করতে পারে, তাতে তাঁর হার হয়ে গেছে। লড়াইয়ে হেরে গিয়ে সে হার মেনে নিতে পারাও বীরধর্ম। তাই অপর পক্ষ—এ যুগে শত্রুপক্ষ বললে বেমানান হবে—তার জায়গীরের মাটিতে পা ফেলবার আগেই তিনি নিজে রাতারাতি স্ত্রী পুত্র পরিবার পাগড়ি আর তলোয়ারখানা নিয়ে জায়গীর ছেড়ে উদয়পুর শহরে চলে এলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সংক্ষেপে আমায় বলেছিলেন—কী করব আর? নিজের জায়গীর থেকে আমি ওদের সেখানকার মাটিতে পা ফেলতে দিতাম না। তরোয়াল দিয়ে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করতাম। তাই ছেড়েই চলে এলাম আগে ভাগে।

সেই ঠাকুর সাহেব মোটরের সামনে তুলেধরা ডাণ্ডা দেখে মাথা হেলিয়ে নেমে এলেন মোটর থেকে। অবশ্য খালি হাতে। কিন্তু তরোয়ালের স্বপ্ন এখনও তিনি দেখে থাকেন।

কাজেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও নেমে পড়লাম মোটর থেকে। দেখি, ব্যাপারটা কী।

সবাই নেমে পড়ল মায় আমাদের বালিকা কন্যা অনুরাধা পর্যন্ত। নিশ্চয়ই খুব মজার একটা কিছু হবে।

ভীল মেয়েরা ততক্ষণে ডাণ্ডা মোটরের সামনের কাঁচ থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের মাথার উপর ঘুরোতে শুরু করেছে। ওদের উদ্দেশ্য সাধুই ছিল। ঘুরছে রঙঝারীতে ছোপানো পরনের ঘাঘরা, লেহঙ্গা, গেঁয়ো সাজ। পায়ে বাজতে শুরু করেছে পাঞ্জের, অর্থাৎ পায়জোর। রুপোর, না হয় রুপালী ঘুঙুর। বাজছে মিঠে রুপালী সুরে।

গাইছে ওরা সোনালি আবেশে লুহর্ অর্থাৎ ডাণ্ডা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেহাতী আওরতের গান—

ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা
ঘুম্‌রেছে নখরালি,
নখরালি যাদুগারি সা
ঘুম্‌রে রমোবা মেজাসা।

খুশিতে সবাই একসঙ্গে নাচছে, সেজে-গুজে নাচছে। ওগো, যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করে দিয়ে নাচছে। খুশিতে সবাই একসঙ্গে নাচছে।

ওদের ঘুরে-ঘুরে নেচে যাওয়া দেখে, ফুলন্ত কেশোলা গাছগুলিতেও যেন নাচন শুরু হল। টুপ টাপ করে এদিক সেদিক থেকে মহুয়া ফুল ঝরে পড়তে লাগল। ভীলনীদের নাচ সাড়া দিয়ে জেগে উঠল ভীলোয়ারার অন্তর।

আমরাও দিলাম সাড়া, মন থেকে।

গত ক'দিন থেকেই লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ থেকে পেশোলা হ্রদে জলের খেলা দেখতে দেখতে হোলির খেলা দেখানোর জন্য অনুরোধ করেছি শ্রীরামগোপালজীকে। তিনি এই প্রস্তাবে তেমন উৎসাহ দেননি। শেষ পর্যন্ত একবার মৃদুস্বরে এ কথাও বলেছিলেন যে, ওসব দেখে আর কী হবে? এদেশে হোলিতে যা হয়, তার একটা সাফা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত মাজাঘষা নমুনা তো কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলেই দেখে থাকবেন। কাদা আর রঙ-গোলা নোংরা জলের খেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে তিনি প্রথম থেকেই আমল দেননি। এর পর যখন হোলির গান শুনতে চাইলাম, তখনও তিনি আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলেছিলেন।

শ্রীরামগোপালজী অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁর বিচারবুদ্ধিতে নির্ভর করতেন স্বয়ং মেবারের মহারানা। আমিও তাই করেছিলাম। কিন্তু এ যে অপরূপ সুন্দর এক হোলির গান। তার সঙ্গে মনমাতানো নাচ। শহুরে পালিশকরা লোকগুলিকে বনলক্ষ্মী আজ তাঁর ঘোমটা খুলে এ কী নাচ আর গান দেখালেন!

আমাদের অন্তরের খুশি ভাবটা উপচিয়ে উঠে ওদেরও উপর যেন ছড়িয়ে পড়ল। ওরা আরও বেশি খুশি হয়ে ডাণ্ডায় ডাণ্ডা ঠুকে ঠুকে তাল দিতে লাগল। আমাদেরও মাথা তালে তলে একটু দুলছিল না কি?

জানি না। তবে ঠাকুর সাহেবের মালবদেশ ঘেঁষা সবে খোয়া-যাওয়া পিতৃপুরুষের জায়গীরখানার কথা মনে পড়ল। তিনি ওদের প্রথমেই একটা মালবিকা মেয়েদের প্রিয়মিলনের গান করতে বললেন।

নববর্ষের প্রথম ন'দিন ধরে রাজোয়ারাতে গৌরী দেবীর পূজা আর উৎসব হয়। বাংলা দেশে আমরা যেমন শারদীয়া পূজার সময় প্রবাসী প্রিয়জনের ফিরে আসার পথ চেয়ে থাকি, রাজপুতরাও গাঙ্গোর পূজার সময় ঠিক তেমনভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শুধু শরৎ আর বসন্তে প্রকৃতির আর মানুষের মনের যেটুকু তফাত থাকে, সেটুকুর আলাদা ছায়া এসে পড়ে। গানে গানে মালবিকারা প্রিয়কে আবাহন করে—''মাতাল করা বসন্ত এসেছে। গাঙ্গোরের নিত্য রঙিন উৎসব এসেছে। হৃদয় আমার উতলা হয়ে উঠেছে। শরীরের ভরে উঠেছে গোলাপের সৌন্দর্য আর যৌবন। হে প্রিয় রসিক, তুমি তো প্রবাসে অনেক উপায় করেছ, এখন ঘরে ফিরে এসো। দিল্লির দুয়ারে নহবত বাজছে, এখন তুমি ফিরে এসো।''

নেচে নেচে রাজপুতানীরা গ্রামে গ্রামে গায় : —

হামারা প্যারা আজ তো
গুলাবী গাঙ্গোর ছে।
জোড়ী রা প্যারা আজ তো
বসন্তী গাঙ্গোর ছে।
হামারা প্যারা রাজা।

এমন আনন্দের সময় যদি স্বামী বাইরে বিদেশে যেতে চায়, তা হলে ভীল গ্রামবধূ কী গান গেয়ে তাকে বারণ করবে, তা-ও শোনাল ভীলনীরা।

মহ্‌রা মাতা নৈ মহিমদ ল্যাব।
মহ্‌রা হেজা মারু ইহাং হো রেবো জী।
ইহাং হো রহো উতজা সুরজ
ইহাং হো রেবো জী।

আমার মাথার দিব্য রইল; ওগো তুমি এখানেই থাক।

একেবারে বাংলা দেশের হৃদয়-নিংড়ানো কথা।

নতুন বিয়ের কনে স্বামীর ঘরে যাচ্ছে। মন যেতে চায় হয়তো, কিন্তু চরণ চলতে চায় না। চরণে নূপুর বাজিয়ে নেচে নেচে ভীলনীরা গাইল : —

মাতা বাইসেঁ মিলোয়া
দি রে হাতিলা বানরো।

ওগো একটুখানি দাঁড়াও, আমি মায়ের কাছে একটু বিদায় নিয়ে নিই।

হাওয়া একটু ভারী হয়ে আসছে দেখে, ঠাকুর সাহেব ওদের একটা বসন্ত পঞ্চমীর গান ধরতে বললেন। মালব দেশের কিশোরী মালবিকারা পানিয়াভরণে চম্বেলি অর্থাৎ চামেলী নদীর পারে যায়। গাগরী দোলে মাথায় আর পায়জোর নাচে পায়। নতুন ঋতুকে ওরা আবাহন করে গানে গানে, নতুন পাতা ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। গায় তারা প্রেমের গান, স্বপ্ন দেখে তারা প্রেমের আর রূপঅ্যাগের। ভরা থাকে, ভরা থাকে 'গাগরমে সাগর'।

ফুলে ফলে লাল মহুয়া শাখার তলায় বসে শুনলাম এক নতুন বৌয়ের গান। বেচারির স্বামী আগেই লুকিয়ে আর একটা বিয়ে করে রেখেছিল।

কৈসেঁ জুবার করুঁ রসিয়াসেঁ।
ডাল রে বাদল বিচ চমকে তারেঁ।
সাঁজ পরে পিন লাগেঁ প্যারো।
জোর করুঙ্গি জুবাব করুঙ্গি
তো রসিয়ারা মেলামেঁ রীজা রহুঙ্গি,
কৈসেঁ জুবাব করুঁ রসিয়াসেঁ।

প্রিয়তমের কাছে আমি কেমন করে নালিশ করব, ওগো! সে যে মেঘদলের মাঝখানে তারার মতো। সন্ধ্যায় তাকে আরও বেশি মিষ্টি দেখায়। আমি যদি নালিশ করি আর তর্ক করি, তা হলে তার সঙ্গে আমার জীবন সুখে কাটাব কেমন করে? ওগো, প্রিয়তমের কাছে আমি নালিশ করি কেমন করে?

রসিয়া, রসিয়া, ওগো রসিয়া। মাজাঘষা সংস্কৃত কাব্যের বিরহবিধুরা যক্ষপত্নীর প্রেমবিহ্বলতা নয়, রসিয়া এই ছোট্ট কথাটুকুর মিঠে রেশ সমস্তটা দেহ-মন-আত্মাকে প্রেমের রসে বিহ্বল করে তুলল।

কালিদাসের উজ্জয়িনী কি আজ ফুটে উঠল রঙ-ঝরানো মহুয়াতলায়? হয়তো তার যুগেও কোনও প্রেমবিহ্বলা নায়িকার মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠত এমন করুণ আন্তরিকতা ভরা আপনঢালা গান। সুসভ্য সংস্কৃত কাব্যের শত মুগ্ধা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকার ছবি আমার এই উজ্জয়িনীর বাইরের পল্লীবালার গান শুনে নতুন রূপ ধরে এল! এরই আপনভোলা আপনঢালা প্রেমের জন্য মরুভূমির মতো মন তৃষিত হয়েছিল এতদিন।

এবার শুনতে চাইলাম পুরুষদের হোলির গান। আমরা শহুরে সভ্য জীবনে একালে পুরুষদের গান প্রায় ভুলে গেছি। মেয়েরা গান শেখে বিয়ের জন্য। কখনও বা তাতে সংসার চালাবার সুবিধাও হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ঘরে ছেলেরা সাধারণ দিনগুলিকে ভরে তুলবার গান শিখবে কিসের তাড়ায়?

তবু ভাবলাম যে, এই বন্য অঞ্চলে ছেলেরাও তো পায় প্রকৃতির প্রেরণা। শুধোই ওদের পুরুষদের হোলির গানের কথা।

অমনি বেরিয়ে এল একখানা ধামাল নাচের গান। পুরুষরা রঙভরা পিচকারী নিয়ে গায়--

রঙ ঝিনো, রাঠোরাকা রঙ ঝিনো,
ভূপতো বড়ে ভারী
গড়তো বিকানো।

রাঠোররা রঙ খেলছে। রঙ খেলাচ্ছে। এত বড় বাহাদুর শানদার আদমী। বিকানীরে তার বাস। তবুও কেমন খেলছে।

পরদেশী পুরবিয়াদের দেখেই এই গানখানা বেছে বের করল কি না কে জানে? একটু চঞ্চল হয়ে উঠলাম। পল্লীবালাদের চঞ্চল চরণের নাচনে মনে যে চলেছে অনুরণন।

সতৃষ্ণ চোখে তাকালাম পশ্চিমের কোণে। আরাবলী পাহাড়ের চূড়াগুলি পার হয়ে, মরুভূমি পার হয়ে

আরেকটি সুন্দর দেশে গিয়ে নজর ঠেকল।

সে হচ্ছে ইরান। বুলবুল আর গোলাপ, সাকি আর সুরার দেশ। আঙুরের মতো রমণীয় সাকি আর আঙুরের রস-নিংড়ানো সুরার দেশ।

এমনি একটা মরুপ্রান্তরের পাশাপাশি শ্যামল স্নিগ্ধ কোনাটুকুর ছবি। সে ছবির রূপ দিয়েছেন হাফিজ তাঁর অমর লেখনীতে—

খুশি হও মোর হিয়া,
প্রভাতের বায়,
ওই আসে পুলকিয়া
সে দিনের প্রায়,
পুনঃ আসে সাথে নিয়া
মিঠে বারতায়।

উটের ক্যারাভ্যান চলেছে প্রান্তর দিয়ে। তাদের গলার ঘণ্টার আওয়াজে তিনটি কিশোরী ঘুম থেকে জেগে উঠল। সেই ক্যারাভ্যানের সঙ্গে সওদা চলেছে সুগন্ধির, জহরতের, তুকতাক করে মনোহরণের বেসাতীর। কিশোরীরা তাড়াতাড়ি স্নান সেরে পোশাক পরে নিল। পরল তারা ইরানি মরুভূমিতে অরুণোদয়ের রঙের, গোলাপী রঙের, হালকা বেগুনি রঙের পোশাক। সাজিয়ে রাখল তাদের স্বপ্নগুলিকে ফুলের মতো থরে থরে, বেসাতী যাত্রার পথে মনে মনে ছড়িয়ে দেবে বলে। ওরাও ওই পথেই চলে যাবে। সব চেয়ে বড় কিশোরীটি প্রেমে পড়ার জন্য যেন তৈরি হয়েই ছিল। ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজ তার মনে প্রেমের আহ্বান এনে দিল। সেই আহ্বানে সে অন্য দুটি কিশোরীকেও সাড়া দিতে শেখাল—

ওগো সাথী, মম সাথী,
আমি সেই পথে যাব সাথে।

কিন্তু ওরা যে বিয়ের জন্য বাগ্‌দত্তা। গ্রামেরই ছেলেদের কাছে। তারা এসে ওদের হাত ধরে বাধা দিল, জানতে চাইল কেন ওরা চলে যেতে চাচ্ছে? কোথায় যেতে চাচ্ছে?

কিন্তু কী উত্তর দেবে ওরা? দিগন্তের ওপারে যে বিশ্ব, চলন্ত ঘণ্টার টুংটাঙের মধ্যে যে বাণী, তার মর্ম ওরা বোঝাবে কী করে এই বিয়ের জন্য বসে থাকা রেগে ওঠা তরুণদের? শেষে ওরা নাচতে নাচতে তাদের রাগ জল করে দিল। নাচের মোহে, যাদুমন্ত্রে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারা যখন আবার জেগে উঠল, তখন ওরা চলে গেছে মোহনিয়ার ডাক অনুসরণ করে। আর ওরা ফিরবে না। ফিরবে না ওই মরুপারের গাঁয়ে।

ইরানি মরুপ্রান্তরের প্রেমবিহ্বলা এই কিশোরীরা যেন তাদের হাসির আর নাচের ছন্দে ছন্দে জেগে ওঠা ঢেউয়ের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে মিলিয়ে গেল। তাদের আর দেখতে পেলাম না। তাদের সেই ব্যাকুলকরা রঙ ঝরানো পোশাকগুলি পর্যন্ত না।

কবি সাদী তো ঠিকই লিখেছিলেন—

ওগো ক্যারাভ্যান, ধীরে চল ধীরে, মনের শান্তি যায়;
আমার ছিল যে হিয়াখানি তারে মনচোর লয়ে যায়।
পণ্ডিত জনা দেহে আর হিয়ে পৃথক্ করিতে চাহে না;
আপন আঁখিতে আমি যে হেরেছি, হিয়া আর মোর রহে না।

সত্যিই, হিয়া আর মোর রহে না।

ব্যাকুল হয়ে পল্লীবধূদের কাছে আরও নিবিড়ভাবে আপনাদের, আরও পুরোপুরি খাঁটি দেহাতী গান শুনতে চাইলাম। বললাম—এমন গান শোনাও যা শুধু তোমরাই গেয়ে থাকো এই মরুভূমির পারে শ্যামল বন-প্রান্তরে—যা গাওয়া হয় না সভ্যতার পালিশ করা শহুরে বৈঠকে।

ওদিকে তকিয়ে দেখি, ঠাকুর সাহেব প্রাণপণে ইশারা করে কী যেন বলতে চাচ্ছেন। মুখের চেহারা দেখে মনে হল যেন কিছু একটা বারণ করতে চাইছেন, কিন্তু চোখের চেহারায় সেটা মালুম হল না।

শেষ পর্যন্ত তিনি রামগোপালজীর নামটা শুধু বললেন।

জানি, রামগোপালজী কী রকম গান আর কবিতা এই রাজধানী দিল্লি শহর থেকে আসা লোকগুলির জন্য ফরমাস দেবেন। তিনি চারণদের মুখে আমায় শুনিয়েছিলেন দুঃসাহসী রাঠোর বীর মাড়োয়ারের রাজা

যশোবন্ত সিংহের লেখা কবিতা।

মুখ শশি বা শশি সোঁ অধিক
উদিত জ্যোতি দিনরাতি।
সাগর তে উপজি নয়হ
কমলা পর তা সোহাতি।
নৈন কমল য়ে এন হৈ, ঔর কমল কেহি কাম
গমন করত নৌকী লগৈ, কনকলতা য়হ বাম।

মাথা নেড়ে বলেছিলাম—সাধু, সাধু। আওরঙজেব এঁর ভয়ে সর্বদা অস্থির থাকতেন, আর শেষ পর্যন্ত আফগানদের ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কাবুলে পাঠিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হন। অনেকের বিশ্বাস, দিল্লিশ্বর সেখানে বিষ খাইয়ে এই মরুভূমির কাঁটাকে উপড়িয়ে ফেলেন। সেই বীরের কবিতা আমায় মুগ্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু এই কবিতা আর সমসাময়িক পুরানো বাংলা কবিতার ভাব আর ভাষার খুব বেশি তফাত নেই। তা ছাড়া এই কবিতা তো দিল্লিতে বসেও উপভোগ করতে পারতাম। তাই তার চেয়ে দিন নতুন কোনও জিনিস।

তখন বের হল ভারি সুন্দর আর একটি কবিতার ডুয়েট।

বিকানীরের রাজার ভাই পৃথ্বীরাজ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁকে মোগল দরবারে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বীরত্বে আর কাব্যপ্রতিভায় তাঁর জুড়ি তখন আর কেহ ছিল না। তিনিই আকবরের সভা থেকে মেবারের মহারানা প্রতাপকে এমন একখানি কবিতা লিখে পাঠান যা পেয়ে মহারানা আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে নতুন উৎসহে যুদ্ধে নামেন ও মেবার আবার জিতে নেন।

এহেন বীরকবি পৃথ্বীরাজ স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেক বয়সে আবার বিয়ে করেন। কথাতেই আছে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্'। কিন্তু এই বিষকে কবি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতা কলাবিধৌ' করে নিয়ে অমৃত বানিয়ে নিলেন। যশলমীরের রাওলকন্যা চম্পাদেবী আর তাঁর স্বামী পৃথ্বীরাজের একটি ডুয়েট কবিতা ডিংগল ভাষার অমর কাব্য 'রূপমণি-মঙ্গল' থেকে রামগোপালজী আমায় শুনিয়ে দিলেন।

পৃথ্বীরাজ দাড়ি থেকে একটা ধোলা অর্থাৎ সাদা চুল উপড়িয়ে ফেলে দিচ্ছেন। তরুণী স্ত্রীর যেন নজরে না পড়ে। কিন্তু পিছন থেকে তা দেখতে পেয়ে চম্পা হাসতে শুরু করলেন। আয়নাতে চম্পার মুখে হাসি দেখে পৃথ্বীরাজ বললেন : —

পীথল ধোলা আবিয়াঁ; বহুলো লাগি খোড়।
পুরে জীবন পদমিনী, উভী সূঁহ মরোড়॥
পীথল পলী ঠমুক্কিয়াঁ, বহুলী লগ গই মোড়।
স্বামিনী হাঁসা করে, তালী দে মুখ মোড়॥

এমন রসাল অথচ ব্যথায় ভরা কবিতা শুনে, স্বামী পীথল অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের মনের গ্লানি মেটাবার জন্য চম্পা সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে উত্তর দিলেন : —

প্যারী কহে পীথল শুনো,
ধোলাং দিস মত জোয়।
নরাং নাহরাং ডিগমিরাং
পাকাং হো রস হোয়॥
খেড়জ পক্কা ধোরিয়াং, পঙ্কজ গ উধাং পাব।
নরাং তুরংগাং বনফলাং পক্কাং পক্কাং সাব॥

ভরাযৌবনা পদ্মিনী স্ত্রী স্বামীকে পাকা চুল উপড়াতে দেখে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে হাতে তালি দিচ্ছে। স্বামীর মুখে সে সম্বন্ধে কবিতা শুনে স্ত্রী উত্তর দিচ্ছে যে, শোন শোন, প্রিয়ার কথা শোন। মানুষ, সিংহ আর দিগম্বর অর্থাৎ সন্ন্যাসী পাকা অর্থাৎ পরিপূর্ণ হলেই রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পৃথিবীতে আর কোনও স্বামী তাঁর স্ত্রীকে কবিতা রচনায় শিষ্য করে এমন পুরস্কার পেয়েছেন কি না জানি না।

কিন্তু কোথায় এখন রামগোপালজী আর তাঁর সুসভ্য কাব্যসুধা? আমি যে ভীলোয়ারার অন্তরে বসে বনবালাদের কাব্য আর গীতে সুরার মতো রস পেয়ে গেছি। তাই শুনতে চাইলাম, ওদের একেবারে নিজস্ব

গোপন কথার গানগুলি।

এবার ভীলনীরা চোখে হানল লক্ষ বিদ্যুতের ঝিলিক। হাসি মুখগুলি ঢেকে নিল রঙিন ঘোমটার আড়ালে। মাটিতে পাজের-পরা পা-গুলি তাল ঠুকে জানিয়ে দিল যে, মনের মতন কিছু একটার জন্য এবার তৈরি হচ্ছে ওরা।

ওই আধো সভ্য আধো বসনে ঢাকা কোকিলরা প্রাণ ঢেলে গলা পঞ্চমে তুলে কী যেন গাইল। কোনও পাওয়া না পাওয়ার বেদনায় রাঙানো অনুরাগের গান। কেমন না জানি সে অনুরাগ—যা এই হোলির খেলায়, এই প্রাণের মায়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বনে বনে। যে ময়ূর আর হরিণগুলি আপন খেয়ালখুশিতে ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখে যাচ্ছিল, তারাও যে হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! ওরাও যেন কান পেতে শুনতে লাগল, এই ভীলনীদের হোলির গান। পৃথিবীতে আর কোনও গান শুনতে কি কখনও দাঁড়িয়ে পড়ে ময়ূর আর হরিণ? এই বিশ শতকে? এই আণবিক বোমার বাজারে?

কী সে গানের কথাগুলি? যদি দেখা পেতাম, কালিদাসকে মিনতি করতাম সে গানের আবেগকে ভাষায় ফোটাতে, তানসেনকে অনুনয় করতাম সে ঝঙ্কারকে রূপ দিতে। সে গানের কথাগুলি কী?

ভীলনীদের প্রিয়তমদের দেহে হোলির দিনের ফাগের রঙ এসে পড়েছে প্রিয়ারাই সে রঙ ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কে যে কার গায়ে রঙ ছুঁড়েছিল তা কেউ স্বীকার করছে না। এদিকে ওদের গায়ে আগুনরাঙা ফাগের স্পর্শে সত্যি সত্যিই আগুন লেগে গিয়েছে। সারা গায়ে সর্ব ইন্দ্রিয়ে। এ আগুন নেভাবে কী দিয়ে? দাউ-দাউ করে জ্বলছে যে আগুন!

তার পর কী হল?

নাঃ। সে আগুনের আঁচ আমার এ কলমে সইবার ক্ষমতা নেই। মাপ চাইছি।

আট

শেরির গ্লাস এগিয়ে দিলেন সেই ফরাসি ভদ্রলোকটি। জয়পুর মহারাজের গেস্ট হাউসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও বেশ ভাব হয়েছিল।

রাজস্থানে এসে রাজপুত পরিবেশের মধ্যে একে বিশ শতকের প্রতি সন্ধ্যার সামান্য শেরী বললে রাজোয়ারার অমর্যাদা করা হবে। মনে করতে হবে, এ হচ্ছে কোনও সোয়াই রাজার আদর করে দেওয়া মনোয়ার পিয়ালা—অর্থাৎ আমন্ত্রণ পত্র।

অবশ্য আরকের বদলে শেরি।

হায়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণটা যখন তখন দিয়ে ফেলার দিন আর নেই। তাই সন্ধ্যার শান্তিবারি শেরিই আজকাল যথেষ্ট মনে করতে হবে।

কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়ে সবিনয়ে তা ফেরত দিলাম। বললাম যে মর‍্যালিস্টরা যে কারণে 'কারণ' করেন না সে জন্য নয়। ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ। তবে আপনি নিশ্চয়ই পান করুন। কারণ বন্ধুরা 'সামাজিক মাত্রায়' পানানন্দ করলে আমার আপত্তি নেই· আর তাদের খুশি দেখলে নিজেও খুব খুশি হই।

ভদ্রলোকের চোখে দুষ্টামির হাসি ও মুখে রঙ্গরসের আভা। বললেন,—রোমে এসে রোম্যানদের মতো চলতে হয়।

হেসে উত্তর দিলাম,—সেটা হচ্ছে শুধু রোমে। তবে কথা দিচ্ছি যে, প্যারিসে এসে ঠিক আপনার মতো চলতে চেষ্টা করব।

উত্তর পেতে দেরি হল না। বেশ তো তাহলে রাজপুতানায় একটু আফিম দিয়ে শুরু করুন।

আলোচনাটা জমে উঠল।

বাবর হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন তুর্কি এবং মোগলের অত্যাচারে তাঁর পৈতৃক রাজ্য ও সুখ শান্তি সব গিয়েছিল। সারা জীবন তাদের সঙ্গে লড়াই করে অস্থির হয়ে শেষে হিন্দুস্থানে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন ইতিহাস পরিহাস করে তার নাম দিল মোগল সাম্রাজ্য।

সেই বাবর নিজের দেশ মধ্য এশিয়া থেকে আর কিছু না আনতে পারুন এনেছিলেন আঙুর ও খরমুজা। এদেশে এ দুটি এই প্রথম আমদানী হল। তাঁর প্রপৌত্র জাহাঙ্গির আমদানী করলেন তামাক। কিন্তু

আফিম যে কে এনেছিলেন তা কেউ জানে না। আফিম ছাড়া পুরাতন যুগের রাজপুত চরিত্র ও জীবন কল্পনাই করা যায় না। যারা রাজস্থানে বিদেশী অথবা ঘরভেদী বিভীষণ তারা পেছনে পেছনে বলে থাকে যে, এই আফিমের সাময়িক নেশায় বুঁদ হয়ে থাকাই রাজপুত বীরত্বের বড় কারণ। এটা কিন্তু নিছক পরনিন্দার কথা। কারণ রাজপুতের বীরত্বের উৎস হচ্ছে তার হৃদয়ে আর ঐতিহ্যে। বাইরের কোনও মাদকতায় নয়। তার বীরত্বের কাহিনি অন্যকে দিয়েছে মাদকতা; কিন্তু মদিরায় তার জন্ম নয়। শস্য, মূল, ফল এসবের নির্যাস থেকে রাজপুতরা আরক তৈরি করত আর আফিমের ফুল থেকে করত আফিম। মাধোয়ারা পিয়ালা অর্থাৎ মাতোয়ালা পাত্র ছিল ওদের চিরকালের সামাজিক অনুষ্ঠান। আম্‌ল্‌ অর্থাৎ আফিমের পেয়ালা এগিয়ে দিলে একই সঙ্গে অভ্যাগতকে চা দেওয়া ও আশ্রিতকে রাখীবন্ধন দেওয়া হয়ে যেত।

বংশের কুলপ্রদীপ জন্মাল—বিলাও সবাইকে আফিম। কোনও খোশ্ খবর এল—বের কর বাড়ির সবচেয়ে বড় গামলাটা, মেশাও তারমধ্যে জলের সঙ্গে আফিমের দলা, কাঠি দিয়ে খুব ভালো করে নাড়তে থাক যতক্ষণ না সেটা খুব ভালোভাবে গলে মিশে যায়। আর পাড়ার সবাইকে বিলোবার জন্য অত কৌটো বা বাটি কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সবাই হাতে হাতে অঞ্জলি করে মন্দিরে চরণামৃতের মতো আম্‌ল্‌ চাখতে থাকে। বাইরের লোক তখনই বুঝে নেবে যে, বিশেষ একটা পরব চলছে এ বাড়িতে।

আরব বেদুইনের ও রাজপুতের শপথ করা আর শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়ার রীতি ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রচলিত আছে। কথার জন্য মাথা দিতে ওদের তুলনা নেই পৃথিবীতে। রাজপুত যখন পাগড়ি বদল করে বা ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে অথবা এক সঙ্গে আফিম খেয়ে কোনও কথা দেয় তখন সে কথা বজায় রাখবার জন্য সে প্রাণ দেবে, কিন্তু মান খোয়াবে না।

অবশ্য এ যুগে আফিমের সে দিন নেই। রাজপুতেরও সে দেমাক নেই।

এ যুগের কথায় ফিরে এলেন আমার সন্ধ্যার সঙ্গী। তিনি নালিশ করলেন যে, ভারতবর্ষে সামাজিক মেলমেশা, ভাবের আদানপ্রদান ও সাংসারিক সৌহার্দ্যের বড় অভাব। যে দেশে ধর্ম এত উদার, এত বহু ধারায় দিকে দিকে বয়ে যাচ্ছে, যে দেশে মানুষের মন এত কোমল, সে দেশে সমাজ এত কঠিন কেন? সংসার এত কঠোর কেন? পূজায় পার্বণে উৎসবে বারোয়ারীতে এত মেলামেশা, এত হট্টগোল! কিন্তু প্রতিদিনের প্রতি সন্ধ্যার ব্যাপারে এত কচ্ছপের মতো নিজের খোলার মধ্যে লুকিয়ে থাকা কেন? এত নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকার অসামাজিকতা কেন?

আমার কিন্তু বর্তমান যুগে, হালের কালে ফিরে আসার কোনও ইচ্ছা ছিল না। যা রোজ চোখের সামনে দেখছি, যা সব সময় অনুভব করছি চারদিকে তা যে কোনও সময় বিচার করা যাবে। তার যাচাই করে দেখুক ভবিষ্যৎ। অতীতকেই আমি বর্তমানে অনুভব করতে চাই। বর্তমানে—সংসারের হাত থেকে আমার দুদণ্ডের নিষ্কৃতির সময়টুকুতে।

তাই বললাম,—আমাদের অসামজিকতার সম্বন্ধে নালিশ নতুন নয়। পাঁচ শ' বছর আগে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরও সেটা লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, প্রশংসা করবার মতো আরাম হিন্দুস্থানে খুব কমই আছে। এখানে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গসুখের, দিলদরিয়া ভাবে মেলামেশা করার বা অন্তরঙ্গতার আনন্দ যে কি তা লোকে জানেই না। এদের ব্যবহারে নেই ভদ্রতা, আচারে নেই সহানুভূতি, বিচারে নেই পরের মনের দিকে তাকানোর কোনও প্রয়োজন।

এ যুগেও বিদেশীরা আমাদের সম্বন্ধে তাই মনে করে থাকে।

সন্ধ্যার বন্ধু বাধা দিয়ে বললেন, কিন্তু বাবর তো এদেশে এসেছিলেন শত্রু হিসাবে, আক্রমণকারী হিসাবে। তিনি এদেশের লোকের মন ও সামাজিকতার কথা কী করে জানবেন অত তাড়াতাড়ি?

উত্তরটা খুব সহজ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকলে এসব বুঝতে মোটেই সময় লাগে না। বাবরের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ফতেপুর সিক্রিতে রানা সঙ্গের উপর জয়। মেবারের রানার সঙ্গে সৈন্য ও সামন্ত ছিল বাবরের চেয়ে অনেক বেশি। এই মাত্র একবার রাজপুতরা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘ তৈরি করেছিল। রানা সঙ্গ যে সঙ্ঘ দাঁড় করিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো জোর বাবরের ছিল না। তবু সঙ্গের হার হল। হিন্দু হেরে গেল বীরত্বের অভাবে নয়, বন্ধুত্বের অভাবে। বিশ্বাসের অভাবে।

শুধু গোলাবারুদের বিক্রমের চোটে নয়, গলাগলি করে এক প্রাণ হয়ে যুদ্ধ করার অভাবে।

ফতেপুর সিক্রির (খানোয়া গ্রামের) যুদ্ধের বর্ণনায় বাবর সঙ্গের সেনাদলের সম্বন্ধে লিখছেন যে, সঙ্গের অশ্বারোহীদের মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়ংশ এর আগে তাদের প্রভুভুক্তির পরিচয় দিয়ে এসেছিল। বেশির ভাগ ছিল শৃঙ্খলাহীন লোকের দঙ্গল, যারা তাকে কোনোদিন নেতা বলে স্বীকারও করেনি। রাজপুত সঙ্ঘ ''সাঙ্গার'' অধীনে একত্রিত হয়েছিল বটে, কিন্তু একতাবদ্ধ হয়নি। একত্র আর একতা এক জিনিস নয়।

এই যুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিয়েছিল একজন হিন্দু রাজা। যে সময় বাবরের সেনাদল ভয়ে অসহায় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আর বাবর নানারকম চেষ্টা করে তাদের সাহস ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করছিলেন। ঠিক সে সময়েই রানা সঙ্গের এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু বোঝাচ্ছিলেন যে, মোগলদের আক্রমণ করার কোনও দরকারই নেই। সঙ্গ তাই বাবর সন্ধি করবেন এই আশায় বসে থেকে সুবর্ণ সুযোগ ছেড়েই দিচ্ছিলেন। প্রায় এক মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পর বাবর যখন যুদ্ধে নামলেন তখন সন্ধির প্রস্তাবের ঘটক রাইসিনের রাজা শিল্লাদি, রাজপুত সেনার ঠিক মাঝখানে সাজানো ও সামনে এগিয়ে রাখা সৈন্যদল নিয়ে বাবরের সঙ্গে যোগ দিল।

ভারতের ইতিহাসে জয়চাঁদ শুধু একজন নয়। বহু বহু সংখ্যায় তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিজেদের অক্ষয় কালিমা স্বদেশের মুখে লেপে দিয়েছে।

কিন্তু সঙ্গ আর বাবরের ব্যক্তিত্বের তুলনা করলে এই যুদ্ধের ফলাফলের কারণ তার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সঙ্গ ছিলেন রাগী, অহঙ্কারী। তার আধিপত্যে ছিল শৌর্য, সখ্য নয়। তিনি ছিলেন বীর, কিন্তু কারও বন্ধু নয়। তাঁর সামন্ত দলে ছিল বশ্যতা, ভালোবাসা নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল প্রভাব, কিন্তু প্রীতি নয়।

হিন্দুর স্বদেশপ্রেম বলতে খুব পরিষ্কার দৃঢ় ধারণা ছিল না। যুদ্ধ করতে যেত শুধু জাত ক্ষত্রিয়রা—তাও শুধু রাজার জন্য এবং ভূইয়াঁতন্ত্রের (feudalism) বাধ্যবাধকতার খাতিরে। সেই রাজাই যদি হন রাগী ও একরোখা, সৈন্যরা লড়বে কার কথায়?

অন্যদিকে একবার বাবরকে বিচার করে দেখা যাক। তাঁর অন্যান্য অস্ত্র, রণকৌশল প্রভৃতি সুবিধা ছাড়াও বড় যে গুণটি ছিল তা প্রত্যেক নায়ক ও সেনাপতির পক্ষে খুব বড় জিনিস। তা হচ্ছে অন্তরের টান। বন্ধুবাৎসল্যে তার উৎস, সহানুভূতিতে তার সঞ্চার।

সেই চরিত্র মাধুর্যের কথায় ফিরে আসা যাক।

ইসলামে মদ খাওয়া বারণ। কিন্তু মধ্য এশিয়া ও তাতারিস্থানের মুসলমানদের মধ্যে মদ বাদ দিয়ে উৎসবই হত না। মদ ছিল প্রতিদিনের বিলাস। তবু অনেক বয়স পর্যন্ত বাবর নিজে কখনও মদ স্পর্শ করেননি, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আর অন্যান্য উপজাতির সর্দারদের আনন্দে বাধা দেননি বা বিরক্ত বোধ করেননি।

একদিন পূর্বপুরুষ তৈমুরের বংশের প্রধান শাখা মীর্জাদের নিমন্ত্রণে বাবর তাদের তারেবখানা অর্থাৎ প্রমোদ-ভবনে গেলেন। খানার পর পিনা শুরু হল। আমরা খানার আগেই আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক প্রভৃতি মিষ্টি কথায় অভ্যর্থনা করে শরবত বা ওই জাতীয় কিছু দিই। তারপর শুরু হয় খাওয়া। ওরা খাওয়ার পরই নিমন্ত্রিতদের তরল আবাহন আরম্ভ করল। তার পর বার বার এমনভাবে পেয়ালা ভরা ও শেষ করা হল যেন যে জল না হলে প্রাণ বাঁচে না, তাই বুঝি পান করা হচ্ছে। বাগ-ই-জাহান-আরার মধ্যে প্রমোদভবনে সবারই মন গরম আমেজে ভরে উঠল। মীর্জারা বাবরকে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। একবার ভালো করে মাতাল হলে কি রকম লাগে তা যাচাই করে দেখবার যে মনে মনে লোভ ছিল তা বাবর স্বীকার করতেন। তিনি ভাবলেন যে, দেখা যাক না একবার এই বাধার নদী পার হয়ে, দেখা যাক না ওপারে কী সুখ অপেক্ষা করছে। ছেলেবেলায় চারদিকে অনেককে মদ খেতে দেখেছিলেন কিন্তু প্রলোভন অনুভব করেননি। এমন কি, নিজের বাবা যখন মদ খেতে অনুরোধ করেছেন তখনও তিনি রাজি হননি। নীতিবাগীশ বলে তাঁর এত দুর্নাম হয়ে গিয়েছিল যে, যে উঠতি বয়সে নতুন জিনিস চেখে দেখার দারুণ লোভ জন্মায় তখনও তাঁকে কেউ এ সুখে দীক্ষা নিতে অনুরোধই করল না।

আর নিজের সভাসদ্‌রা রাজার প্রতি সম্মান দেখিয়ে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে দরজা বন্ধ করে মাসে বছরে একবার তারা প্রাণ ভরে পান করে নিত। কিন্তু নির্ভয়ে নয়, সভয়ে। যদিও সাগ্রহে।

এমন অবস্থায়, বিশেষ করে যখন মীর্জাদের অনুরোধ একবার প্রত্যাখান করে ফেলেছেন—তখন এই নিমন্ত্রণে কী করে আর প্রথম দীক্ষা নেওয়া যায়। তিনি এই বাধার কথা তাদের গোপনে জানালেন। কাজেই

এবারকার মতো তাঁরা তাঁকে আর জোর করলেন না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই আর একটা উৎসবের আয়োজন করা হল। সবচেয়ে বড় মীর্জা তাঁর বিখ্যাত বাগ-ই-জাহান-আরাতে অর্থাৎ ভুবনশোভা বাগানে মকাউভিখানার (আরামঘরে) বাবর ও তাঁর সঙ্গী সভাসদ্ সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। বাবর কখন লক্ষ্য করছেন না তা নজর করে এরা লুকিয়ে লুকিয়ে এক চুমুকে এক এক পেয়ালা শেষ করে আবার সাধু সেজে যেতে লাগলো। অবশ্য এতটা সাবধান হবার কোনও দরকার ছিল না। কারণ এরকম সামাজিক ভোজের চলতি নিয়ম অনুসারে পান করতে বাবর কোনও আপত্তির কারণ দেখতেন না। যাই হোক, এই উৎসবে আপত্তির শেষ কারণ দূর হয়ে গেল।

পান বিড়ি সিগারেটে পর্যন্ত যে অনভ্যস্ত তাঁর মুখ থেকে পানোৎসবের কাহিনি শোনা বড় আমোদের—বললেন ফরাসি বন্ধুটি। আরও এরকম কাহিনি শোনবার জন্য অনুরোধও করতে লাগলেন।

আমার নিজের দিক থেকেও কোনও আপত্তি ছিল না। যুদ্ধের বাজারে দুর্লভ ককটেল পার্টিতে আমিই নাকি যোগ্যতম বন্ধু যার হাতে ওয়াইন সেলারের চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

আর একবার বাবরের পালাজ্বর হতে লাগল। দু'দিন তিন দিন বাদ ধরে জ্বর আসে। শিরা কেটে রক্ত বের করা ছিল তখনকার দিনে, এমন কি, একশ বছর আগেকার আমেরিকাতেও, এসব ব্যাপারে মোক্ষম চিকিৎসা। সেই চিকিৎসাও করা হল, তবু জ্বর ফিরে ফিরে আসে। একবার ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায় আবার আসে। হায় মালোয়ারীর কোন ওষুধের বোতল তখনকার দিনে ছিল না, না ছিল সর্বজ্বরহর বটিকা। হাকিম নার্গিস ফুলের রেণু মিশিয়ে মদ দিলেন; কিন্তু ম্যালেরিয়া তাতে নরম হল না।

এমন সময় একজন প্রিয় বন্ধু আজকাল যাকে বলে ড্রিংক পার্টি তাই দিতে চাইলেন। বাবর জানতেন যে, হাসবার সময় সারা পৃথিবী সঙ্গী হয়, কিন্তু কাঁদবার সময় হতে হয় নিঃসঙ্গ। তাই ছেলেবেলা থেকেই অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ, পৈতৃক রাজ্য হারানো ও রাজ্য গড়ার নোঙরহীন জীবনে কখনও অপরকে নিজের মনোভার চাপাতে চাননি। শুধু অনুকূল পবনে মাঝদরিয়ায় সুখদুঃখের সাথীদের নিয়ে এক সঙ্গে পাল তুলে বেড়িয়েছেন। এ সময় হিন্দুস্থানে ও আফগানিস্থান প্রান্তে ভারতীয় ও আফগানরা বিদ্রোহ করে তাঁর প্রতিনিধি শাসনকর্তা হিন্দুবেগকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তবু তিনি এই উৎসবে সম্মতি দিলেন। নিজের ভারে তো আর সারাদিন নুয়ে থাকা যায় না।

বাবর বললেন—আমার বন্ধুবান্ধবরা আনন্দে আত্মহারা হবে আর আমি গুরুগম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে থাকব এ কখনও হতে পারে না। তোমরা আমার কাছে এসে আনন্দ কর। নিজের বহু যত্নে সাজানো চেনার বাগে ঢুকবার মুখেই ছিল সুরতখানা অর্থাৎ ছবিঘর। সেখানে এই উৎসব হল। মুখে মুখে একটি কবিতা বানিয়ে তিনি বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই তুর্কি রুবাই কবিতার বাংলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায় :—

বন্ধুরা মম আজিকার এই
রূপের গোলাপ বাগে।
পান উৎসবে পরস্পরের
সঙ্গসুধায় জাগে॥
বঞ্চিত আমি তাহাদের প্রিয়
সঙ্গমাধুরী ব্রতে।
শত প্রার্থনা তবুও করেছি—
বাঁচো অনিষ্ঠ হ'তে॥

দিল্লিতে জাতীয় দলিল ও পুঁথিপত্রের দপ্তর ন্যাশনাল আরকাইভে বাবরের আত্মজীবনীর একটি বাইশ হাজার টাকা দিয়ে জোগাড় করা কপি আছে। নানা রঙে ও সোনায় আঁকা দুশো তিরাশিখানা প্রাচীন ছবিতে সাজানো বইখানাতে এই কবিতার মূল রুবাইটি আছে।

কিন্তু বাবর ছিলেন যোদ্ধা। লড়াই করা যার নেশা, শুধু কবিতার বড়াইয়ে তার আশা মিটবে কেন? একটু পরে গায়ে জ্বর নিয়েই অসুস্থ অবস্থাতেই খচ্চরে টানা চৌদোলা তখৎ-রওয়ানে চড়ে বন্ধুদের মাঝখানে হাজির।

বন্ধুরা বান্দা হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

এই বন্ধুরাই বাবরের ফতেপুরে সিক্রির যুদ্ধজয়ের পাণ্ডা।

ওরা রানা সঙ্গের বিশাল সৈন্যদল দেখে ও রানার বিক্রমের কথা শুনে কাবুল যে কত ভালো জায়গা আর হিন্দুস্থানের স্বাস্থ্য যে কত খারাপ সে সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করে পিছনে হঠবার পথ ঠিক রাখছিল। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো মহম্মদ শেরিফ নামে এক জ্যোতিষ এসে জুটল তাদের দলে। সে গণনা করে সবাইকে বলল যে, মঙ্গল গ্রহ তখন পশ্চিমে উঠেছে এবং যে কেউ উলটা দিক থেকে অর্থাৎ দিল্লি আগ্রার মতো পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করবে সেই হেরে যাবে।

বাবর তখন চারদিকে কামান সাজিয়ে গোলন্দাজ ও বরকন্দাজদের ভালো করে তালিম দিতে লাগলেন। চারদিকে লুটপাট করিয়ে সবাইকে উৎসাহ দিবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

শেষ পর্যন্ত একদিন ঘোড়া চড়ে সৈন্যদের ঘাটি পরীক্ষা করতে করতে ভেবে দেখলেন যে, বড় একটা লাভের জন্য বড় একটা ত্যাগ করা দরকার। হিন্দুরাও গয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়ে 'সফল' পাবার জন্য জন্মের মতো একটা ফল ত্যাগ করে। কিন্তু সে হচ্ছে মনকে চোখ ঠারার মতো। সত্যিকারের ত্যাগ তার মধ্যে কিছুই থাকে না। কারণ বিশেষ কিছু ভাগ মাখানো থাকে না ওই ফলের মধ্যে। যে জিভ আম কাঁঠাল ও মর্তমানের স্বাদে অভ্যস্ত সে জিভে নিমফল আর এ জীবনে খাব না এই মানত করার মধ্যে ত্যাগটা কোথায়?

যাহা চাই তাহা ঠিক পেতে চাই,
যাহা পাই তাহা ছাড়ি না।

বাবব কিন্তু সত্য সত্যই একটা বড় ত্যাগ করলেন। মদের মধ্যে তিনি প্রথম প্রণয়ের মাদকতা পেয়েছিলেন। সেই মদ একেবারে ছেড়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। ঠিক সে সময় তাঁর এক বন্ধু সুদূর কাবুল থেকে ফিরে এল। বাবরের ফরমায়েস ছিল গজনীতে বানানো বাছা বাছা সেরা মদ। তিন সারি উটের পিঠে চাপিয়ে পাঁচ শ' জন লোকের সঙ্গে তা আনানো হয়েছিল। কী বিরাট এলাহি ব্যাপার তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

এই এরোপ্লেনের যুগে কোনও বন্ধু সন্ধ্যাবেলা কলকাতায় গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছ কিনে রাতারাতি নাইট প্লেনে করে তা দিল্লি নিয়ে এলে আমরা যা সোরগোল লাগাই তার ঢেউ দক্ষিণে কুতুব মিনার থেকে উত্তরে কাশ্মীরী গেট পর্যন্ত কোন্ না কোন্ তেরো মাইল পৌঁছিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধবরা টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়েই দিনের সবচেয়ে গরম খবরটার সঙ্গে সঙ্গে ইলিশের গন্ধ পেয়ে যান। যাঁরা নেহাত আগে থেকে অন্য কাজে আটকিয়ে গিয়েছেন বলে আসতে পারেন না, তাঁদের আফসোসের ধোঁয়া ঝোলটা পাতে ঢালবার সময় নতুন করে দেখতে পাওয়া যায়। আর র‍্যাশনের বাজারে সপ্তাহের শেষ দিনটা যে নিশ্চয়ই চাল বাড়ন্ত হবে সে দারুণ দুশ্চিন্তাটাকে একবারও মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেওয়া হয় না। পান চিবোতে চিবোতে বন্ধুরা মনের সুখে দারোগা হওয়ার আশীর্বাদ করতে থাকেন।

আর সেই সাড়ে চার শ' বছর আগেকার দিনে উটের ক্যারাভান আসছে গজনী থেকে আগ্রা। মাসের পর মাস শত্রুর এলাকা, ডাকাতের আওতা এড়িয়ে খাইবার পাস ও পঞ্চনদ পেরিয়ে আসছে মদের জালা। এ যুগের পৃথিবীতে এক এভারেস্টের চূড়ায় চড়া ছাড়া এরচেয়ে শক্ত আর কোনও যাত্রার কথা ভাবা যায় না। জেট এরোপ্লেন কমেট তো সত্যি সত্যিই ধূমকেতু। পারসিয়ান কার্পেটের আরামে গা ঢেলে দিয়ে মাত্র ক'ঘণ্টায় সেই বিলেত থেকে বোম্বাই।

এমনই সেই মদ, হিসাব করে যার দাম ধরা যেত না সে যুগে। বিশেষ করে বাবরের মতো পানরসিকের কাছে সেই মদের কি দাম হতে পারত তা বুঝতে পারা শক্ত নয়। তা-ও বাবর ছেড়ে দিলেন। ভগবানের নামে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিলেন। ফারসি কবিতায় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন,

চন্দ্ বাশী জে মাসি মজাকুশ্
তোবা হাম্ বে মজে নিস্ত্ বাজুষ॥
আরও কতদিন পাপে মেতে থেকে
আনন্দ পাবি মন?
অনুশোচনারে আস্বাদ কর,
বড় সে মধুর ধন।

যত সোনা রুপোর পেয়ালা, গেলাস আর অন্যান্য মদ খাবার সাজসরঞ্জাম ছিল সব জড়ো করে তিনি ভেঙে ফেললেন। ওই দামী জিনিসের টুকরোগুলি পর্যন্ত যাতে সংসারী কারও হাতে না পড়ে সেজন্য সে সব দরবেশদের দিয়ে দিলেন। তারা সোনা রুপো বেচে গরিবদের সেবার কাজে সেগুলি লাগাতে পারবে। সে রাত্রে আর তার পরের রাত্রে সব আমির, পারিষদ্, সৈন্যরা এসে একে একে মদ ছাড়ার শপথ করে গেল। ওই মদের সবটাতে নুন ঢেলে নষ্ট করে দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হল। পরে সে জমিতে ভিখারিদের জন্য একটা বাড়ি বানানো হয়েছিল।

তারপর তিনি একটা ফারমান লিখে সকলের মধ্যে তা বিলি করলেন। ''আমরা ক্ষমাকারীর প্রশস্তি করছি। তিনি অনুশোচনাকারীদের ও যারা পাপ থেকে নিজেদের পরিষ্কার করে নিয়েছে তাদের ক্ষমা করেন। ...হে আমার স্রষ্টা, আমরা রিপু জয় করেছি। তোমার দলে আমাদের নিয়ে যাও, কারণ মনের মধ্যে আমি লিখে রেখেছি যে এই প্রথম আমি সত্যিকারের মুসলমান হয়েছি।''

তার আমির ও উজিররা এতদিন ভয়ে জড়সড় হয়ে মাথা নিচু করে থাকত। তারা রানা সঙ্গের নাম দিয়েছিল রানা শঙ্ক—এতই শঙ্কা হয়েছিল তাদের মনে। রাজপুতদের বিক্রমের চোটে বহু জেলা আর পরগণা বাবরের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এইরকম মনের অবস্থা যাদের তাদের নিয়ে যুদ্ধ চলে না। তাই সবাইকে এক সঙ্গে ডেকে তিনি মনের কথা সব বললেন; তাদের হৃদয় স্পর্শ করে বোঝালেন যে, মৃত্যুই হচ্ছে অমর হবার পথ। ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা থেকে তাদের শোনালেন যে,

যদিও মরিব, কীর্তিরে লয়ে
সন্তোষ পাব আমি।
কীর্তি আমারি, মৃত্যু যখন
হবে মোর দেহ-স্বামী॥

আরও বললেন যে, পরমেশ্বর আল্লাই তাদের এমন সৌভাগ্যের সূচনা এনে দিয়েছেন। তারা যদি যুদ্ধ করতে করতে মরে, শহিদ হতে পারবে। আর যদি বাঁচে, তাহলে গাজী হয়ে আল্লার পক্ষের জয় এনে দিতে পারবে।

এ যুদ্ধে কী ফলাফল হয়েছিল তা আপনি ইতিহাসের ছাত্র না হয়ে থাকলেও এতক্ষণে নিজেই বুঝে নিতে পারবেন।

শুধু তাই নয়।

রানা সঙ্গ তো আহত হয়ে যুদ্ধে হেরে মেবারের পাহাড়ের দিকে পালালেন। প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে না জিতে চিতোরে ফিরে যাবেন না। কিন্তু চিতোরে তাঁকে আর ফিরতে হয়নি। আবার সৈন্য সামন্ত সাজিয়ে যখন তিনি যুদ্ধের জন্য এগোবার বন্দোবস্ত করলেন তখন তাঁরই সর্দাররা লড়াইয়ের পর লড়াইয়ে হয়রান হয়ে এ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সঙ্গকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল। দেশ চুলোয় যাক, আমরা তো আরাম করি।

সঙ্গ ছিলেন একমাত্র রাজপুত রাজা যিনি সমগ্র সম্মিলিত রাজস্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সবাইকে নিয়ে বিদেশী বিধর্মী শত্রুর বিপক্ষে যুদ্ধে নেমেছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী বাবর বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিন্দুর এই স্বপ্ন সফল হবার নয়। তিনি লিখে গিয়েছেন যে, বড় বড় বংশের রাজা ও রায়রা, সর্দার ও সেনাপতি যারা এই যুদ্ধে সঙ্গের দলে যোগ দিয়েছিল তারা কেউ আগে কোনও যুদ্ধে তাঁর অধীনতা স্বীকার করেনি। এমন কী, নিজেদের মর্যাদাকে বড় করে দেখতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব পর্যন্ত রাখেনি। রাঠোর চৌহান কাছোয়া এসব বংশের রাজারা শিশোদীয়া বংশের রাজার কাছে মাথা নিজে থেকে নোয়াতে চায়নি। কাজেই হিন্দুপৎ রানা সঙ্গ শুধু নামেই ছিলেন হিন্দুপতি।

শুধু বীরত্ব অথবা হাসিমুখে মরবার ক্ষমতা দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। তাই রাজপুত বীরত্ব শুধু কবির অমর কবিতায় কীর্তি লাভ করে গেছে। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে সামনাসামনি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত কাজের বেলায় সার্থক হয়ে ওঠেনি।

মারি অরি ছলে বা কৌশলে। ছল তো দূরের কথা, ধর্মযুদ্ধে তার কোনও স্থানই হিন্দু শাস্ত্রকাররা রাখতে চাননি। কৌশলও আমাদের খুব উঁচুদরের ছিল না। রাজপুত ব্যক্তিগত বীরত্ব বা কষ্ট সইবার ক্ষমতাতে তুর্কি বা পাঠানের চেয়ে কিছুমাত্র কম যেত না। কিন্তু রাজপুত ঘোড়সোয়ার চড়ত দেশি বা পাহাড়ি

ছোট ঘোড়া, আর মুসলমান তার তুলনায় উল্কার মতো ছুটে আসত খোরাসানী (মধ্য এশিয়ার সব জায়গাকেই তখন হিন্দুরা খোরাসান বলত) টগবগে ঘোড়ায় চড়ে। মুসলমানরা হিন্দু সৈন্যদের বারবার ছত্রভঙ্গ করে হটিয়ে ও হারিয়ে দিয়েছে এই তেজী ও উঁচু ঘোড়ায় চড়া ঘোড়সোয়ার দিয়ে। রাজপুতের যুদ্ধযাত্রায় রোম্যান্স ছিল, স্ট্র্যাটেজি নয়। ঠমকে চমক লাগাত, কৌশলে কায়দা করত না।

সে রকম ঘোড়ার উত্তর ছিল হিন্দুর হাতি। আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় পুরু রাজার হাতিরা বিজয়-স্তম্ভের মতো দলবলে এগিয়ে এসে গ্রীকদের নাভিশ্বাস এনে দিয়েছিল। কিন্তু একবার হাতির নূতনত্ব চলে গেলে বর্শা আর দূর থেকে ছোড়া তীর দিয়ে হাতিকে অস্থির করে তুলে সৈন্যদের বিশৃঙ্খল করে দেওয়া খুব সহজ হত।

হাতির পিঠে চড়ে রাজারা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র লক্ষ্য করে সৈন্য চালনা করতে পারতেন। কিন্তু ঠিক তেমনি তারা নিজেরাও শত্রুপক্ষের সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষ্য হতেন। বার বার দেখা গেছে যে. হিন্দু রাজা বা সেনাপতির উপর দূর থেকে ভালো করে নিশানা করে শত্রুসৈন্য তীর ছুড়েছে। রাজা বা মাহুত যে কেউ জখম হলেই সৈন্যদের মধ্যে এমন হতাশ ভাব এসেছে যে, নেতার বিহনে তারা জেতা যুদ্ধও হেরে পালিয়ে গিয়েছে। শূন্য হাওদা দেখলেই সৈন্যরা আর ভেবে পেত না যে, কার জন্য যুদ্ধ করবে। মাহুত বা হাতি আহত হলেই চারপাশে এমন গোলমাল হত যে, স্বপক্ষের সৈন্যবাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেত। আলেকজান্ডারের সময় থেকে এই সাধারণ শিক্ষাটুকু হিন্দু রাজাদের কখনও হয়নি।

আর তারা শত্রুর নূতন রণকৌশল অনুসারে নিজেদের যুদ্ধপদ্ধতি বদলিয়ে নিতেন না। বাবরের সঙ্গে ছিল কামান, ছিল গোলন্দাজ ও বরকন্দাজ—যারা বজ্রের মতো কঠোর তীর বিদ্যুতের মতো বেগে ছুড়তে পারত। বহুদিন ধরে ফতেপুর সিক্রির প্রান্তবে বাবর তাঁর কম সৈন্যই ভালো করে সাজাচ্ছিলেন। যেখানে কামান ছিল না সেখানে দরকার মতো যাতে কামান তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনে বসানো যায় তার বন্দোবস্ত কবছিলেন। তীরন্দাজদের যাতে শত্রুর আক্রমণ থেকে আড়াল করা যায় তার বন্দোবস্ত করছিলেন। পাশ থেকে যাতে শত্রু হঠাৎ এসে হাজির না হতে পাবে সেজন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আর সেনাপতি থেকে সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত সবাইকে এক বাঁধনে ও বর্মে ঢেকে রাখা হয়েছিল—তা হচ্ছে ইসলাম। তাকে এগিয়ে যেতে হবেই, কারণ পিছনে পালাবার পথ নেই। কিন্তু রানা সঙ্গ সে সব কিছুই নজর করেননি। হাতে সময় ও সঙ্গে সাহায্য ছিল প্রচুর। কিন্তু শুধু ছিল না রণকৌশল। তাই তার অশ্বারোহী দল ঠাসা ব্যূহ রচনা করে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে এসে শত্রুর কামানের সহজ ও পাইকারি লক্ষ্য হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও রাজপুত বীররা এই এক প্রথায় যুদ্ধ করে গেছে।

সবার উপরে সর্বনাশ করল সেই হাতি ভারতীয় চতুবঙ্গের বড় অঙ্গ হাতি। তাব উপরে থেকে সঙ্গ সৈন্য চালনা করছিলেন আর বাবরের তীরন্দাজরা দূর থেকে এমন সহজ লক্ষ্যকে তাক করতে ভুল করেনি। একটি চোখ ও একটি বাহু রানার আগেই গিয়েছিল। এবারে তার কপালে হল তীরাঘাত। ভাগ্য এসে রাজপুতের কপালে করাঘাত কবে গেল।

হিন্দুর সিদ্ধিদাতা দেবতা হচ্ছেন গণেশ। স্থির, ধীর, অবিচল। কিন্তু তাঁর মুখে আছে হাতির প্রতিচ্ছবি। হাতি অচঞ্চল, কিন্তু হায় অপরিবর্তনশীলও বটে। তার গতিতে আছে যতি, যাযাবরতায় ভরা স্থাবরতা।

আমরা শুধু শেষের অংশটুকু বেছে নিয়েছি। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বেঁধেছি। সেটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

ইতিহাসের শিক্ষা আমরা কখনও নিইনি।

নয়

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সর্দার প্যাটেল মনে মনে শপথ করলেন যে, হিন্দুস্থান যখন স্বাধীন হয়েছে, এবার সোমনাথের ভাঙা দেউলের জায়গায় নতুন মন্দির গড়ে তুলতে হবে।

সমস্ত দেশ সে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় সাড়া দিল।

সোমনাথের কাহিনি ঠিক রাজস্থানের অর্থাৎ এ যুগে রাজপুতানা বলতে যা বুঝায় তার কাহিনি না হলেও রাজপুতের কাহিনি বটে। রাজপুতানার সঙ্গে তার খুব নিবিড় সম্বন্ধ। কারণ রাজোয়ারা বলতে সৌরাষ্ট্র

প্রভৃতি জায়গার রাজপুতদের দেশও বাদ দেওয়া ঠিক হবে না।

আর সোমনাথের আক্রমণ এসেছে রাজপুতানার বুকের উপর দিয়ে। গজনীর সুলতান মামুদ রাজপুতানায় উট জোগাড় করে বিকানীর আজমীরের পথে সোমনাথে এসেছিলেন। রাজস্থানে কোনও বাধাই পাননি।

সর্দার প্যাটেলের মতো আরও একজন সর্দার এ মন্দির সম্বন্ধে অন্যরকম একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

চাকতির দু পিঠের তুলনা এবার করে দেখা যাক।

মামুদের বাবা ছেলের জন্মদিনে অনেক দেবমূর্তি ভেঙে উৎসব করলেন। আর প্রার্থনা করলেন যেন ছেলেও এইরকম সুমতি পায়। পুত্ররত্নও রাজা হয়েই শপথ করলেন যে, প্রত্যেক বছর হিন্দুস্থান আক্রমণ করবেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে তিনটিরই সাধ তাহলে হাতে হাতে মেটানো যায়। তার উপর চতুর্থটিও ইহলোকের মতই নানারকম সুখের ডালি নিয়ে পরলোকে অপেক্ষা করবে। কাজেই মামুদের ও তার সৈন্যদের উৎসাহের অভাব ছিল না। এদেশের রাজাদের শরৎকালে দিগ্বিজয়ে যাবার প্রথা ছিল। তিনিও প্রত্যেক শরতের শেষে ভীষণ ঠাণ্ডা গজনী থেকে দলে বলে বের হয়ে হিন্দুস্থানের আরামদায়ক ঠাণ্ডায় কয়েকমাস কাটিয়ে গরমের সময় গজনীতে ঠাণ্ডা হবার জন্য ফিরে যেতেন।

পাঞ্জাবের এক রাজপুত রাজা জয়পাল একবার ভীষণ যুদ্ধ করে সুলতানকে বাধা দিলেন। তাব প্রায় তেরশো বছর আগে অর্থাৎ মানুষ যখন সভ্যতার আরও কিছু আগের ধাপে ছিল, তখন গ্রীক আক্রমণকারী আলেকজান্ডার ঠিক এমনিভাবে পাঞ্জাবে আর একজন রাজা পুরুর কাছে ভীষণ বাধা পান। পুরু ও জয়পাল দুজনকেই শত্রুব হাতে বন্দী অবস্থায় শত্রুপক্ষের রাজার কাছে শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়।

তারপর কি হল তার তুলনা করা দরকার।

পুরুকে আলেকজান্ডাব জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্দী, তুমি আমার কাছে কী বকম ব্যবহার আশা কব?"

পুরু উত্তর দিলেন, "বাজার মতো ব্যবহার।"

আলেকজান্ডার অবাক হয়ে এই বীরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

পুরু আবার নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বললেন, "রাজার মতো। এই যা আমি বললাম, এই কথার মধ্যেই সব বলা হয়ে গেছে।"

এর ঠিক তেরশো সাতাশ বছর পরে জয়পাল বন্দী অবস্থায় মামুদের সামনে আনীত হলেন। উতবী নামে এক ঐতিহাসিক তারিখ-ই-ইয়ামিনি বইতে লিখে গেছেন যে, "আল্লার শত্রু জয়পাল, তার ছেলেরা. পৌত্রবা, ভাগ্নেরা, সব সর্দাররা আর আত্মীয়রা ধরা পড়ল। দড়ি দিয়ে তাদের শক্ত করে বেঁধে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যারা বদমায়েসী করেছে. যাদের মুখে বিধর্মীর ধোঁয়া দেখা যায়, যাদের দুর্ভাগ্যের বাষ্প ঢেকে দিয়েছে, তাদের যেমনভাবে বাঁধা অবস্থায় নরকে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক তেমনভাবে। কারও কারও হাত পিঠের পিছনে বাঁধা। কারও গাল পাকড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল, কাউকে বা ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে। প্রকাণ্ড মুক্তা ও চকচকে মণি-চুনীতে সাজানো সোনার হারটা জয়পালের গলা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল। সেটার দাম ছিল দু'লক্ষ দীনার। ....আল্লা তাঁর বন্ধুদের এমন লুঠপাটের ধন দিলেন, যার কোনও মাপজোখ নেই, যা হিসাবেব বাইরে। তার মধ্যে ছিল পাঁচ লক্ষ সুন্দর পুরুষ ও নারী। তাদের ক্রীতদাস করা হল।"

জয়পাল অপমান সহ্য করতে না পেরে মুক্তি পাবার পর চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেন।

তার ছেলে আনন্দপাল উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র, কনৌজ, দিল্লি, আজমীর প্রভৃতির রাজাদেব সাহায্য নিয়ে মামুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেন। এই সময়ের রাজপুত নারীরা পরের যুগের রাজপুতানীদের মতই যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। তারা অস্ত্রশস্ত্র কিনবার জন্য নিজেদের সব গহনা বিক্রি করে দেয়। গরিবরা সৈন্যদের কাপড় বোনার জন্য নিজেরা বিনা পয়সায় সুতো তৈরি করা কাপড় বুনে দেয়।

এ যুগের বিশ্বযুদ্ধে বিলেত-ঘেঁষা আধুনিকারা দিল্লি কলকাতার রাজপথে মরণ-পণ করে রাস্তায় মিলিটারি মোটর চালিয়েছেন। ট্রাক, মোটর সাইকেল, জীপ নিয়ে ডেসপ্যাচ রাইডারের কাজ করেছেন। লাটভবনে বা স্বামীর বড়কর্তার কর্ত্রীর নেতৃত্বে পশমের মোজা, পুলোভার বুনেছেন—'ফ্রন্টে' যাঁরা লড়াইয়ে গেছে তাদের জন্য। কিন্তু ডেসপ্যাচ রাইডার হয়ে তাঁরা পরেছেন স্মার্ট মিলিটারি ইউনিফর্ম। মোজা, পুলোভার বোনার পিছনে রয়ে গেছে খবরের কাগজে ছবি উঠবার বা পরে অন্তত একটা ছোটখাটো খেতাব বা

নিদেন-পক্ষে সোনা-রুপোর না হোক ব্রোঞ্জের কাইজার-ই-হিন্দ্ মেডাল পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু তা বলে গহনা বিক্রি? নেভার নেভার।

সেবারকার আক্রমণে যুদ্ধ জিতে মামুদ গজনীতে এত ধনরত্ন নিয়ে ফিরে গেলেন যে, তার তুলনা পাওয়া যায় না। "অসংখ্য মণিমাণিক্য, মুক্তা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ঝকমকে বা বরফে জমানো লাল মদের মতো চুনী, চিরশ্যাম লতার তাজা শাখার মতো সবুজ পান্না, ডালিমদানার মতো ওজন আর মাপের হীরে।" এর পরের বার মথুরার মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করে করলেন পাঁচ পাঁচ গজ লম্বা খাঁটি সোনার পাঁচটি মূর্তি; চোখ তাদের মহামূল্য মণি দিয়ে তৈরি।

থানেশ্বর সে সময় হিন্দুদের কাছে মক্কার মতো ছিল শুনে মামুদ থানেশ্বব লুঠ করবেন ঠিক কবলেন। রাজা আনন্দপালের ভাই মামুদের কাছে গিয়ে মন্দিরটি বাঁচাবার জন্য মিনতি করলেন। বললেন যে, মূর্তি ধ্বংস করাই যদি সুলতানের পক্ষে বড় কীর্তি ও পুণ্য হয়, তাহলে তা তো এতদিনে অক্ষয়ভাবে অর্জন করা হয়েই গেছে। থানেশ্বরের মন্দির যদি রক্ষা পায়, তাহলে বছরে বছরে হিন্দুরা তাকে ভারী হাতে নজরানা দিতে রাজি আছে। নিবেদনকারী নিজেও পঞ্চাশটি হাতি ও অসংখ্য মণিমুক্তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন যে, মামুদ উত্তর দিয়েছিলেন যে, বিশ্বাসীদের (অর্থাৎ আল্লায় বিশ্বাসীদের) ধর্মে বলে যে পৌত্তলিকতা যত বিনষ্ট করা হবে ততই স্বর্গে পুরস্কার বাড়তে থাকবে। কাজেই থানেশ্বরকে কি করে বাঁচানো যায়।

সেবার গজনীতে দু' লক্ষ বন্দী আমদানি হল। প্রত্যেক সিপাহীর অনেকগুলি করে দাস ও দাসী জুটে গেল। গজনীকে যেন একটা হিন্দুস্থানেরই শহর বলে মনে হতে লাগল।

সোমনাথ মন্দিব ভাঙবার সময়ও মামুদ ঠিক এমনই উত্তর দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা নিবেদন করলেন যে মূর্তি অক্ষত রাখলে তারা মামুদকে বহু কোটি মোহর প্রতিদানে দেবেন। 'তারিখ-ই-আলফি'-তে বর্ণনা আছে যে, এই প্রস্তাবে মামুদের ওমবাহরা খুব খুশি হয়ে রাজি হন ও মামুদকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, একটা মূর্তির চেয়ে কোটি কোটি মোহরের দাম বেশি। কিন্তু মামুদ বলেন যে, শেষের সেদিন যখন আল্লা সবাইকে ডাক দেবেন সেদিন তিনি যেন টাকার জন্য পৌত্তলিকদের কাছে প্রতিমা বিক্রি করেছে যে মামুদ তাকে না ডেকে সবচেয়ে বড় প্রতিমা ভেঙেছে যে মামুদ তাকে ডাকতে পারেন। এই হচ্ছে সুলতানের মনেব একান্ত সাধ।

এই বলে মামুদ নিজেব হাতে খড়্গ তুলে সোমনাথের জ্যোতির্লিঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করেন। তাব ভিতরে এত মণিমুক্তা পাওয়া গিয়েছিল যে যত কোটি সোনার মোহর ব্রাহ্মণরা দিতে রাজি ছিল তার একশ গুণের চেয়ে বেশি তার দাম হবে।

আজ আমরা সেই মন্দির ও সেই জ্যোতির্লিঙ্গ আবাব প্রতিষ্ঠা করেছি সেই সোমনাথে। গুর্জর রাজপুতদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হবে হিন্দুস্থানের জনসাধারণের দেওয়া সামান্য সামান্য চাঁদা একসঙ্গে করে এই অসামান্য মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সেদিন সোমনাথের মন্দির রক্ষার জন্য হিন্দুস্থানে কোনও সাড়া পড়েনি। গজনী থেকে গুজরাটের পথে কোনও হিন্দুরাজা দেয়নি যুদ্ধ। কোনও গণজাগরণ দেয়নি বাধা। দুর্গ ভেঙে মামুদ যখন মন্দিরের দেওয়ালের নীচে এসে দাঁড়ালেন ভক্তরা ভগবানের আত্মরক্ষার ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই নিজেদের কর্তব্য সমাধা করেছিল। তারা পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীদের ঠাট্টা পর্যন্ত করেছিল। পবদিন মামুদের সৈন্যরা ভীষণ যুদ্ধ করে পাঁচিল-দখল করে ভিতরে নেমে পড়ল। কিন্তু যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে সে রাত্রিতে মন্দির আক্রমণ করল না। সারারাত্রি হিন্দুরা ভিড় করে মন্দিরে কাঁদল। বুক চাপড়িয়ে চোখের জলে ভগবানকে আত্মরক্ষা করতে জাগবার জন্য তারা ডাকল।

কিন্তু হায় ভক্ত যদি নিজে না নড়ে, ভগবান কাকে দেবেন সাড়া?

ভোর বেলা গজনীর সৈন্যরা আবার আক্রমণ করল। সরু সরু গলির প্রত্যেকটিতে হিন্দুরা লড়াই করে মরতে লাগল। লড়াই চলল মন্দিরের দরজা পর্যন্ত। তরবারির মুখে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু প্রাণ দিল সেই মন্দিরের সামনে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

একথা আমরা সংস্কৃত ভাষায় শুনি আর সংস্কারের বশে ভুলে যাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা বলহীন হয়ে থেকেছি, হাত জোড় করেছি আর নতশিরে মরেছি।

তবু আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে হারাইনি। শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিইনি।

চাকতির দু-পিঠের তুলনা করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। গুণগ্রাহী মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকেই তা তুলনা করে দেখা যাক।

মহম্মদ উফি তার 'জমাইউল হিকায়ত' নামে বইতে মুসলমান রাজত্বের প্রথম যুগের অনেক কাহিনি ও নিজের চোখে দেখা ঘটনা লিখে গিয়েছেন। তার মধ্যে আমরা মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ব্যবহারের সুন্দর উদাহরণ পাই।

যে সোমনাথের মন্দির মামুদ ভেঙে যান, তার কাছে গুজরাটের মধ্যেরই একটি ঘটনা।

সমুদ্রের পারে কম্বায়েৎ (কাম্বে) শহরে অনেক মুসলমান ও অগ্নি উপাসক থাকত। অগ্নি উপাসকদের প্ররোচনায় হিন্দুরা একবার সেখানকার মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়, আজান দেওয়ার মিনার ভেঙে ফেলে ও আশি জন মুসলমানকে মেরে ফেলে। মুসলমানদের তখনও সে অঞ্চলে কোনও রাজত্ব বা প্রভাব ছিল না।

মসজিদে খুতবা পড়ত যে খাতিব সে পালিয়ে গিয়ে রাজদরবারে নালিশ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাজার সভাসদ্‌রা কোনও নালিশ কানেই তোলে না। শেষে রাজা শিকারে যাচ্ছেন জানতে পেরে খাতিব পথে এক জঙ্গলে গাছের নিচে অপেক্ষা কবতে লাগল। রাজা যখন সেখান দিয়ে হাতি চড়ে যাচ্ছেন, তখন সে উঠে দাঁড়াল ও হিন্দি কবিতায় রচনা করা নালিশটি রাজাকে জানাল। রাজা শুনে খাতিবকে যত্ন করে দেখাশোনার বন্দোবস্ত করলেন। পরে রাজধানী অনহিলপট্টনে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য সব রাজকার্য দেখবার ভার দিয়ে অন্দরমহলে বিশ্রাম করবার জন্য চলে গেলেন।

কিন্তু বিশ্রাম নয়, বিচার।

সে রাত্রি রাজা রওনা হলেন ক্যাম্বে শহরে। দুদিন পরে সেখানে পৌঁছে সাধারণ সদাগরের ছদ্মবেশে বাজারে ঘুরে ঘুরে সব খবর নিলেন। নিয়ে বুঝতে পারলেন যে অকারণে মুসলমানদেব উপব অত্যাচাব ও তাদের হত্যা করা হয়েছে। তখন তিনি সমুদ্রের জল এক হাড়ি নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন ও বিচাব সভায় সব পক্ষকে ডাকলেন। যারা মসজিদ নষ্ট করিয়েছিল, তারা নিজেদের কুকীর্তি ঢাকবার চেষ্টা করল। তখন রাজা তাদেব সেই সমুদ্রের জলের হাঁড়ি দিয়ে সে জলে চুমুক দিতে বললেন। লোনা জল কেউ খেতে পারল না। তিনি তখন বললেন যে, সব ধর্মই সমান; অন্যধর্মী লোকদের কাছে কিন্তু ওই লোনা জলের মতো বিস্বাদ। কিন্তু তা বলে তিনি অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার হতে দিতে পারেন না।

তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সব প্রজাই ধর্মনির্বিশেষে তাঁর কাছে সমান আর তাঁর নিজের কর্তব্য তাদের সকলকে আশ্রয় দেওয়া। তিনি সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। তাই তিনি ব্রাহ্মণ ও অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য ধর্মীদের দু'জন করে নেতাকে শাস্তি দিলেন। মুসলমানদের মসজিদ ও মিনার আবার তৈরি করে নেবার জন্য দিলেন এক লক্ষ টাকা। আর ধর্ম সম্বন্ধে এই নালিশ তাঁর নজরে আনার জন্য খাতিবকে দিলেন চারটি পোশাক।

প্রায় ১২০০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলতামশের রাজত্বকালে লেখা এই ঘটনা। লেখক মহম্মদ উফি কাম্বেতে নিজে গিয়ে তার বহু আগে ঘটা এই ব্যাপারটির সব সত্যতা যাচাই করে এসে লিখেছিলেন।

তাঁরই লেখা আর একটি ঘটনা থেকে হিন্দু রাজাদের নারীর প্রতি ব্যবহারের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর সম্মান ও স্বাধীনতা সেযুগে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এদিকে সেদিকে নারী মহিলা কবি বা তেজস্বিনী রানীর সাক্ষাৎ কখনও মিললেও পথঘাটে সাধারণ জীবনে নারীর স্থান খুব ছোট ও নিচু হয়ে এসেছে। সেই মরুভুমি সৃষ্টির আরম্ভের সময়ের একটি সরস শ্যামল ঘটনা।

গুরপাল নামে একজন গুর্জর রাজপুত রাজা ছিলেন। তাঁর প্রজাদের মতে এমন ভালো আর প্রবল রাজা খুব বেশি হয়নি। একদিন তিনি শিকারে গেলেন একা। হাতির পিঠে চড়ে যেতে যেতে এক গ্রামের প্রান্তে দেখলেন যে একটি পরমাসুন্দরী রজকিনী জঙ্গলে ঢুকছে কাপড় কাচবার জন্য। পরনে তার রাঙা শাড়ি, বরণ তার নিখাদ গোরী। রাজা একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

প্রেমিক কবির ভাষায় বলতে গেলে—

থির বিজরী
বরণ গোরী
চলে নীল শাড়ি
নিঙারি নিঙারি
পরাণ সহিত মোর।

কবি সে কথা লিখে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্যে মনের ব্যথাকে মিশিয়ে ঘরে ফিরে এসে প্রেমিকার স্বপ্ন দেখতে পারবেন। চাঁদের জন্য চকোরের কাকুতি, হৃদয়ের ব্যথাকে ভাষায় ব্যাখ্যান করা—এ ছাড়া আর কবির কী-ই বা করবার ক্ষমতা থাকতে পারে? বিশেষ করে রজকিনী যদি নেহাতই 'হাম সে অবলা' গোছের নারী না হয়? আর অন্য কোনও কিছুই কবির পক্ষে কবিজনোচিত বা কাব্যশাস্ত্র অনুমোদিত হবে না।

কিন্তু সেকালের স্বৈরাচারের যুগের রাজার বেলা তো সে কথা খাটে না। বসুন্ধরা যেমন বীরভোগ্যা, রূপসীও তেমনই নিঃসন্দেহে রাজভোগ্যা।

যেমন চিন্তা তেমনি কর্ম। রাজা হাতি ছুটালেন রজকিনীর দিকে। বাসনা সে বশ করে ফেলল রাজধর্মকে।

কিন্তু হঠাৎ রাজার মনে ফিরে এল রাজধর্মের কথা, নিজের কর্তব্যের কথা। তিনি মনকে সংযত করে কোনমতে নিজেকে সামলিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এসে তিনি সব পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ডাকলেন ও চিতা সাজিয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ব্রাহ্মণদের বললেন যে, রাজধর্মে তিনি পতিত হয়েছেন। কারণ, রক্ষক হয়ে ভক্ষক হতে যাচ্ছিলেন। অতএব সব পবিত্র করে দেয় যে আগুন তাতে এই দেহ তিনি বিসর্জন করবেন।

ব্রাহ্মণরা এই শাস্তি সমর্থন করলেন। বললেন যে, রাজার ক্ষমতা হচ্ছে অসীম। তিনি যদি কামবাসনা সংযত করতে না পারেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত সব কুলনারীরই অমর্যাদা হতে পারে। অতএব আগুনে পুড়ে প্রায়শ্চিত্ত করাই তার উচিত।

চিতা জ্বালান হল। অগ্নিশিখা চারদিক উজ্জ্বল করে তুলল। সে শিখার দিকে রাজা হাতজোড় করে প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে গেলেন। চোখ তাঁর বন্ধ, কিন্তু মনে নেই কোনও সন্দেহ।

আগুনে তিনি ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন এমন সময় ব্রাহ্মণরা তাঁকে ধরে ফেললেন। বললেন যে, তার অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে। তাঁরা বিধান দিলেন যে, রাজার মনই শুধু পাপ করেছিল; দেহ ছিল নিষ্পাপ। দেহ যখন কোনও পাপ করেনি, চিতায় তাকে দাহ করলে নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর মন যা পাপ করেছিল, এই অগ্নিব্রতে তার শুদ্ধি হয়ে গেছে।

সব মনের জ্বালা দূর হয়ে গেল। রাজা প্রসন্ন মনে বহু টাকা দান করলেন। রাজধর্মের জয় হল।

মহম্মদ উফি এই ঘটনা লিখে মনের আবেগে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন :—

"রাজা যদি ন্যায়পর হয়,
নাই হোক নিজে মুসলমান—
তার রাজ্য হইবে নির্ভয়,
হবে নাক' কোন অকল্যাণ।"

মানবতার বিচারে হিন্দু মুসলমানে তফাত নেই।

নয়া হিন্দুস্থান যাঁরা তৈরি করছেন, তার নব সংবিধান যাঁরা করছেন তাঁরা সেই ন্যায়, সেই সর্বধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন।

হিন্দুস্থানের উপর যে অন্যায় সে যুগে হয়েছিল আজ শুধু সেই অন্যায়টুকুই মুছে দেওয়া হচ্ছে সোমনাথ নূতন স্থাপনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধু সে প্রতিষ্ঠাই তো সব নয়।

গড়তে হবে নয়া হিন্দুস্থান, নতুন দেশ, নতুন ভক্তের দল, যাদের হৃদয়ে থাকবে ভক্তি কিন্তু বাহুতে থাকবে শক্তি, আর দেশ হবে যাদের কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী।

দশ

ডাকাতেরা আমাদের ধরে নিয়ে যেতে পারে। একেবারে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে।

উদ্দেশ্য অতি সাধু। চৌকিদার অভয় দিয়ে বলল্ যে, আমাদের প্রাণে মারবার কোনও মতলব ওদের নেই। ওরা এরকম প্রায়ই করে থাকে। সাধারণত উট ভাগিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে যায় পালে পালে। নিদেনপক্ষে ভারত আর পাকিস্তানের সীমান্তে অজানা 'নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডে'। সেখানে জনমানবহীন জায়গাতে অনেক সুবিধামতো পোড়ো কেল্লা আছে। যার জানের কোনও দাম আছে অর্থাৎ যে খোয়া গেলে অন্য কারও লোকসান হতে পারে এমন মানুষ পেলে উটের চেয়ে মনিষ্যিদের ওপরই ডাকাতের লোভ বেশি। কারণ তাতে 'র‍্যানসম' অর্থাৎ মুক্তিপণ অনেক বেশি পাওয়া যায়।

উটের চেয়ে মানুষকে আটকে রাখাও সহজ। খিদে তেষ্টায়, বিশেষ করে তেষ্টায় মারা যাবার ভয়ে ওই কেল্লা থেকে ভেগে তেপান্তরে পাড়ি দিতে আর যেই সাহস করুক, মানুষ করবে না।

কত টাকা দিলে ডাকাতরা ছেড়ে দিতে রাজি হবে তার দর কষাকষি হতে থাকে ততদিন।

হাতে হাতে তার প্রমাণও দেখে এসেছি স্বচক্ষে। আমাদের রেললাইন মরুভূমির মধ্যে পাকিস্তানের দিকে এসে পোকরাণে শেষ হয়ে গেছে। সেই শেষ রেল স্টেশন থেকে মাইল পঁচাত্তর উত্তর-পশ্চিমে খাঁটি মরুভূমির ভিতর পাড়ি দিয়ে যশলমীর এসেছি। এ মরুতে একটুও ঘাস জল এমনকি একটা ঝাউ বা ঝোপের ভেজাল পর্যন্ত নেই।

শুধু একটা ভেজাল আছে। তাও আধুনিকতার কল্যাণে। আমি চলেছি একটা জীপ গাড়িতে, উটের পিঠে নয়।

কিন্তু মরুভূমি তার খাজনা আদায় করতে ছাড়েনি। ফাঁকি দিয়ে ঘণ্টা সাতেকে পৌঁছে গেলাম বটে। কিন্তু কী ঝাঁকুনী রে বাবা! আমি কোনোরকমে টিকে গিয়েছিলাম বটে। কিন্তু আমার সঙ্গী পঞ্চনদের বীর মদনলাল লম্বা হয়ে বালিতে শুয়ে পড়ল। তার অন্নপ্রাশনেব দিনের স্মৃতি ফিরে এসেছিল।

পথ বলে কিছু নেই। শুধু দূরে দূরে বালিয়াড়ির চুড়োগুলো দেখা যায়। তাও একটা দমকা ঝড়ে পিল পিল করে বালির রাশি কোথা থেকে উড়ে গিয়ে কোথায় নতুন ঢিপি তৈরি করে তার ঠিক নেই। সরকার থেকে কিছু খোয়া আর পাথর বিছিয়ে একটা রাস্তা গোছের কিছু বানিয়েছিল বটে। কিন্তু মরুভূমি হাসতে হাসতে তার উপর বালির ঝড় বইয়ে তাকে ঢেকে দিয়েছে। তার পর খোঁজ পথ, যে জান সন্ধান।

অবশ্য পথে আসতে আসতে দু'এক জায়গায় কাঠের ডাণ্ডায় লেখা আছে যে অত মাইল ভেতরে গেলে অমুক গ্রাম পাওয়া যাবে। এরকম একটা গ্রামের নাম লাঠি। মদনলালের ইচ্ছা যে সে রণে ভঙ্গ দিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করবে। ফিরে আসবার সময় আবার জীপে উঠিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু লাঠির দৌড় কতদূর তা জেনে সে তাড়াতাড়ি মত বদলাল। কষ্ট সওয়া সহজ। কিন্তু তা বলে ডাকাতের হাতে?

তা ছাড়া খেসারত দেবে কে?

লাঠির সর্দার কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে নিবেদন করল যে তার শ্বশুরকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেছে।

নয়া দিল্লিতে খানাপিনার পর এয়ার-কন্ডিশন ঘরে বসে আমেরিকানরা গল্প বলেছে যে, ওদের দেশে ডাকাতরা শাশুড়িকে ধরে নিয়ে গুম করে রাখে। তারপর হুমকি পাঠায়—ভেজো দশহাজার ডলার জলদি; না হলে এই দিলাম শাশুড়িকে ফেরত পাঠিয়ে। ভয়ে ভয়ে বড়লোক জামাই ডাকাতদের টাকা পাঠিয়ে দেয়। টাকা যাক, কিন্তু শাশুড়ি যেন ফেরত না আসে।

সেখানে নাকি মর্তলোকে মা সিংহবাহিনীর অবতার হচ্ছেন জামাইবাহিনী শাশুড়ি।

শুনে সবাই এমন হাসি হেসেছিলেন যে কোনও দিন ভুলব না। কিন্তু আজ এই 'বানিয়া' বেচারার গল্প শুনে মদনলালের মুখ শুকিয়ে গেল। পেটে পাথর চাপা দিয়ে সে জীপের মধ্যেই কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

মহারাওল (মহারাজা) বাহাদুরের জীপ আমায় এনে তুলল খাস রাজপ্রাসাদে। চাঁপাফুলের রঙের মার্বল পাথরের প্রাসাদ। তার মিহি আর নিপুণ কারুকার্যের ছবি রাজস্থানের সব দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যেই একেবারে উপরের দিকে ঠাঁই পেয়েছে। সেখানে ঠাঁই পেলাম আমি।

শহর আর কেল্লা থেকে মাইল দুই দূরে এই দোতালা রাজবাড়ি। ঝকমকে ফার্নিচার আর দামী পুরু কার্পেটে ভরা। মহারাওলের প্রাইভেট সেক্রেটারি অতিথিকে আদরের কোনও ত্রুটি করলেন না। কিন্তু একটু পরেই কোথায় যেন গা ঢাকা দিলেন।

সব খাবার মায় চা পর্যন্ত এল রাজবাড়ি থেকে। কিন্তু এ বাড়ি নয়, কেল্লার গায়ে লাগানো রাজবাড়ি থেকে।

বিকেলবেলা মহারাওল নিজে আর তাব খুড়ো এলেন জীপে করে। সমস্তটা যশলমীর শহব—থুড়ি পোড়ো গ্রাম—ঘুরিয়ে দেখালেন। যত্ন করে দেখালেন কয়েক মাইল দূরে দূরে মহারাওলদের অমর কীর্তি চবুতরা আর মরূদ্যানগুলি। এই ওয়েসিসগুলির মধ্যে শুধু সরোবর নয়, পদ্মফুল পর্যন্ত আছে। আছে বেল চামেলী আর বাংলা দেশের আম। স্তরের পর স্তরে 'টেরাস' অর্থাৎ ধাপ ধাপ সিঁড়ি কাটা বাগানবাড়ি। মরুভূমির মধ্যে সত্যিই বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু শহরখানা মরুভূমি হয়ে এল। নতুন সরকার প্রথমে এটাকে কমিশনারের ডিভিসন বানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন একটা ছোট্ট মহকুমা মাত্র। কারণ ব্যবসা নেই বলে শহব উজাড় হয়ে যাচ্ছে। একদিন গজনী কাবুল ইরানের ব্যবসা উটের পিঠে যশলমীর হয়ে ভারতে ঢুকত। আজ উটের পিঠে চড়ে হঠাৎ হামলা দেয় শুধু ডাকাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্যারাভ্যান নয়।

রাজধানীতে লোক নেই। রাজপ্রাসাদে নেই রাজা। তরুণ মহারাওল তাঁর নতুন বিয়ে কবা মহাবানি আর সামান্য প্রিভি পার্স অর্থাৎ রাজত্ব যাওয়ার দরুন খরচের টাকা নিয়ে কেল্লার পাশে পুবোনো রাজবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। না হলে বড় নিঃসঙ্গ লাগে।

শুধু নিঃসঙ্গ নয়। নিরাপদ মনে করেন না—টিপ্পনী কাটল একজন যশলমীরী। হাল ফ্যাসানের প্যালেস যখন বানানো হয় তখন মহারাজা রাজত্ব কবতেন। আজ তিনি সরকারেব সাধারণ প্রজা বই তো কিছু নন। কাজেই যেখানে নিজের ধন সম্পত্তি আত্মীয় স্বজনকে নিরাপদে রাখতে খরচ কম হবে সেখানেই তিনি থাকবেন।

অবশ্য হাত পা ঝাড়া মেহমানের এই রাজবাড়িতে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। পাকিস্তানেব ডাকুরা (হিন্দুস্থানের ডাকুরাও ওদেশে বহাল তবিয়তে আস্তানা গেড়েছে) শুধু স্থানীয় বানিয়াদেবই ভালো শিকাব বলে মনে করে। তবে দরজা জানলা বন্ধ করে শোয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শিয়াল ডাকতে লাগল। শিয়াল ডানদিকে দেখে সীতা অমঙ্গলের চিহ্ন বুঝতে পেরেছিলেন। বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। কিন্তু আজ আমাদের চারিদিকেই শিয়াল। সেকথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু শিয়ালকে ভোলা সাধ্য কি? এই যশলমীরেও এক রাজা লক্ষ্মণ সেন একবাব প্রত্যেক রাতে শিয়ালের চিৎকারে অস্থির হয়ে ওরা কেন বাতে কাঁদে তার খবর নিতে হুকুম করেছিলেন। পারিষদরা বলল যে, ওদের ঠাণ্ডা লাগে বলে ওরা চেঁচায়। তাতে হবুচন্দ্র রাজা ওদের তুলোর পোশাক বানিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন।

পোশাক যার গায়েই চড়ুক বা তার দামটা যার পকেটেই যাক, শিয়ালের রা থামল না। আবাব লক্ষ্মণ সেন ওদের কান্নাব কারণ শুধোলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই ঠিক করলেন যে ঘরবাড়ি নেই বলে ওরা কান্নাকাটি কবে। মরুভূমিতে অনেক জায়গাতেই ছোট ছোট কুঠরী বানিয়ে দিলেন। সুধী পাঠক, আপনি এটাকে নেহাত গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেবেন না। এখনও এখানে সেখানে পাথরের ছোট কুঠরী দেখলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারেন যে, শিয়ালের আস্তানা খুঁজে পেয়েছেন। উড্ সাহেবও পেয়েছিলেন।

সেই রাজা যে কেল্লাটার মধ্যে বসে রাজত্ব করতেন, সেখান মাত্র দুয়েকটা বাতি এখানে জ্বলতে দেখেছি। বাকি সব বাতি নিভিয়ে লোকেরা ঘুমোতে গেছে। আমিই শুধু জেগে আছি।

আলাউদ্দিনের পাঠান সৈন্যদলও এমনিভাবে রাতের পর রাত ওই কেল্লার বাতির দিকে চেয়ে থাকত। দোষ ওদের নয়। ওরা এসেছিল প্রতিশোধ নিতে। রাওল জৈৎসিংহের ছেলেরা গমের ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একটা খুব দামী ক্যারাভ্যানের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। বেশ কিছুদিন দহরম মহরম করার পর সব লুট করে নিয়েছিল। তাতে পনেরো শ' ঘোড়া আর পনেরো শ' খচ্চর বোঝাই ধনরত্ন যাচ্ছিল আলাউদ্দিনের কাছে দিল্লিতে। একফোঁটা ধনরত্নও পাঠান সম্রাটের কাছে পৌছায় নি।

"ভাদ্র মাসের মেঘ এমনি করেই আকাশ ভরে আসে"—পাঠান সেনাদলের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন যশলমীরের চারণ কবি।

কেল্লার বাইরে নবাব মাবুব খান আস্তানা গেড়েছেন। কিন্তু কেল্লার পাঁচিলের মাথায় ছাপ্পান্নটা কোনার ঘাঁটি আগলাচ্ছে তিন হাজার সাতশ ভাট্টি অর্থাৎ যশলমীর বীর। বাইরে মরুভূমির বালিয়াড়ির পিছন থেকে হঠাৎ হঠাৎ হামলা দেয় রাওলের ছোট ছেলের সৈন্যরা। পাঠানদের রসদ আনা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা শুধু আস্তানা গেড়ে দুর্গ ঘেরাও করে রাখল।

এদিকে রাওলের ছেলে রতন সিং মাবুব খানের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে ফেললেন। দুজনেরই এক রোগ—দাবা খেলা। সময় ঠিক করা আছে। রোজ সেই সময় লড়াই স্থগিত থাকে। কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসেন রাজপুত্র আর তাঁবু ছেড়ে এগিয়ে আসেন নবাব। দু'পক্ষের মাঝামাঝি জায়গায় গাছতলায় দুজনের হুকোবরদাররা দাবার ছক বিছিয়ে দেয়। শত্রুতা আর লড়াই ভুলে দুজনে খেলেন দাবা।

আট বছর ধরে এহেন লড়াই—হাতিয়ার আর দাবা দুই নিয়েই—চলল। একেবারে রূপকথার ব্যাপার।

একদিন দাবা খেলতে এসে নবাব দেখলেন, রাজপুতদের মধ্যে খুব স্ফূর্তি আর গান-বাজনা চলছে। ব্যাপার কী? রতন সিং বললেন, তার বাবা মারা গিয়েছেন আর বড় ভাই মূলরাজের অভিষেক হচ্ছে। নবাব অভিনন্দন জানালেন। তার পর দুঃখ করে বললেন যে, গাছতলায় বসে দাবা খেলার দিনও ফুরিয়ে গেছে। আলাউদ্দিন হুকুম পাঠিয়েছেন যে, দুষমনের সঙ্গে দহরম মহরমের কথা তাঁর কানে পৌঁচেছে। এবার দাবা থামাও আর শুধু লড়াই চালাও। কাজেই দুজনে অনেক দুঃখের মধ্যে শেষবার চুটিয়ে সুখ করে দাবা খেলে নিলেন। আলিঙ্গন করে বললেন যে, পরের দিন ভোরে আবার তাঁরা মিলিত হবেন—মরণ আলিঙ্গনে।

ভাট্টি আর পাঠানে পরের দিন মারাত্মক লড়াই হল। এক দিনেই ন' হাজার সৈন্য হারিয়ে মাবুব খান তাঁবুতে ফিরে এলেন। আনালেন নতুন সৈন্য দিল্লি থেকে। এবার আরও জোর আক্রমণ চালাবেন।

এদিকে কেল্লার মধ্যে সৈন্য আর রসদ দুই-ই ফুরিয়ে এসেছে। মূলরাজ আর তাঁর সামন্তরা ঠিক করলেন যে রাজপুতের শেষ উৎসর্গ করবার মতো যা আছে, তাই, অর্থাৎ প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য এবার শেষ যুদ্ধ করতে যাবেন।

কিন্তু পরের দিন ভোরে দেখা গেল, পাঠানরা আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কেল্লায় খুব আনন্দ উৎসব শুরু হল। যে মৌর অর্থাৎ মুকুট পরে যমের বোন যমুনার সঙ্গে শেষ অভিসারে যাবার কথা, সে মৌর পরে তারা করলেন প্রেয়সীর সঙ্গে নতুন বিয়ের নতুন অভিনয়। তলোয়ারের ঝনঝনের বদলে সবাই শুনল নূপুরের ঝুনঝুন।

কিন্তু এই ফাঁকে নবাব মাবুব খানের ছোট ভাই যে কেল্লার কারাগার থেকে পালিয়ে উধাও হয়ে গেল, সে খবর কেউ রাখল না।

ক'দিন পরেই আবার ভাদ্র মাসের মেঘের দল যশলমীরের ছবির মতো সুন্দর কেল্লার তলায় জমা হল। নবাব তাঁর ভাইয়ের কাছে জেনেছেন যে রাজপুতদের আর সৈন্য বা খাবার বলতে বিশেষ কিছু নেই। ক'দিন আগে যে শেষ উৎসব স্থগিত হয়েছিল, সেটা এবার সেরে নিতে হবে।

রতন সিং বললেন—মেয়েরা সব চিতায় আত্মসমর্পণ করুন। আগুন আর জল দিয়ে যা নষ্ট করা যায়, সবই আমরা শেষ করে দেব। তারপর কেল্লার দরজা খুলে তলোয়ার দিয়ে কেটে কেটে স্বর্গের পথ বানিয়ে নেব।

মূলরাজ বললেন লড়াইয়ে হাতিও তোমাদের রুখতে পারে না। আমার রাজসিংহাসনের সম্মান এই তলোয়ার রইল তোমাদের হাতে। শত্রুর উপর এরই আঘাতে আঘাতে যশলমীরে আলো জ্বলে উঠুক।

শেষ রাত্রিটুকু কাটল স্বজনের সঙ্গে মিলনে—চিরকালের জন্য মিলনের ভূমিকায়। রাজপুতানীরা বলেছিলেন—আজ রাতে আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছি। ভোরের আলোতে আমরা স্বর্গে চলে যাব। স্বামী ভাইছেলেদের জন্য জায়গা ঠিক রাখবার জন্য একটু আগেই যাব।

চল্লিশ হাজার রাজপুতানী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সেদিন। রাজপুতেরা খোলা তলোয়ার হাতে দেখল সে আগুন জ্বালা। আগুন রঙের পোশাক পরে, বিয়ের মুকুট মৌর মাথায় চড়িয়ে তিন হাজার আটশ রাজপুত পরস্পর আলিঙ্গন করল। এত ভালো তারা আগে কখনও বাসে নি। তারপর চলল শেষ অভিসারে। নিজেরাই খুলে দিল দুর্গদ্বার।

চারণ কবি লিখেছেন,—"যুদ্ধের সমুদ্রে রতন সিং ডুবে গেলেন। কিন্তু তাঁর তলোয়ারের সামনে শুয়ে পড়ল একশ কুড়িজন মীর। মূলরাজ বর্বরদের শরীরে বর্শা চালিয়ে চললেন। রক্তে মাটি ভেসে গেল।"

নবাব মাবুবও বীরপূজা জানতেন। তাঁর ভাইকে রাজপুতরা প্রাণে না মেরে শুধু বন্দী করে রেখেছিল। তাই তিনি যুদ্ধে জিততে পেরেছিলেন। তিনিও প্রতিদানে রতন সিংহের ছেলেদের বাঁচিয়েছিলেন। যশলমীরের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

যশলমীরের কেল্লা আর কখনও শত্রুর হাতে হার মানে নি।

সেই কেল্লার শেষ বাতিটি এখন নিবে গেল। রতন সিং আর মাবুব খান কি এখন আবার গাছতলায় দাবার ছক নিয়ে বসবেন রোজকার মতো?

বিজলী বাতি আর পাখা এখন বন্ধ হয়ে গেল। মহারাওলদের রাজত্বের সময় সারা দিনরাত বিজলী পাওয়া যেত। রাজার খরচে বিদ্যুতের কারখানা বসান; যা কিছু লোকসান হয়, তা-ও রাজার। এখন গণতান্ত্রিক সরকার যে টাকাটা জনসাধারণের কাছ থেকে ফেরত পাবে না সেটাকে লোকসান বলে ধরে। কাজেই বিজলীর কারখানা চলে মাত্র ঘণ্টা বার। রাত্রে মরুভূমির গরমে যদি হাঁসফাঁস কব, সে তোমার নিজের দোষ। এটা যে বৈশ্য যুগ।

কিন্তু বিজলীর ঝিলিক দেখেছি সারা সন্ধ্যাবেলা। মহারাওলের পূর্বপুরুষের তৈবি অমর সাগরেব পারে। আজ ওদের ভাদোন্ উৎসব গেছে। রাজোয়ারার সবচেয়ে বেশি অনুর্বর মরুতে তৈরি হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর ফুল। বালির দেশে পাথরের ফুল। চোখ ঝলসিয়ে দেওয়া রোদের মধ্যে স্নিগ্ধ বাতাস আর আলো বাড়ির মধ্যে আসতে দেবার জন্যে আশ্চর্য সুন্দর পাথরের ঝিলমিল। এত সুন্দর যে হাতে খুদে করা হয়েছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

আজ সেই অদ্ভুত সুন্দর "হাভেলী"-তে লোক নেই। যে দেশ এই সেদিনও সৌন্দর্যের স্বপ্ন দেখেছিল, সে দেশ এখন স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানে চোরাই মাল আমদানি-বপ্তানির, দুঃস্বপ্ন দেখে ডাকাতি আর রাহাজনির। এক কালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমল বাপ্‌নাব প্রাসাদ বোধহয় সবচেযে বড় আব সুন্দর। পুলিশ দারোগার লোহার নাল বাঁধাই নাগরার খটাখট আওয়াজে সেই হাভেলি এখন বোজ কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে। মাসিক ক্ষতিপূরণ অথবা বকশিস মাত্র পঁচিশ টাকা।

সেই পড়ো আর ছেড়ে-আসা পাড়াগুলির ভিতর থেকে রঙিন সোনালি রূপালি চুণরী শাড়িতে ঝলমল করতে করতে বেরিয়ে এল রাজস্থানের রূপসীরা। শিরে গাগরী, চলন ভারী। জল নয়, বালির উপর দিয়ে তারা যেন রাজহংসীর মতো লীলাভরে ভেসে আসতে লাগল। চলেছে তারা অমরসাগরে। না, না, স্বপ্নসাযবে।

পোশাকের অত রঙ, গয়নার অত বাহার, ফুলের এত মিছিল চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। চোখ বুঁজে কান পেতে রইলাম। ভুলে গেলাম রঙহীন সাদামাটা বাঙালি জীবনের কথা, নুন আর পান্তার সমস্যায় ঘেরা আটপৌরে দিনগুলি।

কালীরে কালায়ন উপড়ী এ পানিহারী হেলো
ওড়লা সা বরষে মেহ সোনেলো।।
মোটোরী ছোটোরীর বরষে মেহ সোনেলো।।

কালো মেঘের ডাকে আমার পূর্ব-বাংলার মেঘনার কালো জলে বান ডাকা দেখেছি। আজ চোখ বুঁজে মরুভূমির বুকে সোনালি মেঘের আবাহন করলাম মনে মনে।

অমর সাগরের টলটলে বুকের উপর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হবে কি? ছোট আর মোটা বৃষ্টির ধারা ঝিমঝিম সুরে ঝরবে কি? বিবহিণীর করুণ ডাকে সাড়া দেবে কী?

পানিয়া ভরণের গানের পর ওরা গাইতে লাগলো 'উম্‌রলো'। ওগো আমার প্রিয়, বহুদূর থেকে মেঘ আসছে, বল কোথায় তারা ঝরবে। বল প্রিয়তম আমার, তুমিও কখন উটে চড়ে আসবে। ওগো, বিরাট কালা পাহাড়ের মতো মেঘ উঠছে আকাশে, আর শিগ্‌গিরই বরফের মতো সাদা হয়ে যাবে। ওগো প্যারে, তোমার ফিরে আসার সময় যে এল। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সময়মতো আসবে। ...কচি সবুজ বাঁশ আনা হয়েছে মণ্ডপ বাঁধবার জন্য; সাজানো হয়েছে কলস। ওগো প্রিয়তম, তোমার কথামতো তুমি নিশ্চয়ই আসবে। ...ওগো, মণ্ডপের মধ্যে চৌকি সাজানো হয়েছে আর চেরাগ দিয়ে তা সাজানো হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই আসবে।

আওয়েরে ঢোলো উমর্‌লো

গানের প্রত্যেক পদের শেষে করুণ রাগিণীতে গেয়ে উঠতে লাগল তারা—

আওয়েরে ঢোলো উমর্‌লো।

উজ্জয়িনীর পাহাড়ের চূড়া থেকে, বাংলা দেশের তমাল বন থেকে মেঘের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে কবিরা যুগে যুগে। জনহীন মেঘহীন মরুভূমি যশলমীরের বিরহিণীদের মুখেও সেই নিমন্ত্রণ ধ্বনিত হচ্ছে।

কালিদাস একা নন, ঘরে ঘরে আমরা ক্লান্ত অকবির দলও মর্মে মর্মে বুঝি— মেঘালোকে, মেঘ দেখে মন আনমনা হয়ে যায়—প্রেয়সী পাশে থাকলেও। আর তিনি যদি থাকেন দূরে, বহুদূরে? এই দুস্তর মরুর ওপারে? আরও, আরও অনেক দূরে?

প্রেয়সী যদি থাকেন ওই দূর দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায়? কেল্লার মধ্যে জানলার পাশে বসে আছেন বিরহিণী আঁধার রাতে বাতি জ্বালিয়ে। প্রিয় আসবে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যাকুল বেগে। চাইবে নিচের সমতল ভূমি বনজঙ্গল থেকে আকাশের তারাগুলির পানে। তার মাঝে নিজের বাতায়নের পাশে একটি দীপশিখা আর দুটি আঁখিতারাকে খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু যদি মিলন না হয়? বিরহ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যদি দুজনে দুজনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

আঁধার রাতে আজ আকাশে কয়েকটি তারা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘুমও নেই আমার চোখে। রোমিও জুলিয়েটের আত্মা হয়তো আকাশে তারা হয়ে চিরকাল বিরহী বিরহিণী হয়ে আছে। পৃথ্বীরাজ আর তাবাবাঈও নিশ্চয়ই এমন ভাবেই আছেন। বীর প্রেমিক পৃথ্বীরাজ আর বেদনোর শহরের তারা, তারাবাঈ।

রানা রায়মল্লের তিন ছেলে আর ছোট ভাই পাহাড় বেয়ে উঠছেন চারণী দেবীর মন্দিরে। সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্লের মধ্যে কে যে পরে রাজা হবে, সে কথা তিনজনেরই মনে আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছে। সঙ্গ বড় ছেলে। বাপের পর মেবারের সিংহাসন তাঁরই পাবার কথা। (তিনি তা পেয়েছিলেন ও বাবরের সঙ্গে লড়েছিলেন। কিন্তু তিনি একটু হিসাবী আর সাবধানী। পৃথ্বীরাজ হচ্ছেন বেপরোয়া। দেশেব শত্রুদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অস্থির আর সেজন্য তাঁব শিক্ষা আর সাহসের শেষ নেই। আব জয়মল্ল? —তা, ছোট ছেলে বলে কি সিংহাসন পাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে না? খুড়ো সূর্যমল্লেরও নজর সেদিকে আছে।

খুড়ো আর ভাইদের পৃথ্বীরাজ বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভালো ভাবে লড়বার জন্য তাঁরই রাজা হওয়া উচিত। সঙ্গও দেশকে কম ভালোবাসেন না। বললেন—বেশ তো, ভগবান যাঁকে সবচেয়ে বেশি কাজের বলে মনে করবেন, তাঁকেই মেবারের রানা করবেন। আমি বড় হলেও দাবি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। বাঘ পাহাড়ে চারণী দেবীর মন্দিরে গিয়ে পূজারিণীকে জিজ্ঞাসা কবা যাক।

পূজারিণী মন্দিরের গুহাতে ছিলেন না। কাজেই ওঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। পৃথ্বীরাজ আব জয়মল্ল বসলেন পূজারিণীর বিছানার উপর আর সঙ্গ বাঘছালের উপর। সূর্যমল্ল বসলেন মাটিতে, একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে অর্জুন আর দুর্যোধন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঘুমিয়ে ছিলেন। দুর্যোধন এসে বসলেন তাঁর মাথার কাছে। আর অর্জুন পায়ের কাছে। সেই বসার ভঙ্গির মধ্যে ছিল নিয়তির ইঙ্গিত। যিনি পায়ের কাছে বসেছিলেন, আসল সাহায্য ভিক্ষা তো তিনিই করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে দেখতে পেলেন অর্জুনকে। প্রথম সাহায্য বেছে নিতে দিলেন তাঁকেই।

পূজারিণী গুহায় ফিরে এলেন। পৃথ্বীরাজ সব কাজেই আগুয়ান। হুড়মুড় করে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য খুলে বললেন। কিন্তু পূজারিণী সঙ্গের দিকে ফিরে তাকালেন। বাঘের ছাল হচ্ছে আদ্যিকাল থেকে রাজার আসন। তুমি যখন বাঘছাল বেছে নিয়েছ ভবিষ্যতে মেবারের রানা হবে তুমিই।

পাশেই বসে সূর্যমল্ল। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আর তুমি যে একটি হাঁটু বাঘছালের উপর রেখে বসে আছ, তুমিও ভবিষ্যতে একটুকরো রাজ্য পাবে। তবে অনেক দুঃখ, অনেক লড়াইয়ের পর।

লড়াই বেধে উঠল তখনই। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পৃথ্বীরাজ তখনই সঙ্গকে মেরে ফেলতে উঠলেন। কিন্তু মাঝখানে এসে পড়লেন খুড়ো। বেঁচে গেলেন মেবারের ভাবী রানা। একটা চোখ গেছে, আর সারা গায়ে ঝরছে রক্ত।

না, তবু রক্ষা নেই। পৃথ্বীরাজ আর সূর্যমল্ল লড়াইয়ের চোটে জখম হয়ে পড়ে রইলেন গুহাতে। কিন্তু

জয়মল্ল তাঁর সঙ্গী-সামন্ত নিয়ে তেড়ে চললেন সঙ্গকে। একজন রাঠোর একটি মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গ তাকে পরিচয় দিয়ে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রাঠোর তাঁকে আশ্রয় দিলেন। যতক্ষণ না সঙ্গ পালিয়ে যেতে পারেন, ততক্ষণ একা তলোয়ার হাতে জয়মল্লর দলের সঙ্গে লড়লেন। আশ্রিত বেঁচে গেল, কিন্তু রাঠোরকে প্রাণ দিতে হল।

হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে বীরত্বে সবচেয়ে বেশি বড় ছিল মেবার। চারপাশে মুসলমান শত্রুর রাজ্য। তারা একে একে হিন্দুরাজ্যগুলি গ্রাস করছে, উত্তর পশ্চিমের গিরিপথে আসছে তৈমুর-বাবরের আক্রমণ। তবু এই মেবারের রাজপুত্রদের মধ্যে ভায়ে ভায়ে মারামারি। সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি। কাজেই হিন্দুর ভবিষ্যৎ কোথায়?

রানার কানে সব খবর এল। তিনি পৃথ্বীরাজকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন। লড়াই যখন এতই ভালোবাস, যাও লড়াই করেই খাও গিয়ে।

নরওয়ে দেশের ডাকাত ভাইকিংদের এইরকম ব্যবস্থা ছিল। সব জোয়ান ছেলেকেই নিজে করে খেতে হত। বড় হয়ে যেই ঘরে গোলমাল সৃষ্টি করতে শুরু করত, তাদেব বাইরে খেদিয়ে দেওয়া হত। নিজের ব্যবস্থা তখন থেকে নিজের হাতে। বাঙালি জমিদার ঘরের মতো নয় যে, পৈতৃক কিছু আছে বলে সেটুকু ভাগাভাগি করেই দিন চালাতে হবে। অথচ এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে তালপুকুরে ঘটি ডোবে না।

পৃথ্বীরাজ করে খেতে লাগলেন। কাজ হচ্ছে একটার পর একটা পরগনা গায়ের জোরে দখল করে নিজের নাম বাড়ান। আর বাপের রাজত্ব।

মেবারের বেদনোর শহরে আশ্রয় নিয়েছিলেন টোডাররাজ। পাঠানরা তাঁকে রাজ্যহারা করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বার বার চেষ্টা করেও নিজের রাজ্য ফিরে পাচ্ছিলেন না। বহু রাজপুত বীর তাঁর হয়ে লড়েছিল। কারণ যে টোডা জয় করতে পারবে, রাজা তার সঙ্গেই রাজকুমারী তারাবাঈয়ের বিয়ে দেবেন। তারাবাঈ অন্দরে বসে রান্না আর সেলাই আর সংসারের সেবা নিয়ে বসেছিলেন না। তলোয়ার হাতে দামাল ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতেন। তাঁর হাতের বর্শা আর চোখের চাহনি সমান ঝিলিক হানত। রূপের জন্য তাঁকে সবাই বলত বেদনোরের তারা।

জয়মল্ল টোডারাজের কাছে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু উত্তব দিলেন তারাবাঈ : যে আমার বাবার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে, শুধু তাঁকেই দেব বরমাল্য। শুধু বসুন্ধরাই বীরভোগ্যা নয়। নারীও।

জয়মল্ল কথা দিলেন যে, তাই করবেন। দেখতে এলেন তারাবাঈকে। পেলেন তাঁর পরিচয় আর সঙ্গ। কিন্তু আফিমের ঝোঁকেই হোক বা তার চেয়ে কড়া যৌবনের নেশাতেই হোক মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। টোডারাজের তলোয়ারে তাই মাথা হারাতে হল।

পুত্রহত্যার প্রতিশোধ চাই। মাথার বদলে চাই মাথা। মেবারের সামন্তরা গরম হয়ে উঠলেন। রানাকে ক্রমাগত উস্কোতে লাগলেন। কিন্তু রানা মাথা নাড়লেন। যে অসহায়া নারীকে অসম্মান করে, আশ্রিতকে দেয় না মর্যাদা, তার মরাই উচিত। শুধু তাই নয়, এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব। বেদনোরের জায়গীর আমার পুত্রহন্তাকেই দিলাম।

ভাই এমনভাবে মরল। বাপ প্রায়শ্চিত্ত করলেন এমনভাবে। আর সবার উপরে তারাবাঈয়ের এত রূপ। এতেও যদি পুরুষত্ব না জেগে ওঠে, তবে সে কেমনতরো রাজপুত?

পৃথ্বীরাজ কোমরে তলোয়ার ঝুলিযে নিলেন।

সোজা বেদনোরে এসে একেবারে তারাবাঈয়ের পাণি প্রার্থনা করলেন। হবে কি তুমি আমার সহধর্মিণী?

তুমি কি আমার বাবাকে টোডা ফিরিয়ে দিতে পারবে?

পারব। রাজপুতের দিব্যি দিয়ে বলছি, নিজের শপথ করে বলছি, পারব।

আচ্ছা, তবে তাই হোক। হলাম তোমার সহধর্মিণী। এবং সহকর্মিণীও।

দুজনে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চললেন টোডা জয় করতে। বাহুতে তুমি যে শক্তি। সেই শক্তি চলেছেন জীবনমরণ কী সাথী হয়ে। যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী। আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিণী।

টোডা শহরে খুব উৎসব চলছে। মিছিলে মিছিলে লোক একাকার। উপরের ঝুল বারান্দা থেকে পাঠান

দেখছেন লোকের ভিড়, পরে নিচ্ছেন দরবারের পোশাক। এমন সময় নজরে পড়ল যে দুজন ভিনদেশী পোশাক পরা লোক সেখানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এরা কারা? কোন্ সুদূরের বিদেশী?

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পেতে হল না। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা ধনুকের ছিলা টঙ্কার দিয়ে কেঁদে উঠল। একটা বর্শা শনশন করে বাতাস ফুঁড়ে উপরে ছুটে এল। বারান্দায় গড়িয়ে পড়ল সুবাদারের মৃতদেহ।

চারদিকে মহা হৈ চৈ। কী ব্যাপার? কী করে হল? দুষমণরা ক' হাজার লোক? মেবারের রানা হামলা করল নাকি?

কিন্তু কে দেয় জবাব, আর কে করে খবর? সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ততক্ষণে বীরদম্পতি চলেছেন শহরের দরজার দিকে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাজপুত সৈন্যদল।

পাঁচিলের দরজার সামনে একটা হাতি শুঁড় তুলে রুখে দাঁড়াল, নিমেষে একটা তলোয়ারে ইস্পাতের বিদ্যুৎ খেলে গেল। শুঁড় ধড় থেকে কেটে গড়িয়ে পড়ল। হাতি পালাল পথ ছেড়ে। তারাবাঈ নিজে হাতে ফটক খুলে দিলেন। জয় বেদনোরের তারার জয়।

আজমীরের সুবাদার তৈরি হতে লাগলেন এই হারের শোধ নেবার জন্য। কিন্তু আগে থেকে নিজে হামলা করাই আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভালো পথ। চিরকালের যুদ্ধের নিয়ম হচ্ছে এই। পৃথ্বীরাজ রাতারাতি দলে-বলে চললেন আজমীরে। ভোর না পোয়াতে আজমীরের কেল্লার চূড়ায় রাজপুতের নিশান পৎ পৎ করে উড়তে লাগল।

এ দিকে বুড়ো রানার মন ভেঙে গেছে। বড়ছেলে সঙ্গ নিখোঁজ; ছোটছেলে জয়মল্ল নেই। এক আছে পৃথ্বীরাজ। সে তো নির্বাসনে। অথচ তার জযগানে, পুত্রবধূর রূপ আব বীবত্বের গাথায রাজস্থান ভবে উঠেছে। তিনি ছেলেকে ফিরে আসতে নিমন্ত্রণ করলেন।

বাপের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের আর কোনও মন কষাকষি রইল না। কিন্তু তা বলে কি তিনি বাজপুত্রের মতো আরামে রাজপ্রাসাদে দিন কাটাবেন? মেবারের পশ্চিম দিক থেকে আসে দিল্লির হানা, মালবের সুলতানের আক্রমণ। তিনি পশ্চিম সীমান্তে যশলমীরে নতুন কেল্লা বানালেন। একটার পর একটা সারি সারি যুদ্ধের দেওয়াল, তাতে গুলি ছোঁড়বার ঘুলঘুলি, পাহারা দেওয়ার গুমটিঘর সবই বসানো হল। আর সবার উপরে একেবারে চূড়ায় তৈরি হল তারাবাঈয়ের মেঘমহল।

রাজ্যের সীমান্তে হঠাৎ হঠাৎ হানা দিত ডাকাত আর লুঠেরার দল। বিচারব্যবস্থা ভালো ছিল না। পৃথ্বীরাজ সেখানে শান্তি আর ন্যায়ের রাজত্ব ফিরিয়ে আনলেন। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে দলে দলে রাজপুত নানা দেশ থেকে তার দলে এসে যোগ দিল। চারণকবি গেয়েছেন যে, "তাদেব তলোযাব আকাশে ঝকমক করত আর পৃথিবীতে সবাই ভয় করত। কিন্তু যাদের রক্ষা করবার কেউ নেই তাদের সাহায্য করত।" রবিন হুডের রাজ সংস্করণ।

এ দিকে সূর্যমল্ল বিদ্রোহ করে বসলেন। পুজারিণীর ভবিষ্যৎবাণী তিনি ভোলেন নি। রাজা তাকে হতে হবেই। তাই মালবের সুলতানের সাহায্য নিয়ে তিনি লুটপাট করতে করতে মেবারের বেশ খানিকটা দখল করে ফেললেন। রানার সঙ্গে যুদ্ধ হল। ব্যাপার বেগতিক দেখে রানা নিজে সাধারণ সিপাইয়েব মতো লড়ে গেলেন। তবু মেবারের বেদম হার হত যদি না পৃথ্বীরাজ হঠাৎ শেষ মুহূর্তে নিজের রবিন হুডের দল নিয়ে হাজির হতেন।

রাত আঁধার হয়ে যাওয়াতে যুদ্ধ মুলতুবি রইল সেদিনকার মতো। কিন্তু দু-দলেরই শিবিরে জ্বলছে আলো। কখন আবার ভোর হবে, আবার শুরু হবে লড়াই। কিন্তু পৃথ্বীরাজ বেপরোয়া ভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন একেবারে সূর্যমল্লের তাঁবুতে। খুড়োর গায়ের সব জখম নাপিত সেলাই করে দিয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে পৃথ্বীরাজ। ভয়ে আঁতকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন সূর্যমল্ল। এত হঠাৎ, এত জোরে যে জখমের সেলাইগুলি সব ছিঁড়ে গেল। আবার রক্ত পড়তে লাগল।

কিন্তু পৃথ্বীরাজ হেসে অভয় দিলেন। আমি নিশুতি রাতে চোরের মতো মারতে আসি নি। আপনি ভালো ত?

খুড়ো কম যান না। বললেন,—বাবা, তোমায় দেখেই আমি ভাল হয়ে গেছি। কোনও কষ্ট আর নেই। কিন্তু, কাকা, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমার একটুও তর সইল না। লড়াইয়ের পর বাবার

সঙ্গে এখনো পর্যন্ত দেখা করি নি। এমন কি খাই নি পর্যন্ত, এখন কিছু খেতে দাও আমায়।

খাবার এল। যারা সারা জীবন পরস্পরের মরণ চেয়েছেন—মনে মনে আর মারামারিতেও—তারা একসঙ্গে বসে এক থালা থেকে খেতে লাগলেন। যেন এত বড় বন্ধু আর হয় না।

সকালেই আমাদের লড়াইয়ের এস্পার ওস্পার করে নেওয়া যাক্—এই বলে পৃথ্বীরাজ বিদায় নিলেন।

খুড়ো জবাব দিলেন,—সেই ভালো বাছা। একটু তাড়াতাড়ি এসো।

পরের দিন সূর্যমল্লের বেধড়ক হার হল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তলোয়ারের ছোঁয়া তাঁর গায়ের উপর পড়ল না। বনে পালিয়ে গাছপালা দিয়ে লুকোবার ঠাঁই তৈরি করে নিলেন। আশা করলেন যে শত্রুপক্ষ আর তাঁর নাগাল পাবে না। কিন্তু একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ডাল লতা পাতার বেড়াগুলি মড়মড় করে আওয়াজ করে উঠল। সূর্যমল্ল চেঁচিয়ে উঠলেন—এ নিশ্চয়ই আমার ভাইপো। তাছাড়া আর কেউ হতে পাবে না। হাতে তলোয়ার তুলে নিতে না নিতেই পৃথ্বীরাজের তলোয়ারের একঘায়ে সেটা খসে পড়ে গেল।

সূর্যমল্ল যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করলেন। বললেন,—আমি যদি মরি কিছু যায় আসে না। আমার ছেলেরা রাজপুত। তারা আবার লড়তে পারবে; শোধও নিতে পারবে। কিন্তু বাবা তুমি যদি মর, তা হলে চিতোরের কী হবে?

শেষ পর্যন্ত চিতোরের ভবিষ্যৎ ভেবেই সূর্যমল্ল এই শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরই এক বংশধর, দেওলার রাজা, আকবরের চিতোর জয়ের সময় কাপুরুষ রানার বদলে নিজের মাথায় রাজছত্র নিয়ে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছিলেন।

একটি নারীর কাতর মিনতি এখন পৃথ্বীরাজের মনকে নাড়া দিল। তার নিজের এক বোনের বিয়ে হয়েছিল সিবোহীর রাজার সঙ্গে। মাউন্ট আবুর মতো সুন্দর জায়গা মেবার জামাইকে যৌতুক দিয়েছিল। তবুও জামাই নববধূর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। আফিম খেয়ে বা মাতাল হয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচার অনেক স্বামীর বীরত্বের প্রমাণ হয়ে আছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে এ হেন বীরপুরুষরা স্ত্রীকে চুল ধরে হেঁচড়িয়ে বিছানা থেকে নামিয়ে পালঙ্কের নিচে মেঝেতে ফেলে রাখে।

সিরোহীরাজ আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আর তার স্ত্রী খাটের নীচে। এমন সময় বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিরাট লম্বা মূর্তি। মাঝরাতে রাজবাড়ির দেওয়াল বেয়ে সিপাইসান্ত্রীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পৃথ্বীরাজ এখানে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু স্বামীর গলার কাছে ছোবা দেখে স্ত্রী ভাইয়ের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলেন। রাজার তখন ভয়ের চোটে নেশা উধাও হয়ে গেছে। আর কখনও খারাপ ব্যবহার করবেন না এই প্রতিজ্ঞা স্ত্রীর জুতো নিজের মাথার উপর রেখে এবং স্ত্রীর পা ছুঁয়ে করতে হল। প্রাণে রক্ষা পেলেন তিনি।

এর পরে পৃথ্বীরাজ ভগ্নীপতিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক যেমনভাবে পরাজিত শত্রুকে তিনি করতেন। যে রাজপ্রাসাদে চোরের মতো ঢুকেছিলেন সেখানে রাজার মতো সম্মান পেলেন। অনেক দিন সেখানে থাকতে হল তাঁকে। মেবারের যুবরাজ আর রানির ভাই। কত আনন্দ উৎসব হল।

বিদায় নেবার সময় ঘোড়ায় উঠতে যাবেন এমন সময় সিরোহীরাজ নিজে হাতে পৃথ্বীরাজকে কিছু মিঠাই দিলেন। মিঠাইয়ের জন্য সিহোরীর খুব নাম ডাক আছে। আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরাও যাবার দিন হাঁড়িতে কটি মিষ্টি দিয়ে দেন রাস্তায় খাবার জন্য। পথে যেন তোমার খাবার কষ্ট না হয়। অসুবিধা না হয়। আর লক্ষ্মীটি, আমার কথা মনে রেখো।

সম্মুখ সমরে যিনি সর্বদা ধর্মযুদ্ধ করেছেন, শত্রুর হাতের খানা পিনাকে তিনি সন্দেহ করবেন কেন? সিরোহীর মিঠাই খেতে খেতে তিনি চললেন। কিন্তু কমলমীরে তাঁকে পৌঁছাতে হল না। যে পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে কমলমীরের গিরিবর্ত্ম দেখা যায় সেখানে এসে তাঁর বুক ধুক ধুক করতে লাগল। তারাবাঈকে তখনই তিনি খবর দিয়ে পাঠালেন। তারা তখন অপেক্ষা করছিলেন মেঘমহলের বাতায়নে। দূরে বহুদূরে স্বামীকে দেখতে পাবেন গিরিবর্ত্মে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। তারাবাঈ চোখ মেলে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথ্বীরাজও মুদে আসা চোখ কোনমতে টেনে রেখেছেন। একবার বেদনোরের তারাকে শেষবারের মতো দেখে যাবেন।

শেষ দৃষ্টি বিনিময় আর হল না। কিন্তু বীর নারীর গানে গানে যে আকাশ ভরে আছে তার নিচে তারাভরা রাতে আমি একা নই। একা নই।

এগারো

গিন্নির হাতের চারুশিল্প।

দেখুন কী চমৎকার মিহি ছুঁচের কাজ। যেন মেশিনে বানানো হয়েছে। একেবারে বেলজিয়ামে—যেখানে দুনিয়ার সব্‌সে সেরা লেস তৈরি হয়।

একবার আনন্দ সিংয়ের মুখের দিকে তাকালাম। একবার জিনিসটার দিকে। কত মমতা দিয়ে তিনি হাত রেখেছেন লেসটাতে। মুখে তাঁর কত খুশি খুশি ভাব।

ব্যাপারটা সবই বুঝলাম। গিন্নির হাতের তৈরি নিশ্চয়ই। কালিদাস না হয় নেই একালে। কিন্তু কিছু উপমা তো দিতেই হবে। না হলে ঠাকুর সাহেবের কাছে বাঙালি সাহিত্যিকের মান থাকে না। কিন্তু কি বলি, কি বলি?

চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। বললাম—বাঃ, কী চমৎকার কাজ। ঠিক আড়াই দিন কা ঝোপড়ার মতো।

ভদ্রলোক একটু চোখ তুলে তাকালেন। কি জানি হয়তো প্রশংসাটা অবিশ্বাস করছেন। অথবা অত প্রকাণ্ড একটা শ্বেত পাথরের ধর্মস্থানের সঙ্গে তুলনাটাকে উনি 'লেগ-পুলিং' অর্থাৎ ঠাট্টা মশকরা বলে মনে করছেন। তাই একটু টীকা করতে হল।

সামান্য ছুঁচ আর সুতো দিয়ে শ্রীমতী আনন্দ সিং এমনই একখানা সুন্দর জিনিস বানিয়েছেন। এর একমাত্র তুলনা হচ্ছে আড়াই দিন কা ঝোপড়ার পাথরের জালির কাজ। প্রথমে ছিল একটি পাঠশালা। কিন্তু টড আর কানিংহামের মতে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের এত বড় সুন্দর নমুনা আর নেই। পৃথিবীতে যত সুন্দর প্রাচীন প্রাসাদ আছে তাদের যে কোনোটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। এ যেন পাথরের বাড়ি নয়। জমকালো চোখ ধাঁধানো কারুকার্যে ভরা একখানা জড়োয়া গয়না।

না। না। আপনি একটা সামান্য লেসের সম্বন্ধে এ কী বলছেন। এ যে ভীষণ বাড়িয়ে বলা হল। প্রতিবাদ করে বললেন আনন্দ সিং।

কেন? অত বড় আর অত সুন্দর পাঠশালাব রাজবাড়িখানা যদি আড়াই দিনে ভেঙে মসজিদ তৈরি করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমি আর কী বাড়িয়ে বলেছি?

তা, দেখুন বাড়িয়ে বলাটা আমাদের দেশের এটা ন্যাশনাল আর্ট। জাতীয় শিল্পকলা।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—মনে আছে ঝোপড়ার ভাঙা পাথরে খোদাই করা প্রশস্তিটা? তাতে লেখা আছে যে, আজমীরের (অজয়মেরুর) রাজা অজয়দেবের ছেলে আজমীরের মাটি তুরস্কদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। আর কেমন পুরোপুরি লালে লাল হয়ে গিয়েছিল তাও লেখা আছে। ঠিক যেমনভাবে যুদ্ধ জিতে স্বামী ফিরে এলে স্ত্রী লাল কুমুদ রঙের বেশভূষা করে।

ঠাকুর আনন্দ সিংহের সে কথা খুবই মনে আছে। আরও একটা উদাহরণের কথা তাঁকে জানালাম।

দিল্লিতে কুতুব মিনাবের পাশে মরচেহীন ক্ষয়হীন লোহার স্তম্ভে তার আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কারিকরের নাম নেই। তার বদলে আছে এমন একজন রাজার নাম যাঁর কথা ইতিহাসের কোন পাতায় পাওয়া যায় না। অথচ তাঁর বীরত্বের বর্ণনার ঘটাখানা দেখুন একবার। তাঁর ক্ষমতার হাওয়ার চোটে দক্ষিণ সাগর এখনও খোসবুয়ে ভরে আছে। তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

অবশ্য হিন্দু পাঠান মোগল সব পুবদেশীদেরই এই রোগটা সমানভাবে ছিল। এই ঝোপড়াতেই সুলতান আলতামসের বর্ণনা হচ্ছে যে, তিনি পৃথিবীর রাজা, মানুষের শ্রেষ্ঠ মাথার অধিকারী, আরব আর পারস্যেরও রাজা। শুধু পৃথিবীটুকু নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হন নি। তিনি ছিলেন এ জগতে ঈশ্বরের ছায়া। আর ধর্ম ও পৃথিবীর সূর্য।

এই আজমীরেই তারাগড় পাহাড়ের পশ্চিমে খুব সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চশমা উপত্যকা। সেখানে জাহাঙ্গির চশমা-ই-নুর নামে একটি মহল বানিয়েছিলেন। তাতে লেখা আছে যে, তিনি সপ্তলোকের রাজা, চিত্রগুপ্তের খাতায় তাঁর সব গুণ লিখবার মতো জায়গা নেই। (হায়! সে খাতাখানিতেও হয়তো দোষগুণ লিখবার জন্য পাতার র‍্যাশন করা আছে)। শুধু তাই নয়। তিনি যখন এই জায়গাতে ঝরনার পাশে এলেন তাঁর দয়ায় হঠাৎ জল বইতে শুরু হল আর সেখানকার ধুলো পর্যন্ত পরশমণি হয়ে গেল।

আজও ঠিক এমনি করেই মানুষের মাথায় ফুল বেলপাতা চড়াতে চড়াতে সেটাকে আমরা এমন গরম

করে তুলি যে, সত্যিকারের বড় মানুষরাও স্তাবকদের হাতেই নষ্ট হয়ে যায়। খোশামোদে দেবতারাই ভুলে যায়। মানুষ তো কোন্ ছার। প্রাচ্যের এই প্রাচীন বিষ যে কি সাংঘাতিক চীজ তা বুঝতেন বলেই মহাত্মা এই নামে গান্ধীজী খুশি হতেন না।

খোশামোদ করতে গেলেই বাড়িয়ে বলতে হবে। কে বলে শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না? আরে মশায়, কথায় মন পর্যন্ত গলে যায়।

তাই নাকি?

বেশ একটা বসন্তের আমেজ দিয়েছে বাতাসে। মরুভূমির নির্জন দেশে আজমীর একটা বেশ বড় শহর। তার মধ্যে আবার আনা সাগরের আশেপাশে একেবারে ওয়েসিস অর্থাৎ মরূদ্যান। এহেন জায়গায় ঠাকুর আনন্দসিংহের মতো সুরসিক লোকের অতিথি হয়েছি। বসন্তের আমেজ তো এমনিতেই বইবাব কথা। হাসিমুখে বললাম—বাঙালি কবিরা মনের দুঃখে গেয়েছেন—

"ও তোর মনের নাগাল পাইলাম না"।

অথচ আপনি বাহাদুর লোক, শুধু কথাতেই মন গলিয়ে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক কথাটার মধ্যে যেন একটা যুদ্ধং দেহি গোছের চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেলেন। একটু গম্ভীব হয়ে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। যেন তলোয়ারে শান দিচ্ছেন। বাজপুত তো।

না, মশায়, হাসবেন না। জানেন তো গোঁফ আর তলোয়ার দুই-ই রাজপুতেব বড় হাতিয়াব, বীরত্বের জবব নিশানা। আপনি যদি খাঁটি বাজপুত হন তাহলে গোঁফে হাত রেখে হলফ করলেই হবে। দিব্বি গালতে হবে না।

গোঁফে তা দিতে দিতে ফেলে আসা দিনেব পাতাগুলো সরে গেল। আনন্দসিং ফিবে এলেন তাঁর মেয়ো কলেজে পড়ার মাতাল কবা গোঁফহীন দিনগুলিতে। মরুভূমির মাঝখানে এক অজ্ঞাত 'ঠিকানা' (জায়গীর) থেকে সেকেলে বাপ টাকা পাঠায় ভাবী হাতে। ছেলে চীফ কলেজে লেখাপড়া কবে। সাহেবী কায়দায়। সাহেবী শিক্ষার সঙ্গে একটি সাহেবী রোগও তাকে ধরল। রাজপুত মাতব্ববরা নাকি এ বস্তুটিকে রোগ বলেই মনে করেন।

অর্থাৎ ঠাকুর আনন্দসিং প্রেমে পড়লেন। তাও বিলেতী কায়দায়। একটি আধা বিলেতী তরুণীব সঙ্গে। এখানকার রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কল্যাণে এরকম তরুণীর অভাব নেই আজমীরে।

ঠাকুর সাহেবের সেই সযত্নে কামানো ঠোঁটের উপর আজ জাঁকালো গোঁফ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আধুনিক সেই প্রেমের নেশা গেছে ছুটে, স্বপ্ন গেছে ছুটে। কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন যে, বিলেতী আধা বিলেতী ছোকরাদের সঙ্গে প্রেমের ঘোড়দৌড়ে পাল্লা দেবার জন্য তিনি এমন একটা বাস্তা বের করে নিয়েছিলেন যে, তার ধার কাছ দিয়েও তারা ঘেঁষতে পাবেনি। এমনই রঙ ফলিয়ে তিনি মেয়েটির রূপ গুণেব তারিফ করে যেতেন যে সে বেচারি যে হেলেন অব ট্রয় থেকে পদ্মিনী অব চিতোর পর্যন্ত সবাব চেয়েই বেশি রূপসী সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রইল না।

আপন মনে টিপ্পনী কাটলাম—বিউটি ইজ দি লাভার্স গিফ্ট—রূপ হচ্ছে প্রেমিকের উপহাব।

মাথা নাড়লেন ঠাকুর সাহেব। উঁহুঃ ঠিক হল না। রূপ হচ্ছে চোখেব নেশা; কিন্তু তার বস জোগাচ্ছে মুখের ভাষা। সেখানেই প্রেমিকের চেয়ে আপনারা সাহিত্যিকবা বেশি সুবিধে করতে পারেন।

অর্থাৎ সাহিত্যিকরা প্রেমের খেলায় নামলে বাজার মাত করতে পারবেন? বলতে বলতে সুন্দর-কাজ-করা আজমিরী নাগরা জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে নিলাম। যেন সাহিত্যিকদের এই তাজা সুসংবাদটা এখনই জানানো দরকার। জুতোজোড়াও আজ সকালেই কিনেছিলাম।

তা মোটেই অসম্ভব নয়,—আশ্বাস দিলেন ঠাকুর সাহেব। আর একটু ফোড়নও দিলেন—যদি অবশ্য কলমের মতো জিভেরও জোর থাকে।

ওই তো গোলমাল করলেন আপনি—খুব একটা আশাভঙ্গের ভাব দেখিয়ে বললাম। কোনও জায়গাতেই যখন জোর থাকে না, তখনই কলমে জোর হয়। সে জন্যেই তো সাহিত্যিকদের নিয়ে লোকে হাসি ঠাট্টা করে নির্ভয়ে নির্ভাবনায়। তা যাক সে কথা। বলি, এই পটিয়সী বিদ্যেটা কোন্ গুরুর কাছে শিখেছিলেন তা একবার চুপি চুপি বলুন না আমায়। এই মরুভূমির দেশে আনন্দ সিং না হয় একজনই ফুলে ফুলে মঞ্জরিত হয়েছিল। কিন্তু আমার বাংলা মুলুকে চারিদিকেই লোকে প্রেমে পড়বার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। একবার

আপনার গুরুজীর ঠিকানাটা বাতলে দিন। তারপর আর আমার পশার মারে কে? বালিগঞ্জ লেকের পারে ভালো ঝুলবারান্দাওলা একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে নোটিস লটকে দেব—

প্রেমসাগর কার্যালয়

পুষ্কর তীর্থে প্রাপ্ত স্বপ্নাদ্য মন্ত্র॥

কিন্তু আনন্দসিং আমায় একেবারে নিরাশ করলেন। তাঁর বিদ্যাটা শুধু রাজারাজড়াদের দরবারে শোনা কাহিনি থেকে শেখা। খোশামোদ আর বাড়িয়ে বলার দরবারি বিদ্যাটা তিনি প্রেমের কারবারে খাটিয়ে অঢেল মুনাফা মেরেছিলেন।

হেসে তিনি শুধু একটা কবিতা আওড়ালেন। এইটি ছিল তার মূলমন্ত্র :

অগর শাহ রোজরা গোয়দ শব্ অস্ত্ ঈন্।

ববায়দ গুফ্‌ৎ বিনম্ মাহ্ ইঁ পরবীন্॥

অর্থাৎ

রাজা যদি বলে—দিন হয়ে গেছে রাত।

বলো—চন্দ্র তারা করে জৌলুষে মাত॥

ভয়ানক নিরাশ হলাম। ওঃ, শুধু এইটুকু? এই বিদ্যা তো অফিসে ওই খাটাশমুখো রাসকেলটা পর্যন্ত তার 'বসে'র কাছে চালিয়ে চালিয়ে ভালো রিপোর্ট পেয়ে আসছে। ওতে কী আর কাজ হবে?

হয়, মাশাহ্ হয়। অফিসে 'বস' আর ঘরে বৌ, ও দুই-ই এক চীজ, মাশাহ্। একই আশমানের চিড়িয়া, শুধু একটু রঙ চড়ানোর ফারাক—এই যা।

সবিনয়ে স্বীকার করলাম। তবে বললাম যে আমরা সামান্য প্রাণীরাও আমাদের খুদে কর্তাদের মন ভেজাবার জন্য বাড়িয়ে বলে থাকি। পাশের বাড়ির বিনা ভাড়ার রোয়াকে বসে রাজাউজির মারাতেও কম যাই না।

আনন্দ সিং মানতে রাজি হলেন না। আপনারা লড়াই করেন না। আমাদের সঙ্গে পুরুষালীতে পাল্লা দেবেন কী করে? বলুন তো, রাস্তা দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী চলে যাচ্ছে; তার কি বর্ণনা আপনারা ইয়ার-বকশিদের মধ্যে বসে দেবেন?

ভাববার জন্য অপেক্ষা করলাম না এক মুহূর্ত। ছেলেবেলায় একটা পত্রিকায় কার্টুন দেখেছিলাম। পাড়ার একটি মেয়ে বাঁটুল ছাতা হাতে করে চলেছে। কবি গলির মোড়ে রোয়াকে বসে—

ময়ূরপঙ্খী তনু

ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে

দেখিয়া উতলা হনু।

'হনু' কথাটার উপর দুরকম মানে চাপিয়ে সেই পত্রিকায় একটা মারাত্মক রকম ঠাট্টার ছবি এঁকেছিল। ছবিটা মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। আজকের আলাপের মধ্যে বাড়িয়ে বলার বিদ্যায় বাঙালিকে এই রাজপুত বীর যে চ্যালেঞ্জ দিলেন তার জবাবে চটপট এই বর্ণনাটাই ঝেড়ে দিলাম।

হ্যাঁ, ভারী তো বললেন, স্যার। আপনার কর্ম নয়। আপনারা একটু বেশি পশ্চিম-ঘেঁষা হয়ে গেছেন। বিলেতি লেখাপড়া অনেকদিন ধরে শিখেছেন কিনা। তবে এই শুনুন আমি কি বলতাম : —

জ্বলে পুড়ে খাক পরাণ আমার—

তুমি হলে কাশ্মীর;

যেথা গেলে পাখা পালক গজায়

কেটে ভাজা মুরগির।

অবাক করলেন আনন্দসিং! যশোরে বসে এক কালে শাহজাদা খুররমের দরবারে যশোর আর কাশ্মীরের আবহাওয়া নিয়ে তুলনা হয়েছিল। সেখানে মৌলানা উফির একটা ফারসি কবিতা ঝেড়ে একজন খয়ের খান কাশ্মীরের হয়ে বাজিমাত করেছিলেন। সেই কবিতার ছায়া নিয়ে আজ,আনন্দসিংও টেক্কা দিলেন।

ঠাকুর সাহেবের মনে ততক্ষণে রঙ লেগেছে। তিনি একটার পর একটা কবিতা আওড়ে যেতে লাগলেন। কবি কে তা জানা নেই। কিন্তু তার ভাব আর ভাষার ছটা প্রেমে পড়ার জন্য তৈরি তরুণীদের মন

কতখানি ভোলাবে তা পাঠিকারা বিচার করে দেখুন।

চাঁদ কি গোলাই লেকর সাপ কা সা পৈচ ও খুম।
ঘাস কি পাত্তি কি হাল্‌কি থের গ্রাহাৎ বৈশ ও কম॥
বৈদ-ই মজনুন কি নজকৎ, বৈল কে বাল কী কূজী
বাঁক পণ তুষ কা—নের্‌মি গুল-ই-কোহ্‌সর কী॥
আগ কা তন বন গয়া ঔর নূর কী মূরত বনী।
শক্‌ল্‌ ঔরৎ কী বনী কিয়া—মোহনী সুরৎ বনী॥

চাঁদ থেকে নিয়েছ সুডৌল
সর্প হতে তনুর বঙ্কিমা
তৃণ হতে লাবণ্য বিকাশ
কম বেশি সুন্দরের সীমা।
আইভির কমনীয় শোভা
লতা সম বঙ্কিম বল্লরী
পাহাড়ীয়া গোলাপের বিভা
ময়ূরের বর্ণালী লহরী।
অনলে ভরানো দেহলতা
আনন্দের ছবি একখানি,
রমণীয় মুরতি তোমার
দরশনে হরষণ মানি।

হায় বিশ শতকের সাদামাঠা লেপাপোঁছা ইংরেজি কবিতা। হায় রবিঠাকুরের পরের যুগেব বাংলা কবিতা! তোমরা এ যুগে প্রেয়সীর চোখে সুরমা লাগানো তো দূরের কথা, তার চোখে সানগ্লাস এঁটে দিয়েছ। যাতে রামধনুর মায়া তার নজরে সহজে না আসে।

এই দুঃখটি নিবেদন করলেন ঠাকুর সাহেব। তিনি এখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নতুন প্রেমের কবিতা কি বের হচ্ছে তার খবর রাখেন।

কথার মোড় ঘোরাবাব জন্য বললাম,—কিন্তু এমন অবস্থাও কি কখনও এসেছিল —যখন এ অস্ত্রে আর শানায় নি?

হেসে ঠাকুর সাহেব জবাব দিলেন—হুঁ, একবার খুব মান অভিমানের পালা হয়েছিল বৈ কি। কিন্তু তখনও আমি হরেক রকম চেষ্টার মধ্যে এই বিদ্যাকেও হাতে রেখেছিলাম। বলেছিলাম : —

হিমানী দিয়েছে শীতলতা
দেবদারু কঠিনতা ভরা
লৌহসম কঠিন হৃদয়
হয়ে গেল পাথরেতে গড়া।

বাঃ, বাঃ। এতও ছিল পেটে পেটে? এক কালে রাধা নামে সাধা বাঁশি কৃষ্ণের হাতে যেমন লীলাভরে বাজত ঠিক তেমনভাবে এর পূর্বপুরুষদের হাতে প্রেমসে তলোয়ার খেলত। সে লীলাখেলা এখন শ্রীমানের হাত থেকে জিভে এসে ঠেকেছে।

তা, প্রেমের দায় যে প্রাণের দায়ের চেয়েও বেশি।

শুধু তাই নয়। লাউ কুমড়োর ঘ্যাঁট-খেকো বাঙালির ধাতে বাড়াবাড়িটা যে বেশি দূর সম্ভব নয়, তাও মানতে হবে। ওই তো থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। ওর মধ্যে কোথায় পাব কাশ্মীরী কোফ্‌তার সোয়াদ আর মুরগি মুশল্লমের তার?

এই কর্মী ছাটাই, ইনকালাব আব গণবিক্ষোভের বাজারে কোন্‌ বাঙালি বাদশার হারেমের নাম-লুকানো কবিদের মতো লিখতে পারবে : —

গর সবাহ্‌ আরদ শমীম-ই-পিরহন সু এ চমন
গুনচে রা দিল দীর্‌-উ-নে সিনে চুঁ গুল বগ্‌-উ-গফ্‌ৎ॥

প্রভাতের বায় যদি বয়ে আসে কাঁচুলি সুরভি তব॥
হিয়ার কোরক বিকশি উঠিবে—কুঞ্জে কুসুম নব॥

একমনে চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়ছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা ঘোড়ার খুরের টগবগ আওয়াজে মুখ তুললাম পাহাড়প্রমাণ এক টাঙ্গাওয়ালা তড়াক করে তার ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। একেবারে নিজের স্ত্রীর ভাইয়ের পত্নীর ভ্রাতৃপ্রবর এই যোটক মহারাজকে হেঁকে গালাগালি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তিন মিনিটের মধ্যে তিন মাইল পথ আনা সাগরে যদি সাহেবান সোয়ারদের আমি না পৌঁছে দিতে পারি তাহলে আমি যেন দিল্লির মসনদে না বসতে পারি।

আর সামলাতে না পেরে বাপঠাকুর্দার নিজস্ব বাংলাতে বলে ফেললাম—সাবাস, টাঙ্গাওয়ালা। দিল্লির মসনদ তোমার জন্যেই হা পিত্যেশ করে বসে আছে।

দিল্লির মসনদ কেন, যে মহাকালের হাতে মসনদ আর মহারথীরা সমানভাবে খেলার পুতুল সে মহাকাল কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আজ এখানে বসে ঠাকুর সাহেবের আধুনিক প্রেমের খেলার কাহিনি শুনে মনে মনে হেসেছি। ছেলেবেলায় আরও একটি প্রেমের গল্প শুনে রাজোয়ারার কাহিনির দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সে হচ্ছে রাজোয়ারার প্রথম বীর, মেবারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওয়ের প্রেমের খেলা। সহজ মেঠো বাঁশির সুরের মতো।

উদয়পুর থেকে দশ মাইল দূরে একলিঙ্গ মহাদেবের পূজার গাঁয়ে শিশু বাপ্পাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তার বাবা ছিলেন রাজা। কিন্তু শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলেছে। মা লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন এখানে। শিশু রাজপুত্র গাঁয়ের ছেলে হয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু তাতে কী হবে? আগুন যদি সত্যি আগুন হয় তা কি কখনও ছাই চাপা থাকে? সকাল সাঁঝে গরু চরানোর ফাঁকে ফাঁকে বাপ্পা রাখাল রাজা হয়ে বসল। রাখালরা তার সব কিছু ভালো দেখে। সব হুকুম তামিল করে।

ঝুলন পূর্ণিমার দিন এল। সব ছেলে মেয়েরাই ঝুলাতে ঝুলে খেলা করবে। কিন্তু দেবতার মন্দিরের কুঞ্জবনে। গাঁয়ের রাজার মেয়েও এসেছে। এসেছে সব সখীরা, সব মেয়েরা। কিন্তু রশি আনে নি কেউ। এখন কী করে?

বাপ্পা বেড়াতে এসেছে কুঞ্জবনে। মেয়েরা সবাই ওকে ধরল—দাও রশি জোগাড় করে। না হলে যে ঝুলন হয় না।

বাপ্পা রাজি হল। সে রশি এনে দেবে। প্রাণ ভরে দুলে মজা করতে পার, কিন্তু তার আগে একটা খেলা খেলতে হবে আমার সঙ্গে।

রাজকন্যা শুধোল—কী সে খেলা?

রাখাল রাজা উত্তর দিল—এমন বেশি কিছু নয়। শুধু বিয়ে বিয়ে খেলা।

সবাই রাজি হয়ে গেল। বাপ্পার চাদর আর রাজকন্যার ওড়নাতে পড়ল গেরো। ওরা দুজনে আর এক দুই করে দু'শ জন মেয়ে হাত ধরাধরি করে গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচল। বিয়ে বলতে ওরা শুধু এইটুকুই বুঝত, ওইটুকুই জানত। আশ মিটিয়ে তারা গাছের চারদিকে ঘুরঘুর করে হাত ধরে নাচল। তারপর শুরু হল ঝুলন। সাঁঝে সবাই ফিরে গেল বাড়ি। সবাই গেল ভুলে।

বাপ্পার সাথী রাখাল বালকরা কথা দিল যে তারা কেউ একথা ফাঁস করে দেবে না।

এদিকে বাপ্পা যে গাইদের চরাতে নিয়ে যায় তার মধ্যে সেরা মুংলি গাইটা সন্ধ্যাবেলা এক ফোঁটাও দুধ দেয় না। গাঁও বুড়ারা বলেন বাপ্পা চুরি করে দুধ খায়। কিন্তু বাপ্পা কি কখনও চুরি করতে পারে? সে নিজেই গাইটার উপর কড়া নজর রাখল। দেখল যে ঝোপঝাড় পেরিয়ে গাই কখন চুপিসারে চলে আসে একটি শিবলিঙ্গের কাছে। তার বাঁট থেকে মহাদেবের মাথায় ঝরতে থাকে দুধ—আপনা থেকে।

কাছেই এক মহাপুরুষ ছিলেন ধ্যানমগ্ন। বাপ্পা তাঁর ধ্যান ভাঙাল। খবর পেল এক দিব্য জীবনের। সাধুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিল। তিনি তো জানতেন যে এ ছেলে রাখাল নয়, রাজপুত্র। ভারতের সবচেয়ে বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হবে একে দিয়ে।

দীক্ষা নেবার পর বাপ্পা স্বপ্নে পেলেন ভগবতী ভবানীর আবির্ভাব।

বাঘে চড়ে লাল বস্ত্র পরে এলেন মা ভবানী। বর্শা, তীর আর ধনুক দিলেন বাপ্পাকে। আর দিলেন

বিশ্বকর্মার তৈরি দু'দিকে ধার দেওয়া তলোয়ার। শুধু তলোয়ারের ওজনই ছিল আধ জন মানুষের সমান।

মহাপুরুষের পৃথিবীব কাজ শেষ হয়ে গেল। তারপর দিন ভোরে তিনি দেহরক্ষা করবেন। তার আগেই বাপ্পাকে শিবলিঙ্গের কাছে আসতে বললেন।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে বাপ্পা ঠিক সেই ভোরেই ঘুম থেকে উঠলেন দেরীতে। মহাপুরুষের সাক্ষাৎ আর মিলল না। তার বদলে শূন্যে দেখলেন অপ্সরারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রের রথ। তাতে বসে আছেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, বৎস, উপরের দিকে তাকাও—যত পার উপরের দিকে। উঁচুতে তাকাতে তাকাতে বাপ্পা অন্য মানুষদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বড় হয়ে গেলেন।

অবাক হয়ে বাপ্পা ঘরে গিয়ে মাকে সব কথা জানালেন। জানলেন তাঁর কাছে যে বাপ্পা রাখালের ছেলে নয়, রাজার ছেলে। তাঁর মা হচ্ছেন রাজার ঝিয়ারী। শুনে বাপ্পা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর গরু চরাবেন না, মানুষের মতো ভাগ্যের সন্ধান করবেন।

এদিকে রাজকন্যার বিয়ের সময় এল। কিন্তু কোষ্ঠী বিচার করে পুরোহিত বললেন, মহাসর্বনাশ, এ মেয়ের যে এর মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে।

ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যা স্বীকার করলেন যে খেলার ছলে গাছের তলায় তার পুতুল খেলার বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু তারই সঙ্গে নয়, গাঁয়ের দুশো মেয়ের সঙ্গে। হাতে হাত ধরা, গাঁটছড়া বাঁধা, গাছের চারিদিকে সপ্তপদী—আর বিয়ের বাকি রইল কী?

বাপ্পা পালালেন তাঁর শৈশবের আশ্রয় ছেড়ে। দুশো বিয়ে করা বৌয়ের বাপের গ্রাম ছেড়ে। চিতোরে এসে মামার রাজ্যে মাথা গুজলেন। ক্রমে সেখানেই রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেবেলার খেলার ছলে বিয়ে করা বৌদের ভোলেননি।

কিন্তু রাজস্থানের প্রেমের কাহিনি তার পুরুষের প্রেম নিয়ে নয়। নারীই সেখানে মহীয়সী। রাজোয়ারার নারীই হচ্ছে রাজসী।

শেষ স্বাধীন হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ ঘোরীর সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে সব সামন্তদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু কী কৌশলে যুদ্ধ করবেন তা বিচার করবার জন্য অন্দর-মহলে সংযুক্তার কাছে গেলেন। সংযুক্তা তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সারা পৃথিবীতে যেখানেই নারী তার নিজের স্বাধীনতা, নিজের অধিকার পায়নি সেখানকার নারীর মনের কথা। তিনি বলেছিলেন, "মেয়েদের কাছে কে বা পরামর্শ চায়? পৃথিবী মনে করে যে, তাদের বুদ্ধি নেই। তারা যখন সত্য বাণী বলে তখনও কেউ তাতে কান পাতে না। ...বিজ্ঞ জ্যোতিষীরা এই গ্রহ-নক্ষত্রেরও গতিবিধি গুনতে পারে বই দেখে। কিন্তু নারী—পুঁথির তারা কিছুই জানে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমরা তোমাদের সঙ্গে সমানভাবে সয়ে যাই। আমরা হচ্ছি সরোবর আর তোমরা হচ্ছ হাঁস। আমরা না থাকলে তোমবা আর কি?"

এই হাঁসের কথায় মনে পড়ল আর এক রাজসী রাজকন্যার কথা। বাদশা আওরঙজেবের প্রতাপ যখন সবচেয়ে বেশি তখন তিনি চেয়ে পাঠালেন রূপনগরেব রূপসী রাজকন্যাকে। মাড়োয়ারের ছোট্ট এক রাজ্য হচ্ছে রূপনগর। সাধ্য কি তার যে দিল্লিশ্বরের হুকুম অমান্য করবে? তার উপর তলবের সঙ্গে এল দু হাজার ঘোড়সোয়ার। বাদশার বেগম যিনি হবেন তাঁর উপযুক্ত সম্মান দেখাতে হবে বৈকি।

কিন্তু রূপনগরী এই বিয়েকে কেমন সম্মান বলে মনে করলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ পড়ে সব বাঙালি জানে। রাজস্থানে তখন মেবারের রানা রাজসিংহের বীরত্বের জয়গান চলছে ঘরে ঘরে। তিনি কি আসবেন না এই অসহায়া রাজকন্যাকে রক্ষা করতে? একথা সত্যি যে, অম্বরের মতো বড় রাজাও দিল্লির-হারেমে মেয়ে পাঠিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। কিন্তু যদি কোনও রাজপুত নারী তাঁর বংশের সম্মান, হিন্দু নারীর ধর্মরক্ষা করার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করে রাজপুত বীর কি আশ্রয় দেবে না? "রাজহংসী কি বকের সঙ্গিনী হবে? বিশুদ্ধ বংশের রাজপুতানী কি বাঁদরমুখো বর্বরের বৌ হবে?"

বসুন্ধরার মতো রূপসীও যে বীরভোগ্যা সে কথাও রূপনগরী তাঁর গোপন আমন্ত্রণে জানিয়ে দিলেন। রানা রাজসিংহের বীরত্বে কীর্তিতে রাজকন্যা মুগ্ধ হয়ে আগে থেকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করে রেখেছিলেন। বহুদিনের পরিচয়ে নয়, প্রথম দর্শনে নয়, শুধু বীরত্বের কথা শ্রবণেই যে প্রেম সে প্রেম রাজপুতানীর পক্ষেই সহজ, স্বাভাবিক।

বীরপূজায় তার সৃষ্টি, বীরত্ব দিয়ে তা সাঙ্গ।

শেখ সাদীর একটা কবিতা আছে—

চঃন জান-ই-হিন্দি কাশে দার আশিকি মর্দানা নিস্‌ত্।
শকতাউ বার শাম-ই কুষ্‌তা কার-ই-হার পরোয়ানা নিস্‌ত্।

ভালোবাসাতে হিন্দু মেয়েদের মতো এত সাহসী আর কেউ নেই। সব পতঙ্গ তো আর নিভে যাওয়া মোমবাতির আগুনে পুড়ে মরতে পারে না।

কিন্তু সে মোমবাতি যখন আঁধার ঘরে কামনার শিখা জ্বালিয়ে জেগে থাকে তখনও রাজপুত নারীর সাহসের অভাব থাকে না। অম্বরের আঁধার প্রায় শিষমহলে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঁচের মধ্যে তার হাজার হাজার ছায়া দেখতে দেখতে এমনই একটা কাহিনি মনে পড়েছিল।

জয়সিংহ হারা (হর) বংশের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জয়পুরী কাছোয়ারা মোগলের সভ্যতার রস পেয়েছে। দিল্লির মারফত পেয়েছে সারা দুনিয়ার হাল ফ্যাসনের সুন্দরীদের হাব-ভাব, পোশাক-আশাক। আশাক কথাটার মানে কি মশায়? জানি না। তবে ধরে নিলাম যে, ওটা হচ্ছে প্রেমের ধরন। প্রেমের ধরন বস্তুটা যে কী তা সেকালের হারেমের রূপসীরা খুব ভালো করেই জানতেন।

কিন্তু রাজপুত অন্দরমহলের মহিলারাই বা কম যাবেন কেন? হিন্দু শাস্ত্রেও তো প্রিয় প্রসাধন বলে একটা বিদ্যা আছে। তার উপর আছে দিল্লির আমদানি নতুন ধরন-ধারন। জয়পুরের সুন্দরীরা তাঁদের লেহ্‌ঙ্গার ঝুল ছেটে ফেলতে লাগলেন। ক্যা বেশরম কী বাত!

রঙিন ঘাগরার নিচের সুঠাম চরণের কিঙ্কিণী আব্রু থেকে ছাড়া পেয়ে অম্বরের মার্বেলের মেঝেতে ঝুম ঝুম বাজতে লাগল। বিনা বাধায়,—পুরুষের মনে ঝঙ্কার তুলে।

জয়সিংহ তাঁর নতুন রানির ঘাঘরার লম্বা ঝুল নিয়ে ঠাট্টা শুরু করলেন। জয়পুরের সুন্দরীরা তাঁদের রূপ দেখাতে জানে, মন ভোলাতে জানে। কোটার সুন্দরী কি পিছনে পড়ে থাকবেন?

এই না বলে তিনি কাঁচি তুললেন ঘাঘরা ছাঁটবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রানি তুললেন—কী? অভিমান নয়, নয়নবাণ নয়, এমন কি গোসাঘর পর্যন্ত নয়। সোজাসুজি তাঁর স্বামীরই তলোয়ার। শাসিয়ে দিলেন যে, আবার যদি কোনোদিন পতিদেবতা তাঁর মান-ইজ্জত নিয়ে বেয়াদবি করেন তাহলে তিনি হাড়ে হাড়ে তাঁকে সমঝিয়ে দেবেন যে, অম্বরের পুরুষের ছুরি চালানোর চেয়ে কোটার মেয়ের তলোয়ার চালানোর বাহাদুরী অনেক অনেক বেশি।

গণোরের রানি তাঁর স্বামীর কাছে পরলোকে চলে গেলেন এমনিভাবে বীর মহিমায়। একের পর এক করে পাঁচটি দুর্গ তিনি হারালেন। পাঠান সৈন্যদের কিছুতেই রুখতে পারলেন না। তাঁর স্বামী এরমধ্যেই যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন। নর্মদা তীরে শেষ ঘাঁটিতে যখন তাঁর হার হল পাঠান সেনাপতি প্রস্তাব পাঠালেন যে, যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে, এখন রানি তাঁর দেশ আর খানের হৃদয়ে রাজত্ব করলেই সবদিক রক্ষা হয়। হাতে হাতে উত্তর পাবার জন্য খান নিজে রাজবাড়ির নিচের তলায় অপেক্ষা করছিলেন। কাজেই রাজি নই এই জবাবে কোনও লাভ নেই।

রানি রাজি হলেন। শুধু তাই নয়; যুদ্ধে আর নারীর প্রতি—দুয়েতেই খানের বীরত্ব দেখানোর প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। আরও লিখলেন যে, এহেন শিভ্যাল্‌রিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। খানকে তিনি বরণ করবেন স্বামীরূপে। নিজে হাতে তাকে বিয়ের পোশাকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। বরবেশে আসুন খান; বরনারী তাকে ছাদের উপর উপযুক্তভাবে জাঁকজমকের মধ্যে বরণ করবেন। রানির সঙ্গে বিয়েতে রাজার যোগ্যভাবেই আয়োজন করতে হবে।

মাত্র দুটি ঘণ্টা সময় দেওয়া হল। বিয়ের আয়োজন এরমধ্যেই সেরে নিতে হবে। হাতে সময় যত কম, জাঁকজমক ঠিক ততই বেশি। নহবতের বাজনার সুরে দুদলই যুদ্ধের বাজনার কথা ভুলে গেল। বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রানি প্রেমে পড়েছেন। তাঁর নিজে হাতে পাঠানো পোশাক, গণোরের রাজবংশের সব দামী জহরৎ পরে ছাতে উঠে এলেন খান। হঠাৎ পাওয়া প্রেমে, বীরত্বের প্রশংসায় এমনিতেই দিশেহারা ছিলেন তিনি। রানির রূপ দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলেন। সুরসিকা, কথায় পটু নাগরীর মোহিনী প্রভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। কোথা দিয়ে ঘণ্টাগুলো যেন নিমেষের মতো কেটে যেতে লাগল।

এদিকে খানের গা গরম হয়ে উঠতে লাগল। ভাবলেন যে, প্রেমের তাপ এরকমই হয়। যুদ্ধে জয় করে রাজ্য লাভ করার চেয়ে বীরত্বে মন ভুলিয়ে সে রাজ্যের রানিকে লাভ করা—সে যে অনেক বেশি বাহাদুরী।

পৃথিবীতে আর কোনও বীর এহেন প্রেম পাবার মতো কপাল করেছিল? খান দেহে মনে গরম হয়ে উঠলেন।

মাতাল করা শরবতে আর দরকার নেই। মন গেছে উতল হয়ে; শরীরে জ্বলে উঠেছে আগুন। এখন ঠাণ্ডা খাবার জলই যথেষ্ট।

কুজো থেকে দেওয়া হল ঠাণ্ডা জল; ঝালর দেওয়া পাখা দিয়ে সখীরা বাতাস করতে লাগল জোরে। বাসরশয্যা যে তৈরি।

খান তাড়াতাড়ি তাঁর বরবেশ খুলে ফেলতে লাগলেন। একি বাসরে দোসরের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হওয়া? মিলন রাতির পরম লগ্ন কি এল এখন?

হ্যাঁ এল বৈ কি। একই পথে গেলেন দুজনে। একই সময়ে।

গরম আর সইতে না পেরে খান বরবেশ জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু ততক্ষণে সে পোশাকের কাজ খুব ভালোভাবেই এগিয়ে গেছে। রানিও তাঁর বধূবেশ খসিয়ে ফেললেন। গম্ভীরভাবে বললেন,—তোমায় এখন জানিয়ে দিচ্ছি, খান, যে তোমার সময় হয়ে এল। আমাদের মিলন আর আমাদের বিচ্ছেদ একই সময়ে শুরু হবে। এই পোশাকে বিষ মাখান আছে। বিষের জ্বালায় তুমি এখনই মরবে। আর এই আমিও চললাম আমার স্বামীর কাছে।

কেউ কথা কইবার আগে, বাধা দেবার আগে রানি দুর্গের চূড়া থেকে নিচে নর্মদার জলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলেন। খানও বিষের জ্বালায় মারা গেলেন। তাঁর কবর ভূপাল যাবার পথে এখনও দেখা যায়।

লোকে বলে এই কবরে সির্নি দিলে এখনও নাকি জ্বরের জ্বালা সেরে যায়।

দূরে শ্যামল বাংলা দেশে বসে পাঠিকারা হয়তো এই পর্যন্ত পড়ে এই লেখাটা পাশে সরিয়ে রাখবেন। মুচকি হেসে বলবেন—যত সব গাঁজা গল্প। বন্ধুরা এখনই বলছেন—যত রাজা-রাজড়ার আজগুবি গল্প নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে শুরু করেছি। যে সময়কার সঠিক ইতিহাস বানানো গল্পের মধ্যে মিশিয়ে হারিয়ে গেছে সে সময় নিয়ে নাড়াচাড়ার কোনও মানে হয় না। যে রাজা রাজড়ারা অতীতের বস্তু তাঁদের নিয়ে আর টানাটানি কেন? একশ বছরের উপর ধরে বাংলা সাহিত্যে রাজস্থানের গান গেয়েছে। এখনও, এই গণতন্ত্রের যুগে আর কেন?

আমিও বলি তাই। আমারও এক মত। তবু একটা জবাব দিই। পাড়ার পাইকিরি রোয়াকে বসে রাজা উজীর মারা তো আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাধনা। আমিও তো সেই রাজা উজীরই মারছি। তফাতের মধ্যে রোয়াকে বসার বদলে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ান, পাষাণে কান পেতে তার অতীতের গুমরে ওঠা কান্না শোনা। চিরকালের রাজোয়ারার রাজসী কাহিনি। আজকের দিনের পটভূমিকায় নতুন করে বলা। এক হাজার বছর পরে দেশ আবার স্বাধীন হল। নতুন পথে নতুন জগতে তার যাত্রা। আজ আমাদের কত দরকার প্রতাপ আর শক্তের মধ্যে লড়াই না করে ভাই ভাই এক ঠাঁই দাঁড়ান। কত দরকার সোয়াই জয়সিংহের মতো বাইরের পৃথিবীর সব নতুন বিদ্যাকে নিজেদের দেশে টেনে আনা, পদ্মিনীর মতো দেশের বিপদে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দেওয়া। একদিন দেশ ছিল শুধু রাজার মাথাব্যথা। আজ সেটা আমাদের সকলের সমান দায়িত্ব। ত্যাগে আর সাধনায় সবাকার ধন। যে গুণ, যে বীরত্ব আমরা দেখেছি শুধু রাজারানিদের মধ্যে তাকে পেতে হবে আমাদের সকলের মধ্যে। জনসাধারণই এই যুগে রাজারানি।

দিল্লি কলকাতায় রাস্তাঘাট মানুষের চেহারা দিনের পর দিন বদলিয়ে যাচ্ছে। নতুন নতুন ঘরবাড়ি কলকারখানা মাথা তুলে স্বাধীনতার আকাশের দিকে হাত বাড়াচ্ছে। নিয়ন আলোতে অমাবস্যার রাত আলোময়। আমি এখানে যশলমীরের সীমাহারা মরুর মধ্যে পথ খুঁজে চলেছি। এখনই আঁধার নামবে—রাশি রাশি বালিয়াড়ির মধ্যে বাসর জাগতে।

পঁচাত্তর মাইল দূরে ভারতের শেষ রেল-স্টেশন।

পিছনে পশ্চিমের দিকে হলদে পাথরের বিরাট যশলমীর দুর্গ যেন আকাশের গায়ে আঁকা ছবি। তার চূড়ায় রাজবাড়ির সিঁথিতে সিঁদুর মাখিয়ে সূর্য অস্ত গেল।

শেষ রাতে প্রথম আলোর রেখা জাগতে দেখেছিলাম এভারেস্টে। মানুষের ভাঙাগড়া খেলা তুচ্ছ করে হিমালয় অনন্ত শান্তি আর সৌন্দর্যে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘ আর ফগের মায়া তাকে ঢেকে রাখতে পারবে না।

দিনশেষের প্রথম আঁধারের মধ্যে অনুভব করলাম মরুভূমিকে। মানুষের লোভ, হিংসা হানাহানির কত ঘটনা হয়ে গেছে এই বালির বুকে। তবু তার শান্তি আর আভরণহীন রূপকে নষ্ট করতে পারেনি কেউ।

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা থেকে মধ্যযুগের আধো অসভ্যতা পর্যন্ত। উটের পিঠে পশরা নিয়ে ক্যারাভান চলেছে; ঘোড়ায় চড়ে চলেছে বীরবেশে বর। ছুটে চলেছে হিংসায় উন্মত্ত সেনাদল। সে সব যাত্রার কথা মরুভূমি নিমেষে ভুলে আবার ধ্যানে ডুবে গেছে।

মানুষ কিন্তু ভোলেনি এই মরুদেশের বীরগাথাকে। তার বীর আর বীরাঙ্গনাদের। তাই তো বার বার ছুটে আসি এখানে। ভাঙা দেউলে আর দুর্গের দেওয়ালে, মরুর ঝাউয়ের ঝোপে কান পেতে শুনি তাদের বাণী। দুহাতে অঞ্জলি পেতে তুলে নিতে চাই তাদের প্রাণরসের ধারা। সে রসে নতুন জীবন পাবে আমার স্বাধীন দেশের নতুন নরনারী। সাধারণ জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে তাদের কাহিনিও হবে মহিমাময়ী—রাজসী।

'রাজসী' সম্বন্ধে

"বিগত দিনের বিশিষ্ট প্রেমে মশগুল হয়ে অন্তরঙ্গ সুরে ঐতিহ্যের সংবেদনাকে রূপ দিয়েছেন। ...আখ্যানে কথকতার সুর পরিস্ফুট, ভঙ্গিমায় ঈষৎ চটুল রস সমৃদ্ধি। ...এতে উপন্যাসের দ্রুতগতি রেখাচিত্রের সূক্ষ্ম দীপ্তি আবার নাটকীয় সংস্থানে চিত্রপীঠের যথাযথ পরিবর্তন অনেক গুণই আছে।"

—দেশ

"ভ্রমণ, দর্শন ও ইতিহাসের সমমাত্রিক মিলনে এই গ্রন্থটি যেমন উপভোগ্য, তেমনি অভিনব। উপন্যাসের মতো অনাবিল স্বচ্ছ প্রবাহ...। মনোরম প্রকাশভঙ্গি, জাগ্রত জীবন-বোধ ও কবিত্বময় ভাষা বইটিকে এত উপভোগ্য করিয়াছে।"

—যুগান্তর

"রোমান্সে ভরপুর কিন্তু বাস্তবতায় তার ভিত্তি। রাজ হারেমের জৌলুসী মিছিল ও প্রেরণাময় বীরত্বের শোভাযাত্রা উজ্জ্বল বর্ণসমৃদ্ধ মহিমায় সমভাবে আঁকা হয়েছে এবং শুধুগল্প বলার স্তর থেকে বহু উচ্চে আসন পেয়ে...এই বিচিত্র ঘটনাগুলি শুধু হৃদয়কে স্পর্শই করে না, আমাদের করুণতম দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুকে টেনে আনে।"

—অমৃতবাজার পত্রিকা

"ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রচ্ছদপটে মহান অর্থপূর্ণ বই। ...বাংলা দেশে অজ্ঞাত রাজদরবারগুলির অন্তরতম গোপন রহস্যাবলী সমুজ্জ্বল রসালতা ও করুণ সমবেদনার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। ...উপন্যাসের চেয়ে মনোহর ও আকর্ষক।"

—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড

"পড়ে মনে হল ধন্য এই বাঙালি জন্ম যার এ হেন সম্পদ ও মানবিকতার গৌরবময় ইতিহাস আছে। ...সাহিত্যিক রম্যতা ও ঐতিহাসিক তথ্যের অমৃত রসায়নে দীপ্ত একটি সাধনা।"

—ভারতবর্ষ

সেই চিরকাল

সেই চিরকালের মনের সন্ধানী

সুমথনাথ ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু

সেই চিরকাল

নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা-মণিপুর সীমান্তে যুদ্ধে হেরে ক্রমে ক্রমে পিছু হটে আসতে বাধ্য হল।

এমন সময় মার্কিন বিমান বহর সুযোগ বুঝে আমাদের পিছনে পিছনে হঠাৎ হানা দিতে লাগল। সম্মুখ-সমরের সময় তারা কোথাও ছিল না। কিন্তু পিছনে হানার সময় তাদের বিক্রম দেখে কে? হালের লডাইয়ের কৌশলই এই। তুমি কেন মিছিমিছি যাবে প্রাণে মরতে? যন্ত্রকে দাও তোমার হয়ে বদলী লড়তে।

মনে আছে ছেলেবেলায় এ নিয়ে দুর্বল বন্ধুদের লজ্জা দিতে ছাড়তাম না। লাট্টু খেলার সময় ঝগড়া আরম্ভ হলেই চেঁচিয়ে সবাইকে লড়ে যাবার জন্য হাঁক দিতাম। বলতাম, বাক্যবাগীশ বাঙালি, হাত থাকতে মুখে কেন?

এখন দেখছি বাঙালির মতো বুদ্ধিমান অন্য লোকও আছে। এরা তাই আকাশ থেকে ফাইটার প্লেনের মেশিনগানের লাট্টু চটাপট ঘোরাতে থাকে। যেন বলে যায়,—কল থাকতে হাতে কেন?

আর সারা পৃথিবীটাই তো কল হয়ে গেল। কলের মতোই চলেছি রোজ জঙ্গলে লুকিয়ে যুদ্ধ করতে করতে। গোরিলাযুদ্ধ করে আগাগোড়া ইংরেজ দলদের হটিয়ে এসেছি কলের মতো। এমনই করেই রোজ রাত্রিতে কোনও-না-কোনও মণিপুরী বা নাগা বা কেরেন গ্রামের মধ্যে হাজির হয়ে তাদের সব রান্না-করা ভাত-তরকারিতে ভাগ বসাতাম। ভাগ বসানো কথাটা অবশ্য একটু মোলায়েম করেই বলা হল। যতটা দরকার খেয়ে নিতাম আর বাকিটা সম্ভব হলে বেঁধে নিতাম। আমাদের পিছনে তো ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যের মতো লম্বা সরবরাহকারীর দল নেই যে, একটানা খাবারের জোগান দিয়ে চলবে। যতটা সম্ভব, ওদেরই সরবরাহ লাইনে হঠাৎ হামলা দিয়ে নিজেদের সংস্থান করে নিই। তাতে যখন কুলোয় না বা ওদের রসদ যখন আসা স্থগিত থাকে, তখনই শুধু আমরা গ্রাম চড়াও হয়ে পেট পুজো করে নিই। সঙ্গে হয়তো নিয়ে গেলাম গোটা দুই কুমড়ো বা হাঁস-মুরগি, আর বলে গেলাম—খবরদার, দেশের দুশমনকে জানিও না যে, আমরা এসেছিলাম।

আমি তো একদিন আমার প্ল্যাটুনের সবাইকে শুনিয়েই দিলাম—তোমরা হচ্ছ বাঙালি মেয়ে।

শুনে সবাই খুব তাজ্জব বনে গেল! কেন? কেন? আমরা কি বন্দুকের ঘোড়া টিপি হারমোনিয়ামের চাবির মতো? না 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা'—গানটি তোমাদের মেয়েদের মতো মিঠে গলায় গাই?

হেসে শুধু জবাব দিয়েছিলাম—

"খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে
হায়, হায়, ওই যায় বাঙালির মেয়ে।"

বলা বাহুল্য, টমির দল বা "জি আই রা" "ওই যায় বাঙালির মেয়ে" বলে রসিকতা করবার জন্য প্রাণ ধরে অপেক্ষা করতে পারত না। পালিয়ে যেত ধেয়ে। আমরা কাছাকাছি কোথাও আছি, এই খবর পেলেই কর্পূরের মতো সুন্দর গায়ের রঙ নিয়ে কর্পূরের মতো কোথায় যে উবে যেত, তার ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে দুষ্ট লোকে বলত যে ওরা লড়তে এসেছে, মরতে আসে নি। ওরা দূর প্রাচ্যে জাপানীদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে বুঝেছে যে, ধরা পড়া মানেই মরা। আমাদের কাছেও সে ভয়টা ওরা করে, যদিও তার কারণ ছিল না।

আমার প্ল্যাটুনটা সেদিন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে—পিছু হটা লড়াই চালাতে চালাতে। অনেক চেষ্টা করলাম সবাইকে এক সঙ্গে জড়ো করতে। কিন্তু কে যে কোথা দিয়ে পালাতে বাধ্য হল তার ঠিক পেলাম না। সবচেয়ে মুশকিল হল যখন রাত্রি হয়ে এল, তবু তাদের খোঁজ পেলাম না। অথচ তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, পথ দেখিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা আমারই দায়িত্ব। আর এখন নিজেই পথ পাচ্ছি না।

এমন অবস্থায় আমার নির্দেশ ছিল যে, যতক্ষণ আবার আমরা এক সঙ্গে না মিলতে পারছি, পরস্পরের খোঁজ করব, কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে চলব। —শত্রু যেন কোনও সন্ধান না পায় বা না করে সন্দেহ। কাজেই রাত্রের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে খাবারের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যেন এমন বাড়িতে হাজির হই, যেখানে আদর করে খেতে দেবে—নিজের দেশের লোক বলে। দেশ স্বাধীন করতে এসেছি বলে, বিপদে ফেলব বলে নয়।

সারাদিন ওৎ পেতে থেকে ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক চালানো আর পাহাড়ি জঙ্গলে লুকিয়ে পিছু হটে আসার পর দলছাড়া হয়ে একা গ্রামে ঢোকা যে কতখানি দুঃসাহসের ব্যাপার তা কি আগে কখনও ভেবে দেখেছি! বাঙালি বেহিসাবী জীবনে বড়জোর কালবৈশাখীতে মেঘনায় পাড়ি দিয়েছি বা শেষরাত্রে বান ডাকার আওয়াজে ঘুম ভেঙে লুকিয়ে নৌকার বাইরে এসে চরে ছুটাছুটি করেছি। এই তো হয়েছে জীবনের যা কিছু দুঃসাহসী অভিযান।

তারপর আরম্ভ হল কলকাতায় মেসের বারান্দায় সন্ধ্যা কাটানো। চাকরির সন্ধান সন্ধ্যায় শেষ করে পাশের বাড়ির রোয়াকের উপর কাঠের বানানো পানের দোকানে রেডিওতে শুনতাম—

মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে।

তখন মনে মনে প্রিয়তমার বদলে চাকুরিদেবীর আবাহন করতাম। রাস্তার পুলিশই তখন বড় সাহেব। কি জানি কোনও জায়গায় চাকরি পেলেও ওই কর্তাদের নেকনজর থাকলে সেটাও টিকবে না। অমন শান্ত নিরীহ জীবন কামনা করার পর এখন হঠাৎ এ কি পরিবর্তন হল আমার! চকিতে গানটার কলি মনে পড়ে যাওয়াতে একটা প্যারডিও মনে এল—

মেশিন গানেতে কয়ে যাবে কানে
প্রাণ নিয়ে তুমি ভাগিবে।

ভাগ্যের বিপাকে এই রকম অভাবনীয় অবস্থার মধ্যেই পড়তে হয়েছে। তার মধ্যেও বড় আশার কথা এই যে, এত কষ্টের মধ্যে মনের মৃত্যু হয় নি। পুরানো কথা আর প্রাণের ব্যথা দুই-ই এখন আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যখন সৈন্যদলে ঢুকে কুচকাওয়াজ করতে শিখি তখন ওরা বলত যে, ঠিক একভাবে তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে এমন একটা অবস্থা আসবে, যখন নিজের মন বা নিজের ক্ষমতা বলে কিছু থাকবে না। মার্চের তালেই আপনা থেকে দলকে চালিয়ে নিয়ে চলবে। ইটালিতে মুসোলিনীর "হংসপদিকার" দল সম্বন্ধে নাকি সেকথা আরও বেশি খাটে। 'গুড্ স্টেপ' অর্থাৎ হংসগমন মুসোলিনী সেই জন্যই ফ্যাসিস্টদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন।

সে কথা মনে হতেই আপনা থেকে মনে মনে বলে উঠলাম—হায় গজগামিনীর দল, তোমরা এবার কবিতার খাতা থেকে বিদায় নাও—আমরা সেখানে মার্চ করে ঢুকছি এবার।

বলতে বলতেই অন্ধকারে কাকে দেখলাম যেন! নিচু হয়ে বসে কান খাড়া করে ঘাড় উঁচু করে রইলাম। সত্যিই তো, একজন গজগামিনীই যেন মনে হচ্ছে। তাহলে তো খাবারের হদিস হয়ে গেল। আহা বেঁচে থাক তোমরা অন্নপূর্ণার জাত।

কিন্তু বুঝিয়ে দিতে হবে যে খাবার দিতেই হবে। কেন, তাও বুঝিয়ে দিতে হবে। এত হয়রান হয়েছি যে, আর ঘুরতে পারব না আজ রাত্রে।

'হল্ট, হু কামস্ দেয়ার?"

পরিচিত কিন্তু পিলে-চমকানো এই হাঁক। তা শুনে গজগামিনী গজেন্দ্রাণীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল না। মুখ ফিরিয়ে দুঃসাহসে আমার দিকে এগিয়ে এল। যুদ্ধং দেহি ভাব দেখিয়ে সাহসিনী নির্ভীকভাবে আমায় বলল—হুঁ, ভালো ইংরেজি জানো দেখছি! তুমি টমি?

এই হানা-হামলায় তোলপাড় জঙ্গলে নারীকণ্ঠের ইংরেজি ইংরেজের হাওয়াই হানার বোমার চেয়ে অনেক বেশি আশ্চর্য কথা। অন্য মনে কাঁধ থেকে ঝোলানো 'স্লিং'-এ রাইফেলটা আটকে রাখলাম।

নারী অন্ধকারের মধ্যে নীরব রইলেন না। ইংরেজিতে আবার বললেন—এখান থেকে শীঘ্র চলে যাও—তোমাদের লাইনে চলে যাও।

কণ্ঠে তাঁর আদেশের সুর। আদেশ দিতে, মনে হচ্ছে, তিনি আজন্ম-অভ্যস্ত।

আমার মধ্যের সৈনিক তখন আস্তে আস্তে যুদ্ধসাজ সরিয়ে নিচ্ছে। এখানে ভয় বা হুমকিতে কাজ হবে না। সাধারণ মানুষের সহজ ব্যবহারই দরকার।

ইংরেজিতে বললাম—ম্যাডাম, আমি আই-এন-এ—আপনার কাছে খাবার চাই। আশ্রয় চাই না। খেয়েই চলে যাব। চলুন আপনার বাড়িতে।

ম্যাডামের মনে কী ভাব হল না মুখে কী ছাপ পড়ল তা অন্ধকারে বুঝবার উপায় নেই। শুধু তাঁর

কণ্ঠস্বর বুঝিয়ে দিল যে, তিনি আমায় ভয় করছেন না। আমার পরিচয় পেয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মতলব কী? শুধু খাবেন তো?

আমার পক্ষে তাই একমাত্র কাম্য ছিল। ভোজনং যত্র তত্র চ, কিন্তু শয়নং হট্টমন্দিরে নয়। বরং ঠিক তার উলটো। যত গভীর বন হবে ততই আমার আর একটা দিন বেঁচে থাকার মেয়াদ বেড়ে যাবে। শুধু বেঁচে থাকা।

ব্যাকুলভাবে বললাম—হ্যাঁ শুধু খাব। আর তখনই চলে যাব।

আমি খাবার পাঠিয়ে দেব। এখানে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করুন।

না, না, অপেক্ষা করতে বলবেন না। আমি আপনার সঙ্গেই যাব।

দূরে তখনও এদিক সেদিক থেকে রাইফেলের গুলির আওয়াজ আসছে। বহু বহু দূরে হঠাৎ এক একটা তীব্র সন্ধানী আলোর রেখা আকাশের বুক চিরে উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার জঙ্গলের গাছপালার ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফালি হয়ে ঢুকে আসছে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে একটা টিলার তলায় শালবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। পিছু হটতে হটতে যে কোথায় এসে পড়েছিলাম তা টেরও পাই নি আগে। পেলে এদিকে আসতামই না।

কিন্তু যে দিকেই যেতাম ফল সেই একই। 'ছন'-বনের ও কাদার জলাগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে গা ঘষে ঘষে আসতে আসতে কখন যে একটা জোঁক হাতের আস্তিনের ভিতর দিয়ে বগলে ঢুকে রক্ত চুষতে আরম্ভ করেছে তা এতক্ষণে টের পেলাম। ঘামে যে বগল ভিজে গিয়েছে, তা তো বুঝেইছিলাম। কিন্তু সেটা যে শুধু ঘাম নয়, রক্ত—তা এতক্ষণে টের পেলাম। পোড়া কপাল! যে রক্তপাত শত্রু করতে পারল না, সেটা করে গেল একটা জোঁক। তখনও সেটার রক্ত-পিপাসা ও গা ফুলে-যাওয়া শেষ হয় নি। জোরে টেনে বের করে আনতে গিয়ে ব্যথায় বলে উঠলাম—উঃ।

নারীটি ঘুরে দাঁড়ালেন,—অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে। ঘুরে দাঁড়ালেন—বললেন, আপনি বাঙালি? পরিষ্কার বাংলা কথা।

সমুদ্রে আলোকস্তম্ভ বোধহয় এমনই আশার আলো এনে দেয় গর্জনমুখর ঝড়ের রাতে। বললাম—হ্যাঁ, আমি বাঙালি।

সারাদিন শত্রুর তাড়া খেয়ে আর খাবার না খেয়ে যা হয়নি এবার তাই হল। তিন বছর মার্চ করা, দুঃখে কষ্টে পোড়া, জাপানী বন্দী-শিবিরে ঘোরা আজাদ হিন্দ ফৌজের পলায়মান ক্যাপ্টেনের চোখে এই প্রথম জল এসে পড়ল।

২

না, আমার নামধাম জানতে চাইবেন না। শুধু জেনে রাখুন আমার নাম মঞ্জরী। রাজকুমার শীতলজিৎ সিংহের বান্ধবী।

রাজকুমার শীতলজিৎ? মনে একটা সন্দেহ এল। মণিপুর আক্রমণের সময় আমরা আগে থেকেই রাজপ্রাসাদের সবার নাম ও মনোভাবের খবর নিয়ে রেখেছিলাম। রাজপরিবারের মধ্যে শীতলজিৎ বলে তো কেউ ছিলেন না! সন্দেহে আমার পা আপনা থেকেই থেমে এল।

কিন্তু বাড়ির সামনে এসে পড়েছি। যা সন্দেহ আছে তার নিরসন এখনি করতে হবে। যা বাধা তা এখনই দূর করতে হবে। জীবন ও মৃত্যু, স্বাধীনতা আর বন্দীত্বের মাঝখানে মাত্র একটি পদক্ষেপ বাকি।

দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম,—কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন? এখানে কে কে আছেন তা আগে বলুন?

দ্বিধাহীনভাবে বললেন—কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না? ভয় নেই, বাড়িতে দুটি মণিপুরী ঝি ছাড়া কেউ নেই। তারাও রাইফেলের আওয়াজে এতক্ষণে গোবিন্দজীর নাম করতে করতে গুদামে গিয়ে নামাবলী মুড়ি দিয়েছে। আপনাকে ধরিয়ে দেবার জন্য কেউ নেই।

ততক্ষণে টিলার উপরে কুটিরের সামনে এসে পড়েছি। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বললাম,—আগে সব শুনতে চাই, তারপরে ঘরে ঢুকব।

কঠোরভাবে মঞ্জরী প্রশ্ন করলেন,—অর্থাৎ?

অর্থাৎ জানতে চাই আপনি আমায় ধরিয়ে দেবেন কিনা! এখানে কী করে এলেন তা না জানলে সেটা বুঝব কেমন করে? সাধারণ যে-রকম মণিপুরী বাড়িতে আমরা রাত্রিতে চড়াও হয়ে যাই এটা তো সে রকম বাড়ি নয়। তার উপরে বলছেন—রাজকুমার! অথচ এ নামে কোনও রাজকুমার মণিপুরে নেই। তাই সন্দেহ হয় বৈ কি। কিন্তু খাওয়া আমার নিতান্তই দরকার।

নেহাত এমন একটা অবস্থায় এসে পড়লেন মঞ্জরী দেবী যে বহু দ্বিধা সত্ত্বেও আত্মকাহিনি না বলে আর তাঁর উপায় রইল না।

আমি যখন ১৯৪১ সনে চাকরির সব পথে জুতো ঘষে ঘষে বিফল হয়ে সৈন্যদলে ঢুকে সেকেন্ড লেফটনান্ট হয়ে সিঙ্গাপুরে চলে গেছি, তখন থেকে মঞ্জরীর কাহিনি হল শুরু।

তখনও যুদ্ধের ঢেউ বাংলাদেশের উপর বিশেষ এসে পড়ে নি। তারপর যে সময় সব ব্রিটিশ বাহিনীব সঙ্গে আমি জাপানীদের হাতে বন্দী হলাম, তখন থেকেই ব্রিটিশ কর্তাদের শত্রু-বঞ্চনা-নীতির শুরু হল। ফলে বাংলায় ভীষণ অন্নাভাব ও হাহাকার আরম্ভ হল। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। লাখ লাখ লোক না খেতে পেয়ে শহরে এসে ভিক্ষা করতে শুরু করল। লাখ লাখ লোক অনাহারে মরে সারা হয়ে গেল—মড়কের মধ্যে শিয়াল-কুকুবের মতো। তার সঠিক খবর জানতাম না। আশ্চর্য হয়ে শুনতে শুনতে শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

শিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েদেরই বিপদ হল সবচেয়ে বেশি। না করতে পারে ভিক্ষা, না আত্মবক্ষা। একদিন চাকরির খোঁজ থেকে ফিরতে গিয়ে নির্জন রাস্তায় বদমায়েস সরবরাহকারীদের হাতে পড়ে কোথায় যে বেচারি মঞ্জরী উধাও হয়ে গেল তা কেউ জানল না। আত্মীয় যারা তখনও বাকি ছিল, তারা কোনদিন খোঁজ করে নি। এমন কি দেয় নি হয়তো খবরের কাগজে একটা মামুলি বিজ্ঞাপন। এদিকে ওই রাক্ষসরা ওকে এখান থেকে ওখানে গোপনে নানা অজানা জায়গায় চালান করতে লাগল। শেষে আসামে ডিমাপুব রেল স্টেশনের কাছে একটা সেনাছাউনির কাছে এনে গুম করে রাখল। অবিরাম পাশবিক লাঞ্ছনার ফলে বেচারি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল। মানুষের কাছে শুধু পশুত্ব পেয়েছিল বলেই রাজকুমার শীতলজিৎ তাকে উদ্ধার করে আনার পরও সে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে যেতে রাজি হয় নি। সেখানেও যে বাঙালি আছে, সমাজ আছে। রাজকুমারও চান নি তাকে সেখানে রাখতে। কোনও-না-কোনও দিন রটনা হয়ে যাবে যে, তিনি নিশ্চয়ই কোনও কু-মতলবে একটি বাঙালি মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সত্যিকারের রাজকুমার নন, লোক-সুবাদে রাজকুমার। মণিপুরে অনেক বনেদী ঘরের রাজপরিবারের সঙ্গে কোনও-না-কোনও সম্বন্ধ আছে। তাঁরাও নিজেদের রাজকুমার বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

মঞ্জরী যেন একনিঃশ্বাসে অতীতের সমুদ্র মন্থন করে যাচ্ছিল। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিলাম তার কাহিনি। কখন যে তার কুটিরের দরজার সামনে থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছি তার খেয়াল নেই। কিন্তু যখন তার বিবরণ নিজের কাহিনি থেকে রাজকুমারে এসে পৌছল, কেবল তখনই নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। খুব ক্ষীণস্বরে বললাম—মাপ করবেন, আর শুনতে চাই না। আপনার সব কথা আমি বিশ্বাস করছি।

ম্লান আচ্ছন্ন কণ্ঠে মঞ্জরী বলল—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আপনি এখনই খেয়ে চলে যান। আমি আপনার সামনেই বসে থাকব। ভয় নেই যে বাইরে গিয়ে গোরাদের ডেকে আনবার চেষ্টা করব।

আলপনা-দেওয়া কাঠের পিঁড়িতে বসেই বুঝতে পারলাম যে, এই আসন ওর নিজের জন্যই তৈরি ছিল। নিজেরই খাবারটুকু দিয়ে আমার অতিথি সৎকার করবে। প্রতিবাদ করে বললাম—মঞ্জরী দেবী, আপনার খাবারটা আমি খেয়ে নেব না। শুধু একটু জল দিন।

পরিহাস—নিজের প্রতি পরিহাস-ভরা কণ্ঠে সে বলল—হ্যাঁ, দেবী, অবশ্যই দেবী! দানবের লুট করা দেবী!

চুপ করে রইলাম একটুক্ষণ। তারপর বললাম—শুনুন মঞ্জরী দেবী, আমি আর আপনি একসঙ্গে বসে খাব। আপনি আমায় খেতে দিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন। আমি জাতে বামুন। কাজে, ধরুন ক্ষত্রিয়। কিন্তু আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

নিজের মনেই যেন মঞ্জরী বলে গেল—হ্যাঁ, শ্রদ্ধা করি! নিজের প্রতি যে একটুও শ্রদ্ধা, একটুও পবিত্র ভাব বাকি নেই সেটা কী করে অন্য লোকে বুঝবে?

না মঞ্জরী দেবী, একথা বলবেন না। আপনি নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিতা—ইংরেজি যখন জানেন। একথা তো

জানেন যে, বিপদ বা দুর্দৈব আপনাকে ছেয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু ছোট করতে পারে না। এই নিন—এই বাটিতে আপনার জন্য ভাত তুলে দিলাম। চট করে খেয়ে নিন। আমারও দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

না, আপনি খেয়ে নিন। আমি তো প্রায়ই রাতে খাই না। রাত হলেই চারদিকে দুঃস্বপ্ন ঘিরে আসে—কালো কালো দুঃস্বপ্ন। ঘরের বাইরে পালিয়ে যেতে চাই। যেন তাতেই রক্ষা পাব। তাই তো জঙ্গলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ। ঝি দুটোর অভ্যেস হয়ে গেছে। ওরা জানে আমি রাতে খাই না, তবু রেঁধে রাখে রোজ।

কিন্তু আজ রাতে আপনি নিশ্চয়ই খাবেন। কাল তো আমি আসব না আপনাকে সাধতে!

হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল মঞ্জরী। আর্তস্বরে বলল—অ্যাঁ। কাল গিয়ে বাংলা দেশে বলে বেড়াবেন যে আমি বেঁচে আছি, না, না, আমি মরে গেছি! মরে গেছি!

বুঝলাম যে, একমাত্র পথ হচ্ছে একে নিজের কথা ভাবতে না দেওয়া। অর্থাৎ আমার কথাই বলে যেতে হবে। কাল অবশ্য আমি থাকব না, তবু আজ রাতটুকু তো এ একটু শান্তি পাক। সেটুকুই হবে আতিথ্যের প্রতিদান।

ভরসা দিয়ে বললাম—মঞ্জরী দেবী, আমি তো বাংলা দেশে ফিরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি বর্মায় পালিয়ে। যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। এখন কোথায় যে লুকোব তা-ও জানি না। জাপানীর হাতে পার পেয়ে গেলাম, কিন্তু ইংরেজের হাতে রক্ষা নেই। ধরতে পারলে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বাপ-মার চোখের সামনে ফাঁসি দেবে হয়তো।

নিস্পৃহভাবে মঞ্জরী বলল—ঠিক কথা। আমারও বাপ-মা ছিল এককালে। কিন্তু তারা বেঁচে থাকলে এখন বোধ হয় আমায় মেয়ে বলে স্বীকার করতে চাইত না।

অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে যেন নূতন আলো পেলাম। চট করে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, রাজকুমার আপনাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করেছেন। এই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আপনি ওঁর সঙ্গে একবার দেশে ফিরে যান, আপনার গ্রাম সমাজ দশজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ান ওঁর সঙ্গে। রাজকুমারের স্ত্রীকে সবাই সম্মান জানাবে।

রাজকুমারকে এখনও ভালো করে চিনলাম না। ভদ্রলোক স্বপ্নবিলাসী বোধ হয়। কিন্তু সংসারের বিশেষ কিছু বোঝেন না। কেন যে নিজের বিপদ ডেকে এনে আমায় এমন করে উদ্ধার করে আনলেন তা পর্যন্ত বুঝলাম না। ইম্ফলে বাঙালি আছে বলে সেখানে যেতে রাজি নই। তাই স্বচ্ছন্দে আমায় এই দূর জঙ্গলে গ্রামের বাড়িতে রেখে গেলেন। কোনও লোভ নেই, দাবি নেই আমার উপর। অথচ সবই দিয়ে যাচ্ছেন। আমি যে ওঁর কী, তাও হিসাব করে দেখেন নি।

অত্যন্ত অসংকোচে প্রশ্ন করলাম—কেন, সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নি আপনার সঙ্গে?

যখনই কথা তুলি, তিনিই বাধা দেন। বলেন—আমার মন এত ভেঙে আছে যে, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কওয়া ঠিক নয়। বলেন,—সময়ই সব সহজ করে ঠিক করে দেবে, এ সম্বন্ধে আমাদের ভাববার কিছু নেই। কিন্তু—

কিন্তু এর মধ্যে কোথাও নেই। আপনি দেখবেন সময়ই সব ঠিক করে দেবে।

কিন্তু উনি ভাবতে দেন না বলেই তো ভাবছি এত। নির্ভাবনার মধ্যেই তো ভাবনা বেশি। মাঝে মাঝে ভাবি—

কী ভাবেন? কই, আপনার বাটির ভাত তো বাটিতেই রয়ে গেল। একেই তো ঠাণ্ডা ভাত—তাও শুকিয়ে গেছে। শিগগির খান বলছি।

রাগ করবেন না। খেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু খেয়েই বা কী হবে? এ রকম ভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কী?

সান্ত্বনার সুরে বললাম,—মঞ্জরী দেবী, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই যুদ্ধটা কেটে যাক, আর দু-এক মাসেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। তখন দেখবেন রাজকুমারের সঙ্গেই আপনার নূতন জীবন গড়ে উঠতে পারে। অথবা উনি আপনার জন্য এমন বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, যাতে আবার আপনি দেশে ফিরে গিয়ে নতুনভাবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে নিতে পারবেন।

বলতে বলতে মঞ্জরীর বিশাল বিষাদাচ্ছন্ন চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনন্ত করুণতায় ভরা তার মুখের উপর দুটি চোখ। রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা আকাশের বুকে দুটি ম্লান তারা। তাদের ভাষা কে জানে?

মঞ্জরী মৃদু মাথা নেড়ে বলল—না, দেশ আমার সব শেষ হয়ে গেছে। সেখানে আর যেতে পারি না। এবারকার মতো জীবনের সব সাধও শেষ হয়ে গেছে।

বাধা দিয়ে বললাম,—তবু তো আমরা বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। এই দেখুন না, আমিও তো পালাচ্ছি, যদিও জানি প্রত্যেক দিনই আমার ধরা পড়বার কথা। পৃথিবীর কোথাও গিয়েই নিষ্কৃতি পাব না। আমেরিকানরা ধরতে পারবেই। তবু তা বলে লুকোবার চেষ্টা তো করতে হবেই। যুদ্ধ এখন শেষ হয়নি, কিন্তু বাঁচবার বাসনাতেই তো পিছু-হটা যুদ্ধ আমরা চালাচ্ছি। হয়তো তারই মধ্যে একটা কিছু পথ আবিষ্কার হয়ে যাবে। আপনিও তেমনভাবেই বাঁচতে চাইবেন মনে মনে, যতই না কেন জীবনে ধিক্কার আসুক।

না, মনে তো হয় না।

ভেবে দেখুন তো। এই গত ক-মাসের মধ্যেই এমন কিছু হয়ে থাকতে পারে, যা হয়তো আপনাকে বেঁচে থাকার সম্বল তৈরি করে দেবে।

চুপ করে রইল মঞ্জরী অনেকক্ষণ। অনন্ত স্মৃতি-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পরে তার মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে যেন বাণীর প্রকাশ হতে লাগল। আমি নির্মম আশ্বাসহীন পরাজয়ের বন্যার মুখে তাড়িত তৃণখণ্ড— সে বাণী কান পেতে শুনে যেতে লাগলাম।

মঞ্জরী বলে চলল—জানেন নিশ্চয়ই, বাংলায় কথা আছে যে, চোরের ধন বাটপাড়ের পকেটে যায়। সমাজের বুকে বসে থেকে পাপের জোগানদার তল্পিবাহকরা যে কোথা থেকে কোথায় আমাকে লুকিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তার সন্ধান কারও পাওয়ার সাধ্য ছিল না। ট্রেনে বা স্টিমারে কোনদিন তোলে নি আমাকে। শুধু রাত্রিবেলা হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় ট্রাকে করে নিয়ে যেত। পালাবার পথ নেই, আত্মহত্যা করবার উপায় নেই। ছিল শুধু অসহায়ভাবে সহ্য করে যাওয়া, চোখের জল মনের আগুনে শুকিয়ে ফেলা। তার মধ্যে একদিন হঠাৎ যে-তাঁবুতে রাতে আমাকে চালান করা হয়েছিল, সেখানে কোনও জরুরি কাজে ঢুকে পড়লেন এক মণিপুরী যুবক। হাতে তখনও খোলাই রয়েছে নিজের পরিচয়-পত্র (আইডেন্টিটি কার্ড)। ভদ্রলোক মহা অপ্রস্তুত হয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার সে রাত্রের কাপ্তেনের তখন কাণ্ডজ্ঞান একটু তাড়াতাড়ি লোপ পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। কলির সন্ধ্যা কখনও কখনও সত্যি সন্ধ্যাতেই নেমে আসে। রাক্ষসটা ভদ্রলোককে খুব হৈ-হল্লা করে স্ফূর্তিতে ভাগ বসাতে নিমন্ত্রণ করল। বাড়িয়ে দিল একটা মদের গ্লাস। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ ছিল আমার দিকে—যে আমার দিকে এতদিন ধরে কেউ স্বাভাবিক চোখে কখনও তাকায় নি। সে দৃষ্টিতে আমার চোখে জল এসে গেল। কাঁদবার যে অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম সে অধিকার যেন আমি ফিরে পেলাম। তিনি গ্লাসটা এক হাতে ধরে রেখে আর একহাতে আমায় ইশারা করলেন কাছে এগিয়ে আসতে। জানি না কেন, একটু দুঃসাহস হল—এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। তাঁর পাশেই রাক্ষসটা ছিল, তবু তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি—ঘর-ভাঙা, সর্বহারা, নিঃশেষিত আমি।

৩

সেই গভীর রাত্রে একটা জীপে করে চলেছি আমরা। সেই অচেনা মণিপুরী ভদ্রলোক আর আমি। রাত্রি অন্ধকার, তার চেয়ে বেশি অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে যাওয়া বাঁকাচোরা পথ। আমাদের সামনে পিছনে এমনিভাবে আরও বহু মোটর, জীপ ও ট্রাক চলেছে। তাদের সামনে কোনও বড় বাতি নেই, শুধু দুটো সরু বিন্দুর মতো আলো। দিনের আলোতে জাপানি বিমান-হানার সম্ভাবনার জন্য বিশেষ দরকার না হলে এ পথে গাঁড়ি চলে না। সন্ধ্যার পর শুরু হয় মণিপুরের পাহাড়ি পথে অন্ধ অভিযান।

আমি তখন অঝোরে কাঁদছি। আমি যেমনভাবে আপনাকে শুধু একটা কথা থেকে বাঙালি বলে চিনে নিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে তিনিও আমায় চিনে নিয়েছিলেন। সেই রাক্ষসটা কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। লালসায় লালা গড়িয়ে পড়ছিল তার জিভ থেকে। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে কী বললেন জানেন? আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

তিনি বললেন,—জো, একে তুমি কোথায় পেয়েছ? এ যে আমার বহুদিনের হারানো পুরানো সুইট-হার্ট!

জো হেসে গড়িয়ে গেল। বলল,—গশ্, তোমরা সুইট-হার্ট! জানো, একটা ইংরেজি কথা কইতে-পারা

মেয়ে জোগাড় করতে কত টাকা খরচ হয়েছে? তোমরা ইন্ডিয়ানরা শুধু বিছানা চেনো; প্রেম করতে জানো না। কিন্তু ফ্লার্ট করাই হচ্ছে প্রেমের প্রথম ভাগ। সেরা রস। সে সব তোমরা বুঝবে না। বাই জোভ, ব্লাইটি (ইংলন্ড) ছেড়ে আসার পর একটু ফ্লার্ট করবারও মতো মেয়ে পাই নি এই পোড়া দেশে এসে!

ভদ্রলোক ভয়ানক চটে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন,—জো, তুমি স্কাউন্ড্রেল। আমার হারানো সুইট-হার্ট, একে আমি নিয়ে যাব।

সহ্য করতে পারলাম না। বাঘের গহ্বর থেকে ভালুকের কবলে পড়তে যাচ্ছি কি না কে জানে? লোকটি বেসামরিক আর চেহারায় ভদ্রলোক। কিন্তু বলছেন এ সব কী? অসহ্য লাগল। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। বলেছিলাম—মা গো!

তখনই কিন্তু ভদ্রলোক সব বুঝে ফেললেন। বললেন—জো, আমার কলেজে পড়ার সময়কার বাঙালি সুইট-হার্ট এখানে কী করে এল? শীঘ্র বল, শীঘ্র। না হলে তোমায় মেরে ফেলব। এখনই যাচ্ছি রিপোর্ট করতে তোমার জেনারেলের কাছে।

আহত মানবতা যেন জেগে উঠল ওঁর স্বরে। রেগে খেপে গিয়ে তিনি দাপাদাপি করে সারা তাঁবুটা যেন চষে বেড়াতে লাগলেন। খালি বলতে লাগলেন—তোমরা জানোয়ার, আমার বাঙালি প্রণয়িনী, কতদিন থেকে তার সন্ধান পাচ্ছি না। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর ওকেই। চাই না তোমাদের কন্ট্রাক্ট, চাই না তোমার সঙ্গে বসে সন্ধ্যাবেলা মদ খাওয়া! যদি এখনই ওর জন্য বাইরে যাওয়ার পারমিট না দিতে পার, জেনারেলের কাছে নালিশ করব। এখনই নালিশ করতে যাচ্ছি। এখ্খনি! কোনও কথা শুনব না। নো এক্সপ্লানেশনস।

বিনা বাধায় বেরিয়ে এলাম। বিনা বাক্যে তাঁর জীপে উঠে বসলাম। কিন্তু বিনা অশ্রুতে তো আমার জীবন কাটবার নয়। কোথায় বা যাব এর পরে? যাওয়ার জায়গা নেই, বাঁচবার উপায় নেই। সব চেয়ে বড় সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যা।

আমার কান্না অনুভব করতে পেরে ভদ্রলোক খুব সস্নেহে বাংলায় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি তো ছাড়া পেয়ে গেছেন, তবে কাঁদছেন কেন? না, আমায় বিশ্বাস করছেন না?

আরও বেশি কাঁদছি দেখে তিনি আবার বললেন,—শুনুন, কাঁদবেন না। আমি আপনার পারমিটে আপনার পরিচয় লিখিয়ে নিয়েছি আমার স্ত্রী বলে। প্রেমিকা এ পরিচয়ে তো ছাড়া পাওয়া যায় না। তাই 'জো' স্ত্রী এই পরিচয় লিখে দিয়েছে। এখন রাস্তায় প্রত্যেক খানাতল্লাসীর ঘাঁটিতে আপনাকে স্ত্রী হিসাবে চলতে হবে। তা না হলে কী হবে বুঝতে পারছেন তো? আপনি তো মারা যাবেনই, আমারও ইতি হয়ে যাবে।

অনির্দিষ্টের জন্য ভয়ের চেয়ে অসত্যকে ভর করা ভালো। মনে মনে প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম যে, আমি ওঁর স্ত্রী, আমি ওঁর স্ত্রী। প্রত্যেকটা মুহূর্তকে মনে হতে লাগল চিরকাল। প্রত্যেকটা ঘাঁটিকে মনে হতে লাগল বৈতরণী ঘাট। প্রত্যেকটা জায়গায় তিনি জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে পরম সস্নেহে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমায় নামিয়ে মিসেস শীতলজিৎ সিংহ বলে ঘোষণা করতে লাগলেন। প্রতি বার হাতে তুলে দিতে লাগলেন ফ্লাস্ক থেকে একটু জল বা টুকরি থেকে একটা ফল। পিছনে ঠেস দিয়ে বসার জন্য নিজে নিজের কোটটা দিলেন পাট করে। টাইটা খুলে গলার চারপাশে জড়িয়ে দিলেন, যেন ঘোমটা খুলে গিয়ে চুলের গোছা এলোমেলো না হয়ে যায়। স্বামিত্বে রইল না কোনও খুঁত, অনুরাগের প্রকাশে কোনও খাদ।

কিন্তু সেই ডিমাপুর-কোহিমার চল্লিশ মাইল পাহাড়ি পথের নিশীথ অভিযান পর্যন্তই। তার পর থেকে তিনি আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে চান নি পর্যন্ত। অঙ্গস্পর্শ তো দূরের কথা। ইম্ফলে নিয়ে যেতে চাইলে তাই আপত্তি করলাম; বিনা দ্বিধায় এখানে রেখে গেলেন। বন্দোবস্ত করে গেলেন যাতে কোনও অসুবিধা বা অভাব না হয়। শুধু নিজেকে নূতন করে তৈরি করে নিতে বলে গেলেন, যাতে এদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে দেশে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু ফিরবার আমার না আছে পথ, না মতি।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জরী। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া না পেয়ে আমিই নীরবতা ভাঙলাম। বললাম,—বেশ তো, ফিরে যাবেন কেন? বাংলা দেশে তো আপনার কোনও বন্ধন বা প্রয়োজন নেই। ইনিও বাংলা জানেন। মণিপুরীরা আহারে আচারে এমন কিছু অন্য রকমের লোকও নয়। যদি রাজকুমারকেই আপনি বিয়ে করেন আপনার তো কোনদিকেই অসুবিধা হবে না। চলে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে সেই কথাটাই ভেবে দেখবার জন্য বলে যাব।

ম্লান হেসে—এতক্ষণে প্রথম হেসে বলল মঞ্জরী—এইখানেই আপনি ভুল বুঝলেন। তিনি দিয়ে গেছেন

এক রাত্রির অভিনয়। একজন অনাথাকে বিপদে দেখে তাকে উদ্ধার করে গেছেন। কিন্তু মিথ্যার মধ্যে যেটুকু মুহূর্তের সত্য ছিল তাকে সেটুকুর মধ্যেই রেখে দিতে হবে। তাকে টেনে বড় করা কি যায়? না, করতে গেলে তা টেকে?

আর দেরি করা নিরাপদ হবে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। শত্রুরাও অনেক দূরে ও অনেক দিকে খুঁজে এবার বোধ হয় আমার পথের দিকেই এগিয়ে আসবে। তবু মঞ্জরীর ইতিহাস এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছে যে, এখানে থামা যায় না। আমার তো পঞ্চমাঙ্কের উপর যবনিকা শীঘ্রই পড়বে। এর জীবনে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা তোলায় একটু সহায়তা আমি বাঙালি হয়ে না করলে আর কে করবে?

বললাম—দেখুন, মানুষের জীবন অনেক দিনের কারবার। একদিন হঠাৎ যে আলো আপনার জীবনে এসে পড়েছিল সেটা তখনই মিলিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু হয়তো সেটা এত সত্য যে, আবার কোনদিন তার প্রকাশ হতে পারে এবং তারপর বহুদিন, হয়তো চিরকালের জন্যই, থেকে যেতে পারে। কাজেই আপনি এখনই কোনও সিদ্ধান্ত করবেন না। আজ আপনার চারদিকেই অশান্তি। যুদ্ধ চলছে, লোক মরছে। এসব যখন কেটে যাবে, তখন দেখবেন বহু সমস্যাই সহজে মিটে যাবে। আপনি আর রাজকুমারও পরস্পরের প্রতি ভালোভাবে তাকাবার সুযোগ পাবেন।

সবল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মঞ্জরী বলল—না, তা হয় না। আর উচিতও হবে না। জীবনে বাবা-মা দিতে পারল না আশ্রয়। সমাজ করতে পারল না রক্ষা। দেশ করল না একটুখানি সন্ধান পর্যন্ত। ঠিক এক ফোঁটা জলের বুদ্বুদের মতো আমি হারিয়ে গেলাম। আর যে একটু ক্ষণের জন্য করল স্বামিত্বের অভিনয়, তাকেই সারা জীবন আঁকড়ে ধরে থাকতে যাব? কিসের দাবিতে? কিসের জোরে? সেই অভিনয়ের ক্ষণটুকুর সত্য কিসের অজুহাতে চিরকালের সত্য হয়ে থাকবে? কী করে তাকে টেনে হেঁচড়ে রোজকার সংসারের মধ্যে নামাব? না, তা হয় না।

প্রশ্ন করলাম—তবে?

মঞ্জরী বলল—তবে বলে কোনও প্রশ্ন নেই। আমার কাছে কোনও উত্তরও নেই। সেদিনের সেই ক্ষণটুকুতে যা আশ্রয় যা অবলম্বন পেয়েছিলাম, সেটাই স্বামিত্বের চিরকালের জিনিস। সেই আমার চিরকাল। তার বাইরের জীবন আর সংসার নিজেদের সামলে নিজেরাই চলতে পারবে। প্রত্যেক দিনের ঘরকন্নার মধ্যে তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া চলবে না।

বলতে যাচ্ছিলাম যে, তাতে মানুষের চলে না। ভাবাবেগ অনুভবের দিক দিয়ে সত্য হলেও অবলম্বনের দিক দিয়ে অসার। সেকথা মঞ্জরীকে ভালো করে বুঝিয়ে যাওয়া দরকার। খুব ভালো করেই দরকার। আমি তো আমার দেশ আর সমাজকে চিনি। তাই ওকে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভাবের ভেলায় ভবনদীতে ভাসা যায় না।

কিন্তু তার সময় হল না। দূরে ওরা তীব্র-সন্ধানী আলো ফেলে জঙ্গলের তলার আগাছাগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে আরম্ভ করেছে। যাকে বাঁচবার পথ বলে যেতে চাই, তাকে ফাঁসিয়ে গেলেও চলবে না। আমার যা-ই হয় হবে, তার চারা নেই। মঞ্জরীর তো অন্তত চিরকাল বলে একটা—অসার হোক, অসত্য হোক—একটা কিছু মানসিক আশ্রয় গড়ে উঠেছে। তারই ফলে সে ধীরে ধীরে নিজেকে বাঁচিয়ে তুলুক। কিন্তু আমায় এখনই সরে পড়তে হবে। যেন ওরা না ধরতে পারে যে মঞ্জরী আমায় খেতে দিয়েছিল। আমার জীবন এখনই এই মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করছে আমার পায়ের তলায়। ওর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকুক ওরই সেই চিরকাল।

বাসীফুলের বাস

হঠাৎ একটা মিষ্টি সেন্টের গন্ধে ভরে গেল সারাটা মন।

ব্যারিস্টার মিস্টার রাকসিট ওই সেন্টটা খুব ভালো করেই চেনেন। নাম হচ্ছে মিসচিফ। বাংলায় তার ঠিক মানে কী হবে? বম্বেতে এত বছর এক নাগাড়ে কাটিয়ে বাংলা ভাষার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় ঘুচে এসেছে। গুজরাটি বলুন, মারাঠি বলুন, হিন্দি বলুন, কিছু কিছু পরিচয় হয়েছে এ সব ভাষার সঙ্গে। কিন্তু বাংলা? নাঃ।

রাকসিট সাহেব বহু বছর এদেশে আসেন নি। না হয়েছে সময়, না তেমন চাড়। কাজেই মিসচিফ কথাটার কী মানে হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত ভাষা-চর্চার চেষ্টা ছেড়ে তিনি পাইপ ধরালেন। যে মেমটি বম্বে মেলের এয়ারকন্ডিশন কোচের টানা বারান্দা দিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তার চিন্তাটা অনেক সহজ, অনেক আরামের। ইংরেজি মিসচিফ কথাটার মানে যাই হোক না কেন।

তা মেমটির বয়েস হয়েছে নেহাত মন্দ নয়। চল্লিশের ওপারে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন ছিমছাম, গড়ন-পেটন কেমন নিটোল। টয়লেট ঘর থেকে বেরিয়ে এল যেন একটি রূপসী তন্বী তরুণী। হ্যাঁ, মিসচিফ মানে—মানে নষ্টামি নামের সুরভিটা ওকে মানায় বটে।

পাইপে আরও নিবিড়ভাবে একটা টান দিলেন মিস্টার রাকসিট।

হায়, এই স্বাধীনতাটা এসে গিয়ে অনেক দিকেই লাভ হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি "বি. এন. জি. এস."-এর দলও বিলেত না গিয়ে সাহেবি করবার চেষ্টা হালে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু খাস দেশী সাহেবরা দেশে বসেই যে সব বিলেতি রঙ আর ঢঙ, ক্লারা, মেরী, লুসিদের চারদিকে আনাগোনার সুখ পেতেন, সেসব তারা এখন 'মিস' করছেন। এসবের অভাব অনুভব করছেন।

সে জন্যেই মিঠে গন্ধটা আরও বেশি মিঠে লাগল।

মুছে গেল রাকসিটের নাকে প্রায়-লেগে-থাকা পানা পুকুরের এঁদো গন্ধ। 'লর্ড'কে অর্থাৎ ভগবানকে তিনি প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিলেন।

তা লর্ডকে তিনি প্রায়ই ধন্যবাদ দিয়ে থাকেন। এই তো খানিকক্ষণ আগেও দিয়েছিলেন। তখন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি হাওড়া স্টেশনের ভিড় ঠেলে কোনও মতে বম্বে মেলের এয়ারকন্ডিশন কোচে এসে উঠেছিলেন। বাবাঃ, কি সাংঘাতিক অবস্থা এই বাংলা দেশের। এত নোংরা, এত হট্টগোল, চারদিকে ভাঙা আর পুরোনোর ছড়াছড়ি। তবু কেন যে ইংরেজরা এই কলকাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলত তা তারাই জানে।

তার চেয়ে মিস্টার রাকসিটের ঘষা-মাজা, রাতদিন মুখে মেক-আপ করা বম্বে শহর অনেক ভালো। বেঁচে থাক তাঁর সমুদ্রের ওপর মালাবার হিলে বাড়ি—আর ফিরোজ শা মেটা রোডে চেম্বার।

নিজেও তিনি বাঁচতে চান। সেই বাঁচবার তাড়াতেই তিনি বি.এ. পাশ করে কিছুদিন চাকরির দরখাস্ত লেখা মক্‌শ করেছিলেন। কিছুই হল না অবশ্য। তার পর গাঁয়ের মামারবাড়ি থেকে বাপ-মা-হারা জীবেন রক্ষিত যে দিন কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল, সেদিন খুব বেশি হৈ-চৈ হয় নি বোধ হয়। অন্তত বম্বের মিল অঞ্চলে যে অচেনা বাঙালি যুবক মজুরদের চিঠিপত্র, মনি-অর্ডারের ফর্ম এসব দু আনা মাথাপিছু 'ফি' নিয়ে লিখে দিত, সে কিছু টের পায় নি।

তারপর কেমন করে সে জাহাজে মাল হিসাবের চাকরি নিয়ে বিলেত গেল—সে কথা আজ মনে করার দরকার নেই। তার চেয়ে অনেক কম এলেম পেটে নিয়ে চাটগাঁ-শিলেটের লোক হামেশাই বিলেত ঘুরে আসে। এমন কি, 'ইস্ট এন্ডে' অর্থাৎ লন্ডনের গরিব পুব পাড়াতে ঘর-সংসারও পেতে বসে। দশ বছর পরে দেখা গেল ব্যারিস্টার মিঃ রাকসিট বিনা টাকায় বম্বেতে মজুরদের মোকদ্দমা লড়ছেন। রাকসিট সাহেবকা জিন্দাবাদ।

তারও প্রায় পনেরো বছর পরের কথা।

এই সাতাশ বছরের মধ্যে তিনি বাংলা দেশে আসেন নি। কেনই বা আসবেন? মামার বোধ হয় তাঁর গা-ঢাকা দেওয়াতে খরচ কমল বলে খুশিই হয়েছিলেন। এতদিন ধরে খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েও যে ভাগ্নের কাছ থেকে দু মুঠো টাকার মুখ দেখা গেল না, সে বাড়িতে বসে আর ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে দু বেলা অন্ন ধ্বংস করলে তাঁদের লাভটা কী? আর গাঁয়ের বন্ধু-বান্ধবরাও ওর উধাও হয়ে যাওয়াতে দুঃখ করবে এমন মনে করার কোনও কারণ ছিল না।

কিন্তু সেই গাঁয়েই তিনি আজ গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ অকারণে। শুধু একটা খেয়ালে। হাড়ভাঙা ঠিক নয়, তবে মাথা ঘামানো খাটুনির ফলে ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বললেন, হাওয়া বদলাতে হবে। বাইরের হাওয়া নয়, মনের হাওয়াও বদলাতে হবে। তাই তাঁর মানস হোম বিলেতের বদলে এবার এলেন বাংলা দেশে—মানে, কলকাতায়।

তা এই স্ট্রান্ড আর মেফেয়ার, চৌরঙ্গি আর আলিপুরে ঘেরা কলকাতায় রাকসিট সাহেবের মন্দ কাটে নি। তাঁর গুজরাটি মক্কেলের কলকাতার বাড়িখানা বম্বের অভাব মোটেই অনুভব করতে দেয় নি। কাজের দরকারে গেল বছর কয়েকের মধ্যে যে সব বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তারাও লোক ভালো। বাংলা দেশের অতিথিকে ভালোভাবে দেখাশোনা করেছেন।

তবু আজ সকাল থেকে মনটা এত খারাপ হয়েছিল! ঠিক খারাপ নয়, একটু যেন উদাস। রাকসিট সাহেব উদাস ভাবটা ঠিক বোঝেন না। তাঁর বন্ধুদের বললেন, কেমন একটা ব্লাজে (blase) বোধ করছেন তিনি। যে ভাবটা বাংলায় খুলে বলা তার কাছে সহজ নয়, ফরাসি কথাটা তার সবখানি গন্ধ, সবটা রূপ তার মনের কাছে তুলে ধরল। বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলেন যে, আজ কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলেই যে এই উদাস ভাব তা নয়।

কিছু ভালো লাগছিল না। এই মেঘে ঢাকা মেঘ-ডাকা আকাশটা মানুষকে শান্তি দেবে না। সারা সকাল তার ভার তাঁর মনের ওপর চেপে ছিল তাই তিনি লাঞ্চের খানিকক্ষণ পর চুপচাপ নিচে নেমে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে লম্বা ড্রাইভে নিয়ে যেতে বললেন। ভালো পিচঢালা রাস্তায় যেতে বললেন।

মোটরের চাকা জোরে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে লাগল মিস্টার রাকসিটের মনের চাকা। জোরে জোরে। শেষ পর্যন্ত দু পাশের পাটের কল আর কারখানার চিমনি তাঁর অসহ্য লাগল। তিনি ড্রাইভারকে কোনও নিরিবিলি ছোট রাস্তায় মোটর নিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু আশ্চর্য—মাইল পনেরো যাবার পরই—এ তো চেনা রাস্তা মনে হচ্ছে। এখানে অবশ্য আগে মোটর চলার মতো রাস্তা ছিল না। ছিল পায়ে হাঁটার, গরুর গাড়ি চলার মতো সরু রাস্তা। হ্যাঁ, ওই তো খিলানওয়ালা দালান-বাড়িটা, ওই তো তার পিছন দিয়ে বাঁশঝাড়ে আড়াল করা দ্বাদশ শিবের মন্দির। তার নাট-মণ্ডপটাও দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ের প্রাণ ছিল এই জায়গাটা। তা হলে এখানেই নেমে একটু হেঁটে গাঁখানা দেখে নিলে মন্দ হয় না। বাংলা দেশে এসে কী কী দেখলেন তার গল্প হিসাবে বেশ মুখরোচক হবে।

বম্বের সমুদ্র পারে মেরিন ড্রাইভের ঠিক ওপরেই ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়াতে সান্ধ্য-আড্ডাতে এমন জমাট গল্প আর কেউ করতে পারবে না।

জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলেন রাকসিট সাহেব। সুশীল ও সুবোধ বালক ছিলেন না বলে যে-গাঁয়ে তাঁর কোনও আদর ছিল না, সেখানে আজ খাস বিলেতের র‍্যাডাল কোম্পানির তৈরি জুতো পরে মস মস করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

মন কিন্তু ঘুরতে লাগল সন্তর্পণে। না, তিনি এখানে কাউকে পরিচয় দিতে চান না। এখানে এমন কেউ তাঁর ছিল না যে সাতাশ বছর পরে আবার দেখা হওয়ার জন্য আনন্দে গলে যাবে। হাত ধরে তুলে এনে দাওয়াতে বসাবে। একটু হিংসা, একটু তেরছা প্রশ্ন না করে খোলা মনে সব কথা বলবে, জানতে চাইবে। বরং ভয় আছে যে পুরোনো দুঃখের আর বিপদের, রোগ আর মরণের কথা শুনতে শুনতে ব্লাড প্রেশারটা আবার বেড়ে যেতে পরে।

কাজেই তিনি অচেনা লোকের মতো চুপিসাড়ে গ্রামটাতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিজে কাউকে পরিচয় দেবেন না। সুট আর চোখের ওপর টেনে আনা হ্যাট তাঁকে ঢেকে রাখবে। কিন্তু আগের চেনা লোকদের হয়তো তিনি নিজে চিনে নিতে পারবেন।

কিন্তু কই কাউকে তো চেনা ঠেকল না। হাঁটতে হাঁটতে শিবমন্দিরের পিছন পর্যন্ত চলে গেলেন। লোক নেই। আরও দুরে যেখানে হাট বসত, সেখানেও কেউ নেই। ভিটেগুলো এখনও উঁচু হয়ে আছে, কিন্তু চালা নেই। সেখানে নিশ্চয়ই আর হাট বসে না। চাটুজ্যে বাড়ির সামনের দরজায় তালা লাগানো। কিন্তু বাড়ির যা অবস্থা তাতে তালা লাগিয়ে রাখার দরকার যে কী তা বোঝা গেল না। আরও কয়েকটি বাড়িরও সেই অবস্থা। শুধু রামু ঘরামির ঘরগুলো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে—। ছাদ ধ্বসে গেছে বলে। ঘরই যখন নেই, তখন ঘরামিকেও দরকার নেই কারও—মনে মনে টিপ্পনী কাটলেন রাকসিট সাহেব।

একজন পশ্চিমা গোছের লোককে দেখা গেল। তাকে ডেকে তিনি গাঁয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন—আলগোছে, গা বাঁচিয়ে। যাতে তার নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা না ওঠে। পশ্চিমাও এখানে নতুন এসেছে। খালি বাড়ি-ঘর-জমি পড়ে আছে অনেকের। মাটি খুব ভালো; ফসল পাওয়া সোজা। বি.টি. রোডের মেহেরবাণীতে কলকাতার বাজারে সবজি পাঠানো খুব সহজ হয়ে গেছে। সে আরও দেশওয়ালী ভাই-

বেরাদরদের এখানে এসে আস্তানা গাড়তে লিখেছে। বাঙ্গালী ভাইরা তো সব মালায়ারীতে সাফা হয়ে গেল। গায়ে তাকত নেই; মেহনতি করতে পারে না। ক্ষেতির কাম করবার লোক নেই। কেউ বা কলকাতায় গিয়ে বাবুর কাম লিয়েছে। কাজেই মুলুক থেকে নতুন লোক এলে সহজেই পাট্টা গাড়তে পারবে।

তবে তো এখানকার ভবিষ্যৎ খুব ভালো! পরিষ্কার হিন্দিতে বললেন রাকসিট সাহেব।

হ্যাঁ বাবুসাব। সবই এখন ভালো। এই দেখুন না, আধ মাইল দূরে যে 'রেফৌজি' কলোনী বসেছে, তারাও কেমন জঙ্গল সাফ করে সবজি চাষ শুরু করেছে। ইয়া বড় টিউবওয়েল বসিয়েছে সরকার থেকে। এই গোটা এলাকাতেই রেফৌজি বসবার কথা আছে। তা হলে আর এমন হাল থাকবে না। আপনি কি কোনও কলের সাহেব নাকি বাবুসাব? তা হলে আমার একটা আর্জি আছে।

আর কথা না বাড়িয়ে সরে পড়লেন রাকসিট সাহেব। কিন্তু যাবেন কোথায়? এই পুরোনো ধ্বসে পড়া পানা-পুকুরের চাপা গন্ধ এড়িয়ে যাওয়া কি সোজা কথা? পুকুরের ওপারে পচা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে জল নিয়ে উঠে আসছে কে ওই বুড়ি?

থমকে দাঁড়ালেন রাকসিট সাহেব। কয়েক পা পেছিয়ে এলেন। একটু দাঁড়িয়ে আবার ভালো করে তাকালেন সেই নারীমূর্তির দিকে। নজর করে দেখতে লাগলেন তার চলন, তার ঘাড় দোলানো, তার কলসি ধরার ভঙ্গি। দেখতে লাগলেন আর চোখের ওপর টুপি আরও একটু টেনে দিলেন।

ব্লাড-প্রেশারটা যেন একটু একটু করে আবার বেড়ে যাচ্ছে।

এই সব পুরোনো কথা, ভুলে যাওয়া স্মৃতি—এগুলো অত্যন্ত খারাপ জিনিস। কেবল অস্বস্তি এনে দেয়। পিছুটান দেয়। মনে করিয়ে দেয় যে, এককালে আমিও ছিলাম এমনই তুচ্ছ, নড়বড়ে। হ্যাঁ, এই গাঁ-খানারই মতো মরচে-পড়া। ভবিষ্যৎহীন। তার চেয়ে এই অচেনা পশ্চিমা, এই নতুন গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনী ভালো। এদের বর্তমানটা কাজে ভরা; ভবিষ্যৎটা আশার।

সেজন্যই তিনি সাতাশ বছর ধরে বম্বেতে প্রবাসী। মুছে ফেলেছেন তাঁর মন থেকে এই ভাঙন ধরা গ্রাম, শিকড়-ছেঁড়া অতীত। কলকাতায় শুধু নিজের, মানে মিস্টার রাকসিটের, সমান ওজনের নতুন বন্ধুদের সঙ্গেই করেছেন মেলামেশা।

এই অম্বালী ছিল তাঁর গ্রামের স্বর্ণলতিকা। সোনার মতো বরণ, লতার মতো গড়ন। মাইকেলের কবিতা ছিল গ্রামের মধ্যে ফ্যাশান। "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে।" স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে লাইনটা সারা গ্রামে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সদ্য বি.এ. পাশ করা জীবেনের মনেও গেঁথে ছিল এই স্বর্ণলতিকা। এই অম্বালী।

কিন্তু কোন্ রসালের কপালে জুটবে এই সোনার বরণ লতা? সে জানত যে অম্বালীকে বিয়ে করার লোকের অভাব হবে না। তার বাপ-মাও জানত। বিয়ের বহু সম্বন্ধ আসছিল দূর আর কাছ থেকে। কাজেই বেকার তরুণের এ অবস্থায় কোনও আশা ছিল না। তবু সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, যাতে বিয়ে করতে চাইবার মতো সামান্য একটু অধিকার তৈরি করতে পারে। যদি কপাল গতিকে একটা চাকরি জুটে যায়, মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অম্বালীকে পাওয়া অসম্ভব হয়তো হবে না। কিন্তু অল্প বয়সের ভীরু প্রেম সে কথা কাউকে খুলে বলতে পারে নি। এমন কি অম্বালীকেও না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অম্বালীর বিয়ে হয়ে গেল। নিজেদের গ্রামেই। ঘরে বরে সব দিকেই ভালো পাত্র। সবাই খুশি। হয়তো অন্যান্য আরও তরুণের মনে অম্বালীর জন্য ঢেউ উঠেছিল। সে খবর তাদের নিজেদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বাইরে কারও জানবার কথা নয়। কিন্তু তাদের সঙ্গে দল বেঁধে মুখ বুজে ঠোঁট চেপে জীবেনও সমান দৌড়াদৌড়ি করে পরিবেশন করে গেল।

নতুন কনে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর সন্ধ্যাবেলায় জীবেন একবার এসেছিল অম্বালীদের বাড়ির কাছে। এই পুকুরেরই পাড়ে। তাতে ছিল টলটলে জল; নিজেব চোখের জলের মতো। ঝাপসা চোখে পাড়ে জমানো বাসী ফুলের রাশি দেখতে দেখতে খুব আস্তে আস্তে সে চলে গেল। গ্রাম ছেড়ে উধাও হয়ে গেল। তার আগের দিন পর্যন্ত সে ভাবে নি যে এমন একটা কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। তার জন্য কারও কোনও মাথাব্যথাও ছিল না।

সে দিনেব তুচ্ছ জীবেন কারও কাছে দাবি জানাতে পারে নি। করে নি কোনও অভিযোগ। দাবি করবার ক্ষমতা ছিল না। ছিল না নালিশ করবার মুখ। কিন্তু কেন সে তা করে নি? কেন চোরের মতো পরাজিতের মতো সে সরে পড়ল? বেকার হয়ে ব্যর্থ হয়ে বসে থাকা বড় শক্ত। সবাই তার কথা ভেবে

'আহা' করবে, সে কথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে। তার ওপর এটা হল নতুন একটা হার। যদি সেই পালানোর মতো দুঃসাহসী কাজই করতে পাবল, কেন সে পালাবার আগে দুঃসাহস দেখিয়ে অন্তত তার স্বর্ণলতিকাকে অন্য কোনও গাছে তুলে দেবার দিন পেছিয়ে দিতে অনুরোধ করে নি? যে ধাক্কার চোটে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ধাক্কা কেন তাকে ঘর গড়বার জন্য আরও বেশি চেষ্টা করাল, না' না, সে প্রশ্ন এখন তুলে তিনি নিজের আলোয় ভরা বিকেলবেলাটাকে মেঘলা করতে চান না।

বম্বে মেল অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে থেমে এল। মিস্টার রাকসিট নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। আজ বিকেলের ওই হঠাৎ খেয়ালে মোটর ড্রাইভটা তার মনকে একটু এলোমেলো করে দিয়েছিল। ওই পচা পানাপুকুর, পোড়ো তালাবন্ধ বাড়িঘর, ভাঙা শিবতলা—তার পুরানো অতীতের মুছে যাওয়া ছবি। কিন্তু সে ছবিকে তিনি মেরিন ড্রাইভের পারে ক্রিকেট ক্লাব অব ইন্ডিয়াতে লাউঞ্জে বসে তার সাহেব কোম্পানির আসবাবে সাজানো বাড়ি, রেডিও বসানো ক্রাইসলার গাড়ি আর প্রত্যেক গরমের ছুটিতে 'হোমে' পাড়ি দেওয়া এ সবের ঝকমকে ছবির পাশে এনে দাঁড় করাবেন না। ওই শিবতলাতে দাঁড়িয়েই মরে যাওয়া গাঁয়ের চেয়ে নতুন গড়ে ওঠা রেফিউজি কলোনীর দিকে তাঁর নজর গিয়েছিল বেশি। পানায় ঢাকা পুকুরের চেয়ে নতুন আবাদ করা ফসলের খবরই তার মনে ধরেছিল। তিনি নিজে তাঁর বেকার অসহায় জীবনের উপর জয়ী হয়েছেন। তাঁর পুরোনো গ্রামের পরাজয়ের ক্ষেত্রে তাই র‍্যান্ডালের তৈরি জুতো মসমস করে দাপটে হাঁটাহাটি করেছেন। আজ সবটুকু গ্রাম হেরে গেছে, চোখ বুজে মরার মতো পড়ে আছে। জীবেন হেরে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মি: রাকসিট আজ জয়ী।

কিন্তু সত্যি কি তাই, জীবেন? পাইপের ধোঁয়াটা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যি কি তাই? তুমি আজ মিস্টার রাকসিট সেজে নিজেকে জয়ী বলে ভাবছ। এমন কি আজ ইচ্ছে হলে তোমার টাকা আর প্রভাব দিয়ে এই গ্রামটাকে নতুন করে গড়ে দিতেও পার। কিন্তু ওই যে তোমার স্বর্ণলতিকা, তোমার অম্বালী? তাকে তুমি কি আবার ফিরে পেতে পার? পার নতুন করে তাকে স্বাস্থ্যে রূপে সার্থকতায় ভরে তুলতে? ইচ্ছা করলে তুমি পুকুরের শ্যাওলা তুলে নতুন টলটলে জল তাতে ভরে দিতে পার। কিন্তু ম্যালেরিয়া, অপথ্য আর গেঁয়ো আবহাওয়ায় অম্বালীর অকালে বুড়িয়ে যাওয়া জীবনে যে শ্যাওলা পড়ে গেছে তা থেকে কি পার ওকে বাঁচাতে?

না। তোমার হারই হয়েছে মিস্টার রাকসিট। তোমারই হার হয়েছে।

কিন্তু পশ্চিম সাগরের হাওয়ার দোলায় মাথা ঠাণ্ডা ব্যারিস্টারের হার হল না। অম্বালী? আজ যাকে পুকুরপাড়ে দেখলাম সে তো সেই অম্বালী নয়। মানি [illegible] মানুষই বটে, কিন্তু সে অম্বালী নয়। তার মধ্যে হয় নি আমার কোনও পরাজয়। অবশ্য [illegible] আজ খুশিই হয়েছি। বেশ ভালোই লাগল। সে হচ্ছে শুধু বাসী ফুলের বাস।

এই মিসচিফ সেন্টটারই যত নষ্টামি। পাইপটা মুখে চেপে ধরে মিস্টার রাকসিট হালকা নীল কাঁচের শার্সির উপর প্লাস্টিকের পর্দাটা টেনে দিলেন।

বৌদি

এ-রকম অঘটন আমাদের দেশে বড় একটা শোনা যায় না। তবে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড হীথ বাগানটা যেন জাদুতে ভরা। ওখানে মাইলখানেক চওড়া আর তার চেয়ে লম্বা বাগানটা ঝোপ-ঝাড়-টিলা দিয়ে সাজানো। গরমের দিনে তাতে পুকুরে সাঁতার কাটে হাঁস। শীতের দিনে তার বুকে জমে যাওয়া বরফে তরুণ-তরুণীরা করে স্কেটিং। বেহেস্ত অবশ্য চোখে দেখবার নসীব নিয়ে জন্মাই নি, কিন্তু হ্যাম্পস্টেড হীথই আমার পক্ষে যথেষ্ট—দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন নির্মলদা।

নির্মলদা কেন যে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে বছরের পর বছর একাটি পড়ে আছেন তা বুঝি না। পেটে অঢেল বিদ্যা। আর এখানে বড় কোম্পানিতে একাউন্টেন্সি করে এমন হাত পাকিয়েছেন যে, দেশে ফিরে গেলে যে-কোনও সাহেব কোম্পানি ওঁকে লুফে নেবে। এখানে তিনি কোনও শিকড়ও গাড়েন নি। বন্ধু-বান্ধবের

সঙ্গে দহরম-মহরমে চৌকস লোক।

কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে চাপা। হাঁড়ির খবর তো দূরের কথা, হাঁড়ি আছে কিনা তারই দিশা পেল না কেউ এ পর্যন্ত।

এই ধরুন, শনিবার রাতে নটার সময় পিয়ন হোম মেল অর্থাৎ দেশের ডাক বিলি করে গেল। শুধোলাম—কি দাদা, বৌদির খবর কী?

দাদা হাসিতে গলে গিয়ে বললেন,—দারুণ বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন। এবার বাংলা দেশে সে জন্যেই গরম এত বেশি!

তাহলে এই মিঠে 'মে' মাসটা চলছে—"বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া"—বৌদিকে আনিয়ে নিন না লন্ডনে! পাশের ডবল-রুমটা আপনাদের জন্য ছেড়ে দেব। আপনারও সুখ, আমাদেরও দু-এক দিন রোস্ট-মাটন আর বয়েল পোটাটোর হাত থেকে রেহাই হয়!

দাদা আপোষ করেন সে দিন কাফে হিন্দুস্থানে ভাত-মাছের ঝোল খাইয়ে। কিন্তু বৌদির অস্তিত্বের উপর থেকে ঘোমটাটা আর খোলে না।

পনেরো দিন কারখানা ছুটি। দাদা চলেছেন কন্টিনেন্টে বেড়াতে। কি দাদা, বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে একাই? না, সিংকিং সিংকিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার? আমরা কিন্তু স্পাই লাগিয়ে রেখেছি, জানিয়ে রাখলাম।

দাদা আবার হাসলেন। সংক্ষেপে বললেন, জানোই তো, শাস্ত্রে লিখেছে, পথি নারী বিবর্জিতা। আত্মনেপদী আর পরস্মৈপদী দুরকমই।

আমাদের রক্ত গরম, মুখেরও লাগাম নেই। ফস করে বলে বসি—এ গার্ল ইন এভরি পোর্ট—প্রত্যেক বন্দরেই বুঝি আপনার আস্তানা আছে?

পূর্ব-বাংলার ওস্তাদ ছেলে দাদা। সাফ জবাব দিলেন—ঘাটে ঘাটে নাও বাঁধাই হচ্ছে বাহাদুরি। তবে আমার নাও লাগে না, ডুব-সাঁতার মক্স আছে। বলেই এমন একটা তেরচা চাউনি চালালেন যে, তিনি যে পাঁড় 'লেডি-কিলার' সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা নির্মল গুহ-রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও হদিস পাই নি। আমাদের চেয়ে অন্তত দশ বছর আগে বিলেতে এসেছেন, কিন্তু চালচলন আমাদেরই মতো অল্পবয়সী। আমরা কাজ ফুরোলেই কবে দেশে ফিরব তার দিন গুনি। কিন্তু দেশ যে একটা আছে, সে-কথাও উনি ভুলে গেছেন মনে হয়। বৌদি ব্যাপারটা নেহাত রূপকথা, না সত্যি কোনও বাঙালি বৌ দেশে বসে নির্মলদার ফিরে আসার দিন গুনছেন, তার সঠিক খবর কেউ জানে না। তবে সবাই জানে যে, তিনি মেয়েদের ধার-কাছ দিয়েও যান না।

সম্ভবত বৌদি সৃষ্টি হয়েছিল সেই জন্যই। বয়সকালে হয়তো তিনি ফুর্তি করতে বের হতে রাজি হতেন না। বন্ধুরা জোর-জবরদস্তি করায়, দেশে বৌদি আছেন এই কারণ দেখিয়ে দড়ি-ছেঁড়া জীবনকে এড়িয়ে গেছেন। হয়তো বৌদির প্রতি ধর্মে অবিচল আছেন বলেই দাদা মেয়েদের সঙ্গে মেশেন না—এই কারণ অল্পবয়সীরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে।

এ হেন নির্মলদা একটা নারীঘটিত অঘটনে জড়িয়ে পড়েছেন।

রাত প্রায় দশটা। বিলেতের মাতাল-করা বসন্তকাল। পড়ায় মন বসছে না। পরীক্ষা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বসন্ত জানালায় এসে উঁকিঝুঁকি মারছে অনুক্ষণ। লম্বা সন্ধ্যাগুলো আলোয় ভরা। রাত নটার সময়ও পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করে পড়াতে মন বসাতে পারি না। বিরক্ত হয়ে উঠে ভাবলাম যে, তার চেয়ে বই ছেড়ে বাড়িতে চিঠি লিখতে বসা যাক। তার ফলে হয়তো পড়ার চাড় ফিরে আসবে। এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

ব্যাপার সাংঘাতিক! দাদা নাকি এই রাতে হ্যাম্পস্টেড হীথের এক নিরালা আঁধার কোণে বেঞ্চিতে বসে একজন মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলেন। এমন সময় এসে হাজির হল তার স্বামী আর স্বামীর এক বন্ধু। দাদা পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধবস্তাধস্তি হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পুলিশ এসে পড়ে। পুলিশ দু-পক্ষকেই থানায় নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে এই ফোন।

মাথা ঘুরে গেল আমাদের। শেষকালে দাদার যদি বদনাম হয়, এ কাহিনি খবরের কাগজে বেরোবে। এদেশে কেচ্ছার কথা লোকে 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান' মনে করে পড়ে। চারদিকে সবাই তাকাবে

আমাদের দিকে, আর মনে মনে ভাববে, ‘এই চলেছে আরেক ব্যাটা ইন্ডিয়ান’।

নাঃ। দাদা যে নির্দোষ তা জানি; কিন্তু ওকে বেকসুর খালাস করে আনতে হবে। দলে দলে চললাম থানায়। দাদার চরিত্র সম্বন্ধে সবাই সাক্ষী দেব। থানার খাতায় রিপোর্ট দাখিল হওয়ার আগেই মামলাটা উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিলেতে পুলিশি আইন-কানুন এত ভালো যে, একজন অফিসার ব্যাপারটা তলিয়ে না দেখা পর্যন্ত থানায় হুট করে কোনও নালিশ খাতায় টুকে নেয় না।

দেখি, দাদাকে একটা ঘরে ‘ইনটারোগেশন’ করা হচ্ছে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে অন্নপ্রাশনের ভাত থেকে কুষ্টি-ঠিকুজী সবকিছুর হিসাব নিচ্ছেন একজন অফিসার। অন্য পক্ষকেও পাশে আর একটা ঘরে এইরকমভাবে যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে।

আপনারা নির্মাল গিউহারের বন্ধু? এই দেখুন তার জবানবন্দী।

মিস্টার গিউহারে অর্থাৎ গুহ-রায় সাহেব তার রোজকার অভ্যাস মতো ডিনারের পর হ্যাম্পস্টেড হীথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরবার আগে রোজকার মতোই বাঁধা একটা বেঞ্চিতে বসে সিগারেট খাচ্ছেন, এমন সময় একটি তরুণী মেম তার পাশে এসে বসল। ভদ্রতা করে সে আগে থেকে বসা ভদ্রলোকের অনুমতিও নিয়েছিল। তারপর আরও ভদ্রতা করে বিদেশী দেখে তাকে সিগারেটও ‘অফার’ করেছিল। ক্রমে ক্রমে সে দাদার কাছে একটু একটু করে সরে আসে। কথাবার্তার মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠতার সুর জমিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ফস করে যেই দাদাকে জড়িয়ে ধরে একটু চুমু খেয়েছে, গাছের আড়াল থেকে কে ফ্লাস-লাইটে ছবি তুলে নিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দু জন গাট্টাগোট্টা লোক এসে দু জনকেই পাকড়াল। তার পরের ব্যাপারটা বোঝা শক্ত নয়। ওদের নালিশ যে মেয়েটিকে দাদা ফুসলোচ্ছেন বেশ কিছুদিন ধরে। দাদার পালটা নালিশ হচ্ছে যে, ওরা নিশ্চয়ই অনেক দিন ওর গতিবিধি নজর করে টাকা আদায়ের একটা চক্রান্ত করেছে। ওরা খুব চোটপাট করে টাকা দাবি করেছিল। না দিলে সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে থানা-পুলিশ করবে; দেশের ঠিকানায় ছবি পাঠিয়ে দেবে, এমন কত কী।

ওদিকে পাশের ঘরেও ‘ইনটারোগেশন’ চলছে। মেয়েটার নাকি-সুরে কান্নাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। ও-পক্ষের জবানবন্দী শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাদাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না।

আমরা ফিস ফিস করে বললাম, দাদা, শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে না কি? বৌদি কী ভাববেন!

অফিসারের কান খাড়া হয়ে উঠল। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল,—আপনারা কি কথাবার্তা কইছেন? হোয়াট ইজ ব্যাডি? খারাপ কিছু না কি?

বুঝলাম বৌদি কথাটার সঙ্গে ইংরেজি ব্যাডলির একটু আওয়াজের আদল আসে বলে তার কানে ঠেকেছে। বললাম বৌদির রহস্যের কথা। অফিসারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এনকোয়ারির জন্য অ্যান্টিসিডেন্টের দরকার হয়। অতীত জীবন-কথা তদন্তের জন্য দরকার।

কাজেই সে দাদার ব্যক্তিগত ব্যাপারের কথা জানতে দাবি করল। কিন্তু সরকারি পোশাকী কায়দায় নয়। গরম কফি আনাল। রাত-দুপুরে আরাম করে আমরা টেবিল ঘিরে বসলাম। দাদা অফিসারের মুখোমুখি। সাদা মুখে তার নোট করবার লাল পেন্সিলটা গোঁজা।

দাদা তখন বাংলাদেশের এক জেলা শহরের ছাত্র। বি.এ. পরীক্ষায় অঙ্কে অনার্স দিয়েছেন। প্রথম হবার আশা আছে। ব্যবহারে চাল-চলনে একেবারে নিখুঁত। চেহারাটা অবশ্য মেয়েদের প্রাইভেট টিউশানি করার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কিন্তু টিউশানিতে ভালো পড়ানোর জন্য সুনাম ছিল। তাই সেই শহরেই এক রাজকুমারীকে বাড়িতে পড়ানোর কাজ জুটে গেল। গরিবের ছেলে। টিউশানি করে যখন খরচ চালাতে হয়, তখন রাজবাটিতে বেশি মাইনের কাজই সুবিধা।

আত্মকাহিনি বলতে বলতে দাদা একটু গরম হয়ে উঠলেন। চাটার্ড একাউন্টেন্টের হিসাব-কষা মনে কোথা থেকে কবিতা জেগে উঠল এমন। দাদা ব্যাকুলভাবে অফিসারকে বললেন,—তোমাদের কবি শেলী লিখেছেন—‘দি ডিজায়ার অব দি মথ ফর দি স্টার’। আকাশের তারার জন্য ভুঁইপোকার আকুতি। কিন্তু সে জিনিসটা কী তা তোমরা এই ঠাণ্ডা দেশের লোকরা বুঝবে না।

সাত ফুট লম্বা তাগড়া পুলিশ ভদ্রলোকের চোখে ঝিলিক্ খেলে গেল। বলল,—তা ‘কাফ লাভ’ অর্থাৎ এঁচোড়ে-পাকা প্রেম আমাদের দেশেও হয়ে থাকে। তবে সে প্রেম সাধারণত বাড়তে পারে না। কুঁড়ি

অবস্থাতেই ঝরে যায়।

ব্যথা পেয়ে দাদা বললেন,—না, এ তোমাদের কচি ও কাঁচাদের পিরীতি নয়, রীতিমতো মারাত্মক অবস্থা। ভেবে দেখ, আমি পড়ি বি.এ.। বাড়িতে চাল-চুলো নেই, নেই মুরুব্বির জোর। এক ভরসা, যদি স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেতে আসতে পারি। একুশ বছর বয়সে অঙ্কের ছাত্র হয়ে কিনা ভালোবেসে ফেললাম এক ডাকসাইটে রাজা-জমিদারের কলেজের জন্য প্রাইভেট-পড়া মেয়েকে? তার পাঁচ-মহলা রাজবাড়ির সারি সারি দেওয়ালের ওপারে গিয়ে?

পুলিশেরও প্রাণে বেশ রস আছে দেখলাম। বলল—তা চায়না থেকে পেরু পর্যন্ত সর্বত্রই মেয়েদের ভালোবাসা চলে। অবশ্য সিংহের গুহায় ঢুকে...

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দাদা বললেন—তা সত্যিই সিংহের গুহা। তবে সিংহ তো একটি নয়, গণ্ডায় গণ্ডায়। শুধু রাজপরিবারের লোকরাই নয়, প্রত্যেক দেউড়ির গুর্খা সিপাইগুলোর নাম পর্যন্ত সিংহ; সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। তবু, জানো অফিসার, এমন একটা দুঃসাহসী বোকামি করলাম!

আবার তাজা কফি ঢালা হল পেয়ালায়। চামচ দিয়ে চিনি নাড়তে নাড়তে সাত ফুট বলল—তা দেখ, আমাদের দেশে প্রেম করাতে বাধাও কম, বিপদও কম। লর্ডের মেয়ের সঙ্গে 'কমনারে'র প্রেম হলে তার গর্দান যাবার ভয় থাকে না।

দাদা বাধা দিলেন—কিন্তু আমাদের দেশে থাকে। বিশেষ করে রাজা জমিদারদের ঘরে। অবশ্য আমাদেব প্রেম লোকের মধ্যে জানাজানি হয় নি। আমার সুইট-হার্টও ছিল খুব সাবধান। আর আমরা কোনদিন অসম্ভব আশাও করি নি। তবু বিপদ হল যখন তার বিয়েব সম্বন্ধ আসতে লাগল, আর সে সাহস করে তার মাসিমাকে জানাল যে, প্রাইভেটে বি.এ. পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়ে সে বিয়ে করতে একেবারেই রাজি নয়।

টিপ্পনী কাটল সাত ফুট—তোমাদেব দেশে তো শুনেছি একেবারে হালফ্যাশানের বাড়ি না হলে মেয়েদের বিয়েতে মতামত নেওয়া হয় না।

গলাব টাইটা একটু আলগা করে নিলেন দাদা। মানসিক উত্তেজনায় তাঁর যে অস্বস্তি হচ্ছিল তা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। তিনি বললেন—সেই জন্যেই তো বিপদ হল। রানি—হ্যাঁ, যদিও সে রাজকুমারী, তাকে রানি বলে ডাকতাম—যদি চুপচাপ থাকত তাহলে বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি না হওয়া পর্যন্ত কেউ বোধ হয় টের পেত না। কিন্তু সে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই আগে থেকেই তার আপত্তি জানিয়ে দিল। মেয়েরা এই রকমই। তাদের দেহকে বন্দিনী করে রাখতে পার, কিন্তু মনকে নয়। অবলার মনের বরের কাছে পুরুষ চিরকাল হার মানে।

আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু মেমদের ভালোবাসার পথে এরকম মুশকিল সহজে হয় না। স্বাধীন ইচ্ছার সম্মান আমরা রাখি।

দাদা আর সইতে পারলেন না। একটু জ্বলে উঠে বললেন—সেই জন্যেই তো আমাদেব অন্দরমহলে যখন প্রেম জাগে সে প্রেমের দাম অনেক বেশি। আমিও তাই আমার সব ভয়, ভবিষ্যৎ ভুলে রানির ভালোবাসায় সাড়া দিলাম। জানতাম, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে সে হয়তো একদিন আস্তে আস্তে নিজেকে সংসারের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হবে। তা বলে তার কিশোর মনের প্রেমের সত্যতা একটুও কমে যাবে না। কিন্তু আমার মন তো পেকে গিয়েছিল; তার উপব সংসার আর কোনও নতুন রঙ চড়াতে পারবে না। তবু সব বুঝে সব জেনেশুনে ভালোবেসেছিলাম।

একদিন রানিকে বললাম যে, বিয়েতে রাজি না থাকার কথা তার মাসিকে জানানোর পর থেকেই আড়ালে আড়ি-পাতা, উঁকিঝুঁকি মাবা এ সবের বন্দোবস্ত হচ্ছে বলে টের পেয়েছি। অতএব একটু হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। রানি ক্ষেপে গেল। বলল, জমিদার-ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মে যথেষ্ট অপরাধ করেছি। জেলখানা থেকে কয়েদীদের একদিন ছাড়া পাবার আশা থাকে; আর আমার কি কোনও আশাই থাকবে না, একদিন তোমার হাত ধরে তোমার স্বাধীন ঘরে গিয়ে ওঠবার? আমি আজই রানিমাকে সব খুলে বলব। একেবারে কিছু ঢাকব না। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। মোকাবিলায় একেবারে সব সাফসুফ হয়ে যাক। দেখি, কে আমায় রুখতে পারে?

আমার অন্তর কেঁপে উঠল। ওই দেউড়ির দারোয়ানদের ভয়ে নয়, সিংহের কন্যার শিয়ালের গর্তে বাসা

বাঁধবার সাহস দেখে। তার হাত চেপে বললাম, একদিন তুমি ভেবে দেখ, তোমার মাকে এ-কথা বলা ঠিক হবে কিনা। ভেবে দেখ যে অন্তত আমার পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা চুপিচুপি ঠেকিয়ে রাখা যায় কি না। আমি যদি স্টেট স্কলারশিপ পাই, অনেক সমস্যাই সহজে মিটে যাবে হয়তো।

সমস্যা মিটে গেল সেদিনই।

হুর্‌রে, হুর্‌রে। খোশমেজাজে বলে উঠল সাত ফুট। যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি দরাজ দিল। তার খুশি ভাবটা যে অত্যন্ত খাঁটি সে সম্বন্ধে সন্দেহ রইল না।

দাদা কিন্তু খুব মনমরা হয়ে রইলেন। একটুও সাড়া দিলেন না হৈ-হল্লাতে। সাত ফুট বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করল, দাদার কাঁধে হাত রেখে খুব মোলায়েম স্বরে বলল, আমি বুঝতে পারি নি আপনার কথাটা। যাই হোক, আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারের খুঁটিনাটি আমি জানতে চাই না। থাক্ গে সে সব কথা।

একটু পরে দাদাই শুরু করলেন। বললেন—আজ হঠাৎ পুরোনো কথা সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে আমার মনে। বাকি কাহিনিটা না বললে নিজেও শান্তি পাব না। আর আমার এই অল্পবয়সী ভায়াদেরও কৌতূহল মিটবে না। তার চেয়ে বরং বলেই ফেলি।

সেই রাতেও রোজকার মতো রাজবাড়ির ঘোড়াগাড়ি আমার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছিল। হঠাৎ মাঝপথে সামনে বসা কোচম্যানের পাশ থেকে একজন, আর পিছনে দাঁড়ানো সহিসের পাশ থেকে আর একজন লোক নেমে গাড়ির বাক্সের মতো চৌকো কামরাতে ঢুকল। ছোরা হাতে। গলা টিপে ধরল; মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে ফেলল। শ্মশানঘাটে নিয়ে এসে শুধোল,—প্রাণে বাঁচতে চাই, না মরতে চাই?

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। মুখ দিয়ে কথা সরল না। একবার রানির কথা ভাববার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার মিষ্টি মুখখানিকে এই শ্মশানে তারই বাবার ভাড়াটে গুণ্ডাদের সামনে মনেও আনতে সংকোচ হল। বললাম—আমি মরতে চাই।

কালো আলোয়ানে মাথা-মুখ জড়ানো ঝুটা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা গুণ্ডাবেশী নায়েব বলল—না, তোমায় মরতে দেওয়া সহজ নয়। অবশ্য থানা-পুলিশে আমরা ডরাই না। কিন্তু রাজকুমারীর উপর উলটো ফল হতে পারে।

তবে শোন ছোকরা। এই তোমার বিলেতে যাবার টিকিট। একেবারে এখান থেকে বোম্বাই; সেখান থেকে বিলেত। আর এই তোমার নামে টমাস কুকের ব্যাঙ্কে একাউন্ট। চার বছরের খরচের টাকা জমা দেওয়া আছে। তোমার জন্য নতুন কেনা কাপড়, চলনসই বিলেতী পোশাক সব কিনে স্টেশনে লোক অপেক্ষা করছে। এই গাড়ি তোমায় ভোরবেলা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে। এখনই আমার সামনে তোমার মার কাছে চিঠি লেখ যে তুমি লটারিতে টাকা পেয়েছিলে বলে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলে বিলেত যাচ্ছ। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছ না—পাছে বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলেকে তিনি বিলেত যেতে না দেন সেই ভয়ে। আর সাবধান, বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত দুখানা ছোরা তোমার পাশাপাশি চলেছে সে কথা ভুলো না যেন।

তার পর থেকে আমি এখানে। দেশে ফিরি নি। যেখানে আমার রানি আমার জন্য জন্মায় নি, সেখানে আর ফিরে কী হবে? ভায়ারা বৌদির কথা জিজ্ঞেস করে। দেশী বা বিলেতী যে-কোনও বৌদি হলেই ওদের হাসি-ঠাট্টার খোরাক জুটত। কিন্তু যেখানে শুধু মনে মনে মন্ত্র পড়াই সার হল, সেখানে বৌদি আসবে কোথা থেকে?

দাদা চুপ করলেন। ওদিক থেকে টেলিফোন কথা কয়ে উঠল। এদিক থেকেও অনেক প্রশ্ন হল—পুরোনো ব্ল্যাকমেলের (মিথ্যা ব্যাপার সাজিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের) দু-একটি ঘটনার কথা, ঘটনায় জড়িয়ে ফেলা শিকারদের রীতি চরিত্রের কথা—এ-রকম আরও কিছু আলাপ। আজ রাতের ঘটনার আসামির 'পাস্ট' খুব 'ক্লিন'; ওর চরিত্রে কোনও দোষ নেই।

তারপর অফিসার খস খস করে তার খাতাতে কী সব লিখল। পাশের ঘরে গিয়ে কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর হাসিমুখে ফিরে এসে দাদাকে বলল—অলরাইট মিস্টার গিউহারে, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে, তুমি এ রকম একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলে, আর তোমায় থানায় বসিয়ে প্রশ্ন করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার সম্বন্ধে নালিশকে আমরা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে লিখে নিয়েছি। তুমি আর তোমার বন্ধুরা এখন যেতে পার। বিদায়, ভারতীয় বন্ধুরা, বিদায়।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় সাত ফুট আবার দাদার কাঁধে হাত দিল। খুব সহানুভূতিমাখা গলায় বলল—তোমার, আশা করি, আজ ভালো ঘুম হবে। সুখস্বপ্ন দেখো। তোমার আর তোমার প্রিন্সেসের সৌভাগ্য কামনা করি।

বসন্তের মাতাল-করা রাত! নির্জনতা ভরে উঠছে অদেখা রানির প্রতি অসীম মমতায়। তবু অল্প বয়সের কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। বললাম—দাদা, আমাদের বৌদি যেমন ভুয়ো, রানিও তেমন নয় তো?

থেমে পড়লেন দাদা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন—ভুয়ো না সাচ্চা, তাতে তোমাদের কী? তার সঙ্গে প্রেমের কথাটা যে সাচ্চা বৌদিব কাজ করেছে, সেটুকুই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

এই ধরণীরে

সুপার-ফরট্রেস বোমারু বিমানটা হঠাৎ যেন দু ভাগ হয়ে খুলে গেল।

মহাশূন্যের বুক চিরে আমাদের এরোপ্লেন এগিয়ে চলেছিল। একেবারে ধূমকেতুর মতো। হ্যাঁ ধূমকেতুর মতো। এইমাত্র আমরা একটা বর্মী গ্রামে শুধু আগুনের ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু রেখে আসি নি।

জাপানি সৈন্যদের একটা আগুয়ান ঘাঁটির খোঁজ আমরা পেয়েছিলাম। আমাদের হাওয়াই দল ওদের লুকোনো ঘাঁটির সুলুক সন্ধান নিয়ে বেড়ায়। তাদের কাছ থেকে রেডিওতে খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের এয়ার-ফিল্ডের কন্ট্রোল-রুমে সারা পড়ে গেল। পড়ে গেল দৌড়ানোর পালা। সাজ সাজ রব নয়। সেজে আমরা ছিলামই। আর কেউ মরবার জন্য, মারবার জন্য এমনভাবে রাত-দিন তৈরি থাকে না। তার উপর আমি মোটে কাল ফার্লো ছুটি থেকে ফিরে এসেছি। বোমারু স্কোয়াড্রনের লোক আমি। শত্রুর ঘাঁটি তাক করে আকাশ থেকে বোমা ঝরাতে তর সয় না।

তাই বাড়ি থেকে লড়াইয়ে ফিবে আসতেও তর সয় নি। এই বর্মা-আসাম সীমান্তের যে সবুজ নরক 'গ্রীন হেল'' তাতেই চলে এলাম। সন্ধ্যাবেলা তাঁবুর তলায় ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে এয়ার-ফোর্সের জঙ্গীরা ঠাট্টা করল—ফ্রম ব্লু হেভেন টু গ্রীন হেল—নিজের কুটিরের নীল স্বর্গ থেকে গহন জঙ্গলের সবুজ নরকে।

ঠিক তাই। নরক কাকে বলে দুশমনকে তা এইমাত্র দেখিয়ে এসেছি। উল্কার মতো নিচে প্লেন নামিয়ে এনে আমরা মোটে হাজারখানেক ফুট উঁচুতে নেমেছি। স্কুলের গুলি খেলার মতো তাক করে করে বোমা ফেলেছি জাপানী ছাউনির উপরে। ওদের মরণ চিৎকারের সঙ্গে মিশে গেছে আগুনের হুঙ্কায় ওদেরই গোলা বারুদ ফেটে ফেটে যাওয়ার আওয়াজ। সে কি তাণ্ডব! সে কি প্রলয়কাণ্ড! সবুজ নরকের আগুন-রাঙা নেশায় বার বার ফিরে এসেছি সেখানে। ছুঁচের মুখের মতো সরু আর নিশ্চিত নিশানা করে আবার মেশিনগান চালিয়েছি। আবার। আবার। সবুজ নরকের মধ্যে রাঙা আগুন।

আসামে বলে হাতি নাকি যৌবন-তাড়নায় ''মস্ত্'' হয়। তখন নাকি পাগলের মতো হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে। তছনছ করে। কিন্তু বেচারি হাতি। আমাদের বিজ্ঞানের কাছে কোথায় লাগে একটা অবলা হাতি। নিজের মনেই হাসি পেল। খুব তাচ্ছিল্য করে নিচে মাটির দিকে তাকালাম।

ধুঃর তোর ধরণী।

শুধু একটা অনাসক্ত অবহেলা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারি না ওই মাটির পৃথিবীকে। তিনশো মাইল বেগে চলেছি। বাতাসকে কলা দেখিয়ে চলেছি আজ। শব্দের চেয়েও জোরে যাব শিগ্‌গিরি। অথচ প্লেনে বসে মনে হচ্ছে যেন একটুও গতি নেই। নেই নড়ন-চড়ন। ওই যে নিচে সবুজ নরকে গুলজার আর তোলপাড় চলছে, তার একটুখানি ঢেউও কি ছুঁতে পেরেছে আমার প্লেনকে?

আমাদের পাইলটও ঠিক এই কথাই ভাবে। আর বলে যে, ওর দেশের আকাশের চেয়ে আমার দেশের আকাশে এই তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরও বেশি আসে। এখানে আকাশটা নিস্তরঙ্গ, বাতাস প্রায়ই নিথর। নিচে পৃথিবীর লোকগুলো ঝড়-বাদলা-মেঘ এ সব নিয়ে মাথা ঘামায়। আমরা তার অনেক উপরে উঠে এসে মজা

দেখি। ধুলো-মাটির ধরণী আর মেঘ-বিদ্যুৎ-ভরা আকাশের তোয়াক্কা রাখি না।

এই তো দেখছিলাম প্রকাণ্ড একটা হ্রদ। এটা এমন গোপন দুর্গম জায়গায় যে আমাদের ম্যাপে পর্যন্ত নেই। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে চিকিচিকে জল মিলিয়ে গেল। এল পাহাড়ের চূড়ার পর চূড়া। নিচে গাছের আর ঘাসের সবুজ জাজিম; মাথায় পাথরের ইস্পাত-রঙা মুকুট। আর কয়েক মিনিট পরেই নামতে আরম্ভ করব। সন্ধ্যার আগেই জঙ্গলে লুকোনো বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে হবে। বোঁ-ও-ও-ও।

বোঁ-ওঃ—ওঃ। হঠাৎ কান যেন ছিঁড়ে গেল আওয়াজে। প্লেনটা দু টুকরো হয়ে গেছে। ককপিট ভরে গেল ধোঁয়াতে। যন্ত্রের মতো আঙুল চালিয়ে চাবি টিপলাম। উপরের চাঁদোয়াটা নিচে ফেলে দিলাম। আরেকটা বোতাম টিপে নিজেকে ককপিট থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেললাম। প্যারাসুটের রশি ধরে টানলাম। রেশমী ছাতার তলায় ঝুলতে ঝুলতে পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে নেমে চলেছি। পরিষ্কার, ন্যাঙ্গা চূড়াগুলো বেয়নেটের ফলার মতো নিষ্ঠুরভাবে আমার দিকে উঠে আসছে। একটা ফলা তো নিশ্চয়ই আমায় বিঁধে দেবে। একেবারে ফুঁড়েও দিতে পারে। না তবু ভয় করি না। আমি এয়ার-ফোর্স লেফটেনান্ট রঞ্জন দত্ত। সবুজ নরকের রাঙা নেশায় আমি জ্বলছি।

২

বাঁ হাঁটুটা বোধ হয় ভেঙে গেল। না, হাঁটু নয়, সম্ভবত গোড়ালি। হতভাগা পৃথিবী শোধ নিয়েছে। তাই মাঠে নয়, পথে নয়, পুকুরে নয়, পাথরে ঠুকে দিল। ঠিক আছে। আমিও ভাঙি না। মাটিতে পড়ে শুয়ে শুয়ে আমার চারদিকের নিঃশব্দতার সঙ্গে পরিচয় করতে লাগলাম। প্লেনে ওঠার পর থেকে এই প্রথম নির্জন নিঃসঙ্গ নিঃশব্দতা।

আর কী কী আছে আমার সম্পত্তি? একটা রিভলবার, একটা ছুরি, আর কয়েকটা বুক-ম্যাচ। অর্থাৎ অ্যামেরিকান ধাঁচের দেশলাই কাঠির প্যাকেট। প্যারাসুট দিয়ে নামবার সময় যে সব যন্ত্রপাতির ব্যাগ সঙ্গে থাকে তা নিয়ে নামার সময় হয় নি। যাক গে।

কতটা উঁচু এই পাহাড়? কি জানি বুঝছি না। তবে শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি। অর্থাৎ একলা একটা লোকের পক্ষে বেশি উঁচু। আবার একজন বোমারু পাইলটের পক্ষে বেশি নিচু। যাক্ গে।

শুধু একটা নিয়ম এখন মেনে চলতে হবে। নিচের দিকে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ। একটা দিয়ে গড়িয়ে নেমে নীচে যেখানে যাই, সেখানে আরেকটা পাহাড়ের গা গড়িয়ে এসে মিশে গেছে। সেখান থেকে আবার উপরে উঠব কী করে? আর উঠেই বা আবার কোথায় যাব? যেখানেই যাই পৃথিবী বন্ধ হয়ে গেছে আমাব জন্য। কিন্তু জংলী জোঁকের রক্তচোষার শিকার মিলে গেছে। একটু পরে পরেই পা থেকে জোঁক ছাড়িয়ে নিতে হয়। বড় জ্বালা করে। মাটির সৃষ্টি কিনা।

পরের দিন।

তারও পরের দিন।

আরও কত পরের দিন এমন করে গেল হিসাব নেই। দিন যায় গড়িয়ে। আমিও।

দুই পাহাড়ের জোড়াতে ছুরি দিয়ে গর্ত করলে একটু জল মেলে কখনও কখনও। একদিন তো একটা ঝরনাই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভালো জল খেয়ে ক্ষিধে পেয়ে গেল! কী খাই? কী খাই? পরশু দিন একটা বুনো জানোয়ার পেয়েছিলাম। রিভলবারের গুলিতে মারলাম। পাহাড়ি কাঠ দিয়ে ঝলসিয়ে দু দিন ধবে খেলাম। তার খানিকটা এখনও পড়ে আছে। কিন্তু পচে গেছে। মাটি আর পাহাড় তো রেফ্রিজারেটর নয়।

মনে পড়ল সেই জাপানি সিপাইর গল্পটা। একবার একপাল পথ-হারিয়ে-যাওয়া জাপানির উপর হামলা দিয়েছিলাম। ওরা যে অনেকদিন খেতে পায় নি, তা বুঝতে পেরেছিলাম। ওরা দল থেকে ছিটকে পড়েছিল সে খবর জানতাম। কিন্তু এরাই বেশি বেপরোয়া হয়। তাই ওদের ঠিক মাঝখানে একটা বোমা ফেলে দিলাম। ককপিট থেকে দেখলাম একজনের পিঠ থেকে খানিকটা মাংস আলাদা হয়ে খসে গেল। বেচারা দৌড়তে দৌড়াতে খপ করে সে মাংসের টুকরোটা নিজের মুখেই পুরে দিল। দিয়েই ফেলে দিয়ে থুতু ফেলতে লাগল। কিন্তু ওর মুখে বাইরে ফেলবার মতো থুথুও বাকি ছিল না। এখন সেই জাপানি সিপাইর গল্পটা থেকে থেকে মনে আসছে। যেন আমার বোমারু বিমানের ককপিট থেকে বার বার নিচে পাগলের মতো দৌড়ানো তার চেহারাটা দেখছি।

রোজ রাতে তার চেহারাটা আমার উপরের আকাশকে আঁধারে ঢেকে দেয়। আগুনে ঝলসিয়ে দেয় রোজ দিনে। সেই ঝলসানোর জ্বালা খাঁক করে দিচ্ছে আমার পেট, আমার হাঁটু। হাঁটুর কথা মনে পড়তেই একবার আকাশের দিকে তাকালাম। ওই আকাশ, তার বুকে পাখির মতো সাঁতার কেটে ভেসে বেড়াত আমার সুপার ফরট্রেস। মাটিতে তো নয়, যে খুঁড়িয়ে না-হয় গড়িয়ে চলাফেরা করতে হবে।

আরও ক-দিন ক-রাত গেল। কতগুলি তা জানি না। হিসাব রাখবার উপায় নেই। রেখেই বা কী হবে। আগে প্রায়ই পাটকাই বুম শৈলমালা ম্যাপে দেখেছি আব মুচকি হাসি হেসেছি। জুম জুম করে আকাশ ফুড়ে উঠে যেতাম। বুম তো কোন্ ছার, "ওভার দি হাম্প", হিমালয়ের কুঁজের উপর দিয়ে এক ঝাঁপ দিয়ে পৌঁছে যেতাম চীনে। পাটকাই বুমকে হিসাবের মধ্যেই আনি নি কখনও। আজ সুবিধা পেয়ে সেই বুমও আমাব উপর শোধ তুলছে।

না, তবু আমি হার মানি না। তাই খোঁড়া হাঁটু নিয়েই আমি এগিয়ে চলেছি। কোথাও না কোথাও পৌঁছাবই।

হঠাৎ আজ সকালে মনে পড়ল উপনিষদে নাকি লেখা আছে, চরৈবেতি —এগিয়ে চল। সেই এগিয়ে চলাবই চেষ্টা কবছি।

পরের দিন হাসি পেল সে কথা মনে পড়ে। পেট আর পিঠ মিশে গেছে, হাত আব পা সমান অকেজো। সামনে একটা বড় নদী। আব আমি মনে করছিলাম উপনিষদেব কথা। যেন বৈতরণীর তীরে পৌঁছেছি।

কিন্তু নদীটা পার হতে হবে। পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া চলে না। রিভলবার আব বাকি গুলিগুলোকেও শুকনো রাখতে হবে। না হলে একেবারে না খেয়ে মরতে হবে। ইউনিফর্মটাও রেখে যাওয়া চলবে না। যদিও এটা বোধহয় নাগা দেশ, এলাইড আর্মি আমায় দুশমন বলে ধববে। নাগাবা হয়তো মাথাটা নিয়ে ঘরেব বারান্দা সাজাবে।

তাই সব কিছু সম্বল নিয়েই নদীতে নামলাম। বুটজোড়া বেঁধে তার ফিতে দুটো দাঁতে চেপে রেখেছি। কিন্তু নদীতে বড় স্রোত। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাত দুটো অবশ হয়ে গেল। পা দুটো আব চলে না। ইউনিফর্মটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম। সেটা ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে। পাথরেব বোঝার মতো টেনে আমায় জলেব তলায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। গা এলিয়ে দিলাম স্রোতে। যাক, যেখানে খুশি নিয়ে যাক।

নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরটা আর বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখতে পারব না। গলা দিয়ে অনেকটা জল পেটে চলে গেল। নিশ্বাস নিতে গিয়ে যেই মুখ হাঁ করলাম, বুট জোড়া নদীতে তলিয়ে গেল। চোখ মেলে তাকাতে গিয়ে দেখি ওপারেব কাছে এসে পড়েছি। পারে দাঁড়িয়ে দেখছে সারি সারি নাগা। হাতে বর্শা পিঠে তীব-ধনুক। 'হেড হান্টার' হবে নিশ্চয়ই। একবাব এমন মাথাকাটুনে নাগা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের ঘরের চাল থেকে ঝুলছিল সারি সারি শুকনো কলা। কলা নয়, মানুষের কাটা হাত। শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়ে কালো কলার মতো দেখাচ্ছিল। এখন চোখে আর কিছু দেখতে পেলাম না। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কানে আব এল না সব্ সর্ সর্ করে ঘা মেরে মেরে এগিয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজ।

৩

সেই স্রোতের ধাক্কায় আমার স্মৃতি পাঁচ দিন পিছনে ফিরে এল।

বৃহস্পতিবার আর্মি মেসে ব্যান্ড নাইট। আমি এয়ার-ফোর্স লেফটেনান্ট রঞ্জন দত্ত গ্রীন হেল থেকে ফার্লো নিয়ে এসেছি। মাত্র ক'দিনের জন্য। আমার কাছে ওরা অনেক মজার মজার গল্প শুনবে। শুনবে সবচেয়ে হালের চটকদার রগড় আর দুশমনের কেচ্ছা। ওই জাপানি সিপাইর নিজের কাঁধের মাংস নিজের মুখে পুরে দেওয়ার গল্পটার মতো গল্প নাকি আর দ্বিতীয় হয় নি। 'ব্ল্যাক লেডি' ককটেল মদ আর্মির সবচেয়ে নতুন আবিষ্কার। সেটির দিব্যি দিয়ে বললাম যে, এই গল্পটা বানানো নয়, সত্যি।

তাই বেচারি মনোর নিজের হাতে তৈরি রান্না আমার ছুটির শেষ রাতে খাওয়া সম্ভব হবে না। ওর চোখ ছল ছল দেখে বিরক্ত হলাম বৃহস্পতিবারে। সেই সাবেকী প্যানপেনে বাঙালি মেয়ে। এতদিন এয়ার-

ফোর্স অফিসার্স ফ্যামিলি ব্যারাকে থেকেও শুধরাতে পারল না। হাতের লোহাকে সোনার পাতে মুড়েছে—পাছে 'ফেলো' অর্থাৎ সহকর্মী ইংরেজ অফিসাররা ঠাট্টা করে। পাছে বলে যে, ওটা পতিদেবতার দেওয়া হাতকড়া। মনোর সিঁথির সিঁদুরের ছোঁয়াটা যাই যাই করেও মিলিয়ে গেল না। সেদিন একজন সদ্য বিলেত থেকে আমদানি ওয়াক-আই মেয়ে অফিসার ওকে জিজ্ঞেসই করে বসল যে, এদেশে পুরুষরা বিয়ের পরে ঠোঁটের বদলে সিঁথিতে চুমু খায় কিনা।

মনো নিজের হাতে ব্যারাকের বারান্দায় তোলা উনুনে রেঁধেছিল। হোক তা মাছের ঝোল, হোক মিষ্টি অম্বল, মনো বোঝে না যে আমার পৃথিবী আর মাটিতে নেই। আকাশে আমি উড়ে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, মনোর সঙ্গে এতদিন পরে ক'দিনের দেখা। আজ শেষ সন্ধ্যাটা এক সঙ্গে থাকলে আনন্দ হত বৈকি। কিন্তু আর্মি মেসে বুক ফুলিয়ে ইউনিফর্মের উপরে বোনা পাখির পাখা জোড়া দেখাব। টেক্কা মেরে বুঝিয়ে দেব আমি রঞ্জন দত্ত—ওদের চেয়ে কত উপরে উড়ি। শুধু চলি-ফিরি না; একেবারে ভাসি আর উড়ি। তোমরা যখন মাটির বুকে পিঁপড়ের মতো গুটি গুটি হেঁটে এগিয়ে চল, আমি ততক্ষণ বাজপাখির চেয়ে জোরে বাতাস চিরে উড়ে যাই। ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মতো দুশমনকে লণ্ডভণ্ড করে দিই। মনো, বেচারি বাঙালি মেয়ে। স্বামীর গৌরব, তার ওড়বার ক্ষমতা, দৃষ্টির বিশালতা এ সবের মহিমা পুরোপুরি ঠিকমতো বোঝে না।

মনে মনে বিশেষ করে সেই কথাটাই ঘুরছিল। আজকের ব্যান্ড নাইটে তাই খুব জাঁকিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম। ব্রিগেডিয়ার তখনও এসে পৌঁছান নি। সাব অল্টার্নরা সবচেয়ে খুদে-পুঁটি অফিসার। ওরা সাড়ে-সাতটাতেই এসে জড়ো হয়েছিল। বড় কর্তাদের সামনে ওরা থরহরি কম্পমান হয়ে যাবে। তাব আগে, তাই তামাক আর মদ দিয়ে ওরা নিজেদের গরম করে তুলছে। আস্তে আস্তে মৌতাত জমে উঠল। জমে উঠল একটার পরে একটা আরও বেশি রগড়-ভরা ধাপ্পা।

জিন আর হুইস্কির ফাঁকে ফাঁকে চাটনির মতো চুটকি ঠাট্টা পরিবেশন হতে লাগল। মনোর মুখখানার কথা ভেবে এমন মন খারাপ করা অন্তত আমার সাজে না।

চতুর্থবার যখন জিন ঢালা হয়েছে, বাজনা তখন বেশ জমে উঠেছে। ব্যান্ড মাস্টার নিজেও একগ্লাস পোর্ট একটু আড়ালে আবডালে সাবড়ে এসেছে। কাজেই সবটাই দারুণ জম-জমাট। একজন বিলেতী মাঝবয়সী কর্নেল ভাবের আবেগে আমায় জড়িয়ে ধরে যা বলল, বাংলায় তার মানে দাঁড়ায় চমৎকার। সে বলল—তুমি তো বাওয়া আমাদের রামধনুতে চড়ে বেড়ানো পিটার প্যান। একটি বার দেখিয়ে দাও না তোমার বিনা তারে আকাশে ওড়ার নমুনাটা।

বুকটা আরও ফুলে উঠল বৈকি।

আরেকজন সবিনয়ে নিবেদন করল যে, যদি আমি তাকে হাওয়াই হামলার একটা নমুনা এখনই দেখিয়ে দিই, সে তাহলে মেঝেতে হামাগুড়ি দিতে দিতে সোফার আড়াল থেকেই দেখবে।

হাসি আর আনন্দের চোটে নিজেকে সামলানো দায় হয়ে উঠল। আমি তো আর ওদের মতো চুর হয়ে যাই নি। যদিও আমারই সবচেয়ে বেশি মাতাল হবার অধিকার হয়ে গেছে। ব্রিগেডিয়ার নিজে হাতে আমায়—এয়ার ফোর্সের এই জুনিয়ার বাচ্চা বীর আমায়—খাতির করে পথ দেখিয়ে নিয়ে খাবার টেবিলে তার পাশে বসালেন। বিমান বীর যে পরের দিন ভোরেই আবার 'গ্রীন হেলে' ফিরে যাচ্ছে জাপানিদের 'হেল' দেবার জন্য।

আমার মাথাটা আরও উপরে উঠে গেল। সামনে ক্লিয়ার সুপের প্লেট; তার মধ্যের ছায়াতে দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্ব গগনে এয়ার-ফোর্সের রঞ্জন দত্তকে। পরম হেলায় সে নিচের পৃথিবীকে তুচ্ছ করে উড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মশগুল হয়ে গেলাম।

৪

দেখতে দেখতে ওই শ্যাম রঙের ক্লিয়ার সুপের মধ্যে বোঁ বোঁ করে নেমে আসতে লাগলাম। জোরে জোরে সুপের মধ্যে ঢেউ উঠতে লাগল। আশ্চর্য, রঞ্জন, এয়ার-ফোর্সের রঞ্জন দত্ত আমি, সেই সুপের শ্যামল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ডুবে যেতে লাগলাম। সুপ যে এত অতল এত অপার হতে পারে, তা কে জানত।

তার চেয়ে মাছের ঝোল অনেক ভালো। সব কিছুই তার চেয়ে ভালো। মিষ্টি অম্বলও অনেক ভালো। উপরে আকাশের দিকে তাকালাম, প্রাণপণে তাকালাম। সেখানে নেই আমার সুপার-ফরট্রেস বোমারু বিমান।

নেই খোলা আকাশের নীলিমা। রয়েছে শুধু রঙহীন, ভরসাহীন, সীমাহীন শূন্য।

তার চেয়ে মাটি ভালো। মাটি শ্যামলা কাদা মাটি। যা দিয়ে বানাব ঘর, যাতে বাঁধব বাসা, আবার শুরু করব প্রতিদিন আর প্রতিরাতের কাঁদা-হাসা। মাটি, ধুলো-মাটি, কাদা-মাটি। কই মাটি?

কঠিন হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছি খানিকটা মাটি। আর ছাড়ব না। নিশ্চয়ই মাটি। অমনি নরম পরশ, স্নিগ্ধ আবেশ। মাটি, মাটি। না হয় মাথা কাটনেওয়ালা নাগারাই ধরে নিয়ে যাক। তবু তো পা থাকবে যেখানে সেটা মাটি। আঃ, সে কথা ভাবতেও আরাম।

আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালাম। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা; চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়। তাকিয়েও বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আঁধার ঘরে শুধু একটু নীল আলো। একপাশে রয়েছে কারা? ডাক্তার? নার্স?

আর অন্য পাশে কার হাতটা অমন করে চেপে ধরে আছি? মনো? মনোর হাত। মাটির মতো নরম, স্নিগ্ধ। সবুজ নরক থেকে ফিরে এসেছি। মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসেছি আমার 'ব্লু হেভেনে'। নীল স্বর্গ নয়, নীল সংসার।

ফলি বারজেয়ার

শুধু চরিত্র নয়।

পকেট নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে।

কেউ এই জাদুতে ভরা প্যারিসে বিশ্বাস করবে না যে ভারতীয় ছাত্রের পকেট গড়ের মাঠ। এই মেয়েটো থেকে আরম্ভ করে 'পেন্সনের' (পাঁসিয়ো অর্থাৎ সস্তা গোছের বোর্ডিং হাউস) বুড়ি মায় পাড়া-পড়শীরা হাঁকাহাঁকি করবে—নিকালো রুপেয়া, আউর ভি নিকালো।

আমাদের দেশের গুণ্ডারা বোধ হয় বেকায়দায় পেলে এমন করেই ছোরা হাতে টাকা আদায় করে থাকে। নির্জন পথে ঘাটে একলাটি পেলে গলার স্বরটা চড়াতেও কসুর করে না। এই ফরাসি মুল্লুকেও 'অ্যাপাসে' অর্থাৎ গুণ্ডার গল্প অনেক শুনেছি। কিন্তু এখানে বোধ হয় গুণ্ডামির দরকার হবে না। বাড়িউলিই মিঠে-কড়া শুনিয়ে পাড়ার লোক জড়ো করবার ভয় দেখাবে। চোখ পালটে বলবে—আর কেলেঙ্কারি করে কী করবে, বাছাধন। ফেলে দাও হাজার বিশেক ফ্রাঙ্ক। তোমাদের তো টাকার অভাব নেই। তোমরা হচ্ছ মহারাজের জাত।

কিন্তু এত সব কথা গুছিয়ে ভাববার সময় নেই। বলিই বা কী করে ছাই। রামুর একেবারে গা জড়িয়ে, একরকম লেপটে জড়িয়ে, তালে তালে পা ফেলে হাঁটছে যে মেয়েটো। একটু আলাদা ডেকে নিয়ে অন্তত ঠারে-ঠোরে যে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব তারও সুবিধে নেই। বরং ভয় আছে যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটো আমাকেই না জাপটে ধরে।

শীতের নিশুতি রাত। প্যারিসের ভর নির্জন রাস্তা। ঠাণ্ডায় পথে ঘাটে একটা বেওয়ারিশ কুকুর পর্যন্ত নেই। আর গরিব ভিখিরিরাও তো এদেশে এ হেন হাড়কাঁপানি শীতে থেকে থেকে তুষার ঝরানো রাতে বেঞ্চিতে বা ফুটপাতের উপর শালগ্রাম শিলা মেরে থাকবে না। সম্ভব নয়।

আমাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। মানে, এই অচেনা বিদেশে বিভুঁয়ে মাঝরাতে পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু এটাকেও অ্যাডভেঞ্চারের সামিল বলে ধরে নিয়েছিলাম। আপনি হয়তো বলবেন গরিবের ঘোড়া রোগ। কিন্তু আমি বলব এ আমাদের একেবারে নিখাদ নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার। ভেবে দেখুন, সেই উত্তর মেরুতে যাওয়া বা এভারেস্টের চুড়োয় ওঠার চেয়ে আমার পক্ষে প্যারিসের ফলি বারজেয়ারে নাচ দেখতে আসাটা কম দুঃসাহসের ব্যাপার হল কিসে?

দুই বন্ধুতে গিয়েছিলাম কন্টিনেন্টে বেড়াতে। কন্টিনেন্টে মানে স্পেনে। ওখানে নানারকম গোলমাল বিদ্রোহ চলছে বলে বাইরে থেকে কেউ আজকাল বেড়াতে যাচ্ছে না। টাকা বদলি এক্সচেঞ্জে স্পেনের টাকা পেসেতার দাম দাঁড়িয়েছে জলের দরের মতো। কেবল বাপ-পিতামোর বংশধর হয়ে পৈতৃক প্রাণটা সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছাটা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, তা হলেই সবচেয়ে কম খরচায় ওদেশে এখন বেড়ানো চলে। লন্ডনে কলেজের সবাই বসন্তকালের ছুটির পর এসে নাক উঁচু করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রটনা করেছে কে

কোন্ জার্মানি ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড পাড়ি দিয়ে এসেছে। খেয়েছে কোন্ হোটেলে, নেচেছে কোন্ নাইট ক্লাবে, এমনকি কপাল ঠুকে 'রুলে' খেলেছে কোন্ জুয়োর আড্ডায়।

সব সহ্য হয়েছিল। কিন্তু সইল না প্রাণে যখন ব্যান্ডো অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে নতুন ময়ূরকণ্ঠী রঙের সোনালো কাপড়ের স্যুট পরে গলায় টাইয়ের বদলে ফরাসি ফিনফিনে রেশমী স্কার্ফ জড়িয়ে শুনিয়ে গেল তার দিগ্‌বিজয়ের কাহিনি। শেষ পর্যন্ত একজন স্পেনিশ কন্টেসা অর্থাৎ কাউন্টের ঘরণী নাকি তার প্রেমে মশগুল হয়ে এমনই তাকে ধাওয়া করেছিল যে সে সাতদিনের বেশি মন্টিকার্লোতে তিষ্ঠোতে পারল না। একদিন মাঝরাতে ক্যাসিনো অর্থাৎ জুয়ার ক্লাব থেকে গা ঢাকা দিয়ে সোজা পিটটান দিয়ে তবে তাকে কন্টেসার হাত এড়াতে হয়েছিল। কালার বিপরীতি আর কারে কয়?

ব্যান্ডো তো মহা বন্ধুর কাজ করে শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অ্যা, বলে কী? শেষ পর্যন্ত একজন কন্টেসা? এ হেন সোনা দিয়ে বাঁধানো কপাল? আচ্ছা, আমাদের পোড়া নসীবে তাহলে তার চেয়েও বড় কিছু জুটে যেতে পারে। একবার তাল ঠুকে লেগে দেখা যাক না।

হ্যাঁ, রামুকে বললাম সে-কথা। ও আর আমি দুজনেই পাল্লা দিয়ে কম খরচার সাধনা করি। আমার গুণে গেথে স্কলারশিপের মাসোহারাটুকুর মধ্যে চালাতে হয়। রামুর অবস্থা তার চেয়ে একরত্তিও সুবিধের নয়। যদিও বাড়ি থেকে টাকা আসে। কাজেই রিভিয়েরা আর পরলোকের সেই নন্দন-কানন দুটোই আমাদের নাগালের বাইরে। সমানভাবেই একেবারে। বরং হঠাৎ বিনা নোটিশে এই পোড়া পৃথিবীর পাট গুটিয়ে নিলে হয়তো বা আগের জন্মগুলোর জমাখরচের হিসাবে কোনওগতিকে স্বর্গলোকে পৌঁছোলেও পৌঁছোতে পারি। কিন্তু রিভিয়েরা?

দিল্লির লালকেল্লায় শুনেছি শাজাহান বাদশা দেওয়ানী খাসে লিখিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তা এখানেই। শাজাহান হয়ে জন্মাই নি বটে, কিন্তু নয়া দুনিয়ায় স্বর্গ রিভিয়েরায় কি আর কোনদিন যেতে পারব না?

রিভিয়েরার সোনালি বালুচরে চরে বেড়াতে হলে যা রেস্ত দরকার তা কিছুতেই হিসাব করে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না, শেষ পর্যন্ত রামু চেঁচিয়ে উঠল—রেখে দাও তোমরা ব্যান্ডোর গুলগাপ্পি। কন্টেসা, না কচু। কাঠ-কুড়ুনী হবে বোধ হয়।

আমিও ততক্ষণে প্রায় সেই সিদ্ধান্তই করে ফেলেছি। তবু হিসাব খতিয়ে দেখা গেল যে, এই ক'মাসে অসময়ে দরকারে-অদরকারে লাগবে বলে চেষ্টাচরিত্র করে যা টাকা জমিয়েছিলাম তা দিয়ে স্পেনটা ঘুরে আসা যায়।

তা বিবেচনা করে দেখুন—মানুষের আশার শেষ নেই। কাটাচিপি করে স্পেন দেশটা যখন ঘুরে বেড়ালামই, প্যারিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আর প্যারিসটা দেখে যাব না? লোকে তাহলে বলবে কী? আর নিজেরাই যে নিজেদের বেকুব বলে মনে করতে থাকব রাতদিন। সে অনুতাপ, সে আফসোসের সীমা থাকবে না।

অতএব প্যারিসের একটা স্টেশন থেকে নেমে শহরের মধ্যে দিয়ে অন্য স্টেশনে লন্ডনের ট্রেন ধরে যাবার সময় আর একবার হিসাব কষতে বসলাম। শেয়ালদা থেকে হাওড়া যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই একটা জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে।

আপনার পকেটে তো আর আমাদের মতো আরসোলা ডন মারে না। কাজেই আপনি বুঝবেন না আমার আর রামুর অবস্থা। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে খুব সস্তা পেন্সনে যদি শুধু রাতে ঘুমানোর ঘর নেওয়া যায়, আর বাইরে বাইরে সস্তা রেস্তোরাঁ থেকে খাওয়া যায়, তাহলে হাতে যা টাকা বাকি আছে তা দিয়ে এ যাত্রা প্যারিসটাও সেরে নেওয়া যায়।

আমেরিকানরা বলে ডুইং ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ইন্ডিয়া সারছি। আমরা তার চেয়ে ভালোভাবেই প্যারিস সারব। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক, তার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমরা—এ হেন কত ভারী ভারী কথা মনে এসে গেল। কী কী দেখব তার তালিকা সে অনুসারেই তৈরি করে নিলাম। সরবোন ইউনিভ্যার্সিটি থেকে লুভর্ মিউজিয়ম পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত আমি বলে ফেললাম—কিন্তু ম্যাক্সিম? ম্যাক্সিম অব প্যারিস? সেখানে একবেলা না খেলে কি আর প্যারিস দেখা সম্পূর্ণ হতে পারে?

নোটবুক থেকে মুখ তুলে হাতের বুড়ো আঙুলটা থুতনিতে রাখল রামু। বলল—দি আইডিয়া! প্যারিসে যখন এসেছি তখন ম্যাক্সিম অবশ্যই। তা যত খরচাই লাগে। তবে তার সঙ্গে যোগ দাও ফলি বারজেয়ার।

খুশিতে উছলে উঠে দুজনেই জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে একা ঘুরে নিলাম। যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।

কিন্তু ড্রেস-স্যুট অর্থাৎ রাত্রে খাওয়া পোশাক নেই বলে ডিনারের হাঙ্গামে গেলাম না। দুপুরের লাঞ্চ সারলাম সেখানে। আর ফলি বারজেয়ার থেকে মাঝরাতে সবাই যখন হুস হুস করে নিজের মোটরে, না হয় ট্যাক্সিতে ফিরে যেতে লাগল, আমাদের দুই হিঁদুর তখন সম্বল রইল চরণ মাঝি।

তা, তাতে আর লোকসান কী, বলুন? আর্ট ইজ দি থিং। জীবনে শিল্পই হচ্ছে আসল, সুন্দরই হচ্ছে সত্য। তার আরাধনা, তার আস্বাদ—সেটাই বড় কথা। সে পরম সম্পদ কি আর মোটর চড়লেই বেশি পাওয়া যায় না? পায়ে চলে চলে জুতোর তলা খুইয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে সে ধনেও টান পড়ে? আমরা আকাশে পা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

আমি বললাম—যা বলিস্ ভাই রামু, আমার বেশ লাগছে। শীতে হাত-পায়ের আঙুলগুলো অবশ্য কনকন করছে; ওভারকোটের কলার উলটে তুলে দিয়ে কান দুটোকে কোনমতে ঢাকবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তবু শিল্পসাধনার যা অপরূপ প্রতিভা দেখলাম তাই মনকে উত্তাপে সরিয়ে রেখেছে—তাই না?

রামুও উৎসহে সায় দিল—ঠিক বলেছিস। ওই মোটরবিহারীর এখ্খুনি বাড়ি ফিরে নাক ডাকাতে শুরু করবে। না হয় ককটেলের ঝোঁকে আবোলতাবোল ভাবতে থাকবে। কিন্তু এই যে আমরা নিখুঁতভাবে সাদা চোখে সাদা মন নিয়ে এই নাচের দৃশ্যগুলো হরেকরকম শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করতে করতে চলেছি—এটা কি আর ওরা পারবে? ওরা কী হারিয়েছে তা ওরা জানে না।

রেখে দাও তোমার ওদের কথা। এমন সব ভাল্‌গার দর্শক, দেখলি না, যখন ওই নগ্ন নৃত্যটি দেখাচ্ছিল, কত লোক একশো ফ্রাঙ্ক দিয়ে অপেরা গ্লাস ভাড়া করে সে নাচটি দেখতে লাগল। ছ্যাঃ, কী রুচি সব!

রামুও সায় দিল, বলল—ঠিক বলেছিস, আমরা কেমন দূর থেকে সাদা চোখে স্বাভাবিক মন নিয়ে ভগবানের সৃষ্টি সৌন্দর্য সোজাসুজি দেখবার, অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। আর ওরা? ছ্যাঃ। কতখানি বসন আছে, তার কতটুকুই বা আছে শাসনে, সে সব খুঁটিয়ে দেখতে গেলে কি আর 'এসথেটিকসের' দিকে নজর থাকে? না সুন্দরের অনুভব করা চলে?

দুজনে বেশ একটু ধাপে ধাপে নৈতিক স্তরে উপরে উঠে গেলাম। মনটা চড়া সুরে বাঁধা রইল। হায় ব্যাডো, তুমি থাক তোমরা কন্টেসার কাহিনি নিয়ে। আমরা এই নিশুতি রাতের নিঃসম্বল সাধনায় রূপের মধ্যে অপরূপের সন্ধান পেয়েছি।

এমন সময় কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল রামুর উপর? আঁতকে উঠলাম। পুলিশ নয়তো? শীতের প্যারিসে রাতদুপুরে লক্কা পায়রারা হেঁটে বেড়ায় না। পকেটমাররা খোলাখুলি বুক ফুলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করে না। তবে? গুণ্ডা নয়তো? তাহলে তো এক লহমাতেই হেস্তনেস্ত করে ফেলত? তবে আমাদের পকেটে কী থাকবে তা তো চেহারা আর কাপড়চোপড়েই মা'লুম। সাহেবগুণ্ডারা কি এত কাঁচা হবে?

কিন্তু এ যে মেয়েলী গলা, মেয়ের চেহারা। গায়ে ওভারকোট নেই। তা বোধ হয় খারাপ মেয়ে বলেই এই শীতের রাতেও নিজেকে ওভারকোটে ঢেকে রাখতে চায় না। কথা বলছে বড় মিঠে সুরে। মায়ায় ভরে গিয়েছে সে সুর। সত্যি, ফরাসি ভাষাটাই কি মিঠে! তার উপর তাতে যখন থাকে 'আমুবে'র ময়ান। ভেবে দেখুন, ফরাসি 'আমুর' কথাটার মধ্যে সংস্কৃত প্রেমের 'র' ফলাটুকু নেই। নেহাতই কোমল, কমনীয়। মাখনের মতো নরম অথচ মধুর মতো মিঠে।

কিন্তু এই নির্জন শীতের রাতে? কালিদাসের লাইনগুলো মনে পড়ল। "রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে" অভিসারিকারা আনাগোনা করতেন। কিন্তু বিদ্যুৎ তাদের পায়ের কাছে চমক দিয়ে দিয়ে পথ আলো করে তুলত। আহা, এই ফরাসিনীর মুখও আলো করে তুলেছে রাস্তার 'মার্কারি ভেপার' ল্যাম্পের নীলাভ আলো।

আঃ, রামুটা একেবারে লাকি ডগ্। পকেট ফুটো হলে কী হবে, কপাল মোটেই ফাটা নয়। ওকে অভিনন্দন করে সরে পড়াই বোধহয় উচিত হবে। রসভঙ্গ হলে সেই দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকি হবার সময়কার

ব্যাধের প্রতি অভিশাপ আমায় লাগতে পারে। বাবাঃ, আমি কারও অভিশাপ কুড়োতে চাই না।

কিন্তু রামুই আমার স্বপ্ন ভেঙে দিল। ফিস্ ফিস্ করে কাছে আসতে বলল। জানিয়ে দিল যে মহা বিপদ হয়েছে।

বিপদ কেন? ব্যান্ডো যে কন্টেসার কাহিনি ঝেড়েছিল একখানা! আর এ যে খাস প্যারিসের জল্যজ্যান্ত একজন অভিসারিকা। বিপদের কী হল? না হয় ঝেড়ে ফেলে সটান বাড়ি ফিরেই চল্। তা বিপদ কিসের?

কাতরকণ্ঠে রামু জানাল—ভাই মহা বিপদ। বলে কিনা সঙ্গে নিয়ে চল।

কথাটাতে একটা ধাক্কা খেলাম। এতক্ষণ খেয়ালই হয় নি যে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠতে পারে। সাদা চোখে মন না রাঙায়ে ফলি বারজেয়ারের নগ্ন নৃত্যও দেখে এসেছি। শিল্পে রঙিন চশমা দিয়ে দেখে এসেছি রূপের পসরা, যৌবনের অভিষেক। ভেবে এসেছি যে ও-ই হচ্ছে আমার মানস স্বপ্নের অরূপরতন। রূপসায়রের পারে দাঁড়িয়ে রূপসীর বালুচরের কথা মনেই হয় নি।

কিন্তু দুনিয়াটা অত বোকা, অত নিরামিষ যে নয় তারই হাতে হাতে প্রমাণ লেপটে আছে রামুর গায়ে। জড়িয়ে ধরেছে তার গলা। চাইছে তার সঙ্গে ঘরে গিয়ে উঠতে। শিল্পের এইরকম ব্যভিচার? নেভার, নেভার।

হেঁকে উঠলাম প্রায়—আবার বেশি চেঁচাতেও সাহস নেই, কী জানি যদি গোটা কতক 'অ্যাপাসে' অর্থাৎ গুণ্ডা রাস্তার আনাচ-কানাচ থেকে এসে হাজির হয়? যদি ব্ল্যাক মেল করতে চায়? বলে, আমাদের মেয়েকে ফুসলোচ্ছিলে। এখন নিকালো রুপেয়া; না-হয় কর থানা-পুলিশ!

মাথা গরম হয়ে উঠল। রামুর কাছে এগিয়ে এসে বললাম—কখ্খনো নয়, কখ্খনো নয়। বিদেয় কর ওটাকে এখুনি।

কাতরকণ্ঠে রামু বললে—কিন্তু কমলি যে নেহি ছোড়তা।

দ্বিগুণ জোর দিয়ে বললাম—আলবাত, একশো বার ছোড়তা, বল যে পুলিশ ডাকব।

রামু তাতে ভরসা পেল না। বলল—পুলিশ কোথা রে বাবা? তার চেয়ে চুপেচাপে চল বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাই। সেখানে ওর মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেই হবে।

উঁহুঃ, অত কাঁচা মেয়ে নয় এরা। চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। সবাইকে জাগিয়ে তুলে জানাবে যে, এতক্ষণ যে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে তার জন্যেও টাকা দিতে হবে।

তাও তো বটে। এমন কি পুলিশ ডেকে নালিশ করতে পারে যে চুক্তি অনুসারে টাকা দিই নি বলে সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সর্বনাশ! শুধু চরিত্র নয়, পেকেট নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে। হা ভগবান, এতও ছিল তোমার মনে।

এদিকে অন্য ভাষায় কথা কয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা খুব ভরসা পেয়ে গেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল—যাক বাঁচালে আমায়। আমি অবশ্য বেশি টাকা চাইব না।

চটে গেলাম। রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। সেই শীতের রাতেও। এগিয়ে এসে মুঠো শক্ত করে পাকিয়ে বললাম—সরে পড়, কেটে পড়, মাদমোজেল, ওসব সুবিধে হবে না। আমরাই পুলিশ ডাকব যদি চালাকি করতে চাও।

চোখ নিচু করে সে বলল—না, না, আমি কোনও চালাকি করব না। বেশি টাকা আমি চাই না। শুধু...

হোয়াট? বেশি টাকা তো দূরের কথা, তোমাকে পুলিশে দেব আমরা।

হ্যাঁ, মনে মনে ভেবে দেখলাম যে, যুদ্ধের শাস্ত্রে বলে যে এগিয়ে এসে হামলা করাই নিজেকে বাঁচানোর সবচেয়ে বড় উপায়। আক্রমণই শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা। তেড়ে হাঁকলাম—তোমায় পুলিশে দেব আমরা।

রাগের চোটে জাদার্ম (পুলিশ) কথাটা ইংরিজি বানান অনুসারে উচ্চারণ করে ফেললাম গেন্‌ডার মেস। কিন্তু যা মেজাজ সে উচ্চারণে ফুটে বের হল, তাতে কথাটার মানে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভালো করে নজর পড়ল। তন্বী তনুলতার উপরে ফুলের মতো কোমল মুখ। তার মধ্যে ফুটে রয়েছে বনহরিণীর ভীরু চাহনি। হ্যাঁ; স্বীকার করতেই হবে দেখতে ভালো, এমন কি খুবই ভালো। এত ভালো না হলেও চলত। কন্টেসাই হোক আর কাঠ-কুড়ুনীই হোক, তাতে রামুর কিবা আসে যায়।

না, এসব মায়া-রাক্ষসীর পাল্লায় পড়া ঠিক নয় ও দেখতে ভালো বলেই বেশি বিপদ। যত দেরি তত বেশি বিপদ। রামুকে বাংলায় বললাম—দে না ঝটকা মেরে একটা ধাক্কা। শেষ কালে কে এসে পড়বে ঠিক নেই।

রামুও যেন জেগে উঠল। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যাবে এমন সময় মেয়েটা করুণ সুরে আবার বলল—আমার বেশি টাকার দরকার নেই। সামান্য হলেই চলবে। আমি সত্যি দেখতে ভালো, এই দেখুন, পেন্ট পর্যন্ত করে আসি নি।

হুঁ। ওতে হিঁদু ভোলে না। দরকার হলেই তোমরা সেজেগুজে নকল সুন্দরী সাজতে জানো। আরেকটু বয়স হলেই তা শুরু করবে। কিন্তু আমরা সে সব যাচাই করতে তো প্যারিসে আসি নি।

আমরা সত্যি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছি দেখে মেয়েটা আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল,—না, না মঁসিয়ে, টাকা তোমরা যা খুশি তাই দিয়ো। আমার কোনও দাবি নেই।

তাতেও কোনও ফল হবে না। মেয়েটা সত্যি বোকা। কারণ আমাদের এত বোকা ভাবে যে সস্তার লোভ দেখিয়ে একেবারে তৃতীয় অবস্থায় পৌছে দিতে চায়। মনের উত্তেজনায় এবার মুখ দিয়ে হিন্দি বেরিয়ে এল। কভি নেহি, নেহি, নেহি।

নেহি কথাটা বোধ হয় দুনিয়ার সব দেশেই বোঝা সহজ। যদি বা শক্ত হত, আমার গলার আওয়াজেই তার মানে মালুম করিয়ে দেবে।

কাতরভাবে অনুনয় করল মেয়েটা—মঁসিয়ে, দয়া কর। এক ফ্রাঙ্কও চাই না। শুধু তোমার ঘরে রাতটা থাকতে দাও। বড় শীত। আমার গায়ে ওভারকোট পর্যন্ত নেই।

রাস্তার আলো ভীরু হরিণীর চোখের উপর এসে পড়ল আবার। দেহপসারিণীরা কি আর তাদের পসরা ঢেকে রেখে, লুকিয়ে রেখে ব্যবসা করতে বের হবে? কিন্তু এই রাক্ষুসী তার চেয়ে বেশি শয়তান। একবার যদি ঘরে পা দিতে পারে তাহলে কি আর আমাদের রক্ষা আছে? যদি ওকে শীতের জন্য ঘরে থাকতেই দিই, আর নিজেরা সিঁড়ির মোড়ে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে রাত কাটাই, তাহলেও কি আর কোনও বুদ্ধিমান আমাদের ধর্মপুত্তুর বলে বিশ্বাস করবে?

ওরে রামু, বোকচন্দর, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল্, যদি বাঁচতে চাস।

ম্যাক্সিমের বিল আর ফলি বারজেয়ারের টিকিট পকেটটাকে একেবারে শুষে নিয়েছিল। তবু সে খরচটা তো করব বলে ঠিক করে নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করেও কিন্তু সামলাতে পারলাম না। প্যারিস থেকে ভুল ট্রেনে উঠে যে বন্দরে এসে হাজির হলাম, সেখান থেকে ইংলন্ডে যেতে জাহাজের ভাড়া লাগবে বেশি। গেল; দুপুরের আর বিকেলের খাওয়ার পয়সাও উবে গেল এই টিকিট কিনতে গিয়ে। তা যাক, সস্তায় স্পেনে কিস্তিমাত করেছি। ম্যাক্সিমে খেলাম, দেখলাম ফলি বারজেয়ার। দেশে না হয় আপনার দেদার টাকা থাকতে পারে; সখ আর সামর্থ্যের হয়তো অন্ত নেই, কিন্তু দেখা আর চাখার ব্যাপারে এত কষ্ট করে এত রস পাওয়ার সৌভাগ্য কি আর আপনার হবে?

কিন্তু এ বয়সে ছাই খিদেও আবার হয়ে উঠে রাক্ষুসে। কিছুতেই সামলাতে পারি না। পকেটে মোটে পাঁচ পেনিও তো লন্ডনে পৌছে স্টেশন থেকে বোর্ডিং হাউসে যেতে বাস ভাড়াতেই লেগে যাবে। কাজেই ও পয়সায় হাত দেওয়া চলবে না।

অনেক মনোযোগ দিয়ে ঢেউ গুনতে লাগলাম। কটা 'সীগাল' পাখি একসঙ্গে দেখা যায়? কটা ট্রলার আজ সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে? ইংলিশ চ্যানেলে বেশি ঝড় ওঠে, না বিস্কে উপসাগরে? জাহাজের উপরে ক্যাপ্টেনের ডেকে উঠে তার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করলাম। শেষ পর্যন্ত জাহাজের বৈঠকখানায় রেডিও খুলে দিয়ে চোখ বুজে বসে রইলাম।

ক্ষিদের যে এতগুলো দাঁত আছে তা আগে কখনও জানতাম না। আর এত বাঘের নখের মতো দাঁত! পেটে কামড় দিচ্ছে। মাথা করছে ঝিম ঝিম। সকালেও খাই নি। মতলব ছিল যে জাহাজে উঠবার আগে, সকালের আর দুপুরের মাঝামাঝি সময়ে একটা লাঞ্চ খেয়ে এক ঢিলে দু পাখি মারব। সে মতলবটা তো ফেঁসেই গেছে।

সন্ধে নাগাদ গা বমি বমি করতে লাগল। আর পারি না। শেষ পর্যন্ত সবার নজরে পড়ে যাব। হাসবে লোকে, ডুববে দেশের নাম। তার চেয়ে না হয় লন্ডনে পৌছে পাঁচ মাইল হাঁটব বাসায় পৌছবার জন্য। এখন তো খেয়ে নিই।

কিন্তু পাঁচ পেনি পকেটে নিয়ে জাহাজের রেস্তোরাঁয় ঢুকলে কি আর জাত থাকবে? সেখানে শুধু এক টুকরো টোস্ট, মাখন মাখানো, তা তো আর চাওয়া যায় না। শুধু এক কাপ চা না হয় নিলাম। অমনি দিতে

হবে তার পেছনে অন্তত তিন পেনি টিপস্ বকশিস। না, এককাপ চা-ও চলবে না। তাহলে?

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম যে, ওতে একটুকরো চকোলেট কেনা চলে। তার পরে খাও বিনি পয়সায় এক চুমুক জল। ওইতে যতদূর হয়। পেটে পাথর চেপে পড়ে থেকেও যখন কুলোল না তখন এতেই যথা লাভ।

লাউঞ্জে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চকোলেট চুষছি। খাচ্ছি না কিন্তু। তাহলে যে ফুরিয়ে যাবে চটপট।

রামুর মুখে একটু হাসি ফুটল। বলল—যাই বল ভাই, কালকে ম্যাক্সিম আর আজ উপোস—জীবনে কত বড় একটা কন্ট্রাস্ট (বৈষম্য) হল ভেবে দ্যাখ। কজনের কপালে আর তা জুটেছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—তার চেয়ে বড় কন্ট্রাস্ট তো কালরাতেই জুটেছে তোর কপালে। ফলি বারজেয়ার আর তার বাইরেই সেই রাস্তার মেয়েটা।

হঠাৎ আয়নায় নিজের মুখটা নজরে পড়ল। আজ যে খাই নি কিছু সারাদিন তার ছাপ সেখানে স্পষ্ট। কিন্তু এ অনশন তো শুধু একদিনের, সামান্য কতটুকু সময়ের। আর কালকের ওই মেয়েটা? ভাবতেই চমকে উঠলাম।

ওর তনু তো তন্বী নয়; অনাহারে, অর্ধাহারে ক্ষীণ। যে খেতে পায় না ভালো করে, সে মেয়ের মুখ অল্পবয়সে কোমল না হয়ে আর কী হবে? আর ক্লান্ত দুঃখী চাহনিকে বনহরিণীর ভীরু চাহনি বলেই তো কবিরা রসিকরা দূর থেকে ভুল বুঝবে। তুষার-ঝরা দুরন্ত রাতে যে মেয়ে শুধু পাতলা ফ্রক পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে তো শুধু পসরা সাজাবার মতলবে নয়।—সে মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, ওর থাকার জায়গা নেই। পেটে নেই ভাত।

আমাদেরও চাল-চুলো এমন কিছু ছিল না—তা বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই। তবু যে শুধু রাতের জন্য আশ্রয় চেয়েছিল, সেটাও হয়তো চাইত না—ওর ওভারকোট থাকলে। ফলি বারজেয়ারের এয়ারকন্ডিশন করা আরামে বিলাসে ভরপুর স্টেজে যে তনু নগ্ন নৃত্যে বিলসিত হয়ে ওঠে, সে তনুকে অনশনে অর্ধাসনে সামান্য বসনে বরফের রাতে রাস্তায় ছেড়ে দিলে তার মধ্যে যে চাহনি ফুটে উঠবে, তাকে কোন্ অপরূপের রূপায়ণ বলে ধরে নেব?

না; গলা চকোলেটটা গলায় আটকে গেছে।

অপরা

হঠাৎ অজিতাকে নাচতে দেখে সুজিত চমকে উঠল।

এখানে? স্ল্যাক্স অর্থাৎ মেয়েদের প্যান্টালুন পরা থোড়াই-কেয়ার-করা সাজে? সিমলা পাহাড়ে ডেভিকো রেস্তোরাঁয় মিলিটারিদের ভিড়ে?

ভালো করে একবার চোখ কচলিয়ে নিল সুজিত। না, কোনও সন্দেহই নেই। এ অজিতা না হয়ে যায় না। এ মূর্তি যে মনের মধ্যে আঁকা আছে। অজিতার অরুণ-বরণী স্মৃতি বেদনায় নীল হয়ে আছে। কিন্তু...কিন্তু. .

কিন্তু, কিন্তুর উত্তর তো আর শুধু আন্দাজে মেলে না। এগিয়ে যাবে নাকি সুজিত ওর কাছে? ওর টেবিলে গিয়ে যদি হাজির হয় তাহলে কেমন হয়? সম্ভবত সে টেবিলে অন্য যারা বসেছে তাদের সঙ্গেই অজিতা এখানে নাচতে এসেছে। তাদেরই নিমন্ত্রণে। সেখানে বিনা পরিচয়ে বা বিনা অনুমতিতে তো আর সে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসতে পারে না।

যেন এমনি অকারণে চারদিকে সে নজর ছড়িয়ে দিতে লাগল। একদৃষ্টে কোনও বিশেষ দিকে তাকানো যে একেবারে অসভ্যতা। এ রকম প্রকাশ্য জায়গায় কোনদিকে কৌতূহল দেখানো বা মনোযোগ দেওয়া বিলাতি শাস্ত্রমতে একেবারে অচল। তা ছাড়া অন্য লোকে তাকে বাঙাল ভাবতে পারে। কাঙাল তো ভাববেই। তারা পরেন ফিটফাট পোশাক; কাঁধে জ্বলজ্বল করে শোভা পাচ্ছে একটা রাজমুকুট। মেজর সুজিত এখন

সংসারে সবার মাঝখানে বুক ফুলিয়ে চলে। সে এখন চেষ্টা করলেও নৃত্যপরা কোনও মহিলার দিকে হ্যাংলা ভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে না।

যার সঙ্গে অজিতা নাচছে সেও একজন মিলিটারি অফিসার। আচ্ছা, এর সঙ্গে অজিতার কতটা পরিচয় আছে? ভাব বা মাখামাখি কতখানি? পাইপটা মুখে দিয়ে যেন আনমনেই সুজিত চারদিকে তাকাতে লাগল। অবশ্য কাউকেই সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে না।

চা খাবার সময়েও নাচা চাই। যুদ্ধের বাজারে সিমলা একেবারে সরগরম। এযাত্রা ইংরেজরা আবার টিকে যাবে মনে হচ্ছে। রাশিয়া থেকে জার্মানরা হঠে আসছে। বর্মায় মিত্রপক্ষ দিচ্ছে পালটা হানা। মিলিটারি অফিসাররা যুদ্ধের মধ্যেই কয়েকদিনের জন্য ছুটি পাচ্ছে, আর দেশের নানা জায়গায় 'হলিডে হোমে' ছুটি কাটাতে আসছে। সিমলাতেও এমনই একটা বড় আড্ডা আছে। ওদের ছুটি কাটানোর প্রোগ্রাম নাচ, অকারণে সময়ে অসময়ে নাচ একটা খুব বড় ফুর্তির খোরাক। যুদ্ধে ফিরে গেলে যে কোনও সময়ই তো জাপানি গুলিতে হয়ে যাব খতম! অন্তত যেতে হবে বর্মার সবুজ নরকে অর্থাৎ মারাত্মক জঙ্গলে। তার আগে-- আজি যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে?

তাই রজনী শুরু হবার আগেই নাচ শুরু হয়েছে। সেই চায়ের সময় থেকেই। ডেভিকো রেস্তোরাঁ একেবারে জমজমাট। কোনও টেবিলেই খালি চেয়ার নেই একটাও। নাচের শেষে অজিতা আর তার সঙ্গী মিলিটারি যে টেবিলে এসে বসল, সে টেবিলের অন্য দুজন মিলিটারির সঙ্গে একসঙ্গেই ওরা এসেছিল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য কথাবার্তা সকলের সঙ্গেই সমানভাবে কইছে। হাসছে হো হো করে। সোডার বোতল যেন উপচে উঠছে। অথবা হাসি-ঠাট্টার তুবড়ি। দূর থেকে তার ফিনকিগুলো সুজিতের আঁধার মনে আলো জ্বালিয়ে দিতে লাগল কিন্তু আলো—না আগুন? সেকথা ভেবে দেখবারও সময় নেই এই নাচের হুল্লোড়ে।

এই অজিতাকে নিয়ে সুজিত দেখেছিল স্বপ্ন---আর অজিতা সেজন্য শুধু হেসেছিল। আজও অজিতা হাসছে।

নাচের বাজনা আবার বেজে উঠল। একটা বেশ পুরনো ফক্সট্রট নাচের গান আর বাজনা। অর্কেস্ট্রার সামনে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গি গায়ক গাইতে লাগল "স্টরমি ওয়েদার" --ঝড়ো আবহাওয়া।

বুকে ঝড় নিয়ে সুজিত দৃঢ় পদক্ষেপে অজিতাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সঙ্গে সে নাচতে চাইবে। নাচ মানে নাচ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, সুজিত নাচতে জানে না। মিলিটারিতে ঢুকেও শেখে নি। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যে যেখানে ছেলেরা-মেয়েরা ঠাসাঠাসি ধাক্কাধাক্কি করে ঘুরঘুর করে ঘুরে যাচ্ছে, সেখানে নাচের নাম করে যদি অজিতাকে ডেকে নেওয়া যায় তাহলে কে আর সেটা বুঝতে পারবে? হায়! সভ্যতার কত যে দায়।

আমি আপনার সঙ্গে এই নাচটার সৌভাগ্য পেতে পারি কি, মিস্?

অজিতা চমকিয়ে উঠল। হঠাৎ চিনতেই পারল না। যার সঙ্গে এইমাত্র নেচে এসেছে তার দিকে একবার তাকাল। ওর ইতস্তত ভাব দেখে সুজিত সেই মিলিটারিটির দিকে লক্ষ্য করে জুড়ে দিল---অজিতা আর সুজিত বহু দিন আগেকার কলেজের বন্ধু। হঠাৎ দেখতে পেলাম। তাই আপনাদের মাঝখানে এসে বিনা পরিচয়ে ঢুকে পড়লাম। কিছু মনে করবেন না আশা করি।

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠল অজিতা। বলল, ---না, না, এতে কারও কিছু মনে করবার নেই। ইউ আর ওয়েলকাম। তারপর বাংলায় বলল---চলে এসো।

চলে তো এল ওরা। কিন্তু নাচের সঙ্গিনীকে কোন্ হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয়? আর কোন্ হাত দিয়েই বা তার হাতখানা তুলে ধরতে হয়? বোকা বনে যাচ্ছিল সুজিত। কতদিন নাচ দেখেছে। ঠিক বাইরে সিঁড়ির ধাপ থেকে মন্দিরের ভিতরে দেবতা দেখার মতো। কাজেই ঠিকমতো খেয়ালও করেনি। ওর ইতস্তত ভাব দেখে অজিতাই ঠিকমতো হাত এগিয়ে দিল। নাচের ভঙ্গিতে পা চালিয়ে নিজেই সুজিতের পা চালানোকে নিয়ন্ত্রিত করে একটা কোনায় সরে এল। মাথা নেড়ে বলল---নাঃ, তুমি সেই সুজিতই রয়ে গেছ। কিস্সু হবে না তোমার। ইউনিফর্মটাই মাটি।

তা হোক। কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সে তো বুঝতেই পারছি। না হলে আর অতগুলো অচেনা লোকের মাঝখানে আমায় ধাওয়া করে আস?

উপায় ছিল না। কিন্তু আমায় একটু সময় দাও। অনেক কথা আছে।

হেসে ফেলল অজিতা। বলল—এই ভিড়েই তো কথা বলার সবচেয়ে সুবিধে। কেউ কারও কথা শুনতে পায় না।

সুজিত রাজি হল না,—এত বাজে ভিড়ের মধ্যে নয়।

অজিতা আবার হাসল—খুব কাজের কথা বুঝি তোমার? তা হোক। নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলে লোকে মনে করতে পারে যে, এরা প্রেমে পড়ে গেছে।

বলতে বলতে অজিতা ঘাড় বাঁকিয়ে এমনভাবে হাসল যে সুজিত উসখুস করতে লাগল। নাচঘরের কোণে এক রাশ টুপি, ছাতা প্রভৃতি জড়ো করে রাখার জন্য যে প্রকাণ্ড "গাছ" সাজানো আছে—তার আড়ালে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসলে লোকেই বা কী বলবে।

শেষ পর্যন্ত বলল—বেশ তো, প্রেমে কখনও পড়তে পারি না এমন ভাব দেখিয়েই এসো, আমার টেবিলে বসবে।

না, তা হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে এসেছি যে।

আমিও একজন পুরোনো বন্ধু বলে ওরা ধরে নেবে। যাই, আমিই তোমার হয়ে ওদের বলে আসি।

"ডোন্ট্ বি সিলি।" অজিতা খপ করে ওর হাত ধরে বাধা দিল; এ হেন বোকামি করা উচিত নয়।

তবে?

আধুনিক হালচালে কী করা যে স্মার্ট ও বুদ্ধিমানের মতো হবে, তা বুঝতে না পেরে সুজিত শুধু প্রশ্ন করল—তবে?

চল, ওদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। এক টেবিলেই বসা যাবে।

চল, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা আছে। আজ রাতে ডিনারে এসো আমার সঙ্গে।

না, আমার তখন রেডিওতে শত্রুপক্ষের বেতার বক্তৃতাগুলো শুনে শুনে "মনিটার" করতে হয়। রাত দশটার পর রেডিও অফিসের কাছে 'ম্যালে' অপেক্ষা করো। এক সঙ্গে হেঁটে ফেরা যাবে।

একসঙ্গে ওরা ফিরে এল অজিতার টেবিলে। অজিতা এবার ওদের সবাইকে সুজিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তিনজনই অবাঙালি মিলিটারি অফিসার।

একজন একটু তেরছা হেসে প্রজাপতি ধাঁচের গোঁফের কোনা চুমড়িয়ে জিজ্ঞেস করল—আপনি বোধ হয় দিল্লিতে, জি. এইচ. কিউ. দপ্তরে আছেন? কোন্ "ব্রাঞ্চ" অফিসে কলম পেষেন?

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে নটবর ভঙ্গিতে সে অজিতাকে প্রশ্ন করল,—জানো নাকি, জি?

জি অর্থাৎ অজিতা। একটা অর্থহীন ইংরেজি অব্যয় শব্দ। কিন্তু পেয়ারের ডাকনাম।

মুখ লাল হয়ে উঠেল সুজিতের। খুব সংক্ষেপে বলল—বর্মা ফ্রন্টে। মিলিটারি ক্রস পুরস্কার নেবার জন্য আমায় দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল।

ওঃ। মেজর এস. চাউড্রি এম. সি. তাহলে এই সাদামাঠা নিরেমিষ্যি বাঙালি। ছোঃ।

তিনজনেই এক জোটে পাইপ ধরানোতে মন দিল।

চারদিক চুরুট সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরা। তার পাশের পাহাড়ের খাদ থেকে অনবরত কুয়াশা উঠে নাচ-ঘরটাতে বাসা বাঁধছে। সে জন্যেই জি-র চোখ ছল ছল করে উঠেছে নাকি?

২

সেদিনও অপরাজিতার চোখ ছল ছল করে উঠেছিল।

এম.এসসি. পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। অপরাজিতা খুব ভালো পাশ করেছে। আর সুজিতও। কিন্তু পাশ করেই ওরা ভাবনায় পড়েছে। এবার কিছু একটা তো করতে হবে।

অপরাজিতার ভাবনা এই যে, আর তো স্কলারশিপের টাকা ভরসা করে খাওয়া-পড়া চলবে না। গরিবের মেয়ে। কিন্তু মাথার জোরে চালিয়ে এসেছে পড়াশুনো। এবার নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নিতে হবে। ভবিষ্যৎটা কী? বিয়ে? তাহলে এত কষ্ট করে পড়াশুনো করলাম কেন? তবে মাস্টারি? ছিঃ, সে তো আরও অধম। অর্থাৎ দারিদ্র্য আর অস্তিত্বহীনতার সঙ্গে বিয়ে। নীরস থোড়বড়ি-খাড়ার সনাতন মার্কা চাপে যৌবনকে

আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে পিষে ফেলা। না, নতুন কোনভাবে নিজের পথ করে নিতে হবে। "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।" অন্তত একটু হাত-পা ছড়িয়ে জীবনযাত্রা।

সুজিতেরও সেই ভাবনা। যুদ্ধ প্রায় লাগে লাগে। বাংলা দেশে মধ্যবিত্তের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু তার নিজের মনে আছে সাহস। বেপরোয়া বেহিসেবী সাহস। তারই জোরে সে সহপাঠিনীর কাছে প্রেম নিবেদন করতেও পিছোয় নি। কিন্তু কলেজে রোজ দেখা হবার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তা এবার ছিঁড়ে যাবেই, যদি আর কোনও সম্বন্ধ না গড়ে ওঠে।

অপরাজিতা আর সুজিত।

ওদের মধ্যে যে কী সম্বন্ধ তৈরি হবে সে সম্বন্ধে অন্য সহপাঠীদের কোনও সন্দেহ ছিল না। সুজিতের নিজেরও নয়।

তাই সে সেদিন খুব উল্লাস দেখিয়ে বলল—অপরা, এবার কেল্লা মেরে দিয়েছি। আর কোনও ভাবনা নেই।

অপরাজিতা হেসে ফেলল—বেশ তো একটা নতুন নাম বের করেছ আমার! কিন্তু তোমার কেল্লা-জয় ব্যাপারটা খুবই সহজ। শুধু হাওয়ার উপর তোমার এই নয়া কেল্লা বানিয়েছ বোধ হয়।

সুজিত অনেক ভেবেচিন্তেই নতুন নামটা বের করেছিল। বলল—সত্যি তাই, তবে হাওয়ার উপর নয়, শক্ত পাথুরে মাটির উপর। তুমি আর আমার পর থাকবে না, তাই তুমি অ পরা। অর্থাৎ আর পর নয়। একেবারে একান্তভাবে আমার।

বাঃ। তোমায় এই সহজ পথটা আবিষ্কার করার জন্য অভিনন্দন করছি। এম.এসসি. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিনা মেহনতে ডক্টরেটও হয়ে গেল। শুধু নামাবলীব জোরেই তোমার স্বর্গলাভ হবে।

হবেই তো। আমাদের দুজনের সংসারে আমাদের স্বর্গলাভ হবে।

এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল অপরাজিতা। বলল—তার মানে? তার মানে...

খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে সুজিত বলল—তার মানে হচ্ছে যে আমি বেলুচিস্থানে চাকরি পেয়েছি। লুচি-পোলাও না হোক ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে দুজনের মতো। আকাশে নয়—মাটিতেই। ওখানে সরকার থেকে সালফার মাইন খুলছে। যুদ্ধ বাধলে এদেশে আর গন্ধক চালান আসবে না!

একটু শক্ত হয়ে উঠল অপরাজিতা—ওঃ, সেই জন্যেই অপরা বলছ! কিন্তু বন্ধু হিসেবে আপন হলেও সংসারে যে অপরা হব সে কথা তো কখনও ওঠে নি।

এই তো ওঠালাম। আজকের বন্ধু আগামী দিনের বধূ হবে।

চুপ করে রইল অপরাজিতা। অনেকক্ষণ। অনেক কিছু ভাবল মনে মনে। সুজিত শুধু তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তাও চোখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। কি জানি, তাতে আছে কী বাণী। যে বারণ মুখ ফুটে করা যায় না, চোখ দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শেষ পর্যন্ত অপরাই নীরবতা ভাঙল। বলল—তোমাব সাফল্যের দিনে আমাবও কত আনন্দ হবার কথা। তুমি চাকরি পেয়েছ, নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ, মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছ। আমার কত আনন্দ। তবু সত্যি কথা আমায় বলতেই হবে তোমাকে।

সুজিত অস্থির হয়ে উঠল। যখন দুজনেই চুপ করে ছিল, তখন ছিল না কোনও চঞ্চলতা। কিন্তু এখন আর নিজেকে সে সামলাতে পারল না। বলল—অর্থাৎ, তুমি আর কাউকে ভালোবাস?

খুব স্থিরভাবে উত্তর দিল অপরা—তাহলে কি তুমি জানতে না?

হয়তো জানতে পারি নি। হয়তো তুমি জানাতে চাও নি।

তুমি রেগে গেছ সুজিত। তোমায় জানাব না, তোমায় ঠকাব—একথা তুমি ভাবতেও পারছ?

সুজিত উঠে এসে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। মিনতিভরা কণ্ঠে বলল—পারছি না। তাই তো বলছি তুমি ধরা দাও, হও আমার অপরা।

মাথা নেড়ে অপরা উত্তর দিল—তা হয় না সুজিত। তা হয় না। সে-ই বিয়ে করে ঘর-সংসার করে জীবন কাটিয়ে দেবার জন্যেই এত কষ্ট করে, এত চেষ্টা করে লেখাপড়া শিখি নি। নীল আকাশে পাখি উড়তে শেখে—সে তো শুধু খড়-কুটোর বন্দোবস্ত করবার জন্য নয়। নীল আকাশে স্বাধীনভাবে ওড়ে।

কিন্তু নীড়ও রচনা করে।

করে, কিন্তু শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্য। জীবন-ভরা নিগড় গড়ে না।

ঘরকে নিগড় মনে করছ কেন? মানুষের রাতের আশ্রয়, দিনের বিশ্রাম, প্রাণের প্রয়োজন সে সবই কি বন্ধন?

হেসে ফেলল অপরা। বলল—সে সব তোমরা পুরুষরা বুঝবে না। বিয়েকে যে সত্যিই বলে উদ্বাহ-বন্ধন। হাতে হাত দিয়ে চলা যখন পাণি-গ্রহণে দাঁড়ায়, তখন সেটা যে হাতকড়া হয়ে ওঠে তা তোমরা বুঝবে না।

সুজিত সে কথা মানল না—কিন্তু তোমার আগে আরও কত বাঙালি মেয়ে, ইয়োরোপের মেয়ে অনেক শিক্ষা পেয়ে, চোখ চারদিকে খোলা রেখে বিয়ে করেছে, ঘর-সংসার করেছে। তারা কি তোমার চেয়ে কম স্বাধীনতা উপভোগ করেছে?

অপরা বলল—ইয়োরোপের মেয়েদের কথা যখন তুললে তাদের কথাই বলি। ওরা কেউ বিয়ের জন্য পা বাড়িয়ে বসে থাকে না। সংসারে অনেক দেখে, অনেক শেখে। হয়তো বা ঠকে। যখন শেষ পর্যন্ত কারও ঘরে পা দেয়, তখনও বেরিয়ে আসার পথ খোলাই থাকে।

তোমারও তা থাকবে।

হেসে ফেলল অপরাজিতা—যা বলেছ। এর পর রবিঠাকুরের কবিতার ভাষার বলে ফেলো—

"আসা যাওয়া দুদিকেই
খোলা রবে দ্বার।"

কিন্তু দুয়ার বন্ধ যে হয়ে যায় আমাদের দেশে। দেশ, সমাজ, পরিবার সব কিছুরই আবহমান ধারা, ট্র্যাডিশন মেয়েদের শুধু যে বেঁধেই রাখে।

সুজিত স্বীকার করল না—তোমার মতো মেয়েকে কিছুই বাঁধতে পারবে না। বাঁধবে শুধু ভালোবাসা, বিয়ে নয়। বাঁধবে প্রিয়ের বাহু, মন্ত্রের বাঁধন নয়।

কিন্তু সব তর্কের শেষ করে দিল অপরাজিতা—ও সব কথার কোনও দরকারই নেই। আমাকে কোনও কিছুই হয় তো বাঁধবে না। অথবা হয়তো কোনদিন বাঁধবে। কিন্তু তার আগে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবন গড়ে নিতে চাই। দেখতে চাই সংসারকে নিজের চোখ, নিজের ক্ষমতা দিয়ে। এই বিশ শতকে জন্মালাম। দুনিয়ার এত খবর, এত ব্যাপারের সঙ্গে সংস্পর্শে আসছি। এত আধুনিকতা, স্বাধীনতা। সব কিছুকেই পুরো আস্বাদ করতে চাই, অনুভব করতে চাই। জানো, আমার নামটি পর্যন্ত বড় সেকেলে, বড় লম্বা। তাই ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করে ওটাকে ছেঁটে নিয়েছি। এখন থেকে আমার নাম হচ্ছে অজিতা।

অপরাজিতা নয়—অজিতা। কিন্তু মানে একই।

৩

জি রেডিও অফিস থেকে বেরিয়ে ম্যালের স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে এসে দাঁড়াল।

কেন যে জায়গাটার নাম হয়েছিল স্ক্যান্ডাল পয়েন্ট তা সুজিত ভেবে দেখছিল। বিকেল থেকেই দলে দলে যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া হরেক-রকমের আর বয়সের লোক রথের মেলার মতো ভিড় করে এখান দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। মেয়েদের পোশাক যত চটকদার ততই ছাঁটকাট। ছেলেদের সুটের স্ট্রাইপ আর টাইয়ের রঙের ফোয়ারা একেবারে হালফ্যাসানের মার্কিন ধাঁচের। কিন্তু তারা এত সব করেও জুত করতে পারছে না। যুদ্ধের বাজারে বরমাল্য পাচ্ছে শুধু ইউনিফর্ম-পরা অফিসাররা। তাদের কাঁধের উপর তারার সংখ্যা, মুকুট ও তারার পাঁচমিশেলি—এসবেই প্রমাণ হবে কে কতটা কুলীন। এমন কি চারজন কুলিতে টানা রিকশা চড়ে যে বয়স্কা মহিলারা ককটেল পার্টি আলো করতে যাচ্ছেন তাদেরও নজর ওদিকে। পরনিন্দা না হোক পরচর্চা নিশ্চয়ই হয় এই স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে। কিন্তু পরের কথা ভাববার সময় নেই সুজিতের।

হাওয়ার উপর দিয়ে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে গুটিকয়েক পাঞ্জাবী অফিসার। হুইসিল দিয়ে এলোমেলোভাবে বেড়াচ্ছে। বেসুরো জড়ানো গলায় দু-একটা ইংরেজি গানের লাইনও যেন গাইবার চেষ্টা করছে। লড়াইয়ের কল্যাণে আর কিছু না আসুক বিলেত থেকে এসেছে দলে দলে তরুণী—ওয়াক-আই, রেন, এনসা, ফ্যানি—এ সব নামের নানান রকম দল। তারা সবাই যুদ্ধের কাজে পুরুষের সহকারী। সহচরীও হয়ে যায় একটু ভাব

হলেই। হয় অফিসের কাজে, না হয় ফ্রন্টের ঠিক পিছনেই রেডিও, সেন্সার বা রাডারের কাজ করে। এমন কি নেচে-গেয়ে নাটক করে আনন্দ দেবার মধ্যে দিয়েও তারা করে লড়াইয়ে সহায়তা। জানটা যদি দিয়েই দিতে হয় তার জন্যও মনকে রাখতে হবে চাঙ্গা।

তাই সিমলার স্ক্যান্ডাল পয়েন্টে রাত দশটার পরেও ভিড়ের কমতি নেই। বেসামরিকরা সব যে যার আস্তানায় ফিরে গেছে। কিন্তু মিলিটারিদের তো অহোরাত্র জীবন দেওয়া-নেওয়ার কারবার। কাজেই জীবন উপভোগের সময়েরও সীমানা টানা নেই। "ইন বাউন্ড" অর্থাৎ মিলিটারি লোকদের পক্ষে বারণ নয় এমন জায়গা সিমলায় প্রায় সর্বত্র। খানাপিনার পর দিলটা আরও একটু বেশি মাত্রাতেই দরিয়া হয়ে যায়।

সামনের রেস্তোরাঁ থেকে একজন কিল্ট অর্থাৎ গামছা-মার্কা পোশাক-পরা মিলিটারি বেরিয়ে এল। বেশ রঙিন অবস্থা। বিড়বিড় করে গাইছে—"মাই বনি ইজ ওভার দি ওশেন"।

ওর বনি অর্থাৎ প্রেয়সী যদি সমুদ্রের ওপারেই থেকে থাকে, সমুদ্রের এ পারে কি আর তা বলে ও দেবর লক্ষ্মণ সেজে বসে থাকবে? অতএব ও অজিতাকে কাছে দেখতে পেয়ে বেশ সচেতন হয়ে উঠল। একটু জোরেই শুরু করল—ব্রিং ব্যাক মাই বনি টু মি। প্রেয়সীকে কাছে পাবার জন্য যেই সে হাত বাড়াল, অমনি অজিতা ঠাস করে তার গালে কষিয়ে দিল একখানা চড়। কঠিন স্বরে হাঁকল—ইউ ব্রু।

পশু ততক্ষণে এক চড়েই চৈতন্য ফিরে পেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। দেশী মেয়ের এই রুদ্র ব্যক্তিত্ব দেখে সে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্যালুট ঠুকে বলল—দুঃখিত মিস। আমি ক্ষমা চাইছি।

দূর থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এল সুজিত। তার হাতের মুঠো একেবারে তৈরি। কিন্তু অজিতা এককথায় তাকে থামিয়ে দিল—যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছুর দরকার নেই। না হলে একটা দৃশ্য তৈরি হয়ে যাবে।

সুজিতের কিন্তু সামলিয়ে নিতে সময় লাগল। একটু হাঁটতে হাঁটতে এগোনোর পর সে বলল—কিন্তু তুমি তো খুব বিপদের মধ্যে কাজ কর। যে কোনও দিন আবার এ রকম হতে পারে। হয়তো দলবেঁধেও আসতে পারে।

যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে অজিতা উত্তর দিল—কিন্তু তা বলে তো আর মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু তুমি কেন এ বিপদে মাথা গলিয়ে রেখেছ?

বিপদ কাকে বলছ, সুজিত? তোমরা জীবন দিয়ে দাও লড়াইয়ে। আর আমরা এতটুকু ঝক্কি নিতে পারি না? দেখেছ নিশ্চয়ই বর্মা ফ্রন্টে কত সাধারণ ভদ্রঘরের মেয়েরা বিলেত থেকে এসে তোমাদের কত কাজে কত সাহায্য করছে!

ওরা করছে দেশের জন্য।

আমি করছি নিজের জন্য। নিজের জন্যই যদি না করতে পারি, দেশের জন্য মনুষ্যত্বের জন্য কি আর কোনও দিন কিছু পারব?

কিন্তু ওই পশ্চিমের মেয়েদের এ কাজ একদিন ফুরিয়ে যাবে। তারা দেশে ফিরে যাবে, সংসারে ফিরে যাবে। ঘর ভেঙে গিয়ে থাকলে আবার ঘর বাঁধবে।

অজিতা চুপ করে রইল।

কিন্তু সুজিত বুঝতে পেরেছে। অজিতার মনে যে কিছু ধাক্কা এসে লাগছে— এই মৌনতা বোধ হয় তারই প্রমাণ। কাজেই সে আবার শুরু করল—ভেবে দেখ অজিতা, স্বাধীন জীবন, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তার সব কিছুরই স্বাদ তুমি পেয়েছ। কলকাতার কলেজ থেকে সিমলার অফিস সবই তো করেছ নিজে নিজে, কারও উপর নির্ভর না করে।

বাধা দিল অজিতা—এখনও নির্ভর করতে চাই না।

চাও না জানি, কিন্তু এই যে তোমার জীবন, এ শুধু বাইরে থেকেই দেখতে স্বাধীন। এ হচ্ছে কিন্তু আসলে নিজেকে মুছে রাখা। এ অস্তিত্বে তুমি কী পাচ্ছ, অজিতা? তোমায় যখন অজিতা বলে ডাকি তখন তুমি আমার অনেক কিছু। আমার সব স্বপ্ন, সব ভবিষ্যৎ জড়িয়ে একজন মানুষ। কিন্তু ওই লোকগুলি যখন তোমায় জি বলে ডাকল তখন তোমার কতটুকু ওদের কাছে রূপ পেল? ইংরেজিতে জি কথাটা শুধু একটা কথার কথা। ওর মধ্যে নেই কোনও রূপ, নেই কারও আপন ছাপ। তুমি যে কত বিকশিত হয়ে উঠলে সে

কি শুধু এমনি একটা লেপাপোঁছা অস্তিত্বহীন পুতুল হিসাবে প্রকাশ পাবার জন্য অজিতা?

চুপ করে রইল অজিতা। সিমলা পাহাড়ের আকাশে তারাগুলির মতো তার মনেও অনেক প্রশ্নের ঝিকিমিকি চলছে। কিন্তু সে নিজে নীরব।

ভেবে দেখ অজিতা। আজ তুমি ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসাবে নাচতে গেলে। কাল ওরা আরেকজন বন্ধুর সঙ্গে যাবে। তুমিও যাবে হয়তো আর কারও সঙ্গে। কারও উপরই তোমার নেই দাবি। দায় নও তুমি কারও। কিন্তু কখনও কি তোমার মনে হয় নি যে, আজ আর বের হব না, ঘরে বসে শাল মুড়ি দিয়ে একজনের সঙ্গেই গল্প করব? অথবা ধর, শুধু একজনের সঙ্গেই নাচ-ঘরে যাব—তুমি সেদিন না নাচলে যে মনে করবে না যে তোমার জন্য কেনা নাচের টিকিট-খরচটা জলে গেল। তোমার একলার বাসা কি ভালোবাসায় দুজনের হয়ে গড়ে উঠতে পারে না?

রাতের সিমলার পাহাড়ের গায়ে একে একে বাড়িগুলির আলো নিবে যাচ্ছে। খাদের নিচ থেকে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠে আসছে ফগ। তার ভিতর দিয়ে প্রায় দেখা যাচ্ছে না আকাশের তারা বা ঘরবাড়ির বাতি।

ওই দেখ অজিতা, যে বাতিগুলো নিবে যাচ্ছে, ওদেরই মতো একদিন তোমার বাইরের লোককে আনন্দ দেবার ক্ষমতা নিবে যাবে। তাদেরও তোমার মধ্যে আনন্দ পাবার ইচ্ছা ক্রমে ফুরিয়ে আসবে। জীবনভরা নিত্য নতুনের হয় না আনাগোনা। কোনও একজনের মধ্যেই সেই নিত্যকালের একজন ঠিক করে নিতে হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হচ্ছে শুধু প্রয়োজন, পরিণতি নয়।

অজিতা একবার ওর দিকে তাকাল, আরেকবার পাহাড়ের গায়ে। আকাশের বুকে আর একটা তারাও দেখা যাচ্ছে না।

আমার সময় খুব কম অজিতা। কাল ভোরের "কন্‌ভয়" মিলিটারি ট্রেনে দল বেঁধে ফিরে যেতে হবে। তুমি কিন্তু আমায় এম. সি. পাওয়ার জন্য অভিনন্দনও করলে না। অথচ তোমার কথা মনে না থাকলে আমার মিলিটারি ক্রসের দুর্লভ সম্মান পাওয়া সম্ভবই হত না।

অজিতার এতক্ষণে যেন হুঁশ হল। বলল—সত্যি, আমারই ভুল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। তোমার কথা বল। কেমন করে তুমি এম. সি. পেলে সেকথা বল। তুমি যে চাকরি ছেড়ে মিলিটারিতে গেছ তা ভাবতেও পারি নি। তাই এস. চৌধুরীর বীরত্বের খবর কাগজে দেখলেও, তুমিই যে সেই লোক হবে এমন একটা সম্ভাবনা খেয়াল করি নি।

থাক সে সব কথা। বর্মা ফ্রন্টের লড়াইয়ের খবরে তোমার কী হবে বল? তুমি থাক তোমার মনগড়া পৃথিবীতে, আর আমি থাকব তা থেকে অনেকদূরে। তোমার কথা ভুলতে চেষ্টাও যদি করি, তবু পারব না।

না সুজিত, তুমি আমার কথা ভুলবেই বা কেন? তুমি চাও স্ত্রী, চাও ঘর সংসার। সে সবের সঙ্গে আমার স্মৃতির তো কোনও বিরোধ হবার দরকার নেই!

সুজিত দৃঢ়স্বরে বলল—না অজিতা, যার নেই তার নেই। আমার আছে। আমি প্রত্যেক দিন মনে করব যে তোমারই বেপরোয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা ভেবে আমি নিরাপদ টেবিল-ঘেষাঁ কাজ ছেড়ে লড়াইয়ের কমিশন নিলাম। তোমারই কথা ভেবে আমার কম্যান্ডার ম্যাকেঞ্জির বুকে চার্জ-করা জাপানি বেয়নেটের সামনে নিজের বুক পেতে দিয়েছিলাম। ম্যাকেঞ্জি বেঁচে গেছে। যার ছবি তার বুক-পকেটে সব সময় থাকে তার কাছে সে ছুটি নিয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু বাঁচলাম না আমি। বুকে বেয়নেটের প্রকাণ্ড ঘা শুকোল, কিন্তু মনটা রয়ে গেল ফোঁপরা। আমি ছুটি নিয়ে কার কাছে যাব অজিতা?

এতক্ষণে ওরা অজিতার হোস্টেলের কাছে এসে পড়েছে। ফগও ঘিরে আসে ঘন হয়ে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে চাবি বের করে বন্ধ দরজা খুলে বলল অজিতা। সুজিত তবু তার হাত ছাড়ল না। দৃঢ়স্বরে বলল—বল, আমায় বলে যাও, আবার আমি আসব কিনা। যদি যুদ্ধে বেঁচে থাকি, যদি ফিরে আসি, তোমার মত বদলাবে কিনা। বল, বল।

কিন্তু কোনও সাড়াই নেই। সিমলা পাহাড় ঘুমোচ্ছে।

রাস্তার মৃদু আলো সুজিতের ব্যাকুল মুখের উপর এসে পড়েছে। কিন্তু অজিতার মুখ রহস্যের আঁধারে ঘেরা। সেই রহস্যের দিকে উদ্দেশ করে আপন মনে সুজিত কথা বলল। যেন সে অজিতাকে বলছে না। সে শুধু বলল—অল রাইট, গুড বাই, জি।

রহস্যের আড়াল থেকে মৃদু উত্তর এল, —না, না, জি নয়। বল, অপরা।

বিজয় দশমী

দেশের জন্য প্রায়ই বড্ড মন কেমন-কেমন করে। এই বিলেতের বরফ-মারা ঠাণ্ডায় হাত-পাগুলো একেবারে কালী মেরে যায়। সুয্যিমামার মুখ দেখি নি বোধ হয় মাস তিনেক। আর বাপ-মার কাছে আবার যে কবে ফিরে যাব তারও ঠিক নেই। মনের অবস্থাটা তাহলে কেমন তা বুঝতেই পারছেন। শরীরের মতন মনকে তো আর মাফলার-ওভারকোট চড়িয়ে গরম রাখা যায় না!

এমনই একটা শীতের রাতে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় ল্যান্ড-লেডির মুখটা মনে পড়ল। একে দেশ থেকে ঠিক সময়ে টাকা আসে নি বলে এ সপ্তাহের ভাড়া আর খাবারের বিল মেটাতে পারি নি, তায় ঘরে ফিরে ওকেই অনুরোধ করতে হবে—কয়লা দিয়ে ফায়ার-প্লেসটা জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে। চুল্লিতে যদি কয়লার বদলে আমার মনকে বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সম্ভবত দেশলাইয়ের কোনও দরকার হবে না আজ। বুড়ির ঠাণ্ডা চাহনিতেই জ্বালিয়ে দেবার মতো আগুন থাকবে প্রচুর।

কিন্তু সেজন্য নয়। এমনিতে বাড়ির জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে ছিল। তাই সোজা ঘরে না ফিরে ডিনারটা সেরে নিতে গেলাম কাফে ইন্ডিয়ানে। গেলাম দেরিতে। যাতে বসে থাকতে পারি অনেকক্ষণ। তার চেয়ে বড় কথা—ঘরে পৌঁছে আর চুল্লি জ্বালাতে হবে না। সোজা বিছানায় গিয়ে যাকে বলে সেই পিঠের একসারসাইজ করা।

তা পিঠের ব্যায়াম ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? আজ রাতে ঘুম আসার আশা নেই। ক্রিসমাস ইভ—কাল থেকে বড়দিনের ছুটি। সারাটা বিলেত তেড়ে ছুটে চলেছে নিজের নিজের প্রিয়জনের কাছে। আর আমি লাজুক কুনো বাঙালি ঘরের ছেলে। আমি ছুটে যাব কার কাছে? তায় বাড়ি থেকে টাকা আসতে দেরি হচ্ছে।

ঝাল মশলার সোয়াদ ছাড়া বিলেতি রোস্ট আর গ্রীল খাওয়া জিবে ততক্ষণে বেশ জল এসে গেছে। মাছের ঝোলটা—আঃ, কি ফার্স্ট-কেলাসই না হয়েছিল। জিভের জল আর ঝাল খেতে অনভ্যাসেব জন্য চোখের জল পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। কৃপণের ধনের মতো খুটে-খুটে খাচ্ছি আর চুপিসাড়ে চোখ মুছে নিচ্ছি।

ততক্ষণে কাফে ইন্ডিয়ান প্রায় খালি। রেডিওর বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু পাশের টেবিলে একটু টুং-টাং আওয়াজ কানে এল। তাকিয়ে দেখি—সোনার চুড়ির আওয়াজ। আচ্ছা, ঠিক জলতরঙ্গের মতো মিঠে শোনাচ্ছে, না?

ভদ্রমহিলাও আমার দিকে তাকালেন। মুখে একটু মৃদু হাসি। প্রসন্ন আভা ছড়ানো। যেন শরৎকালে আমাদের দুন নদীর পারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাশফুল ফুটে আছে।

প্রায় একই সময়ে দুজনেই উঠে পড়লাম। বাইরে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়ছে। ওভারকোট আর টুপি ঝোলানোর 'ট্রি' অর্থাৎ গাছ থেকে তিনি ওভারকোট তুলে নিতেই আমি ওঁর অনুমতি নিয়ে ওঁর গায়ে সেটা পরিয়ে দিলাম; দরজাটা খুলে ধরলাম, উনি যাতে আগে বেরোতে পারেন। বিনিময়ে পেলাম একটু মিষ্টি হাসি আর ধন্যবাদ।

ল্যান্ড-লেডির গোমড়া মুখ আর বরফ-মারা চাহনির কথা ভুলে গেলাম।

একটু এগোতেই রাস্তায় বাংলা কথা শুনে চমকে উঠলাম. সেই মহিলাই বটে! একটা ট্যাক্সি থেকে মুখ বের করে আমি কোন্ দিকে যাব জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাম্পস্টেডে যাব শুনে বললেন—আসুন না আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে। আমি যাচ্ছি প্রিমরোজ হিল। অনেকটা পথ—একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

অপরিচিতা বটে, কিন্তু আমারই দেশের একজন রূপসী যুবতী। বাইরে বরফ পড়ছে বলে নয়, উনি একা যাবেন, বাংলায় ডেকেছেন। আমি যদি এটুকু কথাও না রাখি, তাহলে বিলেতে এসে সভ্যতা শিখলাম কোথায়?

ওঁর বাড়ির দরজার সামনে এসে নামলাম। চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি শুভরাত্রি জানিয়ে চলে আসছি, এমন সময় আবার উনি ডাকলেন,—আসুন না একটু ভিতরে; কফি খেয়ে যাবেন। আর

সন্দেশ, নিজের হাতে বানানো। অবশ্য আপনার যদি দেরি না হয়ে যায়—

একজন নতুন-চেনা যুবতী মহিলার ঘরে এত রাতে কী করে যাওয়া যায়? কিন্তু সন্দেশ, ওঁর নিজের হাতে করা! সেটার নেমন্তন্ন তো আর এই দূর বিদেশে ফেলে দেওয়া যায় না?

ভদ্রমহিলার বাড়ির অবস্থা বেশ ভালোই। আমাদের মতো একখানা বেড-সিটিং রুম—শোয়া-বসার ঘর নয়। আলাদা একটি বৈঠকখানা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। স্বদেশী বিদেশী কোনও সামাজিক রীতিতেই আমায় দুষতে পারবে না। তিল থেকে তাল বানানোর লোকের তো আর অভাব নেই!

বিলেতে একজন সুন্দরী বাঙালি মহিলা—হ্যাঁ, অবশ্যই তাকিয়ে দেখবার কথা। এখানে তো আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাতে হবে না। সহজ দৃষ্টিতে দেখলে এদেশে কোনও অসভ্যতা হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একবার বৈঠকখানাটাও ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। লোকের পরিচয় ছড়ানো থাকে বৈঠকখানায়, শোবার ঘরে।

ম্যান্টল-পীসে দুখানা ছবি। দুটোরই দু পাশে সাজানো ফুলদানি। তাতে টাটকা ফুল, রোজ বদলানো হয় চারটে ফুলদানিই। ব্যাপার কী!

ভাই আর স্বামী! উঁহুঃ। দুই ভাই? না, তাও না। দুই বন্ধু? হতেই পারে না। একজন চোস্ত মিলিটারি ইউনিফর্ম-পরা, আরেকজন বেশ চালাক, কিন্তু দেশী সাবেকী ঢঙের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। তবে কি জগৎসিংহ-ওসমান? ধ্যেৎ, ভাবতেই হাসি পেল। যিনি নিজের দেশের অচেনা লোককে ডেকে নিজের হাতের তৈরি সন্দেশ খাওয়ান, তাঁর সম্বন্ধে এ-সব কথাই ওঠা ঠিক নয়।

কি, হাসছেন যে মিস্টার বয়? আমার আনাড়ি গিন্নিপনা দেখে হাসি পাচ্ছে? তা, নিজের ঘরে চা-কোকো তৈরি করা আপনারও বোধ হয় অভ্যেস আছে?

না, না, মিসেস চৌধুরী। আপনার কফির সুন্দর গন্ধে মনটা খুশি হয়ে গেছে, তাই।

একেবারে বাঙালি মেয়ে বটে। এটুকু কথাতেই গলে গেলেন। পরের দিন অর্থাৎ বড়দিনের দিন রাতে ওর ফ্ল্যাটে এসে খিচুড়ি খাবার নিমন্ত্রণ করে ফেললেন।

মহা খুশি হয়ে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফিরে চলেছি। ক্রিসমাসের রাতে এদেশে নেই হুটোপাটি, হৈ-হল্লা। স্বজনদের সঙ্গে ওরা চুপচাপ নিরেমিষ আনন্দে দিন কাটায়, সন্ধ্যা ভরে তোলে। মিসেস চৌধুরী এ-হেন রাতের জন্য আমাকে ডেকে নিলেন। এম.সি. এই দুটো অক্ষর সই-করা ছবিটা বোধ হয় শ্রীমতীর স্বামীর। সি. অর্থাৎ চৌধুরী। কিন্তু এম? এম? নিশ্চয়ই শ্রীমতীর ভাই নয়—আর যাই হোন, একেবারে দেশী পাঁচের লোকের বোন হতে পারেন না তিনি।

২

নো ডার্লিং, নো!

হঠাৎ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

দুটো ছবির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সারা দিন ঠেসে পড়তে হয়েছে। সন্ধে সাতটার সময় মিসেস চৌধুরীর দরজার সামনে ঘণ্টি টিপব, এমন সময় শুনতে পেলাম ওর গলা। দরজার ঠিক ওপারেই কাকে তিনি বলছেন, নো ডার্লিং, নো!

একটু থেমে অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু কৌতূহলও কম নয়। কানে তো আর তুলো গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না! বিশেষ করে এমন একটা কথা শোনার পরে। ছবি দুটোর কথাও মনে পড়ল।

না, আমি দেশে ফিরে আসতে পারি না। তুমি বোঝ না কেন ডার্লিং।...

এখনও তোমায় ভালোবাসি। সেজন্যেই ফিরতে পারব না। কিন্তু সে কথা যাক।...

শুধু তোমার স্ত্রী নয়, তোমার কথা আর এমন কি আমার কথা ভেবেও আমার পক্ষে ফেরা সম্ভব নয়।...

একতরফা কথা শুনতে পাচ্ছি। তাহলে টেলিফোনেই আলাপ চলছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। টেলিফোনটা তো দরজার ঠিক পাশেই ছিল দেখেছি কালরাত্রে। কান পেতে রইলাম।

না, 'সু'র ডাকেও ফিরব না। সে-ও আমায় খালি বলছে, ফিরে এসো। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে—না আসা।...

ঠিক, এটা দুর্বল লোকের কথা মনে করতে পার। কিন্তু আমি যে বড় দুর্বল মুরলী! 'সু'র কাছ থেকেও এমন কোনও বল পাই নি যে তোমার ডাককে একেবারে উপেক্ষা করতে পারব।...

না, না, তাকেও ছাড়তে পারব না। আমার অসহায় মুহূর্তে সে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, নিজেকে আবার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ভুলো না যে তাকে আমি বিয়ে করেছি। প্লিজ, প্লিজ। আমার কথা ভাব। বি কাইন্ড টু মি...

জানি, তোমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। 'সু'রও কষ্ট হবে। তার চেয়ে আমায় এখানে একা থাকতে দাও তোমরা। আমি ফিরতে চাই না দেশে। কিন্তু হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ, ডার্লিং।

তিন মিনিট আন্দাজ কথা চলার পর বন্ধ হয়ে গেল। ফিরে যাব না ভিতরে আসব এখন? দুটো ছবির সমস্যাটার উপর একটা নতুন আলো পড়েছে। একটু ভেবে দেখা দরকার।

শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করতে করতে ঘণ্টাটা টিপেই দিলাম। শ্রীমতী দরজা খুলে দিলেন। মিনিট খানেক সময় লাগল। কিন্তু যেরকম হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বলে মনে হল না।

বেশ ঘটা করে হৈ-চৈ করে তিনি বড়দিনের শুভেচ্ছা জানালেন। নিজে থেকেই দুষ্টুমি করে বললেন যে, কালকের জন্য কড়িকাঠে 'মিসল-টো' ডাল টাঙানোর বন্দোবস্ত করছেন না, অর্থাৎ 'বক্সিং ডে'-তে অবাধ চুমু খাবার এই সুযোগটা কাল তার ঘরে থাকবে না।

হেসে ফেললাম। বাইরে এত হাড়কাঁপানি শীত, আর ভিতরে এমন মনমাতানো উত্তাপ। ভুলে গেলাম টেলিফোনের কথা, ম্যান্টল-পীসে (আতসখানার উপরে) সাজানো ছবি দুখানা।

বললাম—তা 'মিসল-টো'র দরকার কী? এত ফুল দিয়ে ঘর ভরে রেখেছেন। অবশ্য আর্যপুত্রীরা সাধারণত ফুল ভালোবাসেন।

চোখ বড় বড় করে উনি বললেন---আর্যপুত্রী।

হ্যাঁ, আপনাকে দেখে আমার রূপে-গুণে মমতায় সব দিক থেকে মহীয়সী মহিলাদের কথাই মনে হয়। তাই সংস্কৃত কথাটা বললাম। কেন বললাম যে আপনারা ফুল ভালোবাসেন! ওই ভালোবাসাটা উভয়ত। ফুলও তো আপনাদের ভালোবাসে। দু পক্ষই সৌরভ বিলায়—তাই।

মৃদু হেসে ফেললেন তিনি—ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন আপনি এ সব কথা বলে!

ভয় কেন? ফুল শুকোয়, চাঁদের কলা কমে যায়, কিন্তু শুধু মেয়েরাই দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠে।

বলেই ভাবলাম যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে প্রথম দিনের আলাপ। কী জানি কী ভাববেন। মনের কথা পড়বার কল বিজ্ঞান বের করতে পেরেছে। কিন্তু মেয়েদের মন নয়। কারণ তার যে তলও নেই, সীমাও নেই।

একেবারে কামিনীভোগ চালের সুবাস। তার উপর খাঁটি গরুর দুধের মাখন। বাঃ, এই রুইয়ের পেটি ভাজা পেলেন কোথায়, মিসেস চৌধুরী?

উনি প্রসন্ন হেসে বললেন,—না, রুই নয়। হোয়াইটিং মাছ। স্বাদ অনেকটা একরকম।

আর এ যে বেগুন দেখছি, বাঃ, চমৎকার বেগুন! মাশরুমের (ব্যাঙের ছাতা) চেয়ে ভালো।

হ্যাঁ, বেগুনই তো এটা। স্পেনের জিনিস। নাম ওবরজিন। বৃন্‌জাল ইংরেজি কথাটা ওই থেকেই এসেছে।

আদর্শ গৃহিণী আপনি। আহা, চৌধুরী সাহেব কি ভাগ্যবান্!

মন্তব্যটা অবশ্য ইচ্ছা করেই করলাম।

উনি সরমে পুলকিত হলেন কি? মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সরমের কোনও ছোপ না দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম,—কই, কর্তার নামে যে বড় ব্লাশ করলেন না?

হেসে জবাব দিলেন—ব্লাশ জিনিসটা যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন তার মেয়াদ ছিল কম। এখন ম্যাক্স ফ্যাক্টরের কল্যাণে সাঁঝ থেকে রাত ভোর তক জেগে থাকে মুখের উপর। সে জন্যেই আপনাদের নজরে পড়ে না।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম ওর রূপের ছটায়, কথার ঘটায়। বললাম--সত্যি, আপনি এত দিল-খোলা, এত সরল যে মুখের উপরই প্রশংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে! আচ্ছা, আপনিই বলুন না, এ দেশে মেয়েরা তো সব সময় সাজে-গোজে, কেন? শুধু পুরুষের নজর কুড়োতে? না, অন্য মেয়েদের হিংসা জাগাতে?

দুই-ই, দুই-ই মিস্টার রয়। আর তাছাড়া উপরিলাভ হয় আয়নায় নিজের হাসি।

আবার ওঁর হাসিমুখের দিকে তাকালাম। আর একবার ম্যান্টল-পীসের উপর রাখা দুখানা ছবির দিকে। কার জন্য মিসেস চৌধুরীর মুখের হাসি? কার বুকে জাগায় তা বেদনা? কার খুশির ছায়া পড়ে তার আয়নায়?

কিন্তু ভাবতে হল না। ক্রিং-ক্রিং করে আবার টেলিফোন বেজে উঠল। ওদিককার কথা অনেকখানিই শোনা যাচ্ছে। রেডিও টেলিফোন এসেছে। কলকাতা থেকে। মিস্টার চৌধুরী ডাকছেন।

শ্রীমতী চৌধুরী একবার আমার দিকে তাকালেন। একবার ম্যান্টল-পীসে ছবি দু খানার দিকে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু উনি আঙুল নেড়ে মানা করলেন। উনি করছেন এত ভদ্রতা, কিন্তু আমি অভদ্র হই কী করে?

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে যেন কিছুই শুনছি না এ রকম ভাব দেখিয়ে বইয়ের তাকগুলি দেখতে লাগলাম। খুব মনোযোগ দিয়ে। যেন পরীক্ষা-পাশের মন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কানে তো আর ছিপি দিয়ে রাখি নি!

হ্যাপি, মোস্ট হ্যাপি ক্রিসমাস টু ইউ ডার্লিং। আশা করি খুব ভালো আছ। ...

এখানে বরফ পড়ছে বটে। তবে তুমি ভেব না। না, না, তোমায় আসতে হবে না। ...

না, না, না। তোমায় ভালোবাসতে চাই বলেই কাছে চাই না। তুমি তো সবই বোঝ, সু। ..

প্লিজ, ভুল বুঝো না। তোমার দোহাই। আরেকজনের কথা তুলো না। তাতে আমার স্মৃতি ব্যথা পায়, তোমারও মনে ছায়া পড়ে। সে কথা এনোই না এর মধ্যে। একটু সময় দাও আমাকে, সু।...

ও, তোমার সঙ্গে তার মুখোমুখি কথা হয়েছে? তোমরা দুজনেই "সিলি ফুল" না হয়ে সহজ হয়ে চললে আমার পক্ষেও সহজ হয়, তা বোঝবার চেষ্টা কর, প্লিজ। আমার প্রতি অবুঝ হয়ো না। ..

হ্যাঁ, সেও রেডিও টেলিফোন করেছিল এই ঘণ্টাখানেক আগে। তোমাদের দুজনকেই বলছি, এসো না তোমরা এখানে। টেনো না আমাকে দেশে। তাতে এ জট আরও জড়িয়ে যাবে। আমায় দূরে থাকতে দাও, প্লিজ, প্লিজ...

তুমি তো সবই জানতে; আমিও কিছুই লুকোই নি। তবু যে তুমি আর আমি বিয়ে করেছি—এটাকে একটা মানসিক পরীক্ষা বলে ধরে নাও। আমায় সাহায্য কর এ পরীক্ষায় জয়ী হতে। অগ্নি-পরীক্ষায় জয়ী হতে। তোমাদের দু-জনেরই তাতে লাভ হবে। আমায় দূরে একা থাকতে দাও। ...

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় খুবই মনে পড়ছে। সে কথা মনে করেই আজ নিজের ঘরে বসে খিচুড়ি রাঁধলাম।..

ঠিক, ঠিক। কোনদিন সে ঘর শুধু আমার নিজের না-ও থাকতে পারে। কিন্তু তত দিন তোমরা দুজনেই আমায় একলা থাকতে দাও। তুমি ভুলো না ওর উপস্থিতির কথা। সেও যেন না ভোলে তোমার স্বামিত্বের কথা। ওঃ, ছ মিনিট হয়ে গেল। আচ্ছা, সো লঙ্। হ্যাপি ক্রিসমাস্!

সব চুপ হয়ে গেল। মিসেস চৌধুরী হ্যান্ড মাইক্রোফোন রিসিভারটা এমন ভাবে ধরে রইলেন, যেন হাতল নয়, কারও এগিয়ে দেওয়া হাতটিকে তিনি ধরে আছেন। না পারছেন রাখতে, না ছাড়তে।

আমি ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি ওই দুটি ছবির দিকে।

মিসেস চৌধুরীর একতরফা কথাগুলি শুনে অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারলাম। মহাসাগরের এপারে দাঁড়িয়ে এক নারী, বহু আকাঙ্ক্ষার ধন বরনারী! ওপার থেকে আকাশের মধ্যে দিয়ে তাকে ডাক দিচ্ছে দুজন পুরুষ। একজন প্রিয়, আর অন্যজন স্বামী কিন্তু অপ্রিয় নয়। শুধু তাই নয়, যে প্রিয় সে স্বামী আসার আগে থেকেই এই নারীর প্রিয়। এখনও তার দিগন্তে প্রিয়ের প্রেমের বর্ণচ্ছটা মিলিয়ে যায় নি। অথচ উদয় হয়েছে আরেকজনের প্রেম। সংসারের দাবি করে তুলেছে সে প্রেমকে জোরালো। যদিও স্বামী এখনও সংসারের সঙ্গে মিশে যায় নি। দুই সূর্যের উত্তাপ সইতে পারবে কী করে এক চাঁদিনী? কাজেই সে সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে সে আকাশ থেকে।

আহা!

মনে শুধু এই কথাটুকুই বলতে পারলাম। কিন্তু উচ্চারণ করবার সাহস নেই। এ সম্বন্ধে কোনও কথা তোলাও সভ্যতায় বাধবে। আস্তে আস্তে ছবি দুটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। যেন কিছুই শুনি নি, কিছুই ভাবি নি।

শ্রীমতীই প্রথম কথা কইলেন—ও হো, আমায় মাপ করবেন মি. রয়, ভুলেই গিয়েছিলাম যে ক্রিসমাস

পুডিংটা এখনও বাকি আছে। এ কি, বসুন বসুন। ওটা পাশের ঘর থেকে নিয়ে আসি।

পাশের ঘর বটে, কিন্তু যেন কত দূরে। ফিরে আসতে বেশ কিছু সময় লাগল। কিন্তু যখন এলেন, তখন তাঁর মুখে আবার পূর্ণচন্দ্র ফুটে উঠেছে।

কিছু বুঝতে বাকি রইল না। একেবারে যাকে বলে টিপিক্যাল সোসাইটি গার্ল। পাখনা-মেলা প্রজাপতি। এত সব নাকিসুরে প্রেমের কথা, দোটানার কথা অন্যকে অপরিচিতকে না শুনিয়ে বললে রস জমবে কেন? তা না হলে এর পরেও পাশের ঘরে গিয়ে মুখের চুনকামটুকু ঠিক সেরে নিয়ে এসেছে। পুডিং তো অছিলা মাত্র। এ ঘরেই এক পাশে ছিল।

ক্রিসমাস পুডিং-এর উপর নিয়মমাফিক একটুখানি 'রাম' মদ ঢালা ছিল। তাতে দেশলাই দিয়ে আগুন ধরানো হল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে শ্রীমতীর মুখে দেখতে লাগলাম আগুনের আলো।

আলো কিন্তু ফুলঝুরির মতো কথা ঝরাতে শুরু করল। আমাকে একেবারে ভাবতেই দিল না আলোর চারদিকে ঘেরা আঁধারের কথা, সংঘাতের কথা। তিনি বললেন—দেখুন তো, বড়দিনের জন্য কী রকম একটা বাজে পুডিং এদেশে তৈরি করে! অথচ কত সুন্দর স্বাদের পুডিং করা যায়!

আমারও তাই মনে হয়! এরা ট্রাডিশনকে, আবহমান কালের ধারাকে এত আঁকড়ে পড়ে থাকে!

আশ্চর্য, অথচ এরা সব চেয়ে বেশি উৎসাহী, নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কাব করছে।

হঠাৎ একটু লোভ হল কথার মোড় ঘোরাতে। এর জীবনের রহস্যের উপর যে ঘন অথচ লোভনীয় পর্দা টানা আছে তা একটু তুলে দেখতে কৌতূহল তো কম নয়। তাই বললাম—সেটা ঠিক। এদের আবিষ্কার হচ্ছে সব বাইরের জগতে। নিজের ঘরে, নিজের সংসারের মধ্যে কিন্তু ইংরেজ একেবারে রক্ষণশীল। ঘর এরা ভাঙবে, তবু ভাগাভাগি সহ্য করবে না।

কথা কোন্ খাতে বওয়াবার চেষ্টা করছি তা তিনি বুঝতে পারলেন। মিষ্টি হেসে বললেন—ওদেব সারা জীবনটাই হচ্ছে একটা একসপেরিমেন্ট, তত্ত্বের সন্ধান। ভাঙবার সাহস আর গড়বার ক্ষমতা ওদের মধ্যে পাশাপাশি পাবেন। এই দেখুন না...

বলতে বলতে কথার তোড়ে উনি আমায় কত রকমের রসাল কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেব বাইরের বিষয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। শুনতে শুনতে এমন এক জায়গায় এলাম, যখন উনি বললেন—আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের পুরুষদেব চোখে মেয়েদের কখন সবচেয়ে সুন্দর দেখায়?

ফস করে বললাম—যখন মেয়েরা হাসে, লজ্জা পায় অথবা চোখে জল এনে ফেলে!

আর তারও মধ্যে?

তারও মধ্যে বেশি, যখন তার চোখে থাকে জল আর মনে ভালোবাসা।

বলেই একবার ওঁর দিকে তাকালাম। একেবারে পুরোপুরি—যুদ্ধং দেহি ভাবে। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে আঘাত হানা, আক্রমণ করা। মন শক্ত করে নিলাম।

কিন্তু উনি সে আক্রমণকে মানলেন না। পাশ কাটিয়ে গিয়ে টিপ্পনী কাটলেন যে মেয়েদের চোখে তো জল আসে হামেশাই।

আমিও ছাড়লাম না, বললাম—তার কারণ মেয়েরা অস্ত্র চালাতে ওস্তাদ আর সর্বদাই লড়াই করতে প্রস্তুত।

কেন? মনের ভালোবাসা আব চোখের জলে আপনারা কোনও তফাত পান না বুঝি?

পাই বই কি মিসেস চৌধুরী! একটা হচ্ছে বালিকার সরল ঝরনা-ধারা, আরেকটা অভিজ্ঞতার সাগর। একটা হচ্ছে তাজা, মিষ্টি; অন্যটা অনেক দিনের জমানো, নোনতা।

বলে আড়চোখে একবার ছবি দুটোর দিকে তাকালাম।

মিসেস চৌধুরী লক্ষ্য করলেন, কিন্তু আমল দিলেন না। যেন কিছুই নেই আমার চাহনিতে। এ দিকে আমি এই দুটো টেলিফোনের কথাবার্তার রহস্য, তার ইতিহাস জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি। বার বার চেষ্টা করছি একজন সোসাইটি-গার্লের মনের উপর যে ঘোমটা টানা আছে তাকে তুলে ধরতে।

ইনি স্বচ্ছন্দে হেসে উঠলেন—বাঃ, বাঃ, মি. রয়, আপনার দেখি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদিও বয়স বোধ হয় কুড়ির কোঠা সবে পেরিয়েছে, কি পেরোয় নি!

গরম হয়ে প্রতিবাদ করলাম—দেখুন, আমি শিশু নই!

আরও বেশি হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন তিনি। হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে তিনি বললেন—সে কথাটা আপনার বান্ধবীদের জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। যদি অবশ্য আপনার সে কপাল হয়ে থাকে। তা স্বীকার করতেই হবে যে যৌবন তো বয়সের হিসেবে হয় না, হয় মনের মাপকাঠিতে।

ওঃ, মনে হচ্ছে আপনি ব্যারিস্টারি পড়ছেন। নিশ্চয়ই খুব সফল হবেন আপনি এ লাইনে।

না, আমি ইউনিভার্সিটিতে আর্ট পড়ছি।

এবার সুযোগ এল মোক্ষম ডেপথ্ চার্জ অর্থাৎ তলফোড় দেবার। দেখি শ্রীমতীর মনের সাগরে আমার এই বোমা কী তোলপাড় তোলে। বেশ ওজন করে, পুরোপুরি ওঁর দিকে তাকিয়ে, যেন ওঁকে বিশেষ লক্ষ্য করে বলছি এমন ভাবে বললাম—শিল্পকে ফোটাতে গেলে চাই প্রেম, আর প্রেম চায় যে শিল্প ফুটে উঠুক। আশা করি আপনার জীবনে দুইয়েরই আগমনী বেজে উঠেছে।

উনি কি টললেন তাতে? দিলেন কি মনের মণিকোঠার দরজা খুলে আমায় উঁকি মারতে? অথবা বেদনায় বিবশ হয়ে করলেন সহানুভূতির প্রত্যাশা?

শুধু বললেন, আরও উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘরকে সচকিত করে বললেন—আপনার যা অবস্থা দেখছি, তাতে শিগগির আপনার হৃদয়ে হিরোসিমার অ্যাটম বোমা ফেটে পড়বে। সময় থাকতে সাবধান হবেন, মি. রয়!

রাত অনেক হল। বাইরে এখনও বরফ পড়ছে। কিন্তু এত আদর-যত্নে এত খেয়ে পেট আর মন দুই-ই ভরে গেছে। শুধু এই রূপসীর মনে সত্যি কোনও টানাপোড়েন চলছে কি না, কোনও দুঃখ আছে কি না, তার গোপন রহস্যটা জানতে পারলাম না। সম্ভবত এই দুটো টেলিফোনই বড়লোক বন্ধু আর বড়লোক স্বামীর খেয়াল হবে। ওদের যখন দুঃখ থাকে না, অভাব থাকে না, তখন এমন করেই মনগড়া দুঃখ অতৃপ্তি বানিয়ে নিয়ে আর্টিস্টিক বেদনা উপভোগ করে। এই শ্রীমতী চৌধুরীও নিজের সৃষ্টি করা বেদনা বেশ রসিয়ে রসিয়ে আস্বাদ করছেন। আর্ট শিখছেন কিনা।

একেই বোধ হয় বলে সফিস্টিকেশন, অর্থাৎ কিনা সভ্যতার ভেজাল। আরে, যেতে দাও ওসব সখের খেয়াল। রূপ আর রুপোর বাসায় এরকম হয়েই থাকে।

মন থেকে মুছে নিলাম নিজের মনে বানানো দোটানার কথা। শুভরাত্রি আর ধন্যবাদ জানিয়ে, আবার এসে খেয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম—বরফের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে।

হঠাৎ খেয়াল হল উনি সামনের ঘরের দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করেন নি। হয়তো আর খেয়ালই করবেন না। খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই সেটা তাকে জানিয়ে আসবার জন্য ফিরে গেলাম। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখি, দরজাটা সত্যি বন্ধ হয় নি। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে সেকথা বলতে গেলাম।

উনি তখন ওই ছবি দুখানার সামনে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে আছেন। দু চোখে জলের ধারা। নিঃসাড় তন্ময় শ্রীমতী চৌধুরী!

আমি কী করব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে উনি খুব নিচু গলায় বললেন—আজ বড়দিনের রাত। আমাদের বিজয়া দশমীর মতো। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে হয়। তুমি এখন যাও, ভাই!

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম।

লভ নামে সেই বিলেতি জিনিসটা

গার্ডের শ্যামের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কামরার মধ্যে লাফিয়ে উঠল ছোকরা।

দরজাটা ভেতর থেকে পাকা ভাবে বন্ধ করেই দেহলতাখানা লাগেজের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা ভাবে খেলাতে খেলাতে বাথরুমের ভেতর গিয়ে ঢুকল। অবাক হয়ে কান পেতে শুনলাম যে ভেতর থেকে ছিটকিনি খানাও বন্ধ হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় এই লম্বা রাতের গাড়িতে আমরা দুজন মাত্র যাত্রী।

তাকালাম সামনের অচেনা যাত্রীটির দিকে। দেখি যে তারও চোখে সেই একই প্রশ্ন। অর্থাৎ কে বটে এই বখা গোছের চেহারার ছোকরা?

গুণ্ডা বা ডাকাত হওয়াই সম্ভব। অন্তত বিনা টিকিটের ওস্তাদ। না হলে যে ফার্স্ট ক্লাশ গাড়িতে মাত্র দুখানা বার্থ, আর দুখানাই দখলে, সেটাতে এমন ভাবে ঝটকা মেরে কেউ উঠে পড়ে? যদি বা শেষ মুহূর্তের হঠাৎ দরকারে উঠে পড়ে, সে কি মুখের কথাটি না খসিয়ে, সোজা বাথরুমে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেয়?

খুব পাকা ফন্দি করেই ঢুকেছে ছোকরা। হঠাৎ দরকারের কারবার নয় নিশ্চয়ই। সামনের ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হতে লাগল যে তিনি মনে মনে হিসেব করছেন লোকটার হাতের কাগজের প্যাকেটে কী হতে পারে—ছোরা, না রিভলভার।

ভদ্রলোকের উপরই আমার সবটা রাগ গিয়ে পড়ল। যেমন চেহারা, তেমনি চরিত্র। না, না, নৈতিক চরিত্র বলছি না। অন্তত পক্ষে যখন চেনা কোনও মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছি না, তখন ওর নৈতিক চরিত্র নিয়ে আমার কোনও মাথা-ব্যথা নেই। আমি ভাবছি ওঁর চরিত্র—অর্থাৎ কিনা ইংরাজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার, তার কথা।

কামরাখানাতে শুধু আমার নামেরই রিজার্ভেশন টিকিট লটকানো ছিল এতক্ষণ। তোফা নিশ্চিন্ত মনে টুকটুকে লাল রঙের উপর মিশ-কালো বর্ডার (পাড় বলবেন না দয়া করে—তাতে শাড়ি মনে হতে পারে) বসানো 'কসাক' পায়জামাখানা পরে নিশ্চিন্ত মনে চুরটটা ধরাব, এমন সময় হুড়মুড় করে কামরার ভেতরে হাজির হল তিন-তিন খানা চাপরাসী। তাদের পেছনে কমসে কম জনা তেরো কুলির ব্যাটালিয়ান আর কোন্ না কোন্ তেত্রিশ দফা মোট-ঘাট। একেবারে যাকে বলে কিনা মালবাহী গাড়ি। সবার পেছনে সশরীরে খোদ গার্ড আর তস্য আড়ালে পাণ্ডবকুলের মহাবীর অর্জুনের মতো হাতের বদলে গোঁফ জোড়াতে ধনুক চালানোর পোজ বাড়িয়ে আমার নয়নমণি এই ভদ্রলোক।

রেলেরই কেষ্ট-বিষ্টু কেউ হবেন। না হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে এত লটবহর নিয়ে কেউ ট্রেনে চড়ে না এই আক্রা রেলভাড়ার যুগে। খুব বিরস মুখে একবার মোট-ঘাটের দিকে, আর একবার তার মালিকের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কোন্‌টি যে বেশি সনাতন মার্কা তা বোঝা শক্ত।

বলা বাহুল্য যে দরজাটা বন্ধ করে দেয় নি কেউ। এমন কি এই ইনিও না—যদিও নিজের বাড়িতে এদের মতো মালবাহকরা সম্রাট শালীবাহনের ধন আগলাবার জন্য দরজার হুড়কোতে ফালতু তালা পর্যন্ত লাগিয়ে তবে ঘুমোতে গিয়ে থাকেন.

সত্যিই রেলের কেউকেটা। আমার হাল-ফ্যাসানের বিলিতি 'কসাক' পায়জামার মর্ম ভেদ করে এগিয়ে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, বেশ সাফ অথচ একটু টানা বাংলাতেই বললেন যে, লোকটার মতিগতি সুবিধের নয়। গুণ্ডা তো হবেই, ডাকাতও হতে পারে। ছোরা তো আছেই, রিভলভারও থাকতে পারে।

আড়চোখে ওঁর পোঁটলা-পুঁটলির দিকে তাকাচ্ছি দেখে ক্ষমা চাইবার সুরে বললেন—জানি, আমার এত মাল দেখেই বোধ হয় এই কামরাতেই ঢুকে পড়েছে, আর মালের জন্যেও দরজাটা বন্ধ করার সুবিধে ছিল না। সে যাই হোক, এখন কী হবে মশায়?

দিন না চেনটা টেনে! পরামর্শ দিলাম আমি।

আরে রাম রাম। আমি রেলের 'অফসার' হয়ে চেনটা টেনে দিই, আর এই ডাকু পকেট থেকে একটা টিকিট বের করে দেখিয়ে দিক। তখন আমার ইজ্জতটার কী হবে বলুন তো! আপনার সেই ব্লিৎস থেকে শুরু করে সব কাগজে বড়বড় হেড লাইন বের হবে আর আমার হেডটিও যাবে। প্রমোশন আর হবে না তাহলে কখনও।

ভয়ের চোটে ভদ্রলোক মরমের কথাখানি বের করে ফেলেছেন অজানতে।

হেসে বললাম—মশায়, প্রমোশন আগে, না প্রাণটা আগে?

সে কথা কানেই তুললেন না তিনি। খুব অনুনয় করে বললেন যে, আমরা দুজনেই যদি খুব হুঁশিয়ার হয়ে থাকি তাহলে একটা গুণ্ডা নিশ্চয়ই কিছু করতে সাহস পাবে না। বর্ধমানে ট্রেনটা থামলেই উনি গার্ডকে ওর টিকিট চেক করতে বলবেন আর অন্য কামরায় সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন। শুধু ততখানি সময় দুজনে সাবধান থাকতে হবে।

কিন্তু সময় যে আর কাটে না।

ছটফট করতে করতে ভদ্রলোক আমার বার্থে এসে বসে পড়লেন। ফিস ফিস করে ফাঁস করে

দিলেন—যদিও তার দরকার ছিল না—যে তিনি সত্যি সত্যিই রেলের একজন বড় অফিসার, আর তিনি অন্য সব রেলের যাত্রীদের কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছেন যে শুধু গার্ড নয়, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যে সিপাইরা যায়, একেবারে তাদের দিয়ে ছোকরাকে চেক করিয়ে তবে ছাড়বেন।

অর্থাৎ যেমন বুনো ওল বলে মনে হচ্ছে, তেমনই বাঘা তেঁতুলের বন্দোবস্ত তিনি করবেন। এখন বাছাধনকে শুধু বর্ধমান পর্যন্ত সামলাতে পারলেই হয়।

এমন সময় হঠাৎ বাথরুমের দরজাটা খুলে বেরিয়ে এল ছোকরা। ভদ্রলোকের হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনায় তাঁর বুকের ধড়ফড়ানি পাশে বসা আমার কানে ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে এসে পৌঁছল। ভুরু কুঁচকে কপালে উঠে গেছে দেখলাম।

তা যাবারই কথা। বাবরি ছাঁটের মাথা বংশীধারী ধাঁচে এক কোণে হেলে ছোকরা ভদ্রলোকের পাতা বিছানার উপর দিব্যি বসে চোখ আধ-বোজা করে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক চোখের কোনা দিয়ে আমায় যা বোঝাতে চাইলেন, তার অর্থ হচ্ছে যে—সাবধান, ওই সব কবি কবি পোজে ভুলবেন না। হঠাৎ হামলা করতে পারে।

ছোকরা আধ-খোলা চোখে তাকিয়েই রইল। আমাদের খুব কড়া ভাবে নজর রাখছে, না নিজের ভাবনায় ডুবে আছে বোঝা শক্ত। সবটাই বোধ হয় ওর ঢঙ—এমন কি ওর ফুলবাবু-মার্কা পাঞ্জাবির বুক পকেট থেকে যে নীলরঙের খামটা উঁকি মারছে ওটা পর্যন্ত।

এদিকে ভদ্রলোকের কপাল কুঁচকে একেবারে ত্রিশূল মেরে রয়েছে। যদি ছোকরা আগে ভাগেই একে সাবড়ে না ফেলে, তবে উনি যে বর্ধমানে ট্রেন এলেই ভয়ানক মারাত্মক রকম কিছু একটা করে বসবেন তাতে সন্দেহ রইল না।

বর্ধমানের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামতে ছোকরা কামরা থেকে লাফিয়ে পড়ল। ছুটে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা তরুণী মেয়ে। একেবারে জড়িয়ে ধরল ওর দু'হাত। এত রাতেও আশে পাশে যে লোক থাকতে পারে সেকথা ভুলে মেয়েটি প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল—ডার্লিং, ডার্লিং, তুমি এতদিনে এসে পৌঁছলে, ডার্লিং। ডার্লিং ডার্লিং শব্দ দূরেও যেতে লাগল। ভাবের আবেগে মেয়েটি বোধ হয় আর কিছুই বলতে পারছিল না।

এদিকে সহযাত্রী তো লম্ফঝম্প করে গার্ড, সিপাই সবাইকে জড়ো করে ফেলেছেন। মায় তিন-তিন জন সঙের মতন চাপরাসী পর্যন্ত। উত্তেজনায় ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন—ডাকু, চোট্টা, টিকিট চেক করো।

আরও বেশি উত্তেজনায় ওরা কাঁপতে কাঁপতে দাপাদাপি শুরু করে দিল— বাতাইয়ে হুজুর, ডাকু কিধর হ্যায়। কৌন্ হ্যায়।

আমাকেই না সন্দেহ করে বসে এরা।

কারণ এদিকে ভদ্রলোক চুপ করে গেছেন হঠাৎ। না কন কথা, না দেন জবাব। একেবারে চুপ।

শেষ পর্যন্ত আমতা আমতা করে বললেন,— সরি, আই অ্যাপলজাইজ, ভুল হয়েছিল।

আর কী সব বিড় বিড় করে বলতে বলতে তিনি মাথা নিচু করে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। শুধু একটা কথা বুঝতে পারলাম- -সেই বিলেতি জিনিসটা।

কী করব বুঝতে না পেরে সব দরজা জানালা দেখে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বসে পড়লাম। ভদ্রলোক ওপাশ ফিরে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছেন।

২

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল।

দেখি যে ট্রেনটা থেমে আছে। কোনও খোলা তেপান্তরে লাইন খারাপ হয়ে আছে দেখে ট্রেনটা চলছে না। এদিকে গরম লাগাতে ঘুম ভেঙে গেছে। সঙ্গী ভদ্রলোকও দেখি জেগে চুপচাপ বসে আছেন। একটুও ঘুমিয়ে ছিলেন বলে মনে হল না। ওর টিকিটি এখনও তেমনি পরিপাটিই রয়েছে দেখলাম।

মনে পড়ল—সেই তখন বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন। শুধু একটি বিলেতি জিনিসের কথা শুনতে পেয়েছিলাম। আর অমন তোড়জোড় করে সিপাই চাপরাসী জড়ো করে শেষ পর্যন্ত ছোকরাকে দাঁড় করিয়ে একটু জিজ্ঞাসাবাদও কেন করালেন না সেকথাও মনের মধ্যে ছিল। তাই এখন চেপে ধরলাম।

একটুখানি চুপ করে থেকে আমার সুটকেসের পাশে লটকানো লেবেলের উপর চোখ রেখে তিনি

আমায় পালটা প্রশ্ন করলেন—আপনি স্কটিশচার্চ কলেজে অমুক বছরে বি.এ. পড়তেন কি?

অস্বীকার করলাম না।

কিন্তু তার সঙ্গে আজ রাতের ব্যাপারটার সম্পর্ক কী?

সে কথা তিনি কানে তুললেন না। বললেন—আত্মারামকে মনে আছে আপনার?

একটু ভেবে নিতে হল। পরে মনে পড়ল। ওঃ, সেই যে—যাকে আমরা খাঁচু বলে ডাকতাম।

খাঁচু অর্থাৎ খাঁচাছাড়া। আত্মারাম ঝাঁকে এই আদরের ডাকনামে সবাই ডাকত। ওর যে বাপ-মায়ের দেওয়া একটা নাম ছিল সেটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তখনই ভুলে গিয়েছিলাম।

খাস কুমায়ুনের সনাতনপন্থী লোক। ভোরবেলা বড়বাজারের পাড়া থেকে রোজ হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতে হয়। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে। একাদশী, অমাবস্যা, চন্দ্রগ্রহণ এসব সর্বদাই লেগে আছে। পেঁয়াজটা পর্যন্ত ব্রজের আলু নামেও চলে না ওদের বাড়িতে।

এ হেন আত্মারামের এক দেশের এক আত্মা বন্ধু ছিল ব্রিজমোহন চতুর্বেদী। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল। এই সেই ব্রিজমোহনই নিশ্চয়। যাকে আমরা হাওড়া ব্রিজ ওরফে হাওড়া বলে ডাকতাম। ওদের মুলুকে ব্রজকে ব্রিজ বলে ডাকার রেওয়াজ আছে তা জানতাম না।

নিষ্ঠুরভাবে আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম যে দুই টিকিতে পর্যন্ত ওদের অভিন্ন থাকা উচিত। স্বামী-স্ত্রী তো নয় যে গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া যাবে। তাই নিদেনপক্ষে টিকিছড়া লুকিয়ে চুরিয়ে কোনরকমে বেঁধে দেওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছার অন্ত ছিল না।

কেবল দুজনের হিমালয়-মার্কা গড়ন-পেটন দেখেই আমাদের হাড্ডিসার টিঙটিঙে হাতগুলো এ হেন সাধু কাজে এগোতে সাহস পেত না।

সেই খাঁচু মারা গেছে থাইসিসে। সংক্ষেপে ঘোষণা করলেন ভদ্রলোক। থাইসিসে—লভ করে থাইসিসে মারা গেল।

লভের সঙ্গে থাইসিসের কী সম্বন্ধ বুঝলাম না। কলাকাতার বাঙালি পাড়াগুলোর গলিতে গলিতে যাদের যক্ষ্মায় ধরে, তারা যে সবাই প্রেমে পড়ে যক্ষ্মায় পড়ে এমন মনে করার তো কোনও কারণ নেই। উহুঃ বুকে কত বেদনা—বলে বুকে হাত দেওয়া আর কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরা তো এক জিনিস নয়।

চারদিকে রাতটা বড় গভীর হয়ে জমাট হয়ে ঘিরে এসেছে। আকাশে একটা তারাও জেগে নেই। খাঁচুর টিকি দোলানো কদমছাঁট-মার্কা গোলগাল মুখের মধ্যে যে সবোধ সরল চোখ জোড়া ভেসে থাকত তারাও মুদে গেছে।

কিন্তু এ হেন সুশীল সুবোধ, যাকে বলা যায় একেবারে নাবালক, তার এ রকম পরিণতি কেন হল তা জানতে খুব কৌতূহল হল। অথচ মনটা এত খারাপ লাগছে যে জিজ্ঞেস করতেও মন সরে না।

'লভ' আর যক্ষ্মা এ দুটোর কোনটাই ওই স্বাস্থ্যবান, বিবাহিত নিরীহ লোকটির সঙ্গে খাপ খায় না।

ব্রিজমোহনেরও মনে নিশ্চয়ই সেজন্য খুব ব্যথা হয়ে আছে। সেজন্যই বোধ হয় সেও ওই খবরটুকু দিয়েই চুপ করে রইল।

আমি আস্তে আস্তে তার বিছানায় এসে বসলাম।

সহানুভূতির এই সাড়াটুকু পেয়ে ওর মন যেন কান্নায় ভেঙে পড়ল। মেঘ যেমন করে ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ে।

আপনার কি খেয়াল আছে আমাদের সঙ্গে সেই যে মেয়েটি পড়ত? সেই যে শ্যামবর্ণ ছিমছাম চেহারা হাসিমুখ মেয়েটি!

মুশকিলে পড়লাম। বাঙালি মেয়ে কলেজে নতুন ঢুকেছে—এমন মেয়েদের প্রায় সবাই তো শ্যামবর্ণ, ছিমছাম হাসিমুখ হয়ে থাকে। তা দিয়ে কি আর লোক চেনা যায়? তার চেয়ে যদি বলতেন—খুব ফর্সা বা দাঁতউঁচু বা হাই হিল তাহলে না হয় সনাক্ত করা যেত।

কিন্তু কুমায়ুন পাহাড়ের ঘাঁটি আর্যরক্তের এই টকটকে ফর্সা ভদ্রলোকের কাছে এই বর্ণনাটুকুই যথেষ্ট। ওদের ঘরে ঘরে গৌরী মেয়েরা মুখে কোনও ভাব বা ইচ্ছার ছাপ ফুটিয়ে তোলা দরকার মনে করে না; চায় না বসনে ভূষণের সামান্য টুকিটাকিতে নিজেদের ফিটফাট করে ফুটিয়ে তুলতে। ওদের জগতে তাই একাকিনী কোনও শ্যামা বাঙালিনী অ্যাটম বোমার মতো চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদের নিজেদের মেয়েরা সেই

চোখ-ধাঁধানো আলোর সন্ধান জানে না।

ব্রিজমোহনের লটবহরের দিকে একচোখ নজর দিলেই বোঝা যাবে যে কোনও আধুনিকা বাঙালিনী তার স্বামীর বাক্স-বোচকা এমনভাবে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরবার মতো বন্দোবস্ত করত না! তার নিজে হাতে সাজানো মালপত্রের মধ্যে একটু হালের হালকা বিলেতি ছোঁয়া থাকত। থাকত দামী শতরঞ্জি মোড়া বিছানার বদলে একটা হোল্ড-অল; চকচকে পেতলের টিফিন ক্যারিয়ারের বদলে দ্বারিকের সন্দেশের বাক্স। আর নগদ তেত্রিশখানা মোটঘাট? নেভার, নেভার।

এ হেন ব্রিজমোহনের বন্ধু আত্মারাম ঝাঁ ঘরে ফর্সা ঘোমটা-পড়া কিশোরী বৌ রেখে কলেজে শ্যামলা আঁচল-দোলানো তরুণী সহপাঠিনীর দিকে তাকিয়ে থাকত।

কবিরা যুদ্ধ ঘোষণা করে লিখে গেছেন—"চোখের দেখা মুখের হাসি কে করেছে মানা?"

কথাটা মনে পড়ল। তাই সুবিধামাফিক ঝেড়ে দিলাম ব্রিজের উপর।

ব্রিজ কিন্তু আমল দিল না কবিতাটাকে। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র প্রায় খেপে উঠল। বলে উঠল—হ্যাঙ্গ্ ইয়োর বেঙ্গলী পোয়েট্রি। ওই করেই তোমরা গোল্লায় গেছ!

অবশ্য একমত হলাম। রসগোল্লার রস যারা পেয়েছে তারা রসের সন্ধানে গোল্লায় যেতে সব সময়ই তৈরি আছে। আর প্রেমের রস? ওরে বাবা সে যে একেবারে যাকে বলে কিনা আদিরস।

কাজেই মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কিন্তু সায় দিল না ব্রিজ। সে আত্মারামকে এই সর্বনাশা নেশা ছাড়াবার জন্য চেপে ধরল। চোখের নেশার চেয়ে বড় নেশা নাকি আর নেই।

একথা বলাতে আমাদের সেই সরল অবোধ নাবালক খাঁচু নাকি গুনগুনিয়ে উঠেছিল—'আঁখি মোর ঘুম না জানে।'

ব্রিজ তাকে খুব ভারিক্কি ভাবে সদুপদেশ দিল—ভাই, এসব আঁখকা কারবার ঘরানার সঙ্গে কর। ঘরও সুখে থাকবে, তুমিও শান্তি পাবে। তোমার ঘরে বৌ আছে, আত্মীয়স্বজন আছে। কলেজে-পড়া বাঙালি মেয়ে তোমাব দিকে তাকাবেও না। আর ওর দিকে তাকাবার মতো আছেই বা কী? কোথায় লাগে মানসী সেন পদমকুয়াঁরীর কাছে?

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল মানসী সেনকে। হ্যাঁ, আধুনিকা অবশ্যই। চলনে, বলনে, বসনে—সব কিছুতেই। কিন্তু ভেসে যাওয়া হালকা মেঘের মতো মেয়ে মানসী সেন খাঁচুর আত্মাকে শ্যামল করে তুলল কী করে?

ব্রিজ ওকে বুঝাবার চেষ্টা করল—ভাই, ওই মেঘবরণী মেয়ে শুধু মেঘ নয়, বিদ্যুৎও হানতে পারে. যদি টের পায় তোমার মনের কথা। তোমার কোনও লাভও হবে না, সুবিধাও হবে না। ও পথ ছাড়।

কিন্তু আত্মারাম কোনও কথাই শুনল না। নিজের মন যেদিকে টানছে সেদিকে সোজা এগিয়ে গেল। সে সব কথা আপনাকে বলবার সময় নেই। শুধু এটুকু বলছি যে ওর বাড়িতে ওর মনের এই বদলে যাওয়া প্রথম টের পেল ওর কিশোরী স্ত্রী।

ব্রিজের কথায় একটু বাধা দিলাম। বললাম—কেন, আমি অবশ্য বেশিদিন আপনাদের সঙ্গে পড়ি নি, কিন্তু খাঁচুকে যতটুকু দেখেছি তাতে তো মনে হয় না যে ও কারও মনে কষ্ট দিতে পারে। আর মুখ ফুটে মনের কথা বৌকে বলে বসবে এমন লোকই সে ছিল না।

তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু মুশকিল তো সেখানেই। যে যত কম কথা কয়, তার ব্যবহার তাকে তত বেশি ধরিয়ে দেয়। আর ওর মতো গম্ভীর প্রকৃতির লোক কাউকে যদি ভালোবাসে তাহলে একেবারে তাতে ডুবে যায়। নিজের কাছ থেকে স্বামী যে সরে যাচ্ছে তা ওর বৌ খুব সহজেই টের পেয়ে গেল। বিশ বছরের ছোকরা স্বামীর প্রেমে ভাটা পড়া বুঝতে পারা আর এমন শক্ত জিনিস কী?

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম—মানসী সেন কি খাঁচুকে কোনও সাড়া বা উৎসাহ দিয়েছিল?

বেশ খানিকটা ঝাঁঝ দিয়ে জবাব দিল ব্রিজ,—সেখানেই তো আরও বেশি মুশকিল হল। আপনাদের বাঙালি মেয়েদের মন বোঝা ভার। না হয় একটু সাড়াই দিয়ে দে না বাপু। তাহলে আত্মাও ঠাণ্ডা থাকে, ঘরও ঠিক থাকে। মানসী না হাতি। ও মেয়ে কোনদিন কারও মানসী থাকতে পারবে না। এক্‌কেবারে জাঁহাবাজ।

অর্থাৎ?

গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে ব্রিজ বলল—অর্থাৎ আপনারা যে বলেন, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' তাই। সাফ জবাব দিয়ে দিলে বরং কিছু হিল্লে হতে পারত! উলটে হেদোর পারে দু-এক চক্কর ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত, আর বেচারা তারপর আরও বেহুঁশ হয়ে যেত।

প্রতিবাদ করলাম আমি। বললাম—তাতে তো একটু টনিকের কাজই করবার কথা।

পুরুষ্টু গোঁফ জোড়ায় তা দিয়ে ব্রিজ বলল—তা আমার মতো লোকের বোধ হয় তাই হত। কিন্তু আত্মারাম শেলি কীটসের কবিতা একটু বেশি পড়েছিল। বিলিতি নভেলও পড়েছিল মন্দ না। তার উপর জুটল আপনাদের ওই রবি ঠাকুর।

তাতে লোকসান কী? প্রশ্ন করলাম আমি। সে তো একটু-আধটু আমরা সবাই কাঁচা বয়সে করে থাকি।

কিন্তু লভে তো পড়েন না! সেটাই যে ওর কাল হল। যখন থেকে বুঝতে আরম্ভ করল যে কোনও চান্সই নেই তখন থেকে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। শরীরের যত্ন করে না, ঘুমায় না। বাড়ির সবাই চাপাচাপি করলে চুপিচুপি গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। অমন ফর্সা লম্বা-চওড়া চেহারা কালো শুটকো হয়ে গেল।

গঙ্গার কথা তোলাতে একটু ঠাট্টা করার লোভ হল। প্রেমের ব্যাপারই এই। নিজে প্রেমে পড়লে হয়তো লোকে মারা যাবার দাখিল হয়; কিন্তু অন্যকে প্রেমে পড়তে দেখলে বড় মজা লাগে। আকণ্ঠ প্রেমে যে ডুবে গেছে তার পা ধরে টানাটানির মতো মুখরোচক জিনিস আর নেই।

তাই বললাম—পবিত্র গঙ্গার ঘাটে বসেও পবিত্র দাম্পত্য কর্তব্যের কথা মনে পড়ল না—আশ্চর্য তো!

ব্রিজের ততক্ষণে এসব ঠাট্টায় চটে উঠবার মতো মনের অবস্থা নেই। কথায় নজর না দিয়ে সে আত্মারামের অসহায় মনের অবস্থার কথা বলে চলল। সত্যিই অসহায় অবস্থা। সাধারণ জীবনে এমন ব্যাপার হয় না। কত লোকেই তো বিফল প্রেমে কষ্ট পায়, কত চোখের জল ফেলে, আবার তা মুছে নতুন করে হাসে। কিন্তু সিরিয়াস অথচ লাজুক লোকরা প্রেমে পড়লে সর্বনাশ।

বাড়ির লোকদের এ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ প্রায় অত্যাচারে দাঁড়াল। ঘন ঘন ব্রিজমোহনের ডাক পড়ে বন্ধুকে সমঝিয়ে সামলাবার চেষ্টা করবার জন্য। কলেজ থেকে নাম কাটাবার জন্য দরখাস্ততে সই করানো গেল না ওকে দিয়ে। টার্মের মধ্যে কোনও অজুহাতে চেঞ্জে নেওয়ানো গেল না। এমন কি শ্বশুরবাড়িও না। শেষ পর্যন্ত রাতে ঘুমাবার জন্য ও সংবে বৈঠকখানায় এসে আশ্রয় নিল।

বাধা দিয়ে বললাম—সে কি? এ রকম করে কি কারও মন ফিরে পাওয়া যায় নাকি? আপনারা এসব করলেন কী?

ব্রিজ বলল—আরে মশাই, আমরা বিলেতি ঢঙে মনের কারবার করলাম কখন যে এসব রোগের ঠিক দাওয়াই বাতলাতে পারব? আমাদের কোনও মেয়েকে নজরে ধরলে তার সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কি না সে খবর করি। জাতে কুলে যদি না মিলল তাহলে সুবিধা থাকলে আরও বেশি সুন্দর কোনও মেয়ের খবর করি। না হয় তাকে লোপাট করে নিয়ে আসা যায় কিনা ভেবে দেখি। তা বেটা ইংরেজদের রাজত্বে সে পথটাও বন্ধ।

তা আপনারা কী করলেন?

একদিন সবাই মিলে ধরে বেঁধে আমায় মানসী সেনের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। না, না, ঘটক করে নয়, ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে আত্মারামকে ছাড়াবার জন্য। আরে মশাই, আমারই আত্মারাম একেবারে যায় আর কি! এমন বেণী দুলিয়ে মা মনসার মতো তেড়ে এল মানসী।

তার পর?

তার পর মানসী ওকে দেখলেই ফেটে পড়ে। ও কিন্তু খুব মুষড়িয়ে পড়ল আরও বেশি। নিজেকে আরও বেশি কষ্ট দিতে লাগল। বলুন তো আপনি আমি হলে কি এ সব করতেন?

আপনি আমি কী করতাম সে প্রশ্ন এড়িয়ে আত্মারামের কথাতেই ফিরে যেতে চাইলাম। বিশেষ করে যখন ব্রিজের মতে সে আপনার আমার মতো বেরসিক না থেকে বিলেতি লভ করেছে।

ব্রিজের মাথায় রেলের সিগন্যালের মতো টিকিখানা এখনও উঁচু হয়ে আছে। এত বছর বড় চাকরি করেও নিচু বা লোপাট হবার কোনও লক্ষণ নেই। সম্ভবত সংস্কৃতটা ভালোই জানবে।

তাই ঝেড়ে দিলাম সংস্কৃত কাব্যের কথা। ওর বার বার বিলেতি লভের উপর জোর দেওয়াটা ভালো লাগছিল না। বললাম—আপনি যদি সংস্কৃত পড়েন তাতে কম প্রেমের কথা পাবেন। সেটা এমন কিছু

বিদেশীও নয়, নতুনও নয়। এই মনে করে দেখুন না, একজন মেয়ে কবি যেমন লিখেছিলেন যে, রেবা নদীর পরে বেতসী তরুর তলায় তার মনখানা দেওয়ানা হয়ে উঠেছিল।

তেড়ে জবাব দিল ব্রিজ। বলল—আরে সে কথা ছেড়ে দিন। যার জন্য কবির মন দেওয়ানা হয়েছিল সে যে তার কৌমার্য হরণ করেছিল। আত্মারাম বেচারার তো সে হিসাবে স্ত্রীর জন্যই দেওয়ানা হওয়া উচিত ছিল।

তোবা! তোবা!

একদিন সন্ধ্যা থেকে অঝোরে বর্ষা নামল। বড়বাজারের নিঃশ্বাস বন্ধ বাড়িগুলির দেয়ালগুলো পর্যন্ত সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে নিজেদের আনন্দ জানিয়ে দিল চারদিকে। ঘরে মনে মনে তৈরি বৌ পদমকুঁয়ারীর সমস্ত আকুতিকে ঠেলে ফেলে আত্মারাম তার সাজানো খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পরে বিকারের ঘোরে বকার মধ্যে যে রাস্তাটির নাম করেছিল তা থেকে বুঝেছিলাম যে সে মানসী সেনের বাড়ির সামনে পাগলার মতো ভিজে ভিজে ঘোরাফেরা করেছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে তাকে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম বাবুঘাটে। জোরে জ্বর এসেছে। তার তাড়সে বেচারা সিঁড়িতে ঠেস দিয়ে কোলে হাত রেখে বসে আছে। জপ করছে মনে করে সেই সকালে কোনও লোক তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে নি পর্যন্ত। জানতাম গঙ্গার ঘাটেই তাকে পাওয়া যাবে। মানুষের সব জ্বালা যেখানে জুড়োয়।

তার পরের ইতিহাস আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত নয়। ডবল নিমোনিয়া আর প্লুরিসি, প্লুরিসি থেকে থাইসিস—এসব তো আপনাদের বাঙালিদের ভালো করেই জানা আছে। তফাত শুধু এই যে আপনাদের ওই জিনিসটা এত গা-সওয়া হয়ে গেছে যে আপনাদের থাইসিস হয় লভে পড়ে নয়, অভাবে পড়ে, সেই অভাবকে দূর করবার চেষ্টা না করে।

কিন্তু এমন করে আত্মহত্যা করবার কী দরকার ছিল আত্মারামের? যাদের এদিকে সেদিকে প্রেমে পড়তে দেখি তাদের মধ্যে হঠাৎ এক-আধজন নিমেষের ভুলে লেকের জলে ডুবে বা অন্যভাবে আত্মহত্যা করে বটে। কিন্তু এভাবে দিনের পর দিন তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে মরার কথা তো কখনও শুনি নি। আপনি না বললে বিশ্বাসও করতাম না।

আমিই কী ছাই বিশ্বাস করতাম? কিন্তু ওই বিলেতি জিনিসটা এমন সাংঘাতিক যে যাকে একবার ধরে তাকে আর সহজে ছাড়ে না।

একটু শুধরে দিতে বাধ্য হলাম। বললাম—তা বোধ হয় ঠিক নয়। অনেকে ও রোগে বার বার পড়ে "ইম্‌মিউন" হয়ে যায়; রোগে আর কাবু করতে পারে না। কেউ কেউ আবার জিমনাস্টিক কসরত করে তা থেকে বহাল তবিয়তে বেরিয়েও আসে।

তা হলে সেটা খাঁটি মাল নয়। আমি চোখের সামনে দিনের পর দিন আত্মারামের মুখখানা দেখেছি। আমার বুঝতে কোনও ভুল হয় নি।

যাক আত্মারামের কাহিনি। বেদনার কথা, দুঃখের গল্প অন্তত নিশুতি রাতে আমি শুনতে চাই না। তাই জিজ্ঞেস করলাম—বর্ধমান স্টেশনে কেন আপনি সিপাই-শাস্ত্রির সামনে অমনভাবে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সেই বিলেতি জিনিসটার দোহাই দিলেন?

কিন্তু কোনও সাড়া দিলেন না ভদ্রলোক। ধরাও দিলেন না। খালি আস্তে আস্তে সুজনীটা গায়ের উপর ভালো করে টেনে নিয়ে বললেন—মেয়েটির মুখখানা দেখেই বুঝতে পেরেছি। ওকেও ওই বিলেতি রোগে ধরেছে।

সোহো

সোহো। অর্থাৎ যাকে বলে কি না বোহেমিয়ানদের স্বর্গ।

ভেবে দেখুন ব্যাপারখানা। সেই সোহোতে এসে হাজির হয়েছি আমি। এত সব রকম লোক থাকতে আমা হেন রেস্‌পেক্‌টেবল অর্থাৎ মানী ভদ্রস্থ বৃদ্ধই কিনা এসেছে সেখানে! প্যারিসেও নাকি মোমার্তর কী ওই রকম নামের একটা পাড়া আছে। সেখানেও এইসব আজব চীজদের সন্ধান মিলবে বলে খবর পেয়েছি।

কিন্তু আমি তো আর ফরাসি ভাষা জানি না। বুঝি না ওদের কথাগুলোর মধ্যে অত ঢঙ করে হঠাৎ হঠাৎ 'দন্ত্য-স দন্ত্য-ন'গুলো বেমালুম লোপাট করে দেওয়া। যারা কথাবার্তার মধ্যেই এমন সব ছলাকলা ছড়িয়ে রেখেছে, তাদের কাজ-কারবারই আলাদা। সেখানে যেতে ভরসা পাই না। তাই ভাবলুম একবার সোহোতেই না হয় ঘুরে আসি। হাতে-নাতে দেখে যাই বোহেমিয়ান বস্তুটা কী রকম। গিন্নির অর্ডার আছে।

যাকে তাকে আবার শুধোনো যায় না। কি না-জানি ভেবে বসবে। তাই চারদিকে তাকিয়ে একটু একলা পেয়ে হাই কমিশনারের অফিসের বুড়ো লিফ্টম্যান সাহেবটিকেই জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাসনাটা খোলাখুলি নিবেদন করলাম। ঠিকানা বাতলাবার সময় বুড়ো একটু তেরছা ভাবে হেসেছিল।

তা অমন কত মেমসাহেবও তো আমার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে একটু-আধটু ফিক করে হাসে। যত বয়স কম, হাসির রকমফেরও তত বেশি।

মানে, ভারী বজরার চেয়ে পানসীই তো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খায় বেশি।

তা বাপু, আমার মতে অত-শততে কী কাজ? অবশ্য এই তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকার কাছাকাছি সময়ে প্রথম বিলেতে এলাম। কিন্তু বয়সটা পড়তির মুখে হলেও লোহার কারবারটা খুব উঠতি। কাজেই দেশটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখব না? অবশ্যি খরচাটা বড্ড বেশি আর শীতও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তবু ছেলেমেয়েগুলো ওভারকোট কমর্ফটার না পরে কেমন বেগে দৌড়াদৌড়ি করে, ঘোরাঘুরি করে—বুঝতেই পারি না। মেয়েগুলোর আবার না লাগে শীত, না লজ্জা।

তাই দেখছিলাম বসে বসে। একটা ছোট্ট দেখে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিলাম। প্রথমে ছোট্ট দিয়েই শুরু করা যাক। ব্যাপারটা বুঝে রাতে গিন্নিকে চিঠি লিখতে হবে। ওরই এ সবে সখ একটু বেশি কি না। সব জানাতে হবে, মায় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা বইয়ে পড়া সোহোর কাহিনি পর্যন্ত। না হলে আমি আর এই বয়সে...

বছর পঁয়ত্রিশের এক ছোকরা, আমাদের দেশেরই নিশ্চয়, রেস্তোরাঁয় ঢুকেই আমার দিকে এক চোখ তাকিয়ে নিল। কেন রে বাবা, আমার দিকে তুমি কেন? চেহারাতেই তো মালুম দিচ্ছে আমি তোমারই দেশের লোক। মিছে কেন নজর দিয়ে আমায় জেরা শুরু করেছ?

পাশের টেবিলটায় বসে ওয়েট্রেসকে খুব গম্ভীরভাবে অর্ডার দিতে শুরু করল। চাই বয়েল্ড এগ্‌স,—এত কড়া সিদ্ধ যে হাতুড়ি ঠুকে ভাঙতে হবে। চাই কড়কড়ে টোস্ট—ভাজতে ভাজতে রঙ কালো হয়ে গেছে, আর তার সঙ্গে জলো চা।

আমি তো অবাক! হরি, হরি! ছোকরা বলে কী? দিন-দুপুরেই শুরু করে এসেছে না কি? লাল পানির পরে চায় বোধহয় জলো চা! কোনও নয়া রসিকতা হবে বোধ হয়।

ওয়েট্রেসও একেবারে হাঁ। মুখে পেন্সিল গুঁজে একটুখানি তাকাল। তার পর হেসে ফেলে বলল—আজ বিকেলে রোদ উঠি উঠি করছে। বসন্তকাল এই এসে পড়ল বলে, না স্যার?

ছোকরা, মানে আমার দেশের এই খদ্দের, গলায় টাইয়ের বদলে বেঁধেছিল হালফ্যাসানের একটা রেশমী চৌকো রুমাল। তার ফাঁস আরও একটু টানতে টানতে সংক্ষেপে শুধু বলল,—আমি ঠিক এই রকমই চাই। এক্কেবারে এইরকম, বুঝলে?

ইয়েস স্যার! বলে ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়েটা চলে গেল। ছোকরা ইয়া লম্বা একটা পাইপ বের করে তাতে ধোঁয়া ফুঁকতে লাগল। যেন বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিচ্ছে। একটু নজর রাখলাম।

ওয়েট্রেস ট্রে থেকে অর্ডার-মাফিক জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখল। ঠোঁটের উপর চেপে রাখল একটু মুচকি হাসি। তারপর মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে বলল—আরও কিছু, স্যার?

হ্যাঁ, এইবার সামনের চেয়ারটা টেনে বসো। বসে খুব কষে আমায় কথা শোনাও। প্রাণ ভরে। একেবারে যা খুশি মনে আসছে।

মেয়েটা দিশেহারা হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে পেন্সিলটা আবার মুখে গুঁজে দিল।

বুঝলে না, মিস! আমি একটু আগাম রিহার্সাল দিয়ে নিতে চাই। সেজন্যেই অনুরোধ করছি।

খদ্দেরকে খুশি করাই ওদের নিয়ম। চোখ-মুখ ভার করে কাজ করলে ওদের দেশে চলে না। মেয়েটা হেসে বলল—ওঃ, আপনি বুঝি হলিউডের কোনও ফিল্ম স্টারের সঙ্গে সংসার করবেন ভাবছেন, স্যার? হাউ

ফানি!

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে ছোকরা বলল—না, না। আমি গত যুদ্ধে লড়েছি এবং এখন হাতে অনেক কাজ। আবার দ্বিতীয়বার যুদ্ধে নামা আমার পোষাবে না।

ঠিক বলেছেন: অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো কথা। তবে বোধ হয় আপনি এই প্রথম নিজে ফ্ল্যাট চালাবার বন্দোবস্ত করেছেন—তার রিহার্সাল দিচ্ছেন!

বলতে বলতে মেয়েটা হেসে গড়িয়ে গেল। কিন্তু আরও অনেক খদ্দের চারদিকে আছে। যেন তাদের পরিবেশন করতে হবে এমন একটা ভাব দেখিয়ে মাথার সাদা লেসের টুপিটা এঁটে বসাতে বসাতে সে সরে গেল।

কিন্তু এই তো একটা জলজ্যান্ত নাটক আমার পাশে বসে আছে। একে একটু বাজিয়ে দেখলে মন্দ হয় না! মুখে তো বেশ একটু ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-গোঁফের চাষবাস চালাচ্ছে। ইনটেলেকচুয়াল সাজতে চায় বোধ হয়। তা হোক, সোহোর পর্দা তুলে ধরবে নিশ্চয়ই আমার জন্যে। গিন্নির অর্ডারের কথা মনে করে একটু সাহস পেলাম।

'একসকিউজ মি' বলে ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম। নতুন এদেশে এসেছি, আমারই দেশের লোক যখন, একটু সাহায্য করলে এদেশের গোপন হৃদয়টুকুর পথ দেখালে অনেক কৃতজ্ঞ হব, ইত্যাদি মামুলি গৎ ঝেড়ে গেলাম। ছোকরা এবার তাজা চায়ের অর্ডার দিল।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে দুজনে সোহোর রাস্তা দিয়ে চলেছি। পঁয়ত্রিশ আর পঞ্চান্নতে বেশ ভাব হয়ে গেছে—ওর গলায় রেশমী রুমাল আর আমার পট্টুর কমফর্টারের তফাত সত্ত্বেও। সিন্‌হা আমায় তার সোহোর ক্লাবে নেমন্তন্ন করেছে। পর্দা তুলে বোহেমিয়ার মনের ছবি দেখাবে।

আরও আধ ঘণ্টা পরে সিন্‌হা কিন্তু একটু রঙিন হয়ে উঠল। ওর ক্লাবটার আবহাওয়াতে এমনিতেই বেশ একটা আমেজ আছে। রাস্তা থেকেই মাটির নিচে 'বেসমেন্টে' নেমে যাবার সিঁড়ি; কাঠের সিঁড়ি, কার্পেট পর্যন্ত নেই! ওপরে পাকিয়ে পাকিয়ে ব্রোঞ্জের অক্ষরে নাম লেখা—দি কেভ। গুহাই বটে। সরু দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকেই একটি 'বার' অর্থাৎ মদের কারবার। সামনের কাউন্টারটা কাঠের নয়, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি। আমাদের দেশের ঢেউ-টিনের মতো ঢেউ তোলা ভাব দেখে বেশ মজা লাগল! ঘরের দেওয়ালে ওয়াল-পেপারের বদলে এবড়ো-খেবড়ো কাঠের এলোমেলো প্যানেল। বসবার চেয়ারগুলোর সিট হরেক রকমের রঙিন রশির আর টেবিলগুলো সিঙ্গাপুরী বেতের। বাতিগুলো বিজলীর কি মোমের বোঝাই যায় না। মোট কথা, ওগুলো বালব হলেও মোমবাতির চেহারা; তা-ও লাল ঘোমটায় ঢাকা।

পঞ্চান্ন থেকে এক ধাক্কায় কুড়িটা বছর খসিয়ে ফেললাম।

সিন্‌হা শুধু 'ওয়াইন' খায়, 'লিকার' খায় না। অর্থাৎ পান করে, কিন্তু নেশা করে না। কেন? যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে স্কচ-হুইস্কির সন্ধান করতে গিয়ে জার্মানদের হাতে প্রায় ধরা পড়েছিল একবার। সেই থেকে দিব্যি গেলে লিকার ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য নিজেই একটু হেসে টিপ্পনী কাটল—ফরাসি সুরার রসের পরে কি আর হুইস্কি জিভে লাগে?

আমি নিজে অবশ্য ও দুটি রসেই বঞ্চিত। একটু অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলাম—মিথ্যে বলছেন না তো?

হো-হো করে অট্টহাসিতে সে ফেটে পড়ল। বলল—মিথ্যে কথা? মাই ফুট! অবশ্য মিথ্যে কথা শুধু আমার মতো ইনটেলেকচুয়ালদেরই বলবার অধিকার আছে।

ভ্যাঁ রুজ অর্থাৎ ফরাসি লাল মদে আরেকটা চুমুক দিয়ে সে বলল—আছে আপনার হিম্মত মিথ্যের বেসাতী করবার?

আমি অবশ্য আর ঘাবড়াই না এসব প্রশ্নে। শুধু বললাম—স্বর্গ-নরক এ সব তো আছে!

হ্যাঁ, আছে হয়তো। কিন্তু স্বর্গ হচ্ছে দেবতাতে ভর্তি। আমি একটু নিরিবিলি জায়গা চাই।

গলায় বেশ একটু ঘনিষ্ঠ সুর টেনে শুধোলাম—তা হলে নরক?

মুখ থেকে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল—নোঃ। ওটা বড্ড প্রলেটারিয়াট। আমি হচ্ছি একজন ইনটেলেকচুয়াল।

ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ঠিক এই জায়গাটাই তাহলে আইডিয়াল, কী বলেন?

এদিকে আমার নজর ততক্ষণে তেরছা হয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। একটি ছিমছাম তরুণী এসে ঘরে ঢুকল। কাঁচা-ডাঁসা পেয়ারার মতো। তার চারদিকে চট করে মৌচাক গড়ে গেল।

সিন্‌হার মুখে কিছুই আটকায় না। চট করে বলে বসল—কী দেখছেন? মেয়েটার দেহের সরলরেখাগুলো ফিগারে পরিণত হয়েছে কিনা তাই দেখছেন তো?

লজ্জা পেয়ে গেলাম। এই বয়সে...থাক, ওসব রস-কষে আমার মতি নেই। শুধু নেহাত গিন্নির খেয়াল মেটাতেই না এখানে এসেছি। তবু বললাম, ওর বয়স আর মনের কথা কোনটাই তো লুকোনো নেই।

ওয়াইন-গ্লাসটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে সিন্‌হা হাসল—তা দেখুন, বয়স লেখা থাকে দেহে, আর মনের কথা ছাপা থাকে চোখে। বেচারা কী করে ও দুটো লুকোবে বলুন?

বলেই তার ফ্রেঞ্চকাট মুখটা আমার দিকে অনেকটা এগিয়ে দিল। বড় কেমন কেমন লাগতে লাগল। বেসামাল হয়ে পড়ে নি তো? ওর ওয়াইনগুলো আবার "অন মি" চলছে। অর্থাৎ মদের দক্ষিণা আমিই গুনছি।

—কিন্তু, কিন্তু,—খুব চাপা গলায় ফিস-ফিস করে সিন্‌হা বলল—কিন্তু, কিন্তু আমার সবকিছু লুকানো হয়ে গেছে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।

ওর গলার সুরটা যেন একটু-একটু ভেজা। আজকাল ইউরোপে যে কথাটা সবচেয়ে বেশি লোকের মুখে মুখে আলোচনা হচ্ছে, তার নাম একজিস্টেনসিয়ালিজম অর্থাৎ বেঁচে থাকা। মানে, থোড়-বড়ি-খাড়া খেয়ে দেহরক্ষা নয়; সবকিছু দায়িত্ব এড়িয়ে গায়ে দিব্যি ফুর্তির হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো। যত অকাণ্ড কুকাণ্ডের সাফাই গাইবার জন্য সুবিধামাফিক দর্শনতত্ত্ব। মোট কথা জীবনটাকে বেশ একটা মৌতাতী আমেজে ভরে রাখা যায়। আদ্রে জিদ্, জ্যাঁ পল সার্তর এদের সব দোহাই দিয়ে যা কিছু করা যায়। নিজেদের বেলেল্লাপনা ঢাকবার জন্য মন্ত্রগুরুর অভাব নেই।

ব্যাপারটা অবশ্য ঠিক বুঝি না! আর বুঝতে পারার মোকাই বা পেলাম কোথায় আমাদের এই সচ্চরিত্র দেশে?

তাই একে একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। বললাম, বেশ ঘনিষ্ঠ সুরেই বললাম, —কেন? আপনি নিশ্চয়ই একজিস্‌টেন্‌সিয়াল জীবনের রসটুকু পেয়েছেন!

গলার রুমালটা নাড়তে নাড়তে সে বলল—রস? রসেই তো আমি ভরপুর থাকতে চাই। কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন যে লোকে বুড়ো হয় নিজের বয়স দিয়ে নয়, স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

আহা! সে তো বড় দুঃখের কথা। আপনার স্ত্রী বুঝি—

না-না, আমাকে এখনও স্ত্রীর সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় নি। কিন্তু এবার রেহাই নেই! আমার পিতৃদেব এর পরের হপ্তাতেই এদেশে হাজির হচ্ছেন। নোটিশ দিয়েছেন যে সঙ্গে করে পাকড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং নিজের পছন্দ-করা একটি সুশীল সুবোধ বালিকার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেবেন।

সে কি কথা। আপনার তো বয়স কম হয় নি! বাবাকে বুঝিয়ে লিখলেই পারেন।

তা কসুর করি নি। কিন্তু এত বছর পরে মনে হচ্ছে যে আর বাবা-মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

আমিও একটু ভেতরে ভেতরে জমে উঠেছিলাম। হেসে বললাম—তা এই বেলাতে সবাই তো সুবোধ সুশীল বালক সেজে যায়! আর তাতে সুবিধেও খুব। তাছাড়া আপনার স্ত্রী বোধ হয় দেখতে সুন্দরী হবেন!

সিন্‌হা উল্লসিত হল না। বরং উলটো। বলল—জোর করে গছিয়ে দেওয়া স্ত্রী যে কত দুঃখের ব্যাপার, তা আপনারা বুঝবেন না! সেই দুঃখের জন্য আমার মনে ভয়ানক দাগ কেটে গেছে।

ওঃ। না দেখুন, মদ নাকি খুব ভালো করে দাগ উঠিয়ে দেয়। পেট্রলের চেয়ে বেশি পরিষ্কার করে দেয়।

বুঝলাম এর মনে একটা বিশেষ ঝড় চলেছে। সেটা বুঝতে হবে। তাই নিজে উঠে গিয়ে 'বার থেকে আরও এক গ্লাস মদ নিয়ে এলাম ওর জন্য। বুকে আমার দুঃসাহস কম গজায় নি।

ততক্ষণ ওর মনে জোয়ার এসে গেছে। মুখে ফুটেছে কথা। ১৯৪৩ সন থেকে যখন ফ্রান্সে স্বদেশ-প্রেমিকদের দল লুকিয়ে-চুরিয়ে হিটলারের সৈন্যদের উপর হামলা করতে শুরু করল, সারা পৃথিবী হাততালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করতে লাগল। বিলেতেও অনেক ছোকরা ওইরকম বেপরোয়া বাহাদুরি করে হাততালি পাবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠল। জীবনটা যখন খোলামকুচি, ওটাকে অমন করেই ব্যবহার করলে লোকসান কী?

সিন্‌হাও একটা ডিঙি নৌকোয় মাইল চল্লিশেক সমুদ্র পেরিয়ে লুকিয়ে ফ্রান্সে কোনও আঘাটায় গিয়ে উঠল। সেখান থেকে গেঁয়ো চাষী সেজে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ফ্রান্সের কোনও জংলা জায়গায় "মাকি" (maquis)-দের দলে ঢোকার কাহিনির মধ্যে এক ফোঁটাও ভেজাল নেই। এখনও ওর সারা গায়ে তার বহু চিহ্ন, মনে অনেক ঝড়।

ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি অনেক রকম লোকই 'মাকি'দের দলে ছিল। পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে, গাছের গুড়ির তলায়, আঙুরলতার আড়ালে, কত জায়গাতেই না ওঁদের লুকিয়ে থাকতে হত দিনের পর দিন। ম্যাঞ্চেস্টারে বয়নশিল্পের ছাত্র, বাংলা দেশের বড় ঘরের ছেলে, বাইশ বছরের সিংহের অদৃষ্টে কি অঘটনই না বুনে দিল এই যুদ্ধ।

আমাদের দেশের ভালো ঘরের ছেলে গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য উঁচু নজর আর পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে। কিন্তু যাদের জীবনের কোনও দাম নেই, তাদের মনেরও নেই বাঁধন। হয়তো আজই নাৎসিদের গুলিতে ডেড মাটন (মরা পাঁঠা) হয়ে যাব, হয়তো হাতের কাছের গাছটা থেকেই লাস হয়ে ঝুলতে থাকব। তার চেয়ে ভীষণ কথা—হয়তো কোনও বোমা বা গ্রিনেডের ঘায়ে আধখানা শরীর উড়ে যাবে ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মতো। এমন অবস্থায় বাঁচা-মরা সাধু-অসৎ সব কিছুরই মানে বদলিয়ে যায়! চোখের সামনে কত মৃত্যু, মৃত্যুর চেয়ে বেশি কষ্টে প্রাণটুকু নিয়ে টিকে থাকা এসব ঘটতে লাগল। মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'মাকি'রা অমৃত আস্বাদ করল।

শুধু অমৃত নয়, অমৃতের মতো মধুর জীবনের বিষও। অনেকের চরিত্রের বাঁধনও গেল আলগা হয়ে। এমনিতে ইয়োরোপে চরিত্রের মানদণ্ড আলাদা! তার ওপর সমাজের বালাই যেখানে নেই, সেখানে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেই বা কে? সিন্‌হা তার চার পাশের মরণ-পণ করা ছেলে-মেয়েদের জীবনের এই দিকটা একেবারে উপেক্ষা করে গেল। বে-সামরিক বাঙালি জীবেন মৃত্যু, না হয় মহিমা—এই তার ধ্রুবতারা।

এক দিন সমস্ত তল্লাটটা নাৎসি সৈন্যরা ঘেরাও করে ফেলল। গ্রামগুলিকে কড়া ভাবে বাছাই করতে লাগল—যেন ছাঁকনি দিয়ে দুধ ছাঁকা হচ্ছে। জার্মানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে এমন সন্দেহ করলেই সরের মতো তাদের তুলে নেবে আর ছারপোকার মতো টিপে মেরে ফেলবে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জায়গা নেই। সেখানে আবার খেতে দিতে হয়। তার চেয়ে গাছ থেকে ঝুলিয়ে দিলে, নিখরচায় যে শুধু মরে তা নয়, সেই লাসটা দিয়ে আর সবাইকে শিক্ষাও দেওয়া হয়। দলে দলে লোক জার্মান-জালে ধরা পড়ে মরতে লাগল। কিন্তু আসল যোদ্ধারা তো সবাই পাহাড়ে-জঙ্গলে।

মাকিরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাই একমাত্র উপায় হল একটা ডাইভার্সন করা অর্থাৎ অন্য কোনদিকে এমন একটা কিছু করা যাতে নাৎসিরা এই তল্লাট ছেড়ে অন্য দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়। অতএব কয়েক মাইল দূরে একটা সাঁকো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু ফিউজ তার নেই। এবং সাঁকোতে আছে পাহারা। অতএব যারা যাবে তারা আর ফিরবে না। এদিকে সবাই যেতে তৈরি। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল মরবার অধিকার নিয়ে।

লটারি করে নাম উঠল সিন্‌হা আর জিনের! জিন খুব সাহসী আর কাজের মেয়ে, কিন্তু চেহারাটিতে তার সৃষ্টিকর্তার হৃদয়হীনতা বড় বেশি ফুটে উঠেছে। এই এত দিনে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। সেও নিজের অবস্থা বুঝেই হোক আর রক্ষণশীল ফরাসি পরিবারের মেয়ে বলেই হোক, কোন রকম যৌবন চঞ্চলতার ধার-কাছ দিয়েও যায় নি। এখন অভিসারে চলল একজন যুবক আর একজন যুবতী! পরস্পরের সঙ্গে নয়; মৃত্যুর সঙ্গে।

শেযরাতের অন্ধকারে সাঁকোর উপর যেতে হবে। ওরা সন্ধ্যা থেকে একটা খড়ের গাদায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। একটুখানি ফাঁক করে ঢুকে সেখানে দুজনে—প্রায় সারা রাত গায়ে গায়ে লেপটে কাটাতে হবে একসঙ্গে।

গভীর রাতে সিনহা জিনের যৌবন-চঞ্চলতার উত্তাপ অনুভব করল। জিন তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। মুখে নেই ভাষা, কিন্তু সারা দেহে তার প্রকাশ। সারারাত্রি ভরা সে বাণীতে।

সিন্‌হা বাধা দিল—জিন, জিন, ছিঃ। আমাদের সামনে কর্তব্য আছে। মোটে মিনিট চল্লিশেক বাকি।

তার নীরব উত্তর জিন দিল মুখ দিয়ে।

না, না, জিন! দূরে সরে যাও, সরে যাও অনুগ্রহ করে। আজ একটুও অন্য দিকে মন গেলে কর্তব্য নষ্ট হতে পারে। ভেবে দেখ, তোমার দেশ।

তার উত্তরে জিন মুখ দিয়ে কি যে অস্ফুট আওয়াজ করল তা বোঝা গেল না কিন্তু সে যে বারণ মানছে না সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

জিন, সিল্ ভুপ্লে, যদি অনুগ্রহ করে সামনের কাজটার দিকে পুরো মন দাও। এখন অন্য কিছু ভাবা যায় না। জিন, জিন, তোমার...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জিন পাগলিনী বাঘিনীর মতো রুখে উঠল—কী? আমার কী? আমার চেহারা পছন্দ হয় না, এই তো?

বেঁচে গেল সিন্হা। জিনের রাগের সুবিধা নিয়ে সে বললে—হ্যাঁ, তোমার চেহারাখানা ভেবে দেখ একবার। মুখটা তোবড়ানো, দুটো চোখের রং দু রকম, নাকটা রিভলভার ছুঁড়বার জন্য এগিয়ে তেড়ে আসছে।

জিন সত্যি সত্যি এবার ক্ষেপে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। ওর রিভলভারটা, নাকের নয়, হাতের রিভলবারটা যেন সিন্হার গায়ের উপর কোথায় সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। সিন্হা এবার তার শেষ অস্ত্র বের করল নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

জানো জিন, তোমায় যখনই দেখি, তোমার চেহারাটা মনে হয় মডার্ন ফরাসি আর্টের সেরা নমুনা। ঠিক যেন পিকাসোর আঁকা। হো, হো, হো।

বারণে যা হয় নি, দেশের দোহাইয়ে যা হয় নি, এই বিদ্রূপে তা হঠাৎ হয়ে গেল। জিন, বেচারি কুরূপা জিন, দু হাতে মুখ বুজে খড়ের গাদার মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আওয়াজ হলে বিপদ, খড়ে নাড়াচাড়া পড়লে বিপদ। সব দিক দিয়ে নিরুদ্ধ রোদনের সে কি বেদনা!

কিন্তু জিনকে এরকমভাবে কেঁদে সারা হয়ে যেতে দিলে চলবে না। ওর মনকে শক্ত করিয়ে নিতে হবে। সামনে নিষ্ঠুর কর্তব্য। হয় মৃত্যু—না হয় মহিমা।

সিন্হা ভেবে-চিন্তে ঠিক করল যে জিনের সঙ্গে এ ব্যাপারটা আলোচনা করেই ওকে শান্ত করতে হবে। তাই তাকে বুঝিয়ে বলল—ভেবে দেখ জিন, আমি ইন্ডিয়ার লোক, হিন্দু। স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক সম্বন্ধ আমাদের কাছে পাপ। আমাদের দেশে বাপ-মা বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে দেয়। ভাবী স্বামী-স্ত্রী বড়জোর বিয়ের আগে পরস্পরকে একটু দেখে নিল! কিন্তু কোনও দৈহিক সম্বন্ধ নেই। ভেবে দেখ, আমি কি তোমার অসম্মান করতে পারি।

জিন অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল—সে কি সাংঘাতিক কথা! চেনা নেই, শোনা নেই, বাপ-মা নিজেদের পছন্দ মতো বর-কনে ঠিক করে দিলেই তাদের মধ্যে সম্পর্কে পাপ নেই? দেহ কি জামা-কাপড়ের মতো বাইরের জিনিস যে অন্য লোকে ইচ্ছা মতো, পছন্দ মতো অচেনা কাউকে দিয়ে ফেলা যায়? আমি তো ভেবেই পাই না তা কী করে সম্ভব? প্রায় অচেনা অজানা একজন স্ত্রী কিংবা পুরুষের সঙ্গে থাকাটাই পাপ। কী ঘেন্না, কী নোংরামির কথা! মা-গো!

সিন্হা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। ধর্মের বন্ধন, হিন্দু বিয়ের মূল-তত্ত্ব সব কিছুই বলল। অবশ্য, পতিদেবতা তত্ত্বের কথাটা তুলবার সাহস হল না।

কিন্তু কোনও কথাই জিনের মনে ধরল না।

জিন শুধু বলল—না, না, সে বড় লজ্জা, ঘোর অসম্মানের কথা। আমি তো ভেবেই পাই না, তোমাদের দেশের মেয়েরা কেমন করে এরকমভাবে আত্মসমর্পণ করে?

কেন? স্বেচ্ছার আত্মসমর্পণে তো কোনও দোষ তুমি নিজেই দেখছ না!

স্বেচ্ছা কোথায় দেখছ তোমাদের দেশের ছেলে বা মেয়েদের মধ্যে? ওটা তো বাপে-মায়ের ইচ্ছা!

সিন্হা হেসে ফেলল। বলল—সে কথা না হয় দেশে ফিরে গিয়ে ভেবে দেখব। কিন্তু এই যে তোমাদের দেশে বিয়ের বাইরেই এত সব অশাস্ত্রীয় কাণ্ড হয়—

খুব গভীর স্বরে জিন বলল—অশাস্ত্রীয় মোটেই নয়। অসম্মানজনক তো নয়ই। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, নিজের বিবেচনা বিবেক সব কিছুর সমর্থন নিয়ে। যাকে এতদিন ধরে চিনলাম, জানলাম, মন দেওয়া-নেওয়া করলাম, তাকে আর অদেয় কী থাকতে পারে? যাকে চেনো না, জানো না, ভালোবাস না, তাকে হয় দাও ভিক্ষা, না হয় আদায় করো জোর করে। ছিঃ, আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন সমাজের ছেলে-মেয়েরা সে কথা ভাবতেই পারি না! এই যে মনে করো

তোমাকে এতদিন ধরে চিনলাম জানলাম—

সিন্‌হা আর কথা বাড়াতে দিল না। সময় হয়ে এসেছে। সাঁকোতে পৌঁছানোর সময় হয়ে এল। ওদের পায়ের তলায় মৃত্যু, মাথার উপরে স্বর্গ।

জিন সেই স্বর্গে চলে গেছে। তার জীবনের শেষ সাধ, শ্রেষ্ঠ সার্থকতা আমি পূর্ণ করতে পারি নি। কিন্তু এক সঙ্গে থাকার শেষ মুহূর্তটির প্রেমের চিহ্ন আমার সর্বাঙ্গে বহন করছি। একটা শ্রাপনেল বোমা ফেটে একই আঘাতে জিনকে মেরে গেল, আর আমাকে সেই মহিমার আজীবন সাক্ষী রেখে গেল। সেই অমর মুহূর্তে এক ফোঁটা জল দিতে পারি নি তার মুখে; শুধু দিয়েছি আমার শেষ চোখের জল আর আমার প্রথম চুম্বন।

এর পর সিন্‌হা চুপ করে রইল। আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। যেন আমায় নিরুপায় পেয়ে সে তার এই কাহিনিটার ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে গল্পের ভার, এই বিবাহাতিত দেহসম্বন্ধের তত্ত্ব আমার কাছে বড় ভারী হয়ে উঠেছে। আজ রাতে গৃহিণীর কাছে সোহোর বর্ণনা লিখতে বসে যদি প্রেমের এই দর্শন ব্যাখ্যা করতে যাই তার উলটো উৎপত্তি হতে পারে। নাঃ—এই বাউণ্ডুলে মাতালের আড্ডা বোহেমিয়া থেকে আস্তে আস্তে কেটে পড়াই ভালো। কিন্তু একটা জুৎসই অজুহাত দেখাতে হবে তো!

তার দরকার হল না। এর মধ্যেই সিন্‌হা নিজের মনের ভার ঝেড়ে ফেলেছে। হয়তো ঢেকে ফেলেছে—তা-ও হতে পারে। পাশের কামরা থেকে জ্যাজ বাজনার সঙ্গে গান ভেসে আসছে। তার তালে তালে সে আঙুল ঠুকছে টেবিলে :

"ভোর ইস্তক বাঁচার মেয়াদ,
নাচবে না সখি?
দু'দিক থেকে জ্বালাও মোম,
ঢেলো না ছাইয়ে ঘি।'

বসে বসে আমিও আগুনে ঘি ঢালা দেখতে লাগলাম।

অভিনয় নয়

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখছে। ওরা দুজনে তন্ময় হয়ে পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখছে। তন্ময়ও বটে, পাশাপাশিও বটে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তন্ময় নয়।

বরং জীবনে কোনদিন নিজস্ব নয়, কিন্তু নিজের করে আনা বন্ধু বা বান্ধবী, অথবা প্রিয় বা প্রেয়সীর সঙ্গে লুকিয়ে যারা সিনেমা-থিয়েটারের অন্ধকারের আশ্রয়ে ক্ষণিকের প্রেমের ছোঁয়া পায়, তারা এক নজরেই বলে দিতে পারবে যে, ওরা শুধুই পাশাপাশি বসে আছে। নেহাত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ চেয়ারগুলি পিঠোপিঠি না সাজিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে বলে।

অর্থাৎ যে মন নিয়ে শুক আর সারি এক দাঁড়ের উপর পাশাপাশি এসে বসে, সে মন নিয়ে এরা আসে নি।

এমন কি, বিরহ-নদীর দু পারে থেকেও চকাচকী (সমাজবাদীরা নাকি এদের নতুন নামকরণ করেছেন—'সখাসখী') যেভাবে সারারাত ধরে পুনর্মিলনের জন্য ব্যাকুল থাকে, সেরকম ভিতরে ভিতরে উন্মুখ অভাবও এদের মধ্যে নেই।

সম্পূর্ণ নিস্পৃহ নিরাসক্ত পরস্পরের প্রতি। অথচ চোখ, মন আর সব ইন্দ্রিয় যেন তন্ময় হয়ে স্টেজের উপর অভিনয় দেখে যাচ্ছে। যাতে মন বা চোখ বা হাতখানাও ভুলে পাশের জনের দিকে না চলে যায়।

অথচ অভিনয় হচ্ছে রোমিও ও জুলিয়েট।

আর অভিনয় দেখছে বিকাশ ও বল্লরী।

বিকাশ সরবরাহ দপ্তরের একজন হালের ছোকরা-অফিসার। যুদ্ধের বাজারটা এখনও বেশ গরম

রয়েছে। কাজেই চাকরির বাজারটাও ভালোই চলছে। আর বেঁচে থাকুক সরবরাহ দপ্তর। তার কল্যাণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে অনেকে। এবং আরও অনেক দূর এগোবার আশা রাখে অনেকেই।

তবে বিকাশ তেমনভাবে এগোবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে না। বহু কালোবাজারীর চকচকে নগদ টাকা বা ঢাকা-দেওয়া লোভ দেখানো প্রত্যাখ্যান করে সেই সব হতাশ প্রেমিকদের কাছ থেকে 'পাতি অফিসার' (পেটি অফিসার) নাম পেয়েছে পিছনে পিছনে; অবশেষে তার মাথার উপর অনুকম্পার বিষ-নজর ঢেলে ওই সব হতাশ প্রেমিকরা অন্যত্র গিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নিয়েছে। সেকথা বুঝতে পারার দুর্ভাগ্যও তার হয়েছে। কিন্তু সে টলে নি কিছুতেই। সদ্য পিছনে-ফেলে-আসা কলেজ-জীবনে পড়া শেক্সপীয়রের বাণী মনে মনে আউড়ে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে। যে তার টাকা চুরি করবে, সে পাবে টাকা না ছাই। কিন্তু তার সুনাম যদি কেউ চুরি করতে পারে, তাহলে তো সবই গেল।

বুদ্ধিমানরা বিভোর হাসি হেসে অনুকম্পার স্বরে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, ছোকরার এখনও অনেক শেখাই বাকি আছে।

এই অভিনয়েও সে আসত না। কিন্তু যুদ্ধের বাজারের আর সরকারি কাজের চাপে জীবন থেকে সব রসকষ শুকিয়ে গেছে। তাই যখন কয়েকজন ভাবী অনুগ্রহপ্রার্থী এই বিলেত থেকে আসা শখের দলের অভিনয় দেখে যেতে ধরল, তখন তাকে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হতে হল। ভেবে দেখল, এমন আর কি দোষ হবে এতে? টাকা-পয়সা নয়, সাংসারিক সুযোগ-সুবিধা নয়, এমন কি একটা দামী উপহারও নয়, মাত্র একটা কম্পলিমেন্টারি টিকিট স্বামী-স্ত্রীর জন্য।

শেষ পর্যন্ত সে নিল, কিন্তু যে দিচ্ছে—তার জন্য নয়; নিমন্ত্রণের পিছনে কান টানলে মাথা আসার সম্ভাবনায় নয়, শুধু শেক্সপীয়রের জন্য, আর ওই খাস বিলাতি অভিনয়ের জন্য।

এতে নিশ্চয়ই তার সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ সাধু চরিত্রে কোনও কলঙ্ক লাগবে না। অথবা হবে না কোনও কানাঘুষা।

তবু মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল—যতক্ষণ না অভিনয় আরম্ভ হয়ে যায়। তার পর যখন বইয়ের পাতার সুপরিচিত দৃশ্য একটার পর একটা সামনে এসে পড়তে লাগল, তখন সে এসব কথা ভুলে গেল। কিন্তু একটা কারণে এখন মনটা আরও বেশি খচখচ করছে। সেই ব্যাপারটার উপর রঙ্গমঞ্চের যবনিকা এখন একটু একটু করে উঠতে লাগল। একদিনের ব্যাপার নয়, একটা মামলার হিসাব নয়, বহু দিন ধরে বহু বিষয়ের মধ্যে একটা বেসুরো রেশের ব্যাপার।

মানসের মঞ্চে তাদের ছায়ামূর্তিগুলো একে একে চরে বেড়াতে লাগল। পাদ প্রদীপের আলোয় তাদের বিস্বাদ বিবর্ণ ইতিহাস ফুটে উঠতে লাগল।

এই গতকাল সন্ধ্যাবেলার কথাটাই ধরা যাক না। অফিস থেকে তখন সে সবে ফিরেছে। মনের মধ্যে তখনও একটা সামান্য দ্বন্দ্ব চলছে যে, টিকিটটি নেওয়া ঠিক হবে, কি হবে না! যারা দিতে চাইছে, তাদের অফিসের সঙ্গে মাল জোগানোর সম্পর্ক আছে। যদি ও টিকিট নেয়, তার সুযোগ নিয়ে তারা ওর কাছে এগিয়ে আসবে। অন্তত মতলববাজি করে রটিয়ে দেবে যে সেও আজকাল তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করে থাকে। ওর নিজের শিক্ষা ও প্রবৃত্তি সেটুকু সম্বন্ধও সৃষ্টি করতে দিতে প্রস্তুত নয়। হোক না তার চারদিকে অন্য মানদণ্ডের অনেক লোক, সে তো নিজের মানদণ্ড ঠিক রেখেছে। হোক না সে তাদের তুলনায় নিঃস্ব—নিঃশেষ তো নয়।

মনে দ্বিধা সংশয়ের দোলা নিয়ে সে বাড়ি পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু বল্লরীর মনে তো তার কোনও ঢেউ গিয়ে পৌঁছায় নি। সে বেচারি তো কিছু না জেনেই সহজভাবে তার কাছে বাড়ি পৌঁছানো মাত্র কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে যাবার প্রস্তাব করেছিল। বলেছিল যে, প্রত্যহের র‍্যাশন, হিসাব আর নিষ্প্রদীপের জ্বালার হাত থেকে একটুখানি নিষ্কৃতি দরকার। সংসারের ঘানিতে একটু সরষে না ঢাললে আর তাতে তেল পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রস্তাবটি শুধু সঙ্গত নয়, সংযতও বটে। বল্লরী তো ফার্পো বা গ্রেট ইস্টার্নে খানা-পিনায় মাসের অর্ধেক মাইনে উড়িয়ে দিয়ে আসতে অথবা ব্যারাকপুরের ঘোড়দৌড়ে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করে আসতে বলে নি। সে বেচারি তো জানতও না যে, বিকাশের মনে এই একটু আমোদ-আহ্লাদের কথা নিয়েই তখন দ্বন্দ্ব চলছিল। তবে কেন সে হঠাৎ খুব স্বাভাবিক আর সামান্য একটা নিরীহ কথাতেই সাপের গায়ে পা পড়ার মতো ফোঁস

করে উঠল।

কোথায় গেল তখন তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা, অনুশীলিত মনের আভিজাত্য?

কেন? বিকাশের স্ত্রী বলে কি বল্লরীর বেলায় নীতি আর রুচির কোনটি দেখানোরই প্রয়োজন নেই। কই, রাস্তায় চেনা কোনও বিপুল বা বিপ্রচরণ বা বিরূপাক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে এরকম ব্যবহার সে করতে পারত?

এইমাত্র জুলিয়েট কি গভীর দরদ দিয়ে, আবেগভরা কণ্ঠে আবেগমাখা মুখে বলে গেল।

'এসো ভদ্রা রাত্রি
তুমি শান্তবেশা ধাত্রী, সর্বাঙ্গ নিকষা।

*

* *

এসো রাত্রি, এসো রোমিও,
এসো রাত্রিমাঝে দিবা।'

রোমিওর প্রতি আকুল আহ্বান, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিনের মতো উজ্জ্বল রোমিওর আবাহন—এ কি শুধু একা জুলিয়েটের মনের কথা? ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার জুলিয়েটেরা কি সীমান্তে সিন্দুরবিন্দু আঁকতে আঁকতে, মাথার চুলে পরিপাটি করে কবরী বাঁধতে বাঁধতে নীরব ভাষায় অথচ নিবিড়ভাবে এই জুলিয়েটেরই কথার পুনরাবৃত্তি করে না?

বল্লরী অন্তত করে।

এবং যারা বল্লরীর মতো কলেজে পড়ে, শহরে ঘোরাফেরা করে, পাঁচজনের সঙ্গে মেশে ও দশজন কবির কাব্যগ্রন্থ মুখস্থ করে আধুনিকা হয়ে ওঠে নি, তারাও করে।

তবে?

বিয়ের পরে প্রথম যখন বল্লরী বাপের-বাড়ি ফিরে গেল, অফিসের ছুটি ছিল না বলে বিকাশ জোড়ে একসঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যেতে পারে নি। সে রাত্রিটিতে বল্লরী একেবারে জুলিয়েটের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিল। নব প্রেমের নব আশার উল্লাসে, কল উচ্ছ্বাসে সে বলেছিল :

'বিদায়, হে মধুময়,
বসন্তের বিকাশ-চুম্বনে এ প্রেমকোরক
পুনর্দর্শনকালে সুন্দর ফুল ফুটে উঠবে।'

শেক্সপীয়র-পড়া নববধূর বাক্‌চাতুর্যে, রসবিদগ্ধতায় প্রেমে বিহ্বল বিকাশ সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল যে, এই প্রেম, এই নিবিড় আনন্দ-রসঘন প্রেম তাদের দুজনের জীবনে সব কিছুই মধুর করে তুলবে। ভরে দেবে অভাবকে অনুভব দিয়ে। ঢেকে দেবে মর্তের দুঃখে স্বর্গের সুখ দিয়ে। শ্যামল সরস করে তুলবে এই ধূলিরুক্ষ সংসারকে।

এ তো বিবাহ নয় শুধু, এ আবহমানকাল ধরে আরাধনা-করা স্বর্গের আবাহন।

তবে কাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বল্লরীর খুব স্বাভাবিক একটা প্রস্তাবে কেন সে হঠাৎ জ্বলে উঠল?

শুধু তো কালকের কথাই নয়, অনেকদিন থেকেই এরকমভাবে খুঁটিনাটি নিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা একটু বেসুরো, একটু বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। সবুজ ঘাসের মধ্যে কোথায় যেন একটা কালসাপের ঘুমন্ত নিশ্বাস শোনা যায়।

মনে মনে নিজেকে যাচাই করে নিতে লাগল বিকাশ।

ঠিকই তো, তার নিজেরই দোষ। সে নিজেই খুব অনুযোগ করেছিল যে, বল্লরী তাকে আর আগেকার মতো ভালো চোখে দেখে না। তার প্রতি কোনও সহানুভূতি নেই, নেই তার পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা অন্য কোনও প্রয়োজনের প্রতি নজর। না হলে তেতে-পুড়ে অফিস থেকে ফেরার পরই এসব অন্যায় আবদার কেউ করে? এ হেন আবদারের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে মাসের শেষের সংসারের নানারকম খরচ-চালানোর অসুবিধা, অফিসের নানারকম ফাইল ও স্টেটমেন্ট কোনমতে শেষ করার হ্যাঙ্গাম, বড় সাহেবের চড়তি মেজাজের সঙ্গে বাড়তি পরিচয়। নাঃ, দুনিয়াটাই বেদরদী। কেউ তার নিজের কথাটুকু ছাড়া ভাবে না, এমন কি অফিস-ফেরত স্বামীর শ্রান্তির কথাটুকুও না। বিড়বিড় করে নানারকম নতুন আর পুরোনো ভুলে-যাওয়া আর ভাবী অভিযোগ আওড়াতে আওড়াতে বিকাশ নিজেকে বাঁচাতে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

পরের দিন ভোরেও আগের সন্ধ্যার বেসুরো আবহাওয়াটা এলোমেলোভাবেই বইতে লাগল। ফিরল না শান্তির সুর, উড়ল না ক্ষান্তির শাদা পতাকা। সকাল থেকেই সাংসারিক খুঁটিনাটিতে একটা থমথমে ভাব জমাট হয়ে উঠতে লাগল।

অনেকদিন তার চুল ছাঁটার সময় হয় নি। ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে অফিস থেকে সোজা ছুটতে হয় বাড়িতে। তাই সেলুনে যাওয়া ঘটে ওঠে না সহজে। আর এই ট্রামে ঝোলা বা বাসে-দোলার যুগে সকালেও এমন কিছু বেশি সময় বা সুবিধা হাতে থাকে না। প্রভাতের দোলা-জাগা বাতাসে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে কোনও সেলুনে চুল কেটে আসা তাই সম্ভব নয়। রবিবারগুলোও এত খারাপ—সপ্তাহে তো মাত্র একটা! তার উপর সেদিন নানা কাজ ও অকাজ এসে জোটে, নানা বন্ধুবান্ধব, সংসারের হরেকরকম অর্ডার। যাই হোক, চুল একটু বড় হয়ে উঠলে এমন আর কি অপরাধ হয় যে, তার জন্য বল্লরী তাকে অমন করে ঠাট্টা করে হাসতে থাকবে?

হ্যাঁ, সে স্বীকার করছে যে, ঘুম থেকে উঠবার সময় তার চুলগুলি শুধু যে এলোমেলো হয়ে সামনের দিকে নেমে এসেছিল তা নয়, কপালের উপর দিয়ে বটগাছের ঝুরির মতো ছড়িয়ে এসে চোখ দুটো ঢেকে গিয়েছিল, নাক-মুখও আধঢাকা হয়ে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল সম্ভবত।

গেল রাতের মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যে ভালো ঘুম হয় নি। মোটে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়েই সে বল্লরীর চোখে পড়ল। প্রভাতের প্রথম দেখায় ঘটল না সংস্কৃত কাব্যে লেখা কোনও দৃষ্টি-মহোৎসব। বিকাশের মুখ একটা হাইয়ের কল্যাণে আরও বিসদৃশ হয়ে উঠল। এমন অস্বস্তিকর অবস্থা যে, হাত দিয়ে হাইটা ঢাকতেও সে ভুলে গেল।

বল্লরীর মুখ রৌদ্রে ঝলমল করা তরোয়ালের মতো চঞ্চল হয়ে নেচে উঠল। গত রাতের মন-কষাকাষি সে ঝকমকে তরবারিতে আরও শান লাগিয়ে দিল। সে বলে উঠল : বাঃ, মুখখানা বেশ ভালো বানিয়েছ দেখছি! একেবারে বঙ্গোপসাগরের ডেলটা (ব-দ্বীপ) মনে হচ্ছে. আহা, গঙ্গার খাঁড়িগুলি রাশি রাশি নেমে আসছে খাস মহাদেবের জটা থেকে! শীগ্‌গির যাও, চেহারাটা ভদ্রস্থ করে নাও। লোকে দেখলে কী বলবে!

একটু থেমে বল্লরী আবার বলল : বিশ্বাস না হয়, আয়নায় মুখখানা একবার দেখে এসো, আর বাংলা দেশের ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিও।

বল্লরীর মুখের হাসি চিকণ ছুরির মতো বার বার বিকাশকে যেন আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল।

বিব্রত হয়ে বিকাশ তাড়াতাড়ি দু হাতের দশটা আঙুলই চুলের মধ্যে চালিয়ে দিল। যদি মাথার উপরে চুলগুলি একটু কম বেসামাল মালুম হয়।

কিন্তু বল্লরী সেখানেই থামল না। খরধার শ্লেষে আঘাত করে বলল : আজকাল বোধ হয় অফিসটি শখের যাত্রাদলের আড্ডা হয়ে উঠেছে। তাই ভেড়ার লোমের মতো চুল গজালে কিছু বেখাপ্পা হয় না।

কাল রাত্রে সে যে এই বিলেতি শখের থিয়েটার দলের অভিনয়ে নেমন্তন্নের কথাটা বল্লরীকে বলে নি, সেজন্য বিকাশ নিজেকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

এক পা এগোতে না এগোতেই শুনতে পেল, পিছন থেকে বল্লরী বলছে . কি জানি, যুদ্ধের বাজারে পশমের ঘাটতি পড়েছে কিনা, তাই বোধ হয় আজকাল মাথার চুল চালান দিচ্ছ তোমরা বিলেতে! তা ভালো, এমন প্রভুভক্তি না হলে যুদ্ধ জিতবে কী করে তোমরা?

অভদ্র নয়, অশিক্ষিত নয়, রুচিহীন নয়। তাই এর চেয়ে বেশি খোলাখুলি আর কী করে মানুষের চেহারা নিয়ে আক্রমণ করা চলে! কিন্তু বিকাশ অবাক হয়ে গেল যে, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে বল্লরী কিনা এমন তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করল!

হায় প্রভাত, তুমি তো সুপ্রভাত নও! ওই যে রোমিও স্টেজে দাঁড়িয়ে প্রভাতের বর্ণনা দিচ্ছে :

'রাতের প্রদীপ পুড়ে হল সারা;
পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে প্রভাত
দাঁড়িয়েছে হাসিমুখে কুয়াশা-ঢাকা
গিরিচূড়ে।'

কই, রোমিও তো কত দুঃখের মধ্য দিয়ে কত দূরে চলে যাবে এখুনি। জীবনে আর কোনদিন জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা হবে কি না জানে না। মাথার উপরে ঝুলছে আদেশ জীবনহানির, পায়ের নীচে দুলছে

আবাহন পলায়নের। সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রোমিও আর জুলিয়েট।

পিছনে শুধু একটিমাত্র রাতের মিলন ও সামনে হয়তো সারাজীবনব্যাপী বিরহ! এত আনন্দের অবসান আর এত বিষাদের আবির্ভাবের মধ্যে দাঁড়িয়েও কই ওরা তো কোনও আক্রোশ দেখাচ্ছে না, ঝগড়া করছে না।

আজ সকাল বেলার দৃশ্যটা আবার বিকাশের মনে পড়ল। নিজেরই অজ্ঞাতসারে বোধ হয় মাথার চুলের উপর হাতটি গিয়ে উঠল একবার। চুল এখনও কাটা হয় নি, কিন্তু এলোমেলো হয়েও নেই মাথার উপর! শিবের জটাজাল থেকে গঙ্গার খাঁড়িও নেমে পড়ছে না। ঠিক যেমন রাত্রির শেষে সদ্য বিছানা থেকে উঠে-আসা রোমিওর মাথার চুলে এলোমেলো নেই। ওর এই মোটামুটি পরিপাটি অবস্থা কি শুধু সাজঘরের পরিচালনার ফল? না, রোমিওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক? রোমিও কি সব অবস্থাতেই নিজেকে জুলিয়েটের জন্য প্রস্তুত করে রাখে? প্রেমের কি এই নিয়ম?

ভাবতে ভাবতে বিকাশ কোথায় যেন চলে গেল। সত্যই তো, বিকাশ তো শুধু বিকাশ নয়, বল্লরীও নয় শুধু বল্লরী। আবহমানকাল থেকে, এমন কি শেক্সপীয়র এই নাটক লেখার আগে থেকে, এমনভাবেই রোমিও আর জুলিয়েটরা সংসারের স্রোতে ধাক্কা খেতে খেতে, দোলা দিতে দিতে—অনির্দিষ্ট অনির্দেশ্য কালসাগরে লোপ পেয়ে গিয়েছে। যাত্রাপথে এসেছে কত সংশয়, কত সংগ্রাম। কত হানাহানি, কত হাহাকার! তবু কি তারা কোনদিন পিছু ফিরে স্রোতের বিপরীত পথে বা কোনও ঘাটে-আঘাটায় আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে? দিশেহারা হয়ে পরস্পরকে আঘাত দিয়েছে বিনা কারণে—বিনা করুণায়? রাজি হয়েছে কি সংসারের জুলিয়েটরা অবাঞ্ছিতকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে? রোমিওরা বাঁধাধরা গতানুগতিক জীবনে আচ্ছন্ন হয়ে আত্মরক্ষা করতে? না, বাইরের সংঘাতের ফলে নিজেদের পরস্পরকে আঘাত করে দুঃখ পেয়েছে বা দুঃখ দিয়েছে?

না। না। নিজের মনেই বিকাশ বলে উঠল, না, না।

তবে?

তবে কেন সে এই রোজকার অসুবিধা, র‍্যাশন, বাসে-ঝোলা, মাসকাবারের হিসাব কষার মধ্যেই নিজেকে জুলিয়েটের জন্য প্রস্তুত করে রাখবে না? কেন সে একটি সন্ধ্যায় বল্লরীর চিত্ত-বিনোদনের একান্ত ন্যায্য ও স্বাভাবিক দাবি শুনে বিমুখ হয়ে উঠল? কেনই বা সে আজ বল্লরীর দৃষ্টিতে প্রথম পড়বার সময় নিজেকে একটু কম এলোমেলো করে নিল না? সে কি শুধুই প্রত্যাশা করবে বল্লরীর কাছে বরণডালা? নিজেকে কি করে রাখবে না তার কাছে অহরহ বরণীয়? প্রেম কি জীবনের প্রভাতের জন্যই?—তপ্ত মধ্যাহ্নে বা শ্রান্ত অপরাহ্নে কি তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, না কমে যায়?

সাধারণ প্রত্যহের আটপৌরে জীবনের খুঁটিনাটির মধ্যেও সে তো রোমিওর মতোই একটু শোভনতা, অন্তত একটু সহনীয়তা প্রত্যাশা করে। তাই তাকেও তার বল্লরীর কাছে নিজেকে একটু শোভন, একটু সহনীয় করে তুলতে হবে।

বল্লী!

কোনও প্রিয় বন্ধুর মতো পিছন থেকে নামটা যেন তার উপর একটু আলগোছে টোকা দিয়ে গেল। হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

অথবা যেন ঘুমন্তি স্মৃতির সরোবরে শীতের নিশীথে বসন্তের একটা মৃদু হিল্লোল হঠাৎ একটু ঢেউ জাগিয়ে গেল! টলমল করে দুলে উঠল মানস শতদল! ঝলমল করে উঠল আকাশের বুকে শত শত অনিমেষ অতন্দ্র তারকা!

রোমিওর খবরের প্রত্যাশায় ব্যাকুল বুকে আকুল আবেশে জুলিয়েট একটু আগেই রাত্রিকে উদ্দেশ্য করে বলে গেছে যে, রোমিও যখন আর থাকবে না, তখন তাকে যেন টুকরো টুকরো তারায় ভাগ করে নেয় রাত্রি। রোমিও তখন আকাশের মুখখানা এত সুন্দর করে তুলবে যে, সমস্ত জগৎ রাত্রির সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাবে এবং খরসূর্যের উপাসনা আর করবে না।

নিজেকে অমন করেই আমি ছড়িয়ে দেব বল্লরীর আকাশে। তার প্রতিদিনের সংসারের আকাশে। সেবায়, সহানুভূতিতে 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবে' সব খররৌদ্রের দাহ স্নিগ্ধ করে দেব তারকার মৃদু হীরক-দীপ্তিতে। আজ থেকে হব আমি নতুন লোক। নতুনভাবে হবে আমার বিকাশ।

কোথা দিয়ে যে অভিনয় শেষ হয়ে গেল তা বিকাশ ঠিক খেয়াল রাখে নি। ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি ওরা দুজনে বেরিয়ে এল। স্রোতের তোড়ে একজোট হয়ে ভেসে-আসা শৈবালের মতো। কিন্তু পথে বেরিয়ে এসেও ওরা খুব কাছাকাছি— পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। শান্ত রাত্রির নীরব নিষ্প্রদীপ পথে দুটি প্রাণী। কোনও সাড়া নেই। নেই কোনও ইশারা।

একটু পরে বল্লরীর একটি হাত সন্তর্পণে মিলে গেল বিকাশের হাতে। আরও একটু পরে বল্লরী মৌন ভেঙে বলল : আমার খুব ভুল হয়েছে—গত ক'মাস থেকে। তুমি সে সব ভুলে যেয়ো, কাশ।

কাশ, কাশফুল, বিকাশ বসু নয়, প্রফুল্লকাশা বসুধা এসব কত অন্তরঙ্গ অনুরাগে সিক্ত নামে যে বল্লরী তাকে ডাকত, বিকাশ সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সে নামের একটুখানি ছোঁয়া লেগে যেন কাশফুলের শিষে শিশির বিন্দু টলমল করে উঠল।

সংস্কৃত-কবির প্রফুল্লকাশা বসুধা শুধু অধরোষ্ঠের একটু মৃদু কাঁপনের মধ্যে দিয়ে সাড়া দিল, বল্লী!

ওদের প্রত্যহের জীবনে নূতন ঊষার উদয় হবে এখন থেকে। রোমিও জুলিয়েটের ভেরোনা শহরে শুধু নয়, সারা সংসারে যে ঊষার আবাহন করে গেছে যুগে যুগে নবপ্রণয়ীর দল, যার আলোয় আকুলকণ্ঠে আমন্ত্রণ করেছে প্রিয়তমাদের, ব্যাকুল বাহু দিয়ে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে প্রেয়সীকে, বিহ্বল চঞ্চলতায় উপেক্ষা করে গিয়েছে বিপদকে—বিদ্বেষকে—বিরোধকে। যে ঊষা কুয়াশার অন্তরালে গিরিচূড়ায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে, আলোয় ঝলমল করে তুলতে চায় সবারই জীবনকে—আবহমানকাল থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত—সেই ঊষা নতুন করে উদয় হবে ওদের জীবনে।

বিকাশ আর বল্লরী সেই ঊষার অভিমুখে হেঁটে চলেছে অন্ধকার দীপহীন পথ বেয়ে।

কাশ-বল্লী!

সোনার হরিণ

বোকা মেয়েরা ডায়েরি রাখে, বুদ্ধিমতীরা রাখে না।

কথাটা শুনে পাশ ফিরে তাকালাম। আপনি হলেও তাই করতেন। কারণ মনে হচ্ছে যে একটা জলজ্যান্ত নাটকের যবনিকা উঠে যাচ্ছে।

বেশিক্ষণ আড়চোখে তাকানো যায় না। ভদ্রতায় বাধবে। বিলেতে আবার ভদ্রতার বালাইটা বড্ড বেশি। ব্যক্তি-স্বাধীনতার বড়ই অভাব বলে মনে হল এই মুহূর্তে।

তা নাহলে, দেখুন, ওই সুন্দরী তরুণীটির দিকে একবারের বেশি তাকিয়ে দেখতে পারছি না কেন? যাই হোক, কান পেতে রাখলাম।

ওর সঙ্গীর বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। ভদ্রলোককে কদিন ধরেই দেখেছি। হোটেলের খাবার ঘরে আমার পাশের টেবিলে বসেন। প্রথম দিনই সেখানে বসবার সময় কায়দা করে কাছাকাছি টেবিলগুলোর লোকদের দিকে একখানা পাইকিরি হাসি বিলিয়েছিলেন। আমার ভাগে ক-আনা পড়েছিল তা তিনিই জানেন। কিন্তু আমার টেবিলের বুড়ো সুরসিক ওয়েটার তাব ষোল আনাই আমার হিসাবে জমা করে দিল।

সেই ভদ্রলোক উঠে যাওয়ার পর ওয়েটার জো আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জ্যাম আর মুচমুচে ক্রোয়াসাঁ—ফরাসি রুটি সাজিয়ে দিতে দিতে বলল—স্যার, দেখেছেন খেয়াল করে ভদ্রলোকের গোঁফজোড়া?

চমৎকার! খুব যত্ন করে মাথা ঘামিয়ে ওই গোঁফের পরিকল্পনা করতে হয়েছিল নিশ্চয়ই!

ঠিক বলেছেন স্যার! একেবারে হালের আমেরিকান মটরের 'ফরোয়ার্ড লুকে'র মতো। কেমন আগ বাড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বাঃ, বেশ উপমাটা দিয়েছ তো! মে-ফেয়ারের হোটেলগুলোর বদনাম আছে যে সেখানকার ওয়েটারদের মন পাথরে তৈরি। ভারী হাতে টিপলেও অর্থাৎ বখশিস দিলেও তাদের মন পাওয়া যায় না।

কিন্তু তোমার ভক্তি দেখছি ভদ্রলোককে এক চোখ দেখেই উথলে উঠল।

আমি বিদেশী। ওদের মতো অত মেপে-জোকে বরফে জমানো ঠাণ্ডা গলায় কথা বলার অভ্যাস নেই। হপ্তায় হপ্তায় মোটা বখশিস ব্রেকফাস্ট খাবার পর কফির পেয়ালার নিচে রেখে যাই। কাজেই মে-ফেয়ারের ওয়েটাররা আমায় খাতির করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গোঁফসাহেব প্রথম দেখা দিয়েই ওদের মন জয় করে ফেলল? বিনা দক্ষিণাতেই।

জো বলল—স্যার, দেখেছেন ওর স্যুটখানা? নিশ্চয়ই স্যাভাইল রো'তে সেরা দর্জির তৈরি। ওর ফিগারে কেমন খাপে খাপে সহজ ভাবে বসে গেছে। একেবারে সাপের খোলসের মতো।

হুঁ, তোমার নজরের প্রসংসা করতে হবে বটে।

বলতে বলতে ভাবলাম ওয়েটারটা সাপের কথা তুলল কেন? হিন্দুস্থান সাপ, সাধু আর মহারাজাদের দেশ বলে নয় তো?

ওয়েটার তো উচ্ছ্বসিত। বলল—আর দেখুন না। কেমন জীবনী-শক্তি উপছে পড়ছে চেহারার মধ্যে। হাইড পার্কে রোজ ভোরে ঘোড়ায় চড়ে রাইড করে নিশ্চয়ই।

বুঝতে পারলাম না এর পরের হপ্তায় টিপ্‌স বাড়াতে হবে, না কমিয়ে দেওয়াই ভালো?

পরের দিন জো আবার পাশের টেবিল খালি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে জুটল। কফির চামচটা যেন ভালো করে সাফ করে দিচ্ছে এমন ভাব দেখিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বলল—জানেন স্যার, আপনি তো ডিনার বা সাপারের সময় কখনও এখানে খেতে আসেন না? কাল কর্নেল সাহেবের সব খবর পেলাম সাপারের সময়।

সামনে সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনি. এই সময়টুকুই যা ফুরসত। শোনাই যাক একটু খোশ-খবর।

জো ভক্তিতে চোখ ছোট করে টেনে বলল—কর্নেল যুদ্ধে মিলিটারি ক্রশ পদক পেয়েছিল। একেবারে আসল লড়াইয়ে। কিন্তু শুধু বীর নয়, বড়লোকও বটে।

টিপ্পনী কাটলাম—তা তো বটেই, নাহলে এত খরচ করে এ হোটেলে এসে উঠবে কেন? আমার মতো সরকারী খরচে নয়, নিজের রেস্ত...

জো বাধা দিল।—না, না, কর্নেলেরও সরকারি রেস্ত। কাল সন্ধ্যায় 'বার'-এ হুইস্কিতে সোডা মেশাতে মেশাতে কয়েকটা কথাও ফিস-ফিস করে যেন গ্লাসের ফেনার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। আমি কিন্তু শুনতে পেয়েছি। উনি সিক্রেট সার্ভিসে আছেন। একটা বিশেষ গোপন কাজে। সেজন্যেই নিজের কোম্পানির হোটেল ছেড়ে গা ঢাকা দিয়ে এখানে এসেছেন কদিনের জন্য।

আজকের মতো আমিও গা তুললাম এ পর্যন্ত শুনে।

পরের দিন এই তরুণীকে কর্নেলের বাহুতে জড়ানো অবস্থায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসতে দেখলাম। প্রথমে কোনও আমল দিই নি। কিন্তু কানে এল চমৎকার এই কথাটা। 'বোকা মেয়েরা ডায়েরি রাখে, বুদ্ধিমতীরা রাখে না।' এর পরে আর উদাসীন থাকি কেমন করে?

কান পেতে রইলাম।

কর্নেল বলছেন—তবু, ডার্লিং, তুমি যখন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি, আর, আমার স্ত্রী হতে চলেছ, তোমার ডায়েরি রাখতে হবে বৈকি! কত এনগেজমেন্ট—ঘোড়দৌড়ে, বোট রেসে ফ্যাসান প্যারেডে, শেয়াল শিকারে হরদম যেতে হবে। ডায়রিতে না টুকে রাখলে কোনও এনগেজমেন্ট মিস করে যেতে পার।

তরুণী উত্তর দিলেন—আমি যখন মিস থাকব না, দেখো তখন কিছুই মিস করব না।

তবু নজর রাখা দরকার। এই দেখ না, তুমি হ্যাট অর্থাৎ টুপির সঙ্গে প্রেমে পড়ে আছ। গত হপ্তায় একই দোকান থেকে তুমি পাঁচ-পাঁচটা টুপি কিনেছ, কিন্তু একটাও তেমন মানানসই হয় নি, অর্থাৎ কোনটাই তোমার প্রেমের প্রতিদান দিল না।

তুমি তো দিচ্ছ, তাহলেই হল!

ঠিক বলেছ, ডিয়ারি। অ্যাসকট রেসে রানির বক্সের পাশে বসে কত লেডি আর কাউন্টেসের সঙ্গে দেখাশোনা হয়েছে। কাউকে বুঝতে ভুল করি নি। কিন্তু প্রথম ভুল করলাম তোমার বেলা।

আশ্চর্য! আমি তো খুব সাধারণ সাদাসিধে একটি মেয়ে!

না, তুমি জানো না, তুমি কত অসাধারণ। প্রথম সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে কথাবার্তায় একেবারে চমক

লাগল। মনে হল, তোমার মতো 'সফিসটিকেটেড' মেয়ে দেখি নি। পরের দিন তোমার সঙ্গে দেখা করবার আগে ফুলের তোড়া কিনতে গেলাম। দোকানী বলল—যদি সোনালি কেশের মেয়ে হয় তবে এই তোড়া নিন, আর যদি কালো কেশবতী হয় তবে এই তোড়াটা।

তুমি কী বললে?

আমি ভাবলাম যে, সেই সন্ধ্যায় তুমি কোন্ রঙের চুলে উদয় হবে, তার ঠিক নেই। তাই দুটো তোড়াই কিনে নিলাম।

না, না, নিশ্চয়ই তুমি আমায় নিয়ে রগড় করছ। আমি এমন চালাক-চতুর মেয়ে হলাম কবে? অবশ্য দু-একটা চটকদার কথাবার্তা শিখে রেখেছি পাঁচজনের সঙ্গে মিশবার জন্য।

আমার চোখে, আর সব সমঝদার লোকেরই চোখে তুমি অসাধারণ। তাই তো চটপট তোমায় বিয়ে করে নিতে চাই। অন্য রসগ্রাহীরা তোমার সন্ধান পাবার আগেই।

কিন্তু এত তাড়া কেন বল তো? এই তো তোমার সব কথাতেই রাজি হয়েছি। তোমার হোটেলে পর্যন্ত এসে উঠলাম। আমাদের বিয়ের পর কিন্তু আর এরকম খরচ করতে পারবে না। টাকা ওড়ানো আমি পছন্দ করি না।

কিচ্ছু ভেবো না, ডিয়ারি! টাকা ওড়ানো শুধু সেই খরচকেই বলে, যা নিজের স্ত্রী বা সুইটহার্টের কোনও কাজে লাগবে না।

আত্মহারা তরুণীর দিকে আর একবার আড়চোখে তাকাবার লোভ হয়েছিল। পরেরদিন আবার জো ব্রেকফাস্ট টেবিলে হাজির। খুব জবর খবর। সারা দিন কর্নেল আর তরুণী মোটরে করে ঘুরে বেড়িয়েছে। নতুন শ্যাম্পেন রঙের মোটর ঝকমক করছে হোটেলের সামনের রাস্তা আলো করে। তরুণীর মুখের হাসির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে মোটরের ঝিকিমিকি। ওদের বিয়ের আর দেরি নেই। আজ রাতেই সাপার খেতে আসছে লন্ডনের একজন খুব বড় জহুরি। কর্নেল যা বিশেষ খানার অর্ডার দিয়েছে, তা নাকি কোনও রাজা-মহারাজারও হিংসার ব্যাপার হবে। শুনতে চান 'মেনু'র তালিকা, স্যার?

না, বেল পাকলে কাকের কী?

ইংরাজিতে এই সুন্দর বাংলা কথাটার অনুবাদ মাঠে মারা গেল। কারণ, শুধু যে ইংরেজিতে মানে বোঝানো শক্ত তা নয়, কর্নেল এমন সহজ একখানা হাসি ছড়িয়ে পাশের টেবিলে জাঁকিয়ে বসলেন যে, তার পর আর ওদের সম্বন্ধে গল্প শোনা চলে না। ওদের গল্প, ওদের ফিশফিসানিই একমাত্র জিনিস যা শোনা চলে। ওদের টেবিলের দিকেই কান পাতলাম।

তরুণী বলছে—হ্যাঁ ডার্লিং, কি মজাই না করা গেল! সারাটা দিনকে যেন মোটরের চাকার উপরে চড়ানো হয়েছিল। আর কি চমৎকার জোরে তুমি চালালে! কেবল একটা জিনিস আমার ভালো লাগল না।

কোন্টা? আমার গোঁফজোড়ার বাতাসে দোলা?

ছি, ছি! তোমার গোঁফজোড়া হচ্ছে তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। তোমার 'বিগ বিজনেস', বড় কারবারের সঙ্গে ওটা অত্যন্ত মানানসই হয়েছে। আমি পছন্দ কবলাম না শুধু, যখন আমরা বড় জেলটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওখানকার শাস্ত্রীরা কেমন কেমন ভাবে তাকাল। তোমার দিকে ওরকম করে রুমাল নাড়ল কেন?

ওঃ, এই কথা! আমি যে ওখানে অনেক সময় 'ওয়েল ফেয়ার' কাজ করতে গেছি কিনা। জানো তো, দুঃখীর দুঃখভার আমি কমাতে ভালোবাসি।

আমাকে কোনদিন ভার বলে মনে হবে না তো, ডার্লিং?

তোমাকে? নেভার নেভার ডিয়ারি! অন্য মেয়েরা আমাব দিকে আকৃষ্ট হয়েছে আমার কী আছে তার জন্যই, আমার জন্য নয়। কিন্তু তুমি সে ধরনের নও। আর আমরা দুজনেই পরস্পরের জন্য তৈরি হয়েছিলাম। আমার কেউ নেই আপনার, তোমারও কেউ নেই।

শুধু আমি তোমার হব। কথায় বলে যে স্বামী আর স্ত্রীর লড়াইয়ে শাশুড়ি হয় রেফারি। অবশ্য শুধু এক পক্ষের দিকে টেনে চলে সে। আমাদের সে সব বালাই থাকবে না। কোনও আত্মীয়-স্বজনের ছায়া আমাদের উপর এসে পড়বে না!

সে জন্যেই তো বলছি। মনে রেখো কিন্তু যে আজকের পার্টিতে খুব বড় একজন জহুরি আসছে। রত্ন

আর রত্নময়ী দুয়েরই পাকা জহুরি। যে সব ঐতিহাসিক হীরে-জহরতের পৃথিবীজোড়া নাম তাদের গল্প তোমায় কাল বলেছি। সেগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তার মাঝে মাঝে ঝেড়ে দিয়ো। এই ধর, কোহিনূর হীরে, কুলিনান হীরে।

কিন্তু তার কী দরকার?

বাঃ, জানো তো কারবারীরা কিরকম সব নাকউঁচু হয়! ওকে বুঝিয়ে দিয়ো যে তুমি ওর কারবারের মালের সেরা মালগুলির সম্বন্ধে জানো। অতএব হ্যালের জহরত সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তুমি অনেক কিছু জানো। যার কাছ থেকে অত টাকার গয়না কিনব তোমার জন্য, সে কেন মনে করবে যে তুমি তার মহিমা বোঝ না। অবশ্য তোমার দাম তো হীরে-জহরত দিয়ে হিসেব করা যাবে না, ডিয়ারি!

ওঃ, তোমার চটক আর চাটুকাবিতা কোনটাকেই ঠেকানো আমার সাধ্য নেই!

তরুণীর কথায় আমিও মনে মনে সায় দিলাম। সত্যি কর্নেল মেয়েমহলে সব পুরুষের উপর টেক্কা দিয়ে যাবে নির্ঘাৎ।

পরের দিন সকালে তাড়া ছিল। ঘরের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তরুণী-কর্নেল নাটক কত দূর এগোলো জানি না। রাতে বাইরে থেকে খেয়ে ফিরেছি। টাইটা খুলতে যাব, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

জো'র মুখে দুঃখ আর উত্তেজনা দুই-ই মাখানো রয়েছে। ব্যাপার সাংঘাতিক। কর্নেলের গোঁফজোড়া আসল নয়।

কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকল। ব্যাপারটা সোজা ভাষায় জানাতে বললাম।

সেদিন রাতে কর্নেলের ছোট্ট পার্টিটা নাকি খুব জমেছিল। শ্যাম্পেন আর চিকেন প্রভৃতিতে এমন বনেদী খানা হোটেলে শুধু বিশিষ্ট-নিমন্ত্রিতদের জন্যই করা হয়। আর তিনজনের টেবিলটার মাঝখানে ছিল একটা পরীর মূর্তি। তার মুখ থাকে বেরিয়ে আসছিল সোনালি আলোব ফোয়ারা। পানকুঞ্জের আড়ালে বসে সেই আলোয় ওরা সাপার খেয়েছিল। তিনজনের ডিনারের জন্য হাজার টাকার মতো বিল সই করেছিল। প্রায় একশো টাকা ওয়েটাররা বখশিস নগদ পেলে নিমন্ত্রিতের চোখের সামনেই।

পরের দিন সকালে কর্নেল আর তরুণী সেই জহুরির দোকানে গেলেন। হাজার বিশেক টাকার গহনা বাছা হল অনেকক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত কেনা হল হাজার ত্রিশেকের। কিন্তু চেক ভাঙানোর পরেই কর্নেল সেগুলো হোটেলে ডেলিভারি নেবেন।

এদিকে আজ দুপুরেই যে লন্ডনের সবচেয়ে বড় হোটেলে লাঞ্চ-পার্টি। তাই এই গয়নাগুলোর মধ্যে বাছাই করা এই ব্রুচটা এখনই নিলে তরুণী সেটা পরে সেখানে খেতে যেতে পারে। চেকটা তো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভাঙানো হয়ে যাবে। আর ব্রুচটার দাম মোটে হাজার আষ্টেক— মোট ত্রিশ হাজারের সওদার মধ্যে!

এখন সব নির্ভর করছে জহুরির শিভ্যালরির উপর। ব্যবসাদার মানুষ, শিভ্যালরি দেখাবার মোকা তো হামেশা মেলে না। তা ছাড়া কাল রাতের শ্যাম্পেনের সোনালি আমেজ এখনও মাথায় চড়ে রয়েছে। ব্রুচটি পকেটে ফেলে তরুণীকে বাহুর মধ্যে জড়িয়ে কর্নেল এসে তার নতুন মোটরে চড়ে বসলেন।

হোটেলে ফিরে তরুণী মনের খুশিতে নিজের ঘরে সাজগোজ করছেন। ডার্লিং ডিয়ারিকে নিজের হাতে ব্রুচ পরিয়ে দেবে প্রসাধন শেষ হলে। এদিকে ঝড়ের মতো জহুরি এসে হাজির ঘণ্টাখানেক পরে। হতে গয়না নয়, চেক। ব্যাঙ্ক চেক ফেরত দিয়েছে।

একটু পরেই মোটরের দোকান থেকে লোক হাজির। এত দামী গাড়ি, তার দ্বিতীয় সপ্তাহের ভাড়াই এখনও দেওয়া হয় নি। ব্যাপার বুঝে হোটেলের বিলটিও তরুণীর ঘরে হাজির। একার নয়, দুজনের। সবাই তো জানে যে তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি যদি সুন্দরী আর অল্পবয়সী হয়, আর কর্তা যদি হয় অবিবাহিত, তাহলে এ-হেন বিয়ে বিলেতে হামেশাই হয়ে থাকে।

গল্পটা শুনে হাঁ হয়ে গেলাম। অবশ্য জো'কে ধন্যবাদ দিলাম যে কষ্ট করে এত রাতেও খবরটা দিতে এসেছে। মনে মনে ভাবছি এ সপ্তাহের বখশিসটা একটু বোধহয় বাড়িয়ে দেওয়াই ভালো দেখাবে।

কিন্তু কই, জো যে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। কিছু মতলব আছে নিশ্চয়ই।

শেষ পর্যন্ত গলাখাঁকারি দিয়ে খুব নিচু স্বরে জো বলল—স্যার, একটা নিবেদন আছে।

নিবেদনের কথা শুনে সাবধান হয়ে গেলাম। জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় শান্ত্রীরা কর্নেলের দিকে

রুমাল উড়িয়েছিল। দাগী আসামী নিশ্চয়ই। যে রকম করে একটা নিরীহ মেয়েকে ফাঁদে ফেলে পাকা জহুরিকে খেলিয়েছে, তাতে কর্নেলের বাহাদুরি আছে অবশ্য। কিন্তু এ-হেন ধড়িবাজ জোচ্চোরের ঘটনা বলতে এসে সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিবেদন করতে চাচ্ছে জো। ব্যাপারটা নেহাত নিরীহ না হতে পারে। কোথায় জিলিপীর প্যাঁচে হয়তো জড়িয়ে যাব। মনটা একটু কঠিন হয়ে উঠল।

স্যার, দি ইয়ং লেডি বড্ড কান্নাকাটি করছেন।

খুব নিস্পৃহভাবে বললাম—তা তো স্বাভাবিক।

জো তবু দাঁড়িয়ে রইল দেখে বললাম—যারা সোনার হরিণের পেছনে দৌড়োয়, তাদের জন্য খুব বেশি চিন্তার দরকার হয় না।

জো যেন অন্ধকারে দিশা পেল। হাতে তুড়ি দিয়ে বলল—ঠিক বলেছেন। সোনার হরিণ দরকার। আপনি তো নিশ্চয়ই যাদু জানেন! অন্তত জোতিষ। একটু অনুগ্রহ করে বলে দিন না, কোথায় সেই জোচ্চোর কর্নেলের সন্ধান পাওয়া যাবে? তাহলেও মেয়েটির একটা সুরাহা হয়ে যায়।

চুপ করে রইলাম।

তা দেখে জো আরও একটু ভরসা পেল—অন্তত শুধু হাত দেখেই না হয় বলে দিন।

হেসে ফেললাম। ওর চোখে মিনতি, কিন্তু আমার মুখে হাসি। বেচারা মনে হচ্ছে পরের মুশকিলে আসানের সন্ধান করছে। তার জন্য ভারতবর্ষের গণতকার, হাত দেখার পণ্ডিত সবারই সাহায্য নিতে সে তৈরি। তাকে সোজাসুজি নিরাশ করতে বাধল।

শুধু বললাম—এ যুগে আর সোনার হরিণ পাওয়া যায় না। তাই যাবা হাত দেখত আর জ্যোতিষ করত, তারাও ওই বিদ্যা ভুলে যাচ্ছে। এই দেখ না, তোমাদের কর্নেলের অমন জলজ্যান্ত গোঁফজোড়া, তা পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে!

তাহলে?

তাহলে, আমি শুধু বলতে পারি গুডনাইট।

গুডনাইট স্যার!

বেচারা জো মাথা নুইয়ে চলে গেল। কেমন একটা মায়া হল ওর উপর। আমার কামরার দরজা খুলে ওকে পিছন থেকে দেখতে লাগলাম। লম্বা বারান্দার আলোগুলোতে ওর ঝকঝকে টাকটা পেছন থেকে সোনার মতো জ্বলজ্বল করছে। সোনার হরিণের সন্ধান দিতে পারি নি, কিন্তু একটি সোনার হৃদয়ের খোঁজ পেয়েছি।

নতুন ধারা

হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আর সময় কাটছিল না। শুধু ছোকরা ডাক্তার শ্যামাপদ রায়ই যা একটু-আধটু খোশ-খবর নিয়ে আসে, মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে যায়। ডাক্তাররা আমার পেটের সব কলকবজা পরীক্ষা করে দেখছে। কোথায় কোন্‌টা বে-কল হয়েছে তা ধরা পড়ছে না।

এদিকে আমিও শুয়ে শুয়ে ডাক্তারের মনের কলকবজা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া শুরু করেছি। কারণ ডাক্তারের মন যে একজায়গায় ধরা পড়েছে এবং কাছেপিঠেই কোথাও, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই।

না হলে কোন্ ডাক্তার ভোর সাতটার সময় এসে রাউন্ড দিতে হাজির হয়? বড় ডাক্তার আসবে সেই সাড়ে-আটটায়। জুনিয়ার হাউস সার্জনের এত কাজে মনকে তাই আমি প্রথম থেকেই অতি ভক্তি বলে ধরে নিয়েছিলাম।

কি জ্যোতিষবাবু, আজকের দিনটা আমার কেমন যাবে পাঁজি দেখে বলে দিন তো?—বলেই ডাক্তার হাসতে শুরু করবে। আমি অবশ্য জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানি না। মানিও না। কিন্তু ভোর হওয়াতে, আর হাসপাতালে রাউন্ড দিতে আসার সুযোগ হওয়াতে, ডাক্তার যে খুশি হয়েছে এটুকু বুঝতে পারি।

তবু যেন কিছুই বুঝি না এমন ভাব দেখিয়ে বলি—তা ডাক্তার, তুমি তো স্টেথিসকোপ লাগিয়ে

হৃদয়ের খবর ধরতে পার। তোমার নিজের দিনটা কেমন যাবে সে খবর দিয়েই শুরু করো।

ডাক্তার লজ্জার ভাব মুখে দেখায় না বটে, কিন্তু বড় মিষ্টি হাসে। আহা, বড় ভালো ছেলে ডক্টর রায়। ওর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেছে যে অনেক সময় শুধু শ্যাম বলেই ডাকি।

সন্ধ্যাবেলা যখন সব ভিজিটার বিদায় হয়ে যায়, তখন শ্যাম একবার উঁকি মেরে যায়। এমন কি রাতে খাওয়ার শেষেও। হেসে বলে—জ্যোতিষবাবু, যাবার আগে দেখে যেতে এলাম কেমন আছেন! কিন্তু ওর চোখ যে কোন্ দিকে ঘুরে বেড়ায় তা আমার নজর এড়ায় নি।

একদিন শ্যাম খোলাখুলি বলে বসল—জ্যোতিষবাবু, কাঁহাতক আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনবেন, চলুন একবার পাশের ওয়ার্ডটা দেখে আসবেন।

প্রথম দিন গেলাম, একটু কৌতূহল ছিল বলে। দেখে আসি কম খরচের ওয়ার্ডে লোকে কেমন থাকে? কিন্তু দেখলাম যে শ্যাম একজন রোগিণীকেই যেন একটু বেশি যত্ন করে দেখল। একটু বেশি কথাবার্তা কইল তার সঙ্গে। তা-ও বেশ একটু খুশি হয়ে, অনেকখানি মমতাভরে। অল্পবয়সি ডাক্তার কথাবার্তায় গোছালো, দেখতে ছিম-ছাম কোনও তরুণী রোগিণীর দিকে অমন একটু পক্ষপাত দেখালে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

দুয়েকদিন পরে আবার যেতে হল সেখানে। এবার আরও একটু মমতার ছোপ নজরে পড়ল। কিন্তু ওই ওইটুকু পর্যন্তই। পাশাপাশি বিছানায় জনাবিশেক রোগী। এর চেয়ে বেশি নজর দিলে দেখায় খারাপ। তবে যখন আর একজন রোগী গুটি গুটি ডাক্তারের সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে, তার খাতিরেও তো মিস কুন্তলার বিছানার পাশে ডাক্তারকে একটু বসতে হয়। রোগিণীরও তাতে বিশেষ আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। বরং একটু আগ্রহই যেন দেখা গেল।

আমি লোকটাও নেহাত বেদরদী বা বেরসিক নই। এদিক-সেদিক আরও দুয়েকজন রোগীর সঙ্গে আলাপ করে নিয়েচি। দেখলাম ডাক্তার এ ওয়ার্ডে আগের চেয়ে বেশি ঘন ঘন আসে বলে তারাও খুশি। খুব আলগোছে মিস কুন্তলার বিছানার দিকে একটা চোরা চাউনি হানলাম। সন্ধ্যার পড়ন্ত আলো ওদের মুখে।

কয়েকদিন পরে শ্যাম সন্ধ্যাবেলা আমার কেবিনে আঠার মতো লেপটে রইল। আমিই মাঝে মাঝে তাড়া দিই। বলি—ডাক্তার তোমার সন্ধ্যাবেলার রাউন্ডটা এখনও আরম্ভ করলে না যে!

শ্যাম প্রথমে কথাটা যেন শুনতেই পেল না। পেটের ভেতরকার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করবার জন্য আমাকে কেন 'বেরিয়াম মিল' ওষুধপত্র খাওয়ানো হল তা বোঝাতেই সে ব্যস্ত।

হবেও বা। ডাক্তারের নিজের কাজের দিকে খুব মন। রোগীদের মনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টারও অন্ত নেই।

কিন্তু এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এল। বলি, ও ডাক্তার, তোমার যে আজ পাশের ওয়ার্ডের দিকে নজর বড়ই কম!

এবারও ডাক্তারের উত্তর পেলাম না। দেওয়ালে লটকানো চার্টগুলোতে সে মনোযোগ দিয়েছে।

ব্যাপারটা আমার নজর এড়াল না।

এটা-সেটা আরও কিছু কথা হওয়ার পর আবার একটু ইঙ্গিত দিলাম। এবার আরও একটু খোলাখুলি। ডাক্তার তোমার রোগিণী যে বিনা চিকিচ্ছেতে হাঁসফাঁস করছে!

এবার শ্যাম লাট্টুর মতো পাক খেয়ে ঘুরে আমার দিকে মুখ ফেরাল। সোজা চোখের উপর চোখ রেখে বলল—তাহলে, জ্যোতিষবাবু, আপনি সবই ধরতে পেরেছেন?

বেচারার ভঙ্গি দেখে একটু রসিকতা করবার লোভ হল। মুচকি হেসে পালটা প্রশ্ন করলাম—দোষ কার? যে ধরা দেয় তার, না যে ধরতে পারে তার!

সইতে না পেরে শ্যাম বলল—আচ্ছা, হার মানলাম। কিন্তু, জ্যোতিষবাবু, ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। দাওয়াই বাতলান!

চোখ কপালে তুলে বললাম—সে কি? ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি? তা দেখ বাপু চোরের উপর বাটপারির লক্ষণ দেখা দিয়েছে বুঝি? না, বোঁচকা নিজেকে সামলে নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে?

বর্ষার মেঘ একেবারে জল হয়ে ঝরে পড়ল। আমার দুটো হাত চেপে ধরল তার শক্ত দুটি হাতে। একেবারে অসহায়ের মতো আশ্রয় চাইল। ভুলেই গেলাম যে হয়তো ওই হাত দুটোই আর কদিন পরে আমার পেটখানাকে করাত-চেরা করে তন্ন তন্ন করে নাড়ীভুঁড়ি উলটে-পালটে কসরত করবে।

আপনি অন্তর্যামী, জ্যোতিষবাবু। না-হয় সত্যি জ্যোতিষ জানেন। তাহলে আমার কি হাল হবে তা বলে দিন। শ্যামের গলা ভারী, চোখ ছলছল।

তাহলে তুমি হও আমার রোগী। লক্ষণ সব খুলে বল। আমি হলাম ডাক্তার।

টেবিল পালটে গেল।

শ্যামাপদ আর কুন্তলা দুজনেই ডাক্তারির ছাত্র ছিল। এক ক্লাসের, এক বয়সের। দুজনে ভাবও হয়েছিল। সংসারে আজকাল এটা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম আর তার পর বিয়ের ঘটনা নতুন জিনিস নয়। কিন্তু একাকিনী কুন্তলা ঘর বাঁধতে রাজি নয়। আর শহুরে ছেলে হলেও শ্যাম সেই স্বপ্নই দেখছে।

শ্যাম বলেছিল—আমরা দুজনেই যখন কলকাতায় ডাক্তারি করব, এক বাড়িতে থেকে করলে তো সুবিধাই হবে। একই লাইনের কাজ, দুজনে পরামর্শ করে বুঝে শুনে করা যাবে। পরস্পরকে ভুল বোঝবারও কোনও ভয় থাকবে না।

তার পর একটু হেসে আরও একটু বলেছিল—শুধু সন্ধ্যাবেলা দুটো নৌকা এক ঘাটে বাঁধলেই হবে।

কুন্তলা তাতে রাজি হয় নি। বলেছিল—দুটো নৌকোই থাকবে দোটানায়। স্টেথিসকোপ আর ব্যাগে যে হাত জুড়ে থাকবে। হাতে হাত মেলাবার সময় কই?

শ্যাম বেশি কথা কইতে পারে না। তবু প্রাণের তাগিদে বলে ফেলেছিল—একদিকে থাকবে ব্যাগ, আর আরেকদিকে স্টেথিসকোপ। তার মাঝখানের খালি জায়গাটুকু জুড়ে থাকবে আমাদের দুখানা মিলিত হাত।

বব-করা মাথা নেড়ে কুন্তলা আপত্তি জানিয়েছিল। মন যেখানে মিলে গেছে, সেখানে হাত মেলাবার জন্য এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন? সে কি শুধু নিশুতি রাতে রোগীর বাড়ি থেকে 'কল' এলে রোগী দেখতে বেরোতে মত আছে কিনা সে নিয়ে হাতাহাতির জন্য?

একটু চুপ করে থেকে কুন্তলা জুড়ে দিয়েছিল—ওই মাঝখানের জায়গাটুকুই হবে আমাদের বাঁচোয়া। ওই খালি জায়গাটুকুতে আনাগোনা করবে আমাদের ভালোবাসা। ওটাকে বিয়ে দিয়ে ভরাট করে দিলে ভালোবাসার ঠাঁই থাকবে না!

তর্কে হেরে শ্যাম চুপ করে গিয়েছিল।

এই পর্যন্ত বলে শ্যাম নীরব হয়ে বসে রইল। কিন্তু তার পরের ব্যাপারগুলিও জানা দরকার। তাই আমি আবার একটু কথা জুগিয়ে দিলাম। বললাম—তাতে কী হয়েছে? তুমি পালটা বললেই পারতে যে আজকাল বিয়ে জিনিসটা এত হালকা, এত ফিনফিনে হয়ে গেছে যে, সংসারে কোনও জায়গাকেই বিয়ে ভারী করে তোলে না। ভরাটও করে না। বিয়ের দাবি কমে গেছে; ভালোবাসার দাম গেছে বেড়ে। তাই এ যুগের সাধারণ স্বামী-স্ত্রীতে ভুল বোঝা আর ঝগড়াঝাঁটি কম হবারই কথা। যেখানে হয় সেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধই টিকবে না। নতুন আইন হচ্ছে জানো তো?

ঠিক বলেছেন আপনি জ্যোতিষবাবু—উৎসাহিত হয়ে উঠল ডাক্তার। আপনার বুদ্ধি নিয়েই এবার থেকে আমি ওকে পাবার চেষ্টা করব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী জানেন? কুন্তলা যখন আমার কথায় সায় না দিয়ে শুধু বলে—রাগ করো না শ্যাম—অমনি আমি গলে জল হয়ে যাই।

মনে মনে ভাবলাম—বেচারা শ্যাম শুধু জল কেন, ধোঁয়া হয়ে যায়। কুন্তলার ব্যক্তিত্ব যে ওকে নিঃশেষে উবিয়ে দেয় তা বেশ বুঝতে পারলাম।

কুন্তলাকে যখন হঠাৎ অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হল, ডাক্তারের একটা মোকা মিলে গেল। জুনিয়ার হাউস সার্জন হিসাবে সে যখন-তখন কুন্তলার ওয়ার্ডে আসে; সেবা-যত্ন করে প্রাণ ঢেলে। মুখে যেকথা বুঝিয়ে দিতে পারে নি, কাজে তা বোঝাবার এই হল প্রশস্ত সময়। পরস্পরের অসুখ-বিসুখে দেখবে কে? দুঃখের সময় পাশে দাঁড়াবে কে? নিশুতি রাতে রোগীর ডাক এলে হাতাহাতির কথাই শুধু ভাববে কুন্তলা? মাথা ধরলে যে অ্যাসপিরিনের সঙ্গে একখানা মমতামাখা হাতেরও দরকার হবে তা ভাববে না?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম—তা দুজনে নিরালা থেকে যে কথা তাকে সমঝাতে পার নি, ঘরসুদ্ধ অন্য লোকের মাঝখানে তা বোঝানো বোধ হয় তোমার পক্ষে সহজই হয়েছে!

শ্যাম আর সইতে পারল না। বলল—ছাই হয়েছে। খাল কেটে অন্য একটা কুমির এসেছে!

অভয় দিতে আমি খুব মজবুত। হেসে ফেললাম। কুমির এসেছে তাতে কী রয়েছে? গায়ে হলুদ মেখে এগিয়ে যাও। কুমির তো ভাগবেই, চাই কি, গায়ে হলুদের দিন এগিয়ে আসতে পারে।

আপনি বোঝেন ছাই! এই আপনার সাইকলজি পড়ানোর নমুনা! রাগে গরগর করে বেরিয়ে গেল ডাক্তার শ্যাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় ডাক্তার এল না। অন্য আর একজন এসে ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে আজ ডক্টর শ্যাম ছুটি নিয়েছে। তার সন্ধ্যার রাউন্ডটা এই ডাক্তারকে গছিয়ে গেছে। বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে পাশের ওয়ার্ডে একটু উঁকি দিয়ে এলাম। মিস কুন্তলা একা নয়, চুপ করেও নয়। তার ভিজিটারের মুখে খই ফুটছে। আর কুন্তলার চোখে হাসি।

পরের সন্ধ্যায় শ্যাম আবার এল। কিন্তু পাশের ওয়ার্ডে যাবার কোন চাড় নেই। ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। বারান্দার দিকে এক পা এগোয় তো দু পা পেছিয়ে ঘরে ঢুকে আসে। বুঝলাম যে লড়াই করবার মতো বুকের পাটা নেই ডাক্তারের।

অন্যের দুঃখের কথা নিজে খুঁচিয়ে তোলা ঠিক নয়। তাই আমি চুপ করে আছি। ওদিকে ডাক্তারই বা নিজে কী করে মুখ ফুটে বলে যে তার হার হয়ে যাচ্ছে!

তবু আমি শেষ পর্যন্ত শুরু করলাম—ডাক্তার, তুমি যে কাল এলে না! শরীর খারাপ ছিল না তো?

ডাক্তার করুণভাবে শুধু চাইল একবার।

আবার বললাম—আজও মনে হচ্ছে তোমার শরীর-মন তেমন ভালো নেই। কাউকে তোমার ডিউটি দিয়ে দিলে পারতে।

না-না, তা কী করে হয়? কাজ তো করতেই হবে। খুব নিচু স্বরে উত্তর দিল ডাক্তার। দিয়েই থেমে গেল।

কিন্তু থামলাম না আমি। যে 'ডুয়েল' দ্বৈরথ যুদ্ধে লড়তে চলেছে সে, লড়াইয়ের কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। লড়তে অবশ্যই হবে। আর নিজের কোর্ট বজায় রেখে। যে আগে থেকে বিনা যুদ্ধে সব ছেড়ে দেবে সে তো বীর নয়। বহু যুগ থেকে তো কথাই আছে যে সাহসী ছাড়া কেউ সুন্দরীকে পায় না।

বোঝালাম তাকে। বললাম—তুমি কাল আস নি কেন তা বুঝতে পারি, আমি কিন্তু উঁকি মেরে দেখে এসেছি। যা তুমি বলতে পার নি, আর যা আমি আন্দাজ করেছিলাম, তা দেখে এলাম।

আপনি কি দেখে এলেন? —চাপা উৎকণ্ঠা ডাক্তারের প্রশ্নে।

কিছুই না, আবার সব কিছুই। —এটুকু বলে যেন পত্রিকাতে মন দিলাম।

ডাক্তার ধৈর্য রাখতে পারল না। বলল—বলুন না আপনি, পত্রিকাতে ক্রশওয়ার্ড পাজল নেই যে অমন করে ধ্যান করতে হবে।

কনুয়ে ভর দিয়ে একটু উঠে বসলাম। হেসে বললাম—আমি ধ্যান করতে যাব কী দুঃখে? সে তো করবে তুমি। তা দেখ, শুধু যদি ধ্যানই করো তো পাশার দানে তোমার হার হবে। ও হাতিয়ার এ যুগে অচল।

ছেলেমানুষ ডাক্তার, অন্তত আমার তুলনায় তো নিশ্চয়ই। ছেলেমানুষের মতো নির্ভর করে বলল—দিন না আমাকে সেই হাতিয়ার যাতে কাজ হবে।

কি করে বোঝাই বেচারাকে? আমাদের রোজকার জীবনের সীমানায় এ জিনিসটা পুরোনো হলেও নতুন। বই পড়ে আমাদের মন পেকেছে, কিন্তু হাতে খড়ি এখনও পাকা হয় নি। মন্ত্র করেই সাধনায় সিদ্ধি নাও হতে পারে। কিন্তু এসব হল ভারী ভারী সাইকলজি মনস্তত্ত্বের কথা। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না।

শুধু বললাম—দেখ কুন্তলা হচ্ছে একালের মেয়ে। একেবারে স্ট্রীম লাইন করা পালিশ তার মন। তোমার সঙ্গে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাতেই বুঝেছি। কিন্তু শুধু মন্ত্র পড়ে পাবে না ওর মতো মেয়েকে। পেতে হবে মন জয় করে। সেজন্যে তুমি কী করেছ?

বলুন, কী করব?

দেখ ভাই, কোনও শাস্ত্রে এর মন্ত্র লেখা নেই। কেমন করে মন পাওয়া যায় তা আমাদের সাইকলজিস্টরাও জানে না।

কিন্তু এত দিন তো মনে হচ্ছিল যে কুন্তলা আমায় ভালোবাসে। শুধু বিয়ে করে সংসার পাততে চায় নি এই যা!

এখনও হয়তো ভালোবাসে। তুমি আগে থেকেই ভড়কাচ্ছ কেন?

উঁহু, এখনও যদি ভালোবাসবে, তাহলে ওই ডাক্তার চৌধুরীটাকে অত আমল দিচ্ছে কেন? কটা গায়ের রঙ আর কড়া ইস্ত্রির ট্রাউজার নিয়ে হাজির হলেই হল, অমনি কুন্তলা ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কত খুশি, কত গল্প-গুজব। আমি লোকটা যেন উবে গেছি! চোখেই আর দেখতে পায় না।

প্রেমকেও লোকে চোখে দেখতে পায় না। কোনদিনও পায় নি। তা বলে কি সে বস্তুটা উবে গেছে সংসার থেকে?—পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলাম।

কিন্তু একজন প্রেমে পড়েছে কি না, বা অন্য কাউকে ভালোবাসছে কি না তা বুঝতে কষ্ট হয় না লোকের।

কিন্তু কষ্ট হয় ভুল বোঝার জন্যেই বেশি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল ডাক্তার। জড়িয়ে ধরল আমার হাত। ব্যাকুলভাবে বলল—আপনি বলতে চান আমি ভুল বুঝেছি? বলুন, বলুন আপনি, কেন তা মনে করেছেন?

আমি কিছুই মনে করছি না ডাক্তার। মনে করবার মতো মালমশলাও আমার কাছে নেই। তবে তোমায় একটা কথা জানিয়ে রাখছি। তুমি হচ্ছ এ কালের ছেলে। যাকে ভালোবাসবে সে বিয়েকরা বৌ না-ও হতে পাবে। যাকে ভালোবেসে বিয়ে করবে তার ভালোবাসাও না টিকতে পারে। একালে এ দাম মানুষকে দিতে হবেই। যদি তুমি রাজি না থাক, ফিরে যাও তোমার বাপ-ঠাকুর্দার গ্রামে। তাদের কালের ছাপ-মারা কোনও মেয়েকে নিয়ে সংসার পাত। তবে একালের ঢেউ যে কোনদিন তার কলসিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না, এ গ্যারান্টি তোমায় কেউ দিতে পারবে না।

আঃ। আপনি কী যা তা বলছেন দাদা! আমি ভাবছি কুন্তলার কথা। আর আপনি যত্তো সব..

হেসে বাধা দিয়ে বললাম—আর আমি যত্তো সব কুইনিনের বড়ি ঝাড়ছি! কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে চিরকালই কুইনিন। তেতো, এমন কি বিষ। কিন্তু বিষ খেয়েই আজকের প্রেম হয়ে উঠেছে নীলকণ্ঠ। খাঁটি—অমৃত।

তার মানে?

মানে খুব সোজা। আজ যদি কুন্তলা তোমায় ভালো না বাসে, আমার নিষ্ঠুর কথাগুলোর জন্যে তুমি ক্ষমা করো ভায়া, তাহলে জানবে যে সে যদি তোমার স্ত্রী হতে রাজি হয়ে থাকে, আর কথা রাখবার জন্য তোমায় বিয়েও করে, তার ভালোবাসার মধ্যে ফাঁকি থাকবে। যদি তোমার সঙ্গে এত মেলামেশা, এত সুখ-দুঃখের প্ল্যান কষার পবও ওই ডাক্তাব চৌধুরীর দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকে আর শেষ পর্যন্ত তোমায় এবং আরও অনেককে বাজিয়ে নিয়ে তাকেই বিয়ে করে, তাহলে জেনে নিয়ো যে চৌধুরীকে ভালোবাসাটাই খাঁটি।

ওঃ, আপনি যে সোনা কষতে বসেছেন! জহুরি। আপনি পাকা জহুরি, দাদা!

ওর কথার মধ্যে বিদ্রূপ আছে কি না তা ভাববার মতো মন ছিল না। আমি বলে চললাম—সত্যিই আজকালকার ভালোবাসা কষ্টিপাথরে যাচাই হচ্ছে রোজ। রাতদিন। ঘোমটার আড়ালে, কৌটোর ঢাকনার নিচে যাকে ঢেকে রাখা হয় নি, তাকে আপন করে রাখতে হবে শুধু তোমার ভালোবাসা দিয়ে। সব পুরুষের মাঝখানে তোমাকেই হতে হবে সেই পুরুষ যার জন্যে কুন্তলা পথ চেয়ে থাকবে। ঠিক যে রকম এত মেয়ের মধ্যে কুন্তলাই সেই মেয়ে, যার জন্য তুমি ডিউটি সেরেও হাসপাতালে এসে ঘুরঘুর কর। বলবে তো ভাই, কোন্‌টাতে বেশি সুখ? বেশি লাভ? রোজকার লড়াইয়ে, অহরহ সাধনায় জয়লাভ করে পেয়ে? না, একদিনের গাঁটছড়ায় বেঁধে সিন্ধুকে তালাচাবি দিয়ে রেখে? পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাও। মুখের কথার লড়াইয়ে যদি বা হেরে যাও, মনের কথাই তোমায় জিতিয়ে দেবে। ভালোবেসে মন পাওয়া—সে তো শুধু কথার কথা নয়।

শ্যাম উঠে দাঁড়াল। কোমরের বেল্টটা একটু এঁটে নিল। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার।

তাই শেষ কথাটা যোগ করে দিলাম,—ঘাবড়িয়ো না মোটেই। চৌধুরীর চটক বেশি থাকতে পারে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নেরও তা ছিল।

ডিউক অব ওয়েলিংটন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পা ফেলার মধ্যে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

আবার আটপৌরে প্রফেসারি জীবনে ফিরে এসেছি। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে এক ক্লাসে সাইকলজি পড়ে। সারাদিনে মাত্র ঘণ্টা দুই ক্লাস। বাকি সময়টা নোট বই লিখি। আর সন্ধ্যায় প্রত্যাশা করি ডাক-পিয়নের হাতে একটা লাল খামের চিঠি, ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছ থেকে!

সাদামাঠা গল্প

দেখব নাকি একখানা চিঠি লিখে মিসেস রুজভেল্টকে?

ওদের আমেরিকা হল গিয়ে সোনার দেশ, ডলারে মোড়া। একটা ডলার আবার গোটা চার-পাঁচ টাকার সমান। আমার মানসিক ব্যর্থতার কাহিনি চিঠিতে জেনে উনি দিতে পারেন ডলার দশেক পাঠিয়ে। একজন ইয়ং-ম্যানের ফ্রাস্ট্রেশন (যুবকের মানসিক বৈকল্য) ওদের দেশে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার বলে ওরা ধরে নয়। এই তো সেদিন মিসেস রুজভেল্ট এদেশে ঘুরে বেড়িয়ে গেছেন। এদেশের সবরকম কষ্টই নিজের চোখে দেখে গেছেন। কাজেই আমার চিঠিতে অবিশ্বাস করার মতো কিছু থাকবে না। নিজের দেশের মান আর নিজের নাম বজায় রাখবার জন্য নিশ্চয়ই একটা কিছু সাহায্য পাঠিয়ে দেবেন।

আই. এ. পাশ অকিঞ্চন ভাবছে পাশের বাড়ির রোয়াকে বসে। এই সুবিধাজনক রোয়াকটি তার ও পাড়ার আর গুটিকয়েক ছোকরার বিনা খরচের, বিনা খাজনার জমিদারি। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্ষ্যান্ত-ঝি চেঁচামেচি করে এ নিয়ে। কিন্তু তোর তাতে কী বাবা? তোর মনিব যখন কিছু বলে না, আর তোকেও আমাদের জন্যে একবারও বেশি ঝাঁটা লাগাতে হয় না, তখন কেন এত আপত্তি?

অবশ্য মনটা যখন প্রসন্ন থাকে—অর্থাৎ যখন মনে হয় যে এই বিজ্ঞাপনটি ঠিক আমাকেই তাক করে কাগজে ছাপিয়েছে বা আজই সম্ভবত একটা বড় চাকরির দরখাস্তের ভালো উত্তর আসবে, তখন অকিঞ্চন মনে মনে ক্ষ্যান্ত ঝিকে ক্ষমা করে। বলে—কলেজে তো আর পড়ে নি। তাই ও বেচারা জানে না যে 'ডগ ইন দি ম্যাঞ্জার' পলিসি করছে। রোয়াকটি ওর নিজের ভোগেও লাগবে না, তবু আমাদের ভোগ করতে দেবে না, এটা যে কত অন্যায় তা ক্ষ্যান্ত ঝি জানে না।

তবে সারা দুনিয়াটাই যেখানে আমার উপর অন্যায় করছে সেখানে শুধু পরের বাড়ির ঝি ক্ষ্যান্তর ওপর রাগ করে কী হবে? কত বড় অন্যায় ভেবে দেখুক একবার প্রেমোৎপল, নির্ঝর আর নবীন। ওদের কাছেই আমি আজ একথা বিচারের ভার দেব—যখন ওরা এই রকে রোজকারের মতো আড্ডা জমাতে আসবে। ওরাই বিচার করে বলুক কত ঘোর অন্যায়।

আজ বিকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল ম্যাচ আছে। এই খেলাটির উপর নির্ভর করছে এবারকার লীগ জেতা। অন্যান্য দিন আমি গড়ের মাঠের উঁচু দিকটায় দাঁড়িয়ে গলাটা বকের মতো তুলে ধরে খেলা দেখার চেষ্টা করে কোনও মতে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে ফিরে আসি। কই, গড়ের মাঠে যাওয়া-আসার জন্য কোনদিন তো বাবাকে ট্রামের পয়সা দিতে বলি নি। এমন কি, মার কাছেও চাই নি লুকিয়ে লুকিয়ে। তবে এত কৃপণতা কেন?

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা হচ্ছে স্পেশ্যাল। আজ খেলাটির উপর লীগের কলকাঠি নির্ভর করছে, আর কাল রাত্রে বহুবার এই খেলাটির স্বপ্ন অকিঞ্চন দেখেছে ঘুমের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গল তো প্রায় গোল করে দিয়েই ছিল। নেহাত সে নিজে আকাশ ফুঁড়ে নেমে এসে মান্না সেজে গোল লাইনের উপর থেকে অমন জোরালো কিকটা না করে দিলে কি আর রক্ষে ছিল? অবশ্য ভাগ্যিস ডান পায়ে কিক করেছিল বলে দেওয়ালে পা টা লেগে একটু পা ব্যথা হয়েছে। কিন্তু বাঁ-পায়ে কিক করলে বোগাস ছোট্‌কনটার গায়ে নির্ঘাত লাথি লাগত। ও আহাম্মকটি আবার বড় সুশীল ও সুবোধ বালক। চোখে চশমা এঁটে মুখ বুজে বই মুখস্থ করে। খেলাধুলোর মর্ম কিছুই বোঝে না। কাজেই একটা চেঁচামেচি লাগাত।

যাই হোক, গোলমাল কিছু হয়নি। আর এই পায়ের চোটটা মোহনবাগানের কল্যাণ কামনায় সামান্য একটু উৎসর্গ মাত্র। আজ কলকাতার সব লোকই যদি এমনভাবে একটু একটু আত্মোৎসর্গ করত, তাহলে দেশটি কি আর এত পেছনে পড়ে থাকে না মোহনবাগানের হারার কোনও কথা ওঠে?

কিন্তু বাবা বুড়ো অত্যন্ত বে-দরদী। একটুও বোঝে না যে আজকের দিনে অন্তত খেলাটি মাঠের বাইরে থেকে দেখলে চলবে না। অচ্ছুতের মতো মন্দিরের বাইরে থেকে দেবী দর্শন না করে ভিতরে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে দেখা অত্যন্ত দরকার। তাতে শুধু যে প্রাণের শান্তি হবে তা নয়, মনের ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ উন্নয়নও হবে। আর সবাই মিলে এক সঙ্গে এক মন এক কণ্ঠ হয়ে একটা দলকে উৎসাহ দিলে জাতীয় একতার দিকেও

যে কতখানি এগিয়ে যাওয়া যায়—তার দাম কে বোঝে?

অন্তত অকিঞ্চনের বুড়ো বাবা তা বোঝেন না। চশমাটা নাকের ওপর থেকে নামিয়ে হাতের পত্রিকাটা পাশে সরিয়ে রেখে কৃতী ছেলের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার পর গত রাত্রি হাঁপানীর চোটে দুর্বল বুকটার উপর হাত বুলোতে বুলোতে একটু কেশে জিজ্ঞাসা করলেন—মোহনবাগানের খেলা? তার জন্য পয়সা চাই? কিন্তু বাপু, কবে থেকে এ সংসারে দুটো পয়সা ফেলবে বলতে পার? শুধু বুড়োর পেন্সনে যে আর চলে না! চোখ বুজলে চালাবে কী করে? দশ-দশটা মুখের খোরাক আসবে কোথা থেকে?

বলেই হাড়কৃপণ বাবা হৃদয়হীনভাবে চোখের উপর চশমার ঠুলিটা আবার এঁটে নিলেন। দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল মোহনবাগান।

চোখের সামনে দিয়ে যেতে শুরু করল অফিসযাত্রীর দল। একসময় অকিঞ্চন ওদের একটু অনুকম্পার চোখেই দেখত। ভাবত, ওরা সামান্য কটা টাকার জন্য নিজেদের গোলামখানায় বিকিয়ে দিয়েছে। ছিঃ, লেখাপড়া কি মানুষ শেখে এই জন্য. এসে বড় হবে, অনেক বই পড়বে, অনেক বিদ্যা অনেক বুদ্ধিতে সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই তার আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলেবেলায়। অতএব সে অফিসে কেরানী হবে না।

তার পর আরও একটু বড় হয়ে সে আরও একটা কারণ বের করল যার জন্য সে ওই বৃত্তি গ্রহণ করবে না বলে ঠিক করল। অফিসে কেরানীর অর্থাৎ কলম মজদুরের কাজ করে সে পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ চিরকাল বজায় রাখতে সহায়তা করবে না। যতদিন পর্যন্ত মার্চেন্ট অফিসগুলি মালিকের টাকা সমানভাবে সবাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেবার বন্দোবস্ত না করছে, আর সরকারী অপিসগুলিতে সকলের সমান মাইনের হার না চালু হচ্ছে, অন্তত‌পক্ষে ভিতরে ভিতরে বুর্জোয়া কংগ্রেসের পাঁচশো টাকার নিয়মটি কাজে না লাগানো হচ্ছে, ততদিন সে অফিসের ছায়া মাড়াবে না। সে পাবে পঁচিশ আর ম্যানেজিং ডিরেক্টার পাবে পাঁচ হাজার. এই অসম্মানজনক ব্যবস্থার মধ্যে সে নেই।

সরসী অবশ্য সেরকম যুগান্তকারী সংস্কার না আসার আগেই দল ভেঙে চাকরিতে ঢুকে পড়েছে আর সকাল-বিকেল চিনির ভারবাহী সেই বিখ্যাত জন্তুর মতো অফিস আর বাড়ি করছে। অফিসের মুনাফা ভাগে বা ভোগে কোনও কিছুতেই সে নেই। আছে শুধু হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে গরিবের রক্তশোষা মুনাফাটা বাড়িয়ে দেবার জন্য। সরসী অবশ্য বলেছিল যে বাপের বিনি পয়সার হোটেলে আর চলছে না বলেই নেহাত চাকরি নিতে হয়েছে। কিন্তু ওসব ওজরে ভবীরা ভোলে নি। কেন, বাপ-মার দায়িত্ব নেই নাকি আমাদের প্রতি যে আমাদের আদর্শ নষ্ট করে শিঙ ভেঙে গোয়ালে ঢুকতে হবে? আমরা জন্মেছি বড় কাজের জন্য। শুধু ডাল-ভাতের বন্দোবস্তের উদ্দেশ্যে জীবনটা ঘানিতে জুতে দেবার জন্য নয়। যতদিন সেই বড় কাজ হাতের কাছে না এগিয়ে আসছে, ততদিন অবশ্য এমনই করে রোয়াকে বসে সে সম্বন্ধে আলোচনা চালিয়ে আদর্শটা জীইয়ে রাখতে হবে।

সেকথা মনে হতেই অকিঞ্চন ভেতরে ভেতরে একটু বল অনুভব করল। শরীরটা নাড়াচাড়া দিয়ে একটু বুকটা চিতিয়ে বসল। সাদামাঠা জীবন তার জন্য নয়।

কিন্তু আজকের ফুটবল ম্যাচটা? সামান্য এই ক-আনা পয়সার জন্য বুড়ো বাপের কাছে হাত পাততে হয়। কথাও শুনতে হয়। আবার তাতেও পয়সা মেলে না।

এরকম অসহ্য অন্যায় আর কতদিন সওয়া যায়? রাগের চোটে নতুন কিছু ভাববে বলে সে ঠিক করল। নতুন কিছু। ভাবতে শুরু করল অকিঞ্চন। এরকমভাবে সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাই ভালো, না কখনও কখনও বিশেষ ব্যাপারের সময় বাড়িতে হাত পেতে চেষ্টা করে দেখাই ভালো, না একটু লুকিয়ে লুকিয়ে আদর্শ ভেঙে কিছু কাজ করে উপায়ের চেষ্টা করা চলতে পারে? কই, এখনও নবনী নির্ঝর এরা এসে পৌঁছোয় নি। নিরিবিলিতে একটু ভেবে দেখা যাক। ওরা এসে হাজিরা মারলে এসব কথা আর ভাবতে দেবে না। এরকম কথা ওদের কাছে পাড়তেও লজ্জা করবে।

না, মিসেস রুজভেল্টের কাছে লিখে কোনও সুবিধে হবে না। গোটা কয়েক টাকা অবশ্য দিতেও পারে পাঠিয়ে, কিন্তু তা পেলেই নবনী কোম্পানি তাতে ভাগ বসাতে চাইবে। অন্তত নীলকণ্ঠ কেবিনে রোজ সন্ধ্যায় খাবার তাগাদা দিয়ে সত্যিকারের সোস্যালিজম চালাবে আমার পকেটের ওপর। তারপর আবার পকেট গড়ের মাঠ, আর আবার সেই একই চালচুলোহীন অবস্থা। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তার চেয়ে একটা বাঁধাধরা উপায় মন্দ নয়। কিন্তু কই, তার তো কোনও পথ দেখছে না অকিঞ্চন।

ওসব লেখাপড়ার লাইনে কিছু সুবিধা হওয়া বড় শক্ত। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহড়া দেবার জন্য অনেকগুলি "দিবস" সে পালন করতে কসুর করে নি। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের ব্যাটন আর গুলির ভয়ও সে করে নি। ভেবেছিল যে ভিয়েৎনামের দিবস পালনের মধ্যেও ভারত স্বাধীনতা দিবস মেশানো আছে। ভেবেছিল টেনিসনের সেই 'চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড' কবিতাটার সৈন্যদের মতো—

Their's but to do and die.
Their's not to reason why...

তারও স্বাধীনতা যুদ্ধে শুধু প্রাণ ঢেলে এগিয়ে যেতে হবে নির্বিচারে। সেই ডিসিপ্লিনেই হবে তার পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় অবশ্য পাশ সে করেছে, তবে দুর্ভাগ্যের কথা, কলেজের অ্যানুয়াল পরীক্ষায় পাশ করে নি। আর পার্সেন্টেজেও যে ঘাটতি পড়েছে তা বুঝতে পেরে সে নিজে থেকেই কলেজ থেকে রেহাই নিয়েছে।

তার পর এই রোয়াকে সে রোজ পার্সেন্টেজ কমাচ্ছে।

ইতিমধ্যে যারা স্বার্থত্যাগ করল না, দেশের জন্য যুদ্ধ করল না, নির্বিবাদে পাশ করে গেল, তারাই এখন চাকরির বাজার গুলজার করছে। এমন জমাট ভাবে যে, কোনও ইস্কুলে পর্যন্ত তার মাস্টারি জোটানো শক্ত।

তার চেয়ে ভাবতেও মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল অকিঞ্চন—আজ একবার অফিস-পাড়াটা ঘুরে আসা যাক। যদি কিছু জুটে যায়; অন্তত প্রথম কিছু দিন নবনী কোম্পানিকে কিছু না বললেই চলবে। একটা চক্ষু লজ্জা তো আছে।

চোখটা ওপরে তুলতেই সামনের বাড়ির জানালায় অতসীর দিকে নজর পড়ল। অকিঞ্চনের বোনের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। এবার ইন্টার দিয়েছে, পড়াশুনোয় খুব মন। ভারি ইন্টারেস্টিং মেয়ে। ওর সম্বন্ধে আলোচনা করতে, ওর কথা ভাবতে, ওকে হঠাৎ দেখতে পেতে খুব ভালো লাগে। বোনের বন্ধু, সেই সুযোগে একটু ভাবসাবও যে করবার চেষ্টা না করেছে তা নয়। খুবই ভালো লাগে ওকে। সত্যি কথা বলতে কি, যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু লাভ কী? ভালো লাগায় কোনও লাভ নেই, যদি তার পিছনে আরও কিছু না থাকে। অকিঞ্চন জানে যে অতসীর বাবা-মা ওর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। বলছে যে হাতের কাছে এমন কোনও পাত্র তো নেই, কাজেই এখন থেকেই খোঁজখবর না নিলে চলবে কেন? হাজারটা সম্বন্ধ আর লাখটা কথায় একটি বিয়ে। কাজেই বছর দু-তিন আগে থেকেই খোঁজখবর নিতে শুরু করা দরকার।

কিন্তু হায় তার ঘাটে কোনদিন নিজের নৌকা ভিড়োবার আশা নেই অকিঞ্চনের। শুধু অতসী কেন, কোনও মেয়েই তাকে ভিড়তে দেবে এমন আশা সে ঠিক এই মুহূর্তে করতে পারছে না। কলেজের ভালো ছাপ তার কপালে পড়ল না। সময় কাটে রোয়াকে, না হয় পাড়ার মাঠে। কোনও অফিসে বা কাজের মধ্যে নয়। ভবিষ্যতের জন্য কোনও রঙিন আশা নতুন পথ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই অতসীর মতই সব কিছু জানালার পিছনে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে একটু গরম হয়ে উঠল কানের ডগাটা। তাহলে সব কিছু পাওনা, সব কিছু চাওয়ার মতো জিনিসই ওই জানালার লোহার শিকের পিছনে আড়াল হয়ে যাচ্ছে? সবকিছুই ছিনিয়ে নিতে হবে নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিচয় দিয়ে? বাপের হোটেলের কল্যাণে যে দেহ বাঁচানো যেতে পারে আড্ডা, ম্যাচ ও হৈ-হৈ যে উত্তেজনা প্রাণে সঞ্চার করে, তাতে বেশিদূর এগোনো যাবে না? পাড়ার লোক এর মধ্যেই যে ওকে বকা আর বাউণ্ডুলে বলতে শুরু করেছে এমন কথাও মা চোখের জল মুছতে মুছতে দু'একবার বলেছে ওকে।

নাঃ, এর একটা বিহিত করতেই হবে। সে গা আড়ামোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙে উঠে পড়ল। নবনী কোম্পানির সঙ্গে এবেলার মতো আড্ডা দেওয়া আর হল না।

অকিঞ্চন কয়েকটা অফিসে ঘোরাফেরা করেই বুঝল যে চাকরির বাজারটা কলেজের পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ব্যাপার। বাবার সময়কার চেনা কয়েকজন বড়বাবুর কাছে গিয়ে সে ধরনা দিল। কিন্তু চাকরির উমেদারি আর উমার তপস্যা, সে দেখল, সমানই শক্ত কথা। প্রার্থী এসে দাঁড়িয়েছে বুঝলেই, মহাদেব অর্থাৎ মহাবাবুর দুই নেত্রই সঙ্গে সঙ্গে সামনের ফাইলে ধ্যানস্থ হয়ে যায়।

সে অনেক অনুনয় করল। অনেক গলা-খাঁকারি দিল ও বিগলিত ভাব দেখাল। কিন্তু কিছুতেই বর

পাবার ভরসা পর্যন্ত পেল না। ধ্যান যদি বা ভাঙে, বড়বাবু এমনভাবে তাকান যে নেহাত কলিযুগ না হলে অকিঞ্চন একেবারে ভস্মই বোধ হয় হয়ে যেত। এত রাগ, এত তাচ্ছিল্য।

তাতে অবশ্য তার সঙ্কল্প আরও দৃঢ়ই হতে লাগল। বেকার-জীবনর অবসান আজই ঘটাতে হবে। এখনও কয়েকটি চেনা অফিসে চেষ্টা করা বাকি আছে। সম্ভব হলে একটা হেস্তনেস্ত আজই করে নিতে চায়। এখন আর নবনী কোম্পানির আদর্শ পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া বা ফুটবল ম্যাচ দেখতে না পাওয়া তাকে বিচলি করে তুলছে না। হাউইবাজির মুখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলেছে—সে ক্লান্ত হয়ে, ক্ষুন্ন হয়ে, প্রায় নিরুৎসাহ হতে হতে অন্য একটা অফিসে ঢুকতে ঢুকতে মনে মনে বলতে লাগল—হাউইবাজির মুখে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলছে; আজই এটাকে ওড়াতে হবে আকাশে। পলতে জ্বলে শেষ হয়ে যাবার আগেই।

কিন্তু হায়! পলতে জ্বলে ছাই হয়ে গেল এবং সে ছাই মেখে অকিঞ্চন ভীষণ একটা কিছু করবে ঠিক করে ফেলল।

শেষ যে অফিসে সে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গেল সেখানে বড়বাবুর শিবের ধ্যান আর কেউ বোধ হয় একটু আগেই ভাঙিয়ে গিয়েছিল। মদনভস্ম ততক্ষণে হয়ে গেছে। কারণ মদন অন্তর্ধান করে আত্মরক্ষা করেছে। চাপরাসী দাঁত বের করে হেসে কাঠের বোর্ডটি চোখের সামনে তুলে ধরল—বড় বড় কবে লেখা আছে : চিরকালের জন্য নো ভেকান্সি। তাতেও সে দমল না। কারণ সামনে বেড়া দেওয়া থাকলেও খিড়কি দিয়ে যে ঢোকা যায় সে কথা সে অনেক শুনেছে। অতএব সে যখন ঢুকতে চাইল, চাপরাসী তাকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে সরবে জানিয়ে দিল, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

তবু সে আবার ঢোকবার চেষ্টা করছে, এমন সময় দেখল বড়বাবুই বোধ হয় নিজে বেরিয়ে এলেন। চড়া গলায় বললেন—এই যে, আর এক ছোকরা ভ্যাগাবন্ড, চাকরি চাও নিশ্চয়ই! আরে বাবা, চাকরি তোমার বাপের পোতা গাছের ফল কিনা, ঝেড়ে নামালেই মুখে এসে সেধোবে। বলি, ক-জন্ম, তপস্যা করেছ?

আত্মসংবরণ করে সে বলল—স্যার, একটি ছোটখাটো চাকরি হলেও চলে যায়।

ব্যঙ্গের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বড়বাবুর মুখটিই একটি ব্যঙ্গ। তার উপর তিনি যখন আরও ব্যঙ্গের বিকাশ করলেন, তখন অকিঞ্চনের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পড়তে লাগল,—চলে যায়! বটে, ছোট চাকরিতেই চলে যায়? অবশ্য বড়সাহেব হয়েই তোমাদের শুরু করা উচিত, কেবল দয়া করে ছোট চাকরিতেই চালাতে চাও। যাও না, ওই যে বেগ, বরো অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি আছে, ওখানে বড়সাহেব হয়েই শুরু করতে পারবে। যাও, যাও, যত্তো সব ভ্যাগাবন্ড।

বলেই তিনি আঙুলটা যেদিকে এগিয়ে দিলেন সেটা তার নিজের বড়সাহেবের কামরা না ওই নামের কোন অফিসের পথ তা ঠিক বোঝা গেল না।

সিঁড়ির মাথায় নেমে আসছে, এমন সময় অকিঞ্চন শুনতে পেল চাপরাসী মহাবীরত্ব দেখিয়ে আস্ফালন করছে—হামি তো আগে ভি বলিয়েছে, নো ভেকুন্সি হ্যায়।

সর্বত্রই নেই নেই রব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হাউইয়ের ছাই অকিঞ্চনের মনকে ঢেকে দিচ্ছে এতক্ষণে। উৎসাহ নিভে গেছে এবং সে ঠিক করেছে যে কলকাতায় স্কোপ এত কম এবং চাকরি নিয়ে কাড়াকাড়ি এত বেশি যে এখানে ওর মতো লোকের কোনও আশা নেই। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন মনে সে হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। অন্যমনস্ক ভাবে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে ভিতরেও ঢুকে এল। সারাদিনের ব্যর্থতার পর মন এত ক্ষুন্ন ও অবসন্ন যে সে আর ভাবতেও পারছে না যে এরপর কোথায় যাবে বা কী চেষ্টা করবে! তবে কলকাতায় যে ওর কিছু হবার আশা নেই, এমন একটা সিদ্ধান্ত সে করে নিয়েছে। কাজেই খালি পকেটে ও বিনা টিকিটে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে নতুন জায়গায় একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কোন্ ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে সুবিধামতো ওঠা যায় তা ভেবে দেখবার জন্য সে প্ল্যাটফর্মে একটা বেঞ্চে বসল। এই কলকাতায় কিছু হবে না। বাইরে কোথাও গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে হবে।

পশ্চিমের একটা ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। সামনের একটা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসে একটু দিশেহারার মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে দেখে টিকিট-চেকার এসে টিকিট পরীক্ষা করে নিয়ে নিল। লোকগুলি যে কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। এদিক-সেদিক চেয়ে ওরা অকিঞ্চনের পাশে ও পিছনে লাগানো বেঞ্চের ওপাশে বসল।

কিছু করবার নেই বলে অকিঞ্চন ওদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখল। নেহাত দেহাতী লোক, শক্ত-সমর্থ কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নতুন। হাবভাবে একটু বিব্রত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। লোটা ও পুঁটলির দৈন্য দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে ওদের পকেটও তার নিজেরই মতো প্রায় গড়ের মাঠ। ভালো করে ওদের লক্ষ্য করতে লাগল। ওরা নিজেদের গেঁয়ো ভাষায় কথা বলছে। অকিঞ্চন ভাবল, ওরাও তার নিজের মতো টাকার সন্ধানেই বেরিয়েছে। বেঁচে থাকার সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। তার মতই ওরা স্বদেশ থেকে পলায়ন করেছে।

সে সমস্যা ওদের ব্যাকুল করে তুলেছে। পোঁটলা থেকে একটা আলুমিনিয়ামের গ্লাস বের করে প্ল্যাটফর্মের কলের জল খেতে খেতে একজন সে কথা তুলল। জয়পুরের কোনও গ্রাম থেকে অনির্দিষ্টের অদৃশ্যের সন্ধানে এই বিরাট শহরে এসে পড়ে সে একটু যেন ভড়কিয়ে গিয়েছে মনে হল। অন্য সবাই তার মতোই ভড়কিয়ে গিয়েছে। কিন্তু একজন বলে বসল যে ভয় পাবার কিছু নেই। স্টেশন থেকে বেরিয়ে শহরে একবার পা দিতে পারলেই হল। তার শোনার মধ্যে বহুলোক আছে যারা তার মতো নিঃসম্বল হয়ে এখানে এসে এখন শ্রীধনধনিয়াজী ইত্যাদি নাম নিয়ে লাখপতি হয়ে বসেছে।

আর একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—বল নি কেন এতক্ষণ? তাহলে ধনধনিয়াজীর কাছেই তো এখন পাওয়া যেতে পারে। আজ রাতটা ধর্মশালায় কাটিয়ে কাল তার কাছে গেলে ছোটখাটো একটা চাকরি তো জুটিয়ে দিতে পারবে। অন্তত আরম্ভ করবার মতো।

প্রথম জন প্রতিবাদ করে উঠল মনে হল। বেশ ঝাঁজ দিয়ে বলল—চাকরি করণে মটে কৈ ফয়দা নৈছে। সে আরও কী সব বলে গেল বোঝা গেল না। এটুকু বোঝা গেল যে, গেলামে হু দেখতা দেখতা হি কামালুঁলা।

'গেলামে' জিনিসটা কী? কোথায় ওরা দেখতে দেখতে টাকা কামাই করবে? উৎসুক হয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল অকিঞ্চন।

ওরা যদি 'গেলা' থেকে দেখতে দেখতে টাকা করে নিতে পারে সেই বা কেন পারবে না? বাপের হোটেলে এত কিছু আদর বা আরাম সে পেতে অভ্যস্ত নয় যে একটু কষ্ট করে বাজারের ভিড়ে বা রাস্তার ঠেলাঠেলিতে নিজের একটু ঠাঁই করে নিতে পারবে না। ওরা অত দূর থেকে কষ্ট করে এসে আস্তানাবিহীন অবস্থাতে মূলধন ছাড়া যা পারবে, অন্তত মাথা গোঁজবার জায়গা যার আছে সে কলকাতায় নিজের চেনা কোটায় তা করতে পারবে না?

এতক্ষণে বোঝা গেল, গেলা মানে রাস্তা। আচ্ছা, ওরা এত কাজের লোক যে রাস্তা থেকেই টাকা কামাতে পারবে? তবে আমি নিজে তা পারব না কেন? ফেরি করে, রকের কোনায় প্যাকিং বাক্সের কাঠের দোকান দিয়ে আজকাল উদ্বাস্তুরাও নিজেদের সংস্থান করে নিচ্ছে। তবে কেন আমি পারব না? কোনও না কোনও পথে পারবই। থাকুক ডালহাউসি স্কোয়ারের তপস্যা পিছনে পড়ে। আমি এগিয়ে যাব। পালাব না।

অকিঞ্চন ঠিক করল সে আর মিছেমিছি সময় নষ্ট করবে না। ওই দেহাতী জয়পুরী লোকগুলি বলেছে যে কলকাতায় এত উপায়ের পথ পড়ে আছে যে যো কি মর্জি আবে ওই লে যাবে। তারও মতি এসেছে, সেও নিজের পথ করে নিতে পারবে। সাদামাঠা ভাবেই তার প্রথম জীবন শুরু হোক।

দৃঢ় পদক্ষেপে একজন নতুন মানুষ প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হয়ে আসছে। সামনের লম্বা রেলিংগুলি ওকে বাধা দিতে পারবে না। জানালার শিকের ওপর অতসী ও সংসারের আরও অনেক চাওয়ার ধন তার পাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে।

বাল্মীকি

ফুলের মালাগুলি গলায় অসহ্য ঠেকছে।

শুধু অসহ্য নয়, ভারী আর গরম। গলাটা হাল-ফ্যাশনের গলাবন্ধ প্রিন্সকোর্টের কাছে বাঁধা দেওয়া। কিন্তু রায় সাহেবের তাতে কোনদিন অসুবিধা হয় নি। তার আগের জমানাতে কলার আর টাই পরতেন কিনা। কিন্তু আজ চাকরি জীবনের শেষ দিনটি। এতকালের বন্দী গলাটার আজ মুক্তি হবে। তবু আজই বাঁধনে

অভ্যস্ত গলায় ফুলের মালার বাঁধন সইতে পারছেন না।

মিস্টার রত্নাকর রায়। ভুল বুঝবেন না যেন। মিস্টার—এখনও শ্রী বলা পছন্দ করেন না। দেশী নামে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু ট্র্যাডিশনটা তিনি বজায় রাখতে চান। সর্বদা তাই করে এসেছেন। ব্রিটিশ জাস্টিসের আবহমান ধারা তিনি স্বাধীনতার আমলে সমানভাবে চালিয়ে এসেছেন। আজকের বিদায় সভায় সেজন্যে বিশেষ করে তাঁর গুণগান হয়েছে। বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় জেলার বড় জজ। নেহাত প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক, তাই মোটে সিলেকশান গ্রেড পর্যন্ত পৌঁছেছেন। হাইকোর্টের বুড়ি-ছোঁয়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তাঁর বিচারের সুনাম করেছে মামলার দুই পক্ষই। স্বাধীন মতের সম্মান দিয়েছে গবর্নমেন্ট। স্বাধীন যুগে রায় বাহাদুর খেতাবটা উঠে গেছে অবশ্য। কিন্তু লোকে তাঁকে এখনও বলে থাকে মিস্টার রত্নাকর রায়—বাহাদুর। বলে থাকে, ভালোবাসে বলে।

শেষ বক্তা ছিলেন সেখানকার একজন নামী সাহিত্যিক। বেশ ভাষার দখল দেখিয়ে, গলায় কাঁপন তুলে সভার মন একেবারে গলিয়ে দিলেন। বড় বড় মামলাগুলো থেকে জজসাহেবের জোরালো রায়ের টুকরো টুকরো দার্শনিক অভিমতগুলো তার মধ্যে ঝেড়ে দিলেন। খবরের কাগজে উঠত সেসব রায়ের টুকরো। হাইকোর্টের আপিলে ফুল-বেঞ্চ সেসব পড়ে শোনাতেন কোর্টকে। এমনই গালভারী আর জ্ঞানে ভারী সেসব বাণী।

একটা মামলায় ছিল খুন আর নারীহরণ। তাঁর জুরির প্রতি বক্তৃতায় নাকি তিনি লিখেছিলেন যে এই মামলার হেলেনের মুখখানা হাজার জাহাজ ভাসায় নি, কিন্তু হাজার লাঠি জোগান দিয়েছে দাঙ্গাবাজদের হাতে। এই মামলার প্যারিস তার সমস্ত ভাই-বেরাদরকে ট্রয়ের সৈন্যসামন্তে দাঁড় করিয়েছে। জেন্টেলমেন অব দি জুরি, আপনারা বিবেচনা করবেন যে এই মামলার মেনেলাস আর অন্যান্য আসামিদের আপনারা শুধু কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের (ঠাণ্ডা মাথায় খুনের) অভিযোগে দোষী দেখছেন কিনা। বিজ্ঞ হোমারের মতো দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ঘটনাটা বিচার করুন।

পুরোনো পত্রিকা থেকে পড়ে গেলেন সাহিত্যিক। হাইকোর্টও জজসাহেবের এই জুরির প্রতি বক্তৃতা থেকে অনেক টুকরো নিয়ে আলোচনা করেছিল। তারিফ করে বলেছিল যে জজসাহেব হোমারের মতো দিব্যদৃষ্টি আর বিচার-বোধ দিয়েই মামলাটা বিচার করেছেন। এত গোলমেলে জটিল সাক্ষী প্রমাণ ঘেঁটে এমন সুবিচার করা শুধু অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ নয়। সত্য আর সাধুতাই আছে এর মূলে।

পড়তে পড়তে গদ্‌গদ হয়ে সাহিত্যিক বললেন—ভারতবর্ষের এই অসাধারণ সত্যপ্রিয় সাধুতার অবতার বিচারককে আমরা বলব না রত্নাকর—তিনি হচ্ছেন বাল্মীকি।

কানে কি চোট পেলেন জজসাহেব? বক্তৃতা শুনতে শুনতে কানে, দু কানেই যেন আঙুল দিয়ে চুলকোতে লাগলেন। বিদায়-অভিনন্দনের জবাব দিতে গিয়ে তিনি বিশেষ কিছু জুত করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে গলার শেষ মালাটাও নামিয়ে ফেললেন। গলার কোটের বাঁধনটা ফেললেন খুলে। একগ্লাস জল খেয়ে নেহাত জোলো যাহোক কিছু বলে আবার বসে পড়লেন।

বাল্মীকি। বাল্মীকি।

বাল্মীকি তখন নদীর পারে একটা আঘাটায় ছিপ ফেলে মাছ ধরা মক্স করছিলেন। পুব বাংলার ছোট্ট মহকুমা শহর। তার সর্বময় কর্তা সদরালা হয়ে বিরাজ করছেন। এস. ডি.ও. সাহেবের সাহেবি চালচলন আর মেজাজ। বিলেত অবশ্য যান নি। নেহাত সুযোগ পান নি বলে। কিন্তু যে জিনিসটা শিখতে সুযোগ পেয়েছেন তাতে কোনও ত্রুটি রাখেন নি। যে স্টেশনে—মানে ইস্টিশানে নয়, সরকারি হেড আপিস শহরে—টেনিস নেই, গল্‌ফ্ নেই, সেখানে ইংরেজ এস. ডি. ও. সাহেবরা করেন ফিশিং।

অর্থাৎ ছিপ হাতে বসে ছুটির দিনটা কাটানো পুকুর পাড়ে নদীর ধারে। গাছে থাকে ছায়া আর হাতে বিয়ার। সন্ধের পর ক্লাবে তাঁর গল্প শুরু হয়। রাত যত বাড়ে সেদিনকার 'ক্যাচ' অর্থাৎ ধরা মাছটার সাইজও ততই বাড়ে। তাতে অবশ্য কেউ দোষ ধরে না। কারণ শখের শিকারীর ধরা মাছই নাকি পৃথিবীর সব প্রাণীর মধ্যে তাড়াতাড়ি মাপে বাড়ে।

কিন্তু গেল হপ্তায় এস. ডি. ও. অর্থাৎ মহকুমার পুলিশ সাহেবের মাছই নাকি সবচেয়ে বড় ছিল। কাজেই এস. ডি. ও. সাহেবের এই রবিবারের সাধনাটা একটু বেশি কড়া। আরও বড় একটা মাছ ধরতে হবেই। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে ফাতনার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু পাশেই যে নৌকোটা বাঁধা আছে তার

ভেতরে মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁর খেয়াল হয় নি। তাহলে এখানে এসে খুঁটি গাড়তেন না।

এক মালাই নৌকো। তার ছইয়ের নিচে লোকের চোখের আড়ালে যারা লুকিয়ে কথা বলছে তারা একটি পুরুষ আর একটি নারী। এস .ডি. ও. সাহেব একটা গলা-খাঁকারি দিয়ে ওদের ভাগিয়ে দেবেন কি? ফিশিংটা যে নাহলে মাটি হয়।

কিন্তু মেয়েটির গলার স্বর ভারি মিঠে, ভারি আকুলতায় ভরা। শোনাই যাক না কী কথাবার্তা হয়।

রঞ্জু আর অঞ্জনা। বুঝেছি, সেই চিরকেলে পুরোনো কাহিনি।

তুমি যেমন করেই হোক একটা চাকরি জোগাড় করো। বাবা কিছুতেই বেকারের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। রঞ্জু, রঞ্জু যেমন করে পার, এই চাকরিটি তোমায় পেতেই হবে। তাহলে এখনও একটা চেষ্টা করা যায়।

মেয়েটির অনুনয়ের উত্তরে রঞ্জু যা বলল তাতে সাহেব খুশিই হলেন। এস. ডি. ও, ভীষণ রাশভারী লোক। যেমন তাঁর দাপট তাঁর তেমনি নিরপেক্ষতা। যে তাঁর কাছে নিজের চাকরির সুপারিশ করতে যাবে বা মুরুব্বি পাঠাবে নির্ঘাত তার নাম কাটা যাবে। ওঃ বাবা। তার চেয়ে সিংহের গুহায় মাথা গলানো সহজ।

ছোট্ট মফঃস্বল শহর। চাকরির সুবিধেই বা কোথায়? আর যদি বা এক আধটা চাকরি থাকে রঞ্জিতের মতো নামকরা অকেজোর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বেই বা কেন? তার উপর এস. ডি, ও. সাহেবের কাছারিতে। তার বাঁশি বাজানোটা হয়তো একটা অযোগ্যতা বলেই সাহেব ধরে নেবেন।

অঞ্জনা? মাই গুডনেস! ওই রাজকন্যার মতো সুন্দর মেয়েটা? ওর সঙ্গে প্রেম এই বাঁশুরে রঞ্জিতের? রত্নাকর রায়ের মধ্যে এস. ডি. ও. হাকিম জেগে উঠল। তিনি কান পেতে রইলেন। শুধু সুশাসন নয়, সামাজিক নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থাও তাঁর কাজের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে বলে তিনি মনে করেন।

বাঁশির সুরের মতো করুণ শোনাল অঞ্জনার কথা। সে বলছে—না, না রঞ্জু! এস. ডি. ও. সাহেব এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আমি নিজেই আজ তাঁর বাংলোতে গিয়ে দেখা করব। অনুরোধ করব যে এই চাকরিটা যেন তোমাকেই দেন। দরকার হলে খোলাখুলি সব বলব। দুটো জীবন কি তিনি এমন করে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেন?

বিষণ্ণভাবে রঞ্জু উত্তর দিল—তুমি জানো না সাহেবের কথা। ন্যায়-বিচারটা ওঁর নেশা। মনটা একেবারে পাষাণের মতো। তুমি যদি বল যে আমি চাকরিটা পেলে তুমি বাপ-মায়ের অমতেও আমায় বিয়ে কববে তাহলে সোজা আমায় তাঁর এলাকা থেকে বের করে দেবেন। পেয়াদা সঙ্গে দিয়ে রাতারাতি খেদিয়ে দেবেন।

তাহলে? আমার বিয়ের দিন যে ঠিক হয়ে গেছে।

কোনও পথই নেই? আমি মরে যাব তোমায় না পেলে। আমার ভাগ্যে তাই আছে।

ছি! অমন কথা মুখেও আনতে নেই। আচ্ছা, তুমি এসব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা ভাবতে পার, তবু সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পার না? বোঝাতে পার না ওঁকে তোমার দরকারটা?

নাঃ বাবা। তার চেয়ে যমের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সহজ। ধর্মরাজও ধর্মাবতারের মতো অত মর‍্যালিস্ট নয়। যদি সুপারিশ করাতে যাই তাহলে ইন্টারভিউতে ডাকবেই না সাহেব।

শুনে রত্নাকর রায় হাসলেন। তাঁর ন্যায়-বিচারের, নিরপেক্ষতার সুনাম যে কতখানি ছড়িয়েছে তারই প্রমাণ। ছোকরা মরতে রাজি, তবু তাঁকে অন্যায় অনুরোধ করতে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রেমালাপের পথে কাঁটা হবেন না তিনি। রত্নাকর চুপি চুপি চলে এলন। খোশামোদে দেবতারাও তুষ্ট হয়। তিনিও একটু হচ্ছিলেন। এমন কি তাঁর এত সাধের ফিশিংটা যে মাটি হল তা সত্ত্বেও। কিন্তু পরের দিন চাকরি দেবার জন্য যখন দরখাস্তকারীদের ডাক পড়ল তখন তিনি সে কথাটা মন থেকে মুছে ফেললেন। এই ছোকরার তাঁর সম্বন্ধে এত উঁচু ধারণা যে আছে তা নিজের কানে শুনেছেন গোপনে। তবু তার জন্য খুশি ভাবটা মন থেকে মুছে ফেললেন। জাস্টিসের চেয়ে বড় কথা হুজুরের কাছে নেই।

রঞ্জিতের যখন ডাক পড়ল তখন তার মিনতিমাখা চোখের দিকে তাকিয়েই তিনি নিজের নজর অন্যদিকে ফেরালেন। চাকরি পাওয়াটা তোমার মরণ-বাঁচন সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমার ধর্ম তার চেয়ে বড়। আমি অবশ্য এক কলমের খোঁচায় তোমায় চাকরিটা পাইয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমিই তো যোগ্যতম প্রার্থী নও।

সব প্রার্থীর ইন্টারভিউ হয়ে গেল। সাহেব তাদের সবাকার যোগ্যতা শেষবার বিচার করতে লাগলেন। না, বাঁশি বাজালেও ছোকরা নেহাত খারাপ করেনি। দাঁড়িপাল্লায় একটু আলতো চাপ দিলে ওর দিকের

পাল্লাটাকেই ভারী বলে দেখানো শক্ত নয়। ছোকরা তাঁর উপর গভীর শ্রদ্ধা রাখে। ধর্মরাজের চেয়ে বেশি ন্যায়-বিচার করেন বলে মনে করে।

ঠিক বলেছে ছোকরা। বিশেষ করে সেই জন্যেই ওকে চাকরিটা দেওয়া যায় না। এ হেন চুলচেরা বিচারের জন্য তিনি নিজের উপরই খুশি হয়ে উঠলেন।

আবার ছোকরার কথা মনে পড়ল। তোমায় না পেলে আমায় মরতেই হবে। হ্যাঃ, ও-সব ছাঁদা কথা অনেকেই বলে থাকে। বিলেতে 'কাফ লাভ' বলে যে জিনিসটাকে ঠাট্টা করা হয় এটা ঠিক তাই।

কিন্তু মেয়েটার কথাও ভাবতে হয়। রঞ্জু হয়তো মনের দুঃখ একা একা সামলে নিয়ে কয়েক মাস পরে সব ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াবে। বড় জোর বাঁশি বাজানো কিছুদিন বন্ধ থাকবে। কিন্তু মেয়েটা অত সব শৌখিন ব্যাপার করবার ফুরসতই পাবে না। সানাই বাজার সঙ্গে সঙ্গেই মন বাঁধা হয়ে যাবে অন্য সুরে। তার পর আর একা থাকবার মোকাই মিলবে না। দুঃখের তো কথাই ওঠে না।

আচ্ছা, ধরে না হয় নিলাম যে মেয়েটারও খুব কষ্ট হবে। তা বলে আমি কি অন্যায় করতে যাব? ভজহরি যদি রঞ্জিতের চেয়ে এক রতি ভালো হয় তাহলে সোনা মাপার মতো করে আমি রঞ্জিতকে বাদ দেব। অঞ্জনা? না, অঞ্জনার মুখটি বড় মিষ্টি, ভারি সুন্দর মেয়েটি। ওর মুখখানা ম্লান হয়ে যাবে সেকথা ভাবতে কষ্ট হয়।

তা হোক একটু কষ্ট। ওকে একটা অপদার্থ বাঁশুরের হাত থেকে বাঁচাচ্ছি এ কথাও আমি অবশ্য মনে করে নিতে পারি। তাহলে কোনও কষ্টই হবে না। কিন্তু তা করতে যাব না। রঞ্জিতকে বাদ দিচ্ছি ন্যায়-বিচার করে। অঞ্জনা রঞ্জু এবং কেউ সে এলাকায় ঠাঁই পাবে না।

দিন দশেক পরে এস. ডি. ও. সাহেব দূরে মফঃস্বলে দশ ধারার মকদ্দমার বিচার করছেন। যারা "বি. এল." অর্থাৎ চাল-চুলোহীন আর হরেক অকাণ্ড করে বেড়ায় বলে পুলিশে সন্দেহ করে, তাদের একশো দশ ধারায় বিচার করা হয়। সাহেব এসব মামলায় একেবারে পাকা। পুলিশকে যেমন একচুলও মিথ্যে প্রমাণ সাজাতে দেন না, তেমনি সন্দেহ প্রমাণ হলে আসামিরও নেই রেহাই। কড়া মেজাজে তিনি এজলাস জাঁকিয়ে বসেছেন। পুলিশ আসামি সাক্ষী সবাই তটস্থ।

এমন সময় তার এল। সদর থেকে জানিয়েছে যে একটা আত্মহত্যা ঘটেছে মনে হচ্ছে। ভদ্রঘরের ছেলে রঞ্জিত বোধ হয় আফিম খেয়ে মরেছে। কিন্তু ছোট হাকিম আর হাসপাতালের ডাক্তার দুজনই বেমারী পড়ে আছেন।

রঞ্জিৎ? সেই বাঁশুরে ছোকরা রঞ্জু? জ্বালাতন! আত্মহত্যার আর সময় পেল না হতভাগা। হতভাগা তো একেই বলে।

ঠিক তো। আজই ভোরে অঞ্জনাদের কলকাতায় চলে যাবার কথা। বিয়ে কলকাতায় হবে। এ শহরে অনেক লোকে রঞ্জু-অঞ্জনার কথা জানে। বিশ্বাস নেই কে কখন শেষ মুহূর্তে ভাংচি দেবার চেষ্টা করে। রূপের শত্রুর অভাব নেই সংসারে।

হুড়মুড় করে সাহেব এজলাস ছেড়ে উঠে পড়লেন। মামলা স্থগিত রইল। পেশকার অন্য তারিখ দেখে ঠিক করে দেবে। তার আগে জরুরি তারে সদরে জানাবে যে তিনি ফিরে আসছেন। তিনি মোটের উঠে আরদালিকে জিনিসপত্র নিয়ে পিছনে আসবার জন্য বলে ঝড়ের মতো রওনা হলেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হরিসংকীর্তনের মতো ভিড় করে লোকজমা হয়েছে রঞ্জুর ঘরের সামনে। পুলিশ ইনস্পেক্টর দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে কয়েকটা কাগজ। পেছন থেকে লোকে ফিস ফিস করে অনুরোধ করছে—পড়ুন, পড়ুন না একটুখানি। শুনি একটু জ্যান্ত নাটক-নভেলের গল্প। ইনস্পেক্টরের মুখ হাসি হাসি। যেন হরিলুটের বাতাসা এখনি ছড়াতে যাচ্ছে।

রাশভারী রত্নাকর এক লহমায় সব ব্যাপার বুঝে নিলেন। ইনস্পেক্টারের হাতের কাগজগুলি তাঁর হাতে এল। সব ভিড় ভয়ে সরে গেল। এমন কি জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারা চোখগুলিও। শক্ত সুরে ইনস্পেক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন—এ ঘরের কোনও কাগজপত্র, জিনিস কিছু লিস্ট করেছেন? কিছু থানায় নিয়ে গেছেন?

না, হুজুর। আপনার আসার অপেক্ষায় আছি।

বেশ, খুব ভালো করেছেন। কিন্তু এটা যে আত্মহত্যা সেটা কি ডাক্তারসাহেব বলেছেন?

না, তিনি বাড়িতে শুয়ে আছেন। বোধ হয় আপনি এসেছেন খবর পেয়ে এসে হাজির হবেন। পোস্ট-মর্টেম তো করতেই হবে। তা ছাড়া ডেথ সার্টিফিকেট...।

আচ্ছা, আচ্ছা। সে সবই হবে। কিন্তু ফুড পয়জনিং, না ওপিয়াম সেটা জানলেন কী করে? আচ্ছা, ব্যাপারটা দেখে বুজে-সুঝে আমিই অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের বাড়ি যাব রিপোর্টটা লেখাতে। আর ছোট হাকিম সাহেবকে আর অসুখের মধ্যে হাঙ্গাম করাবেন না। আমিই তো এসে গেছি।

হ্যাঁ স্যার, আমাদেরও ভাবনা ঘুচল। অঞ্জনাদের বিয়ের পার্টি আজ ভোরে রওনা হয়ে গেছে।

এক মুহূর্ত ভেবে নিলেন এস. ডি. ও.। পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের নিয়মকানুন আবার তাঁর তাঁবে পড়ে না। বিয়ের তারিখটা হচ্ছে কাল।

তিনি যেন নিজের মনে মনেই বললেন—দেখুন পোস্টমাস্টারকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে ব্যাপারটার এখনও তদন্ত চলছে। এর মধ্যেই এ সম্বন্ধে কেউ কোনও তার কারও কাছে পাঠাতে চাইলে আগে যেন আমায় জানানো হয়। মানে, ডাকবিভাগের কোনও নিয়ম ভাঙা হোক এটা আমি চাই না। তবু, বুঝলেন তো ব্যাপারটা তদন্তের অধীন। এ সম্বন্ধে কোনও তারই কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। যান, যান, এখনই কথা কয়ে ঠিক করে আসুন। ততক্ষণে আমি একটু কাগজপত্র তালাস করে দেখছি।

বাইরে, ভেজানো দরজার বাইরে আরদালি দাঁড়িয়ে। ভিতরে তাড়াহুড়া করে রত্নাকর রায় সব কাগজপত্র পড়ে যাচ্ছেন। ছোকরা, ছোকরা বোকা। প্রেম কি এমন করে করতে হয়? চিহ্ন প্রমাণ রেখে? এই চিঠিগুলো; এই চিঠিগুলোর যে কোনটা হয়তো এরই ভালোবাসার পাত্রীর সারা জীবনের উপর ছায়া ফেলে যেতে পারে। ইউ "রেচ"। তুমি একটা হতচ্ছাড়া।

সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা দেহটির দিকে তিনি তাকালেন না পর্যন্ত। সবগুলো প্রমাণ ঘেঁটে দেখতে হবে! প্রমাণের জোরেই বিচার হয়।

"আমার অঞ্জু,

এই সুন্দর ধরণী থেকে আমি আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। মরবার সাহস আমার নেই, কিন্তু তোমায় ছাড়া বাঁচবার শক্তি আরও কম। তোমার সবগুলি স্মৃতি, তোমার সমস্ত স্পর্শ আজ আমার অঙ্গে বহন করলাম। আজকের রাত্রি আমাদের মনে মনে মিলন-রাত্রি হয়ে রইল।

আমি জানি তুমি আমায় পাগল বলবে। জানি তুমি বলবে যে এতই যদি আমি মরীয়া, তবে সাহস করে কেন হাকিম সাহেবের সামনে হাজির হয়ে সব বললাম না? সেই চাকরিটাই আমার শেষ ভরসা ছিল। কিন্তু তিনি হয়তো গোটা পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করে আমায় অপমান করতেন, তবু নিজের বিচার থেকে ভ্রষ্ট হতেন না। তাই পারলাম না।

আমি যে বিষ খেয়েছি তা অমৃত হয়ে উঠেছে আমার মনে। তুমি কাল ভোরে চলে যাবার আগে কেউ জানবে না এ খবর। তুমি যখন অন্যের হয়ে যাবে তখন আমায় আর দেখতে পাবে না ম্লান মুখে তোমার সামনে। মরণের মাধুরী অনুভব করতে শুরু করছি। আর লিখতে..."

এর পর আর কিছু লেখা নেই সে চিঠিতে। রত্নাকর রায় যেন ক্ষেপে গেলেন। ইউ কাউয়ার্ড, ইউ! এই বোকা দুর্বল ভীরু লোকটার প্রতি তাঁর কোনও সহানুভূতি নেই। তিনি বিচারই করে এসেছেন এত দিন। শুধু ন্যায়-বিচার। জীবনে অসত্যের শরণ কখনও নেন নি। নেন নি রত্নাকর রায়।

সবগুলি চিঠি, ছবি আর প্রমাণ তিনি জড়ো করে নিলেন। তাঁর পোর্টফোলিয়ো ব্যাগটিতে শুধু জরুরি কাগজপত্রই থাকে।

সেদিন রাত্রে নিজের বাড়িতে বসে সেসব তিনি দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। তার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ন্যায়বিচারের হাকিম, ধর্মরাজের চেয়ে বেশি সত্যবান রত্নাকরের মুখে ফুটে উঠল বেদনা। যে করুণ মমতা-ভরা বেদনা অনুভব করেছিলেন সেই পুরাকালে বাল্মীকি।

তার পর তিনি চেষ্টা করে একজিকিউটিভ ছেড়ে জুডিসিয়ারিতে চলে এসেছেন। অধর্ম অবিচার তাঁর ধাতে সইবে না। রক্তে নেই সেসব। কিন্তু সেই অধর্মটার চেয়ে বড় ধর্ম তিনি কখনও করেছেন কিনা তা বিচার করে খুঁজে পান না। যখনই সে কথা ভাবেন, ন্যায়-অন্যায় সবকিছু ছাপিয়ে মনের মধ্যে বেজে ওঠে একটা কাব্যের সুর।

যে গলায় এতগুলি ন্যায়-বিচারের পুরস্কার—ফুলের মালা পরেছিলেন, সেখানে আনমনে তিনি হাত বুলোতে লাগলেন।

নভোচারিণী

শেষ পর্যন্ত এরোপ্লেনটা কোনরকমে অজানা মাটিতে এসে নামল। দড়াম দড়াম করে মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ, যাত্রীদের চাপা আর্তনাদ আর কামরাটা একেবারে অন্ধকার।

ভাগ্যিস শুধু ওইটুকুই। বুক হাঁটু মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল সবারই। সিটের সঙ্গে আঁট করে বেল্ট দিয়ে বাঁধা পেট প্রায় ছিঁড়ে যায় যায়। কিন্তু প্রাণে যে বেঁচে গেলাম তাই যথেষ্ট।

আমিই কি ভেবেছিলাম যে এ যাত্রা রক্ষা পাব? বমি করতে করতে গলাটা প্রায় চিরে এসেছিল। মাথা ঘুরছে। বুক করছে ধুক ধুক। হুড়মুড় করে প্লেনের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা চলছে না। মনের মতো শরীরও অসাড় হয়ে এসেছে। শুধু এটুকু চৈতন্য ছিল যে প্লেনটাতে যখন এখনও আগুন ধরে যায় নি, ওদিকে ফিরে তাকালে বিপদ নেই। তাই পিছন ফিরে তাকালাম।

হাওয়াই জাহাজ তো নয়, যেন যমদূতের রথ। উঃ, এতক্ষণ কি পাগলা তাণ্ডবই না নাচছিল। ভিতরে আমরা একুশ জন যাত্রী। যেন খাঁচায় বন্দী পাখি। খাঁচাটা মাটির দিকে রওনা দিলেই প্রাণপাখিও আকাশের দিকে ফুড়ুত করে উড়ে যাবে। কিন্তু মামলা অত সহজে শেষ হবে না । তার আগে ভয়ে ছটফট করব। হাড়গোড় ভেঙে মারাত্মক জখম হব আর সব শেষে। পেট্রলের আগুনে জ্যান্ত জ্বলে মরব।

নতুন রকমের সহমরণ।

আর একবার প্লেনের দিকে ফিরে তাকালাম। মনু তখনও মাথায় হাত দিয়ে প্লেন থেকে নামার সিঁড়িটার শেষ ধাপে বসে আছে। বেচারি মনু, সে-ও আমার সঙ্গে আজ সহমরণে যেত।

অন্য সহযাত্রীরা ততক্ষণে আমার মন থেকে মুছে গেছে। এমনিতেই অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আপন প্রাণ নিয়ে সবাই দূরে কোনও গ্রাম আছে কি না তার খোঁজে সরে পড়েছে। পাইলট যে কোথায় গেল তা খেয়াল হয় নি। ভাগ্যের টানে আবার মনু আর আমি দুজনে একলা।

বিকেলের প্লেনটাতে আসাম থেকে কলকাতায় আসছিলাম। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর বাবার বিরাট কমলার বাগানগুলি পথে বসে গিয়েছিল। শুধু বাবার নয়, বাঙালি খাসিয়া সব কমলার ব্যবসাদারদেরই। রেলে বা স্টীমারে মাল চালান গেলে শুধু টুকরি আর পচা লেবুর গন্ধ ছাড়া আর কিছুই কলকাতায় পৌঁছাবে না। এদিকে শিলেটের দিকেও হিন্দুস্থানের কমলা অচল। কাজেই আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন আসে আসামে লোক নিয়ে, চালানি কাপড় আর হরেক রকমের মাল নিয়ে। ফেরত যায় খালি। দর কষাকষি শুরু করলাম একটা কোম্পানির সঙ্গে। ওদের প্লেনে নামমাত্র ভাড়ায় আলু, কমলা, তেজপাতা এসব চালান দেব কলকাতায়। ওদের যথা লাভ। আর আমার পৈতৃক ব্যবসাটা বেঁচে তো গেলই; অন্য সব জিনিসেরই চালানি কারবার আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল।

সবাই খুশি হয়ে পিঠ চাপড়িয়ে ছিল। বাহবা দিল আমার স্বর্গগত বাবার বিষয়বুদ্ধিকে। তিনি সব পরীক্ষায় রয়্যাল ক্লাস পাওয়া ছেলেকে আমেরিকায় বিজনেস্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যবসা চালানো শেখার জন্য এত খরচ করে পাঠিয়েছিলেন।

তার আগে অবশ্যই ছেলের বিয়ে দেওয়া দরকার। অনেক তোড়জোড় করে সম্বন্ধ ঠিক করলেন। দেশের লোকরা খুশি হল মানী শিক্ষিত ঘরে কলকাতায় বিয়ে হচ্ছে বলে, মেসের বন্ধুরা হাল-ফ্যাশনের বন্ধুপত্নী জুটবে বলে। কিন্তু আমার মুশকিলের খবর কেউ জানল না।

সাত মণ ঘি পোড়ানো শুরু হয়ে গেল বলতে গেলে। রাধাও যে নাচতে রাজি তা আমার জানতে বাকি নেই। বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে। দিনও প্রায় ঠিক হয়ে এল বলে। এখন একটু বিলেতি কায়দা-মাফিক পূর্বরাগে কারও আপত্তি নেই। মনুরও মনের নাগাল পেয়েছি।

একদিন রেড রোডে মটর ছেড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। গঙ্গার পার দিয়ে। একটার পর একটা ছোট আর মাঝারি সাইজের জাহাজের সারি জলের উপর ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমিও কিছু দিন পরেই ওর চেয়ে বড় জাহাজে পাড়ি দেব। মনু আমার হাতে একটু হালকা চাপ দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—আমিও যদি যেতে পারতাম তোমার সঙ্গে! তোমায় ছেড়ে থাকাই কত কষ্ট, তার উপর যাচ্ছ সেই দূর আমেরিকায়।

লক্ষ্য করলাম তার চোখ দুটি সে জাহাজের উপর থেকে সরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি বললাম—চল না, তুমিও চল আমার সঙ্গে।

সে চুপ করে রইল। আবার যেই তার হাতে একটু চাপ দিলাম, সে বলল—আমেরিকা যেতে আর সেখানে থাকতে কত খরচ লাগে তা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি।

ওঃ, শুধু এইটুকু আপত্তি? নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে বললাম—ওঃ, শুধু এইটুকু আপত্তি? তারজন্য একটুও আটকাবে না। তাহলে বল, আগে থেকে এখনই প্যাসেজ বুক করে রাখি।

মুচকি হেসে মনু বলল—তার মানে, তোমারও নিজের উপায় আছে?

আমিও হাসি বজায় রেখে বললাম—বা রে, বাবার টাকাও তো আমারই টাকা। ঠিক যেমন আমার টাকা থাকলে সেটা বাবার টাকা হত।

একটু ঝাঁজ দিয়ে মনু উত্তর দিল—শেষেরটা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে প্রথম কথাটার দৌলতেই বাঙালি ছেলেদের এত জুরিজারি। বাপের হোটেলের মতো এত ভালো জায়গা দুনিয়াতে আর নেই।

মনুকে আমি একটু একটু করে চিনতে আরম্ভ করেছি। ওকে ভালোও লাগে, ভয়ও করে। ও ভালোবাসে শুধু আমাকে, আমার পরিবেশসুদ্ধু মিলিয়ে আমার বাবার ছেলেকে নয়। তবু হাওয়াটা হালকা রাখার চেষ্টা করে বললাম—নিজের তাঁবু না গাড়া পর্যন্ত ওই আস্তানাটা মন্দ কী?

ব্যঙ্গ করে সে বলল—কেন আর একটা আশ্রমও তো আছে—সারং শ্বশুরমন্দিরং। তবে সেটা হচ্ছে শুধু ছেলেদের বেলা।

ওর ব্যক্তিত্ব, নিজের স্বাধীন মন, আলাদা জীবনের উপর টান আমাদের পাঁচজনের সংসারে ঠিকমত মিশ খাবে না। এদিকে ওর মতিগতিকে আমাদের সবার চোখে সহজ করে নিতে, আমাদের সবাইকে ওর চোখে সইয়ে নেবার জন্য আমিও থাকব না। অথচ একরকম পাড়াগাঁয়ে মানুষ সাবেকি বাবা-মা নতুন বৌকে বাড়িতে এনে যেভাবে তোলা তোলা করে রাখবেন তাতে মনু নিজেকে তালাচাবি বন্ধ বলে মনে করবে নিশ্চয়ই। ওই বাড়ি আর এই বৌ এ দুয়ের চাপে মাঝখানে শুকিয়ে ঝরে যাবে আমাদের সুখ, আমাদের জীবন।

সেদিন বর্ষার গঙ্গার রাঙা জলের পারে গোধূলি লগ্নে মনুর সঙ্গে যে কথা হল তাতে মনের মিলের ছাপ পড়ল না। আমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি তাকে চাই সংসারের মধ্যে, সবাকার মাজে, ঘরের মাটির মধ্যে। সে চায় আমাকে সংসারের বাইরে, সবার থেকে আলাদা, আকাশের রামধনুর মাঝখানে। তাই আমাদের নিরালা আলাপের উপর কোনও শাঁখের আওয়াজের, উলুধ্বনির আশীর্বাদ পড়ল না।

মনুই শেষ পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করল।

হেসে ফেললাম। বললাম—জানি না আর কোন্ বাঙালি মেয়ে নিজে থেকে বিয়ে বন্ধ রাখতে বলত। যদি তুমি আমায় ভালো না বাসতে তবু হয়তো বুঝতাম।

ছল ছল করে উঠল তার চোখ। ঠিক গঙ্গার বুকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে যাওয়া আলোর মতো। সে ম্লান স্বরে বলল—ভালোবাসি, তোমায় ভালোবাসি। স্থির জেনো, তোমায় ভালোবাসি। তোমারই জন্য অপেক্ষা করব। তবু, দুটি হাত ধরে মিনতি করছি। এখন বিয়েটা স্থগিত রাখ। আমার আমাকে যদি তোমার করে পেতে চাও, তাহলে তুমি ভবিষ্যতে ফিরে এলে আবার আমরা এখান থেকে শুরু করব।

মনুর বাড়িতে সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। আর আমাদের বাড়ি তো চটে আগুন। যত নষ্টের গোড়া ওই কলেজী হাল-ফ্যাশানে মেয়েটা। কয়েকদিন আগে হলে আরেকটা সম্বন্ধ ঠিক করা যেত। কিন্তু এখন আর সময় নেই। ওরা এত চটে গেলেন যে মনুদের আর কোনও খবরই রাখলেন না। প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে চিঠি লিখে মনুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। কিন্তু ওর বাবার অসুখের পর থেকে আর ওর কোনও চিঠি পেলাম না।

দু-তিনখানা চিঠি লিখে কোনও জবাব না পেয়ে আর চিঠি লিখি নি। দু বাড়িতে মন কষাকষি খুব হয়েছিল। ভাবলাম এমন অবস্থায় চুপ থাকাই ভালো। দেশে ফিরে খোঁজ নিয়েছিলাম বৈ কি। মনুর বাবা মারা গেছেন, আর ওরা কোথাও উঠে গেছে—শুধু এটুকু জানতে পারলাম। তার বেশি খবরও করি নি। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মেলামেশার দেশ থেকে সবে ফিরে এসেছি। কাজেই কোথায় বা মনু, আর কোথায় বা বিয়ে করার মন।

শিলচর থেকে প্লেনে উঠেই বুকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলাম। মনু, সেই মনু, যে আমার হতে পারত, সে এয়ার-হোস্টেস। আমার সামনে ট্রে ধরে আছে। আর আমি, আমি আমেরিকান রেয়নের ঝকমকে সুট পরে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছি!

চায়ের পেয়ালা পিরিচ তুলে নিতে সাহস হল না। কি জানি, যদি অন্য যাত্রীরা দেখে যে আমার হাত কাঁপছে? হয় তো কাঁপবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই কাঁপবে না। মনু তো আমার কেউ নয়, কেউ ছিল না তবু ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখি কী বলে?

খুব সহজ গলায় সে বলল—টি, প্লিজ।

আর কথা বাড়বার আগেই, লোকের নজরে পড়বার আগে আমি শুধু একখানা স্যাণ্ডুইচ তুলে বললাম—আর নয়, ধন্যবাদ।

তার পর কিছুই যেন হয় নি—কিছুই যেন ভাবছি না, নরম চেয়ারটাতে বসে মুখ জানালার দিকে করে শক্ত হয়ে বসে রইলাম। পুবদিক অন্ধকারে ভরে এসেছে। পশ্চিমে এখনও একটু রঙের ছোপ।

শুধু অন্ধকার নয়, ঘন মেঘ। হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ ভীষণভাবে প্লেনের পাখার একেবারে পাশ দিয়ে ঝিকমিক করে গেল। নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই প্লেনটা গোত্তা খেয়ে হাজার দুই ফুট সোজা নেমে গেল! পেটটা মনে হল ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রাণ যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসবে সেই ধাক্কায়। এয়ার-হোস্টেস গলা চড়িয়ে চেঁচাচ্ছে ইংরেজিতে—চেয়ারের বেল্টের সঙ্গে নিজেদের শক্ত করে বেঁধে নিন।

না। এই গোত্তাটার হাত থেকে কোনরকমে বেঁচে গেলাম। পাইলট কোনরকমে প্লেনকে সামলিয়ে তার নাকটা উঁচুতে তুলে নিল। তবু আমরা অনেকখানি নেমে এসেছি এক ধাক্কায়। আবার যদি একটা এয়ার পকেট অর্থাৎ হাওয়াহীন এলাকায় পড়ি, নির্ঘাত প্লেন বেসামাল হয়ে ভুঁয়ে আছাড় খাবে। ঝড় যেন মাতাল হয়ে ওলট-পালট করে আছাড় দিতে লাগল প্লেনটাকে। ঠিক ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মতো। কয়েকজনের সীটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখার বেল্ট ছিঁড়ে গেল টানের চোটে। বমি শুরু করল অনেকেই। আমিও। সবার সামনের জোড়া সীটে বসে ছিল নতুন বিয়ের বর কনে। প্রলয়ের দোলানীতে ওদের মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। এয়ার-হোস্টেস ছুটে গিয়ে ওদের সামনে কাগজের ঠোঙা ধরল। বমি যেন কারও গায়ে ছিটকে না পড়ে।

আমার সারিতে ও পাশে বসেছিল এক মাদ্রাজী অফিসার। চোখ তার একেবারে বোজা। হাত দুটো দু পাশে এলিয়ে পড়েছে। এয়ার-হোস্টেস কোনরকমে টলতে টলতে তার কাছে এল। শুকনো গলায় আমাকেই জিজ্ঞেস করল, ভদ্রলোক হার্টফেল করেছেন নাকি?

আমি তাকে জোরে নাড়ানাড়ি করতে লাগলাম। সে চোখ মেলতেই জিজ্ঞেস করলাম—কী মশায়, চোখ বুজে কী করছেন? প্রাণায়াম নাকি?

খুব নির্লিপ্তভাবে জবাব এল—প্রার্থনা করছি, হে ভগবান, মরব তো আজ নিশ্চয়ই। এখখুনি। কিন্তু ভগবান, প্লেনটা মাটিতে আছাড় খাবার আগে যেন হার্টের কলকব্জাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

এতক্ষণে মনু তাকাল আমার দিকে। শুধু এক নিমেষ। তারপরই আবার সে এয়ার-হোস্টেস।

শেষ পর্যন্ত পাইলট অনেক কৌশলে কোনরকমে একটা সমতল মাঠের মধ্যে প্লেনটাকে নামাল। আমরা একুশ জন প্রাণী প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু বেঁচে গেলাম। সবাই ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের সন্ধানে ছুটল। রইলাম পিছনে পড়ে শুধু আমি আর—আর মনু।

আস্তে আস্তে আমি ওর দিকে এগিয়ে এলাম। কিন্তু কিছু বলবার আগেই সে উঠে ওই প্লেনের আঁধার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে গেল। খুব অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাব কিনা ভাবছি এমন সময় দেখলাম সে ট্রে-হাতে বেরিয়ে এল। তাতে কাগজের গেলাস আর খাবার জল।

ইংরেজিতে বললাম—না, ধন্যবাদ, মিস্। আমার জলে দরকার নেই।

ইংরেজিতেই উত্তর হল—কিন্তু মুখে একটু জল ছিটিয়ে নিন একটু তাজা লাগবে। ফ্লাস্কের চা ঠাণ্ডা হয়ে

গেছে। কিছু কমলালেবু দিতে পারি।

বসলাম—তা কয়েকটা লেবু বাইরে নিয়ে আসুন। আপনারও খাওয়া দরকার।

একেবারে অন্য পৃথিবীর লোক এয়ার-হোস্টেস। খুব গা ছাড়া ভাবে বলল—আমি এখনও ডিউটিতে আছি। আগে যাত্রীদের প্রতি কর্তব্য।

এখনও কথাবার্তা ইংরেজিতে চলছে। একটু অন্তরঙ্গতার ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বললাম—কিন্তু এ-রকম একটা অবস্থায় আমারও তো মহিলার প্রতি একটা কর্তব্য আছে।

ঠোঁট চেপে সে উত্তর দিল—না, মিস্টার প্যাসেঞ্জার। যতক্ষণ প্লেন দমদমে না পৌছায় আমি কোম্পানির ডিউটিতে আছি।

একটা যেন কিনারা পেলাম। বাংলায় বললাম—বেশ তো মনু, অন্তত তার পরে তো আমায় তোমার প্রতি কর্তব্য করতে দেবে!

বলতে বলতে বুঝতে পারলাম যে তার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। তাই সে কোনও বাধা দিতে পারবার আগেই আমি ঝড়ের মতো বলে চললাম—মনু, মনু, তুমি এত কঠিন কেন? এতদিন পরে, এত খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু তুমি আমাকে যেন চিনতেও পারছ না। তুমি কেমন আছ সেকথা তো অন্তত বল।

কোনরকম ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে সে বলল—আমি তো ভালোই আছি। এয়ার হোস্টেসদের খারাপ থাকতে নেই। চাকরির একটা শর্ত হচ্ছে এই। আর এত বড় সংসারের ভার যার উপর সে ভালোই থাকে।

একটু যেন পথ তৈরি হল কথাবার্তার জন্য। চট করে বললাম—খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে, তোমার বাবা মারা গিয়েছেন। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুমিই বড় ছিলে। তা সংসারটা কি তোমারই ঘাড়ে এসে পড়েছে?

একটুও বিরক্ত না হয়ে সে বলল—ঘাড়ে কেন হতে যাবে, হাতে বলুন। আপনি কি আমেরিকাতে দেখেন নি কত সংসারে মেয়েরাই কর্তা সেখানে?

সে ঠিক কথা। কিন্তু এদেশ তো আমেরিকা নয়!

ঝাঁজের সঙ্গে সে বলল—অর্থাৎ এদেশে সব মেয়েকেই বিয়ে করে বাঁদি হতে হবে! বাঁধা পড়তে হবে বিনা ভাবনায়, বিনা দায়িত্বে দু-মুঠো খেতে-পরতে পাবার মতলবে!

বাধা দিয়ে বললাম—না, না, আমি সেভাবে মোটেই বলছি না। তুমি তো জানো, আমি কোনদিন তোমাকে তেমন চোখে দেখি নি। তাই তো আমেরিকা যাবার আগে বিয়ে করে চটপট তোমায় সিন্দুকে পুরে রাখবার বন্দোবস্ত ভেঙে দিয়ে গেলাম। তোমারই কথা মতো।

চুপ করে রইল মনু।

আবার বললাম—কিন্তু তুমি এমন নিষ্ঠুর যে আমার চিঠিরও জবাব দিলে না। এমন কি নিজেকে একেবারে নিখোঁজ করে ফেললে।

খুব শান্ত ভাবে সে উত্তর দিল,—বিয়ে স্থগিত রাখাতে তোমার আর আমার বাড়িতে যে রকম হৈ-চৈ হল তাতে এছাড়া কী উপায় ছিল? দু হাত যেখানে এক হয়নি সেখানে দুটো মন এক হওয়া যে শাস্ত্রের বারণ। তোমার সঙ্গে চিঠির যোগাযোগ আছে জানলে সবাই তো জ্বলে উঠত।

বললাম—বেশ তো, অন্তত জানাতে পারতে যে যতদিন না ফিরে আসছি ততদিন যেন চিঠি না লিখি। না হয় দেশে ফিরে নতুন করে তোমায় জানার পথটা খোলা রাখতে। তুমি ভরসা দিয়েছিলে যে, আমি ফিরে এলে আবার একসঙ্গে মিলিত হব। তুমি আমার হবে।

অন্ধকারে চুপ করে রইল সে। আমিই আবার কথাটা ফিরে বললাম। মনে করিয়ে দিলাম তারই দেওয়া প্রতিশ্রুতি, তারই প্রেমের আশ্বাস।

কিন্তু সে বলল—পথ কোনদিকেই খোলা রইল না। আমার বাবাও মারা গেলেন। একটা বড় সংসার আর ভালো ঘরের চাল-চলন ছাড়া কিছুই রেখে যান নি। তখন কি আর তোমার কাছে চিঠি লেখা যায়?

একটু হয়তো তীক্ষ্ণ ভাবেই বললাম—অর্থাৎ তুমি আমায় পুরোপুরিই পর ভেবে রেখেছ!

আস্তে আস্তে সে উত্তর দিল,—এটা আপন-পরের কথা নয়। সব দিক যখন ঠিক ছিল তখনও পাছে তোমার অনুপস্থিতিতে আমি আঘাত পাই সে ভয়ে বিয়ে পেছিয়ে দিলাম আমরা। পরে যখন আমার দিকটা

ভেঙে গেল তখন আর ভরসা করব কোন্ বালুচরে? কাজেই চাকরি নিতে হল। তোমার কাছ থেকেও লুকোতে হল।

তা বলে এই চাকরি?

আর কোথাও শুধু কলেজী বিদ্যার জোরে এত মাইনে পেতাম? এতটা সময় পেতাম ভাইবোনদের দেখার জন্য? আর এ অবস্থায় যদি তোমার কাছে এসে দাঁড়াতাম—তার মানে হত খুবই পরিষ্কার।

মিনতি করে বললাম—তুমি তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতার মুখ চেয়ে আর সব কিছু ভুলে যাচ্ছ। তুমি কেন ভাব না যে, বিপদে পড়ে যে তুমি আমার কাছে আসতে, সে-তুমি তোমার স্বচ্ছল জীবনের বাবার মেয়ের চেয়ে মানুষ হিসাবে কোনও অংশে কম নও। তোমার শিক্ষা, তোমার ব্যক্তিত্ব আরও বড় হয়ে গিয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। আমার চোখে তুমি আরও বড় হয়ে গিয়েছ। এবার এসো আমরা এক হয়ে যাই।

একটুখানি হাসল সে। অন্তত অন্ধকারে তাই মনে হল। বলল—যাক, তবু ভালো যে আমার ঘরে এসো—একথা তুমি বল নি।

না, না। আমার একার ঘর তো কোনদিনও হতে পারে না। আমাদের দুজনের ঘর।

তবু, তবু সে ঘর আমার হবে না। আগে আমার সাহস হয়তো কম ছিল, কিন্তু ছিল স্বাধীনতা। আজ আমার আর যা-ই থাক স্বাধীনতা নেই, কর্তব্য আছে। মা আছেন, ভাইবোন আছে।

বুঝলাম যে আগে যে মেয়ের মনের স্বাধীনতা সোডার বোতলের মতো উছলিয়ে উঠত, তাকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যেত, হয়তো মত বদলিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু মনুর মনে আজ উচ্ছ্বাস নেই। জল গেছে বরফ হয়ে।

তবু তাকে তো সমঝিয়ে নিতে হবে। আমার নিজের যে ওকে কতখানি দরকার তা আজ বুঝতে পেরেছি। যেমন করেই হোক ওর মনকে বদলিয়ে নিতে হবে। ব্যাকুলভাবে তাই বললাম—ওঁরা তোমার বাড়িতে থাকতে পারবেন। তোমার বাড়িও তাঁদের বাড়ি।

শক্তভাবে মাথা নেড়ে সে বলল—আর তা হয় না সহজে। কেন জানো? মনের পিছনে সব সময় খোঁচা থেকে যাবে। যাকে ভালোবাসি তার সবাইকেই ভালোবাসি এ নিয়ম আর আজকালকার সংসারে চলে না। এখন সবাই হচ্ছে টাকা-আনা-পাইয়ের সঙ্গে হিসাবে কষা। তাই...

চট করে বললাম—তবে তোমারও মা-ভাই-বোনদের ভালোবাসায় টান পড়বে ক্রমাগত তাদের বোঝা এরকম করে একা বয়ে বেড়ালে। সেজন্যেই তোমার আমায় বিয়ে করা বেশি দরকার। অন্তত পক্ষে তাদের তো আমার কাছে তেমন সংকোচ থাকবে না।

তোমার কাছে আরও বেশি করে থাকবে। তুমি যে ছিলে সুদিনের...

কথাটা শেষ করতে দিলাম না। দেবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। বললাম—শুধু সুদিনের কেন, দুর্দিনেরও। বোঝ না কি যে আজ আমরা দুজন সহমরণেও যেতাম একসঙ্গে। ভগবান পর্যন্ত যা চান তুমি তাতে 'না' করো না।

হেসে ফেলল মনু। হাউ সেন্টিমেন্টাল! আমারও মৃত্যুর কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু জোর করে সে কথা মুছে ফেললাম। যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কর্তব্য আছে। কোম্পানির উপর, বাড়ির উপর। তার পর সবই হাওয়া।

আর থাকতে পারলাম না। এগিয়ে এসে তার হাতটা আলগোছে তুলে ধরলাম। কাতর মিনতি করে বললাম—হাওয়া হাওয়া, ছেড়ে দাও এই হাওয়ার চাকুরি। নেমে এসো তোমার নভোচারিণীর জীবন থেকে মাটিতে। আমরা মাটিতেই ঘর বাঁধি, হাওয়ায় নয়।

কোনও সাড়া দিল না। তবে কি আমার কথা তার মনে ঢুকছে?

বললাম, তোমার আদর্শ, তোমার মনের গতি সবই আকাশে ওড়ে, আকাশের মতই উঁচু। কিন্তু লক্ষ্মীটি, এবার নেমে এসো মাটিতে।

দূরে লণ্ঠন নিয়ে একদল লোক আসছে দেখা গেল। পাইলট আর রেডিও অফিসারও তাদের সঙ্গে। মনু তাড়াতাড়ি বলল—এবার থাক ও-সব কথা। বিজলী আর রেডিওর কলকবজা মেরামত করে দমদমে খবর দিতে হবে। তার আগে ওদের একটু তদারক করব আমি।

বেশ তো আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি কথা দাও।

জোরে মাথা নেড়ে মনু বলল—তুমি অত্যন্ত অন্যায় দাবি করছ। আমার কাজ আছে, কর্তব্য আছে।

প্রতিবাদ করলাম—আকাশের কাজ ছেড়ে মাটির উপর নেমে এসো। আমার প্রতিও কি তোমার একটু কর্তব্য নেই?

কোনও কথাই শুনল না। শুধু আকাশ আর মাটি যেখানে মিলিয়ে যায় সেদিকে একটুক্ষণ তাকাল। তারপর নভোনীল ইউনিফর্ম শাড়ির আঁচলটা তুলে নিয়ে প্লেনের ভিতর ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হাতে একটা টর্চ, তাতে সরু পেন্সিলের মতো আলোর রেখা। লোকদের প্লেনের দিকে আসতে ইশারা করছে। আমি মুছে গেলাম যেন অন্ধকারে।

না। আমিও ওই আলোর রেখার দিকে তাকিয়ে আছি। নভোচারিণীকে এক সময় তো মাটিতে পা পাততে হবেই।

এই বইয়ের কথা

সম্প্রতি জার্মানীর সম্পাদকমণ্ডলী সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত জুয়ান হিমেনেজ ও মাইকেল শলোকফ, আর্নল্ড জাইগ, পার্থার লাভকুইস্ট প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ একটি সেরা সাহিত্য পত্রিকায় দেবেশ দাশের ছোট গল্প রোম থেকে রমনাকে প্রথম স্থানের সম্মান দিয়েছেন। সেই ইয়োরোপীয় সাফল্য লাভের ঠিক পরেই এই গল্পগুলি আত্মপ্রকাশ করল। কাজেই এদের মূল্যবিচার আরও বেশি সতর্কভাবে হবে। জার্মান সম্পাদকমণ্ডলী লিখেছেন যে দেবেশ দাশের গল্পগুলি ভারতীয় সাহিত্যের দিগন্ত বিস্তৃততর করে দিয়েছে এবং পৃথিবীকে তার দুয়ারে এনে দিয়েছে। আমরা মনে করি যে বর্তমান গল্পসংগ্রহও সেই মানদণ্ড সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে।... নিবিড় ভাবে নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশ করবার সময়ে লেখকের অন্তরে ছিল অশ্রু, কিন্তু লেখনীতে ছিল ইস্পাত। এতে আমরা নূতন, স্পন্দনশীল সদ্যজাগ্রত যৌবনের, প্রস্ফুটিত জীবনের সন্ধান পেয়েছি (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)।

এই গল্পগুলিতে লেখক মানবমনের নিগূঢ় রহস্যটিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন এবং প্রেমের বিচিত্রলীলাকে তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। বর্তমান জীবনেব ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের বেদনাকে প্রত্যেক গল্পের মধ্যে দীপ্যমান করে তুলেছেন। শেক্সপীয়র রোমিও-জুলিয়েটের মানব-ভাগ্যের অপচয়ের দিকটি উদ্ঘাটিত করেছিলেন। বাল্মীকির শোকগাথা আজও বিরহীর প্রাণে ঝড় আনে। কিন্তু একালের বল্লরী-বিকাশের মধ্যে (অভিনয় গল্প), অঞ্জনা-রঞ্জিতের আকাশে (বাল্মীকি গল্প) একই সুরের গুঞ্জন তোলে, একই বেদনার সঞ্চার করে। অন্য দিকে সুখী জীবনের যে চকিত চমক এতে পাই তা মনোহারিত্ব ও চমৎকারিত্বে মন মুগ্ধ করে (কথাসাহিত্যে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী)।

গল্পের পটভূমিকাগুলি এমন এক জগতের যাকে পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরও চিনতে অসুবিধা হয় না। বাংলা গল্পে বা উপন্যাসে এই ধরনের বহু অভিজ্ঞতালব্ধ পটভূমিকা পাওয়া যায় না (ভারতবর্ষ)। বাঙালি আজ নবযুগের যাত্রী; লেখক নবযুগের বাঙালির ছবি এঁকেছেন, অভ্যস্ত জীবনের প্রতিধ্বনি নয় (প্রবাসী)।

অভিনব পরিবেশ সৃষ্টিতে সমুজ্জ্বল (আনন্দবাজার পত্রিকা) এই গল্পগুলি লেখকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দরদী মনের স্পর্শে সুন্দর হয়ে উঠেছে। তিনি প্রেমের বিচিত্র লীলাকে অপরূপ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন (যুগান্তর)। ক্ষণকালের উদ্ভাসে যে চিরকালের মূর্তি ফুটে ওঠে, হৃদয়ের যে শাশ্বত সৌন্দর্য বিস্ফুরিত হয়ে ওঠে, তাই অনবদ্য ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন লেখক (দেশ)। পটভূমি ও বিষয়বৈচিত্র্যে তার একাধিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে সাড়া এনেছে। আমাদের যুগে বাংলা সাহিত্যে যে শাশ্বত সৃষ্টি হচ্ছে সেই চিরকালের মধ্যে এই গল্পগুলি মহিমান্বিত আসন লাভ করবে (অমৃতবাজার পত্রিকা)।

জীবনের চেয়ে বড়

উৎসর্গ

আগামী দিনে
যারা জীবনের চেয়ে বড় কিছুর সাধনা করবেন
সেই বীর তরুণ তরুণীদের

উপন্যাসের উৎস মুখে

সিনরা পুত্তির চোখে জল, কিন্তু মুখে হাসি।

দুইয়েরই ছবি আমি লেক জেনিভার বুকে দেখছি। মুখ তুলে এই রূপসী ইটালিয়ান মহিলার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না।

কী জানি কী কাহিনি উনি বলবেন। কোন্ বেদনার স্মৃতি। কোন্ সান্ত্বনার শান্তি দিতে হবে তাঁকে।

ওঁর স্বামী গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে যুদ্ধবন্দী ছিলেন। স্বামীর ভাবনায় ব্যাকুল দীর্ঘ তিন বছরের কাহিনি শুনছি। আমি ভারতীয় আর কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের সেক্রেটারি। তাই উনি তাঁর স্বামীর ভারতের অভিজ্ঞতার কথা আমায় শোনাচ্ছেন।

যুদ্ধ সত্ত্বেও, যুদ্ধের মধ্যে আমাদের দেশ আর বন্দীশিবিরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী ধারণা আর অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই বর্ণনা। শুধু বিরহবিধুরার অন্তরের কাহিনি হলে অন্য কথা ছিল। সে ব্যথা তো অনেক পুরনো, অনেক গল্প উপন্যাসে জানা, অনেক ভুক্তভোগীর মুখে শোনা—এমন আর নতুন জিনিস কী? স্বামী যে আমারই 'অতিথি' ছিলেন তা জানেন না।

কিন্তু শত্রুরা যে বর্বর ব্যবহার করে, নিষ্ঠুর কষ্ট দেয়, অত্যাচারে অনাহারে মেরে ফেলে নিজেদের দায়ভার কমিয়ে ফেলতে চায় একথা কাগজে বেতারে প্রায়ই বলে। স্বামীর বন্দিদশার প্রথম পর্যায়ের সময় সিনরা পুত্তির যা মানসিক অবস্থা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ তিনি দিচ্ছিলেন। নীরব আর সংবেদনশীল শ্রোতা পেয়ে তাঁর মনের আগল খুলে গিয়েছিল। এমনিতেই ইটালিয়ানরা কথা বলতে, মুখের তোড়ে বুকের ব্যথা উজাড় করে দিতে ভালোবাসে। তাঁর বর্ণনা অন্তরঙ্গ রোজনামচার মতো হয়ে গেল।

আর এখানে যে নিরীহ লোকটি শ্রোতা তিনি আগামী ইন্টারন্যাশন্যাল সোশ্যাল সিকিউরিটি কনফারেন্সের সভাপতি। সেই আন্তর্জাতিক ইউ. এন. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই কনফারেন্সের লেয়াইজন অফিসার তাঁর স্বামী। লেকের পারে তাঁর গৃহের নিরালা বাগানে আমাদের বসিয়ে তিনি হঠাৎ অফিসে গেছেন জরুরি ডাকে। এ অবস্থায় স্মৃতিচারণ কবা চলে।

সেই কাহিনি শুনতে শুনতে নতুন একটি মানসজগতের সন্ধান পেলাম। সে খোঁজ যারা যুদ্ধ করে, মরে আর মারে এবং যারা যুদ্ধে পাঠায় মরবার আর মারবার জন্য—তারা কেউ পায় না। পাবার মতো সময়, মন বা অনুভবশক্তি কোনটাই তাদের থাকে না। থাকলে তারা যুদ্ধ করতে বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে গিয়েও থমকিয়ে যেত।

কিন্তু আমি তো সে সব সংক্রমণ থেকে বেশ দূরে নিরাপদ দূরত্বে নিজের মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পেরেছি। তিন চার বছর ধরে সারা ভারতের অন্তরীণ অ্যাকসিস ইন্টার্নী অর্থাৎ জার্মান ইটালিয়ান জাপানি বন্দীশিবিরগুলি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে তাদেব বন্দীজীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করেছি।

সেই জীবনের খুঁটিনাটি তদারক করাই তো শুধু নয়। ধরা পড়ার আগের ঘটনা, পলায়নের চেষ্টা, অচেনা আঘাটায় ধরা পড়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে আসা—কত কিছুরই বেদনাভরা বৈচিত্র্য, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার মানবতার আয়নায় প্রতিফলিত দেখেছি। আসাম বর্মা সীমান্তে মৃত্যুর পদধ্বনি আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার হিংস্রতা ও হাহাকার মর্মে অনুভব করেছি।

যুদ্ধ-সংক্রান্ত অনেক বিবরণ এখনও অলিখিত বা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তারাও আমায় দিয়েছে অনেক কল্পনা, অনেক তথ্য। কিন্তু সে সবই মেলে ধরেছে তথ্যের চেয়ে বড় একটি সত্য। তা হচ্ছে মানবতার দৃষ্টিতে দেখা মানুষের কথা। ব্যথা অসহায়তা আনন্দ আশ্বাসের কথা।

সেই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি যে বীরোত্তম বাঙালি নেতাজীর প্রেরণায় ভীতু ও ভেতো নিবীর্য ও নিরুপায় বাঙালির যৌবন সামরিক জীবনে অমৃত রসায়নের স্বাদ গ্রহণ করবে।

সিনরা পুত্তির মানসকাহিনি শুনতে শুনতে মনে হল যে জীবনে একটি সার্থক কাজ করেছিলাম আমার 'রক্তরাগ' উপন্যাসের মধ্যে সেই বাঙালিকে সাহিত্যের সিংহাসনে অভিষেক করবার চেষ্টা করে। আমার

সাহিত্যধর্মে এটিকে একটি সত্য জ্ঞান করেছি। এবারও তাই করেছি।

এই কাহিনি কিন্তু পুরোপুরিভাবেই উপন্যাস। এর চরিত্রগুলিও সবাই কাল্পনিক। যাঁরা ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন তাঁদের কথাতে অবশ্য এতটুকুও কল্পনা মেশানো হয়নি। ঘটনাগুলি, এমন কি খণ্ডযুদ্ধগুলি পর্যন্ত সত্য।

সাহিত্যের ময়ানে রূপান্তরিত সত্য।

দেবেশ দাশ

।। এক।।

প্রেম?

না, মৃত্যু?

কোন্‌টা জীবনের চেয়ে বড়?

অথবা স্বাতী? যার মধ্যে প্রেম আর মৃত্যু দুই-ই স্বয়ম্ খুঁজে পেতে চেয়েছে।

দুটোর মধ্যে যে কোনও একটাতে সে স্বাতীকে খুঁজে পাবেই।

অথবা কোনটার মধ্যেই নয়? জীবন, জীবনের চেয়ে বড় কিছুই নয়। শুধু বেঁচে থাকা, এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকা। এমন কী সবচেয়ে সামান্য, সবচেয়ে ছোট হয়ে বেঁচে থাকা। তার চেয়ে বড় কথা আর কিছু আছে কি?

জীবনই যদি না থাকল তবে থাকল কী? হাসি, খেলা, ভালোবাসা, ভোগবিলাস সবইতো সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়। জীবন হচ্ছে আধার। তার পাত্রে ধরে তবেই প্রেমকে করব আস্বাদ। মৃত্যুকে করব অবহেলা।

সংসারে সবই হচ্ছে রং। সুখের রঙিন রং অথবা দুঃখের কালো ছায়া কার উপর পড়বে জীবনই যদি ফুরিয়ে যায়?

তাই জীবনই বুঝি সবচেয়ে বড়। শুধু বেঁচে থাকা। শুধু দেহ ধারণ করে থাকা, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

অদেহী প্রেম?

সে তো শুধু কবির কল্পনা। আকাশের নীলিমার মতো দূর থেকে অধরা। তাই দেখতে সুন্দর।

এই তো দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে সেই নীলিমার বুক চিরে স্বয়ম্ভু আর তার সৈন্যদলের ডি সি থ্রি প্লেন উড়ে চলেছে। কোথায় নীলাভ রং? কোথায় তার মোহ অঞ্জন? কিছু নেই। সব কিছু শূন্য। অলীক।

কিন্তু এই জীবন?

যে জীবনকে স্বয়ম্ভু স্বাতীর একটুখানি কথার, একটুখানি হাসির ঝংকারে মরণের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। মরণাতীত হবে বলে।

তাই তো এই ভয়ে ভরা তারা-হারা রাতে জীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই। জীবনকে ব্যবহার করেই সেই জীবনের চেয়ে বড় কিছু পাবে। স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ তারই সাধনা করছে।

স্বয়ম্ বার বার মন থেকে স্বাতীব স্মৃতি সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। প্যারাসুট সম্বল করে উড়ন্ত প্লেন থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সময় এগিয়ে এল। এবার মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মরণ-ঝাঁপ দিতে হবে।

সেজন্য তার কোনও ভয় বা দ্বিধা নেই। ভারতীয় এমার্জেন্সে কমিশন অফিসার স্বয়মের চোখে প্যারাট্রুপ বাহিনী পদাতিক বা গোলন্দাজ বা বোমারু বাহিনীর চেয়ে অনেক অনেক বেশি নতুন, অনেক বেশি রোমাঞ্চকর, অ্যাডভেঞ্চারে ভরা। তাই সে এই ডিভিশনটাতে নিজে যেচে এসেছিল। অবশ্য মানসিক যোগ্যতা, হার্টের অবস্থা, মাংসপেশী আর স্নায়ুর রিফ্লেকস অ্যাকশন ইত্যাদি পরীক্ষায় পার হতে হয়েছিল।

স্বাতী কয়েক মাস আগে একবার মৃদু হেসে ওকে বলেছিল—লিভ এ লিটল।

ও তখন তার কোনও উত্তরও দেয়নি। শুধু মনে মনে শপথ করেছিল—এ লিটল নয়, এ লার্জ স্লাইস—প্রকাণ্ড বড়ভাবে বৃহৎ জীবন আস্বাদ করব।

পণ্ডিত নেহরু কয়েক বছর ধরেই তরুণদের উদ্দেশে বলছিলেন—লিভ ডেঞ্জারাসলি। বিপজ্জনকভাবে বাঁচো। সে কথা আর কেউ মনে রেখেছিল কিনা স্বয়ম্ জানে না। সে শুধু জানে যে স্বাতী বলেছিল—লিভ এ লিটল। সেইটুকুই তার কাছে বৃহতের সাধনার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল।

এই জন্যই সে শান্তভাবে যুদ্ধবাহিনীর নানা শাখার দিকে নজর দিয়েছিল। কোথায় সব চেয়ে বেশি নূতনত্ব, মৌলিকতা, অ্যাডভেঞ্চার। আরাকান ফ্রন্টে প্যারাট্রুপ বাহিনীকে কাজ ছাড়াই তাঁবুর দড়ির গিঁট গুনে গুণে দিন কাটাতে হচ্ছিল। তখন সে নিজে থেকে যেচে সাময়িকভাবে ভি ফোর্সে যোগ দিয়েছিল। সে বাহিনীর কাজে ছিল সবচেয়ে বেশি বিপদ। আর নিজের বুদ্ধি খরচ করে নিজের পরিকল্পনা অনুসারে ঘুরে

বেড়াতে হত। সেই সুযোগ সে পুরোপুরি নিয়েছিল। আর এখন সে নিজের ইউনিটে ফিরে এসেছে আসল কাজের সময় এসে গেছে বলে। জাপানি যুদ্ধের এই অধ্যায়ে জেতা বা হারা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে প্যারাট্রুপ সৈন্যদলের ওপর।

আজ রাতেই আরাকানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পঞ্চম ইন্ডিয়ান ডিভিশনকে রাতারাতি সরিয়ে এনে জাপানি হামলার মাঝখানে নামিয়ে দেওয়া হবে। শুধু সেনাদল নয়, তার রসদ, অস্ত্রশস্ত্র কামান মায় মালবাহী খচ্চরের দল পর্যন্ত। সবকিছু নামানো হবে জাপানিদের আগুয়ান বাহিনীর ঠিক পিছনে। একটা নতুন সামরিক স্ট্র্যাটেজি এই প্রথম চালু করা হল এই বর্মা-আসাম সীমান্তে।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলা প্রথম বসন্তের পাহাড়ি মাদকতায় ভরা আবহাওয়াতে জাপানিরা চিন্দুইন নদী বাঁশের ভেলায় চড়েই নির্বিবাদে পার হয়ে এসেছিল। তাদের দুর্বার বন্যাস্রোত ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় বিনা বাধায় এসে পৌঁছেছিল। পাহাড়ের পর পাহাড়ের চূড়া এই সীমান্তকে অগুনতি কেল্লার মতো আড়াল করে রেখেছে। তবু তাদের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এসে জাপানি সৈন্যদল ইম্ফল, উখরুল আর কোহিমার চারপাশ ঘেরাও করে ফেলল। সোমরা শৈলমালার চূড়া থেকে ওরা আসামের সমতল ভুমিকে নজরবন্দী করে রাখল।

উঠতি সূর্য অর্থাৎ রাইজিং সান মার্কা জাপানি জাতীয় পতাকা ওরা ভারতের ভূমিতে পুঁতে দিল। ক্ষণে ক্ষণে রেডিয়োর অন্যান্য কর্মসূচী থামিয়ে জাপানি ঘোষক জানাচ্ছিল যে, দিল্লি দখলে এল বলে। ভারত বিজয়ের উৎসবের জন্য টোকিয়ো শহর আলোয় আলোময়।

আর অন্ধকারের আড়ালে নিজেদের গা ঢেকে স্বয়মের দল শত্রুসৈন্যে ঘেরাও এলাকার মাঝখানে নামতে যাচ্ছে। আকাশ পথে। আকাশ থেকে।

হালকা সাদা মেঘ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে প্লেনগুলির চারপাশে জমা হচ্ছে। আবার সরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরে যাবার মধ্যেও প্রায় লেপটে থাকার ভাবটা থেকে যাচ্ছে। কলকাতায় চৌরঙ্গি পাড়ার সেই হোটেলের নাচঘরের যুগল নৃত্যের মতো।

জীবনে সেই প্রথম স্বপ্নের মতো একটা ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ। সঙ্গতি সাজপোশাক আর সামরিক আমেরিকান-মার্কা আবহাওয়া সবদিক দিয়েই একরকম নিষিদ্ধ এলাকা ছিল সেই পুরী। যুদ্ধের কল্যাণে আউট অব বাউন্ডস। স্বয়মের মতো বাউণ্ডুলে বাঙালির পক্ষে।

পাইলটের পাশে বসে স্বয়ম্। ডাকোটা বিমানের ড্যাশবোর্ডে হরেকরকম বোতাম টিপে টিপে পাইলট মাইকেল আলোর সংকেত দেখে নিচ্ছে আর নেভাচ্ছে। মিটিমিটি তারার মতো আলোর ফোঁটা। যেন এই চৌরঙ্গী পাড়ার রেস্তোরাঁর মধ্যে বাতি নেভানো রয়েছে। শুধু সামনের নাচের ব্যান্ড বাজিয়েদের পিছনের দেওয়াল থেকে বিন্দু বিন্দু বিজলী আলোর সংকেত নাচঘরে এসে পড়ছে। নৃত্যমাতাল যুগলদের চোখের ভাষায় চকিত ইশারার সংকেত।

না। স্বয়ম্ ওসব কথা এখন মনে করবে না, মনে আসতে দেবে না। কোলের উপর মাইক্রোফিল্‌ম করা ম্যাপটা পেতে ছোট্ট একটা লেন্স দিয়ে নামবার জায়গার ভূগোলটা আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এখন কোনও পিছুটানের সময় নেই। জঙ্গী ট্রান্সপোর্ট প্লেন শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। ঠিক জীবনের মতো।

কিন্তু নিচু টান হঠাৎ এক হ্যাঁচকায় প্লেনটাকে অনেক নিচে নামিয়ে আনল। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত এয়ার পকেটে পড়ে প্লেনটা এক নিচু টানে হাজার দুই ফুট বোধহয় নেমে এল। সোমরা হিলসের একটা চূড়া সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ জেগে দৈত্যের মতো মাথা তুলে ওদের দিকে ছুটে এল। বেয়নেটের খোঁচা যেন নিচে থেকে ওপরে উঠে আসছে তেড়েফুঁড়ে। মাইকেল (বন্ধুদের কাছে সংক্ষেপে মাইক) ব্যাটিল ফর ব্রিটেনে অংশ নেয়নি। কিন্তু বম্বস ওভার বার্লিনে হাত পাকিয়েছে। সেই অভিজ্ঞ পাইলট মাইকেলও একটা উল্লাসের আওয়াজ করে উঠল। ওদের অল্প কয়েক মাস আগে পরিচয়। তবু মুখ খুলে কথা বলার অবসর নেই।

সেই আওয়াজটা কানের মধ্যে ঢুকে মিঠে সুরের মতো মনটাকে আনন্দে ভরে দিল কারণ সেই চূড়ার দৈত্যটাকে পাশ কাটিয়ে প্লেন কোনমতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। তারপরই নিচে পাহাড়ের সানুদেশ। বাতাসের ঝাপটা কম। তাই প্লেনের ইঞ্জিনের শব্দও কম। গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে মাইক প্লেনটাকে একটু ধাতস্থ করছে মনে হল। যেন প্লেনটাও একটু শান্তিতে স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইছে।

স্বয়ম্‌ও যেন এক ঝাপটায় কুলায়-প্রত্যাশী পাখির মতো কোথায় কোন্ স্মৃতির মধ্যে নেমে এল।

স্বাতী। স্বাতী নক্ষত্র আকাশে, অনেক দূরে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তার মনের আকাশের স্বাতী এই মুহূর্তে অনেক কাছে। আকাশের কোন্ এয়ার পকেট কবে কোথায় মনের মণিকোঠায় এমন করে টেনে আনে?...

সেই রেস্তোরাঁটা।

নীরব নয়, কিন্তু নিবিড়। জনতাকে যারা উপেক্ষা করতে জানে তাদের কাছে সব জায়গাই নির্জন।

কিন্তু স্বয়ম্ চাকরির সন্ধানে টহলদার পদাতিক মাত্র। তার উপরও যে হাওয়াই হামলা হবে তা সে কবে ভেবেছিল? চাঁদনীর শার্ট কোট আর ট্রাউজার্সের ইউনিফর্ম, থুড়ি, ব্যাটল ড্রেসপরা পদাতিক সে। ডালহাউসি পাড়ার নো-ম্যানস ল্যান্ডে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে চাকরির খোঁজ করে এবং সে স্থির করে রেখেছে যে বলতে পারার মতো একটা প্রাইজ চাকরি জোগাড় করতে পারার আগে সে মামার কাছে কিছুই রিপোর্ট করবে না।

তবু সে সেদিন সন্ধ্যার দিকে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে মামার অফিসের দিকেই যাচ্ছিল। তারপর একবার বন্ধুদের সন্ধানে যাবে। এমন সময় হবি তো হ সে নিজেই কব্‌জা হয়ে গেল।

এবং এক অত্যন্ত স্মার্ট আর অগ্রসর তরুণীর হাতে।

তারই প্রতিবেশিনী।

স্বয়ম্ অবশ্য শুনেছিল যে স্বাতী বিলেত থেকে সদ্য ফিরেছে। হাওয়াই হামলার ঠ্যালায় পাশের বাড়ির বোমারু বিমান, মানে এই মেয়েটি, একেবারে সাতসমুদ্র পার হয়ে সোজা নিজের দেশে।

ঝকঝকে বেবি অস্টিন কারের দরজা খুলে সেই বোমারু তার স্থলপথের বিমানে উঠে আসার জন্য স্বয়মকে আহ্বান করল। হুকুম করতে অভ্যস্ত নিশ্চয়ই। তাই কথা শুনবে কিনা তা না ভেবেই হুকুম চালাল। ইঞ্জিনটা বন্ধ পর্যন্ত করল না।

বেশ কয়েক বছর পরে দেখা। তার জন্য কোনও সংকোচ নেই। শুধু প্রতিবেশী হিসাবে সামান্য পুরনো পরিচয়টা কোনও বাধা নয় ওর কাছে। ব্যবহার যদিও সিভিল, মনটা মিলিটারি। যুদ্ধের আঁচ পেয়েছে তো!

স্বয়ম্ অবশ্য জানে যে পুরনো বালিগঞ্জের এই প্রতিবেশীরা আর ওরা শুধু নামেই প্রতিবেশী। কিন্তু আচার-বিচারে চালচলনে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। স্বাতীরা হাল-ফ্যাশানের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের একেবারে সামনের দিকে। উপরের দিকে স্বয়ম্‌রা ইঙ্গের চেয়ে বঙ্গ অনেক বেশি। সাবেকী আমলের বড় অ্যাটর্নি অফিসের নতুন পার্টনার ও বড় সাহেব হয়েছেন মামা। অফিসের পুরোনো আর নিজের নতুন ইজ্জত বাড়াবার জন্যই সাহেবপাড়ায় উঠে এসেছেন।

স্বয়ম্ ইতস্তত করতে লাগল। মরি ভয়ে ভয়ে—যাব কী যাব না। অথচ মুখ ফুটে হ্যাঁ কী না কিছুই বলতে পারছে না।

ইতিমধ্যে হাইকোর্ট পাড়ার মক্কেল আর মামলাবাজরা একটু রসের সন্ধান পেয়ে গেল। নিশ্চয়ই এই দুজনের মধ্যে 'কিছু একটা আছে। না হলে কী আর হিটলারের 'ভি' রকেট মার্কা একটা মেয়ে এখানে হাজির হয়?

দেশী কলকাতাটা একেবারে পুরুষের শহর। ফুড সাপ্লাই দপ্তরের কল্যাণে সবে মেয়েরা অফিসে আসতে শুরু করেছে। তবু কোর্টপাড়া রক্ষণশীল।

স্বাতী হাত এগিয়ে দিল, কাম অন ইন—ডোন্ট বি সিলি।

স্বয়ম্ গলার টাইটা আগেই খুলে নিয়েছিল ভাগ্যিস। না হলে গলা কাঠ হয়ে বন্ধ হয়ে যেত।

বালিগঞ্জের বাড়িতে উঠে আসার পর প্রথম প্রভাতে যে কিশোরীকে সে ভোরের আলোয় দেখেছিল তার কথা স্বয়ম্ ভোলেনি কখনও। কিন্তু এখন মনকে নাড়া দিয়ে সেকথা স্মরণে এল:

শুধু দূর থেকে প্রথম দেখা। অপরিচয়ের দেখা।

একটা উপমা মনে এসেছিল। যেন দার্জিলিং-এ কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর প্রথম অরুণোদয়ের রংয়ের খেলা দেখছে ম্যাকেঞ্জি রোডের হোটেলের নিজের নিভৃত জানলা থেকে। একান্তভাবে তার নিজস্ব নিরালায় দেখা।

মাই গড, সেই ভোরের আলোয় একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল মেয়েটির বারান্দার উপর দিয়ে। খুব কাছ দিয়ে। সেই পাখির দুটো উড়ন্ত ডানার ছায়া সেই কিশোরীর মুখের ওপর মায়া বুলিয়ে গিয়েছিল। একটা মিষ্টি ডাক দিয়ে ওরই বাগানের ঝোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

সেই কিশোরী। সে অকারণে একটু নিজের মনেই হেসে ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

আর স্বয়ম্ প্রায় বলে উঠেছিল—যেয়ো না, যেয়ো না। আর একটু দাঁড়াও। আর একটুখানি দেখি।

সেই কিশোরী আজকের যুদ্ধের বিলেত-ফেরত তরুণী হয়ে এই মুগ্ধ প্রাণকে নিজে থেকে আহ্বান করেছে।

একটি কথাও না বলে স্বয়ম্ মোটরে উঠে এসে পাশে বসল।

সে এখন এই প্লেনের ককপিটের খোঁদলে উবু হয়ে মুরগির মতো বসে আছে। সেই বেবি অস্টিন মোটরের বালতি মার্কা অর্থাৎ 'বাকেট সীটে' বসার কথা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ল। ককপিটের মধ্যে কথাবার্তা এমন কি সংকেত বিনিময়ও প্রায় নীরবে চালাতে হয়। শত্রুরা যদি 'মনিটর' করে ফাঁস করবার চেষ্টা করে? সেইজন্যেই তো সেখানে নেই আলো, নেই ভাষা।

মোটরে পাশাপাশি বসে স্বয়মেরও সেই অবস্থা। চারধারে প্রায় অন্ধকার। নিজের মুখে নেই ভাষা। ব্ল্যাক আউটের আকাশে সুদূরের তারাগুলি কি কথা কয়ে উঠতে চাইছে?

তারার আলোর টুকরোগুলো যেন স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর মিটিমিটি আলো। ছাদ থেকে ফুটো করে কয়েকটা আলোর বিন্দু সাজানো রয়েছে। ওইটুকুতেই কাজ চলবে। আঁধারে আঁধার হলেই তো হিয়ারা হিয়ে হবে একাকার।

॥ দুই ॥

রেস্তোরাঁটা নতুন। বলতে গেলে প্রধানত বিদেশী, বিশেষ করে বিদেশী মিলিটারিদের কল্যাণেই সরগরম। সাধারণ বেসামরিক বা মধ্যবিত্ত লোক এখানে কলকে অর্থাৎ চেয়ার পাবে না। অর্থাৎ ঢুকতেই পাবে না। এসব ঝকঝকে চেয়ারটেবিলে ঠাঁই পেতে হলে চাই সর্বাঙ্গ থেকে যেন পিছলিয়ে পড়া পালিশ। এ রেস্তোরাঁর জন্য চাই শুধু রেস্ত নয়, রাশভারী মর্যাদা আর রসে ভরা মন।

উঁচুতলার স্বাতী অনায়াস রসে আর পালিশে অবলীলাক্রমে পিছলিয়ে এগিয়ে গেল। স্বয়ম্‌কে নিয়ে ডবল ঘুরপাক খাওয়া কাঁচের দরজা পার হয়ে এসে ঢুকল। সাদা বকের পালকের মতো ধবধবে দস্তানা পরা একটা হাত এমনভাবে দরজা খুলে ধরল যেন কোনও রাজরানীর আবির্ভাব হয়েছে।

এ যুগের রাজরানীরা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এই রকম নতুন ইন্দ্রাণীদের জৌলুষ তাদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। স্বয়ম্ মনে মনে ছবি এঁকে নিল—আধুনিকা অ্যাট হার বেস্ট।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে, নিজের পোশাক আর চালচলন এই জায়গা আর এই সঙ্গিনীর সঙ্গে বড়ই বেমানান। কিন্তু সে যা তাই থাকতে চায়। তাতেই তার সম্মান, তার ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে। নাই বা থাকল তার ময়ূরপুচ্ছ। সে তো দাঁড়কাক নয়। সে রাজহংস। তার মরাল কণ্ঠ নেই, কিন্তু মরাল দৃষ্টি আছে। আকাশে এতদূরে তার কল্পনা আর দৃষ্টি যায় যেখানে হাই সোসাইটির চন্দ্র-সূর্যরা হয়তো পৌছতে পারবে না। তার চাল-চলন চরিত্র আর আচরণ থাকুক রাজহংসের মতই শুভ্র, স্বচ্ছন্দ।

রাজহংসের মতই সে ঘাড় উঁচু করে স্বাতীকে আবার দেখল। বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে। সে চেয়ারটা টেনে স্বাতীকে বসবার জন্য আহ্বান করতে ভুলে গেল।

স্বাতীর দৃষ্টি শূন্য চেয়ারের দিকে পড়তেই সে নিজের ভদ্রতার ত্রুটির কথা বুঝতে পারল। তাড়াতাড়ি হাসিমুখে চেয়ারটা টেনে সঙ্গিনীকে বসবার জন্য অভ্যর্থনা জানাল।

সঙ্গিনীর প্রসন্ন দৃষ্টিটুকু সে পুরস্কার হিসাবে নিল। ধন্যবাদ তো মামুলি বাঁধা বুলি। তার হিসাব না রাখলেও চলে।

বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই স্বাতী চট করে অভ্যস্তভাবে বলল, দুটো শেরি, প্লিজ। আমারটা ড্রাই। আর তোমারটা কী হবে, স্বয়ম্?

কোনও বিব্রত ভাব বা বিস্ময় না দেখিয়ে স্বয়ম্ বলল, আমার জন্য শুধু কফি। হট কফি, প্লিজ।

স্বাতী ডান চোখের ভুরু একটু উপরের দিকে তুলতে আরম্ভ করেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, অ্যান্ড টু হট ডগ্স, প্লিজ।

জিজ্ঞেস করবে না কি? অথচ সংকোচও হয়। বস্তুটা নিশ্চয়ই কোনও খাবারের নাম। বইয়ে এ নাম কোথাও দেখেনি। হালের ইংরেজি ম্যাগাজিনেও নয়। নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ মাংস নয়। গরম কুত্তার মাংসে তৈরি

অবশ্যই নয়। তার প্রতিবেশিনীর উপর এটুকু আস্থা না রাখা মানে তার অসম্মান করা।

ফরাসিরা ব্যাঙ খায়। জাপানিরা খায় সাপ। চীনেরা আরশোলা। ওদের কাছে এগুলি নাকি সুখাদ্য। আবার অভিজাত খাদ্যও। প্রত্যেক জাতই কিন্তু নিজেদের অনভ্যস্ত খাদ্যকে অখাদ্য মনে করে। কাজেই চিন্তাটা সে মন থেকে সরিয়ে নিল।

আর স্বাতী তো সদ্য বিলেত-ফেরত। তায় মার্কিন-মার্কা অনেকখানি। কলকাতাতে ওকে কেমন বেমানান মনে হয়। ও যেন বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-স্বাধীনতার সোনালি আলোয় ঝলমল রুপোলি সুপার ফরট্রেস এরোপ্লেন। একগাদা গরুর গাড়ি ভরা গেঁয়ো তেপান্তরে ফোর্স ল্যান্ডিং করে দায়ে পড়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে।

একবার স্বয়মের মনে হল—পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিল—এ তো যবন নয়। আর্য অথচ যবনী। আয়োনিয়ান অর্থাৎ গ্রীক রূপসীদের সংস্কৃতে বলা হত যবনী। আর্যের সেরা আর্য, সুন্দরী তনুমধ্যা আধুনিকা। সুবাসিত পশ্চিম পবনের ব্যাকুল নিঃশ্বাস ভেসে আসছে তার কাছ থেকে।

চকিতে ডি. এল. রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কথা মনে হল। যবনী হেলেন রাজকন্যা। চন্দ্রগুপ্ত যবনের শিবিরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। শেষে গুরুর বিদ্যাতেই গ্রীকদের হারিয়ে গ্রীক সম্রাটের কন্যা হেলেনকে লাভ করেছিলেন তিনি। বাহুবলে সাম্রাজ্য আর সম্রাজ্ঞী দুই-ই জয় করেছিলেন।

মনে মনে স্বয়ম্ চঞ্চল হয়ে উঠল।

ততক্ষণে স্বাতীর সামনে বসানো হয়েছে একটা লম্বা ডাঁটির উপরে জেগে থাকা টিউলিপ ফুলের মতো দেখতে ছোট গ্লাসে শেরি। আর নিজের সামনে মাঝারি সাইজের কালো ধাতু আর কাচের গোলা দিয়ে তৈরি কফি পারকোলেটার। নিচের কাচের পাত্রে উপরের গোলা থেকে বিন্দু বিন্দু নেমে আসছে কফি।

মনের পাত্রেও বিন্দু বিন্দু ঝরছে একটা গাঢ় অনুভূতি। তার স্বাদ বিচিত্র। সৌরভ মনোহর। সুধায় ভরে দিচ্ছে সমস্ত চৈতন্যটাকে। আর দেহে জাগিয়ে তুলছে কদম্ব-কেশরের রাঙা আবেশ।

খানিকক্ষণ পর সিগারেটের ধোঁয়ায় স্বাতীর রাঙানো ঠোঁট দুটির বানানো সার্কল অর্থাৎ বৃত্ত থেকে নতুন নতুন শিকলি উপরে উঠতে লাগল। মৃদু সুবাসে স্বয়ম্ আচ্ছন্ন বোধ করল। স্বাতীর সামনে শেরি আর স্বয়মের কফি যেন কোন্ মায়াজালে অর্থহীন হয়ে গেল। সার্থক শুধু স্বয়মের অনুভূতি।

কফির পেয়ালাটার দিকে একটু তাচ্ছিল্য হয়তো বা অনুকম্পার চাহনি হেনে স্বাতী বলল, ছো, স্বয়ম্, তুমি সেই টিপিক্যাল বাঙালিই থেকে যাবে?

স্বয়ম্ বিচলিত হয়ে খালি গলাটাতে হাত বোলাতে লাগল। প্রশ্নটা যেন কোন্ অজানা বেদনায় বরফের মতো নীল ধোঁয়ার মায়াজালের ওপার থেকে ওর কাছে ভেসে এসেছে।

স্বাতী সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ধর না কেন, গলায় টাইবিহীন কলারটা যেন বাঙালি ঘরের বিধবা।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে স্বয়ম্ কলারটা সোজা করতে করতে বলল, বুঝলাম না।

যেন কলা দেখাবে এমনভাবে আঙুল নাচিয়ে স্বাতী বলল, বুঝেছ খুব ভালো করেই। বনেদী ঘর, সাবেকী চাল, পুরনো ঠাঁট সবকিছু মিলিয়ে একটা অসহ্য মিইয়ে যাওয়া জীবন। বাদলায় ছাতাপড়া গোছের আর কী। দি ক্লাইম্যাক্স অব ডালনেস।

স্বয়ম্ ওর সুন্দর ভ্রূভঙ্গির দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল। পাঁচ বছর বিলেতে থাকার পরও যে চোস্ত বাংলায় চোখা আক্রমণ করছে আর বাক্যবাণের মুখে একটু ইংরেজির ফুলঝুরি ছিটিয়ে দিচ্ছে হাসি ছাড়া আর কিছু দিয়েই তার ধাক্কা সামলানো যায় না।

স্বয়ম্‌কে হাসতে দেখে ও আরও অসহ্য বোধ করল। হাতের গ্লাসটা স্বয়মের দিকে হেলিয়ে বলল, লুক অ্যাট ইউ। আই মিন লুক অ্যাট ইউ। একজন টিপিক্যাল বেঙ্গলি ইয়ুথ। মায় তোমার পায়ের মোজা পর্যন্ত। রাইট ডাউন টু ইয়োর সক্‌স।

ইংরেজির তোড়ে ভেসে যাওয়া বেড়ালের মতো স্বয়ম্ এবার নিজের মোজার দিকে তাকাল। মোজা দুটোতে অনেক ফুটো হয়ে গেছে। কিন্তু বাইরে থেকে তো দেখা যায় না। তবে?

বরং তার মনে হল যে মামার মক্কেলেরা পা থেকে নিচে নেমে-আসা মোজা আর গলায় লেপটানো

বিধবা কলারের উপরই ভরসা করে ভারী ভারী মামলাগুলো হাতে তুলে দিয়ে যায়। মনে হল যে মামা তার জুনিয়ারদের একদিন বোঝাচ্ছিলেন যে, বেশি স্মার্ট বা ফ্যাশনদুরস্ত হলেই মক্কেলরা মনে করতে পারে যে, নতুন অ্যাটর্নির কোর্টের চেয়ে কোর্টশিপের দিকেই নজর বেশি। তার মানে এই যে প্রফেশনে এখনও তেমন পাকাপোক্ত হয়নি।

কিন্তু সে কথাটা কোনও সদ্যপরিচিতা প্রতিবেশিনীকে এখনই বলতে কেমন যেন লাগে।

সেই তরুণীকে যার নাম ছিল স্বাতী, কিন্তু সাহেবি কায়দায় হয়ে গেছে সুইটি।

তবু নিজের কোট বজায় রেখে স্বয়ম্ বলল, হ্যাঁ। আমার তো টিপিক্যাল বেঙ্গলি ইয়ুথ হবারই কথা। জীবনে আমি যা, চেহারায় তাই তো মালুম হওয়া উচিত?

স্বাতী একথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ায় শিকলি একটার পর একটা তৈরি করতে লাগল।

ওর সুন্দর রাঙানো ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গিমা দেখে স্বয়মের কৃত্তিবাসের রামায়ণের বর্ণনা মনে পড়ল—কামের কার্মুক যেন এক একখান।

কার্মুক মানে ধনুক।

স্বয়ম্ ভাবতে লাগল—স্কুলে পণ্ডিতমশায় যখন কথার মানে বুঝিয়ে দিতেন তখন তার মধ্যে যে এত রস আছে তা তো বুঝতে পারিনি।

শেষ পর্যন্ত স্বাতী বলল, ইয়েস ডিয়ার, ইউ আর টু-উ অনেক উইথ ইয়োরসেলফ। কিন্তু এখনও তোমার উদ্ধারের আশা আছে। তোমার হিতৈষী প্রতিবেশী বলেই বলছি—বয়েস বেড়ে গেলে তুমি সেই পুরনো 'রাট'-এ সেঁটে বসে যাবে। তার চেয়ে এইবেলা কিছু একটা করে ফেল।

স্বয়ম্‌কে অবাক হয়ে ওর ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্বাতী ঠাট্টায় ঠোঁট দুটি উদ্ভাসিত করে তুলল, এই ধর, তোমার মামার কোনও শাঁসালো মক্কেলের টাকা মেরে উধাও হয়ে যাও। হাওয়াই দ্বীপে পাড়ি দাও। লড়াই সত্ত্বেও সেখানে হুলা হুলা ডান্স এখনও ওরা চালিয়ে যাচ্ছে। না হয় অন্তত কোনও প্ল্যাটিনাম ব্লন্ডকে নিয়ে লোপাট হয়ে যাও।

স্বাতী স্বয়মের কনুই ধরে একটু আলতোভাবে টিপে দিল। ফিস ফিস করে যেন কত গোপন একটা কথা জানিয়ে দিল—লিভ এ লিটল। একটুখানি বাঁচো।

একটুখানি মরমে মরে সে সাড়া দিল, সত্যি স্বাতী। বিলেতে গেলে এ রকম হয় কিনা জানি না। কিন্তু বাঁচার সম্বন্ধে তোমার ধারণাগুলো বড় আজব।

স্বাতী আরও নিবিড় হয়ে এসে বলল, আজব নয়, মাই গুড বাট লোনলি ন্যোবার। আজব নয়, সজীব। একসাইটিং। তোমরা হচ্ছ সেই দু-তিন শো বছর আগেকার ঘুমিয়ে পড়া ঘুনে-ধরা বাঙালি বাঁশফুল। কিন্তু তোমাদের সেই তারাও বেঁচে থাকত। যা তোমরা নেই।

—যথা?

—ফর ইনসটানস—যথা তোমার এনেমিক ধমনীর ক্ষীণ রক্তে কোনও সাড়া জাগবে না যদি কেউ বলে—

অর্কেস্ট্রার বাজনা ছাপিয়ে ওর মাজা-ঘষা 'হাস্কি' গলায় ও বলে চলল, যদি কেউ বলে যে, নারী হচ্ছে ভালোবাসার জন্য, সুরা সুধার মতো পান করার জন্য, যুদ্ধ বেঁচে থাকবার জন্য আর ইজ্জত মরণ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য। কই, এর মধ্যে কোন্‌টা তুমি করেছ, বল? কোন্‌টা?

স্বাতীর কথার স্রোতে স্বয়ম্ ভেসে যেতে লাগল। অসহায় খড়কুটোর মতো। সে তো জানত না যে কথার মধ্যে এত সুধা। সুধার মধ্যে এত সুরা। সুরার মধ্যে এত ঝাঁজ।

সে উঠে পড়ার জন্য উসখুস করতে লাগল।

পরাজিতের পথ পলায়ন।

স্বাতী হেসে বলল, কী? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ? আমার কথার ঝাপটার ঝড়ে? কিন্তু কী করি বল? বিলেত থেকে ফিরে দেখি যে পুরোনো বন্ধুদের আর আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে একটা দুস্তর ইংলিশ চ্যানেল।

তারপর আগ্রহ করে বলল, এসো না একদিন আমাদের বাড়ি সন্ধেবেলা। ইংলিশ চ্যানেলটা পার হয়ে।

প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড তোমাকে দেব।

আশ্চর্য হয়ে ওর বব-করা তেল-ছাড়া রংয়ের চুলের দিকে তাকাতে দেখে স্বাতী হেসে ফেলল।

বলল, ভড়কে গেলে দেখছি প্ল্যাটিনাম ব্লন্ডের নাম শুনেই। ভয় নেই। তোমায় কিডন্যাপ করে 'হাওয়াইতে সে নিয়ে যাবে না। ক্লান্ত সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছে আনা কয়ঁত্রো, ছ' আনা রাম আর চার আনা ক্রিম মেশানো একটা নতুন পানীয় তুমি খাবে। একটু চিনিও মেশানো থাকবে। আর উপরে ভাসবে একটা টুকটুকে চেরি। 'সিপ' করতে করতে তুমি খুশি হয়ে হাসবে। জীবনটাকে আর বোঝা মনে হবে না। এই হচ্ছে প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড।

ডাকোটা বিমানের মাফল-করা অর্থাৎ যেন কম্বল চাপা ইঞ্জিন দুটো মনে হল গেয়ে উঠছে—প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড। প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড।

॥ তিন ॥

প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড।

প্ল্যা-টি-না-ম ব্ল-ন-ড। নামটার মিষ্টি রেশ অনেকক্ষণ ধরে স্বয়মের মনে ধ্বনিত হয়েছিল।

ওই পানীয় বস্তুটি কেমন স্বাদের হবে, তার প্রতিফলই বা কী সে সম্বন্ধে ভাববার কথাই মনে হয়নি সেদিন। শুধু সুরেলা রেশটুকুই সমস্ত আন্তরাত্মা ভরে রেখেছিল।

আজ রাতের এই নিশীথ অভিসারের ডাকিনী ডাকোটার ইঞ্জিনের মৃদু গর্জনকে মনে হচ্ছে মধু গুঞ্জরন।

হঠাৎ এয়ার পকেটের টানে অনেক প্লেন শোঁ শোঁ করে এক নিমেষে নেমে আসে। যাত্রী আর মালসুদ্ধ আসাম-বর্মা সীমান্তের আকাশে উড়তে উড়তে শেষ হয়ে যায়। আজ এদের প্লেনের সেই একই গতি হতে পারত। অবশ্য মাইক বিশেষ হুঁশিয়ার পাইলট। আর বেশ কয়েক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল বলে সামলে নিয়েছে।

সামলাতে যদি না পারত তাহলে নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়বার আগেই হৃদ্‌যন্ত্রটা বিকল হয়ে যেত অথবা প্লেনে আগুন ধরা নিচে আর চুরমার হবার পরে দেহটা দাহ হয়ে যেত। সে খবর কেউ রাখতে আসত না।

স্বাতীর স্কুল অব ইকনমিকসের সহপাঠী বন্ধু মাইক আর কলকাতার প্রতিবেশী স্বয়ম্ দুজনেরই নাম থাকত নিখোঁজ, সম্ভবত মৃত, এই তালিকায়।

যুদ্ধ তো যুদ্ধই। এবং মৃতরা কথা কয় না।

তবু একটি যুদ্ধে সে জয়ী হবার পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের সেই আহ্বান, লিভ এ লিটল, ওকে টেনে এনেছে অজানা পথে অশান্ত অ্যাডভেঞ্চারে। পিছনের দিকে সে তাকায়নি।

যে স্বাতীকে সে পিছনে রেখে এসেছে তাকে কোনও বাঁধনে জড়িয়ে প্রতীক্ষা করে থাকতে পর্যন্ত বলে আসেনি।

এরোপ্লেনটা সামলে নিয়েছে। পিছনে প্যারাসুটবাঁধা প্যারাট্রুপের দল এবং পাশে বসা বহু অভিযানের বন্ধু মাইক পর্যন্ত জানে যে সব কিছুই সামলে গিয়েছে।

শুধু স্মৃতির এয়ার পকেট এখনও স্বয়মকে পিছনের দিকে হু-হু করে টেনে নিয়ে চলেছে। ঘূর্ণির দুরন্ত টানে।

প্লেনের ককপিটটা যেন কোনও মায়াবীর পরশ পাথরের ছোঁয়ায় আরেকটা কামরা হয়ে গেছে।

* * * *

সেদিনও বাইরে এমনই অন্ধকার ছিল। রাতের নয়, ব্ল্যাক আউটের। আর সেটাই শেষ দেখা। বিদায় বেলার দেখা।

কামরার সব দরজা জানলা ঘন পর্দায় ঢাকা। বাইরে যেন কোনও আলোর রেখা বেরিয়ে না আসে। কিন্তু বেরিয়ে আসছিল পিয়ানোর রেশ। কার, কোন্ মুখর মূর্তির মূক বাণী মেলডি হয়ে সুরের স্রোত বইয়ে দিচ্ছিল তা স্বয়ম্ জানত।

তাই কোনও আওয়াজ না করে এমন কী দরজায় টুক টুক করে জানান না দিয়েই সে ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে রইল।

সুরটা চিনে নিতে তার ভুল হয়নি। স্বাতীরই দেওয়া কয়েকটি ইয়োরোপীয় ক্ল্যাসিক্যাল রেকর্ডের মধ্যে

একটি ছিল বীঠোফেনের মুনলাইট সোনাটা। অন্য রেকর্ডগুলি সে ফেরত দিতে পেরেছিল। কিন্তু এটি স্বাতী ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়নি।

সংস্কৃত পণ্ডিতের ছেলে শুনবে প্রতি রাতে সামগানের বদলে সোনাটা।

তার মধ্যে স্বাতী কী শোনাতে চায় তা স্বয়ম্ জানত।

এই জ্যোৎস্না সংগীতের অনুরণন আকাশ ছুঁয়ে যায়, মেঘলোক ছাপিয়ে যায়। প্রেমের গহন বন আর আকুতির স্রোত সৃষ্টি করে যায়। ছন্দে ছন্দে আত্মার সংবেদন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পরিক্রমা করে আসে।

কিন্তু বেছে বেছে মুনলাইট সোনাটা কেন? এটা যে পরম বেদনার সংগীত।

কাল ভোরে স্বয়মের প্রভাত আর শান্ত বেসামরিক জগতের প্রভাত হিসাবে তার কাছে আসবে না। তাই কি এই বাজনা স্বাতী বাজাচ্ছে?

স্তব্ধ হয়ে নিঃশব্দে সে শুনছিল।

স্বাতীর কাছেই এই সংগীতের রহস্য আর মর্মবাণী সে জেনেছিল।

প্রথম অংশ যেন আত্মার প্রশান্তির রূপ, তার মৃদুমন্দ পদধ্বনি। মাঝখানে করুণ অন্তরের আবেদন, আত্মার প্রার্থনা শোনাতে শোনাতে স্বর্গে পাখা মেলে ওড়া। শেষ অংশ সুরের বন্যাস্রোত। মূর্ছনার পর মূর্ছনা যেন সাগরতরঙ্গের মতো মনের উপর আছড়ে পড়ে।

আরও কয়েকবার স্বাতী তাকে এই মুনলাইট সোনাটা বাজিয়ে শুনিয়েছিল।

মনে পড়ল, প্রথমার শুনে স্বয়ম্ এই মহান সংগীতের মর্মকথা বুঝবার জন্য গোপনে অর্থাৎ স্বাতীকে না জানিয়ে ইউরোপীয় সংগীতের বই পড়ে নিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে কিছু জার্মান কথা মুখস্থ করেছিল।

মনে পড়ল : প্রথম প্রণয়ভীরু স্বরে বীঠোফেনের ব্যবহার করা কয়েকটি জার্মান কথা সে স্বাতীকে শুনিয়ে দিয়েছিল—আইন লীবেস, ৎসাউবারিশেচেস মাডচেন। একটি প্রিয়া, একটি মায়াবিনী মেয়ে।

স্বাতী ভ্রূভঙ্গিতে বিশ্বের রাগ তুলে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি হচ্ছ বঙ্গ। আমি অনেকটা ইঙ্গ। কিন্তু তুমি জার্মান ভাষার আড়াল দিয়ে আমায় কী বললে তার মানে আমি জানি না মনে করেছ?

স্বয়ম্ অত্যন্ত নিরীহভাবে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল যে এই মেয়েটি কি শুধু শুধুই তমসা তীর্থে এত বছর শকুন্তলার মতো কাটিয়ে এসেছে?

শুনে স্বাতী আরও ক্ষেপে গেল।

বলেছিল, তোমাদের বাংলা দেশে সোজাসুজি অ্যাডমায়ার করবার হিম্মতও দেখি গজায় না। ফ্লার্ট করার তো মুরোদই নেই কারও।

হাত জোড় করে প্রায় পদ্মকলির মতো একটা মুদ্রা করেছিল স্বয়ম্। নিবেদন করেছিল স্বপনচারিণী মানসী হয়ে উঠতে পারে এমন কোনও মেয়ে কখনও আমাদের বাংলা দেশে বলে না—পুরুষ হও, আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠো। আয়নায় তাকিয়ে যাচাই করে নাও তুমি কি সত্যি সত্যি প্রেমের চোখে আকর্ষণীয়। আমরা যে রোগা-পটকা বরবটি হলেও বর সাজবার সুযোগ পেয়ে থাকি।

—অর্থাৎ আবার তোমরা মেয়েদের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছ।

—কি করব বল? আমাদের বাথরুমের বীঠোফেনরা এমন কোনও প্রেয়সী জ্যুলিয়েট্টাকে পায় না যে তাদের সব বিষাদ ও মানুষের প্রতি বিদ্বেষ দূর করে দিতে চেষ্টা করবে। যে বেকারি আর দারিদ্র্যের বিভীষিকার উপরে তুলে তাদের অন্য জগতের সন্ধান দেবে।

—তবে সবাই যে বলে, তোমাদের দেশে সবাই প্রেমে পড়ে, সেটা সত্য কি?

—শোন মন দিয়ে। মেনে নিতে না পার ক্ষতি নেই। আমার নিজের পেয়ালাটি ছোট। কিন্তু আমি অন্যদের সুরা পান করে থাকি।

—আঃ, তুমি একেবারে একটা হেঁয়ালি। সোজা সরলভাবে কিছু বলতে পার না।

—কী করে পারব বল? রিসার্চের দোহাই দিয়ে আমি না হয় মামার দৌলতে এতদিন মোটামুটি ভালোভাবে কাটিয়েছি। কিন্তু আমাদের সমবয়সি আর সমসাময়িকরা? যুদ্ধের কল্যাণে আর সবাই করে খাচ্ছে। কিন্তু ওরা হয়ে গেল রকবাজ—প্রায়ই অকাজের। নিজেদের মন নেই, উদ্দেশ্য নেই। কোনও কাজ জোর করে ধরে নিতে ভয় পায়। নিজেদের মুখোমুখি একলা হতে সাহস নেই। এমন কি বাড়ি ফিরে যেতে

ভরসা পায় না। ঘেন্না করে এভাবে জীবন কাটাতে অথচ কাটাতে বাধ্য হয়।

একটু পরে সে আবার বলল, আমিও সেই জেনারেশনের একজন। তুমি আমায় সেই চৌহদ্দি থেকে তুলে এনে শোনালে কী না মুনলাইট সোনাটা।

দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়ে স্বাতী বলেছিল, না, তুমি তাদের একজন নও। আমি অনেক দিন তোমায় দূর থেকে দেখেছি। এবং আশা করি বুঝেছি। তা না হলে সেদিন হুট করে তোমায় মোটরে তুলে নিতাম না। একা রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতাম না। বাড়িতে আসতে বলতাম না।

—প্রতিবেশী বলেও না?

—না, প্রতিবেশী হয় মন দিয়ে, ভবন দিয়ে নয়।

—বাঃ।

হো হো করে হেসে উঠেছিল স্বয়ম্।

—তুমিও দেখছি কেতাবী বাংলায় হাত পাকাচ্ছ আজকাল।

—তোমারই সঙ্গদোষে হয়তো। আচ্ছা, এবার তোমার সেই ছোট্ট পেয়ালাটার কথা বল তো! ভারি চমৎকার লেগেছে শুনতে। বীর পুরুষের নিট ব্যাটল ড্রেসে সাজা তোমার মুখে এখন আরও ভালো মানাবে।

স্বয়ম্‌ও এই অনুরোধটুকুরই অপেক্ষা করছিল।

নইলে নিজে থেকে কিছু বলবার বাসনা থাকলেও ওর মনের দিক থেকে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকেছিল।

—তবে শোন। যেদিন প্রথম তোমায় দেখি সেদিন তুমি জানতে না কেউ তোমায় সেই মুহূর্তে দেখেছে কিনা। কিন্তু শুদ্ধাচারী পণ্ডিত বাবার ছেলে আমি। ভাঙা চোরা নোংরার বাইরের মানুষ আমি! বাল্মীকির কমণ্ডলুতে আমার তৃষ্ণার জল খুঁজে পেলাম। বয়স তখন কতই বা। কিন্তু এর চেয়ে সরল করে এত গভীর অনুভব আর কোথাও আমি খুঁজে পাইনি।

—তোমার কমণ্ডলু থেকে একটু ছিটেফোঁটা ছিটিয়ে দিতে পার।

স্বাতীর গলার স্বরে সে সুরের অনুরণন পেয়েছিল। হালকা ঠাট্টা ছিল না একটুও।

তাই বলেছিল, তুমি শুনিয়েছ মুনলাইট সোনাটা। আমি শোনাচ্ছি রামায়ণী গান। এটাও মুনলাইটেরই সোনাটা।

সুপ্তৈক হংসং কুমুদৈরুপেতম্
মহা হ্রদস্থং সলিলং বিভাতি
খনৈর্বিযুক্তং নিশিপূর্ণচন্দ্রং
তারাগণাকীর্ণমিবান্তরীক্ষম্।

প্রথম ভোরের আলোকে আমার মনে হয়েছিল পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। অনেক কুমুদফুল ফুটে আছে। সায়রে একটি হাঁস ঘুমিয়ে আছে। আকাশ-ভরা তারার মধ্যে তুমি। তুমি হচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদ।

এবার ঠাট্টায় হালকা হয়ে স্বাতী জিজ্ঞেস করল, ওঃ, তোমার আকাশে বুঝি অনেক তারা আছে?

ওর ঠাট্টা গায়ে না মেখে স্বয়ম্ উত্তর দিয়েছিল, আমার ওড়বার আকাশই নেই, তায় তারা।

—ওঃ। তবে ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ না কি যেন একটা বলেছিলে?

—সেটাও আমার আকাশের নয়। দূর গগনের।

—কী রকম? আবার যেন হেঁয়ালি করছ।

—না, হেঁয়ালি নয়। তুমি যখন পিয়ানো বাজাচ্ছিলে বিদেশী ব্যাটলড্রেসে-সাজা আমি তখন বইয়ে পড়া এবং ছবিতে দেখা ভিয়েনার প্রাসাদ আর দুর্গের কথা ভাবছিলেম। সেই সব প্রাসাদ দুর্গের কুঞ্জবনের আড়ালে আঁধারে কত মধুরবাণী, কত চুম্বন, হয়তো কত প্রতিশ্রুতি বিনিময় হত। ওই সংগীতের রেশই থাকত তার মূলে। কিন্তু সে সবই হয়তো বাতাসে শিমুল ফুলের আঁশের মতো উড়ে গেছে।

হেসে স্বাতী বলেছিল, এবার তাহলে হেঁয়ালি ছেড়ে স্বীকার কর তো, এই বাজনাটার রেশও তেমনি করে মিলিয়ে যাবে কিনা।

দৃঢ়ভাবে স্বয়ম্ বলেছিল, না স্বাতী, না। তোমার সমাজের লোকরা তোমায় 'সুইটি' বলে ডাকে। সুইটির ড্রয়িংরুমের বাজনা তারা ভুলে যাবে। স্বাতীর পিয়ানোতে মুনলাইট সোনাটা আমি ভুলব না।

একটু থেমে সে বলল, আমি যে সোনাটার পরিশেষের প্রেসটো অ্যাজিটাটোর মাতাল ঝংকার নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছি, স্বাতী।

* * * *

এদিকে ডাকোটা প্লেনটাও পাহাড়ি ঝড়ের মধ্যে পড়ে উথালি-পাথালি করছে।

মাইক সেজন্য একটু ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। রওনা হবার আগে আবহাওয়া দপ্তরের 'মেট' রিপোর্টে এর পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চাঁদের আলো কতক্ষণ্ থাকবে আর জাপানি বাহিনী সক্রিয় হয়ে এগিয়ে আসার জন্য আর কতদিন দেরি করবে, সেকথা বিবেচনা করে ঝড়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অভিযান পেছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

তাছাড়া একবার সাজ সাজ রব উঠলে আর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেলে সেটা স্থগিত রাখলে শত্রুর কাছে তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ঝড়-ঝাপটায় কয়েকটা প্লেন, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর কমব্যাটান্ট সৈন্য শেষ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ করা যায়। হারানো সুযোগ ফিরে নাও আসতে পারে।

আর সারপ্রাইজ, হঠাৎ চমকে শত্রুকে বেকায়দায় ধরা যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কৌশল। সেরা স্ট্র্যাটেজি।

স্বয়ম্ একবার ভালো করে মাইকের কাজ নজর করে দেখল। পিছনে তাকিয়ে দলের সবারই মনের অস্থিরতা অনুভব করল। অন্য সময়ে এই অবস্থায় হৈ-হৈ চঞ্চলতার সীমা থাকত না।

কিন্তু এখন সমরশৃঙ্খলা সবার উপরে। যার যা কাজ তা নির্বিবাদে, বিনা প্রশ্নে তাকে করতে দাও।

এবং স্বয়ম্ স্থির সাহসে অবিচল থাকবেই। তার দলের মনে সাহস সঞ্চার করা, ভরসা বজায় রাখার দায়িত্ব তারই।

ঠিক যেমন স্বাতীর কাছ থেকে বিদায়ের সন্ধ্যাতে সেই বিদায়কে সহজ করে রেখে আসার দায়িত্বও তারই ছিল।

মাত্র কটা সন্ধ্যার দেখা। মাঝখানে ট্রেনিংয়ের জন্য দুর্গম গোপন সেন্টারে থাকার সময়টা তার নিজের দিক থেকে ভরে রেখেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

আর স্বাতীর দিক থেকে ধীর প্রতীক্ষায়।

আর মাঝখানে বিরহের নদী।

কিন্তু স্বয়ম্ সেই বিরহের কথা এতদিন এত বিপদের মধ্যে, শত্রু এলাকায় ঘুরে ঘুরে যুদ্ধে মেতে থাকার মধ্যে মনে করতে চায়নি। শুধু সঙ্গসুধার কথাই মনে করেছে বারবার। বিরহের বিধুরতা নয়, মিলনের মধুরতাই তাকে উৎসাহ দিয়েছে। দিয়েছে সাহস। দিয়েছে বিশ্বাস।

তাই তো মরণের দিকে অভিযানের মধ্যে সে জীবনের অভিসার চালিয়েছে।

তাই তো এই সাংঘাতিক ঝড়ের পাগলামি আর ডাকোটার দুটো পাখার ঝটপটানির মধ্যেও স্বয়ম শান্ত মনে ধর্মপদের একটা লাইন মনে করল—চিত্তম্ রাজরথুপমম্।

তার চিত্তই তার রাজরথ।

* * * *

সেই রথের দোলায় দোলায় সে স্বাতীর পিয়ানোর সুরের দোলায় যেন ভাসতে লাগল। তার আত্মার সংগীত প্লেনের অন্ধকারকে আলোর স্রোতে উজ্জ্বল করে তুলল। স্বাতী যেন সন্ধ্যার পূরবী জাগিয়েছিল তার বাজনাতে। যেন সন্ধ্যাকে চাঁদিনীর রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল।

স্বয়মের মন তখন শুধু একটি সুন্দর দেহকেই দেখেনি। তার মধ্যে দেখেছিল সংগীত। প্রিয়ার আঁখি কৃষ্ণকলির মতো কালো না মাইকেল এঞ্জেলোর মতো অরুণাভ সেকথা তখন মনে হয়নি। তার মধ্যে সে দেখেছিল বিগলিত মমতা। লীলায়িত আঙুলগুলির মধ্যে অনুভব করেছিল আদরের উচ্ছ্বাস।

আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে থাকতে সেই সন্ধ্যায় স্বাতীর কণ্ঠস্বরে স্বয়ম্ অনুভব করেছিল বহুদূরে বাজানো শঙ্খের মূর্ছনা, চোখে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপের আলো।

'প্রেসটো অ্যাজিটাটোর' দ্রুত লয়ের ঝংকার স্বাতীর মনেও উঠেছিল। সেদিনই সে প্রথম, প্রথম নয়, পরমভাবে বুঝেছিল যে স্বয়ম্ সত্যি সত্যি ফ্রন্টে চলে যাচ্ছে।

কেন যাচ্ছে তাও বুঝেছিল।

ভালোবাসতে আরম্ভ করলে বোধ হয় এমনই হয়। পরম পরিণামটুকু যদি বিচ্ছেদের রূপ নিয়ে আসে

তার দিকে তাকাতে, তাকে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না।

ভালোবেসেও মানুষ অস্ট্রিচ পাখির মতো বালিতে মুখ ঢাকে। শুধু ভয় পেয়ে নয়, ভালোবেসেও।

স্বাতী তাই বলল, রাখ তোমায় অ্যাজিটাটো। আজই যে তুমি চলে যাবে তা বেশ বুঝতে পারছি। আমার বাজনাটা তুমি থামিয়ে দিলে না কেন?

—কেন থামালাম না তা তুমি জিজ্ঞেস করছ, স্বাতী? তুমি কি জান না?

স্বাতী খুব ভালো করেই জানে। তবু সে আবহাওয়া হালকা করার জন্য অন্যদিকে কথার মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করল।

—হ্যাঁ জানি। আমাদের সোসাইটির মতো মেরুদণ্ডহীন লোক তুমি নও। তারা সব কিছু বোঝে, সব কিছু ব্যাখ্যা করে, অথচ কিছুই অনুভব করে না। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর্ট আর লভ নিয়ে চুলচেরা আলাপ করে, অথচ কোনটাতেই না করে বিশ্বাস, না পায় আশ্বাস।

—আমি কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ সেলাই করে তোমার দিকে তাকিয়ে থেকে অফুরান আনন্দ অনুভব করতে পারি। আর কিছুই পারি না।

রাগের ভান করে স্বাতী বলল, তুমি? এ হেন অধঃপতন তোমার?

অত্যন্ত নিরাশার ভান করে স্বয়ম্ বলল, উঃ, কত দুঃখ আমার। ঠিক অধঃপতনের সৌভাগ্য হল না। যে-কোনও সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে মন গরম হয়ে ওঠার কথা; কিন্তু আমি বেচারা ত্রিশঙ্কু। আমার আনন্দে বাসনা মেশে না। আমি আনন্দের মধ্যে পাই সান্ত্বনা, শক্তি, স্বস্তি। একরকম বলতে পার ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভার্চু'। আমার ব্যারাকের বন্ধুরা বলেছে যে আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আমারও সে ভয়টা আছে।

না হালকা না ভারী কী রকম একটা স্বরে স্বাতী তার পরের কথাটা বলেছিল। স্বয়ম্ বুঝতে পারেনি তখন ঠিক করে।

স্বাতী বলেছিল, ভয় ভাঙার সাহস কোনদিন হয় কিনা চেষ্টা করে দেখ না একবার।

—জোর খাটাবার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যোগ্যতাই জোর। ইচ্ছার দাম নেই।

—তোমার কি ইচ্ছাটুকুও নেই?

স্বাতী তখন একটা ঘেরাটোপে ঢাকা মৃদু বিজলি বাতির তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার জগতে ওইটুকু আলোর বৃত্ত যেন ওকে সমস্তটা স্বর্গের আলোতে ঘিরে রেখেছিল। সেই সুদূরের শঙ্খধ্বনি যেন আবার স্বয়মের কানে এসে বাজল।

শঙ্খ। একটা শঙ্খের ভিতর দিকটা কী চমৎকার স্নিগ্ধ, শুভ্র, মুক্তোর মতো টলটলে। স্বাতীর অঙ্গের সমস্ত অনাবৃত অংশ যেন শঙ্খের গুঁড়োর প্রলেপে ঢাকা।

স্বয়ম্ বলল, আমার ইচ্ছার কথা জানতে চাও? তুমি যেমন করে তোমার পিয়ানোর রীডগুলি স্পর্শ করে তা থেকে ঝংকার তুলছিলে, ঠিক তেমনি করে আমি তোমার মধ্যে ঝংকার তুলতে চাই। তেমনি মমতা দিয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চাই। ঠিক তেমনি করে। কারণ, তুমি আমার আকাশে চাঁদ এনে দিয়েছ।

তারপর স্বাতীর গলার স্বর কেমন যেন বদলে গিয়েছিল। এমন সেই স্বর, যার ভিতরে লুকানো থাকে বহুদিনের ইতিহাস। বহু অন্তর-নিংড়ানো স্বীকারোক্তির রোমাঞ্চকর প্রকাশ।

স্বাতী সেই স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, তবে তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করেছিলে এতদিন? তুমি কি কোনও আকস্মিক, কোনও আশ্চর্য ঘটনার অপেক্ষায় ছিলে?

স্বয়ম্ নীরব রইল।

স্বাতী আবার বলেছিল, তুমি কি এমন কিছুর অপেক্ষায় ছিলে যার কোন মানে হয় না? অথবা সাড়া পাবে না বলে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলে?

স্বয়ম্ তবু নীরব রইল।

স্বাতী আবার বলেছিল, অথবা তুমি ঠিক লোকের জন্য অপেক্ষা করছ কিনা তা-ই ভাবছিলে? জানো, জবাব পাব কী পাব না সেই আশঙ্কায় চুপ করে থাকলে উত্তর কোনদিনই এসে পৌঁছায় না। মানুষকে এমনভাবে চলতে হয় যেন উত্তর সে পাবেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত উত্তর কখন আসে সে-লগ্নের জন্য কি অপেক্ষা করা চলে?

খুব মৃদুস্বরে স্বয়ম্ উত্তর দিয়েছিল, জানি যে তা চলে না। তবু আমি পারিনি। ঠিকানা মামার বাড়ি, পেশা চাকরি খোঁজা, নেশা বইয়ের মধ্যে, রিসার্চের মধ্যে পলায়ন। এই মূলধন সম্বল করে শুধু অপেক্ষাই করা চলে। তোমার দিকে তাকিয়ে শুধু দেখেছি একটি অ্যান্টিক স্ট্যাচু, মুখে দেখেছি দা ভিঞ্চির আঁকা ছবি। আর ভেবেছি যে জীবনের একটি দিন রমণীয় অপেক্ষায় কেটে গেল।

দুজনেই তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। আর মায়াবিনী রাত অসীম মমতায় ওদের দুজনকে যেন ঢেকে রেখেছিল।

* * * *

প্লেনের জানলার কাচ দিয়ে স্বয়ম্ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন অন্ধকারকে মনের ফটোমিটার দিয়ে মাপবে।

শত্রু-এলাকার একটা ছাউনি উপর থেকে নজরে পড়েছে। কিন্তু ওদের সন্ধানী নজর আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্ট কামানের নিশানা এড়িয়ে, ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে।

বসন্ত-সন্ধ্যা, বাগানে পাশাপাশি বেড়ানো, নিচু স্বরে ফিসফিস করা এসব সুখের স্বপ্ন, যে ছত্রী-বাহিনী নিয়ে শত্রুর সীমানার পিছনে গোপনে নামবে তার জন্য নয়।

আকাশে একটা তারা হঠাৎ খসে পড়বে, তারকার মৃত্যু দেখে চিত্তে একটু দোলা লাগবে, একটা স্বপ্নের অবসান হবে। এসব মন-মাতানো সুদূরের ছবিও তার জন্য নয়।

ভিতরের দিকে চোখ ফেরাল স্বয়ম্।

স্বাতী ওকে সেই সন্ধ্যায় বলেছিল, কিন্তু আমি তোমায় শুধু বলেছিলাম জীবনকে খুঁজে নিতে, একটুখানি বাঁচতে। কিন্তু বাঁচা রসের সন্ধানে তুমি যে মিলিটারিতে যাবে, তাও আবার প্যারাট্রুপে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ভাবলে...

বাধা দিয়ে স্বয়ম্ বলেছিল, এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড করতে দিতে না, এই তো? জানো, প্যারাসুট ঝাঁপ অভ্যাস করতে করতে আমার নিজেকে এত হালকা লাগছে যে রবিঠাকুরের কবিতা আউড়ে ফেলতে পারি।

ওর মুখের ভাব আর বলার ভঙ্গি দেখে স্বাতী হেসে উঠেছিল, সে তো সব বাঙালিই পারে।

দুই বাহু তুলে প্যারা-ঝম্পের একটা আভাস দিয়ে স্বয়ম্ বলেছিল, মনে রেখো, জঙ্গী দলে ঢুকে যে জঙ্গলে মরণঝাঁপ দিতে যায় সে ঠিক বাঙালি নয়। কিন্তু তাকে কি তুমি চিনলে না এতদিনে?

—চিনি বলেই জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে আমার সামান্য কথাটার এমন অসামান্য দাম কেন দিলে।

—সামান্য নয়, স্বাতী। যে নিজে স্বয়ং আসবে আমার কাছে সেই হচ্ছে স্বাতী। স্ব আতি। যে পথ দিয়ে তুমি নিজে থেকে আসবে সেই পথ আমি তৈরি করতে যাচ্ছি। আমি ধন্য হতে চাই।

—তুমি আমার বীর, স্বয়ম্ নিজে থেকে তুমি তা হয়েছ। বীর আমার।

।। চার ।।

বীর আমার।

স্বাতী স্বয়ম্‌কে বলেছিল, বীর আমার। এই একটুখানি সম্বোধনে সে তার সমস্ত হৃদয় উজাড় করে দিয়েছিল।

আর স্বয়ম্ মনে করেছিল যে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেও কোনও পৃথ্বীরাজ বা কোনও নেপোলিয়ন এমন প্রেমের সম্ভাষণ, প্রেমের সম্বোধন পায়নি।

যেদিন স্বাতী ওকে এই বলে ডাকল তখন পর্যন্ত সে তো শুধু যুদ্ধে যেতে তৈরিই হয়েছে। তার শিক্ষার পরীক্ষাটুকুও তখনও হাতে কলমে হয়নি। তবু...

ভাবতে ভাবতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল। যেন শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নেমে আসছে। ডাকোটা প্লেনটা যেন এভারেস্টের চূড়ায় একটা পাখির বাসা। খড়কুটোয় তৈরি। তেমনি সামান্য অসহায় একটা আচ্ছাদন শুধু।

না। ভয় তার করেনি। কিন্তু আজ রাতে প্লেন টেক অফ করার আগে তার দলের কারও কারও করেছিল।

অন্ধকারের মধ্যে প্লেনের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার আগে দরজাটা বন্ধ করার কথা। ইঞ্জিনের দিক থেকে একজন হেঁকেছিল, অল সেট? অর্থাৎ সব তৈরি?

মাটিতে গ্রাউন্ড স্টাফ সবাই সরে দাঁড়িয়েছিল। ইঞ্জিন দুটো নড়েচড়ে গর্জন করে উঠল। হঠাৎ পাইলটের পাশে একজন আর্তনাদ করে উঠল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, দরজাটা খোলা।

দরজা খোলা অবস্থায় প্লেন আকাশে উড়লে ভারসাম্য থাকবে না। তখন খুব সহজে প্লেনটা মাতালের মতো উথালি-পাথালি করতে করতে ভো-কাটা ঘুড়ির মতো গোঁত্তা খেয়ে নেমে আসবে।

মিলিটারি জীবনে হরদম ব্যবহার করা হয় অকথ্য হরেকরকম রামখিস্তি। তারই তুবড়ি ফুটতে লাগল এখন অনেকের মুখে। শুধু তেরছা চোখ দিয়েই এই সৈন্যটির দিকে সবাই তাকাল। একজন হাঁকল, হারি আপ—অ্যান্ড শাট দি ডোর।

হরি হরি। হারি আপ—অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করবে কী। বেচারি ঠায় দাঁড়িয়ে দরজার জন্য হাতড়াতে লাগল অথচ দরজাটা বেশ দূরে।

বে...বেটা দরজাটা খুঁজেই পায় না। অন্ধ শা।...

যেন সবারই স্নায়ু বিগড়ে ছিল। সব কাজেই, বার বার মহড়া দেওয়া সত্ত্বেও অভ্যস্ত কাজে ওদের অনেকেরই দেরি হচ্ছিল। বে-বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

প্লেনের মধ্যে সেই সৈন্যটি হঠাৎ বলে বসল, আমার পেটের ভেতর খালি খালি মনে হচ্ছে যেন।

একজন বেরসিকভাবে উত্তর দিল, কুছ ডর নেহি। কাগজের ঠোঙা ব্যবহারের অনেক মৌকা মিলবে।

কিন্তু বমি পেলে ব্যবহারের জন্য ঠোঙা এই প্লেনে এই যাত্রায় একটা অসম্ভব বিলাস। রোজ প্যারাসুট নিয়ে মরণঝাঁপ যারা অভ্যাস করেছে তাদের বমি বমি হবে কেন?

বোমারু বিমানই বরং আগুন বমি করে একথা বলা চলে।

অর্থাৎ ব্যাপারটা গুরুতরভাবে স্নায়ুর চাপের।

স্বয়ম্ তাড়াতাড়ি বেচারার মনটা অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল।

বলল, জানো জার্মান প্যারাট্রুপদের সঙ্গে কী দেওয়া হয়? ওদের সঙ্গে দু-তিনদিনের র‍্যাশন দেয়। চকোলেট, স্লাইস রুটি, বিস্কুট আর সিগারেট। আরও কত কি। সব সেলোপেন কাগজে মোড়া। একটা করে কম্বল আর রান্নার জন্য স্টোভ পর্যন্ত। তা ছাড়া দেয়...

বলতে গিয়ে স্বয়ম্ থেমে গেল। জার্মান প্যারাট্রুপদের সঙ্গে যে 'কারেজ পিল' অর্থাৎ সাহস জোগাবার পিল দেওয়া হয় সেকথা চেপে গেল.

বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

স্বয়ম্ বলল, খুব গোপন রেখো কথাটা। ইম্ফলে আমাদের নামিয়ে দেবে! তারপর কী হবে, কী মজা হবে জানো?

—না, স্যার।

—শোন, কথাটা চাউর করা হয়নি। কারণ মাল বেশি নেই। ওখানে পাবে সি অ্যান্ড সি।

সি অ্যান্ড সি? ওর চোখ দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল। কথাটার তো মানে হয় কম্যান্ডার ইন চীফ। মিলিটারিদের মুখে মুখে এই নামটাই চালু। তাহলে?

সি অ্যান্ড সি হচ্ছে কয়ন্ত্রোঁ ককটেল। ইম্ফলে বলে যে এমন মোলায়েম ভিকটোরি কাপ অর্থাৎ বিজয়োৎসবের পেয়ালা নাকি আর হয় না। সিকি ভাগ কয়ন্ত্রোঁ, আধ ভাগ ক্যানিয়াক আর বাকিটা লেবুর রস। ভালো করে ফেটিয়ে বরফ কুচির উপর ঢেলে দাও। আর নৈবেদ্যের উপর মণ্ডার মতো সাজাও একটা তাজা পুদিনার পাতা। ব্যাস, লড়াইয়ের হয়রানি এক লহমায় খতম।

কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই যে নিজেরা খতম হয়ে যেতে পারি স্যার।

না। এসব হার-মানার ভাবনা ওদের মনে আসতে দেওয়া চলে না।

নেপোলিয়ন বলতেন, মনের সাহস দেহের শক্তির চেয়ে তিন গুণ বেশি জরুরি যে কোনও যুদ্ধে। প্যারাট্রুপ বাহিনীর পক্ষে সেই সাহস অনেক বেশি, আরও অনেক বেশি দরকার।

স্বয়মের মনে পড়ল রেজিমেন্টাল মেসে সবাই কিরকম পড়িমরি করে লাকি চার্মস জোগাড় করে রাখত। বিশেষ করে ইংরেজরা।

ওরা তো দেশী সহকর্মী মারফত তান্ত্রিক কবচ মাদুলি পর্যন্ত জোগাড় করত। প্রচুর বিয়ার পান আর প্রচণ্ড হৈ-হল্লার মাঝখানে বাহুর উপরে বাঁধা মাদুলি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়ে ব্যাটলড্রেসের তলায় মিলিয়ে যেত।

প্যারাঝম্প অভ্যাস করতে করতে বা যুদ্ধের মহড়ায় হঠাৎ কেউ পড়ে মরলে অনেকে মনে মনে খুশি হত। কারণ এর পরের দুর্ঘটনাটা নিশ্চয়ই কিছুদিন পরে আসবে। ততদিন বাঁচার মেয়াদ।

স্বয়মের মনে পড়ল ওর তাঁবুর সঙ্গী এক যোদ্ধা স্বপ্ন দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। সকলের ঘুম ভাঙিয়ে সিকিউরিটি রিস্কের কথা ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, নো, নো।

তার স্বপ্নলোকের কম্যান্ডার যেন তাকে প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে কড়া হুকুম দিচ্ছেন, আর ও বেচারা প্রাণভয়ে প্রাণপণে বলছে, নো, নো।

পঞ্চাশ নম্বর প্যারাশুট রেজিমেন্টের সেই যোদ্ধা পরদিন ইম্ফলে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জরুরি তাগিদে প্লেনে রওনা হয়েছিল। সে ঝাঁপিয়ে নেমেও ছিল ঠিকই। জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলিটারি ক্রশও পেয়েছিল পরে। সেদিনই বীরের মতো মৃত্যুর জন্যে।

কিন্তু মৃত্যুটাই তো শেষ কথা।

সে কথা বাহিনীর লোকদের বলা যায় না। যেটা বলা যায় তাই সে ওদের বলল, তোমরা নিশ্চয়ই প্যারা-মিউলের কথা জানো?

ওরা এই নামটা শুনেছে। প্যারাশুট বেঁধে খচ্চরকে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া শেখানো হয়েছিল— নেহাতই স্থানীয় প্রয়োজনে। খচ্চর ছাড়া ভারী ভারী অস্ত্র ওই ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ি এলাকায় কে আর নির্বিবাদে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? তাই চার চারটে প্যারাশুট একটা খচ্চরের সঙ্গে বেঁধে প্লেন থেকে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া চালু হয়েছিল। মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর নমুনা। অথচ বাইরের কোনও লোক জানত না।

তোমরা ভেবে দেখ, প্যারা-মিউল পর্যন্ত হাসিমুখে ঝাঁপ দিচ্ছে দুশমনের মোকাবিলা করবার জন্য। আর তোমরা হচ্ছ মরদ। শুধু মানুষ নও, পুরুষসিংহ। শের-ই-হিন্দুস্থান। থ্রি চিয়ার্স ফর অল অব ইয়ু।

যে কথা স্বয়ম্ খুলে বলল না তা হচ্ছে—প্রথম প্যারাখচ্চর যখন দেখেছিল যে নিচের পৃথিবী ওর দিকে ছুটে আসছে তখন সে এত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মাটিতে নামার পর চারদিন ধরে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো পঙ্গু হয়ে ছিল।

তাই পরে যে খচ্চরগুলিকে নামানো হয় তাদের প্লেনে তোলার সময় এনাসথেটিক ইনজেকশন দেওয়া হত যাতে মাটিতে নামার পরে আরও পনেরো মিনিট ধরে তার ঘোর থাকে।

ফলে যখন ইনজেকশনের ঘোর কেটে যেত তখন খচ্চর একটু বিহ্বল হলেও শান্ত ও সুস্থভাবে কাজ করে যেত।

—কিন্তু স্যার, ওরা হচ্ছে মিউল। আর আমরা মানুষ।

মনে মনে স্বয়ম্ ভাবল—তা কী আর বুঝছি না বাছাধন। এত দিনের প্যারাশুট ঝাঁপের অভ্যাস। এখন গভীর রাতে শত্রুসেনার পিছনে অজানা আঘাটায় নামার বেলা কোনও ভরসাই দিচ্ছে না ওদের। ওই সব যুদ্ধজীবী সৈন্যদের।

তবু ওদের সাহস দেবার জন্য সে একবার শূন্যে ঝাঁপ দেবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন হঠাৎ মাথা তুলে ওর দিকে তাকাল। মনে হল যেন পিছনের প্লেনগুলিও ওই চূড়াগুলোর মধ্যে পাখির মতো ব্যাকুলভাবে নিজেদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করবার জন্য পাখা মেলে এগিয়ে চলেছে।

আর সে হচ্ছে দলপতি। সবাইকে সাহস দিয়ে ভরসা দিয়ে ভরিয়ে তোলার দায়িত্ব তার।

স্বাতী তো ওর আজ রাতের বিশেষ দায়িত্বটার কথা না জেনেই ওকে বলেছিল, বীর আমার।

স্বয়ম্ নিজের বসবার জায়গাতে এসে বসল। ওর ঘুরে ফিরে যাওয়াতে সবাই একটু ধাতস্থ হয়েছে। বুঝেছে যে সবই ঠিক আছে। এবং এখনও হাতে সময় আছে।

* * * *

এই সময়টুকু স্বাতীর জন্য।

কারণ, ধরণীর ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে আমি দেখেছি স্বাতীকে। আমার নক্ষত্রটিকে। সংসারের সার সেই প্রতিমা, অনির্বচনীয় আনন্দমূর্তি। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অমরতার আভাসের মতো মনের মধ্যে খোদাই করা মূর্তি। নাঃ, মরণের পথে ঝাঁপ দেবার রাতেও পড়া-পাগলের বইয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

হায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তুমি যদি জানতে।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছে যে তারা একবার আকাশে উড়লে বদলে যায়, আর আগেকার মানুষটি থাকে না। শুধু আকাশে উড়লেই যদি এতটা বদলে যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে স্বাতীর চৈতন্যময় চিন্ময় আকাশে বিচরণ করলে সে রূপান্তর না জানি আরও কত বেশি গভীর।

আকাশে শুধু একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র রোবট উড়িয়ে দিলে সেটাও তো সমস্ত পৃথিবী ঘুরে সব কিছুকে ধ্বংস করার মতো অস্ত্র ছড়িয়ে বেড়াতে পারে।

আর স্বয়মের মনটা যে স্বয়ংক্রিয় হলেও যন্ত্র নয়। মন্ত্রে গড়া, মাধুর্যে ভরা মন। সারা আকাশে সে যখন যুদ্ধের জন্য উড়ছে তখনও সন্ধান করে বেড়াচ্ছে জীবন। সারা বিশ্বজগতে ছড়িয়ে আছে যে জীবন শুধু তাকে নয়, তার চেয়ে বড় কিছুকেও সন্ধান করছে।

হালকা মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ে গেছে। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য তারা মখমলের মতো নরম আকাশকে যেন মিনা করে রেখেছে। পাহাড়গুলি কতরকম গাছগাছড়ার অলংকারে সেজে আছে আর সেই গয়নাগুলি হেলেদুলে ওদের নিশীথ অভিযানকে যেন স্বাগত জানাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে প্লেনের ককপিটটা যেন কোনও মায়াবীর যাদুদণ্ডের স্পর্শে আরেকটি নিভৃত কক্ষ হয়ে গেল।

সেখানে স্বয়ম্ পরম একটা পুরস্কার পেয়েছে—যার তুলনা কোনও মিলিটারি ক্রশ বা ভিকটোরিয়া ক্রশেও নেই। স্বাতীর চোখে সে এখন বীর।

।। পাঁচ ।।

বিদায়-রাতের বাকি কথাগুলি তাই মনের মধ্যে ফিরে আসছে।

বাইরে অন্ধকার সেই রাতও আজকের মতই ছিল। ব্ল্যাক আউটের মধ্যে রাতের কলকাতা। তার মধ্যে ঘন পর্দায় ঢাকা, মাথার উপরের ভেনটিলেটর বন্ধ করা ঘেরাটোপের মৃদু আলোয় রহস্যময় একটি কামরা। ঠিক প্লেনের ককপিটের ভিতরের গহন অন্ধকারের মধ্যে যন্ত্রপাতির প্যানেলের একটি মিটমিটে আলো যেমন রহস্য সৃষ্টি করে রাখে ঠিক তেমনি একটি ছোট্ট আলোর বৃত্ত সেই ঘরে।

আর প্লেনের ককপিটে যে ইঞ্জিনের কম্বল চাপা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি চলে তারই মতো সেই পিয়ানোর বাজনার মৃদু অনুরণনের রেশ মনে ধ্বনি তুলছিল।

আইন লীবেস। একটি প্রিয়া। একটি দীপশিখা। অন্ধকারকে সার্থক করে। তারার মতো স্তিমিত, কিন্তু চাঁদের মতো মধু বর্ণের।

সাহিত্যের কথা মনে পড়ল হঠাৎ। ইংরেজিতে যখন প্রেয়সীকে 'হনি' বলে ডাকে তার মধ্যে এত মধু কি থাকে কখনও? এত সুধা? এত সার্থকতা?

আবার একটা সাহিত্যেরই কথা মনে পড়ল ওই আলোর বৃত্তের তলায় দাঁড়ানো স্বাতীকে দেখে। একটা ইংরেজি কবিতা। আমার জীবনে স্বাতীই তো দ্বিতীয়ার চাঁদ।

তুমি বলো—এ শুধু কাগজে আঁকা চাঁদ
কার্ডবোর্ডের সাগরে যাচ্ছে ভেসে ঃ
কিন্তু এ শুধু মনগড়া নয় কোনও ফাঁদ
আমায় যদি বিশ্বাস করো তুমি হেসে।

মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা সুঠাম দেহের ওপর জাগ্রত মুখ থেকে কবিতাটা যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। যেন ওর নিজের রচনা।

স্বাতী মৃদু স্বরে, প্রায় নিজের মনে বলল, যদি বিশ্বাস করি? সে কথা ভাবছ এখনও?

—না, তা ভাবছি না মোটেই। ওটা শুধু একটা কবিতার অনুবাদ। ওটা শুধু পেপার মুনের সম্বন্ধে।

মনের মধ্যেকার মুনের নয়।

সোনাটার সংগীতের রেশ যেন এখনও ঘরটাকে ভরে রেখেছে, মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। যেন একটা দখিনা বাতাস ঘরের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

স্বয়মের বঙ্গোপসাগরের তীরে প্যারাট্রুপ শিক্ষার সময়ে সে আকাশের তারাগুলির নিচে পাল তোলা নুলিয়া নৌকো দেখত। এখন তেমনই সব কিছু মনে হতে লাগল।

তেমনি অধরা, তেমনি সুদূর।

বিরাট উন্মুক্ত আকাশের নিচে জীবনের কালো স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তার কোনও ভার নেই, নেই কোনও সীমানা। আছে শুধু ছন্দ আর গতি আর প্রেম। আছে শুধু নিজেকে সার্থক করে তোলার সাধনা, ধ্যান।

সেই ধ্যানকে দেশের ব্যর্থ বেদনা বা অভাগা লোকগুলির আর্ত ক্রন্দন—একটু ফ্যান দাও মা—ভঙ্গ করতে আসতে পারে না।

সেই সাধনার পথে রণবেশে সে স্বাতীর সামনে দাঁড়িয়ে। তার মুখে একটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের আভা। আলোর বৃত্তটা তাতে মায়া মিশিয়ে দিয়েছে। সে তো হিয়া সমর্পণ করবার স্বীকার না হোক সংকেত জানিয়ে দিয়েছে।

নিজে থেকে। অযাচিত।

স্বয়ম্ ভাবল—তবু ভালো আমাদের মধ্যে কোনও কাফ্ লভ— ছেলেমানুষি প্রেম নেই। নেই বোকার মতো, ভীরুর মতো আলগোছে হাত ধরা, আধো-আধো মিঠে কথা। বন্ধুদের প্রথম 'কাফ্ লভে'র সময় থেকেই সে এ জিনিসটাকে হাস্যকর মনে করেছে। এই প্রেমিক-প্রেমিকার চোখে ভাঙা ভাঙা ভাষা, বোকামিভরা দেহস্পর্শ আর হর্ষ, একটা চোরাই সুখের ছোঁয়াচ লাগা ভাব।

তার মতে এ সব প্রণয়ীযুগলকে নিজেদের ওপরে ওঠবার ক্ষমতা বা ফুটে ওঠবার মতো ঐশ্বর্য দেয় না।

স্বয়ম্ মনে মনে অনেক প্রত্যয় নিয়ে ভাবল—ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এক হয়ে যাবার মনোভাবটাই কেমন যেন অস্বাভাবিক। আমরা দুজনে কি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ দুজন থাকতে পারি, আবার দুজনে এক হয়ে যেতে পারি, অথচ নিজেদের নিজস্বতা বজায় রাখতে পারি?

স্বাতীকে কি করে বিলোপ করে দিতে পারি আমার মধ্যে? তাহলে তো সে আর অনন্যা থাকবে না।

আর আমিও যদি ওরই মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাই তবে ও-ই বা আমাকে আমি হিসাবে পাবে কী করে? নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় ও বিকশিত। স্বাতী দেখতে চাইবে যে আমিও সেই ভাবে ফুটে উঠছি।

সেও দেখছে স্বাতীকে অনিমেষে। এমনভাবে, যেন সে দেখার শেষ নেই।

সে ভাবছে : প্রেমে পড়ে দুজন নিজেদের স্বাধীন চিত্ত, স্বতন্ত্র সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখে যখন ভালোবাসে সেই ভালোবাসাই বোধহয় সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে বড়। যা যৌবনকে অতিক্রম করে যায়, জীবনের পাত্র থেকে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু পাত্র থাকে ভরপুর। থাকে অফুরান।

সেই ভালোবাসার কথা ভেবেই বোধহয় বৈষ্ণব কবি গেয়েছিলেন—দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

ভাবতে ভাবতে স্বয়ম্ স্বাতীকে দেখছে। এতক্ষণে নজরে পড়ল যে ওর চরণে আজ শুধু সাধারণ একটা স্যান্ডাল। উঁচু হিলের ঔদ্ধত্য নয়, নরম নম্রতা ওর পা দুখানিকে ঘিরে রেখেছে।

পরনে সাদা, ঠিক সাদা নয় হালকা জলরঙের তাঁতের শাড়ি। পাড়ে নেই জরি, জমিতে নেই জামদানির ছিটেফোঁটাটুকুও। খাস বিলেতি কোনও যুদ্ধধর্মী পিরিয়ড গহনা নেই কোথাও। নেই বন্ড স্ট্রীটের মেক-আপের ছিমছাম প্রকাশ। নেই সেলফ্রিজের ঝকমকে ট্রিংকেট, টুকিটাকি নকল গয়না।

শুধু একটা সরু মুক্তার হার প্রসাধনের সাক্ষী হয়ে গলাকে মুক্তি দিয়ে রেখেছে।

এত বছর ধরে বিলেতে সযত্নে যত্নহীনতার ছোপ লাগিয়ে প্রায় ঘোড়া রং করে আনা চুলগুলি পনি টেইল অর্থাৎ ঘোড়ার ল্যাজের মতো হালকাভাবে বাঁধা নয়। কাঁধের ওপর নরমভাবে ছড়ানো। পার্ক স্ট্রীটের কোনও হেয়ার ড্রেসার অর্থাৎ কেশ শিল্পীর কারুকার্যের কোনও নমুনা নেই সেখানে।

লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে নয়, কলকাতার বেথুন কলেজে যেন প্রথম সলজ্জভাবে ভর্তি হতে চলেছে ভবানীপুরের কোনও ছাত্রী।

নতুন এক স্বাতী।

নতুন এক স্বয়ম্ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে না। ম্যান্টেল পীসের উপর দেওয়ালে টাঙানো কাঠের কাজ-করা সুইস ঘড়িটার ভিতর থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এল। কাঠের কোকিল মধু ঝরিয়ে ডেকে গেল—কু-হু কু-হু।

না। বিলেতি কোকিল কুহু কুহু ডাকে না। ডাকে কায়াকি, কায়াকি। আর অনন্তকালের সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে সময় জানিয়ে যায় যে সময় সমুদ্রের চেয়ে বেশি অনন্ত, তবু কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

সেই ঢেউয়ের ধাক্কাতেই বোধহয় স্বাতী সচকিত হয়ে উঠল। বলল, জান, এতদিনে আমার সত্যি ভয় করছে। কতখানি ভয় তা এতদিন বুঝতে পারিনি। তুমি হঠাৎ 'এনলিস্ট' করে নাম লিখিয়ে ফেললে মিলিটারিতে। তার ওপর সবচেয়ে বেশি বিপদ আর সম্মানের বাহিনীতে। একেবারে 'কোর এলিট'। আমার বুক ফুলে উঠল...

হেসে স্বয়ম্ বাধা দিল, আর এখন বুঝি করছে দুরু-দুরু। হিয়া দুরু-দুরুকে কবিরা যার লক্ষণ বলে থাকেন সেটা কিন্তু ভয় নয়। অন্য কিছু।

স্বয়ম্ ওকে বিদায়-রাত্রিতে ভারাক্রান্ত দেখে যেতে চায়নি। হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-প্রলাপ যা হয় কিছু হোক। শুধু বিষাদ নয়।

স্বাতী ম্লান হেসে বলল, তুমি এয়ারবোর্ন অফিসার কিনা। আকাশে তোমার বিচরণ। সেখান থেকে নামো। তাই হেসে সবটা উড়িয়ে দিতে চাও।

—না, ফুরিয়ে দিতে চাই। ফুর-ফুর করে পাখির মতো অন্ধকারে মিলিয়ে যাক তোমার ভয়।

—তবু তোমায় জানাতে চাই।

—সবই তো জানি।

অন্য সময় হলে ঠোঁট উলটে স্বাতী বলে উঠত, ও-হ্ রিয়েল্লি!

কিন্তু আজ সে ঠোঁটে রং-ই নেই। তার বঙ্কিম ভঙ্গিমা আসবে কোথা থেকে? সে কোনও উত্তর দিতে পারল না। শুধু অপলক দৃষ্টি একটি দীঘল দৃঢ় সজ্জিত দেহের দিকে তাকিয়ে ছল-ছল করে উঠল।

স্বয়ম্ খুব কাছে এগিয়ে এল। আবার একটু নড়ে-চড়ে সরে গেল। সে চলে যাবে অনির্দিষ্ট আকাশপথে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। ফিরবে কিনা তার ঠিক নেই। এবং কি মূর্তি নিয়ে, কতখানি অক্ষত থেকে ফিরবে তাও কেউ জানে না।

এই ক'মাস ধরে যে হাতে মৃত্যুর অভিষেক অভ্যাস করেছে সে হাত দিয়ে স্বাতীর চোখ মুছে দিতে মন চাইল না।

একবার নিষ্ঠুরের মতো ভাবল—এই তো আমার সাধনার প্রথম প্রতিদান।

সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে সে চিন্তা সরিয়ে দিল। সামরিক জীবনে প্রত্যেক বিদায়ই হয়তো শেষ বিদায়।

শুধু বলল, না স্বাতী, তুমি দুর্বল হয়ো না। তুমি তো কোনদিনই দুর্বল মেয়ে ছিলে না। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় যারা স্টারের মতো নিজের মহিমায় ঝিকমিক করে তাদের শিক্ষাই আলাদা। ব্যক্তিত্বই আলাদা। আমায় তুমি বলেছ বীর। কিন্তু বীরাঙ্গনা তো তুমি।

বীর আর বীরাঙ্গনা দুটো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে স্বয়ম্ নিজেই বিব্রত বোধ করল। এখনও সে এই কথাটা বলতে চায় না। এখনও নয়।

তাই সে কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলল, তুমি তো পরীক্ষিত পদার্থ। টেস্টেড টাফ স্টাফ। আমি এখনও শুধু ময়ূরপুচ্ছে সেজে আছি।

স্বাতী একথায় খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

মৃদুস্বরে বলল, আমাদের সোসাইটি গার্লদের সম্বন্ধে বাইরের লোকের বোধহয় তাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু আমাদের দুর্বলতা যে কোথায় তা তারা বুঝবে না। ইয়োরোপের আধুনিকা মেয়েদেরও সেই দশা। লোকে শুধু দেখে হাই সোসাইটির মেয়েরা ফ্লার্ট করে, হাসে, 'সিলি' ধরনের কাজকর্ম করে, কথা কয়। এই ফ্লার্ট আর সিলি—এই কথা-দুটোর বাংলা সঠিক অনুবাদ পর্যন্ত নেই বোধহয়। তাই তারা মনে করে যে আমরা শুধু এ সবই স্বপ্ন দেখি আর তারা আমাদের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।

একটু চুপ করে থেকে স্বাতী আবার বলল, ওরা যদি শুধু প্রজাপতির রং না দেখে মন দেখতে পেত।

কিন্তু ওদের না আছে দেখবার চোখ, জানবার মন বা যাচাই করার ক্ষমতা।

স্বয়ম্ বাধা দিল, থাক, সে সব বাজে কথা। আমিও সে বাঙালি নই, তুমিও সে প্রজাপতি নও। তবে কেন এ সব কথা?

—না, তবু তুমি জেনে যাও, আমার বাইরের পরিচয়ই সবটা নয়। আমাদের সমাজ একটা মুখোশ মুখে এঁটে দেয়, মনে করিয়ে দিতে থাকে যে ওটাই আসল মুখ। আমাদের মায়েরাও শুধু বিয়ের আয়নার মধ্যেই ওই মুখটা দেখতে চায়।

—না, না, স্বাতী। আমি শুধু তোমাকে চিনি, তোমাকে জানি।

—তবু তুমি মনে রেখো। প্রজাপতির দল যখন সমাজে বের হয় তারুণ্য ও লাবণ্য সহজেই সফলতা এনে দেয়। তারা বিভোর হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবা, মা অন্য স্বপ্নে মেতে ওঠে। আমরা যখন নাচি, গাই বা পিয়ানো বাজাই বা চটকদার অর্থহীন বুলি আওড়াই যোগ্য পাত্র যুবকরা হাসতে হবে বলেই হাসে। কিন্তু তখন আর সবাই স্বপ্নে মেতে ওঠে। এই সব মেয়েরা ছেলেদের চোখে যে আলো খোঁজে সে আলো তাদের চোখে হয়তো জ্বলেই না। তবু...

একটু থেমে স্বাতী বলল, তোমরা যদি সেই মেয়েদের দেখতে—তাদের নির্জন ঘরে নিবিড় রাতে, নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মধ্যে। তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে কোনও মায়াভরা স্বপ্নই তৈরি করতে পারে না।

—থাক না ওদের কথা। তোমার সঙ্গ যে আমি পেয়েছি সেটাই তো আমার পরম ভাগ্য। আমায় যে নতুন প্রাণ দিলে...

স্বাতী বাধা দিয়ে বলল, ঠিক তা নয়। আমি সামান্যই সঙ্গ দিয়েছি। প্রাণের প্রেরণা নিশ্চয়ই নয়।

স্বয়ম্ দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল, না না, তুমিই আমায় প্রাণবন্ত হতে বলেছিলে। আমার সামনে নতুন পৃথিবী জেগে উঠেছে তোমারই জন্যে। তুমিই প্রেরণা, তুমিই প্রাণ।

ম্লান ভাবে স্বাতী বলল, তোমার নিজের বাঁচবার প্রয়োজনে আমার সামান্য কথাটাকে অসামান্য দাম দিয়েছিলে। বিনা চিন্তায়, আধো পরিহাসে আমি তা বলেছিলাম। আমি নিজেই তো সম্পূর্ণ নই। শুধু একটা টুকরো।

আজ স্বয়ম্ ওকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে যাবে। তা না হলে নিজের ব্রতই বৃথা।

স্বয়ম্ বলল, সেই তো সব চেয়ে ভালো। শুধু একটা টুকরো। দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো। যে পূর্ণিমার দিকে অহরহ এগিয়ে যাবে। একটু টুকরো থেকে। ঠিক যেমন তুমি বলেছিলে—লিভ এ লিটল। ওই একটা অঙ্কুর থেকেই তো চারা গজায়, ফুল ফোটে। সেইভাবেই তো প্রাণ বিকশিত হয়।

—তার মানে তুমি...

—হ্যাঁ, তার মানে এমন মেয়েকেই চিরকাল মনে ধরে রাখা যায়। সম্পূর্ণ একটি নারীকে ধরা যায় না, পরশ করেও ভুলে যেতে হয়। যোগ্যা রমণীও ভোগ্যা হলেই খরচের খাতায় চলে যায়। কিন্তু মনোহারিণী একটু টুকরো থেকে যায় অফুরান। তোমার কাছে আমি সেই অফুরানের ঠিকানা পেয়েছি।

।। ছয় ।।

মোনালিসার হাসি দিয়ে শুরু হয়েছিল।

কয়েক বছর আগেকার পুরোনো সৌরভ সমস্ত স্মৃতি জাগিয়ে আবার ফিরে এল। সেই জাগরণ সে-সময় ছিল প্রায় আধো ঘুম আধো জাগরণের মাঝামাঝি। তাকে যেন এতদিনে স্বয়ম্ স্বীকার করবার সাহস পাচ্ছে।

সেই হাসির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল সেই প্রভাতে। স্বয়মের জীবনের, জাগরণের শুরু সেই লগ্নে। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

* * * *

সেই সোনালি নীল সকালে স্বয়ম্ ফিরে গেল।

কৈশোর যৌবন দুঁহু মেলি গেলা। বৈষ্ণব কবির রসঘন বর্ণনার মধ্যে সেদিন স্বয়ম্ নিজেকে খুঁজে পেয়েছিল। নিজেকে জাগতে দেখেছিল। দেখেছিল মনকে উড়তে।

বিখ্যাত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' এক ভ্রমণ-কাহিনি 'ইয়োরোপা-তে সে পড়েছিল কেমন

করে বসন্তের প্রথম পরশ পেয়ে হঠাৎ শীতের ঘন ঘোমটা খসিয়ে ইয়োরোপা আধো-নির্মিলিত আঁখি মেলে ধরে। কেমন করে সেই দেখা দেহে জাগায় হর্ষ, মনে শিহরণ। সেই লেখাতে একটি ফুলের ছবিও ছিল। নাম—চেরির হাসি। ফরাসি ঢঙে চেরিকে শেরি বলে উচ্চারণ করলেই সে হয়ে যায় প্রেয়সী।

সেই প্রেয়সীর হাসিই মোনালিসার হাসি।

আশ্চর্য। সে ইয়োরোপে যায়নি। তার খবর শুধু বইয়ের পাতা আর ফিল্মের ছবি ছাড়া আর কোথাও পায়নি। কিন্তু ভিন্‌দেশী বধূর হাতছানি সে সেই প্রভাতে পেয়ে গেল নিজের জীবনে। নিজের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

কোন্ ইন্দ্রজালে মন মুকুলিত হয়ে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিল দিগন্ত। দেহের উপর থেকে বরফের আবরণ খসে গেল।

সে মেয়েটির মুখে দেখল একটু হাসি। শুধু হাসি, অকারণ পুলকে আপন মনে হাসি।

বাংলায় তখনও রোমান্টিক যুগ চলছিল। লোকে আপন মনে হাসতে পারত। অন্যের মুখে হাসি দেখলে নিজে খুশি হতে পারত। বাঙালি মধ্যবিত্তের আলো তখনও দেশের মধ্য-আকাশে ছড়িয়ে থাকত।

পৃথিবীময় ব্যবসা-বাণিজ্যের ভীষণ মন্দা অবস্থার টাল সামলে বাংলা একরকম মোটামুটি শান্তি আর স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। নতুন সংবিধানের ফলে যে নতুন রাজনীতি সৃষ্টি হল, তা কখনও বাঙালিকে ততখানি উদ্ব্যস্ত করে তোলেনি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল খেতে পেত। সম্মান পেত। ভবিষ্যতের আশাও ছিল।

ছাত্ররা প্রত্যেক মাসে রবীন্দ্রনাথের নতুন গান, নতুন কবিতা পেত। পথে-ঘাটে নজরুলের গান গেয়ে বেড়াত। আর আবৃত্তি করত :—

'কাহারে পরাবো আজি যৌবনের
রাখী পূর্ণিমায়'

যৌবনের সঙ্গে আপন মনে হনিমুন মধুচন্দ্রিমা যাপনের সেই দিনগুলির মধ্যে স্বয়মের কৈশোর কেটেছিল। একদিকে স্বাধীনতার বাণী, অন্যদিকে 'ইয়োরোপা'য় বর্ণনা করা স্বপনচারিণী বিদেশিনীর হাতছানি—দুই-ই সমানভাবে যৌবনকে দোলা দিয়ে যেত।

ভালোবাসার মধ্যে ছিল রঙ, ছিল রোমান্স। যা সুদূর, যা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাকেই ভালোবাসতে মন আকুলি-বিকুলি করত।

এ-সময়ে স্বয়মের মামা একজন 'হোমে' মানে স্বদেশে অর্থাৎ বিলেতে রিটায়ার করে ফিরে যাওয়া সাহেবের বাড়ি সস্তায় কিনে বালিগঞ্জ পাড়ায় উঠে এলেন।

তখনকার দিনের নির্জন সাহেবপাড়া। শুধু মোটরগাড়িগুলো হুস-হুস করে চলে যায়। এমনকি হর্ন বাজিয়েও সাহেব-সুবোদের নির্জনতায় ব্যাঘাত করে না।

প্রত্যেক বাড়িতে বড় বড় বাগান, অজস্র ফুলের মেলা। গাছপালার সমারোহ। ওরা পর্যন্ত নিরিবিলি ভাবটাকে ঘন নিবিড় করে তুলেছে। শুধু তাদের মাথায় মাথায় মাঝে মাঝে ডাক শোনা যায়—পিউ কাঁহা। কখনও বা কুহু-উ-উ।

প্রেম কৃত্রিম হট-হাউসের যত্নে লালিত ফুল নয়। অগোচরে নিজে থেকে ফুটে ওঠা বনফুল। কোনও শিশিরসিক্ত রাতে, অরুণরক্ত প্রাতে, নির্জন মধ্যাহ্নে হয় তার সঞ্চার। পথের ধারে, পুকুর পাড়ে, মন-পবনের হাওয়াতে।

সেই মন-পবন বইবার পক্ষে সহজ অনুকূল এই পাড়াটা।

স্বয়ম্ তাই মনে করল। দক্ষিণের বাগানটাতে ছায়া নেমে আসে ছবির মতো। ওদের উত্তর কলকাতার পুরোনো বসতবাড়ির উঠোনে নিজেদেরই বাড়ির তেতলার রেলিঙের ছাপমারা ছায়া নয়। লম্বা সুঠাম পাম গাছের ছায়া। তমালতালিবনরাজিনীলা প্রকৃতি সে কলকাতায় দেখেনি। কিন্তু কালিদাসের সৌন্দর্য বর্ণনা সে এইটুকুর মধ্যেই পেয়ে গেল।

নিচু পাঁচিলের উপর তারের জালিকে ঢেকে রাখা লতার মর্নিং গ্লোরি ফুলের বাহার সেই ছায়াকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

কালই বিকেলে স্বয়মরা এ-বাড়িতে উঠে এসেছিল। জিনিসপত্র, লাইব্রেরি আগে থেকেই আসতে শুরু করেছিল। তাই তেমন গণ্ডগোল বা হাঙ্গামা হয়নি। শুধু যথাস্থানে সব সাজিয়ে রাখার ব্যাপার।

তারই মধ্যে সারা বিকেল স্বয়মের মনে একটি অচেনা রাগিণী ঝংকার তুলেছিল। যেন কোন অজানা বিদেশে সে এল। কোনও রূপকথার রাজ্যে। কোনও স্বপ্নভরা অলকায়।

অলকা কথাটা তার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন তুলল। অলকা মানে স্বর্গ। কিন্তু শুধু ধরাছোঁয়ার বাইরের কল্পনার স্বর্গ তো নয়। কয়েকদিন আগে ওরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'। অভিনয়ে ছিলেন শিশির ভাদুড়ী।

সেই নাটকে ধরাছোঁয়ার বাইরের ভৈরবী ষোড়শী তার মন্দির ছেড়ে সংসারের প্রেয়সী অলকা হয়ে এসেছিল। মনের মধ্যে যে প্রেয়সী তার নাম অলকা।

দক্ষিণ কলকাতা থেকে অনেক দিনের মধ্যে শ্যামবাজারে থিয়েটার দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে না। নতুন কেনা বাড়িতে শুভ গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনও কিছু এসেছিল।

উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরানার রীতি অনুসারে থিয়েটার দেখাটা একটা উৎসবের ব্যাপার। এতটা আমোদ বোধহয় আর কিছুতেই নেই। তাই ওদের বাড়ির সবাই দল বেঁধে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল।

স্বয়ম্‌ও বাদ যায়নি। কিন্তু ওই বয়সে আর ওই বই-পড়া মন নিয়ে স্বয়ম্ অভিনয়ে যা খুঁজে পেত, যা অনুভব করত সম্ভবত অন্যেরা তার ধারকাছ দিয়েও যেত না।

অভিনয় যেন জীবনের দর্পণ, মনের আয়না। রাঙানো মুখোশ নয়।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আলেকজান্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন নাটকের অভিনয় যে তাঁকে শুধু আনন্দ দিত তা নয়, প্রত্যেক বিজয়ের উৎসব হত অভিনয় দিয়ে।

স্বয়ম্‌ও মনে মনে যেন দিগ্বিজয়ে বের হত নাটক দেখবার সময়। ভাবত যে আনন্দ উপভোগের ব্যাপারে আমাতে আর আলেকজান্ডারে মিল আছে।

এর আগেও সে কয়েকবার নাটক দেখেছে। ঐতিহাসিক না হয় পৌরাণিক নাটকের জমজমাট ভাব। ভেলভেট আর চুমকি, বেনারসি আর রেশমি, মুকুট আর তলোয়ারের ঝকমক করা উজ্জ্বলতা অনেক সময় ওর চোখে চমক লাগিয়ে দিয়েছে। বহিরঙ্গের রঙ, স্টেজের দৃশ্যপট ওকে মন ভুলিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গিয়েছে। আর অভিনয় দেখতে দেখতে এটা যে অভিনয় তা অনেক সময় যেন ভুলে গেছে।

স্ত্রী-পুত্রের বিরহে ব্যাকুল রামের বেশে যখন শিশির ভাদুড়ী ওই নীল নলিন নয়ন দুটির সন্ধান করেছেন, তখন স্বয়ম্ নিজের অজান্তে রামের ব্যথা অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের মধ্যেকার মন আমাদের রোজকার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি চিনতে পারে, অনুভব করে।

ষোড়শী নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে স্বয়মের দৃষ্টি দুশ্চরিত্র জমিদারের কামনা-বাসনার নতুন একটা দিকে আকৃষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার নতুন রঙের কথা তার মনে গুনগুন করতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় সে যার পরিচয় পেল, সে হচ্ছে 'মন্ আমি', ফরাসিতে যাকে বলে বঁধু। ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদ বইয়ে সে যার পরিচয় পেল, সে হচ্ছে 'বেল আমি'—সুন্দর বঁধুয়া।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক প্রখর প্রেমের কথা সে আজকালকার বইয়ে পড়েছে। নিজের মনকে প্রসন্ন সূর্যের তাপে ধীরে ধীরে পাকতে দেখেছে। কাঁচা পেয়ারার সবুজের উপর হলদে ছোপ পড়ার মতো।

কত অগোচরে অলক্ষিতে পেয়ারার রঙ পাকে তার কোনও হিসাব কেউ রাখতে পারবে না। স্বয়মেরও কোনও হিসাব ছিল না। বাঙালি জীবনের পরিবেশে লক্ষ্মী ছেলে পাঠ্য বই আর তার চেয়ে বেশি করে অপাঠ্য বই ছাড়া প্রেমের প্রথম পাঠ আর কোথায় পাবে।

কিন্তু চোখ যার খোলা আর মন যার জাগা এবং রাজ্যের বইয়ের ভাণ্ডার যার হাতের মুঠোয়, তা শিখতে তো দেরি হবে না।

বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় আর আলোচনায় প্রেমের বিশদ বিশ্লেষণ সে শুনেছে এবং সংস্কৃতের পণ্ডিত বাবার কাছে শেখা সংস্কৃতের কল্যাণে মহিলা কবির রচনায় কৌমার-হর নায়কের জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে তা মিলিয়ে নিয়েছে।

সংস্কৃত যুগে মহিলা কবি লিখেছিলেন প্রেমের কবিতা। নায়িকা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সেই প্রেমিকের জন্য যে তার কৌমার্য হরণ করেছে। ভাবতেই স্বয়মের তরুণ মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

রক্ষণশীল বংশের সুশীল ও সুবোধ সন্তান স্কুলে পড়বার সময় বাপ-মায়ের ছায়ায় ঢাকা জীবনে বেশ ভালোই ছিল। কী বই পড়বে, কার সঙ্গে মিশবে সবই ছিল ছকে বাঁধা। কিন্তু কলকাতায় মামার বাড়িতে থেকে

পড়তে আসার পরেও কি মনের কৌমার্য অক্ষত থাকবে?

এই ক'দিন আগেও ওরা তিনজন বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার আনন্দে সোজা ইডেন গার্ডেনে চলে গিয়েছিল। সেখানে প্যাগোডার নিচে বসে প্রেম সম্বন্ধে কী তুমুল আলোচনা।

কারণ, ওদের বন্ধু সরল প্রেমে পড়েছে বলে স্বীকার করেছে।

এবং বন্ধুদের মধ্যে গোপনে দিব্যি দিয়ে বলেছে যে, এটা একেবারেই পৌরাণিক বা প্লেটোনিক নয়। এমন কী বইয়ে পড়া প্রেমও নয়। স্বয়ম্ ওরফে শ্যাম যেসব কাব্যিক-মার্কা প্রেমের উচ্ছ্বাস তোতাপাখির মতো মুখস্থ আওড়ায়, সরলের প্রেম মোটেই ওরকম পরস্মৈপদী পদার্থ নয়। একেবারে জলজ্যান্ত একটি তরুণীর সঙ্গে জীবন্ত প্রেম।

যদি সে কবিতা লিখতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই বাংলার বায়রন হয়ে উঠতে পারত, একথাও সে ঘোষণা করেছিল।

শুনে স্বয়মেরও মনে হয়েছিল যে, ওরও এখন প্রেমে পড়া উচিত। নিজের দেহের অণু-পরমাণুতে প্রেমে পড়বার জন্য সাড়া জেগেছে। অনুরণন চলছে তার রক্তধারায়, শিরাতে শিরাতে।

কবি লিখেছেন প্রথম প্রেমের উন্মেষের বর্ণনায়—প্রথম কদম ফুল। প্রথম কদম ফুলের শিহরণ জেগেছে দেহের প্রতি রোমে। উৎসুক হয়ে সে সরলের কাহিনিতে কান দিল।

সরল বলছিল, জানিস, আমার মনে হচ্ছিল যেন একটা আশ্চর্য জ্যোতি এসে পড়েছে আমার মনের ওপর। তার নামটা এখনও না হয় না-ই বললাম। ধরে নে তার নাম—মনু।

গোপীনাথ অন্য সবার চেয়ে বেশি দিন ধরে দাড়ি কামাচ্ছে। ওর নবোদ্ভিন্ন পৌরুষের প্রায় সবুজ আভাসের ওপর মমতা ভরে হাত বোলাতে বোলাতে বিজ্ঞের মতো একটা মুখভঙ্গি করল। তারপর টিপ্পনী কাটল, হ্যাঁ, মন নিয়ে যে নাড়া দিয়েছে, তাকে মনু ডাকনামটা মানাচ্ছে ভালো। এগিয়ে যা রে, ব্রাদার। তোর নির্ঘাৎ হবে।

সরল জোর দিয়ে বলল, হতেই হবে। পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। একটা অদ্ভুত সুন্দর উপস্থিতি। একটা অশরীরী মায়া। আমাদের পণ্ডিতভায়া হয়তো কালিদাস থেকে শ্লোক আউড়ে দিত। মায়া না স্বপ্ন, না মতিভ্রম।

বিজ্ঞ গোপীনাথ অনভিজ্ঞ স্বয়মের দিকেই যেন তাকিয়ে বলল, না রে, না। শরীরী কায়া নিশ্চয়ই। তা না হলে বেরথাই পীরিত করতে চলেছিস।

বৃথাই কথাটাকে সে বেশ ভেবেচিন্তে ওজন করে বেরথাই বলে উচ্চারণ করার ফল হাতে-হাতে দেখা গেল।

পীরিত কথাটাও যেন এক ধাক্কায় স্বয়ম্‌কে পুঁথিতে পড়া প্রেমের জগৎ থেকে মাটির সংসারে নামিয়ে আনল। মনোযোগ দিয়ে সে শুনতে লাগল।

এ যেন বৈষ্ণব কবিতার পীরিতির চেয়ে আরও বেশি কাছের ব্যাপার। হাতের মুঠোয় ধরাছোঁয়ার, আঁকড়ে রাখার মতো জিনিস।

সরল বলল, না, সত্যি বলছি, ভাই। একটা অশরীরী মায়া যেন রূপ ধরে সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরির দোতলা থেকে নেমে এল। আমি একটু আগেই একতলায় নেমে এসে সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে দাঁড়িয়েছি। যেন ওরই প্রত্যাশায়...।

বেশ সবজান্তা গোছের একটু হাসি ঠোঁটের ওপর খেলিয়ে নিয়ে গোপীনাথ বলল, যেন ওরই প্রত্যাশায়? এটা যে একেবারে রবি ঠাকুর মার্কা হয়ে গেল রে, ব্রাদার।

বলেই সে গলায় একটি কাঁপন তুলে হাত দুলিয়ে আবৃত্তি করে নিল—

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।

বাব্বা, প্রথম দর্শনেই এত?

সরল একটু অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে রইল।

অভিজ্ঞ গোপীনাথ আবার শুরু করল, শোন ব্রাদার, ওসব অনাদি আর অশরীরীতে এ-যুগে চলবে না।

ভালো লেগেছে, বেশ হয়েছে। ভালোবেসেছিস মনে করছিস, বেশ করছিস কিন্তু ভালোবাসায় পড়েছিস বলে মনে করিস না। তাহলেই পড়বি গভীর গাড্ডায়। ওস্তাদরা বলে যে, শুধু প্রেমের সায়রে নারায়ণের মতো অনন্ত শয়ন করলে আর এ-যুগে চলবে না। একেবারে চাই অমৃত মন্থন। বুঝলি, ভায়া, মানেটা?

স্বয়মের এত কাঠখোট্টা সাংসারিক হিসাবমাফিক ভালো লাগার কথা ভালো লাগছিল না। ভালোবাসার যে ছবি তার কল্পনায় ফুটে আছে তার সঙ্গে গোপীনাথের দৈহিক কারবারের টিপ্পনী মোটেই মেলে না।

স্বয়ম্ এখন বাধা দিল, মনে হচ্ছে, গোপীনাথ, যে তুই সরলকে ভুল বুঝছিস।

সরলও সাহস পেয়ে বলে বসল, আমারও তাই মনে হয়। তুই যা আমাদের বলেছিস তাতে মনে হয় প্রেমের উদয় তোর ওই এঁচোড়ে পাকা মনে এখনও হয়-ই নি। তুই হয়তো নিজেকেই এত ভালোবাসিস যে, যাদের ভালোবেসেছিস বলে বলেছিস, তাদের যে কত ভালোবাসা দেওয়া উচিত তা-ই বুঝতে পারিসনি। তাই আমাকেও বুঝছিস না।

হাত জোড় করে গোপীনাথ বলল, ঘাট হয়েছে বাবা। এখন তোর সেই প্রেমিকার কথাই বল্।

খুশি হয়ে সরল বলল, আমি ওরই প্রত্যাশায় আছি। অথচ কোনও কথাও হয়নি। হয়নি কোনও চোরা চাহনি বিনিময় পর্যন্ত।

গোপীনাথ ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঝাড়ল একখানা মোক্ষম 'নো কনফিডেন্স'।

সরল আহত হল, 'তার মানে তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না?'

গোপীনাথ মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, আহা, বিশ্বাস কবছি পুরোপুরি। তবে তোর যে ওই কটাক্ষ বিনিময়টুকু পর্যন্ত না হওয়া, সেটা বিশ্বাস করলাম না। বাবাঃ, দেখেছি অনেক সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ জলজ্যান্ত গোটা মানুষগুলো ডুবে ডুবে জল খেয়ে নেয়, আর তোর ওই উপোসী নয়ন আড়চোখে ডুব সাঁতার কেটেছে তবু—ওরে আমার আকাট ব্রহ্মচারী—চোরা চাহনি বিনিময় হয়নি এই কথাটা তুই বোঝাতে এসেছিস আমায়? জানিস কলকাতা শহরটা বানপ্রস্থের ডেরা নয়? আর সেকালে পর্যন্ত বনের মধ্যেও বিশ্বামিত্র মেনকা প্রভৃতি থাকত? পীরিতের দাবানলে ছটফট করত।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরল বলল, 'হুঁ, ভুল করেছি। ভুলেই গেছলাম যে তুইও একজন পাঁড় প্রেমিক।'

।। সাত ।।

পাঁড় প্রেমিক এই স্বীকৃতিতে গোপীনাথ একটু সন্তুষ্ট হল। আহা, বন্ধুবান্ধবরা ওর প্রেম করবার বিদ্যাটা স্বীকার করুক। সমীহ করে চলুক। তবেই না ওকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হবে।

নতুন কলেজে ওঠা ছাত্রদের মধ্যে আর কে এমনভাবে প্রেমের ব্যাপারে বিদ্যাদিগ্‌গজ হতে পেরেছে? এত তাড়াতাড়ি?

আব কে-ই বা সাফ ফতোয়া দিয়েছে যে লক্ষ্মী মেয়েরা লক্ষ্য করার অযোগ্য। দুষ্টু মেয়েরাই প্রেম জাগিয়ে তোলে?

তাই গোপীনাথ খুশি হয়ে বলল, আহা, যাই হোক। চার চোখ মোদ্দা এক হল তো সিঁড়ির নিচে এসে? তার পরের কাহিনিটি এবার বলে ফেল। আমরা শুনেই সুখী। শুনেই কনগ্রাচুলেট করব।

স্বয়ম্ নীরবে দুই বন্ধুর শুধু কথা শুনতে শুনতেই নিজের মধ্যে একটা উত্তাপের আভাস অনুভব করতে লাগল। একটা কিসের যেন উন্মাদনা, কিসের জন্য একটা উল্লাস, একটা অতৃপ্তি আর আনন্দে জড়াজড়ি অঙ্গাঙ্গী অনুভব।

এখন স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—বড় আশ্চর্য! ও শুনেই সুখী? সত্যি, এত্ত সুখ যে নিজের মধ্যে আর ধবে রাখা যায় না।

স্বয়ম্ মুখে বলল, পথ দেখিয়ে যা ভায়া, তুই সত্যি সত্যিই মহাজন। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। যারা এত বয়স পর্যন্ত শুধু কেতাবেই প্রেমের কথা পড়ে এসেছে তারা এবার থেকে বেছে নেবে তোর দেখানো পথ।

হ্যাঁ। সরল একটু দম নিয়ে বলল, হ্যাঁ, পথই বটে। একেবারে বন্ধুর পন্থা। বঁধুয়া তো নেমে এল একেবারে যাকে বলে বেপরোয়া। মাথা উঁচু করে, টান টান ভাবে, থুতনিটুকু পর্যন্ত উঁচুতে তুলে ধরা...

গোপীনাথ অধীর হয়ে যোগ করে দিল, যেন চুম্বনের জন্য ব্যাকুল...

সরল বাধা দিল, আঃ থামই না তুই গোপীনাথ। আমার ফিলিংস এসে গিয়েছে আর তুই সেটা নষ্ট করে দিচ্ছিস।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল, এ যে বড় অপরূপ ফিলিংস। আহা, সরলটা একেবারে লাকি ডগ যদি সত্যি প্রেমে পড়ে থাকে। যদি না...

গোপীনাথ এবার চুপ করে একদৃষ্টিতে সরলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাহাদুর ছেলে বটে সরল। ও এত চেষ্টা করে রঙ লাগিয়ে বানানো নিজের মিথ্যে প্রেমের গল্পগুলোকে সত্যি সত্যি পেছনে ফেলে একটা সত্যিকারের প্রেম করে নিল মনে হচ্ছে। সাবাস বটে সরল।

মনু হনহন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একেবারে দৃঢ় পদক্ষেপে। নিচে নেমে কোনও কথা না বলে সরলের পাশাপাশি দাঁড়াল। দুজনেই আশ্চর্য হয়ে যেন এই প্রথম দুজনকে আবিষ্কার করল।

আশ্চর্য! যেন এর আগে কখনও দেখেনি পরস্পরকে। অনেক লোকের ভিড়ে লাইব্রেরিতে যারা ছিল অপবিচিত তারা হয়ে গেল এক মুহূর্তে পরস্পরের অতি পরিচিত।

ওরা একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। সরলের মতো অনেক তরুণই তো কলকাতায় রাস্তায় গিজগিজ করছে। মনুর মতো মেয়ে অবশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। তবু ওরা দুজনে মিলে যেন আর সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

ওরা কী সব মামুলি কথাবার্তা বলেছিল তাও সরলের মনে নেই। শুধু মনে আছে যে বেশি কথাবার্তা হয়নি। মুখে ভাষা জোগায়নি। বুকে বেশি ভরসা ছিল না। দুজনেই শুধু পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

এমন কি আলতোভাবে দুজনের হাতের আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত সহজে হয়নি। হঠাৎ মনে হয়েছে যেন বিজলির ধাক্কা লেগে দুজনে আলাদা হয়ে দূরে ছিটকে যাবে।

গোপী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে দিল, ডিরেক্ট কারেন্ট কিনা। এক ঝটকায় স্পর্শের পরেই ছিটকে দেয়।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবতে লাগল—ভালো করে বুঝতে চাই, বেশ ভালো করে—কেমন করে প্রেমে পড়ে—কেমন করে—। বইয়ের বর্ণনা দিয়ে তো ঠিক মতো তার হদিস পাওয়া যায় না। কাব্যের কথা শুধুই কেতাবি।

ভাবতে ভাবতে ওর মনে কথাটা ইংরেজি ভাষাতে ধ্বনিত হয়ে উঠল—'আই ওয়ান্ট টু গেট দি ফীল অব ইট'। এর অনুভবটা পেতে চাই। শুধু বই পড়ে হয় না। বইয়ের ভাষায় কুলায় না।

গোপীনাথ বলল, আচ্ছা, তোদের দুজনের কোনও মন কষাকষি হল না? মানে, একটু মানে একটুখানি দুরকম ভিউ, মানে মতদ্বৈধ?

সরল অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল।

মন কষাকষি? হ্যাঁ,—

আমতা আমতা করে গোপীনাথ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, মন কষাকষি। মানে, ঠিক তা নয়। এই ধর তুই একটা শক্ত কথা কিছু বলে ফেললি। শক্ত মানে, একটু বেশি আধুনিক আর কী। এই ধর তোর সেই মনু সেকথা শুনে ভাবল যে, তুই একেবারে একটা গোঁয়ার আস্ত অজ, অথবা ধর লক্কা পায়রা অথবা ধর রকফেলার। এদিকে তোর প্রেমের স্পর্শ পেতে পেতে যার ডাকনাম মনু তার নিরালার নাম হয়ে গেল মনুয়া। সে চায় যে ওর বঁধুয়া, আই মিন বন্ধু, হোক একজন ইনটেলেকচুয়াল আর না হয় স্পোর্টসম্যান। তা তোর মধ্যে তার কোনটাই পেল না। ফলে একটু হতাশার ভাব। একটু হয়তো তাচ্ছিল্য। এবং তা সত্ত্বেও ভালোবাসা। মনু ঘুরিয়ে জানিয়ে দিল যে সে অন্য দুনিয়ার দিকে নজর রাখে। তুইও তাকে মানিয়ে নিতে কোনও চেষ্টা করলি না। তবু দুজনের মধ্যে প্রেম জমে উঠল।

গোপী হাতের নানারকম মুদ্রা করতে করতে বলল, কবিরা বলেন প্রেম হচ্ছে পূজা। আমিও একমত। যদিও অৰিশ্যি স্বয়মের মতো কাব্যি করি না। আমিও অ্যাডোর দিয়ে শুরু করি। মানে, ইংরেজি ঢঙে অ্যাডোর অর্থাৎ উপাসনা—যতক্ষণ না অ্যাডোরটাকে আদরে টেনে আনতে পারি।

শিক্ষানবীশ সরল হঠাৎ ওর হাত কচলানোর মধ্যে একটা কিছু ইঙ্গিতের সন্ধান পেল।

আর স্বয়ম্ ভাবল—এর মানে হচ্ছে এই যে, প্রথমে হবে হর্ষ, কিন্তু পরিণতিতে হবে স্পর্শ, আর পরিণামে...?

মুগ্ধ সরল ফস করে জিজ্ঞেস করল, আর ওটা কী হচ্ছে, বাছাধন?

ওর চোখে চোখ রেখে গোপীও নতুন একটা আইডিয়া পেল—শোন তা হলে। লেখকরা বলে প্রেম হচ্ছে সেই চুম্বক শক্তি যার কাছে নীতি সম্মান সমাজ কোনও কিছুরই বাধা আটকাতে পারে না। কিন্তু ওটা লেখকদের ভুল। ওরা ভদ্র কিনা, তাই ভুল করে। চুম্বক শক্তি হচ্ছে চুম্বন শক্তি। সেখানেই শুরু। বুঝলি?

—তোকে বোঝা? সে অনেক তপস্যার ফল, ওস্তাদ। বলই না খুলে ওটা কী হচ্ছিল?

মুখে একটা রহস্যের আভাস এনে গোপী বলল, ওই তো এখনই বললি, বাছাধন। বাছা মানে বৎস, মানে গরু। একটু দুধ দোয়ানো প্র্যাকটিস করছিলাম।

সরলের মুখ লাল হয়ে উঠল। আর স্বয়মের ছাই।

স্বয়মের বুকও ঢিপঢিপ করতে লাগল। প্রেমের কথা, রসের ইয়ার্কি শুনতে লাগে বেশ। কল্পনা করতে লাগে আরও বেশ। কিন্তু গোপী তার শেষ উত্তরের সঙ্গে যে হাতের ভঙ্গি করছিল তাকে ঠিক ভরতনাট্যমের মুদ্রা বলা চলে না। গীতগোবিন্দে অবশ্য আছে—পীনপয়োধর পরিসর-মর্দন চঞ্চল-করযুগ। তাই বলে,...

স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের একটা চটকদার কথা ওর মনে পড়ল। ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত ভাষা জার্মান। রাজনীতিকদের বেলা ফ্রেঞ্চ, সুন্দরীদের সঙ্গে ইটালিয়ান, মুরগীদের বেলা ইংরেজি; আর রাজা ও দেবতাদের বেলা স্প্যানিশ।

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—কিন্তু প্রেমের আর দেবতাদের বেলা ভাষা হওয়া উচিত সংস্কৃত। কালিদাস থেকে জয়দেব কত কামনার লীলাই না অবলীলায় সংস্কৃতে বর্ণনা করেছেন। কামকে করে তুলেছেন কমনীয়।

এদিকে সরল ভরসা করে জিজ্ঞেস করল, মানে তরুণী সুইটহার্টের...?

রস আর রহস্য দুই-ই চোখের ইশারায় ছড়িয়ে গোপী জবাব দিল, হ্যাঁরে ওল্ড বয়, হ্যাঁ। সুইটহার্ট হচ্ছে স্যালাডের ডিস। তাতে যেমন ড্রেসিং মাখাবি তেমনটিই...

ধৈর্য ধরতে না পেরে সরল প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, তার মানে ..তোমাদের ওই...।

গম্ভীরভাবে গোপীনাথ সরলের অব্যক্ত প্রশ্নটা বুঝে নিল।

তারপর গম্ভীরভাবে বিজ্ঞ গোপীনাথ সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল, শোন বাছাধন, সুইটহার্ট আর বয়ফ্রেন্ড কত দূর এগোবে তার একটা অলিখিত বিধান—দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দার। এতখানি, কিন্তু এর চেয়ে বেশি দূর নয়।

উৎসুকভাবে সরল প্রশ্ন করল, বললি নো ফার্দার, কিন্তু কতদূর সেটা?

—নো ফার্দার মানে নো ফাদার। অর্থাৎ এতদূর গড়াবি না যাতে বাপ-মার কাছে ছুটতে হয়। বুঝলি, বৎস? আজকের দিনে এই পর্যন্তই হচ্ছে আধুনিক প্রেমের সীমানা।

একটু থেমে আবার একটি মোক্ষম সদুপদেশ ঝাড়ল, দেখ, পীরিতি হচ্ছে একটা দ্বীপ। ফর টু ওনলি। ভাবোচ্ছ্বাসে ভরা, কিন্তু খরচাতে ঘেরা। যদি বাহাদুর সাঁতারে হোস তো সাঁত্‌রে সেখানে যাতায়াত করতে পারবি। কিন্তু খবরদার, কখনও ঘর বাঁধবি না। আর না হলে, মনে রাখিস ওরে কলিজায় প্রেমের বীজাণু পোরা কলেজের প্রেমিক, একেবারে যাবি ডুবে।

বাঁধা পড়া আর ডোবা সমান সর্বনেশে।

একটু থেমে বলল, তোর আমার পক্ষে প্রেমের প্রথম পাঠই হচ্ছে এই। নো খ্যাঁট, নো খরচা।

ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সরল জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু ওই যে কথাটা আছে নাথিং ভেঞ্চার নাথিং হ্যাভ। কিছুই যদি না খসাতে পারি হৃদয়েশ্বরীকে বসাব কোন্ আসনে?

ওই বাস্তব আর কল্পনা, কথার চাতুরী আর মনের ছলনা মিশিয়ে প্রেমের আলোচনা স্বয়মের নবোদ্ভিন্ন মনে রঙ ধরিয়ে দিচ্ছিল। একটার পর একটা ঘটনা কাঁচা পেয়ারাতে শরতের মায়া ঘেরা রোদের উত্তাপে অলক্ষিতে রঙ ধরিয়ে পাকিয়ে দিচ্ছিল।

সেই সময়ে সে নাট্যমন্দিরে দেখল ষোড়শী নাটকের অভিনয়। আর তার কয়েকদিন পরে উত্তর কলকাতার চোখে বিলেতের হাতছানিতে ছাওয়া সাহেবি বালিগঞ্জে উঠে যাওয়ার কথা।

নাটক দেখতে দেখতে কেবলই উচ্ছৃঙ্খল নায়ক জীবানন্দের পরিবর্তনের, প্রেমের স্পর্শে পরিবর্তনের প্রভাব মনের মধ্যে স্বয়ম্ গভীরভাবে অনুভব করতে লাগল।

বন্ধুরা কী সব দেহ মন্দিরে অনুভবের কথা আলোচনা করছিল। তার মধ্যে এই দেহসর্বস্ব জীবানন্দ যে পেয়াদার ডাক নতুন করে পেল তার কোনও প্রতিধ্বনি নেই।

জীবানন্দ ষোড়শীকে বলেছিল যে, যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না তাকে শাস্ত্রে নাম দিয়েছে অতনু।

সেই অতনুর প্রভাব স্বয়ম্ নিজের মধ্যে চায়। মন যেন তৈরি হয়ে উঠছে আত্মবিকাশের জন্য। হয়তো আত্মসমর্পণেরও জন্য।

সেই অতনুর আহ্বান যেন কত দূর থেকে ভেসে আসা সাগরসংগীত। হে সাগর, তোমার মধ্যে অবগাহন করতে চাই। গোপন স্বপনচারিণীর সংগীত যে তুমি বয়ে আনছ তোমার কলকল্লোলে।

নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িতে এসে সেই স্বপ্নচারিণীকে সে দেখল প্রথম প্রভাতেই। যে সুদূর, যে অধরা থাকবে, তাকে।

দেখে ওই নাটকের কথাগুলিই সে স্মরণ করলে মনে মনে —কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চিররহস্যে ঢাকা? জন্মান্তরের সহস্র পরিচয় যে আজ তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তুমিই মোনালিসা।

॥ আট ॥

মনোময়ী সেই কিশোরী। তার হাসির সামনে অনন্তকাল ধরে স্বয়ম দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তো তার মানসীর হাসির সামনে চার বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিলে তিলে নিমেষে নিমেষে সেই হাসির নব নব রহস্য অনুভব করেছিলেন।

অত বড় বিশ্বমুখী প্রতিভার যদি অতদিন লেগে থাকে, হা ভগবান, আমার, যে আমি সাধারণ আমি, প্রেমের কিছু জানি না, হৃদয়ের কোনও হদিস জানি না, সেই আমার কতদিন লাগবে এই হাসির রহস্য উন্মোচন করতে?

হায়! গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা? আমার হৃদয় আজ অসীম আকাশ হয়ে গেল। তার নীলিমাময় পটে তোমার মুখখানা অরুণরাঙা করে এঁকে রাখব দিনের পর দিন। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে।

স্বয়ম্ ভাবছিল আর ভাবছিল।

বন্ধুদের কথা অবশ্যই মনে এসেছিল। কই, সরল তো প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার মনে তো এরকম রঙ লেগেছে বলে মনে হল না।

অবশ্য আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। এমন কিছু কল্পনার দৌড়ও নেই। না আছে নিজস্ব মতামত। সরল যেমন সহজভাবে, সাহসী হয়ে মনুর দিকে নিজের মনখানা এগিয়ে দিল, কই আমার তো তেমন কোনও অনুভূতিই হল না।

স্বয়ম্ ভাবছিল—আমি যেন কী। দুটো দেহ, তরুণ ব্যাকুল জীয়ন্ত দুটো দেহ পাশাপাশি হেঁটে চলেছে, একথা ভাবতেই নিজের দেহটা কেমন সিরসির করে উঠেছিল।

আবার সরল বলেছিল যে আলতো ভাবে দুজনের হাতের আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত সহজে হয়নি। তার মানে, শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। সেকথা ভাবতেও নিজের মনটা চনমন করে উঠেছিল।

আর এদিকে মক্কেল ব্যক্তি গোপী। কেমন বেশ অভিজ্ঞভাবে বেশ সবজান্তা মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে সরলের ব্যাপারে টিপ্পনী কেটেছে। শুধু তাই নয়। টিপ্পনী টিপতে টিপতে ব্যাপারটাতে একটা বেশ আমেজ এনে দিয়েছে। জমিয়ে তুলেছে নরম গরম মৌজ সঞ্চার করে। এমনকি আমার—নেহাতই বইয়ের পাতায় প্রেমের সম্বন্ধে বর্ণনাই যার বিদ্যার দৌড়—সেই আমারও মনে। মক্কেল ব্যক্তি আমাদের গোপীনাথ।

কিন্তু ওকেও আজকের ব্যাপারটা বলা চলবে না।

শুধু স্বয়মের আকাশেই এতদিন কোনও নীলিমা ফুটে ওঠেনি। কোনও রঙই নয়। আকাশ যতক্ষণ শূন্য তাতে কোনও রঙ নেই। নেই কোনও মায়া, নেই কোনও হাতছানি। কেবল আজ সকালে হঠাৎ কেমন যেন সব বদলে যাচ্ছে।

স্বয়মের মনে হল যেন তার, তার নিজস্ব আকাশ এতদিন যার অপেক্ষা করছিল সে আজ বিনা আহ্বানে, বিনা ব্যাকুলতায় অরুণোদয়ে উষার মতো বেদগানের ঝংকারের মধ্য দিয়ে উদয় হল।

বিশ্বসংসারের সব কাব্যই যেন স্বয়মের জন্য রচিত হয়েছিল।

ঋগ্‌বেদের উষার উদয় থেকে তার মন চলে এল শেক্‌সপিয়রের জুলিয়েটের বারান্দায় আগমনের দিকে। রোমিয়ো দেখেছিল জুলিয়েটকে জানলার মধ্যে দিয়ে মৃদু আলোতে। বলেছিল যে ওটা পুবদিক আর প্রেয়সী হচ্ছে সবিতা। মিনতি জানিয়েছিল—ওঠো সুন্দর সূর্য, উদয় হও।

কিন্তু স্বয়মের প্রতিবেশিনী উদয় হয়েই মনোমোহিনী হাসির রহস্য আকাশে বিলিয়ে দিয়ে অন্তরালে, কোনও অমরাবতীর অন্তরালে বিলীন হয়ে গেছে। অন্তরের অন্তস্থলে সে লীন হয়ে থাক। বন্ধুদের একথা বলা ঠিক হবে না।

যদি শেক্‌সপিয়রের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত তাকেও না।

এই গতকাল পর্যন্ত যে জগতে সে নিশ্বাস নিয়েছিল সে জগৎ থেকে যেন সে বেরিয়ে এসেছে। নেই সেই হট্টগোল আর ঠেলাঠেলি। কলকাতাকে এখন আর জনারণ্য মনে হচ্ছে না। শুধু ইটকাঠের অরণ্য নয়। এখানেও যেন দা ভিঞ্চির চোখ আর মন থাকলে রঙ আর আলোর মায়ার পরশ পাওয়া যায়।

সেইজন্যই আজ সকাল থেকেই মনে হচ্ছে যে সে এসে পৌঁছেছে একটা নতুন রকম অরণ্যে। আসলে অরণ্য না বলে উপবন বললেই ঠিক হয়। বইয়ে বনের যে বর্ণনা পড়েছে তা তো আর কলকাতায় মিলবে না।

কিন্তু ছুটিতে শিলং আর দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়ে শহরের মধ্যেই যে শ্যামলিমা, যে প্রশান্তি পেয়েছে তারই তুলনা সে খুঁজে পেয়েছে বালিগঞ্জের এই সাহেবি পাড়ায়।

এখান দিয়ে যখন মোটরে করে হুস হুস করে চলে গিয়েছে অথবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নতুন কাটা ঢাকুরিয়া লেক দেখতে যাবার পথে এখান দিয়ে ঘুরে গেছে, তখনই মনে হয়েছে এ যেন নতুন একটা দেশ। শহর কলকাতার সঙ্গে এর ঠিক যেন মিল নেই। এটা যেন কলকাতা নয়।

তবে কি লন্ডন? প্যারিস?

না।

বইয়ে পড়ে আর সিনেমা দেখে সে এটুকু বুঝে নিয়েছে যে মে ফেয়ার আর লভলক প্লেস আর সানি পার্ক বিলেতী নাম অবশ্য। বিলেতের, খাস বিলেতের লোকরাই বেশির ভাগ এই অঞ্চলে থাকে। তাই এ পাড়াগুলো কলকাতার মধ্যে বিলেত।

কিন্তু বড় কথা—সবচেয়ে মনমাতানো কথা হচ্ছে এই যে, এদিকে এলেই মেলে বিদেশের ইশারা, পশ্চিমের হাতছানি।

মেলে ভিড় আর দারিদ্র্যের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে দিন যাপনের হাত থেকে নিষ্কৃতি।

মেলে অসুন্দরের, আত্মার গ্লানির অহরহ ক্ষুদ্রতা থেকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য মনের ব্যাকুলতা।

মেলে ধুলো আর ধোঁয়াতে ভরা হাওয়া এড়িয়ে, পশ্চিম পবনের মধ্যে একটি দীর্ঘ সুরভিত নিঃশ্বাস নেবার ইচ্ছা।

স্বয়ম্‌ মনে মনে অনুভব করল যে, সে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, অনেক পরিণত, অনুভবপ্রবণ। এমনকি কাল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে যে সব আলোচনা হয়েছিল তার মধ্যে সে নিজেও একজন নায়ক হতে পারে আজ। রাতারাতি তার জীবনে একটা যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

আশ্চর্য। কাল ওদের আড্ডা শেষ হয়ে যাবার সময় গোপীনাথ ওর অনভিজ্ঞ কানের কাছে গুনগুন করে শুনিয়ে দিয়েছিল : 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'। তুই এত বোকা আর 'ইনোসেন্ট' যে এর চেয়ে বেশি কিছু আর বললাম না।

শুনে স্বয়মের নিজেরই হৃদয় থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। একটি ফুলের কুঁড়ির উপর মৌমাছি যেন অতি লঘু পদক্ষেপে এসে বসে কলিকে আহ্বান করে গেল জেগে উঠতে। কলি এখনও বিকশিত হয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেই প্রস্তুতির অভাবের জন্য, এখনও সময় হয়নি বলে লজ্জায় ফুলের কলি কেঁপে উঠল যেন।

স্বয়মের মন কালও ছিল সেই কলির মতো। আজ অনুকূল পবনে দোলা লাগাতে তা যেন ফুটে এল বলে।

কিন্তু অনুকূল হবে কিনা তারও ঠিক নেই। এই তো আজই দিনের বেলা এই পাড়া আর পাড়ার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কেমন একটা প্রতিকূল আলোচনার ঝড় বয়ে গেল বাড়িতে। শুরু হয়েছিল ক্লার্কবাবুর ঘর থেকে।

আগের দিন ফাইল, কাগজ, দলিল-দস্তাবেজ সব লরি করে এ বাড়িতে চালান হয়ে এসেছিল। সকাল থেকে মুহুরিবাবু ও স্টেনোবাবু একজন বেয়ারা নিয়ে সে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে লাইব্রেরি ঘরখানা সাজানোর তদারকও করছেন। আসলে লাইব্রেরি ঘরের তদারকিটাই বেশি হচ্ছে।

সায়েব ঠিক নটার সময় এ বাড়িতে সপরিবারে এসে উঠেছেন। এবং এগারোটার সময় হয়তো নিচে নেমে এসে কাজ কতদূর গোছানো হয়েছে তা দেখে যাবেন।

সে সময়ে সায়েবের কজন বন্ধুবান্ধবও বাড়িখানা দেখে যাবার জন্য আসবেন।

কাজেই মুহুরিবাবু ও স্টেনোবাবুর ব্যস্ততার অন্ত নেই।

বেয়ারা যুধিষ্ঠির কয়েকটা ব্রীফ একটা তাকে তুলে রাখার জন্য ঝাড়ছিল। ঝাড়তে ঝাড়তে হাঁকল, মুহুরিবাবু, দেখুন তো এগুলো এই তাকে রাখব না কি?

মুহুরিবাবু নিরুত্তর।

যুধিষ্ঠির আবার ডাকল। এবার গলাটা আরও চড়া। কিন্তু সুরটা আরও সরু।

মুহুরিবাবু এতে বেয়াদবির গন্ধ পেলেন। আর সহ্য করা ঠিক নয়। সময়ে একটা ছুঁচের ফোঁড় দিলে ভবিষ্যতে অনেকটা ছেঁড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

উনি হাঁকলেন, জানিস, যুধে, এটা সায়েব পাড়া।

যুধিষ্ঠিরেরও আঁতে ঘা লাগল। সে পুরোপুরি যুধিষ্ঠির। আধখামচা যুধে হতে তার সত্যিকারের আপত্তি চিরকালই আছে। এবং সে আপত্তি যে যথার্থ তাও এ বাড়ির সবাই সাধারণত মেনে চলে।

আজ নতুন সায়েব পাড়ায় এসে তার আরও কিছু পদবৃদ্ধিই হবার কথা।

এ বাড়িতে আসার দিন কয়েক আগেই ও পাড়ার রাস্তার মোড়ের বিন্দু ঠাকুরের পানের দোকানে সবাই ওকে এ সম্বন্ধে সমঝে দিয়েছিল। অবশ্য ওকে বেয়ারা সায়েব বলে কেউ ডাকবে এতটা ভরসা দেয়নি। তবে সবাই একমত ছিল যে, মুহুরীবাবু আর স্টেনোবাবু এখন থেকে নিশ্চয়ই ওকে মিস্টার বলে ডাকবে।

যুধিষ্ঠির আর মিস্টার দুটো কথা শুনতেও খানিকটা একরকম। কাজেই কিছুদিনের মধ্যে বাপ-মায়ের দেওয়া যুধিষ্ঠিরের বদলে মিস্টার নামটাই চালু হয়ে যাবার আশা আছে। আর সায়েব বোধহয় এখন থেকে ধুতির বদলে ভালো মার্কিনের পায়জামাও করিয়ে দেবেন।

সে সময় যুধিষ্ঠির একটু মন মেজাজ বুঝে নিবেদন করতে পারলেই পায়জামার বদলে পাতলুন একেবারে নির্ঘাৎ জুটে যাবে।

বিন্দু ঠাকুর অবশ্য একটু সময়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, যেন পান্টালুন কথাটা সে ঠিকমতো বলবার চেষ্টা করে। পান্টালুন বড় ভারী কথা। যদি ভুল করে প্যান্ট বলে বসে সে তাহলে সায়েব আবার চটে যেতে পারেন। মনে করতে পারেন যে মোড়ের মামলেট কেবিনের হ্যাংলা কারিগরগুলোর মতো হাফ প্যান্ট চাইছে যুধিষ্ঠির।

তাহলেই সর্বনাশ। তাহলে যুধিষ্ঠিরের আর কোনদিন পাতলুনে প্রমোশন হবে না। মিস্টার হওয়াও হবে না।

কাজেই মিস্টারের প্রত্যাশায় তৈরি কানে যুধে ডাকটা ঢাকের মতো কড়াৎ করে আওয়াজ তুলল যেন।

অতএব যুধে যুদ্ধের জন্য তৈরি হল।

পাতলুন কেন, পায়জামাও এখনও শ্রীঅঙ্গে চড়েনি। তবে সায়েব যখন এ পাড়ায় নিবাস করেছেন পাতলুন এই এল বলে। কিন্তু সেটা যতদিন না আসছে ততদিন তো আর যুধিষ্ঠির নিজের পদবৃদ্ধির দিকে অন্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

এই সঙ্গে মনিবের পদবৃদ্ধি সে নিজেই করে নিয়েছে। তাই সায়েবের বাড়িকে সে এখন বাসা না বলে নিবাস বলছে।

সে চড়া সুর তুলে বলল, সায়েব পাড়ায় যুধে কাজ করে না। করে মিস্টার।

মুহুরিবাবু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, হো হো মিস্টার যুধিষ্ঠির। মিস্টার। মিস্টার।

স্টেনোবাবু যেন তার টাইপ মেসিনে কথাটা টাইপ করতে গিয়ে অন্য কিছু ছাপলেন। সোজা হাঁকলেন, মিস্টার নয় হে, মিষ্টান্ন। বুঝলে যুধিষ্ঠির, তুমি মিষ্টান্নর ব্যবস্থা করো। তারপর তোমার আর্জি শোনা যাবে। আগে মিষ্টান্ন, পরে মিস্টার।

মিষ্টান্নের কথায় ঘরের আবহাওয়া একটু শান্ত হল। যুধিষ্ঠির আর মুহুরিবাবু দুজনেই পরস্পরের দিকে এখনও তেমন খুশি নজরে তাকালে না। স্টেনোবাবু সেটা লক্ষ করলেন। এ অবস্থায় মিষ্টান্নের মিষ্টি প্রত্যাশাটা আরেকটু চালিয়ে যাওয়া দরকার।

তাই বললেন, দেখ হে যুধিষ্ঠির, এ পাড়ায় মোড়ে মোড়ে আসল বাগবাজারের রসগোল্লার দোকান তো আর পাওয়া যাবে না। পান তামাকেরও জোগান নেই। কাজেই ওসব আগে থেকে মজুদ রাখার ব্যবস্থা তোমায় করে রাখতে হবে। তাহলেই সবাই তোমার উপর খুশি হয়ে ডাকাডাকি করবে। ততক্ষণে র‍্যাকগুলো ঠিক করে ফেল, বাবা যুধিষ্ঠির।

—র‍্যাক, বাবু?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই তাকগুলোই হচ্ছে র‍্যাক। সাহেবি বাড়ি, তার সাহেবি ভাষা।

পায়জামা আর পাতলুনের পালা তাহলে এগিয়ে এল সত্যি সত্যি।

হাসিতে দুটো গাল কান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিল যুধিষ্ঠির।

তারপর সবিনয়ে নিবেদন করল, কিন্তু স্টেনোবাবু, এই আলামারিগুলোর সায়েবি নামটা তাহলে বাতলে দিন। সাহেবের খাস কামরায় তো দেওয়াল ঠাসা আলমারিতে। ওগুলোও তো আমিই ঝাড়পোঁছ করি।

মুহুরিবাবু মনে মনে চটছিলেন। এতক্ষণে ফিস ফিস করে বললেন, ব্যাটা অলক্ষ্মী এবার সরস্বতীর বরপুত্র হবেন।

প্রমাদ গনলেন স্টেনোবাবু। তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বললেন, ওই আলমারির ইংরিজি নাম বলবি আলমিরা, আর বাইরের মাঠটাকে বলবি লন।

যুধিষ্ঠির ততক্ষণে প্রাণপণে আলমিরা শব্দটা তালিম করছে।

স্টেনোবাবুও মনের মতো শিষ্য পেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলেন, আর ওই খেজুর গাছের মতো গাছগুলোকে বলে পালমিরা। আলমিরা আর পালমিরাতে যেন উলটোপালটা করে দিস না আবার। আজই সন্ধের দিকে সায়েব আর মা-ঠাকুরণকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি লনের কোনার পালমিরা গাছের ছায়ায় বেতের কুর্সি সাজিয়ে দিবি কিনা। সায়েব তোর ইংরিজির ঠ্যালায় খুশি হয়ে বকশিশ করে দেবেন। বুঝলি, যুধে?

ইংরেজির ধাক্কায় মিস্টার যুধিষ্ঠির যে কখন পোষমানা বেড়ালের মতো যুধে হয়ে গেল তা সে নিজেই টের পেল না। মাথা নেড়ে আলমিরা আর পালমিরা করতে করতে সে ঝাড়ন হাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

সকালে আলমিরা আর বিকেলে পালমিরা—তাহলে মনে রাখতে সুবিধে হবে। এই ফরমুলাটা মনে মনে তৈরি করতে পেরে যুধিষ্ঠিরের নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

ইতিমধ্যে মুহুরিবাবু ও স্টেনোবাবুর মাথাতেও নতুন বুদ্ধি খেলে গেছে।

রামজয়বাবু মুখটা আকাশের দিকে তুলে বললেন, বুঝেছ নবকেষ্ট, ব্যাটা যুধে আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। শালা মিস্টার না হয়ে ছাড়বে না। এখন থেকেই পাঁয়তারা কষছে।

একই লোক যে কী করে রামজয়বাবুর ব্যাটা আর শালা দুই-ই হতে পারে সে প্রশ্নের মধ্যে নবকেষ্ট গেলেন না।

ওঁর নিজের মনেও সায়েব পাড়ার অনুরণন লেগেছে। পদবৃদ্ধি না হোক পয়সা বৃদ্ধিটা তো হওয়া দরকার।

ভেবেচিন্তে নবকেষ্ট বললেন, তা তো বুঝতেই পারছি, রামজয়। তোমাদের দুজনেরই পৌষ মাস পড়েছে। যুধিষ্ঠিরের দস্তুরি আর তোমার তহুরি দুটোই এবার বেড়ে যাবে। শুধু বাড়বে না আমার...।

রামজয় তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘোরাতে চাইলেন। বললেন, তোমারও হবে ভায়া, তোমারও হবে। ভুলো না যে পাশের বাড়িতেই আছেন ব্যারিস্টার। আর অফিসের হাওয়া...

নবকেষ্ট মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, আর হাওয়া। ব্যারিস্টার সাহেব নিজেই হাওয়া

হয়ে যাচ্ছেন বিলেতে। লং ভেকেশনে অর্থাৎ হাইকোর্ট পুজোর অজুহাতে তিন তিন মাস বন্ধ হলে। আমাদের লং ভুখাশন অর্থাৎ অনশন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। নিয়ে যাচ্ছেন ওঁর মেয়েকেও।

—আরে মেয়েটা আবার কী পড়বে?

—কেন? এটিকেট। বিশ্বেস না হয় পরশুরামের বই পড়ে দেখ।

যুধিষ্ঠির আর থাকতে পারল না। ভবিষ্যতে মিস্টার এই ডাকনামে প্রমোশন পাবার কথা ভুলে সে জিজ্ঞেস করল, বাবু, এটাকেটা পড়া থাকলে বুঝি জজ ম্যাজেস্টের হয়?

—না রে যুধে, না। এটিকেট পাস করলে কেউকেটা স্বামী পাওয়া যায়। একেবারে নির্ঘাৎ।

—এবং সম্ভবত নিখরচায়। টিপ্পনী কাটলেন রামজয়বাবু।

নবকেষ্টবাবু যুধের সামনে কম ওস্তাদ বা কম ওয়াকিবহাল সাজবেন সেটা অসহ্য। তিনি খুব মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে যোগ দিলেন যে সে পাসটা করবার মোকা নাও মিলতে পারে।

—কেন, এমন কী শক্ত পাস সেটা? যত্তো সব লাস বেঞ্চির ফেল-মার্কা লক্কা পায়রার দল পর্যন্ত ওখান থেকে ওটা ভালো করেই শিখে আসে। তা আসুক। কিন্তু আজকালকার সবচেয়ে ওস্তাদ প্রজাপতি অফিস হচ্ছে তমসাতীর্থ। সবচেয়ে 'প্রগ্রেসিভ'। পুরাকালে তমসা-তীরে সীতা বিসর্জন হয়েছিল। একালে তমসা-তীরে রামের স্বয়ংবর হয়। বুঝলে ভায়া কিছু?

স্বয়ম্ একটু আগেই ঘরে ঢুকেছিল। কান পেতে ব্যারিস্টার কন্যা সম্বন্ধে আলাপ শুনছিল।

সেই কন্যাই যে ওর দৃষ্টিতে আজ উষার আলোর মতো উদয় হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই ছিল না তার মনে। সেটা যেন হতেই হবে, সেটা যেন নিয়তি।

স্বয়মের ভাগ্যে একাধারে প্রাপ্তি আর প্রয়াণ দুই-ই।

সে জন্যই তো তার মোনালিসা মাত্র একবার একটুখানি হেসে ঘরের ভিতরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই চলে যাওয়াকে সে প্রয়াণ হতে দেবে না। দিতে চায়নি।

অন্তরাত্মা ভেদ করে তার কণ্ঠে একটা মূক আকুতি জেগে উঠেছিল—যেয়ো না, যেয়ো না। আর একটু দাঁড়াও। আর একটুখানি দেখি।

সেদিন নিয়তি তাকে দাঁড়াতে দেয়নি। আজ রাতেও নিয়মিত সেই হাসিটুকু আবার তার সামনে তুলে ধরেছে। রহস্যময়ী সেই হাসি।

॥ নয় ॥

—সুইটি বলছি—সরি, স্বাতী বলছি। তুমি আজ নিশ্চয়ই সন্ধ্যাবেলা...

—সন্ধ্যায় তো আমি ব্যস্ত থাকি। কেন, তাও জান। সরি।

—না, সরি নই আমি। আমি খুশি যে তোমার বাঁধাধরা ছকের জীবনে একটা আপসেট এনে দিচ্ছি। সামান্য একটু ওলট-পালট।

—না স্বাতী, অত সহজ নয় আমার জীবন...

বাধা দিয়ে টেলিফোনের ওপার থেকে হাসির তরঙ্গ ভেসে এল—আরে, দূর ছাই জীবন। জীবনই তোমায় শাসন করবে, যদি তুমি ওটাকে শাসন না করো। আজ সন্ধ্যার জন্য তুমি সে লাগামটা আমার হাতে তুলে দাও। ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্যালপ না করাতে পারি নিদেনপক্ষে নাচুনী ছন্দে ক্যান্টার করিয়ে ছাড়ব।

স্বয়মের মনে পড়ল স্বাতীর খেদের কথা। ওর বন্ধুবান্ধব আর ওর মাঝখানে এসে গেছে একটা দুস্তর ইংলিশ চ্যানেল। অবশ্যই বিলেতে থাকার কল্যাণে। বেচারি নিঃসঙ্গ। কিন্তু তা বলে সঙ্গী হবে আমার মতো বাদলায় মিইয়ে পড়া বিস্কুট?

উপমাটা তো স্বাতীরই দেওয়া।

সেকথা মনে করিয়ে দিতে ওর আত্মসম্মানে বাধল। শুধু বলল, সন্ধেবেলাটা পড়াশুনোর জন্য আদর্শ...

আরও জোরে হেসে উত্তর ভেসে এল, আদর্শগুলো বড় সাংঘাতিক। বাস্তবটা অনেক ভালো। কারণ তা ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু খতম করে না। অতএব একটু ক্ষতিই হোক।

তবু স্বয়ম্ একটু ইতস্তত করে আরেকটা আপত্তি তুলল। বলল, প্রায়ই তোমার সঙ্গে ঘুরলে সেটা কি ভালো দেখাবে?

এবার স্বাতী রেগে গেল, হ্যাংগ ইয়োর ভালো দেখানো। এ দেশটা ভালো মেয়েতে ভরা। ওদের সঙ্গে জানাশোনা হওয়াটা মাত্র একটা ডাল মিডল ক্লাস এডুকেশন। তুমি আমার সঙ্গে আজ স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় এসো। একজন রিখাস ইংরেজ ছাত্র মিলিটারি অফিসার আর একজন ইংলন্ডে পড়া দেশী ছাত্র এদের ডেকেছি। ওদের সঙ্গে পরিচয় হলে তোমার নতুন একটা এডুকেশন হবে। কোনও ওজর করছি না।

মিলিটারি ধাঁচের আওয়াজ—যেন বুটের ক্লিক করে আওয়াজ করে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ এই ডাকটা এড়ানো যাবে না।

যে দুজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হবে তারা ওর কাছে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীর লোক। সত্যিই তো এই ব্যাপারে একটা 'এডুকেশন'ও হয়ে যাবে। স্বাতী তো বুঝছে না যে স্বাতীর সঙ্গে পরিচয়টাও স্বয়মের কাছে একটা নতুন ধরনের শিক্ষা।

* * * *

হ্যালো, সুইটি।

হ্যালো সোয়াতী।

কী সৌভাগ্য, তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হল।

হাসিমুখে এগিয়ে এসে স্বাতী করমর্দন করল। প্রথমে ইংরেজটির সঙ্গে, যে ওকে স্বাতী বলে ডেকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, তুমি তো আমাদের দেশের অতিথি। সুস্বাগত জানাচ্ছি।

স্বয়ম্ বুঝল যে, যে বন্ধুটি সুইটি বলে ডেকেছে তার মনে যেন না লাগে সেই জন্যই স্বাতী এই ব্যাখ্যাটা করল। তারপর স্বাতী তার সঙ্গে হাত মেলাল। এমন হালকাভাবে যে, তাকে প্রায় এক হাত দিয়ে নমস্কারও বলা চলে।

কিন্তু তিনজনের কলকাকলীর হুল্লোড়ে চারপাশ যেন হঠাৎ এক লাফে জীবন্ত হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ ওদের লক্ষ করতে লাগল। একজন ইঙ্গ। আরেকজন নামেই বঙ্গ। কিন্তু দুজনেই অন্য একটা পৃথিবীর বাসিন্দা। কোন্ সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এসে হাজির হয়েছে। মিলেছে ওদেরই মতো রঙিন পাখাওয়ালা এক প্রজাপতির সঙ্গে।

স্বয়মকে অস্বস্তি বোধ করতে না দিয়ে স্বাতী ওদের সঙ্গে বেশ আবেগ দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল।

মাইকেল রেনল্ডস অব স্কুল অব ইনকনমিকস—সংক্ষেপে যাকে সবাই এল. এস. ই. বলে জানে।

রণো সেন—ডিটো।

স্বয়ম্ রায়—ব্রিলিয়্যান্ট রিসার্চের ছাত্র—মাই গুড ন্যোবার।

ব্যস, পরিচয় হয়ে গেল। এখন প্রত্যেকেই নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করত।

স্বয়ম্ বিদেশী অতিথিকেই আগে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত মনে করল। তার মিলিটারি পোশাক দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে মাইক ন্যাশনাল সার্ভিসে যুদ্ধে যোগ দিয়ে এদেশে এসেছে।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল, আপনার এদেশ কেমন লাগছে?

যুদ্ধের কথা কিছু তুলল না।

মাইকেল হেসে বলল, খুব ভালো। খুব। আমি তো পড়ে গেছি লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইটেই। প্রথম দর্শনেই।

স্বয়ম্ বলল, সে তো পুরোনো, বহু প্রচলিত কথা। ফিরে যাবার সময়ও যদি প্রেম টেঁকে সেটাই আসল কথা।

হেসে স্বাতী স্বয়মকে সাবধান করে দিল, মাইক বলছে বলেই ওকে বিশ্বাস কোরো না কিন্তু। ও কথা বলে র‍্যাডিক্যালের মতো, কিন্তু অনুভব করে টোরিদের মতো। তোমার মতো মনে মুখে এক নয়। অতএব সাবধান।

স্বয়ম্ বুঝতে পারল যে এই পরিচয়ের মধ্যে স্বাতী ওকেই একটু বেশি গুরুত্ব দিল।

সেটা কি স্বাতী ওকে বাকি দুজনের তুলনায় সামাজিক নিক্তিতে ছোট বলে মনে করে বলে? মনে মনে সে একটু অস্বস্তি বোধ করল। সম্ভবত একটু কঠিন হয়ে উঠল।

কিন্তু না, কঠিন হয়ে কচ্ছপের মতো শক্ত খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলে সেটাই হবে হার মানার

লক্ষণ। স্কুল অব ইকনমিকস পৃথিবীজোড়া খ্যাতির কলেজ হতে পারে। পরনে থাকতে পারে ক্ষুরধার ইস্ত্রি করা ঝকমকে পোশাক। কিন্তু আমিই বা কম কিসে? আমি কলকাতায় পড়েছি—যেখানে আধুনিক ভারত, দ্বিজেন্দ্রলালের গান অনুকরণ করে বলব, 'মেলিল নেত্র'। আমি নিজের বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত। কাজেই কম কিসে।

আর ওই রণো সেন? নামের ধরন আর পরনের পোশাক থেকেই চেনা যাচ্ছে বড়লোক বাড়ির লক্কা পায়রা। ইনি তো বিলেতে গিয়েছেন সম্ভবত স্রেফ এটিকেট অধ্যয়ন করতে। বড়জোর উড়ে বেড়াতে বেড়াতে মা সরস্বতীর ঝুলিতে একটু আধটু ঠোকর মারতে। বিলেতের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বোধহয় দেশে ফিরে এসেছে সুশীল ও সুবোধ সুপুত্তুরের মতো। যুদ্ধে নাম লেখাবার বা যুদ্ধকালের বেঁচে থাকার কষ্ট সইবার মতো পৌরুষ ছিল না নিশ্চয়ই।

বেশ ভালো করে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিল স্বয়ম্।

না, আমি মাথা উঁচু করে অহংকার দেখাব না। আমার বিদ্যা আমায় বিনয় দিয়েছে। অবিদ্যার হাত থেকে আঘাত সহ্য করবার ধর্ম দিয়েছে। মায়ের শেখানো সংস্কৃতি হচ্ছে এই।

তা ছাড়া প্রতিবেশিনীর সম্মান জড়িত আছে আমার আচরণ আর মেলামেশার ক্ষমতার সঙ্গে। তাকে বিব্রত হতে কিছুতেই দিতে পারি না।

মনে মনে সে একটি ইংরেজি পরিহাস আউড়ে নিল। আজকাল আমাদের সবারই খুব টানাটানি চলছে। শুধু যে জিনিস বিনা খরচায় দিতে পারি তা হচ্ছে মিষ্টি কথা আর ভদ্রতা।

সাগরপারের বন্ধুকে নিয়ে স্বাতী স্বভাবতই একটু বেশ উৎসাহ দেখাল। বলল, জানো স্বয়ম্, মাইক অর্থনীতিতে এত ভালো রিসার্চ করছে যে আরও বছর খানেক তা করতে পারলে একটি খুব বড় প্রাইজ পেতে পারত।

উৎসাহ দেখাল স্বয়ম্। সপ্রসংস দৃষ্টিতে বলল, আশা করি সে সুযোগটা শিগ্‌গির ফিরে পাবেন।

কথাবার্তার পর স্বাতী মাইক আর রণোর জন্য ড্রিংকসের অর্ডার দিল। আর কোনও কথা না বলে স্বয়মের দিকে একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তার সামনে আগে এসে অর্ডার দেওয়া কফির পেয়ালাটা এখনও রয়েছে।

মুহূর্তে সে মন ঠিক করে নিল যে, সে যা আছে তাই থাকবে। আমার নিজের মূল্যই কোনদিন আমায় আকর্ষণীয় করে তুলবে, অমূল্য করে তুলবে।

মাইক আর রণো জিন অ্যান্ড লাইমের অর্ডার দিল। স্বাতী দিল শেরির। এবং স্বয়ম্‌কে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, মাই গুড ন্যেবার, এবার কি তুমি তোমার মত বদলাবে? দেখই না একবার মত বদলে।

মাইক খুব মোলায়েমভাবে বলল, অবশ্য আপনার যদি কোনও দ্বিধা থাকে, শুধু আমাদের সঙ্গ দেবার জন্যই যে আপনি ড্রিঙ্ক নেবেন তেমন অনুরোধ আমরা করব না।

স্বয়ম্ বলল, দ্বিধা নয়, অভ্যাস আর দরকার নেই বলে। আপনি জানেন না হয়তো যে স্বাধীন ভারতে আগে মনের আর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাধীনতা ছিল। মদ মাংস বা আহার বিহারের বাধানিষেধ তাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারত না। আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণে আছে যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রামচন্দ্রের ভাই ভরতের সৈন্যরা বিশ্রাম করতে এলে তাদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। আবার যদি আমরা বাহুবলের আর মনোবলের প্রসার ফিরে পাই সমাজের নিয়ম বদলাবে।

মাইক একবার সোজাসুজি স্বয়মের দিকে তাকাল। ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করে নিল।

ভাবল—সম্ভবত এর মারফত রিয়েল ইন্ডিয়ার কিছু পরিচয় পেতে পারি। যুদ্ধের দৌলতে যে দেশে এসেছি তাকে শুধু জানতে নয়, যাচাই করে নিতে পারি।

বম্বস ওভার বার্লিন—বার্লিনের উপর বিমান হানার অভিযানে সে হাত পাকিয়েছে। উড়ন্ত বেলুনের তারের জালের ব্যূহ বার বার ভেদ করেছে। জার্মান অ্যাক অ্যাক কামানের অজস্র গোলা উপেক্ষা করে বোমা ঝরিয়ে এসেছে। মনে মনে এই ধ্বংসলীলাতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। অথচ সেটা কারণ হিসাবে দেখালে নিষ্কৃতি নেই।

তাই সে নতুন আকাশে অজানা জাপানিদের মোকাবিলা করবার জন্য যেচে রণক্ষেত্রের বদল চেয়ে নিয়েছিল।

মনের মধ্যে ছিল আরও একটা গোপন সাধ। ভারতবর্ষ দেখে আসবে—যে ভারত সমস্ত হানাহানির

ঊর্দ্ধে নিজের আত্মাকে হয়তো এখনও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

সেই মাইক। ভারতকে যাচাই করতে চায়।

ইতিমধ্যে স্বাতীই মাইককে যাচাই করে দেখছিল। টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি তার পরিপূর্ণ যৌবনমূর্তি।

স্বাতীর চোখে ছিল সন্ধানী দীপ, শুধু দৃষ্টি নয়।

আর মাইকের মনে ছিল আগ্রহের আলো, শুধু প্রশ্ন নয়। শুধু পরীক্ষা নয়।

কয়েক মুহূর্ত পরে স্বাতী হেসে উঠল। বলল, কি দেখছি জানো, মাইক? আজই তোমাকে প্রথম মানুষ হিসাবে দেখছি। এতদিন ইউ ওয়্যার এ স্টাফড শার্ট; দি ক্ল্যাসিক ব্রাইট ইয়ং ম্যান।

মাইক মনে মনে নিজের অতীতকালের মূর্তিটার ওপর যেন চোখ বুলিয়ে নিল। নামকরা বৃত্তি পাওয়া ছাত্র, প্রাইজম্যান, একেবারে নিখুঁত ছাত্র বিদ্যায় আর ব্যবহারে। আদর্শ চিরাচরিত ইংরেজ ছাত্র যদি দেখতে চাও তো মাইকের সামনে দাঁড়াও।

হ্যারলড লাস্কির মুট কোর্টে তর্কের নকল আদালতে বিদ্যার পরীক্ষায় সে এই পৃথিবীজোড়া খ্যাতিমান গুরুকে অভিযুক্ত করেছিল যে, তিনি বুদ্ধিজীবীদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন। তার তর্কের মনীষার ছটা স্বয়ং গুরুকে আনন্দে অভিভূত করেছিল।

কিন্তু কোনও সহপাঠিনী অভিভূত করতে পারেনি কখনও। ছাত্রছাত্রীদের মিলিত কমনরুমে বা রিফেকটরি অর্থাৎ খাবার ঘরেও সে তার বিদ্যার আভিজাত্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল।

সেই মাইকও তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর বিদ্যাচর্চা পিছনে ফেলে রেখে দেশের ডাকে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। বিদেশে এসেছে। বিদ্যার দৌলতে যার মাথা আকাশে উঁচু হয়ে থাকত সে আকাশে উড়ে যুদ্ধ করা শিখেছে। আজ তার মধ্যে সেই ক্লাসিক ব্রাইট ইয়ং ম্যানের চেহারা প্রায় ঢাকা পড়ে এসেছে। সামরিক পোশাকই এখন সুধী ছাত্রের একমাত্র পরিচয়।

তার জগৎ একটা যুদ্ধের ছোঁয়ায় একেবারে বদলে গিয়েছে। বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে সে এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। দেশ যে সবার উপরে।

স্বাতীর প্রশ্নে সে কেন হেসে বলল, সত্যিই কি আমি কোনদিন তাই ছিলাম? আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

স্বাতী মাথায় দেশী তেল মাখা কবে যে ছেড়ে দিয়েছিল তা তারও মনে নেই। মাথারও মনে নেই। ঘোড়া রঙের থুড়ি, প্রায় চেসটনাট রঙের চুলের ঝালরে ঢাকা ঘাড় দোলাল স্বাতী।

তার পর মুখে একখানা অপরূপ হাসি ফুটিয়ে তুলল। তার আধখানা বিলিয়ে দিল মাইকের দিকে। আর বাকি আধখানা অন্য কাউকে।

যে কুড়িয়ে নিতে জানে তাকে।

রণো সেনকে? অবশ্য রণো তাই ভেবে নিল। স্বয়মকে সে ধরে নিয়েছিল একটা শুধুমাত্র 'কিড' নয়, নিরেট একটা 'ক্যাড'। শুধু ছাগলছানা নয়, বিরাট গবেট।

অতএব স্বয়ম্ হচ্ছে আউট।

স্বাতী সেই হাসিটুকুর সঙ্গে আলো ছড়িয়ে বলল, আমাদের আবেগভরা মুহূর্তটি—থুড়ি, আমার আবেগভরা মুহূর্তটির কথা আমি প্রায় ভুলে এসেছিলাম। তোমার ওই মিলিটারি সাজে আবার সেটা মনে করিয়ে দিলে। তার জন্যে তোমার কী শাস্তি পাওয়া উচিত, মাইক ডার্লিং?

স্বয়ম্ সেই কলকাতার হেমন্তের রাতে চেয়ারে বসেই ঘামতে লাগল। আবেগভরা মুহূর্ত! সেটাকে আবার মনে করিয়ে দেওয়া? তার রেশ টেনে এই সাত হাজার মাইল দূরে ডার্লিংকে সাজা দেওয়া?

পাড়ার মেয়ে। প্রতিবেশিনী। মোনালিসার মতো যে রহস্যমধুর ভাবে হাসে। যার হাসি দেবদূতের মতো পাখা মেলে ওর মনকে তুলে নিয়ে গেছে কোনও অসীম নীল আকাশের অধরা রঙিন আবেশে। যে তার অমল ধবল পালে শুধু মন্দমধুর হাসি পরিহাসের হাওয়া লাগিয়েছে।

অনেক ভারতীয় ছাত্র ইয়োরোপে গিয়ে উড়ে বেড়ায়। তার একটা রোমান্টিক সমর্থনও সে পড়েছে 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। 'ইয়োরোপা'র ধারাবাহিক বর্ণনায়। তবে অন্তত পাশের বাড়ির মেয়ে তা করেনি এহেন একটি আশা সে মনের ভিতর লালন করেছিল। ব্যারিস্টার সাহেবের মেয়ে হলেও করেনি।

তমসা তীর্থে গেলেই কি সবাই তামসিক হয়ে যায় না কি?

পরক্ষণেই স্বয়ম্ নিজেকে সমঝিয়ে নিল। স্বাধীন দেশের সহজ পরিবেশে গেলে প্রাচীন স্বাধীন ভারতের সংস্কৃত যুগের সংস্কারমুক্ত মনটাও বোধহয় ফিরে আসে নিজে থেকে।

মাইক কিন্তু মোটেই স্বয়মের মতো ঘেমে ওঠেনি। হেসে উঠেছে।

বলেছে, বাঃ। এদিকে যে আমার আবেগময় মুহূর্তের আশাটাকে তুমি শেষ করে দিয়ে বসে আছ। অজন্তার এত সব মনোহারিণী মূর্তির প্রিন্টগুলির স্বপ্ন দেখতে দেখতে মিলিটারি ট্রুপশিপে ভেসে এলাম তোমার বন্দরে। আর তুমি কি না...

স্বাতী বাধা দিল, হোয়াই অজন্তা? লন্ডনে স্ট্রান্ডে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে শাড়ির বাহার দেখেই তো তোমরা মূর্ছা যাও।

—তা যেতাম এই আশায় যে হট-হাউসে কাচের ঘেরাটোপে যে গোলাপ দেখছি বসরাই বাগিচায় তাকে তার নিজস্ব পরিবেশে আর এক শোভায় দেখতে পাব। মোট কথা 'এল এস ই'-তে তোমায় একা পাওয়াই যেত না কখনও। সব সময় মহারানীর সঙ্গে গুটিকয়েক বডিগার্ড। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে এ ডি সি মনে করাই উচিত। নিদেনপক্ষে ডানপিটে স্কার্টপরা পাহারাদারণির দল।

একটু থেমে মাইক বলল, কতবার কমনরুমে ওয়েডনেসডে টি-ড্যান্সে তোমার সঙ্গে নাচতে চেষ্টা করেছি। কয়েকবার অন্যান্যদের ফাঁকি দিয়ে 'কাট ইন' করে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মিনিট খানেক আর পাঁচ সেকেন্ডের বেশি কখনও মোকা পেলাম না। আর এখন তুমি বলছ আবেগভরা মুহূর্ত।

দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে মাইক বলল, সেটা বোধহয় তোমাদের মিস্টিরিয়াস ইস্টেব মিষ্টিরসে মেশানো। তার একটু নমুনা এবার চাখতে পারব আশা করছি।

রণো খুব সমঝদার ভঙ্গিতে শুনতে লাগল। মুখে ব্রায়ার কাঠের বাঁকানো একটা পাইপ ত্রিভঙ্গ ধাঁচে বসিয়ে ঠোঁটের কোনা দিয়ে ফিনকি ফিনকি হাসি ছড়াতে আরম্ভ করল।

কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের ক্লাসে 'উপমা কালিদাসস্য' মক্স্-করা ছাত্র স্বয়ম্। সেই হাসি দেখে সে মনে করল যেন ধানখেতের আলের কয়েকটি জায়গা কেটে দেওয়া হয়েছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে খেতের জমানো জল ফিনকি ফিনকি বেরিয়ে যাচ্ছে।

স্বাতী মোটেই ঘাবড়াল না। ডান কাঁধটা কুঁচকে এনে মাইকের দিকে তাকাল।

একটু হালকা তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে টিপ্পনী কাটল, কী আর বলি, বল? তুমি একটুও ড্রিঙ্ক করতে না। হতাশ হয়ে দেখলাম যে সিগারেটও খাও না। যাদের সঙ্গে নাচো, মানে যারা কলেজের টি-ড্যান্সের সময় তোমার ভালো ছেলে মার্কা তকমা দেখে নাচের জন্য এগিয়ে আসে, তাদের ভালো করে স্পর্শ পর্যন্ত করো না। তুমি সেই তরুণ নও যার কঠোর পরশে একজন সহপাঠিনী দশ লহমাতে কাঁপতে কাঁপতে খান-খান হয়ে যাবে। তোমার প্রতি আবেগ এমনকি 'কাফ লাভ' অনুভব করবো তার কোনও পথ পর্যন্ত ছিল না।

এবার স্বাতী দুষ্টুমি ভরা হাসি হেসে বলল, তোমার প্রতি দুর্বলতা দেখানো মেয়েদের আত্মসম্মানে আঘাত করতে পারত। হিন্দুশাস্ত্রে বলে আকাট ব্রহ্মচারী।

মাইক মিষ্টি হাসি হেসে মন্তব্য করল, শকুন্তলার জন্মকাহিনি আমি পড়িনি বলে মনে করো না, সোযাতি। হায়, কোনও মেনকা আমার কাছে আসেনি।

ঠাট্টায় হেরে গিয়ে স্বাতী একটা সিগারেট ধরাল খুব ক্ষিপ্র হাতে। যাতে সঙ্গীরা কেউ দেশলাই ধরাবার সুযোগটুকুও না পায়। তাবপর নিজের মনে ধোঁয়ার শিকলি তৈরি করে শূন্যে ওড়াতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি।

পরাজয় ওকে ছুঁতে পারল না। মিলিটারি অস্ত্র আর পোশাক পরা প্যারাট্রুপ এক্সপিডিশনের দলপতি স্বয়ম্ প্লেনে বসে স্মৃতিচারণ করতে করতে চকিতে ভাবল যুদ্ধের শাস্ত্রে স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট একেই বলে!

॥ দশ ॥

স্বয়ম্ ততক্ষণে মাইকের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

এদেশে পড়ুয়া ভালো ছাত্র শুধু সুশীল ও সুবোধ বালক হয়েই থেকে যায়। তার বাইরের জীবনে পা বাড়ায় না। তার জন্য না পায় সাহস না উৎসাহ। না সহযোগ। হঠাৎ একটা দিশেহারা অবস্থায় পড়লে হতবুদ্ধি

হয়ে পড়ে। অসহায় হয়ে যায়।

সে হচ্ছে আজীবন দণ্ডকবনে লক্ষ্মণের গণ্ডি বাঁধা ছকের মধ্যে সীতা।

এদিকে মাইককে দেখ। ওর বুকের ডোরাকাটা রঙিন ফিতে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এরই মধ্যে ও ডিসটিনগুইশড ফ্লাইং ক্রস ডি. এফ. সি. নামে পুরস্কার পেয়েছে। বিমানবাহিনীতে বিশেষ বীরত্বের জন্য।

কিন্তু সেই পুরস্কার ওর বুকে চড়েছে; মাথায় নয়।

অথচ জীবনকে ও যে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারে তার প্রমাণ এই সন্ধ্যায় ওর হাসিঠাট্টার ব্যবহার। জীবনের সহজ স্বচ্ছ মুহূর্তগুলির উচ্ছলতা আর নিবিড়তা ও দু'হাতে অঞ্জলি ভরে পান করছে।

কিন্তু ওর বোমারু বিমানের অন্ধকারে এই সরল হাসিমাখা মুখটি কি সহসা শ্রান্ত বিরক্ত বিবর্ণ মরণের আর মারণের কালো ছায়ায় ভরে ওঠে? না। তবু সে মাইক রোনাল্ডসই থাকে।

আর আমরা? বাঙালি ছেলেরা? পুরুষানুক্রমে থোড় বড়ি খাড়ার চর্চা করে চলেছি। নিশ্চিন্ত না হয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে জানা পথেই আনাগোনা করছি।

যুদ্ধ বেধেছে, তাতে কী যায় আসে? জিনিসপত্রের দাম আগুন। কিন্তু যাদের সামর্থ্য আছে তারা পাচ্ছে ঠিকই। খাচ্ছে ঠিকই। দুর্ভিক্ষে লোক ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে শহরে। মরছে রাস্তার দুধারে।

কিন্তু বাড়ির ভিতরে আমাদের মতো লোকের মনের ভিতটা তোলপাড় করছে না। মোটামুটি সইয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে আছে।

মাথার উপর শত্রুর আক্রমণের ভয় যখন-তখন। কিন্তু দেশরক্ষা করার জন্য খাটুক অন্য লোক। বিদেশী মনিবের মাইনে করা লোক আছে, মিতারা আছে। তারাই দেশটাকে জমিদারি জ্ঞান করে বাঁচাবে।

আর সবারই কিছু করণীয় আছে। অথবা অন্য কোনও আকর্ষণ। শুধু আমাদেরই যেন নেই কিছু।

স্বয়ম্ একবার তাকাল মাইকের দিকে।

আরেক বার রণোর দিকে।

এই তো রণোও বেশ আছে। বিলেতে জার্মানদের বোমার ঠেলায় এত বছর বাদে সে দেশে এসে উঠেছে। কিন্তু ওর মনের অবস্থা আর দিন কাটানোর ব্যবস্থা বোধহয় বিলেতি মহা মডার্ন স্বাধীনা তরুণীদের মতো।

একটি বিলেতি তরুণীর বিয়ের খবর হাই সোসাইটির খবরে প্রকাশ পাওয়া মাত্র বাড়ির দালাল চেপে ধরল। কিস্তিবন্দী হারে একটা বাড়ি কিনে বিয়ের উৎসবটা করুন। বড় পত্রিকায় নাম উঠে যাবে।

তরুণী মিঠে হেসে বললেন, আমার বাড়ি? হোমে আমার কী দরকার? নার্সিং হোমে জন্মেছি, কলেজের হোস্টেলে থেকেছি, অটোতে সেঁটে বসে কোর্টেড হয়েছি। প্রেম পেয়েছি। খাই আমি টিনের ক্যান আর কাগজের কার্টন থেকে। সকালটা কাটে গলফ কোর্সে, বিকেলটা ব্রিজ টেবিলে আর সন্ধ্যাটা ক্লাবে সিনেমায়। সংসার আর সমাজের ঝামেলা আমার জন্যে নয়। অতএব কেটে পড়ো, বাছা।

এই বলে তরুণী মিষ্টি হাসিটুকু দালালের দক্ষিণা দিল।

রণোর মুখেও যেন তেমনিই একটা মিষ্টি হাসির হরির লুট চলেছে।

বহু লোক জাপানি বোমার ভয়ে গাঁয়ে জঙ্গলে আঘাটায় আস্তানা নিয়েছে। কিন্তু রণোর দল শহরে ঠিক টিকে আছে। গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিতে হয়নি। জাপানিকেও রুখতে যেতে হবে না। ওর বিলেতে যাওয়া আর থাকার খরচ কোনও হিসাবেই উশুল হবে না।

আবার দেখ মাইককে। অজানা দেশে অচেনা জাতের শত্রুর বিরুদ্ধে সে লড়তে এসেছে। হয়তো জাতির জমিদারি রক্ষা করার নিছক স্বার্থেরই খাতিরে। তবু ওর দিক থেকে সেটাও তো একটা কর্তব্য : বর্মার জঙ্গলে যদি ধরা বা মারা পড়ে নেক্সট অব কিনের কাছে সে খবরটা সময়ে পৌঁছাবে না পর্যন্ত।

স্বয়ম্ নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করল। এইসব চিন্তা আর বিশ্লেষণ করবার প্রচুর সময় সে পাবে। এখন সে নিমন্ত্রিত অতিথি। অন্য দুজন অতিথির মধ্যে বসেছে। আর এমন একজনের নিমন্ত্রিত যে বলেছে জীবনকে খুঁজে নাও। একটুখানি বাঁচো।

এত বিচার বিশ্লেষণ নিয়ে বাঁচা চলে না।

এমন সময় স্বাতীই তার দিকে তাকাল। তার বাঁকা আঁকা ভুরুর তলায় চোখ দুটি তারার মতো দীপ্ত। যেন সুদূর দৃষ্টি দিয়ে বলছে—তুমি একটি শিশু। ওহ্ গড, হোয়াট এ বেবী।

হঠাৎ আলোগুলি কমতে কমতে প্রায় চোখ বুঁজে ফেলল। শুধু ছাদ থেকে একটা প্রকাণ্ড আলোর গোলা কাচের অজস্র ফুটোর ভেতর গিয়ে মিটমিট করতে করতে নেমে এল। প্রেমিক প্রেমিকা বা ক্ষণিক ক্ষণিকাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে। তাদের সহজ সুযোগ দিতে।

আলোতে খচিত বৃত্তটা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল আর মৃদু সন্ধ্যার আলো তৈরি করে তাতে রামধনুর রঙ ছিটোতে লাগল।

যারা শীঘ্রই ফ্রন্টে চলে যাবে না ফ্রন্ট থেকে ক'দিনের ছুটিতে এসেছে তাদের যেন একটু হালকা করে একটু চাঙ্গা করে দিতে পারে। মরবার আগে ওরা যেন একটুখানি বাঁচার সুখ পেয়ে যায়।

স্বয়ম্ বুঝতে পারল যে সামনের অর্কেস্ট্রা একটা ট্যাঙ্গোর মাতাল ঝংকার তুলছে। রক্তে একটা আবেশ জাগছে। এহেন উত্তাপই কি স্বাতী তার সেই হাসিঠাট্টা করে উল্লেখ করা আবেগভরা মুহূর্তে অনুভব করে থাকে?

এই তো এখানে শুধু উত্তাপভরা সংগীত আর উন্মাদনা জাগানো সুরা নয়, মাতাল করা নাচ আর আদিম আকর্ষণের নেশা সমস্ত আবহাওয়াটাকে জড়িয়ে রেখেছে।

এইজনাই তো ঝাঁকে ঝাঁকে মিলিটারি আর পসারিণী ভদ্রতার মুখোশ পরে এখানে রাত বাড়লেই হাজির হয়। ততক্ষণে স্বাতী আর রণোর মতো নিরামিষ স্ফূর্তির সন্ধানীরা উধাও হয়ে যায়। আউট অব বাউন্ডস তখন তাদের জন্য।

সেই আলোর ফুটকিগুলি যার মাথার উপর স্থির হয়ে মুকুটের মতো ঝুলতে লাগল তার দিকে তখন সবারই দৃষ্টি পড়ল। পেঁয়াজ রঙা ব্লন্ড চুলের ফাঁপানো চূড়া। তার নিচে গভীর কালো আর ধনুকের মতো টানা দুটি চোখের ভুরু। চোখ দু'খানা বরফের মতো হালকা নীল। ঠোঁট দু'খানা পরিপূর্ণ, পরিপক্ক আর বাঁধুলি ফুলের মতো রাঙা। চোয়াল উঁচু আর ডালিমভাঙা গালদুটিতে মাদকতাময় ছায়া পড়েছে। নাকটি যেন লুভর মিউজিয়ামে রাখা কোনও মর্মরমূর্তির প্রতিলিপি।

স্বয়ম্ নির্নিমেষে দেখতে লাগল। রূপ, রূপরতন যদি কিছু কবির কল্পনায় থেকে থাকে তা বুঝি এই: যে রূপ লাগি আঁখি ঝুরে তা বুঝি এই।

দেখতে দেখতে স্বয়মের অন্তরিন্দ্রিয় যেন রূপসায়রের গভীরে ডুব দিল। সে খেয়ালও করল না যে কখন সেই বরতনু সব ফ্যাশন আর ছলনা ছেড়ে দিয়ে, বসনের শাসন থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিজেকে প্রায় পুরোপুরি খুলে ধরেছে। মেলে দিয়েছে।

কমনীয়া কামনীয়াতে রূপ নিয়েছে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়ে স্বয়ম্ সুন্দরের পূজারী হয়েছে। এখন নাচঘরের আঙিনায় রঙিন আলোর রেখায় রেখায় দেহের আরতি দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে ইন্দ্রিয় পরিণত হল অতীন্দ্রিয়ে, ভোগ প্রণত হল যোগে তার ব্যাখ্যা সে করতে পারবে না।

নিজের মনকে বোঝাল সেসব জিনিসের তো ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজা উচিতও নয়।

হঠাৎ অর্কেস্ট্রার ঝংকার তাকে সচকিত করে তুলল। সে দেখল যে দেহের লাস্য আর বাজনার মাদকতা অনেক যুগলে পাগল করে তুলছে। ইন্দ্রিয়সচেতন হয়ে তালে তালে দুটি করে দেহ মোহভরে কেমন যেন এক হয়ে যাচ্ছে। যারা নাচছিল না তারাও শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

কামনার কাঁচা রঙে তাদের মন রাঙানো। বাজনা আর নাচের তালে তালে যারা শুধু টেবিলের ধারে ধারে বসে আছে তারাও উত্তাল। কেবল এদের টেবিলে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখার আনন্দে এরা একটু আত্মস্থ হয়ে আছে।

স্বাতীর অধরোষ্ঠে ধরা জাফরানী রঙের স্বচ্ছ সিগারেট হোল্ডারটা যেন আর সব রঙকে ম্লান করে দিচ্ছে।

সে ব্যাগ থেকে খুলে একটি সিগারেট কেস বের করল। তার এক কোনায় ম্যানিকিওর করে রাঙানো নখের একটু হালকা চাপ দিতেই একটা সিগারেট বের হয়ে এল।

যেন মিলিটারি কম্যান্ড শুনে তড়াক করে লাফিয়ে সেলাম করে নিবেদন করছে—অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, ইয়োর একসেলেন্সি।

ওরা চারজনই সাময়িকভাবে চুপচাপ। স্বয়ম্ শুধু নীরব নয়, নিমগ্ন নিজের মনে।

সে ভাবতে লাগল, একি অপরূপ ব্যক্তিত্ব এই তরুণীর। সে হাসলে মুক্তা ঝরে, আর সবাই তা কুড়িয়ে নিয়ে ঐশ্বর্যবান হয়। সে নীরব হলে সবাই আত্মস্থ হয়।

হঠাৎ একটা খুব চেনা গানের সুর শুনে স্বাতী খুশি হয়ে উঠল। স্টর্মি ওয়েদার, ঝড়ো আবহাওয়া। অতীতের সুখস্মৃতি আর বর্তমানের বিষাদ মিশিয়ে গায়িকার প্রিয়ের সঙ্গে উৎসব রজনী কাটানোর গান। গায়িকা এখন রিক্তা, পরিত্যক্তা, একাকিনী, বিরহিণী। আজ হচ্ছে ঝড়ো আবহাওয়াতে আশাহতার রাত।

এই গানের ঢেউ আমেরিকা থেকে এদেশেও এসে পৌঁছেছে। এমনকি দেশী মহলেও—যারা সামান্য একটু আধটু ইংরেজি গান আর নাচের বাজনা পছন্দ করে—তাদের মধ্যে এই হিট মিউজিক প্রচুর সাড়া তুলেছে।

কাজেই স্বয়ম্‌ও এটা শুনে ভাবের গভীরে চলে গেল। তবু সে ভাবতে শুরু করল—সেই বিগত রজনী না। আমি, নতুন আমি, ভাবছি আজি যে রজনী যায় তাকে ধরে রাখি কেমন করে?

স্বাতী যে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে তা মাইকেরও নজরে পড়েছিল। আসলে সে এত নাচগানের মধ্যে এই সময়টুকু চুপ করে থাকার ফলে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিল। স্বাতীর ঠাট্টাটুকু সে হজম করে গেলে কোনও ক্ষতি হত না। ওর নিজের তো নিশ্চয়ই না। নিক্তিতে ওজন করা ভালো পড়ুয়া ছাত্র হলেও না।

ওর মনে পড়ল যেদিন সে সেনাদলে নাম লেখাল সেদিন এল. এস. ই.-র সহপাঠীরা ঠাট্টা করে বলেছিল যে মাইক এখন খুব ভালো স্বামী হবার শিক্ষা পেয়ে যাবে।

সেনাদলে নিজের রান্না, বিছানা, সেলাই সব কিছু নিজের হাতে করতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, হুকুম নেওয়া আর বিনা বাক্যব্যয়ে তামিল করা অভ্যাস করতে হয়।

বলা বাহুল্য সহপাঠিনীরা সবাই চোখে ঝিলিক আর মুখে হাসি হেনে এই ভবিষ্যদ্বাণী সমর্থন করেছিল।

রণোর ক্ষতির তো কথাই ওঠে না। বরং ও এই আবেগময় মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে তার আরেকটা মহড়া দেওয়া যায় কিনা তার সুযোগ খুঁজত।

আর সামনের ওই ভালোমানুষ মার্কাটি হয়তো একটু শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ওরই বা এমন কি লোকসান হত? রণো ভাবল সুইটি নিশ্চয়ই ওর সুইটহার্ট নয়। অসম্ভব। সুইটির বয়ফ্রেন্ড হবার মতো তাকে নিয়মিত নাচঘরে পার্টিতে ক্লাবে সঙ্গী হয়ে নিয়ে যাবার মতো ওর না আছে মুরোদ, না মদত।

মনের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তফাত জোগাড় করবার জন্য সে মাইককে বলল, জানো মাইক, তুমি যদি একবার জার্মানির ডুসেলডর্ফ শহরটা জয় করে আসতে।

মাইক হেসে বলল, ও. কে. বস্। কিন্তু অর্ডার অব দি ডে-তে কারণটা জানাতে হবে। অবশ্য কনফিডেন্সিয়ালি।

রণো বলল, ওখানে টাউন হলের খানা কামরার মাথায় লেখা আছে :—

পুরপিতা, মহানন্দে শুরু কর সুরা।
প্রদীপ জ্বলে না ভালো বিনা তৈলধারা।

এই মহান্ শিক্ষাটা গ্রহণ করে আমরাও প্রদীপ জ্বালাতে চাই।

বলেই সে যেন প্রদীপ জ্বালাতেই উঠে পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকে সে স্বাতীর সঙ্গে এই নাচটা নাচবার অনুমতি চাইল।

সে বলল, তুমি তো জানো, হিটলার এই নাচটা জার্মানিতে মানা করে দিয়েছে। স্টর্মি ওয়েদারের বাজনা নাকি লোককে নেতিয়ে দেয়, যুদ্ধ-বিমুখ করে তোলে। কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব যে জার্মানদের চেয়ে বেশি খাঁটি আর্য। আমরা নিগ্রোর গাওয়া গানটার সঙ্গে নেচেও চাঙ্গা থাকতে পারি।

একেবারে নাৎসি ধাঁচের হঠাৎ হামলা। ব্লিৎসক্রীগ যাকে বলে।

স্বাতী রাজী না অরাজি তা জানবার আগেই সে উঠে গিয়ে হেসে তার দিকে হাত বাড়াল। এমনভাবে যে তাকে না করা যায় বারণ, না নিবারণ।

স্বাতী তাই উঠে পড়ল। তার পর—দুজনে নৃত্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ঝড়ো আবহাওয়া সুরের হাওয়ায় মিশে সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ দেখতে লাগল। অপরূপার আরতি করবার মতো নৈবেদ্য যদি তার নিজের থাকত। যদি. . যদি...

দেখতে দেখতে অনুমান করতে লাগল ওরা নাচতে নাচতে কী কথা না জানি বলছে। পুরানো সহপাঠী সহপাঠিনী। ওই সুদূর বিলেত দেশের স্বাধীন সমাজ। সেখানে যুগলে যখন দক্ষিণ দেশের সাম্বা নৃত্য নাচে হৃদয় তখন সামলাতে পারে না।

সেখানে কলেজে বই পড়া থেকে প্রেমে পড়া দুই-ই সমান সহজে সম্ভব।

দূর থেকে একবার স্বয়মের মনে হল যে স্বাতী ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

কেন হাসছে? এটা কি হাসি, না উপহাস? তৃপ্তির হাসি, না তাচ্ছিল্যের? কেমন যেন বিচিত্র একটা মুখভঙ্গিমা।

মোনালিসার ছবির প্রতিলিপির সামনে স্বয়ম্ অনেক সময় কাটিয়েছে অনেকদিন। সেই হাসির পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। পারেনি বলেই বেশি মোহিনী মনে হয়েছে সে হাসিকে। যত সুদূর তত মধুর। যত অধরা তত অসীমা। তত অফুরান।

আজ এই হাসিটুকুর অর্থও তার বোঝবার ক্ষমতাকে এড়িয়ে গেল। কেমন বিচিত্র, বর্ণনার অতীত একটা হাসি। যার একদিকে আছে অনুকম্পা, অন্যদিকে আহ্বান।

মোনালিসার হাসি।

।। এগারো ।।

—স্বাতী বলছি...

সুইটি নয়।

কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি মধুর শোনাচ্ছে। স্বয়মের সমস্ত অন্তরাত্মা মধুরে মধুর হয়ে উঠল। মোনালিসা যেন মনোলীনা হয়ে গেল।

—বলছি, ইংলিশ চ্যানেলটা একবার পার হয়ে আসতে পারবে? আমাদের বাড়িতে?

স্বয়মের ইংলিশ চ্যানেল সম্বন্ধে সেই প্রথম সন্ধ্যার কথাটা মনে হল। বেচারির পুরানো বন্ধুবান্ধবরা কেউ সেই সাগরবারির বাধা পার হয়ে স্বাতীর সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব জমাতে পারছে না।

কিন্তু বেচারি কে? স্বাতী? না, ওর বন্ধুরা? সেটাই ওর কাছে এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রাণের উচ্ছ্বাসে আনন্দে উল্লাসে যে এত ভরপুর তাকে নিজেদের মনের দুয়ার খুলে ওরা একবার আবাহন করে দেখতেও তো পারত।

ঠকছে সম্ভবত ওরাই। এবং নিজেদেরই সংকোচ সংশয়ের জন্য।

সে নিজেও তো ঠকে যাচ্ছিল। কেবল দুঃসাহসে ভর করে সীমানার ওপারে নো ম্যান্‌স ল্যান্ডে গিয়ে যে প্রাণশক্তিকে আবিষ্কার করে এল তার তুলনা নিজের চেনা সাধারণ মহলে সে পাচ্ছে কোথায়? স্বাতী যেন প্রতিমার মতো ঝলমল করে।

কিন্তু শুধু ডাকের সাজের ঐশ্বর্য দেখেই শক্তিস্বরূপিণীর অন্তরের শক্তিকে কি অবহেলা করা উচিত? দূরে ঠেলে রাখা উচিত?

স্বয়মের হঠাৎ মনে হল যে নিজের মন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

আবার মনে হল ম্যাথু আর্নল্ডের একটা কবিতা। আমরা প্রত্যেকেই লবণাক্ত সমুদ্রে ঘেরা এক একটি দ্বীপ। ওই বেচারি সেই নিঃসঙ্গতা, একাকিত্বের বোঝা বহন করে চলেছে। সম্রাজ্ঞীর মতো মহীয়সী হিয়া নিয়ে যেন এ এল্‌বা দ্বীপ থেকে নেপোলিয়নের মতো নিজের দেশ ফ্রান্সের দিকে ব্যাকুলভাবে দৃষ্টিপাত করছে।

কিন্তু ভারতের ফরাসি অর্থাৎ বাঙালির মন নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে থাকে।

দূর ছাই। সুইটির বিদেশী আবরণ ছেড়ে স্বদেশিনী স্বাতী টেলিফোন করছে। তার গলার স্বর শুনেই কি সব এলোমেলো ভাবছি। ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে বকুল বিছানো পথে আবাহনের স্বপ্ন দেখছি।

—বলি, ওহে সোহং স্বামী, এত চিন্তায় পড়েছ কেন? এদিকে যে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এসে সত্যি সত্যি এক ইংলিশ ইয়ুথ তোমার মধ্যে সোহং স্বামীর সন্ধান করছে।

এতক্ষণে স্বয়ম হেসে ফেলল। এবং অকস্মাৎ দুর্দান্ত একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, ওঃ, মাইক বুঝি? তা ও নিজেই তো তোমার কাছে সোহং স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইন্ডিয়া সম্বন্ধে এতই যখন জেনেছে সোহং আর স্বামী কথা দুটোর মানেও নিশ্চয় জানে।

স্বাতী বেশ চটে গেল। বলল, ইউ আর ইমপসিবল। শুধু বই মুখস্থই করেছ। না হলে জানতে পারতে যে ওদেশে অত সহজে কেউ প্রেমীর ভোল ছেড়ে স্বামী হয় না। যাই হোক, মাইক তোমার খোঁজ করছে আমার এখানে এসে। আমি খবরটা দিয়ে দিলাম। যদি সাঁতার কাটার সাহস না থাকে ওকে তোমার ওখানে উড়ে যেতে বলব। আর-এ-এফ অফিসার স্বচ্ছন্দে গেট ক্র্যাশ করে ক্র্যাশ ল্যান্ড করবে তোমাদের বাড়িতে। চাই কি, কো-পাইলট হিসাবে আমিও সহযাত্রী হতে পারি।

স্বয়ম্ এবার রীতিমতো ঘাবড়ে গেল। যুদ্ধের বাজারে এই কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে ডাকোটাগুলো বোমা নিয়ে গুম-গুম করে প্রায়ই আজকাল আনাগোনা করে।

বাড়ির সবাই বলে ডাকোটা না ডাকাত। সেই ডাকাত চালায় যারা, তাদের মধ্যে একজন লালমুখ আর নীল ইউনিফর্ম পরে হঠাৎ হাজির হবে। সঙ্গে থাকবে টর্পেডো একখানা।

বিনা নোটিসে তাদের কোথায় বসাবে, কী করে যত্ন করবে? একেবারে তোলপাড় পড়ে যাবে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অর্থাৎ আড়ালে আবডালে।

আর ওরা চলে যাবার পব যে চোরা চাহনি আর গুনগুনানির ছোরা শুরু হবে তার ধাক্কা সামলাবে কে? স্বয়মের সাধ্যে কুলাবে না।

মামার আমন্ত্রিত হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। কিন্তু স্বয়ম্ নিজেই জানে যে ঠিক আসল বাধা সেখানে নয়। সেটা অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

মনের আঙিনায় যেখানে রঙের আনাগোনা সবে শুরু হয়েছে, সেখানে কড়া আলোর চড়া প্রকাশ সহ্য হবে না। শিশুর চোখ কি কড়া রোদের আলো সইতে পারে?

সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না। সে কি হয়? মাইক তোমার বন্ধু। তোমার বাড়িতে এসেছে। আমায় 'মিট' করতে চায়, সে তো আমার সৌভাগ্য। ওকে বল যে, মহম্মদ যখন পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে এবং তুমিও সেই স্বর্ণলঙ্কা একেবারে পারাপার করে এসেছ, আমি সামান্য গন্ধমাদন পর্বত, আমিও পাশের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পাবব।

একটু ইতস্তত করে যোগ করে দিল, কিন্তু আমার বেলা শুধু কফি কিন্তু!

অর্থাৎ ওকে যদি কোনও ড্রিঙ্ক করতে অনুরোধ করা হয়, সে কথাটুকুও যেন চাকর-বাকরদের মুখ দিয়ে এ বাড়িতে এসে না পৌঁছয়।

সিংহের কেশর দোলানোর মতো স্বাতীর কেশের ঝালর দোলে। তার পটভূমিতে মুখে জাফরানী রঙের স্বচ্ছ লম্বা সিগারেট-হোল্ডারে বসানো সিগারেটের আলোর আগুনভরা উজ্জ্বলতাটুকু পর্যন্ত ওর মনকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। সে কথাটুকু যেন আভাসেও কারও কাছে ধরা না পড়ে।

এ কি গহন দহন জ্বালা।

পাশের বাড়িতে পোর্টিকোর তলাতেই সে মাইক আর স্বাতীকে দেখতে পেল। প্রকাণ্ড লম্বা একটি আমেরিকান লিমুজিন মোটর। মিলিটারি নম্বর নেমপ্লেটে আঁকা। কিন্তু চকচক্ করছে একেবারে শো-কেসে সাজিয়ে দেখানো কারের মতো। মাইক সপ্রেমে সেটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। তরুণের মুখে তৃপ্তির অরুণিমা।

স্বয়মের দিকে সে মুগ্ধ চোখে তাকাল। ধোপদুরস্ত সাদা পাঞ্জাবি আর ধুতিতে বলিষ্ঠ এক বাঙালি মূর্তি। তার সাধারণ ইংরেজি ঢলের সুট পরা চেহারা স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর চেকনাই আর্মি নেভির সুট বা মিলিটারি ইউনিফর্মের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বয়ম-সম্পূর্ণ বাঙালি।

দুয়েকটা কথার পর মাইকই বলল, তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে মোটরটাকে একটু আদর করে নিচ্ছিলাম। জানো তো দেশে সব চালু প্রাইভেট গাড়িই পেট্রল র‍্যাশনের জন্য ছোট আর সবেরই রঙ ক্যামোফ্লাজ করা। এখানে এয়ার হেড কোয়ার্টার-এর দৌলতে আজ এই লম্বা হাডসনটা পেয়ে গেলাম—মায় তার ফ্যাক্টরির প্রথম করা পেন্ট সুদ্ধ। তাই একটু হাত বুলিয়ে আদর করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমিও আমেরিকান হয়ে গেছি।

বলেই মাইক সরলভাবে হাসল।

—তা আমেরিকান কেন? মোটরটা আমেরিকান বলে? না, আমেরিকা বৃহতের সাধনার প্রতীক বলে?

—বলতে পার শেষেরটা। তাছাড়া আরেকটা কথা আছে। বছরের পর বছর ধরে আমেরিকানরা তাদের বিরাট বিরাট ঝকমকে মোটরের সঙ্গে যেমন ভাবে রোম্যান্স চালিয়ে এসেছে, তেমন ভাবের লভ এফেয়ার আর কোথাও দেখা যায় না। একেবারে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ চড়া গ্রামের প্যাশন বলা যায়।

স্বাতী বলল, ওদের পারিবারিক মোটরটা স্ট্যাটাস, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা আর স্বাধীনতার প্রতীক বলেই ওরা মনে করে।

—অবশ্য, অবশ্য। আর দেখ না আরও স্বাধীনতা, ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা এনে দিল এই স্টাফ কারটা। স্বাতী, তুমি বোধহয় আমার জন্য মনে মনে লাকি চার্ম কিছু ঠিক করে রেখেছ।

বলেই সে আবার সরল মনে হাসল। স্বাতী আর স্বয়ম্ দুজনেই হেসে সায় দিল।

স্বাতী ওদের বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ওর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সহজ আন্তরিকতা ফুটেছিল।

একটা ছোট্ট ল্যান্ডিং অর্থাৎ খোলা চত্বর পার হয়ে স্বাতী ঘরের দরজাটি খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে স্বয়ম্ সত্যিই ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে একটা বসন্ত বাতাসে ভরা সুরভিত দ্বীপে এসে গেল।

সামনেই একটা চুনার পাথরের কাজ করা ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ শুভ্রহাসি আর মিষ্টি গন্ধ দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করল।

স্বাতী খুব খুশি ভাব দেখাল, জানো স্বয়ম্, এই চমৎকার ফুলের গোছা উপহার এনেছে মাইক।

স্বয়ম্ মুখে বলল না, কিন্তু মনে মনে স্বয়ম্ ভাবল যে, কোনও বাঙালি বন্ধু দেখা করতে আসবার সময় তো ফুলের গুচ্ছ নিয়ে আসবে না। যদি বা আসে হয় তার মনে কোনও বিশেষ ভাব থাকবে, না হয় আর সবাই সেই ভাবটা আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।

মাইক মৃদু কিন্তু মিষ্টভাবে বলল, কি সুন্দর সুরভি এই ফুলগুলির। আহা, বিলেতে যদি এমন ফুল ফুটত। লাইলাক আর টিউলিপ ছেড়ে এই ফুলই তাহলে ফোটাতাম।

ততক্ষণে স্বয়ম্ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরটা দেখে নিচ্ছিল।

বসবার সোফা সেটের ঢাকনাগুলির নকশা হালকা কিছু আধুনিক। তাদের রঙ চড়া নয় অথচ চোখে পড়বার মতো। সোফা সেটটি পুরানো অভিজাত যুগের ধারায় তৈরি। ইংরেজিতে যাকে বলে পিরিয়ড ফার্নিচার। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর তৈলচিত্রের প্রতিলিপি টাঙানো। এবং প্রত্যেকটিই যাতে ভালভাবে বিশেষ কোণ থেকে দেখা যায় সেরকমভাবে বসবার জায়গাও সাজানো।

অর্থাৎ সেগুলি শুধু দেখাবার জন্য নয়, দেখবার জন্য।

অন্যান্য সাজসরঞ্জামও শুধু নজরে পড়ার জন্য রাখা হয়নি। নজর সেগুলিতে আপনিই পড়বে। কারণ তার প্রত্যেকটিরই পিছনে আছে রুচি আর মমতা, যত্ন আর আদর।

ধনী বাঙালি বাড়ির বড় হলঘরে চীনে মিস্ত্রির হাতের মিহি কাজের খাঁজে খাঁজে জমানো ধুলো আর তার ইটালিয়ান বা জয়পুরী শ্বেতপাথরের টেবলটপের মলিনতা এ বাড়িতে যে পাওয়া যাবে না তা স্বয়ম্ এক নজরেই বুঝে নিল।

ধন এখানে জোর গলায় নিজেকে জাহির করছে না। মন মিঠে সুরে জমিয়েছে ঘরোয়া পরিবেশে।

টুক টুক করে দরজায় হালকা আওয়াজ হল। অন্তরঙ্গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে যেন বাধা না পড়ে। তাই বিনা জানানিতে, বিনা অনুমতিতে হুট করে উপদ্রব হাজির হবে না এই ধরনের শৃঙ্খলায় সাজানো জীবনে।

স্বয়মের পৃথিবীতে এটা একটা অপ্রত্যাশিত স্বস্তি। যেন এটা অপ্রয়োজনীয় বলেই সবাই মনে করে। বোঝা গেল যে, মাইক এই রকম শৃঙ্খলাতেই অভ্যস্ত। স্বয়ম্ নিজেকে শুধরে নিল। সত্যিই তো, এইটুকু ছন্দের মতো শৃঙ্খলা এটা তো বর্তমান সভ্যতারই রীতি।

এই প্রথম সে আশ্চর্য বোধ করল যে, তার পারিপার্শ্বিকে আর চেনা সমাজে এটাকে সবাই ঢঙ বা কৃত্রিমতা বলে নাক উলটে থাকে। এইটুকু নিজস্ব নিরালা ভাবের মূল্যও কেউ দিতে চায় না।

পরিষ্কার কাপড় পরা পরিচ্ছন্ন এক বেয়ারা একটা নিচু দোতলা ট্রলি ঠেলে ঘরে নিয়ে এল। টি-সেটটা মৃদু একরঙা। স্বয়ম্ মনে মনে বুঝে নিল যে, এই ধরনের রঙকেই পাস্টেল শেড বলা হয়। কোনও জবরজঙ লতাপাতার নকশা কাটা নয়। ডিমের খোলসের ভিতরকার স্নিগ্ধ বরফ-নীল রঙের পোর্সিলেন ওকে মুগ্ধ করে ফেলল।

হালকা কটকী ফিলিগ্রি জড়োয়া কাজের রূপার পাত্রে কেক, আরেকটা ওইরকম পাত্রে প্রায় কাগজের মতো পাতলা করে কাটা রুটির টুকরো আর শসা দিয়ে বানানো স্যান্ডুইচ। আরও একটা পাত্রে বাংলা মিষ্টি।

একপাশে তিনটে শ্বেতপাথরের গ্লাস।

মাইক ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল, কি সর্বনাশ! এ যে একেবারে বাদশাহী বিলাস হয়ে গেল। হায়! হায়! প্লেনে বসে দুশমনের হদিসে চোখ দুটো ফিল্ড-গ্লাসে আঠা দিয়ে এঁটে রেখে গ্রীজ-প্রুফ কাগজের মোড়ক থেকে খুলে শুকনো সামগ্রী খাবার অভ্যেস আমার। তোমার এই 'বোন-চায়না' সেট তো আমার হাতে এখনই খান খান হয়ে যাবে।

তারপর স্বয়মের দিকে চোখ টিপে বলল, ঠিক প্রথম প্রণয়ের পরশে কুমারী হৃদয়ের মতো।

স্বয়ম ছাড়বার পাত্র নয়। এই একটু আগেই শুনে এসেছে যে মাইক তার নতুন নামকরণ করেছে— সোহং স্বামী।

সে মুচকি হেসে বলল, তোমাদের দেশে প্রথম প্রণয়ের পরশটা কি কোনও মেয়ে অ্যাট অল পাবার মোকা পায়? বাচ্চা বয়সের ডেটিং জিনিসটার কল্যাণে প্রথম প্রণয়ই বোধ হয় গাছপাকা আপেলের মতো স্বাদে ভরা থাকে।

রাগের ভান করে মাইক বলল, ইউ বিব্লিক্যাল প্যাট্রিয়ার্ক, ওহে বাইবেল যুগের দাঠাকুর, পাকা আপেলের স্বাদের মধ্যে তুমি ইভকেও হারিয়ে ফেললে। আর তোমাদের সমাজে তো শুনছি আপেল যেমন দুর্লভ তেমনি দুর্মূল্য। ম্যারেজ ইজ টু হাই এ প্রাইস ফর দি অ্যাপল।

সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফলের দাম দিতে হয় বিয়ে করে? সে যে বড্ড মাগগি দাম হয়ে গেল।

এবার সে স্বাতীর দিকে তাকাল। অর্থাৎ তিন অবিবাহিতের মধ্যে স্বাতীই একমাত্র মেয়ে। এই দেশে, এই সমাজে, এই বাড়িতে যদি এরকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করা ঠিক না হয়, সে মোড় ঘুরিয়ে নিক।

সে নিজে বিদেশী সমাজের লোক, তায় মিলিটারি। তাদের মধ্যেকার রসালাপ আর ভাষা হয়তো এদেশে অচল।

স্বাতী সেই চাহনীর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। মৃদু হেসে চায়ের সরঞ্জামের গড়ানে ট্রলিটা নিজের দিকে টেনে আনল। ট্রলির চার পায়ার চাকতিগুলি নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল ওর দিকে।

সে শ্বেতপাথরের গ্লাস তিনটে দেখিয়ে মাইককে জিজ্ঞেস করল, যদি বলতে পার এর লেসের ঢাকনার তলায় কী আছে তাহলে একটা বিশেষ পুরস্কার পাবে।

তারপর স্বয়মের দিকে তাকিয়ে হাসল, তোমাকেও সেই একই অফার দিচ্ছি।

দুজনেই ভাবতে লাগল। হঠাৎ দুজনেই ঘোষণা করল—দুধ।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই প্রতিবাদ করল, না, আমরা দুধ চাই না, আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু নই।

স্বাতী বলল, যাই হোক, সরবৎ নয় দুধও নয়। প্রকৃতির দুধ। খেয়ে দেখ, মাইক! যদি কখনও তোমার এয়ার সর্টিতে বিমান হামলায় আঘাটায় নামতে হয় এই ডাবের জল চিনে রাখ। তখন মনে হবে এর চেয়ে মিঠে পানীয়, প্রাণ দেবার মতো পানীয় হুইস্কি থেকে ভদকা পর্যন্ত কোনও কিছুতেই নেই। আর স্বয়ং, তুমি চেয়েছিলে কফি। বদলে দিচ্ছি কোকোনাট মিল্ক।

মনে মনে দুজনেই কৃতজ্ঞ বোধ করল।

অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সন্ধ্যাটা ভরে উঠল। স্বাতী তারপর চা পানের মধ্যে মাইককে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো, কলকাতায় কী কী দেখলে?

মাইক একটু ভালো করে নড়েচড়ে বসল। মুহূর্তে ঠিক করে নিল যে কলকাতার ভাঙাচোরা নোংরা যা দেখেছে, যে জীবন ভাঙছে, যে সমাজ পালটাচ্ছে, যে শহর নোংরা সে সম্বন্ধে কিছু বলবে না। সে রয়াল এয়ারফোর্স ফাইটার কম্যান্ডে বেহালার যে বিরাট মার্বেলে মোড়া বাড়িটাতে প্রায় রোজই যায়, তার পথে বলতে গেলে গোটা দুঃখী শহরটারই পরিচয় পেয়েছে। যা দেখেছে তার চেয়ে বেশি, অনেক বেশি অদেখা দুঃখও বুঝেছে।

যা বুঝেছে, বেদনা বেজেছে তার চেয়ে আরও, আরও অনেক বেশি।

বেদনার সবচেয়ে বড় কারণ যে, এই শহরে যত জ্বালা যত জঞ্জাল তার প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তারই নিজের দেশের কর্তাদের অনাদরে, অবহেলায়।

কিন্তু সে কথা এখন আলোচনার মানে হয় না। যুদ্ধটা যদি না জিততে পারে ওরা, তাহলে সবই যাবে ডুবে। যদি জিততে পারে, তবুও শেষ পর্যন্ত নিজেরাই যাবে ভেসে।

কিন্তু এদেশী কর্তারা যে ফুটো নৌকোটা ভাসিয়ে তুলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পালে হাওয়া লাগাতে পারবে তেমন ভরসাও সে এই সামান্য সময়ে পায়নি।

কাজেই সে কথা থাক। বাঙালিরা যে রাস্তাটা নিয়ে বড় গর্ব করে জোর গলায় বিদেশীদের শোনায়, তার কথা বলবে। বাঙালি মনীষীর প্রাণকেন্দ্র কলেজ স্ট্রীট।

সে বলল, কলেজ স্ট্রীটে গেলাম। দূরে এই লম্বা মোটর আর সিকিউরিটি গার্ড বা গাইড আড়ালে রইল। দেখলাম একটা আলাদা কলকাতা। দি গ্রেট প্রেসিডেন্সি কলেজ—

স্বয়ম্ বাধা দিয়ে নিজের আনন্দ জানাল, আমার কলেজ, মাইক।

—তোমায় অভিনন্দন জানাই। শুধু সেরা কলেজ নয়, সেরা পরিবেশ তুমি পেয়েছ! কলেজের দেওয়ালের কাজ করা লোহার রেলিং-এ সাজানো সারি-সারি মর্নিং গ্লোরির বীথি নয়, পুরোনো পুঁথি। আগ্রহী আঙুলের স্পর্শে প্রায় ছেঁড়া, কিন্তু ধন্য তাদের পাতা। পাশে পাশে জ্ঞানতপস্বীদের হাতে লেখা টিপ্পনী। আশ্চর্য! লোহার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে ঠায় অপেক্ষা করছিল আমারই জন্য হোমারের ওডিসির এক ঐতিহাসিক সংস্করণের কপি। আমার মনের অফুরান অভিযানের সমুদ্রে ঢেউ তুলে দিল।

হাততালি দিয়ে উঠল স্বাতী। কী আশ্চর্য। কী চমৎকার তোমার আবিষ্কার।

মাইক একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল। তার মুখটা বেশ করুণ হয়ে উঠেছে। সে বলল, জানো, পাতা ওলটাতে ওলটাতে অনুভব করলাম যে এদেশের মনীষীদের কী সাংঘাতিক অসহায় অবস্থা এসে পড়েছে। তার জন্যই এই সমস্ত অমূল্য বই রাস্তার রেলিং-এ হাজির হয়েছে। কত জ্ঞান, কত স্বপ্ন, কত সাধনা ওদের ঘিরে ছিল। আর এখন...

মাইক আর কিছু বলতে পারল না। শুধু মাথা নেড়ে বলল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম—অসহ অসহায়তা মনের মধ্যে বহন করে।

একটু পরে মাইকই আবার শুরু করল, মুখ ফিরিয়ে কলেজের দেবদারু গাছগুলির দিকে তাকিয়েছিলাম। ট্রামের ঘড়-ঘড় আওয়াজ আর ফেরিওলার ঘণ্টার টুং-টুং ছাপিয়ে স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল দেবদারুর পাতার হিল্লোল। আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হয়ে গেল। হিমালয়ের শান্তি। তুমি কি কখনও তা নিজের মনে অনুভব করো, স্বয়ম্? সংস্কৃত কাব্যে শুনেছি এই গাছকে ট্রি অব গডস বা দেবতাদের গাছ বলে।

—আমার কথা থাক মাইক। তোমার কথাই আমরা শুনতে চাই।

।। বারো ।।

মাইক বলতে লাগল, ট্রি অব গডস দেখতে দেখতে ভাবলাম রিভার অব গডস গঙ্গাকে একবার নিজের মনের মধ্যে অনুভব করে দেখবার চেষ্টা করতে হবে। ওই তো ইন্ডিয়ার প্রাণগঙ্গা।

ওরা দুজন আশ্চর্য হয়ে শুনতে লাগল।

গভীর সুরে মাইক বলে চলল, আমরা এখনও পাইনি এমন একটা জিনিস এদেশে আছে— একটা রহস্যময় আর উপলব্ধিভরা জীবনের সীমানার আভাস। এক হিসাবে একটা করুণ ট্র্যাজেডির রেশ, যা তোমাদের ঘিরে রেখেছে।

একটু থেমে সে আবার বলল, আর আমাদের মধ্যে আছে একটা জিনিস যা তোমাদেরও প্রয়োজন— জীবনের অসীম সম্ভাবনার আশ্বাস। এক হিসেবে একটা উল্লাসের উন্মাদনা। এ-দুটোকে মিলিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণতার রূপ দেবার মতো শক্তিধর আছে কে?

অভিভূত হয়ে, যেন কোনও অপার অন্ধকারের ওপার থেকে স্বাতী মৃদুস্বরে বলল, এবারে তোমার গঙ্গার অনুভবের কথা বল মাইক।

—হ্যাঁ বলছি। পোর্টের জাহাজগুলির আরও উত্তরে হেঁটে কয়েকদিন গভীর রাতে ঘোরাঘুরি করলাম। উৎসুক লোকের কোনও অভাব হল না। সবাই সাহায্য করতে চায়।

মুশকিল হল যে কোন্ লোকটা বদ মতলবে ফিটন গাড়িতে তুলতে চায় আর কোন্ লোকটা সত্যি

কোনও সাধুর সন্ধানে নিয়ে যাবে তা ধরব কী করে।

শেষে অফিসের একজন বেসামরিক কেরানী খবর আনল যে সোহং স্বামী বলে একজন শিক্ষিত সিদ্ধ মহাপুরুষ হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন আর জগন্নাথ ঘাটের কাছে এক ধর্মশালায় সাময়িক আশ্রম খুলেছেন। তিনি অনেক বিভূতি পেয়েছেন আর যৌগিক পন্থাতে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারেন।

আমি তাঁর কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু শুধু নাকি রাতদুপুরেই তিনি যোগনিদ্রা ভেঙে দর্শন দেন। তাই-ই সই।

শুধু শর্ত করা হল যে, আমি একা আসব এবং আমার পরিচয় তিনি আর কাউকে দেবেন না। এমনিতেই আমি সামরিক নিরাপত্তার অনেক সাধারণ নিয়ম ভাঙছি। তবু তারও একটা সীমা আছে।

কোথায় রাতদুপুর। একটা অন্ধকার-প্রায় কুঠুরিতে খাটিয়ার পাশে টুলে বসে আছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্বামীজীর যোগনিদ্রা আর ভাঙে না। আমিও ভাঙব না বলেই এসেছি।

হঠাৎ শেষ রাতে তিনি যোগের মধ্যেই কেঁদে উঠলেন—মা মা, তুই এতদিনে আমার পুজো গ্রহণ করলি। তুই তোর বাছাই-করা সেবককে আমার কাঠ পাঠালি। ধ্বংসময়সীমা, তুই সব সংসার-দুঃখ ধ্বংস করবি বলে এক যোদ্ধাকে তোর শিষ্য বেছে নিলি। এই হচ্ছে এই মহাযুদ্ধের মহান দান। একমাত্র বিভূতি।

এমন আরও কত কথা কান্নাভরা ভাঙা সুরে নিদ্রার মধ্যেই স্বামী বলে চললেন।

ধ্যানে যোগাসনে বসে তিনি দেখেছেন যে আমার অবস্থার সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে। আমিই মাদার্স চোজেন, মায়ের বাছাই করা সে মহান ভক্ত যার মধ্যে দিয়ে মাদার্স মেসেজ, মায়ের বাণী, সোহং স্বামীর মুখ থেকে বেরিয়ে অবিশ্বাসী পশ্চিমকে স্যালভেশন অর্থাৎ বিমুক্তি এনে দেবে। এই মহাযুদ্ধ সেই যোগাযোগ সৃষ্টির জন্যই তৈরি হয়েছে।

স্বামীজী অবশ্য জানতেনই যে আমি তাঁর পায়ের কাছে ভক্তিভরে টুলে বসে অপেক্ষা করছি।

টুলে বসে, কিন্তু ঢুলু ঢুলু আঁখি নয়। কারণ রাতের হাওয়াই হামলার কল্যাণে আঁধারেই আমার অভিসার শুরু হয়। আর রাতেই আমার সব ইন্দ্রিয় মায় অন্তদৃষ্টি বেশি সজাগ থাকে।

স্বামীজীর মতো আমারও রাতের সাধনা। আঁধারের মধ্যে সন্ধান।

শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে স্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হল। পুরোপুরি নয়। অর্ধেক ভাঙা আধেক ভরা নিদ্রার মধ্যে তিনি ঠিক আমার ডান হাতখানা তাক করে জড়িয়ে ধরলেন।

আবার যেন ঘুমঘোরেই ডুকরে কেঁদে ফেললেন, বাছা তুই এসেছিস এতদিন পরে। একশো বছরের ওপর তোর জন্য অপেক্ষা করে হিমালয়ে কায়কল্প সমাধিতে মগ্ন ছিলাম। প্রথম যখন এক ইংরেজ মিলিটারি অফিসার সিমলা শৈলনিবাস আবিষ্কার করে সে তো আমারই আশীর্বাদ নিয়ে সেখানে বসতি বানিয়েছিল।

তখনই আমি বুঝেছিলাম আর জ্ঞাননেত্রে দেখেছিলাম যে তার দেশের এবং সামরিক বৃত্তির একজন ভক্ত আমায় খুঁজে বের করবে। আমার সাধনাকে পূর্ণ রূপ দিতে তার নিজের দেশে নিয়ে যাবে। মায়ের বাণী নিজের দেশে প্রচার করার যন্ত্র হবে। ধন্য হবে সে বিশ্বের সেবায়।

এই পর্যন্ত বলে হেসে মাইক আবার বলল, তোমরা তো জানো সবচেয়ে বেশি মদ খাবাব অভ্যাসের জন্য সুনাম এয়ার ফোর্সের আছে—স্বামীজীও বোধ হয় হিসাব করে দেখেছিলেন যে একজন শিক্ষিত তরুণ এয়ার ফোর্সের লোক মাঝরাতে যখন জগন্নাথ ঘাটের ধর্মশালায় তাঁর এবং ভারত-আত্মার সন্ধানে এসেছে সে বেহেড মত্ত অবস্থাতেই এসেছে।

তিনি নিশ্চয়ই আরও হিসাব কষে দেখেছিলেন যে ভগবৎ প্রেমের নেশার চেয়ে ভদকা বা রামের নেশা বেশি রঙিন। বেশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসে।

এবং আর.এ.এফ.-এর লোক যখন, তায় সদ্য বিলেত থেকে আসা—সে রাতের কালো আঁধারে ঢুলু ঢুলু চোখে কবুল করা কথার খেলাপ দিনের সাদা আলোয় সাদা চোখে কখনও করবে না।

দুঃখের বিষয় তার তিনটে হিসাবেই ছিল ভুল। শুধু যে মিস-ফায়ার করল তাই নয়, বড্ড অ্যাডভান্স ফায়ার করে বসল।

অবশ্য আমারও বুদ্ধিতে ছিল গরমিল। আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু রাতের পর রাত আমি জার্মান বেলুন ব্যারাজ আর অ্যাক অ্যাক কামানের গোলার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে অভ্যস্ত হয়েছি। আর তার চেয়ে অনেক মোক্ষম মরাবাঁচার খেলায় হিমালয়ের হাম্প অর্থাৎ কুঁজের উপর মেঘ আর

ঝড়ঝাপটার লীলাখেলার সঙ্গে মোকাবিলা করেছি। তাই একবার না হয় একজন ওস্তাদ গেরুয়াধারীর সঙ্গে একটু মাতামাতি করে নিই। লোকসান তো কোনও পক্ষেরই হয়নি।

স্বয়মের একটু হল লজ্জা।

আর স্বাতীর লাগল মজা।

মাইক দুজনেরই এই দুরকম মানসিক প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারল।

প্রথমে সে স্বাতীর দিকে উদ্দেশ করে বলল, দেখ সোয়াতি, আমার কীরকম নিরাশা হল। যাকে বলে একেবারে ফ্রাস্টেশন। পুরোপুরি আশাভঙ্গ। কোনও ব্লন্ড আমায় এভাবে ঠকালে হৃদয়টাকে আবার জোড়া লাগাবার মোকা মিলতে পারত। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী আমার দোষে ঠকে গেল। প্রেমের ভাষায় বলতে পার 'জিল্‌টেড' হয়ে গেল। আমিই যে তাকে ঠকিয়েছি, তার আশাভঙ্গ করেছি এজন্য আমিই দোষী বোধ করছি মনে মনে। এবং তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এই মিষ্টি রসগোল্লাটা। স্বামীজী নিশ্চয়ই পুজোর নৈবেদ্য হিসাবে রসগোল্লা সমর্থন করেন।

সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে দুটো আঙুল দিয়ে—চামচ দিয়ে নয়, ভারতীয় ভাবে রসগোল্লা মুখে পুরে দিল।

তারপর মাইক স্বয়মের মুখের দিকে তাকাল। ওর দিকে একটা রসগোল্লা এগিয়ে দিল চামচ করে।

মুচকি হেসে বলল, তুমি যেন একটু এমবারাস্‌ড বোধ করছ। কিন্তু বিব্রত হচ্ছ কেন? বরং আমারই উচিত তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। আমি যদি গঙ্গার কিনারে কিনারে গরু খোঁজা না করে তোমার কাছে আসতাম তাহলে ঠকতাম না। অযথা সময় নষ্ট হত না। অন্তত তুমি এমন সব বই আমায় পড়তে দিতে যা আমার মতো সখের 'সীকার'দের পক্ষে যথেষ্ট। তুমিই হতে পারতে আমার সোহং স্বামী।

মাইক স্বয়ম্‌কে অবাক হয়ে যেতে দেখে বলল, হ্যাঁ; শুধু অহং ভোলের গেরুয়া বসনটা বাদ দিয়ে। সোয়াতির কাছে যে তোমায় সোহং সোয়ামী বলে বর্ণনা করেছি তার মধ্যে ছিটেফোঁটা আন্তরিকতাও আছে একথা বিশ্বাস করো।

পরিবেশ একটু হালকা করে নেওয়া দরকার। স্বাতীই হাল ধরল। আলাপের নৌকার মোড় ঘোরাল।

—মাইক, তুমি গেরুয়া রঙ খুঁজছ তো? তা গঙ্গার উপর সূর্যাস্ত দেখ না কেন? গেরুয়া কেন, তুমি রামধনুর হরেক রঙ পাবে হঠাৎ হঠাৎ। অবশ্য রাইডিং ইন দি স্কাই, আকাশে চড়ে বেড়াবার সময় তো ওদিকে মন দিতে পারবে না।

কিন্তু মাইক এখন মুখর হয়ে উঠেছে। নিজেব বাপ-মা বাড়িঘর কলেজ এই সবে ঘেরা পরিচিত সংসার ছেড়ে এয়ার ফোর্সের ব্যারাকে ব্যারাকে তাকে জীবন কাটাতে হচ্ছে। মরণের মুখোমুখি হতে হচ্ছে অন্ধকার অজানা আকাশে।

তার মধ্যে এখন সামান্য কিছুদিনের জন্য সে কলকাতায় আর.এ.এফ.-এর ফাইটার কম্যান্ডে হেড কোয়ার্টার্স স্টাফে এসে কাজের সঙ্গে বিশ্রামের স্বাদ পাচ্ছে।

আর যে ঘনিষ্ঠ বাঙালিপাড়া বেহালার প্রাসাদে ওদের অফিস সেটা একটা হাসিকান্নায় স্পন্দিত বিরাট অভিজাত পরিবারের বসতবাড়ি। যুদ্ধের প্রয়োজনে সে পরিবারকে ওখান থেকে সরানো হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ঘরোয়া জীবনের সবরকম ছাপ রয়েছে সেখানে। তার ছাপ পড়েছে তার মনে।

স্বাতীদের এই ঘরটুকুও তার বর্তমান রুটিনে একটা মধুর জীবনের স্নিগ্ধ নিষ্কৃতি। তাই সে মুখর হয়ে উঠেছে।

মাইক তার মনের মোড় ঘোরাতে চাইল না। আবার কবে এ বাড়িতে নিজের বাড়ির মতো করে বিনা বাধায় বিনা সামরিক হাঁকডাকে নিজের মন নিয়ে বসতে পারবে তার ঠিক নেই। এয়ারফোর্স মেসে মদের পাত্রে বরফের সঙ্গে মিশিয়ে ঝাঁকি মারতে মারতে 'এল প্রেসিডেন্টে' ককটেল বানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার কমলা রঙের স্বপ্নে বিভোর হওয়াটাই স্টাইল্। তার বদলে আবার কবে মর্মর পাথরের গ্লাসে মাটি মায়েব তৈরি সাদামাঠা ডাবের জল খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তার ঠিক নেই।

কাজেই সে যা নিজে থেকে পেয়েছে বা খুঁজে পায়নি তার কথা বলার সুযোগটুকু এখন ছাড়বে কী করে?

স্বাতী তো শুধু একই কলেজের ছাত্রী নয়। সে একই মনের পথের পথিক।

আর এই স্বয়ম্? সে তো একটা আবিষ্কারের বিস্ময়। নেই কোনও রাসায়নিক মিশ্রণ, কোনও ভেজাল। একটি খাঁটি পরিশীলিত মনের মানিক।

মাইক বলল, আমি গঙ্গার সূর্যাস্তের কথা বলছি। কলকাতার গঙ্গা নয়। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখতে পেয়েছিলাম। রম্যা রোলাঁর বই পড়েছি। মন্দির ছাড়িয়ে পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম। একা আর নিরালা। আমার ইউইনফর্মটা সেখানে কোনও কৌতূহলী চোখ বা বিস্মিত ছেলেমেয়েকে টেনে আনবে না। আমি সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ভুলে গেলাম যে খালি চোখে ওদিকে বেশিক্ষণ তাকাতে নেই। চোখে কেমন যেন ঘোর দেখতে শুরু করলাম। তারপর...

ওরা দুজনেই রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

—হ্যাঁ, সেই কথাটাই তো আমিও ভাবছি। তারপর মনে হল এক সন্ন্যাসী আপন মনে বটগাছের তলায় বসে আছেন। আমারই প্রত্যাশায় যেন। একটু চমকে উঠলাম।

না মায়া নয়। চোখের ভুল নয়। স্বপ্ন, ভ্রম, হ্যালিউশিনেশন নয়।

সন্ন্যাসী ইংরেজিতে আপন মনে বললেন, বেঁচে থাকো। তুমি তরুণ। তোমার জীবনে অরুণবর্ণ দেবতার জ্যোতি এসে পড়ুক। বাঁচো। জীবনই সবচেয়ে বড়। সেই জীবনকে তমসার ওপারের আদিত্য বর্ণে উজ্জ্বল করো।

কিন্তু তাঁর আশীর্বাদী কথাগুলির মানে কিছু বুঝলাম কিনা সে সম্বন্ধেও কোনও ঔৎসুক্য দেখালেন না।

—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। এদেশে তো টোয়াইলাইট, মানে দিন আর রাত্রির মিলনসেতু সন্ধ্যা খুব সংক্ষিপ্ত। আমি আত্মস্থ হয়ে দেখলাম অন্ধকার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর কথাগুলি স্বর্গ থেকে ঝরা আলোর মতো অন্ধকারেও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মনে হল।

আচ্ছা স্বয়ম্, তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বোধ হয় এমন তমসা আর আদিত্য বর্ণের বর্ণনা আছে ভগবানের কথা প্রসঙ্গে?

খুব মৃদু স্বরে স্বয়ম্ জানাল, আছে, উপনিষদে আছে। কিন্তু, মাইক তোমার এই ঘটনা শোনার পর আমার মনে কী রকম একটা অনুভূতি আসছে। তোমাকে তা বোঝাতে পারব না।

একটু থেমে আত্মস্ত হয়ে স্বয়ম্ আবার বলল, কিন্তু এই সন্ন্যাসী স্বপ্ন হোন সত্য হোন বা যাই হোন না কেন, তোমাকে কিসের আহ্বান শুনিয়ে গেলেন? তমসঃ পরস্তাৎ অন্ধকারের ওপার থেকে কিসের এই ডাক? অথবা কার ডাক?

স্বাতী ভয়ে শিউরে উঠল।

মাইক তা লক্ষ করল।

না। এই সুখী স্বর্গের ফুলকে ভাবনার মধ্যে ফেলে গেলে অন্যায় হবে। এর আতিথ্যের এর বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হবে। এ চলতে পারে না।

মাইক তাই খুব খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে হেসে উঠল।

স্বাতী, তুমি তো জানো হঠাৎ এরকম সাধু দর্শন হওয়াটা আমাদের মধ্যে খুব ভালো লক্ষণ ধরা হয়। আমরা মিলিটারিতে এসব মানি না। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সব সার্থক আর মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। আমার বাবা মাকে এই ঘটনাটা জানাব। ওঁরা খুব আশ্বস্ত হবেন।

স্বাতীও আশ্বস্ত বোধ করল এবার। এবং নিজের বাবা-মাকে খবর দিল।

ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন যে বন্ধুদের চা আর খোশগল্প শেষ হলে ওদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

খুব সুন্দর একটা পারিবারিক পরিবেশ গড়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পর এরা বিদায় নিয়ে গেল। মাইকের মনে একটা সার্থকতার আনন্দ। সত্য অনেক সময় বিবর্ণ আর বিস্বাদ হয়। কিন্তু সেই গঙ্গাতীরের ঘটনা সত্যিই হোক আর স্বপ্নই হোক তার অনুভূতিটাই তো বেঁচে থাকার রং। জীবনের রং।

মিলিটারি মোটরটা পিছনের দিকে রক্তচক্ষু দেখাতে দেখাতে চলে যাবার পর স্বয়ম্ ঘরে ফিরে নিজের দিকে তাকাল।

সে কে? এদের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই না। এই 'কিছু না'র আয়নার ভেতর দিয়েই কি সে পৃথিবীটাকে দেখবে? জীবনটাকে আস্বাদন করবে? অথবা অপচয় কববে?

নিজেকে সে সমঝাল। তুমি একটা রোমান্টিক গঙ্গাফড়িং। জীবনের আনাচে কানাচে উড়ে বেড়াচ্ছ। সেই জীবনের তুমি কেউ নও। গোটা কতক বই আর বুলির ভারে নিজেকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দেখছ। কিন্তু সেগুলি তো তোমার নিজস্ব অর্জন নয়। পৃথিবীর সকলের সম্পত্তি। তোমার নিজের পরিচয় কী? এবং কী দিয়ে?

হ্যাঁ, তুমি গলার জোরে নিজের সাফাই গাইতে পার যে তুমি ব্যর্থ আর পরাজিতদের দলে থেকে তাদের সঙ্গে তালে তালে এগোবার চেষ্টার মধ্যেই তোমার মহত্ত্ব দেখাবে।

কিন্তু তাদের আশা উদ্দেশ্যহীন, আকাঙ্ক্ষা অর্থহীন। তাদের ভালোবাসার মধ্যে মর্যাদা নেই। এমন কি নিরাশার মধ্যেও নেই নীতি। এই অসার্থকের দল হেবে যায়, পিছিয়ে পড়ে, মার খায় মুখ বুজে।

তুমি, তুমিও স্বয়ম্, না-পাওয়ার ওপারে পৌঁছবার জন্য উঠে পড়ে লড়ে যাচ্ছ না। শুধু তোমার অন্তরের পাথরে গভীর অক্ষবে খোদাই করে যাচ্ছ সেই দিন আর সেই বাত্রিগুলিকে যাদের মধ্যে না আছে রং, না আছে রক্ত।

এই কি তোমার জীবন? তাই যদি হয় তার চেয়ে বড় কি কিছু নেই যার জন্য তুমি বসাবে অজানা সাধনে?

প্রায় সারা রাত সে জেগে জেগে ভাবল।

স্বাতীদের বাগানের অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেলের ওপারের মর্নিং গ্লোরি লতার ফুলগুলির ততক্ষণ চোখ মেলে তাকাবার সময় হয়ে এসেছে। শিশিরসিক্ত লতাগুলি বীণার তারের মতো ঝুলছে। যেন আলোর পরশে এখুনি বেজে উঠবে।

॥ তেরো ॥

সেই তার বেজে উঠেছিল। কিন্তু বীণার ঝংকারে নয়। ধনুকের টংকারে। এবং ঠিক তার পরের দিনই। সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে।

আশ্চর্য! স্বয়ম্ বুঝতেই পারল না কোথা থেকে কী হয়ে গেল। মন কী করে নিজেরই অগোচরে এমন করে পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রবল বেগে কিন্তু নীরবে, বিনা প্রতিবাদে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

এত তাড়াতাড়ি যে সে নিজেই তার কোনও হিসাব দিতে পারবে না। অথবা কোনও হদিস।

বীণার ঝংকারের পরিণতি ধনুকের টংকারে। সে কী রকম রূপান্তর?

অথচ মর্নিং গ্লোরির লতাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব কিছুকেই মিষ্টি মনে হচ্ছিল। এমন কি ভোর রাতের ঠেলি পড়া মিটিমিটি বাতি নিয়ে চলা ট্রামগাড়ির টুংটাং শব্দটুকুও।

মনে হচ্ছিল ওই সাজানো বাগানটুকু, ওই পাম গাছগুলি, ওই মায়াভরা রাত সবই বেঁচে থেকে উপভোগ করার জন্য। এই যুদ্ধ এই হাহাকার এই হানাহানি সত্ত্বেও।

কিন্তু সেই উপভোগের আনন্দ আস্বাদের প্রথম সোপান হচ্ছে বেঁচে থাকা। ভিখারিও বেঁচে থাকে। ভবঘুরেও। কিন্তু সে বাঁচা বাঁচা নয়। বাঁচার আনন্দে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাধনায় সার্থকতায়।

অস্ট্রিচ পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে রেখে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলে নিশ্চিন্ত থাকলেও বাঁচা বলে না তাকে। সেটা তো পলায়নেব পথ।

অথচ জীবনের রাজপথ তৈরি হয় জয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই জয় সে কোথায় পাবে?

ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে সে ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে বাইরে এসে পূবের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। মন মেলে দিল সেই দিকে যে দিক থেকে আসে আলো। আসে আশা। আসে প্রত্যয়। ভাসা তস্য বিভাতি সর্বমিদম্। তাঁর আলোয় সব কিছু আলো হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে সেই আলো নিয়ে সে বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে মেট্রো সিনেমায় গিয়েছিল। তারপর রাস্তায় অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে কী হয়ে গিয়েছিল সেটা বন্ধুরা জানে না।

তার পর কোনও খবর না দিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে সে কোথায় আর কেন যে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাও তারা জানত না। খবর নিয়ে পরে জেনেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বুঝবে না। এখন সে সেটা বুঝিয়ে

বলবে তাদের সঙ্গে দেখা করে।

সে মনে মনে সমস্তটা যেন মহড়া দিয়ে নিল। বন্ধুরা ওকে এই ক'মাস পরে একেবারে ইউনিফর্ম পরা কমিশনড অফিসার হিসাবে দেখবে। একটা বিরাট রূপান্তর।

আরও একজন দেখবে সে রূপান্তর। সে নিশ্চয়ই বুঝবে যে এটা শুধু রূপান্তর নয়। জন্মান্তর।

কী করে সেটা সম্ভব হল তা সেই বিশেষ ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই বুঝবে।

জার্মান হাওয়াই হামলা ভরা বিলেত থেকে ফিরে আসা মাইকের সহপাঠিনী সে। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁ বা ওইরকম জায়গায় যেতে অভ্যস্ত সে। কাজেই তার চোখে খুব কিছু একটা পরিবর্তন মনে হবে না। সে মন দিয়ে যাচাই করে। কাজেই স্বাতী বুঝবে স্বয়মের এই বিবর্তন। স্বাতী নিশ্চয়ই বুঝবে।

ফ্রন্টে যাবার আগে ফার্লো নিয়ে সে এসেছে। সেই আরেকজনের কাছে আর বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার জন্য।

বন্ধুরা খুশিতে বলে উঠবে—তুই স্বয়ম্ না, শ্যাম—সব বাঙালি রাধার চোখে পীতবসন বনমালী হয়ে উঠেছিস তুই।

হয়তো সরল বাধা দেবে—হায় হায়! সে চান্সটা পাবার আগেই তোকে হয়তো খাকীবসন মরুমালী হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ খাকী পোশাক পরে মরুভূমিতে চরে বেড়াতে হবে। গোষ্ঠে বিচরণের মতো। আফ্রিকায় রোমেলের জার্মান রোলারের ঠেলায় সব মরুসুন্দরীর দল মিশরে জমায়েত হয়েছে শুনেছি। শোন্, সেখানে বাঙালির থুড়ি ইন্ডিয়ানের মুখ রক্ষা করিস কিন্তু। মরুতরুণীদের মধ্যে শ্যাম ওয়েসিস।

—হ্যাঁ দেখিস, বসরাই গোলাপদের যেন অবহেলা করিস না। ঝটাপট তোড়া বেঁধে বানিয়ে চলবি। আর তোর সংস্কৃত কাব্যে কিন্তু আর কুলোবে না। এবার শুধু আরেবিয়ান নাইটস।

স্বয়ম্ বাধা দেবে—আঃ কী সব রসিকতা করছিস তোরা। তোদের মুখে দেখি কোনও আগলই নেই।

এবার সরল চটে উঠবে।

ভাববে যে বন্ধুর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে বা হবে কি না তারও ঠিক নেই। ওরা এই সময়টুকু হালকাভাবে ওকে খুশিতে ভরিয়ে বিদায় দিতে চায়। আর ও-ই কিনা বাধা দিচ্ছে। ও তো যুদ্ধ নিয়ে থাকবে. আমরা থাকব কি নিয়ে?

সে বলবে—তবে শোন্। আগল আজ কোথাও নেই। না সমাজে, না চরিত্রে, না অর্থসামর্থ্যে। তুই হয়তো কিছুটা শান্তি পাবি, কারণ একটা আদর্শ তৈরি করে দুঃসাহসে জীবনমরণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবি। নিজের মনের উপর আগল চাপাবার পথ পাবি।

আর আমরা? এই বাঁধভাঙা প্লাবনের প্রতিরোধ করবার কোনও ক্ষমতা আমাদের আছে? রাজাশাসন যারা করছে তারাই দুঃশাসন সেজে সমাজের বস্ত্রহরণ করছে। অন্ন লুণ্ঠন করছে। চরিত্র হনন করছে।

গোপীনাথও যোগ দেবে। চারদিকে বেড়াজালে বাঁধা মন মুক্ত হবার মুহূর্তে এইরকমই হয়ে থাকে।

সে তিক্ততাভরা স্বরে বলবে—প্রশাসন যা করছে সবই শুধু যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বাঁচাবার আর বাড়াবার জন্য। বাইরের শত্রুকে ঠেকাবার আর ভিতরের শাসিতকে ঠকাবার জন্য? তুই তো স্বচক্ষে দেখেছিস লক্ষ লক্ষ লোক প্রাসাদনগরীর অন্ধকার পথে ঘাটে একটু ফ্যানের জন্য কান্নায় গলা শুকিয়ে মরল। ওদিকে খেতবাজার উজাড় করে খাবার জড়ো করে যুদ্ধের গুদামে রাখা হচ্ছে। রেসের ঘোড়ার পর্যন্ত রেশন বেড়ে গেছে। মিলিটারিকে খোশ মেজাজে রাখতে হবে যে!

কর্তারা বলে—অন্ধকার? সে তো তোমাদেরই ভালোর জন্য। জানো না, জাপানি বোমারু বিমানগুলি বর্মায় কী করেছে?

বুভুক্ষা? সে তো তোমাদেরই ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমাদের সৈন্যরা, অত্যাবশ্যক কাজের কর্মীরা পেট ভরে খেতে পেলে তবেই তো তোমরা বাঁচবে। আর বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ সিপাহী আসছে। তোমাদের বাংলা মুলুকে ঘাঁটি করে তোমাদের সারা ভারতকে বাঁচাবে। তোমরা অতিথি সৎকার করবে না?

নিজে অভুক্ত থেকে অতিথিকে খাওয়ানো সনাতন শাস্ত্রে প্রশস্ত বলে লিখেছে।

বেকারি? তার প্রতিকার তো তোমাদেরই হাতে। জাপানিরা এলে তাদের অগুনতি জনসংখ্যা এদেশে হাজির হয়ে মৌরসী পাট্টা গাড়বে। তার চেয়ে আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কাজ নাও। রেশন পাবে, মাইনে পাবে। আর স্বাধীনতাও পাবে একরকম মোটামুটি।

তবে যুদ্ধটা আগে শেষ হোক। তারপর সব দেখা যাবে।

তোমাদের বাঙালিদের উপর অবশ্য আমাদের বিশেষ ভরসা নেই। সিপাহী হবার বা চালাবার মতো না আছে তাকত, না ইতিহাস। বিদ্যা তোমাদের ওই বন্দেমাতরম আর বোমার মাতন পর্যন্তই। কিন্তু না পার নিষ্ঠুর হতে, না পার হুকুম মানতে।

অতএব নিজের মুখের অন্নটুকুই আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নৈবেদ্য হিসাবে তুলে দাও।

আর যদি বিশেষ যোগ্যতা প্রমাণ করতে পার তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সক্ষম আর যারা স্বদেশী নও তারা রিক্রুটমেন্ট অফিসে চান্স লড়ে যাও। অন্ততপক্ষে যদি নন-কমিশন্ড অফিসার হতে পার, শুরু করবে লান্স-নায়েক থেকে। জাপানি যুদ্ধের যা তোড়জোড় তাতে ধাপে ধাপে নায়েক আর হাবিলদার হতে বেশি সময় লাগবে না।

যদি বরাত নেহাত ভালো থাকে আর ভি সি ও অর্থাৎ ভাইসরয়েস কমিশন্ড অফিসার হবার জন্য নির্বাচিত হও তাহলে তো কথাই নেই। এক তারামার্কা জমাদার থেকে সুবেদার, সুবেদার মেজর হতে কত আর সময় লাগবে?

কিন্তু এসব কথা তো জানা কথা। হাড়ে হাড়ে বোঝা কথা। তাই গোপীনাথ বলবে. শোন্ ভাই. শ্যাম, তবু আজ আমরা খুশি। খুব খুশি।

কারণ আমাদের বাঙালিদের ভাগ্যে এন. সি. ও., ভি.সি.ও. হবার যোগ্যতাও প্রায় নেই বলে সবাই বলে। আর আমাদের ছেলেছোকরারা কোনও র‍্যাঙ্কে ঢুকবার জন্যই পাত্তা পায় না। সেখানে আমাদের স্বয়ম্ একেবারে এমার্জেন্সি কমিশনে নির্বাচিত হয়ে গেল।

বন্ধুরা যে কত খুশি হয়েছে তা অনুমান করেই স্বয়ম্ খুব খুশি।

কেন যে স্বয়ম্ হঠাৎ সটকিয়ে গেল আর কোথায় লুকোল তা ওরা জানত না। এতদিন স্বয়মের অবশ্য দেখাই নেই। কোথায় কোন্ ট্রেনিং-এ যাচ্ছে সেসব খবর জানতে চাওয়াও ঠিক নয়।

সরকার হঠাৎ স্পাই বলে সন্দেহ করে বসলে আর রক্ষে নেই।

কাজেই বন্ধুরা ওর সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। এমনিতেই বালিগঞ্জে মামার নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পরে দেখা-সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। আর এখন তো কথাই নেই।

সিঙ্গাপুরে মালয়ে বর্মায় ব্রিটিশের যা দুর্দশা হয়েছে তাতে বন্ধুরা মনে করত যে জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার চেয়ে ইটালিয়ান এমনকি জার্মানদের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় চালান যাওয়া ভালো।

তাই তারা আফ্রিকার রণাঙ্গনে হয়তো বন্ধুকে পাঠানো হবে একথা ভাববে। এটাও স্বয়ম্ মনে মনে অনুমান করল।

এই কাল্পনিক কথাবার্তা ওর মনকে খুশিতে ভরে তুলল।

তারা তিনজন নিজেদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স নাম দিয়েছিল। তিন ছাত্র অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছিল এমন বন্ধুত্ব যা হয়তো পরবর্তী জীবনে নতুন করে গড়া সম্ভব হয় না।

পৃথিবীর পরিধি যাচ্ছে ছড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের বুনোট যাচ্ছে ছিঁড়ে।

সেইজন্যেই প্রথম যখন স্বয়ম্ বালিগঞ্জে উঠে গেল ওদের যেমন আনন্দ হয়েছিল তেমন দুঃখও। উত্তর কলকাতার বুকচাপা বাতাস আর মাথা ছাপানো আকাশ ওদের কোনদিনই ভালো লাগত না।

কিন্তু দক্ষিণ কলকাতায় যেটুকু উদার উন্মুক্ত ভাব এখনও আছে মানুষের ভিড়ে প্রয়োজনে তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তা দেখেও তাদের খারাপ লাগত। তবু তিন বন্ধুর মধ্যে একজন দক্ষিণবাসী হয়ে যে ইটকাঠ নোংরার খাঁচা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেয়েছে তাতেই তারা খুশি ছিল।

চৌরঙ্গীপাড়ায় সিনেমা দেখতে গেলেই তাদের মন খারাপ হয়ে যেত। ইয়োরোপ আমেরিকার ছবি দেখে তাদের কেবলই মনে হত যে ওই সব দেশের লোকরা যে কলকাতাকে প্রাসাদপুরী নাম দিয়েছে এক একটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুর পরিহাস।

ইংরেজি ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ হাস্য সব অলঙ্কারই আছে প্রচুর। কিন্তু প্রাসাদপুরী কথাটার মধ্যে যে শ্লেষ আছে তার তুলনা নেই।

অল্পে সন্তুষ্ট চোখ বুজে কুয়োর মধ্যেই পৃথিবী দেখতে অভ্যস্ত বাঙালি বলে এই তিন বন্ধু নিজেদের উপরই নিজেরা অসন্তুষ্ট ছিল। অথচ এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করার তো উপায় বা শক্তি কিছুই নেই

বলে নিজেদের অসহায় মনে করত। শুধু মাঝে মাঝে ভাবত, ভগবান, করবার হাত যখন দাওনি, দেখবার চোখ আর ভাববার মন কেন দিয়েছ?

সেই ভাববার মন নিয়ে ওরা যে রাত্রে একসঙ্গে শেষবার বেরিয়েছিল সেই দৃশ্যটা ওদের মনে পড়ল। মনে মনে সেটা আবার দেখে নিল।

* * * *

স্বয়ম্ হঠাৎ মিলিটারিতে নাম লেখাতে যাবার আগে ওদের তিনজনে শেষ দেখা হয়েছিল একসঙ্গে সিনেমা দেখবার সময়। ওয়াটার্লু ব্রিজ ফিল্ম। পৃথিবীর সব দেশেই অভিজাত বংশের সন্তানের সঙ্গে সাধারণ ঘরের সন্তানের প্রেমের যা সাধারণ পরিণতি হয়ে থাকে তারই স্মৃতি দিয়ে রচিত ছবি। সে ছবিতে লন্ডনের প্রাসাদপুরীর সঙ্গে কলকাতার বিনাযুদ্ধেই ভাঙাচোরা ছবি দেখতে দেখতে তার চেহারা আর হাহাকারের তুলনা করে ওদের তিনজনেরই মনে অনেক ভাবান্তর হয়েছিল।

মেট্রো থেকে বেরিয়ে ধর্মতলার ভিড়ে চ্যাপটা আর চোবাগোপ্তা গলি মার্কা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুই শহরের তুলনা না করে পারেনি।

সরল বলেছিল, ছবি দেখে সুখ পাই না ছাই একটুও। এত বোমার হামলা আর এত সার্চলাইট দিয়ে আকাশের বুকে ছুবি চালানো। তা সত্ত্বেও শহরটি সুন্দর। আমার এই দেশেতে জন্ম—সেটা ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে এই দেশেতেই মরি? কেন? কেন এই দেশের চেয়ে ভালো পরিবেশে বাঁচব না?

গোপীনাথ বলল, ঠিক তাই। এমন দেশ আমরা চাই অথবা এমন দেশ তৈরি করতে চাই যা আজকের এই বাংলা নয়। যেখানে নেই ভয়, নেই ভিখিরি। সাইরেনের চিৎকার দিয়ে ফ্যানের জন্য চ্যাঁচানি ঢাকতে হয় না। ওদের অন্ধকারেও আকাশভরা আলোর নিশানা। আর আমাদের আঁধারে শুধু নোংরা হাহাকার।

আমরা বাঁচি না। শুধ জীবনধারণ করি। শেষ পর্যন্ত দেহরক্ষা করি। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!

বলেই গোপীনাথ রাস্তায় চলতে চলতে আর পাঁচজনের মতো থুথু ফেলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু হঠাৎ সেই অভ্যাসটা সে দমন করল। মরণের ছড়াছড়ির মধ্যেও যে পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবি সে এইমাত্র দেখে এসেছে তার সঙ্গে থুথু ফেলা খাপ খায় না মনে হল।

মনে হতেই সে টানটান হয়ে মাথাটা উপরের দিকে তুলে ধরল। যেন ওয়াটার্লু ব্রিজের উপর বেলুন ব্যারাজের বেড়াজাল টাঙিয়ে তাকে বোমারু বিমানের আক্রমণ করার ভার ওরই উপরে বর্তেছে। যেন সরকারি সাপ্লাই দপ্তরের একজন কনিষ্ঠ কেরানির মাথা আর চোখ দুটো উপরওলার কড়া নজরের ভয়ে টেবিলের সঙ্গে লেপটিয়ে নেই।

স্বয়ম্ কিন্তু চুপ করে রইল। ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে ওর চোখে একটা আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। সার্চলাইটের সন্ধানী আলো ওর আকাশে কী যেন খুঁজছে।

স্নেহশীল মামার টাকায় আর উপদেশে কেনা চাঁদনীর সুটটা আজ যেন আর চাকরির বাজারে ঢুকবার পোশাক নয়। কেমন করে না জানি সেটার ঢং আর কাপড় আর কাট চাঁদনির মার্কা ছেড়ে দিয়ে আর্মি অ্যান্ড নেভির লেবেল নিয়ে ফেলেছে। সাধারণ অফিসের কনিষ্ঠ কেরানি না হয়ে জীবনযুদ্ধের সেনানী হয়ে যাচ্ছে স্বয়ম্।

ছেঁড়া মোজার ফুটোগুলো জুতোর ভিতরে আপনা থেকে বুজে গেছে। চকচক করছে জুতোজোড়া—ঠিক ওই নায়কের বুটের মতো। সারাদিন চাকরির সন্ধানে অফিস পাড়ায় ঘোরা সত্ত্বেও।

মাথায় এখনও ক্যাপ নেই। কিন্তু সারাটা আকাশ মানে, ধর্মতলার সরু ট্রামে বাসে আক্রান্ত ভিড়ে চ্যাপটা সরু রাস্তাটার উপরে যে আকাশের ফালিটুকু দেখা যায় তার সমস্তটা যেন ওরই মাথার ক্যাপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এমনিতেই সাধারণ বাঙালির তুলনায় সে একটু লম্বা। এত বছর গ্রামে ঘরের খেয়ে মায়ের যত্নে থাকার ফলে স্বাস্থ্য বেশ ভালো। কলকাতার মাজাঘষা পেয়ে ট্রাম বাসের পয়সা বাঁচানোর তাগিদে চলাফেরা করে সে বাঙালির তুলনায় ক্ষিপ্র। সওদাগরি অফিসে চলনসই ভালো চাকরি পেতে হলেও ছিমছাম স্মার্ট হাবভাব দরকার। নিজেরই খেয়াল ছিল না যে স্বয়ম্ আপনা থেকেই এর বিশেষত্ব অর্জন করে নিয়েছিল।

খেয়াল হল এতদিনে।

সে বুঝল যে সেও এইরকম সটান দেহ নিয়ে মাথা উঁচু করে দ্রুতপদে তালে তালে এগিয়ে যেতে

পারে।

দেহ তার ঠিক আছে। কাল রাত থেকেই মন কিসের আহ্বান পাচ্ছে। আত্মার মধ্যে একটা অব্যক্ত আকৃতি।

তাহলে বাকি রইল কী? শুধু এই বাইরের খোলস আর পচনধরা পরিবেশ? পরিণতি লাভ করবে সে শুধু এরই মধ্যে? পরিত্রাণ কি নেই কোথাও কোনরকমে?

লিভ এ লিটল। লিভ এ লিটল! একটুখানি বাঁচো।

সেই বাঁচার জন্য মানুষ তো সব কিছুই করে।

এই যে লক্ষ লক্ষ লোক আজ কলকাতা নামক নরকে এসে ভিড় করেছে সেও তো শুধু বাঁচার তাগিদে। দেশে গাঁয়ে অন্ন নেই, পয়সা উপায়ের পথ নেই, খেটে খাবার মতো মাঠ বা কাজ কিছুই নেই। তবু মানুষ বাঁচতে চায়। মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই শহরে। নেই কাজ পাবার পাকা আশা। এমনকি দু মুঠো ভিক্ষার ভরসা।

তবু তো ওরা গ্রাম উজাড় করে শহরে চলে আসছে। ফুটপাতে ভিক্ষা করছে। গলিতে ঘুরছে পুলিশের ভয়ে। এয়ার রেড ট্রেঞ্চগুলি শোওয়া থেকে পায়খানা সব কাজে লাগাচ্ছে। নারীর ন্যূনতম লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থাও নেই! কিন্তু মানুষ নামক শকুনের নজর থেকে কুকুর বিড়াল রেহাই পেলেও ওরা রক্ষা পাচ্ছে না।

তবু মানুষ বেঁচে আছে। সরল আর গোপীনাথও বেঁচে আছে। ওরা দুজন তবু সংসারের তাগিদে যা হোক ছোটখাটো কেরানির চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সরকারি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে। নিজেদের চোখ ঠেরে বলে কনিষ্ঠ করণিক। ভাষার ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে ভব্যতাতে নিজেদের ভরিয়ে নিতে চায়।

ওর নিজের জন্যও সে পথ খোলা ছিল। চেষ্টা করলে একটা চাকরি জুটে যেত। কিন্তু বন্ধুদের পারিবারিক প্রয়োজন যত প্রবল ওর ততটা নয়। বালিগঞ্জে নতুন উঠে যাওয়া অ্যাটর্নি মামার সংসারে থেকে কনিষ্ঠ করণিক হওয়া মানায় না।

মানায় না জীবনের প্রয়োজনে।

মানায় না মনের প্রসাধনে।

বিশেষ করে একটা বিহ্বল রাতের সেই হাওয়াই হামলার ঝড়ো হাওয়া ওর সবকিছু তোলপাড় করে গিয়েছে। এখন সিনেমা দেখে ফেরার সময় শুধু সেই হাওয়াই দোলা দিচ্ছে।

হাওয়াই হামলা ছাড়া স্বাতীর ওই ব্লিটজ্‌ক্রিগ অর্থাৎ ঝটিতি আক্রমণের আর কোনও বর্ণনা দেওয়া যায় না। সাগরের ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের হানা এসে গেছে তারপরে।

না হলে অত্যন্ত নীরক্ত এনেমিক চেহারার ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের মোড়ে তস্য বেশি ওল্ড অর্থাৎ বুড়ো ঝুরঝুরে বাড়িগুলির সামনে স্বাতী ওকে দেখতে পাবে কেন? আর কেনই বা চুপচাপ ওকে অনুসরণ করে মামার অফিসে এসে হাজির হবে?

স্বাতীর অনুরোধ নয়, হুকুম যেন ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং-এর হামলার মতই। হঠাৎ আর হটকারী দুই-ই। ব্যাপারটার আকস্মিকতা ওকে যেন সমুদ্রের ভাটার টানে ভাসিয়ে বের করে নিয়ে এল। থোড় বড়ি খাড়ার শুকনো বালুচর থেকে টেনে এনে। কল্লোলিত জীবনের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

আর টেনে নামাল নিজে ড্রাইভ-করা মোটরের ভিতরে নয়, শুধু আলোআঁধারি মায়ায় ঘেরা রেস্তোরাঁয় নয়, এমন একটা জীবন সমুদ্রের কেন্দ্রস্থলে যার আহ্বান কল্লোলের মতো ওর কানে বাজছে।

অহরহ বাজছে। মহাসিন্ধুর অন্তর-রহস্য সংগীতের মূর্ছনায় অহরহ মনে বাজছে।

স্বয়মকে বাঁচতেই হবে। সে বইয়ে পড়েছে, বক্তৃতায় শুনেছে যে তরুণরাই হচ্ছে দেশের আশা, জাতির ভরসা। যৌবনই জীবনের সেরা সময়। ফুল ফোটানোর ঋতু। কিন্তু সে এমন রঙিন রোম্যান্টিক নয় যাকে রংয়ের মোহ থেকে সরানো যায় না।

কয়েকটি সন্ধ্যা, দুয়েকটি কথা তাকে প্রেমে মজায়নি। প্রাণে জাগিয়েছে।

সেদিন রাতে চাঁদের আলো তাদের বাড়ির বাগানে অন্যান্য রাত্রির মতই মায়াজাল বুনেছিল। মাঝে মাঝে একটা দুটো মোটরের সামান্য হর্নের ধ্বনিও বাহির বিশ্বের কোন্ প্রেমে ভরা গিরিপ্রান্তরে রাখালিয়া শিঙ্গার আবাহন ধ্বনির মতো কানে এসে বেজেছিল।

তার পরেও সেই আবাহন সে পেয়েছিল।

কদিন পরের সন্ধ্যাতে এল মেট্রো সিনেমার এয়ার কন্ডিশন করা বিলাসে, বেকারি আর বিষণ্ণতা থেকে খানিকক্ষণের জন্য মুক্তি।

সেটাও তো একটা হাওয়াই হামলা বটে।

সিনেমার পর্দায় দেখা বিমান আক্রমণ যেন সমস্তটা নিবির্য নীরক্ত অসহায়তার বিরুদ্ধে। যেন ওকে সবসময় প্লেনের গুরু গুরু আওয়াজে আহ্বান করছিল, ভয় কোরো না, বেঁচে ওঠো। বেঁচে থাকবার চেষ্টা করো। পড়ে পড়ে মার খাওয়া মোটেই বেঁচে থাকা নয়। মৃত্যুর বিরুদ্ধে মাথা তোলো। জীবনকে হাতে তুলে নিয়ে গর্জে ওঠো। তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাও।

সেই ক্ষণিকের মুক্তির আলো থেকে বেরিয়েই ধর্মতলায় অন্ধকার। অধর্মের কারবারের হরেক ইসারা। অধর্মের অভিশাপের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস।

তার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে স্বয়ম্ নীরবে গোপীনাথের দিকে আবার তাকাল।

গোপী, আমাদের গুপী পর্যন্ত মৃত্যুর উপরে জয়ী জীবনের ছোঁয়া পেয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও পেয়েছে। তা না হলে ছেলেবেলা থেকে টনসিলের রোগে ভোগা গুপী যে রাস্তায় চলতে চলতে রাতদিন কাশে আর থুতু ফেলে—বারণ করা সত্ত্বেও ফেলে—সেও এই নোংরা অভ্যাসটা দমন করে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে।

এই মুহূর্তে সাপ্লাই দপ্তরের থার্ড ডিভিশন কেরানি সে নয়। সে একটা গোটা মানুষ। ছকু খানসামা লেনের পাঁজর বের করা নোনা ইটের বাড়ি তাকে ঘিরে রাখতে পারেনি।

যে লন্ডনের ছবি তারা এইমাত্র দেখে এসেছে সেখানে এক মাসের মধ্যে জার্মানরা দুশো আটষট্টি বার হাওয়াই হামলা করেছে, ছয় হাজার টন বোমা আর নয় হাজার আগুন জ্বালানোর ইনসেনডিয়ারি ঝেড়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আগুনে পুড়ে গেছে।

তবু ওরা রুখে দাঁড়িয়ে আছে,; রুদ্ধশ্বাসে লড়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে আমাদের গুপীও ওই লন্ডনের আজকের নাগরিক হবার যোগ্যতা অর্জন করতে চলেছে।

একটা নোংরামি, আজন্ম অভ্যাসের নোংরামির উপর উঠতে পারাও বলিষ্ঠতার লক্ষণ। স্বয়ম্ মাথা টানটান করে উপরের দিকে তুলে চলতে লাগল।

কার দিকে স্বয়ম্ তাকিয়ে আছে তা সে নিজেই জানে না। আকাশের কোন্ নক্ষত্রটির দিকে? কোন্ অজানা অধরা ভবিষ্যতের দিকে?

কোন্ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ আলোর মশালের দিকে সে তাকাবে? আলোর মশাল।

হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আমেরিকার স্বাধীনতার মূর্তির হাতে তুলে ধরা মশাল।

সেই মশালের আগুন যেন দুঃখ থেকে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির রূপ ধরে বিশ্ব নিখিলের সবাইকে আহ্বান করছে। আমেরিকার বন্দরে ঢুকবার প্রবেশপথেই সেই মূর্তি। কিন্তু সেটি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্য মহান বিপ্লবী ফরাসিদের সৃষ্টি। তাই সেটি আমেরিকার একলার মুক্তির মূর্তি নয়। বিশ্বের সকলের।

তাই সে পশ্চিমের নতুন পৃথিবী থেকে পূর্বের পুরানো পৃথিবীকে আবাহন করছে।

বিশ্বের সকলের মুক্তি না হলে মুক্তির সার্থকতা নেই।

সেই মূর্তির বেদীমূলে কবি এমা ল্যাজারাসের রচিত যে কবিতাটি খোদাই করা আছে তাও স্বয়মের মনে পড়ল। মূর্তির পায়ের কাছে একটা শিকল ভেঙে পড়ে আছে। আর মাথার উপরে তুলে ধরা বরাভয়ের মশাল।

পরিশ্রান্ত দরিদ্র যারা
পুঞ্জীভূত মানুষের জটলার মধ্য থেকে
যারা মুক্ত বাতাসে
নিঃশ্বাস নেবার জন্য ব্যাকুল
জনভারাক্রান্ত তটপ্রান্তের ভাগ্যহত
পরিত্যক্তের দল,
সেই গৃহহীন জীবন বিড়ম্বিতদের
পাঠাও আমার কাছে।

স্বর্ণ সিংহদ্বারের কাছটিতে আমার
প্রদীপটি তুলে ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সেই মূর্তি আর সেই কবিতার কথা মনে পড়তে স্বয়মের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার চোখ দুটি নিজের দেশের আকাশে সেই ডাক, সেই মুক্তি খুঁজে বেড়াতে লাগল। আমাদের কবিও তো বলেছেন কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়, আয় তোরা সবে ছুটিয়া। অন্নপূর্ণা মা আমাদের।

এমন সময়ে সে হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বয়ম্ দাঁড়িয়ে পড়ল। বন্ধুরাও দাঁড়াল। পায়ের কাছে একটা মৃতদেহ। ওরা থতমত খেয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে যেন নানারকম লোক এসে হাজির। নানা মতলবের ধান্ধায়। নানা জগতের জীব।

একজন ফস করে একটা অশ্লীল কথা বলে উঠল। তারপর বলল, কি বাওয়া চলছ মাল-টাল টেনে, বুঝি? আরও চাই নাকি? খাঁটি বিলিতি আছে।

আর একজন মুখে একটা সিটি মারার আওয়াজ করে ফিসফিস করে বলল, হলদে পাখি চলবে? তাজা মাল, এই কাছেই আছে। গোরা পসন্দ!

পেছন থেকে একজন বলে বসল, সস্তায় পাবেন, মশায়। আনকোরা কুমারী। হিম্মত আছে?

মুখ নিচু করে তিন বন্ধুতে দেখল যে গলির মোড়ে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। কোনও ভিখারি হবে। খেতে পায়নি বলে মরেছে।

গোপী ফিসফিস করে বলল, বেচারা বোধহয় বড় রাস্তায় এসে খিদেতে মরতে সাহস পায়নি। গোরাদের নজরে পড়তে পারে বলে পুলিশে খেদিয়ে দিত। তবু শেষ মুহূর্তে বাঁচবার আশায় বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসেছিল।

সরল বিষণ্ণভাবে বলল, আলোর মধ্যে মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতেও সাহসের দরকার হয়। সে সাহস আমাদের বাঙালিদের আজ নেই।

স্বচ্ছন্দ জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বাভাবিক মরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূর্তি হয়ে পড়ে আছে এই মৃতদেহ।

না। ওয়াটার্লু ব্রীজের আশেপাশে কোনও গলিতে অনশনে অসহায়ভাবে কেউ মরে পড়ে থাকবে না।

এক ধাক্কাতে স্বয়ম্ সচেতন হয়ে উঠল। সে শুধু অস্ফুট স্বরে ঋগ্‌বেদ থেকে আওড়াল—দেবতারা ক্ষুধাকে আমাদের মৃত্যুর বিধান করে দেননি। আমার মনুষ্যত্ব, দেশের মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন করে। বিধাতার অভিপ্রায় এ নয়। ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধম্।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একশ সতেরো সূক্তটি যেন ওর মনে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের কাজ করল।

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং।
দুদুরুতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ॥

স্বয়মের স্বগত উক্তি নিজের মনে মনে বলাটুকু মুখের কথায় সুন্দরভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

একবার বলে যেন তৃপ্তি হয় না। আশ মেটে না। আবার বলল। আবার আবৃত্তি করল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকল স্বাতী নক্ষত্রের সন্ধানে।

সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের গতি একটু বেড়ে গেল।

বেদ থেকে উপনিষদে এগিয়ে গেল সে। যুগে যুগে মানুষ যে সম্মুখের পথ বেয়ে এগিয়েই চলেছে। পেছিয়ে পড়েনি, থেমে থাকেনি। কারণ পিছু হটা বা স্থাণু হওয়াই হচ্ছে মৃত্যু।

জীবনের মধ্যে মৃত্যু দেহমুক্তির চেয়ে অনেক বেশি দুঃখের। অনেক বেশি দহন করে। সেই মৃত্যুকে সে অতিক্রম করবে।

স্বয়মের মনের আবেগ চরণের বেগে রূপায়িত হয়ে উঠল। চরৈবেতি। চরৈবেতি।

—কী রে? এত জোরে পা চালাচ্ছিস কেন? ব্যাপার কী?

—তাড়া কিসের রে? আমাদের বাড়ি গিয়ে স্নান করে কাপড় ছেড়ে নিবি। তারপর বালিগঞ্জে গেলেই হবে।

কিন্তু কোথায় স্বয়ম্?

অন্ধকারে ওকে আর দেখা গেল-না।

।। চোদ্দ।।

শুধু রূপান্তর নয়। একটা জন্মান্তর।

সেই স্বয়ম্ভু রায়। স্বয়ম্ নয়, শ্যাম নয়, একেবারে শ্যামসুন্দর। ধড়াচূড়া পরা। শুধু মোহন বাঁশির বদলে মহান অসি।

ক্ষীণদৃষ্টি সরলের চোখে পীতবসন আর খাকী বসনে তফাত নেই।

আংকল স্যামের দেশের মার্কিন ধাঁচের স্মার্ট সামরিক পোশাক। ব্রিটিশ সেনাদলের এমার্জেন্সি কমিশন অফিসার। নিশ্চয়ই ওকে মিলিটারি মেসে স্যামি বলেই ডাকে।

সরলা আর গোপীর ক্লান্ত বিকেলটা হঠাৎ বীর বেশে স্বয়মকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একটু ইতস্তত করে, একটু কেশে, একটু হেসে গোপীনাথ বলে ফেলল, হ্যালো স্যামি। এতদিন পরে হঠাৎ দেখা। তোকে কী বলে ডাকব ভেবে পাচ্ছি না। তাই ওরই মধ্যে একটু মিলিটারি কায়দা করে নিলাম। বন্দুকধারী বন্ধুর বর্ণনা তো বৈষ্ণব পদাবলীতে নেই।

ওই সহজ ভাবটুকু স্বয়মের মনের বাঁধ খুলে দিল। এতক্ষণ কোথায় যেন একটু বাধা ছিল মনের ভেতরে। সেটাও উড়ে গেল। সহজ হয়ে স্বয়ম্ ওদের দুজনকেই জড়িয়ে ধরল।

বলল, ওরে স্যামের খোলস ছেড়েই তোদের কাছে এসেছি। যা খুশি ডাক আমাকে। আমি সেই স্বয়ম্‌ই আছি। ফ্রন্টে যাবার আগে সেটুকু জানিয়ে যেতে এলাম।

সরল খুশি হয়ে বলল, তা তো নিশ্চয়ই আছিস। কিন্তু সেই রাতের আঁধারে যে সটকালি, আর তো দেখাও দিলি না, চিঠিও দিলি না। তোর মামার বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানলাম হঠাৎ মিলিটারিতে যাবার জন্য দরখাস্ত করেছিলি। আর তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোকে নিয়েও নিয়েছে।

গোপী বলল, জানিস শ্যাম, এত খুশি হয়েছিলাম যে তুই না জানিয়ে পালিয়েছিস বলে রাগ পর্যন্ত করতে পারিনি। এমন কি খোঁজ-খবরও করিনি পাছে কর্তারা আমাদের বাউণ্ডুলে ব্যাকগ্রাউন্ডের রিপোর্ট পেলে সেটা তোর বিরুদ্ধে যায়।

স্বয়ম্ হেসে ফেলল। আজ তার হাসার অধিকার হয়ে গেছে। সাফল্যের হাসি। সার্থকতার হাসি।

সে বলল, তা মিথ্যে বলিসনি, ভাই। প্রথমে ফিল্ড টেস্টগুলোতে বেশ ভালো করে তরে গেলাম। তবুও আমি ভেবেছিলাম যে 'ভাইভা'তেই ভেস্তে যাব। কিন্তু একটা নতুন ধারা সবে চালু হয়েছে। খাস বিলেতের ওয়ার অফিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চালানো নিয়ম। তাতে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডই দেখে না, সাইকলজিস্ট, সাইক্রিয়াটিস্ট এরাও সব থাকে। এমন কি খাস মেমসাহেব ওয়াক-আই পর্যন্ত। সবার হাত দিয়ে যেতে হয়।

তার পর গম্ভীরভাবে যেন নিজের মনে বলল, বাহুর বলই শুধু নয়, মাথার বুদ্ধি আর মানুষ চালানোর ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব সব যাচাই করে সবাই মিলে। এই যুগের যুদ্ধে নাম লেখাতে হলে অনেক কিছুই চাই।

গোপী ব্যাপারটার গাম্ভীর্য হালকা করে তোলার জন্য একটু ঠোঁট চেটে নিল, অ্যাঁ, খাস মেমসাহেব? তোকে দেখেই বোধহয় বিরহিণীর মন নরম হয়ে গেল।

—না রে, না। ওরা শুধুই ব্যথা জাগানিয়া। বিরহের বোঝা বইবার জন্য সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে এই পোড়া দেশে আসেনি। মিলন বিরহ এসব শিকেয় তুলে রেখে রিক্রুটদের ঠিকুজী কোষ্ঠী নিয়ে বসেছে। আমায় কী জিজ্ঞেস করল জানিস?

আমার ডোসিয়ের (খবরে ভরা কাগজপত্র) দেখে জিজ্ঞেস করলে—স্যানসক্রিট পণ্ডিটের ছেলে টোল ছেড়ে গুলি চালাবার কাজে নামতে চাও কেন?

শুনে থ হয়ে সুন্দরীর চোখের দিকে তাকালাম।

—কী দেখলি? কটাক্ষই শুধু, না আর কিছু?

—সযত্নে প্রসাধন করা মুখে শোভা পাচ্ছে দুটো বন্দুকের নল। ডি বি বি এল যাকে বলে। ডাবল ব্যারেল ব্রিচ লোডিং।

—হায় হায়। আমি হলে তখনই নল দুটোর সামনে এই বুভুক্ষু বুকখানা সটান খুলে দিতাম। তা নসিবে

তো সে সুখ নেই।

সরল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার তার পালা। সে বলল, শিবেরও অসাধ্য সে সুখ আমাদের দেওয়া।

গোপী ক্ষেপে গেল, কেন, কেন? শিবঠাকুর নিজে তো তপস্যা পর্যন্ত ভেঙে উমার শ্রীচরণে নিজেকে উৎসর্গ করে ফেললেন। আর আমাদের বেলা শুধু বিলাপ? অবশ্য বিলাপ করতেও রাজি আছি, তার আগে মদনের দয়া যদি ছিটেফোঁটা পাই।

সরল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কোথায় পাবি মদনের দয়া? পুষ্পধনুর পথ এই বাঙালি পট্টীতে এই চল্লিশের দশকে কোথায় খোলা পাবি বল্? যদি বা খোলা থাকে অলিখিত বাধাতে ভরা সে পথ। মেঠো চোরকাঁটার মতো ছেয়ে আছে।

এতক্ষণে স্বয়ম্ হেসে ফেলল, অবশ্য আমাদের প্রভুদের দেশে ওরা মেঠো চোরকাঁটায় ঘাবড়ায় না।

—অ্যাঁ, তুই জানলি কী করে? তোদের ট্রেনিং ক্যাম্পেই বুঝি...?

—না রে, না। ওদেশে স্পাইরা কী করে গোপন খবর বের করে আনে, কী করে চালাকি না বুঝে মিলিটারিরা খবর ফাঁস করে দেয় তার ছবিতে দেখিয়েছে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড হীথের লীলাভূমি। ভাগিস বাঙালি ছোকরারা সে সব ছবি দেখেনি।

মাথা নেড়ে সরল বলল, দেখলে ভালোই হত রে, ভাই। এই পোড়া দেশের ন্যাড়া মাঠে শুধু বেলতলাই সার।

একটু কেশে সে আবার শুরু করল, তা শ্যাম, তোর সেই স্যানস্ক্রিট মার্কা সুন্দরীকে 'হলা পিয়সহি' বলে গলাগলি করে নিয়েছিস আশা করি।

স্বয়ম্ হালকা ভাবে বলল, ওদের বৃন্দাবনের গোচারণভূমি খুব ছড়ানো জায়গা। পাড়ার মধ্যে খুঁটির রশিতে বাঁধা গরুর মতো ওদের অবস্থা নয়। কাজেই স্যানস্ক্রিট সুন্দরীর দিকে নজির দেওয়া ঠিক হত না।

হেসে সে বলল, অবশ্য ওকে ঘায়েল করলাম ওরই প্রশ্ন দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি যখন স্যানস্ক্রিটের কথা তুললেন, জানেন কি যে আমাদের প্রথম মহাকাব্য রামায়ণে বলেছে যে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী? সেই জন্মভূমির রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে আমার ধর্মই শিখিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক খাঁটি ইন্ডিয়ানের উচিত যুদ্ধ করতে শেখা।

একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল দুই বন্ধু। সাবাস। বন্দুকের গরম নল কেমন নরম হয়ে গেল। তারপর?

—নরম হয়ে সে এক ভারী ওজনের হোঁৎকা কর্নেলের দিকে তাকাল।

—অ্যাঁ, তোর দিকে নয়?

—না। বলেছি তো কাজের বেলা ওদের রসকষ থাকে না। কড়ায় গণ্ডায় ডিউটি পুষিয়ে দেয়। তায় দেশরক্ষা করতে বিদেশে এসেছে।

—এবার কর্নেলের কাহিনি বল্।

—ঝানু কর্নেল এতক্ষণ যেন রাইফেল তাক করেছিল আমার দিকে। বুলেটের মতো হেঁকে বলল যে তোমাদের বেঙ্গলে এত চালের অভাব, এত অশান্তি। তবু সেখানে মিলিটারি 'বেস' ঘাঁটি বসানো হয়েছে এটা কি তুমি ভালো মনে করো? এমন সব কাজ তোমায় করতে হতে পারে সেখানেই, তোমার কলকাতাতেই, যা করতে তোমার মন চাইবে না। তুমি তখন কী করবে?

—এমন সব প্রশ্ন? একেবারে হিটিং বিলো দি বেল্ট?

—না, সোজা ফ্রন্ট্যাল অ্যাটাক। সোজাসুজি খোলাখুলি প্রশ্ন করাই ঠিক এসব ব্যাপারে। আমি বেশ টান টান করে ঘাড় তুলে বলেছিলাম যে আপনারা যখন জানেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, তখন আপনারা এটাও বুঝবেন যে আমি শাস্ত্র মেনে চলি। আমাদের রামায়ণে আছে যে প্রজারক্ষণের জন্য নিষ্ঠুর হওয়াও চলে। এটাই সনাতন কর্তব্য। কর্তব্যং রক্ষতা সদা। গোটা শ্লোকখানার অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলাম।

—অ্যাঁ—তুই বললি একথা? তার মানে ওরা যে যুদ্ধ চালাবার জন্য সব খাবার কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, শত্রুকে বঞ্চিত করবার জন্য আমাদেরও ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা নষ্ট করে দিচ্ছে সে সব সমর্থন করবার মতো মাল মশলা তুই ওদের হাতে তুলে দিচ্ছিস? এই তোর ধর্ম?

—না, আমাদের ধর্ম আমাদের দেশ আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করা। নির্বির্য নিঃসহায় লোকেরা সে

ধর্ম পালন করতে পারে না। আমরা নিজেদের স্বাধীনতার যুগের শাস্ত্র ভুলে গেছি বলেই আজ এই অবস্থা।

একটু চুপ করে থেকে স্বয়ম্ আবার বলল, ভুল বুঝিস না তোরা। আমি কেবল রাইস সোলজার হবার মতলবে যুদ্ধে যোগ দিইনি। ভেবে দেখ্ শাস্ত্রের বাণী—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। মনে করো স্বামীজীর বাণী—খালি পেটে ধর্ম হয় না। ম্যায় ভুখা হুঁ কোন্ ধর্মের মন্ত্র? না খেয়ে না খেটে বসে শুয়ে মরা কোন্ ধর্ম?

—তা বলে তুই ইংরেজের দোষ ঢাকবি? গুণ গাইবি?

—ইংরেজের নুন তোরা খাচ্ছিস না? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি তোরা ইংরেজকে ভবিষ্যতে হঠাবার বা জাপানিকে বর্তমানে রুখবার কোনও বিদ্যা অর্জন করছিস? বরং আমি যা শিখেছি তা—যদি বেঁচে ফিরে আসি...

বলতে বলতে স্বয়ম্ দেখল যে বন্ধু দুজনেরই মুখ ম্লান হয়ে এসেছে।

তাই সে মৃদুভাবে বলল, যদি বেঁচে ফিরে আসি আমি আর্মিতেই থাকব। আরও বাঙালি যাতে যুদ্ধবিদ্যা শেখে, অন্তত অবাঙালির উপর বাংলা দেশ রক্ষার ভার সঁপে দিয়ে নিজেরা গলিতে গলাবাজি আর রকে রকবাজি না করে সেই ব্রত নেব। তখন তোরা আমার পাশে এসে দাঁড়াবি? আমার পলিটিক্স নেই। কিন্তু আমার দেশ আর আমি আছি।

ঘরের আবহাওয়া বড় ভারী হয়ে উঠল। এটার জন্য স্বয়ম্ ছুটতে ছুটতে বন্ধুদের কাছে আসেনি। আজ সে একটি বড় কাজ পেয়েছে। আজ তার ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত তেমনি অসীম। তাকেই হাওয়াটা হালকা করে বন্ধুদের হাসিমুখ দেখে যেতে হবে।

তা না হলে মিলিটারি জীবনে সে কি ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে? মিলিটারি সেজে কী সামাজিক গুণ শিখেছে?

তাই স্বয়ম্ সকালে খাওয়া খালি চায়ের কাপ দুটোর দিকে তাকিয়ে বলল, তখন কিন্তু শুধু চায়ে চলবে না। আমরা সবাই ফ্লাইং টাইগার হয়ে যাব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেশে আমরা হব উড়ন্ত বাঘের দল। হাসিতে হৈ-হল্লাতে জীবন উপচিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে—যেমন দেখেছি বর্মা ফেরত 'এ ভি ডি' আমেরিকান ভলান্টিয়ার গ্রুপ পাইলটদের।

গোপী বলল, আমরাও হঠাৎ এমন একটা উড়ুক্কু এয়ারম্যানের ঝাঁক দেখেছিলাম চৌরঙ্গিতে। যেন সদ্য কোনও হলিউডের সেট থেকে নেমে এসেছে। গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, জিপ ফ্যাসনার লাগানো। হরেক রঙের হাওয়াই হাওয়া শার্ট। পায়ের গুলি পর্যন্ত উঁচু বুট। গলায় চকরা-বকরা রংদার রুমাল বাঁধা। ওরাই বোধহয়?

—বাঃ! তোর তো দেখছি দিব্যি জ্ঞাননেত্র খুলে গিয়েছে। রতনদের ঠিক চিনে নিয়েছিস। তোর হবে। দেখিস ঠিক হবে।

স্বয়মের মুখে রহস্যের আভাস দেখে সরল বলল, কেন, আরও কিছু আছে নাকি?

—আছে বলে আছে? আঁটসাঁট হিপ পকেটে আছে বুর্বন মদের চ্যাপটা ফ্লাস্ক আর দিল নামক খোলামেলা দরিয়াতে ফুর্তির লাল ডিঙা। আর, আর নয়ন ভরিয়া হেরে নেশা।

—তার মানে?

—মানে বোঝা সবার কর্ম নয়। ওরা অনেকেই চোখ বুজে নিট ড্রিঙ্ক করে। বলে যে খাঁটি জিনিস জলো করলেই ভেজাল হয়ে যাবে।

—কেন? সোডা?

—সোডাও জলই হল। ওরা বলে যে গ্লাসের দিকে তাকালেই জিভে জল এসে যায়। তাই জল মিশিয়ে ভেজাল না করে খাঁটি খাওয়াই ভালো।

—সাবাস।

—আরও আছে। চোখ বুজে ওরা দিব্যচোখে দেখতে পায় যে ওরা সব মোল্লা পুরুত আর পাদ্রির চেয়ে অনেক অনেক আগে স্বর্গারোহণ করতে পারবে। কারণ ওই সব মহাত্মাদের চেয়ে ওদের পুণ্যের জোর বেশি।

—এত সব দুষ্কর্মের পরেও?

—ওরে, তোরা শুধু দুষ্কর্মই দেখছিস। কিন্তু এরা যে ওনাদের চেয়ে অনেক বেশি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে। বুঝলি কিছু?

—ওদের বোমাবাজির সংকীর্তনের ঠেলায়।

—ওদের তাহলে কোনও দুঃখ ভাবনাই নেই বল্।

—ছিল প্রথম প্রথম। রেঙ্গুনে এসে লড়াইয়ের কোনও মোকা মিলল না। জাপানি জিরো ফাইটারের বদলে মশার এয়ার স্কোয়াড্রন আর আরশোলা ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার। অবশ্য অন্য দিকে ওরা পুষিয়ে নিয়েছিল।

—ওহো-- সেটাই তো আসল খবর। বল্ না খুলে।

—ওদের রোজনামচা শুরু হত বরফে ঢাকা বিয়ার দিয়ে সকাল নটায় আর শেষ হত মাঝরাতের পর জ্যাম আর ডিম দিয়ে। তার আগে তরোয়ালের ধারের মতো তেজী পিংক জিন আর কারী।

—আমেরিকান কিনা।

—শুধু তা বললেই চলবে না। ওরা তো শুধু লক্কা পায়রা 'প্লে বয়' নয়। ওদের টোমাহক বিমানগুলোর নাকে আঁকা থাকে হাঙরের লালমুখ ঝকঝকে দাঁতের সারি আর তীক্ষ্ণ চোখ। আর প্লেনের বডিতে আঁকা উদ্ধত ঘাড় আর উদ্যত দাঁত দেখানো বেঙ্গল টাইগার। তার পাশে দুটো পাখনা আঁকা—যেন ভি ফর ভিকটরি। কিন্তু মনে রেখো, কত সম্মান বাংলা দেশের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। মহীয়সী নেত্রী ম্যাডাম চ্যাঙ্ক-কাই শেক বলেন—ওদের ডানা থাকুক আর নাই থাকুক, ওরাই আমার দেবদূত।

একটু চুপ করে থেকে স্বয়ম্ আবার বলল, ভেবে দেখ্ ভাই, বেঙ্গল টাইগার।

বেঙ্গল টাইগার!

ওদের তিনজনেরই মনে কথা দুটো অদ্ভুত ঝংকার তুলল। অনেক আলোড়ন। একসঙ্গে ওরা তিনজনেই স্বপ্ন দেখত মানুষের মতো মানুষ হবে। তার বদলে দুজন হল গিয়ে কেরানি। দিনগত পাপক্ষয় করে দেহকে বাঁচাবে থোড়বড়ি খাড়া দিয়ে—দেহরক্ষা না করা পর্যন্ত।

আর তৃতীয়জন অনির্দিষ্ট অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পাপক্ষয়ের গ্লানি এড়াতে গিয়ে। হয়তো ও একদিন বেঙ্গল টাইগার হয়ে বেরিয়ে আসবে মাথা উঁচু করে।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল ঘোর জঙ্গলে পরিণত হতে চলেছে। সে জঙ্গলে শকুনি আর হায়েনা শিকার করে বেড়াচ্ছে। ভালুকরা নাচছে। গণ্ডাররা গা বাঁচিয়ে সরে যাচ্ছে। কিন্তু টাইগার কোথায়?

—সে তো শুধু স্বপ্ন।

দুই বন্ধুই পরস্পরের অজান্তে বলে উঠল, সে তো শুধু স্বপ্ন। যে স্বপ্ন যুদ্ধের বন্যায় নৌকাডুবি হয়ে গেছে। সে ডুবে যাওয়া নৌকো আর উদ্ধাব হবে না।

স্বয়ম্ বলল, না, উদ্ধার করতেই হবে। বিশ্বাস বাখ্ তোরা নিজেদের ওপর। স্বপ্নগুলো নিজে থেকেই নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসে।

—আশ্চর্য! শ্যাম, তুই এখনও কত ছেলেমানুষ আছিস।

—তোদেরও তাই থাকতে হবে, ভাই। সবসময় মনে রাখিস মরণ সর্বদাই খুব তাড়াতাড়ি হাজির হয়। এমন কি নব্বই বছর বয়সেও যখন আসে তখনও। তাই তোরা ছেলেমানুষ থাকবার সাধনা কর্ মনে মনে।

সরলের হঠাৎ মনে হল যে বন্ধুকে একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত। আজ নতুন চাকরিতে ঢুকে সাহেবসুবোদের সঙ্গে তালে তাল ঠুকে সে চলেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে বেঁচে ফিরে এলেও পুনর্মূষিক হতে হবে। এমার্জেন্সি কমিশন তো স্থায়ী নয়। যুদ্ধও স্থায়ী নয়।

কিন্তু এই নতুন উচ্ছ্বাসের মুখে সে কথাটা উল্লেখ করবে কোন্ মুখে?

শেষ পর্যন্ত সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবি কিপলিং থেকে একটা কবিতা আওড়াল। বলল, মনে আছে সেই কবিতাটা?

ওরে ফলনা টমি তসকা টমি;
নিকালো উসকো জন্তু।
দেশের রক্ষাকর্তা ও সে
লড়াই বাধলে কিন্তু।

আজ কর্তারা তোদের মাথায় তুলে রাখছে, কিন্তু ওরা নিজেদের জাতভাই সাদা টমিগুলোকে পর্যন্ত কী চোখে দেখে এই কবিতাই তার প্রমাণ। কাজেই যা মাইনে দেবে আর যে সব কর্তাব্যক্তির সঙ্গে চেনা পরিচয় হবে সে সব ঠিক করে রাখিস। আখেরে কাজে লাগবে।

স্বয়ম্ বলল, সে কথা ঠিক বলেছিস ভাই। টমিরাও আমারই মতো বেকার থাকত বলেই সৈন্য হত। প্রাথমিক ট্রেনিং-এর পর বছর ছয়েক বিদেশে থাকত। হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠানদের ছুরি বা গুলি থেকে গা বাঁচিয়ে চলা আর ভাগ্যবান হলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বা মিলিটারি রাম মদে সাঁতার কাটা। সারা দিনরাত্রি প্যারেড আর খানাপিনা, বিউগিলের মিঠে আওয়াজে ঘুম আর সস্তা বিয়ারে আরামে কেটে যেত। তবে এখন আর ঠিক সে আর্মি নেই। আমাদের সঙ্গে বহু শিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্য। ন্যাশনাল সার্ভিস করতে এসেছে। আমার ইন্টারভিয়্যুতে যে কর্নেল ছিল সে অক্সফোর্ডের পাস। আমি তরে যাবার পরে নিজে থেকে দেখা করতে এল। আর কী বলল জানিস? শুনে অবাক হয়ে যাবি।

ওরা দুজনেই আগ্রহ দেখাল।

—কর্নেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করতে এসেছে। সেই সাম্রাজ্য আমাদের দেশে যে তৈরি করল সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের ১৭৮৬ সালে লেখা গীতার ভূমিকা থেকে আমায় শুনিয়ে দিল যে ভারতের ব্রিটিশ রাজত্ব যখন বহুদিন শেষ হয়ে যাবে আর তার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উৎসাহ সবাই বেমালুম ভুলে যাবে তখনও ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিকর্তারা বেঁচে থাকবেন।

সে আমায় আরও বলল, আজকের ব্রিটিশ শাসন আর বেশিদিন নয়। কিন্তু তোমাদের চিরদিনের সম্পদগুলি গোলাগুলি আর সামরিক পোশাকের আড়ালে যেন ভুলে যেয়ো না।

এমন কথা এক আমার মা-ই আমায় বলতে পারতেন। আর কেউ নয়।

সরল বলল, আশ্চর্য তোর এই অভিজ্ঞতা, শ্যাম। তোর ভাগ্য ভালো। আমরা খুব সুখী। তবু, তবু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে থেকে যাচ্ছে। যে ইংরেজ আমাদের বুটের তলায় রেখেছে, দেশটা দেড়শ বছর ধরে লুঠ করেছে আর এখন ছারখার করে দিচ্ছে বলে গান্ধীজী...

—থাক, থাক। আমি সংক্ষেপে তার জবাব দিচ্ছি। তোরা নিজেরাও সে উত্তর জানিস। কিন্তু মানিস না। বা মানতে সাহস নেই। গান্ধীজী বলেছেন যে অজানা শয়তানের চেয়ে জানা শয়তান ভালো। কিন্তু সেকথা কি ঠিক?

একটু থেমে সে আবার বলল, অজানা শয়তান যদি বেশি খারাপ নাও হয় তার নতুন উৎসাহে সাম্রাজ্য শাসনের ঠেলা এখনকার চেয়ে বেশি সাংঘাতিক হবে। স্বাধীনতা সংগ্রাম যতটা এগিয়েছে, ইংরেজ যতটা নরম হয়েছে আমাদের অবস্থা তার চেয়ে বেশি খারাপ হবেই—যদি নতুন প্রভু এসে গেড়ে বসে। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সে কী সাংঘাতিক সম্ভাবনা ভেবে দেখ্। তাছাড়া স্বামীজী কী বলেছিলেন তাও ভুলিস না।

ওরা দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

—স্বামীজী বলেছিলেন যে ইংলন্ডের মাটিতে তাঁর মতো এত ঘৃণা নিয়ে আর কেউ কখনও পা নামায়নি। অথচ তিনি ইংরেজকে যত ভালোবেসেছিলেন তেমন আর কেউ করেনি।

তিনি বলেছিলেন, ওরা সত্যিকারের ক্ষত্রিয় জাত। ক্রীতদাসের মনোভাব না জাগিয়ে হুকুম তামিল করানো, ডিসিপ্লিন শেখানোর রহস্য ওরা সমাধান করেছে। মহা স্বাধীনতার সঙ্গে মহা আইন মেনে চলা মিলিয়ে নিয়েছে। ওদের অন্তরের মধ্যে উনি আদর্শের বীজ বপনের যোগ্য ভূমি দেখেছিলেন।

তোরা দেখিস ওদের যে সব শিক্ষিত লোক এদেশে যুদ্ধের কল্যাণে এসেছে তারাই যুদ্ধের পরে আমাদের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দেবে।

দুই বন্ধুই স্বয়মের এই উচ্ছ্বাসে সায় দিতে ইতস্তত করল।

ওরা জানত যে স্বয়ম্‌ও ওদের চেয়ে কম স্বদেশী নয়। বরং একটু বেশিই। কলকাতা কংগ্রেসের সময় সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং ছিলেন তখন সে বালসেনা হয়ে কাজ করেছিল। এবং ওর স্বাদেশিকতার ভিত্তি অন্ধ দেশপ্রেমে নয়, চোখখোলা বাস্তব বুদ্ধিতে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অগাধ বিদ্যা দিয়ে দেশের স্বাধীন হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারণ দেখাতে পারে।

কিন্তু বন্ধুদের মনের দ্বিধা ওর নজর এড়ায়নি।

ও তাই বলল, তোরা জানিস না। আমি এত তরুণ ইংরেজ সেনার সঙ্গে মিশেছি। তারা যখন কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের বিরুদ্ধে জোর গলায় কথা বলে তখনও সঙ্গে সঙ্গে এদেশ শীঘ্রই স্বাধীন হওয়া উচিত সে কথাও স্বীকার করে। হোয়াইট ম্যান্স বার্ডেন, কালো লোক যে সাদা লোকের দায়দায়িত্ব সেকথা কোনও

তরুণ শিক্ষিত ইংরেজেকেই আমি বলতে শুনিনি রেজিমেন্টাল ব্যারাকে।

অবশ্য একথাও ঠিক যে অনেকেই মনে মনে সাম্রাজ্যবাদী। তারাও মুখে ওর সামনে সে ভাব প্রকাশ করবে না। ওদের সামনে এখন যুদ্ধ জেতাই সব চেয়ে বড় কথা। কাজেই এ দেশকে সঙ্গে আর হাতে রাখতে হবে ছলে বলে কৌশলে। মিষ্টি বুলি আর ভদ্র বোলে। যাদের ভিতরের মন খাঁটি নয় তারাও বাইরে ব্যবহারে মাটির মানুষ।

তবে স্বয়ম্‌ও সেকথা বোঝে আর ইতিহাসের আলোয় তা যাচাই করে নিয়েছে। প্রাচীন ঐতিহাসিক প্লুটার্কের মহৎ লোকদের জীবনীতে সে পড়েছে যে তিনি পুরুকে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বাহাদুরি দিয়েছেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করেছেন গ্রীকের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখে গ্রীককেই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য। সে কথা সে সব সময় মনে হয়েছে।

গোপী কী যেন ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল। স্বয়মের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

খুব নরম সুরে বলল, শ্যাম, সত্যি কথা বল্ তো? এই যুদ্ধে নাম লেখানো, তার জন্য এত সাফাই গাওয়া—এ কি শুধু অন্নচিন্তা? না কোনও কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা?

বলেই পাছে স্বয়ম্ ব্যথা পায় সেজন্য হেসে বলল, আরে দূর ছাই। আজকাল আবার ওরা কাঁকন পরেই না।

স্বয়ম্ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

অবস্থাটা সামলিয়ে নেবার জন্য গোপী আবার বলল, টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'-এ পড়েছি যে সেনাপতিরা মনে করে যে ওরাই যুদ্ধ জিতেছে। কিন্তু হয়তো সে জয়ের পিছনে আছে যুদ্ধে যাবার পথে সৈন্যদলকে ছুঁড়ে দেওয়া কোনও মিষ্টি মেয়ের মিঠে হাসি। সে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল। তাই...

স্বয়ম্ মনে মনে কৃতজ্ঞ হল যে গোপী ওকে স্বাতীর কথাটা এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ দিয়েছে।

সে বলল, এই কথাটা আমিও মিলিটারি মেসে বর্মা থেকে রক্ষা পাওয়া একজন ছোকরা অফিসারকে বলেছিলাম। তার ইউনিটও দারুণ লড়েছিল সেখানে। সে নিজে মিলিটারি ক্রশ পেয়েছে। কিন্তু সে বলেছিল যে ওসব স্রেফ কবিকল্পনা। ওর সবচেয়ে উজ্জ্বল ক্ষণটুকুর, মোস্ট শাইনিং আওয়ারের, পিছনে কোনও মিষ্টি মেয়ে ছিল না। ও ভুলেই গিয়েছিল মিষ্টি মেয়েরা কেমন দেখতে।

সরল কিন্তু অত গভীরে তলিয়ে দেখল না।

ফস করে বলে বসল, আচ্ছা, সত্যি বল্ তো, তুই কি তোদের পাশের বাড়ির মেমসাহেবের প্রেমে পড়ে ফৌজে মরতে গেলি না কি?

গোপী প্রাণপণে চোখের ইসারায় সরলকে চুপ করতে অনুরোধ করছিল। সেটা স্বয়মের নজর এড়ায়নি।

সে পরিহাস করে বলল, কল্পনাশক্তি তোর। এবার বোধহয় বলবি—মডার্ন তরুণী হইতে সাবধান। তারা প্রেমকে ভালোবাসে কিন্তু প্রেমাস্পদকে বিপদে ঠেলে দেয়। অতএব কেটে পড়, কেটে পড় বাছা।

গোপী হেসে বলল, তুই ফৌজে গিয়ে মৌজে মেতেছিস যেভাবে তাতে মনে হচ্ছে যে সঙ্গীনটাই তোর প্রেমের সঙ্গিনী। না হলে কী আর এত সাফাই গাইলি। তবে ভেবে দেখলাম যে সঙ্গীন আর সঙ্গিনী দুটিই বুকে চেপে ধরার ধন।

।। পনেরো ।।

সীমার হাতে নীরেন তুলে দিয়েছিল একটি রক্তগোলাপের স্তবক। রক্তিম আভায় তার মন ছিল ভরে।

এই বিশ্বযুদ্ধের বাজারে সেই ড্রয়িং রুমটাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সময়টাও ছিল রাত্রি। তবে মনের উচ্ছ্বাসে ঝলমল। আঁধার বা হতাশা যা ছিল তা শুধু শত্রু নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনে।

কলকাতায়। মালয়ে নয়। মনোভূমিতে সেই যুদ্ধ। বনভূমিতে নয়।

সেই মনোভূমিতে সীমাদের বাড়িতে মহাসমারোহ। সীমার জন্মদিন। বহু নিমন্ত্রিত। বিশেষ করে যারা পাত্র, একেবারে সুপাত্র হিসাবে গণ্য হতে পারে তারা অনেকেই এসেছে। তারা প্রায় সবাই নীরেন চৌধুরীর বন্ধু। এবং বন্ধু হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী বললেই ঠিক বলা হয়।

সীমার মতো মেয়েকে লাভ করার জন্য কলকাতায় যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে রেষারেষির অন্ত নেই।

অথচ মুখ ফুটে সে কথা বলতে ভদ্রতায় বাধবে। এত যোগ্য যুবকের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে যোগ্যতম বলে ভাবছে। সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা, বংশের কৌলীন্য, রোজগারের জোর, এটিকেটের চমক—সবকিছু অস্ত্রশস্ত্রই সীমাকে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা চলছিল।

হায় রে আজকালকার কাল। একেবারে ঘোর কলিকাল। না হলে সেই তো স্বয়ংবর প্রথা দিব্যি চালু রয়েছে। সীমা নিজে যাকে পছন্দ করবে, তাকে জামাই রূপে বরণ করতে ওর আধুনিক বাবা-মা এমন কিছু আপত্তি করবেন না।

যাদের ওরা তেমন সুপাত্র বলে মনে করবেন না, তারা তো আগে থেকেই ওদের বৈঠকখানা থেকে বাতিল। একেবারে সেই সংযুক্তার স্বয়ংবর সভার মতো। সেই সুযোগে অনেকগুলো যাকে বলে লোফার, অর্থাৎ লুফে ফেলে দেওয়ার মতো পাত্র, আগেভাগেই বাতিল হয়েছিল।

আজকের জন্মদিনের পার্টিতে যারা আমন্ত্রিত, তারা এতে খুশি।

অ-খুশি কেবল এজন্য যে পৃথ্বীরাজের মতো সীমাকে নিয়ে উধাও হয়ে যাবার একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

একেবারে জঙ্গী। থুড়ি, জঙ্গলি। চৌধুরীটা আবার হিটলারের কল্যাণে এমার্জেন্সি কমিশন পেয়ে অফিসার হয়ে ঢুকেছিল এবং দেখ-না-দেখ সদ্য সদ্য মেজর হয়ে গেছে। নরাধমকে কর্তারা আগে-ভাগে নরওয়েতে চালান করে দিলে বেশ হত।

তবে মাত্র মেজর। এবং মুরুব্বি নেই কেউ। তায় যুদ্ধটা বেশ জোরে বেধে উঠেছে। নরওয়ের বরফ আর আফ্রিকার মরুভূমি যে কোনও জায়গাতেই ওকে চালান করে দিতে পারে। তাহলে এই রাইফেলধারী রাইভ্যালটি বাতিল হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

সেদিনই সকালে সীমার মা আর বাবাতে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়ে গিয়েছিল।

মা মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, হ্যাঁ, খুব কম ইন্ডিয়ানই একাল পর্যন্ত মেজর হয়ে প্রমোশন পেয়েছে। মানলাম। কিন্তু মর্যাদা দিয়ে কি মেয়ে ধুয়ে খাবে? থাকবে কোনও মিলিটারি ওয়াইভ্স্ মেসে। সধবা হয়েও বিধবার মতো। না হলে উড়নচণ্ডীর মতো। মিলিটারির মাইনে কতটুকু? জিনিসপত্তরের কী আক্রা দাম হচ্ছে তার খবর রাখ?

বাবা শান্ত কণ্ঠে সবদিকটা যাচাই করে দেখছিলেন। আর্মি সাপ্লাই এত ভালো আর এত সস্তা যে মিলিটারিতে যারা কাজ করে, আজকাল লোকে তাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, তা ছুটছে বটে। কিন্তু ওটা তো ইংরেজদেরই চালাকি। দেশের সবাইকে আধপেটা রেখে মিলিটারিকে দুনোপেটা রাখার ব্যবস্থা। দুনো লাভ তাতে। ইংরেজ রাজের গুণগান আর মেশিনগান সমান তোড়ে চলবে।

—আহা, আর্মি রেশন আর আর্মি অ্যালাউয়েন্স তো পাকাপাকি ব্যবস্থা। চিরকালই চলবে। ওদের দেখাদেখি রেল প্রভৃতি সব জরুরি এসেনশিয়াল প্রতিষ্ঠানেও চালু হচ্ছে র‍্যাশন, সস্তা দাম ইত্যাদি। কাজেই মাইনে দিয়ে নীরেনের ওজন করলে পুরো ঠিক হবে না। পশ্চিমে তো রাশিয়াও এখন ইংরেজের পক্ষে। কাজেই ওদিকটা ওরা সামলে নেবে। সে-অবস্থায় পূর্বেও আর কোনও গণ্ডগোল পাকাবে বলে মনে হয় না। নীরেন দেশেই থেকে যাবে—যা দেখছি। হয়তো কোনও ভালো ক্যান্টনমেন্ট বা চাই কী হিল স্টেশনে।

—হ্যাঁ হিল স্টেশনে। যেখানে মিলিটারি মেসে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় কে কার বৌয়ের সঙ্গে রাত কাটায়। ছ্যাঃ!

মা অনেক বেশি রিয়েলিস্ট। এসব ব্যাপারে বিশেষ করে। যেখানে মেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত, সেখানে সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই তিনি সিদ্ধান্ত করবেন।

স্যান্ডহার্স্টের রয়্যাল মিলিটারি কলেজের ছাপমারা মিলিটারির অফিসাররা যে ইংরেজ জঙ্গীদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আর তাদের তালে তালে মার্চ করে ভারতীয়রাও যে ক্রমে ক্রমে এই জাতে উন্নতি পাবে সে ভরসা তিনি রাখেন। সেজন্যেই নীরেনকে প্রথম থেকেই বাতিল করেননি। হাতে রেখেছেন।

কেবল এই যুদ্ধটা ছড়িয়ে পড়েই ওঁর সব হিসাব গোলমাল করে দিচ্ছে।

তাই উনি অনেক খোঁজখবর নিয়েছেন। বইয়ে পড়েছেন কেমন করে পঁচিশ বছর আগে বিলেতে সবাই মুখ বুজে ঠোঁট চেপে জপ করত যে যুদ্ধটা কোনও রকমে চালিয়ে যেতে হবে। মনে প্রাণে ঘৃণা করত যুদ্ধকে। অথচ যুদ্ধ না করে উপায়ও ছিল না। সব কটি ছেলে বেঁচে আছে এমন ঘর বিলেতে ফ্রান্সে জার্মানিতে মেলা

শক্ত ছিল।

অথচ পেট্রিয়টিজমের এমন মাদকতা ভরা নেশা জন্মিয়ে গিয়েছিল যে যাদের তেমন ভালো ভাগ্য ছিল তারা অন্যের সামনে লজ্জাই পেত। ভাগ্য ভেঙে যাওয়াটা গৌরবের জিনিস বলে বীরের জাত মেনে নিতে শিখেছিল। এবং মুখে প্রচার করত।

তোমার কোনও ছেলে যুদ্ধে যায়নি? যায়নি ফ্রন্টে? মারা যায়নি? মা গো।

প্রথম প্রথম যুদ্ধের মধ্যে বীরত্ব আর মৃত্যুর মধ্যে মহিমা খুঁজে পেত সবাই। যাদের শোকে সান্ত্বনা দিতে হবে, মনে জোর দিতে হবে তাদের কাছে স্বদেশ আর স্বাধীনতার বড় বড় গৎ আওড়ানো যেত। কিন্তু শেষের দিকে আর সহানুভূতিতে কুলোত না।

সীমার মা তাই মনে করিয়ে দিলেন, আর আমাদের বাছারা যে সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে তাতে স্বদেশই বা কোথায়? আর কোথায় বা স্বাধীনতা?

মোট কথা যে কোনও দিক দেখা যাক না কেন নীরেন চৌধুরী আজকের দিনে পরিচিত হিসাবে ভালো, কিন্তু পাত্র হিসাবে বাতিল।

আরও জোর দিয়ে তিনি বললেন, মেয়েকে মনে করিয়ে দাও যে ইংরেজের ছাতার তলায়, সাদা ছাতার তলায় ওই ঝকমকে পোশাক বেশ স্মার্ট, বেশ চটকদার। কিন্তু জার্মান ঈগলের ছোঁ অথবা পরে জাপানি সূর্যের তেজ থেকে সে ছাতা হয়তো এই পোশাককে বাঁচাতে পারবে না। মনে করিয়ে দাও।

মনে করিয়ে দিয়েছিল এই পার্টির অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও।

বড় অ্যাটর্নি অফিসের ছোট পার্টনার সুবীর কম তুখোড় নয়। নীরেনের মিলিটারি ইউনিফর্মে ঢাকা সুঠাম দেহের সঙ্গে পাল্লায় নিজে অনেকখানি পিছিয়ে আছে সেটা সে হাড়ে হাড়ে বুঝত। সে জন্যই সে নীরেনের নাম দিয়েছিল নীরো।

সুবীর বলত যে মানুষের পরিচয় কাজে, না হয় তার মর্গেজে। নীরো বন্দুক চালায়নি, বন্ধকও দেয়নি। তবে কী করছে সে?

সুবীর বলেছিল, ব্রাদার আমার একমাত্র ছেলে বাপ-মায়ের। তবু সাধ হয়েছিল হতে হিরো। আরে বাবা, আফ্রিকা মরুতে হঠাৎ হিটলারি হামলায় ওই ইউনিফর্ম ছেড়েছুড়ে চোঁ-চোঁ দৌড়াতে হবে বলে রাখলাম। হতে চান হিরো, কিন্তু হবেন জিরো। নীরেন দি হিরো, এক কথায় নীরো। হিপ হিপ হুররে।

পুরুষানুক্রমে খাস কলকাতার বাসিন্দা বড়লোকের দুলাল সুশোভনও প্রার্থী। সেও উল্লাসে হিপহিপ হুররে, থ্রি চিয়ার্স ফর নীরো বলে চেঁচিয়ে উঠল।

সবাই তাতে যোগ দিয়ে হো হো করে হেসে নিল।

দূর থেকে নীরেনকে আসতে দেখেই সে আরও টিপ্পনি কাটল, ওই যে আসছেন আমাদের মেজর। একেবারে প্রেমে জরজর। তাই আর্মি থেকে ওকে প্রমোশন দিয়েছে মেজর।

সুবীর দূর থেকেই নীরেনকে দেখে বলে উঠল, আরে ব্রাদার, এ যে একেবারে স্ক্যান্ডাল হয়ে গেল।

সুশোভন প্রতিবাদ করল, না, মোটেই স্ক্যান্ডাল নয়। একেবারে গসিপ। মিলিটারি মহলের চালু মশকরা।

ইংরেজির অধ্যাপক তমালকান্তি সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছে হিটলারি হাওয়াই হামলার ধাক্কায় এসেই বিলেতি তরুণীদের বিকল্প খুঁজে পাওয়ার জন্য বিবাহযোগ্যা তরুণীদের সার্কিটে নাম লিখিয়েছে।

এ ছাড়া তো এ ছাই দেশে আর কোনও ওপেনিং নেই। একমাত্র ওপেন সিস্টেম হচ্ছে বিয়ের সম্ভাবনা, গাজরের মতো সামনে ঝুলিয়ে মেয়ে মহলে এগিয়ে যাওয়া।

সেই তমালকান্তি ফোড়ন কাটল, ও দুই-ই দিকে। গসিপ হচ্ছে জনপ্রবাদ। লোকের মুখে মুখে ফেরে। ওটাতে একটু রংয়ের ছোপ লাগালেই হয়ে ওঠে স্ক্যান্ডাল। ওই দেখ না, মেজরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

হাঃ। হাঃ। সেই লাল হওয়াটাই স্ক্যান্ডাল। উনি জঙ্গী কিনা। শত্রু সৈন্য দেখছেন স্বপ্নে।

তা---ও-ই যুদ্ধটা করুক গিয়ে সত্যি সত্যি! আর এই যুদ্ধটা স্বপ্নের মধ্যে সেরে সরে পড়লেই সব দিক দিয়ে ভালো মানাবে।

সুশোভনের এই মন্তব্যে খুশি হল তমাল। সে বলল, মেজরের উচিত শুধু সেই সব মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করা যারা পোশাক নিয়েই ইশাক করে। থুড়ি, সাজগোজের সঙ্গে প্রেমে মজে আছে।

—সর্বনাশ ব্রাদার, এমন সব সুন্দরীর মেলায় নিশ্চয়ই তুমি বিলেতে অনেক ঘুরেছ। তোমার সঙ্গে

পাল্লা দিতে গেলে দেখছি আমায় ছুটতে হবে 'রাম ফ্লিপ' পান করবার জন্য। গঙ্গাজলে তৈরি চা পান করলে তো পেরে উঠব না।

সুশোভন 'রাম ফ্লিপে'র রহস্যটা জানতে চাইল।

তমাল খুব মুরুব্বিয়ানা করে বলল, রেসিপি অর্থাৎ অনুপানটা আমার পেটেন্ট করা। এতে রামের সঙ্গে চিনি আর দুধ মেশাতে হয়। চিনি দেয় তাকত, এনার্জি আর দুধ দেয় বল, হিম্মৎ। বাকি রইল তোমার কিসমত।

—সেটা তো জানা কথা, রাম তবে দেয় কী বস্তু?

—রাম দেয় প্রেরণা। ওই উৎসাহ আর শক্তি নিয়ে কোন্ কাজে লাগাতে হবে তার হদিস।

বটে। তাহলে 'রাম ফ্লিপ' খেয়ে এই রামচন্দ্রটিকে একটু কড়কে দিয়ে বনবাসে ঠেলে দেওয়া যাক।

—অবশ্য, অবশ্য। তা ভায়া, তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে খুব তাড়াতাড়ি।

সুশোভন মদের ধারকাছ দিয়ে যায়নি কখনও। তাই বলল, কিন্তু শুনেছি ড্রিঙ্ক করলে আয়ু কমে যায়।

—লোকসান কী। ড্রিঙ্ক করলে যে একই সময়ের মধ্যে দ্বিগুণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আপনার দিব্যদৃষ্টি এইমাত্র শুধু ড্রিঙ্কের নামেই খুলে গেল।

সুবীর বলল, আমাদের প্রফেসার হচ্ছে সত্যিকারের দার্শনিক।

—তার মানে?

—মানে খুব সহজ। যে সবগুলি সমস্যারই সমাধান জানে অথচ সমস্যাগুলি যে কী তা-ই জানে না সে হচ্ছে দার্শনিক। প্রফেসার জানেই না যে আমাদের সমস্যাটা কী।

—কেন? কে না জানে যে সমস্যা হচ্ছে আমাদের ড্রয়িংরুম নীরো। ওর হাতে যা সাজবে ভালো তা বন্দুক নয়, বেহালা।

—বেহালা নয় ব্রাদার, ব্যায়লা ভাঙা ব্যায়লা। সেই জন্যই তো ভেবেচিন্তে নাম দিয়েছিলাম নীরো। রোমের রাজা নীরো আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ব্যায়লা বাজাতে বসেছিল।

নীরেন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। তার দীর্ঘ সবল দেহ আজ ইউনিফর্মে আরও বেশি চোস্ত দেখাচ্ছে। তার মধ্যে উচ্চতা আছে, কিন্তু উদ্ধত নয়! সংযম আছে সচেতনতা নেই।

সীমার মা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। অন্যান্য যুবকদের মতো কথাবার্তায় মুখর বা বংশে সম্পদে অগ্রসর নয়, তবু ভালো ছেলে।

আর্মিতে এখন ভারতীয় অফিসারদের পার্সেন্টেজ মাত্র সতেরো। কিন্তু ক্রমে বাড়তে বাধ্য। কেবল এই যুদ্ধটাই বাগড়া দিয়েছে। পদবৃদ্ধি হবে, কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি যে অনেক বেশি। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও দেশেই যে ওকে রাখবে তার ভরসা কী?

অতএব কুশল প্রশ্ন করার পরই মা সোজাসুজি যুদ্ধের কথা তুললেন। এদেশ থেকে অনেক সৈন্য শুনছি আফ্রিকায় চালান যাচ্ছে। তবে ইন্ডিয়ায় কোনও আক্রমণ হবে না। তা বাবা, তুমি তো এদেশেই পাকাপাকি পোস্টেড থাকবে? দিল্লিতে? সাউথ ব্লকে?

মায়ের উৎকণ্ঠা খুব প্রকট হয়ে উঠল।

একটু চুপ করে থেকে, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে নীরেন বলল সেই কথাটাই জানাতে এসেছিলাম। হঠাৎ...কালই...

একবার দূরে অন্য কোথায় দাঁড়ানো সীমার দিকে সে তাকাল। সীমার সঙ্গে ওর কয়েকটি বান্ধবী কথা কইছিল। ওর দিকে তাকিয়ে যেন ওকেই জানাচ্ছে এমন ভাবে বলল, কালই আমায় রওনা হয়ে যেতে হবে। এমার্জেন্সি অর্ডার।

অ্যাঁ! সীমার মা একবার দূরে মেয়ের দিকে তাকালেন। আজকের সন্ধ্যাটা বড় লম্বা ঠেকছে। তাড়াতাড়ি রাত হয়ে গেলে বাঁচা যায়। পার্টিটা চটপট ভাঙতে শুরু হলেই যেন ভালো হয়।

ঘড়িগুলো বড় বেয়াড়া। কাঁটাগুলো কারও সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকায় না।

ঘরে সাজানো রয়েছে জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেওয়া ছোট ছোট সুন্দর উপহার। নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবীরা সবাই প্রথমে সীমাকে তাদের উপহার হাতে তুলে দিয়ে এসেছে। কিন্তু নীরেন কি সীমাকে দেবে শুধু দুটি ব্যাকুল চোখের নীরব দৃষ্টি? ওর হাতে ফিনফিনে কাগজে মোড়া রক্তগোলাপের স্তবকটা নিয়ে এগোতে

পারছে না কেন?

ওর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক তমালকান্তির চোখ এড়াল না। খাস কালিদাসের কাব্যে এ হেন দোলায়মান মনের বর্ণনা ওর মনে পড়ল। কিন্তু সেই উপমা তুলে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা বাড়াবে না। হালকা ঠাট্টায় প্রেমের গুরুত্বকে তুলো ধোনা করে উড়িয়ে দিতে হবে।

চোখ ঠেরে সে বন্ধুদের বলল, দেখেছ, দেখেছ মেজরের জড়সড় ভাব। ঘড়ির চেয়ে বেশি তড়িঘড়ি প্রেমিকরা প্রেমিকার দিকে দৌড়োয়। আর উনি ভাবছেন যে উনি যখন প্রেমে পড়লেন ঘড়িই তখন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এগোচ্ছেন না।

সুবীর ছাড়ল না। সে-ও তো বীর বটে।

ব্রাদার সুশোভনকে কানে কানে বলল, আমাদের প্রেমে জরজর মেজর এখনই জড়সড়। অবশ্য খরচার বেলায় দেখ না, বিয়ের আগে দিচ্ছে শুধু ফুল। অর্থাৎ পরে দেবে শুধু কাঁটা। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, হে ব্রাদার। দিব্যচক্ষে।

দু চোখ কপালে তুলে চাদরটা ঘাড়ে ভালো করে চাপিয়ে নিয়ে সুশোভন বলল, কেন ব্রাদার, এমন আর কী সর্বনাশ হবে?

—হবে না? ওই চরিত্রবান জঙ্গী একেবারে জঙ্গলী। সিগারেটটা পর্যন্ত খায় না। নেহাত খরচার ভয়ে। ওরকম লোকের বিয়ে করা মানেই সর্বনাশ। সিগারেটের মতই ডিমর‍্যালাইজিং। প্লাস অঢেল খরচান্তের ব্যাপার।

সবাই সীমার প্রতি দরদে বিগলিত হয়ে গেল। সত্যই সীমা ওদের প্রতি অবিচার করে নিজেরই বিপদ ডেকে আনছে।

তমাল বলল, সত্যিই তো। মেজর যে ডুবেছে তা তো জানি।

একটু থেমে সে নিজেই প্রশ্ন করল, কখন ব্যাচিলাররা ডোবে? যখন প্রেম সায়রে ঝাঁপ দিতে শেখে। কিন্তু মেজর আবার হুঁশিয়ার আদমী। তাই হাতে করে এনেছে শুধু ফুল। দুটো মিষ্টি কথা ছাড়া আর কিছু দিতে গেলেই যেন দেউলে হয়ে যাবে।

এদিকে ততক্ষণে নীরেন সীমার কাছে এসে পৌঁছেছে। দুয়েকটি সম্ভাষণের পর বান্ধবীরা এদিক-ওদিক সরে পড়ল। পার্টিতে তরুণ বন্ধুরা যখন উপহার নিয়ে সীমার সামনে দাঁড়াবে, তখন হয়তো একটু অন্তরঙ্গ কোনও কথা বলবে, সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই সুবিবেচনা।

নীরেন ধীরে ধীরে গোলাপ স্তবকের মোড়ক খুলে টকটকে লাল ফুলগুলি সীমার হাতে তুলে দিল। আসন্ন শীতে মুকুলিত ফুলের উষ্ণ সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল ওকে ঘিরে। একটা অদৃশ্য, মৃদু অনুভব যেন একটি অবগুণ্ঠন রচনা করে দিল।

নীরেন ওর মুখের দিকে তাকাল। ওর হাতেব দিকে। ওর মাথার সিঁথির দিকে।

নীরেনের ভীরু চাহনি আজ ভরে উঠেছে সাহসে, বিশ্বাসে. বলিষ্ঠতায়। মুখ যেন হয়ে উঠতে চাইছে মুখর। অধরেতে লাজুক ভাব আর ধরে রাখতে পারছে না। বার বার সে তাকাচ্ছে সীমার সিঁথির দিকে।

সীমা অবশেষে জিজ্ঞেস করল. কী হয়েছে বলো তো? আমার চুলে কিছু গোলমাল দেখছ না কি?

—না। তোমার সিঁথিতে দেখছি আমার পথ; আশা ছিল একদিন সেখানে তুমি আমার জন্য রাঙা রেখা রচনা করবে। তাই তো আজ এনেছিলাম রক্তগোলাপ।

বিব্রত হয়ে সীমা মৃদু স্বরে বলল, তুমি কেন খালি খালি রক্ত আব রাঙা এ সব কথা মনে আনছ। আমি তো জানি শীঘ্রই এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আর তুমিও স্বাভাবিক ভাবে ফিরে আসবে। তখন দেখা যাবে।

ধীর কিন্তু দৃঢ় স্বরে নীরেন বলল, না, অত সহজে শেষ হবে বলে মনে হয় না। আর এদেশে যা তোড়জোড় চলছে তাতে পরিষ্কার যে আরও অনেক ছড়িয়ে পড়বে এই যুদ্ধ। যাই হোক, অনেকদিন যুদ্ধ চললে বোধ হয় আমার কোনও আশা থাকবে না।

অসহায়ভাবে সীমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

নিজের মন আর নিজের মা একইভাবে দেখছে না এই ব্যাপারটাকে।

এবং নিজেই যে ঠিক মানুষটি বেছে নিতে পেরেছে সে সিদ্ধান্তও পুরোপুরি হয়নি এখনও।

এ যুগের মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। অথচ বাপ-মাও তাদের দায় সম পরিমাণে কমে গেছে

বলে মনে করে না। তারই ফলে আসে কিছু সংঘাত, কিছু সংশয়।

কিন্তু বিফলতা যদি আসে, ব্যথা যদি বাজে তাতে ভুগবে তো সেই নারী নিজেই। সে কি ভাবতে পারবে 'রক্তে মোর বাজে রুদ্র বীণা' আর দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে পারবে?

অথচ যে বীর আজ বিদায় নিতে এসেছে তাকে হতাশ করে ফিরিয়ে দেবে কি করে? একটা অনির্দিষ্ট আশার সম্ভাবনা দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়াও কি সততা হবে? এদিকে যে মনকে এখনও পরিপূর্ণভাবে তৈরি করতে পারেনি তাকে কি করে এখনই বাক্য দিয়ে আবদ্ধ করবে?

অসহায়ের মতো সীমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

অনেক কাহিনি সে জানে যেখানে ঝট করে মত দিয়ে হঠকারিতার জন্য পরে পস্তাতে হয়েছে। মিথ্যা আশার কুহক সে দেখাবে না। আবার অযথা নিরাশ করে তার বীরের উঁচু মাথা নিচু করে বিদায় নিয়েও যেতে দিতে পারে না।

চারদিকে পৃথিবী একটা প্রলয়োচ্ছ্বাসে মত্ত হয়ে উঠছে। ইয়োরোপে এমনভাবে ঝটিতি বিয়ে আর ত্বরিত বিচ্ছেদ নিশ্চয়ই বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সমাজ, পরিবেশ, কিছুই তো এর জন্য তৈরি হয়ে ওঠেনি। এখনও নয়।

শুধু কথা দেওয়া। শুধু আশ্বাস দেওয়া। শুধু বিশ্বাসকে বাঁচতে দেওয়া। তার পর যদি সংসারের চাপে মনের রঙ বদলিয়ে যায় তখন কী হবে?

কিন্তু শুধু তো আশ্বাস দেওয়া নয়, আশ্বাস পাওয়াও তো বটে। কুমারীর নব নীরব প্রীতি হচ্ছে মৃদু আর মধুর। তাকে নির্ভর করতে হবে সবল আর কঠোরের উপর। তরুণীরা হয় মনোহারিণী, নয়নাভিরাম নানা রঙের প্রজাপতি, জোনাকির মতো ক্ষণদীপ্তিতে উজ্জ্বল।

কিন্তু যে তরুণদের তারা বরণ করবে তাদের মধ্যে যদি ঋজু বলিষ্ঠতা না থাকে, তাহলে তাদের কাছ থেকে প্রেমের স্বীকৃতির সার্থকতা কোথায়?

ওরা যে সুশোভনের দল, তমালকান্তির দল, ওদের মধ্যে সে বীর্য কোথায়? ধৈর্য কোথায়? ওরা তো মিষ্টি কথা বলে। ফুলঝুরির মতো ভাব ও ভাষা ওড়ায়। তার মধ্যে যদি বা মাধুর্য থাকে, মর্যাদা কোথায়?

ওরা কিন্তু সবই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। এবং কথার বাঁধুনী ও টিপ্পনীতে নিজেদের শূন্যতাকে ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিল।

সুবীর বলল, বাঃ, বেড়ে জমিয়ে নিয়েছে দেখছি ব্রাদার। তবে কী জান, এখনই এসব পালা সেরে রাখা ভালো। আমাদের পোড়া চোখের সামনে আগুন জ্বালানো এত প্রেম পরে তো জাহির করা চলবে না।

—কেন, তাতে আপত্তিটা কী? বরং আরও বেশিই চলবে হয়তো। কারণ তখন তো অল রাইটস রিজার্ভড। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

—সে জন্যই চলবে না। স্বত্ব পাওয়া মানেই হারানো। কারণ লোকে ভাববে যে সামনে ঢলাঢলি করছে পেছনে ঠেঙাঠেঙি করে বলে। তায় আবার মেজর। ওরে বাবা! লড়াইটা ঘরের মধ্যেই চালাবে আমাদের ড্রয়িংরুম হিরো।

—আশ্চর্য! এমন হিরো দেখিনি বাবা সাতজন্মে। জঙ্গীতে যখন ঢুকেছিস রঙ্গে ভরিয়ে নে জীবনটা। নেহাত যদি রোমান্টিকই হয়ে থাকিস গঙ্গাফড়িঙের মতো উড়ে বেড়া। কানা ফুলের তো অভাব নেই মিলিটারির বালুচরে।

বালুচর নয় হে ভায়া। ময়নামতীর দ্বীপ। জলের মতো পয়সা খরচ করে সে দ্বীপের ঘাটগুলো বাঁধানো।

—একটু তফাত আছে ব্রাদার। মেজরের চোখে বোধহয় সব মেয়েই হচ্ছে স্যালাড। যে রকম সস আর ড্রেসিং দেবে সেরকমই সাজবে। সীমাকে বানাতে চায় একেবারে নিজস্ব রেসিপি। প্রাইভেট পাক প্রণালীতে।

এদিকে নীরেনের মনে প্রত্যাশার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নিরাশা। সে যেন একটা ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাটিতে শেকড় গেড়ে থাকতে চায়। প্রেম সেই পৃথিবী, সেই জমি যেখানে তার জীবনের মূল সজীব রেখে সে ঝড়ের অভিসারে বেরিয়ে যাবে।

সীমা যে কেন প্রত্যাশা দিতে পারছে না তা সে ভালো করেই বুঝতে পারছে। তবুও অবুঝ মন। নীরবতাব কারণটাকে স্বীকার করলেই মাথার উপর পাগলা ঝড় ভেঙে পড়বে। সে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কারও কাছে ব্যক্তিবিশেষ হয়ে বেঁচে থাকার কী বিরাট অর্থ, কী মহান তাৎপর্য তা সে জানে। শুধু সে

আছে বলে, কাছে আছে বলে যে একজন সুখী হয় সেই অনুভবের কী বিপুল মহিমা। কী অনন্ত অন্ধ। এরই স্পর্শে মানুষ পরিবর্তিত হয়ে যায়, পরিবর্ধিত হয়ে যায়। যেমন সে হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ এরই জন্য বাঁচে, এগিয়ে চলে, তাঁবু বাঁধে। মানুষ বাঁচে শুধু অশরীরী প্রেম বা শরীরী প্রয়োজনের জন্য নয়। পরিপূর্ণ একজন মানুষের জন্য।

সীমাও জানে যে পৃথিবীটা এক জায়গায় ঠেকে থাকে না। যদি একটা দেশ বা একটা যোদ্ধা দল হেরে যায় বা হারিয়ে যায়, তবু হাল ছাড়লে চলে না।

কিন্তু একজন মানুষই জীবনের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করে। মনের মধ্যে সে-ই থাকে রাজা। সাময়িকভাবে দুঃখ, বিচ্ছেদ এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত আসত পারে। সূর্যগ্রহণ হয়, চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আশা ছেড়ে দেয় না কেউ সেজন্য।

সীমার মনে পড়ল আজ ভোরবেলা বাবা প্রত্যেক ভোরের মতোই উপনিষদ পাঠ করছিলেন। যুদ্ধ অশান্তি অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই পাঠ কখনও বাদ দেন না। আজই পড়ছিলেন :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে

সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ আবৃত। হে পুষণ, হে স্বর্গীয় জোতিস্বরূপ, মুখের আবরণ সরাও, যাতে সত্যকে দর্শন করতে পারি।

সেই সত্য, মনের সত্যকে তুমি এখন খুলে দেখাও। আমি জীবনে জেগে উঠতে চাই।

এদিকে সীমার মা ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পেরেছেন। মেয়েকে এমন একটা জটিল অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া মায়ের অবশ্য কর্তব্য। উনি হাতে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে এগোতে লাগলেন।

তা লক্ষ্য করে নীরেন শান্তভাবে বলল, সীমা, সীমা তুমি বলো। একটুখানি হেসে প্রসন্ন মনে বলো, আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

সীমা হাসল। হ্যাঁ, হাসল।

যে হাসি পৃথিবীর সব কান্নার চেয়ে বেশি গভীর সেই হাসি হেসে নিজের সীমন্তের উপর রক্তগোলাপের স্তবকটা বুলিয়ে দিল।

হঠাৎ নীরেনের মনে হল যে সীমা এখন হয়ে গেল অসীমা। পৃথিবীর সবগুলি নাম নিয়ে একটি মহিম্ন স্তোত্রের শ্লোক হয়ে গেল। নিমেষে সহসা বিদ্যুৎচ্ছটার মতো একটা অসহ আলোকে ওর মনে ভরে গেল। বিরহ মিলন গমন প্রত্যাগমন জীবন মরণ সংসারের সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে একটা অনন্তের সৃষ্টি করল যা লোপ করে দেওয়া যাবে না।

তাই তো চোখের সামনে রক্তগোলাপে আর সিঁদুরে সব একাকার লাল রং রয়ে গেল।

।। ষোলো।।

যেন 'নিশি'তে পেয়েছে ওদের।

দলকে দল যে নিশির খপ্পরে পড়ে এমন কথা কেউ কোনও কালে বলতে পারবে না। সবচেয়ে দুর্গম অশিক্ষিত অঞ্চলের বুনো লোকদের মধ্যেও এমন জনপ্রবাদ কোনদিন ছিল না।

কিন্তু এদের বেলা সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই হয়েছে। সাধারণ লোকের দলও নয়। একেবারে শিক্ষিত সুশৃঙ্খল সৈন্যদল। সৈন্য অর্থাৎ জওয়ান। কুসংস্কারে নয়, শৃঙ্খলাতে যাদের শিক্ষা। সর্বাধুনিক অস্ত্রে রণকৌশলে যাদের দীক্ষা।

পাহাড়ের গা বেয়ে লুকিয়ে ঘন জঙ্গল ঘেঁষে ওরা পিছু হটে চলেছে। গভীর গাছপালা ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে। দক্ষিণ মালয়ের শেষ প্রান্তটুকু থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছোবার পথে। কোনমতে আপাতত প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ। ওদের পিছন সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ওদের চারপাশে পিলপিল করছে ওদেরই নিজেদের দীর্ঘায়িত ছায়া। কিলবিল করছে যেন ভয় আর নির্ভরসা। রবারের জঙ্গলে ভয় আর বিপদ যেন রবারেরই মতো টানে টানে বড় হয়ে ওদের ধাওয়া করে চলেছে।

কিন্তু ওদের পদক্ষেপে নেই প্রাণ, নেই কুচকাওয়াজ বা মার্চ করে চলার টান। এমনকি নেই একটুও শব্দ। কারণ মিহি ধুলোর রাশি রবারের মতো সব শব্দকে শুষে নিচ্ছে।

আর সেই ধুলো পায়ের তলায় মথিত হতে হতে উপরে উঠে এই পলায়মান সৈন্যদলের মাথার উপর চাঁদোয়ার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু স্থাণু হয়ে থাকছে না। ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

প্রত্যেকেরই মনে একটা লুকিয়ে ঢেকে রাখা প্রশ্ন। এই চাঁদোয়ার ওপর দিয়ে যদি জাপানি বোমারুর দল উড়ে আসে আর পরম নিশ্চিন্তে বোমা ঝরিয়ে যায়? তাক করতে হবে না। পালটা হামলারও ভয় নেই।

অথচ সে সম্বন্ধে কিছু করারও নেই। শুধু মনকে অপেক্ষা করতে দাও। আর চরণকে দাও চলতে।

মেজর নীরেন চৌধুরী মাঝে মাঝে নিজের কাঁধে হাত দিয়ে দেখছে। যেন যে ঝকঝকে রাজমুকুটটা মেজরের পদমর্যাদার প্রতীক হয়ে কাঁধে বিরাজ করছে সেটা কোনও ভরসা এনে দিচ্ছে।

তার চেয়ে বড় কথা—কোনও বেতার বাণী, 'এস. ও. এস.'।

শিগ্‌গির এসো তোমরা মিত্র বাহিনী। মাথায় মেলে ধরো এরোপ্লেনের ঝাঁক ঝাঁক চাঁদোয়া। সামনে এনে দাও ট্রান্সপোর্ট আর অ্যাম্বুলান্স আর আরও সৈন্যদল। যাতে এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার পথটা জাপানিরা বন্ধ করে দিতে না পারে।

দ্রুত পাশ কাটিয়ে পিছন থেকে অবরোধ করার রণকৌশলে জাপানিদের জুড়ি নেই।

একবার পাশে চোরা চাহনি মেরে চৌধুরী দেখল লেফটেন্যান্ট বেচারা তার শুকনো ঠোঁট চালাচ্ছে। তার জিভও বারবার যে চাটার জন্য নয়, শুধু অভ্যাসবশত বেরিয়ে আসছে। চৌধুরী আশা করল যেন নিজের মুখমণ্ডল স্বাভাবিক থাকে। কিন্তু একথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হল যেন চোখের ভুরু দুটো কপালের দিকে উঠে গেছে।

আরেকজন লেফটেন্যান্টের চোখ মিটমিট করছে। আকাশের তারা যেন মেঘে ঢেকে যাবার ভয়ে আগে থেকেই ঘোমটার আড়ালে চলে যেতে চাইছে।

কিন্তু না। এসব কল্পনা বা উপমার স্থান এখানে নয়। সময়ও এখন নয়। কর্নেল অনেক আগেই জাপানি শেলের আঘাতে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

এত বিরাট সৈন্যদল, এই ব্যাটেলিয়নগুলির কর্তৃত্ব এখন মেজর চৌধুরীর দায়িত্ব। তাদের সবাইকে যতটা সম্ভব নিরাপদে পিছু হটে 'বেস এরিয়া-তে নিদেনপক্ষে খোলা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।

কাজেই মেজর আর সকলের মতোই মুখ বুজিয়ে রেখেছে। জোরে চেপে।

এখন সে মনকেও জোর করে চেপে রাখতে চাইল। মনে মনে নিজেকে সমঝাল মনের বালাই থাকলে যুদ্ধ করা চলে না। তুমি এখন শুধু একটি মেসিন, মন নও। তুমি যন্ত্র। মন্ত্রের বালাই এখন নেই। কারণ মনই নেই।

কিন্তু চোখ খুলে রাখতেই হবে। তাও অনেক কষ্টে। নাকেরও সেই অবস্থা। সব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে চলতে হবে। পরম যোগীদের মতো। আব খোলা রাখলেই ধুলো খেতে হবে।

যোগীরা বায়ু গ্রহণ করেই নাকি যোগ সাধনা করতে পারেন। কিন্তু এরা যা খেতে পাবে তা হচ্ছে শুধু ধুলো।

ধুলো ভুক যোগীদের কথা কি কেউ কোথাও শুনেছে?

মেজর নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করল।

কিন্তু নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। না খোলা যায় নাক, না মুখ। অথচ শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। যেটুকু হাওয়া ভিতরে টেনে নেওয়া যায় সেটুকুও ভেজাল গ্যাসের মতো। অর্থাৎ হালকা হাওয়া। ফুসফুস তাতে ভরে না। এত হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়িয়া জঙ্গলে কোনও কিছুতেই কিছু ভরে না।

কোনও কিছুই ভরে না। অবসন্ন মন ভরে যায় এলোমেলো পাগলা হাওয়ার মতো রাশি রাশি চিন্তায়। চৌধুরী এক পলক উপরে নজর দিয়ে ধুলোর কুণ্ডলীর দৃশ্য দেখে যেন হঠাৎ দিশাহারা হয়ে গেল।

কোথায় আকাশ? আকাশ ভরে তাদের সৈন্যদলের লাইন ঘিরে এ যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী নয়। এ যেন সমুদ্রের মধ্যে হঠাৎ ফুঁসে ওঠা জলস্তম্ভ। অসীম জলরাশি কোনও অজানা টানে ফুলে উঠে আকাশে লাফ দিয়ে উঠেছে আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

জলস্তম্ভের কথায় মনে তৃষ্ণা নতুন করে জেগে উঠল। পলায়মান সৈন্যদল যতদূর সম্ভব ক্ষুধাতৃষ্ণা

ভুলে, পিছনে ফেলে রেখে সামনে পালিয়ে যেতে চায়। আগে তো পৈতৃক প্রাণটা—যেটা আপাতত সরকারের জিম্মায়—বাঁচুক! তারপর অন্য কথা।

হঠাৎ যেন গলা শুকিয়ে গেল। আর জন্মের প্রথম দিন থেকে জমানো তৃষ্ণা বুক ঠেলে উপরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথার পিছনে ধড়াস করে একটা ধাক্কা। মানসিক সেই আঘাতে তার চৈতন্য ফিরে এল। নিজেকে সামলে সে বুকটা আবার একটু টান করে মাথা তুলে নিল। না, মেজর চৌধুরীর উপর আজ অনেক অনেক দায়িত্ব।

ট্রেনিং ক্যাম্পে সাইকলজিক্যাল ওয়ার-ফেয়ার ক্লাসে বোঝানো হয়েছিল যে মৃত্যুর বাস্তবতা সব সময়ই তোমার মনে উপস্থিত থাকবে। এবং তার হাত এড়াতে চেষ্টা কোরো না। এইভাবে নিজেকে বাঁচানোর সবচেয়ে জরুরি তাগিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার কৌশলগুলিও ভুলে যেতে পারবে না—যতই হঠাৎ চাপ আসুক।

যারা খুব বেশি মনকে বাঁচার দিকে আর চোখকে বিপদের দিকে খোলা রাখে তারা ক্রমে পাগলামি করতে শুরু করে। ফলে হয়ে যায় শত্রুর সামনে ভীরু এবং সহজে শত্রুর শিকার।

নতুন আমদানি ট্রেনিং পর্যায়ে ইংরেজ মেয়ে সাইকলজিস্ট আর সাইক্রিয়াটিস্ট পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে আমদানি করা হয়েছিল। ট্রেনিং-এর ফল কেমন হচ্ছে তা যাচাই করার জন্য। মিষ্টি জীবনের মজাদার আমেজ হয়তো একটু বয়ে গেল ক্যাম্পে। কিন্তু কর্তব্যে ভরা দিন ও সন্ধ্যাগুলোতে তারা ইস্পাতের মতো কঠোর আর সীসার মতো রংহীন হয়ে থাকত। নেহাতই মরীচিকা। মরুভূমি ভরা জীবনে। সেও ছিল একরকমের আকণ্ঠ তৃষ্ণা। ভাগ্যবানরা অবশ্য সে তৃষ্ণা লুকিয়ে চুরিয়ে মেটাত।

প্রকাশ্যে অবশ্য নীরেনের সহকর্মী তরুণ অফিসাররা ওরই মধ্যে কিছু আনন্দ আমদানি করেছিল। আমেজে আবেশে ওরা এই তরুণী বা মাঝবয়সী সুবেশা ইউনিফর্মধারিণীদের লক্ষ করে গান গাইত দল বেঁধে।

এখন গরম সীসা আর আগুনে ইস্পাতের খেলা। মরণের সঙ্গে খেলা। গভীর রাতে ঘন জঙ্গলে উপায়হীনভাবে পালাতে অর্থাৎ মাথা ঠিক রেখে পিছু হটতে হটতে নীরেনের ব্যাটেলিয়নকে ক্রমাগত জাপানিদের ওড়ানো আলোর হাত থেকে লুকোতে চেষ্টা করতে হত।

একদিকে হঠাৎ রঙিন আলো। অন্যদিকে কোথাও বিজলির মতো আলো। পিছনে হয়তো কামানের সগর্জন সেলাম। বাতাস চিরে মেসিনগানের বাঁশ ফাটানো বাঁশী। আকাশ ভরে স্টার শেলের ফুলঝুরি।

প্রত্যেকটা দিনমানকেই মনে হত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী। সামনের আগামী দিনটাই বা রেহাই দেবে কেন?

তবু পিছু হটে কোনক্রমে সিঙ্গাপুর 'কজওয়ে' সামুদ্রিক সাঁকোটার ওপার পর্যন্ত না পৌঁছুলে রক্ষা নেই।

রাইফেলধারী কোম্পানিগুলির সঙ্গে এলোমেলোভাবে মিশে গিয়েছে আরও অন্যান্য কোম্পানি। যারা খচ্চর আর গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারাও। মাল আর অস্ত্র দুই-ই চলেছে একসঙ্গে!

খচ্চরদের গতি সৃষ্টির আদিকাল থেকে সেই চিরন্তন দু মাইল ঘণ্টায়। ইনফানট্রির পায়ে হেঁটে পলায়মান দলগুলির গতিও প্রাণের দায় সত্ত্বেও তার চেয়ে বেশি নয়। তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে, ভয়ে আর হতাশায় সৈন্যদের পাগুলি পাথর হয়ে গেছে।

অথচ জাপানিরা তেড়ে ফুঁড়ে আসে। যেন পায়ে তাদের মোটরের ইঞ্জিন আর নতুন কাঁটা বা সদ্য ধসে যাওয়া পাহাড়িয়া পথগুলি যেন মন্টিকার্লোর রেসিং ট্র্যাক।

জাপানি আগুয়ান বাহিনীর জন্য। ব্রিটিশের পলায়নী সেনার জন্য নয়!

এদিকে জাপানিদের অস্ত্রের চেয়ে বেশি ভয়ের কথা ওদের তৈরি রোড ব্লক। অর্থাৎ লুকোনো আঘাটা দিয়ে এগিয়ে এসে আগে থেকে মুক্তির পথ অবরোধ করে দেওয়া। তারপর ইঁদুরকে যাঁতাকলের মধ্যে পুরে বন্দী করে...তারপর?

তার পরের খবর ওরা জানে না। ভাবতেও চায় না। কারণ ভাবলেই ভয়। ভয় মানেই অসহায় আত্মসমর্পণ। ভয় মানেই পলায়নী মনটাকে পঙ্গু করে তোলা। গোটা মালয় জুড়েই এমনই করে ব্রিটিশ সৈন্য বিনাযুদ্ধে বন্দী হয়ে যাচ্ছে।

এগোতে এগোতে একটা চড়াইয়ের সামনে ওরা এসে পড়ল। অতএব চড়তেই হবে। যদিও বেশি উঁচু নয়। পাশ কাটিয়ে যেতে গেলে কতদূর বেশি ঘুরতে হবে তার ঠিক নেই। শুধু তাই নয়। যদি ওরা কোনও

খোলা জায়গায় এসে পড়ে জঙ্গলের সামান্য আবরণ আর বাঁচোয়াটুকুও থাকবে না। অতএব চড়াই পার হতেই হবে।

পিছন থেকে হু হু করে পাহাড়ি বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের সামনের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। জওয়ানদের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস তার সঙ্গে মিশে একটা অদ্ভুত আওয়াজের মতো প্রত্যেকের কানে লাগতে লাগল।

না, এর চেয়ে নীরবতাও ভালো। এমনকি শত্রুপক্ষের ছরর ছরর মেশিনগানের গুলি বা মর্টারের চাপা শব্দের আগমনী। এমনকি আর্টিলারির কামান গর্জনও।

প্রত্যেকেরই মনে একমাত্র ও শেষ কামনা—বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য যুঝতে হবে। অবশ্য যুদ্ধ করার কোনও সুযোগ নেই।

ওরা নিজেরাই শত্রু সৈন্যদের সমুদ্র থেকে মালয়ের তীরে তীরে নেমে পড়া আটকাতে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জাপানিদের কৌশলী এনসার্কলমেন্ট ব্যূহের ফলে প্রায় বিনা যুদ্ধেই ওরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়েছে। যা কিছু হতাহত নিজেদেরই দলের। মায় দলপতি পর্যন্ত।

উলটে এখন জাপানিরাই এগিয়ে আসছে শমনের মতো। কামানও চালাতে হচ্ছে না। ধাক্কা না দেওয়া (রিকয়েল লেস) রাইফেলের ধাক্কাই যথেষ্ট। এমন বেধড়ক পালাতে হয়েছে যে কারও কারও হাতে নেই হাতিয়ার, পায়ে নেই বুট, গায়ে নেই শার্ট।

কিছু হয়নি নেওয়া। প্রায় সবই গেছে খোয়া।

যা বাকি আছে তা হচ্ছে দুশমনের ধেয়ে আসা। সেটাই সত্য। আর সব মায়া। উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উপরের মেঘলা রং-মাখা আকাশের মতই মায়া।

চৌধুরী প্রাণপণে ভাবতে লাগল কী করে সবার মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে এদের এই ঘেরাও অবস্থা থেকে নিরাপদে বের করে আনা যায়। এই নিরেট অন্ধকারে নীরবতাই সবচেয়ে বড় ভয়ের কথা।

ওদের মধ্যে কথাবার্তা চালু করালে কি কোনও ফল হবে? কিন্তু তার বিপদ আছে। প্রত্যেকের মনেই ভয় ও অসহায়তা জমাট বেঁধে আছে। যদি তা একবার ভাষার স্রোতে বেরিয়ে আসে তাহলে শৃঙ্খলা বা সাহস কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তখন কোনও হুকুমই আর হুকুম বলে কেউ মানবে না। সেনাদলের সব চেয়ে বড় সর্বনাশ হচ্ছে সেই অবস্থা।

তাছাড়া ওই বুভুক্ষু দলের ক্ষুধার্ত পদক্ষেপ আর তৃষ্ণার্ত মুখ দেখে কথা কওয়ানোর কথাই ভাবা যায় না।

তার চেয়েও বড় কথা আছে। যত বেশিদিন মানুষ যুদ্ধের মধ্যে থাকে ততই সে অন্যের প্রতি সহানুভূতিহীন হয়ে উঠতে থাকে। নিজে যদি সে একটুও নিরাপদে থাকে তাহলে যারা বেঘোরে মারা যেতে পারে বা সামনের সারিতে শত্রুপক্ষের প্রথম খন্দের হয়ে আছে তাদের জন্য মাথাব্যথা থাকে না। এমন কি বিপদ ও নিরাপদের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের তফাত থাকলেও। যত দিন যায় ততই সে নিজে যে সময়টুকু মৃত্যুর মুখোমুখি আছে তার বাইরে ভয় দয়া মায়া কিছুই থাকে না।

তাই সেনাপতির কঠোর হুকুম অত সহজে, অস্বাভাবিক আর অসাধ্য হলেও অত অম্লান ভাবে বেরিয়ে আসে।

কিন্তু চৌধুরী নিজেকে মনে মনে সমঝে নিল—সাবধান চৌধুরী, তুমি পেশাদার যোদ্ধা নও। তুমি শুধু হাড়শক্ত ঝাঁঝাপোড়া নিরেট একটি অস্তিত্ব নও। তোমার অন্য পরিচয় আছে। কিন্তু সবার ওপরে তুমি যোদ্ধা। কর্মের নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর।

সে খুব বেশিদিন আগে সৈন্যদলে আসেনি। কিন্তু এই সময়টুকুর মধ্যেই তার অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অতি অল্প সময়ে অনেকখানি।

জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে যে বিরাট একটা দেওয়াল ছিল সেটা আজ তার কাছে ফানুসের কাগজের চেয়েও পাতলা, স্বচ্ছ। এদিক থেকে ওদিক সবই যেন দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ভয় কেন? কেন এত মায়া?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে সমস্ত নীরবতা যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একটি

রাইফেলের আওয়াজ। অনেক দূরে। কিন্তু নিঃসন্দেহ রাইফেলের আওয়াজ। এবং নিজেদের নয়।

হঠাৎ যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল কে তার গায়ে ঢেলে দিল। নিজের চারপাশে যেটুকু নির্মম কঠোরতা বা নিঃসহায় উদাসীনতা ছিল তা সাপের খোলসের মতো খসে পড়ল। ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সে যদি শুধুই সেনানী হয়—নিষ্ঠায় নিষ্ঠুর, উদ্দেশ্য পালনে হৃদয়হীন হয় তাহলে কেমন লোকটিকে সে সীমার সামনে এনে হাজির করবে? তার যোগ্য প্রণয়ী, তার জীবনসঙ্গী, তার সহধর্মী স্বামী হিসাবে নিজেকে ভবিষ্যতে দাঁড় করাবে?

চৌধুরী নিজেকে সামলে নিল। সে এখন পেশাদার যোদ্ধা। তার ইউনিফর্মের মর্যাদা দিতে হবে। এতগুলি প্রাণ নিয়ে যার দায়িত্ব, প্রণয়িনীর কথা সে ভাববে না।

সামনে আছে একটা দলং অর্থাৎ পোল। আগে পিছনে রাস্তা হিসাবে ম্যাপে দেখানো আছে একটা সরু মাটির লাইন। তার দুটো টুকরোকে জুড়ে দিয়েছে কাঠের গুঁড়ি আর পাটাতনে সাজানো একটা দলং।

শত্রু নিশ্চয়ই দলংয়ের খবর আগে থেকেই রেখেছে আর একজন সৈন্যই একটা কাঠের পোল লোপাট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাহলে এই দলংয়ের উত্তর পারে দলের সব সৈন্য ইঁদুরের মতো আটকে পড়বে। তাহলে জাপানিদের আর কষ্ট করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে এসে এই সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে অর্থাৎ আউট ফ্ল্যাঙ্ক করে আটকে ফেলার কোনও দরকারই হবে না।

অন্ধকার নেমে আসছে। আশাও তাই বাড়ছে।

রাস্তাঘাট তৈরি করার স্যাপার দল পোলটা যাচাই করে দেখে নিল। নাঃ। ঠিকই আছে। এবং তার নিচে কোনও ফিউজ লাগানো নেই। যেখানে যেটুকু দরকার ঠেকা দিয়ে আরও মজবুত করে নিল।

নীরো একবার চারপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে কজন সৈন্যকে দূরে দূরে ঘাঁটি পাহারায় মোতায়েন করল। পাহারা দিতে হবে—যাতে হঠাৎ কোনও শত্রুর হামলা বা স্নাইপিং না শুরু হয়। বিনা হুঁশিয়ারিতে।

অন্ধকার হয়ে গেছে। অতএব দুশমন অন্ধকারে আক্রমণের জন্য কোনও বড় দল নামাবে না। কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে হঠাৎ ভেরি লাইট ফেলে সবুজ আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে দিতে পারে। সবুজ আলোয় বহুদূর থেকে রাইফেলের গুলির লালচে বিদ্যুৎ কেমন দেখাবে তা কল্পনা করার সময় কেউ পাবে না।

অথবা ঠিক মাথার উপরের চূড়া থেকে তাক করে লাট্টুর মতো বোঁ বোঁ করে গ্রেনেডও ছুটে আসতে পারে।

অথবা কালীপুজোর সময়ে ছুঁচোবাজির মতো হিসহিস আওয়াজ করে মর্টার।

অথবা হালকা মেশিন গান।

জাপানি সৈন্যরা নিজেদের পিঠের উপরে মেশিন গান বেঁধে চার হাত পা দিয়ে ভারবাহী খচ্চর সেজে যায় আর ডাইনে বাঁয়ে গা হেলাতে থাকে। সে অবস্থায় মেশিন গানের গুলি যে কী সাংঘাতিক কার্যকরী হয় তার প্রমাণ ব্রিটিশ সৈন্যরা হাতে হাতে পেয়েছে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ। একেবারে পাশে। একজন টহলদার পাহারা দিতে দিতে লুটিয়ে পড়ল।

নীরেন ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই এ অবস্থায় কী করা উচিত সে শিক্ষা মনে হল। সে তার পাশে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে ক্যান্টিনের জল একটু মুখে দিল।

এই ক'নিমেষেই বেচারা জোয়ানের চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সেজন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ফিসফিস করে সে বলল হিন্দিতে, আমি মরছি, মেজর সাহেব। মরছি। আমি। আমি।

বলতে বলতে জোয়ান চোখ বুজল। ঢোক গিলল। তারপর আবার বলল, সাব, আমি মরছি। দাঁড়িয়ে ছিলাম অন্ধকারে। হঠাৎ কী যেন একটা ধাক্কা খেলাম। সাব, আমি কি বাঁচব?

নীরেন ওর কপালে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল—একটু সহ্য কর, এখনই স্ট্রেচার পাঠাচ্ছি। মেডিক (ডাক্তার) এসে তোমার গুলি বের করে দিলেই তুমি আরাম পাবে।

কিন্তু বলতে বলতে একথা বলার অর্থশূন্যতাও যেন একটা বুলেটের মতো নীরেনকে ধাক্কা দিল। সে আর মুমূর্ষু জোয়ানের দিকে তাকাতে চাইছে না। তার বুকের ঠিক মোক্ষম জায়গায় রাইফেলের

গুলি লেগেছিল। তাই মাথায় কপালে হাত বুলিয়েছিল। কিন্তু চোখ না বুলিয়ে নীরেন যাবে কোথায়?

জোয়ান হঠাৎ বলে উঠল—সাব, আমার বাড়িতে খবর পাঠাবে তো? ওরা যেন কষ্ট না পায়। ওদের লিখো...আমার...বেশি কষ্ট হয়নি।

নীরেন মুহূর্তের জন্য বাকি সৈন্যদলের ব্যবস্থার কথা মন থেকে সরিয়ে দিল। জোয়ানের ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে ওকে কষ্ট একটু কমাবার মতো ভঙ্গিতে শোয়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু ততক্ষণে বেচারার চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। যদিও চোখ বোজেনি।

না। এখন নীরেনকে এত বড় একটা ব্যাটেলিয়নের গতিবিধি, নিরাপদে মুক্তির ব্যবস্থা দেখতে হবে। এই জোয়ান শুধু একজন। ব্যাটেলিয়নে আছে বহু জন।

আর যুদ্ধ জগৎ জুড়ে।

বাকি সৈন্যরা যেন স্রোতে ভেসে এগিয়ে অর্থাৎ পেছিয়ে চলল। অর্ডার দেবার দরকার নেই। ওরা জানে যে সাঁকো মানেই মুক্তি। অন্তত এ যাত্রার মতো প্রাণে বেঁচে যাবার প্রথম সোপান।

ওরা ধুঁকতে ধুঁকতে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে চলল। যেন গড্ডালিকা। কিন্তু প্রবাহ নয়। নিশিতে পাওয়া অবসন্ন আত্মবিস্মৃতের দল।

একটু ক্ষণ নিঃশ্বাস নিয়ে নীরেন ভাবল তার ট্রেনিংয়ের কথা। এরকম সময়ে কী কী মাল হাতের কাছে থাকে আর কী কী অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় সে সম্বন্ধে ট্রেনিং সেন্টারে বক্তৃতার কথা।

ক্যামেরন হাইল্যান্ডাররা একবার গ্র্যান্ট ট্যাঙ্ক আর মাউন্টেন ব্যাটারি নিয়ে জাপানিদের রোড ব্লক ভেঙে দিয়েছিল। তারপর তারা একলা পড়ে যাওয়া ছত্রভঙ্গ ব্রিগেডকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু এখন কোথায় বা ট্যাঙ্ক আর কোথায় মাউন্টেন ব্যাটারি?

রোড ব্লকের দরকারই হবে না। শত্রুরা এমনিতেই ওদের গ্রাস করতে পারবে এখন।

আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরেন বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সমস্ত চৈতন্য হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠল। ও নিজের সঙ্গে রেখেছিল শুধু রিয়ার সেকশনের সৈন্যদের। অন্য সকলকে পার করে দিয়ে তবেই সে এদের পার করাবে। সবার শেষে সে নিজে দাঁড়িয়ে এই পোলটা ভাঙিয়ে চলে যাবে। মুক্তির পথে। সীমার পথে।

যে ওর কাছে অসীমা সেই সীমার পথে।

কিন্তু গোটা পঞ্চাশ গজের মধ্যেই কোন্ কোনা থেকে জাপানি সাবমেশিন গান চলতে শুরু করেছে? পোলটা মেশিন গানের তাকের ঠিক মাঝখানে।

এখনও অনেক জোয়ান পার হতে বাকি। নিজের সঙ্গের রিয়ার প্ল্যাটুন আর নিজে পার হবে সবার শেষে। নিজস্ব দায়িত্বের মহিমা তাকে যেন সীমার কাছে, অতি কাছে এনে দিল।

অর্থাৎ পিছনে। স্মৃতির উজানে পিছু টানে।

শুধু নিমেষের জন্য।

কিন্তু এখন তাকে পিছনে ঘুরে শত্রুসৈন্যের মেশিন গানের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাতে হবে। অন্ধকার কোন্ টেরে পাখির বাসার মতো ডালপালায় ছাওয়া মেশিন গানের বাসা পাতা হয়েছে তার হদিস মিলবে কী করে?

সে নিজের প্ল্যাটুন থেকে একটা স্কোয়াড—ছোট্ট দল বেছে নিল। অর্থাৎ প্ল্যাটুনের বাকি সৈন্যরাও হয়তো এদের খরচের খাতায় রেখে নিজেদের বাঁচিয়ে সরে যেতে পারবে।

এই স্কোয়াড শুধু এলোপাথাড়ি সামনে হামলা দিয়ে চার্জ করবে না। যতদূর সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে আড়ালে আবডালে এগিয়ে যাবে। তারপর করবে গ্রেনেড বৃষ্টি। তার পরেই সরে আসবে। সেই সময়টুকু প্ল্যাটুনের বাকি লোকরা পিছন থেকে মেশিন গানের গুলির ধারা দিয়ে রক্ষাকারী ছাতা সৃষ্টি করবে।

নীরেন যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে নিজে সে এমন একটা অভিযানে চলেছে। কেমন করে না জানি তার ধারণা ছিল যে এমন একটা অভিজ্ঞতা তার নিজের হবে না। কোনরকমে এমন কিছু হবে যাতে জাপানিদের সঙ্গে বেয়নেট বা বন্দুক নিয়ে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে হবে না।

না। এসব চিন্তা মনে আসাও এখন অন্যায়। বাঙালি হয়ে জন্মেছে বলে, ইচ্ছামতো চিন্তা করতে শিখেছে বলে সে তো কর্তব্যচ্যুত হতে পারে না। সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে জেনেও তার ব্রিগেডের কম্যান্ডার একটা

ব্যাটেলিয়নকে মালয়ের উপকূলের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সামরিক শিক্ষার আগের পর্বে হলে সে তর্ক না করলেও নিজের বক্তব্য অন্তত রাখত। অন্তত চেষ্টা করত।

কিন্তু এখন সে সামরিক শৃঙ্খলার কাছে উৎসর্গীকৃত। হ্যাঁ, উৎসর্গীকৃত—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়। বীর সন্ন্যাসীর বাণী বীর সৈনিক উপেক্ষা করে কী করে?

যুদ্ধক্ষেত্রে তর্ক অচল, অসহ্য। বিতণ্ডা মানেই ঠাণ্ডা।

খরচার খাতায় তোলা সে আর তার নির্বাচিত স্কোয়াড ঠিক মতোই কাজ করল। কিন্তু তাতে যে শেষ রক্ষা হবে না তাও পুরোপুরি জানা ছিল। প্ল্যাটুনের বেশির ভাগ লোক পোল পার হয়ে গিয়েছে। এবার নিজেদের পালা।

সঙ্গের সবাইকে সে সোজা লাইনে নয়—এঁকেবেঁকে দৌড়ে পোলটা পার হতে হুকুম দিল। হুকুম না দিলেও হয়তো ওরা এখন দৌড়াত। কিন্তু সর্বদাই নিজের উদাহরণ দিয়ে সে ওদের শিখিয়েছে।

সে নিজে রইল সবার পিছনে। অর্থাৎ শত্রুর সবচেয়ে কাছে, সবচেয়ে সামনে। একা।

ঠিকই তো। জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি সে হয়েছিল একা। মরণের সঙ্গেও তাই। চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল।

তার শেষ হ্যান্ড গ্রেনেড সে তুলে নিল। চার সেকেন্ডের গ্রেনেড। তার লেবার-কলের মুখটা খুলে নিয়ে নিজের হাতেই দু সেকেন্ড গ্রেনেড ধরে রাখল। এতে বেশি মোক্ষম ফল পাওয়া যাবে। তাই দু সেকেন্ড পরে সেটা মেশিনগানের লুকানো কুঞ্জের উপর ছুঁড়ে মারল। দুড়ুম দুড়ুম দুম্। সব চুপচাপ।

ওদিকে পিঁপড়ের মতো সারি দিয়ে নিঃশব্দে ওর শেষ সৈন্যগুলি সাঁকোটা পার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মেশিনগান কুঞ্জের কাছাকাছি আরও শত্রু সৈন্য লুকিয়ে মোতায়েন ছিল। তারা গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

মরীয়া হয়ে নীরেন সেই লুকোনো ঘাঁটির উপর ফিকস্‌ড বেয়নেট নিয়ে তাড়া করল। দুজনকে বিঁধে ফেলল। তৃতীয় জনের বুকে বেয়নেট এমনভাবে বিঁধে রইল যে সে সেটা টেনে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ইতিমধ্যে কী যে হয়ে গেল নীরেন তা জানতে পারল না।

যখন জানতে পারল তখন তার সামনে একজন অতি উচ্চপদের জাপানি সামরিক অফিসার। সামুরাই তরোয়ালেই তার পদের পরিচয়।

সোনা আর হাতির দাঁতের কাজ করা কালো কাঠের কারুকার্যে ভরা ঢাকনা রয়েছে হাতলের উপর। ইস্পাতের উপর কুচো কুচো চুনী আর পান্না বসানো। চামড়ার খাপখানাই বা কী সুন্দর।

মনে পড়ল মিলিটারি মেসে জাপানি জেনারেলদের সামুরাই সোর্ড নিয়ে ওরা কত আলোচনা করত। বলাবলি করত যে ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে না রেখে বনেদী বংশের উত্তরাধিকারগুলি যে জাপানিরা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে তা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ অফিসারদেরই উপহার দেবার জন্য। 'রামে'র গ্লাস মাথার উপরে তুলে জাপানিদের এরকম সদিচ্ছার জন্য ওরা 'টোস্ট' করত। এই সামুরাই তরোয়াল একদিন তাদের ব্রাইটন বা সাউথ এন্ডের সাগরপারের কুটিরগুলির শোভা বাড়াবে।

সে কথা মনে পড়ানোর ভার অবশ্য এখন জেনারেলের। উৎসাহ করে তিনি নিজেই বন্দী ভারতীয় অফিসারের ইনটারোগেশন চালাচ্ছেন। ইংরেজি জানেন তিনি। এবং বন্দী তার পদমর্যাদায় অভিভূত হয়ে জাপানি সাম্রাজ্যের সৎ উদ্দেশ্য সহজে বুঝে নিতে পারবে।

বোঝাতে পারলেন না কিন্তু কিছুই তিনি। আহাম্মক না হলে কি সে 'স্লেভ আর্মি-তে যুদ্ধ করতে এসেছিল? এবং আহাম্মক না হলে এহেন সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয়? কত সৈন্যদল পিছনে আছে, সিঙ্গাপুর 'কজওয়ে'র এপারে কত আর ওপারেই বা কত, তাদের মধ্যে ভারতীয় কত—কিছুই মিষ্টি কথায় বের করা গেল না।

বহু তর্জন গর্জন অত্যাচারেও কিছু ফল হল না। সর্বাঙ্গে যত রক্তধারা ছুটল তাতে সামান্য একটু খবর দিলেই ওষুধের প্রলেপ পড়বে এ প্রলোভনেও কিছু হল না। দেহ বিবশ। মাথা প্রায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবুও না।

নীরেনের এমনভাবে আহত আর প্রহৃত হবার কোনরকম সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই সীমার মনে আসবে না। তবু সে এই অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার করবে না। সামরিক শপথকে সবল করে তুলল সংসারাতীত প্রেমের স্বীকার। না, নীরেন চৌধুরী সবকিছুর উপরে। সব কিছু ছাপিয়ে যাবে।

অন্ধকার জঙ্গলের বেড়াজাল এড়িয়ে তার প্ল্যাটুন পোল পার হয়ে দক্ষিণে মুক্তির দুয়ারে পৌঁছে গেছে কি? দেশ দেশের ডাক কত মহান, দেশের ভালোবাসা কত সবল, কত সর্বব্যাপী। এই মালয়ের জঙ্গলে বিদেশের অন্ধকারে দেশ আর যার জন্য দেশ এত আকাঙ্ক্ষিত এত মনোরম সেই সীমা নীরেনের রক্তমাখা মুখের দুটি মুদে-আসা চোখের সামনে জেগে উঠল।

হঠাৎ লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল মেজর নীরেন চৌধুরী। নিজেরই রক্তে তার মুখ রক্তরাঙা হয়ে গেল। রক্তে চোখদুটিও ভরে গেল।

জাপানিরা আর ওর উপর সময় নষ্ট করবে না। এখনই ধেয়ে যেতে হবে সিঙ্গাপুরের দিকে।

একজন অর্ডার দিল—বানজাই, বানজাই। বেয়নেট প্র্যাকটিস।

অর্থাৎ বন্দীকে তুলে ধরো, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হাত-পা বাঁধ। তারপর আনকোরা নতুন সৈন্যরা জ্যান্ত বন্দীর উপর বেয়নেট বেঁধানো প্র্যাকটিস করবে। বন্দীকে কাজে লাগাতে হবে তো।

বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখার হাজারো ল্যাঠা। প্রিজনার অব ওয়ার কনভেনশন নিয়মটা একটা বেজায় রকম অসভ্য অসুবিধা।

হঠাৎ বেয়নেটধারীর দল বোধহয় থমকে দাঁড়াল। একটা জীপের মতো গাড়ির মোটর গর্জন করে উঠল। তার উপর থেকে সম্ভবত সেই জেনারেলই হুকুম দিলেন, না, বেয়নেট নয়। ওকে বাঁচিয়ে রাখ। শিগগিরই অন্য কাজে লাগতে পারে।

শক্ত রশির বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অচেতন দেহ মাটিতে ঢলে পড়ল।

রক্ত গোলাপের স্তবকের মতো দেখাচ্ছিল নীরেনের মুখ। সেই স্তবক যা সীমার হাতে স্তব্ধের মতো নীরবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল একদিন।

রক্ত গোলাপের স্তবক।

॥ সতেরো ॥

নারী না হয়ে যদি ঘোড়া হয়ে জন্মাতাম।

প্রায় মনে মনেই কথাটা বলেছিল মেখলা।

স্বয়ম্ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সুশিক্ষিত অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এমনিভাবেই চমকে গেলে থমকে দাঁড়ায়।

এই তরুণ রূপসী মেখলার স্বামী ফিল্ড রেজিমেন্টে সদ্য প্রমোশন পাওয়া ক্যাপ্টেন। সুন্দর বাংলো বাড়ি; মিলিটারি কেতায় ছিমছাম। আসবাবপত্র ফিটফাট। প্রকাণ্ড একটা পুরনো ওল্ড্‌সমোবিল আমেরিকান মোটর। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ি; তার মিলিটারি নাম ট্র্যাপ।

আর অন্তত পুরো এক ডজন চাকর-বাকর। কিন্তু চাকর বললে তাদেরও মর্যাদাহানি হবে। আর মনিবের তো হবেই। কারণ তাদের পরিচয় হচ্ছে বাটলার, খানসামা, খিদমতগার ইত্যাদি ইত্যাদি। পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে পদের মর্যাদা আর মাইনে।

এই ধরনের বাংলো বাড়ির চৌহদ্দি আর চটক, ঠাট আর জমজমাটি বাইরের বাকি দশজনের কাছে হিংসা আর কল্পনার খোরাক।

কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে সেখানকার সেরা ঘর হচ্ছে বুটখানা। বৈঠকখানা নয়, বুটখানা। গোটা একখানা কামরা শুধু শ্রীচরণের সেবায় উৎসর্গ। হরেক রকমের আর ফাশনের জুতো সেখানে।

নতুন প্রমোশন পেয়েছে স্বয়মের সিনিয়র বন্ধু মনোহর শর্মা। রাঁচি এরিয়াতে এই ফিল্ড্ রেজিমেন্টে সে নতুন এসেছে। ট্রেনিংয়ের সময়ে পরিচয় হয়েছিল। শর্মা তখন খবর পেয়েছে যে সে প্রমোশন পেয়েছে। আর খুব ভালো বাংলো পাচ্ছে রাঁচি এলাকায়।

আর্টিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনীর তখন খুব নামডাক। রয়্যাল আর্টিলারির খাস ব্রিটিশ অফিসাররা এই রকম রেজিমেন্টে সগৌরবে ডেপুটেশনে আসে, বড় খাতিরের পেয়ারের বাহিনী।

তার উপর মনোহরের মতো গো-অ্যাহেড, আগুয়ান চালু অফিসার ইন্ডিয়ানদের মধ্যে খুব বেশি হয় না। ব্রিটিশ 'বস'রা তো এত সন্তুষ্ট যে, ওরা মনোহরকে ম্যানর বলে ডাকতে অজ্ঞান।

সেই ম্যানর স্বয়ম্‌কে নিমন্ত্রণ করেছিল একটা সপ্তাহান্তে ছুটি নিয়ে ওর বাংলোতে অতিথি হতে। এবং

সে সময় গেস্ট-নাইট আছে। স্ট্যাগ পার্টি অর্থাৎ বল্লাবিহীন হরিণদের পার্টি আর তার পরে একই রাতে হরিণীদের আগমন। রস আর রোম্যান্স, রঙিন সুরা আর রঙ্গিণী নারী দুইয়েরই ব্যবস্থা।

অবশ্য নারী মানে প্রিয়া আর প্রেয়সী। তার বাইরে কিছু নয়। পোশাকী জীবনে পিছনের জানলা দিয়ে ছিটেফোঁটা কাদাও চালান করা চলবে না। অর্থাৎ অসামাজিক নারীর স্থান নেই।

যে কোনও দিন যুদ্ধে যাবার অর্ডার আসতে পারে। তাই উর্ধ্বশ্বাসে জীবনটা নিংড়ে আস্বাদন করে নিতে হবে।

আজকের দিনটাই সত্য। গত দিন হয়ে গেছে বিগত। আগামী দিন অজ্ঞাত। তাই যেটা সত্য, যেটা মুঠোর মধ্যে সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে।

জঙ্গী জীবনে ওমর খৈয়ামের দর্শন হচ্ছে একমাত্র মন্ত্র। আজকের মাধুরীই একমাত্র মধু।

সেই সত্যে দীক্ষা দিতে হবে এই রসহীন গম্ভীর প্রকৃতির সুইট বয়কে। সিনিয়ার অফিসাররা জুনিয়ার ছোট ভায়াদের এমন করেই ছোট থেকে মানুষ করে তোলে। সিভিল আর মিলিটারি দুই প্রশাসনেই।

অতএব স্বয়মের মতো একটি আনকোরা ছেলেকে ম্যানর সপ্তাহান্তে একটু পালিশ করে দিতে চায়। একেই বলে ক্যামরাডেরি।

তার উপর বাড়িতে একা থাকে মেখলা। নতুন বিয়ের পর এসেছে। সবে বাংলোটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন থেকে বাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে হাত পাকাতে হবে।

সে হিসাবে স্বয়মের মতো গেস্ট মেখলার শিক্ষার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। স্বামীত্বের ডিপ্লোম্যাসি পরীক্ষাতেও সে সসম্মানে প্রমোশন পেত। এ কথা ভেবে মনোহর নিজের বুরুশ মার্কা গোঁফে একটু তা দিয়ে নিয়েছিল।

সেই গোঁফজোড়া আর তাতে মোম মাখানো মোচড় স্বয়মের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেই দরদ ভরা দৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে এই ঘরে ঝকঝকে গ্রীনলি নামের রাইডিং বুট, যোধপুর, ওয়েলিংটন হন্টিং বুট, ইউনিফর্ম বুট, পি.টি বুট, ছুঁচোলো অক্সফোর্ড সু। শুধু জঙ্গী বুটের জোড়াগুলিই নয়, বেসামরিক নিজস্ব জীবনেও জুতি নাহি ছোড়তা। নটবর ধাঁচে ড্রেসিং গাউন পরে আরাম করবার জন্য পাম্প সু, ঘরে ঘরে ঘোরার জন্য কোলাপুরী চপ্পল, বাগানে বেড়াবার জন্য পাঠানী চপ্পল আর ঋতু অনুসারে পরবার জন্য লোমশ ফারের আর মখমলের বেডরুম স্লিপার।

দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে ড্রিলের পোশাকে বাঁধবার স্যাম ব্রাউন বেল্ট। প্রকাণ্ড কাঠের আলনাতে ঝকমক করছে ঘোড়াকে পরানোর জিন আর রেকাব—যে ঘোড়া হয়ে জন্মালে এই পরমা রূপসী নারী সুখী হতেন।

তার অন্তরের ব্যথার অন্তরঙ্গ স্বীকারোক্তি।

মেখলা মিথিলার প্রাচীন জমিদার বংশের ধনী জমিদারের মেয়ে। স্বয়মের মনে পড়ল—জনমদুখিনী সীতা। মনে মনে প্রার্থনা করল যে এই মৈথিলীও যেন সীতার দুঃখ না পান।

ম্যানরকে যে খুব তাড়াতাড়িই মিথিলার মেয়ে নতুন বিয়ে করা স্ত্রীকে ছেড়ে যুদ্ধের দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এই প্রমোশনটা তারই একটা মোলায়েম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। আজকের সুখে মশগুল ম্যানরের নজরে তা হয়তো পড়েনি এখনও।

কিন্তু সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলা চলবে না। সে যে মেখলার মনের দুঃখের একটুও আঁচ পেয়েছে সে কথাও প্রকাশ করা চলবে না। আবার এত বড় গভীর একটা আক্ষেপকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে গেলেই সেটা আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠবে।

হায়! অনুভূতিময় অন্তরে যন্ত্রণাময় অনুভবের অন্ত নেই—

তাই স্বয়ম্ বলল, জানেন মেখলা দেবী, আমাদের মেসগুলিতে যা মাতামাতি হয় ঘোড়ার আলোচনা নিয়ে। চামড়ার কী গুণ, কী মান, কী করে তার জেল্লা বাড়ানো যায়, এসব নিয়ে তর্কাতর্কি চলে হরদম। সম্ভবত তাতে আমাদের মরাল 'বুস্ট' করা হয়। মনের জোর বাড়ানো হয়। এই ধরুন না, আজকাল আমার মেসে প্যারাশুট সিল্ক নিয়ে যাচাই শুরু হয়েছে। যে রেশমের কাপড় আপনাদের শ্রীঅঙ্গে মানাতো তা নিয়ে আমরা হনুমানরা নাচানাচি করছি। হাওয়ার মাতনে।

গৃহকর্ত্রীকে মিসেস শর্মা বলে ডাকতে স্বয়মের বাধল। তাতে আন্তরিকতা আসতে দেরি হবে। মৈথিলী

বলে ডাকতে ওর খুব লোভ হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনই অতটা এগোলে বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

অথচ জঙ্গী জীবনে পরমায়ুর শ্বাস যে হুস হুস করে বয়ে যায়। তার উপর এয়ার বোর্ন প্যারা রেজিমেন্টে। আকাশী ঝাঁপের সময় হয়তো প্যারাশুটের ছাতি খুলবে না। হয়তো শুটের বা নিজের ছাতিই শত্রুর চাঁদমারীতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

তাই তো সামরিক জীবনের সবাইকে এত ভালোবাসি। এত তাড়াতাড়ি বুঝতে, আপনার করে নিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতার লাইনগুলি স্বয়মের সব সময় মনে পড়ে। সময় যে নাই।

আর স্বয়মের যে দৌড়াবারও সময় নেই। উড়ে চলছে ওর জীবন। ঝড়ের রাতেও বিরাম নেই। সেটাই তো মস্ত কথা। কিন্তু সমস্ত কথা নয়।

জঙ্গী জীবনে স্বয়ম্ সকলকে আপনার মতো করে নেবার, একসঙ্গে গেঁথে নেবার অদৃশ্য মাল-মশলার স্বাদ অনুভব করেছিল। কোনও দিন নিজের পরিচিত অসামরিক জীবনে এই জিনিস সে পায়নি।

একটা মিলিটারি ঘাঁটিতে দেশের ছত্রিশ জাতের লোক। নানা ভাষার নানা পরিবেশের নানা ভাবধারার লোক কেমন যেন এক ছাঁচে গড়ে ওঠে। তাদের বাংলো আর ব্যারাক, প্যারেড আর পি. টি. অর্থাৎ ফিজিক্যাল ট্রেনিং, খানা আর পিনা সবই যেন এক সূত্রে সহস্রটি মন গেঁথে রাখার মন্ত্র।

সবই যেন জীবনের এক বৃন্তে এসে কেন্দ্র নিয়ে বসেছে। সেই কেন্দ্রটি হচ্ছে মরণের আমন্ত্রণ।

স্বয়ম্ মনে মনে ভেবেছে যে, মনের গহনে সেই অনুচ্চারিত অঘোষিত মন্ত্রটি আছে বলেই বোধহয় মিলিটাবিরা যেখানে যে অবস্থাতেই যায় মানুষ প্রকৃতি আর প্রাণীকে নিয়ে নিজেদের সংসার গড়ে তোলে। পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না।

সেই এক হয়ে যাবার মন্ত্রে যারা দীক্ষা নিয়েছে তারা আর তাদেব স্ত্রীবাও তো সেই নিটোলভাবে এক হয়ে যাবার কথা। বরং আরও বেশি করে, অনেক বেশি নিবিড়ভাবে। নিজেদের নিঃশেষ করে।

কারণ যে কোনও বিচ্ছেদই তো শেষ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে।

তবে?

স্বয়ম্ ভাবল যে এই রূপসী তরুণী নববিবাহিতার সঙ্গে একটু রসালাপ করলে শাস্ত্র অশুদ্ধ হবে না। সহকর্মীব সহধর্মিণী।

জঙ্গী জীবনে যে রঙিন নেশা মানুষকে মাতিয়ে রাখে তা সঙ্গীন মুহূর্তগুলিতেও বাঁচবার দিশা দেয়। তাই তো সেনাদল মরবার জন্য, মারবার জন্য সাহস পায়।

এই সহজ কথাটা আমরা বুঝি না বলেই তো সামরিক বৃত্তি থেকে সরে থাকি। মুখ ফিরিয়ে থাকি।

কিন্তু এই মহিলা অকস্মাৎ নিজের মনে যে কথা বলে ফেলেছেন তার পর আর কি করে হালকা হাসি-ঠাট্টা করা যায়?

অন্যপক্ষে ওর মনকে যদি একটু হালকা করে তুলতে পারি তাহলে বরং মনে করব যে আতিথ্যের একটুখানি প্রতিদান দিয়ে গেলাম। কিন্তু কী করে আরম্ভ করব?

আরম্ভ করার পথ শ্রীমতী শর্মাই খুলে দিলেন। বললেন, চলুন, বারান্দায় বসে কফি খাওয়া যাক।

স্বয়ম্ শর্মার জন্য অপেক্ষা করতে চাইল। কিন্তু মেখলা বলল, না স্যাম, ওর জন্য অপেক্ষা করার মানে হয় না। ও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে তোমার আসার আগে। কাল রাতেও ঘোড়ার তদারকেই বেরিয়েছিল।

—কেন? রাতে তো অর্ডারলি অফিসার আচমকা তদারকি করতে যায়।

—তবু মনোহর নিজেই গেল। শেষ রাতে। একেবারে পুরোপুরি ধড়াচূড়া পরে। ব্লু প্যাট্রল আর জ্যাকেট, ক্যাপ আর তলোয়ার। যেন পটে আঁকা ছবি।

স্বয়ম্ লক্ষ করল যে রক্ষণশীল ঘরের নববিবাহিতা বধূ স্বামীর নাম কোনরকমে সলজ্জভাবে উচ্চারণ করল। না হলে অন্যান্য রেজিমেন্টাল ঘরণীরা ঠাট্টা করে প্রাণ বের করে দেবে। অবশ্য ম্যানর নামটি এখনও মুখে ফুটছে না।

আহা, যতদিন এই আধো ডাকা আধো ফোটা লজ্জা ওর স্বপ্নকে জড়িয়ে রাখে ততদিনই তো রোম্যান্স।

হালকা হেসে স্বয়ম্ বলে উঠল, আমি কিন্তু আরেকটা ছবিও দেখতে পাচ্ছি, মেখলা দেবী। বিলেতি মায়েরা তাদের মিলিটারির স্ত্রী মেয়েদের শিখিয়ে দেয় : স্বামীর সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করো। বিলেতি মিলিটারির বরদের বাপরা পরামর্শ দেয় : স্ত্রীকে ঘোড়ার মতো যত্ন করো।

ওস্তাদ ক্যাভালরিম্যান আমাদের ম্যানর শিব্যালরিম্যান হিসাবে নিশ্চয় কম যায় না—বলেই সে হাসল।

মৈথিলীর মুখে লজ্জার অরুণিমা ফুটে উঠতে দেখে স্বয়ম্ খুশি হল।

তবু মেখলা অনুযোগ করল—আমি বললাম, এমন আঁটসাঁট পোশাকে শীতের কী যন্ত্রণা!

মুখ ঘুরিয়ে সে তেড়ে এল, তুমি এসব বুঝবে কী? শেষ রাতই হোক আর শেষ দিনই হোক, আমায় যেতেই হবে। গার্ডদের পুরো কায়দায় টার্ন আউট করতেই হবে। শুধু সিপাহী নয়, সোয়ারদেরও দেখতে হবে। ঘোড়াই হচ্ছে ব্যাটারি কম্যান্ডারের প্রথম প্রেয়সী।

মেখলা বলে চলল, স্যাম, তুমি জানো না। কী গম্ভীর হয়ে উঠল ওর মুখ। সে বলল—মেয়েদের যৌবনের চেয়ে ঘোড়ার কন্ডিশন বেশি দামী। তার চিকণ ত্বকের জেল্লা মেয়েদের ত্বকের কমনীয়তার চেয়ে বেশি সাধনার ধন। সংসারে সবচেয়ে বড় বিউটির প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেরিমোনিয়্যাল প্যারেডে চামড়া আব পিতলের ঝলমলানির মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকা চার্জারের দল।

তার পব—তার পর সে মুখ ঘুরিয়ে শুনিয়ে গেল—মাই মাউন্ট ইজ মাই শেরি। আমাব ঘোটকীই আমার প্রিয়া।

বলেই স্বামী আমার শূন্যে একটা চুমু ছুঁড়ে দিল।

—ওহ্ ওহ্ ভাবীজি, তোমাকে বাচ্চা মেয়ে পেয়ে ম্যানরদা একটি মোক্ষম লেগ পুল করে গেল। তুমি বুঝলে না সেকথা?

অভিমানিনীর মনের ব্যথা মুছিয়ে দেবার জন্য ভাবের আবেগে স্বয়ম্ মেখলাকে বৌদি বানিয়ে দিল।

কিন্তু বৌদি সীতার দেশের মেয়ে। স্বামীর সবটুকু তার চাইই, সর্বস্ব, সব সুখদুঃখ। কিবা রাজপাটে কিবা বনবাসে।

ঘোড়াশালে অশ্বশালার সইস এবং অন্যান্যরা যা যত্ন-তদারক করে অভিজাত ঘোড়দৌড়ের বা ক্যাভালরির ঘোড়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। সোয়ার সেনানী নিজে হাতে অশ্বকে দলাই-মলাই করে। স্পর্শনে আর ঘর্ষণে পেষণে আর পোষণে যেন ফুটে ওঠে প্রেমস্পর্শ। আর অশ্বও সে সবই বুঝতে পারে। শুধু হাতের তালুকে পেয়ালার মতো করে নিয়ে চাপড়ে দেবার আদরটুকু সে বুঝতে ভুল করে না।

সারাদিন কাজ শিক্ষা আর ব্যায়ামের পর সোয়ার যখন তার মুখে নিজের হাতে গাজর, গুড় কিংবা ঘাস গুঁজে দেয় কোনও প্রেমিকের চুম্বনের চেয়ে কম প্রত্যাশিত সেই প্রেম?

মেখলাও তেমনি করে স্বামীর সব আদর যত্নই চায়।

মেখলা বলল, জান স্যাম, শুধু এই সময়। বাইরের জগতে লোকে দেখে এদের পোশাকের বাহাব। ভোরে প্যারেডের জন্য খাকি শার্ট আর ট্রাউজার্স, পি. টি.-র জন্য সাদা শর্ট আব শার্ট, ডিনারের জন্য ডিনার জ্যাকেট, রাতের ইনসপেকশনের জন্য ব্লু প্যাট্রল গাঢ় নীলের উপর লাল ডোরা। তার উপব ওয়েলিংটন আর তাতে সাঁটা ঝকমকে নিকেল প্লেটেড স্পারস্। আর টুপির বাহারই বা কম কী? সিঁদুরে নীলে মেশানো গ্লেনগেরি ক্যাপের উপর সোনালি ঝুলসী ঝালরের মতো ঝলমল করছে।

কোন্ সুইট সেভেনটিন, কোন্ মিষ্টি সপ্তদশীর মন তা দেখে না গলে যাবে, ঢলে পড়বে? প্রশ্ন করে বসল মেখলা।

স্বয়ম ভাবল—এইবার পথে এসো ভাবীজী। এ যুগে বিবাহ হচ্ছে প্রেম আর প্রেম হচ্ছে অন্ধ। তাই বিয়ে হচ্ছে অন্ধদের প্রতিষ্ঠান।

তোমার চোখ তখন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল মিলিটারির চটকে। এখন মনকে মজিয়ে রাখো তার পোশাকের বাহারে। আজ রাতে যখন তোমার স্বামী মেস কিটে সেজে নীল আর রেশমের পাড় বসানো আঁটো জ্যাকেট পরে আর কালো প্রজাপতি মার্কা টাই কঠিন কলারের উপর বেঁধে লাল-নীল—সোনালি পোশাক-আশাকে সেজে চরণ রুপোলি স্পারের লহরা তুলে নাচতে যাবে তখন তোমার মনকে তাতেই মজিয়ে রেখো।

মুখে অবশ্য সে কথা বললে না।

সে শুধু বলল, ভাবীজী, বাইরের সাজগোজ আর ডিউটিতে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ এটা তো আমাদের জীবনের একটা 'মাস্ট' উপকরণ দিয়েই হয় পূজার প্রথম পাঠ। শুধু মিলিটারি কেন, সিভিল জীবনেও তাই হওয়া উচিত। ইংরেজদের মধ্যে সেটি আছে বলেই ওরা এত বড় হয়েছে। ম্যানরদা যে প্রাণপণে ওদের বিদ্যাগুলো শিখছে, তার পিছনে জেনে রেখো তোমার কথাই প্রেরণা জোগাচ্ছে। আজ সে ক্যাপ্টেন, কাল সে

কম্যান্ড পাবে। সবই তো তোমার জন্য।

মেখলা হেসে ফেলল প্রসন্ন হয়ে। জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে জানলে? বড় যে অভিজ্ঞ লোকের মতো কথা কইছ।

—সবাই সংসারে বোকা হয় না; কিছু কিছু লোক থাকে চালাক। অবশ্যই তারা অবিবাহিত।

কথাটার প্রচ্ছন্ন ঠাট্টা বুঝতে পেরে মেখলা রাগে ঝলমল করে উঠল। অন্তত স্বয়মের চোখে এই ক্ষণে তাই মনে হল।

—তা ঠিক বলেছ। নারী সম্বন্ধে অবিবাহিতরা বিবাহিতদের চেয়ে বেশিই বোধ হয় জানে। মেখলা বলল।

স্যালুট করার ভঙ্গিতে হাত তুলে স্বয়ম্ জবাব দিল, ভাবীজী, যে সমাজে আর যে মিলিটারি মহলে তাদের সেই অভিজ্ঞতা হয় সেখানে আমি নতুন ঢুকেছি। বলতে গেলে এখনও আমার পৈতে হয়নি। ম্যানরদা ভরসা দিয়ে বলেছে আমাকে শিগ্‌গিরই ব্যাচিলর অব আর্টস অর্থাৎ বি. এ. বানিয়ে দেবে।

—অ্যাঁ, কি সর্বনাশ! তুমি বিয়ে করে বসবে?

—না না। আমাদের মেসে বলে—যে হরদম অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেও কুমার রয়ে যাবার আর্ট জানে সে-ই হচ্ছে ব্যাচিলর অব আর্টস।

—দাঁড়াও, তোমাকে একজন ওস্তাদ এম. এ. অর্থাৎ মিসট্রেস অব আর্টসের গোলাগুলির রেঞ্জের মধ্যে তুলে ধরতে হবে। সেই হবে সমুচিত শিক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য! কলকাতায় তোমায় এ পর্যন্ত কেউ চাঁদমারী করেনি?

স্বয়ম্ কলকাতার কথায় ফিরে যেতে চায় না। কলকাতা মানেই হাহাকার। কলকাতার বিষণ্ণ আকাশে স্বাতী নক্ষত্র দৃষ্টিপথে প্রায় আসেই না। সে কথা থাক।

মুখে সে বলল, জান ভাবীজী, আমার মানদণ্ডটা একটু অবিশ্বাস্য রকম ধোঁয়াটে। এখনও অভিজ্ঞতা হয়নি কিনা। কলকাতায় তেমন সুযোগ-সুবিধাই নেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার।

স্বয়মের উত্তরটা ঠিক লক্ষ্যভেদ করল। ভাবীজী তাড়াতাড়ি সেই মানদণ্ডটা জানতে চাইলেন।

নিজের সঙ্গে যাচাই করে অবশ্যই দেখতে হবে। তরুণীদের নিঃসঙ্গতা আর বিষণ্ণতায় ভালো টনিক।

স্বয়ম্ বলল, কলকাতায় আমরা ভিন্‌দেশী সুন্দরীদের এই পোড়া চোখে দেখার বিশেষ সুযোগ পাই না। তবে সিনেমা পত্রিকা আর বিদেশী জার্নাল দেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। ওয়াই.এম.সি.-এর কাফেতে বসে আমরা একবার স্টুডেন্টস ইন্টারন্যাশন্যাল ঘোষণা করেছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বিদেশী পড়তে আসে। তারাই মুরুব্বি আর তাদের বিচার বিবেচনাই ভরসা।

—আহা তোমাদের রায়ে কি দাঁড়াল তাই বল না। শুধু ভনিতা করে সময় নষ্ট করছ।

স্বয়ম্ মনে মনে হাসল। অন্তত ক্ষণিকের মানসিক শান্তিই বা কম কিসে? সংসারে তার দামই বা কী কম?

মেখলা দেবীর মনের মেঘ একটুক্ষণের জন্যও তো সরে গেছে।

সে বলল, আমরা সবাই ছিলাম ব্যাচিলর। অর্থাৎ নারী বিরাজ করে যাদের মনের মধ্যে, ঘাড়ের উপর নয়।

মেখলার কোপ কটাক্ষ দেখে স্বয়ম্ চকিতে কথা ঘুরিয়ে ফেলল। বলল, থুড়ি, ভাবের আবেগে জিব ফসকে কথাটুকু ভুল বলেছি। ঘাড় নয়, সংসার। স্ত্রীরা তো সংসারের উপরে সর্বময়ী কর্ত্রী।

হ্যাঁ। যা বলছিলাম। আমাদের রায় হল যে তিলোত্তমা সুন্দরী নারীটি গায়ের রঙে হবে ইংরেজ, হাসিতে আইরিশ, চলনে স্প্যানিশ, গড়নে ফরাসি। তার নাক হবে গ্রীক, চুল হবে ইটালিয়ান, চোখ ইরাণি, চিবুক ও চরণ দুটি সুইডিশ। এমনই একটি ডিশ—আই মিন আমেরিকান অর্থে ডিশ—শাড়িতে সাজিয়ে দাও মার্কিন স্মার্টনেস দিয়ে। ব্যাস। এবার সারারাত স্বপ্ন দেখো আর দহন জ্বালায় জ্বলো।

চোখের ধনুখানা টানটান করে মেখলা একখানা তীর হানল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তিলোত্তমার সঙ্গে প্রেম করবে কী করে? আর কী ভাষায়?

লাজুক হাসি এবার স্বয়মের মুখে ফুটে উঠল। অনেক কল্পনাশক্তি খরচ করে সে এই তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করেছে মেখলার মন হালকা করে তোলার জন্য। আর কুলোচ্ছিল না।

সে শুধু হেসে বলল, আমরা সবে ডাঁসা পেয়ারা। আমরা রায় দিলাম যে প্রেম হচ্ছে ভাষার অতীত আর জাত বা দেশের সীমানা মানে না। কী করে প্রেম করতে হয় সে সম্বন্ধে আমরা ভোট নিইনি। বিষয়টা বড় জটিল বলে।

অবশ্য এক আমেরিকান ছাত্র কোনারক আর খাজুরাহোর শিল্পকলা থেকে অনক কিছু শিখে নিয়েছিল। সে আপত্তি তুলে বলেছিল যে বিষয়টি নাকি বড়ই সরল। শিখবার দরকারই হয় না।

—তুমিও আজকাল সরল মনে করো নাকি?

হাতজোড় করে স্বয়ম্ বলল, আমার মনে করাকরির জন্য মিলিটারি জীবনে কিছু যায় আসে না। আমি শুধু জানি যে একবার ট্রেনিংয়ের সময় একটা সুইট অব রুমস দিয়ে কর্তারা বলেছিল যে আমায় নিজে চরে খেতে হবে। ব্যাচিলরদেরও এরকম শিক্ষা হওয়া দরকার।

আমি দেখলাম যে তার মানে হচ্ছে বেশ মজাসে টিন আর কার্টন কেটে জুতসই ব্রেকফাস্ট, চলনসই রকম ডিনার আর সন্ন্যাসে পাঠাবার মতো সাপার। মিলিটারি মেসের দিকে অন্ধকারে জুলজুল করে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ হত না।

ট্রেনিং কিনা!

॥ আঠারো ॥

মেখলারও ট্রেনিং হল সেই রাতেই।

অন্যান্য ভারতীয় অফিসারদের স্ত্রীদের হাতেখড়ি এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিলিটারিতে দেশী অফিসারের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা তেরো। ম্যানর সেই ভাগ্যবান তেরো শতাংশের মধ্যে পড়ে। কাজেই তার পদের মর্যাদা আর জৌলুস যুদ্ধের কল্যাণে যারা নতুন আসছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি।

স্বাভাবিকভাবেই সে এই ঝলমলে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে তাব সময় আর সুযোগ দুই-ই ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু বেচারি মেখলার মাত্র সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। এই জগতে মিশে যাবার সে সুবিধা পায়নি। আজ তাব হাতেখড়ি হবে প্রথম মেস নাইটে ককটেল পার্টিতে।

স্বয়ম্ সঙ্গে থাকায় যে এই দীক্ষার ব্যাপারে সুবিধা হবে তা মনোহর হিসাব করে নিয়েছিল। শান্ত গভীর প্রকৃতির নতুন রিক্রুট জুনিয়ার অফিসার মেখলার আনাড়ি ভাবকে ঢেকে চলবে। ঠাট্টা করে বা অনুকম্পার দৃষ্টিকে ছোট করবে না।

হায়! এই মেস কি সেই ছক্কু খানসামা লেনের মেস নাকি?

কোনও বাঙালি সাহিত্যিক প্রথম যুগে ব্রিটিশ মিলিটারি মেসের বর্ণনা শুনেই হয়তো রসিকতা করে চালচুলোহীন আমাদের পাইকারি খাওয়া থাকার আস্তানাগুলির নাম দিয়েছিল মেস। সে সম্বন্ধে গবেষণা করার সময় স্বয়ম্ পায়নি।

সে শুধু আশ্চর্য হয়েছিল এই দেখে যে, যে সামান্য মাইনেতে সামরিক জীবন সে শুরু করেছে তাতে এই ভদ্র পরিচ্ছন্ন আর সাজানো গোছানো আস্তানা অসামরিক জীবনে কল্পনাও করা যায় না। যে টাকা তাকে দিতে হচ্ছে তার বিনিময়ে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বা মধ্য কলকাতায় কী আর কী খাবার পাওয়া সম্ভব তা মনে করতেও ওর সংকোচ এসেছিল।

সে হিসাব করে দেখেছিল যে সরকারি অনুদানে কেনা ক্রোকারি আর কাটলারি আর বাসিন্দাদের দানে সাজানো হরিণের শিং বাঘের ছাল প্রভৃতি ট্রফি বাদ দিলেও মিলিটারি মেসে অল্প পয়সায় যা পাওয়া যায় তা কল্পনা করা যায় না। সুব্যবস্থাই সস্তার কারণ।

মেস তো মেস নয়। একেবারে যাকে বলে হোম। মেসের বাংলোর চারপাশে অবিবাহিত অফিসারদেব কোয়ার্টার্স। হয়তো জনা পঁচিশ-ত্রিশ অফিসার—প্রায় সবাই জুনিয়র অবস্থায় মেসে নিয়মিত খেতে আসে। বিবাহিতরা বাইরে বাংলো পেয়ে যায় অল্পদিন অপেক্ষার পরেই।

সপ্তাহে দিন চারেক ডিনার নাইট আর একদিন অতিথির রাত। সে সব ডিনার তো শুধু খানাপিনা নয়। যাকে বলে একেবারে প্যারেড।

আর অবিবাহিত দিনগুলিতে মেসে বাসের যে আনন্দ ছিল তা স্মরণ করে বিবাহিত অফিসাররাও

দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শুধু বেপরোয়া মুখ ছোটানো বা বোতলের কর্ক ফাটানো নয়। নির্ভেজাল চিন্তাহীন রসাল রঙিন মুহূর্তগুলির জন্যই সেই দীর্ঘশ্বাস। ওরা কতবার যে স্ত্রীদের বলে ফেলেছে যে মেসকে মিস করছে তার আর হিসাব নেই।

স্বভাবতই মিলিটারি স্ত্রীরা মেসকে সতীন মনে করে।

মেখলাও করেছিল।

সন্ধ্যাবেলা তৈরি হতে যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্বয়মকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তুমি তো ব্যাচিলার, তুমিই বল বৌয়ের চেয়ে মেস কেন তোমাদের চোখে বড়?

সাবধানে স্বয়ম্ উত্তর দিল, খুব স্বাভাবিক। যখন যুদ্ধ থাকে না তখনও নন ফ্যামিলি এরিয়াতে বদলি হলে তোমরা আমাদের ত্যাগ করো। কিন্তু তোমাদের দেশের সীতার মতো মেস আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। অপেক্ষা করে বনে, পাহাড়ে, দুশমনে ঘেরা ঘাঁটিতে।

—কিন্তু ফ্যামিলি স্টেশনেও তো তোমরা মেসে ছোটার জন্য ব্যাকুল।

—সে কথা ঠিক। একসঙ্গে গড়েপিটে রাতদিন না কাটালে যুদ্ধের সময় ঠিকমতো বোঝাবুঝি হবে কী করে? একসঙ্গে লড়ব আর মরব কী করে?

—তবু তো তোমরা হামেশা স্ট্যাগ পার্টি করো। শুধু পুরুষদের পার্টি।

—করি। কারণ মহিলারা সঙ্গে থাকলে আমাদের হয় সব চেয়ে ভালো, না হয় সবচেয়ে খারাপ 'নটি' সাজতে হয়। তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক সহজ রূপে থাকি না।

একটা স্যালুট করে স্বয়ম্ বলল, আচ্ছা, এখন যাই, ভাবিজী। আমাদের হরিণীহীন স্ট্যাগ পার্টির মেয়াদ মাত্র দেড় ঘণ্টা। ততক্ষণ। সো লং।

সেই দেড় ঘণ্টায় যা হাসি হৈ হৈ আর হুল্লোড় হল তা যেন সঞ্জীবনী সুরা।

মিলিটারি আড্ডা, অশালীন গালি আর ঠাট্টার ব্যবহার আর চড়া মদ এই তিনটে বাইরে থেকে স্বয়মের চোখে ত্রিবেণী সঙ্গমের মতো মনে হত।

এখন ওর মত কিছু কিছু বদলেছে। এখন সে মনে করে অসীম ক্লান্ত মুহূর্তে অনন্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে শুধু একটি পানপাত্রে যদি এক বিন্দু প্রাণ ফিরে পাওয়া যায় তাতে কারও কোনও ক্ষতি বা কিছু ক্ষয় হয় না।

একবার তার মনে পড়ল মাইকের কথা। স্কুল অব ইকনমিকসের ছাত্র ছিল যখন তখন সে সম্ভবত পান করতই না। এখন যুদ্ধ-বিভাগে যোগ দিয়ে সে যেটুকু পান করে তাতে তার অকল্যাণ হয়নি। মনে পড়ল যে সে নিজেই প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যায় রামায়ণের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সৈন্যদের সুরা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের উদাহরণ দেখিয়েছিল।

কিন্তু মেস নাইটে স্ট্যাগ পার্টিতে সে যে সুরাস্রোত বইতে দেখল তাকে সে সমর্থন করতে পারল না। মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বিশেষ করে এজন্য যে, একটু পরেই মহিলারা যোগ দেবেন।

অবশ্য তাদের মধ্যে ভারতীয়রাও কেউ কেউ বেশিই পান করবেন। তাই তার অপ্রসন্নতা বেড়েই গেল।

পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিল একজন মেজর ইংরেজ। তাড়াতাড়ি সে সম্মান দেখাল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসি হানল ইংরেজটি—কি? মনে তোমার কিসের বোঝা, স্যাম? প্রেমে পড়েছ? না, কোনও মেয়ে তোমায় শিকারের জন্য তেড়ে আসছে? বল দেখি বাছা? আই হ্যাভ গট দি মেডিসিন।

হেসে স্যাম তার তখনও প্রায়-অস্পৃষ্ট শেরির গ্লাসটা তুলে ধরল। ছোটদের গল্পের শিয়ালের মতো এই একটি গ্লাসই সে সারা সন্ধ্যা দেখাবে।

—সাবাস! তুমি ঠিক তরে যাবে। তবে জেনে রেখো যে বেশির ভাগ পুরুষই নারী সম্বন্ধে সব জানে, কিন্তু স্ত্রী সম্বন্ধে একেবারে কিস্‌সু না। অতএব সাধু সাবধান।

নারী আর স্ত্রীর মধ্যেকার সূক্ষ্ম তফাতটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে মেজর তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল।

পাশ থেকে ক্লিক করে বুটের আওয়াজ তুলে যোগ দিল আরেকজন ইংরেজ অফিসার।

সে বলল, তবে জেরিদের এ সম্বন্ধে যা অভিজ্ঞতা আছে তা আমাদের নেই। ডানকার্কে সমুদ্রতীরে বন্দী

থাকার সময় শিখে নিয়েছি যে হুনরা ওদের হুরিদের কি চোখে দেখে। ওরা বলে নারী হচ্ছে পেঁয়াজ। জীবনে ঝাঁজ মেশাবার জন্য। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পর্যন্ত বলে সে একবার চারিদিকে তার নজর ছড়িয়ে দিল। সহৃদয় হুবি না শত্রুপক্ষের হুন কাদের সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার হদিস নেই।

শেষ পর্যন্ত সে গ্লাসটি প্রেমসে মুখের, মানে ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে রসিয়ে আবৃত্তি করল :—

"নারী হচ্ছে শুধুই পিঁয়াজ;
শোভন সুঠাম তার সাজ।
খোল তার আবরণখানি,
নেই হিয়া, নেই দয়া;
কাঁদো হেরি কঠিন পরাণী।"

* * * *

আমি বন্দীশিবির থেকে খালি হাতে পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এই অমূল্য শিক্ষাটি সঙ্গে নিয়ে। খোদ হিটলারের খাস দাওয়াই।

ততক্ষণে মিলিটারিদের স্ত্রীরা আর নিমন্ত্রিত কয়েকজন ওয়াক-আই,—যুদ্ধের আনুষঙ্গিক গোপন কাজের জন্য বিলেত থেকে সদ্য আমদানি ইংরেজ তরুণী এসে পৌঁছেছে। কাজ আর মজা দুই-ই হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে ওদের উপস্থিতিতে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

সে কি দৃশ্য। সোনালি বা মধু রঙের তারার আকারের বাতি। বিরাট হলটা আর তার পাশের কামরাগুলি মোলায়েম মখমলের পর্দায় সাজানো। হরিণের শিঙওলা মাথা, বাইসন আর হাতির দাঁত, পুরনো বন্দুক আর ঝকঝকে নতুন স্পোর্টস কাপ সুন্দর রুচিসম্মতভাবে সাজানো।

ইস্পাতের মতো কঠিন যাদের কাজ ফুলের মতো কমনীয় তাদের সঙ্গিনীরা। আর বাসরের আতিশয্য না থাকলেও ফুলের ঘটা কী আর ফুলদানিগুলির ছটাই বা কী।

অপ্সরাদের পরার যোগ্য ইভনিং গাউন আর শাড়ি, ভারতীয় মহিলাদের ঝলমলে সোনা মুক্তো হীরের গহনা, বিদেশিনীর অঙ্গে মুক্তো না হয় কসটিউম জুয়েলারি।

আর পারফিউম? সুরভিসার? এই যুদ্ধে বাজারেও শ্যানেল নম্বর তিনের উন্মাদনায় পরান অরুণবরণী।

স্বয়মের উপর গোপনে ভার দেওয়া হয়েছিল মেখলাকে চালিয়ে নেবার। নতুন প্রমোশন পাওয়া ক্যাপ্টেন স্বামী ব্রিটিশ ট্র্যাডিশন অনুসারে পায়ের ওয়েলিংটন বুট থেকে স্পারস্ খুলে নিয়ে ব্রিটিশ মেজরের স্ত্রীর সঙ্গে তদগতচিত্ত হয়ে নাচছে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট হয় যে। কাজেই নিজের স্ত্রী অন্যের হেপাজতে। বিলেতি এটিকেটও তাই ই বলে।

ওয়েটারদের বকের পালকের মতো শাদা পোশাকে বুকের উপর সোনালি লাল মনোগ্রাম, কুলো পাগড়িতে সোনালি এবং সিঁদুরে রঙের পাড় আর ঝালর ঝলমল করছে। তারা ট্রেতে করে ড্রিঙ্ক, ঈটস পানীয় আর চুটকি খাবার নিয়ে সাদা দস্তানা পরা হাতে সসম্ভ্রমে পরিবেশন করে যাচ্ছে।

বিলেতি মেমরা খাবারের চেয়ে পানীয়ের দিকেই বেশি মন দিচ্ছে। দেবে না-ই বা কেন? মেখলা দেখল যে ওদের হাতে কি সব চমৎকার রঙের পানীয়ের কাট গ্লাসের ছোট পাত্র। তার মধ্যে ভাসছে চেরি।

চেরি? অর্থাৎ কি না শেরি?

'মাই মাউন্ট ইজ মাই শেরি' ঘোষণা করেছিল মনোহর। মেখলার মন আনচান করে উঠল। ছোট্ট বিস্কুটের উপর সাজানো সুডোল একটা ডিমসেদ্ধর টুকরো নিয়ে দাঁতে খুঁটতে খুঁটতে সে মনোহরের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকাতে লাগল।

কিন্তু বিলেতি পার্টিতে স্বামীই না কি পরপুরুষ। দূরে সরে থাকবে।

জার্মানদের বন্দীশিবির থেকে যে বীরপুরুষ পালাতে পারে, ত্রস্ত ভীরু হরিণী মেখলার চাহনি কি তার নজর এড়াতে পারে?

সে টুক করে এগিয়ে এসে স্বয়মকে বলল, যাও না স্যাম, কর্নেলের ঘরণীর গ্লাসটা শুকনো শুকনো মনে হচ্ছে। তুমি নতুন অতিথি। তুমি সেটা আরও সুরা দিয়ে চার্জ করে দিলে আমাদেরই মান বাড়বে।

অভিজ্ঞ সিনিয়রের অনুরোধ রক্ষা করতে হয়।

শুধু ভদ্রতা নয়, ডিসিপ্লিনও বটে।

ততক্ষণে প্রাক্তন বন্দী খোলা মাঠ পেয়ে গেছে। মেখলাকে খুব আপনজনের মতো অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী পান করবেন?

আনকোরা সাহেবের মুখের অনুরোধে সলজ্জ হয়ে মেখলা নিম্বু পানি চেয়ে বসল।

অবশ্য অবশ্য। আমি একটি স্পেশ্যাল নিম্বু পানি শুধু আপনারই জন্য বানিয়ে নিয়ে আসছি।

সাহেবের সদাশয় ভালোমানুষিতে মুগ্ধ হবারই কথা। মেখলার রঙিন ওষ্ঠাধরে হাসি খেলে গেল। সে নিজেকে বেশ যাকে বলে ইমপরট্যান্ট তাই বোধ করল।

স্বামী তো কদর বুঝছে না। এখন দেখ, রাজার জাত রাজপুরুষ কেমন খাতির করছে।

লেবুটা বোধহয় একটু বেশি টেপা হয়েছিল। অথবা বোধহয় কোনও খারাপ গাছের লেবু হবে। কেমন একটু তেতো-তেতো লাগল। কিন্তু যে কষ্ট করে আদর দেখিয়ে এনে দিয়েছে তার মর্যাদা রাখতে হবে তো?

সে ঢক করে এক চুমুকেই গেলাস শেষ করে ফেলে সম্মান রাখল। তারপর একটু আলাপ-প্রলাপ।

খুব প্রসন্ন হাসি হেসে বন্দী বলল. আমি যে খুব নিকট অতীতে জার্মানদের হাতে বন্দী ছিলাম তা আপনাকে বলেছি। এখন আমি আপনার মধুর ব্যবহারের হাতে বন্দী। আসুন না একটু নেচে সেই বন্ধনদশাকে সার্থক করে তুলি।

বন্দী তো একটি বাহু বাড়িয়ে দিল। অন্য বাহুটি জড়িয়ে ধরার প্রতীক্ষায়। একেবারে ফিলড রেজিমেন্টের বেগবান ঘোড়ার মতো তড়বড় করে উঠছে।

দূর থেকে মনোহর দেখতে পেল।

দেখতে পেল স্বয়ম্‌ও।

মনোহরের আশা হল লজ্জাবতী লতা নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যাবে। মেখলা তো নাচ জানেই না।

স্বয়মের মনে হল একটি বেতসী লতা আধুনিকতার বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠতে চাইছে। কিন্তু তার উপর যে ভার আছে সেই ঝাপটা হাওযার সঙ্গে ভাবিজীকে মানিয়ে নেওয়ার। উড়তে দেওয়াব নয়।

কিন্তু এক চুমুকে পান করে নিলে নেশাটা যে হয় বড্ড ভারী আর তাড়াতাড়ি।

স্বয়ম্ চট করে পাশে এসে দাঁড়াল।

হেসে বলল, মিসেস হীটনের কাছে যেতেই উনি জানতে চাইলেন এই নবীনা নবাগতাটি কে? আমায় বললেন এখুনি ওঁর কাছে নিয়ে যেতে। আমি এঁকে ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আগে। ততক্ষণ অপেক্ষা করো।

চাতুরীটা বুঝতে বাকি রইল না।

ছোকরাকে কর্নেলের ঘরণীর কাছে পাঠানোব মতলবটার জন্য বন্দী মনে মনে নিজেকেই শাপান্ত করল। কে জানত মিসেস হীটনের দোহাই দিয়ে মিসেস শর্মাকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

এঃ! এক্কেবারে হীরে দিয়ে হীরে কাটা!

তবে এ-আকাশে তারকার অভাব নেই তো। বন্দী অন্য তারকার বন্দনা করতে এগিয়ে গেল।

স্বয়ম্ অবশ্য শেষরক্ষা ঠিক করতে পারল না। তরতাজা টাটকা ফুল দেখলে মধুমত্ত অলির দল ঘিরে আসবেই। এবং জুঁই ফুল যেন রঙহীন জিনের সুরা সিঞ্চনে সহসা রঙিন হয়ে উঠেছে। আরও মোহময়।

মক্ষিরানী।

তার চারদিকে মধ্যযুগের বীরবেশী ঝকমকে নাইটের দল মধুচক্র রচনা করল। ইউনিভার্সিটির শিক্ষায় মুক্ত মন আর মিষ্ট রসনা নিজের চারদিকে ভক্তের ভিড় তৈরি করল। খুব সহজে। সাবলীল ভাবে।

সেই ভিড়ের ওপরে এক মনোহর বার বার মেখলার দিকে তাকাতে থাকল। তার প্রতিদিনের সংসারে হারিয়ে যাওয়া মেখলা, তার গৃহের নানা সাজসজ্জা সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একটি সচলা সজ্জিতা মূর্তি মেখলা—সে তো এ নয়, এ নয়। এ হচ্ছে অন্য কেহ, অন্য কোনও খান থেকে আবির্ভূতা জীবন্ত প্রতিমা।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।

কিন্তু শুধুই কি বিস্ময়?

বিষভরা জ্বালাও কি নেই তার সঙ্গে মিশিয়ে? আমার ঘরণী অন্যদের পরান করে তুলছে অরুণ-বরণী। আর তার উৎস, তার প্রেরণা যা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকার কথা, ইচ্ছামতো সাধ অনুসারে অহরহ

উপভোগ করার কথা—সেই প্রাণধারা সেই আনন্দস্রোতের পারেই বসে আছি। অথচ পান করি না। পিপাসা থাকি ভুলে।

স্বয়ম্ নীরবে এক কোণে দাঁড়িয়ে বার বার দুজনকে দেখতে লাগল।

মেখলা একটু মাত্র সুরার আগুনে জ্যোতির্ময়ী হয়ে জ্বলে উঠেছে। মনোহর এখটুখানি সংসারের জ্বালায় সেই জ্যোতিকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমারি বঁধুয়া...। আন বাড়ি যায়...?

জেলাসি কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ এই মুহূর্তে স্বয়ম্ খুঁজে পেল না।

কিন্তু গভীর রাতে ফেরার সময় ওদের ওলডস্‌মোবিল গাড়ির পিছনের সীটে একা বসে সে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে সামনে দেখল যে মনোহর আর মেখলা পরস্পরকে খুঁজে পেয়েছে।

এক টুকরো চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে আর সমস্ত আকাশকে তার সঙ্গে নিজের পানে নামিয়ে আনছে।

স্বয়মের চোখ স্বাতীর স্বপ্নে মুদে গেল।

॥ উনিশ ॥

আহ্া! তরুণীর চাঁপার কলির মতো নরম আঙুলগুলি বার বার ঠোঁটে তুলে নিচ্ছি যেন।

বলেই আকাশের দিকে একটা চুমু প্রেমসে ছুড়ে দিলেন এই রসিক পুরুষ।

তাই তোমাদের মনে হয় নাকি অ্যাসপারাগাস চুষবার সময়? ক্রীমের চেয়ে নরম, মাখনের চেয়ে মোলায়েম। মুখে তুললেই তোমার হয়ে গেল। অ্যাসপারাগাস তোমরা পাবে—প্লেনটি অব দেম। চারদিকে ছড়ানো।

মারমুখী এক প্যারাট্রুপ ট্রেনার ওদের প্যারাসুট ঝম্পের কলাকৌশলের ক্লাস নিচ্ছিলেন।

৮২ নম্বর ট্রুপার দলের নেতা হিসাবে তিনি সিসিলি দ্বীপে প্যারা-ঝাঁপের মধ্যে ছিলেন। আর সেখানে জার্মান ও ইটালিয়ান সৈন্যদল অ্যাকঅ্যাক থেকে আরম্ভ করে অ্যাসপারাগাস পর্যন্ত সবকিছু দিয়েই ওদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা রেখেছিল।

এসো, মাই ডিয়ার বয়েজ, দুশমন তোমাদের অ্যাসপারাগাস দিয়ে আপ্যায়ন করবে এই আশা করে অভিযানে এসো।

আহা, টিনে ভর্তি নধরকান্তি ননীর মতো কোমল সুখাদ্য। সবুজাভ সাদা সবজি।

একটা মারাত্মক রকম অশ্লীল দিব্যি দিয়ে শিক্ষক জানালেন যে, ইংরেজি কবিতায় আছে যে, বেহেস্তে হুরি আর পরিরা এই সুস্বাদু বস্তুটি খেয়ে থাকে। ঠোঁটের মধ্যে দিতে না দিতে মিলিয়ে যায়।

তারপর আবার একটা অশ্লীল খিস্তি।

আহা, তোমরাও ওই নধর কোমল পরশের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্রেম শিহরণে হুরীদের উদ্দেশে উবে যাবে। স্বর্গের লীলাভূমিতে তাদের সঙ্গে কেলি করতে চলে যাবে।

শুধু, সীমান্ত কেন, জাপানিদের দখলী এলাকার সামনে-পিছনে পাহাড় জলা আর জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেখানেই কিছু খালি জমি আছে, সেখানেই মিত্র পক্ষের প্যারাট্রুপারের দল বা গ্লাইডারে বয়ে আনা সৈন্যদল নেমে পড়তে পারে। সেখানে কেন এহেন খানার ব্যবস্থা?

এমনিতেই জাপানি সেনাদল অনেক বেশি এগিয়ে এসেছে। যোগাযোগ রাখাই কঠিন। পিছনের দলগুলি সহজে বা তাড়াতাড়ি জানতে পারে না। যে আগুয়ান দল কী করছে। তার উপর রসদ বা অস্ত্রশস্ত্র কোনও কিছুরই জোগান সহজ নয় এই রকম রণভূমিতে। কাজেই শত্রুরা প্যারাট্রুপ বা সৈন্যদল আকাশ থেকে পিছনে নামিয়ে দিলে জাপানি দুশমনের দল যাঁতাকলে পড়বে।

কাজেই অবাঞ্ছিত অতিথির সরেজমিনে সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে অ্যাসপারাগাস।

ফাঁকা ডাঙা জমি বর্মা আরাকান সীমান্তে তেমন কিছু বিশেষ নেই। যেখানে আছে সেখানে বসানো হচ্ছে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি। জঙ্গলে গাছের অভাব নেই। কাজেই গুঁড়ি বানানো সহজ। কিন্তু লোহার শিক বা ডাণ্ডার মতো গাছের গুঁড়ি ততটা সুবিধের নয়।

কারণ, প্রত্যেক অ্যাসপারাগাসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুবি ট্র্যাপ। আর প্রত্যেক খুঁটির সঙ্গে পাশের খুঁটি তারে জড়ানো। জেনারেল্স লোহার খুঁটি বসাতে আর তাতে বিজলির প্রবাহ চালিয়ে দিতে

চেয়েছিলেন। অন্তত হামলার মুহূর্তে।

কিন্তু কোথায় বা লোহা আর কোথায় বিজলি। শুধু কাটা তার যে আছে তা-ই যথেষ্ট। তবে জরুরি হলে ডায়নামো চালিয়ে বিজলির বন্দোবস্ত করতে হবে। ভোল্টেজ বাড়ানোর ব্যবস্থা করবার যন্ত্রপাতিও আছে। কেবল ডামাডোলের মধ্যে গাছের গুঁড়ির খুঁটি বিজলি প্রবাহের শক সামলে নিতে পারে। একটি বড় অসুবিধের ভয় হচ্ছে সেটা।

সেজন্যই তারের সঙ্গে মাইন অথবা শেলের সংযোগ আছে।

এতটুকু ছোঁয়া লাগে যদি, তাহলে এতটুকু কাল শুনতে আর হবে না। একেবারে পরকালের ওপারে পৌঁছে দেবে অ্যাসপারাগাস। যমের মুখের ওপারে। এই হচ্ছে অ্যাসপারাগাস।

প্যারাট্রুপদের তালিম দেবার সময় সেই শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। শুধু হাতে-কলমে শিক্ষাই যথেষ্ট নয় এই বাহিনীতে। মানসিক দীক্ষা আরও বেশি জরুরি।

আমাদের ছিল দুটো প্রধান লক্ষ্য। আমরাই ছিলাম আগুয়ান বাহিনী, পথ দেখানিয়া।

ঠিক জায়গাতে নেমে প্রথমেই সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষের যে যেখানে ঘাপটি মেরে আছে তাদের সাবাড় করতে হবে। শুধু খেদালে হবে না। কারণ তাহলে ওরা সব দিকে সংকেত জানানী দিয়ে দল ভারী করবে। সবাইকে হুঁশিয়ার করবে।

তার আগেই ওদের সাবড়াতে হবে। এবং তার পরই আমাদের পরে যে সব গ্লাইডারের ঝাঁক আসবে তাদের জন্য ফাঁকা জায়গা খোলা রাখতে হবে। যেন না থাকে কোনও বাধা, কোনও বিপদ।

গ্লাইডাররা নিচে নেমে হাতিয়ার সামলে দুশমনকে মোকাবিলা করতে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জিম্মাদারি। খোলা মাঠ হচ্ছে আমাদের জমিদারি।

কিন্তু সেই জমিদারি আগে তো নিজের দখলে আসুক।

আপনি শুতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।

নিজেই সেই এলাকায় আগে কখনও নামিনি। কোন এলাকা তারও ঠিক ঠিকানা নেই। অথচ আমার মিশন হচ্ছে যে গ্লাইডারদের নামবার জন্য জায়গা সরেজমিনে কী কবতে হবে। শত্রু বাধা দিতে এলে তাকে ঠেকাতে হবে। ঠুকতে হবে। হটাতে হবে।

তার জন্য শুধু হালকা হাতিয়ার সম্বল। কারণ শুধু তো হাতিয়ার নয়, নানারকম গুলি, বোমা, আলো ফেলে সংকেত জানাবার যন্ত্র এবং কিছু র‍্যাশন—এসবও সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে।

আকাশের খুব বেশি উপরের স্তর থেকে প্যারাট্রুপার নামিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

মাটিতে কোথায় নামাবে সেটা কিছু আন্দাজ করে দেখা দরকার এবং বেশি উপর থেকে ঝাঁপ দিলে হাওয়ার টানে টানে কোথায় গিয়ে নামবে তারও ঠিক থাকবে না।

বিশেষ করে সকাল-সাঁঝের আলো-আঁধারি বা মেঘলা বাদলার ঘোমটার মধ্য দিয়ে আকাশ থেকে উঁকি মারতে যদি হয় তাহলে অনিশ্চয়তা আরও বেড়ে যায়।

আমি তখন সামান্য একজন প্রাইভেট।

স্বয়মের দল আর সহকর্মীরা গুরুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু ভাবছিল যে গুরু শুধু প্রাইভেট হলে কী হবে, তার বর্ণনার তোড় যে কোনও পাবলিককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের কল্যাণে হাজার হাজার ছাত্র, মাস্টার, রিসার্চ ওয়ার্কার পণ্ডিত সব সেনাদলে নাম লিখিয়েছিল। আইনের ভয়ে নয়। যুদ্ধ থেকে ফিরে বেঁচে বর্তে এলে বেসামরিক জীবনে অর্থাৎ 'সিভিক স্ট্রীট'-এ যে সব আখের রক্ষা করবার ব্যবস্থা আছে তার ভরসাতেও নয়। নিছক দেশের টানে, মনের টানে। সমস্ত মানবজাতিকে স্বৈরাচারের হাত থেকে, একনায়কত্বের হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে বাঁচানো যাবে এই বিশ্বাসে।

কাজেই গুরুও নিশ্চয়ই সাধারণ প্রাইভেট হবার আগে বিশেষ কোনও পণ্ডিত ছিল। শিক্ষার্থীর দল মনে মনে সেইরকম সিদ্ধান্ত করেছিল।

না হলে কী আর এমন মন-মাতানো, প্রাণ-জাগানো ভাবে শিক্ষা দিতে পারে?

অথবা এমন করে শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদের বিদেশী রাজ্যের হয়ে আরেক বিদেশী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করতে পারে? যার ফলে নিজের দেশের পরাধীনতা হয়তো আরও বেশি পাকা, না হয়

আরও বেশি দীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে, এমন একটা যুদ্ধের জন্য মাতিয়ে তুলতে পারে?

কিন্তু ওদের এতসব কথা ভাববার সুযোগ তখন গুরুজী মোটেই দেননি। তার সাকরেদদের অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু শেখাতে হবে।

আর এইসব শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের হাতে-কলমে গড়ে পিটে নেবার সময় ভাবতে বা তর্ক তুলতে অবকাশ দিলে চলবে না।

আর্মির সিক্রেট সার্কুলার আছে যে, এয়ার ফোর্সে বাঙালি তরুণের মতো টিচেবল শিখিয়ে নেবার মতো মাল আর নেই। এরা যেমন চালাক তেমনি চৌকস। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বেপরোয়া। নো ফাইনার স্টীল ইজ প্রডিয়ুসড ইন ইন্ডিয়া। ইউ হ্যাভ ওনলি টু টেম্পার ইট দি রাইট ওয়ে। ভারতবর্ষে এর চেয়ে ভালো ইস্পাত জন্মায় না। শুধু একে ঠিকভাবে শান দেওয়া দরকার।

সেইসব শান পালিশ দেওয়া ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা হচ্ছে এই এয়ারফোর্সের ১ নং বাঙালি প্যারাট্রুপারের দল। ওরা শিক্ষককে আদর করে নাম দিয়েছে গুরু। আগ্রহ করে নিয়েছে তালিম।

গুরু বলে চলেছে—আমি তখন সামান্য একজন প্রাইভেট। আমরা প্যারাট্রুপার দলের সবাই তাই। আর আমরা আগুয়ান দল বলে আমাদের নাম পাথ ফাইন্ডার। পথ দেখানিয়া। আমাদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি।

আমরা যদি ঠিক সময়ে আর ঠিক জায়গায় পিছনের প্যারাট্রুপার আর গ্লাইডারে বয়ে আনা সৈন্যদের নামিয়ে আনতে না পারি, তাহলে সবটা অভিযানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। চুপিসাড়ে আর তাড়াতাড়ি সব হাসিল করতে হবে। দুশমন টের পাবার আগে দলের সবাইকে নেমে পড়তে হবে। হাতিয়ার নিয়ে তৈরি হতে হবে।

না হলে নিজেদেরই বাঁচাতে পারব না।

ঘাঁটি আগলানো তো পরের কথা। ঘাঁটি তৈরি তো প্রথমে করতে হবে। এবং সেই মোক্ষম সময়টুকু পারতপক্ষে শত্রুকে ঘাঁটানো শাস্ত্রের বারণ।

সবাইকে তাক লাগিয়ে পিছন থেকে বাঙালি একজন শিক্ষানবীশ বলে উঠল, অর্থাৎ সে সময়টা শত্রুর সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ।

কিন্তু কেউ সে ঠাট্টাটা কানেও তুলল না আজ। কয়েকদিনের মধ্যেই আগুয়ান এলাকায় যেতে হবে।

কবে? কোথায়?

কেউ তা জানে না। শুধু জানে যে যেতে হবে বিনা প্রশ্নে, বিনা উত্তরের প্রত্যাশায়।

সামরিক জীবনে এর চেয়ে বড় কথা কিছু নেই। দলপতির আদেশ হচ্ছে বেদবাক্য। কোনও প্রশ্ন নেই। থাকবে না কোনও দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। কোনও বাধা, ব্যতিক্রম।

তেলেজলে মানুষ, রঙ্গ ও কলরোলে অভ্যস্ত মানুষ, এই বাঙালিদের জীবনে একেবারে নতুন স্বাদ, নতুন আমেজ। অতীত জীবনটা যেন একটা পুরানো বইয়ের ওলটানো পাতা। ভুলে যাওয়া, ফেলে আসা রাস্তা।

অসীম আগ্রহে এরা গুরুর কথাগুলি শুনতে লাগল।

লিস্‌ন ওলড বয়েজ, তোমরা একটা সত্য ঘটনা শোন। আমারই দলের কথা। কিন্তু এ শিক্ষাটা ইয়োরোপের সিসিলি আর বর্মার শোয়েবো সব জায়গাতেই সমানভাবে মনে রাখতে হবে।

দরকার না হওয়া পর্যন্ত পথ দেখানিয়ারা দুশমনকে দেখা দেবে না। ঘাঁটাবে না।

সিসিলিতে নামবার সময় আমাদের মধ্যে একজন অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হাতড়াতে ঝোপের ওপারে একজন শত্রুসৈন্যকে দেখতে পেল। সহজেই তাকে শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু গুলির আওয়াজে অন্য শত্রুরা সজাগ হয়ে যাবে বলে চুপ করে রইল।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে আগে খোলা জমিটা বের করতে হবে। তারপর শত্রুরা ছাউনি থেকে দলে দলে এসে সে জমিতে পৌঁছনোর পথে যে সাঁকোটা আছে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে। তার পরেই তো আসবে হাতের সুখের পালা।

সেজন্য সে কঠোর আত্মসংযম করল।

বয়েজ, আমাদের সেই দলের একটা গ্রুপ আরেকটা নালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারে নালার ওপারে একটা সৈন্যদল দেখতে পেল। তাদের হেলমেটের আকৃতি দেখে বুঝল যে ওরা ইটালিয়ান সৈন্য। তারাও এদের আবছা অন্ধকারে এক চোখ দেখেই বুঝতে পারল এরা কারা।

আচমকা একটা শক পেয়ে গেল দু'দলই।

নালার এপারে আমাদের দল আর ওপারে ওরা। দু'পক্ষই চুপচাপ। মুখে 'রা' নেই, চোখে নেই ইশারা। যেন কেউ কাউকে দেখতে পায়নি এমন ভাবে দু'দল পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে গেল। ওদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে গেল। ঠিক ভূতপ্রেতের মতো।

অবশ্য ওরা তাই। অন্তত মৃত ভূত হওয়াই ওদের উচিত। বেঁচে থাকার হক থাকা উচিত আমাদের। শুধু আমাদের।

কিন্তু বয়েজ, আমাদের এই দলটাই একটু পরে প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে সেই স্ট্র্যাটেজিক সাঁকোটা সাবড়িয়ে দিয়েছিল।

মনে রেখো, এই সব মোকাবিলাতে তোমাদের জীবন আর তোমাদের পরে যারা আসছে তাদের জীবন আর তোমাদের সকলের সাফল্য নির্ভর করবে শুধু তোমাদেরই আগাম দলের বুদ্ধির উপর।

বন্দুকে ঘোড়া টিপতে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি তড়িঘড়ি খাটাতে হবে তোমাদের বুদ্ধি।

মনে রেখো যে তোমাদের আপেল বাছাই করে টুকরিতে রাখার মতো একটি একটি করে বাছাই করা হয়েছে। এক হাজার জন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিল। মাত্র দেড়শজনকে যোগ্য বলে মনে করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তোমরা নামবে শুধু শত্রু এলাকায় নয়, শুধু আঘাটায় নয়, একেবারে আনকোরা নরকে। গ্রীন হেল বস্তুটিকে চিনে রেখো।

ওরা হয়তো টের পেয়েই চারধারে গুলির শিলাবৃষ্টি শুরু করে দেবে। শ্রাপনেল ফাটাতে থাকবে। ঝলমলে ট্রেসার বুলেটের ফুলঝুরি ছোটাবে। রং-বেরঙের তারার মতো সেই গুলির আলোয় তোমাদের চোখ ঝলসে যাবে।

কিন্তু দুশমনের চোখ থাকবে চাঁদমারি প্র্যাকটিসের ওপর। মণ খানেক হাতিয়ার, আলো, রাডার আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে তোমরা যখন আকাশী লীলায় নামতে থাকবে দেবদূতের মতো, ওই মরণদূতরা তখন রেশমী প্যারাসুটের ছাতাগুলো ঝাঁঝরা করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু তাতে ঘাবড়িয়ো না। মনে রেখো যে জোয়ানের ছাতি যৌবনবতীদের জন্য। ব্লন্ডদের মাথার সোনালি চুলের ঘষা খেয়ে খেয়ে ফুলে উঠবার জন্য। গুলি খেয়ে চুপসে যাবার জন্য নয়।

গুরু তারপর আশ্বাসে ভরা যে লোভের ব্যাপার ব্যাখ্যা করলেন, তা রসাল সাহিত্যের গুরুঠাকুর বোকাচ্চিয়োর মতো রঙ্গরাজও হজম করতে পারতেন না।

লড়াই শেষ হলে সে সব সুখ তোমাদের জন্য রিজার্ভ রেখেছে প্যাট্রিয়ট তরুণীরা। বেহেস্তে গিয়ে হুরি পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এপারেই ওরা বসে আছে তোমাদের জন্য।

ততদিন মনে রেখো যে, বুকের ছাতির চেয়ে শুটের ছাতি ঝাঁঝরা হওয়াই ভালো। সেজন্যেই সযত্নে ক্যামোফ্লাজ করা জলপাই গেরুয়া আর হলুদ রঙে চকরাবকরা করে ছোপানো জাম্পিং স্মক ভরিয়ে তোমাদের ফাদার ক্রিসমাস সাজানো হয়।

হঠাৎ যদি কোনও শত্রুর ঘাঁটির ওপর বা প্যাট্রল দলের সামনে উদয় হও, ফর হেভেন্স সেক, ওরা টের পাবার আগেই সরে পড়ো একটেরে। অন্ধকারে ওরা ভূত দেখতে থাকুক। ততক্ষণে তোমরা ভূতের মতো নিঃসাড়ে সরে পড়ো।

তারপরই যেখানে প্যারাট্রুপ নামানোর মতো জায়গা পাবে তার সন্ধান শুরু করো। পেলেই সংকেত দাও। মনে রেখো যে তোমাদের হাতে সময় আছে মাত্র এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টায় তোমরা জাপানি যুদ্ধের একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

কেমন করে সেটা সম্ভব হবে তা আবার এই শেষ বার ব্রিফিং-এর (মামলা বুঝিয়ে দেবার) সময় আবার বলছি।

জাপানিদের যথেষ্ট পরিমাণে ফিল্ড টেলিফান নেই। বেতারযন্ত্রের আরও বেশি অভাব। তোমরা গ্লাইডার আর প্যারাট্রুপাররা নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যাতে শত্রুর কোম্পানিগুলি ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারে।

রেজিমেন্টাল হেডকোয়ার্টার থেকে ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠানোর পথও বন্ধ করতে হবে।

ওরা হাঁটা পথে জঙ্গলের আড়াল দিয়েও যেন লোক মারফত খবর চালাচালি না করতে পারে।

মনে রেখো ফলের দিক দিয়ে প্রত্যেকটা যোগাযোগ এক একটা দুশমন দলের ব্রিগেডের সমান দামী।

রসদের ঘাটতি আর গোলাবারুদেরও কমতি আছে ওদের আগুয়ান বাহিনীতে। ওদের পিছনে যখন তোমরা কায়েম হয়ে পাট্টা গাড়বে তখন বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ওদের তোমরা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবে। আমাদের লোকক্ষয় হবে অনেক কম। হয়তো নামমাত্র।

কিন্তু খবর পেলেই ওদের হেডকোয়ার্টার্স থেকে মরিয়া হয়ে খাবার পাঠাবে, আরও রি-ইনফোর্সমেন্ট পাঠাবে। তখন তোমাদের এই দুঃসাহসী অভিযানে কোনও ফল হবে না। তাছাড়া তোমরা আর তোমাদের পরের প্যারাট্রুপাররা যাবে মোটামুটি হালকা হাতিয়ার নিয়ে।

তোমাদের উপর আর্মার্ড ট্যাঙ্ক নিয়ে পালটা হামলা যাতে না হতে পারে সেজন্যও এই অভিযানে সফলতা অবশ্য দরকার।

অবশ্য তোমরা জান যে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই যে সব গ্লাইডার তোমাদের পিছু পিছু তোমাদেরই আলো দেখানো জমিতে নামবে তাতে আসবে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক কামান আর লোহার বর্মভেদী কামান।

কিন্তু সেগুলি কতদূর আর কত তাড়াতাড়ি তোমাদের কাজে লাগবে তা নির্ভর করবে তোমাদের সরেজমিনের উপর। আর্মার্ড কেরিয়ার কতখানি উঁচুনিচু ভাঙা বা ডাঙা জমির মোকাবিলা করতে পারবে তা পশ্চিমী যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে জোর করে এখুনি বলা যায় না।

তাই তোমাদের আসল ভরসা থাকবে শুধু তোমাদের রাইফেল স্টেন গান, গ্রেনেড আর ব্যাঙ্গালোর টর্পেডো। অর্থাৎ বারুদ ভরা পাইপ যা দিয়ে কাঁটাতার থেকে হালকা বেড়া অনেক কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায়।

আর সবচেয়ে বড় ভরসা থাকবে তোমাদের হঠাৎ খেলানো বুদ্ধি, রেডি উইট।

আমি যে আজ তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের আমারই মতো চোরা বিদ্যায় তালিম দিচ্ছি, তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র এই বুদ্ধির খেলায়। আর কোনও কপিবুক উপদেশেই তা সম্ভব হবে না।

যুদ্ধে যোগ দিয়ে তোমাদের এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সেজন্যই তোমাদের শিক্ষার উপর আমার এত ভরসা।

তবে শোন আমার নিজের কাহিনি। আমি যখন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—আমার প্লেনের কোনও দোষ নেই—যেখানে নামার কথা তার চেয়ে মাত্র মাইল খানেক দূরে। ফ্ল্যাক ব্যাটারির গোলা তুবড়ির মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। হাউই বাজির মতো ট্রেসার বুলেটের চারিদিকে তুর্কিনাচন।

তার সব নাচা-কোঁদা এড়িয়ে এপাশ-ওপাশ পাক খেতে খেতে আমাদের প্লেন আমাদের সবকটি প্যারাট্রুপারের একটা স্টিক অর্থাৎ লাঠির মতো গোঁজা সারি কোনমতে খালাস করে গেল। খালাস না বলে উগরে গেল বলতেও পার। আমরা পনেরো জনের লাইন।

কিন্তু তারপর?

তারপর ভূমধ্যসাগরের তাজা হাওয়া আমাদের ছাতাগুলোকে দোলা দিতে দিতে নানান দিকে সরিয়ে নিতে লাগল।

ঘন গাছপালায় ঢাকা একটা জঙ্গলের উপর আমি এসে পড়লাম। কোন্ গাছের কোন্ মাথা উঁচু মগডাল আমাকে বর্শা বা সড়কি বেঁধে করে দেবে তার ঠিক নেই।

অথচ আঁধারে ঠিক কী করে যে ওরই মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে নামব তারও ঠাহর পাই না।

আমার ফাঁসি হল শেষ পর্যন্ত।

অর্থাৎ আমার প্যারাশুটের লাগামগুলো একটা গাছের মগডালে ফেঁসে আটকে গেল। আমি মাটি থেকে হাত বিশেক দূরে ইতি-উতি দোলা খেতে খেতে ঝুলতে লাগলাম।

জঙ্গলটা নিথর নিঃশব্দ। কিন্তু তার বাইরে অবিশ্রান্ত মেশিন গানের গুলি। আর মাথার উপর এরোপ্লেনের কান ঝাঁঝরা করা আওয়াজ। আকাশ ভরা ফ্লেয়ার অর্থাৎ নিশানা আলোর ভুতুড়ে ঝাড় লণ্ঠন জ্বলে উঠছে, আর নিভছে। আবার জ্বলে উঠছে।

জঙ্গলটাও একেবারে জনমানবহীন নয়। একটা ইটালিয়ান সান্ত্রী পিল বক্সের অর্থাৎ গুমটি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আমি চোখ বুজে মড়ার মতো ভান করে রইলাম। নিঃসাড়, নির্নিমেষ। শুধু বাতাসে শুটের ছাতাটাকে যেটুকু দোলা দিয়ে যাচ্ছে সেটুকু বাদে।

মুখের উপর তেজী টর্চের বাতি এসে পড়ল। বুঝলাম যে ভারী পিস্তলের গুলি করে সে আলোর শিখা ছাড়লো না কারণ সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে কোনও প্লেন জঙ্গলে শত্রু লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে মনে করে বোমা

ছাড়তে পারে।

তারপর সেই ইটালিয়ান কারাবিনেরো অর্থাৎ সিপাই পা চালিয়ে এগিয়ে এল। যতটা কাছে হতে পারে এগিয়ে এসে আমার ফাঁসিকাঠে ঝোলা মৃত দেহটাতে একবার চোখ বুলিয়েই "সে মর্টে" ওটা মরে গেছে বলে ফিরে গেল।

জার্মান হলে তবুও দুটো গুলি ছুড়ে শরীরটা যাচাই করে নিত। কিপটে ইটালিয়ান গুলি বাঁচাল।

অথবা উপর থেকে কোনও প্লেন টের পেলে বোমা ছাড়বে সে ভয়ও হয়তো ছিল। মোট কথা সে চুপচাপ করে গুমটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। নিশ্চিন্ত নিঃসন্দেহ মনে।

আর আমিও খাপ থেকে ছুরি খুলে লাগাম কেটে নিলাম আস্তে আস্তে। শব্দ হলেও চলবে না। হাতের স্টেন গানটা ঝাঁপ দেবার পর গাছে আটকে যাবার ধাক্কায় ছিটকে দূরে পড়ে গিয়েছিল। কাজেই শব্দ শুনে ক্যারাবিনেরো যদি ফিরে আসে—দ্বিতীয়বারের বার আর বাঁচতে পারব না।

খুব হুঁশিয়ার হয়ে জঙ্গলী ডালপালায় বুটের আওয়াজ বাঁচিয়ে স্টেন গানটা খুঁজে নিলাম। আর গুমটি ঘরের পাহারাদার সেই ক্যারাবিনেরোই আমার প্রথম শিকার হল।

কিন্তু মনে রেখো, তোমার বুদ্ধির ঢাকনাটা তালাবন্ধ রেখো না। কখন চুপ থাকবে আর কখন দৌড়বে সে সব নতুন নতুন পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক করবে।

নিজের দলের অন্য লোক যদি চুপচাপ লুকিয়ে এগোচ্ছে দেখ, তাহলে খুশি হয়ে তাকে ডেকে বসো না। কোনও বিশেষ কারণেই সে চুপ করে আছে হয়তো।

আর শত্রুকে যদি তাকের নাগালের মধ্যে পাও একবারে চাঁদমারির মতো, তাহলেও তখুনি গুলি ঝাড়বে অথবা তাকে নিঃসন্দেহ মনে সরে যেতে দেবে সেটা চকিতে ভেবে নেবে। তোমাদের জীবন ঝুলছে এক নিমেষের সুতোয়।

যদি কোনও পুকুর বা ডোবায় পড়ো, চেঁচিয়ে উঠো না। বন্দুক আর কোন্ কোন্ হাতিয়ার নিরাপদে পরে ছুঁড়ে দিতে পারবে তা নিজেরাই বুঝবে। তবে কিট ব্যাগের জন্য মমতা করো না। ভিজে ব্যাগের ওজন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

দিনের বেলাই এসব পরিস্থিতি মানুষকে দিশেহারা করে তুলতে পারে।

কিন্তু সবুজ নরকে গ্রীন হেলে অজানা আঘাটায় তোমরা তোমাদের গ্লাইডার বাহিনী আর প্যারাট্রুপারদের দিশা দিতে যাচ্ছ। অনিশ্চয়তা আর অনুমানকে মনে ঠাঁই দিয়ো না।

ওই ভাবগুলো হচ্ছে শত্রুপক্ষের বন্ধু।

আর—বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে গুরু বললেন, আর তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র ভগবান।

পাছে কোনও ভগবানে অবিশ্বাসী এ কথায় ভরসা না পায় সেজন্য তিনি আবার বললেন, কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগতে পারে। কিন্তু মনে রেখো যে বলশেভিকরাই সেই ১৯৩০-এ যুদ্ধের জন্য প্রথম প্যারাঝম্প শুরু করে। আরও জেনো যে ১৯৩৫ সালে যখন জার্মানরা সবার প্রথমে গোয়েরিং রেজিমেন্ট নাম দিয়ে প্যারাবাহিনী তৈরি করেছিল তখন এই নারকী, থুড়ি নাৎসিরাও এই শিক্ষাই পেয়েছিল।

আর ওদের যে শিক্ষা দিত তার নাম জানো?

সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল।

শিক্ষকের নাম ছিল জেনারেল ছাত্র। জেনারেল স্টুডেন্ট।

হে আমার ছাত্ররা—তোমরা কিন্তু সবাই আমার চোখে জেনারেল।

তোমরা সব্বাই জেনারেল।

॥ কুড়ি ॥

যদি আমার মৃত্যু হয়...যদি আমি যুদ্ধে মারা যাই শুধু তখনই যেন খোলা হয়।

এরকম শর্ত দিয়ে এমন একখানা চিঠি ক'জন সংসারে লিখে রাখে? বিশেষ করে মৃত্যুর মুখোমুখি বসে?

লিখেছিলেন একজন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বাহাদুর সমরনায়কের মধ্যে অন্যতম। বীরত্বে নয়, সৈন্য চালনার নিপুণতায় নয়, যুদ্ধে কলাকৌশল স্ট্র্যাটেজিতেও নয়। কিন্তু তবুও সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় সমরনায়ক।

স্বয়ম্ভুর মতে বেসামরিক নেতা হিসাবে পরাজয়ের শেষ পরিখায় দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত অবাস্তবকে সম্ভব করে যুদ্ধ জয় করার মতো নেতা চার্চিলের মতো আর কেউ হবে না।

স্বয়ম্ যখন যুদ্ধে যোগ দিতে মন ঠিক করে ফেলেছে তখনও মিত্রশক্তিকে ঘোড়দৌড়ের বাজির কোনও জুয়াড়ি ব্যাক করতে হয়তো সাহস পেত না। কিন্তু ১৯৪০-এ জার্মান প্রলয় বোমার মধ্যে থেকে একটি ডুবন্ত জাতিও মড়ুঞ্চে মানসিকতাকে চার্চিল যেভাবে শুশ্রুষা করে বাঁচিয়ে তুলে যুদ্ধে অবিচল রাখছিলেন তার তুলনা তো ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পায়নি।

'আনটু ব্যাটল' রণপথে তিনি বারবার পার্লামেন্ট থেকে, বি. বি. সি-র বেতারে মাভৈঃ আহ্বান করে যে সাহস জোগাচ্ছিলেন তা স্বয়মের নিজের ভীরু কুণ্ঠিত মুহূর্তগুলিকে ভরসায় ভরে দিত।

অথচ আশ্চর্য এই চার্চিলকেই সে খুব ঘৃণা করে। ভারতের স্বাধীনতা কামনার সব চেয়ে শত্রু, আপসহীন শত্রু হিসাবে তাঁকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

তবু তাঁর চিঠিটার কথা বারবার মনে করে।

ট্রেনিং ক্যাম্পগুলিতে রাত-দিন পরিশ্রম আর শিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে স্বয়ম্ রাজস্থানের চারণদের কথা মনে করে। চিরাচরিত প্রথা আর পেশা অনুসারে তারাও প্রেরণা যুগিয়েছে। এমন কি পৃষ্ঠপোষক রাজা আর রাজবংশের দরকার পড়লে যুদ্ধও করেছে। তবু ইংরাজস্থানের এই চারণ চার্চিলের তুলনা কোথায়?

রসনায় তাঁর মৃতসঞ্জীবনী, লেখনীতে অস্ত্রঝঞ্ঝনা।

প্রায়ই সেই চার্চিলের কথা ভেবেছে স্বয়ম্ভু। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রীর মতো আমাদের দেশের স্বাধীনতার শত্রু বোধহয় কেউ নেই। আবার নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য এত বড় যোদ্ধাও কেউ হয়নি।

তাঁকে স্বয়ম্ভু মন দিয়ে ঘৃণা করে। আর পূজা করে মাথা নুইয়ে।

চার্চিল যুদ্ধে জিতবেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু এতদিন যে দেশকে টিকিয়ে রেখেছেন, এতটা তৈরি করে এনেছেন তার তুলনা নেই। এখন যুদ্ধের এলাকায় সেই চার্চিলেরই একটা চিঠির কথা ওর বারবার মনে পড়ছে।

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। আরাকানের যুদ্ধপ্রান্তর থেকে ফ্রান্সের প্রান্তর কত দূর। কত অন্য রকম।

১৯১৬ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। উপরে লেখা ছিল যে শুধু তাঁর মৃত্যু হলেই যেন খামটা খোলা হয় :—

> 'খুব বেশি দুঃখ কোরো না। আমি নিজের অধিকারে সম্পূর্ণ আস্থাবান আত্মা। মৃত্যু শুধু একটা ঘটনা এবং বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের যা ঘটে তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সবার উপরে—বিশেষ করে তোমায় দেখার পরে, হে আমার প্রেয়সী, আমি সুখী হয়েছি আর তুমি আমায় নারীর হৃদয় কত মহৎ হতে পারে তা শিখিয়েছ। যদি অপর লোক কিছু তাকে সেখানে আমি তোমার সন্ধানে থাকব। ততদিন সামনে তাকিয়ে থেকো, মুক্তি বোধ করো, জীবনে আনন্দ কোরো, ছেলেমেয়েদের লালন কোরো। আর আমার স্মৃতিকে প্রহরা দিয়ো। ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। বিদায়।
>
> ডবলিউ'

এই চিঠিটার কথা স্বয়ম্ভুর প্রায়ই মনে পড়ে। আর মনে পড়ে স্বাতীর কথা।

যার সঙ্গে সাংসারিক কোনও সম্বন্ধই নেই। নেক্সট অব কিন নিকটতম আত্মীয় দূরের কথা, কোনও আত্মীয়াই নয়। শুধু এইটুকু বিনা সুতোর হারের মতো সম্বন্ধ। একটুখানি কথা—একটুখানি বাঁচো।

এমন সময় মৃত্যু যেন নিজে থেকে হাতছানি দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাল।

ভি ফোর্স।

ভি ফর ভিকটোরি নয়। এখনও নয়।

ভয়াল ফোর্স তার মানে।

ভলান্টিয়ার ফোর্স। অর্থাৎ যারা মরতে যেতে রাজি আছে। এবং নিজে যেচে।

কিন্তু সরকারি চাকরির বা সাধারণ সেনাদলের চেয়ে অনেক বেশি রকমারি যোগ্যতা থাকা দরকার।

শুধু স্বাস্থ্য আর কষ্ট সইবার ক্ষমতা নয়। সে তো কম বেশি সৈন্যদলের প্রায় সবারই থাকে। তাকে অভ্যাস দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এখানে চাই অত্যন্ত চটপটে স্বভাব, ক্ষিপ্র গতি আর প্রত্যুৎপন্নমতি। গুলি চালানোতে শব্দভেদীরাজা দশরথ, দৌড়ঝাঁপে ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, আহার-বিহারে বায়ুভক্ষণকারী সাপ আর মুখের ভাব ও চেহারা বদলানোর বিদ্যাতে বহুরূপী চ্যামেলিয়ন।

স্বয়ম্ অর্থাৎ স্যাম মনে মনে ভেবে নিল—লড়াইয়ে বড়াই নেই এতে। কিন্তু আরও কিছু আছে, যা শুধু যুদ্ধের মধ্যে নেই।

এ-হেন সর্বগুণের পাঁচমেশালী পাঞ্চ অর্থাৎ মাদকতা চাই 'ভি' ফোর্সের জন্য। উন্মাদনা চাই মনে। তা না হলে দেহ হঠাৎ করে বসবে অসহযোগ।

পাঞ্চের পাঁচমিশেলী মদের মতোই গরমা-গরম প্রতিক্রিয়া চাই মাথায়। না হলে বিপদের মুখে বুদ্ধি পালাবে উড়ে। বুদ্ধিই যদি পালায়, টমিগানের গুলি বর্ষণের গুরু গুরু ডাকে তুমি ময়ূরের মতো পেখম মেলে নিজেকে সাজাতে অর্থাৎ বাঁচাতে নতুন নতুন পথে আর নয়া নয় ঢং-এ নাচবে না। মোদ্দা কথা তোমার বারোটা শেষবারের মতো বেজে যাবে।

এই বাহিনীতে ঘোরাঘুরিটাই বড় লড়াই।

শুধু নিজে বাঁচলে হবে না, শত্রুকে বাঁচাতে হবে। দরকার হলে কই মাছের মতো সীমাবদ্ধ জলে জিইয়ে থাকতে দিয়ে তার গতিবিধি, কাগজপত্র থেকে খবর বের করে নিতে হবে।

বুদ্ধি করে নিজের গোপন খাতার ফাঁকগুলিও সঠিকভাবে ভরিয়ে নিতে হবে। সে সবের জন্যই নিজেদের সেনাবাহিনী শত্রুর মোকাবিলার অপেক্ষায় ওপারে অর্থাৎ নিরাপদ ডেরায় দিনক্ষণ গুণছে।

আর তুমি রয়েছ এপারে। অর্থাৎ শত্রুর এলাকায়। যেখানে শত্রুর চর আর তোমার চর উপরে উপরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে। এমনই এলাকায় যেটা দু'পক্ষের জন্যই সিকিউরিটি রিস্ক।

মাঝেতে বহে বিরহ কাহিনি। অর্থাৎ দুশমনের উপযুক্ত নানা কারবার হীরে দিয়ে হীরে কাটার কারবার। একেবারে যাকে বলে রণকাব্য।

—লিরিক অব দি ওয়ার স্যার।

—হোয়াট্‌স দ্যাট, স্যাম?

—শিয়ার পোয়েট্রি স্যার, শিয়ার পোয়েট্রি। দিস লাইফ ইজ শিয়ার পোয়েট্রি।

এই মন্তব্যটুকু করেই স্বয়ম্ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এবং আশা করতে লাগল যে বেণাবনে মুক্তো ছড়ায়নি।

আজকের দিনের ইংরেজ আর মার্কিন বাহিনীতে নিচের দিকের পদগুলিতেও বহু শিক্ষিত ছেলে ঢুকেছে। ইংরেজের ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের কল্যাণে শুধু ছাত্র নয়, সমাজের সেরা লোকরাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। শুধু যোগই দেয়নি। নিরাপদ দূরত্বে সমরদপ্তর বা সৈন্যপ্রধানদের ব্যক্তিগত স্টাফে জড়িয়ে না থেকে সোজা চলে এসেছে সম্মুখ সমরে। শত্রুর মুখোমুখি। পুরোপুরি ঝুঁকি নিয়ে।

শুধু মুখোমুখি নয়। পিঠোপিঠি পর্যন্ত।

অর্থাৎ শত্রু এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, তোমার সেনাদলের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে। আর তুমিও এগিয়ে যাচ্ছ সামনেই বটে। তবে শত্রুসেনাকে পিছনে রেখে। তোমাদের দূরত্ব যত বাড়বে তোমার পাঠানো খবরের গুরুত্বও সে অনুপাতে বেড়ে যাবে।

আর তফাতের মধ্যে এই যে তুমি একাই একশো। একটা গোটা ব্যাটালিয়ন বা রেজিমেন্ট তোমার খবরে নির্ভর করে তাদের গতিবিধি আর লড়াইয়ের প্ল্যান কষবে।

এমনিভাবে একেশ্বর হয়ে শত্রুর পিঠোপিঠি গোপন খবর পাচারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে টোনি আরউইন। জেনারেল আরউইনের ছেলে। নিশ্চিন্ত মনে নয়াদিল্লির জিমখানা ক্লাব আর সাউথ ব্লকের উদার নিরাপত্তায় এয়ারকন্ডিশন কারে আরামে সে সাম্রাজ্যরক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকতে পারত। সত্যি সত্যি কাগজ কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারত।

কিন্তু সে মায়ু গিরিশৃঙ্গের অর্থাৎ পাগলী পাহাড়গুলির ওপারে কী জানি কী পাগলামি করে বেড়াচ্ছে। মায়ুর কথাটার মানে হচ্ছে পাগলী।

খোদ হোম সেক্রেটারি কনরান স্মিথ, বলতে গেলে তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রতরণীর একজন কর্ণধার। একটা ইঙ্গিতে একমাত্র ছেলেকে অমনি একটা নিশ্চিন্ত চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারতেন। আর সেই অক্সফোর্ডের পাশ আর পালিশে ঝকমক করা তরুণ মালয়ের কোনও জঙ্গলে জাপানি হানাদারদের পিছনে এসে কোথায় নিঃশেষ হয়ে গেল তার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

সে সব কথা মনে করেই স্বয়ম্ আশা করল যে ওর রসাল টিপ্পনীটা মাঠে মারা যাবে না।

অবশ্য মারা গেল না।

ভি ফোর্সের কমান্ডারের খাস আস্তানার যিনি খোদ কর্তা তিনি নিজে এই বছর দুয়েক আগে ছিলেন আহেলা বিলেতি আই.সি.এস.। বর্মার একজন ডেপুটি কমিশনার। এখন বর্মা রাজ্য নেই। তার জেলা বা শাসনও নেই।

তারই সহপাঠী স্কচ সহকর্মী আই.সি.এস. রেঙ্গুনের প্রলয় পয়োধি জলের প্লাবনে দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে শোনা গেছে।

আর ইনি মাথা ঠাণ্ডা করে নিজের শাসনবিদ্যা আর স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছেন। ভি ফোর্সের কাজের উপর মিত্রশক্তির এগোনো পেছানো যুদ্ধ আর সাফল্য সব কিছু নির্ভর করছে।

মুখে হাসিখুশি আর কাঁধে ব্রিগেডিয়ারের মুকুট ও তারকাচিহ্নের ঝকমকানি নিয়ে তিনি এখন হেসে ফেললেন।

বললেন, আই সি। স্টিল স্মেলিং অব ইয়োর কলেজ ডেজ। এখনও কলেজের গন্ধ তোমার মধ্যে আছে। ভালোই হল এই গন্ধ আর এই রঙ্গরস তোমার খুব দরকার হবে। জানো তো, আরাকানে কোনও রসকস নেই। উঠের পিঠের মতো তোমার নিজের মন থেকে তা আহরণ করে একলা কালহরণ করতে হবে। আশা করি এ সম্বন্ধে তোমার মনে কোনও দ্বিধা নেই।

—না স্যার। আমার মন পরিপূর্ণ তৈরি।

—অ্যাঁ! তুমি মনের কথা তুলে ফেললে একেবারে! তবে শোন একটা সত্যি গল্প.

আমার দাদা গত যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফ্ল্যান্ডার্সে বোম্বার্ডমেন্টের মধ্যে ট্রেঞ্চে শুয়ে তারা গুনবার চেষ্টা করতে করতে তিনি তাঁর পাশে শোয়া স্যাঙাৎকে জিজ্ঞেস করলেন—জো, তুমি যুদ্ধ বাধার আগেই আর্মিতে যোগ দিয়েছিলে। কিন্তু কেন?

জো বলল—জেনে রাখ যে আমার বৌ ছিল না আর যুদ্ধ আমি পছন্দ করি। কিন্তু তুমি কেন ফ্রন্টে এলে, বন্ধু? তোমার অক্সফোর্ডের ছাপ নিয়ে দিব্যি লন্ডনের কাছাকাছি কোনও স্টোর অফিসে বা জি. এইচ. কিউ.-তে থেকে যেতে পারতে।

দাদা উত্তর দিল—আমার বৌ আছে এবং আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না। তাই।

পরমুহূর্তে একটা শেল এসে যুদ্ধপ্রেমিক জো-কে চিরকালের মতো শান্তি দিয়ে গেল। কিন্তু দাদা রয়ে গেল। আর তার যুদ্ধও এখনও চলছে।

কাজেই দেখ, মন নিয়ে জীবনকে মাপজোক করা চলে না।

গল্পটা বলে কম্যান্ডার বললেন, কিন্তু ঠাট্টার কথা আর ভাগ্যের কথা থাক। তোমার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। তোমার বিদ্যা তোমার বুদ্ধি সেগুলি হচ্ছে তোমার পাস্ট, অতীত। সেই অতীতটা হবে সামনের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পাটাতন। বসে থাকার সোফা নয়।

তোমার আসল অস্তিত্ব হচ্ছে তোমার বর্তমান। যাদের দিয়ে কাজ করাবে তারা তোমার স্তরের বা সমাজের লোক নয়। তাদের অনেকে হচ্ছে পাঁড় জোচ্চোর বা বদমায়েস, এমন কি খুনী। অথবা পাঁচটা টাকার জন্য নিজের ভাইয়ের ধড়টা দু-টুকরা করে দিতে পারে।

হঠাৎ বোধহয় স্বয়মের মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছিল। সেটা কম্যান্ডারের নজর এড়াল না। মুখের প্রতিটি রেখা, স্বরের ছোটখাটো ওঠানামা সবই কড়া খেয়ালে না রাখতে পারলে ভি ফোর্সের নেতা হওয়া চলে না।

তিনি বললেন, না, স্যামি, তুমি এখনও তেমন পাকাপোক্ত হয়ে ওঠনি। আরে আমরা তো সবাই খুনী। হয় করেছি, না হয় করব, না হয় করতে মনে মনে তৈরি আছি। মোকা পেলেই করব।

—স্যার, এটা তো যুদ্ধ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, যুদ্ধ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী নেপোলিয়ন আর বিলেতের ডার্টমুর

প্রিজনে বন্ধ আসল খুনী দুজনেই সমান। একই জগতের। তফাত হচ্ছে শুধু বুলিতে আর বলার ধরনে। এসব ব্যাপার বুঝে আমি দার্শনিক হয়ে উঠেছি।

—তার মানে?

অর্থাৎ বর্মা থেকে পালানোর কাবণটা ঘটার আগে অর্থাৎ রোজ ভোরে খবরের কাগজ নিয়মিত আসত। তখন সবার আগে শোক সংবাদের কলমটা দেখতাম। তাতে আমার নামটা নেই দেখলে খুশি হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতাম।

একটু হেসে তিনি বললেন, আর আজকাল রাতে ক্যাম্প খাটটাতে শুতে যাবার আগে মাটির নিচে যে বিছানা পাততে হয়নি সেটা বুঝে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি।

দুটোই সমান মনে করি। আর ভাবি যে এক হিসাবে স্বয়ং ঈশ্বরও খুনী। আমার মতই—প্ল্যান করে খুনী। অবশ্য অনেক বড় স্কেলে।

স্বয়ম্ অপ্রস্তুত হয়ে তাকাল।

—জানো স্যাম, তোমাদের গীতা পড়লাম গত বছর। বর্মা থেকে বানের জলের মতো প্রবল তোড়ে রিফিউজিরা এইসব জঙ্গল দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে নদীনালা পার হয়ে ইন্ডিয়ার দিকে পালাতে লাগল।

না পালিয়ে করবেই বা কী? আমাদের আর্মি বলে যা ছিল তা আর্মিই নয়। আমাদের ইনটেলিজেন্সের মতো বুদ্ধু আর ঘুমন্ত গুপ্তচর আর খবব জোগানে দল সারা পৃথিবীতে কোথাও ছিল না। এমনই অবস্থা যে আমি ব্রিটিশ রাজের একজন জেলা শাসক সেই আমিও খবর পেলাম না যে জাপানিরা হঠাৎ আমাব হেড কোয়ার্টার্সে চড়াও হবে।

আমি পালালাম।

আর্মিও পালাল।

মোক্ষম মুহূর্তে অসুখে পড়েছিলাম। তাই শহরের অন্য ইয়োরোপীয়ানদেব সঙ্গে পালাতে পারিনি। সাদা পলাতকদের রাস্তাটাও শেষ পর্যন্ত ধরতে পারিনি। কিন্তু অন্য রাস্তার নির্দয় নিঃসহায় কাহিনি সবাই জানে। তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলছি না।

একটু উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, শুধু একটা কথা বলব যে সব সময় ঈশ্বরকেই মনে হত খুনী বলে। তিনি যুদ্ধ কবান, রাজ্য হারান, নতুন শাসন বা অত্যাচার তৈবি করেন—সব সত্যি। কিন্তু এইরকম লাখ লাখে খুন কেন? যারা নিরীহ তাদের উপরই এত নিষ্ঠুরতা কেন?

কেন, তার উত্তর পেলাম একদিন। একজন ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক সব আত্মীয় আব সব বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিচে একটা নালায় গড়াতে গড়াতে নেমে গিয়েছিলেন জল খেতে। একা। ওঁর পায়ে হেঁটে নামার ক্ষমতা ছিল না। তবু প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ সবার উপরে।

এক চুমুক রাম গিলে দম নিয়ে তিনি শুরু করলেন, জলের সন্ধানে আমিও ওর পেছনে পেছনে গেলাম। আমার সোলার টুপিতে করে জল তুলে ওঁর মুখে দিলাম। ওঁর কৃতজ্ঞ দুটি চোখ আমার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল। তারপর উনি ছেঁড়া কোটের পকেট থেকে একটা পকেট বুক বের করে আমার হাতে দিলেন।

হয়তো ভেবেছিলেন যে আমায় প্রতিদান দিচ্ছেন। হয়তো কিছু শুনতে চেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলেন।

সেই পকেট বুক ছিল তোমাদের গীতা। পাশে পাশে ইংরাজি অনুবাদ ছাপা ছিল। তাতেই জানলাম যে তোমাদের ভগবান বলেছেন যুদ্ধের আগে তিনিই সবাইকে মেরে রেখেছেন। মাই গড।

এই ঘন জঙ্গলের লতাপাতায় ছাওয়া ক্যামোফ্লাজ করা কুটিরের চারদিকে স্বয়ম্ চোরা চাহনি চালাচ্ছে দেখে কম্যান্ডার বললেন, ওয়েল স্যাম, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অব মাই ফ্ল্যাগস্টাফ হাউস?

তারপর নিজেই বলে চললেন, জানো অল্প কিছুদিন আগেও রেঙ্গুনে আমার বাংলোয় যে ঠাট ছিল তার কথা মনে করে মাঝে মাঝে কম রস পাই না।

ডিনারের আগে ককটেল, সুপের সঙ্গে শেরি, শ্যাম্পেন, লিকিওর আর শুতে যাবার আগে হুইস্কি সোডা। ডিনার টেবিলে প্রত্যেকটি চেয়ারের পিছনে একটি করে বেয়ারা দাঁড়িয়ে। অন্যরা খাবার পরিবেশন করছে আর সুপারভাইজ করছে টেলকোট পরা বাটলার।

পটের আড়ালে প্যান্ট্রিতে আরও গুটিকতক পরিচারক আইসড কসম (বরফ জমানো সুপ), রোস্ট

ডাক, সোল মাছ ফ্রাই, মুখরোচক সেভারি ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যস্ত। আর আমাদের গভর্নমেন্ট হাউসের চাকরেরই সংখ্যা ছিল একশ দশ। কিন্তু আমিও ছিলাম একটি খুদে লাট।

—স্যার, এনলিস্ট করার পরে আমি নয়া দিল্লিতেও এই ঠাট এখনও চলছে দেখে এসেছি।

—কিন্তু সেখানেও কি দেখেছ যে সাম্রাজ্যশাসনকারীদের ঘরে ঘরে যখন এই নিশ্চিন্ত বিলাস তখন নীরবে দুশমন কিভাবে জাল ছড়াচ্ছে? মিলিটারি খবর ছেঁকে তুলবার জাল?

তোমার দাঁতের ব্যথাটুকু হলেও শাদা ওভারল পরা শুভ্রহাস্যমণ্ডিত জাপানি রাজহাঁসের মতো নম্র আবাহনে তোমায় আপ্যায়ন করছে। তোমার পার্টিতে বা ক্লাবে যদি মিঠে মদ মার্টিনি সব চেয়ে ভালোভাবে নাড়ান দিয়ে সার্ভ করা হয়ে থাকে তার পিছনে জাপানি হাত।

তোমার চুলের সবচেয়ে নটবর ছাঁট মাথাকে যদি অহংকারে উঁচু করে তোলে তার জন্য কেবামতি জাপানি কাঁচির। সকালবেলা দলাই মলাই করে মন মেজাজ যে সুখের সুরে ভরে দিয়ে যায় সেই 'ম্যাসিয়োর' উঠতি সূর্যের কিরণে বড় হয়ে উঠেছে।

আর, আর সব গ্লামার গার্লের আর গ্লোরিয়াস সোয়্যারি উৎসবেব ছবি খুট খুট করে হাসিমুখে তুলছে ওরাই।

কিন্তু শুধু ওই মনমাতানিয়া ছবি তোমাব জন্যই কি ওরা বর্মা জাঁকিয়ে বসেছিল?

—আপনারা সন্দেহও করেননি স্যার? ওরা তো কলকাতাতেও ব্যাঙের ছাতার মতো নানান দোকান খুলে বসেছিল আব আমরা পাড়ায় পাড়ায় সেটা নজর করতাম। আর কারণ অনুমান করতে ভুল হয়নি।

—প্রশাসনের যখন নাশ হয় তার পেছনে থাকে বহু আবাম আর আলস্য আর মনকে চোখ ঠাবা। খুসবুভবা খসখস টাট্টি শুধু গরম রোধ করে না, খবরের আনাগোনাকেও করে অবরোধ। অথচ রেঙ্গুনেব সব চেয়ে চটকদার জনপ্রিয় সোস্যাল পার্টি দিত জাপানি কনসাল।

—কিন্তু ব্রিটিশ সিংহ তো এ পর্যন্ত সব সময়ই সিংহবিক্রমে জেগে উঠত আর গর্জে যেত। এবার আপনাদের সাম্রাজ্যেব মুকুটমণি ক্রাউন জুয়েল হংকং থেকে মাত্র হপ্তা দুইয়ের মধ্যেই সাদা পতাকা উড়িয়ে দিলেন কী করে? হোয়াইট ফ্ল্যাগ?

—কাবণ হোয়াইট হল থেকে সাদা পতাকা যে বছরেব পর বছর ওড়ান হচ্ছিল।

—সে কথা আমরা কলকাতায় কলেজে পড়তে পড়তেই ভেবেছি। হিটলারের গুপ্ত মন্ত্রণার শৈলগুহা বার্চটেস গার্ডেনের উপরে যে ধাপ্পার ধূম্রজাল কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছিল তা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের ছাতার পরতে পরতে জমে ঘন হয়ে বইল। কাজেই যে বিরাট মারমুখী বিক্রম ওরা যবনিকাব ঠিক পিছনেই জমা করছিল তা আপনাদের নজরে পড়েনি।

কম্যান্ডার সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই আধো অন্ধকার আধো আলোতে স্বয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপব টেবিলের ওপর রাখা রিভলভারটা ঠুক ঠুক কবে ঠুকতে লাগলেন। অধীন ভারতীয়, তার উপর বাঙালি। নতুন রিক্রুটের মুখে এমন কথা অসহ্য। অথচ অস্বীকার কবাব পথ নেই।

এবং কথাগুলি শাণিত হলেও শান্ত। মর্মান্তিক হলেও মর্মভেদী।

তারপর বললেন, এ কথা ঠিক। ইংলন্ড থেকে আমাদের তথ্যমন্ত্রী ডাফ কুপাব এ ক'মাস আগেও এসে বর্মায় বসিয়ে রাখা তরুণ সৈন্যদের সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন যে বেচারারা যুদ্ধটা আস্বাদই করবার মোকা পাবে না। ঠিক সেই সময়েই জাপানিরা পার্ল হারবার আচমকা খতম করে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে নিচ্ছিল। আর আমরা মান্দালয় ক্লাবে বছরের সেরা রোশনাই মিলিটারি টাট্টু করছি।

—বেসামরিক আর রাজনীতিকরা না হয় এমন নিশ্চিন্ততায় ডুবে থাকত। কিন্তু মিলিটারি ইনটেলিজেন্স কী করে ঘুমিয়ে ছিল বুঝি না।

—প্রত্যেক সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায় এমন করেই। সূর্য আমাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে অস্ত যাবার পথ পেত না। কিন্তু চাঁদের আলো আর মদের আবেশ আমাদের দিন রজনী ভরে বিরাজ করত।

সৈন্যরা অবশ্য সুশৃঙ্খল ছিল। কিন্তু কর্তারা ছিলেন নিশ্চিন্ত আর ঘুমন্ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার শুরু করলেন, তুমি কিপলিং-এর বইতে নিশ্চয় পড়েছ যে তুষারশুভ্র ব্লাউজ আর বিচিত্র বর্ণের রেশমী লুঙ্গিতে সজ্জিত বর্মী মেয়েরা রূপের ঠাটে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর

মনমাতানোর জন্য বিয়ার আর ব্রিজ, সুরা আর নারীর কোনও অভাব ছিল না বর্মায়।

ক্লাব আর মাক্‌সিমের মতো নাইট ক্লাব সংসারের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেত। প্যারাডাইস ক্লাবে যখন জেগে উঠলাম দেখি সব শেষ। একেবারে শেষ।

কে জানে হয়তো এই কম্যান্ডারেরও সবাই, সংসারের নিকটতম সবাই সেই প্রলয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

স্বয়ম্‌ চুপ করে রইল।

একটু পরে কম্যান্ডার আবার শুরু করলেন, স্বপ্নের স্বর্গ শেষ আর গীতার লেখা মোহের শেষ দুটো কথাই একসঙ্গে বললাম। তোমাকেই বললাম—তুমি হিন্দু বলে। এবং আর্মিতে নতুন এসেছ বলে।

দলের মধ্যে থেকে মারা এবং মরা সহজ। একা সেই কাজ অনেক বেশি শক্ত। বিশেষ করে যখন তোমায় স্মাগলার ঠগ শয়তান জেলভাঙা এসব লোকের সাহায্যে কাজ করতে হবে। অনেক সময় মনে হবে জাপ শত্রুরা তোমার সহকারিদের চেয়ে ভালো লোক এবং বেঁচে থাকার যোগ্য। তাই জানিয়ে দিলাম।

তুমি যাদের দিয়ে কাজ করাবে তারা বেশির ভাগ চাটগাঁর লোক। মগ আর জাপানি দু দলকেই তারা দু চোখে দেখতে পারে না—হেট লাইক হেল। তাতে তোমারই সুবিধা।

প্রত্যেক গ্রামে দু-একজন করে আমাদের লোক তৈরি আছে। তাদের দিয়ে শত্রুর গতিবিধি রসদ সরবরাহ অস্ত্রশস্ত্রের বহর ইউনিটগুলির পরিচয় ইত্যাদি বের করতে হবে।

ওরা নিয়মিতভাবে নয়, হঠাৎ হঠাৎ তোমার কাছে আসবে। অথবা তুমি নিজে গাঁয়ে গিয়ে তাদের মোলাকাত করবে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য তোমার ক্যাম্পেই লোক থাকবে।

সকলেরই আলাদা আলাদা ডাকনাম দেওয়া আছে। পৈতৃক নাম আর পরিচয় এখানে অচল।

আর শোন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব ডাকনাম মুখস্থ রেখো। সেটা সব সময় কৌশলে যাচাই করে নেবে প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তে।

শত্রুরেখার আরও পিছনে আমাদের এজেন্টরা আছে। তারা একটু বেশি চালাক আর সজাগ। আর প্রচুর টাকা তাদের দেওয়া হয়।

তবে তার মধ্যে কেউ কেউ আছে ডাবল এজেন্ট। তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হও, তোমাবই সুবিধা হবে। বুঝলে?

—বুঝেছি স্যার।

—বেশ ভালো কথা। তবে জানো আমাদের সবচেয়ে সাবধান হতে হয় ফুঙ্গিদের সম্বন্ধে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে বর্মাতে ত্রিশ হাজারের উপর জাপানি এসে বসবাস করেছিল। তারা সবাই বোধহয় স্পাই। তারা বর্মী ফুঙ্গিদের অনেককে হাত করেছে। অনেক ফুঙ্গি ইংরেজও ভারতীয় সৈন্যদের পথ ভুলিয়ে জাপানিদের দিয়ে 'অ্যাম্বুশ' করতে সহায়তা করেছে।

কিন্তু আমিও দরকার মতো ফুঙ্গি সেজে গেছি। তোমার একটু মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ এ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। গোটা কয়েক ধর্মপদও এখন আওড়াতে শিখে নিয়ো।

দেখবে আমি যখন ফুঙ্গি সেজে সর্বাঙ্গে ক্রীম মেখে আওড়াই :

আকাশ পদম নত্থি
সমনো নত্থি বাহিরে
পপঞ্চাভিরতা প্রজা
নিপঞ্চা তথাগতা

তখন কে আমায় ধরবে যে আমি তাদেরই একজন নই? আকাশে পথ নেই; সাধু শ্রমণ বাইরে দেখা যায় না। আলবত ঠিক কথা। কিন্তু আমি ভুলি না যে প্রজা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ছলনাময়।

ছুরি ওরা আমায় মারবে না আমিই তাদের মারব, তা পদে পদে হিসেব করে চলতে হবে। বুঝলে স্যাম?

আর শোন, তোমার ডান হাত হবে যে তার নাম খুনী খান। ওটা ওর বাপ-মায়ের দেওয়া নাম নয়। খানটা বোধ হয় ওর অবস্থাপন্ন বাপ-মায়ের পদবী। কিন্তু ও এতবার সার্জনের মতো পাকা হাতে পেটে চাকু চালিয়েছে যে যার পেট কাটে সে মরবার আগে টেরই পায় না। তাই ও খুনের রাজা খুনী খান।

কিন্তু ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পার পুরোপুরি। এককালে সরকার থেকে ওর নামে হুলিয়া আর বখশিস, ঘোষণা ছিল। ওর গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে যোগসাজস খুব ভালো। আর খবর আনে পাকা। ওর পাকা শিক্ষা তো সেই আমাদের আমলেই হয়েছিল কিনা।

এই পোশাকে নিশ্চয়ই চলবে না?

—ঠিক বলেছ তুমি। যদি ভগবান গীতার কথামতো তোমায় তুলে নেন—গড হেলপ ইউ—তখনও এই পোশাকের সঙ্গে জড়ানো মর্যাদা তোমার দেহ পাবে না। তোমার এই খাকি সর্ট আর শার্ট, বুট আর সক্‌স্ ওপারে অনুপ্রবেশ করবার সময় সবই ছাড়তে হবে। পরনে থাকবে লুঙ্গি আর চরণে থাকবে শুধু কাদা মাটি। লুঙ্গির নিচে থাকবে খসখসে সুতোর বোনা বেল্ট আর তাতে জড়ানো রিভলভার। আবার ফুঙ্গিপাড়ার জন্য আলাদা সাজ।

—ব্যাস?

—ব্যাস-স। আর কিছু নয়। তোমার একমাত্র বন্ধু বলো, ভ্যালে (নিজস্ব চাকর) বলো, সম্পদ বলো, ওই হচ্ছে তোমার নিজের মাথা খেলানো বুদ্ধি। ত্রিসংসারে আর কেউ তোমার নিজের বলতে থাকবে না। তোমার নিজের জান, আর তোমার উপর ভরসা করে থাকা আমাদের সৈন্যদল নির্ভর করে থাকবে তোমার বুদ্ধির উপর।

বুদ্ধি। বুদ্ধির মতো অদৃশ্য সুতো থেকে ঝুলবে এখন থেকে ওর জীবন। ছিল ছাত্র; চাকরির সন্ধানে জুতোর গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া বেকার যুবক।

হল সামরিক অফিসার; সঙ্গে এল ঝকঝকে পোশাক আর পরিচয় এবং নাম উঠল এনলিস্টেড খাতায়। নামের চেয়ে বড় হয়ে উঠল নম্বর।

একটা শৃঙ্খলাময় সিস্টেমের মধ্যে একটা মাত্র ডিজিট, একটা ভাবলেশহীন পরিচয়হীন নম্বর।

এমন কি 'ডেথ অর গ্লোরি' মৃত্যু না হয় কীর্তি মার্কা ফ্রন্ট লাইন ডেসপ্যাচে উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরে নামার বাহাদুরিও সে এই ফোর্সে পাবে না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে কম্যান্ডার আবার বললেন, তবে জেনে রেখো যে কখনও কখনও বুদ্ধি করে বোকা সাজতেও হতে পারে। আমরা কিছুদিন আগে একজন নাইজেরিয়ান স্যাপারকে প্যারাশুট দিয়ে দি আদার সাইড অব দি হিল'-এ নামিয়ে দিয়েছিলাম। রেল লাইন ওদিকে নেই। তবু এত মাল আর এত সৈন্য ওরা এদিকে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই বড় নদীটিতে সাঁকো বেঁধেছে। সেটা উড়িয়ে দিতে হবে।

—তা নাইজেরিয়ান কেন?

—বাঃ। কালো চাটগাঁয়ের লোকের মতো পোশাক পরে অন্ধকারে পথ হাতড়ে একা যেতে পারবে। তা সে পেরেছিল। সাঁকোটা ভেঙেও ছিল। কিন্তু ধরা পড়ে ঐ ক্ষুরধার বুদ্ধির লোক যেমন বোকা সাজল তা তোমায় বলি।

জাপানিরা জিজ্ঞেস করল—তুমি কী করে এখানে এলে?

—আকাশ থেকে আমায় ফেলে দিয়েছিল—ছাতায় বেঁধে।

এই বলে আকাশে হাত-পা ছুঁড়ে সে হাসতে লাগল। মিশ কালো রঙের ভিতর থেকে ঝকঝকে বুদ্ধি ঝরতে লাগল।

—তোমার মতো কজন আছে? তোমাদের সৈন্যদলে কতজন কালো আছে?

—হাজার হাজার, লাখ লাখ। আমি তো গুনতে জানি না।

আবার সেই মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের হাসি।

—তোমায় কি প্লেনে করে নামাল? না গ্লাইডারে করে?

—ও সব তফাত আমি জানি না। আমায় ধাক্কা মেরে নিচে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

একথা শুনে জাপানিরা ওকে প্রচণ্ড মার দিল। মারতে মারতে আবার জিজ্ঞেস করল—তুমি কি প্যারাশুটিস্ট?

—সব নিগ্রোই ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাদাদের লাথি খাওয়া, পিছন থেকে ধাক্কা খাওয়া আমাদের অভ্যাস আছে।

—কী রকম অস্ত্র আর কামান তোমাদের সঙ্গে আছে?

—জানি না। আমরা তো শুধু জঙ্গলী মানুষ। দা নিয়ে বর্শা নিয়ে মানুষ মারি। বনে চরে বেড়াই।

রাম ধোলাই দিয়ে উলঙ্গ করে ওকে জাপানিরা বনে ছেড়ে দিল। পিছনে রাখল নজর। কিন্তু জাপানিদেরও একটা পাগলাটে উলঙ্গ লোকের পিছে পিছে ঘুরতে লজ্জা হয়েছিল বোধ হয়। সে শেষ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে এসেছে। কেবল বোকার ভানটাই ছিল একমাত্র সহায়।

স্বয়মের নিজের সৈনিক নম্বরটাও এখন লোপ পেয়ে যাবে।

বিশেষত অনেক ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বলে যে তোমার নম্বর যখন আসবে শুধু তখনই তুমি এই ভব-ধাম ত্যাগ করতে পারবে। আর আমি তো এখন নম্বর নিজে থেকেই ছেড়ে আসছি। অর্থাৎ যখন তখন এসপার-ওসপার।

আর শোন। যখনই যে গ্রামে একা খবরাখবর তদারক করতে যাবে সেখানে রাত কাটাতে যেয়ো না। সব চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ অতিথি-বৎসল গ্রামেও না। তুমি জানো না কোন্ দিনের বন্ধু রাতের দুশমনে পরিণত হয়ে শত্রুর হাতে তোময় তুলে দেবে। অবশ্য ওর পক্ষে লাভের ব্যবসা, কিন্তু পুরো লোকসান আমাদের।

আর যদি পারো তো মরো। পটল তোলা বরং ভালো। কিন্তু চরণ মাঝির নৌকো যেন ফুটা না হয়ে যায়। মোদ্দা কথা জাপানির হাতে বন্দী হয়ো না। নেভার। নো, নেভার।

আবেগেরুদ্ধ কিন্তু আনন্দে উৎসাহিত কণ্ঠে নতুনের সম্ভাবনায় সে বলল—তা নিশ্চয়ই হব না। স্যার, যোদ্ধা হয়েও গেঁয়ো মেঠো মানুষের সঙ্গে চোরাগোপ্তা কাজ করতে হবে। সব জেনে, সব বুঝেই ভি ফোর্সে নাম লেখাতে এসেছি। ওদের চালাতে, ওদের সঙ্গে চলতে. হাসতে মরতে হবে গোপনে। তবু তো বাঙালির দুর্লভ জীবনে এখন পাব শুধু দৈহিক লড়াই নয়, বুদ্ধির লড়াই। নিজেই নিজের সেনাপতি হয়ে বাঁচার উন্মাদনা পাব। সেটাই লাভ। হোক না সেটা যুদ্ধের বাঁধা ছকের বাইরে। আপনার ভি ফোর্সের অন্যরা যা পাবে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি পাব আমি।

—ব্রাভো বয়, ব্রাভো। কিন্তু আরও একটা অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে রোজ লড়াই করতে হবে। মশা, সাধাবণ মশা। মশা নিবারণী ক্রীম সঙ্গে নিতে ভুলো না। প্রতি সফরের সহচরী হবে ওই ক্রীম। পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন সূর্য লাল চোখ করে সরে পড়ার জন্য শাসানি দেবে আর গাঁওবুড়া খুব মোলায়েম ভাবে ফিসফিস করে বলবে—এখন বোধ হয় সাহেবের বাসায় ফেরার সময় হল—তখন চট করে এই ক্রীমের কথা মনে কোরো। প্রচণ্ড বৃষ্টিই হোক আর বৃষ্টি নেই বলে কোনও ঝোপঝাড়ে তারার চাঁদোয়ার তলায় রাত কাটাতেই হোক---বেশ ভালো করে ক্রীম মেখে নেবে।

ফিক করে হেসে স্বয়ম্ বলল, ঠিক একেবারে বিলাসিনী বিউটিদের মতো। বিউটি স্লিপের জন্য বিউটি ক্রীম।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে ব্রিগেডিয়ার বললেন, এই রসবোধটা সব সময় বজায় রেখো। সব চেয়ে হতাশ আর একলা মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সঙ্গী।

—ক্রীম মাখার অভ্যেস আছে, স্যার।

—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এখানে সে অভ্যেসটা যেন রিলিজিয়ন করে নিয়ো। না হলে জঙ্গলের গভীরে বা চাঙ্গের বুকে বা পাহাড়ের আড়ালে হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেলে জাপানি তলোয়ারের খোচা ছাড়া আর কিছুতেই সে জ্বর ছাড়বে না। মেপাক্রিম বটিকা রোজ খেলেও ছাড়বে না। মশাকে উপোসী রাখতে হবে।

আরও অনেক কথা হল। চারদিকের এলাকার ম্যাপ, কোথায় কোন্ জাপানি ঘাঁটি নজরে এসেছে, কোন্ কোন্ গ্রামে খবর দেনেওলা আছে, কোথায় আছে স্পাই—সব আলোচনা হল।

কম্যান্ডার আবার শুনিয়ে দিলেন, মনে রেখো তোমায় হুকুম করবার বা নির্দেশ দেবার কেউ ধারে কাছে থাকবে না। সব পরিকল্পনা তোমার নিজের, সব রূপায়ণ তোমারই দায়। শুধু যন্ত্রের মতো গোটাকতক লোক থাকবে। তোমার বিচার হবে তোমার কাজ দিয়ে। তার মাশুল হচ্ছে তোমার নিজের দায়িত্ব আর বুদ্ধি। এর চেয়ে বড় পরীক্ষা জীবনের উপর দিয়ে আর কিছু নেই।

স্বয়ম্ গভীর ভাবে কথাগুলি মনের মধ্যে নিল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। আমি নিজের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের নেতা হয়ে সেনাদলের আর নিজেরও মর্যাদা বাড়াব এই আশাতেই যেচে ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছি। আমি জানি যে বর্মা সীমান্তের এই আর্মিকে মিত্রশক্তি বলে 'দি ফরগটন আর্মি'। তার মধ্যেও

আমি কাজ করব সবচেয়ে বিস্মৃতিতে ঘেরা সৈন্য হিসাবে।

—না, ফরগট্‌ন আর্মি নয়, স্যাম। আন্‌নোন আর্মি। ভুলে যাওয়া নয়, অজানা। খরচের খাতায় তোলা নয়। হিসাবের আড়ালে তোলা। যুদ্ধের শেষে যখন আমরা পর্দার বাইরে বেরিয়ে আসব লোকে আমাদেরই সবচেয়ে বেশি বাহাদুরি দেবে।

একটু হেসে তিনি আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। বললেন, স্যাম, তুমি তো কলকাতার ছেলে। বাঙালি। জানো, তবুও কেন তোমায় এই কাজে নিচ্ছি?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বয়ম্ বলল, বলুন তবে। আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।

—তোমার চেহারা আর ভাষাজ্ঞানই তোমার উপর আমার নজর এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা গৌণ।

বাঙালিদের ইন্‌ডিভিজুয়ালিজ্‌ম বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এই কাজে একটা বিশেষ সুবিধা। যদি—যদি সে বাঙালি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আর শৃঙ্খলার দীক্ষায় একটা দলের একটা টিমের মধ্যে মিলে-মিশে একাত্ম হয়ে যেতে পারে, আবার প্রয়োজনে সেই দলের উপরে দলের বাইরে নিজত্বকে কাজে লাগাতে পারে।

কোনও মানুষ যদি ভেড়ার দলে থেকে থেকে ভেড়া বনে যায় তার দ্বারা এ কাজ হবে না। আমি রিপোর্ট পেয়েছি তুমি তা হয়ে যাওনি।

দ্রুত হাতে দুটো গ্লাসে 'রাম' ঢালতে ঢালতে তিনি বললেন, না, বড় ভারী হয়ে যাচ্ছে আবহাওয়া। তার চেয়ে সেই গানটা একসঙ্গে নিচু সুরে গাওয়া যাক। তুমি তো কলকাতিয়া। গানটার নাম দি ক্যালকাটা কলেরা সঙ। আমাদের জন্যেই যেন লেখা।

Stand to your glasses steady.
This world is a world full of lies.
Here's toast to the dead already
And here's to the next man to die.

কলকাতার স্বয়ম্ যুদ্ধক্ষেত্রের স্যাম হয়ে গেছে। সেও গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল। সামনে অজানার অভিসার। অচেনার লীলা।

গাইতে গাইতে স্বয়ম্ যেন নতুন একটা আবেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। 'রাম' সুরার উন্মাদনা ছাপিয়ে লোপ করে দিয়ে একটা মানসিক রমণীয় জীবন-বেদ শুনতে পেল।

কেমন সমর-যন্ত্র এটা? কেমন সাধনা যার সন্ধানের মধ্যে সে অনুভব করছে একটা পরম সার্থকতা? জীবন-মরণের চরম লীলার মধ্যে পরম প্রাপ্তি।

স্বয়ম্ভু থেকে স্বয়ম্। তা থেকে স্যাম। নামের প্রত্যেকটা পরিবর্তনের মধ্যেও যেন সে একটা নিয়তির ইঙ্গিত, একটা গোপন অর্থ খুঁজে পাচ্ছে।

সমস্ত বনভূমি নীরব নিস্পন্দ।

হঠাৎ একটা হরিণ ডেকে যাচ্ছে। কোনও বুনো পশুর পায়ের খসখস শব্দ তাঁবুর চারপাশে ক্যামোফ্লাজের জন্য ছড়ানো ডালপালায় মর্মরিত হয়ে উঠছে। সুপুরি গাছের মৃদু মর্মরধ্বনি আর বাঁশ-বনের দোলানির পটভূমিকায় একটা জগৎ ঘুমিয়ে আছে।

আর সেই ঘুমের দেশের মধ্যে একমাত্র জীবন্ত জাগ্রত সত্তা হবে স্বয়মের। তার নিজের কাজের গণ্ডির মধ্যে সে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার স্বাদ পাবে।

স্বাতী বলেছিল—লিভ এ লিটল।

॥ একুশ ॥

বন্ধনহীন গ্রন্থি।

কাব্যের ভাষায় যা রমণীয়, আটপৌরে সংসারের মধ্যে তা-ই গাঁটছড়া ছাড়া বাঁধন হিসাবে রোমাঞ্চে ভরা।

স্বাতীর কাছে সেই বহু ভাগ্যে পাওয়া অনুভব না এল তার রমণীয় কাব্যময়তা নিয়ে, না তার সাংসারিক রোমাঞ্চ নিয়ে।

সংসারের হিসাবে স্বয়ম্ কেউ নয়। শুধু প্রতিবেশী, শুধু পরিচিত একজন—যে মাত্র হালে মেশার

যোগ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার যাচাই হল না। অজ্ঞাত যার ভবিষ্যৎ আর অপরিচিত যার বর্তমান তার চিন্তা আর তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিন্তা করে সময় নষ্ট বাস্তব সংসার করে না।

স্বয়ম্ বলেছিল যে সে ত্রিশঙ্কু। স্বাতী বলেছিল, তুমি মাথা তুলে রেখেছিলে আকাশে আর এখন চরণ রেখেছ ধরণীতে। তুমি সেতু—আকাশ আর পৃথিবীর যোগসূত্র।

একটু হেসে যোগ করে দিয়েছিল, সত্যিই তাই। তুমি প্যারাসুট রেজিমেন্টের অফিসার। আকাশে উড়ে স্বর্গ থেকে নেমে ধরণী দখল করবে।

স্বয়ম্ এই প্রশংসাটুকু মন খুলে উপভোগ করেছিল। হেসেছিল। বলেছিল, তার মানে আমি শঙ্কাহীন ত্রিশঙ্কু। বাধা-বন্ধনহীন।

কিন্তু সে রেখে গেল এক বন্ধনহীন গ্রন্থি। ঠিকানাহীন চিহ্নহীনভাবে মিলিয়ে গেল। শুধু রেজিমেন্টের নাম আর তার সঙ্গে এ পি ও (আর্মি পোস্ট অফিস) নম্বর। একটা জলজ্যান্ত মানুষের ঠিকানা ও পদচিহ্ন এমন করেই লেপে মুছে লোপ করে দেওয়া হয় সামরিক ব্যবস্থায়।

সেই বিলোপটা স্বাতী স্পেশাল ট্রেনে স্বয়ম্‌কে বিদায় জানাতে এসে আরও বেশি মর্মে মর্মে বুঝছিল। আর্মি ট্রান্সপোর্টের ট্রেন সিগন্যাল কেবিন ছাড়িয়ে এঁকে-বেঁকে নজরেব আড়ালে মিলিয়ে গেল। ইঞ্জিনের মাথার উপরের সিগারেটটা যেন শেষ সুখ-টানের পর হালকা একটু ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুড়ে দিয়ে নিঃশেষে নিভে গেল।

কিন্তু ট্রেনটার একটা ঠিকানা জানা আছে। তাকে খুঁজে পাওয়াও যাবে। তার আরোহীদের ঠিকানা কিন্তু ওই তিনটি অক্ষর ছাড়া কিছুই নয়। তাদের কোনও খোঁজ করাও চলবে না। যুদ্ধ নামে একটা বিরাট যন্ত্র তাদের গ্রাস কবে মুছে দিয়েছে।

অজানা অ্যাসেমব্লি সেন্টারে নিয়ে যাবার মিলিটারি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বিদায় সম্ভাষণের উপযুক্ত জায়গা নয়। না আছে নিরিবিলি, না নিরালা পরিবেশ। চার দিকে অসভ্য চিঁড়ে-চ্যাপটা ভিড়। তার চেয়ে বেশি অসভ্য হচ্ছে অচেনা লোকের নজরের তীর। ইঞ্জিনের সার্চলাইটের চেয়ে বেশি প্রখর, বেশি মুখর সেই সব নজর। তার বাইরে অনেকটা দূরে নিরিবিলিতে ওরা মিলিত হয়েছিল।

ওই সব ভিড় আর নজর উপেক্ষা করে স্বাতী বলেছিল, এতদিন ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলে। তখন ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে নিজেকে বিদায় নেওয়াতে অভ্যস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

স্বয়মের সুঠাম ইউনিফর্মে ঘষামাজা পালিশ করা পদের চিহ্নগুলি ঝকমক করছিল মিলিটারি মহিমায়। কিন্তু তার নিজের আঁখিতারায় কোনও দীপ্তিরই আভাস ছিল না। স্বাতীর এই কথাতে সে আত্মসংবরণ করে নিল।

হেসে বলল, অর্থাৎ বেশ ভালো করে ওদেশী লোকদের মতো গুডবাই ডার্লিং প্রভৃতি বলতে মক্স করে নেওয়া উচিত ছিল। তা করনি, ভালোই করেছ। বিনা কথার বিদায় বিনা সুতার হারের মতোই বেশি যত্নে তুলে রাখতে হয়। —এবং বেশি সঙ্গোপনে।

তার পরের নিবিড় কয়েকটি সোনাঝরা মিনিট ওদের কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল, কী কথা হয়েছিল আর কী হয়নি স্বাতীর কিছুই মনে নেই বলে মনে হত।

মনে আছে অথচ মনে নেই। স্মরণে-বিস্মরণে জড়ানো সুধায় ভরানো সেই পরম ক্ষণটুকু। সেই পরম স্বীকার। কিন্তু কোনও অঙ্গীকার নয়।

তারপর থেকে স্বাতী ক্রমশ যেন নিজের শামুকের খোলার মধ্যে গুটিয়ে যেতে লাগল। অথচ সে যে কোনও রকমেই সংকুচিত বা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ভাবে থাকুক এটা স্বয়ম্ নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না তাও সে বুঝত।

স্বয়ম্ বলে গিয়েছিল, তুমি খুব সহজ আছ এইটুকু যেন আমি মনে করতে পারি। আমার চিন্তা তোমার চিত্তে যেন কোনও শিকল অদৃশ্যভাবে না পরিয়ে দেয়। এরকম যেন না হয়।

স্বাতী মৃদুস্বরে বলেছিল, তুমি শিকল কেন মনে করছ? আমি যদি মনে করি মণিহার?

—না। মনে মনের মণিহার বাইরের জগতে ব্যবহারে বিহারে যেন শিকল না হয়। আমার কথা তোমার মনে কোনও ছায়া এনে দেবে তা আমি চাই না।

স্বাতী তমসা-তীর্থে স্নান করা আধুনিকা। তবু সে স্বয়মের শেখান, স্বয়মের মুখে শোনা পুরাকালের

নায়িকার কথাটুকু কখনও মন থেকে সরায়নি।

একদিন কথায় কথায় সে স্বাতীকে রামের সঙ্গে বনবাসে গমনের সময় সীতা রামকে যা বলেছিলেন তা বলেছিল, যত্ত্বয়া সহ স স্বর্গঃ। তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ।

একাকিনী স্বাতীর সীতার মতো কোনও বন্ধন নেই, নেই কোনও অনুশাসন। কিন্তু মনে মনে সে পরিবার সংসার সমাজ সব এড়িয়ে, সব ছাড়িয়ে একটি মন্ত্রের অনুসরণে অনুভব করেছে। সীতার মতো স্বর্গসুখ সম্ভব নয় বনভূমিতে। কিন্তু মনভূমিতে সে তো একা নয়।

মনে মনে সে ভাবল—আমার নিঃসঙ্গতার কারণ হচ্ছে তোমার স্মৃতি। আর নিঃসঙ্গতাতেই তোমার সঙ্গ পাব।

কিন্তু সে যে বহুজনের প্রার্থনার ধন। ধনী উঁচু মহলের আধুনিকা তরুণী। নিভৃতে থাকতে চাইলেই বা সেটুকু স্বাধীনতা সে পাবে কী করে? তার নজরে পড়া, তার প্রেম পাওয়া যে বহু তরুণের প্রার্থনা। আর সেই সাধনার হোমকুণ্ডে উভয়পক্ষের হিতৈষী আর গুরুজনরাও যে নিত্য আহুতি দেবার জন্য উৎসাহ দেয়।

মডার্ন কলকাতার, পশ্চিমের মন্ত্রে জেগে ওঠা কলকাতার নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা সান্ধ্য সমাজে মধ্যমণি হবার যোগ্যতা যে রাখে তাকে আড়ালে থাকার সুযোগ দেবে এ হেন বেরসিক নয় কলকাতা।

একটা জ্যাম সেসনে অর্থাৎ অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনতে শুনতে দিন দুপুরে বিকেলে কফি আর হ্যামবার্গার সামনে রেখে আড্ডা আর ইচ্ছা হলে হৈ হল্লা মায় নাচের মাঝখানে বন্ধু-বান্ধবীর দল স্বাতীকে নিয়ে এসেছিল। উত্তর কলকাতার বেঙ্গলি মহিলা মহলে দিবানিদ্রা যেমন মহাপুণ্য, এদের কাছে দিবানৃত্য তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।

তিন-চারজন মেয়ে বন্ধু আগে থেকে একটা টেবিল দখল করে রেখেছিল। তাদেরই একজনের চেনা কয়েকজন মিলিটারি তরুণ অফিসার কোনও টেবিল খালি না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের দেখতে পেয়ে ওরা ডেকে আনল। ওয়েটারকে দিয়ে আরও কয়েকটি চেয়ার আনিয়ে ওদের নিজেদের টেবিলেই বসাল। ঘেঁষাঘেষি করে বসে শুরু হল মেশামেশি।

জ্যাম সেসন সব অর্থেই সার্থক হয়ে উঠল। জ্যামের মতই মিঠে আর ঠাসাঠাসি।

হালকা হাসি আর মিঠে ঠাট্টার মধ্যে শুরু হয়েছিল তাদের পরিচয়। কিন্তু নতুন জঙ্গী বন্ধুরা সব অগ্রসর, মানে অ্যাগ্রেসিভ, মানে এগিয়ে যাবার বিদ্যায় ওস্তাদ।

মিলিটারি বিদ্যায় যারা রপ্ত তাদের ধর্মই যে এগিয়ে যাওয়া। দখল করা।

এমনই একটি দখলিয়ানা ভাব দেখিয়ে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র অর্থাৎ অভিজ্ঞ নেভাল অফিসারটি মোম দিয়ে নরম করা গোঁফের সূচালো প্রান্ত সুখে মোচড়াতে মোচড়াতে নিজের পুরুষালি দুঃখ নিবেদন করল।

সে বেশ দুঃখে বিগলিত ভাবে বলল, জানো তোমরা, আমার কি কপাল। এই কলকাতার এক রেস্তোরাঁ থেকে বছর সাতেক আগে আমি একটি কচি বেবি ফেস নিয়ে নিরীহ নিশ্চিন্ত ভাবে বের হচ্ছিলাম। বেয়ারা দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়াতেই সামনে পড়ল এক লম্বা দাড়িওয়ালা সর্দারজী। দাড়ির চেয়ে লম্বা কাগজপত্রের বাণ্ডিল নাড়তে নাড়তে সে বলল—ফরচুন টেলার, সার। গ্রেট ফরচুন ফর ইউ।

ওর ফরচুন গড়ে তুলতে আমি কিছুই সাহায্য করব না এ কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম। আরও ভালো করে সমঝিয়ে দেবার জন্য হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে দুলিয়ে দিলাম। তারপরই মিলিটারি কায়দায় আইজ ফ্রন্ট।

সে কিন্তু ওস্তাদ চিড়িয়া। মোটেই না ঘাবড়িয়ে সেও পালটা হাত দুলিয়ে লাল ব্রিটিশ সিংহের ছবি আর ছাপমারা একটি সরকারি সার্টিফিকেট দেখিয়ে দিল। ব্রিটিশ ভাইসরয়ের ভারিক্কি একজন একজিকিউটিভ কাউনসিলার নিজে সই করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সর্দারজীর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে অলৌকিক। হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল পেয়েই তবে তিনি এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

তা দেখেও আমি বাগ মানলাম না দেখে সর্দারজী বলে বসল—মিলিটারি সাব, সুন্দরী মেয়েরা সবসময় আপনার চার দিকে ঘিরে থাকবে। সুন্দর সুন্দর সব মেয়ে। আহা! আপনার কী ভাগ্য!

আমি তখনও আইবুড়ো। আহা। শুনে পুলকে গলে গিয়ে একখানা পাঁচটাকার নোটই বকশিশ করে ফেললাম। পাছে তার সঙ্গে সে আবার খারাপও কিছু বলে বসে সেই ভয়ে আর কিছুই শুধোলাম না। শুধু

জেনে নিলাম কটি সুন্দরী। সে বলল পাঁচটির কম নয়।

স্বাতী মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছিল। ওরাও পাঁচটি তরুণী একসঙ্গে বসে আছে আর এই লক্কা পায়রাদের এক টেবিলে বসিয়েছে। কে জানে? এই জঙ্গী নওজোয়ান আবার নৌ-জোয়ান। যে পাঁচটির কথা বলেছে তার খেই ধরে স্বাতীর সুতোতে ও টান দেবে কিনা।

কাজেই স্বাতী লেগ পুল করে জিনিসটা উড়িয়ে দেবার জন্য বিদ্রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, হায় হায়। মোটে পাঁচটাকা বকশিশ করেছিলেন বলে পাঁচটি। একটি দশ টাকার নোট আপনার দেওয়া উচিত ছিল।

মুখে করুণ হাসির রেশ টেনে মিলিটারী বলল, তখন ওই ভবিষ্যৎ-বাণীটা আমায় সোনার স্বপ্নে মশগুল করে তুলল। হাতে হাতে ফল পেতে বেশি দেরি হল না। একেবারে হুমড়ি খেয়ে—হেড লং যাকে বলে—প্রথমেই একটি সোনালি সুন্দরীর সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। মিলিটারি কায়দায় যাকে বলে ফরওয়ার্ড মার্চ। দুর্গ দখল করে ফেললাম। ফল—বিবাহ। তবু তখনও আশা ছাড়িনি।

সঙ্গী আর সঙ্গিনীরা সমস্বরে—একই নিঃশ্বাসে প্রায় জিজ্ঞেস করল, তারপর?

—তারপর? স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট তো সম্ভব ছিল না। একেবারে এনসার্কলমেন্ট হয়ে গেল। চারদিক দিয়ে ঘেরাও। চারপাশে ফুলের বাগান, মুক্তির হাতছানি। কিন্তু চার ধারে ঘেরা বিয়ের কাঁটাতারের বেড়া। এখন সাত বছরেই ঠিক পাঁচটি মেয়ে আমার। পাঁচ দিক থেকে ঘিরে কিলবিল করছে। ওভার-রান করে ফেলেছে। বলে এটা দাও, ওটা চাই। বলে হাঁটু গেড়ে ঘোড়া হও।

বৌ বলে—জাঙ্গল ওয়ারফেয়ারটা ঘরে বসেই প্র্যাকটিস করে নাও। মেয়েরা বলে তোমার উপর আমরা সোয়ারি হব। বৌ বলে—বাড়ি বসেই 'ব্যাটল কিট' আর আর্মামেন্ট নিয়ে মার্চ করা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। দেখ হায়, সুন্দরী পরিবৃত হয়ে থাকার ভাগ্য।

স্বয়ম বলেছিল, অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স। আগুয়ান আক্রমণই সবচেয়ে ভালো প্রতিরক্ষা। তারই শিক্ষা স্বাতী কাজে লাগাবে। কারণ নৌবাহিনীর সেনানী বড় বেশি তার দিকেই টার্গেট প্র্যাকটিস করছে এখন। মেয়েদের ওই দৃষ্টি চিনতে ভুল হয় না।

স্বাতী তাই একটা যখন বুলেট ছুঁড়ল, ওয়েল ড্যাডি, সর্দারজী আপনাকে সময় থাকতে সাবধান করে দিয়েছিল। ওর হাতে পাঁচটাকার নোটখানা গুঁজে দেবার সময় কী আশা করেছিলেন? হুরিতে ভরা হারেম?

হঠাৎ ওদের সকলের হো হো করে হেসে ওঠার ধাক্কায় মেজের মাঝখানের ছোট্ট নাচের জায়গাটিতে যেন বোমা ফাটল। নৃত্যপরাদের তাল ভঙ্গ হল।

সচকিত হয়ে স্বাতী একবার উপরে চোখ তুলে তাকাল। যেন অদৃশ্য শূন্য থেকে স্বয়ম্ প্রশংসা ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু মিলিটারি বন্ধুটি জাতযোদ্ধা। তিন হারেন, কিন্তু হার মানেন না। নেভার সে ডাই—মারা গেলাম একথা কখনও বলো না। শুধু যুদ্ধশাস্ত্র নয়, জীবনশাস্ত্রের বচন।

অতএব তিনি মাথা নুইয়ে মিষ্টি করে বললেন, সুইটি ডিয়ার, তোমার ব্রডসাইড পর্যন্ত কী চমৎকার।

একটু থেমে আর একটু ফোড়ন দিলেন, যেমন মোক্ষম তেমনি মিঠে তোমার ব্রডসাইড।

যুদ্ধজাহাজের একটা পাশের সবগুলি কামান যখন দাগা হয় সে সময়কার গোলার স্রোতকে বলা হয় ব্রডসাইড। মিলিটারিটি স্থলসেনার নয়, নেভির অর্থাৎ জলসেনার। তাই ব্রডসাইড কথাটা ওর মুখ সহজে এসেছিল।

কিন্তু স্বাতী ক্ষুরধার হাসি দিয়ে সেই মিঠে অথচ মোক্ষম অনুযোগকে নস্যাৎ করে দিল, আপনি যে ব্রডসাইডের কথা বলছেন, সেটা জলযুদ্ধের নয়। যদিও অবশ্য জলীয়।

সবাই সকৌতুকে ওর দিকে তাকাল।

স্বাতী উদ্ভাসিত মুখে বলল, রিন-এ অর্থাৎ রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভিতে আজকাল যে ব্রডসাইড সবাই চালাচ্ছে তা, আমি যতদূর জানি, গোলাগুলি নয়। এক ভাগ জিন, এক ভাগ ড্রাই ভারমুথ, এক ভাগ সুইট ভারমুথ, দু ঝটকা বিটারস আর এক চামচ চেরি ব্র্যান্ডি। এতগুলো অগ্নিবারি একসঙ্গে তোড়ে বর্ষণ করলে কোন্ শত্তুরের সাধ্যি তার ধাক্কা সামলায়? তাই না, অ্যাডমিরাল?

বেচারি লেফটেনান্ট কমান্ডার। নেভির ক্যাপ্টেন পর্যন্ত হয়নি। এই যুদ্ধ চালু থাকতে থাকতে ওই প্রেমোশনটুকুও হয়তো হবে না। কিন্তু স্বাতীর ব্রডসাইডের আঘাতে সে এক লাফে অ্যাডমিরাল হয়ে গেল।

মাউন্টব্যাটেনের পদটা এবার যায় আর কী!

অ্যাডমিরাল কিন্তু সত্যিই শিব্যালরীতে খুব উঁচুদরের যোদ্ধা। এমনভাবে মুখের ভঙ্গিতে, উত্তরের ধারাতে এই আক্রমণটাকে সহজ আর সরস করে তুলল যে কোনও বিরক্তি বা অপ্রীতির সম্ভাবনা মাত্র গজাল না।

আরেক জন বন্ধু মিলিটারি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে খুব প্রসন্ন ভাব দেখিয়ে এগোবার চেষ্টা করল। বলল, সিনরিটা, আপনি ম্যাজিক জানেন। আমাকেও দিন না অন্তত একজন স্প্যানিশ গ্র্যান্ডি করে। তাহলে আমি নিদেনপক্ষে ডুবন্ত আর্মাডার ও অ্যাডমিরাল হতে রাজি নই। তার চেয়ে বেশি সুখের ডোবা, সুখের মধ্যে ডোবা আর কিছুতেই সম্ভব নয়।

বলেই সে বাউ করে নত হয়ে ডুব দেবার জন্যই যেন প্রস্তুত হয়ে গেল। ক্ষণকালের লীলার স্রোতে।

চকিতে স্বাতীর একবার বর্মা, আসাম, আরাকানের জলা, জঙ্গল আর জলরাশির কথা মনে হল।

আরেকবার মনে হল সেইসব ফ্রন্টে তৈরি করা বাঙ্কার ডিফেন্সগুলির কথা। মাটিতে লম্বা লম্বা জিগজাগ আঁকাবাঁকা রেখায় খোঁড়া পরিখা। উপরে হয়তো লোহার ঢাকনা। তাকে ঢেকে রেখেছে গাছ লতাপাতার ক্যামোফ্লাজ। তার ভিতর থেকে চোরা কাঁটা-তারের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে মেশিনগান বসিয়ে রেখেছে শত্রুসেনা। স্বয়ম্ হয়তো এমনি করে আনত হয়ে কোনও প্লেন থেকে শূন্যে ডুব দেবার মতো করে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হচ্ছে এই মুহূর্তে।

কেবল জলস্রোতের বদলে বায়ুর সমুদ্র। কেবল ওইটুকুই যা তফাত।

কিন্তু এই কজন যোদ্ধা এখন ফ্রন্ট থেকে নিরাপদ দূরত্বে, দিল্লির জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে না হলেও ফ্রন্ট থেকে দূরে 'বেজ এরিয়াতে'ও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

আবার মনে হল—এদেরও হয়তো শুধু ছুটি কাটানোর সময়টুকুই হাতে এসেছে। মৃত্যুর সম্ভাবনা হয়তো সামনেই আছে। মুরুব্বি বা মোসাহেবির জোরেই যে এখানে মোহ আর মদিরা আর বিলাস উপভোগ করছে তা না-ও হতে পারে।

মোট কথা স্বাতী অন্যের সাময়িক সৌভাগ্যে হিংসা করবে না। তাতে হয়তো স্বয়মের অমঙ্গল হতে পারে।

নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে স্বাতী হেসে এই হিস্পানি মার্কা সেনানীকে পুরস্কার দিল, হ্যাঁ, আমি সবাইকে ম্যাজিক বর দিচ্ছি। এই নাচঘরের সবাই ইন্দ্রজালের প্রভাবে সুখী হবে। জয়ী হবে। না হলেও হয়েছে বলে মনে করবে। সেটার দামই সবচেয়ে বেশি।

সিনিয়র অফিসারটি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—সেটাই ম্যাজিক। আজকের ম্যাজিক সব জিনিসকেই অন্যরকম রং-এ দেখায়। জাদুকর সত্যি কথা বলে না। যা সত্যি হওয়া উচিত তাই বলে। সেটা যদি অন্যায় বলে আমি মনে করি, জাদুকর তবুও সে অন্যায়টার ভার বইতে পিছপাও হয় না। কিন্তু যুদ্ধের জাদুকররা কোনও ভারই বহন করে না। অন্যদের ঘাড়ে চাপায়।

সামনে গায়িকা মাইকের সামনে গাইছিল। যেন 'প্রেম জানাও আমাকে' এই কথাটুকু গানের মধ্যে দর্শকদের নিবেদন করছিল। চোখ বুজে যেন স্বপ্নঘোরে সে প্রেম প্রার্থনা করছিল। সম্ভবত স্পট লাইটের প্রখর আলোর জন্য চোখ বুজে রেখেছিল। সম্ভবত এই বিচিত্র লালসাময় পরিবেশকে দৃষ্টির বাইরে রাখতে চাইছিল।

অথচ যারা শুনছিল তাদের বেশির ভাগই গায়িকার মোহের ঝরনায় যেন স্নান করছিল। সে তো গোলাপী আভার সায়রে ডুবেছিল আর ব্যাকুলহৃদয় শ্রোতারা কান দিয়ে শুনে চোখ দিয়ে দেখে মুখ দিয়ে তাদের তৃপ্তি আর আনন্দ প্রকাশ করছিল।

যে সব মহিলা উপস্থিত ছিল তাদের হাতির দাঁতের মতো শুভ্র সুন্দর মুখের উপর আঁখি দুটির কালো আর ঠোঁট দুটির লাল রেখাগুলিও যেন প্রশংসায় কথা কয়ে উঠতে চাইছিল।

আরও একটু এগিয়ে আমাদের অ্যাডমিরাল এই পরিবেশের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বেমানান বিদ্রোহের মতো বলে চলেছে—যুদ্ধ তো বহু, বহু পুরনো খেলা। জাদুকররা এটাকে ন্যাশনাল স্পোর্ট করে নিয়েছে। জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সবাইকে বলছে তোমরা হচ্ছ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তোমাদের একটা মহৎ মিশন উদ্দেশ্য আছে। তোমরা ইতিহাস তৈরি করছ। নিয়তিকে রূপ দিচ্ছ। বৃহত্তর সুন্দরতর ভবিষ্যতের কারিগর তোমরা।

আর...আমরা বেমালুম সে সব বাণী হজম করছি।

কিন্তু সুইটি স্বাতী, তোমার ম্যাজিক আমাদের অন্য একটা রসাল জগতে নিয়ে গেল একটু ক্ষণের জন্য। তোমার জাদু অক্ষয় হোক।

এই বলে সে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

।। বাইশ।।

বাইরে তখনও গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। সুন্দর আকাশ। ভিড় আর ভাঙাচোরার অনেক উপরের আকাশ। যেন ধানজমির উপর আঁকাবাঁকা নকশা কাটার মতো মেঘের কতগুলি আঁচড় পড়েছে সেই আকাশে। মেঘের পাড়গুলি বাদামী আর জ্বলন্ত সোনার আভায় ঝকমক করছে।

কচি কলাপাতা সবুজের হাসিতে উদ্ভাসিত আকাশে দু-একটি মেঘ বলাকার মতো লীলাভরে উড়ে চলেছে আর শিবের মাথার চাঁদের টুকরোটি এখনই দেখা যাচ্ছে।

একটি রক্তকরবী গাছ ফুলের কুঁড়ির প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে সমস্তটা সন্ধ্যা আর স্বপ্নকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। আকাশের চুনী পান্নার জড়োয়া গহনায় সেজে।

ঠিক সেই সময়টিতে স্বয়ম্‌ও একটা পাহাড়ি সন্ধ্যায় তার গোপন কুঠুরিতে গুপ্ত খবরের প্রত্যাশায় বসেছিল। চোখ কান আর মাথা সজাগ চারিদিকের সম্বন্ধে, বাহিরের সম্বন্ধে।

তবু মন বার বার ভিতরে, হৃদয়ের ভিতরে উঁকিঝুকি মারে। তখনই সে বুঝতে পারে যে সে মন নিয়ে বেঁচে আছে। শুধু যুদ্ধের একটি যন্ত্র হয়ে যায়নি।

সে ভাবছিল—যুদ্ধের পর কী রকম পরিবেশে ফিরে আসব? অর্থাৎ যদি প্রাণে ফিরি এবং মনে না মরি?

খনির দুর্ঘটনায় শুধু প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফেরা কুলির মতো?

অথবা স্বাস্থ্যবান যৌবনবন্ত, কিন্তু সব বিষয়েই স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে? শুধু নিজের স্বপ্নটি বাদে।

স্বাস্থ্য, যৌবন এই দুটি কথা হঠাৎ তাকে যেন একটা ধাক্কা দিল। এই দুটি ধনই হচ্ছে সেই মূলধন যা যুদ্ধে ব্যবহার করতে হয়। পুরে পুরে খইয়ে দিতে হয়। হয়তো বা জলাঞ্জলিও।

জলাঞ্জলি, জীবনের কাছে পুষ্পাঞ্জলি নয়।

সে তো দেখেছে যুদ্ধের এলাকা থেকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি পেয়ে সৈন্য আর অফিসাররা যখন পিছনের এলাকায় লোকালয়ে ফিরে আসে তখন তাদের কী ক্ষুধার্ত চেহারা হয়ে যায়।

অবশ্য সবারই যে তা হয়, তা নয়। কিন্তু যারা ব্যতিক্রম তাদের নিয়েই তো আর সংসার ভরা নয়। বুদ্ধিমান কর্তারাও নানা ব্যবস্থা রাখে তাদের জন্য। কম্‌ফর্ট গার্ল থেকে স্বদেশপ্রেমিক 'এন্‌সা' আর্টিস্টদের মধ্যে মেশানো অন্য ধরনের মেয়ে পর্যন্ত।

এক ধাক্কায় স্বয়ম্‌ সেই সেই চিন্তাগুলি মন থেকে সরিয়ে দিল। যেন তার সাধনার পথে প্রলোভন দেখাতে এসেছে মায়াময়ী মারমূর্তিরা।

মোহিনী মায়ায় মার এমন করেই ভগবান বুদ্ধের সাধনা ভঙ্গ করতে এসেছিল।

গোপন কুঠুরির এক কোণে রাখা বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছদ্মবেশটাতে স্বয়মের দৃষ্টি পড়েছিল। তাই তার মনে জেগেছিল বুদ্ধ আর মায়াবী মারের কাহিনি।

না।

আরও ছবি মনে জাগে যে।

স্বাতীর সঙ্গেই তো সে গিয়েছিল স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয়। সেই স্মৃতিটুকু তার সমস্ত যৌবনের সুরভিতে বিভোর হয়ে ফিরে এল এই মুহূর্তে, এই আঁধার নির্জনে।

প্রায় আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝামাঝি সময়ে। স্বয়ম্‌ তাকে স্বীকার করবার সাহস রাখে।

নিজের মুগ্ধ মন, মগ্ন চৈতন্যের ইতিহাসে সেই চঞ্চলতা, সেই মাদকতা। সে এই নিঃসঙ্গ নিমেষে তাকে অস্বীকার করতে পারছে না।

বাইরে আকাশ ভরা তারার চুমকি। ছায়াপথ।

মনের ছায়াপথে চমক দিয়ে উঠল স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁর মোহ।

মোহে আর মদিরায় চুর হয়েই তো দলে দলে লোক আসে ওখানে।

তার মতো আনাড়ি তরুণও বুঝতে পেরেছিল যে বেচারি স্বাতী সদ্য হাসিখুশি আনন্দের দেশ ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেছে। সেখানে যুদ্ধ আর বোমার হামলা সত্ত্বেও লোকে আনন্দ করবার সুযোগটুকু ছেড়ে দেয় না। যুদ্ধ করতে গেলে শক্তি চাই। শক্তি পেতে গেলে চাই আনন্দ।

সেইজন্যই তো মহাচীনের নতুন স্রষ্টারা চালু করেছেন "স্ট্রেংথ থ্রু জয়" মুভমেন্ট।

আর এদেশে আমরা গোমড়া মুখ নিয়ে মরে থাকি। তরুণ তরুণীরা পর্যন্ত ওদেশে সস্তা রেস্টুরেন্টে গিয়েও যা নাচ-গানের স্ফূর্তি পায়, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ করে সহজভাবে তা এদেশে সম্ভব নয়। স্বাতী তাই ক্যাবারে দেখতে এসেছে।

কিন্তু তার তো বুঝতে বাকি নেই, মোটেই বাকি নেই যে সেখানে যারা জমায়েত হয়েছে তারা সবাই হাড়পাকা অভিজ্ঞের দল। সদাই স্ফূর্তি সম্বন্ধে সজাগ। স্ফূর্তির সামান্য আভাসটুকুকে পর্যন্ত নগদ দক্ষিণায় বাস্তব ব্যাপারে দাঁড় করাতে চায়।

হাতে হাতে গোন মাশুল।
সাতে সাতে করো উশুল।

সাড়া দেয় দু পক্ষই, এত তাড়াতাড়ি যে ইশারাই যথেষ্ট।

সেই পরিবেশে তার নিজের সুরভিত উষার উপস্থিতি সে মোটেই প্রসন্ন মনে নেয়নি। তবু সৃষ্টি হল একটা মোহন মোহ। দুর্বার উন্মাদনা। যদিও সে মনকে বুঝিয়েছিল যে সাদা চোখে উদার মন নিয়ে সবকিছু দেখতে হবে। সইতে হবে। না হলেই হবে তার শিক্ষার হার।

সেই হারজিতের খেলার মধ্যে সে বেশ বুঝতে পারছিল যে দেহ অর্কেস্ট্রার মাতাল ঝংকারে উতলা হয়ে উঠছে। অনভ্যস্ত অপরিচিত জীবন ময়াল সাপের অপলক দৃষ্টির মতো তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

ক্যাবারে যেন কবর দিতে চায় মানুষের নির্মল ভালো লাগাটুকুকেও। দিতে চায় মিশিয়ে নোংরা খাদ আনন্দের সোনার সঙ্গে।

আর যে ভোগ ওর নাগালের বাইরে, ধরা-ছোঁয়ার ওপারে সেই বস্তুটি অনেকের ভুলে আসা ভালোবাসাকেও সামনে টেনে আনবে। ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা।

সহানুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে স্বয়ম্ একবার ভাবল যে, এই সব ঝানু শিকারিদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো যৌবন শুরু করেছিল প্রেম দিয়ে। ব্যথা পেয়ে বা ব্যর্থ হয়ে ম্যান-ঈটারে পরিণত হয়েছে। হায়! ভুলে থাকা তো শুধু ভুলে যাওয়াই নয়।

ভুলে থাকা যে ভেসে যাওয়াও হতে পারে।

সামনেই একটি সুগঠিতা তরুণী নাচছে। তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবলে সরবে আহ্বান করছে। দেখো, আমাকে দেখো। আমার দেহসৌষ্ঠবে পুরোপুরি দৃষ্টি দাও। মন দাও।

আর—আর দামও দাও।

দেখতে দেখতে স্বয়মের মন কুণ্ঠায় ভরে গিয়েছিল।

এ তো বন-হরিণী নয়। এ যে বন্য বাঘিনী। এর সুঠাম তনুলতার মধ্যে লুকানো আছে ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যানিমাল। এর ছাই ছাই ব্লন্ড চুলের ঝালর, ফ্যাকাসে নীলাভ চোখ, সামান্য উঁচু চিবুক, সবই স্বয়মের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আনছিল।

অথচ সেই নারী অধরাই থেকে যাবে ওর কাছে।

সে অবশ্য সুদূর চাহনি দিয়ে তার মুগ্ধ দর্শকদের যাচাই করে দেখছিল। খুব ঠাণ্ডা হিসাবি নজরে। তার মন সম্ভবত সেখানেই ছিল না।

কিন্তু স্বয়ম্ কী দেখছিল?

স্বয়ম্ প্রাণপণে তার মনকে সেখান থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। জীবনের প্রথম উষার আলোয় দেখা কিশোরীর দিকে।

সেই শুভ লগ্নে সেই কিশোরীর চাহনিও ছিল সুদূর। আর মন ছিল দিগন্তে। সেই কিশোরী কয়েক বছর পরে পশ্চিমী শিক্ষার পালিশ পাবার পরে তার পাশেই রয়েছে। তার আজকের চাহনির দিকে তাকাতে স্বয়মের কেন জানি না সাহস হচ্ছিল না। স্টার ডাস্ট রেস্তোরাঁয় বসে স্বয়ম্ সেই সন্ধ্যার দৃশ্য পিছনে ফেলে রেখে সেই

নীল নির্জন উষাতেই ফিরে যেতে চাচ্ছিল।

তবু সেই নৃত্যগীত-উচ্ছল সন্ধ্যায় তার নজরে ফুটে রয়েছিল উৎসুক যৌবন। উদগ্র কামনা। রক্তমাংসের একটি আঁটসাঁট মূর্তি। সময় তাকে এখনও স্পর্শ করেনি। যৌবনের মোহ আর অন্তহীন গোপন রহস্যঘেরা সেই নর্তকী।

না। স্বয়মের চোখে সে মাধুরী নয় অন্তহীন। সে রহস্য নয় অর্থপূর্ণ।

হঠাৎ স্বয়ম্ মনে মনে রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন আবৃত্তি করল—মাটির ভঙ্গুর ভাণ্ড। তার কল্পনা যেন কামনার হাত থেকে এখন নিষ্কৃতি পাবে। কবিগুরুর আশীর্বাদ যে সে পেয়ে গেল এই মুহূর্তে।

সে ভাবতে লাগল—এই দেহ প্রায়-বিবসনাই হোক আর সাটিনের আঁটসাঁট পোশাকে ফুটিয়ে তোলাই হোক কালিদাস কী একে দেখে টাইট ফিটিং অতিপিনদ্ধ বল্কলে আঁটা শকুন্তলাকে আবিষ্কার করতেন?

দা ভিঞ্চি কি এর মধ্যে মোনালিসার হাসির রহস্য খুঁজে পেতেন?

টলমল মন আর চঞ্চল দেহ নিয়ে স্বয়ম্ সেই সন্ধ্যাটা সারাক্ষণ অশান্ত হয়ে কাটিয়েছিল। স্বাতী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও।

যে অর্কেস্টার ঝংকার ওর দেহে যৌবনের জোয়ার জাগিয়েছিল হঠাৎ সেটা থেমে গিয়েছিল। আনন্দের সন্ধানে আসা বিলাসীরা হঠাৎ চমকিয়ে উঠেছিল। আর সারা হলটার আলো একেবারে স্তিমিত করে আনা হয়েছিল। একটা মূর্ছাহত রেশ শুধু গমগম করে বিরাজ করেছিল সামান্য সময়। সাইরেন বাজতে শুরু করেছিল বাইরে।

কিন্তু সেই অন্ধকার, সেই হঠাৎ থমকিয়ে যাওয়া আবহাওয়া সবকিছু ছাপিয়ে স্বয়ম্ মনুষ্যত্বে জেগে উঠেছিল। স্বাতী, তার সাথী স্বাতী। তার নিরাপত্তার ভার স্বয়মের উপর কেউ দেয় নি। তবু সে এখন দায়িত্বশীল সঙ্গী। সে রক্ষা করবে, সাহস দেবে, পথ দেখাবে।

প্রাণে প্রাণে সে তখন অনুভব করেছিল যে সব মোহ, সব বাসনার উপরে তার দায়িত্ব, নিজেকে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব।

সব চেয়ে বড় কথা সেটাই।

সেটাই তার স্বপ্ন। তারই জন্য সে যোদ্ধা হয়েছে।

ইয়োরোপে আমেরিকাতে দুই পক্ষের কর্তারাই সবাইকে শুনিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধটা হচ্ছে মিথ্যা স্বার্থ লোভ প্রভৃতি অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ!

স্বয়ম্ মনে মনে ভাবল—আমাদের দেশেও এই প্রচার এক এক সময়ে এক এক দলের লোক শুনিয়েছে। আমরা যারা লড়াইয়ে হাড় পাকিয়ে ফেলেছি আমরা এখন কিন্তু শুধু আমাদেব পাশের সহযোদ্ধাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করি না।

অবশ্য একটু বিশ্বাস এখনও করি এই আকাশ, এই গাছপালা, পায়ের নিচের মাটি আর র‍্যাশনকে। কিন্তু হায় সেই আকাশ থেকেও ঝরে ফুলঝুরির মতো ভেরি লাইট, ঝুড়িঝুড়ি বোম। গাছপালা আড়াল করে আশ্রয় দেয় শত্রুকে। মাটি গোলার ঘায়ে পায়ের তলা থেকে সরে যায়। আর ঠিক কোণঠাসা হলেই দেখি র‍্যাশন গরহাজির হয়েছে।

কিন্তু স্বয়ম্ সে সব অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনাগুলির জন্য সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। শুধু ভবিষ্যতের উপর ভরসা করাই শক্ত মনে হয়।

এই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যাবে এবং জয়ের মধ্যেই যে শেষ হবে সে সম্বন্ধে সে এখন নিঃসন্দেহ তখন হয়তো ফিরে দেখবে গোটা দেশ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। শুধু পরিবর্তিত নয়, ভেঙে চুরে পড়ে যাচ্ছে। যারা যুদ্ধ থেকে বেঁচে ফিরবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করবে ঔদাসীন্য আর বেসামরিক পথে বেকারি।

মানবজাতির ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বড় বড় বাণী আজ যারা দিচ্ছে, তারা তখন ঝোলের বাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। স্বার্থের সাধনারই জয় হবে।

তবু স্বয়ম্ নড়েচড়ে উঠল। সে যখন একা, তখনও সে তো একাকী নয়। পরিত্যক্ত নয়। শুধু রাতের আঁধারে মাঝে মাঝে এই সামরিক খোলসটা খসে যায়। তখন একটা বেদনাহত অবিরাম সংগীত রেশ চাঁদের আলোর মতো সব কিছু মায়াময় করে তোলে। সঙ্গী বা পরিচিত যোদ্ধাদের মনের বাসনার ব্যাকুলতার বিশ্বাসভঙ্গের আকুলি-ব্যাকুলি তখন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে নিজেকে খুঁজে পায়। বাঁচার আশ্বাস

পায়।

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই নতুন একটা অর্থ, একটা রূপ প্রকাশ পায়।

পাশের ভরা ক্যান্টিন থেকে অমৃতের মতো ফোঁটা ফোঁটা জল খেয়ে সে একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকে নিজের চারপাশে ফুটে উঠছে বলে মনে করে। সেই সন্ধ্যা ওকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করে। চুপি চুপি অন্ধকারকে ছবিতে ভরিয়ে দেয়। স্বপ্নের শোভাযাত্রা একটার পর একটা রোশনাই জাগিয়ে চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায়। বেঁচে থাকার বিবর্ণ বিস্বাদ পটভূমিকে আলোয় আলোময় করে তোলে।

এই আলো এখন মনে জ্বলে উঠল অন্ধকার ভেদ করে। আলোকে সে প্রশ্ন করল—তুমি কি কখনও...?

অসম্পূর্ণ প্রশ্নটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রেশ ফুরাল না।

—কি, বল খুলে...

—আমার হবে...তারপর সে অস্ফুট স্বরে যোগ দিল—এবং আমি তোমার।

—তুমি তো আমার আছই, বীর আমার।

—কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারছ, আমি কী চাই।

বলেই স্বয়ম্ আপনাতে আপনি জেগে উঠল। না, না। আমি এখনও কিছুই চাই না।

স্বয়ম্ কিছুই চায় না। এখনও নয়। কিন্তু ওই গোপন কুঠুরি একটা আশ্রয়ের বন্দর, আশ্বাসের বাসা হয়ে উঠল। সময়ের আলো-আঁধারিতে মনে মনে সে রহস্যের রসায়নে স্বাতীকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখল।

কত কাছাকাছি। কত আপনার।

॥ তেইশ ॥

ভীষণ দাপটে বর্ষণ চলছিল। নরম কাদা মাটির উপর ছোট বাসাটার মাথায় যেন আক্রমণের আগের গোলাবর্ষণের ব্যারাজ চলছে। যেন জঙ্গলী গাছপালার উপর ঝরছে সবেগে হাজারো রাইফেলের গুলি। চার পাশে অসংখ্য জলের ধারা নালার রূপ নিয়ে ধেয়ে চলেছে।

আর মাঝখানে স্বয়ম্ভু।

ওপার থেকে বেশ কয়েকজন স্কাউট খবর এনেছে যে একটু দক্ষিণ দিকে মাইল দশেক দূরে সোনা মিয়া জরুরি খবর পেয়েছে।

কিন্তু সোনা মিয়ার নিজে এ-পাশে আসা ঠিক হবে না। সে মোটামুটি ভদ্রলোক। জাপানিদের চাল সরবরাহ করে। সে এদিক-সেদিক গেলেই ওদের নজরে পড়বে। কাজেই পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হবে।

অতএব পর্বত ব্যবস্থা করতে শুরু করল। সঙ্গে মাত্র দুজন সঙ্গী আর একটা দুই মাল্লার কিস্তি নৌকা।

রাতের অন্ধকারে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি এই একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে, হাতের মুঠোর মধ্যে তারার হাসি ফোটাতে আরম্ভ করেছে। ঝিল্লির দল সবে বর্ষণক্লান্ত অবসরে প্রাণের নিবিড় আনন্দে নীরব নিশীথিনীকে ভরিয়ে তুলেছে। সেই আনন্দের পটভূমিকায় বাদলা কুয়াশায় ঢাকা পাঁচটি মূর্তি খাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল।

কিস্তিতে ওঠার আগে স্বয়ম্ একবার ভালো করে চারদিকে তাকিয়ে নিল। জোরে ক'বার নিঃশ্বাস নিল। যেন নিঃশ্বাস নিয়ে দূরে অথবা অদূরে কোনও গোপন ঘাঁটিতে লুকানো জাপানি টহলদারদের গায়ের গন্ধ শুঁকে নিতে পারবে।

হাওয়া ঠাণ্ডা, ভেজা-ভেজা, কিন্তু ওর মন গরম। একেবারে খটখটে। কিপ্ ইয়োর পাউডার ড্রাই।

চার দিক অন্ধকার। কিন্তু ওর ভিতরে উন্মাদনার আলো। ফ্লেয়ার অব একসাইটমেন্ট।

ওর প্রত্যেক গোপন অভিযানই যে জীবনের শেষ যাত্রা এমন মনে করে এগোতে হয়।

অথচ সে কথা মনেও স্থান দেওয়া চলবে না।

আবার স্বয়ম্ চারদিকে তাকিয়ে নিল।

আবার। আরও একবার।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযানের বর্ণনা। স্কুলে পড়বার সময় একেবারে মুখস্থ ছিল।

শ্রীকান্ত ওর কৈশোরের হিরো। স্বপ্নে-দেখা স্বপ্নমাখা বীর। তার অনুকরণ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারত। কিন্তু না এসেছিল সুযোগ, না সাহস।

আজ সেই সুযোগ এসেছে। কিন্তু শুধু কি এই টুকুই। শ্রীকান্তর জন্য সামনে ছিল ভীষণ অন্ধকার আর ভয়াল নদীস্রোত।

স্বয়মের জন্য অপেক্ষা করছে পৃথিবীর মধ্যে কুখ্যাত গ্রেট রিট্রিটের স্মৃতিতে ভরা বনজঙ্গল পাহাড়ের পটভূমি। প্রলয়ের বন্যাস্রোতে শৈবাল দলের মতো ভেসে যাওয়া ভেঙে পড়া লক্ষ লক্ষ নরনারী। জাপানি সেনার হাত থেকে উর্ধ্বশ্বাসে লুকিয়ে পালানো বর্মী রাইফেলের রক্ষী দল, চিয়াং কাইশেকের চীনা লড়িয়ে দল। যে ব্রিটিশ আর ভারতীয় সৈন্যদল পিছু হটতে হটতে যুদ্ধ করে রিফিউজি অসহায় শরণার্থী দলকে মরতে মরতে সরে আসার একটুখানি সময় করে দিয়েছিল, তারাও জাপানি নামেই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দি গ্রেট রিট্রিট—ইতিহাসে এমনটি আর হয়নি। নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মির হঠে আসাও তার তুলনায় কম মর্মান্তিক।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সৈন্যদের পালানোর শোচনীয় দুর্দশা তো স্বাভাবিক ঘটনা। নিরীহ বেসামরিক লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও মৃত্যুর চেয়ে বেশি দুর্দশা মানবিক দিক দিয়ে অনেক—অনেক বেশি অস্বাভাবিক।

সেই মহাপলায়নের সত্য-মিথ্যা নানা ঘটনা, অসংখ্য অত্যাচারের কাহিনি, জাপানিদের সম্বন্ধে অলৌকিক ভয় আর সীমান্তের আশেপাশের ডাকাত-লুঠেরাদের সম্বন্ধে আতঙ্ক রাত্রির মতো ঘনশ্যাম পর্বতমালায় ঘেরা ঘন সবুজ নরকের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আছে।

গ্রীন হেল—এমন একটা সার্থক নাম'ইতিহাসে হয়নি।

জাপানিরা আহত সৈন্যদের জন্য শুধু একটা তরোয়াল বা বেয়নেটের খোঁচা খরচ করে আর বন্দীদের অমানুষিক অত্যাচার করে—এ কথা জনপ্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তবু শ্রীকান্তকে একবার মনে পড়ল।

জোয়ারের তোড়ে খাড়িতে জল বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের পর ঢেউ কিস্তিতে নাচন ধরিয়ে দিল। স্বয়মের মনে কিস্তির সামনের বসবার জায়গাটার মতো দোলা জেগেছে।

সেই দোলায় দুললে চলবে না। তার নিজের নেতৃত্বে এই প্রথম নির্দেশহীন কম্যান্ডো অভিযান। লুঙ্গির কটি একটু শক্ত করে নিয়ে সে দলকে আবার হুঁসিয়ার করে দিল।

—মনে রেখো আমরা লড়তে যাচ্ছি না। শত্রুকে মারতে যাচ্ছি না। শুধু আক্রান্ত হলেই আমরা গুলি চালাব। কেউ যেন আমাদের দেখতে পায় না, শুনতে পায় না। আমরা মাটিতে লেপটে লতাপাতায় সাপটে থাকব। দাঁড়াব শুধু তখনই যখন গাছের গুঁড়ি আড়াল করবে।

একটি বড় খাড়ির পারে এসে ওরা পৌঁছল। যেমন অন্ধকার তেমনি নিথর জায়গা। নিশ্চিন্ত হয়ে সম্ভবত নামা যাবে।

না। নিশ্চিন্ত হবার ফুরসত বরং যুদ্ধে হতে পারে। চোরা হামলায় একেবারেই নেই। হঠাৎ কোথা থেকে মশালের মতো ফ্লেয়ার আলো জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটার পর আরেকটা জ্বলে উঠতে লাগল। এধার ওধার চারধার থেকে।

জল আর জলা আর জঙ্গল সব হয়ে উঠল আলোময়।

সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি যেন ওকে আর ওদের দলের সবাইকে নগ্ন উলঙ্গ করে দিল। ওরা তো বহু সময়েই বান বা তুফানে উলঙ্গ বা প্রায়-উলঙ্গ হয়ে যায়। ওদের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু .

কিন্তু স্বয়ম্ভুর পক্ষে একেবারে নতুন। দৈহিক নগ্নতা পুরোপুরি নয়। আর সেই অবস্থাটা এমন কিছু শকিং অর্থাৎ চমকাবার মতো নয়। কিন্তু মনের দিক থেকে, মতলবের দিক থেকে একেবারে উদ্‌ঘাটিত। উলঙ্গ।

পারের কাছের গাছের ছায়াগুলি হেলে দুলে খানিকটা ক্ষণিক আবরণ এনে দিচ্ছে। আলোর ছটায় ছায়াগুলি দুলছে। ওরা ধরা পড়ে গেছে।

হঠাৎ ওর কোমরে হাত চলে গেল। রিভলভারের ছোঁয়া লাগতেই বিদ্যুতের ঝাপটার মতো হাত সরে এল। না, না। আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। শেষ পর্যন্ত দলের সর্দারেরই ভুল হয়ে যাচ্ছে। ছিঃ!

কিন্তু ওদিক থেকে জাপানিরা ভুল করেনি। তাক করে ওদের একটা মেসিনগান গর্জে উঠল। একটা

গুলি কিস্তির খুব কাছে জলে পড়ে জলের ছররা ছড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস আগুনের নয়, শুধু জলের।

খুনী খানের এমন অনেক হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অবস্থার মোকাবিলা করার অভ্যাস আছে। সে দুহাতে বৈঠা নিয়ে নিল মাল্লার হাত থেকে। এক ঝটকায় পার থেকে কিস্তিটা একটু দূরে হঠিয়ে নিল।

এবার গাঁইয়া চাটগাঁইয়া ভাব দেখাতে হবে। সেটাই আত্মরক্ষার বর্ম। চট করে লুঙ্গি কোমর পর্যন্ত প্রায় তুলে নিল। রিভলবারটা ভালো করে ঢাকা পড়ে গেল। তারপর চোস্ত নিজস্ব ভাষায় হাঁকল, আমরা হুজুর, জেলে। জোয়ারে ভুল জায়গায় ঠেলে এনেছে। কসুর মাপ হয়, নিপ্পন হুজুর। গুলি ছুড়বেন না।

স্বয়মের খুব ইচ্ছা হল খুনীকে প্রাণদাতা বলে ধন্যবাদ দিতে। নিদেন পক্ষে সাবাস বলতে।

কিন্তু আগুনের আহুতিতে তার নতুন দীক্ষা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে। সে শুধু অন্ধকারে খানের কাঁধে একটা হাত রাখল। কথা নয়, কথা নয়, শুধু কাজ।

অনেকখানি দূরে ভাটিতে সরে এসে ওরা পারে নামল। এবার শুরু হবে শত্রুর দখলি এলাকায় গোপন অভিযান।

এত ঘুরে দূরে এসে সুবিধাই হল। মাল্লারা বলল যে, যেখানে নামবার কথা ছিল আর যেখানে জাপানিদের টহলদার আগুয়ান দলের সাড়া ওরা পেয়েছিল তা থেকে আরও পাঁচ মাইল ভিতরে এসে পড়েছে ওরা।

অর্থাৎ জাপানি আগুয়ান সারির পাঁচ মাইল পিছনে। আরও ভালোই হল।

তিনজন কাদার মধ্যে নেমে পড়ল। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। তবু সবটা আরাকানের তটভূমি কাদায়-কাদা। আর নদীর পারে হাওবের ধারে কাদা হবে না তো কোথায় হবে।

প্রশ্নটা নিজেকে নিজেই করল স্বয়ম্ভূ। হঠাৎ মনে হল আরেকটা প্রশ্ন। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

নাঃ, আমার সামরিক শিক্ষা এখনও পাকা হয়নি, সে ভাবল। না হলে একথা কেন মনে হাজির হয়? তবু তার মনে এল। তখন ওর বয়স আরও অনেক কম। চোখে ছিল রং আর মনে আদর্শ।

উত্তর কলকাতার কোনও সেবাশ্রম সংঘের ও তরুণ সভ্য। সন্ধ্যার পরে বস্তির ছেলেমেয়েদের এক ঘণ্টা করে লেখাপড়া শেখায়। সেই শিক্ষাটা যাতে বস্তিবাসীদের মনে গেড়ে বসে আর বাইরের জিনিস বলে কিছুদিন পরে বাতিল না হয়ে যায় সেজন্য ওদেরই ব্যবস্থা করা একটা ঘরে ওরা হ্যারিকেনের বাতির আলোয় পড়াত।

একবার ঘোর বর্ষায় ঘরে জল পড়তে লাগল। ওরা কজন বন্ধু বস্তির মালিকের বিরাট পাকা বাড়িতে গিয়ে হাজির। টগবগে ওয়েলার ঘোড়ার মতো ওদের উৎসাহে লাগাম টানবে কে?

বস্তির ভাড়াটেরা গেলে দরোয়ানই ওদের মোকাবিলা করে তর্জন গর্জনের দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করত। নেহাত ভদ্রলোকের ছেলেরা এসে হাজির হয়েছে। তাই মালিক সুবিবেচনা দেখিয়ে ওদের দেখা করতে দিলেন।

এবং সব কিছু শুনে উচ্চস্বরে হেসে নিলেন।

নস্যি, এক টিপ নস্যি, সশব্দে নাসারন্ধ্রে দিয়ে বলে উঠলেন, আহা, তোমরা ছেলেমানুষ, স্বামী বিবেকানন্দের সব চেলা। তোমরাই বল ভগবানের অভিপ্রায়টা কী। বস্তির ছপ্পর ভেদ করে ভগবানের জল ঝরবে না তো কী মা ভগবতীর দুধ ঝরবে। স্বামীজীই তো বলেছেন—উঠে যাও, জেগে ওঠ। ভাল ঘরবাড়ি খুঁজে নাও। তাই নয়? কই, তোমরাই বলো?

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজির ফটোর দিকে নমস্কার।

ওরা রাগে নয়, ঘৃণায় দিশেহারা। উচ্চবাচ্য না করে সোজা তড়তড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল।

আদর্শের পিছনে ধাবমান ওয়েলার ঘোড়া পরাজিত হয় না, পিছু হটে আসে। তাও শুধু আবার তাল ঠুকে এগিয়ে যাবার জন্য।

তাই তো সেদিন ওদের তরুণ দল হাল ছাড়েনি। নিজেরা চেয়েচিন্তে চাঁদা তুলে খোলার ছাউনি তুলে দিয়েছিল। বিনামূল্যের লেখাপড়া শেখানো অব্যাহত রেখেছিল।

আজ সে এই কাদায় কাদাময় জলাভূমির বাধা পার হয়ে তার নৈশ অভিসার সফল করে আসবে।

সোনা মিয়া। আহা সোনা মিয়া সোনার ধন বেচে সুবর্ণভূমি বর্মা মুলুকে। এই নিযুতি রাতের পাঁশুটে অন্ধকারে সোনা কথাটাই যেন আলোর রেখা দেখিয়ে দিল।

ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে নীরবে ওরা যাচ্ছে। কোথাও জনপ্রাণী নেই। যুদ্ধের আওয়ান এলাকায় যারা রাতে ঘোরাফেরা করে তারা হয় টহলদার, না হয় টিকটিকি। কারও জীবনেরই দাম একটা বুলেটের চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু সেটাই নাকি সবচেয়ে ভালো দাম। হানাদারের হাতে জীয়ন্ত ধরা পড়লে আরও কী সব হতে পারে তা নিজে জানা নেই, কিন্তু শোনা আছে।

কিন্তু সে সব অমানুষিক ব্যবহারের কথা জলা-জঙ্গলের বা ঘুমন্ত গ্রামের প্রকৃতি তোমায় মনে মনে কচলাতে বারণ করছে।

কাঠের পায়ার উপর দাঁড় করানো বাসাগুলির দরজা বন্ধ। শান্তিতে সুপ্তিময় ছবি সব। কলা পেঁপের বাগিচা আর বাঁশবন আর সুপারিকুঞ্জ একেবারে বৈষ্ণব কাব্যের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। সাহিত্যের ছাত্র স্বয়মের সেসব কথা মনে না আসাব উপায় নেই।

কিন্তু আজ সে একটা ডিসিপ্লিনে, শৃঙ্খলার কাঠামোতে ঋজুভাবে বাঁধা, একটা বিশেষ শিক্ষায় দীক্ষিত। সে অতীতকে ভুলে যায়নি, তাকে ফেলে চলেছে বর্তমানের ভিতরে। ভবিষ্যতের অভিমুখে।

এমন অবস্থায় কী করতে হবে সে সম্বন্ধে কেউ দেবে না কোনও নির্দেশ। কোনও হুকুম। কিন্তু ফলাফল দিয়ে তোমার বিচার হবে। যত কম খুশি কাজ করো বা যত বেশি অকাজ করো, বলবাব কেউ নেই। তেলে-জলে মানুষ স্নেহের আঁচলে নিতান্ত দীপশিখার মতো আড়াল করে রাখা সাধারণ বাঙালির পক্ষে কত সুবিধামতো, কত মনের মতো অবস্থা।

কিন্তু না। এমন অবস্থাতেই স্বয়মের সবচেয়ে বড় ব্যবস্থার অবকাশ এসে গেছে। চারদিকের নিস্তব্ধ পরিত্যক্ত ভাবটাই সন্দেহজনক। কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত,—না, এখন গীতগোবিন্দ নয়। শঙ্কা এখানে চলবে না।

ঠিক কথা। জাপানিরা নিশ্চয়ই গ্রামটা দখল করেছে আব সব বাসিন্দাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় সোনা মিয়ার উপরই নজর বাখছে। বোধ হয় বুঝছে যে ওর মতিগতির উপর একটা হুঁশিযারি পাহারা রাখা দরকার।

উত্তেজনায় মন ভরে গেল।

এই তো আসল জীবন। যার কোনও নোঙর নেই। নির্দেশ নেই; কিন্তু নিশানা আছে। যার কোনও দায় নেই; অথচ দায়িত্ব আছে।

শেষ পর্যন্ত সোনা মিয়ার দেখা মিলল। একটা পরিত্যক্ত গোয়ালঘরের গরুগুলি চলে গেছে জাপানিদের ভোগে। আর এখন সেটা লাগছে মিত্রশক্তির গুপ্তসেনার কয়েক জন দড়িছেঁড়া টহলদারের সামরিক কাজে।

অন্ধকারে দুটো সবল কিন্তু উত্তেজিত হাত ওর হাত আঁকড়িয়ে ধরে শেকহ্যান্ড করল। হাতের ভঙ্গির চেয়ে ধরার ভঙ্গিতে স্বয়ম্ একটা ইঙ্গিত পেল। নির্ভেজাল আন্তরিক সহায়তার ভাব। আশ্বাস আর বিশ্বাসে ভরা।

কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে তার উপর লালকাগজের ঠুলি পরিয়ে ওরা মাটিতে রাখল। কোন্ দিন কত চাল দেওয়া হয়েছে, চাল জোগাড়েব আর পাচারের সময়, কোন্ কোন্ পথ দিয়ে কত পরিমাণ গেছে, কোন্ কোন্ গ্রামে বা জলাভূমি বা বাঁশবাগান থেকে কত বস্তা হালকা করেছে, কোন্ খাড়ির পারে বা কটি বস্তিতে চাল চলাচল করছে এসব একটা হাতে আঁকা মানচিত্রের উপর দাগ দিয়ে স্বয়ম্ ঠিক করে নিল। দরকার মতো সাংকেতিক ঢেড়া মেরে নিল।

হীরা দিয়ে হীরা কাটতে হয়। সোনা মিয়ার সোনাতে আজ খাদ নেই হয়তো। তবু যুদ্ধের গতি কোন্ পথে গেলে কোন্ খানে কতটুকু খাদ মিশে যাবে তা খোদাই জানেন।

হপ্তায় হপ্তায় সরবরাহের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল দেখে সে প্রতি কিস্তির বাড়তির পরিমাণ আর কোনও দিকের চালানে কত বাড়ছে তাও লক্ষ করে নিল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

দুর্ভিক্ষের শহর কলকাতা থেকে চালের চোরা পাচারের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে আর সে চালান কোথায় ছড়িয়ে পড়ছে তার হিসাবও কী শত্রুর গোপন টিকটিকিরা এমনি ভাবে নিচ্ছে?

মা ফ্যান দাও, দুটি ফ্যান দাও মা, বড় পেটের জ্বালা—এই করুণ কান্নার পাশাপাশি হয়তো কয়েক

জোড়া বেহিসেবী চোখ অলক্ষিতে চরে বেড়াচ্ছে। এবং আমাদের দেশের অনাহারী লোক কালোবাজারির কথাই শুধু ভাবছে। শুধু মজুতদারের মুণ্ডপাত করছে মনে মনে।

কিন্তু হয়তো দেশের নিরাপত্তাও যে এই চালের হিসাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা কি কারও নজরে আছে?

থাক থাক, দেশের কথা আর দেশের কান্না দূরে থাক। তার উপব তো সে ভার, সে দায়িত্ব কেউ দেয়নি। আজ তার কর্তব্য শুধু ভি ফোর্সের প্রতি।

এখানে এখনই সে যা আবিষ্কার করতে পারছে মিত্রশক্তির আগুয়ান হামলার পক্ষে তার দাম হবে অসীম। শত্রুসৈন্য কী পরিমাণে র‍্যাশন পায় বা পেতে অধিকারী তা ওদের জানা আছে। ওদের উপর হুকুম আছে টু লিভ অন দি ল্যান্ড— যেখানে আছ সেখান থেকে খাবার জোগাড় করে নাও। কিন্তু যদি জোগানেব বন্দোবস্ত করতে পারে জাপানি সৈন্যের কম্যান্ডাররা তা অবহেলা করে না।

পকেটে আছে এন্তার জাপানে ছাপানো ভারতীয় নোট আর বেয়নেটে আছে এসপাব-ওসপার ফুঁড়ে দেওয়ার মতো শানদার ধার।

মনেব ভিতরে এত উত্তেজনা আর মুখের উপরে আরাকানি বাসার গায়ে মাটির প্রলেপেব মতো শান্ত আলপনা।

ইচ্ছা হচ্ছে যেমন একাই সে এই সব খবর হিসাব করে আবিষ্কার করেছে তেমন একাই ছুটে যায় ওইসব দুশমনের ডেরায়। তাদের সস্তা জঙ্গী পোশাক, অযত্নে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল আব পায়েব বুড়ো আঙুলের অংশটাতে আলগা করে বানানো ক্যাম্বিসের বুট—এসবের মাঝখানে তেড়েফুঁড়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাদের মিঠে মিঠে আঠালো ঘাসের গন্ধে ভরা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রিভলভার তুলে জঙ্গী হুকুমের হুমকি দিয়ে ওঠে -আল হ্যান্ডস আপ।

কিন্তু সে আজ আব সাদামাঠা ভেসে-যাওয়া জীবনেব প্রতিনিধি নয়। সামবিক জীবনের আটঘাট-বাঁধা প্রতীক। একটা নূতন শিক্ষাব ফসল।

এবার ফেরবাব পালা। কিন্তু একটা খবর এখনও বাকি। যে পথ দিয়ে সে প্রথমে আসবে বলে ঠিক করেছিল সেখানে জাপানি টহলদার আছে। তার সঙ্গে কতজন আছে? তার পিছনে নিশ্চয়ই একটা ঘাঁটি থাকবে। ম্যাপের রেখাচিত্রে সেদিকে কোনও চালান গেছে বলে মনে হয় না। যদি তার কাছ থেকে সুবিধাজনক সহায়ক খবর পায় তাহলে ওয়েস্ট ইয়র্কশায়াব রেজিমেন্ট সেদিক দিয়ে এগোবে।

ফিফ্‌থ ডিভিশন এগিয়ে বর্মায় ঢোকবার জন্য কোমর বাঁধছে।

এখন কী কবা যায়?

এমন হতে পারে যে শত্রুরা ওইদিকেই ঘাঁটি পেতেছে আর সৈন্যদল সরিয়ে এনেছে। রসদেব লাইন ওদের খোঁজ পাবার একমাত্র লাইন নয়। তাছাড়া সম্ভবত ওরা মতলব করেই আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য চাল চালান নিচ্ছে এক জায়গায় আর পাচার করছে অন্য জায়গায়।

জাপানি সেনাদলে জাতবিচার নেই। যে পিঠ অস্ত্র বয় সে পিঠ বস্তাও বইতে পাবে। বিশেষ করে যদি তা রসদ হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের মতো ধর্ম জাত প্রদেশ ব্যবসা এসব প্রভেদ আর দুর্বলতার বালাই নেই। ওদের একটিই ধর্ম : দেশ।

আরও একটি কথা জানা দবকার। স্থানীয় লোকদের জাপানি সেনাদেব প্রতি কীরকম ভাব। তার উপর মিত্রশক্তির এই ভূখণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঢং ও জনবল নির্ভর করবে।

স্বয়ম্ সোনা মিযাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল।

সোনা মিয়া নিঃসংকোচে বলল যে আজকাল সবাই হচ্ছে উঠতি সূর্যের উপাসক। মনে মনে না হলেও বাইরে। যে জিতছে তার দিকে ঢলাই জগতের নিয়ম।

আর জাপানিরা যে চালটা মুরগিটা নিয়ে নিচ্ছে তা যে শুধু দায়ে পড়ে নিচ্ছে সে কথা বুঝিয়ে দিতে কসুর করছে না। বলছে যে সাদারা তো শান্তির সময়েই শুধু লুঠের মহান নীতি দেখিয়ে সব কিছু নিয়ে নিয়েছে। দেশে পাঠিয়ে দেশকে বড়লোক বানিয়ে ছেড়েছে।

আমরা কিন্তু শুধু বৃহত্তর সহ-সমৃদ্ধির এলাকা তৈরি করছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই সব সম্পদ তোমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেব। জাপান দুশো বছর আগের বিলেত নয়। আমাদের নিজেদেরই সব

আছে। শুধু তত দিন যদি আমাদের সৈন্যদের চাল আর অন্যান্য জিনিস জোগান দাও তাহলে তোমাদের কোনও মুশকিল নেই।

জাপানিরা আরও বোঝাচ্ছে যে, জানো তো, আমরা নিজেরাও তোমাদেরই ধর্মের লোক। আর সব ধর্মকেই আমরা শ্রদ্ধা করে চলি।

আর যদি কোনও লোক তোমাদের মধ্যে শাদাদের চর থাকে আমাদের শুধু জানিয়ে দিয়ো। আমরা তাদের উচিত রকম দেখাশোনা করব।

এই পর্যন্ত বলে সোনা মিয়া একটু কেশে বলল, কিন্তু আমাদের একটি মুশকিল হয়েছে হুজুর। জাপানিরা বর্মীদের বুঝিয়েছে যে কোটি কোটি কালাকে বর্মা থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে ওরা শুধু বর্মীদেরই কল্যাণের জন্য।

তা ছাড়া আরাকান থেকে চাটগাঁইয়াদেরও তাড়াবে মগদের মঙ্গলের জন্য। ওদের জার্মানী দোস্ত হিটলার নাকি লেবারাম না কি একটা কথা চালু করেছে। হাত-পা মেলে আরামসে থাকার বাসা আর ব্যবস্থা সবই জাপানিরা বর্মী আর মগদের জন্য করে দেবে। তাই ওরা একরকম তাদের হাত করে নিয়েছে।

এই বলে সোনা মিয়া লুঙ্গির গেঁজে থেকে দুয়েকটা ছাপানো ইস্তাহার বের করে দেখাল। গাঁয়ে গঞ্জেও এগুলো বেটা বাটুরা বিলি করছে।

সোনা মিয়ার নিজের টান যে কোন্‌দিকে তা বুঝতে বাকি রইল না একটুও। জার্মানদের ভাষায় 'লেবেনসরাম' অর্থাৎ হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচার জমি বর্মাতে বর্মীদের জন্যও থাকবে না তা বর্মীরা এখন বুঝবে না।

অতএব ওকে এখন বাকি প্রশ্নটা করা চলে। 'জিফ'দের প্রতি স্থানীয় লোকদের মনোভাব কী? এবং ওরা সংখ্যায় কত?

এবার কিন্তু সোনা মিয়ার জবাব দিতে কোনও উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মিত্রশক্তি তাচ্ছিল্য করে জিফ এই ডাকনাম দিয়েছে। অথচ ওরা জাপানিদের সঙ্গে এসেছে বলেই আক্রমণকারীর নিষ্ঠুরতা থেকে বর্মা অনেকটা বেঁচে গেছে। ওদের জাপানিরা নতুন জায়গা দখল করতে যাবার সময়ে প্রায়ই আগে ঠেলে দেয়। অথবা আগুয়ান লাইনে পাহারা দিতে টহলদারি করতে অনুরোধ করে। ওরা এদেশী লোককে ভালো চিনবে ভাষা বুঝবে এই অজুহাতে।

অবশ্য মনে মনে জাপানিরা জানে যে নেতাজী সুভাষের স্বাধীনতার আহ্বানের আকর্ষণেই বর্মীরা তার সেনাদলকে সাহায্য করে।

স্বয়ম্‌ প্রশ্নটা আবার করল। খানিকটা ইতস্তত করে। তবু করল। কর্তব্য যখন সামনে, আনুগত্যের শপথ যখন বুকের মধ্যে তখন দুর্বলতার কোনও ঠাঁই নেই। নিজেদের সেনাদলের কাজে লাগবে এই খবর।

সে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যখন শুনল যে এই এলাকাতে ওরা বিশেষ নেই এবং ওদের রসদের ব্যবস্থা পাকাপাকি কিছু নেই।

পালটা প্রশ্ন করল সোনা মিয়া—হুজুর, আপনি কি ওদের কোনও সুলুক সন্ধান পেয়েছেন?

স্বয়ম্‌ উত্তর দিল না।

শুধু মনে মনে ভাবল যে খাড়ির পাড়ে যদি জাপানির বদলে জিফ পাহারাদার থাকত তাকে হয়তো ভি ফোর্সের ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ করে নিতে হত।

॥ চব্বিশ ॥

বিকিনি স্নানের পোশাকের মতো বলতে পারা যায়। সিকিটা ঢাকা, বাকিটা খুলে রাখা।

যেটুকু প্রকাশ করা তার মধ্যেই যথেষ্ট ইশারা। যেটুকু রাখা-ঢাকা সেটুকুই আসল। নারীদেহের মতো। আমার কারবার বিকিনি নিয়ে।

এই উপমাটুকু মনে করে স্বয়ম্‌ খুব হেসে নিল। নিজেকে সমঝাল যে সে এখনও বেঁচে আছে।

পুরুষসিংহ হতে সে চেয়েছে। কিন্তু প্রায় শৃগালের মতো তার গতিবিধি। শুধু চোরা খবর, গুপ্তি হামলা

আর মগজ খাটিয়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড় করা মালমশলা দিয়ে হিসাব তৈরি।

তার গোপন কাজ হচ্ছে এই।

সে ভি ফোর্সে সাময়িকভাবে ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছে। খুব গোপন, খুব দরকারি কাজ এই ফোর্সে। তাতে যেমন বিপদ তেমনি বাহাদুরি।

তবে সেটাই পর্দার আড়ালে। রঙ্গমঞ্চের রং নেই, ঢং নেই। এমনকি রাজা-উজিরের সাজগোজও নেই।

অথচ ভি ফোর্সের কাজের উপর নির্ভর করছে অন্যান্য সব ইউনিট আর ডিভিশনের সাফল্য। বিশেষ করে জলায় জঙ্গলে যুদ্ধে জাপানিদের সঙ্গে এঁটে ওঠা ভি ফোর্সের কাজ আর খবরাখবর ছাড়া একেবারেই অসম্ভব।

ইয়োরোপে মিত্রশক্তিরা ফার্স্ট আর্মি কম্যান্ডো, রয়্যাল মেরিন কম্যান্ডো এরকম বিশেষ বাহিনী তৈরি করে কাজ চালিয়েছিল। কিন্তু জার্মান সাবমেরিন সে সব শিক্ষিত বাহিনী জাপানি রণাঙ্গনে পৌঁছতেই দিচ্ছে না।

কিন্তু স্বয়ম্‌দের নতুন গড়া ভি ফোর্স আসাম বর্মা সীমান্তে দারুণ কাজের কাজ করে যাচ্ছে। তার মধ্যে যেমন বিপদ তেমনি বৈচিত্র্য।

আর ওরা যেটুকু খবর যেমন ভাবে পাঠায় তার মধ্যেকার রস থুড়ি মধু সংগ্রহ করতে হলে মৌমাছি হওয়া দরকার। অথবা বলা চলে মাতাল হওয়া দরকার। মাতাল যেমন করে ঠেকা দিয়ে থাকবার জন্য ল্যাম্পপোস্ট লেপটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনভাবেই মিটিমিটি প্রকাশিত খবরটুকুতে ঠেকা দিয়ে নিজের অনুভূতি অনুমান এসবকে কাজে লাগাতে হয়। শত্রুপক্ষের পাহারাদারকে এড়াতে হয়।

কিন্তু ভি ফোর্সেব খবব বা খণ্ড যুদ্ধগুলির রিপোর্ট পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে স্পেশ্যাল ডেসপ্যাচে দিল্লি লন্ডন পৌঁছবে না। যাবা আত্মরক্ষার জন্য বা শত্রু ঠেকানোর জন্য হয়তো বুদ্ধি আর ক্ষিপ্রতা ছাড়া কোনও হাতিয়ারই ব্যবহার করতে পারবে না তাদের নাম, তাদের কীর্তি থাকবে একবারে গোপন। স্রেফ যুদ্ধের প্রয়োজনেই।

তবু স্বয়ম্ সব দিক দিয়ে নিজেকে জীবনযুদ্ধে শুধু বিকশিত নয়, প্রকাশিত করবে। তাই সে এই কাজে নিজে যেচে এগিয়ে এসেছিল। সাময়িকভাবে এই বদলিটুকু করিয়ে নিতে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল।

ময়ূর শিখীপাখা মেলে নিজেকে শুধু বিকাশ করে না, ময়ূরীর সামনে তাকে প্রকাশ করে। রঙের ছটা ছড়িয়ে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে নিজে আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে আত্মনিবেদনের মধ্যে প্রেম আহরণ করে। কিন্তু তার আগের প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে থাকে গোপন সাধনা।

শুধু কম্যান্ডোর হামলায় তাই স্বয়মের আর মন ভরছে না। যদি একটা জাপানি বুলেটে সে ইহলোক থেকে লোপাট হয়েই যায়, সম্মানের তালিকায় রোল অব অনারে তার নাম জ্বলজ্বল করে উঠবে কি না তা সে জানে না। স্বাতীর সামনে খবরের কাগজে যে যুদ্ধের খবর বের হবে তাতে জানতেও পারবে না স্বয়ম্ তাতে নিজে ছিল কিনা। তার অবদান কী ছিল।

অ্যাডভেঞ্চার, বৈচিত্র্য, ধরাবাঁধা মারা আর মরার ছকে যে যুদ্ধের ছবি আঁকা থাকে তার বাইরের নতুন আস্বাদের জন্য সে এই দলে এসেছিল। তার প্যারাট্রুপ ফোর্সকে এখন শুধু বসে থাকতে হচ্ছে বলেই সে এই সাময়িক বদলি নিতে পেরেছিল। তা ছাড়া এই অভিজ্ঞতা প্যারা ফোর্সেও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

কিন্তু এখন অন্য কিছু আস্বাদ করতে হবে। নিজেকে যদি তুলে ধরতে না পারলাম তবে জীবনের প্রকাশ কোথায়?

সে শুধু খবর সংগ্রহ আর সরবরাহ, শুধু স্কাউট প্রশিক্ষণ আর তাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ, কিস্তি আর সাম্পান সরবরাহ বা তাতে চড়ে আঘাটায় অভিযানে আর তৃপ্ত হতে পারছিল না। এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত সুবিধা এসে গেল।

একটা বড় রকমের হঠাৎ হামলার ব্যবস্থা হয়েছে। ওর সবগুলি চেলাকেই এই কাজে বিভিন্ন উপদলের সঙ্গে ভাগ করে করে যোগ করে দিতে হবে। মন্ত্রগুপ্তি শুধু নয়, বেশ কয়েকদিন থেকে এক সঙ্গে হঠাৎ আক্রমণই এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।

বেশ কয়েকটা নতুন ইউনিট এসেছে। জঙ্গলী সবুজ তাদের ইউনিফর্মের রং—যা থেকে পরে এরকম সৈন্যদলের 'সবুজ বেরে' (ফরাসি টুপি) এই নামই হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর তীব্র উৎসাহে তারা সবুজ

নরকে হলদে দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করে আবার সাম্রাজ্যের স্বর্গে ফিরিয়ে আনতে ছটফট করছে।

আর এসেছে নিকষ কালো কিছু আফ্রিকান ইউনিট। ৮১ নং ওয়েস্ট আফ্রিকান ডিভিশনের সেনাদল। তাদের বুকে রেজিমেন্টের নিশানা দেখলেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। হলদে জমির উপর কালো বীভৎস মাকড়সার ছবি, সেই মাকড়সা যার কামড়ে দুরারোগ্য উৎক্ষেপ অর্থাৎ নাচন রোগের মড়ক ছড়িয়ে পড়ে আফ্রিকা মহাদেশে।

আড়ালে আবডালে থেকে পিছনে বা পাশে সরে এসে বাঘের মতো হঠাৎ হামলা করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা আর গুটিকয়েক মাথা খসিয়ে দিয়ে গা ঢাকা দেওয়া ওদের পূর্বপুরুষরা একটা শিল্পকৌশলের মতো অভ্যাস করত। সেই খেলার মাতনে ওদের উৎসাহ দেখে কে। ওদের হাতের লম্বা ধারালো দা আফ্রিকার জঙ্গলে গাছের নিচের গুঁড়ি আর মানুষের ঘাড়ের উপরের শির দুটোই সমান অবহেলায় সাবড়িয়ে দিতে পারে।

ওদের দলের নায়ক থাকত প্রায় সবই ইংরেজ। জাতে ও জীবিকাতে সৈন্য বা ন্যাশনাল অ্যাক্টের নাম লেখানো বেসামরিক ইংরেজ এন.সি.ও.। ভারী সামরিক সম্ভার, সিগন্যালের যন্ত্রপাতি আর যানবাহনের সবটাই দলপতি সাদার হেপাজতেই থাকত। কালোরা শুধু যন্ত্র।

ওদের দেখে স্বয়মের মনে হল যে বর্ণবৈচিত্র্যের এমন বাহার বোধহয় সংসারে কোথাও হয়নি। সাদা অফিসার আর কালো সৈন্য এসেছে বাদামী লোকের দেশকে হলদে দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করতে। শিল্পী বিধাতার নিজের হাতের রঙের তুলিগুলি একটি পটে এনে জড়ো করা হয়েছে।

মনে পড়ল প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় রক্তকরবী নাটকের অভিনয়। নাটকের উক্তি : সুন্দরের হাতে রঙের তুলি দিয়েছে বিধাতা।

রক্তকরবীর কবিকে প্রণাম করবার, তাঁর শুভ্র হাসিতে পুরস্কৃত হবার সৌভাগ্য পেয়েছিল সে জীবনে একবার। তিনি আজ ওকে এই রক্তের খেলায় মাততে দেখলে কী বলতেন?

থাক। থাক সেসব কাব্য আর বর্ণালীর কথা। আমরা সবাই লড়াইয়ের পরিখার খাতে লুকিয়ে গ্রিনেডে হাত রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকি। তবু কারও কারও চোখ তার দিকে হঠাৎ চলে যায়।

মোট কথা এবার সে সৈন্যদলের সঙ্গে অভিযানে যাবার অনুমতি পেয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গে যাবে, প্রয়োজনে লড়বে। এবং ওর দলের স্থানীয় বংরুটরাও সবাই যাবে। প্রত্যেক ইউনিটের সঙ্গে ভাগাভাগি করে।

লুঙ্গি ছেড়ে ওরা সবাই খাকি পরে নিল। বেসামরিক পোশাকে ধরা পড়লে ফিফ্‌থ কলাম পঞ্চম বাহিনীর পরিণতি যে কী হয় তা স্বয়ম্ এত উত্তেজনা আর তাড়াহুড়োর মধ্যেও ভোলেনি।

হঠাৎ একটা কথা ওর মনে হল। নানা জাতের আর দেশের লোকে তৈরি এই ইউনিটগুলির সঙ্গে ওর চেলাদের ভাগ করে দেবার সময় কাদের সঙ্গে কাদের ভালো বনে তা ভেবে দেখা দরকার।

কলকাতা নাকি কসমোপলিটান শহর। কিন্তু বাঙালি কলকাতায় বা বাঙালি সমাজে মানুষ হবার মধ্যে সেই বিশ্বমুখীনতার বিশেষ কোনও শিক্ষাই হয় না। নানা দেশের নানা দৃষ্টিভঙ্গি বা বিভিন্ন রুচি রীতিনীতির প্রতি সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার কথাও হঠাৎ মনে আসে না।

এমনকি বিশ্বকবির ভাষা ছেড়ে কলেজে ইংরেজিতে কথা বললেই অনেকে ট্যারা চোখে তাকাত। কেবল উত্তর কলকাতা ছেড়ে দক্ষিণে উঠে আসার পরেই এই আত্মমুখীতার কথা তার মনে হয়েছিল। তাও মাঝে মাঝে।

তার আগে পর্যন্ত ছত্রিশ জাত কথাটার মধ্যে মোজায়েকের মহিমার চেয়ে তাচ্ছিল্যের তলানিটাই বেশি নজরে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখীন অনুভব আর গান্ধীজীর নিখিল ভারতীয় মহামানবতা সত্ত্বেও।

এই যুদ্ধক্ষেত্রেও যেখানে জাত আর বর্ণের আর দেশের পার্থক্যের জন্য মৃত্যু কোনও পরোয়া করে না—সেখানেও ভেদাভেদ ভোলা সহজ নয়। কিন্তু সবার বড় হচ্ছে কর্তব্য। আর সেই কর্তব্য সাধনে যেন বাধা না আসে। যেন মানুষের মনের মেশিন মোলায়েম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সহজে চালু থাকে।

চাটগাঁর স্কাউটদের মুখে আফ্রিকানদের সম্বন্ধে হাবসি এই ডাকনামটা যেভাবে উচ্চারিত হয় তাতে সে বুঝেছে যে তেলে জলে মিশ খাবে না। হাবসিদের গোগ্রাসে হাপুস হুপুস করে খাওয়া সম্বন্ধে স্কাউটদের বিদ্রূপ

ওর নজর এড়ায়নি। তা ছাড়া ওদের দিলখোলা হাসি আর হৈ-হল্লা গুপ্তি কারবারে দীক্ষিত স্কাউটরা যে পছন্দ করবে না তাও স্বাভাবিক।

তাই সে ওদের সঙ্গে চাটগাঁয়ের স্কাউটদের দিল না। নিজে কয়েকজন বর্মী স্কাউট নিয়ে আফ্রিকানদের ইউনিটগুলির সঙ্গে এগিয়ে গেল।

খবর এল যে মগ গুপ্তচরদের দেওয়া পথের হদিস পেয়ে জেনারেল সাকুরাইয়ের সেনাবাহিনীর একটা ব্রিগেড তানাহাসির নেতৃত্বে ব্রিটিশ সেনাদলের পাশ কাটিয়ে পিছনে পৌঁছিয়ে তাদের বেকায়দায় ফেলেছে। মিত্রশক্তির সপ্তম ডিভিশন জাপানি ফাঁদে পড়েছে।

কিন্তু তানাহাসির এই পাশ দিয়ে এসে পিছন অবরোধ কী করে সম্ভব হল? স্বয়ম্ আর অন্যান্য ভি ফোর্সের অফিসাররা কেন আগে থাকতে জাপানি অগ্রগতির খবর পায়নি?

পরে সব টুকরো টুকরো পাঠানো খবর খুঁটিয়ে দেখা গেল যে ওরা যেসব খবর আর সন্দেহজনক অনুমান পাঠিয়েছিল তাতে কোর কম্যান্ডের ইনটেলিজেন্স স্টাফ কোনও গুরুত্বই দেয়নি। নিজেরা যত এগিয়ে যাবার প্ল্যান আঁটছে তারই মুসাবিদায় সবাই মশগুল ছিল।

কিন্তু ওদের অস্ত্র দিয়েই ওদের ঘায়েল করতে হবে। স্বয়মের দলের নানা টুকরো টুকরো খবর জড়ো করে বের করা গেল যে পিছনে হাজির আর মোতায়েন জাপানিদেরও পিছন আছে এবং সেটা অরক্ষিত। এবং রাতারাতি সেখানে পৌঁছানো সম্ভব।

এদিকে সময়মতো তাক করে মিত্রশক্তির প্লেন থেকে জাপানিদের উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। সময়ের নিখুঁত হিসাব দরকার। স্বয়ম্ অঙ্ক কষে হিসাব করে জঙ্গল পথের গতিসীমা ঠিক করে বিমান আক্রমণের সময় কখন হওয়া উচিত তার অভিমত দিল।

কিন্তু সম্মুখ-সমর চলবে না। মিত্রবাহিনীর প্রধান ভাগ ঘেরাও হয়ে গেছে। শুধু বেড়াজালের বাইরের ইউনিটগুলি দিয়ে পিছন থেকে হঠাৎ হামলা করতে হবে। তার ফলে যখন শত্রু পিছু ফিরে হানাদারদের রুখতে যাবে তখন যেন একটা বিরাট বাহিনী হানাদারি করতে এসেছে এমন ভাব দেখিয়ে আওয়াজ, ট্যাঙ্ক হাউটজার প্রভৃতির আওয়াজ নকল করতে হবে।

এমনি সময়ে সশঙ্কিত শত্রুর মাথায় ঝরবে মুস্তাঙ্গ নামের প্লেন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা। শুধু তাই নয়। উপর থেকে হিসাব করে রেডিয়োতে শত্রুসেনার স্থিতি জানিয়ে দেবে। শত্রু অপ্রস্তুত থাকবে বলে ট্রেঞ্চের আশ্রয় পাবে না।

এদিকে সেই রেডিয়োর খবরে নিজেদের গোলার রেঞ্জ সঠিক হয়ে যাবে। যতক্ষণে শত্রুরা বিশৃঙ্খল হয়ে ছত্রভঙ্গ হবে ততক্ষণ ঘেরাও মিত্র সেনা মুখ ঘুরিয়ে শত্রুকে পালটা আক্রমণ করবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে আসল ওস্তাদি হচ্ছে পরিকল্পনার মধ্যে। তার পরে মনে হয় যেন কত সহজ রণকৌশল। অথচ কত চিন্তা করে, সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রসংখ্যা, বিমানবহর, হাঁটা পথ আর আকাশপথের গতিসীমা, চাঁদের আলোর উদয়-অস্ত, আবহাওয়ার অবস্থা সব কিছু হিসাব করে তবেই এই কৌশল তৈরি করতে হয়।

তেলে জলে মানুষ বেসামরিক ভালোমানুষ স্বয়ম্। এই আধুনিক যুদ্ধের একটা পরিকল্পনায় একটা বিশেষ স্থান পেয়েছে।

তার মধ্যে সেই স্বয়মেরও যে অন্তত কিছু—যদিও অনির্দেশ্য—দান আছে তা ভেবে নিজেকে সার্থক মনে করল।

সার্থক। স্বাতী, আমি সার্থক হতে চলেছি।

আরও সার্থক সে বোধ করল যখন যে তিনটি হামলা দল তিনদিক থেকে একই সময়ে এগোবে তাদের মধ্যে তার ইউনিটকেই বাছা হল। এবং সে নিজে প্রথম গ্রিনেড ছুঁড়বার জন্য নির্বাচিত হল। তিন ইউনিটই মারবার জন্য, লড়বার জন্য এগোবে। কিন্তু প্রথম মারণ সংকেত দেবে স্যামি। অর্থাৎ স্বয়ম্।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সে উপরের দিকে তাকাল। ওই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলমান মিটিমিটি হাসিতে ভাসমান তারামণ্ডলের মধ্যে কোন্‌টি স্বাতী নক্ষত্র? কোন্ নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিয়ে অসীম আকাশ থেকে সসীম ধরণীতে আলোকশিখা নেমে এসেছে তার স্বাতীর নাম ধরে?

অন্ধকারে শেষ নির্দেশ ঘোষণা হল—প্রথমে গ্রিনেড। তার ঠিক পরেই বেয়নেট ঠাসা। তারপর শুধু চপ্

করে ফেলা অর্থাৎ টুকরো টুকরো করা। বুঝলে সবাই?

বোঝা খুব সহজ। এতদিন জাপানি লুকোচুরি খেলায় ওরা জেনে নিয়েছে যে হঠাৎ গ্রিনেডের দ্বারা আক্রান্ত হলে জাপানি সৈন্যরা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে সামলাতে পারে না। বন্দুক তুলে চালাবার আগেই হুমড়ি খেয়ে ওদের উপর পড়তে হবে। সে ক্ষণটুকুর মধ্যেই বেয়নেট নিয়ে ওদের আক্রমণ করতে হবে ঠেসে।

বাকি কাজ যেটা হাবসিরা করবে সেটা হচ্ছে ওদের লম্বা লম্বা দা দিয়ে শত্রুকে টুকরো টুকরো করা। ওদের একান্ত নিজস্ব সাবেকী প্রথা।

স্বয়ম্ পছন্দ করে চার সেকেন্ড মার্কা ক্ষিপ্রকর্মা গ্রিনেড। অতি ক্ষিপ্র—বিশেষ করে যে শত্রুর মানসিক রিফ্লেক্স প্রতিক্রিয়া খুব তড়িঘড়ি হয় না তার বিরুদ্ধে একেবারে মোক্ষম। কিন্তু এই গ্রিনেড শুধু ওস্তাদদের হাতেই নিরাপদ।

অনভ্যস্ত হলে বা গড়িমসি করলে পিন খুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতেই গ্রিনেড ফেটে যাবে।

মনের মধ্যে স্বাতী। কাজের কুয়াশায় অবগুণ্ঠিতা। মাথার উপরে চন্দ্রমা। গাছের লতাপাতার ছায়ায় কার্পেটের নক্‌শা কাটা মাটি। কিন্তু দুজনেই আলো ছড়াচ্ছে ঠিক যেটুকু দরকার। উঁচু-নিচু জলাভূমি প্রায় যে হয়ে এল। এখন কিন্তু সামনে একেবারে সমতল জমি—নিরাবরণ আর অনিরাপদ।

হাবসিদের অপেক্ষা করতে বলে সে আর খুনী খান হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল। চার দিক নিরীক্ষণ করে নেওয়া দরকার। সামনে গোটাকয়েক বাসা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ শত্রুদলের পিছনের লাইনে হয় পাহারাদারি না হয় খানাদারি কাজ চলছে।

স্বয়ম্ আরও এগিয়ে গেল। কোনও সশস্ত্র পাহারাদার নেই। শুধু কয়েকটা কামান বসানো আছে বাসাগুলির সামনে। গোলন্দাজরা বোধহয় ভোর রাতের কাজ সারতে ব্যস্ত।

চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। শেষ রাতের কুয়াশা ছড়িয়ে পড়েছে। মোনালিসার রহস্যময় হাসি সে কুয়াশায়। কিন্তু সে হাসিটি যিনি অমর করে গেছেন তিনি বহু বহু শতাব্দী আগে অসামান্য সামরিক আবিষ্কার করে আর সমর প্রতিভারও পরিচয় রেখে গেছেন।

স্বয়মের এখন মোনালিসার জন্য সময় নেই।

হাত উপরে তুলে সে হাবসি দলকে এগোতে নির্দেশ দিল। ওরা শয়ানভঙ্গি ছেড়ে একসঙ্গে যেন একই রশিতে বাঁধা কাঠের বান্ডিলের মতো উঠে দাঁড়াল। কাঁধ নিচু আর মাথা হেঁট রেখে নিভন্ত চাঁদের আলোছায়া দিয়ে শিকারের অভিমুখে বিড়ালের মতো ওরা খালি পায়ে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা আলোক দেখা দিল। একটা বাসার দরজা খুলে গেছে। আর সেখানে একটি ইউনিফর্ম পরা ধুতি।

স্বয়ম্ সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আক্রমণের নিশানা দিল। আর কয়েক পা এগিয়ে এসে তার প্রিয় চার সেকেন্ড মার্কা গ্রিনেড অব্যর্থ লক্ষ্যে সেই মূর্তির উপর ছুড়ে মারল। যেন দেওয়ালের গায়ে একটা ঢেলা পড়ল সশব্দে। একটা ভয়ের প্রতিচ্ছবি বিরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছড়িয়ে পড়ল।

ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রিনেড ঝরতে লাগল। জাপানিরা চিৎকার করতে করতে বাসাগুলি থেকে বাইরে বের হতে লাগল আর গ্রিনেড বিস্ফোরণের মাঝখানে ধরা পড়তে লাগল। হঠাৎ হামলার ফলে দিশেহারা ওদের হাতের রাইফেলের গুলির চেয়ে মুখের গালি বেশি তেড়ে বেরোতে লাগল—বেটা নোংরা রোমশ বেজন্মার দল। ডার্টি হেয়ারি বাস্টার্ড।

স্বয়ম্ চেঁচাল, আর নয়, গ্রিনেড বন্ধ। বেয়নেট চালাও। এখনই চপ্ করতে শুরু কোরো না। ডোন্ট চপ্ এম্ আপ রাইট নাও।

উৎসাহে রক্ত টগবগ করতে লাগল। সহজাত দিলখোলা হৈ হৈ হাসি ওদের স্বভাব। তার বদলে পিলে-চমকানো চিৎকার করতে করতে এখন আফ্রিকানরা তেড়ে ধেয়ে এল।

জাপানি যারা অক্ষত ছিল তারা বন্দুক তুলে নেবে কী, আধো অন্ধকারে নিকষ কালো দৈত্য আকারের মারমূর্তিগুলি দেখে তারা আর্তনাদ করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিতে শুরু করল।

সেই আর্তনাদ আর তাজা রক্ত আর বারুদের মেশানো গন্ধে আফ্রিকানরা একেবারে পাগলা হাতির মতো 'মস্ত্' হয়ে উঠল। পাগলের মতো তারা ভূপাতিত বা মৃত বা জীবন্ত বিচার না করেই জাপানিদের বেয়নেট বিঁধাতে তারপর 'চপ্' করতে শুরু করল। আধুনিকতম যুদ্ধশাস্ত্রে যে আদিম প্রবৃত্তি আর পুরনো

অভ্যাস অচল তা ভুলেই গেল।

অথচ আধুনিক যুদ্ধে প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে।

স্বয়ম্ কড়া হুকুম দিল—যারা জখম আর মৃত তাদের ছেড়ে যারা পালাচ্ছে তাদের ধাওয়া করো।

এমন কঠোর হুকুমে ওরা অভ্যস্ত নয়। সাদা প্রভুর জাতের নয় অথচ প্রভুত্বের হুংকারে হঠাৎ হুকুম দিচ্ছে একজন ভারতীয়। এমন দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি।

তবু যুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রই। বিশৃঙ্খল জঙ্গলের নিজের খুশিমাফিক নিয়ম এখানে চলবে না। ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা চপ্ করার সহজাত অভ্যাস ছেড়ে সামনে তেড়ে গেল।

গেল না শুধু একজন। স্বয়মকে দা হাতে রুখে দাঁড়াল। আর যাই হোক এই বাদামী দলপতি আর হলদে দুশমনে তফাতই বা কতটুকু। একই রকম ছোটখাটো শরীর, হালকা রং আর নরম স্বভাব। এক ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

হুকুমের তীব্র গর্জনে স্বয়ম্ রিভলবার হাতে নিয়ে এগিয়ে এল। দৃঢ় পদক্ষেপে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সেই স্থির দৃষ্টির সামনে হাবসির মাথা নিচু হয়ে গেল। হাতের দা নামিয়ে সে তার সহকর্মীদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। দুয়েক মুহূর্ত পরে ছুটে গিয়ে ওদের সঙ্গ ধরল।

অন্ধকার এখনও দূর হয়ে যায়নি। ওর পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে এল খুনী খান।

এইরকম হঠাৎ হামলার রাত্রি অভিসারে প্রকাশ্যে এমনভাবে ছোটা ঠিক নয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ নিয়ম চলে না।

খান নিবেদন করল যে আর এগোনো ঠিক হবে না। একটু সামনেই জাপানিদের খোঁড়া সারি সারি বাঙ্কার আছে। তার আশ্রয়ে প্রবল ঘাঁটি বানিয়ে ওরা রাইফেল হাতে অপেক্ষা করছে। সংখ্যায় কত তা বোঝার সময় ছিল না।

সামনে এগিয়ে—ওরই হুকুমে ধেয়ে চলেছে আফ্রিকান দল। ওদের নিরাপত্তা ওদের যুদ্ধক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের দায়িত্ব ওর। এমন কী যে দুর্বিনীত দুর্ধর্ষ হাবসি ওকেই এখনই শেষ করে দিত তারও জীবন যেন বিনা কারণে বিনা পরোয়াতে নষ্ট না হয় সে দায়িত্বও তার।

স্বয়ম ছুটে এগিয়ে গেল। এত জোরে যে সাধারণ হুঁশিয়ারির নিয়মে তা পড়ে না। কিন্তু তারই পরিচালনার উপর নির্ভর করে সামনে ধেয়ে যাওয়া সৈন্যদের নিরাপত্তা।

আই মাস্ট রাইজ টু দি অকেশন।

এবং সে ঠিকই ওই ঘটনার মুখোমুখি মোকাবিলা করতে পারল। এই বিরাট দেহ দীর্ঘ পদ ও দ্রুত দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আশ্চর্যরকম ভাবে সে তাদেব কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। তাদের থামাল। কিন্তু তারপর কী করতে হবে?

সারপ্রাইজ দেওয়া অর্থাৎ চকিতে ঝটিতি আক্রমণ আর তো সম্ভব নয়।

এদিকে ভোরও হয়ে এল।

সে ভেবে ঠিক করল এমন ভাব দেখাতে হবে যে হঠাৎ সামান্য একটু হামলা করে তার দল থমকিয়ে গিয়েছে। এবং ভড়কিয়ে গিয়ে ফিরে পালাবার পথ খুঁজছে। বেপাড়ার গলির মুখে হঠাৎ এসে গোটাকতক ইট-পাটকেল ছুড়ে সটকে যাবার আধুনিক যুদ্ধ সংস্করণ।

অতএব গোটাকয়েক বাসাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া যাক। ওগুলো যতক্ষণ দাউ দাউ করে ভোরের কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকারে জ্বলতে লাগল, এদের দলের চোখ ততক্ষণ বাজপাখির মতো শত্রুর পরিখা ঘাঁটির দিকে দেখতে লাগল।

সেয়ানে সেয়ানে লড়াই সংসারের সেরা লড়াই।

ঘরপোড়া আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জায়গাটা। চেষ্টা করলে হয়তো পেরিস্কোপ লাগিয়ে বাঙ্কার থেকেই এদের লুকানো জায়গাগুলো দেখার চেষ্টা করা যায়। চাই কী কোনও গাছের বা পাথরের আড়ালে গা ঢেকে একে-আধজনকে স্নাইপ করারও চেষ্টা করা যায়।

কিন্তু জাপানিরা তা কিছুই করল না। ওরা নিজেদের স্থিতির গোপন আড্ডাগুলি ফাঁস করে দেবে না। এমন কি দুয়েকজন স্কাউট পাঠিয়ে তাদের হঠাৎ সাপটে মারার মতো অ্যাম্বুশের বিপদেও ফেলবে না। বজ্জাত হাবসির দল নিশ্চিন্ত মনে খানিক পরে যখন পিছন ফিরবে তখন বরং দেখা যাবে।

ততক্ষণ বাসাগুলি পুড়তে থাকুক। নিজেদের কিছু মালপত্র আর গোলাগুলি বৃষ্টিতে ভেজার হাত থেকে রক্ষার জন্য সেখানে রাখা ছিল। মানুষের চেয়ে সেগুলির দাম এই দুরদুর্গম সরবরাহ রেখার শেষ প্রান্তে অনেক বেশি। তবুও।

স্ট্র্যাটেজির জন্য আগাম লোকসানে ক্ষতি নেই।

ততক্ষণে স্বয়মের স্ট্র্যাটেজিও ঠিক হয়ে গেছে। জাপানি বাঙ্কারের উপর হঠাৎ মর্টার এসে লাগল। সপ্রেমে আলাপের মতো ফিসফিস করতে করতে বাতাসে ভেসে যেন মর্টারটা তার লক্ষ্যস্থানে অর্থাৎ প্রেমাস্পদের মর্মে এসে পড়ল।

সাদা সাদা গভীর ধোঁয়ার পুঞ্জ তরঙ্গে তবঙ্গে ফুলে ছড়িয়ে পড়ল। হেলে দুলে সে কুহেলী মালা কুঞ্চিত কেশদামের শোভা নিয়ে যেন মাটির উপরে আর চারদিক ঘিরে মায়াজাল রচনা করল।

একটার পর একটা আরও মর্টার ঝরতে লাগল।

ততক্ষণে সেই মোহিনী মায়ার আড়ালে মেঘনাদের মতো বীর হাবসিরা নিঃশব্দে এগোতে লাগল। সেই কুহেলী কমে এলে স্বয়ম্ প্রথম গ্রিনেডটি তাক করে থেকে বাঙ্কারের উপর অব্যর্থ লক্ষ্য নিয়ে ঝাড়ল। দলের সৈন্যরাও সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনেড ছুঁড়তে লাগল।

তার পরেই এগোল ওরা যমদূতের মতো বেয়নেট চার্জ করবার জন্য।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

প্রথম সারির বাঙ্কারগুলি সব খালি। সেয়ানা তো জাপানিরা কম নয়। বাঙ্কাবগুলি লতাপাতায় ঢেকে কামোফ্লাজ করে রাখা। শত্রুর চার্জ তাতে ব্যাহত হবে। কিছু শত্রু হাঁটু ভেঙে পড়েও যাবে।

তবু এরা ছাড়বে না। আক্রমণ থেকে ক্ষান্ত হবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই কৌশল আগে থেকে অনুমান করে ওরা দ্বিতীয় সারির বাঙ্কারে ঘাঁটি বেঁধেছে। আর আশা করছে যে আক্রমণকারী দল নিজেদের ধোঁয়ায় নিজেরা নাকাল হয়ে কাশতে কাশতে কাবু হতে থাকবে।

আর ততক্ষণে জাপানিদেব লম্বা নলওয়ালা রাইফেলগুলি. .

কিন্তু হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে হামলা কবা একবারই সম্ভব। মিরাকলের মতো সারপ্রাইজও বাববার হয় না।

অতএব স্বযম্ আবার হুকুম দিল। এগিয়ে যাও। হামলা চালাও। নাকে রুমাল চাপা দাও। হাওয়া আর ধোঁয়া শত্রুর বাঙ্কারের দিকেই বয়ে যাচ্ছে। তার সুযোগও নিতে হবে।

আফ্রিকানরা যেন মারণ মন্ত্রে জেগে উঠে যন্ত্রের মতো এগিয়ে যেতে লাগল।

এবার শত্রুর গুলি আরাকানের বারিধারার মতো ছুটে আসতে লাগল। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে তা পরিষ্কার হলেও কোন্‌খান থেকে আসছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই ধোঁয়ার আড়াল থেকে আফ্রিকানরাও গুলি চালাতে জুত পাচ্ছে না।

শেষে বোঝা গেল যে একটা জায়গায় মাটির উপর ধানক্ষেতের আলের মতো আল রয়েছে। তারই মধ্যে নানা কোণের মতো অ্যাঙ্গল করা ফুটো। সেইসব ফুটো থেকে রাইফেলেব নল কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার শুরু হল গ্রিনেডের পালা। চড়া বিস্ফোরকে ভরা গ্রিনেড শাঁ শাঁ করে বাতাসের বুক চিরে এগোতে লাগল। কাঁচা মাটির আল আর বাঙ্কারের আড়াল জাপানি অবস্থানকে খানখান করে দিল।

তারপরই শুরু হল বেয়নেটের পালা। বীভৎস উল্লাসে ভোরেব আবহাওয়াকে উচ্চকিত করে তুলল তারা। প্রায় আজানুলম্বিত দৃঢ় বাহুর দৃঢ়তর মুঠির বেয়নেট চালনার সামনে শত্রুপক্ষ কেঁচোর মতো কুঁকড়ে যেতে লাগল।

এক জায়গায় দুজন জাপানি হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে রয়েছে। যেন আত্মসমর্পণ করতে চায়। কিন্তু ভি ফোর্সের শিক্ষায় অভিজ্ঞ স্বয়ম্ জানে যে এইরকম ভঙ্গি করে ওরা বিপক্ষকে নিশ্চিন্ত হয়ে সামনে এগিয়ে আসতে দেয়। এবং কাছে এলেই আচমকা অব্যর্থ রিভলভার চালায়।

এদিকে ওর সৈন্যরা বিনা সন্দেহে এগোচ্ছে। কাজেই একলাফে সে এগিয়ে গিয়ে আগুয়ান আফ্রিকানদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল। সে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু জাপানির দল হাঁটুর নিচে লুকানো রিভলভার চালাল। কিন্তু ত্বরিৎগতির রাইফেলের গুলি তার আগেই কাজ করেছে।

তারই পরমুহূর্তে একটা ফক্স হো অর্থাৎ শিয়ালের গর্তের মতো লতাপাতায় ঢাকা গর্ত থেকে একটা

রাইফেলের নল উঁকি মারল। দলপতির দিকে তাক করে একেবারে মুখোমুখি। খুটখুট।

স্বয়ম্ চোখ বুজে ফেলল।

কিন্তু একি? হঠাৎ ওর আর রাইফেলের নলের মাঝখানে প্রেতমূর্তির মতো ধেয়ে এসেছে কে একজন! নিজের বিরাট দেহ দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে দিয়েছে।

সেই দেহ ওর ওপর ঢলে পড়ল। তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্বয়ম্ নিজেও ঢলে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য! তার নিজের কি হল? ব্যথা, গুলির ব্যথাটা কোথায় লাগল?

দু হাতে চাড়া দিয়ে উঠতে গিয়ে ওই ভূপাতিত বিশাল দেহের দিকে নজর পড়ল। নিকষ কালো একটি মুখ। রাতের হিংস্রতার বক্ষ নিরাবরণ করে ওই মুখখানা যেন বড় মায়ায় ঘেরা। মমতায় ভরা।

মনে হল সেই মুখের বাতায়ন হয়ে খোলা রয়েছে দুটি নীলপদ্মের মতো চোখ। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বোধ হয় ওরই দেশে যুদ্ধজয়ের আগে দেবীপূজার জন্য নীল পদ্মের সন্ধান করতে পাঠিয়েছিলেন। সেই পদ্ম দুটি অকালবোধনের পূজায় ধীরে ধীরে মুদে আসছে।

এই সেই হাবসি যে সামান্য ক্ষণ আগে আদেশ অমান্য করে নিজের কম্যান্ডারের উপরই দা তুলতে গিয়েছিল।

মুদে আসা নীলপদ্ম দুটিব উপর ভোরের নীলাকাশের হাসি-হাসি আলো এসে পড়েছে।

স্বয়ম্ তার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিল।

।। পঁচিশ ।।

জীবন আর জাপানিদের মধ্যে মোট কতটুকু দূরত্ব? কতটুকু তফাত?

সেদিনের মৃত্যুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খণ্ডযুদ্ধের পর স্বয়মের এই প্রশ্নটা প্রায়ই মনে আসছে।

জীবনের চেয়ে বড় কিছুর সন্ধানে সে বাঙালির তেলে জলে লালিত জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সেই বড় কিছুর একটি ঝলক সে দেখেছে ওই সম্পূর্ণ অচেনা ভিনদেশী নিকষ কালো নাইজেরিযানের চোখে। সেই চোখের শেষ চাহনী সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। ভোলা অসম্ভব।

সেই জীবনের চেয়ে বড় কিছুর খোঁজেই তো সে নিজে থেকে 'ভি' ফোর্সের ইনটেলিজেন্স অর্গানাইজেশনে অফিসার হয়ে এসেছিল। ওর দলের প্রায় হাজার জন স্থানীয় লোক বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর জোগাড় করে ওকে জানিয়েছিল যে জাপানি সৈন্যদের রসদের জন্য হাজার হাজার গরু-বাছুর আর অস্ত্রশস্ত্র বইবার জন্য অনেক হাতি জড়ো করা হয়েছে।

কিন্তু ঠিক সেইদিনই ব্রিগেড কম্যান্ডার ট্রেনিং প্রোগ্রাম আর প্রশাসন সমস্যা নিয়েই নিশ্চিন্তে মিটিং করছিলেন।

তিনি খবরই পাননি যে মিত্রশক্তির ১৭ নং ডিভিশন ঘেরাও হয়ে আছে। এখন তাদের বের করে আনার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার অন্য দিকে পূর্ব অঞ্চল থেকে দুটো জাপানি ডিভিশন তাড়াতাড়ি আরও এগিয়ে আসছে।

তাদেরই হঠাৎ হামলায় জড়িয়ে পড়ে দুটো পাঞ্জাবী কোম্পানি সৈন্যদলের কী অবস্থা হয়েছিল তা স্বয়ম্ শুনেছে লেফটেনান্ট দত্তর মুখে।

স্বয়ম্‌কে বিশ্রাম দেবার জন্য বেজক্যাম্পে সরিয়ে আনা হয়েছিল। সেই ক্যাম্পের হাসপাতালে, মানে বাঁশ আর ইকড়ার অর্থাৎ বেতের তৈরি বাসা হাসপাতালে শুয়েছিল আহত লেফটেনান্ট দত্ত। "ওয়াস্‌বি", অর্থাৎ উইমেনস অক্‌জিলিয়ারি সার্ভিস অব বার্মা অ্যান্ড ইন্ডিয়ার নার্সরা স্বয়ম্‌কে খবর দিয়েছিল যে আরেকজন বাঙালি অফিসার তাদের শুশ্রূষায় ওখানে আছে। তার সঙ্গে নিজের মাতৃভাষায় গল্প করলে রোগীর পক্ষে ভালো হবে। সহানুভূতির সঙ্গে মাতৃভাষায় গল্প হবে মানসিক দাওয়াই।

বাঁশের চাঁচির খাটিয়ায় শুয়ে দত্ত তার অভিসারের গল্প স্বয়ম্‌কে শোনাচ্ছিল। স্বয়মের নিজের জীবনের সঙ্গে বেশ অনেকখানি মিল রয়েছে।

জীবনের লীলা বড় আশ্চর্য।

*   *   *   *

জীবন আর জাপানিদের মধ্যে মোট দুশো গজের তফাত।

মাঝে মাঝে মনে হয় বোধ হয় সেটুকুও নয়। জাপানি জিরো বম্বারগুলো জুম জুম করে নেমে আসে। বাজ-পাখির মতো কঠিন তাক করে তীব্র হাঁক দিয়ে ছোঁ মেরে উড়ে যায়। ফটাস্ ফটাস্ ফট্ করে গুলির তুবড়ি ছড়িয়ে দেয়।

আমরা দুশো জন সৈন্যের দুটো কোম্পানি ট্রেঞ্চের উপর লতাপাতা ডালের ক্যামোফ্লাজ করা ঢাকনার তলায় লম্বা হয়ে কড়িকাঠ গুনি।

না। ঠিক হল না। মুখ মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে আমাদের কোল্‌ড মাটন অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাংসপিণ্ডটাকে জিইয়ে রাখবার সাধনা করি।

দু-পাশ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে দুটো বিরাট 'বুম' অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ার লাইন। জংলী গাছ আর লতাপাতায় ভরা এই বুম দুটো পার হয়ে পাশ থেকে আক্রমণ হবে না। জাপানি শত্রুও তা করবে না। আর এই দুই পাহাড়ের লাইনের মাঝখানের প্রায় সমতল জমিটুকু আমরা আগে থেকেই দখল করে রেখেছি। আমরা মানে আমাদের এই নতুন গড়া আনকোরা কোম্পানি দুটো।

এগোবার আশা নেই। সামনে জাপানি সৈন্যদল চিন্দুইন নদীর বন্যার মতো দুর্বার ভাবে এগিয়ে আসছে।

পেছোবার পথ নেই। পিছনে আমাদের প্রায় ভেঙে ছনছান হয়ে যাওয়া ব্রিগেড কতগুলো ছোট নদীর উপর রবারের ডোঙা দিয়ে ভাসানো পুল তৈরি করার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ সেই অছিলায় প্রথমে আপনা প্রাণ বাঁচাবার পথ ঠিক করছে।

জিরো বম্বারগুলো পাহাড়ের চূড়োর উপর দিয়ে ডিঙিয়ে এসে বোমা দিয়ে পোলগুলো ভেঙে নস্যাৎ করে গেছে কদিন আগে। গোটা ডিভিশনটাই ইঁদুর কলের মধ্যে ধরা পড়ত; কিন্তু কী ভাগ্যিস ইংরেজ সৈন্যরাই পথ দেখিয়ে আগুয়ান হয়ে যাচ্ছিল।

শ্‌ শ্‌ কেউ যেন না বলে বসে যে ওরা সবার আগে পালাচ্ছিল। ওরা সাম্রাজ্য তৈরি করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল প্রায় দুশো বছর আগে। এখনও সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই পেছন পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

গা বাঁচিয়ে হটে যাওয়াকে হার বলা যায় না। আগুয়ান শত্রুকে পিঠ দেখানোকে পালানো বলা যায় না।

মোটকথা আমাদের এই ব্রিগেডটাই পেছু হটা লড়াইয়ে সবার পেছনে অর্থাৎ আগে ছিল। আন্‌কোরা রঙরুট সব লাস্ট কাম লাস্ট সার্ভড—থুড়ি লাস্ট সেভড—এতে অন্যায় কিছু নেই।

এই দুটো কোম্পানিই আবার তার মধ্যে সবার শেষে অর্থাৎ জাপানি বন্যাস্রোতের একেবারে সামনে সবার প্রথমে। আমাদের উপর কড়া হুকুম : যেমন করেই পার ট্রেঞ্চ খুঁড়ে এই ফাঁকটা আটকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের উপরই সমস্তটা ডিভিশনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আমাদের অপারেশন অর্ডারের মধ্যে রয়েছে একটা মহান মিশন।

রেঙ্গুনে যখন প্রথম এ. আর. পি. দল তৈরি হল, সেখানকার অসামরিক লোকরা কী হাসিই না হাসত! বলত—এ. আর. পি. নয়। ওটার মানে হচ্ছে এল রে পালা।

আর আমাদের বর্তমান এই ব্রিগেডের পালানোর তৎপরতা দেখলে বর্মার বাঙালিরা বোধ হয় হাসতেও ভুলে যেত।

কিন্তু আমরাও হাসতে ভুলে গেছি।

এই নো-ম্যান্‌স ল্যান্ডে—যেখানে শুধু আমি আছি আর আমার শত্রু আছে, সেখানে হয় সে আমাকে মারবে অথবা নিজে বাঁচবার জন্য আমি তাকে মারব। তাই আমরা এই রাতে হাসতেও পারছি না।

সেদিন ভোরে আমাদের দুটো কোম্পানির সবে ধন অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর ক্যাপ্টেন একটি জাপানি শেলে ঘায়েল হয়েছেন।

শুধু যদি মরে যেতেন তাতেও ক্ষতি ছিল সাংঘাতিক। কিন্তু ওর ব্যাটল ড্রেসের একটা হাতা শেলের ঘায়ে জামা আর হাত থেকে ছিঁড়ে গিয়ে আমাদের ক্যামোফ্লাজের একটা উঁচু ডালের উপর আটকিয়ে গেছে।

আমরা সামনে তাকাতে সাহস পাই না। ফিল্ড টেলিস্কোপে জাপানিদের নড়াচড়া দেখলেও শিরদাঁড়া সিরসির করে ওঠে। পেছনে তাকালেও ভয় হয় ক্যাপ্টেনের ওই হাতাটা ঝুলতে দেখে।

কোম্পানির নেতা, একমাত্র ইংরেজ, অপরাজেয় ইংরেজ। তার হাতাটা যে দক্ষিণ দুয়ার দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্য কোম্পানির অফিসার আগেই ঘায়েল হয়েছিলেন।

তাই আমরা ভয়ে কোনও দিকেই তাকাচ্ছি না। সারাদিন জাপানিরা ওই হাতাটা তাক করে ফায়ার করেছে। ওটাকে ফালি ফালি করে আমাদের বুকগুলোও ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। ওটারই নিশানা ধরে নিজেদের লাইনের পেছনে যে মেশিনগানগুলো ছিল সেগুলি দিয়ে আমাদের ট্রেঞ্চের লাইনটা টুকরো টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আমার চারপাশে এই লাইনটুকু টিকে আছে তখনও।

সেখানেই দু-পাশ থেকে যারা তখনও বেঁচে আছে তারা হামাগুড়ি দিয়ে জড়ো হয়েছে। ফিস ফিস করে, কিন্তু পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে বলছে—কী করব, কী করে বাঁচব বলে দিন, লেফটেনান্ট সাব। আমিই এখন ওদের অফিসার কম্যান্ডিং।

আমি লেফটেনান্ট দত্ত, কলকাতায় হগ মার্কেটের দোকানে সার্ডিন মাছের টিন জানলার পাশে শো-কেশে সাজানো দেখতাম। প্যাক্‌ড লাইক সার্ডিনস কথাটা বইয়ে পড়েছিলাম।

মিলিটারি মেসে খেতে বসে যখন সার্ডিনের ইলিশের মতো আঁশটে গন্ধে আকুল হয়ে উঠেছি তখন কিন্তু কথাটির মানে মনে হয়নি। এখন এই রাতে এই ট্রেঞ্চে গাদাগাদি করে আমার জোয়ানরা যখন চারদিকে চেপটে আমার কাছে এসে শুয়ে পড়েছে তখন কথাটার মানে মনে এল।

আমি ছাড়া আর কোনও অফিসার—ছোট, মেজো, বড় কেউ আর এই কোম্পানিতে বেঁচে নেই।

এমন সময় আবার শেল পড়তে শুরু করল। হঠাৎ ভিজে স্যাঁতসেতে মাটিতেই আমরা মাথা প্রায় কবরস্থ করে শুয়ে পড়লাম। শেল পড়তে শুরু হয়েছে। এই মাটি, এই মাটির ভেজা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নিয়ে কলকাতায় কত কাব্য করেছি। এই মাটিতে নতুন চেরাই করা কাঠের পরিচিত মিঠে গন্ধ, বসন্তের শরতের বর্ষার আদুরে শিরশিরে পরশ। কিন্তু তারই মধ্যে নতুন একটা অনুভূতি এসে গেল।

হঠাৎ যেন সব চেয়ে তুচ্ছ, সব চেয়ে স্বল্পায়ু জীব হয়ে জগতের তলায় নেমে এলাম। পোকামাকড় যারা হতচ্ছাড়া ভাবে মাটিতে হামা দিয়ে বেড়ায় তাদের চেয়ে বড় আমি কিছু নই। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে এই কদিন ধরে শেল পড়া, মেশিনগানের গুলি চলা সব কিছু সত্ত্বেও ওরা নিশ্চিন্তভাবে চলাফেরা করেছে। আমাদের ভয়, চকিত চমক এদের বিচলিত করেনি। মাছি মশারা পরম নিশ্চিন্তভাবে উদাসীনভাবে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে বেড়িয়েছে। আবার দু-পশলা গোলা বৃষ্টির মাঝে নিশীথিনীর নীরবতা ভেঙে দুয়েকটা পাপিয়া পাল্লা দিয়ে গেয়ে উঠেছে—পিউ কাঁহা।

এদিকে ততক্ষণে আমরা ফাইটিং নাইফ অর্থা কুক্‌রি দিয়ে আরও মাটি খুঁড়ছি। নীরবে, কিন্তু ভূতে পাওয়া উত্তেজনায়। শ্রাৎ শ্রাৎ শা এক একটা গোলা যেন কান ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই যেমন করেই হোক আরও খানিকটা মাটি খুঁড়ে অন্তত মাথা মায় কানদুটো তার মধ্যে সেঁধিয়ে দিতে হবে।

হঠাৎ কুক্‌রিটা হাত থেকে ফসকে কোথায় ছিটকে পড়ল। টর্চ জ্বালিয়ে দেখা সম্ভব নয়। পাগলের মতো দশটা আঙুল দিয়েই আরও মাটি খুঁড়তে লাগলাম। ট্রেঞ্চ হচ্ছে পুরো শরীরের কবর। কিন্তু তাতে কুলোবে না। মাথার জন্য আলাদা আরও গভীর কবর চাই।

হঠাৎ মনে হল এই কান ফাটানো গোলাগুলিই হচ্ছে জীবনের চিহ্ন। এই পাখি, এই পোকামাকড় এরাই মৃত্যু। মৃত্যুর হাতছানি। একবার মনে হল ছুটে এই ক্যামোফ্লাজের ছাউনি থেকে বেরিয়ে যাই। এই গাছপালা ডালের আড়ালই আমাদের আসল দুশমন। উপরের সুন্দর পৃথিবী, আলো বাতাস বসন্ত শ্যামল মাটি আর সুনীল আকাশ এই সমস্ত জীবনের লক্ষণ থেকে আড়াল করে রেখেছে এই শত্রু।

আম্‌রিক সিং অন্য জোয়ানদের চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে। মুখে মুখে অঙ্ক কষে বলল যে, জাপানিরা আমাদের পাল্লা ঠিক মতো পেয়ে ফেলেছে। তাই দু-পাশের ট্রেঞ্চের লাইন গুঁড়িয়ে দিয়ে পেছনের পালাবার পথ তছনছ করে দিচ্ছে।

ওদের শেলের পাল্লা হিসাব করে আমাদের উপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

মিনিটখানেক পরে বলল, ওই দেখুন, লেফটেনান্ট, গাছগুলো মড় মড় করে উঠছে শেলের বাতাসের ধাক্কায়। ওদের পাল্লা আরও ছোট করে গুটিয়ে আনছে। আর পাঁচ মিনিট।

ওর মুখটা জোর করে গর্তে সেঁধিয়ে দিলাম।

গ্রীবাল আমার পা জড়িয়ে ধরল, ওই শেলগুলো বর্তানীয়ার সীল ওয়ার্কসের তৈরি।

দাঁত চেপে শাসালাম, কী করে জানলে কোন্ স্টীলে ওগুলো তৈরি? চুপ করে পড়ে থাক।

ও শুনল না। ভেজা স্বরে শুকনো গলায় বলল, আমি সায়ান্টিফিক ভাবে যাচাই করে দেখেছি। না হলে অত হাড়-কাঁপানো আওয়াজ হয় না।

ততক্ষণে আরেকটা শেলের টুকরোগুলো আমাদের মাথার প্রায় উপরে লোহার বৃষ্টি ঝরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডালপালা ছাউনি উড়িয়ে নিয়ে গেল।

আর একজন প্রায় ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে গিয়ে কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিল। যেন জ্যান্ত কবরের ভিতর থেকে ওর আওয়াজ বেরিয়ে এল—আমার টাক, মেরা গাঞ্জা। আমার টাকটা এত চকচকে যে, জাপানিরা দূর থেকেই ওটা দেখে নিশানা করতে পারবে।

পাগলের মতো দু হাত দিয়ে সে মাথার উপর মাটি চাপা দিতে লাগল।

আম্‌্রক সিং একবার মিনতি করে আমায় জিজ্ঞেস করল, মরে যাবার আগে এখান থেকে একবার বেরোবার চেষ্টা করলে হয় না? অর্ডার দিন, অর্ডার দিন, লেফটেনান্ট সাব। চুহা কা তরহ্ মরনা নাহি চাহতা।

চুপ—চুপ করে রইলাম। পিছনে ক্যাপ্টেনের হাতের হাতাটা এখনও দক্ষিণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে কি না কে জানে। একটু পরে বললাম, মরার ভান করে পড়ে থাক, কোম্পানি।

ওর দাড়ি গোঁফের মধ্যে দিয়ে যে কথাগুলি ফিস ফিস করে বেরোল তাদের মানে আমি হলফ করে বলতে পারব না। তবে সম্ভবত আম্‌্রক বলে ছিল, অন্তত ভেবেছিল—শালার অফিসার, ভেতো আর ধুতো বাঙালি। পালাবার হুকুমও দিতে পারে না। ভীতু কোথাকার।

যাই বলে থাকুক, হজম করে গেলাম। আমার নেই বাকি কোনও কম্যান্ডের জোর। কোম্পানির নেই কোনও ডিসিপ্লিন।

তারপর—তারপর একটা নিরন্ধ্র নিরবতা নামল। সমস্তটা জগৎ, আমাদের জগৎ, আমাদের জীবন জুড়ে। শত্রুপক্ষের শেলদাগা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এই নীরবতা আমাদের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে আনল। এ তো আমাদের চেনা গ্রামের মাঠঘাটের শান্তিময় নীরবতা নয়, মধ্যরাতের তারার হাসিতে ভরা অন্ধকার। আগে যত নীরবতা অনুভব করেছি তা ছিল শব্দহীনতা, নিঃশব্দতা। আর এখন মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে শব্দ শুনতে পারার অক্ষমতা।

শব্দ যেন আমাদের চারপাশে অরণ্যের হিংস্র পশুর মতো ওৎ পেতে অপেক্ষা করছে। ঘিরে রয়েছে আমাদের ওই দুপাশের বুম পাহাড়ের চূড়াগুলো, সামনের ওই জাপানিদের ট্রেঞ্চ মায় কামানঘাঁটি, পিছনের ওই ভাঙা পোলের তলায় কলোচ্ছ্বসিত মৃত্যুস্রোতগুলোর সব কিছুতে ছড়িয়ে, জড়িয়ে।

অনেক দূরে হঠাৎ যেন একবার নিঃশব্দতার বুক চিরে একটা মর্টার বা অন্য কিছুর আর্তনাদ বেরিয়ে এল। আমরা চমকিয়ে উঠলাম। সচকিত হয়ে বুঝলাম যে, না, মর্টার নয়।

জাপানিদের কোনও ফিল্ড মাইন ওদেরই দলের কারও অন্ধকারে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে শেষ করে দিয়েছে। না। এও ঠিক শব্দ হল না। এ তো যেন শুধু নিঃশব্দতা কথা কয়ে উঠল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ঈশ্বর নামে যে অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টর এই পৃথিবীর বিশ্বসঙ্গীতি বাজায় তার হাতের মায়াকাঠিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

স্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে সেই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বন্দনা। পাড়ার মেয়ে বললে কিছুই বলা হয় না। সমস্তটা অঞ্চলের স্বপ্ন। ধনে প্রতিষ্ঠায় শিক্ষায় সবচেয়ে মানী অভিজাতের তরুণী কন্যা।

তার পরের কথাগুলি আর পুনরাবৃত্তি না-ই করলাম। সে তো বহু বাঙালির আর্ত অন্তরের আর ব্যর্থ যৌবনের পরাজয়ের পরিচিত কাহিনি। তা শুনতে মধুর; শোনাতে আরও মধুর। আর সাহিত্যিকদের কারও কানে কাহিনিটা একবার পৌঁছালে তো একখানা উপন্যাসই হয়ে যাবে।

সেই বন্দনা।

সংসারে আর কোনও দিকেই কোনও সুবিধা করতে পারলাম না। সে বিমুখ ছিল না। কিন্তু কোন্ মুখে তার বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? বলব যে তাঁর মেয়েকে পেয়ে জীবন ধন্য করতে চাই। কী দেখাব সম্পদ, দেবো কোন্ পরিচয়?

বাপের হোটেলের দৌলতে দেহ রক্ষা চলে, দেহলী ভরে তোলা যায় না। মুখ চালানো চলে; কিন্তু মুখ

থাকে না। আর এই যুদ্ধের বাজারে চাকরি একটা জোটানো চলে, কিন্তু বরমাল্যের জন্য যোগ্যতর প্রার্থীর অভাব নেই।

আধুনিকা বাঙালিনীরাও কেমন যেন বরনারীর চেয়ে বীর নারী অর্থাৎ বীরদের গলায় বরমাল্য দিতে উৎসুক হয়ে উঠেছে এই যুদ্ধের বাজারে। শুধু চাকুরে শান্তশিষ্ট বর আর বরনারীদের প্রার্থনার বর হিসাবে ঠাঁই পাচ্ছে না। মরিয়া হয়ে এমার্জেন্সি কমিশনের জন্য দরখাস্ত করব বলে বন্দনাকে জানিয়েছিলাম।

হেসে বন্দনা উড়িয়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল, আহা দেখো যেন ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যেয়ো না। জাপানি ক্রিসানথিমামগুলো আবার তাবড় তাবড় সাইজের হয়। তা নিশ্চয়ই জানো, কবি।

কবিতা লেখার জন্য এমন দাম নিশ্চয়ই আর কোনও বাঙালি যুবকের দুর্ভাগ্যে জোটেনি।

মনে পড়ল যে কিছুদিন থেকে যত্ন করে ধুতি কুঁচিয়ে পরার দিকে নজর গিয়েছিল। তাতে বাড়তি খরচ ছিল না; ছিল বরণীয় রুচির বিজ্ঞাপন। কোনদিনই কবি কবি চেহারা ছিল না। হ্যাংলা হালকা দেহ অবশ্য ছিল না। কবিদের মতো ভাবের তুফানে উড়ে যাবারও ভয ছিল না। মাথার চুলের প্রাচুর্য আর ঢেউ কবিত্বের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিল।

বন্দনা এবার একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে বলেছিল, বাইবেলেব স্যামসন আর ডিলাইলার গল্প জানো তো। ঝাঁকড়া চুলের মধ্যেই স্যামসনের যতো জোর ছিল। তুমিও বোধ হয় চুল ঝাঁকড়িয়েই জাপুদের...।

সইতে না পেরে সরে এসেছিলাম। আমি কবি, দুর্বল, অপদার্থ। তাই মুখ ফুটে এটুকুও বলতে পারিনি—দেখে নিয়ো তুমি, একদিন সত্যি যুদ্ধ জিতে ফিরে আসব। সেদিন পর্যন্ত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।

কিন্তু আমি পেছন ফিরে রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দনা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ও যেন নতুন আর কেউ। গভীরভাবে বলেছিল, আমি তো রইলাম ওই জানলার গরাদের ওপারে বন্দিনী। যদি তুমি বীর হও, যদি তুমি বড় হও.

তারপর সেও মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল। শিকের ওপারে বন্দিনী। এমনভাবে আর কোনদিন সে নিজের মনকে খুলে দেখায়নি। আমায় অবশ্যই এমার্জেন্সি কমিশন জোগাড় করতে হবে।

* * * *

বো-ও, বো-ও, বো-ও করে বোমারু বিমানগুলো আমার চারদিকে নেমে আসছে। তাক করে, নির্ঘাৎ আমাকেই তাক করে নেমে আসছে। না, শুধু যে নেমে এল তা নয়, আমায় চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। উপরে নিচে পাশে সর্বত্র। কিন্তু আওয়াজ খুব বেশি নয়। বোধ হয় হঠাৎ হামলার জন্য ইঞ্জিনগুলোতে সাইলেন্সার লাগিয়ে নিয়েছে। আব জুম জুম করে মেশিনগান থেকে বুলেটও ছুড়ছে না। বোধ হয় জীবন্ত বন্দী করে নিয়ে যাবে। আর বিদ্যুতের মতো গতিতে আমাকে ছাড়িয়ে পিছনে ফেলে এগিয়েও যাচ্ছে না। শুধু আমার চাবদিকেই বো-ও বো-ও করে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছে। যমদূতের ষাঁড়গুলো সম্ভবত এরকম করেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কোথায় আগুনের হলকা ভরা গুলি, কোথায়? এর চেয়ে আমায না হয় একটা নাইন-পাউন্ডার বোমা দিয়েই সাবড়ে দাও।

আমি আছি রাজি
অভিসারে সাজি
মরণ মহোৎসবে...

আরও কি সব কবিতা লিখেছিলাম। সত্যি আমি আজ রাজি আছি। কই, নাইন-পাউন্ডার একখানা ঝেড়ে দাও।

* * * *

অস্থির হয়ে তন্দ্রা ভেঙে উঠে পড়লাম। কোথায় বন্দনা, কোথায় বোমারু বিমান। চারদিকে শুধু মশার দঙ্গল, কামান দাগছে। বো-ও, বো-ও করে দলে দলে নেমে এসে কামড়াচ্ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মশারি, মুখ ঢাকবার জাল, সিট্রোনেলা মলম সবই কম্যান্ড থেকে দিয়েছিল। সেসব লটবহর চাপিয়ে বড়দিনের রাতে স্যান্টা ক্লজের মতো মূর্তি নিয়ে বর্মা ফ্রন্টে রওনা হয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন শুধু সাবমেশিন গান আর জান নিয়েও পালাতে পথ পাচ্ছি না।

ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। একটা ভেরি লাইটের হাউই উড়িয়েছে জাপানিরা আমাদের লাইনের

পিছনে। সবুজ সবুজ, টকটকে সবুজ আলোর একটি ফোয়ারা যেন আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ফিল্ড টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে প্রাণপণে সামনের দিকটি নজর করে দেখলাম। আমাদের ট্রেঞ্চের ঠিক সামনে ওই দুশো গজ দূরে মেশিনগান বেশ জুৎসই করে বসানো হয়ে গেছে। তাদের নলের চোঙাগুলো যমদূতের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। রক্তচক্ষু থেকে আগুন একবার ছাড়লেই হল।

সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। অত যে শেল ছোঁড়া হচ্ছিল সেটা শুধু বাইরের আবরণ। শেলের ছাতার আড়ালে মেশিনগান বসানো হচ্ছিল। আজ শেষ রাতেই... শেষ রাতেই।

তার আগে আমাদের একটু ধোঁকা দিয়ে ঠাণ্ডা করে ভুলিয়ে রাখার জন্যই ওই নীরবতা। ততক্ষণে জাপানিরাও বোধ হয় একটু খেয়ে জিরিয়ে নিয়েছে। এইবার।

ওই ভেরি লাইটের সবুজ আলোয় শ্যামকান্তি বুম আর বনজঙ্গলকে ভাসিয়ে ওরা একবার যাচাই করে নিল এই ট্রেঞ্চ ছাড়া আমাদের আর কোনও ঘাঁটি বা নতুন সরবরাহ করা রি-ইনফোর্সমেন্ট আছে কিনা। এইবার।

একবার আমার ব্যাটল ড্রেসের উপর কাঁধে বোনাই করা তারা, আমার অফিসার পদের চিহ্ন তারার উপর হাত বুলিয়ে নিলাম। মা যেমন করে তার শিশু সন্তানের কপালে হাত বুলিয়ে তাকে রক্ষা করতে চায়। তারপর অন্ধকারেই কোম্পানির বাকি সব সৈন্যদের ফিস ফিস করে তৈরি হবার অর্ডার মুখে মুখে চালু করে দিলাম।

ওরা হয়তো— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেল। পালাতে চেয়েছিল; তার হুকুম দিতে পাবার মতো হিম্মত হয়নি। বাঁচতে চেয়েছিল; মরবার ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু হুকুম দেবার সাহস হয়নি। আর এখন কিনা বলছি পেটে হামাগুড়ি দিয়ে বেয়ে বেয়ে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে ওই মেশিনগানের নীড়গুলো দখল করতে হবে।

আমৃক সিং অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল, সত্যি, অফিসার সাব, সত্যি? ওরা কিন্তু কচুকাটা করে ফেলবে মেশিনগান চালিয়ে।

দাঁতে দাঁতে চেপে হিস হিস করে বললাম, ঠিক সেই জন্যই হামলা করব এখনই। এখনই ওই মেশিনগান নেস্ট দখল করব। ওগুলির মুখ ওদেরই ট্রেঞ্চের দিকে ঘুরিয়ে ফায়ার করব। কোম্পানি-ই-ই— অ্যাডভান্স।

নিরন্ধ্র অন্ধকার আমাদের চারদিক থেকে পিষে শ্বাসরোধ করে দিতে চাচ্ছে। তবু হামা দিয়ে হামলা করতে এগিয়ে চলেছি। আমায় আমার নেতাহীন কোম্পানি অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলেছে।

আমার সামনের জায়গাটা যেন একটা অন্ধকারের চলন্ত ঢ্যালা। আমার সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে এগিয়ে চলেছে। একবার ভয়ানক প্রস্রাব পেল; মাত্র একবার। তারপর চেপে গেলাম। হাজার আষ্টেক ফুট উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়াগুলা ইস্পাত-নীল আকাশে মাথা তুলে চোখ তুলে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দুপাশে মহামার বোমায় উৎখাত জংলা জমিগুলিতে যেন ছায়ায় ছায়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাদের নজরের সামনে কী...? ছিঃ!

পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আমৃক সিং, আসছে গ্রীবাল, আসছে গোটা নিউ পাঞ্জাব লাইট ইনফ্যান্ট্রিব 'সি' কোম্পানি। ওরা আমায় ভেতো আর ধুতো বলেছিল, ভীতু ভেবেছিল। ওদের পালাতে হুকুম দেবারও সাহস আমার ছিল না।

আর পিছনে আরও কে যেন আসছে। না। পিছনে নয়, সামনে। না, সামনে নয়, চারপাশে।

বন্দনার বর্ণনার ওই বড় বড় ক্রিসানথিমাম ফুলগুলো নয় তো? একবার ওর মুখখানা মনে করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সময় হল না। জানলার গরাদের ওপারে বন্দনা বন্দী হয়ে আছে। ওকে মুক্ত করে আনতে হবে। আমার যৌবনের পরম রাত্রির চরম অভিসার।

এবার মেশিনগানগুলোর প্রায় সামনে এসে পড়েছি। আর পেটে পেটে হাঁটা নয়। একবার হাঁটুতে হাতেতে চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ আবার একটা ভেরীলাইনের হাউই আকাশে উড়ে গেল। সব সবুজে সবুজ! আশার রঙ, আশ্বাসের রঙ। মেশিনগানগুলির সামনে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে হুইল ঘুরিয়ে ওগুলোর মুখ ঘুরিয়ে দিলাম।

মুখোমুখি। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। বন্দনা জানলার গরাদের ওপারে বন্দিনী। আমার হাতে

তার কারাগার ভাঙবার অস্ত্র। ট্রেঞ্চের জমাট সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আর নাকে লাগছে না। ক্রিসানথিমামে গন্ধ আছে না কি? তার সাইজ কত বড়?

থাক। হিসেবে দরকার নেই। কোম্পানি-ই, ফা-য়া-র।

॥ ছাব্বিশ ॥

নরম ঠোঁটের উপর লিপস্টিক বুলিয়ে নিয়েছিল স্বাতী একদিন ওর সামনেই।

আশ্চর্য, লিপস্টিক বুলানোটা যে এত আদরের, এত সাধনার ধন মনে করে সুন্দরী তরুণীরা তা স্বয়ম্ আগে কখনও বুঝতে পারেনি।

প্রিয়প্রসাধনরতা নাগরীদের বর্ণনা সে বহু সংস্কৃত কাব্যে পড়েছে। ছায়াছবিতে দেখেছে। একবার— একবার তা সে নিজের ওষ্ঠের উপর অনুভবও করেছে। প্রথম কদম ফুলের শিহরণ জাগানো সেই অনুভব।

আজ কিন্তু স্বয়ম্ নিজেই সেদিনের মমতা আর সাধনার সঙ্গে লিপস্টিক বুলানোর মিষ্টত্বটা উপলব্ধি করল। দিক্‌বধূর ওষ্ঠের উপর। বহু যত্নে, বহু মমতায়, বহু ব্যাকুলতা ভরা নিষ্ঠায় সে ফিল্ড গ্লাস চোখের উপর রেখে ঘোরাচ্ছিল।

ওপারে, চড়াইয়ের ওপারে সূর্য ঢলে পড়েছে। তার লালিমা ইভনিং ইন প্যারিসের 'অরেঞ্জ মিস্ট' অর্থাৎ কুয়াশামাখা কমলা রঙের লিপস্টিকের কথা মনে করিয়ে দিল। স্বাতী ওই ছোট্ট রঞ্জনী আধারটা ওকে দেখিয়ে বলেছিল— অরেঞ্জ মিস্ট, এই রঙের শেডটা বোধ হয় এদেশে এখনও আসেনি।

বলেই একটু মিষ্টি হেসে নিজের ঠোঁটে পরম আবেশে একটু বুলিয়ে নিয়েছিল।

আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আগুয়ান এলাকায় স্বয়ম্ যেমন করে মাথা হেলাচ্ছে তেমনি করে মাথা ডাইনে বাঁয়ে মৃদু হেলিয়ে হিসাব করে কমলা রঙের কুয়াশা নিজের অধরোষ্ঠে বুলিয়ে নিচ্ছিল স্বাতী। এখন সেটা মনে পড়ল।

নিমেষের একটু মন্ত্র গুঞ্জরনে স্বয়মের মনে হল স্বাতী নক্ষত্রেরই সন্ধানে সে এখন মাথা হেলিয়ে নিচ্ছে। আর দিগন্তে, দূর দিগন্তে বুলিয়ে নিচ্ছে...।

লিপস্টিক নয়, ফিল্ড গ্লাস।

এটুকু মিত্রশক্তির সবকটা আগুয়ান ইউনিট বুঝতে পেরেছে যে জাপানি সৈন্যদল ওদের আউট ম্যানোভার করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে সম্ভবত আছে 'জিফ'-এর দল অর্থাৎ জাপানিজ ইন্ডিয়ান ফোর্স।

সেটাই আরও বেশি চিন্তার কারণ। যদি ব্রিটিশ আর মার্কিন ফ্রন্ট লাইনের পিছনে দেশের লোক জানতে পারে যে সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ভারতীয় সৈন্যরা জাপানি সহায়তা নিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছে তাহলে ইংরেজ ও আমেরিকান পক্ষের আর রক্ষা নেই। ওদের সমরসম্ভার থাকতে পারে অফুরন্ত। কিন্তু সাপ্লাই লাইন লোপ পেয়ে যাবে। এমন কি গান্ধীজীর কংগ্রেস আন্দোলনেরও আর প্রয়োজন হবে না। যারা তাতে যোগ দেয়নি তারা পর্যন্ত রুখে দাঁড়াবে। কুইট ইন্ডিয়া স্লোগান আর শুধু স্বাধীনতার জন্য দাবির ধ্বনি থাকবে না। আসমুদ্র হিমাচল প্রত্যেকের মর্মবাণী হয়ে উঠবে।

যুদ্ধ চিরকালই চলে শুধু সৈন্য নিয়ে নয়। সরবরাহ বিহনে সৈন্য অচল। জাপানিরা অবশ্য দেখিয়েছে কেমন করে সাপ্লাই লাইন ক্ষীণ হয়ে গেলেও "লিভিং অন দি ল্যান্ড" জমির উপরে খেয়ে পরে লড়াই করা যায়। তারও আগে চীনেরা দেখিয়েছিল যে শুধুমাত্র তিন দিনের রসদ চাল বন্দুকের গুলির মতো 'ব্যান্ডোলিয়েরে' ঝুলিয়ে নিলেই পুরো সরবরাহ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের পৈতের মতো কাঁধের পাশ থেকে বুকের উপর ঝুলবে চামড়ার বেল্ট। তাতে বারোটা গুলি আর বারুদ রাখার ব্যবস্থা। মাস্‌কেটও তা থেকেই ঝুলবে। আর চীনেরা তার সঙ্গে যোগ দিল তিন দিনের খোরাক চাল। ব্যাস, এবার তুমি সাপ্লাই কোর নামক প্রতিষ্ঠান ভুলে যাও। যাকে বলে, নিজের ব্যবস্থা নিজে করে চরে খাও।

অবশ্য দায়ে পড়ে ইংরেজরাও এখন ভোল পালটিয়েছে। সাম্রাজ্যই টলমল, তায় ভোলকে সামাল দেবে কে? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটা আর্মি কোরের কম্যান্ড নেওয়া ছিল লাট-বেলাটের মতো এলাহি কারবার। প্রথমেই দখল করো একটা 'স্যাটো' অর্থাৎ প্রমোদ প্রাসাদ, অশ্বশালা, মোটর বাহিনী, আরও কত কি। সমস্ত 'কোর' খুঁজে সেরা রাঁধুনী আর সহিস আর স্যোফার হাজির করতে হবে। জেনারেল সাহেব উদয় হবেন মাত্র জন

তিনেক এ. ডি. সি. আর সাতাশ মণ নিজস্ব লটবহর নিয়ে।

হায়! সাম্রাজ্য আজ ধুকধুক করছে। তাই জেনারেল স্লিম জাপানিদের রুখতে যখন কম্যান্ড নিলেন তখন সঙ্গে মাত্র তিনখানা শার্ট, তিনটে খাকি প্যান্টালুন, একটা গুর্খা হ্যাট আর এক বান্ডিল বিছানা। একজন মাত্র পার্সোনাল স্টাফ যার হাতে একটি টমি গান আর একটা বাড়তি মেস টিন।

ঢাকাই কুট্টিদের রসিকতায় ভরা মাটির সরার মতো। খাবার থালা আর মাথার টুপি থুড়ি মুখের জল দু কাজেই লাগতে পারে।

আপাতত স্বয়ম্‌ও বলতে গেলে একখানা খুদে জেনারেল। অর্থাৎ নিজের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব। এবং সেই কর্তৃত্বের সাফল্যের উপর নির্ভর করছে এই সেকটরে মিত্র বাহিনীর অগ্রগতি। খবর আছে যে সামনের পাটকাই গিরিমালার কতগুলি চূড়াতে জাপানিরা মেশিনগান নেস্ট অর্থাৎ সংক্ষেপে এম. জি. বাসা বেঁধেছে। ঠিক পাখির বাসার মতো। সেগুলির স্থিতি ঠিক না করতে পারা পর্যন্ত সৈন্যদের এগোবার পথ ঠিক করা যাবে না। আর বোমারু বিমানও পাঠানো যাবে না। গহন পাহাড়ি জঙ্গলে ক্যামোফ্লাজের দরকারই নেই।

সেজন্যই কয়েকটা ও. পি. অর্থাৎ অবজার্ভেশন পোস্ট বসানো হয়েছে। সেগুলির দায়িত্ব আর সেখান থেকে প্রয়োজন মতো সামরিক স্কাউট বা সাদামাটা স্থানীয় লোক বা সন্ধানী লোক পাঠানোর দায়িত্বও তার। সে সযত্নে নিজের চাহনি বুলিয়ে নিচ্ছে দিগন্তে। বেশ হুঁশিয়ারিতে, শেষ হিসাব মতো সাবধানে।

চকিতে চকিতে খবরের প্রতীক্ষা আর খবরের সূত্র ধরে ধরে তার শিকড়ের মূল পর্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ অবসর সময় এসে হাজির হয়। তখন বসন্ত বাতাসের দমকা যেন নিকট অতীতের উপর থেকে যবনিকাটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে যায়।

এই নিষ্ঠুর নরককে পায়ে হেঁটে হেঁটে বা জীপের আছাড়িপিছাড়ি দোলায় দুলতে দুলতে হঠাৎ যেন পিছনে ফেলে আসা স্নিগ্ধ সমতল ভূমির প্রান্তরেখা দেখতে পায়।

সামরিক কাজকর্ম তো সাহিত্য আর জীবনকে একেবারে পুরোপুরি ঢেকে দিতে পারেনি। তাই ফিল্ড গ্লাস দিগন্তে বুলোতে বুলোতে কেমন করে লিপস্টিকের কথা মনে এসে গেল। কেমন করে ক্ষণিকের জন্য সরসতায় ভরিয়ে দিল মন।

না। স্বয়ম্ বেঁচে আছে। সামরিক শৃঙ্খলা আর সংযম আর দলগত নৈর্ব্যক্তিক ভাব তাকে নিঃশেষ করে দেয়নি।

এই একটি নিমেষ—যখন ধরণী আর অম্বর একাকার হয়ে চাঁদের হাসিতে স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে রয়েছে তখন, মাত্র একটি নিমেষ সে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। একটু পরেই হয়তো সন্ধানী দলের লোকরা না ফিরে এলে নিজেকেই বের হতে হবে। আর দেরি করা হয়তো ঠিক হবে না।

তার হঠাৎ কেন জানি না রামের বনবাসের কথা মনে এল। তিনিও কি এমনি করে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে কেবল বাহুবল ও মানসিক সাহসের উপর ভরসা করে ঘুরে বেড়াতেন?

তাঁরও তো শত্রুর অভাব ছিল না। রাক্ষস দানব যাদের বলা হত তারাও আসলে মানুষ ছিল। অলৌকিক কিছু নয়। তবে তারা আর্যদের শত্রু ছিল। বহু বিপদ ও বাধা সৃষ্টি করে জঙ্গলে বিচরণ করত। তবুও রাম এমন একটি সন্ধ্যায় দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিত-তারকা
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্।

আহা, অস্তরাগে রঞ্জিত সন্ধ্যা চঞ্চল চন্দ্র-কিরণের স্পর্শে হৃষ্ট হয়ে নক্ষত্র মেলে ধরেছে। এখন সে নিজেই আকাশ ত্যাগ করুক।

সাহিত্যিক মন একটা কোমল ভাবের আভাসে আনন্দে একটি রসস্নিগ্ধ ব্যাখ্যাও তৈরি করে নিল। আহা অনুরাগিণী সন্ধ্যা চঞ্চল হাতের পরশে অভিভূত হয়ে চোখের তারা মেলে ধরেছে। এখন সে নিজেকে উন্মোচন করুক।

আদিকবি বাল্মীকি কি তার স্বাতীর কথা ভেবে এই সন্ধ্যার বর্ণনা করেছিলেন? স্বয়ম্ গভীর ভাবে নিজের অন্তরে একথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আরও গভীরভাবে।

অথচ চোখের দৃষ্টি দূরবীনের ভিতর দিয়ে সামনে গভীর মনোযোগের দাবি করছে। মনের দৃষ্টি এখন

ঢেকে রাখতে হবে। সবার উপরে হচ্ছে এই মুহূর্তের কর্তব্য।

হালকা মেঘ চাঁদের আলোকে মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে। বর্ষা শীঘ্র এসে পড়বে। জাপানি বাহিনী দ্রুত ইম্ফলের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন রামচন্দ্র ও রামায়ণ নিয়ে ভাবার সময় নেই। সীতা আর স্বাতী দুই-ই সুদূর। এই মুহূর্তে সামনে আর সবার উপরে হচ্ছে কর্তব্য।

একটি নিঃশ্বাস ফেলে স্বয়ম্ সটান হয়ে দাঁড়াল। এই শ্লোকটির নূতন একটা অর্থ তার কাছে ফুটে উঠল। আহা সন্ধ্যার লালিমায় ছোপানো রঙে উঠতি সূর্যমার্কাদের চঞ্চল গতিবিধি তার সন্ধানী স্পর্শে খুশি হয়ে চোখের তারা খুলুক, নিজেদের সব গোপন প্ল্যান তার সামনে মেলে ধরুক। এই তো প্রকৃষ্ট সময়। ব্রহ্মদেশ, প্রাচীন কালের নাম সুবর্ণভূমি। সেই বর্মাই হচ্ছে তার কাছে স্বর্ণলঙ্কা।

অতএব সে রামচন্দ্রের মতই নির্ভয় হয়ে গভীর জঙ্গলে নিজেই প্রবেশ করবে। ওই তো মাঝে মাঝে চাঁদের আলোর সাহায্যে সে পথ করে নিতে পারবে। নিস্তব্ধ বনভূমিতে নিঃসঙ্গ স্বয়ম্ যেন রামচন্দ্রেব মতো নির্ভয়ে চলেছে।

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বত সন্নিরুদ্ধং
রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য।

মেঘ এলোমেলো ভাবে উড়ছে। কোথাও আকাশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ে ঘেরা নিস্তরঙ্গ সাগরেব মতো বনভূমি কী দারুণ গোপন রহস্য ঢেকে রেখেছে। মাল্যবান পর্বত নয়। মণিপুর কোহিমার উত্তরে পাটকাই বুম গিরিমালা।

তার স্কাউটবা কেউ এখনও ফিরল না! কে জানে হয়তো সবাই ধরা পড়েছে। অথবা পথ হারিয়েছে। কিন্তু আজ রাতের মধ্যে খবর পাওয়া দরকার। সে তার বেতারযন্ত্রগুলি গোপন গর্তে লুকিয়ে ঢেকে রাখল; আগে থেকে ঠিক কবা জায়গায় স্কাউটদের জন্য সাংকেতিক নির্দেশ রেখে দিল। তার পর যে অভিযানে সে বের হল কে জানে সেটা তার অগস্ত্যযাত্রা কিনা।

তারপর সে একেবারে একা। আমরা প্রায় সবাই নিঃসঙ্গ বন্দিদশার দণ্ডে—নিজেদের দেহের নিচে, মনের গহনে সঙ্গহীনতার জন্য—সারাজীবন ধবে দণ্ডিত। যার নিজের জীবন্ত তারুণ্যে ভরা মন আছে কেবল সে-ই একথা বুঝবে। মানবে যে জীবন ভয়ে এই যাবজ্জীবন নিঃসঙ্গতার দণ্ড বহন করতেই হবে। সৌভাগ্য এই যে সেই দণ্ডটা সদাসর্বদা নিজেরই সামনে ধরা পড়ে না। তাই তো আমরা হাসি, কাজ করি, প্রেমে পড়ি।

আজকের এই নিষুতি রাতের একক অভিযান ওর অভিজ্ঞতায় প্রথম নয়! সবচেয়ে বিপদজনকও নয় তবু আজ নিজেকে বড় একা মনে হল। বড় একা।

চকিতে মনে হল ছেলেবেলার কথা। চাঁদের মতো স্বল্প কিন্তু স্নিগ্ধ আলোর প্রদীপে ছেলেবেলায় শান্ত পল্লীগ্রামে ওর মা রামায়ণ পড়ে শোনাতেন। কৃত্তিবাসের মিষ্টি পয়ার কবিতা ওর কানে মধু ঢেলে দিত। মায়ের আদরের পাঠ সাহিত্যের অনুরাগকে বাড়িয়ে দিত। তাই তো বড় হয়ে সে সংস্কৃত মূল রামায়ণ পড়তে শুরু করেছিল। এবং কলকাতায় আত্মীয়-বাড়িতে চাকুরিপ্রার্থী বেকার জীবনে কখনও নিজেকে তুচ্ছ বা কৃপার পাত্র মনে হয়নি। বাল্মীকিব রসৈশ্বর্য তার মনে।

একবার হঠাৎ সে মায়ের কথা মনে করল। মা যদি বেঁচে থাকতেন হয়তো যুদ্ধের জন্য নাম লেখাতে আপত্তি করতেন না। হয়তো যা বলতেন তা বাল্মীকি মায়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হবার জন্যই রচনা করে গিয়েছিলেন।

শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ
গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্

বাছা আমার, শ্রেয় আর শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যাকুলতাহীন মনে নির্ভয়ে শুভপথে যাও; আবার ফিরে এসো।

সত্যি তো, সে তো একা নয়। তার মায়ের আশীর্বাদে ভরা দুটি আঁখিও এই আঁধার অজানা জঙ্গলে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে পথ দেখিয়ে। শুধু তো ইহলোকের প্রেয়সীই নয়, পরলোকের শ্রেয়সীও তো তার সঙ্গে, মনের গহনে অবিরাম সঙ্গী।

যে নিঃসঙ্গ বন্দিদশার ভাব তার একটু আগেই মনে এসেছিল তা ঘুচে গেল।

শুধু তাই নয়। সে যাদের শিক্ষা দিয়েছে, যারা তার নির্দেশে প্যাট্রল করতে, টহলদারি করতে বেরিয়েছে তারা সবাই তার অভিযানের সঙ্গী। এক সঙ্গে এক পথে না গিয়ে থাকুক, একই উদ্দেশ্যে একই পথের পথিক তারা। সে ইচ্ছা করলে শুধু তাদের দিয়েই ও. পি. পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি তৈরি করে নিজে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে পারত।

সামরিক শাস্ত্র অনুসারে সে স্বাভাবিকভাবেই নিজে পিছনে দূরত্বে থেকে কম্যান্ড পোস্টে ঘাঁটি পেতে বাকি সবাইকে তদন্ত করতে পাঠাতে পারত। 'রেকি' করবার অর্থাৎ নিরীক্ষণ করবার জন্য প্রাইভেটদের পাঠালেই চলত। ওয়াটার্লু যুদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন পঞ্চাশ মাইল দূরে রাজধানী ব্রাসেলসে ডাচেস অব বেলমন্টের পার্টিতে নাচতে নাচতে জিতেছিলেন এহেন সুবাদ আছে।

সে কথা তার কম্যান্ডের একজন তরুণ ইংরেজ প্রাইভেট মনেও করিয়ে দিয়েছিল। কেরামত আলি—বেসামরিক কিন্তু সংবাদ সংগ্রহে বিশেষ ওস্তাদ চাটগাঁইয়া মানুষটিও সে কাহিনি শুনে সেই অনুরোধই করেছিল।

কিন্তু নিচু চাপা স্বরে দৃঢ়ভাবে স্বয়ম্ বলেছিল, ওয়েলিংটনের মতো আমারও একটা ডান্সের চান্স এসেছে। খাস নিপ্পনীদের নূপুর নিক্কণের তালে তালে। ওয়েল। ওয়েল।

অতএব সে একেবারে আগুয়ান এলাকাতেই নিজের কম্যান্ড পোস্ট খাটিয়েছিল। তার নিজস্ব অভিমত হচ্ছে যে তার প্রথম কর্তব্য নিজের দলের লোকদের যথাসম্ভব পুরো ট্রেনিং দেওয়া। আর দেওয়া জয়ের ভরসা। একজন সৈনিক বা সেনাদলকে এর চেয়ে বড় কিছু দেবার নেই।

সেই বড় দান স্বয়ম্ তার দলকে নিঃশর্তে উপহার দিয়েছে।

আর নিজেকে শিখিয়েছে যে কম্যান্ডারকে এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখান থেকে সে দলের আর যুদ্ধের গতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিলেতে সাম্রাজ্যবাদের বিশাল ছাতার তলায় শেখানো হয়েছিল কী করে মাটির নিচের কুঠুরি, চোরাকুঠুরি 'সেলার' থেকে একটি ব্যাটালিয়ন চালনা করা যায়। কিন্তু সে নিজেকে শিখিয়েছে কি করে মিলিটারি কমেন্টেটার না হয়ে কম্যান্ডার হওয়া যায়। যুদ্ধের ধারাবিবরণীর পোস্ট-অফিস অথবা ভাষ্যকার হবে না সে। যুদ্ধের ধারা, মোড় ঘুরিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে তার হাতে।

সে সঞ্জয় হবে না।

হবে অর্জুন।

।। সাতাশ ।।

নিচু ঝোপের লতাপাতা দু হাতে সরাতে সরাতে স্বয়ম্ নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চাঁদ আস্তে আস্তে ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু অসংখ্য তারা আর মিটিমিটি জোনাকি যেন ভেলভেটের মতো নরম আকাশকে কাশ্মীরী চুমকির কাজে ভরিয়ে দিয়েছে। টিলাগুলি গাছে আর লতাগুল্মে ভরা। মাঝে মাঝে বড় পাথরের চাঙড়। এখানে সেখানে লিলির মতো চেহারার ফুল। বুনো বাসন্তী সুবাসে বাতাস বেশ মিঠে মিঠে লাগছে।

বনের নৈশ জীবন কিন্তু চঞ্চল। হঠাৎ হঠাৎ অজানা পাখি ডেকে উঠছে। হঠাৎ কোনও ছোট পশু প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। আর মাথার উপরে গাছে বসে তক্ষক সাপ ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, ও কে? ও কে?

একমাত্র স্বয়ম্ই নীরব। কোনও প্রশ্ন, কোনও চলমান প্রাণের লক্ষণ প্রকাশ করা চলবে না।

একটু থেমে সে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে নিল। হঠাৎ যেন ভয়ের মতো কিছু একটা অনুভূতি তার শিরদাঁড়াকে ঠাণ্ডা করে জমিয়ে দিল। যেন সে চারিদিকে সাজানো শত্রুর গুলির সামনে নিজেকে চাঁদমারির মতো মেলে ধরেছে।

কিন্তু নিজেকে সটান করে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। যেন এখনই সে একটা নূতন সূর্য খুঁজে বের করতে পারবে। নতুন সাহস নতুন বিশ্বাসে ভরা তেজস্বী সূর্য এই নিস্তব্ধ নিঃসহায় আকাশে হবে তার নিজস্ব আবিষ্কার।

নিঃসন্দেহে একটা কিছু অশরীরী ব্যাপার যেন এইখানে কাছেপিঠে কোথাও ঘটে গেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে ধরাছোঁয়া যায় না তার হিসাব যেন সে ষষ্ঠ একটা অদৃশ্য অজ্ঞাত বোধ দিয়ে ধরতে পারছে।

হ্যাঁ, ঠিক।

জংলী লতাপাতার উপর পা পড়তেই ক্যাঁচ করে কী রকম একটা আওয়াজ হয়েছিল।

ঘন অন্ধকারের ভিতরেও নজর করতে অভ্যস্ত চোখে সে একটি দুমড়ানো পোঁটলা দেখতে পেল। প্রায় পাহাড়ি গেরি মাটির মতো রঙের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু পোঁটলাটি কী?

কোনও ছোটখাটো 'মাইন' নয়তো? শত্রুর নজর এড়িয়ে তাকে অতর্কিতে ঘায়েল করবার জন্য কাপড় মুড়ে রেখে গিয়েছে হয়তো।

খুব সাবধানে চার দিক দেখে স্বয়ম্ একটু এগিয়ে গেল।

এবং পোঁটলাটি দেখে সে পাথর বনে গেল। যেন মাটিতে ওর পা দুখানা পুঁতে ওকে প্রস্তরীভূত মূর্তি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শত্রুর হাতে খুন হওয়া একটি মৃত দেহ। যুদ্ধে নিহত নয়। বেসামরিক স্থানীয় লোকের পোশাকে প্যাট্রল করতে বেরিয়েছিল আর জাপানি হাতে ধরা পড়েছিল। তারপর নানাবিধ প্রক্রিয়ার অত্যাচার—যা এখনও অন্য জগতে প্রচলিত নয়—করে শেষ পর্যন্ত মুণ্ডটা তাচ্ছিল্যভরে এক কোপে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। গোটা ধড়খানা নিয়ে মরার সম্মানও যেন সে না পায়।

এই প্রথম সে ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ডা রক্তে খুনের মৃত দেহ দেখল। যুদ্ধে মৃত্যুর জন্য ভাববার বা ভয় করবার সময় থাকে না, প্রয়োজনও থাকে না। সে মৃত্যু সহজ, ভীতিপ্রদ নয়। কিন্তু এমনভাবে তিলে তিলে তাল তাল অত্যাচার করে হত্যা মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভিন্ন বস্তু।

জাপানি সামরিক শাস্ত্রে এই ব্যবহারই প্রচলিত। শত্রুপক্ষের যে ধরা পড়ে, যে হারাকিরি করে নিজের সত্তা ও বিজয়ীর সমস্যা নিজে থেকে শেষ করে না দেয় তার প্রতি অতি মানী জাপানি জাতির অসীম ঘৃণা। সে বাঁচার অযোগ্য। তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখা একটা বিরাট অপচয়। যে ইহলোকে পৌরুষের সব চেয়ে চূড়ান্ত অপমান মাথা পেতে নিয়েছে, পরলোকে তার আত্মা শুধু অভিশাপই পাবে।

তার উপর পাশ্চাত্ত্য শক্তি শতাব্দী ধরে প্রাচ্যের আত্মাকে দলন আর সম্পদকে শোষণ করেছে। তার প্রতিশোধে একটা পুণ্যও আছে।

কিন্তু ওই মুণ্ডহীন দেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, সময় নষ্ট করা চলে না। অথচ তার শেষ সৎকার একটু কিছু অবশ্য করা উচিত। তার দেহ পাশ ফিরে পড়ে আছে। হাঁটু দুটো বুক পর্যন্ত উঠানো। হাতের পাতা দুটো, দুটো গালেব পাশে আলগোছে রাখা। কাপড়ের টুপিটা যেটা এককালে মাথায় ছিল, সেটা পাশে পড়ে আছে। যেন মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সে জন্মের আগের ভ্রূণের অবস্থাতে ফিরে গিয়েছিল। যে মৃত্যু তাকে আঁকড়িয়ে ধরেছে তাকে পিছু ফিরে, জীবনের সবকটা পরিচ্ছেদ অতিক্রম করে সেই মৃত্যুকে এড়াতে চেয়েছিল।

স্বয়ম্ অপরিসীম মমতায় এক টুকরো মাটি আর দুয়েকটা জংলী ফুল সেই দেহের উপর ফেলে দিল। মুখ নেই, কিন্তু দেহ যেন একটি বিদায়বাণী বহন করছে। স্বয়ম্‌কে ওপার থেকে দেখছে। কে জানে হয়তো বা আহ্বান করছে।

কিন্তু না। তা হতে পারে না। নিঃশব্দ পৃথিবীর প্রতিকৃতি আব নিঃসঙ্গ আকাশের আত্মা দুজনকেই হাতছানি দিয়ে কর্তব্য করে যেতে বলছে। দুটো জীবনের দুটো পথে এক হয়ে মিলে যেতে পারে না।

সে শুধু বলল, আমি এগিয়ে চললাম। আমার কাজে। তুমিও তো তোমার কাজেই—যেটি আমারও কাজের অংশ—এগিয়ে যেতে যেতে দেহত্যাগ করেছ। কিন্তু আমার ধর্মে যা বলে তাই তোমাকে শুনিয়ে যাচ্ছি—তোমার আত্মাকে খর্ব করতে, ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তোমার উৎসর্গের মধ্যে তুমি শাশ্বত। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

সব জীবনের যা অলঙ্ঘ্য পরিণতি তাই তোমার হয়েছে। কিন্তু তুমি কর্তব্যের মধ্য দিয়ে জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে গেছ।

জীবন মানেই যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু। সুখশয্যায় হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে বা রোগযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে স্তব্ধ হয়ে যাবার চেয়ে বড় পরিণতি তোমার হয়েছে। তুমি সার্থক।

এগিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে স্বয়ম্ ভাবল যে মৃতের সনাক্ত করা সম্ভব কিনা দেখা দরকার। সামরিক কাগজপত্রে 'জাপানি এলাকায় নিখোঁজ' তালিকায় থাকার চেয়ে মৃতের তালিকায় থাকাটা আত্মীয়স্বজনের কাছেও স্বস্তি।

সনাক্ত করবার কাগজ খোঁজ করতে গিয়ে স্বয়ম্ চমকিয়ে উঠল। একি!

এ যে তারই নিজের দলের বেসামরিক স্কাউট কেরামত!

কেরামতের মতো সফল সন্ধানী বোধহয় কেউ হবে না। সারাজীবন সে মিলিটারিদের সঙ্গে ওঠা বসা করেছিল। তাদের মতিগতি নিজের নখদর্পণে। অথচ বেসামরিক নিজে। চাটগাঁয়ের লোক বলে লুসাই মগ বর্মী, পাহাড়ি মঙ্গোলীয় ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মিশে যেতে পারত। আর কী জীবন্ত চরিত্র তার!

কেরামতকে ভোলা অসম্ভব। এমন কি অসম্ভব তার জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলিও ভুলে থাকা। স্বয়ম্ নিমেষের জন্য কেরামতের নিজের মুখে বলা অতীতের দিকে মনকে ঘোরাল।

মন ঘোরাতে গিয়ে পৌঁছল একেবারে মেসোপটেমিয়ায়।

এই সন্ধ্যাসূর্যের আকাশের মতো সেখানকার আকাশও লালে লাল ছিল। তবে সূর্যের আলোয় নয়। কামানের আগুনে। গ্যালিপলিতে সৈন্যদের ল্যান্ডিং চলছে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে অন্য আকাশে সূর্য ডুবে যাবার পর আর আলো থাকে না। চাঁদ অবশ্য একটু-আধটু মায়ার পরশ বুলিয়ে যায়। আর তারাগুলি সুবিধামত মিটিমিটি হাসে। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার আকাশে স্টারশেলগুলি মিটমিটি হাসে না। হাউইবাজির মতো তেড়েফুঁড়ে আকাশে উঠে সব আলোয় আলোময় করে দেয়। দুশমনের হদিস দিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে স্নাইপার চালায় গুলি। গোলন্দাজ চালায় গোলা।

সেই আজব আকাশের নিচে হাজির হয়েছিল কেরামত। পেটের দায়ে, বেকারির জ্বালায়।

ম্যাট্রিক ফেল কেরামতের কেরানির চাকরিও জুটল না। মামা নেই, মুরুব্বি নেই। পিছু টানও নেই। এদিকে যুদ্ধের বাজার গরম। মেসোপটেমিয়াতে বাবুর্চি চালান দিচ্ছে সরকার চাটগাঁ আরাকান থেকে। কেরামত রঙরুট অফিসে গিয়ে বাবুর্চির কাজের জন্য নাম লিখিয়ে দিল। কী হবে মিছিমিছি আরও বই ঘাঁটাঘাঁটি করে! ইউনিভারসিটি করায় না পাস। বাবুরা দেয় না চাকরি।

কেরামতের কথিত কাহিনি।

যেমন তার ভাষা, তেমনি তার ভাষ্য।

এবং তার কাহিনি অকপটে সে স্বয়ম্‌কে খুলে বলেছিল। তার নিজের হাতে বাছাই করা খবর—খোঁজা আর জোগাড় করার ওস্তাদ এই কেরামত।

বেকার বসে থাকার চেয়ে বাবুর্চিগিরি অনেক ভালো। গাঁয়ের আর পাঁচটা ভাই-বেরাদর কলকাতার হোটেলে কাজ করে। কেরামত তাদের রান্নার তালিম দেওয়া দেখেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে সে বড় হবে। সে যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে।

তাই সে বিলেত না হোক, বিলেতের কাছাকাছি যাবে। সরকারি মাইনে, মোটা বকশিস, মিলিটারি উর্দি, আর গোরা পল্টনের ভাষা উর্দু। জীবনে আর কী চাই।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সারা চাটগাঁ আরাকান খুঁজলে কেরামতের চেয়ে ওস্তাদ বাবুর্চি পাওয়া যাবে না। সমস্তটা রেজিমেন্টাল স্ট্রেংথ অর্থাৎ নাম লেখানো তালিকায় তার মতো চৌকশ বাবুর্চি আর ছিল না।

শুধু তো রান্না নয়। রসের রসায়ন, রেসিপির অদল বদল করে গোরা মিলিটারির মর্জি যোগানো রান্নার চেয়ে অনেক বড় বিদ্যা। সে অবশ্য ওডহাউসের ইংরেজি বই পড়েনি। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার ইংরেজ মিলিটারি মহলে তার কদর জীভ্‌সের চেয়ে কম ছিল না।

গোরা মিলিটারি অফিসাররা যখন 'রাম' মদের নেশায় মজে যায় তখন বলে সে নাকি একাধারে বযসা আর বাবুর্চি।

এদিকে তার ম্যাট্রিকের বিদ্যায় যত মরচে পড়তে লাগল খানা বানানো আর খিস্তি হজমে তত হাত পাকাতে লাগল। টমি মহলেই শুধু নয়, গোরা অফিসার মহলেও খিস্তি ফোটে খইয়ের মতো। কেরামত অদ্ভুতভাবে সেসব হজম করতে শিখেছিল। তখনও গোরা প্রফেশনাল আর্মিতে শিক্ষিত তরুণদের আমদানি বিশেষ হয়নি।

কেরামত নিজের এই নতুন জীবনটা মেনে নিয়েছিল। একে রাজার জাত, তায় মহারাণীর মনসবদার। নিজের দেশেই বড় বড় মহাশয় লোক। রাজাভুজোরা হাতজোড় করে থাকে। সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না সাহেবরা তাদের বসবার হুকুম দেয়। দেশে গাঁয়ে চা বাগিচায় সে দেখেছে যে যত ভদ্দর বা বুড়োই হোক না কেন, কোনও লোক সাদা আদমীর সামনে দিয়ে খোলা ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে পারবে না।

আইনের বাইরের নিয়ম।

সেটা নাকি মহারানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল।

তা মহারানী কোন্ না কোন্ বছর পনেরো আগে সগ্‌গে চলে গেছেন। কিন্তু তার রাজপাট তো চলছে সমান ঠাটেই। কাজেই গাঁয়েভুঁয়ে ওরা গোরা মিলিটারিদের মহারানীর মনসবদারই বলে থাকে এখনও।

সেই মনসবদারের দল যদি মেস নাইটে একটু খিস্তি দিয়ে 'সেভারি' 'স্ন্যাক্স' প্রভৃতি চুটকি খাবারগুলোকে একটু খাস্তা করে তুলতে চায় কেরামত তাতে আপত্তি করবে কোন্ সাহসে?

সে তো আর্মি মেসের বাবুর্চি হয়ে নাম লেখানোর সময় ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করার কথাটা বেমালুম চেপে গিয়েছিল। লেখাপড়া জানা বাবুর্চি নিশ্চয়ই স্বদেশী এমন একটা সন্দেহ হবে। শুধু কি বেশি মাইনের আশাতেই ফিল্ড সার্ভিসে সে এসেছে! আলবত তাহলে স্পাই। অনেক বাঙালিই গোপনে, অন্তত মনে মনে দুশমন জার্মানকে মদত দেয়।

তাছাড়া কে না জানে যে তুর্কির খলিফার উপর দুনিয়াসুদ্ধ মুসলমানের মনে মনে ভক্তি আছে। তিনি আবার জার্মান দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তে নেমেছেন। সে রকম অবস্থায় লেখাপড়া জানা বাবুর্চি কেরামতের যদি টিকটিকির কাজ করবার মতলব থেকে থাকে! এরকম সব সন্দেহ এড়িয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

অতএব সে সেজে গেল যাকে বলে একেবারে আনপড় আদমী।

এমন সময় খাস বিলেতের আমদানি লেখাপড়া জানা কিছু গোরা অফিসার মেসোপটেমিয়ায় ইংরেজ সৈন্যদলে চালান এল। তাদের হাঁকডাকের মধ্যে কেরামত নতুন একটা সভ্যতার ইশারা পেল।

তারা যখন আদর করে তাকে কেরামতের বদলে ক্রাম বলে ডাকতে শুরু করল তখন সে প্রায় বেহেশ্‌তে পৌঁছে গেল।

কিন্তু সে সুখটুকু কপালে সইল না।

তুর্কি আর জার্মান সাঁড়াশি অভিযান পিনসার মুভমেন্টের জাঁতাকলে পড়ে ইংরেজ সেনার তখন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। যত শত্রুর হাতে মার খায় ততই ওরা খিদমদ্‌গারদের উপর মারমুখো হয়ে ওঠে।

মনে মনে তাও মেনে নিল ক্রাম। সাহেবরা মার খাচ্ছে! সামনে বিরাট জলরাশি। তাতে ওদের ভরাডুবি হতে বসেছে। দেশে গাঁয়ে বান ডাকলে কলাগাছের গুঁড়ি ভরসা করে ওরা জলে নামে। আর এই তুর্কি নদীগুলিতে খেজুর গাছ পর্যন্ত ভাসে না। ক্রাম মনিবদের দুঃখে খুবই দুঃখ পেত। চাকরিতে টিকে থাকার উপায় এনে দিল এই সহানুভূতি।

তাই সে ওদের খোশ মেজাজে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সেটাই যে তার জীবন।

রসদ সরবরাহ যখন প্রায় বন্ধ হয়ে এল তখন সে ঘোড়ার মাংস দিয়ে হরেকরকম কাবাব বানিয়ে অফিসারদের একদিন তাক করে দিল। এমনই তাক করে দিল যে তারা খিস্তি করতে ভুলে গেল।

ক্রাম মনের খুশিতে সেদিন খাবার টেবিলে সাজিয়ে রাখা স্কচ হুইস্কির গ্লাসগুলিতে একটু বেশি করে তরল হজমি জল ঢালার ব্যবস্থা করবে ভাবছিল।

এমন সময়—এমন সময় খাস ককনী ইংরেজিতে একখানা চোস্ত খিস্তি বেরিয়ে এল। এস ও বি অর্থাৎ কুকুরীর ছানা নাকি সূপের বদলে উটের পেচ্ছাব পরিবেশন করেছে।

গালাগালির বন্যায় হাবুডুবু খেতে লাগল কর্ণফুলী নদীতে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ক্রাম।

তবু সে ডুববে না। কারণ সাহেবরা গ্যালিপোলিতে পারে নামতে গিয়ে ডুবতে বসেছে। এখন মরণ যদিও নির্ভর করছে তুর্কিদের উপর, তার নিজের উপর নির্ভর করছে সাহেবদের জীবন।

সে মাটি পর্যন্ত নুয়ে সেলাম করে বলেছিল, হুজুর গরিব পরবররা যদি একটা উট কোরবানি করে দিতে পারেন তাহলে তার পেচ্ছাব নয়, পায়ার গোস্ত দিয়ে এমন খানা বানাতে পারে যার কাছে বেহেস্তের নাস্তাও কিছু নয়। আর, আর হুজুরদের পেয়ারের বুলি বীফ তো তুলনায় মাটির ঢেলা।

সে যাত্রা মনিবদের মান রক্ষা হয়নি। কিন্তু জান বেঁচেছিল। অনেকটা ক্রামের কেরামতিতে। কারণ পালাবার সময়ও সে তাদের উপোস থাকতে দেয়নি। তারা খেয়েছিল, খুশি হয়েছিল আর অবশ্যই প্রাণ ভরে খাস ককনীতে গালমন্দ করেছিল।

মোট কথা যুদ্ধ শেষ হবার পর সে চাকরিতে পাকাভাবে বহাল হল। তখন তার বয়স ঠিকমতো

লেখানোর দরকার হল। এদিকে মেঘে মেঘে এর মধ্যেই বেশ বেলা হয়েছিল।

ততদিনে তার বুদ্ধিসুদ্ধিও পেকেছে। ঠিক বয়স লেখালে ঠিক সময়ে 'পেনশন' নিতে হবে। অথচ যুদ্ধটা যখন নেই আর জীবনটা আছে বহাল তবিয়তে, তখন মিলিটারি নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সে রিটায়ার করাটা নেহাত বোকামি। ওকে তো আর হাতে-কলমে লড়াই করতে হবে না।

কাজেই সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ার কথা যেমন চেপে গিয়েছিল তেমনি বয়সটাও ভুলে গেল। দেখাল যে সে শিবঠাকুরের সমবয়সি। রেজিমেন্টাল ক্লার্ক অম্লান বদনে খাতায় লিখে নিল যে বয়স ঠিক করা গেল না। সাপোজড্ টু বি সেম এজ অ্যাজ ওয়ান সিভা ইন হিজ ভিলেজ।

মেস ম্যানেজার থেকে রেজিমেন্টাল কর্নেল সবাই ওর তৈরি খানায় এত খুশি যে শিভাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তস্মিন কথাটার মধ্যে আসল মাল হচ্ছে পেটে। যার জন্য লোকে সব কিছুই করে। নিজে মরে, অপরকে মারে।

কেরামতের সাহেব দিয়ে ভরা আর সেলাম দিয়ে ঘেরা যৌবন কালটা কাটছিল ভালো।

অবশ্য নিজের জীবন যৌবন সে-ই আটপৌরে মামুলি বাঁধি গতে বাঁধা।

তবে হ্যাঁ।

সে যৌবনের নমুনা এককানা দেখেছিল বটে এক সময় সেই বর্মা মুলুকে। রেঙ্গুনে।

তা-ও লড়াইয়ের কল্যাণে। যুদ্ধ না হলে যৌবন খোলে না। আর যৌবন না হলে জীবনটাই বরবাদ। ধনও তার সঙ্গে 'বেরথা'। ধন তো আর কেউ ধুয়ে খায় না।

কিন্তু রেঙ্গুনে সে দেখেছিল যে জীবনটাকে খরচের খাতায় তুলে রেখে যৌবন আর ধন দুটো বস্তুই ধুয়ে খাওয়া যায়।

সেখানেও সাহেব মনিবদের জীবন আর মান নিয়ে টানাটানি শুরু হল। জাপানি হামলার ফলে সামাল সামাল রব উঠল। পালাবার পথও রইল না।

এমন সময় রেঙ্গুনে উড়ে এল এক ঝাঁক উড়ুক্কু পায়রা। পায়রা নয় ঠিক, আসলে নাম ফ্লাইং টাইগারস। আমেরিকান ভাড়াটে পাইলট-ফাইটার। ঠিক যেন কোনও হলিউডের ছবি থেকে সদ্য নেমে এসেছে। গায়ে জিপ ফাসেনার লাগানো চামড়ার জ্যাকেট। গরম লাগলে হরেক রঙের হাওয়া শার্ট। পায়ের গুলি পর্যন্ত উঁচু বুট আর গলায় চকরাবকরা নকশার রংদার রুমাল।

সব চেয়ে বড় কথা যে তাদের আঁটসাঁট হিপ পকেটে সব সময় থাকে চ্যাপটা লাল পানির বোতল। আর দিল নামক খোলামেলা দরিয়াতে ভাসে ফূর্তির লাল ডিঙা।

বর্মার আর্মি মেসে ঝাঁকে ঝাঁকে বোতল খোলার ফাঁকে ফাঁকে ক্রাম কিপলিং বলে কোনও এক সাহেবের কেতাবের কথা প্রায় শুনত। সে নাকি লিখেছে যে ধবধবে সাদা ঝাঁঝরা ব্লাউস আর গরগরে রাঙা রেশমী লুঙ্গি পরা বর্মী মেয়েরা রূপের ঠাটে রেঙ্গুনের হাট মাতিয়ে রাখে। ওই কেতাব পড়েই বোধ হয় এই উড়ুক্কু বাঘের দল বর্মার উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। লড়াই কিনা।

ক্রামের তখন মনে পড়ছিল যে ইস্কুলেই সে কোনও কবির একটা লেখা পড়ে খুব মজা পেয়েছিল। লড়াই আর পিরীত এই দুটো চীজের বেলা সব কিছুই চল।

তাতে বেইমানি হয় না।

ওদের জীবনটা নিজের। সাবালক হবার পর বাপ-মায়ের আর কোনও এক্তিয়ার থাকে না সাহেবসুবোদের সমাজে।

ওদের যৌবনটাও তাই। লড়াইয়ের কারবারে যাকে বলে ফেল কড়ি, মাখ তেল। নগদ বিদায় দাও, তোমার হয়ে লড়ে যাব। মান্যিরা তো আর মিশনারি রূপে হাজির হয়নি।

কিন্তু ধনের বেলায় নগদ বিদায়টা মোটেই ফেলনা ছিল না। যে দেশে চাল বিকোয় টংকা প্রতি আধ মণ সেখানে উড়ুক্কু মার্কিনরা মাইনে পায় মাসে সোয়া তিন হাজার। উপরি বোনাস মাসে আড়াই হাজার। অবশ্য গোটা ধনটাই উড়ুক্কুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হয়ে যেত যাকে বলে এক নিঃশ্বাসে হাওয়া।

তবু তার মধ্যে কোনও বেইমানি ক্রামের নজরে পড়েনি। ওরা নিশ্চয়ই ভাবত জীবন যৌবন ধন মান এই চারটের মধ্যে টিকিয়ে রাখার মতো মাল শুধু শেষেরটা। প্রথম তিনটেই খরচের খাতায় পাকা রসিদে নথি করা ছিল। কালস্রোতে ভেসে যাবার জন্য।

ফেঁসে গেল অবশ্য ক্রামের নিজের মনিবের দল। তাও বেইমানি করে।

না হলে কিনা জার্নেল সাহেব একটা পাহাড়ের শিরদাঁড়ায় চড়ে শুধু বাইনোকুলারে দেখে আর সরেজমিনে তদন্ত না করেই নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

জার্নেল মানে জেনারেল।

কোথায় দেখবেন দুশমনের গোপন প্ল্যান আর ফন্দিফিকির। তার বদলে দেখলেন মেঘের সারি-সারি ঢেউয়ের উপর কালো আর বেগুনি খেলা। মন এত খুশি হয়ে গেল যে ভাবলেন এই রঙিন সময়টুকু হেলাফেলা করবেন না। তাই যুদ্ধের অপারেশন অর্ডার লিখে ফেললেন এক লহমায়।

টেবিল নেই, অর্ডারের ফর্ম নেই। কিন্তু খেয়াল খুশি বলে তো একটা জবর চীজ আছে। জার্নেল সাহেব তার এডিকম্প সাহেবের পিঠটাকে টেবিলের কাজে লাগালেন। এ. ডি. সি. হাঁটু গেড়ে রইল। একটা চোতা কাগজের টুকরোতে তিনি ২৩ নং ইন্ডিয়ান ডিভিশনকে অর্ডাব লিখে দিলেন যে জাপানি সৈন্যদের থামাও, হারাও আর ভাগাও।

মনের খুশিতে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে হেড কোয়ার্টারে এসে তিনি কেরামতের বানানো সেভারি চুট্‌কি টুকরো চাটের সঙ্গে খেয়ে নিলেন প্রকাণ্ড এক গ্লাস রাম।

জার্নেল সাহেবের নাম ছিল জেনারেল সেভারি। আর কেরামতের নাম ছিল ক্রাম।

ইস্কুলে সে পড়েছিল যে বাংলায় কানু ছাড়া গীত নেই। কেরামতের জীবন সার্থক হয়ে উঠেছিল এটুকু জেনে যে ক্রাম ছাড়া মোবাইল আর্মি মেস অচল। অর্থাৎ গোঠে গোঠে শুধু ক্রামের বানানো খানাই গোটা ক্যাম্পের পছন্দ।

এ হেন গোষ্ঠ বর্মায় সিতাং নদীর তীরে একেবারে শুকনো মাঠে পরিণত হল। জাপানি চাবুক নয়, বন্দুকের ভয়ে ইংলিশ বাহিনী ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো চার ঠ্যাঙে পালাচ্ছে।

জিন দিয়ে যারা ছোটা হাজরি শুরু করত তারা তেষ্টায় ছটফট করতে করতে আঁজলা ভরে সিতাঙের জল খেতে লাগল। ক্রাম কী নাস্তা বানাচ্ছে তা দেখবার জন্য অপেক্ষা করল না। সাহেবদের কাছা-খোলা হয়ে পালানোর উপায় ছিল না। কিন্তু পাতলুন খুলে শুধু কাছা সম্বল করে—যে কজন বেঁচে ছিল অনেকেই কাঠের পাটাতান না হয় কলাগাছের গুঁড়ি সম্বল করে ভবনদীর জ্যান্ত পারে চলে আসবার চেষ্টা করল।

এদিকে চুপিসাড়ে জাপানি সেনার এগিয়ে আসা ঠেকিয়ে রাখার জন্য জেনারেল সাহেব রাতের আঁধারে সবে ধন সাঁকোটি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পিছনে ইঁদুরের মতো জাঁতাকলে আটকিয়ে রইল নিজেরই তিন তিনটে ব্রিগেড।

তাদের পিছনে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে জাপানি সৈন্য। সামনে খলখল করে হাসি মশকরা করে লুটোপুটি খাচ্ছে সিতাং নদীর দুরন্ত ঢেউ।

এই প্রথম জীবনের জন্য আফসোস করল ক্রাম। জীবন বড় আদরের। তেলে জলে লালিত। তার চেয়ে আরও বেশি আদরের হচ্ছে পেনশন। কিন্তু যে সাহেবদের সেবায় সে অতীতে বয়সটার দৈর্ঘ্য ছোট করে দেখিয়েছিল আর পেনশনের ঘুনসিটা লম্বা করে টানছিল সেই সাহেবরাই যে বেশির ভাগ ওপারে। ভব নদীর অথবা সিতাং নদীর।

যারা এপারে আটকিয়ে গিয়েছে তারাও ভাগবা হয়েছে বনে-জঙ্গলে। একেবারে লোপাট যাকে বলে। ক্রাম জানত যে তাকে আর ভোরে কারও জন্য হাজরি বা ছোটা হাজরি বানাতে হবে না। তার ময়ূর সিংহাসন যে মেস ট্রাক অর্থাৎ খানা রসদের লরি তাতেও খাবার জিনিসপত্র কিছু বাকি নেই।

শুধু বাকি কয়েকটা স্কচের বোতল।

সাহেবরা যে চার অক্ষরের কথাটা আর যে চারপেয়ে মহিলা জন্তুটির কথা একসঙ্গে জড়িয়ে স্কচে ভেজানো আধো-আধো স্বরে আদর করে প্রায়ই ওকে ঝাড়ত সেটা মনে পড়ল। শুকনো চেখে রঙিন জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রামের মাথায় বুদ্ধি এল। সে বেচারা জন্মে কখনও হুইস্কি খায়নি। শরিয়তের বারণ। তার উপর মেসের তদারকি লেফটেনান্ট সাহেবের কড়া নজর। আজ সেই স্কচের বাচ্চা আর হিসাব নিতে আসবে না।

কিন্তু সাহেবরা যে কত চাঙ্গা হয়ে উঠত এই স্কচের কল্যাণে তা ক্রাম জীবনভোর দেখেছে। এখন ভবনদীর পারে দাঁড়িয়ে সিতাঙের ওপারে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাহেবরা নেই। কিন্তু তাদের মাল আছে।

তা-ই সই। সেলাম সাহেব—জীবনে এবং মরণে।

পুরো বোতল তৃষ্ণার জলের মতো শেষ হয়ে গেল। নিমেষে।

আরও দুটো বোতল তুলে নিয়ে বগলের তলায় চেপে ধরল। এডেনের মরুভূমি আর ফ্রন্টিয়ারের পাহাড়চূড়ায় বিহার করতে করতে সে সাঁতার কাটতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দুই বগলে দুই বোতল নিয়ে চিৎ সাঁতারের ভঙ্গিতে সিতাং নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে কেমন করে পশ্চিমপারে এসে হাজির হল তা কাউকে বলতে পারবে না।

যেন শবাসনে কোনও যোগিরাজ পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় ভাসমান ছিল।

আশ্চর্য! নদী পার হবার সময় রোদে পোড় খাওয়া আর শত্রুর তাড়া খাওয়া অনেক ইংরেজ বহু দূরে গাছের চূড়ায় লুকানো জাপানি স্নাইপারের গুলিতে সাবাড় হয়ে গিয়েছিল।

ক্রাম কিন্তু শবাসনে কারণবারির মন্ত্রে নতুন দীক্ষিত তান্ত্রিক। তাকে দেখে কোনও স্নাইপার না করল সন্দেহ, না চাঁদমারি প্র্যাকটিস।

এর পর ক্রাম মর্মে মর্মে বুঝে নিল যে সাহেবরা বৃথাই হুইস্কির প্রশস্তি গায় না।

কিন্তু সাহেবদের প্রশস্তি সেই সময় থেকে সে ছেড়ে দিল। গ্রামে ফিরে এসে খুলে ফেলল ক্রাম নামের খোলস। অবশ্য জীবন তাকে ছাড়ল না।

জাপানি হামলা হাজির হল আরাকানে চাটগাঁয়। সে পুবে পশ্চিমে বিদেশ-বিভুঁয়ে লড়াই দেখেছে নিজের চোখে, হাতের কাছে। সে কী করে এখন নিস্তরঙ্গ নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে যাবে?

সাহেবরা হারছে হারুক। কিন্তু তা বলে দেশটা যাবে ওই বেঁটে বজ্জাতদের বুটের তলায়? যাদের সে সিতাং নদীতে কলার ভেলা ছাড়াই কলা দেখিয়ে এসেছে?

অসম্ভব! আসল যুদ্ধ যখন দেশের সীমানায় পৌঁছে গেছে সে ফৌজিতেই কাজ নেবে। অবশ্য আর্মি মেসে মশা তাড়ানোতে আর সে থাকবে না।

কাজের মতো কাজ হচ্ছে খবর জোগাড়।

সেই সময় সে স্বয়মের নজরে পড়েছিল। সে আজ কিন্তু সবার নজর এড়িয়ে শেষ নদীটি পার হয়ে চলে গেছে।

এ জন্মের মতো।

কিন্তু তার দেহের ক্ষতগুলি নজর করে দেখে স্বয়ম্ বুঝল যে তার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল। খুব সম্ভবত বেয়নেট প্র্যাকটিস করেছে ওর উপর। বন্দীকে জ্যান্ত অবস্থায় গাছের সঙ্গে বেঁধে আনকোরা জাপানি সৈন্যরা তার সর্বাঙ্গে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে চট করে বের করে নেওয়া অভ্যাস করে শোনা গেছে। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বন্দী খবর প্রকাশ করে ফেলে।

কিন্তু কেরামত নিজের মান রক্ষা করেছে। তার সব জমানো ধন বর্মার ব্যাঙ্কে লোপাট হয়েছিল। যৌবন কেটেছিল সামান্য বাবুর্চির কাজে কঠোর ডিসিপ্লিনে। জীবনটা দিয়েছে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে। কিন্তু মান নষ্ট করেনি।

সেই মানী বীরের জন্য সে একটু প্রার্থনা করল।

তার পর মুখ ফেরাতেই...

মুখ ফেরাতেই বুকের উপর বন্দুকের নলের ছোঁয়া।

কিন্তু এই কাজে যোগ দেবার আগে স্বয়ম্ জাপানি 'জুডো' শিখেছিল। বিদ্যুতের মতো দেহটা নামিয়ে নলের নিচে পর্যন্ত নেমে গিয়ে সে হাতের ধাক্কায় বন্দুক সরিয়ে দিল। মায়াবী চাঁদের আলো শত্রুর মুখের উপর এসে পড়ল।

এ কি? এ কি?

তুমি? ...তুমি, নীরেনদা? মেজর নীরেন চৌধুরী?

তুমি? তুমি?—হাতের বন্দুক আবার যথাস্থানে তাক করতে গিয়ে শত্রু থেমে বলল, তুমি? তুমি, স্বয়ম্?

মায়াবী চাঁদ একটু আগেই রামায়ণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেই চাঁদ, বাল্মীকির বর্ণনার "ক্বচিৎ প্রকাশং" চাঁদ মাথার উপরে।

আর নিচে সামনা সামনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই শত্রু পক্ষের সেনানী।

দুই শত্রু।

॥ আঠাশ ॥

নীরেনদা, তুমি—তুমি জি ..

'জিফ' অর্থাৎ জাপানিজ ইন্ডিয়ান ফোর্স এই কথাটা ব্রিটিশ কেন, সমস্তটা মিত্রশক্তি মহলেই একটা তাচ্ছিল্যের ভাবে ব্যবহার করা হত। শুধু তাচ্ছিল্য কেন, ঘৃণাও বলা চলে। মিলিটারি মেসে, বিশেষ করে যুদ্ধের আগুয়ান এলাকায় ওরা 'জিফ' কথাটাকে বিশ্বাসঘাতক, এমন কি বিভীষণের সমগোত্র বলে আলোচনা করত।

স্বয়ম্ মোটেই তা করতে পারেনি। বিভীষণ বৃত্তিকে সে কম ঘৃণা করে না। কিন্তু ইংরেজ শক্তি দেশকে পরধীন রেখেছে। দেশকে এমন চূড়ান্ত টালমাটালের সময়ে পর্যন্ত স্বাধীনতা দেবার কোনও খোলাখুলি লক্ষণ দেখায়নি।

নেতাজীর গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেই ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে সে তাই বিভীষণ ভাব বলে কখনও মনে করতে পারেনি। যে আত্মোৎসর্গ তার নিজের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি তাকে দূর থেকে মনে মনে শ্রদ্ধাই করেছে।

এবং সুভাষচন্দ্র যে বাহিনী সৃষ্টি করেছেন তা যে শুধু মিত্রশক্তির বিরোধিতা করবার বা জাপানিদের সহায়তা করবার জন্য নয় তা সে ভালো করেই বোঝে। ১৯৩৯ থেকে তিনি সমস্ত রাজরোযের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, রাজদ্রোহীর শাস্তি উপেক্ষা করে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন যে এই যুদ্ধের সময় ইংলন্ডের বিপদই হচ্ছে আমাদের সুযোগ।

তাঁকে যখন গৃহবন্দী করে রাখা হয় তখন, গোপন রহস্যে দেশ থেকে অন্তর্ধানের অল্প আগে, তিনি বাংলা দেশের গভর্নরকে লিখেছিলেন, ভুলবেন না যে ক্রীতদাস থাকাই হচ্ছে জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ। সেই অভিশাপের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য তিনি বর্মার পতনের সময় জার্মানী থেকে আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো থেকে দেশকে যে আহ্বান করেছিলেন তাও স্বয়ম্ কলকাতায় বসে লুকিয়ে শুনেছিল :—

"এই সংগ্রামে এবং এর পরের পুনর্গঠনের সময় যারা আমাদের উভয় পক্ষেরই শত্রুকে ধ্বংস করতে সহায়তা করবে তাদের সকলের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করব।"

এই আহ্বানের পর সুভাষচন্দ্র ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

নিরুপায়, নিরস্ত্র, বলতে গেলে নিবীর্য এ বেকার তরুণের মনে সেদিন নতুন করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

সেই তরুণ আরও পরে একদিন হঠাৎ রেডিয়োতে লুকিয়ে শুনেছিল :

"আমি 'এক্সিস' পক্ষের সাফাই গাইছি না। ভারতই আমার একমাত্র চিন্তা। এবং ভারতের স্বাধীনতা। এই ব্রত উদ্‌যাপিত হলেই আমি দেশে ফিরব।"

সেই তরুণ আরও শুনেছিল :

"আমরা তরুণ এবং আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে। নিজ বাহুবলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। স্বাধীনতা কেহ দেয় না। নিতে হয়।"

এই সব বাণী ও ঘোষণা শুনেও সে ব্রিটিশ পক্ষের সেনাদলে যোগ দিয়েছিল। মনের মধ্যে ছিল বহু বাধা, বহু দ্বন্দ্ব। তবু সে এমার্জেন্সি কমিশনের জন্য হাজির হয়েছিল।

যেদিন সে দিল্লিতে উপস্থিত হয় সেই দিনই আবার জার্মানী থেকে প্রচারিত আজাদ হিন্দ্ রেডিয়োতে সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর শপথ গোপনে শুনেছিল। ভারতীয় বাহিনী শপথ নিচ্ছে, ঈশ্বরের নামে পবিত্র শপথ নিচ্ছে যে :

"...ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, যে যুদ্ধের নেতা সুভাষচন্দ্র বোস—সাহসী সৈনিক হিসাবে আমি এই শপথের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে অঙ্গীকার করছি।"

শেষ মুহূর্তেও স্বয়ম্ মনে একটা ধাক্কা খেয়েছিল। বাহির বিশ্বে বিরাট এই ভারতীয় দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য সর্বস্ব পণ করে বাহিনী গঠন করেছেন। কটূক্তি, কারাগার, এমন কি মহামানব গান্ধীজীর

বিরাগ পর্যন্ত তাঁকে সেই মহান লক্ষ্য থেকে বিচলিত করতে পারেনি। সেচ্ছানির্বাসনের আত্মবিসর্জনের দিক দিয়ে সাংসারিক মানুষ স্বয়মের চোখে নেতাজী রামায়ণের নায়কের মতো বড়। তাঁর আহ্বানের বিপরীত পথে, বিরুদ্ধতা করবার জন্য সে কমিশন নিতে যাচ্ছে। স্বদেশসেবার মন্ত্রে সে উদ্বুদ্ধ না হলেও উৎফুল্ল হয়ে থাকে। সে কি সেই মন্ত্রের বিপক্ষে যেতে চাইছে?

সংশয় আর আত্মবিশ্লেষণের দোলায় অস্থির হয়ে সে ভোরবেলা রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গিয়ে মন্দিরে অনেক, অনেক ক্ষণ বসেছিল।

একজন স্বামীজী দূর থেকে স্থির আসনে ধ্যানমগ্নের মতো অথচ অশান্ত এই যুবককে অনেক ক্ষণ লক্ষ্য করেছিলেন। সে যখন উঠে পড়ল তখন তাকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। গভীর স্নেহ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মনে কি খুব একটা অশান্তি আছে, বাবা? যদি পারো, অকপটে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে দাও। তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করবেন।

স্বামীজীর স্নেহ ও আন্তরিকতা তার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। সে একটু কথাবার্তার পরে স্বামীজীকে তার সমস্যাটা সংক্ষেপে জানাল।

সে নিজের দেশকে ভালোবাসে—যদিও এ পর্যন্ত দেশের জন্য হাতে কলমে কিছু করেনি। আজ দেশ নতুন এক বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হতে চলেছে। সে আক্রমণকে যে শক্তি প্রতিরোধ করছে সে শক্তিও পদে পদে লড়ে দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে ফেলবে। ডিনায়্যাল পলিসি চালাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় সহজে দেশের উপর প্রভুত্ব ছাড়বে না। এক্ষেত্রে ব্রিটিশের সৈন্যদলে কমিশন নেওয়ার সম্বন্ধে ঠাকুরের কী নির্দেশ তা সে বুঝতে পারছে না। তাই তার মনে এত অশান্তি।

ইচ্ছা করেই সে সুভাষচন্দ্রের বেতার আহ্বানের কথা উল্লেখ করল না। সত্যিই তিনি স্বাধীনতা ফৌজ গঠন করেছেন কিনা, ভারত উদ্ধারের জন্য আদপেই ব্রিটিশের ভারতীয় সেনার মুখোমুখি হবেন কি না, অথবা জার্মানী থেকে ভারতে কখনও আসবেন কি না এ সব প্রশ্নের কোনও উত্তর সেদিন ছিল না। কাজেই সে সব কথা সে তোলেনি।

স্বামীজী খুব মমতাভরে বললেন—বাবা, ঠাকুরের কি নির্দেশ হত এ অবস্থায় তা আমি হঠাৎ বুঝে বলতে পারব না। হিংসা হানাহানির সংসারের প্রশ্ন হয়তো কখনও তাঁর কাছে কেউ নিয়ে আসত না। তবে একটা তুলনামূলক উদাহরণের কথা আমি জানি। আমাদের চেনা একজন খুব বিশিষ্ট সরকারি চাকুরে স্বদেশী হওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ সরকারী চাকরির জন্য বিলেতে পরীক্ষা দিতে যাবেন কি না এই প্রশ্ন নিয়ে ঠাকুরের এক মন্ত্রশিষ্যের কাছে এসেছিলেন। সেই ছাত্রকে তিনি বলেছিলেন যে দেশ এক কালে স্বাধীন হবে; তখন ঠাকুরের কথা হৃদয়ে নিয়ে চলে এমন অভিজ্ঞ লোক দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনের জন্য লাগবে। অতএব সরকারী চাকরিকে এড়িয়ে যেয়ো না। আমরা মনে মনে জানি সেই উপদেশ ব্যর্থ হয়নি। আপনিও এই উদাহরণ মনে রেখে নিজের পথ নিজেই বেছে নিন। রাজনীতির চেয়ে দেশ আর মানুষ বড়।

একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে স্বামীজী আবার বলেছিলেন, আর দেখুন, স্বামীজী নিজে ছিলেন কর্মযোগী, কর্মবীর। আপনার কর্ম যদি যুদ্ধের পথে নিয়ে যায়, সে পথেও তো আপনি দেশের সেবা, দেশের জীবের সেবা করতে পারেন। জানেন তো, যত মত তত পথ।

এবার স্বয়মের মনে আর কোনও দ্বিধা রইল না। লিভ এ লিটল, একটুখানি বাঁচো। উজ্জ্বল উৎসাহ ও সুন্দর স্বাস্থ্যে ভরপুর সে। তবু বাঁচার কোনও সম্মানজনক উপায় সে এই দেশে এই মুহূর্তে আর কোনও পথে খুঁজে পায়নি। কিন্তু এই পথও একটা পথ।

ভারতকে রক্ষা করবার জন্য সব প্রদেশের লোকই পাওয়া যাবে। যাবে না শুধু বাঙালিকে। সে চাকরির ভিখারি হয়ে দরখাস্ত হাতে ডালহাউসিতে, আর ভাতের ভিখারি হয়ে ফ্যানের টিন হাতে অলিতে গলিতে বিচরণ করছে। স্বয়ম্ বেছে নিয়েছে অন্য এলাকা। যদি সে কমিশন পায়—যদি সে যুদ্ধে জয়ী দলের একজন হয়ে ফিরে আসে—যদি দেশ স্বাধীনতা পায়...

সেই স্বাধীনতা দেবার জন্য অশেষ দুঃখ বিপদ বরণ করে মরণের পথ বেয়ে যারা শেষ পর্যন্ত ভারতের ভিতরে এগিয়ে এসেছে তাদেরই একজন সামনে দাঁড়িয়ে।

তাকে দেখে নীরেন চৌধুরী একটু বিহ্বল হয়ে গেছে। সেই সুযোগে সে শত্রুনিপাত করতে পারে। অথবা তাকে বন্দী করবার চেষ্টা করতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই যে মনে যতই সাহস থাকুক নীরেনের

দেহে অপুষ্টি আর ক্লান্তির চিহ্ন খুব পরিষ্কার। এবং তার হাতের বন্দুকটি মিত্রশক্তির নতুন বন্দুকের তুলনায় অত ক্ষিপ্র বা মারাত্মক হবে না। জি...

না। সে 'জিফ' বলে নীরেনদাকে অমর্যাদা করবে না।

কিন্তু সামরিক শপথ, আনুগত্যের শপথ নিয়ে যে রেগুলার কমিশনে সেনা বাহিনীতে ঢুকেছিল সেই মেজর নীরেন চৌধুরীকে এ মর্যাদা দেবে কী করে? মেজরের বীরবপু, সামরিক জৌলুস, দৃপ্ত পদক্ষেপ তার কাছে প্রশংসার বস্তু ছিল। হঠাৎ যখন তাকে অজ্ঞাত অপারেশন্যাল এরিয়াতে যুদ্ধের এলাকায় বদলি হতে হল তখন স্বয়ম্ তাকে কী শ্রদ্ধার চোখেই না দেখেছিল। হোক না বিদেশী প্রভুর সেনানী, তবু সামরিক বীর তো বটে। নির্বীর্য নিষ্কর্মা নিষ্ফল বাঙালি জগতে নীরেন একজন ব্যতিক্রম ছিল।

সেই নীরেনদা সামরিক শপথ ভেঙেছে? কী করে সম্ভব হল?

আশ্চর্য নীরেনদার চোখে কিন্তু হিংসার আভাস নেই। স্বয়মের কোনও ক্ষতি করা বা তাকে গুলি করার কোনও চেষ্টা নেই। এই অবসরে তার মনের কথা জেনে নেবে। তাকে পালাতে দেবে না, মারতে দেবে না। বরং তার কাছ থেকে কোনও সামরিক খবর বের করতে পারলে নিজের কর্তব্যেরই সুরাহা হবে। রিভলভারটা যথাস্থানে তৈরি রইল।

সাইকলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার স্কুলের শিক্ষা অনুসরে সে প্রথমেই আঁতে ঘা দিল।

—নীরেনদা তুমি রেগুলার কমিশনের উঁচু অফিসার ছিলে। তুমি সামরিক শপথ..

এতক্ষণে নীরেনের যেন প্রাণ ফিরে এল। কলেজের নামকরা ছাত্র, পাড়ার আদর্শ যুবক স্বয়ম্‌কে দেখে ওর মনে একটা বিরাট বিহ্বলতা এসেছিল। সেই স্বয়ম্ আজ ওর শত্রুপক্ষ। স্বয়ম্ অত ক্ষিপ্র না হলে নির্ঘাৎ নীরেনের গুলির আঘাতে এখনই শেষ হয়ে যেত।

ভাইয়ে ভাইয়ে সাক্ষাৎ যুদ্ধের এই প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা, আশ্চর্যের কথা, নীরেনেব একবারও মনে হয়নি। ২১শ অক্টোবর, ১৯৪৩-এ, সিঙ্গাপুরে নেতাজী সমস্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আর জেনারেল আমামোটোর বাহিনীর সামনে মহা সমারোহে যে শপথ নিয়েছিলেন আর যে আহ্বান প্রচার করেছিলেন তার মাত্র একটিই ফল হবার কথা।

নেতাজী সেদিন আবেগরুদ্ধ গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন—

''ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র শপথ করছি যে ভারতের আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীকে স্বাধীন করবার জন্য আমি, সুভাষচন্দ্র বোস, আমার জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত স্বাধীনতার পবিত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব।''

সেটা হচ্ছে প্রাণের শপথ, পেটের শপথ নয়।

সেদিন থেকে সব আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বপ্ন ছিল যে ওরা যখনই শত্রুপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মুখোমুখি হবে তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য, ব্রিটিশের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলবার জন্য আজাদি ফৌজের সঙ্গে হাত মেলাবে। সেই ভরসাতেই তো এত কম সৈন্যদল, আরও কম অস্ত্রশস্ত্র এবং তার চেয়ে আরও কম খাদ্য সরবরাহ নিয়েই দুর্গম বর্মার আসামের বন আর পাহাড় উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। আগুয়ান এলাকায়।

শুধু নেতাজীর নয়, জাপানি সেনাপতি মুটাগুচিরও সেই আশা। প্রধানমন্ত্রী তোজো সেই আশা করেই টৌকিয়োতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের স্বাধীন অস্তিত্ব আর ক্ষমতা মেনে নিয়েছিলেন।

আর এখন তার ছোট ভাইয়ের মতো স্বয়ম্ কিনা তাকেই জিজ্ঞেস করছে সামরিক শপথ আর আনুগত্যের কথা!

হায়! দেশ তো জানে না সেই শপথ আর সেই আনুগত্যের বন্ধন থেকে ব্রিটিশ প্রভুরাই তাদের মুক্তি দিয়েছে। নিজেদের কাজ ও ব্যবহার দিয়ে।

সে কথা কি আজাদ হিন্দ্ রেডিয়োতে বোঝানো হয় নি?

যদি না-ও হয়ে থাকে একে অন্তত সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিই। আর এই যুদ্ধের এলাকায় পালেল গ্রামের কাছেই বিমানঘাঁটি। ওটা দখল হয়ে গেলেই এই শপথের কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিতে হবে ব্রিটিশ পক্ষের ভারতীয় জঙ্গীদের ঘাঁটিগুলিতে। তাহলেই আমাদের সেনাদল, অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য সরবরাহ আর জয়যাত্রা সবই হাতে এসে যাবে।

নীরেন স্বয়ম্‌কে বলল, তুমি সামরিক শপথের কথা তুলেছ। আমিও সে কথাই তুলব। তোমার আনুগত্য আসলে কোথায় আছে সে কথাও তুলব। এই এলাকাতে এখন আমি ছাড়া আর কেউ আমার রেজিমেন্টের নেই। জাপানি একটা কোম্পানি দুপুর পর্যন্ত এখানে ছিল। তারা তোমাদের দলের সবাইকে সাফ করে দিয়েছে বলে আমায় রিপোর্ট দিয়ে ও আমাদের উপর এখানকার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে। তোমার আমার মধ্যে একটুখানি সময়ের 'ট্রুস' যুদ্ধ বিরতি হোক। তারপর আবার আমাদের পথ আলাদা। আলাদা পথে যাবার আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার শত্রু হব। ও. কে.?

—ও. কে. নীরেনদা। ইট্‌স্‌-এ ডিল। এই চুক্তি হল।

—তবে শোন্‌, স্বয়ম্‌। আমাদের আনুগত্যের শপথ থেকে আমাদের তখনকার কর্তারাই মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল। গি গ্রেট সিঙ্গাপুর 'সারেন্ডার' যে কী বস্তু ছিল তা তোমরা কেউ দেশে জানতে পারনি। জানলে আর শপথের কথা তুলতে না। এবং ইংরেজের সৈন্যদলে নামও লেখাতে না। সিঙ্গাপুরে ইংরেজ সৈনিকের রক্ষাকবচ সৈনিকের রক্ষণাবেক্ষণ খানাপিনা সব পেল। আর আমরা ভারতীয় ফৌজ? আমাদের কোনও বাপ মা রইল না। আমরা যুদ্ধবন্দী নই। আমাদের জন্য বন্দীকারীর কোনও দায়দায়িত্ব নেই।

—এ অসম্ভব কথা। নিশ্চয়ই এরকম হয়নি।

—হয়েছে, স্বয়ম্‌, হয়েছে। ট্রুথ ইজ স্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিকসন। তুমি জানো না হয়তো যে আমি সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণের আগেই মালয়ে সত্যিকারের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম। আমার উপর জাপানিদের জীবন্তে বেয়নেট প্র্যাকটিসের অর্ডার হয়েছিল আমার মুখ থেকে কোনও কথা বের না হওয়ার জন্য। সেই আমাকেও গোঠে মাঠে অনাথ ছাগলের মতো ছেড়ে দিল জাপানিরা। তুমিই বলো, আমি কি যোদ্ধা রইলাম? আমি কি যুদ্ধবন্দী রইলাম? কার প্রতি থাকবে আমার লয়্যালটি?

—অসম্ভব!

—হ্যাঁ, ভাবতেও অসম্ভব লাগবে বই কি। কিন্তু যে প্রভুর প্রতি লয়্যালটির শপথ ছিল সেই প্রভু নিজেই সে শপথ থেকে তার কাজে, তার ব্যবহারে, তার আত্মসমর্পণের চুক্তিতে আমাদের মুক্তি দিয়েছিল। যোদ্ধার আনুগত্য থাকে রাজার কাছে আর দেশের কাছে। রাজা মুক্তি দিয়েছে এবং দেশও সেই রাজার পথ থেকে সরে এসেছে। অহিংসভাবে গান্ধীজী আর সামরিকভাবে নেতাজী দেশের প্রতি আমাদের অনুগত্য দাবি করেছেন। আমরা আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ সে শপথ নিয়েছি। তোমরাও তোমাদের শপথ পরিবর্তন করে আমাদের সঙ্গে বিজয় অভিযানে চলো। নেতাজীর আহ্বান। দিল্লি চলো।

—না, নীরেনদা, তা হয় না। একজন ইংরেজ সেনানী ভুল করেছে, ভয়ে ভেড়া হয়ে গেছে। তা বলে বাঘের দল তাদের আত্মসম্মান ভুলে যায় না। তোমাদের তেরঙা পতাকাতে চরখার বদলে বাঘ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, লাফ দিচ্ছে এই দেখিয়েছ। তোমরা হচ্ছ বাঘ। তোমরা শপথ ভাঙবে? এটা কি স্বপ্নেও কল্পনা করা যায়?

—আমাদের শপথ আমাদের দেশের কাছে, ভাই। তোমার শপথও তারই কাছে। তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে এক পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে দিল্লি চলো। আমাদের ফার্স্ট আই. এন. এ. ডিভিশন তোমাদের সঙ্গে পেলে এক দিনে পালেলের বিমানঘাঁটি দখল করে নিতে পারবে। তার পরের দিন ইম্ফল। তার পরেই সারা ভারতে শুধু একটি ধ্বনি থাকবে—জয় হিন্দ্‌।

বলতে বলতে নীরেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই উদ্দীপনার কল্যাণেই ওদের সেকেন্ড গেরিলা রেজিমেন্ট একটা অসম্ভব দুঃসাহসী কাজ করে বসেছিল। মেইমিও শহরের নিভৃত আরামে বসে জেনারেল মুটা গুচি ডিভিশনাল কম্যান্ডার কর্নেল কিয়ানীকে বলেছিলেন যে ৩৩ নম্বর জাপানি ডিভিশনের সঙ্গে ইম্ফল বিজয়ের গৌরবের অধিকারী যদি হতে চান তাহলে এখনই সসৈন্যে ইম্ফলের দিকে ছুটুন। এখনই পালেল অভিযানের বাঁদিকের লাইন ধরে চামোলের গিরিপথগুলি রোধ করে এগিয়ে যান। ১লা মে আমরা পূর্ব থেকে বিমানঘাঁটি আক্রমণ করব আর আপনারা করবেন দক্ষিণ থেকে।

দ্বিতীয় গেরিলা রেজিমেন্ট সেই আশাভরা উদ্দীপনায় সব ভারী জিনিসপত্র মায় মর্টার আর মেশিনগান পর্যন্ত পিছনে ছেড়ে দিয়ে মাথা পিছু একটা কম্বল, একটা রাইফেল আর মাত্র পঞ্চাশ রাউন্ড করে গুলি নিয়ে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছিল।

সে খবর শত্রুর কাছে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু নিজের ছোট ভাইয়ের মতো যাকে মনে করে সেই

আনকোরা নতুন শত্রুসৈন্যের অফিসারের কাছে এখন আনুগত্যের, সৈনিকের কর্তব্যের কথা শুনতে হচ্ছে।

উত্তেজিত হয়ে নীরেন বলল, শোন লক্ষ্মী, তুমি আমার ছোট ভাই। ব্রিটিশ দলে মাত্র সম্প্রতি যোগ দিয়েই যে ফরোয়ার্ড এরিয়াতে আসার জন্য নির্বাচিত হয়েছ তাতে তোমার বুদ্ধি আর বীর্যের পরিচয় আছে। তোমার বীর্যকে আমি সম্মান দিচ্ছি। তোমার বুদ্ধি দিয়ে আমার কথাটা শোন।

—না, নীরেনদা, তুমি আমায় প্রশংসা করে দুর্বল করে তুলো না। তোমার প্রভুধর্মের দোহাই। তুমি তো জানো আমি কংগ্রেস ভলান্টিয়ার ছিলাম। মনে প্রাণে দেশের সেবক ছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে যোগ করে দিল, এবং এখনও আছি।

—তুমি আমার ছোট ভাই। মানুষকে অহরহ জীবন আর মরণের মধ্যে একটা বাছাই করে নিতে বাধ্য হতে হয়। যতক্ষণ মরণ সীমানা পর্যন্ত এসে না পড়ে ততক্ষণ সে বাঁচতে চায়। কিন্তু যেকোন সময় মরতে হতে পারে, কারণ সৈন্যরা শুধু হুকুমের পুতুল। এই আজাদ হিন্দ হচ্ছে একমাত্র সেনাদল যারা পুতুল নয়, যারা অন্নদাস নয়। যুদ্ধে তারা মার্সিনারি নয়, ব্রতে তারা মিশনারি।

মাথা নিচু করে স্বয়ম্ চুপ করে রইল। মনে তার উদ্বেলিত অতলান্ত সাগরের বিক্ষোভ।

নীরেন তা লক্ষ করে বলে চলল, শোন ভাই, তুমি ১৯২৮ সনে নেতাজীর অধীনে বালসেনা হয়ে কলকাতা কংগ্রেসে কাজ করেছিলে। সেদিনকার জি. ও. সি. আজ নেতাজী। এই তেসরা ফেব্রুয়ারি তিনি আমাদের যুদ্ধযাত্রা সম্ভাষণে কী বলেছিলেন তাই বলছি। আমার কথা নয়। নেতাজীর বাণী :

''রক্ত রক্তকে আহ্বান করছে। নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। অস্ত্র তুলে নাও। যে পথ পূর্বসূরীরা তৈরি করেছিলেন সে পথ তোমাদের সামনে। শত্রুসেনার মধ্য দিয়ে কেটে আমরা পথ করে নেব। অথবা ভগবান যদি চান তবে আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। এবং আমাদের শেষ নিদ্রায় যে পথ আমাদের সৈন্যদলকে দিল্লিতে নিয়ে যাবে সেই পথকে চুম্বন করব। দিল্লির পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লি চলো।''

নীরেন বাইরে শান্ত স্বয়মের মনের অশান্তি বুঝতে পেরে আরও বলল, জাপানি প্রধান সেনাপতি জেনারেল কয়াবেকে নেতাজী বলেছেন যে ভারতের ভূমিতে প্রথম যে রক্তবিন্দু পড়বে তা হবে আই. এন. এ. সেনার। সে আনন্দে আমি এগিয়ে এসেছি। তুমিও এসো ভাই।

ওকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে নীরেন বলল, শোন, স্বয়ম্, আজ সব চেয়ে বড়, বলতে গেলে ইতিহাসে এই একমাত্র, সুযোগ এসেছে আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার। আমার সঙ্গে এখনই চলে আসতে না চাও, না হয় এসো না। কিন্তু নতুন মন্ত্র এখনই নাও। তোমায় ব্রিটিশ লাইনে ফিরে যেতে হবে। বোঝাতে হবে সব ভারতীয় অফিসার আর আদার র‍্যাঙ্ককে অর্থাৎ সাধারণ সেনাদের যে যাঁর জন্য তারা শপথ নিয়েছে তিনি হচ্ছেন মা, দেশমাতা, ভাড়াটে মনিব নয়। তোমরা শুধু অন্নদাস মার্সিনারি নও, শুধু বৃত্তিধারী প্রফেশন্যাল নও, তোমরা মায়ের সন্তান। সব চেয়ে বড় পরিচয়। তার মূল্য তোমাদের প্রত্যেককেই দিতে হবে। এই হচ্ছে মহাজন্মের লগ্ন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা মুহূর্তের জন্য স্বয়মের মনকে ওলট পালট করে দিল।

কে বড়? মা, না মনিব?

সন্দেহ নেই যে মা বড়। চন্দ্রগুপ্ত সেই মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন পাহাড়ি রাজার সহায়তায় আর ম্লেচ্ছ আলেকজান্ডারের সমর শিক্ষায়। মায়ের মুক্তি ও নিজের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল একাধারে। এ যুগের স্বাধীনতার মর্যাদা আরও অনেক বেশি। কারণ এই বিদ্রোহের কারণ ব্যক্তিগত নয়; জাতিগত, নীতিগত।

কিন্তু এখনো সমরশিক্ষাও যে সম্পূর্ণ হয়নি। না জুটেছে যুদ্ধের সরঞ্জাম।

যদিও গান্ধীজীও বলেছিলেন যে অচেনা দানবের চেয়ে চেনা দানবই শ্রেয়, এই অচেনা জাপানিরা তাদের আজকের দিনের সহকারী আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যে কী হাস্যকর নামমাত্র সহায়তা দিচ্ছে, কী নির্মম বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তা স্বয়ম্ খুব ভালো করেই জানতে পেরেছে। সব খবর পেয়েছে বন্দী আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদের কাছ থেকে।

কন্টকেনৈব কন্টকম্ এই নীতি শুধু সবলের হাতেই সফল হয়।

সে সব তর্কের সময় এখন নয়। ব্রিটিশের সঙ্গে আজ শুধু ভারতীয় নয়, মার্কিন আর সাম্রাজ্যের সব দেশের সৈন্যদল আর সমরসম্ভার আছে। জাপানি সরবরাহ রেখা যে রবারের মতো টানতে টানতে সরু হয়ে

প্রায় ছিঁড়ে এসেছে তা ওদের এয়ার রিকনয়সান্সে, বিমান পর্যবেক্ষণে, ভালো ভাবেই ধরা পড়েছে।

এত অসহায় এই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। ওরা জানে না বা ভাবতে চায় না যে প্রচারে নয়, পরাক্রমে মিত্রশক্তিকে হঠাতে হবে। অন্তত সীমান্ত পার হয়ে বাংলা দেশ পর্যন্ত পৌঁছবার আগে দেশমাতার বন্দনা গান কামান গর্জনকে স্তব্ধ করতে পারবে না। কিন্তু সে হিম্মত জাপানিদের হবে না। ইম্ফল কোহিমার গিরিমালা পার হবার প্লেন ও যান তাদের নেই।

তার আগে বালুচ পাঠান থেকে গুর্খা মার্কিন আফ্রিকান সৈন্যদল একমাত্র যে ভাষা বুঝবে তা হচ্ছে বুলি নয়, গুলির।

সবার উপরে সবচেয়ে কঠোর সত্য এই যে ভারতীয় সৈন্যদলের সামরিক শপথও একদিনে ভোলানো যাবে না। আজাদি ফৌজের সেই শপথ থেকে মুক্তির যে কারণ ঘটেছিল ভারতীয় ফৌজের মনে তার ঝংকার উঠতে সময় লাগবে। যুদ্ধের মধ্যে যোদ্ধার মনে মহতের আহ্বানে সাড়া দেবার সময় নেই।

হায়, সে সময় পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্বের মেয়াদ হয়তো নেই। নীরেনদা, বীর উন্নতদেহ উদ্ধতবক্ষ নীরেনদার হাতে মাত্র একটা পুরানো রাইফেল আর মুখে অপুষ্টির রুক্ষ ছাপ। এর মধ্যে মিত্রশক্তির সব সৈন্যকে জঙ্গলী জলপাই রঙের ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে। তাতে শত্রুর নজর এড়ানো যায়। আজাদ হিন্দের গায়ে সেই পুরানো ছিঁড়ে-আসা খাকী ইউনিফর্ম।

হায়, উৎসাহে উদ্দীপনায় মন জ্বালানো যায়। কিন্তু কামান চালানো যায় না।

নিরুপায় নেতাজী। অস্ত্র আর যানবাহনের সামান্য দাবিগুলিও পূর্ণ হলে অসামান্য দান দিতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়।

মাত্র বছর তিনেক আগেই বর্মা থেকে পালানো সৈন্যদের যে মর্মান্তিক অবস্থা হয়েছিল রাশিয়া থেকে হেরে আসা নেপোলিয়নের বাহিনীরও তা হয়নি। হাই তুলে 'হরি হে দয়া করো' এই প্রার্থনাটুকু করারও সময় মেলেনি। 'কট উইথ দেয়ার প্যান্টস্ ডাউন', মুক্তকচ্ছ অবস্থায় বেসামাল ব্রিটিশ সেনাদল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

অত্যন্ত নোংরা, ঘামে ধুলোয় কালো পলেস্তারাপড়া শার্ট আর ম্যালেরিয়ায় ভরা জঙ্গলের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত শর্ট পরে পালাচ্ছে ব্রিটিশের সেনাদল। বেশিরভাগেরই পায়ে বুট পর্যন্ত নেই। যদি বা আছে তার উপরের চামড়া পটাপট আর্তনাদ করে নিচের হীল ছেড়ে পালাই পালাই করছে। অনেকেরই থরথর কাঁপা শুকনো ঠোঁটে আর আগুনরাঙা চোখে ম্যালেরিয়ার নিশানা। কারও বা হলদে চোখমুখ ন্যাবার নিশানা। রক্ত-আমাশার গন্ধ আর চিহ্ন জঙ্গলী হাঁটাপথে রাখতে রাখতে তারা ধুঁকছে আর এগোবার চেষ্টা করছে। একটু বসবার বা উবু হয়ে মলত্যাগের সাহস নেই, কারণ একবার বসলে হয়তো আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পায়ে গায়ে দুর্গন্ধ ঘা আর তার উপর ভনভন করছে মাছি আর গজাচ্ছে পোকা। বীভৎসতার চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি হয়ে গেল হিজ ম্যাজেস্টিস ইম্পিরিয়াল আর্মি।

শুধু পরাজিত নয়, পদাহত। শুধু পদাহত নয়, বিতাড়িত। ইংলন্ডের সৌখিন সমাজের ফক্স হান্টিংয়ের মতো শিকারী কুকুর দিয়ে খেদানো শিয়ালের দলের মতো।

মোটেই মনোহর চিত্র নয়।

পরাজয়ের চিত্র কখনও তা হয় না।

হায় নেতাজী!

সেদিনই ছিল মহাজন্মের লগ্ন।

আজ সে লগ্ন বয়ে গেছে। সুযোগ ভগবান শুধু একবারই বোধ হয় দেন।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের এলাকায় শত্রুপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবিতার কথার একটি হঠাৎ বাসন্তী দোলাকে মনের মধ্যে লালন করা চলে না। পৃথিবী নিষ্ঠুর। সময় আরও নিষ্ঠুর।

গহন বনের লতাপাতার মধ্য দিয়ে নতুন চাঁদের, আলো নয়, রেখা বর্শার ফলার মতো এদিক-সেদিক এসে মাটিতে বিঁধছে। বাতাস ঘন জঙ্গলের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠছে। মর্টার ছোঁড়ার পর যেমন করে হঠাৎ কেঁপে ওঠে সেরকম ভাবে। জোনাকিগুলি গাছের নিচে নেমে এসে তারার খেলা শুরু করেছে।

সীমান্তের সবুজ নরকে একটুখানি স্বর্গের পরশ, মধুরের সুবাস ওরা দুজনেই পেয়েছিল মাত্র মুহূর্তের জন্য।

কিন্তু আর নয়। হঠাৎ হয় দূরে কোনও লাল স্টার শেল আকাশ ফুঁড়ে তেড়ে আসবে। হঠাৎ হয়তো কোনও স্নাইপারের রাইফেল বনভূমিকে উচ্চকিত করে ওদের দুজনকেই নির্বিচারে লুটিয়ে দেবে। নীরেনের নিজের কথা যে একটিও বলা হয়নি এখনও।

যদি তা বলতে হয়, এখনই, এই নিমেষেই, লগ্নের রেশ নিঃশেষ হয়ে যাবার আগেই তা বলতে হবে।

ইউনিফর্ম মানুষটার দেহ বদলিয়ে দিয়েছে। কর্তব্য তার জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু মন তো সব কিছুর বাইরে। সব কিছুর উপরে। তাই তো ওদের দুজনেরই মনে এত দোলা, এত আলোড়ন। শক্রর সামনে। মৃত্যুর সামনে।

নীরেনই ওদের নিঃশব্দ নিস্তব্ধতা প্রথম ভাঙল। বলল, বুঝেছি স্বয়ম্। তোমার সঙ্গে শক্রর বদলে বন্ধু হিসাবে মিলিত হওয়া আর সম্ভব নয়। ভাই হিসাবে এই দেখাই শেষ দেখা। যুদ্ধের মধ্যেই সত্যিকারের দেখা হবে। তবু, তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

গভীর মমতায় স্বয়ম্ ওর দিকে তাকাল।

নীরেনদা, প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের চোখে নীরো আর দূর থেকে তরুণদের চোখে হিরো, নীরেনদার নাম মিলিটারি ক্যাজুয়ালটির তালিকায় নেই। মিসিং, বিলিভড কিলড ইন অ্যাকশন এই অনির্দিষ্ট নিয়তির তালিকায় আছে।

সেই নীরেনদা দু বছর অশেষ দুঃখ দুর্গতি আর পরে অসম্ভব এক দুরাশার ব্রত গ্রহণ করেছে। সেই দুরাশাতেই দেশের দিকে এগিয়ে এসেছে। মানুষ নীরেনদা কী জিজ্ঞেস করবে তা সে নিজেই, নিজে থেকেই অনুমান করে বলে দেবে।

—নীরেনদা, সীমাদির খবর আমি জানি। শেষ দেখা দিল্লিতে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজে যাতায়াত করছেন।

—তুমি ঠিক বলছ, ভাই? সত্যি? সত্যি?

—হ্যাঁ, নীরেনদা। একেবারে সত্য কথা। আমি তখন দিল্লিতে এসেছিলাম কাজে। উনি আমার খবর পেয়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে এ. আই. আর.-এ গিয়েছেন প্রথম বার। যদি আমার ইউনিফর্মের কল্যাণে ওরা একটু বেশি যত্ন করে আজাদ হিন্দ্ রেডিয়ো থেকে তোমার খবর ধরবার চেষ্টা করে সেই আশায়।

—কেমন আছে?

—এমন অবস্থায় যেমন থাকা সম্ভব তেমন। কিন্তু নীরেনদা, তুমি এই হিসাবে ভাগ্যবান। সীমাদি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি শুধু দেশে ফিরে এসো।

তারপর একটু ইতস্তত করে স্বয়ম্ ফিসফিস করে বলল, তোমার নতুন শপথ ভাঙতে আমি বলব না। কিন্তু তুমি নিজের মন নিজে আরেক বার বিচার করে নাও। পরে আর সুযোগ পাবে না।

—না ভাই, তোমার আর আমার পথ পৃথক। সম্পূর্ণ বিপরীত সে পথ। যদিও শেষ পর্যন্ত বিরোধ নেই আমাদের উদ্দেশ্যে। তবুও। আচ্ছা, এই শেষ। লেট আস পার্ট। আধ ঘণ্টা পরে আবার যদি দেখা হয় আমাদের নিজেদের আলাদা ধর্ম হিসাবে কাজ অর্থাৎ যুদ্ধ করব। আর ভুলে যাব যে তোমার আমার মধ্যে এখন কোন দেখা হয়েছিল। গুড বাই অ্যান্ড গুড লাক।

ওরা দুজনে বিপরীত পথে চলে গেল। আধ ঘণ্টা পরে আবার ওরা দুই শক্রপক্ষ হয়ে যাবে।

চাঁদের আলো তখনও জঙ্গলী লতাপাতার মধ্য দিয়ে ঝরে পড়ছে।

কিন্তু তীক্ষ্ণ বর্শার মতো নয়, স্নিগ্ধ বর্ষার মতো।

॥ উনত্রিশ ॥

চিনি গো চিনি।

না। কোনও মিঠে প্রেমের স্মৃতি নয়।

ব্যর্থ প্রেমের মৃদু হাহাকারও নয়।

একজন পাগলের প্রলাপ। আত্মবিস্মৃত জীবনের গানের রেশ। চিনি গো চিনি।

যে মৃদুস্বরে গান করে সে এই গানের পুরোটা জানে কিনা সন্দেহ। সুরটা যে ঠিক মতো জানে না তা

তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু আপন মনে এই যুদ্ধে আহত ঘরে ফেরত পাগল গেয়ে যায়—চিনি গো চিনি।

এই ক'টা কথাই সে রোজ গায়। হামেশাই গুনগুন করে। কখনও বেশ জোরে। সুরে নয়, বেসুরে। পাড়ার ছেলে ছোকরারাও বেশ মজা পায়। অনেক সময় মুখ ভেংচিয়ে ওরাও সুর করে বলেছে—চিনি গো চিনি।

তার বেশি কিছু ওরা ভাবেনি।

তবু ওরাও শেষ পর্যন্ত পাগলের একঘেয়ে গান পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

রতন বলল, ভাল্লাগে না, ভাই। রোজ এই এক ভ্যানভ্যানানি। এই রকে আর পাগলাটা বসতে দেবে না দেখছি।

এই ছোট্ট গলির ছোট্টতর পুরনো বাড়িগুলোর কুলতিলক ওরা। ওদের অন্য কোথাও বিকেলে যাবার বা বসবার জায়গা নেই। দূরে বড় রাস্তার কাছে এককালে পার্ক বলে একটি খোলা জায়গা ছিল। এখন সেটা এ. আর. পি. ট্রেঞ্চ আর ব্যাফল ওয়ালের কল্যাণে পাইকারি পায়খানা। এবং খুবই স্বাস্থ্যসম্মত অর্থাৎ হাইজিনিক। ওপেন এয়ার যাকে বলে।

রতনের মতো ওরাও এই রকের শান্তিভঙ্গে দুঃখিত। মিলিটারিরা পাগলকে নাকি হোম ট্রিটমেন্টে ভালো হবে এই অজুহাতে শ্বশুর বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে গেছে। পাগলের বৌ আগে থেকেই নিজের বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন যুদ্ধফেরত পাগলকে কর্তারাই এখানে তুলে দিয়ে নিজেদের দায় কাটিয়ে নিয়েছে।

ফৌজি থেকে অবশ্য চিকিৎসার নামে ভালো মাসোহারা দিচ্ছে। কাজেই শ্বশুর বাড়ির কোনও আপত্তি হয়নি। সেই সুবাদে র‍্যাশনটারও সস্তা বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধের বাজারে এইটুকুর জন্য শত্রুকেও পোষা চলে। আর এ তো শুধু গরিব হাঘরে জামাই। হলই বা শেলের ঘায়ে পাগল হয়ে যুদ্ধ ফেরত। পাগল আর শক গল দুই-ই একই চীজ মোদ্দা কথা।

তবু সমীর বলল, শোন, আমরা হচ্ছি একনিষ্ঠ পতিব্রতা যাকে বলে। বাড়ির ভিতরে পাগলই থাক আর ভূতই থাক আর আমাদের যতই অসুবিধা হোক আমরা গলির রকখানার দখল ছাড়ছি না।

রতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, অবশ্য না। এমনকি বে-পাড়ার কাউকেও ভাগ বসাতে দেব না। আমরা লড়তে হিম্মত রাখি বাবা। ইংরেজ বর্মার দখল ছেড়েছে। আবার চুরি করে ঢুকবার চেষ্টাও করছে। কিন্তু আমরা ওদের চেয়ে বেশি মিলিটারি। এমন কি অ্যামেরিকান স্যাঙাৎদের চেয়েও বেশি।

কুঙ্কুম কবিতা টবিতা পড়ে। সময়মতো আউড়িয়ে থাকে। সে আওড়াল-এক সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন। কে বলে বাঙালির ইউনিটি নেই?

—অফ কোর্স আছে। আর আমরা তো জাপানিদের মতো পরের সাম্রাজ্যে হামলা করতে যাচ্ছি না। পাগলটা ঘরের ভিতর নিজের মনে বকাবকি করে, হাসে, বক্তৃতা ঝাড়ে। আমরা তো সেজন্য কোনও হামলা করতে যাইনি। তবে এলোমেলো না চেঁচিয়ে যদি চুপ থাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতে রাজি আছি।

—শুনেছি ইউনিভার্সিটিও ওকে আশীর্বাদ করেছিল। পড়াশোনাতে ভালো ছিল, কাপ মেডাল পেয়েছিল। শুধু চাকরি পায়নি।

—না, শুনেছি পেয়েছিল। কিন্তু রাখতে পারেনি। লড়াইয়ের ধাক্কায় কোম্পানি উঠে গেল। জার্মানির সঙ্গে কী সব ওদের কারবার ছিল। তাই তার পর আর কলকাতায় চাকরি পেল না। আসামে গেল চা বাগানে। সেখান থেকে মিলিটারিতে। তার পর বর্মা। আর চীনে আর জাপানি নিয়ে কারবার। এক দল স্যাঙাৎ, অন্য দল শমন।

—মোট কথা ছত্রিশ জাতে একাকার। কেন রে বাবা মরতে গেলি। সেই বর্মা মুলুক। যাকে বলে গঙ্গাবর্জিত দেশ। সেখানে পাহাড়ে জঙ্গলে সাদা মার্কিন, কালো নিগ্রো, হলদে চীনে সবাই মিলে আকাশের রামধনু সেজে আছে। আর তুই কিনা বাদামি বাঙালি আরেকটা রঙের পোঁচ লাগিয়ে দিলি?

—আর দিলি তো দিলি। পাঁচ মিশেলী পল্টনে ঢুকে নাচতে নাচতে একেবারে জাপানিদের সঙ্গেই বা লড়তে গেলি কেন রে বাবা? ছ্যাঃ! আমাদের কবি হেমচন্দ্র এই সেদিনও হক কথা লিখেছেন—অসভ্য জাপান। আর তুই কিনা গেলি তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। এখন কর্মফল ভোগ বাছাধন।

—ভাগ্যিস, বাছাধন নির্বিবাদে থাকে। শুধু রেডিয়োটা ধরে খুব টানাটানি করে। আর সারা দুনিয়ার

খবর শোনবার চেষ্টা করে। গুনগুন করে কিন্তু ওই একটি কথাই। আর বিড়বিড় করে কী যে বলে। মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেয়।

—তা দিক বাবা। তাতেই যদি সন্তুষ্ট থাকে। রকটুকুতে আমাদের নিজেদের মৌরসী পাট্টা। বাড়ির ভেতরটা শান্ত আর বাইরে আমরা চালাই হৈ-হল্লা।

কুঙ্কুম বলল, না, এবার শুনতে হবে পাগল কী সব বলে। জীবনটা মিইয়ে যাচ্ছে। একবার দেখা যাক পাগল কী সব মণিমুক্তো ছড়ায়। বুঝলি রতনা, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

রতন তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে মুখ বেঁকাল—অমূল্য রতন তো সেদিন শুনলাম। পাগল লড়তে গিয়েছিল চীনেদের সঙ্গে সঙ্গে। ওখানে নাকি আসাম থেকে চীন পর্যন্ত পাহাড় জঙ্গল ফুঁড়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। আমাদের জোয়ানরা যেখানে পৌঁছোতেও পারেনি ব্রিটিশ আমলে, সেখানে চীনেরা নাকি কুলিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাস্তা বানিয়েছে। আমাদের 'হোস্ট' সেখানেই ছিল, শুনলি না সেদিন?

কুঙ্কুম গভীরভাবে মাথা নাড়ল, না, অত হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। ওর প্রলাপের মধ্যে একটা মিলিটারি হিস্ট্রি খুঁজে পাওয়া যাবে।

রতন রেগে গেল, নিকুচি করেছে তোর হিস্ট্রির। আমরা যে পরীক্ষার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঠ্যাং ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি সেটাই আমাদের হিস্ট্রি। রাজারা সেকালে শরৎ কালে দিগ্বিজয়ে বেরোত। তোরই রবিঠাকুর লিখে গেছেন কাবুলিওলা গল্পে পড়েছি।

একটু থেমে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার শুরু করল, কিন্তু রেজাল্ট বেরোবার পর আমরা কেউ দিগ্বিজয়ে বেরোতে পারলাম না। শরৎকালে দূর ছাই একটি ছোটমোট চাকরিতে যাচ্ছি বলে যে খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরোব তার পথও বন্ধ। দিগ্বিজয়ের বদলে আমাদের সব দিকই বন্ধ।

সমীর যোগ দিল, শুধু তাই নয়। যেই শরৎ কাল শেষ অমনি মোহনবাগান দুর্গাপুজো সব কিছু শেষ। রকে আলোচনার মতো মালও গেল ফুরিয়ে। আর এদিকে জাপানিগুলো বসন্তকাল পড়তে না পড়তেই আসামে হাজির। যে চাকরিটা পেতে পারতাম সেটাও উঠে গেল। মঙ্গোলিয়ানরা কখনও মঙ্গল করে না। কিবা চীনে, কিবা জাপানি।

রতনের মনেও একটা ব্যথা ছিল এ নিয়ে।

সে বলল, মঙ্গল করবে? চেহারা দেখেছিস এক একটির চীনে পটিতে?

সমীর সাহস পেয়ে গেল। কারণ কোনও চীনে বা জাপানি হাতের কাছে নেই।

বন্ধুরা অবশ্য চীনে পট্টি এড়িয়ে চলে সবদা। ওরা নাকি সব ডাকসাইটে ডাকাত। ওদের আঙুলের নখের এত জোর আর ধার যে ওই ও-পাড়ার কেষ্টধনের পেটে একবার নখ সেঁধিয়ে দিয়েছিল। গেঞ্জি আর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়ি প্রায় বের করে ফেলে আর কি!

তবে হ্যাঁ, চীনে রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে সস্তায় খাঁট মারতে যায় বইকি। তবে সেখানেও—বিশ্বাস নেই, যা সব গাট্টাগোট্টা জোয়ান ওরা। তাই বন্ধুরা দল বেঁধেই যায়।

তাই সমীর বলল, একটু সাহস পেয়েই বলল, দেখেনি আবার? বাপ্ রে বাপ্! আরশোলার চাটনি আর ব্যাঙের ঠ্যাঙ খেয়ে ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করে।

—ঠিক বলেছিস। ওঃ, ভাবতেই ভয় করে। সেই জন্যেই তো ওদের দিকে ঘেঁষি না কখনও। ওরা হচ্ছে চীনে। যেমন মজবুত তেমনি মারমুখো। ওমুখো হওয়া ভদ্রলোকের কর্ম নয়। উচিতও নয়।

কুঙ্কুম বলল, তবেই ভেবে দ্যাখ। এ হেন চীনেরাই পারছে না জাপানিদের রুখতে। আমরা কোন্ ছার।

এমন সময় অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর ঘোষণা শুরু হল। জাপানি সেনা বাহিনী নানা রকম ছলনা করে পাশ কাটানি মোর্চা মেরে অতর্কিতে এগিয়ে এসেছে। কোহিমা আর মণিপুরের যোগাযোগের রাস্তার উপরে। অবস্থা গুরুতর। কিন্তু আয়ত্তের বাইরে মোটেই নয়। আমাদের সৈন্যরা কৌশল-অনুসারে আবার ঠাঁই বদলাচ্ছে। . .

হঠাৎ রেডিয়োর ঘোষণা ছাপিয়ে সেই পরিচিত পাগলামির আওয়াজ শোনা গেল—চিনি গো চিনি।

সমীর এই আকস্মিক ঘোষণা শুনে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। আর থাকতে না পেরে বেশ একটু আক্রমণের সুরে জানলার গরাদের ওপারে দাঁড়ানো পাগলাকে বলল, আর চিনতে হবে না। যারা চীনেদেরও চাটনি বানিয়ে দিয়েছে তারা এবার খাস আসামে ঢুকে পড়েছে।

কুঙ্কুমের মাথায় ঘুরছে মিলিটারি হিস্ট্রি। যুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু পড়েনি। ফ্রন্টের খবর কিছু বেরোয় না। কিছু খবর আর অবস্থা ব্যবস্থা এই প্রলাপের মধ্যে দিয়ে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। সে জানত যে পাশের গলিতে যে সরলবাবু আর গোপীবাবু থাকে ওদের এক বন্ধু মিলিটারিতে গেছে। এবং আসাম সীমান্তে সম্ভবত। ওদের ডেকে আনলে ওরাও হয়তো কিছুটা হদিস দেবে। দুই আর দুইয়ে একসঙ্গে করলে হয়তো চাউর না করা খবরগুলো চারের মতো বেরিয়ে যাবে।

কুঙ্কুম ছুটল সরল আর গোপীনাথের সন্ধানে। ওরাও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। কুঙ্কুম ওদের বলেছিল যে পাগল রেডিয়োর খবরে উত্তেজিত হয়ে জেগে উঠেছে।

ওরা এসে দেখল যে পাগল তখন সাংঘাতিক ভাবে উত্তেজিত। মুখের চেহারা একেবারে বদলিয়ে গিয়েছে। মুখটা যেন মারবার অথবা মরবার জন্য পণ করা একটি মানুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ। চোখ দুটোতে অসম্ভব শান দেওয়া ইস্পাতের ধার চকচক করছে। ডান হাতটা বাঁ হাতের সঙ্গে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে মেলানো। দুটোর মাঝখানে একটা বেয়নেট অনায়াসে বসিয়ে দেওয়া যায়। বাঁ-পাখানা একটু উপরের দিকে তুলে ধরে এগিয়ে দিয়েছে।

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।

* * * *

অ্যাম্ মেরিল্‌স্ ম্যরাডার, মেরিল্‌স্ ম্যরাডার, জেন্টলম্যান। গেস্, ইউ ডোন্ট নো।

হতভম্ব হয়ে ওরা রকে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। জলজ্যান্ত পাগল। জানলার গরাদের নিশ্চিন্ত আড়ালে। অভিনয় করছে যুদ্ধের। আর স্মৃতিচারণ করছে নিজের জীবনের। তন্ময় হয়ে দেখবারই কথা। ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ভিউ।

কিন্তু শুধু দেখা নয়, শোনারও কথা। মেরিলস ম্যরাডার জিনিসটা কী?

সরল আর গোপী পরস্পরের দিকে তাকাল। মার্ডার নয়তো? যুদ্ধের অছিলায় খুন? প্রেমের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে? তারই ধাক্কায় কি ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেছে? তবে যে বলে শেল শক?

গেস, ইউ ডোন্ট নো।

পাগলের আত্মঘোষণা আবার শুরু হল।

তোমরা জানো না ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেরিলের নাম। জেনারেল মেরিল—ইউ আমেরিকান জেনারেল, টেক মি ইন ইয়োর ব্যাটালিয়ান।

বলতে বলতেই পাগল এমন বীরদর্পে একখানা স্যালুট ঝাড়ল যে সরল যদি মেরিল হত সে-ও তার নিবেদন অগ্রাহ্য করতে পারত না।

অর্থাৎ জেনারেল মেরিল যেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

জেনারেল সাহেব, দশ বছর ধরে আমি আর আমার স্ত্রী একটা ছোট্ট ঘরে বাস করেছি। আমরা লোক খারাপ ছিলাম না। আমাদের যদি শুধু দুখানা ঘর থাকত আর একটা রান্নাঘর আর ওই বাচ্চাটার জন্য একটি আলাদা বিছানা—আমাদের বিয়েটা বোধহয় তছনছ হয়ে যেত না। কিন্তু দুটো ঘর আর একটা বাচ্চার খরচ কত সাংঘাতিক এই বাজারে।

একটু থেমে আমি বললাম, হাসছেন সাহেব? আমরা কিন্তু যেন একজন আরেক জনের ঘাড়ে চেপে দিন কাটাতাম। বৌ একেবারে হিস্টিরিয়ার মুখোমুখি। এদিকে আমি নিত্য আমার ছোট্ট চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশটা শুঁকতে পাচ্ছি। আর বাচ্চা, আমার সোনার বাচ্চা বড় হয়ে উঠছে আর বুঝতে শিখছে। আগেকার দিনে হলে ডুবে গেলেও লোকে আবার ভেসে উঠতে পারত হয়তো। কিন্তু এই বাজারে প্রত্যেক চাকরি ছাঁটাইয়ের পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে বেকারির অন্তহীন কুয়োটা। বাঙালি যে সত্যিই কূপমণ্ডুক।

জেনারেল সাহেব, আমি তো বরখাস্ত হয়ে আসামে পালিয়ে এলাম। আমার সোনার ছেলেটা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। বৌটা গেছে বাপের বাড়ি—অনাথাদের শেষ আশ্রয়।

নিজেকে টান টান করে সোজা দাঁড়িয়ে আমি বললাম, কিন্তু আপনার তিন তিনটে ব্যাটালিয়ান। মোট আড়াই হাজার লোক। তাতে ইনফ্যান্ট্রি, সিগন্যালার, ম্যুলেটিয়ার (অস্ত্র আর রসদ বইবার খচ্চর চালকদের দল) সবই তো আছে। আমায় সামান্য প্রাইভেট করে নিন—আপনার ইনফ্যান্ট্রিতে পদাতিক হয়ে লড়ব, মরব। ...কুলি করে নিলেও লড়ব আর মরব।

এই বলে পাগল একটু চুপ করল।

তারপর শুরু করল, নো? আমি সমতল ইন্ডিয়ার লোক, আমি পারব না, স্যার?

স্যার, আপনি জেনারেলে স্লিমের কথা ভাবছেন? উনি বলেছেন যে ব্রিটিশ টমি পৃথিবীর আর সব সৈন্যের মতো সমান লড়তে পারে। প্লাস টেন মিনিটস। আর ইটস্ দিজ মিনিটস দ্যাট কাউন্ট। টমি যে দশটা মিনিট বাড়তি লড়তে পারে তাতেই সব ফতে হয়ে যায়। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি স্যার যে, আমি বাঙালির বাচ্চা, আমিও ওই দশ মিনিট বাড়তি লড়তে পারি।

গোপী বলে উঠল, অদ্ভুত পাগল।

সরল বলল, না। পাগল বলব না।

স্বয়মও পাগলামি করে যুদ্ধে গেছে বলছে পাড়ার লোক। কিন্তু তুইও জানিস, আমিও মানি যে ওর মতো মাথা ঠাণ্ডা আর কারও ছিল না।

প্রাইভেট ততক্ষণে বলে চলেছে আপন মনে।

—স্যার, আপনার ফর্মেশন মার্কিন, গুর্খা, নিগ্রো, চীনা সবাই আছে। সবাই পারবে, আর আমি পারব না?

এই সবুজ নরকে পায়ে হেঁটে মরতে এগোতে হবে বলে আমি পারব না? আর্মিতে বলে যে জন চায়নাম্যান অর্থাৎ চীনে জোয়ানরা পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি কষ্ট সইতে পারে। সব চেয়ে বেশি হাঁটতে পারে।

স্বীকার করছি, স্যার, জন চায়নাম্যান যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানির চেয়েও বেশি নিখরচার সৈন্য। তার জন্য ট্রান্সপোর্ট দরকার নেই। সে তার সব মাল মায় অস্ত্র আর রসদ পিঠে বয়ে চলে। কাঁধে বাঁশের ভারা, তার এক প্রান্তে ঝোলে মর্টারের পায়া, অপর প্রান্তে তার ব্যারেল। রাইফেল আর অন্য বোঝাও সে বয়ে নেয়। পৈতের মতন কাঁধে আড়াআড়ি করে ঝোলায় ক্যানভাসের চোঙা ব্যাগ, তাতে রাখে এক হপ্তার চাল। দেড় মণ বোঝা বয় অথচ পায়ে শুধু ঘাসের চটি। আর মাইনে মাসে কুল্যে পৌনে তিন টঙ্কা।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে শুনতে শুনতে গোপী আর সরল দুজনেরই মনে পড়ল যে স্বয়ম্ জানিয়েছিল যে আমেরিকান ফ্লাইয়িং টাইগাররা মাইনে পেত মাসে সোয়া তিন হাজার টাকা। অবশ্য উড়ুক্কু বাঘদের টাকাও ঝড়ের মতো উড়ে যেত। মাসিক বোনাসের আড়াই হাজার টাকাও এক নিঃশ্বাসেই হাওয়া।

মনে পড়ল যে একই পথের যুদ্ধযাত্রী তাদের প্রাণের বন্ধু এই খবরটার সঙ্গে একটি মোক্ষম মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিল।

জীবন যৌবন ধন মান এই চারটের মধ্যে টিকিয়ে রাখার যোগ্য শুধু শেষেরটা। উড়ুক্কু বাঘরা তাই প্রথম তিনটেই খরচার পাকা খাতায় তুলে রাখে। কালস্রোতে নিঃশেষে ভেসে যাবার জন্য।

ওরা চুপ করে পাগলের ডবল মার্চ দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচাচ্ছে—ওয়েল স্যার, আর পৌনে তিন টঙ্কাও দরকার নেই। অমন চাঁদের মতো ছেলে শ্রীনিবাস অপুষ্টিতে মরে গেল। অমন সুখদুঃখের নিত্যসঙ্গী বৌ বিবাগী হয়ে গেল। আর আমি এলাম চায়ের বাগিচায়। বাগিচায় বুলবুলি তুই।

শেষের কথাগুলি সে গানের সুরে গেয়েছিল।

স্যার, মাই প্যাক ইজ অন মাই ব্যাক। অ্যান্ড আই ওয়াক ইন দি শ্যাডো অব ডেথ। আই ফিয়ার নো সন-অব-এ-বিচ।

বন্ধুরা পরিষ্কার দেখতে পেল যে পাগল মার্চ করছে ঘরের মধ্যে। ওর পদক্ষেপে ফুটে উঠেছে অভিযান, অভিনয় নয়। ওর পোঁটলা, অতীত স্মৃতির পোঁটলা ও বয়ে চলেছে। মৃত্যুর ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে ও কোনও কুত্তীর বাচ্চাকে ডরায় না।

ও যেরকম ভাবে মার্চ করতে লাগল তাতে কোনও সন্দেহ রইল না যে ও জেনারেল মেরিলের হানাদার দলে ঢুকে গেছে। এবং পদে পদে এগিয়ে যাচ্ছে।

* * * *

পাগলের আলাপ, প্রলাপ আর অভিনয়।

এগোতে এগোতে তার দুটি বাহু এরোপ্লেনের দুটো ডানায় পরিণত হল। গুম্ গুম্ করে বোমারু

বিমানের মতো আওয়াজ করতে লাগল। যেন নিচে, অনেকটা নিচে প্লেন নেমে এল। উপরে মেঘের চাঁদোয়া। নিচে গাছের পর গাছে বিছানো শ্যামল কার্পেট। হঠাৎ সে দড়াম করে একটি স্যালুট ঠুকে দিল। ঘোষণা করল, সুপ্রিম কম্যান্ডার, সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ড, অ্যাডমিরাল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।

তারপর সে স্যালুট করে মাথা নিচু করে 'বাউ' করল। প্রসন্ন মুখে বলল, নো ইয়োর এক্সেলেন্সি, ওটা জলের রুপোলি লাইন বটে। কিন্তু নদী নয়। ওটা লিডো রোড।

—লিডো রোড?

—ইয়েস, সুপ্রিমো, ওটা লিডো রোড। আমরাই কাঁচাখোঁচা বানিয়েছি। যদিও শুনেছি যে মার্কিন ম্যাগাজিনে লিখেছে যে ওটা টার ম্যাকাডাম রোড।

—তুমিও বানিয়েছ?

—ইয়েস সুপ্রিমো। আমিও। আমাদের দলে ছিল কালো বাদামি হলদে সাদা সব রঙের, সব জাতের লোক। এই আমাদের সত্যিকারের জগন্নাথ ক্ষেত্র।

—জগর নাউট? হোয়াটস্ দ্যাট?

—জগন্নাথ, স্যার। আমাদের সেরা তীর্থ। সেখানে মানুষে মানুষে কোনও তফাত নেই। কেউ কারও চেয়ে কম নয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেল শত্রুর মোকাবিলা করতে এসে। ধর্মক্ষেত্র আর যুদ্ধক্ষেত্রে দুই-ই সমান। দুশমনের সঙ্গে আমরা স্রেফ কুরুক্ষেত্র করে তবে ছাড়ব।

একটু দম নিয়ে পাগল আবার শুরু করল, হ্যাঁ, আমিও কম নই। ডাকসাইটে চীনে আর কালাপাহাড় নিগ্রোর চেয়ে শ্যামল বাঙালি আমিই বা কম যাব কেন? যে হাতে রাইফেল চালান শিখেছি সেই সম্মানিত হাত দিয়ে কাজের তাড়ায় বুলডোজার আর ক্যাটারপিলার পর্যন্ত চালিয়েছি। জঙ্গলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে মাথা ঢুকিয়েছি। মেঘের উপর চালিয়েছি পা। জলাভূমি করেছি ভরাট আর খোদাই করেছি নীরেট পাথর। আমি কারও চেয়ে কম নই। পাটকাই বুম গিরিমালা থেকে মোগঙ্গ উপত্যকা সমানে চষে ফেলেছি।

*　　*　　*　　*

ওহ্ সার্জেন্ট, হ্যালো সার্জেন্ট, হোয়াট ফান?

—নো ফান? মজা নয় তো মুখখানা অত হাসিমাখা কেন? যেন রসগোল্লার গামলায় মুখ চালিয়ে এসেছ।

পাগল মুখখানা নিজেই হাসিতে ভাসিয়ে দিল। বর্মার জঙ্গলে দুশমন হামলার সময় রসগোল্লায় স্মৃতিতে হাসি ফুটবে ওরই মুখে। ওর ছেলে মরেছে না খেয়ে, বৌ বিবাগী। হাসবে তো ও-ই।

বন্ধুদের চোখে ততক্ষণে জল ছলছল করছে।

—ওহ্, সার্জেন্ট, তোমার গিন্নি এই লিখেছে তোমায়? তা যাই লিখুক, বেচারি বিরহিণী এই সব কথা ভেবে শান্তি পাচ্ছে তো? তাই-ই য-যথেষ্ট। আর্মি পোস্ট অফিসে ভাগ্যিস ঠিকানা দেয় না।

—হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট। বৌ বেশ খাসা লিখেছে। সে ভাবছে তুমি একটি গ্যারিসন টাউনে আছ? চির বসন্তে ঘেরা পুনা শহরে বোধ হয়? খাস বিলেত থেকে আমদানি নাচিয়ে গাইয়ে সুন্দরী "এন্‌সা" আর্টিস্টরা তোমার দিলকে সুখের দরিয়ায় তালে তালে প্রেমে দোলা দিচ্ছে। আহা, বেচারি ভেবেও এত সুখ পাচ্ছে। তোমায় হিংসা করছে এটা জেনে আমিও সুখ পাচ্ছি। এই তোমার হয়ে আমি ওকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিলাম।

সত্যি সত্যি পাগল শূন্যে একটি চুমু ছুড়ে দিল।

বাইরের রক থেকে বন্ধুরা তার আওয়াজ পর্যন্ত পেল।

আর আওয়াজ পেল দুর্বার বেগে বন্যার স্রোতে পার ভেসে যাওয়ার। সে মুখ দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে লাগল। কলকাতার মানুষ ওরা। বন্যা দেখেনি। গঙ্গার জোয়ার পর্যন্ত ভালো করে নজর করে দেখেনি।

সম্ভবত থোড় বড়ি খাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জীবনে এরকমই হয়।

*　　*　　*　　*

অফ কোর্স, অফ কোর্স, স্যার। মাউন্টেন ম্যালেরিয়া অ্যান্ড মনসুন আর আওয়ার এনিমিস ফ্রেন্ডস্। সত্যিই পাহাড়, ম্যালেরিয়া আর ঘোর বর্ষা বর্মার সীমান্তে শত্রুরই সাহায্য করছে। ওরা আমাদের চেয়ে বেশি কষ্ট সইতে পারে। না, স্যার, আমরাও পারি। ওই, ওই খচ্চরটা লাল কাদায় ডুবে তলিয়ে যাচ্ছে। আরে, আরে ওর পিঠে যে আমাদের পাওয়ার শোভেলের ডায়নামো পার্টস রয়েছে। ধরো, ধরো।

আর কেউ ধরতে এগিয়ে গেল না। আমার কেউ নেই। আমিই একা দৌড়ে গিয়ে পার্টসের বাক্স আঁকড়ে ধরলাম। তার নিচে থেকে খচ্চরটা কাদার মধ্যে তলিয়ে গেল। আমার পা দুটো নিচে নেমে যাচ্ছে। যাচ্ছে। যাচ্ছে। আমি হাঁটু গেড়ে কাদার উপর একটি পাটাতন তৈরি করে আটকে থাকার চেষ্টা করছি। না. এবার তলিয়েই যাব। যাই যাব, আমি সবার চেয়ে উঁচু মাথা নিয়ে নিচে তলিয়ে যাব।

না। আমি গেলাম না। একটি নিগ্রো ল্যাসোর মতো দড়ি ছুড়ে আমায় আটকে ফেলল। এই, এই যে হড়হড় করে আমি গড়িয়ে চলে আসছি। দু হাতে জাপটে ধরে রেখেছি বাক্সটা।

ক্যাপ্টেন আমার লাল কাদায় মাখা মুখের উপর থেকে নিজের হাতে কাদা সরাতে সরাতে বলল, তুমি পাগল। পাগল না হলে কেউ এমনভাবে বীরত্ব দেখায়? তোমার নামে স্পেশ্যাল ডেসপ্যাচ দেব। তুমি পাগল। কিন্তু প্রমোশন পাবে।

বন্ধুরা এই মুখর অভিনয় দেখে যাচ্ছে।

পাগল হাসি মুখে সটান হয়ে স্যালুট করল। ইয়েস স্যার, আমি পাগল।

আমার ক্যাপ্টেন কী সোজা লোক। রোদে পোড়া লাল টকটকে হাত দিয়ে আমার কাদামাখা হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, এসব কাজের জন্য পাগল হবার দরকার নেই। তবে এতে কখনও কখনও সুবিধা হয়। ইট হেল্‌প্‌স।

* * * *

হঠাৎ পাগল তরোয়াল দিয়ে গলাকাটার ভঙ্গি করতে লাগল। তার পর চেঁচাতে শুরু করল, নো, নো। বাই জোভ! মঙ্গোলিয়ানরা যতটা দুঃসাহসী ভেবেছিলাম ততটা নয়। আশ্চর্য! জেনারেল স্টিলওয়েলের বাচাই করা ২২ নং চীনে ডিভিশনের সৈন্যদের চেয়ে আমরাই আগে জাপানি বাঙ্কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একটা হুঙ্কার দিয়ে আমি লাফিয়ে পড়লাম প্রথম বাঙ্কারটাতে। বাই জোভ, হেরে যাবার ভয়ে, বন্দী হবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত জাপুরা নিজেদের বেল্ট দিয়ে গলা বেঁধে আত্মহত্যা করেছে। কেউ কেউ হারিকিরি করেছে। কী আশ্চর্য, সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম একা। আমায় একা পেয়ে মারবার জন্য কেউ বেঁচে নেই। এমনকি যারা গাছের ডালে ডালে লতাপাতায় লুকিয়ে আমাদের চোরা গুলিতে স্নাইপ করে মারছিল তারা পর্যন্ত মরে আছে। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে যায়নি। সবারই দেহ দড়ি দিয়ে গাছে বাঁধা। পালানোর পথ বন্ধ করবার জন্য। মন্ত্রের সাধন ওরা এরকম করেই করে। আশ্চর্য।

* * * *

মা, এবার মলে সাহেব হব।

রবিঠাকুরের এই গানটা আমি বদলিয়ে নিয়েছি।

এবার মলে জাপানি বন্দী হব। এতদিন একটিকেও বন্দী করা যায়নি। যাবে কী করে? আমিই তো একটি সৈন্যের পকেট থেকে জেনারেল সাটোর অর্ডার অব দি ডে বের করেছিলাম। অর্ডার দিয়েছে যে মরণকে পাখির পালকের চেয়ে হালকা মনে করো। মরা পর্যন্ত লড়ে যাও। মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়ে লড়ে চল। বাস্ রে বাস।

তবু প্রথম জাপানি বন্দী ধরা পড়ল মোটে ক'মাস আগে। এই ১৯৪৪-এর জানুয়ারি মাসে।

যেন বন্দী হয়নি এই জাপানি। একেবারে নৈকষ্য কুলীন জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি।

খবরটা পেয়েই তো জেনারেল গ্রেসি নাচতে শুরু করেছিলেন। একেবারে সরাসরি টেলিফোন কোর্ হেডকোয়ার্টার্সে। ওরা হুকুম দিল যে যদিও ছোটস্য ছোট একটি সেকেন্ড ক্লাস প্রাইভেট, ওকে জেনারেলের মতো খাতির আত্তি করো। যেমন করে হোক এই ভারী জখম জাপানিকে মরতে দিয়ো না।

সঙ্গে সঙ্গে জীপে করে ছুটল খোদ আর্মি মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তা ব্রিগেডিয়ার তার সব স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার আর ওষুধপাতি নিয়ে। মায় বিলিতী ব্র্যান্ডি।

কিন্তু জঙ্গী জামাই স্ট্রেচারের সুখশয্যায় শুয়েও দু পাশের পাহারাদার অফিসারদের হাত দিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষা করতে লাগল—মেরে ফেল। আমায় খতম করে দাও।

যতই চিকিচ্ছে কর আর লালপানি পিলাও জামাই বাবাজীবন শ্বশুরবাড়ি যেতে নারাজ। ভেলায় ভাসিয়ে লক্ষ্মীন্দরকে একটি নদী পার করার সময় সে গড়াগড়ি খেতে লাগল যাতে ভেলা উলটে ডুবে যায়। কিন্তু এমন জামাই আদর দুনিয়ায় কে কোথায় পেয়েছে।

আমি যদি জাপানি জামাই হতাম ভিখ মাঙতাম আমার বাল গোপাল, আমার শ্রীনিবাসকে। আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তার ডাকনাম 'চিনি'। সেই চিনিকে বাঁচিয়ে দাও।

* * * *

কুড়ি দিন—প্রায় কুড়ি দিন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে সাত হাজার ফুট উঁচুতে একটি 'পাস' পার হয়ে এসেছি। আর পারি না। চীনে, নিগ্রো ওরাও হয়রান, কিন্তু আমাদের মতো নয়। তবু আমি হামা দিয়ে হেঁটেছি। পারতাম না। কিন্তু একটি বর্মার ট্রাইব্যাল চিন উপজাতির ছোকরা মেরিল সাহেবকে দেখতে চায়। ওর বাপকে জাপানিরা মেরে ফেলেছে। মাকে নিয়ে গেছে। ও এখন মেরিল সাহেবকে বলতে চায় যে ও লড়াই করবে। বলে—আমিও লড়াই করব। মরতে ভয় পাই না। কিন্তু অন্ধকারে ভয় করে। তাই আমায় সঙ্গে নিয়ে চল।

কেন ওর উপর আমার মায়া পড়ে গেল? কেন ওকে মাল বইবার তল্পিদার করে সঙ্গে নিলাম?

এই প্রশ্ন করেই পাগল হাত বুলোতে লাগল কোনও অদৃশ্য অশরীরী একটি চীন বালকের গায়ে মাথায়।

হঠাৎ পাগল উত্তেজিত হয়ে উঠল, জঙ্গলের মধ্যে একটা এয়ার ফিল্ড দেখা যাচ্ছে। হুররে হুররে! আমরা জানতাম না যে এখান থেকে হঠাৎ হঠাৎ জাপানি প্লেন হামলায় বেরোয় সেটা অজানতে আবিষ্কার করে ফেলেছি। লাফিয়ে উঠে ধাওয়া করলাম। নরক গুলজার।

স্ট্রাইক। স্ট্রাইক। মেয়েদের হাতের শৌখিন হাত পাখার মতো আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। বিমানঘাঁটি প্রায় দখলে এসে গেছে।

হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার! দুশমন পালটা হামলা করছে। জাপানি জিরো ফাইটার প্লেন এক ঝাঁক বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। চীন বাচ্চাকে নিয়ে মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ফট ফট ফটাস ফট। না, এ যাত্রা আমার চিনি, আমার শ্রীনিবাসকে বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু কই আমার চীনে সঙ্গীরা? ওদের সঙ্গে যে অ্যাক অ্যাক কামানগুলো। অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট কামান ছাড়া জাপানি প্লেনকে ঠেকানো যাবে না। কই চীনেরা?

ওরা পাশের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে। তা বলে দুশমন তো ছাড়বে না। শেলের শিলাবৃষ্টি শুরু হল। ওই, ওই শেলটা আমাদের উপরই আসছে। চিনি কেঁদে উঠতে গিয়ে বোবা হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল। অন্য চোখটা একটি শেলের ফুটানিতে আগেই বুজে গেছে। তবু, তবু আমার চিনি, তোকে তোর বাবা এবার বাঁচাবেই। এই শেলের ধাক্কাটি আমার উপর দিয়েই যাক। আমি শুয়ে না পড়ে তোকে আড়াল করে রাখছি। শেলের সামনে শুয়ে পড়ে তো তোকে বাঁচাতে পারব না।

না। পারলাম না। ধাক্কার চোটে আমি...

পাগল আর কিছু বলতে পারল না। শুধু ধড়াস করে মেজেতে আছড়িয়ে পড়ল। নির্বাক, নিস্পন্দ। নিঃসহায় ভাবে সংজ্ঞাহীন। শুধু একটি হাত একটু উপরের দিকে উঠেছিল। শুধু একটু।

* * * *

সরল আর গোপীনাথ ছুটে গেল কোনও ডাক্তারের সন্ধানে। যেমন করে হোক একজন ডাক্তার চাই। যা খরচ লাগে লাগুক।

ডাক্তার এসে সাময়িক ওষুধপত্র দিলেন। ওরা জিজ্ঞেস করল, মিলিটারিতে খবর দিলে কোনও লাভ হবে কি?

ডাক্তার বললেন, মিলিটারিতে খবর দিয়ে হবে কী? ঠিক কোথায় যে খবর দিতে হবে তাও জানা নেই। তবে চেষ্টা করতে পারেন। মিলিটারিরা হয়তো শুধু বলবে যে ডমিসিলিয়ারি ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ গৃহ চিকিৎসাই এর পক্ষে সেরে উঠবার সব চেয়ে ভালো উপায়; আমরা তো সেজন্যই মাসোহারার ব্যবস্থা করে ওকে শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়েছি। হঠাৎ একটি দারুণ যুদ্ধের খবরে শকটা বেড়ে গিয়েছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত হয়তো বলবে যে ডাক্তারিমতে যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ আঘাতে বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু সৈন্যের চোখের সামনেই মৃত্যু দেখলে হঠাৎ "কমব্যাট ফ্যাটিগ" যুদ্ধে ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। তখন এরকম মানসিক ক্রিয়া হয়। এই রকম হাত পা ছোঁড়া লম্ফঝম্ফ, আনমনে অভিনয় সবই সে সময় স্বাভাবিক। আবার কিন্তু আরেকটি ভীষণ আঘাতের ফলে সেটা সেরেও যেতে পারে। অতএব "হোপ ফর দি বেস্ট" বলে হাত বাড়িয়ে মিষ্টি হেসে বিদায়ও করে দেবে হয়তো। ধুলো পায়ে।

বন্ধুরা ভাবল,—তবু ওদের জানাতে হবে। যদি বিশেষ কিছু চিকিৎসা হয়। স্বয়ম্‌ও যে ওই ভীষণ সীমান্তেই রয়েছে।

॥ ত্রিশ॥

জমজমাটি পার্টি।

ককটেল পার্টি। এ ছাড়া নয়া দিল্লিতে স্মার্টনেস হয় না। রেসপেক্টবিলিটি হয় না। চটক আর চেয়ার যদি না রইল তাহলে আর রইল কী?

এবং আঙ্কল স্যানিয়াল নয়া দিল্লির সাহেব-ঘেঁষা সমাজের ওপর তলায় আছেন। তা ছাড়া জানেন যে সেখানে টিকে থাকতে গেলেও চাই সাধনা। বৈঠায় ভর দিয়ে বিশ্রাম করেছ কী নামতে শুরু করলে।

জবরদস্ত সেক্রেটরিয়াট অফিসাররা গোটা দেশ শাসন করেন বলে শোনা যায়। তারাও নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন যে নিউ দিল্লি হচ্ছে একটা হাত থেকে পিছলিয়ে যাবার মতো ডাণ্ডা।"গ্রিজি পোল" অতএব অহরহ পিছলিয়ে যাবার ভয় মনে রেখে উপরে ঝাণ্ডাটির দিকে চোখ রাখ। উপরে উঠবার জন্য আমড়াগাছি করো।

স্বাতীর বাবা মার স্বভাবতই আঙ্কল স্যানিয়ালের কথাই মনে হল।

বেচারি স্বাতী। দেশে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পর থেকেই কেমন যেন বদলিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য ওর পুরানো বন্ধুবান্ধবীরা ওর দিকে বেশি ঘেঁষত না। তার কারণ বুঝতে পারা শক্ত নয়। কিন্তু ও নিজেও তো তাদের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করল না। বিশেষ কোনও নতুন বন্ধুবান্ধবও তৈরি করবার চেষ্টা করল না।

এটা কেমনতর ব্যাপার?

আর মেয়েটার দিনই বা কাটে কেমন করে? এই যুদ্ধের বাজারে, ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে শুধু মেয়েদের নয়, যেন সব বেসামরিক লোকেরই গতিবিধি কমে গেছে, কাটছাঁট হয়ে গেছে।

তার উপর কিছুদিন থেকে ক্লাবে যাওয়া, এমন কি রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে সময় কাটাতে যাওয়া—তাতেও স্বাতী আর আনন্দ পাচ্ছিল না।

দিনের পর দিন ওর যেন সময় আর কাটছিল না। সারাদিন কিছু করবার নেই। একটা বই, একটি কবিতা, একটু আড্ডা, একটু কফির জন্য মেলামেশা কিছুই মনকে টেনে রাখে না।

সে নিজেও নিজেকে ব্যস্ত রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল। সংকটত্রাণ আর সমাজকল্যাণ সমিতিগুলিতে যোগ দিল। সাময়িকভাবে সামরিক কাজে এদেশে আসছে অনেক বিদেশী পণ্ডিত। তাদের বিশেষভাবে আয়োজিত বক্তৃতা—একটাও সে বাদ দেয়নি। ম্যাটিনিতে ক্ল্যাসিক্যাল কনসার্ট আর চ্যারিটি শোতে সহায়তা করতে গিয়ে সময় কাটানো—সব কিছুতেই মন দিতে চেষ্টা করেছে।

তবু হায় মন লাগেনি কিছুতেই।

একটি নারীর একক মনে যখন প্রেমের স্পর্শ লাগে তখন সেই প্রেমকে সে মুখে স্বীকার করুক আর না-ই করুক মনে তার অনুরণন উঠবেই।

সেতারের তারে একবার আঙুলের ছোঁয়ায় একবার ঝংকার ওঠে; একটুখানি ধ্বনির পর মিলিয়ে যায়। কিন্তু নারীর মনের তারের ঝংকার সুর সৃষ্টি করে তোলে। তা কি সহজে মিলাতে পারে?

নিজের সামাজিক গণ্ডিতে উপর-উপর দেখানো স্বাধীনতা, কাজের আর কথার স্বাধীনতা সত্ত্বেও কুমারী মেয়েদের কী অবস্থা হয় তা দুয়েকটি কথার আঁচড়ে স্বাতী স্বয়ম্‌কে জানিয়েছিল। স্বয়ম্ বিস্মিত হয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল। তবু সেকথা অন্য দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু অবস্থার তো মোড় ঘোরে না।

স্বাতী জানত যে সব ভারতীয়, শুধু ভারতীয় কেন, পাশ্চাত্য বাপ মা-ই মনে করে যে মেয়েদের এগিয়ে চলার এক মাত্র পথ হচ্ছে বিয়ে। বিশেষ করে এদেশে। কারণ এদেশে কোনও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে দেশের জন্য যুদ্ধের কাজে আত্মনিয়োগ করবার যুক্তি বা পরিবেশ বা প্রয়োজন কিছুই পাবে না। দামি পেট্রল খরচ করে কমিটিতে বসে মোজা বোনার শৌখিন ব্যবস্থায় স্বাতীর মন ওঠে না।

অথচ বাইরের, এমন কি নিজের সমাজের বাইরের যে সব লোককে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কাছে এসে

স্বাতী তাদের মনে করেছে বিস্বাদ, এমন কি দুঃসহ। সে জেনেছে যে বাঁচতে গেলে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু আনন্দের এমন কি বিলাসের ব্যবস্থাও চাই। কিন্তু এই কিছু দিনেই সে জেনেছে যে শুধু তাই নিয়ে বাঁচা চলে না।

ভাবতে ভয় হয়। কিন্তু ভাবনাটি যে সত্যি।

সে একবার বেপরোয়া হয়ে নিজের চারদিকে কিছু অবস্থাপন্ন আধুনিক আর চালু তরুণের সার্কল তৈরি করল। সে নিজেকে তাদের স্তরে নামাবে না। কিন্তু হয়তো ওরা কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেবে।

হরি! হরি! সব যুবকই বক। রাজহংস দেখা গেল না একটিও। কেউ হয়তো আপত্তিজনক ভাবে স্নব, নাক উঁচু রাখার বাহাদুরিতে ওস্তাদ। কেউ হয়তো অলস বিলাসে বা মর্যাদার মার্কামারা চেয়ারে দিন কাটায়। একটু ছাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেই উদ্দেশ্যহীন অকারণ অহংকার আগুনের মতো গনগন করছে দেখা যায়।

স্বয়মের বিদ্যার আলোয় উজ্জ্বল মাঝাঘষা মন ছিল। তাই কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত তরুণকেও স্বাতী এই নতুন গোষ্ঠীর মধ্যে আমন্ত্রণ করল। এই যুদ্ধের কালোবাজারে চটকদার পরিবেশ আর চমৎকার আহার বিহার খুবই আনন্দের। তা আরও আকর্ষণীয় মনে হয় কোনও মোহিনী তরুণী যদি নিমন্ত্রণ করে। ওরা তো বইয়ে পড়া প্যারিসের রসে ভরা সালোঁগুলির সন্ধান কলকাতাতেই পেয়ে গেল।

অবশ্য কেউ জানত না যে এই সব নিমন্ত্রণের সামনে স্বাতী থাকলেও পিছনে নিয়ন্ত্রণ করছেন তার বাবা মা। বিচক্ষণ লোক ওঁরা। সমাজে বহু দেখে বহু শিখেছেন। ওঁদের চোখে স্বাতীর মানসিক অবস্থা ধরা পড়তে দেরিও হয়নি। ভুলও হয়নি। এ পাড়াতে প্রমথ চৌধুরী বীরবলের আসর খুলে ছিলেন। কিন্তু স্বাতীর আসরে কেউ প্রণয়ী চৌধুরী হয়ে উঠতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও।

স্বাতীরও ভুল হয়নি এদের সবাইকে বুঝে নিতে। চিনে নিতে। সবাই শুধু আমি নামক আত্মনেপদী শব্দটিকে পরম ব্রহ্ম মনে করে চলে। ওরা বিভিন্ন স্তর আর শ্রেণী থেকে এলেও সবাই নিজেকে সব চেয়ে বড় সব চেয়ে প্রার্থনীয় মনে করত। মনে মনে নিজেরা নারীকে প্রার্থনা করত বলেই ওরা নিজেদের প্রার্থনীয় বলে মনে করত। বড় বড় আদর্শ, চিন্তাধারা প্রভৃতি সম্বন্ধে সবচেয়ে চালু কথাগুলি নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করত।

কিন্তু সব কিছু আলোচনাই শুধু ড্রয়িং রুমের আলাপের ফুলঝুরি।

ফুর ফুর করে শূন্যে আলোর কণা ছিটিয়ে দেয়। তার পরেই সব ছাই। সব নিঃশেষ।

এদিকে কলকাতায় মন্বন্তরের কান্না যেমন প্রবল হয়ে উঠল তেমনি যুদ্ধের বাজার সবগরম। জাপানি বাহিনী দেশের দিকে হঠাৎ এগিয়ে আসতে পারে। আরাকানে মিত্রপক্ষের আগুয়ান দল ভীষণ মার খেয়ে সরে এসেছে এসব খবর বের হতে লাগল।

স্বাতীর নক্ষত্রমণ্ডলে কিন্তু সে নিয়ে কোনও বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল না। আর্মি পোস্ট অফিসের ছাপ মারা ঠিকানাহীন চিঠিগুলি খবরহীন, কিন্তু ভরসায় ভরা। রেডিয়োতে বুঝেসুঝে শুনলে সে ভরসা কিন্তু করা যায় না। একদিন সন্ধ্যায় একটা উদ্বেগের খবর যখন ওদের আড্ডাকে চঞ্চল করে তুলল তখন একজন হঠাৎ বলে বসল, দিন না মশায় ওটার সুইচ বন্ধ করে। কান মলে বন্ধ করে দিন।

আরেক জন সায় দিল, ঠিক বলেছ, দাও না ওটার কান মলে। যত্তো সব 'কিল-জয়'। আমোদকে খতম করে ফেলে।

অথচ সে নিজে উঠে গেল না রেডিয়োর কাছে।

স্বাতী এক লহমাতে এদের স্বভাব বুঝে নিল। বিরক্তি আর বিদ্রূপ চেপে রেখে হেসে বলল, বা রে, রেডিয়োটি কী দোষ করল যে ওটার কান মুলতে চাইছেন আপনারা। যান না এগিয়ে। আরাকানে দুশমনের কান মুলে দিয়ে আসুন। তখন ঘরে বসেই নির্ঝঞ্ঝাটে রেডিয়ো শুনতে পাবেন। মায় যুদ্ধের খবর পর্যন্ত।

বিলেত-ফেরত মিসিবাবা যে রকম লেপাপোঁছা ভাবলেশহীন মুখে কথাগুলো বলে গেল তাতে অবশ্য এই লক্কা পায়রাদের মুখ বন্ধ হওয়া আশা করা যায় না।

বরং একজন তার চেয়ারের হাতল জোরে চেপে ধরে বলল, ওসব হচ্ছে জোয়ানদের কাজ। আমরা কেন এসবের মধ্যে যাব? দিই না আমরা ওদের মাইনে? দিই না রসদ আর ইউনিফর্ম?

স্বাতী হেসে বলল, তাহলে ওদের নিজেদের কাজ করতে দিন। দূর থেকে সমালোচনা করে ওদের মনোবল দুর্বল করে দেওয়া ঠিক নয়।

সেদিন রাতে একা বসে বসে স্বাতী এই সব নতুন বন্ধুদের যাচাই করে দেখল। এরা শিল্প, সাহিত্য, হাই লাইফ, উঁচু মহলের জীবন এসবের আলোচনা করে।

কিন্তু এ সবই হচ্ছে সবলের সম্পদ। ঈগল পাখি আকাশ থেকে নেমে এসে তার ভোগের বস্তুকে তুলে নিয়ে যায়। অসীমের মুক্ত বাতাসে আলোতে তাকে উপভোগ করে। তেমন করেই এসব উপভোগ করতে হয়। সেজন্য চাই বলিষ্ঠ হাত আর দুঃসাহস। এই যাদের দেখছি, যাদের সঙ্গে মিশছি এরা তো শুধু সামান্য চিড়িয়া। এরা কেঁচো নিয়ে কারবার করে।

প্যারাট্রুপ অফিসার স্বয়ম্ হচ্ছে ঈগল পাখি।

স্বাতী আরও ভাবল। জীবন একটা বিরাট মনোভূমি। শুধু পৃথিবীতে টিকে থাকাই জীবন নয়। সে ভূমিতে কি সকলের পা ফেলে হাঁটবার যোগ্যতা থাকতে পারে? সেখানে পদার্পণ করাই তো একটা মহা আনন্দ, মাদকতাময় সোনারঙের শ্যাম্পেন। স্বয়ম্ প্যারাট্রুপ অফিসার। ওই ঈগলের মতো মহাকাশ থেকে নেমে আসে। তার মাথার ক্যাপটা যেন গ্রীক বীরের বিজয়ের পুরস্কার লরেল পল্লবের মালা।

এর পর ওর বাবা মা ওকে দিল্লিতে পাঠালেন। আঙ্কল স্যানিয়ালের কনট সার্কাসের ফ্ল্যাট। সেখানে পার্টি জমে প্রতি সপ্তাহে এক সন্ধ্যায়। স্বাতীর ভালো লাগবে স্থান পরিবর্তন আর নতুন পরিবেশ। আর যদি লাগে মনে নতুন কারও রঙের পরশ? বাবা মায়ের মনে এই রকম একটা গোপন বাসনা ছিল।

সেইজন্যই এই জমজমাটি পার্টি।

জগতের বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্মৃতিটুকু নিয়ে বসে থাকা সেই পার্টিতে একেবারেই অসম্ভব। জায়গাটা হল দিল্লি। যেখানে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য নতুন গড়ে উঠেছে পুরানোকে হটিয়ে দিয়ে। মানুষের মন তো সামান্য কথা। যুদ্ধের বাজারেও বণজয়ের চেয়ে মনজয়ের মহড়া চলছে বেশি।

বিশ্বাস না হয় যে কোনও জঙ্গী বীর বা বেসামরিক অফিস বা সরকারি দপ্তরের অফিসারকে তার অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করে দেখুন।

স্বাতীর কাছে শূন্য, সব শূন্য। শুধু পূর্ণ করে আছে মনকে একটি গোপন আবিষ্কার। কোনও কিছু দিয়েই তাকে সরানো যাবে না। তাই স্বাতী সেই পার্টিতে সাধারণ ভাবে সাজগোজ করে উপস্থিত হল।

রূপের, স্মার্টনেসের, ফ্যাশনের অদৃশ্য পাল্লা সেখানে চলবেই। তার মধ্যে এসে দাঁড়াল একেবারে অনন্যা।

অবিবাহিতা মেয়েদের জহুরি আর ইঙ্গ-ভারতীয় উপরতলার বিয়ে প্রভৃতির সব চেয়ে সফল প্রজাপতি হচ্ছেন মিসেস স্যানিয়াল। তিনি পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করলেন যে যার অত শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আর সুরুচি তার নকল মেক আপের কোনও দরকারই নেই।

এমন একটা ঝকঝকে স্ত্রী-পুরুষের মেলায় স্বাতী মনে মনে স্বয়ম্‌কে এনে দাঁড় করাল। চোখ একটু বুজে ভেবে নিল রবীন্দ্রনাথের রচনা।

কেমন বীর মূরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা।

তাবপর সে ঠিক করে নিল যে আজ কোনও চটুল কথা নয়। নয় কোনও চপল উত্তর-প্রত্যুত্তর। নয় কোনও ঝিলিকমারা চাহনি বা চমক-জাগানো হাসি। স্বয়ম্ অবশ্য তাকে কোনও বন্ধনের মধ্যে রেখে যায়নি। তবু সেই মুক্তিকেই স্বাতী সবচেয়ে বড় বন্ধন মনে করেছে। তাকে সম্মান দিয়েছে। মনের গভীরে লালন করেছে।

কিন্তু আঙ্কল স্যানিয়ালের পার্টিতে ওস্তাদ জহুরির অভাব কোনও দিনও হয় না।

মাথায় রাজ্যের ঢেউ-খেলানো চুল আর মুখে মিষ্টি মাখানো হাসি নিয়ে এক যুবক স্বাতীর সামনে এসে দাঁড়াল।

স্বাতী হালে বিলেত থেকে ফিরেছে জেনে চটপট অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করল।

সে বলল, দেখুন ঠিক আপনাকেই আমি যেন এতদিন খুঁজছিলাম। আমি অবসর সময়ে সাইকলজির ফলিত (প্র্যাকটিক্যাল) প্রয়োগ নিয়ে চর্চা করে থাকি। বিশেষত বিলেতে শিক্ষিত কুমারী ভারতীয়াদের। আপনার জীবনের সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার থিসিস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুমতি হলে আপনার সঙ্গে আরেক দিন যদি...

এদিকে পিছন থেকে কার ছায়া এসে পড়ল, ওঃ, আবার বুঝি তুমি কুমারী মনের থিসিস নিয়ে শুরু করেছ, ডার্লিং?

স্বাতী মুখ তুলে দেখল পাশে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। সুবেশা আর আক্রমণের ভঙ্গিতে সজাগ। মুখের ঘন প্রসাধনের ছোপকে ছাপিয়ে উঠেছে একটা অধিকার বোধের ছায়া।

আমতা আমতা করে মনস্তাত্ত্বিক যুবক পরিচয় করিয়ে দিল, প্লিজ মিট মাই ফিঁয়াসী।

বাগ্‌দত্তার মুখ মোটেই কোমল হল না।

ভিতরে ভিতরে স্বাতীর অসহ্য লাগছিল। অন্য সময় হলে সে শেরি দিয়ে শুরু করত। আজ কিছু ভালো লাগছে না বলে হাতে রয়েছে আপেলের রস। কিন্তু কিছুতেই মন উঠছে না। হাতে গোটাকয়েক ক্যাশু নাট নিয়ে সে ঘরের এদিক থেকে ওদিক বিচরণ করতে লাগল। যেন আর কাউকে খুঁজছে।

হঠাৎ যেন কাঁধের কাছে একটা মসৃণ টাইয়ের ছোঁয়া লাগল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, আরেকটি যুবক। একেবারে কেতাদুরস্ত পোশাক আর তার চেয়ে বেশি পালিশদুরস্ত ব্যবহার।

পরনের সুটের ইস্ত্রি, চরণের জুতোর পালিশ আর মাথার চুলের ব্যাক ব্রাশ পাল্লা দিয়ে সমানভাবে কড়া। কোনও বিদেশী কোটি কোটি টাকার কারবারের স্থানীয় উঁচু সাহেব না হয়ে যায় না। দিল্লির মাজাঘষা সাপ্লাই দপ্তরকেও টেক্কা দিয়েছে।

—মাপ করবেন। আজকের সন্ধ্যাটা আপনার জমে উঠছে না মনে হচ্ছে। আপনার সেবায়...মানে, অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।

এত কড়া ইস্ত্রি আর চড়া চেহারায় ভিতর থেকে এত মোলায়েম কথা বেরিয়ে এল যে স্বাতী তার আচমকা টাল সামলাতে পারল না। অর্ধস্ফুট স্বরে শুধু বলে উঠল, ওহ্!

—মাপ করবেন—যদি আপনাকে চমকিয়ে দিয়ে থাকি। আমি শুধু আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চেয়েছিলাম।

—এই তো বেশ। কথা কওয়া যাক।

স্বাতী ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে কিন্তু যুবকটি ততক্ষণে আবার ওকে বেসামাল করে আনছে। খুব মিষ্টি হেসে মাখনের মতো মসৃণ গলায় জিজ্ঞেস করল, বলুন তো, আপনি কার কাছ থেকে পালাচ্ছিলেন?

ইতস্তত করে স্বাতী উত্তর দিল, না না, পালাব কেন? মানে একজন পুরানো পরিচিত...

আরও নিবিড়ভাবে হেসে যুবক বলল, আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি একজন নতুন আর অপরিচিত।

বলে সে আরও এক ঝলক হাসল। শুধু মুখ নয়, শুধু ঠোঁট নয়, চোখও সেই হাসির ঝিলিকে যেন নেচে উঠল।

স্বাতীর মনের বরফ যেন হঠাৎ গলে যেতে লাগল। যেন মেঘের আড়াল থেকে অনেকক্ষণ বাদে চাঁদ একটুখানি বেরিয়ে এল। মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে সেও এই হাসিতে যোগ দিল। তার গলায় লন্ডনের বিরাট ডিপার্টমেন্ট স্টোর সেলফ্‌রিজ থেকে কেনা নকল মুক্তার মালার সঙ্গে দাঁতের আসল মুক্তার হাসি একসঙ্গে ঝিলমিলিয়ে উঠল।

যুবক এই সুযোগ ছাড়ল না। আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে হেলিয়ে বলল, আমি খুব বড় একটা পুরস্কার পেলাম। এমন তো কিছু হাসির কথা বলিনি। তবু আপনি এত খুশি হয়ে উঠলেন।

হঠাৎ যেন বুকের কাছে নিঃশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠল স্বাতীর। সে বলল, না, না, আমার বেশ ভালো লাগল, তাই। সঙ্গে সঙ্গে তার সুন্দর আঙুলগুলি যেন একটা বরাভয় মুদ্রার ভঙ্গিতে অজানতেই লীলায়িত হয়ে উঠল।

মাথা আবার নুইয়ে 'বাও' করে যুবক বলল—আমায় আপনি খুব সম্মানিত করলেন। প্রথম থেকেই আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল আপনি একটু বিষণ্ণ হয়ে আছেন।

—আমি—আমি—আমতা আমতা করতে করতে স্বাতী আর কিছুই বলতে পারল না।

নয়া দিল্লির পালিশ বৃথা যাবে না। এই সুযোগে যুবক আরও একটু কাছে এগিয়ে এল। দুটো চোখে যেন প্রিয় প্রসাধনের আরতি দীপ তুলে ধরল সে। বলল, মি লেডি, আপনি তখন ছিলেন রূপসী। আর এখন অপরূপা।

বলতে বলতে সে পাশের টেবিল থেকে একটি চিল্‌ড অর্থাৎ জমানো বরফে ঠাণ্ডা করা শেরির ছোট্ট

গ্লাস খুব সাধ মিশিয়ে স্বাতীর হাতে তুলে দিল।

প্রায় এক চুমুকে তা শেষ করে এনে স্বাতী একটু উজ্জ্বল বোধ করল। আবেশে আরামে আনন্দে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

আহা! কী সুন্দর মধুমাখা কথা বলেন এই ভদ্রলোক! কোনও দিন কোনও উপাসক আমার দিকে এমন করে তাকায়নি কলকাতায়। এমন ভাবে খুশি করতে, বিষাদ দূর করে দিতে চেষ্টা করেনি।

মনে পড়ল সেই বিখ্যাত ইংরেজি কথাটা—তুমি হাসলে সারা দুনিয়া তোমার সঙ্গে হাসবে। কাঁদলে তুমি একাই কাঁদবে।

যুবকটি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কোন্ জাদু, কোন্ মায়ামন্ত্র তাতে মেশানো?

আবার মনে পড়ল আরেকটা ইংরেজি গানের কলি—মাই হার্ট ইজ ব্লুয়ার দান ইয়োর আইজ, শেরি, তোমার চোখ দুটির চেয়ে আমার হিয়া বেশি নীল, ওগো প্রিয়া। বেদনায় নীল। বেদনাবিলীন হিয়া।

বেদনার কথা মনে হওয়াতে স্বয়মের উপর একটু অভিমানও হল। দিব্যি নিজের পৌরুষের আহ্বানে নিজেকে জাহির করবার জন্য এনলিস্ট করতে চলে গেল। সেনাদলে নাম লেখাতে যাবার আগে একটিও কথাও বলল না। তার পর বীরপুরুষ সেজে কোথায় কোন্ সবুজ নরকে জলপাই-সবুজ পোশাকে মরণের মুখোমুখি হয়ে আছে। আর আমি এদিকে ভাবনায় বেদনায় নীল হয়ে গেলাম।

যুবকের চোখ একদৃষ্টিতে ওর ভাবভঙ্গি দেখে নিচ্ছে। নিজের কথা ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া যেন যাচাই করছে। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় তো।

স্বাতীর মনে কী প্রভাব হচ্ছে তা বুঝে নিতে হবে। চোখে যে দীপ্তি ফুটে উঠছে তার মানে খুঁজে বের করতে হবে। এই সুন্দরী বোধ হয় কোনও জ্বালা জুড়িয়ে নিতে চাইছে। খুব অল্প সময়ে প্রেসার ট্যাকটিকসে চাপ চালিয়ে সহজে ফল পাওয়া যুবকের অভ্যাস। গলা লোহার মতো হৃদয়কেও গরম থাকতে থাকতেই চাপ দিতে হয়।

তবে এক্ষেত্রে বোধহয় একটু সময় হাতে নিয়ে খেলানোই নিরাপদ। খাস লন্ডন ফেরত। সেটা ভোলা ঠিক নয়।

বেশ ধীরে ধীরে যেন পা মেপে এগোতে এগোতে সে একটু পরে নিবেদন করল, চলুন না, একদিন ডিনার খাওয়া যাক এক সঙ্গে। যে দিন আপনার সুবিধা, যে রেস্তোরাঁ আপনার ভালো লাগে। ওমর খৈয়াম রুম? প্যালেস হাইট্স?

রণকৌশল সে খুব ভালো করেই জানে। তাই এমন সব রেস্তোরাঁর নাম সে করল যার আবহাওয়া, এমন কি নাম পর্যন্ত রসের পরিচয় দেবে।

উত্তেজনার আবেশ তখনও স্বাতীকে, তার ছায়াচ্ছন্ন চেতনাকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। চোখকে করে রেখেছে উজ্জ্বল। সে শুধু বলল, বেশ।

অনেকক্ষণ দুজনে একসঙ্গে ছিল। অনেক হাস্য পরিহাস। অনেক মৃদু আলাপ। এতটা ঘনিষ্ঠতা অন্য লোকের নজরে পড়বে। তা পড়ুক। নয়া দিল্লির পার্টির পরিবেশই তো এই।

স্বাতী সরে এসে সান্যালকাকার চেয়ারের হাতলে হালকা ভাবে বসল। তিনি খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সে পার্টিটা কেমন উপভোগ করছে, কেমন মনের মতো সঙ্গী পাচ্ছে ইত্যাদি।

'মনের মতো' কথাটা স্বাতীকে যেন একটা ধাক্কা দিল। সে মনে মনে ভাবল—হায় আঙ্কল, তোমার বয়সে তুমি কী জানবে মনের মতো বলতে কী বোঝায়। পৃথিবী ভরা রয়েছে হাসি, তামাশা, অ্যাডমিরেশন সব কিছুতেই। বিরহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও। তবু কি ছাই মনের মতো মানুষ মেলে!

কাকা সস্নেহে ওর হাতে হাত বুলোতে লাগলেন। ফিস ফিস করে বললেন, এই কচি বয়সে একা থাকা মানেই সব কিছু থেকে নির্বাসন। তার কোনও মানে হয় না।

স্বাতীর মনে আগুন জ্বলে উঠতে লাগল। ওই বৃদ্ধ তার কাজের ব্যস্ততা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী সংসার নিয়ে ডুবে আছে। ও আমায় কী শেখাতে চাচ্ছে?

কাকা স্বাতীর হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন না। কলকাতা থেকে যে সব চিঠি পেয়েছিলেন সেগুলিই মনের মধ্যে ঘুরছিল।

তিনি বলে চললেন, হ্যাঁ, এই বয়সে এই রকমই হয়। ইয়ুথ কলস আনটু ইয়ুথ। যৌবন যৌবনকে

আহ্বান করে। অবশ্য আশা করে বেশি। আর করে বড় তাড়াতাড়ি। প্রত্যাশায় বসে থাকার মতো ধৈর্য থাকে না। যৌবনের ধর্মই হচ্ছে প্রেসার ট্যাকটিকস।

স্বাতী আর স্থির থাকতে পারল না। কলকাতা থেকে দিল্লিতে কেন ওকে পাঠানো হয়েছে তা বুঝতে পেরেছিল আগেই। এখন বুঝল পাকাপাকি ভাবে। একটু অসহিষ্ণু হয়ে বাধা দিল, আঃ চুপ করো না, আঙ্কল। উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে এই পকোড়াটা খাও।

—ম্ সরি, ভেরি সরি, লিটল্ ডার্লিং।

আঙ্কল মানে মানে পলায়নের একটা পথ খুঁজতে লাগলেন। কাছেই পেলেন মিস্টার চোপরাকে। তাকে বললেন, দেখুন, দেখুন, ভরদ্বাজটা সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজের বৌয়ের সঙ্গে কেমন পাবলিক কোর্টশিপ চালাচ্ছে।

চোপরা মুচকি হেসে বললেন, সম্ভবত বাড়িতে যখন একলা থাকে তখন বৌকে পেটায় বলে।

আঙ্কলও হেসে জবাব দিলেন, তা—তো হতেই পারে। সুখী দাম্পত্য জীবন বলে মনে হবে এমন কিছু দেখলেই আজকাল কেমন কেমন একটা সন্দেহ হয়।

চোপরা বিবাহিত দম্পতিদের এখানেই রেহাই দেবার পাত্র নন।

তিনি ফোড়ন কাটলেন, অন্য দিকে দেখুন, মিস্টার স্যানিয়াল, চারদিকেই দেখি স্বামীকে বিশ্বাস করে বসে আছে এমন সব স্ত্রীদের মেলা। ওদের কিন্তু দেখলেই চিনতে পারা যায়। ওদের মুখে পুরোপুরি মাখানো থাকে একটা অসুখী অসুখী গোছের ভাব।

স্বাতীও এদিকে তার অসুখী অসুখী ভাবটা মুখের উপব থেকে মুছে ফেলেছে। পার্টিতে ঠাট্টা মশকরার স্রোত, পরকীয়া প্রশংসার সঙ্গে ফ্লার্টেশনের ফোয়ারা বয়ে চলেছে। এ সবকেই গ্রহণ করে, স্বীকার করে নেওয়াই বরং সহজ পথ। দুঃখ ভুলে থাকবার ভালো দাওয়াই।

একটু দূরে সেই যুবক আরেকটি রকমারি জাঁকজমকে সাজা তরুণীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। তার হাতের আঙুলগুলি গলার বিলেতি টাইটাকে নিয়ে খেলা করছে। দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে আবার মোলায়েমভাবে সব ভাঁজ মিলিয়ে পালিশ করে নিচ্ছে।

ওর টাইটা কি ওরই মনের একটা প্রতীক? একটা প্রকাশ? যতই দাও মুচড়ে, পড়বে না সে মুষড়ে। গা ঝাড়া দিয়ে মন থেকে গত রজনীর ক্ষণ-সঙ্গিনীর মোহ ঝেড়ে ফেলবে। তার পরে আবার নূতন সন্ধান, নূতন লীলাকলা, নূতন বিজয়।

আগামী কাল রাতের ডিনার কি এমনই আরও একটা সন্ধানের সোপান? ইংরেজিতে যাকে বলে কংকোয়েস্ট?

ওর চোখ, তৃষ্ণায় ভরা চোখ চার দিকে ঘুরে বেড়াতে ছাড়ছে না। তার তৃষ্ণা হয়তো কোনখানেই তৃপ্ত হবে না। তীরের মতো শুধু ভরা বাসনায় বিঁধবে। গুরু বেদনায় বাঁধা পড়বে না।

ফিসফিসে স্বরেও এই তরুণীকে গাঢ় অনুনয় করে বোঝাচ্ছিল, ভুল? যে নারী তার ভুলগুলিকে রমণীয় করে তুলতে না পারে সে তো নারী নয়। সে শুধু মেয়ে লোক। আপনি তো মোটেই তা নন।

স্বাতীর চোখের উপর থেকে একটা ঢাকনা খুলে যেতে লাগল। ওর চোখের আকুল তৃষ্ণা রাতের পর রাত সীমান্তের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে একটি নক্ষত্রেরই জন্য জেগে থাকবে।

অতিথিরা সবাই উঠে দাঁড়াল। এখনই পার্টি ভাঙবে। রেডিয়োতে রাত নটার বেতার খবর শুরু হবে।

স্যানিয়াল সাহেব সুবিবেচক লোক। প্রস্তাব করলেন যে খবরটা শুনেই না হয় ছত্রভঙ্গ হওয়া যাবে। ততক্ষণে 'ওয়ান ফর দি রোড' হয়ে যাক। অর্থাৎ পথে বেরোবার আগে পথের নাম করে আরেক বার ড্রিঙ্ক ঢালা যাক।

সবাই এতে খুব খুশি হলেন। রুচিবান 'হোস্ট'রা এখনও বিশুদ্ধ স্কচ দিয়ে অতিথি সৎকার করেন।

দিস্ ইজ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো।

আজকের বিশেষ খবর হচ্ছে যে জাপানি সেনাদল বর্মা আসাম সীমান্তে নজরে পড়েছে। তবে তারা নিশ্চয়ই সীমান্ত পেরিয়ে ইন্ডিয়াতে অনুপ্রবেশ করবার মতো বল বা সাহস পাবে না। আমাদের সৈন্যদল...

স্বাতী এগিয়ে গিয়ে সেই যুবকের বাহুতে একটা হালকা টান দিল।

নিশ্চয়ই তার মানে বিজয়ের আশ্বাস।

হাসতে হাসতে সে স্বাতীর কাঁধে হাত রেখে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। বলল, অফ কোর্স, আমার নিমন্ত্রণ আপনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করেছেন তা মনে রাখবেন। হ্যাঁ, একটু আগে হলেই ভালো হয়। আমি আটটার সময় 'কল' করব।

বলতে বলতে আরও সাহস করে বলে বসল, টিল দেন, হনি।

হঠাৎ এই বাড়তি অন্তরঙ্গতা স্বাতীর মনের কথাকে সহজ করে দিল।

সেও হেসে উঠল, মাপ করবেন, আমার ঠিক মনে ছিল না যে আমার অন্য একটা এনগেজমেন্ট আছে। শুধু কাল নয়, পরশু, তরশু। কাজেই...

যুবক মচকাল না। রণকৌশলে রিয়ার গার্ড অ্যাকশনও একটা ভবিষ্যতে জিততে পারবার পদ্ধতি। সে বলল, বেশ রসিয়ে বলল, আরও বেশি মজার বোধ হয়?

সমান ভাবেই হাসতে হাসতে স্বাতী শুনিয়ে দিল, হ্যাঁ, অনেক, অনেক বেশি মজার। আর অনেকদিন ধরে।

।। একত্রিশ ।।

বিষ্যুৎবারের পিকাডিলি।

স্বয়ম্ যদি আজ স্বাতীকে চিঠি লিখতে পারত, অন্তত পক্ষে নিজেব সম্বন্ধে একটা ছোটখাট্ট কাহিনি পাঠাতে পারত তাহলে এই কথাদুটো ব্যবহার করত নিশ্চয়ই।

কিন্তু তার কোনটাই সম্ভব নয়। চিঠি লেখা সম্ভব নয়। জীবনটা "ভবার্ণব তরণে নৌকা"র মতো টলমল করছে এই অভিযানে। চিঠি লেখার সময় নেই। নেই চিঠি পাওয়ার পথও। এ হেন বিলাস কর্তারা বরদাস্তও করবে না এই বিশেষ অভিযানে।

একটা বিশেষ কারণও আছে। সে এখন থার্ড ইন্ডিয়ান ডিভিশনের স্পেশাল ফোর্সে সাময়িকভাবে সেকন্ডেড হয়েছে অর্থাৎ চালান হয়েছে। এটা নামেই ইন্ডিয়ান ডিভিশন। কিন্তু এর চব্বিশটা ব্যাটালিয়নে ব্রিটিশ আছে, গুর্খা আছে, আছে আফ্রিকার নাইজেরিয়ান। এমন কি বর্মী পর্যন্ত। নেই শুধু ইন্ডিয়ান।

কারণ ভারতীয়রা গোপনতা রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ ওদেব এই বিশেষ বাহিনীর কাজে বিশ্বাস কবা যায় না।

আসল কাবণ স্বয়ম্ আন্দাজ করেছিল। এদের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে।

তবু সে কেন এই কাজে নির্বাচিত হয়েছিল তাও সে জানে। এর প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে একটা কম্যান্ড সেকশন আছে যারা আকাশী সাহায্য দেবে, গোপন তথ্য জোগাড় করবে। দরকার হলে সিগন্যাল অর্থাৎ তারে বেতারে খবর পাঠানো প্রচারকার্যও করবে। কাজেই স্বয়মের মুখের গড়ন, স্থানীয় ভাষার দৌড় আর সামরিক বিশেষ শিক্ষা জেনারেল উইনগেট কজে লাগাবেন। স্বয়ম্ সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা মাল।

সেও পিছপাও হল না। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে অপমানটা ধামাচাপা আছে সেটা গায়ে মাখল না। মনে মনে ভাবল ওটা শুধুই শ্যাওলার মতো; আমার গায়ে লেগে থাকবে না। সামরিক জীবনের গভীরে আমি অবগাহন করছি।

বরং এই অপমান মুখ বুজে হজম করে নতুন লাভ করা এই শিক্ষাটুকু একদিন আমার স্বাধীন দেশকে উপহার দিতে পারব।

তা ছাড়া বিষ্যুৎবার আর পিকাডিলি এই কথা দুটো সাংকেতিক কোড ওয়ার্ড। এ দুটো কথা কলমের ডগা কেন জিভের ডগাতেও আনা চলবে না।

তবে 'চিনডিট' বাহিনীর খবর কিছু কিছু নানা মুখ ঘুরে কলকাতাতেও হয়তো পৌঁছেছে। রূপকথায় বর্মী প্যাগোডার পাহারাদার ড্রাগনের নাম চিনডিট। সেই নামই এই ডিভিশন নিয়েছে। চীনে ব্যানডিট অর্থাৎ ডাকাতের মতো কাজ করে বলে নয়।

আহা! যদি স্বাতীকে জানানো যেত যে কেমন করে সে 'লিভ এ লিটল' করছে। বেপরোয়া, বেহিসেবি বিশ্বলুট জীবনের একি রমণীয় আস্বাদ। স্বাতী, আমি মুহূর্তে মুহূর্তে তীব্রভাবে সব উজাড় করা, সব নিংড়ানো জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। তোমার কথা পুরোপুরি মেনে চলেছি।

না। সে সব কথা জানানো যাবে না। সামরিক গোপনতা ছাড়াও মানসিক স্বপ্নালুতাও এই জীবনের

সঙ্গে জড়ানো আছে। স্বয়ম্ পেয়েছে এই অভিযানের মধ্যে রসের স্রোত, রঙের বৈচিত্র্য আর সুরভির হিল্লোল। প্রসন্নতায় ভরে উঠল তার মন। 'চিরকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন।'

স্বয়মের লীলা শুরু হল লালাঘাট থেকে। লুসাই পাহাড়ের কোলে লুকানো, আঁকাবাঁকা স্রোতের বুকে বসানো লালাঘাট। সেখানে নতুন তৈরি একটা মোটামুটি বিমানঘাঁটি। ফুটবলের মাঠও বলা চলে। শুধু তফাত এই যে মাটিটা ঝাঁঝরা করা ইস্পাতের পাতে মোড়া। বর্ষার কাদাতেও যাতে প্লেন ওঠানামা করতে পারে।

একজন পাইলট একটু আগেই জাপানিদের দখলী বর্মা দেশের আড়াইশো মাইল ভিতর পর্যন্ত দেখে ছবি আর খবর নিয়ে এসেছে। এয়ার স্ট্রিপের ফালিটুকুতে জলপাই সবুজ রঙের যুদ্ধের পোশাক পরে সারি সারি ব্যাটালিয়নের আর এক নম্বর এয়ার কম্যান্ডোর যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাইডারগুলি মাল আর অস্ত্র আর সৈন্য বোঝাই হয়ে আছে। প্রত্যেকটা ডাকোটা বিমান দুটো করে গ্লাইডার টেনে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

স্বয়ম্ একবার সতৃষ্ণভাবে এয়ারকম্যান্ডোদের দিকে তাকাল। ওদের সঙ্গে আছে মুস্তাঙ্গ জঙ্গী বিমান, মিচেল বোমারু বিমান, ট্রান্সপোর্ট প্লেন মায় হেলিকপ্টার পর্যন্ত। দরকার হলে আহত সৈন্যদের হেলিকপ্টারগুলি ফেরত-যাত্রায় নিরাপদ এলাকায় নিয়ে চলে আসবে। ওদের গোটা দলটর নাম হচ্ছে কর্নেল কক্‌রানের সার্কাস। মার্কিন সার্কাস।

হাওড়া ময়দানের বাচ্চাকাচ্চাদের সামনে খেলার বদলে হাওয়া ময়দানে পাহাড় জঙ্গল আর জলার মধ্যে মরণলীলা।

বিষ্যুৎবারের বারবেলা। সত্যিই বারবেলা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় প্রথম ডাকোটা উড়ে রওনা হবার কথা। কিন্তু সাহেবরা পঞ্জিকা মানে না বলে কী আর কামরূপ কামাখ্যা দেশের যোগিনীরা যাত্রার দিনক্ষণ দেখবে না?

কথায় বলে যে মানুষ ভুল করে আর দেবতারা ক্ষমা করে। কিন্তু ডাকিনীরা যে ক্ষমা করে না সে কথা ভুল করনেওয়ালা মানুষ ভুলে যায়।

এই বিষ্যুৎবার মার্কা অভিসারে হাজার নয়েক সেনা, দেড় হাজার মালবাহী খচ্চর প্রভৃতি আর আড়াইশো টন অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি আকাশপথে শত্রুর সাবির পিছনে উড়িয়ে নিয়ে নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু বারবেলা বাধ সাধল। যাত্রা নাস্তি। পূর্বে যোগিনী। থুড়ি জাপানি।

যাত্রা শুরু হবার চল্লিশ মিনিট আগে ওদের একটা টহলদারি রিকনয়স্যান্স্ প্লেন আকাশ থেকে লুকিয়ে উড়ন্ত ভাবে তোলা ছবি এনে হাজির করল। যে খোলা জঙ্গলে ঢাকা জায়গাটার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল পিকাডিলি, সেখানে আড়াআড়ি করে বড় বড় গাছের গুঁড়ি পাতা রয়েছে। প্লেন নামানো অসম্ভব।

তবে কি জাপানিরা এই গোপন অভিযানের খবর পেয়ে গেছে? এর পিছনে আছে কোন্ মাতাহারি? অথবা বিভীষণ?

একটি মাত্র ভারতীয়কে এই যাত্রার জন্য নেওয়া হয়েছিল। তবে কি স্বয়ম্?

এরকম সন্দেহ যে অনেকে, অন্তত নিচের দিকের লোকরা, বিশেষ করে যারা ইংরেজ বা মার্কিন নয়, তারা করবে সেকথা মনে হওয়াতে স্বয়মের মুখ বেগুনি হয়ে গেল। না। তবু সে মুষড়াবে না। উপরওলা সামন্তরা নিজেরা ওর 'ডসিয়ের' গোপন কুষ্ঠি ঠিকুজী দেখে তবেই ওকে বাছাই করেছিলেন। তবে কেন এই বিশ্রী সন্দেহ?

তাছাড়া নিচের দিকের সৈন্যরা জানতেও পারবে না যে কেন যাত্রা স্থগিত হল।

মরবার ব্যাপারেও পশ্চিমী লোকের মনে মজার আমেজ থেকে যায়। বিপদ তাই সহজ হয়ে যায়। আর ভয়ও হয়ে ওঠে সরস।

না হলে এহেন প্রায় আত্মঘাতী অভিযানের মরণক্ষেত্রের নাম কিনা পিকাডিলি? আর পিকাডিলির পথে যদি চোরকাঁটা কেউ পুঁতে থাকে অন্য গোঠেও ধেনু চরাতে যাবে এই রাখালিয়া দল। সেগুলির নামও কম রঙদার নয়—ব্রডওয়ে আর চৌরঙ্গী।

শুধু রস নয় সাহসও থাকে পশ্চিমের সাধারণ লোকের মনে। আর যোদ্ধাদের তো থাকবেই। স্বয়ম্ মনে মনে প্রশংসা করে সেই শিক্ষাটুকু গ্রহণ করল।

তিন-ঘণ্টার মধ্যেই অভিযানের দিশা ঠিক হয়ে গেল। জেনারেল স্লিম হুকুম দিলেন যে যদি শত্রু

জেনেও থাকে পিকাডিলির কথা, হয়তো বাকি দুটোর কথা জানে না এখনও। অভিযান একবার পিছিয়ে দিলে হঠাৎ চমকের সুযোগ আর হয়তো আসবে না।

সাহসী ছাড়া কেউ সুন্দরীকে লাভের যোগ্য নয়। আর সুন্দরী বসুন্ধরা সম্পূর্ণরূপে বীরভোগ্যা।

লন্ডনে হল না বটে, কিন্তু নিউ ইয়র্কে স্বয়ম্বরা বাসরে চলল।

কক্‌রানের সার্কাসের পাইলটরা সৈন্য আর অস্ত্র আর সাজসরঞ্জামে বোঝাই গ্লাইডারগুলি প্লেনের পিছনে বেঁধে মাটি থেকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে চলল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আকাশে ভেসে চলল গ্লাইডারগুলি। সিগন্যাল যন্ত্রপাতি, অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট কামান, পাঁচশো পাউন্ড ওজনের ব্যাটারি কামান মায় বুল ডোজার পর্যন্ত গ্লাইডারে বোঝাই ছিল। চার চারটে ডিভিশন জাপানি সৈন্য আর তাদের হাওয়াই জাহাজের ছাতার আশ্রয়কে ঘায়েল করতে হবে। ওরা যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে লড়াই দিয়ে নয়। ওরা যেখানে নেই সেখানে কাজ গুছিয়ে নিয়ে।

একেবারে উপরের দিকে জেনারেল উইনগেট ও তার ঠিক নিচের সহকারী সেনাপতিরা ছাড়া অন্য অফিসারকে কেউ এই রণকৌশলের কারণ জানাত না। দেয়ার্স বাট টু ডু অর ডাই। শুধু লড়তে অথবা মরতে হবে এইটুকুই তাদের উপর দেওয়া কর্তব্য। সামরিক শৃঙ্খলার এই কানুন আর তার গুণ স্বয়ম্ মনে মনে মেনে নিয়েছে। প্রশংসাও করেছে মনে মনে।

তা বলে তার মন ছিল না ঘুমিয়ে, চিন্তা ছিল না এলিয়ে। সে বেশ বুঝছিল যে এই অভিযানে একাধারে তিন দিক দিয়ে যুদ্ধজয়ের সুবিধা হয়ে যবে।

আঠারো নম্বর জাপানি ডিভিশনের পিছন থেকেই চাপের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে জেনারেল স্টীলওয়েলের চীনা আর আমেরিকান বাহিনী মিটকিনার বড় বিমানঘাঁটির দিকে এগোতে পারবে। নিজেদের প্যারা ব্যাটালিয়ন দুটির প্রত্যেকেই ভলানটিয়ার। বাছাই করা, বিশেষ ভাবে শিক্ষিত। স্বাতী সত্যিই বলেছিল— কোর এলিট। অভিজাত বাহিনী।

কোহিমা আর ইম্ফলের অবরোধের উপর চাপ দিয়ে তাদের সরবরাহের পথ বন্ধ করে জাপানি ডিভিশনের ভারত আক্রমণ দুর্বল এবং সম্ভবত নষ্ট করতে পারবে। অথচ বর্তমানে অস্ত্র, খাদ্য এমনকি খাবার জল পর্যন্ত এয়ার ড্রপ করে পৌঁছে দিতে হচ্ছে নিজেদের অবরুদ্ধ সৈন্যদের জন্য।

উত্তর বর্মায় জাপানিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বিদ্রোহ করবার, তাদের খাবার ও অস্ত্র সরবরাহ নষ্ট করবার, এমনকি মোকা পেলে তাদের খতম করবার জন্যও সাহস আর উস্কানি দিতে পারবে। সশস্ত্র সৈন্য কাছেপিঠে না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

স্বয়ম্ মনে মনে প্রার্থনা করেছিল যে তৃতীয় কাজটির জন্য তাকে না পাঠাতে হয়। সে পুরুষসিংহ হবার জন্য যোদ্ধা হয়েছে, শৃগালবৃত্তির জন্য নয়। 'ভি ফোর্সে' তার আসল কাজ ছিল মিলিটারি ইনটেলিজেন্স সামরিক সংবাদ সংগ্রহ। সেটাতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি চিরকালই একটু কাঁচা।

লালাঘাট থেকে প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে একটা করে টাগ অর্থাৎ টানার প্লেন দুটো করে গ্লাইডার উড়িয়ে নিয়ে চলল। নামবার জমির কাছে এসে শিকল খুলে দেবার পর গ্লাইডার গুলি ধীরে ধীরে মাটিতে নামতে লাগল। পেটের উপর ধাক্কা সামলিয়ে দুপাশের ডানা ছিঁড়ে কয়েকটা উলটিয়েও গেল।

এতটা আকাশ পথ অন্ধকারে এসে অজানা আঘাটায় নামা, তাও শুধু চাঁদের আলোতে, মানুষকে চন্দ্রগ্রস্ত অর্থাৎ পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রথম ঢেউয়ের সৈন্যরা খোলা জমিটুকু দখল করে পাখার মতো চারধারে ছড়িয়ে পড়ে পাহারা দিতে লাগল।

দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভেসে এল আরও সৈন্য, বুলডোজার, স্যাপার আর মাইনার।

শেষের ঢেউয়ে আনা দল সারা দিনের মধ্যে মোটামুটি একটা বিমানঘাঁটি গড়ে তুলবে।

মুহূর্তের জন্য স্বয়মের মনে হয়েছিল—

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সে-ও ভালো-
সে মরণ স্বরগ সমান।

সেই মরণই হল বহু জনের সেই চাঁদিনী রাতে। সত্তরটা গ্লাইডারের মধ্যে মাত্র বত্রিশটা নামল

ব্রডওয়েতে। কিছু অন্য অন্য নিরাপদ জায়গায়। কিছু ধান জমিতে বা জঙ্গলে নেমে আটকিয়ে গেল। গোটা দশেক শত্রুর ছাউনির মাঝখানে গিয়ে পড়ল। আর একটা তো পড়বি তো পড় একেবারে জাপানি ডিভিশনের হেড কোয়ার্টারের ঠিক মাথায়।

আর স্বয়ম্?

সঙ্গে ছিল একটা বুলডোজার আর ভারী যন্ত্রপাতি। নিচে একটা ভেঙে পড়া গ্লাইডারকে কোনমতে এড়াবার জন্য চোখা ভাবে কোনা কাটল ওদের গ্লাইডার। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে জঙ্গলের দেওয়ালের মতো সারি সারি বিরাট শাল গাছে খেল ধাক্কা। দুপাশের গাছ গ্লাইডারের ডানা দুটো ছিঁড়ে নিল আর মাঝখানের ফিউসিলাজ অর্থাৎ আসল কামরাটা তার বমাল সমেত মানুষ নিয়ে তেড়ে ছুটে চলল। ফিউসিলাজ যদি বা কোনমতে আটকিয়ে থেমে গেল, মাতাল প্রায় বুলডোজার নাহি ছোড়তা। সেটা সব কিছু ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।

স্বয়মের দল কোনমতে প্রাণে বেঁচে গেল।

তারপর কী সব ভয়ানক দৃশ্য শুরু হল। শুধু চাঁদের আলোতে সার্জনরা ভাঙা হাত পা অ্যাম্পুটেট করছে। ভোঁস করে কোনও গ্লাইডার জমি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে ক্র্যাশ করে মরছে। গাছের ডালের মড়মড় আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মানুষের আর্তনাদ।

আর যারা বেঁচে আছে, সক্ষম অবস্থায় বেঁচে আছে তারা মানুষ মারার খেলায় মেতেছে। কেউ কেউ অধমরা মানুষদের বাঁচাবার জন্য জঙ্গলের কোনায় ঘাপটিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

জাপানিরা যখন টের পেল ওরা রাগে অন্ধ হয়ে মাঠে জঙ্গলে পড়ে থাকা ভাঙা গ্লাইডারগুলির উপরেই এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলতে লাগল। এদিকে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা দলে দলে আলাদা হয়ে জাপানি সংযোগ লাইনের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিপদ হল পিকাডিলিকে নিয়ে।

সেখানে কিছু সৈন্যদল গ্লাইডারে করে নেমে পড়েছিল। জাপানি টহলদাররা জঙ্গলের চারপাশ ঘেরাও করে ওদের উপর গুলি চালাচ্ছিল। ওদের সঙ্গের বেতারযন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত নামবার সময়ের রাম ঝাঁকুনিতে। অথচ একটি গোপন পথে বেরিয়ে আসবার খবর ওদের পৌঁছে দেওয়া দরকার। না হলে যাঁতা কলে ইঁদুরের মতো ওরা মরবে।

একটা ফিরতি মুখের প্লেনে সাংকেতিক কোড দিয়ে পথের সন্ধানটা বাক্সে ভরে পাঠানো হল। কিন্তু ততক্ষণে সৈন্যদল জায়গা বদল করেছে। আর কোডের খবরটা পড়বি তো পড় জাপানি লাইনের মাঝখানে। ওরা কোড ভেঙে খবরটা বার করবার আগেই খবরটা আবার পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য ভলান্টিয়ার চাই। কারণ প্লেন থেকে প্যারাশুট দিয়ে যাকেই নামানো হবে তাকেই শত্রু চাঁদমারি করে ছাড়বে। সম্ভবত মিত্ররাই।

স্বয়ম এগিয়ে এল। আর নাক মুখ ভাষা আর ভি ফোর্সের অভিজ্ঞতার কল্যাণে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত হল।

কপাল ভালো। স্বয়ম্ তো কোনরকমে ওর সিসিলি অভিযানের অভিজ্ঞ গুরুর শিক্ষার কল্যাণে নিরাপদে নামল এবং খবরটা যথাস্থানে দিয়ে দিল।

কিন্তু জীবন অত সহজে ছাড়ে না। বিশেষ করে মরণের সঙ্গে মুখোমুখি মুহূর্তে।

বিস্যুৎবারের বারবেলা একজন বাঙালি লেফটেনান্টকে ছাড় দেয়নি। জঙ্গলের ঝোপঝাড় দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে স্বয়ম্ এই সাংঘাতিক ভাবে আহত অফিসারকে দেখতে পেল।

যন্ত্রণা যত না, ভয় আর অস্বস্তি তার চেয়ে অনেক বেশি এই যুবকের। ভুল করে পিকাডিলিতে নামা প্রথম গ্লাইডারটিতেই তার স্থান হয়েছিল। কম্যান্ড সেকশনের সিগন্যালস অর্থাৎ তার ও বেতারে খবর চালাচালির নিপুণতার জন্য তাকে বিশেষভাবে নির্বাচন করে শেষ মুহূর্তে গ্লাইডারে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

সেই গ্লাইডারটা একটি বিরাট শালগাছের উপর আছড়িয়ে পড়ে আর লেঃ সরকারের একটা গোড়ালি সম্পূর্ণভাবে থেঁতলিয়ে যায়। মেডিক অর্থাৎ এই দলের সার্জন ওকে সোজা বলে গেছেন যে ওই গোড়ালি একেবারে কেটে বাদ দিতে হবে। এবং এখনই। না হলে গ্যাংগ্রিন অর্থাৎ সর্বাঙ্গ পচনের হাত থেকে রক্ষা নেই। তিনি কয়েকটি ভারী জখমীকে দেখে ফিরে আসবেন। আপাতত লোক্যাল এনাস্থেটিক দিয়ে পায়ের যন্ত্রণা চাপা দিয়ে গেছেন।

যদি বেঁচে যায় তবুও সরকার সারা জন্মের মতো গোড়ালিহীন হয়ে খোঁড়াবে এই সম্ভাবনা নিয়ে পড়ে আছে।

তার এই কাহিনিটুকু বলে সরকার ব্যাকুলভাবে স্বয়মের দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। নীরব হয়ে রইল। কিন্তু সেই নীরবতা চারদিকের গুলি, গ্রিনেড আর আর্তনাদের আওয়াজের চেয়ে অনেক বেশি সরব হয়ে উঠল।

স্বয়ম্ সান্ত্বনা দেবার ভাষা পেল না।

একটু পরে সে বলল, দেখ. তুমি আমার ভাই। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে তোমায় ছেড়ে যাব না। মেডিককে বুঝিয়ে বলব যেমন করে পারে তোমায় এখানে অপারেশন না করে বেস হাসপাতালে অক্ষত রেখে পাঠাতে। সেখানে বড় সার্জনরা...

মন শক্ত করে সরকার বলল, না, দাদা। মেডিক বলেছে আর আমিও বুঝেছি যে অ্যাম্পুটেট ছাড়া আমার পায়ের আর গতি নেই। মিছে সান্ত্বনা দিয়ো না।

তার কচি মুখ আর করুণ বেদনা দেখে স্বয়মের মন প্রায় কান্নায় ভরে গেল। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, বল ভাই, আমায় যা হোক কিছু করতে বল তোমার জন্য। আমি তোমার যদি কোনও কাজে লাগি!

সরকার পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল। ওর ওয়ালেটে আইডেন্টিটি পেপারস পরিচয়-পত্রাদির সঙ্গে একসঙ্গে রাখা। বারবার স্পর্শে কাগজটি মলিন, কিন্তু যত্নে মনে হয় যেন মহীয়ান।

চিরকুটটা মেলে ধরে সে বলল, জানো দাদা। আমার মতো ফূর্তিবাজ রসিক খুব কম হয়। সেই আমি বিষকে অমৃতে পরিণত হতে দেখেছিলাম।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্বয়ম্ ভাবল — যদি মনটা ওর একটু অন্যদিকে সরানো যায় হয়তো ও শান্তি পাবে।

তাই বলল, যদি কষ্ট না লাগে বলো না সে কথাটা। মেডিক আসতে এখনও বোধহয় দেরি আছে। ততক্ষণে যদি 'হেলি' এসে পড়ে সবার আগে তোমায় হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করব।

ম্লানভাবে সে বলল, নেবে কি আমাকে ওরা প্রথম দিকে?

—নিশ্চয়ই নেবে। জানো, বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের ছেলে ক্যাপ্টেন আর্চি ওয়েভেল সাংঘাতিক জখম হয়েছিল শত্রু এলাকায়। বড়লাটের ছেলে—গোটা আর্মি ওকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সমস্তটা কোম্পানিকে সম্পূর্ণভাবে বার করে আনতে না পারা পর্যন্ত তার জখমের কথা রিপোর্ট পর্যন্ত করেনি। নিজের দলের সবাইকে আগে ইভাকুয়েট না করানো পর্যন্ত ওকে জোর করেও সেখান থেকে সরানো যায়নি।

এদিকে খবর পেয়ে বড়লাট আর লাটপত্নী নিজেরা আসামে এসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এরা যুদ্ধের সময় বীরের ধর্ম ভোলে না। তুমি প্রথম বারেই যেতে পারবে। তা ছাড়া স্পেশ্যাল ডেস্প্যাচে জি. এইচ. কিউ.-তে তোমার নাম নিশ্চয়ই যাবে। কম পক্ষে মিলিটারি ক্রস।

বীরপুত্র ওয়েভেলেরও যে রণক্ষেত্রেই হাত 'অ্যাম্পুটেট' করা হয় এবং তারও অনেক পরে সে সরতে রাজি হয় সে কথা স্বয়ম্ ভাঙল না।

তারপর স্বয়ম সেই অমৃতের খবর জানতে চাইল। সরকারের মন অন্যদিকে সরিয়ে রাখতে হবে যে।

পাটাকে একটু স্বস্তিজনক অবস্থায় সরিয়ে দেওয়া হল। ক্যান্টিন থেকে একটু আর এনার্জি ট্যাবলেট দেবার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু সরকার এখন মেডিক্যাল কেস।

সে বলল, জানো দাদা, মিলিটারি ট্রেনিং-এর সময় ছিলাম মহা সুখে। শুধু ভালো খেতে পরতে ফুটানি মারতে পাই তা-ই নয়। হঠাৎ দেখলাম যে এই বাবলাকে স্মার্ট ইউনিফর্মের কল্যাণে অ্যাপোলো বেলভিডিয়র বনে গেছি।

স্বয়ম্ ওকে একটু খুশি করবার জন্য বলল, তা কিন্তু ঠিক। কামদেবের তো কোনও মূর্তি নেই। কিন্তু অ্যাপোলোর সঙ্গে তোমার আদল আসে। লেডি কিলার হতে পারতে ইচ্ছা করলেই।

—আমার ইচ্ছার প্রয়োজন ছিল না, দাদা। এই যে চিঠিটি দেখছ এ হচ্ছে একটি প্রেম পত্র।

—তা আমি আগেই বুঝেছি ভাই। ওটিই তোমার রক্ষাকবচ হবে।

—প্রেম পত্রখানি পেয়েছিলাম মিলিটারি থেকে ফার্লো নিয়ে যখন কলকাতায় এসেছিলাম তখন। বালিগঞ্জের একটা ফ্যাশনদুরস্ত আধুনিক পার্টিতে। তুমি নিজেও নিশ্চয়ই জানো যে ইউনিফর্ম আর রোম্যান্সের দৌলতে আমরা ছোকরা মিলিটারি অফিসাররা তরুণী মহল মাত করে রেখেছি। স্বয়ম্বরার বরমাল্য গোপনে এমনকি গন্ধর্বমতেও আমাদেরই গলায় গোপনে এসে পড়ত। ছুটি ফুরোবার আগের রাতে এই চিঠিটা গাড়ি-বারান্দার সামনে ভিড়ের মধ্যে একটি তরুণী হাতে গুঁজে দিয়ে সরে গেল।

ঠিক যে কোন্‌টি ঠাহর করতে পারলাম না।

আহত সরকারকে উৎফুল্ল রাখবার জন্য স্বয়ম্ বলল, নিশ্চয়ই সব চেয়ে সুন্দরীটি। প্রেমপত্রে কী ছিল জানতে লোভ হচ্ছে। তোমার সেই লাক, সৌভাগ্য, এখনও 'হোল্ড' করবে। অটুট থাকবে।

—চিঠিটা রোজ বার বার পড়ে আমার মুখস্থ হয়ে আছে :

প্রিয়,

তোমায় ঠিক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মতো অবশ্য দেখায় না। কিন্তু তুমি আমার স্বপ্নলোকের সেনাপতিপুত্র। তোমার রোদে তামাটে হয়ে যাওয়া মুখখানা যেন আগুনে গলা নিখাদ সোনা। যুদ্ধক্ষেত্রের কাদা আর বারুদে ঢাকা আসল সোনা।

ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মুখখানা আমার দু হাতে তুলে ধরে ধুয়ে মুছে দিই। সোহাগের পরশে সব ক'টি রেখা বিলীন করে মসৃণ করে দিই। তোমার মুখের ক্লান্ত হাসিকে অধরোষ্ঠের মধু দিয়ে অরুণ বর্ণ করে তুলি।

তোমায় যে ভালোবাসি তা খুলে বলবার জন্য আমার কাছে পুরীর সমুদ্রতীর বা দার্জিলিং-এর কুয়াশায় ঢাকা আকাশ বা গঙ্গার মেঘে মাখা সূর্যাস্তের প্রয়োজন হবে না।

শুধু তুমি ফিরে এসো।

ইতি—

স্বয়মের মনে এই মুখস্থ করা চিঠির আবৃত্তি গভীরভাবে দোলা দিল। কত রূপে দেখা কত রঙে সাজানো এই জীবন।

কিন্তু এই মুহূর্তে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন এর জীবন বাঁচানো। এবং তার চেয়ে বড় এর মনকে সঞ্জীবিত রাখা।

সে খুব গভীর ভাবে আশ্বাস দিল, ভেবো না ভাই, এই বীর তরুণী তোমারই জন্য অপেক্ষা করছে। এরই কল্যাণে তুমি সেরে উঠবে। তার পর ইউনিফর্মের উপর মেডাল আর রিবন সাজিয়ে বালিগঞ্জে তুমি আবার যাবে। অধরা এবার হাসিমুখে দেবে ধরা।

বিষণ্ন কিন্তু অপরাজিত ভাবে সরকার উত্তর দিল, সেই সেনাপতি-পুত্র পিকাডিলির অভিসারে রূপ কথার রাজ্য থেকে এক আঘাতে পা ভেঙে মর্তলোকে নেমে এসেছে। আর একটা আঘাতের পর পদক আর পেনশন নিয়ে সে রাজকন্যার সামনে আর হাজির হতে চাইবে না।

একটুক্ষণ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস দমন করে সরকার আবার বলল, বীরের মূর্তি নিয়ে এক সন্ধ্যার স্বপ্ন রচনা করা যায়। কিন্তু সে স্বপ্নকে সারাজীবন ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে দিই কী করে?

স্বয়মের মুখে কোনও উত্তর যোগাল না। যুদ্ধ করা সহজ। শত্রুকে জয় করাও সহজ। কিন্তু জীবন বড় শক্ত ব্যাপার।

আমরা জীবনকে চালাই না। জীবনই আমাদের চালায়।

চারদিকে শ্যাম অরণ্যানী; ছোট ছোট টিলার মালা আর শালের দীর্ঘায়ত যবনিকা। হঠাৎ হঠাৎ আলোর ফোয়ারায় ছড়িয়ে দিচ্ছে স্টার শেল আর মধু রঙের চাঁদের আলোয় মিলিয়ে যাচ্ছে। গরম দেশের লতাপাতার শ্যামলে সবুজে ক্ষণিকের জন্য লালিমা লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। গুলি আর শেলের বিস্ফোরণ সৃষ্টির প্রথম কান্নার মতই অর্থহীন ভাবে সবাইকে সচকিত করে তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে। মেরে যাচ্ছে।

আঁধার জীবনেও মরমের রঙের কত বৈচিত্র্য।

॥ বত্রিশ ॥

মন কেমন কেমন করে ওঠে।

থেকে থেকেই এমন হয়। তখন বোমারু বিমানের পাখার ঝটাপটির চেয়ে অনেক বেশি ছটফট করে ওঠে মন।

আরও বেশি মন কেমন করে দেশের জন্য। মায়ের জন্য।

শুধু তেলেজলে মানুষ আর যুদ্ধে হালে নাম লেখানো স্বয়ম্ই যে অনুভব করে তা নয়। মাইকও সেই একই বিষণ্ণ বিস্মৃতিময় সন্ধ্যার রঙে নিজের করুণ মনকে রাঙানো, রক্তাক্ত দেখতে পায়। পেশাদার সৈন্য হলে হয়তো এমন করুণ সন্ধ্যার বিধুরতার মধ্যে দিয়ে ওদের মনকে আনাগোনা করতে হত না।

প্লেন শুধু সামনের দিকেই ওড়ে। দুর্নিবার ভাবে। তা না হলে সে পড়ে যাবে। শূন্যে ত্রিশঙ্কু হয়ে ভেসে থাকার পালাও তার জন্য নয়।

কিন্তু মন নিজের খেয়াল-খুশিতে বা অকারণে এমন কি অজ্ঞানে পিছন দিকে ধেয়ে যেতে পারে। মন তো যন্ত্র নয়। তার নিজের মন্ত্রকে কোনও যন্ত্র বা কোনও যন্ত্রণাই রুখে রাখতে পারবে না।

স্বয়মের মন এতক্ষণ শুধু স্মৃতির আকাশে পিছনে, পিছনের দিকেই উড়ে বেড়িয়েছে। মাঝে মাঝেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা, সব সৈন্য আর সব হাতিয়ার আর আগে থেকে ছক কাটা প্ল্যান ঠিক আছে কি না তার পরখ করে দেখেছে।

এ কাজটা সে করে যাচ্ছে যন্ত্রের মতো। তবু ক্ষণে ক্ষণে পেয়েছে সামনে এগিয়ে আসা চরম লগনের আভাস। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে তাকিয়ে দেখেছে পবম অভাবনীয়ের আবির্ভাব।

সে যে নতুন মানুষ। নতুনতর জীবনের আবাহন শুনেছে। পেয়েছে ইসারা। দিয়েছে সাড়া।

মাইক এতক্ষণ তার স্মৃতির ভারকে পিছনে রেখে প্লেনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যেন কেমন একটা ভার তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। সতৃষ্ণ নয়নে সে একবার প্লেনের ড্যাশ বোর্ডের যন্ত্র আর সংকেতগুলি ঠিক চলছে কি না যাচাই করে নিল। তার পর একবার বাইরের দিকে তাকাল।

নিচে এক ফালি চাঁদের আকারের একটা হ্রদ জ্যোৎস্নার আলোয় চিক চিক করছে।

ঠিক। সে এবার বুঝতে পেরেছে। এই জন্যই মনটা এত উচাটন হয়ে উঠেছিল। না হলে বার্লিনের উপর বোমা ফেলতে হাত পাকানো, ডিসটিন্‌গুইশড ফ্লাইং ক্রমে সম্মানিত পাইলট চঞ্চল হয়ে উঠবার কথা নয়।

কথা নয়?

কেন? এই একফালি চাঁদের পাশে বসেই তো সে একটা রূপান্তর অনুভব করেছিল এই কয়েক সপ্তাহ আগে। সেই স্মৃতি এ মুহূর্তে মনের মধ্যে আগে উঠল।

প্লেনটা সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনটা পিছনে চলে গেল।

ইম্ফলের চারদিকে জলাভূমি গুলিতে সিঁদুর-রাঙা আইরিস ফুল থরেথরে ফুটে ছিল। সেখানে শরৎকালে শ্বেত পদ্ম আর গোলাপি পদ্মে শোভা এই আইরিসের রূপকে ম্লান করে দেবে। কিন্তু আইরিস তার নিজের দেশে ফোটে। তার নিজের মনেও ফোটে। সেই আইরিস।

তা ছাড়া সব কুটিরেরই বেড়ার ঝোপে ঝোপে ছড়িয়ে ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ জুঁই ফুল। সৌরভে আর শোভায় রিভিয়েরার সাজানো গোছানো বাগানগুলিকে লজ্জা দিচ্ছিল। ছোট ছোট নালা খাল নদীর পারে পারে সাদা কাঠগোলাপের সার। নীল আকাশের রঙের ছায়া মেখে সবুজ শ্যাম পাহাড়গুলি সমতল ভূমির টুকরোগুলিকে আয়নার ফ্রেমের মতো ঘিরে রেখেছে। ধানখেতগুলিকে চিকন উজ্জ্বলতায় ভরে দিয়েছে। সেই মণিপুর। সেই ইম্ফল।

মাইক এসেছিল একটা 'রিকনয়টারের' পর্যবেক্ষণের কাজে। কোথায় কোথায় তার প্লেন যাবে, ঘাঁটি তাক করবে বা মাল প্রভৃতি নামাবে তার একটা আগাম সরেজমিন তদন্ত করে রাখা দরকার। সঙ্গে আকাশী যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা। সবাই শিক্ষিত, নতুন যুদ্ধে দীক্ষিত আর মোটামুটি সমবয়সি।

এ হেন তাজা কচি মনের অধিকারী শিক্ষিত স্বদেশবাসীর সঙ্গ পেয়ে মণিপুর করদ রাজ্যের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট, ঝানু আই. সি. এস. জিমসন হাতে স্বর্গ পেলেন। জাপানি আতঙ্ক আর অবরোধের

সম্ভাবনা সমস্তটা উপত্যকায় তার নিষ্ঠুর ছায়া ফেলেছে। জাপানিরা অবলীলাক্রমে নিজেদের রসদ আর কামান নিজেরাই ভয়ে গোপনে, অজানা আঘাটা বেয়ে, মণিপুরের পাহাড়গুলি দখল করে ফেলতে পারে। তা ঠেকাবার সাধ্য আছে এমন পরিচয় মিত্রশক্তি এখনও দিতে পারেনি।

সেই পরিবেশে মাইকের দল যখন একরাশি দেবদূতের মতো আকাশপথে নেমে এল তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে জিমসন তার রেসিডেন্সি ভবনের আতিথ্য পুরোপুরি ওদের জন্য খুলে দিলেন। লাল ইটের বিরাট প্রাসাদ। সম্মুখভাগে গ্রীক করিন্থিয়ান থামের অভিজাত চেহারা। আম পিপুল আর বেগুনি ফুলের গাছ জাকারান্দার ছায়ায় ঘেরা বাগান। বিলেতি লুপিন ফুলের শয্যা দিয়ে প্রান্তর সাজানো। রক্ত-সিঁদুরী বোগেনভিলিয়ার মেলা প্রত্যেকটা দেওয়াল ছেয়ে আছে। আর আধখানা চাঁদের আকারের পদ্মপুকুরে হয় প্রখর রোদ ঝিকমিক করে হাসে, না হয় বর্ষাধারা জলতরঙ্গ বাজায়।

মাইক আর তার বন্ধুরা তাদের সামরিক খোলস খসিয়ে পদ্মপুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ তো বিলেতি ক্লাবের সুইমিং পুল নয় যে সভ্যতার নিয়মমাফিক রয়ে সয়ে উপভোগ করতে হবে। সূর্যের উত্তাপে দেহের সব বাধাবন্ধন আপনা থেকে খুলে গেল। শুধু মশারিমার্কা জাঙিয়া পরা মহাদেবমার্কা দেহগুলি কমলসায়র তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

জীবনে এই প্রথম ওরা কমলবন দেখেছে। ইয়োরোপের মৃত্যুযজ্ঞ এবং এশিয়ার মৃত্যুযজ্ঞের মাঝখানে এই স্নিগ্ধ শান্তির অন্তরাটুকু ওরা অন্তর ভরে ভোগ করে নিতে চায়।

তার পর ক্লান্ত হয়ে ওরা পারে এসে টান টান হয়ে নরম সবুজ ঘাসের গালিচায় এলিয়ে পড়ল। পিছনে পড়ে রইল গোপন পর্যবেক্ষণের প্ল্যান, হানাদারদের উপর পিছন থেকে হানার ব্যবস্থা আর জানোয়ার হাতিয়ার আর জঙ্গী দলের পরিবহন।

এই তো জীবন। তিলে তিলে প্রতিদিনের শত কাজের সহস্র যন্ত্রণার মধ্যে শ্যাম্পেনের আস্বাদের মতো সুধারস।

আজি যে রজনী যায় তাকে জিমসন সাহেব ফিরাতে দেবেন না। এরা প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আজ বন্ধনহীন দায়িত্বহীন জীবন আস্বাদ করে নিচ্ছে। কাল সকাল থেকেই ওরা অন্য মানুষ হয়ে যাবে। আজ সন্ধ্যাতেই ওদের জিমসন মণিপুরী নাচ দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এবং রেসিডেন্সির মধ্যেই। বাইরে নিয়ে গেলে যদি গুপ্তচররা খোঁজ পেয়ে যায়।

বিশেষ করে নাচ দেখাবার বন্দোবস্ত করলেন জিমসন সাহেব এজন্য যে এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত। সাধারণ জঙ্গী অফিসারদের মতো এরা বলরুম নাচ বা কমফর্ট গার্লস অর্থাৎ আরামের নারী খুঁজে বেড়ায় না।

প্লেন চালাতে চালাতে মাইকের চোখের সামনে ভেসে উঠল মণিপুরী নাচের সেই অপূর্ব দৃশ্য।

হলিউডের জিগফিল্ড গার্লসদের অবিশ্বাস্য রকমের জমকালো চোখ-ধাঁধানো দৃশ্যের মধ্যে নাচের ছবি সে দেখেছে। দেখে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথায় লাগে জিগফিল্ড গার্লদের লাস্য মণিপুরী মেয়েদের লাবণ্যের কাছে। ওদের বিলাস জাগিয়েছিল বিভ্রম। এদের রাসলীলা জাগাল বিস্ময়। এই নাচ হচ্ছে দেবতাদের উৎসব। তাদের আনন্দ দেবার জন্য এই রচনা।

লাই হারাওবা নাচে মেয়েদের মিছিল দেখে মাইক মুগ্ধ হয়ে গেল। পুজো আর আরতির পরিবেশে দেবতার আবাহনের মধ্যে নর্তকীরা আমন্ত্রণ জানাল সৃষ্টিকে, যৌবনকে, প্রেমকে। অনবদ্য হাতের ভঙ্গিতে ললিত লীলায় ভরা সৃষ্টির প্রশস্তি গাইল। যে সৃষ্টি জীবনের ধারাকে রাখে অব্যাহত, জন্মস্রোতকে নব নব রূপে মরণের কবল থেকে ঊর্ধ্বে অক্ষুন্ন রাখে। ওরা ললিত ভঙ্গিতে, মধুর সংগীতে গাইল লাস্যভরা যৌবনের বাসনার গান।

দুলে দুলে ফুলে ফুলে অলিদলের মতো ওরা ব্যঞ্জনাময় গতিতে ঘুরতে লাগল। ওদের উলটোদিকে পুরুষ নর্তকরা এসে হাজির হল। নারীদের তালে তালে তালে ময়ূরের মতো ওরা নিজেদের মেলে ধরে নাচতে লাগল।

কোথায় লাগে তার কাছে দক্ষিণ আমেরিকার ট্যাঙ্গো বা স্পেনের ফ্লামেন্কো নাচ।

লাস্য আর তাণ্ডবের অপরূপ মিশ্রণ দেখতে লাগল মাইক আর তার বন্ধুরা। মুগ্ধ হয়ে তদ্‌গত হয়ে

ওরা সৃষ্টিক্ষমতা আর নবজন্মের পূজার আরতি দেখতে লাগল। ভাবে, তালে, রাগে, নাট্যে আর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠল একের পর একে মহারাগ, বসন্ত রাগ, কুঞ্জ রাগ। প্রাণের সৃষ্টি যে কেমন করে প্রেমে বিকশিত হয় তারই রসময় ব্যঞ্জনা।

আত্মহারা হয়ে নাচ দেখতে দেখতে ওরা মিলিটারি মেসে ওদের মধ্যে খুব বেশি চালু গানটাও ভুলে গেল :—

নরকের ঘণ্টা বাজে টিংগা লিংগা লিং
তোমার জন্যে, আমার জন্য নয়।
দেবদূতরা গাইছে গান লিংগা লিংগা লিং
স্বরগে হাজির হব চায়ের সময়॥

মৃদঙ্গের বোল আর করতালের দোল ওদের জীবনের আনন্দস্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আকাশের রেখার ওপার থেকে সেই চাঁদের ফালির মতো কমল সায়রে তখন ছায়াছায়া একটা ভাব চাঁদের আলোতে আর নাচের আসরের আলোতে হাসতে শুরু করেছিল। আর সংগীতের ক্ষণিক বিরতিগুলির ফাঁকে ফাঁকে জলের হিল্লোল অস্ফুটভাবে শোনা যাচ্ছিল। দিগন্তে দূরান্তের পাহাড়গুলির চূড়ায় চূড়ায় হালকা হাওয়ার দোলায় সাদা মেঘ আর নীল আকাশের লুকোচুরি দেখা গিয়েছিল সারাদিন। আর এখন কমল সায়রে চাঁদের হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙাচোরা লীলা।

তাই এরা যে গান গাইছিল আর যে নাচ নাচছিল তার পটভূমি হচ্ছে কুঞ্জকানন। শত্রুর কামান নয়।

অবশ্য গোপনে মণিপুরের সবারই মনে জাপানি আক্রমণ সম্বন্ধে ভয়ের ভাব এসে গিয়েছিল। কিন্তু মুখে কখনও প্রকাশ করত না। ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজ জাপানিরা বর্মা মালয়ে মুচড়িয়ে ওদের ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার কেশর ফুর্‌র্‌ ফুর্‌র্‌ করে উড়ছে এদেশে।

আর কেনই বা উড়বে না? মার্কিনরা এসে গেছে আসামে। মণিপুর রোড রেল স্টেশন থেকে আরম্ভ করে ইম্ফল পর্যন্ত মিত্র সেনার আনাগোনা। মা ভৈঃ!

তাই মণিপুরের বাসিন্দা লোকরা যুদ্ধ সত্ত্বেও বেশ হাসিমুখে জীবন চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রচুর টাকা আর খাবার জিনিস আর ভোগ্যসামগ্রী যুদ্ধের দৌলতে এদেশে ঢালা হয়েছিল। ছোট্ট ইম্ফল শহরে রোজ চলছিল চার চারটে থিয়েটার আর অগুনতি নাচের নাটমণ্ডপ।

এতদিন শিশুর মতো সরল নিশ্চিন্ত জীবন ছিল ওদের। ওরা ঘুমিয়ে পড়ত ইংরেজিতে যাকে বলে লাকড়ির মতো আর ঘুম থেকে উঠত সংস্কৃতে যাকে বলে সূর্যমুখীর মতো। তারপর নিজেদের অনেক ভাবে নাড়া দিয়ে দিনের কাজে সাড়া দেবার জন্য তৈরি হতে শুরু করত।

বাচ্চারা যেমন করে খেলনা নিয়ে নির্ভাবনায় কাটায় ওরাও তেমনি ভাবে গীতিকবিতার মতো স্বচ্ছন্দ ভাবে দিন কাটাত। ওরা গান করত, নাচত— কেবল দেখাবার জন্য নয়, শোনাবার জন্য নয়। পাখি যেমন গায়, ময়ূর যেমন নাচে তেমনি ওদের সহজ ভাবে জীবনের আঙিনায় বিহার।

প্লেন চালাতে চালাতে মনে পড়ল যে এই আনন্দের ছবি দেখবার জন্য মাইক আর তার সহকর্মীরা উৎসুক হয়ে এসেছিল। এবং এই ক্ষণটুকু পর্যন্ত তাই অনুভব করছিল। চারদিকের সেনা আর সাজসাজ রব যেন মণিপুরীদের আনন্দকে ছুঁয়ে যেতেও পারেনি এত দিনে।

সেদিন দুপুরেই মাইক জিমসনকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা স্যার, এখানে কাউকে দৌড়াতে দেখি না কেন?

জিমসন হেসে বলেছিলেন, চোর ছাড়া আর কেউ এদেশে দৌড়ায় না।

মাইক ভাবল যে বোধ হয় এরা সবাই আশা করছে যে জাপানিরা যদি ভুল ক্রমে চোরের মতো হঠাৎ এসে পড়ে ওরাও দৌড়াবে। অর্থাৎ দৌড়ে পালাবার পথ খুঁজবে।

অহিংস বৈষ্ণবের দেশ, প্রেমের গানে মুখর ললিতকলার লীলাভূমিতে এসে ক্ষণকালের জন্য মাইক যুদ্ধের পোশাক আর মনকে মুখোশের মতো খসিয়ে দিয়েছিল। সরিয়ে রেখেছিল।

সেই সন্ধ্যায় রেসিডেন্সি যেন গার্ডেন অব ইডেনে পরিণত হয়েছিল। যেখানে সবাই হাসবে, খুশি হবে। আশা করবে।

সেই নিশ্চিন্ত আশা নিয়েই রেসিডেন্সিতে মণিপুরী তরুণীরা সবে মুখাবলি নাচ শুরু করেছিল। নরনারীর সৃষ্টি আর প্রেমের সঞ্চার হবার পরই মনোহরণের পালা। তাই করযুগল, চরণ দুখানি, নিতম্বভার আর মোহন মুখ নিয়ে কৃষ্ণ কানাইয়ের বাঁশির সুরে সাড়া জাগাতে হবে।

মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরীরা নাচছিল আর 'মধুর মধুর' বলে ধ্বনি তুলছিল। সংগীতে অনুরাগী মাইক ওদের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে তাল দিচ্ছিল—

ধা কি তা ধা ধুমা কি তা ধা

ধে রা কিতা ধা...

এমন সময় গুরু গুরু রবে আঁধার ডম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরে জাপানি কামানের গম্ভীরা বেজে উঠল।

বজ্রগম্ভীর তার প্রতিধ্বনি পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুখে নেমে এসেছিল একটা নীরক্ত নীরবতা। কথা গেল বন্ধ হয়ে, নৃত্যগীত হল স্তব্ধ। চঞ্চল চরণে তরুণ তরুণীর দল যেন নৃত্যপরা মেনকার মতো তালভঙ্গ করে মঞ্চ থেকে বিদায় নিল। নিমেষের মধ্যে কোনও অদৃশ্য মায়াবী সব আনন্দ মুছে নিয়ে গিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মাইকদের তারুণ্য ফিরে পাওয়া, ভাবনা পিছনে ফেলে আসা মুখগুলি কোমলতাকে মুখোশের মতো ফেলে দিল। নিমেষে পাণ্ডুর আর তার পরমুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল।

স্বেচ্ছায় নিজের দেশ, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য ছাত্রজীবন ছেড়ে যুদ্ধে মরণের জন্য ওরা নাম লিখিয়েছিল। তার মধ্যে যে করুণতা আর সাহস আর বাঁচবার বাসনা নিহিত আছে তা ওরা মনেও আনতে চায়নি।

তবু অর্ধমুকুলিত ফুলগুলির পরাগ রেণুতে জীবন মাধুরীর সঙ্গে মরণ মহিমা মিশে থাকে সব সময়। হায়! মধুতে ভরা কমল বনের কলিকাগুলির মধ্যে হিংসার বিষ জেগে উঠছে যে। এখনই।

এখনই। এই জাপানি কামানের দূরাগত গুম্ গুম্ ধ্বনির সহসা তাড়সে।

সেই রাতেই মায়াময় স্মৃতির হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাইক আবার সামনের দিকে তাকাল।

সেই প্রথম ডমরু ধ্বনির পিছনে পিছনে এসেছিল জেনারেল মুটাগুচির তিনটি পদাতিক ডিভিশন অর্থাৎ সাতাশটি ব্যাটালিয়ন, ৩৩নং ডিভিশন আর নেতাজীর আই. এন. এ. ব্রিগেড। ওদের ঠেকানোর একমাত্র যে উপায় ছিল তা সম্মুখ সমর নয়। ওদের হেবি আর্টিলারি আর ট্যাঙ্ক আর পাক আর্টিলারিকে পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নতুন চমকপ্রদ আকাশী অভিযান হচ্ছে এটা।

মাইক 'এস' পাইলট ও লীডার হয়ে পথ দেখাবার সৌভাগ্য পেয়েছে।

বিরাট রাশিয়ান ফ্রন্টের চেয়ে দক্ষিণ চীন থেকে আরাকান পর্যন্ত ছড়ানো বর্মা ফ্রন্ট অনেক বেশি বড়। তারই মধ্যে সে ফর্মেশন ফ্লাইটের দলপতির দায়িত্ব পেয়েছে। দুরূহ দায়িত্বের দুঃসহ আনন্দে সে ভরপুর।

সেই আনন্দে সে এখন একবার মণিপুরের মরকত মণির চূড়াগুলির দিকে জার্মান কবি গ্যেটের মতো প্রসন্ন সিংহাবলোকন করল। গ্যেটে বলেছিলেন যে একটা দেশকে ভালো করে দেখতে গেলে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াও। তখন আল্পস্ গিরিমালাকে একটি বিশাল স্থাপত্যকলার স্তূপ মনে হবে। তুমি মোহিত হয়ে যাবে দেখতে দেখতে।

কিন্তু মাইক একথাও মনে করল যে তাদের ফোর্থ কোর সেনাদলের হাতে সম্প্রতি মোটে সামান্য র‍্যাশন ছিল। আরও পঁচিশ দিন তাতেই চালিয়ে নেবার জন্য র‍্যাশন কেটে ঠিক অর্ধেক করে দিতে হয়েছিল।

তখন সে আর তার দল বোমা ফেলার বদলে শত্রুকে এড়িয়ে দেড় কোটি টন র‍্যাশন, সাড়ে আট লাখ গ্যালন পেট্রল, আট কোটি সিগারেট আর দেড় হাজার টন খচ্চরের খাবার জাপানি সেনাদলের পিছনে নিজেদের সেনার ব্যবহারের জন্য আকাশ পথে নামিয়ে দেবার ভার পেয়েছিল।

একগাদা প্যারাসুটের মালায় ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে জীপ গাড়ি, বেইলিব্রিজ, কামান প্রভৃতি নামিয়ে দেবার অভিনব কৌশলটা তার মাথাতেই এসেছিল। তার জন্যই ৫৩ নং জাপানি ডিভিশন ইম্ফলের দিকে এগোতে পারছে না।

প্রাণ ভরে সে একটা প্রসন্ন নিঃশ্বাস নিল। পাশে তাকিয়ে তার অভিযানের বন্ধু, তার সহপাঠিনীর বন্ধু স্বয়মের দিকেও একবার দেখে নিল। নিজে তো যুদ্ধ করছে নিজের দেশের জন্য, জাতির জন্য। হ্যাঁ, সাম্রাজ্যের জন্য। স্বয়ম্ করছে কার জন্য? এমন বেপরোয়া ভাবে ঝুঁকি নিয়ে যেচে কাজ নিচ্ছে বার বার।

কেন? কিসের জন্য?

মুখ ফুটে স্বয়ম্ কিছু বলেনি এখনও।

কিন্তু মাইক রিসার্চের ছাত্র। অতএব সে কিছুদিন আগে এ বিষয়ে একবার গবেষণা করেছিল। সে সময়ে জঙ্গলে তাঁবুতে একসঙ্গে বসে সে সমুদ্রগর্ভে ডেপ্‌থ চার্জের মতো স্বয়মের মনের গভীরে তলফোঁড় দিয়েছিল।

ঠিক বিলেতি ভব্যতা আর নিস্পৃহতার বেড়াজালের ওপার থেকে একটা পাহাড়ি রূপকথা ফেঁদে বসেছিল। যদি স্বয়ম্ নিজেকে মেলে ধরতে চায় ধরুক। যদি না চায়, তার গোপন মনে সে অনধিকার প্রবেশ করতে বা অনর্থক আঘাত দিতে চাইবে না। সেই কথাবার্তাগুলি মাইকের মনে পড়ল। মরণঝাঁপের আগে।

মাইক বলেছিল, জানো স্বয়ম্, এই উত্তর-পূর্ব পার্বত্য লোকদের রূপকথাগুলি কী চমৎকার। দেশটাই তো রূপকথার দেশ। তুমি তো আকাশী সেনাপতি। তোমার যোগ্য গল্প হচ্ছে এটা। এরা বলে যে রামধনুতে চড়ে দেবতারা পৃথিবী থেকে আকাশে উড়ে চাঁদের দেশে উঠে যায়। প্রেয়সীর সঙ্গে মিলবার জন্য। আরেকটা উপজাতির গল্পে আছে যে রামধনুর আকাশী সাঁকো দিয়ে বধূ তার বরের বাড়ি যায়। তুমিও নিশ্চয়ই বিমান থেকে একদিন নেমে আসবে কোনও রাজকন্যার আঙিনায়।

স্বয়ম্ হাসিমুখে কোনও ভাবলেশের ছোঁয়া রাখেনি।

সে বলেছিল মাইক, এক পাহাড়ি সীমান্ত দেশে যদি কোনও মিল্‌টন জন্মাত আর এদের ভাষা যদি ইংরেজি হত তাহলে এদের পৃথিবী আর আকাশ আর গ্রহ তারা সম্বন্ধে যা কাহিনি আর ধারণা আছে তার মাহাত্ম্য সবাই স্বীকার করত। এরা বলে যে আকাশ আর ধরণী হচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকা। আকাশ যখন ধরণীকে ভালোবাসে ঘাস লতা গাছ প্রাণী প্রভৃতি সন্তান জন্মায়। হায়, তবু এদের মধ্যে ঘন ঘন বিচ্ছেদ হয়, ভেবে দেখো, মাইক, তোমাদের মিল্‌টনের কলমে এই বিষয়বস্তু কী দারুণ একটা প্যারাডাইস সৃষ্টি করতে পারত।

মাইক ওর দিকে একটা প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল, স্বয়ম্, তোমার পাণ্ডিত্য আর সাহিত্যবোধ নিয়ে তুমিই সেই মিল্‌টন হলে না কেন? কেন তুমি এই নরক গুলজার করা যুদ্ধে নাম লেখতে এলে? এ তো তোমাদের নিজস্ব যুদ্ধ নয়। তোমদের নেতা গান্ধীজী তো তাই বলেন।

স্বয়ম্ কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিল। সে শুধু বলেছিল যে রাজনীতি জীবনের সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। রাখা উচিত নয়। তোমার প্রশ্নের বদলে আমি তোমায় সুবনশিরি উপত্যকার মিরি জাতির সূর্য স্তবের কথাগুলি শোনাচ্ছি। তুমি যখন শেষ রাতে বোমা বোঝাই প্লেন নিয়ে সূর্যোদয়ের পানে ধেয়ে যাও তখন এই প্রার্থনাটা মনে রাখলে একটা তাজা আর সাহসী ভাব বোধ করবে।

মিরিরা বলে—হে সূর্য, তুমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবার উপরে। সব কিছু দেখো। তোমার উৎসবের মধ্যে নিচের পৃথিবী থেকে তুমি সুন্দর গহনায় সেজে, রঙিন টুপি মাথায়, সামিত অস্ত্র হাতে উঠে আসো। জানো, মাইক, তোমার সঙ্গে বোমারু বিমানে অভিযানে বেরিয়ে আমার সেই স্তবটা সব সময় মনে হয়। প্রাচীন মিশরের ফ্যারাও আখনাটেনের সূর্য স্তব এত মহান নয়। আর জানো, সুবন শিরি কথাটা হচ্ছে আসলে সুবর্ণ শ্রী। সোনার সৌন্দর্য।

মাইক গম্ভীর স্বরে বলেছিল, সেই সোনার সম্পদ তুমি কার কাছে পেয়েছ তা...

আর কিছু সে বলতে পারেনি সেই রাতে।

তখনই তার ক্যাম্প খাটের কাছে রাখা খুদে মাইক্রোফোনে একটি সাংকেতিক আওয়াজ আরম্ভ হয়েছিল। সে তার যন্ত্রটি কানে তুলে নিয়ে কী সব কথা শুনল। স্বয়ম্ কিছু বুঝল না। কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

মিলিটারি গোপন পর্দার আড়ালের খবর যে সংশ্লিষ্ট নয় তার জানতে নেই। জিজ্ঞেসও করতে নেই। এমন কি বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়। সে শিক্ষা স্বয়ম্ পেয়েছে মিলিটারিতে এসে।

সে চুপচাপ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সে জানত যে এই বিশেষ রেডিয়ো টেলিফোনে যে সব কথা হয় তা 'স্ক্রাম্‌ব্‌লড্' হয়ে অর্থাৎ নানা রকম আওয়াজের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে ইথার তরঙ্গে ভেসে আসে। শুধু যে কথা বলছে আর যে শুনছে তাদের দুজনের যন্ত্রে সেই মাখামাখির গোঁজামিলের ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল কথাগুলি প্রকাশ হয়। সেই দুজন ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে বা ধরতে পারে না।

এই সূক্ষ্ম সেক্রাফোন বাণী পাঠানো বা শোনার যন্ত্র মাত্র গুটিকয়েক বিশেষ কর্মীকে দেওয়া হয়। মাইক তার কাজের গুরুত্ব আর দায়িত্বের জন্য সেই রকম একটি খুদে যন্ত্র ব্যবহার করে। সব সময় সঙ্গে রাখে।

সে সব গোপন সাংকেতিক কথাবার্তার পরে মাইক স্বয়মের খোঁজে তাঁবুর বাইরে এল। এসেই দূরে একটা রক্তরাঙা লাল ফুলে ছাওয়া গাছের তলায় স্বয়ম্‌কে দেখতে পেল। কোন্ চিরবিরহী ওর সামরিক বাসনার তলায় বাঁশির বদলে অসি তুলে নিয়েছে তা আবার বের করবার জন্য সে বিসার্চ করবে। এক পক্ষের অর্থাৎ স্বাতীর মনের কথা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু নিজের মধ্যে মগ্ন স্বয়মের মন রয়েছে অজানা।

মাইক মনে মনে জানে যে হাতে আর মাত্র দু-তিনটে রাতের অবসর আছে। তার পরেই...

তাই এখনই এই সেক্রাফোন কথাবার্তা যেন মোটেই হয়নি এমন একটি ভাব দেখিয়ে সে স্বয়ম্‌কে বলল, জানো, আজ আমার আরেকটা রাতের জন্য বড় নস্টালজিয়া লাগছে। সুখের অতীতের জন্য মনটা আকুলি বিকুলি করছে।

স্বয়ম্ ভালো করেই তার ভিতরের কথাটা বুঝেছিল। সামনেই আসছে মরণ অভিযান। তার আগে অতীতের জীবনরসের আস্বাদটুকু আবার ঝালিয়ে নেওয়া ভালো। তাহলে জীবনটা বৈষ্ণবের ঝুলি থেকে উজাড় করে ঝেড়ে ঝুড়ে দেওয়া সহজ হবে।

সে হেসে বলেছিল, তোমার নস্টালজিয়ার, পুরনো সুখের কথা মনে করে আকুলি বিকুলি হবার রহস্যটুকু খুলে বলো। হয়তো কালই আর বলবার মতো মন থাকবে না। সময় থাকবে কিনা তাই বা কে জানে।

দুজনেই একটু ক্ষণ চুপ করে রইল।

কালকের কথা তুললে তো সামরিক জীবনে আর রহস্য থাকে না কিছুই। মনের মোড় ঘোরাতে হবে।

তাই সব কিছু ঝেড়ে ফেলে স্বয়ম্ গভীরভাবে বলে উঠল, মাইক, ইউ আর গেট; বাট বি গ্রেটার, প্লিজ।

॥ তেত্রিশ ॥

তুমি যেন সেই কৃষ্ণ—প্রেমের ঠাকুর কৃষ্ণ। রাধার জন্য অপেক্ষা করে আছ।

বলে মাইক এত মিষ্টি করে হাসতে লাগল যে স্বয়ম কোনও মতেই রাগ করতে পারল না।

মাইক আরও বলল, জানো, তোমায় ফ্লেম অব দি ফরেস্ট কৃষ্ণচূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠিক তাই মনে হয়েছিল।

বাধা দিয়ে হেসে উঠল স্বয়ম্, আহা হতে তো পারতাম। কিন্তু কোথায় তোমার কৃষ্ণচূড়া এই জঙ্গলে।

বাধা মানল না মাইক, না হোক কৃষ্ণচূড়া। পইনসেটিয়া গাছ তো বটে। তার রাঙা বাহার কৃষ্ণের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে সমানই মানাবে। তবে একটা কথা. .

উৎসুক হাসিমুখে স্বয়ম্ তাকাল।

—রাধা তো আমাদের জগতে প্রেমের খোলা মাঠেই পেয়ে যায়। ঝোপঝাড়ে একটেরে লুকিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। তাই মনে হল ভিনাসের কথা।

রহস্যময় হাসিতে মুখ ভরিয়ে স্বয়ম্ শুনিয়ে দিল, হায়। আমা হেন আর্য সন্তানের জন্য মোটে একটি ভিনাস। অথচ তোমাদের রাজপুত্র প্যারিসের জন্য তিন তিন খানা স্বর্গের দেবী প্রেমিকা হয়ে হাজির হয়েছিলেন।

মাইক বলল, না, ঠিক প্রেমিকা নয়।

স্বয়ম্ মাথা নেড়ে বলল, অবশ্য, অবশ্যই প্রেমিকা। মহাকবি হোমার তো অন্ধ ছিলেন। তাই নজর করতে পারেননি। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি।

এবার বাধা দিল মাইক।

সে বলল, আমি যে ভিনাসের কথা ভাবছি সে একাই গোটা মানুষের প্রস্ফুটিত প্রেমের পক্ষে পর্যাপ্ত।

মুখে হাসি আর চোখে কৌতুক ফুটিয়ে স্বয়ম্ এই অপরূপার কথা জানতে চাইল।

মাইক বলল, ইটালিতে লেক মাজিয়েরোর মধ্যে একটা দ্বীপে টিশিয়ানের আঁকা সেই ভিনাস। ভিনাস অব উর্বিনো। বাস্তব সংসারের রক্তমাংসের দেবী। মদিরা। মধুরা রূপ নিয়ে সুখশয্যায় আধেক শুয়ে রয়েছে

এক হাতে এদেশের কৃষ্ণচূড়ার মতো আগুনজ্বালা লালরঙের ফুল। অন্য হাতটি নারীর একান্ত রহস্যটি আবরণ করে রেখেছে। তার নগ্ন দেহলতাই তার সব চেয়ে বড় সত্য, সব চেয়ে সার্থক সাফল্য।

এই বরনারীর মোহিনী মায়ায় মিলিয়ে দিল স্বয়ম্ একটু হাসি।

—তুমি কি তাকে প্রাণে জাগিয়ে তুলবার জন্য প্রার্থনা করতে চাও? চাও তো আমি একটা সংস্কৃত মন্ত্র তোমায় লিখে দিতে পারি।

যেন কোনও যুদ্ধের, মৃত্যুর ছায়া কোথাও কিছু নেই। দুই যোদ্ধা বন্ধুর সেই মুহূর্তের কথাগুলি রাত্রির অসীমে অনন্ত কালের জন্য ছড়িয়ে রইল।

মাইক প্লেনের গতিপথ মাপতে মাপতে নিজের উত্তরটা মনে করল।

না। সেই কথাগুলি রাত্রির অসীমে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হারিয়ে যায়নি।

মাইক বলেছিল, না, তোমার দেবভাষার মন্ত্র দেবীদের জন্যই উৎসর্গ করে রাখ। আমি কিন্তু ওই ভিনাসকে জীবনে মুকুলিত করে তুলতে চাইতাম না। কারণ রক্তমাংসের নারী হয়ে উঠলে সে আমার মতো ইউনিভার্সিটির সামান্য বৃত্তির টাকায় হাড়ে মাসে উপোসী ছাত্রের সঙ্গে মজত না। যে অ্যাপোলো বেলভিডিয়রটি তার নজরে প্রথম পড়ত তারই সঙ্গে প্রেমে মশগুল হত।

—সেই জন্যেই শুধু...?

—হাঁ। সেই জন্যেই আমি এমন কোনও জগতের কথা জানি না যেখানে প্রেম টিকে থাকে আর সর্বদা পারতৃপ্তি দেয়। না। তার চেয়ে আমি কবিতা আওড়ে যাব। এমন কি ভিনাসের ছবি নকলও করব। কিন্তু কখনও সেই ছবি শেষ করবার জন্য চেষ্টা করব না। শুধু ভালোবেসেই যাব। সেই চলমান ভালোবাসার মধ্যেই ফুলের মতো ভেসে চলবে আমার সুখ।

—ওহ্। এই হচ্ছে তোমার নস্টালজিয়ার স্বরূপ?

—উঁহুঃ। মোটেই নয়। পিছনের দিকে তাকানো, অতীতের কাছে ঋণী বোধ করা কোনও কাজের কথা নয়। প্রত্যেক শিল্পীই আগেকার অন্য কোনও শিল্পীর ধ্যান না হোক, ধারণাকে চুরি করে। সবাই ধার করে। সবাই অতীত থেকে গ্রহণ করে, তাকে ভাঙিয়ে খায়।

—তুমিও মনে হচ্ছে, হাসতে হাসতে স্বয়ম বলল, তুমিও মনে হচ্ছে কোনও একটা বিশেষ অতীতের সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ে আছ।

বলতে বলতে স্বয়মের মুখ মাইকের অনুসন্ধানী নয়নের সামনে কেমন যেন করুণ হয়ে উঠল।

এহেন ভাব যোদ্ধার পক্ষে ভালো নয়। বিশেষ করে যাকে হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে, প্রায় বিনা নোটিশে, আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এবং অসীম শূন্য থেকে শত্রুর নরককুণ্ডের উপর। মাইক অভিজ্ঞতার আগুনে অনেক পোড় খেয়েছে।

তাই মাইক তাড়াতাড়ি আর বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দিল, টু হেল উয়িথ দি পাস্ট। অতীতের নিকুচি হোক। আমি কখনও পিছনের দিকে তাকাই না। নস্টালজিয়া নিয়ে মাতামাতি করি না। শুধু আমার শেষ 'সর্টি', লড়াইয়ের হামলাটা কত ভালো হয়েছিল আর এর পরেরটা আরও কত ভালো হবে সেটুকুই আমার মাথাব্যথা। সব চেয়ে খারাপটা কখনও ঘটতে নাও পারে।

একটু থেমে সে বলল, জানো স্বয়ম্, ফরাসিতে এই কথাটা চমৎকার ভাবে বলেছে। লে পিয়র নে প্যা তুজুর সুর।

আরও একটু থেমে সে আবার শোনাল, "তুজুর" অর্থাৎ সদাসর্বদা সেই কথাটি মনে রেখো, ভাই।

সেই কথাটা মাইক আবার মনে মনে আবৃত্তি করল। মনে মনে স্বয়ম্‌কে উদ্দেশ করে আবার উচ্চারণ করল। জীবনের চেয়ে বড় কিছুর সন্ধানে যে নিরত নিয়তি যেন তার প্রতি প্রসন্ন হয়। বিনা বিপদে বিনা অপঘাতে তাকে প্রিয়ার কাছে ফিরিয়ে আনে।

এই প্রার্থনা তো সে করবেই। স্বয়ম্‌ও যে সেই রাত্রি নিশীথে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে তার জন্য এমনই একটি শুভকামনা জানিয়েছিল।

আর...আর...শেষ পর্যন্ত একটি কথায় নিজের অন্তর প্রায় খুলে দেখিয়েছিল।

স্বয়ম্ বলেছিল, জানো, মাইক, একটা গ্রীক কবিতার অনুবাদ পড়েছিলাম মিলিটারিতে যোগ দেওয়ার পরে। তোমাদের ব্রিটিশ এক্সপিডিশনারি ফোর্স অভিযানী সেনাদের মধ্যে যারা এই বর্মা সীমান্ত থেকে

ফিরবে না তাদের জন্যই যেন গ্রীক কবি লিখে গিয়েছিলেন :—

তোমরা যখন ফিরে যাবে ঘরে
মোদের কথা বলো তাদের সবে;
তাহাদেরি আগামী দিনের তরে
মোদের আজ সঁপে গেলাম ভবে।

এবং সর্বদা প্রার্থনা করেছি যে তোমার সম্বন্ধে যেন একথা লিখতে না হয়। না হয়। কখনও না হয়। তিন দিব্যি।

সেই স্বয়ম্‌কে আজ এই প্লেন থেকে আঁধারে অজানা আঘাটায় ঝাঁপ দেবার আগে মাইক একটা কথা বলবে কী বলবে না ভেবে পাচ্ছে না।

অথচ জাপানি বাহিনী শত্রুপক্ষ হিসাবে এত দুর্ধর্ষ আর নৃশংস যে কোনও পাশ্চাত্ত্য শত্রুবাহিনীই এত ভয়ংকর নয়। স্বয়মের শিশুর মতো সরল, পণ্ডিতের মতো ধ্যানমগ্ন মন। ভি ফোর্সের বেপরোয়া বিপদের, দুঃসাহসী অভিযানের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে হয়তো এই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে ওঠেনি।

এদিকে শত্রু এখন বিমানবাহিনীর অভাবে কোণঠাসা হয়ে এসেছে। ফলে হয়ে উঠছে আরও নিষ্ঠুর। আরও মরীয়া। আরও বেপরোয়া।

সিঙ্গাপুরের পতনের সময় জাপানিদের বিজয় উল্লাসের মধ্যে যেটুকু খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব হয়তো ছিল এখন তাও নেই।

মাত্র হাজার পাঁচেক সৈন্যের জীবনের বিনিময়ে প্রায় জলের দরে ওরা সিঙ্গাপুর জয় করে নিল। সাত শতাব্দী আগে চেঙ্গিশ খানের বন্য মোঙ্গল বাহিনী ভিয়েনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল খোলা তলোয়ার হাতে। তারপর এত শতাব্দী পরে একটা এশিয়াটিক বাহিনী শ্বেতজাতির শক্তি আর সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি সিঙ্গাপুর পায়ের তলায় পেয়েছে।

এক লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য যখন বন্দী শিবিরে ঢুকছিল তখন তাদের বারবার মনে পড়েছিল এই ''ছোট্ট হলদে বাঁদর''দের প্রতি অতীতে নিজেদের কঠিন ঘৃণা আর দুর্ব্যবহারের কথা। এখন এসেছে তাদের প্রতিহিংসার, প্রতিশোধের পরম লগ্ন।

এই মোটা কথাটা ইংরেজ আমেরিকান জাতিরা ভুলে গিয়েছিল। সেজন্যই জাপানিরা বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছে তার নিন্দায় পঞ্চমুখ। মাইক নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখেছে।

কিন্তু জাপানি সৈন্যদের জাতির প্রতি, জাতির নেতা—স্বর্গ থেকে নেমে আসা নেতা—সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের দিকটাও ভুললে চলবে না। এই সিঙ্গাপুর অস্ত্র সমর্পণ করে সারেন্ডার করল সন্ধ্যা সাতটায়। কিন্তু সেই বশ্যতা যিনি জাপানের পক্ষে গ্রহণ করলেন সেই জেনারেল আমাশিটা সেই রাতে শুধু যে ঘুমাতে পারেননি তা নয়। অশান্ত হৃদয়ে বারুদ আর ধোঁয়ার গন্ধে ভরপুর আকাশের তলায় পাহারাদার ছাড়াই একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সারা রাত।

ভোরবেলা যখন উঠতি সূর্যের প্রথম কিরণ আকাশে ফুটে উঠেছে তখন তিনি টোকিয়োতে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করে সিঙ্গাপুর থেকে প্রার্থনা করেছিলেন। বার বার প্রায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে জাপানি প্রথায় অভিবাদন করেছিলেন।

শুধু তিনি কেন, কোনও লোকই তখন জানত না যে তার বিজয়ে পৃথিবীটা ওলটপালট হয়ে গেছে। আর কোনও দিনই সেই আগেকার পৃথিবী ফিরে আসবে না।

আশ্চর্য এই জাপানি মনোবৃত্তি। যুদ্ধে এসে ওরা পরাজিত শত্রুকে সামুরাই সোর্ড দিয়ে ঘটা করে মাথা কেটে ফেলে পরমুহূর্তে চাঁদের বর্ণনা করে কবিতা লিখতে পারে। এই বিচিত্র 'এনিগ্‌মা' অর্থাৎ রহস্যে ভরা দ্বিমুখী দ্বৈতবাদী জাপানি চিত্তও এই যুদ্ধের ফলে বদলিয়ে গেছে। ওদের ফুল আর রক্তে মাখামাখি সভ্যতার এই দিকটা বাইরের জগৎ ঠিক বুঝতে পারে না।

শুধু এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে পরাজিতের প্রতি হিংস্রতায় ওরা সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। সেই প্রবৃত্তি আরও বেশি ভয়াল হয়ে ওঠে যখন ওরা দেখে যে কোনও কালা আদমী সাদা ইংরেজ আমেরিকান পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করছে। স্বয়মের জন্য সেজন্য আরও বেশি চিন্তা। দেবদূতরা তাদের সব ডানা দিয়ে ওকে রক্ষা করুন।

মাইকের মনে পড়ল নেপোলিয়নের কথা। কোনও উচ্চপদে সেনাপতিদের নিয়োগ করবার সময় উনি

তাদের অভিজ্ঞতা বা রণকুশলতার কথা বিচার করতেন না। জিজ্ঞেস করতেন—'ইজ হি লাকি?'' ভাগ্য, ভাগ্যই সবচেয়ে বড় কথা। পুরুষকার বড় হতে পারে। কিন্তু মোড় ঘোরায় ভাগ্য।

স্বয়ম্ সেনাদল নিয়ে শত্রুর ঘাঁটির উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ওদের পিছনে আকাশ থেকে নামবে। ভারী কাজে। কিন্তু হালকা হাতে নয়। হাতে হাতে শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। নিজেদেরই পিঠে বাঁধা কিট ব্যাগে আছে বাজুকা, গ্রিনেড, প্লাস্টিক বিস্ফোরক মশলা। শত্রুপক্ষের যে কোনও নিশানাহীন এলোপাথাড়ি গুলিই সে গুলিতে রঙমশালের খেল দেখাতে পারে।

জীবন্ত রঙমশাল আর তুবড়ির লীলা তখন ফুটে উঠবে এই জাম্পিং স্মক অর্থাৎ ঝাঁপানি পোশাকে ঢাকা মনুষ্য দেহেই।

রাতের আকাশে উল্কাপাত দেখতে কত মজা, কত কৌতূহল, কত কল্পনা। কিন্তু নিজের সর্বাঙ্গে অস্ত্র আর বিস্ফোরক বয়ে বেড়ানো অবস্থায় হাতের কাছে, নিজের চার ধারে মেশিনগানের লাল মিটিমিটি হাল্কা আর বুলেটের বারিধারা দেখার মধ্যে আছে কোন্ মজা? কোন্ কৌতূহল? কোন্ কল্পনা?

না। এই সীমাহীন বিপদে অসীম শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে স্বয়ম্‌কে সেই গোপন কথাটি বলে দেওয়াই ভালো। সে নিশ্চয়ই নিজেকে সবকিছুর জন্য, শেষ পরিণতির জন্য পর্যন্ত প্রস্তুত করে নিয়েছে। 'ডেথ আর গ্লোরি' মরণ না হয় মহিমা এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে সে। এখন শুধু তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার সেই কথাটি যা হয়তো ওর রক্ষাকবচের কাজ করবে।

মাইক প্লেনের গতি কমিয়ে আনল।

প্যারাট্রুপ বাহিনী তার মানে বুঝতে পেরে তৈরি হতে লাগল। ফ্লাইট ডেকে ওরা শুধু দুজন। শেষ পরামর্শ করে নিচ্ছে।

এবং যে কথাটা হয়তো শেষ কথা হয়ে উঠতে পারে তাও এখনই বলে দেওয়া দরকার।

সময় নেই।

আর সময় নেই একটুও।

পাশে বসা স্বয়মের কানে কানে মাইক বলল, স্বয়ম্, স্বাতীর খবর তুমি জানো কিছু? তোমার কাছে তো এর কথা শুনিনি সম্প্রতি।

হঠাৎ খুশিতে ভরে উঠল স্বয়মের মন। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানো নাকি কিছু? তুমি তো বার বার বেস এরিয়াতে যাবার সুযোগ পাও। এমন কি কলকাতা দিল্লিতেও।

খুব মৃদুস্বরে, যেন শুধু নিজেকেই শোনাচ্ছে এমনভাবে মাইক বলল, স্বাতী খুব কাছেই আছে। 'বেস' এরিয়ার কাছেই। সে এখন 'ওয়াফে'র স্কোয়াড্রন অফিসার।

উল্লাসে নয়, আনন্দে স্বয়মের মন ভরে উঠল! স্বাতী এত কাছে। কেন—সে কথা তার চেয়ে বেশি আর কে বুঝবে?

হতাশার নয় ভাবনার রেশও স্বয়মের মনে জেগে উঠল। স্বাতী শুধু শত্রুর নয় মিত্র সেনারও ভয়ানক কাছে। বিপদ আসে বহু রকমের। ঘরে, বাইরে, চারি ধারে।

কিন্তু কোনও বিশেষ ভাবান্তর না দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, কিন্তু মাইক, কী করে এটা সম্ভব হল? ডবলিউ. এ. এ. এফ. বিমান বাহিনীর সহায়ক নারী সেনা তো ডিফেন্স উইমেনস ফোর্সের রেগুলেশনের আওতায় পড়ে। স্বাতী তা হলে রেগুলার এনলিস্ট হয়েছে? রয়্যাল এয়ারফোর্সের এটা একটা অপরিহার্য ইউনিট। স্বাতী, স্বাতী, নাও আই অ্যাম গ্রেটফুল টু গড। স্বাতী, আত্মবিকাশে সার্থক স্বাতী।

গভীর স্বরে মাইক বলল, তুমি ঠিক বলেছ স্বয়ম্। কাউন্টেস অব কার্লাইল নিজে ওকে বাছাই করে নিয়েছিলেন দিল্লিতে। কাউন্টেস বলেন, স্বাতী ইজ এ রেয়ার ফাইন্ড। সুদুর্লভ আবিষ্কার।

—আশ্চর্য! আশ্চর্য!

হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে। তোমার আমার কখনও এরকম ভাবে সমর নায়কদের নজরে আসবার যোগ্যতা হয়নি। 'সিয়াক' সাউথ ইস্ট এশিয়া কম্যান্ডের 'সুপ্রিমোর' স্ত্রী লেডি মাউন্টব্যাটেন দিল্লিতে 'স্যালুট দি সোলজার' বলে একটা বক্তৃতা সভার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তখনই স্বাতীর প্রতিভার ট্যালেন্টের সঙ্গে ওদের প্রথম পরিচয়। ওর ব্যক্তিত্ব, মানুষ চালানোর ক্ষমতা, ক্ষুরধার বুদ্ধি ওকে একবারে প্রথম সারিতে এনে দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি।

স্বয়ম্ শুধু বলল, গড ইজ গ্রেট।

মাইক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলল, জানো, এই যে আমাদের আজকের অপারেশন, এই অভিযানের প্রত্যেকটি বিমানের গতিবিধি-ব্যবস্থা সব বেস কন্ট্রোল অপারেশন রুমে বসে সে-ই নিশান দিয়ে বোর্ডে প্লট করার তদারকি করছে। শত্রুপক্ষের বিমান হানার পথ, আমাদের শত্রু এলাকায় হানার, নিচে নেমে এসে বোমা ঝরানোর সরু লাইন সবই ওর রাডারে ফুটে উঠছে। আশ্চর্য, এমন যুদ্ধের ট্যাকটিকস কী করে যে এত তাড়াতাড়ি এত ওস্তাদের মতো আয়ত্ত করে ফেলেছে তা বুঝি না। শুধু সহজাত বুদ্ধি, শুধু শেখানোর কৌশলে অতটা সম্ভব হয় না। আরও কিছু আছে। মন, মন প্রাণ ঢেলে দেওয়া।

স্বয়ম্ কিছুই মন্তব্য করল না। এই অভিনব আবিষ্কারের বিস্ময় যেন সে অন্তরের অন্তস্থলে একেবারে নিজের করে নিচ্ছে।

শুধু অস্ফুট স্বরে সে বলল, স্বাতী, স্বাতী।

মাইক তা বুঝল। তাই কথা ঘোরাবার চেষ্টায় বলল, স্বয়ম্, তুমি যদি ওকে যোদ্ধার সাজে দেখতে। কাঁধের ওপর দুটো রিং বোনা; তাদের মাঝখানে একটি সরু রিং। মাথায় তেরছা স্লাউচ হ্যাট, তার ওপর একটা ঝলমলে ফ্ল্যাশ। ব্যক্তিত্বে ঝলমল, নেতৃত্বে অবিচল মহীয়সী এক নারী।

সময় হয়ে এসেছে। মরণ ঝাঁপের সময়। সঞ্জীবনী বাণীটুকু এখন না দিলে আর কখনও দেওয়া হবে না।

মাইক বলল, স্বয়ম, উয়ার স্বয়ম্। তোমায় একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই। এই মরণ ঝাঁপের আগে। তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই যে সম্প্রতি তোমার প্রত্যেকটি অভিযান হয়েছে আমার সঙ্গে। কেন, তা তোমার জানা দরকার।

স্বয়ম্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে শুধু তাকাল।

—স্বয়ম্, তুমি তা জানলে নিজেকে অনর্থক অকারণ ঝুঁকির সামনে তুলে ধরবে না। স্বাতীর অনুরোধ। স্বাতীর। সে চেয়েছে যে তুমি যথা সম্ভব পাকা ব্যবস্থায়, পাকা হাতের আওতায় কাজ করে যাও। তাই।

স্বয়ম্ আবার চোখ তুলে তাকাল।

—ডিয়ার স্বয়ম্, তার মানে তুমি নিজেকে অকারণে অযথা বিপদে ফেলো না। সফল হবার জন্যই সাবধানতা দরকার। মনে রেখো...

স্বাতীর অনুরোধ।

স্বয়মের সার্থকতা।

॥ চৌত্রিশ ॥

নিমেষে অমৃত রসে ভরে উঠল স্বয়মের মন। ঝাঁপ দেবার খোলা প্রান্তরটা এক মিনিটের মধ্যে দেখা যাবে। প্লেন নিচু মুখ করে ঘুরতে ঘুরতে নামছে। এবং আবার একটু সোজা হলেই সেই চরম মুহূর্ত।

তার আগে হঠাৎ, হে ভগবান, হঠাৎ যখন স্বাতীর নামটি আমার কানে তুলে দিয়েছ তার কথা একটু ভাবতে দাও। আমার সব ব্যবস্থা আর অনুচরদের প্রতি সব নির্দেশ ঠিক করা আছে। কর্তব্যে কোনও ত্রুটি করিনি।

কাজেই স্বাতীর কথা হঠাৎ একটু ভেবে নিলে বীরের ধর্মে নিশ্চয়ই পতিত হব না।

স্বাতী আমার কথা ভাবছে। আমরা নিরাপদে, তার মানে যথা সম্ভব কম বিপদে, যুদ্ধে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে মাইকের মারফত। সেই স্বাতী।

তার কথা আমায় একটু ভাবতে দাও।

না। মানুষের মরদেহ নিয়ে, রক্তমাংসের মরণলীলা নিয়ে এত কারবার করেছি যে সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে এই মুহূর্তে স্বাতীর কথা ভাবব না। জীবনের চেয়ে বড় সে। জীবনাতীত হয়ে থাক।

তবু—তবু তো ভুলে থাকা যায় না।

মরণ ঝাঁপের ঠিক আগে একটা ছবি মনে পড়ল। প্লেনের ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ যেন গানের সুরের মতো ধ্বনি তুলছে। তাই রাজস্থানী রাগিণীর ছবি মনে পড়ল। স্বয়ম্ স্বাতীকে দেখল দেব গান্ধার রাগিণীর রূপে। মিলন প্রত্যাশী প্রেয়সী প্রিয়ের নিরাপদে ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করছে। যোগিনী রূপে।

ভোগবিলাস ছেড়ে দিয়ে। তার চুলের চূড়ার উপর সাজানো মণিমুক্তা মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়ে প্রেমের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন রাগিণীর রূপে স্বাতীকে কল্পনা করে সে একটা বিচিত্র আনন্দ পেল। বিরাট নিষ্কৃতি। সংসারে তার এখন কোনও ব্যর্থতা, কোনও না পাওয়ার বেদনা রইল না।

এবার এখনই তাকে ঝাঁপ দিতে হবে। মনকে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে নিল। এক লহমায় অতীত স্মৃতি মুছে নিল। দলপতিই তো পথ দেখাবে। অফিসার কম্যান্ডিং এই ইংরেজি শব্দটা অনেক বেশি জঙ্গী। অনেক বেশি জোরদার।

রেডি টু জাম্প।

ঝাঁপের জন্য তৈরি হও।

সবাই উঠে প্লেনের শিরদাঁড়ার সঙ্গে লম্বালম্বি যে শক্ত ডাণ্ডা লাগানো আছে তাতে নিজেদের আঙটাগুলি আটকিয়ে নিল। যাতে হঠাৎ টানের আকর্ষণে হুড় হুড় করে সবাই দলকে দল ছিটকে বেরিয়ে না যায়।

বাতাস তার হালকা ভাব হারাচ্ছে। আর তার চাপে কানে একটু যন্ত্রণা মতন হচ্ছে কারও কারও। ঝাঁপের দরজার ঝাঁপিটা খোলা হল। হাওয়ার স্রোতে কারও কারও গাল পতাকার মতো পৎ পৎ করে নড়তে লাগল। আর পেটের মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে যেন।

গো-ও-ও।

হাত আর পা জোড়া দিয়ে স্বয়ম্ নিজেকেই যেন ধাক্কা দিল। ঈগল পাখির মতো নিজেকে যেন ডানা মেলে ছড়িয়ে দিল। শরীরটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেল। আর বাতাসের স্রোতের উপরে ঠেলে ওঠা চাপে যেন একটা নরম গদির মতো অনুভব হল। যেন সে শূন্যে নিথর দাঁড়িয়ে আছে আর প্রবল বায়ুর বেগ ওর ঝাঁপানি পোশাককে টেনে রুখছে।

স্বয়ম্ জানে যে এই হাওয়ার গদিই শূন্য থেকে নামার সময় ডিগবাজি খাওয়া বা লাট্টুর মতো ঘুরপাক খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। পিঠটা একটু বেঁকিয়ে আর হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিলে শরীর দিয়ে শূন্যের আয়তন একটু বেশি করে ঢাকা যায়। তখন মিনিটে দু মাইল গতিতে শরীরটা নামতে থাকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে সাদা তুলোর মতো হালকা মেঘ পেঁজা তুলোর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। পড়ন্ত বা উঠন্ত সূর্যের আলোয় তাদের উপর কী রঙের খেলাই না দেখা যেত। এখন কিন্তু ওদের মোটেই সুন্দর মনে হচ্ছে না। নিচের জমি, নামবার জমি দেখার অসুবিধা করছে ওরা।

চাঁদের আলো-আঁধারির মধ্যে সে দেখল যে দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলো যেন হঠাৎ মাথা তুলে তার দিকেই তাকাল। অন্য অন্য প্লেনগুলি যেন ওই চূড়াগুলোর মধ্যে ব্যাকুলভাবে নিজেদের গোপন আস্তানা খুঁজে বের করবার জন্য পাখা মেলে দিয়েছে।

এবার সময় হল।

স্বয়ম্ মোটা ওয়েবিং ফিতেতে একটা হ্যাঁচকা টান মারল। বুকের ছাতিতে একটা আচমকা চাপ পড়ল। যেন ফুসফুস থেকে নিঃশ্বাস বায়ু বেরিয়ে আসতে চাইছে। তারপর...

তারপর নিচের দিকে সে আর তাকাল না। সামনের দিকেও না। উপরের দিকে চোখ মেলে দিল। প্রাণ ভরে দেখল যে তার উপরে বিরাট একটা ছাতা, রঙ বেরঙের ছাতা খোলা রয়েছে। যেন মহাশূন্য তাকে অদৃশ্য হাত দিয়ে মাথার উপর ছাতা মেলে আশ্রয় দিয়েছে।

ততক্ষণে নিচের পৃথিবী আরও বড় হয়ে কাছে এসে গেছে। মাটি, মাটি মা, তার স্নেহের আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে কোলে তুলে নেবার অপেক্ষায় রয়েছে।

মনের মধ্যে একটা কথা গুঞ্জন করে উঠল। আমার ডানা নেই। ইঞ্জিন নেই। প্লেনের ককপিটের আশ্রয় নেই। কিন্তু আমার মা আছে। জীবধাত্রী ধরিত্রী।

সেই মায়ের কোলে নামবার জন্য পঞ্চাশ ফুট উপর থেকে সে তৈরি হয়ে নিল। খুঁতনিটা বুকের কাছে টেনে আনল। আর কনুই দুটো বগলের কাছে। শরীরটা একটু বেঁকিয়ে পায়ের গুলির উপর ভর করে মাটিতে নামবার জন্য তৈরি হল।

একেবারে নিজের ত্রিভঙ্গ ধাঁচে।

স্বাতীও তো নাচের কথা বলেছিল। বিদ্যুতের মতো কথাটা মনের মধ্যে উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে নিচে থেকে মাটি যেন তেড়ে ফুঁড়ে উপরে উঠে আসছে। যেন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে নির্ঘাত।

ততক্ষণে সে মায়ের কোলে আলতো ভাবে নেমেই একটুখানি গড়াগড়ি খেয়ে গেল।

মাথার উপরে আকাশে ধীরে উড়ন্ত সি-৪৭ ডাকোটা বিমানগুলি থেকে মানুষ নামক মালগুলি পরের পর ঝুপ ঝুপ করে খালাস হচ্ছে। সেই মানুষরা তারই সঙ্গী, তারই হুকুমে নির্দেশে প্রাণ দেবার জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে নামছে। মাথার উপর প্লেনের ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো এসে চলে যাচ্ছে। যেন ভগবানের দোহাই দিয়ে শপথ করে যাচ্ছে যে আর এরকম চোরাই হামলা কখনও করবে না। পাহাড়ি চূড়াগুলির দিব্যি।

এদিকে চোরাই মালের মতো চুপি চুপি সৈন্যদল নামছে। প্রত্যেকেই ভগবানের কাছে নিশ্চয় প্রার্থনা করছে যে পা ফেলবার মতো একটু মাটি যদি পায় জীবনে কখনও আর এহেন চোরা কারবার করবে না। সমস্ত অন্তরাত্মা বলছে যে চোখ দুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেলো, বলের মতো নিজেকে বিপদের মুখে এসে গুটিয়ে ফেলো। কিন্তু শিক্ষা বলছে যে যদি বাঁচতে চাও যে শেখানো হয়েছে ঠিক তাই করো।

ঠিক যখন ভয় হবে যে যেখানে মাটি থাকার কথা হয়তো সেখানে তা নেই তখনই হঠাৎ একটু ধাক্কা খেয়ে পা দুটো জানিয়ে দেবে যে এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে।

তখন চোখ মেলে দেখতে পাবে যে চারপাশে ছাতার আঁচল বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে।

ছাতায় ছাতায় আকাশের চাঁদোয়াটা ভরে গেল।

ততক্ষণে জাপানিরা কোনও দূর পাহাড়ের চূড়ার ও. পি. অর্থাৎ নজর ঘুমটির মধ্যে থেকে এই ছাতার সমারোহ নজর করেছে।

তাদের গুলির গরম অভ্যর্থনায় অনেক ছাতা ফুটো হয়ে যেতে লাগল। চুপসিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢিলের মতো অসহায় ভাবে ছাতার আরোহীরা টুপটুপ করে পড়ে যেতে লাগল। কেহ কেহ পড়বার আগেই গুলির ঘায়ে শেষ হয়ে গেল। শীতের ভোর রাতে বিলের পাড়ে পাড়ে পাঁতিহাস শিকারের চেয়েও সহজ এই প্যারাট্রুপ শিকার।

জঙ্গী জীবনের জঙ্গলী সুখ।

অসহ সুখ, অসংখ্য উত্তেজনা। স্বাতীর ভাষায় বেঁচে থাকার রস। নিজের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের সবার নামার প্রতীক্ষার সময়টুকু স্বয়ম্ ফিল্ড গ্লাস দিয়ে চার দিকে কড়া নজর রাখছিল। হঠাৎ স্বাতীর কথা মনে হল—লিভ এ লিটল। একটুখানি বাঁচো।

মুহূর্তে সেই স্মৃতি সে মন থেকে সরিয়ে দিল। আমার ফোর্সকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে আমার উপর দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ ভাবে সফল করার মধ্যেই আছে সেই বাঁচা। এই মুহূর্তে সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বাঁচার রস।

এমন সময় স্বয়মের দলের অনেকগুলি ছাতি ফুটো হয়ে যাচ্ছে দেখে সাদা সাদা ধোঁয়ার ফোয়ারা ওদের চারপাশে ছাউনী রচনা করতে লাগল। সেই আবরণ শুধু শূন্যে, মহাশূন্যে। আকাশে নয়। ওদের তৃতীয় ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্স জাপানি ফাইটার ফর্মেশনকে প্রায় কাবু করে এনেছিল। তাই এটা সম্ভব হল।

এবার জঙ্গলের পাশে পাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে কী চমৎকার ধোঁয়ার আঁচল তৈরি হতে লাগল। যেন প্রাচীন কালের রোম্যান অ্যাম্ফিথিয়েটারের গ্যালারি চারদিক ঘিরে আছে। সেই গ্যালারিগুলিতে নিষ্ঠুর দর্শকরা সারি সারি হাজির। মাঝখানের রঙ্গভূমি এরেনাতে জমায়েত হয়েছে মরণপথ যাত্রীর দল।

জাপানিরা আকাশী বাহিনীকে চলতি ভাষায় বলে দেবতাদের সৈন্য। কিন্তু পাশার দান উলটে গেছে। এখন শত্রুর প্লেনের অলক্ষ্য পাখা থেকে ঝড়ে পড়ছে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া। সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য এখনও তৈরি হয়নি। তাই অসহায় যোদ্ধাগুলিকে সাময়িক ভাবে আঘাতের আড়ালে রাখা দরকার। মাত্র কয়েকটা মিনিট। তার মধ্যেই ওরা তৈরি হয়ে নেবে।

ততক্ষণে স্বয়মের নিজের দেহের সঙ্গে বাঁধা ছোট্ট রেডিয়ো ফোনটি সে চালু করে নিয়েছে। 'রোজার' 'রোজার' বলে আহ্বান জানাল। তারপর একটি সাংকেতিক খবর আর তার পাস ওয়ার্ডের জবাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাংকেতিক নির্দেশ।

সে অনুসারে সেই ধোঁয়ার মেঘের বৃত্তের বাইরে বাইরে কিছু নকল রবারের প্যারাট্রুপার নামিয়ে দেওয়া শুরু হল।

বাইরে থেকে ঘেরাও হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে শত্রুসৈন্য ওই ডামি প্যারাট্রুপারদের দিকে তাদের ফ্ল্যাকগান চালাতে লাগল। রবারের নকল সৈন্যের জান আসল সৈন্যের চেয়ে বেশি শক্ত। একবার গুলির ঘায়েই অনেক সময় ঘায়েল হয় না। শত্রুপক্ষের গুলিগোলার ভাঁড়ার খুব বেশি নয়। সে সব যত বাজে খরচ হয় ততই এদের আরও সুবিধা।

আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধিই সব চেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার। আগেকার মতো অতখানি ষণ্ডা গুণ্ডা হবার ততখানি দরকার এ যুগে আর নেই।

আসাম রাইফেল, বর্মা রেজিমেন্ট, নেপালী শের রেজিমেন্ট প্রভৃতি থেকে বেছে নেওয়া পাঁচমিশেলি টাস্ক ফোর্স নিয়ে স্বয়ম্ তার বিশেষ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ড্রপ জোন অর্থাৎ যে এলাকায় সৈন্য আর হাতিয়ার আর সরবরাহ নামানো হবে সেখানে প্রথমে নিজেদের দখল পাকা করে নিতে হবে। শুধু প্যারাট্রুপ নয়, এর পরে ডাকোটার পিছনে বাঁধা জোড়া জোড়া গ্লাইডার থেকে নামবে আরও সৈন্য এবং সব কিছু।

প্রত্যেকটা গ্লাইডার নামার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে মানুষ পড়বে ঝাঁপিয়ে আর হাতিয়ার যন্ত্রপাতি খালাস করতে হবে। তারপরই সেগুলি টেনে একটেরে সরিয়ে দিতে হবে যাতে অন্য গ্লাইডার সেখানে নামতে পারে। নামবার জমিটুকু লম্বালম্বি পুরো খালি রাখতে হবে।

গহন অন্ধকারের মধ্যে এদিক-সেদিকে চাঁদের আকাবাঁকা রেখা। তাকে ছাপিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের মতো বারুদের লীলা। সেই বিস্ফোরণের আলোতে ফুটে উঠছে নিজের দলের সৈন্যদের দেহের দীর্ঘ কম্পিত ছায়া।

আর কম্পিত ছায়া হচ্ছে বনলক্ষ্মীর আঁচলের। দূরে নয়, একেবারে কাছে। চারদিক ঘিরে মায়ের স্নিগ্ধ আঁচল যেমন করে শিশুকে দুরন্ত হাওয়ার ঝাপটা থেকে রক্ষা করতে চায় তেমনভাবে ছড়িয়ে আছে অরণ্যানী। দূর পাহাড়চূড়া থেকে শেলের আঘাতে বাজুকার আস্ফালনে বনের চেলাঞ্চল কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই বনভূমিই হচ্ছে মা। ধরিত্রী। ধাত্রী।

যেন কোনও মহামূল্য সবুজে শ্যামলে মিশানো শাড়ি পরে ধরণী এই সৈন্যদলকে আগলিয়ে রেখেছে। এই শাড়িতেই ভোরের কুয়াশা ভেদ করে আলো ফুটে উঠলে দেখা যাবে কতজন শেষ শয্যায় শুয়ে আছে। এই আধো ঝলসানো আলো-আঁধারে বহু হাসি চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাথা আর আনন্দে দুলে উঠবে না কখনও।

অথচ এই বনের ওপারেই তখন হয়তো কোনও সোনালি প্রান্তরে শ্যামল ঘাস হেসে মাথা দোলাতে থাকবে।

কিন্তু কল্পনার কোনও অবকাশ নেই। জাপানিরা যাতে পাহাড় থেকে নেমে কোনও পালটা আক্রমণ না চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড়ি নদীনালার অন্ত নেই। তার উপর কাঠের পোলও আছে। জাপানিরাও হয়তো সেগুলি মজবুত করে নিয়েছে যাতে সদলবলে ট্যাঙ্ক আর ওয়েপন ক্যারিয়ার নিয়ে পার হয়ে আসতে পারে। সেগুলি ব্যাঙ্গালোর টর্পেডো বা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে।

স্বয়ম্ তার দলের স্যাপার ও মাইনারদের সে কাজের জন্য পাখার মতো ছড়িয়ে দিল। লড়াইয়ের ভাষায় ফ্যানিং আউট।

নিজেদের পক্ষের আরেকটা স্কোয়াড্রন প্লেন মাথার উপর এসে নিচু হয়ে চক্কর খেতে খেতে পিছনে বাঁধা গ্লাইডারগুলিকে ছেড়ে দেবার জন্য তৈরি হতে লাগল। স্বয়ম্ জানে যে প্রথম প্লেনটি চালিয়ে আসছে মাইক। প্রত্যেক বারই সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। অবিস্থিতি, গতি, উচ্চতা এ সবই ঠিক করে দেয় সে। বাকি প্লেনগুলি সে অনুসারে চলে। খানিকটা ফিরে গিয়ে আরেক ঝাঁককে পথ দেখিয়ে আনে।

হঠাৎ সেই প্লেনটিই একটা জাপানি গোলার অর্থাৎ ফ্ল্যাকের ঘায়েই হোক বা যে কারণেই হোক দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। ফিল্ড গ্লাস চোখে স্বয়ম্ পরিষ্কার দেখল যে পাইলট ইজেকটার সীটের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে এসে নিচে পড়ে যাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে সে যেদিকে যে জায়গায় সেই মানুষ অথবা বস্তু নেমে আসছে তা লক্ষ্য করতে লাগল। হ্যাঁ, প্যারাশুট ঠিকই খুলে গেছে। তবে সম্ভবত একটু দেরিতে। মাটির অনেকটা কাছে এসে। হয়তো গুরুতর আঘাত পাবে।

হে ভগবান্! এই পাইলট আমাদেরই দলের যোদ্ধা, বীর। একে উদ্ধার করতেই হবে। বাঁচাতেই হবে। আমাদের সাফল্যের জন্য এর জীবনের দাম হিসাবের বাইরে।

আর হে ভগবান্! এ যদি মাইক হয় তাহলে তো কথাই নেই। একে উদ্ধার করা অন্য যে কোন কর্তব্যের চেয়ে অনেক বড়। এই যুদ্ধে এর চেয়ে বড় ধর্ম আর বোধ হয় আমার পালন করার সুযোগ আসবে না। আমাকে পক্ষপুটে আগলিয়ে নিয়ে চলেছে সে। স্বাতীর অনুরোধে। স্বাতীর।

জাপানিরাও নিশ্চয় ওই পড়ন্ত পাইলটের নেমে আসা লক্ষ্য করেছে। হয়তো ওরাও এই বিশিষ্ট পাইলটকে ঘায়েল বা বন্দী করবার জন্য খুঁজে বেড়াবে। আর একটুও দেরি নয়। দ্বিধা নয়।

স্বয়ম্ তাড়াতাড়ি নিজের দ্বিতীয় নম্বরকে কী কী করতে হবে মুখে মুখে নির্দেশ দিল। নিজে কোন্ দিকে অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিল। ওষুধ স্ট্রেচার প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন সে দিকে পাঠায়। রেডিয়ো ফোনে সাংকেতিক খবর পাঠাল আর বলল যে সরেজমিনে দেখে যথাসম্ভব সংকেতে যেটুকু জানানো সম্ভব তা জানাবে।

সে এগিয়ে চলল। তক্ষুনি।

অন্যান্য ব্যবস্থা সঙ্গে নিতে গেলে যেটুকু সময় যাবে তার জন্যও সে অপেক্ষা করবে না। একা এগিয়ে যাবার বিপদ সে বরণ করে নিল। সেই দুঃসাহস, মনের জোর আর নিজের উপর ভরসা আছে। এই ক-মাসের শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায় সে এক নতুন মানুষ।

চার দিকে চাপা গুম্ গুম্ কামানের ধ্বনি। বিদ্যুতের মতো হঠাৎ হঠাৎ বুলেট বাতাসের বুক চিরে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ভেরি লাইটের আলো এদিক সেদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক গুলি বা মর্টার বা গ্রেনেড। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আর মরণ-যন্ত্রণা।

এ সব সত্ত্বেও যেন নিবিড় নিশ্চিদ্র আঁধার স্বয়ম্‌কে ঘেরাটোপের তাঁবুর মতো ঘিরে রেখে ওর সঙ্গে এগিয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই অন্ধকারকে সে যেন আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ফেলতে পারে। ঠিক যেমন করে তার হাতের আর পিঠের হাতিয়ার আর এমার্জেন্সি প্যাককে কেউ ছুঁয়ে দেখে নিতে পারে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অন্ধকার শুধু নিবিড় নয়। একটা সাঁতরিয়ে সাঁতরিয়ে এগিয়ে চলা তিমি বা হাতির মতো বিরাট একটা কালিমা। যেন তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

কেবল হঠাৎ কোনও স্টার শেলের আলোয় ইস্পাতের মতো মসী নীল আকাশের নিচে ঘন পাহাড়ের জঙ্গল জানান দিয়ে দেখা দেয়।

তখনই দেখা যায় দূরে দূরে প্রেতের মতো কিছু গাছ। শেলের ঘায়ে তছনছ। কিন্তু ছেঁড়া প্যারাশুটের চাদরে মোড়া প্রেত ছাড়া ওরা আর কিছুই নয়। কামান আর মর্টারের ব্যারাজ অর্থাৎ একটানা আওয়াজ যেন ও'দেরই ভয় দেখানো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

তারই মধ্যে হঠাৎ একটা চাপা গোঙানি স্বয়মের কানে এল। খুব সাবধানে অন্ধকারে চোখ আর কান খোলা রেখে সে এগিয়ে গেল। নিজেদের একজন সেরা পাইলটকে খুঁজে বের করতে গিয়ে তারই মৃত্যুর কারণ যেন সে না হয়। বিশ্বাস নেই, শত্রুরাও হয়তো রাইফেল নিয়ে তারই দিকে তাক করে অপেক্ষা করছে।

হে ভগবান্! শেষ পর্যন্ত মাইক!

হে ভগবান, তুমি কত মহৎ! তুম শেষ পর্যন্ত আমাকে এই সুযোগ এনে দিলে! শেষ পর্যন্ত আমাকে তার পাশে এসে তার রক্ষা আর সেবার চেষ্টা করবার সুযোগ দিলে!

স্বয়ম্ কাছে আসতে আধা অজ্ঞান অবস্থাতেও মাইক বুঝতে পারল যে শেষ পর্যন্ত সে নিজেরই সেনাদলের কাছাকাছি রয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, নিজের বন্ধুর কাছে রয়েছে। সেই ভরসাটুকুই তার মনে জোর এনে দিল। জ্ঞান অনেকটা ফিরিয়ে দিল।

স্বয়ম্ পিঠে বাঁধা ফ্লাস্ক থেকে একটু নির্জলা ব্র্যান্ডি ওকে খাইয়ে দিল।

প্লেনটা যে জাপানি ফ্ল্যাকের আঘাতে আগুন ধরে জ্বলতে জ্বলতে পাগলের মতো এলোমেলো ভাবে কাছের কোনও জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। এখন দেখা গেল যে মাইকের দুটি পা-ই একেবারে থেঁতলিয়ে গিয়েছে। ইজেক্টার সীটের কল্যাণে সে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু ওই হঠাৎ দুর্বিপাক নিচু লেভেলে ঘটায় সে ঠিক সময়ে প্যারাশুট খুলবার সুযোগ পায়নি। তাই মাটিতে পড়বার সময় পা দুটি ভেঙে গিয়েছে।

এমার্জেন্সি কিটের মধ্য থেকে স্বয়ম্ সিরিঞ্জ ও ইনজেকশন বের করল। এটা বিশেষ কয়েকটা সেনাদলের পক্ষে রুটিন শিক্ষা। ভাঙা জায়গাগুলির কাছে স্থানীয় ইনজেকশন দেওয়া হল। ধীরে ধীরে মাইকের

জ্ঞান ঠিক মতো ফিরে এল। এবং প্রত্যুৎপন্নমতি বুদ্ধিও।

ভাগ্য ভালো। তাই শুধু যে ঘাড় ভাঙেনি তা নয়। কাঁধের সঙ্গে আঁটা বেতার যন্ত্রটিও ভাঙেনি। তার মাইক্রো ব্যাটারি পর্যন্ত চালু রয়েছে। মাইক তখনই স্বয়মের সঙ্গে পরামর্শ করে নিল।

তারপর নিজের সাংকেতিক কোড নিশানা জানাল। শূন্যের ওপারে বেতার তরঙ্গে খবর তখনই পৌঁছাল। সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে 'স্ক্রাম্‌বল' করা সংকেতের মধ্যে এই প্রান্ত আর ওই প্রান্তে ব্যবস্থার নির্দেশ। তারপর স্বয়মের অভিযাত্রী দলের সাংকেতিক পাস ওয়ার্ড জানিয়ে, তার দলের অগ্রগতির খবর জানিয়ে দিল।

স্বয়ম্ হিসাব করে ঠিক যে জায়গাতে ওরা দুজন আছে সেই জায়গার সন্ধান দিল। এবং এটাও বলে দিল যে স্মোক স্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। কারণ এখনও বহু চূড়ায় জাপানি পাহারা আছে। তারা আবার ফ্ল্যাক চালাতে পারে। অন্ততপক্ষে কোনও স্নাইপার রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। এই বাস্তব বিংশ শতাব্দীতে কৃত্রিম ধোঁয়ার আড়ালও চালু হয়েছে।

থার্ড ট্যাকটিক্যাল এয়ার ফোর্সের আগুয়ান ঘাঁটি থেকে খবর এল যে সে সমস্ত ব্যবস্থাই ওরা করছে। আহত "সে" পাইলটকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বয়ম্‌কে বিশেষ করে অনুরোধ করা হল যেন সে মাইককে প্রফুল্ল রাখে, লোক্যাল অ্যানাস্থেটিক দিয়ে যন্ত্রণা কমিয়ে রাখে আর অজ্ঞান বা চঞ্চল হতে না দেয়। আধ ঘণ্টা—মাত্র আধ ঘণ্টা ওকে ঠিকভাবে রাখ। তার মধ্যেই উদ্ধারের ও ডাক্তার পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মাইকের জীবন, অভিজ্ঞতা আর রণকৌশল মিত্রশক্তির পক্ষে অপূরণীয়, অতুলনীয়ভাবে প্রয়োজন।

স্বয়ম্ সবই বুঝেছে। কিন্তু তার নিজের প্রাণের মধ্যেও মাইকের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুলতা যে এয়ার ফোর্সের চেয়ে অনেক বেশি। ওদের দরকার সামরিক কারণে। ওর দরকার নিজের প্রাণের টানে।

সমগ্র সত্তা দিয়ে সে মাইককে বাঁচিয়ে রাখবার, উদ্ধার করে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থার চেষ্টা করবে। সে নিজের ইউনিটকে নিজের ফিল্ড টেলিফোনে ওয়াকিটকি যন্ত্রে নির্দেশ পাঠাল। শত্রুপক্ষকে ওদের দিকে আসতে যেন কিছুতেই না দেওয়া হয়। কারণ হিসাবে শুধু জানাল সামরিক গোপন প্রয়োজন। আর নিজের দলের মেডিক্যাল ইউনিটকে হাতের কাছে রাখার জন্য নির্দেশ দিল।

বেশি কথা কওয়া নিরাপদ নয়। কে জানে শত্রুর যন্ত্র আড়ি পাতছে কি না।

রাতের জঙ্গলের বিচিত্রজীবন। বন্য জন্তুর চঞ্চলতা ভরা কিচিরমিচির আওয়াজ। আকস্মিক গোলাগুলির আর মানুষের চিৎকারের আওয়াজ। সব কিছুই থেকে থেকে প্রেতের প্রতিবাদের মতো দূরে দূরে জেগে উঠছিল। অস্বাভাবিক আর্তনাদ, প্রাণভয়ে আকুল জন্তু জানোয়ারের হঠাৎ কাছ দিয়ে ছুটে যাওয়া, সমস্ত বনভূমির অস্থিরতা সব কিছুই মাইকের অশান্ত মন আর দেহের যন্ত্রণাকে থেকে থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

স্বয়ম্ বড় বিপন্ন বোধ করল। আরও ইংজেকশন দিলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে। তার সামান্য ফার্স্ট এড প্রাথমিক চিকিৎসার শিক্ষায় যা করা সম্ভব তা সে করেছে। নিজের মেডিক্যাল ইউনিটকে ডাকতে সাহস হয় না। মাটিতে এখনও ফিলড টেলিফোন পোঁতা হয়নি। শত্রুকে এড়িয়ে কথা বলতে চেষ্টা করার বিপদ আছে।

কিন্তু মাইককে কথা বলে বলে ভুলিয়ে রাখতে হবে। সে ভাবতে লাগল। তার মনের কিনারে কিনারে অমরত্বের আশ্বাস ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। এই অন্ধকারের উপরে সেই অমরত্ব যেন ছায়াপথে নিজের স্বচ্ছ অভঙ্গুর অবিনশ্বর ভরসা ছড়িয়ে রেখেছে। সেই ভরসার বাণী রাতের আকাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এঁকে এঁকে এগিয়ে আসছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নীল কৃষ্ণ পটভূমিতে ক্ষণিকের স্বাক্ষর রাখছে।

সে বুঝতে পারল যে এয়ার ফোর্স ওদের দখল করা বনভূমির চারপাশে রক্ষাকারী বৃত্ত রচনা করবার জন্য অনেক প্লেন পাঠাচ্ছে। চূড়ায় চূড়ায় যে সব শত্রু মোতায়েন আছে তারা বোমার হামলার ভয়ে লুকোবে। অন্তত বনভূমিতে আক্রমণ করতে বের হবে না। তার মানে মাইকের উদ্ধারের ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেছে। সেই সাহসিক ব্যবস্থা নেমে এল বলে।

মাইককে সে এই অনুমানটি জানাল।

মাইক খুশি হল। চিন্তাশক্তি হল সজাগ।

সে আস্তে আস্তে বলল, জানো, আমি খুশি এজন্য যে আমার দেশ, আমার সেনাদল তার সামান্য সেবককেও ভোলেনি। সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। জীবনের কাছে এবং ভগবানের কাছেও। আমার

কথা বলতে বা যুদ্ধের কথা ভাবতে এখন ভালো লাগছে না। কিন্তু তোমাদের দেশের শাশ্বত বাণীর কথা তুমি একটু একটু করে আমায় শোনাতে থাক। মনে আমি শান্তি পাব। আমার দেহের যন্ত্রণা কম বোধ হবে।

স্বয়ম্ উৎসুক হয়ে, পুরোপুরি অবাক হয়ে আহত বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাক্টের বা ন্যাশনাল ডাকের জন্য শিক্ষিত ছেলেরা যুদ্ধে এসে যুদ্ধের চেহারা বদলিয়ে দিচ্ছে।

আশ্চর্য এই পৃথিবী। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হচ্ছে মানুষের মন। কোথায় কখন যে সে কিসে শান্তি পায় তা ধরাছোঁয়ার হিসাবের বাইরে। এমন একটা কথা যে একেবারে অবাস্তব। লোকে বলবে অসম্ভব,গাঁজাখুরি। তবুও তো এটা সত্য।

হঠাৎ তার মনে পড়ল আরেকজন তরুণ ইংরেজের কথা। ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন। ১৯১৮ সনে যেদিন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হল ঠিক সেদিনই সে শত্রুপক্ষের শেলের আঘাতে নিহত হয়। তার পকেটে পাওয়া গিয়েছিল তার নিজের হাতে নকল করা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। যুদ্ধের হানাহানির প্রত্যক্ষ অংশীদারের মনে গাঁথা ছিল ভারত আত্মার নিত্য বাণী। শান্তির সন্ধান। সান্ত্বনার বরাভয়।

সেই ঘোর বিশ্বযুদ্ধ যেদিন ঘোষণা হয়েছিল সেদিন মুখরিত ভাঙনের তীরে দাঁড়িয়ে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ আর ফরাসি মহিলা কবি কাউন্টেস নুয়াইলে গীতাঞ্জলির কবিতার মধ্যে মানসিক আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

তার অর্থ স্বয়ম্ এখন বুঝতে পারল।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে মরণ-বাঁচনের সন্ধিস্থলে শুয়ে ইংরেজ মাইক, বানিয়ার জাত বলে খ্যাত ইংরেজ সন্তান মাইক, স্বয়মের স্বদেশের শাশ্বত আত্মার বাণী শুনতে চাচ্ছে।

আশ্চর্য! কিন্তু পৃথিবীর সব চেয়ে বড়, জীবনর চেয়ে বড় বিস্ময়গুলি এমন ভাবেই হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়।

মনে মনে স্বয়ম্ ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল যে সে এই দেশে জন্মেছে। এই দেশের অমর বাণী জানতে পেরেছে। এত মহান, এত বিরাট তার উত্তরাধিকার।

নিজের মুখ মাইকের কানের কাছে এনে সেই বাণী-সমৃদ্ধ গুঞ্জনে আবৃত্তি করে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজি অনুবাদ। বেদ গানের ধ্বনি, মেশিনগানের হুঙ্কার নয়, যেন এই যুদ্ধে বিত্রস্ত বনভূমিরই মর্মবাণী। সমস্তটা সত্তা ঢেলে দিয়ে সুর করে সে বেদ থেকে আবৃত্তি শুরু করল।

আশ্চর্য এই যুদ্ধ। অবিশ্বাস্য এই যোদ্ধা দুজনের মনেব ধারা। অস্বাভাবিক, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হলেও ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শোন মাইক, তুমি যা চাও তাই তোমায় শোনাব। যতক্ষণ না তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা এসে পৌঁছচ্ছে। অথর্ব বেদের ভূমিসূক্তের কথা শোন। যে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনবে ভেবে তুমি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলে সেই পৃথিবীতে প্রণাম জানিয়ে আরম্ভ করছি :—

"গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোহরণ্যং তে পৃথিবী স্যোনমস্তু।'" হে পথিবী, তোমার বরফে ঢাকা পর্বত, অরণ্য সমস্তই মঙ্গলময় হোক।

"শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ স ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা
তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যাং অকরং নমঃ।"

শিলা, মাটি, প্রস্তর ধূলি এই সব দিয়ে এই পৃথিবী তৈরি। দৃঢ়ভাবে গঠিত। সেই সোনার বক্ষযুক্তা পৃথিবীকে প্রণাম করি।

শুনতে শুনতে মাইকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শান্তির আভাসে ভরা হাসিতে উদ্ভাসিত।

মৃদুস্বরে বলল, এই মহাসংগীত আরও বলো। এখন যদি আমি মরি এই স্তোত্র শুনতে শুনতেই যেন আমি শেষ হয়ে যাই। অ্যাবাইড উইথ মি, ও লর্ড। আমার সঙ্গে থাকো, হে প্রভু।

মৃদু, অতি মৃদু স্বরে স্বয়ম্ বলল, না মাইক, তুমি সেরে উঠবে, বেঁচে থাকবে। আজকের রাতে তোমার মনে যে-কথা জেগেছে তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমরা যারা এই যুদ্ধে মরতে এসেছি, আমরা জীবনে আর মরণে দুইয়েতেই পৃথিবীকে নতুন কিছু দিয়ে যেতে পারব। তোমার মনে সেই সম্পদ আছে।

শান্ত, সমাহিত স্বরে মাইক অনুরোধ করল, আবার বলো স্বয়ম্, আরও বলো, তোমাদের বিশ্ব আত্মা

অনুভবের কথা। আমি বার্লিনে বর্মায় বহু ধ্বংস করেছি। কিন্তু হিংসা করিনি। তাই সৃষ্টির কথা, প্রেমের কথা শোনাও।

স্বয়ম্ আবার বেদমন্ত্র শোনাতে লাগল—

"জনম্ বিভ্রতি বহধা বিবাচসং। নানা ধর্মাণং পৃথিবী যথৌকসম্॥
সহস্রং ধারা দ্রবিণস্য মে দুহাং। ধ্রবের ধেণুরনপস্ফুরন্তী॥"

বিভিন্ন ভাষার আর বিভিন্ন বিচারের নানা জাতির মানুষকে তাদের যথাযোগ্য বাসভূমিতে ধরণী ধারণ করে আছেন। সর্বদা দুগ্ধবতী গাভীর মতো, অশেষ দুগ্ধবতীর মতো, তুমি আমাদের ঐশ্বর্যের সহস্র ধারা দান করো।

আবেগে আবেশে মাইক স্বয়মের দুটি হাত মুঠোর মধ্যে ধরে চুপ করে রইল। ওর দু চোখে প্রসন্নতার ধারা।

হাজার কামান আব ইনসেনডিয়ারি বা নাপাম জ্বালানী বোমার আগুন সে ধারাকে কোনদিন নেভাতে পারবে না।

মাইকের মুঠিতে যেন একটি শান্তিকামী আত্মার অনুবণন স্বয়ম্ অনুভব কবতে লাগল। সেই আত্মাকে আবাহন জানাচ্ছে মানুষ একটি চবম সংকটের মধ্যে পড়ে; যে সংকট সমস্তটা পৃথিবীর, সকলের অস্তিত্বের উপর মৃত্যুর ছায়া ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই আত্মা সাহস আর উৎসাহ আব দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলছে। শুধু মৃত্যু নয়, জীবনের উপরও জয়ী হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেই আমন্ত্রণকে গ্রহণ করে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। মুমূর্ষু মানবাত্মাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে। বেঁচে থাকার অভিশাপগুলির উপব একটা পরম বিজয় হবে সেই ভাবে।

অস্ত্রের উপর আত্মার জয়।

মানুষ মানুষকে যে জয়ের মালা পরিয়ে দেয় তা এই জয়েব পুরস্কারের কাছে তুলনায় কিছুই নয়। স্বাধীনতা আর সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থেকে অনুভব করা এই জীবন। শুধু একটি দিনের পর দিন মরণ নয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে ধূলিকণায় জন্মিয়ে ভস্মরাশিতে পরিণতি হয়। অনুভব করা যে অনন্তের বুক থেকে ছিনিয়ে আনা আকাশছোঁয়া সম্পদ, নিজের বুকে তুলে নেওয়ার মতো ধন হচ্ছে এই জীবন। আমরা যাকে জীবনধারণ বলে জানি তার চেয়ে এই জীবন অনেক বড়।

প্রাণের অনুভবে, প্রেমের অভিষেকে, করুণার অশ্রুনিষেকে।

ভাবতে ভাবতে স্বয়ম্ টের পেল যে মাথার উপর সুদর্শন চক্রের মতো চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে আসছে সিকরস্কি হেলিকপ্টার। আওয়াজটা যথাসম্ভব কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারণ পাখি অন্ধকারে পাখা হাতড়াতে হাতড়াতে ঠিক জায়গাতে এসে নেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে খুদে স্ট্রেচার নিয়ে দুজন অর্ডাবলি আর ডাক্তার লাফিয়ে নেমে পড়ল। খুব সাবধানে মাইককে তুলে নিল। তারপর একটি হুকুমনামা স্বয়মের হাতে দিল। যদি অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে মনে হয় তাহলে শ্রান্ত কর্নেলও যেন তাঁর হেপাজতের মূল্যবান আহত পাইলটের সঙ্গে একই সঙ্গে চলে আসেন। তবে এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বিবেচনাই চূড়ান্ত।

অপারেশন অর্ডারে কারও নাম লেখা নেই। অর্থাৎ হেলিকপ্টার ধরা পড়লেও শত্রুরা মাইক আর স্বয়মের পরিচয় জানবে না।

স্বয়ম্ ধন্যবাদ দিয়ে জানাল যে সে যেতে পারবে না। তার টাস্ক ফোর্সের কাজ এখনও পুরো শেষ হয়নি। এবং তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাদের সঙ্গেই সে ফিরবে। কিন্তু 'হেলি' যেন এখনই—এখনই উঠে পড়ে। তাকে নিজেকে এখনই 'ড্রপ জোন-এ' গিয়ে টাস্ক ফোর্সের ভার নিতে হবে।

ধোঁয়া, সাদা ধোঁয়ার ঘেরাটোপের মাঝ দিয়ে সুদর্শন চক্র ঘোরাতে ঘোরাতে পুষ্পক রথই যেন আকাশে উঠে গেল। বুক ভরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বয়ম্ উঠে দাঁড়াল।

জীবনের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভবে উঠল। যেন একটি মহান সংগীতের রেশে। এই কি তার সেই আধো জাগরণের সন্ধ্যায় সোনা মুনলাইট সোনাটা?

স্বাতীর ঘরে শোনা বীটোফেনেব সংগীতের মানে সে এখন খুঁজে পেল।

তার সমগ্র জাগ্রত চৈতন্য যেন সেই মধুর সুদূর সিম্ফনিতে ভরে উঠল। যেন মৃত্যুকে ছাপিয়ে উঠল

জীবন সংগীত। তার আঁধার অতীতের মধ্যে যা কিছু সত্য আর নিত্য ছিল, যা কিছু তাকে অসহায়ের মতো সহ্য করেও টিকে থাকতে শক্তি দিয়েছে, যা কিছু বেঁচে থাকার গ্লানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রেরণা দিয়েছে, তা যেন কোনও রহস্যময় মন্ত্রে এক সঙ্গে মহৎ হয়ে উঠে তাকে এই বিশ্বের অখণ্ড ঝংকারে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত করে তুলল।

অনির্বচনীয় একটা প্রসন্নতা নিয়ে সে উপরের দিকে আবার তাকাল। যে পথে পাখির কুলায়ে ফিরে যাবার মতো ভাবে 'হেলি' চলে গিয়েছে। যে পথ দিয়ে মাইক শীঘ্র কোনও দিন স্বয়মের স্বাতীকে এই খণ্ডযুদ্ধের খবর মুখোমুখি দিতে পারবে।

আমিও সেই পথে যেতে পারতাম সঙ্গে। কিন্তু ওগো সাথী, মম স্বাতী, আমি সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও সেই পথে ফিরে যাইনি। কেন যে যাইনি তাও তো তুমি জানবে। বুঝবে।

ওগো সাথী। মম স্বাতী।

তোমার নিরালা ঘরের নির্জনতায় সেই সন্ধ্যায় প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড সুরা পান করিনি। কিন্তু জীবনসুধা পান করবার, বাঁচবার বাসনা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ভোরের আলোয় প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড আভা ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোনালি রূপোলি কেশবতী কন্যার চুলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে চার প্রান্তে। পাহাড়ের শিখরে শিখরে, বনভূমির আনাচে কানাচে।

বনান্তে।

দিগন্তে।

ক্ষিপ্র হাতে সে নিজের ওয়ারলেস ফিল্ড মাইক্রোফোন তুলে নিল। টাস্‌ক ফোর্স ওরই নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। এইবার তাদের নিয়ে মায়াবিনী প্ল্যাটিনাম ব্লন্‌ডের রহস্য অবগুণ্ঠন ভেদ করতে এগিয়ে যাবে নতুন প্রমোশন পাওয়া কর্নেল স্বয়ম্ভু রায়।

ভিনদেশী বঁধু

উৎসর্গ

কমল/দেবেশকে

—দেবেশ

উপন্যাসের উৎসমুখে

আসবে কি আজ সন্ধ্যায় তোমার আপন ঘরে প্রিয় কমলা রঙের জর্জেট শাড়িটি পরে? গাইবে কি আপন মনে একটির পর একটি অপরূপ গান আর আমি তোমার অগোচরেই লাইব্রেরিতে বসে এই কাহিনি লিখে যাব গানগুলি ফুলের মালার মতো করে গেঁথে?

কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের কন্যা অনুরাধা পারিখকে যার অবিরাম সস্নেহ প্রেরণা ছাড়া এই বই প্রকাশই হত না। এমন সাহিত্যরসসমৃদ্ধ মন বিরল।

ধন্যবাদ জানাই আমার শ্যালিকা বাণী হাজরাকে। একটি বিশেষ ঘটনার মুখে নায়কের আবৃত্তির জন্য স্বরচিত একটি কবিতা ভুলে গিয়েছিলাম। বাণী কাহিনির মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গানের পর গান গেয়ে 'ওগো বিদেশিনী' এই গানটি দিয়ে সেই নাটকীয় মুহূর্তটি উদ্ভাসিত করে তোলেন।

ধন্যবাদ দিই আমার ''ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল'' ও ফিজিওথেরাপিস্ট পোলিশ তরুণী মারিয়াকে, যার সদাহাস্যময় সেবা ও উপস্থিতি আমায় দীর্ঘ অসুস্থতার গ্লানির উর্ধ্বে উঠে যেতে সাহায্য করেছে।

আর ধন্যবাদ জানাই সুহৃদ শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ককে ও ডা: শ্যামলকান্তি চক্রবর্তীকে, যারা যেচে অনুগ্রহ করে যথাক্রমে বইটি প্রকাশ ও প্রুফ দেখে দিয়েছেন।

দেবেশ দাশ

লন্ডন

॥ ১॥

হিজ এক্সেলেন্সি দি অ্যামবাসাডর অব ইন্ডিয়া ইজ মিসিং।

এ হেন একটা জবর খবর যদি রটে যায়? ভুল বা ভিত্তিহীন খবর ছড়িয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ—।

ইন্ডিয়ার হিজ এক্সেলেন্সির যে রাজকীয় সম্মান। ধুলোয় লুটোবে না কি? অথবা লোপাট—?

কে জানে?

আজকাল আবার অ্যামবাসাডররাই গ্রেট পেইন্টিং বা চ্যাম্পিয়ন রেস হর্স বা হিস্টোরিক হীরে জহরতের চেয়ে বেশি দামি। তাই তারা ছিনতাই হয়ে যায় হঠাৎ-হঠাৎ। অনেক কৌশল আর হরেক রকম ব্যবস্থা ষড়যন্ত্র করে তবেই না উদ্যোগী পুরুষসিংহরা রাষ্ট্রদূত ছিনতাই করতে লাফিয়ে পড়ে। যে কোনও ব্যাংক লুট বা রাজারানীর জহরৎ সাফাইয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মর্যাদা আছে এই অপকর্মে।

খবর হিসাবে গরম। ব্যাপার হিসাবে তোলপাড়। রাজনীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক—।

আর যে দেশে ঘটে আর যে দেশের দূত আটক হয় দুটো দেশেরই নাভিশ্বাস। ট্রেজারি উজাড় করে মুক্তিপণ দিলেও মুক্তি না মিলতে পারে। হয়তো বেশ কিছু টেরবিস্ট বা খুনি ডাকাতকে আগে ছেড়ে নিরাপদে পাঠিয়ে দিতে হবে। হয়তো আগেকার কালের অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার বদলে রাজবন্দী।

কিন্তু যদি অ্যামবাসাডরকে আপাতত শুধু মিসিং বলেই মনে হয়?

তবুও ঘটনাটা হবে একটা অঘটন। কাজেই রটনা হতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।

কারণ তা হলে স্পেন আর ইন্ডিয়া দুটো দেশেরই মাথায় পড়বে বাজ। যা হৈচৈ আর জল্পনা-কল্পনা শুরু হবে তাতে ব্যাপারটা হয়ে উঠবে আরও ঘোরালো।

রাজনীতিতে ইন্ডিয়ার সুনাম আছে নিরপেক্ষ আর নির্ঝঞ্ঝাট বলে। কারোকে সে কাঠি দেয় না, না কারও বাড়া ভাতে ছাই। তবে কারা এমন সর্বনাশ করতে গেল?

ইন্ডিয়ান অ্যামবাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি আর স্পেনের পররাষ্ট্র দপ্তরেব সেক্রেটারি সে অবস্থায় হয়তো জরুরি পরামর্শ করতে বসবেন। খবরটা যেমন করেই হোক এই একটা রাতের জন্য চেপে রাখতে হবে।

সকালেব কাগজে শুধু রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়-পত্র পেশ করার খবর আর ছবি থাকবে। আর বাড়তি খবর হিসাবে ওই পোশাকি অনুষ্ঠানের ঠিক পরেই রাষ্ট্রপতির সবকারি প্রাসাদে যে সাংস্কৃতিক সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল তারও একটা বর্ণনা সরকারি বিবৃতিতে খবরের কাগজগুলিকে দেওয়া হবে। ওরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে যে সারা দিনটা হাতে রইল একটা হিল্লে করবার জন্য।

এই সরকারি রিসেপশন অর্থাৎ সংবর্ধনা এমনিতেই ওই সন্ধ্যায় হবার কথা ছিল। কিন্তু মহামান্য ভারতের অ্যামবাসাডরের কলারসিক বলে খ্যাতি আছে। ইউরোপের বিশেষ করে স্পেনের, ললিত উচ্ছ্বসিত সমঝদার বলে তার পরিচয় আছে। সে জন্যই এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানটিতে তাকেই অন্যান্য অ্যামবাসাডর আর বড় অফিসারদের সঙ্গে অতিথি হিসাবে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। শুধু তো রাজদূত নয়। শিল্পের পূজারি। সংস্কৃতির সেতুবন্ধন।

তার দেশ থেকে সুবিধাজনক শর্তে যে অভ্র আমদানির ব্যবসাদারি দরকার আছে সে কথাটা উহ্য রইল। ওটার উল্লেখ করে শুধু দুষ্ট বা অবিশ্বাসী লোকরা। আর অন্যান্য দেশের হিংসুটে অ্যামবাসাডররা।

নিজের মর্যাদা আর অগ্রাধিকার অর্থাৎ ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে ওদের মাথা এমনিতেই থাকে গরম। বাহারে পোশাক আর আহারে বিহারে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো একজন দূত অন্যদের টপকিয়ে বেশি খাতির বা নেকনজর পাবার চেষ্টা চালায়। সেজন্য সরকার আর দূত মহলে চলে নিত্য ঘোড়দৌড়। অথচ কেউ একটু এগিয়ে গেলেই গেল গেল গুঞ্জন উঠবে। রব নয়, গুঞ্জন। কারণ এই মহলে কলরবটা কায়দা-দুরস্ত নয়। কূজনটাই সবার রপ্ত।

সেই কূজন ইন্ডিয়ান অ্যামবাসাডরকে ঘিরে ক'দিন ধরেই গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

হিজ এক্সেলেন্সি রমেন পাত্র মাদ্রিদে এলেন যেন রাজদূত নয়, দেবদূত। আর হবে না-ই বা কেন? যে অভ্র স্পেন সারা পৃথিবীময় সস্তায় কিনবার তালে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বিহার থেকে সহজেই পাওয়া যাবে, যদি

অবশ্য ইন্ডিয়াকে বাপু বাছা বলে একটু মোলায়েম ভাবে খুশি করা যায়। সেটা যে কী করে করতে হয় তা স্পেনের চেয়ে অনেক বড় আর বিক্রমশালী দেশ রাশিয়াও দেখিয়ে দিয়েছে। ভিজিটিং ডিগ্‌নিটারিরা তাদের সম্ভ্রম আর পদমর্যাদা নিয়ে দেশের মাটিতে পা দিলে কেমন করে তাদের তুষ্ট করে কাজ হাসিল করে নেওয়া যায় তা তো ফরেন পলিসির একেবারে প্রথম পাঠ।

তার উপর যখন ইন্ডিয়ান অ্যামবাসাডর স্পেনের শিল্পকলা সম্বন্ধে রসগ্রাহী। বিজলী শিল্পও একটা শিল্প বটে। অভ্রও তো সুন্দর ঝকমকে জিনিস। তাকে স্পেনের নতুন উঠতি ইলেকট্রনিকস্ শিল্পের কাজে লাগাতে সাহায্য করাটাও তো রসিকের যোগ্য কাজ। অন্তত কমার্স ডিপার্টমেন্ট আর ফরেন মিনিস্ট্রি কনফিডেন্সিয়াল কনফারেন্স করে গোপন আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিল।

অতএব রমেন পাত্র ভি. ভি. আই. পি.। শুধু ভি. আই. পি. নয়। ডবল ভি. যেন দুখানা পাখা মেলে দেবদূতের মতো এরোপ্লেন থেকে নেমে এসেছিল। ইউরোপের অন্য দেশগুলির তুলনায় স্পেনের আলো চোখ-ধাঁধানো। সেই আলোয় অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি যারা এয়ারপোর্টে ছিলেন তাদের চোখ টাটিয়ে উঠল। কালোর দেশের শ্যামল রাজদূতের জন্য শুভ্র হাসিতে উজ্জ্বল অভ্যর্থনা। দেশের সব কাগজেই ফলাও বর্ণনা আর ছবি ছাপা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়। মাদ্রিদে প্রটোকল অন্যান্য সরকারি কাজের মতই সিয়েস্তা অর্থাৎ আরাম-বিশ্রামের ঢিমে তালে ভরা। রাষ্ট্রদূতরা সেখানে এসে পৌঁছালেও তাদের পরিচয়-পত্র পেশের তারিখ আর এসে পৌঁছায় না। সবই হয় ধীরে সুস্থে। কত কম দেরিতে কার পরিচয়-পত্র পেশের সময় আসে সেটা দিয়ে ডিপ্লোম্যাট মহল রাষ্ট্রদূতদের গুরুত্ব যাচাই করে নেয়। হিস্পানি হাওয়া অনুকূল বইছে কিনা তা এই অপেক্ষার সময় দিয়ে ধরে নেওয়া হয়।

ইন্ডিয়ার অ্যামবাসাডরের পালে সেই হাওয়া দোলা দিল বেশ তাড়াতাড়ি।

এর আগে যে দেশের রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন তার ভেটের সময় এসেছিল সেখানে পৌঁছাবার তিন মাস পরে। রমেন পাত্রের অর্থাৎ হিজ এক্‌সেলেন্সি রামন পিয়েত্রোর লাগল মোটে দু সপ্তাহ।

স্পেন সিয়েস্তার দেশ। সকালে পেশি হলে বন্ধুত্ব জমবার সময় হবে না। দুপুরে যে তিন ঘণ্টার বিশ্রাম তার দিবা নিদ্রা বরাদ্দ আছে। কাজেই সন্ধ্যা ছটার সময় সেই মহালগ্ন।

প্রত্যেক অ্যামবাসাডরের নূতন দেশে কাজে যোগ দেবার পর এই ক্রিডেনশিয়াল প্রেজেন্ট করাই হচ্ছে মহালগ্ন।

হিস্পানি সরকারি মহল হিজ এক্‌সেলেন্সি সিনর রামন পিয়েত্রোর প্রতি প্রীতিতে আর মনোযোগে বিভোর হয়ে গেল। যে বিরাট উনিশ শতকের কারুকার্যময় প্রাসাদে হিজ এক্‌সেলেন্সির সরকারি নিবাস সেটা যেন একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। তার পাতাবাহারী রঙ করা সিলিং থেকে ইটালিয়ান মার্বেলের মেঝে, তার লতিয়ে ঘোরানে কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি থেকে অজন্তার ছবিগুলির অয়েল পেন্টিং প্রতিলিপি সবেরই উচ্ছ্বসিত বর্ণনা মাদ্রিদের কাগজে কাগজে।

যেন এই পুরানো বাড়িটা আর তার ভিতরে ভারত সরকারের খরচে সাজানো জাঁকজমক হঠাৎ ওরা আবিষ্কার করে ফেলেছে। যেন বিংশ শতাব্দীতে নতুন একটা সোনার দেশ ভারতবর্ষ আবিষ্কার।

কাগজে কাগজে যত রটনা, অন্যান্য রাষ্ট্রদূতের তত চোখ টাটানো। সবাই খুব কড়া নজর রাখলেন ইন্ডিয়া হাউসের উপর। শুধু কি অভ্রের কারবার? শুধু কি অ্যামবাসাডরের শিল্পরসিকতা? শুধুই কি তাব স্পেনের প্রতি টান?

কিন্তু টানই বা কেন? তরুণ ছাত্র বয়সে লোকটা ইউরোপের অনেক দেশেই ঘুরেছিল। সাংবাদিকতার ছাত্র হিসাবে সে, স্পেনের গৃহযুদ্ধ কভার করে প্রথম হাত পাকিয়েছিল, এমন কোনও রিপোর্ট তার গোপন জায়গায় অর্থাৎ কুষ্ঠী ঠিকুজীতে লেখে না। প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির অ্যামবাসাডররা আবার ভালো করে রমেন পাত্রর সম্বন্ধে নিজেদের অফিসের তৈরি 'ডসিয়ের' পড়ে নিলেন। খবরের কাগজে এই নিয়োগের খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে যেখানে যা জীবনী আলেখ্য বেরিয়েছিল তার ক্লিপিং অর্থাৎ কাগজের টুকরোগুলি নিয়ে সম্পূর্ণ কুষ্ঠী ঠিকুজী সব অ্যামবাসিতেই ফাইল করে রাখা হয়েছিল। ওদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারেই। এই মামুলি বন্দোবস্তটা সর্বদাই কাজে লাগতে পারে। এবং বিশেষ কোনও ঘটনার সময় সত্যি সত্যি সেই সংগ্রহ করে রাখা সংবাদগুলি ব্যবহার করা হয়।

সেই সব খবরের মধ্যে হিজ এক্সেলেন্সির চেহারারও একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। রমেনের মুখে নাকি একটা বিশেষত্বের ছাপ আছে। অনেক সংগ্রাম, অনেক অস্থিরতা তার স্বাক্ষর টানাপোড়েন অর্থাৎ টেনসনের রেখা সেখানে লেখা আছে। তার গাল দুটিতে একটা উত্তেজনার আভাস উজ্জ্বল শ্যামবর্ণকে ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু সেটা তার কথাবার্তায় বা ব্যবহারে কখনও প্রকাশ পায় না।

বরং তার সঙ্গে আলাপের সময় একটা বুদ্ধিদীপ্ত, পরিহাসে উজ্জ্বল নাগরিক পালিশে ভরা ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায়। একটু হিন্দু রক্ষণশীলতার বনিয়াদের উপর নতুন রকমের চটকদার চিন্তা আর অ্যাডভেঞ্চারের পরিচয় ফুটে উঠেছে। হিজ এক্সেলেন্সি রসাল গল্পে খুব ওস্তাদ কিন্তু নারী মহলে নিস্পৃহ, সংযত। তার খেলাধুলায় উৎসাহ আছে কিন্তু অভ্যাস নেই। অসিযুদ্ধ জানেন না, কিন্তু কোণঠাসা হলে রসনায় অসির ধার ফুটে ওঠে। মিস্টিরিয়াস ইস্টের পরিচয় আছে তার সরু মুখে, উজ্জ্বল চোখে, শিল্পরসে আর ধর্মভিত্তিক প্রাচীন ললিত কলার প্রীতিতে।

বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা বলেন যে, অন্য কোনও দেশে ডিপ্লোম্যাটদের নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না। অবশ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে শুধু ডিপ্লোম্যাট কেন, যে কোন ক্ষমতাশালী বিদেশী অফিসার বা মন্ত্রী কাজে আসবার আগে খুব সবরকম কুষ্ঠী ঠিকুজী তৈরি করে রাখা হয়। কিন্তু স্পেনে জেনারেলিসিমো মহাসেনাপতি ফ্রাংকোর জমানায় এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি হয়েছে চূড়ান্ত।

কিন্তু শুধু এইসব বিশেষত্বের জন্যই যে রামন পিয়েত্রোর মাদ্রিদে আবির্ভাব নিয়ে এত আগাম বাড়াবাড়ি হচ্ছে তা কে বিশ্বাস করবে? ঝানু রাষ্ট্রদূতরা আর তাদের ততোধিক কুট কুট করে টিপ্পনী কাটতে অভ্যস্ত কূটনীতিক কর্মচারীরা অত সহজে ভোলেন না। রাজনৈতিক মতলব বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে অতল থেকে টেনে এনে তুলে ধরার বিদ্যায় ওরা ওস্তাদ।

অতএব ওদের গবেষণা চলল পুরোদমে। আর আলোচনা চলল হরদম।

শেষ পর্যন্ত রিয়াল (অর্থাৎ রয়্যাল) এইরো ক্লাবে বসে ম্যানজানিলা পান করতে করতে কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক আবিষ্কার করলেন যে ইন্ডিয়ান অ্যামবাসাডর এখন একা আসছেন। সপরিবারে নয়।

কেন নয়? অ্যামবাসিতে সব ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবেই থাকে। তা ছাড়া আগের রাষ্ট্রদূত তো বেশ কিছুদিন আগেই চলে গেছেন। অতএব তার সরকারি বাসভবন নিশ্চয়ই নতুন অধিবাসীর জন্য গুছিয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছে।

একজন অ্যামবাসাডর প্রথম এলে যে সব ধুমধাম, অভ্যর্থনা, ককটেল পার্টি প্রভৃতি চলে সে গুলি থেকে কোনও অ্যামবাসাডরের ফ্যামিলি কি যেচে নিজেদের বঞ্চিত রাখে? প্রথম বার দিনেই যে শুধু তেরো পার্বণ নয়, তেত্রিশ রিসেপশন রক্ষা করতে হয়।

নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যাপার আছে?

সিনরা পিয়েত্রো কি সনাতন মার্কা হিন্দু স্ত্রী।

না। তার সম্বন্ধে যে সব খবর ছেঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে তাতে এমন কিছুই ধরা পড়েনি।

ছেঁকে তুলে নেওয়াই এই রকম একটা ব্যাপারের সঠিক বর্ণনা। কেচ্ছা আর কাহিনি, ঘটনা আর রটনা সব দেশেই কূটনীতিকদের রসনায় পাকা রসুইয়ের সামনের কড়াইয়ের মতো টগবগ করে ফোটে। গরম হিস্পানি আঁচে রসুই আরও বেশি রস, বেশি রঙ খুঁজে পায়।

উৎসবের দেশে সবটা সময় যে এসবেই উৎসর্গ করা রয়েছে। কেবল একটু বিরতি মেলে সিয়েস্তার সময়। সুখের বিষয় আজকাল সেই সময়টা চার ঘণ্টা থেকে কমে তিন ঘণ্টায় এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ বিরতিটা কম।

তবু ওরা কত ব্যস্ত। কত কর্তব্যরত। বিশেষ করে ফেরিয়া অর্থাৎ ফেয়ার মানে মেলার ঋতুতে।

রয়্যাল এইরো ক্লাবে হাওয়া জাহাজ ওড়ার বিরাট প্রান্তরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে খুশি মনে একজন অ্যামবাসাডর ম্যানজানিলার ফেনা তাঁর সাইকেল হ্যান্ডেলের ধাঁচের বিরাট গোঁফ জোড়া থেকে মুছতে মুছতে বললেন—সামনেই আসছে পরবের দিন। তখন আমাদের কি সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকতে হবে ভেবে দেখুন। এই সব হিস্পানি গ্রান্ডিদের সঙ্গে সামাজিক পাল্লা দেওয়া যে কী পরিশ্রমের ব্যাপার তা ভাবতেও মজা লাগে।

একটু দম নিয়ে তিনি যোগ করে দিলেন, অবশ্য পরিশ্রমে আমি ডরাই না।

হালের তরুণ-তরুণীরা যারা জেট সেট অর্থাৎ প্লেনের গতির তালে উড়ে চলা মহলের লোক তাদের

তুর্কি রক্তে—এ রকম পরিশ্রম সম্ভব। কিন্তু এই সব প্রাক প্রবীণ সরকারি প্রতিনিধিদেরও বেশ পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। তাদের জীবনযাত্রার এই দাবি মানতে হবে, মানতে হবে। প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে গেলে কর্তব্য কাজেও হটে যাবার ভয় আছে।

মেলার ঋতুতে ব্রেকফাস্ট শুরু হবে মাত্র বেলা এগারোটায়। আর শুধু কফি আর মুচমুচে রোল নামের খাস্তা রুটি দিয়ে। বেচারাদের মাখন বা জ্যামজেলি, হনি সঙ্গে খাবার সাহস নেই। বয়স আর ফিগার দুই-ই সে সব বিলাসিতার বিপক্ষে রায় দিয়ে রেখেছে।

এতখানি স্বার্থত্যাগের প্রতিদানে ওরা সযত্নে ঘোড়ায় চড়ার পোশাকে সাজবেন যদি কোনও মেলা, মানে ফেরিয়া আর প্যারেড থাকে। সবে সস্তাগণ্ডার যোধপুরী ব্রিচেস পরলে চলবে না। চাই ফ্রক কোট আর টপ হ্যাট, বুট মায় রাইডিং ক্রুপ অর্থাৎ লিকলিকে মলাক্কা কেনের ছড়িখানা। একেবারে যাকে বলে 'ফুল কিট'।—

বেলা চারটেয় শুরু হবে অলস অপরাহ্ণের বিলাস লাঞ্চ। খানা কতক্ষণ চালানো হবে তা নির্ভর করছে এরপরে ষাঁড়ের লড়াই বা ওই জাতীয় কিছু আছে কি না তার উপর।

আর কিছু না হোক, বন্ধু-বান্ধব আর ককটেল তো আছেই। স্মার্ট লোকের পৃথিবীতে খানার চেয়ে পিনার প্রয়োজন অনেক বেশি। আর আলাপ প্রলাপের মধ্যে দিয়েই তো রাষ্ট্রের খোশখবর আর খাস বাত ছেঁকে তুলে নিতে হয়। কোন্ কর্তার কী গতি হবে, কোনও মন্ত্রীর মতি কোন্ দিকে ঝুঁকছে। এ সব জরুরি খবর পাবার জন্য দেশের পররাষ্ট্রদপ্তর অপেক্ষা করছে।

সাধে কী আর খবরকে রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে বলে সন্দেশ।

মোট কথা রাত সাড়ে এগারোটায় যদি ডিনার শুরু করা যায় তাহলে উৎসবের সম্মানটা ঠিক মতো বজায় থাকে। তার পর শুরু করুন ক্লাবে বা কোনও অ্যামবাসির পার্টিতে ডান্সিং। সকাল পাঁচটায় বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে আরেকটা নাইট ক্যাপ পান করে যদি তার পরে ঘুমোতে যাবার কথা চিন্তা করেন আপনার কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন মনে করতে পারেন। অতঃপর সুখ স্বপ্ন না হোক, নিশ্চিত নিদ্রা আপনার পৃথিবীতে দেবদূতের মতো পাখা মেলে নেমে আসবে।

সাইকেলের হ্যান্ডেল বারের গোঁফ জোড়া এ হেন উদয়াস্ত পরিশ্রমকে ডরান না। কিন্তু নতুন একজন অ্যামবাসাডর এসে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই এতটা খাতির পেতে শুরু করলে তাতে চিন্তিত হয়ে উঠবার কথা। এই আগন্তুকের রঙিন ফানুসটাতে কোনও ফুটো আছে কি না তা যাচাই করে দেখা দরকার।

সমব্যথী সবাই একমত হলেন।

আচ্ছা, এই সিনরা পিয়েত্রো কেন সঙ্গে এলেন না? কেন?

তবে কী, এই শিল্পরসিকটি সিনরা এসে পৌঁছোবার আগে অন্য কোনও রস আস্বাদ করবার সুযোগ খুঁজছেন? এই ধরো না সুয়েকার রস? ওই সুইটি সুয়েকো গার্লস অব সুইডেন।

অ্যামবাসাডরের আবিষ্কারটা একেবারে যেন একখানা কলম্বাসের কীর্তি।

সবাই এই আবিষ্কারের প্রথম ধাক্কায় চমৎকৃত আর দ্বিতীয় ধাক্কায় অভিভূত হয়ে গেলেন। যেমন করে প্রথম আমেরিকার মাটি দূর সাগর থেকে দেখতে পেয়ে কলম্বাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। পরে তালের পর তাল সোনা দখল করতে পেরে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন।

এই কূটনীতির কলম্বাসরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সত্যিই তো, প্রত্যেকেরই এই কথাটা আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল।

পিয়েত্রো যখন প্রথম এই দেশে বেড়াতে এসেছিল তখন দেশটা ছিল পুরো পিউরিটান, একেবারে নীতি-বাগীশ। মানে, নটবররা নেচে বেড়াত ঠিকই, কিন্তু পয়সা ছাড়া নটিনী মিলত না। বিয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত খোলাখুলি কোনও মেয়ের হাত পর্যন্ত ছুঁতে পেত না কেউ। অন্যদিকে কোনও হিস্পানি কেন, বিদেশিনী মেয়েও যদি একা কোনও রেস্তোরাঁয় আসত বিলাসী স্ফূর্তিবাজের দল তাকে গেঁথে তুলবার তৈরি মাল মনে করে ফ্যাৎনা ছড়াত। বারনারী ছাড়া কোনও বরনারীই বাইরে একা বেড়াতে আসত না। এমন কি বিকেলে বিলাসী সেজে আরামে বিহারের রাস্তা রাম্বলা গুলিতেও নয়।

সবাই হাসিমুখে আর খুশি চোখে একমত হলেন যে, ভাগ্যিস ওরা পিয়েত্রোর মতো অভাগা ছিলেন না। নিশ্চয়ই সেই দুর্ভাগ্যটুকু উসুল করবার জন্যই সে বেচারা এখন একা এসেছে। আগেভাগে সুয়েকা-বিলাস

করে নেবার জন্য।

সুয়েকা মানে সুইডেন বা ওইরকম সংযমের বাঁধন মুক্ত সমাজের স্ফূর্তিবাজ তরুণী। হালে, স্পেনে যত রাজ্যের দড়িছেঁড়া উড়নচণ্ডী তরুণ-তরুণীরা সস্তায় হলিডে করতে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ওদের সমাজ হয়ে গেছে পারমিসিভ মানে সম্মতিশীল। অর্থাৎ যতখুশি স্ফূর্তি করে নিতে পার বিনা বাধায়। তাতে ভবিষ্যতে ঘর বাঁধার বা ঘর থেকে থাকলেও সেখানে সংসার চালিয়ে যাবার কোনও বাধা হবে না সে জন্য। নীরস লোহার বেড়াজালে ঘেরা হিস্পানি আঙিনায় সরস বসন্তের লুটোলুটি ছায়া বইয়ে দিয়ে যায় এই সুয়েকারা।

একজন দুঃখ করে বললেন যে যৌবনে তিনি ফ্রান্সের সীমান্ত পেরিয়ে সান সিবাস্টিয়ানে একদিনেব জন্য এসেছিলেন। সাগর স্নানের জন্য সুইমিং ট্রাংক অর্থাৎ সাঁতারের জাঙিয়া পরে জলে নেমেছিলেন। সুইমিং স্যুটের টপ অর্থাৎ বুকে বাঁধবার টুকরো যে কোনও দূর অতীতে পুরুষরাও ব্যবহার করত তা তিনি জানতেন না। কিন্তু টপ নেই বলে শুধু ট্রাংক পরা বিদেশীকে পুলিশ থানায় নিয়ে আটকিয়ে রেখেছিল।

হ্যান্ডেল বার গোঁফ জোড়া সহানুভূতিতে নেচে উঠল। তার মালিক আরেক চুমুক ম্যানজানিলাতে নিজেকে ভিজিয়ে তাজা করে নিয়ে বললেন—ব্যাইটলি সার্ভড। যেমন পুরুষের রাজ্য ছিল এই দেশে, তেমনি উপযুক্ত সাজা পেয়েছে ভিন্‌দেশিনী সুয়েকারা এই দেশটা একবারে 'কনকার' করে নিয়েছে। এদেশেব যৌবনকে জিতে নিয়েছে। এখন হিস্পানি তরুণ ষাঁড়বা সামলাক তাদের ঠেলা। তাদের নিজেদের সংসারও সেই ঢেউয়ে টলমল আর টলমল।

খুব বিজ্ঞের মতো ভাব দেখিয়ে একজন বললেন, সে টলমলানিতে অসুবিধে তো বিশেষ দেখছি না। ক্যাবালোরার দল (তরুণরা) গাছেবও পাড়বে, তলায়ও কুড়োবে।

হ্যান্ডেল বাব মন্তব্য করলেন, অত সহজে সমস্যাটা মিটবে না। গাছের ফলটিও আকাশে মাথা তুলে চাইতে শিখে ফেলছে। শুধু তাই নয়। মাটিতে নেমে সোজা ওই সাগর পারের হলিডে সিকার সুয়েকাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আঁকুপাকু করছে।

আরেকজন বললেন, কেন বতিচ্চল্লির ছবি বুঝি ওরা এই প্রথম দেখছে? বার্থ অব ভিনাস?

হায়, রবীন্দ্রনাথ ওরা কেউ পাননি। না হলে উর্বশী কবিতায় সে ছবির যে অমর বাণীরূপ ধ্বনিত হয়েছে তা ওরা মনে করতেন নিশ্চয়ই। কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি অনিন্দিতাদের ওরাও রমণীয়া আর কমনীয়া রূপেই দেখতেন, কামনীয়া নয়।

যে বমেন ওদের হিংসার পাত্র আর কুৎসাব বস্তু সেই রমেনই প্রগাঢ় অনভূতি দিয়ে আবৃত্তি করে এই পবচর্চাকে পবম চিন্তায় রূপায়িত করে দিত।

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গেব মতো পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত করি অবনত।

রূপ সাগরের এই অপরূপ বিকাশকে সে মলিন চোখে দেখত না।

কিন্তু তা বলে ওরা রমেনকে ভোলে নি।

মোটেই না।

ওদের কখনও কেউ কর্তব্য ভুলে গেছে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে করতে পারবে না।

হ্যান্ডেল বারই রমেনকে টেনে আনলেন।

বললেন—আমার নিশ্চিত ধারণা যে ওই বতিচ্চল্লির ভিনাসদের পরখ করবার জন্যই পিয়েত্রো মাদ্রিদে এখন আসছে একা। আমরা সবাই বেশি বয়সে এসেছি। ডন জুয়ানদের দেশে নতুন ডনা জোয়ানাদের আবির্ভাব দেখে আমরা মনে কষ্ট পাব না। কিন্তু বেচারা পিয়েত্রো। তাকে তো পুষিয়ে নিতে হবে।

একটু দম নিয়ে হ্যান্ডেল বার তার পুরুষ্ট গোঁফে মরম ভরে তা দিতে লাগলেন। সে সময়টুকু তার বাক্যসুধার বদলে সামনে পরিবেশন করা সুরায় সবাই মন দিলেন।

তারপর তিনি নিজেই বললেন—অবশ্যই হবে।

সবাই উৎসুক নয়নে ওর দিকে তাকাল। সুরসিক লোক উনি। না জানি কোন্ নতুন রসের ফোয়ারা বইছে, ওর এই ছোট্ট মন্তব্যটির মধ্যে।

তিনি বললেন, আমরা ডিপ্লোম্যাটরা হচ্ছি ক্লিওপেট্রার মতো। বয়স আমাদের লুকিয়ে দেয় না। রীতি নীতি আমাদের অফুরান রাজনীতিক খেলকে একঘেয়ে করে তুলতে পারে না। আমাদের রামন পিয়েত্রোও কোন্ না কোন্ ক্লিওপেট্রার পুং সংস্করণ সেজে উদয় হবেন।

রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে অনেকের থাকে নানা রকম গুণ ও বিদ্যায় হাত পাকানো। একজন ছিলেন হিস্পানি কাব্যের সমজদার। বিশেষ করে রসাল কবিতার। তার বাইরেব প্রকাশ তার নিজেরই চেহারায়।

তাই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখে নিজের ইনটেলেকচুয়াল পরিচয়টি জাহির রেখেছেন।

তিনি টলটলে সবুজ রঙের কিয়াস্তি ভরা টিউলিপ ফুলের আকারের গ্লাসটা সামনে তুলে ধরে একটা স্প্যানিশ কবিতা আবৃত্তি করে ফেললেন। কবিতাটির নাম : আত্মার আঁধার রাত্রি। লেখক একজন পাদ্রী। অবশ্য কলারসিক।

তা আমাদের পিয়েত্রোও তো পাঁট কলারসিক। তায় হিন্দু পাদ্রেতে ভরা দেশের রাষ্ট্রদূত।

আঁধার রাত্রি নিশীথে—
প্রেম বাসনায় পুড়েছি,
ওগো আনন্দ মধুবা,
ঘুরেছি গোপনে নিভৃতে।
গেহ মোর ঘুমে বিধুরা।
ওগো আনন্দ মধুরা।

ডিপ্লোম্যাটরা কর্তব্যে অবহেলা করেন না, সেই জন্যই হ্যান্ডেল বার গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তাদের ঐশ্বর্যে তা দিতে থাকলেন। পিয়েত্রোর প্রাইভেট লাইফ নিয়ে আলোচনা তাদের লক্ষ্যকে অবশ্যই ভুলিয়ে দিতে পারে নি।

কেন ওর আগমনকে নিয়ে হিস্পানি সরকারে মাতামাতি? কেন? কী মতলব এঁটেছে ওরা?

শুধুই অভ্রের আমদানির ব্যবস্থা? অথচ আরও কোনও কারণও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না।

অভ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ আটকিয়ে দেয়।

কিন্তু জেলাসি অর্থাৎ হিংসার প্রবাহ আটকানো যায় কী দিয়ে? তার নন কনডাকটার আছে কি কিছু ঐ সংসারে?

হিজ এক্সেলেন্সি রামন পিয়েত্রো এই দেশে হাজির হবার আগেই দরবার মহলে সামাজিক জগতে তাব এত আগাম খাতির অন্য সকলে সইবে কেন? নিজের দেশের মর্যাদার কথাও সবাই ভাবছিলেন।

কিন্তু সেই রমেন পাত্রই তার সরকারি ক্রিডেনশিয়াল পেশ করার পর সরকারি নাচগানের উৎসবের মাঝামাঝি বিরতির সময় থেকে নিখোঁজ। রিসেপশনের প্রধান অতিথি হওয়া সত্ত্বেও রাতাবাতি, চুপিসারে।

ডিপ্লোম্যাট মহলে লকলকিয়ে উঠল খবরটা। রাতারাতি। সারারাত।

মাদ্রিদের রসিক মহলে রাতেই জমে মৌতাত। বিনোদন চলে সারারাত।

জাগরণে যায় বিভাবরী।

॥ ২॥

ডিপ্লোম্যাসির একটা সত্যি গল্প। অ্যাম্বাসাডর মহলের সবাই এটা জানেন এবং অনুকরণ করার চেষ্টাও করেন।

১৯৪১ সালে লন্ডন থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ছুটে এলেন আংকারাতে। জার্মান বিক্রমের দাপটে ইংরেজের সব কিছু যায় যায় অবস্থা। তুরস্ককে যেমন করেই হোক ইংরেজের দলে চাই।

রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য আংকারা প্যালেস হোটেলে তুর্কি বিদেশ মন্ত্রী ইডেনকে নিয়ে গেলেন। রাত দুটোর সময়ও তা আর শেষ হয় না। মন্ত্রী বললেন চলুন সবাই হোটেলের ক্যাবারে দেখতে যাওয়া যাক।

এ সব ব্যাপারে কামাল পাশার জমকালো নিয়ম একটা ছিল। তারই পুনরাবৃত্তি হল। দু-দুটো অর্কেস্ট্রা চলল—একটা চেক, আরেকটা চীনে। ক্যাবারের মেয়েরা সব ঘুমোচ্ছিল। তাদের টেনে তুলে এনে নাচান হল। ডিপ্লোম্যাটিক অতিথিদের আনন্দ পরিবেশন করতে হবে।

ইংরেজ ইডেনও কম যান না। এককালে অক্সফোর্ডে ওরিয়েন্ট্যাল ল্যাংগোয়েজ শিখেছিলেন। রাত তিনটের পর থেকে সুরায় জড়ানো সুরে পারসীয়ান পোয়েট্রি আবৃত্তি শুরু করলেন। পার্টি চলল পাঁচটা পর্যন্ত।

সরকারি দলিলে লেখা যে সন্ধ্যাটা হয়েছিল হিউজ সাকসেস। বিরাট ভাবে সফল।

কাজেই পররাষ্ট্র অর্থাৎ বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের ব্যাপারই আলাদা। প্রশাসনের থোড় বড়ি খাড়া

সেখানকার পাতে দেওয়া চলবে না।

আবার যে সব দেশে রাজতন্ত্রের পাট সদ্য উঠে গেছে সেখানে ডিপ্লোম্যাসির ঠাট আরও বেশি জমজমাট।

ইতিহাসে লিখেছে যে, এই স্পেনেই যখন সম্রাট ছিলেন, তখন হিস্পানি সাম্রাজ্যই ছারখারে গেল কেবল ঠাটের হিসাব করতে করতে। কোন্ উজীরের চেয়ার কোথায় আর কোন্ সেনানীর আসন কোন্ সারিতে তার মামলাতেই রাজ্য শাসনের ক্ষমতা উজাড় হয়ে গেল।

তারপরে এল এই সামন্ততন্ত্রের শাসন! কডিল্লো সেনানায়ক ফ্রাংকোর জমানা। রাজতন্ত্রের জৌলুসকে সামন্ততন্ত্র আরও জোরালো করে তুলেছে।

দরকারি জাঁকজমক আর তার দরকারি দিকটা হিস্পানি সরকার ভোলে নি। এটাও একদম ভোলে নি, যে মোটে শ'তিনেক বছর আগে তার সাম্রাজ্য ছিল সসাগরা আর আভিজাত্য ছিল আকাশছোঁয়া। শুধু আকাশ নয়, সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই স্মৃতি। সেই স্মরণের নিত্য অনুরণন চলে মনে। প্রত্যেক হিস্পানি মেয়েই যেন সেই মহিমার উত্তরাধিকারী। তার হাতে হয়তো পুরোনো বয়সের বিবর্ণতায় ধূসর একটা পাখা রয়েছে। কিন্তু এমন আবেশে মজাসে প্রেমসে ক্লিক করে আওয়াজ তুলে সেই হাতপাখা নিয়ে সে হাওয়া খেতে শুরু করবে যেন সম্রাট তৃতীয় চার্লস দেখছেন ষাঁড়ের লড়াই আর এই ডাচেসটি তার ম্যানটিলায় সেজে গুজে পাশে বসে বসন্তবায়ু বীজন করছেন।

সংস্কৃত ছাড়া আর কোনও ভাষাতেই তখন আর সেই আভিজাত্যের বর্ণনা কুলোয় না।

তা স্পেনের আর দোষ কী? ওই বরফে জমাট ঠাণ্ডা প্রলেটারিয়াট দেশ রাশিয়াতেই বা প্রটোকলের বাহার কম কিসে? ওরাও ঝলমলে ইউনিফর্মে যাত্রার আসরের রাজপুত্রের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে চীফ অফ প্রটোকলকে ঢাউস একখানা মোটরে করে পাঠিয়ে দেয় নবাগত রাষ্ট্রদূতকে স্বয়ম্বর সভায় এনে হাজির করবার জন্য।

চীনের তো আরও পায়া ভারী। রাষ্ট্রদূতকে প্রেসিডেন্টের আসনের সামনে হাজির হবার আগে তিন বার মাথা নিচু করে 'বাও' করতে হবে। তারপর সাত পা এগিয়ে যাও। আবার তিন বার 'বাও'। এমনি করে তিন তিন বার আগুয়ান হলে তবে হবে সপ্তপদীর শুরু। অর্থাৎ লম্বা একখানা বক্তৃতা আর প্রত্যুত্তরে আরেকখানা লম্বাতর ভাষণ। অর্থাৎ চার চোখের খেলা আর দুহাতের মেলা দিয়ে হবে দুই দেশের মেলবন্ধন।

ফেরার পথটিও এমনি ঘটায় ভরা। তিন বার মাথা নত, সাতবার পিছু হটে। এই পশ্চাৎযাত্রাটি প্রেসিডেন্টের দিকে মুখ আর চোখ রেখে তিন তিন বার চালিয়ে পেছোতে হবে।

ঠিক সেই শাজাহান বাদশার দরবারে ইরানী রাজদূতের অভিবাদনের মতো। গল্পটা রমেনের মনে পড়ল। ইরানের শাহেনশা তার নিজের মতে হিন্দুস্থানের শাহেনশার চেয়ে বড়। অতএব তার দূত কী করে মাথা নুইয়ে এগোতে আর পৌছোতে পারে? কিন্তু দিল্লির দরবার অত কঠিন সমস্যাটার সহজ ফয়সালা করে দিল। বাদশার সামনে আসতে হলে তোরণের পর তোরণ পার হয়ে আসতে হবে। আর প্রত্যেকটি তোরণই বেশি নিচু করে তৈরি হল। মর্যাদার লড়াইয়ে কোন সম্রাটের জিত হল তা ঠিক করে বলতে পারেন নি ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের।

যাই হোক, জমানা গেছে বদলিয়ে, পোশাক গিয়েছে পালটে। হিজ এক্সেলেন্সি রামন পিয়েত্রো চুড়িদার পায়জামা আর আচকানে সেজে সহজ ভাবে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করলেন।

এখানে মর্যাদার লড়াই হল না রাজা থুড়ি রাষ্ট্রপতি আর রাষ্ট্রদূতে। কিন্তু লড়াইয়ের সবুজ ঈর্ষা আর লাল কটাক্ষ ছড়িয়ে পড়ল প্রেজেন্টেশনের পর রিসেপশনে। মনে মনে রঙ্গ-শালা রণভূমি হয়ে গেল।

স্টেটের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ তো শুধু আমন্ত্রণ নয়, শুধু আহ্বান নয়। সোনার অক্ষরে ছাপা চিঠিটার নিমন্ত্রণের পিছনে ঝিকমিক করে একটা নিয়ন্ত্রণ। তাকে উপেক্ষা করা যে শুধু অভদ্রতা তা নয়। তার পরিণতি হচ্ছে যাকে ডিপ্লোম্যাটরা বলেন পারসোনা নন গ্রাটা হয়ে যাবার পথ তৈরি করা। অপছন্দের মানুষ হওয়া আর নির্বাসনে বসে থাকা প্রায় একই রকম দুঃখের। বিশেষ করে কোনও দেশের প্রতিনিধি নেকনজরের বাইরের চলে গেলে ক্ষতিটা সেই দেশেরও বটে। আর প্রতিনিধির নিজের ভবিষ্যৎও ঘোলাটে হয়ে যাবার ভয় থেকে যায়।

অতএব বিরসবদনে হাসি ফুটিয়ে আর সরস কথাবার্তায় পাপড়ি ছিটিয়ে সন্ধ্যার উৎসবাদি সার্থক

করবার জন্য সব ডিপ্লোম্যাটরাই তাদের ঘরণী, সহকারি আর সহকারিণীদের নিয়ে দলে দলে জমায়েত হলেন। সাজে আর সৌরভে, সৌজন্যে আর সৌন্দর্যে চাঁদের হাট বসে গেল।

হঠাৎ চারদিকে, একটা 'হাশ হাশ' নিঃশব্দ আবহাওয়া তৈরি হল। অথচ শুধু 'হাশ হাশ' নয় বরং ফিসফাস বলা চলে।

তার সঙ্গে ঠোঁটের আড়ালে আবডালে আর চোখের আনাচে-কানাচে বাঁকা হাসি।

কন্‌ডেসা আসছেন। কন্‌ডেসা।

অর্থাৎ কাউন্টের ঘরণী।

এই ক'দিন রমেনের খুব খাটুনি গেছে। ক্রিডেনসিয়ালস পেশ না করা পর্যন্ত ডিপ্লোম্যাট মহলে সরকারি স্বীকৃতিতে পোশাকি ভাব আসে না। ডিপ্লোম্যাটের কিন্তু বসে থাকার সময় নেই। রাজধানীতে আর কারা কারা রাষ্ট্রদূত আর তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা ব্যবহার কী রকম সে সব খবর তো পৌঁছোবার আগেই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ঘোরালো ব্যাপার হচ্ছে সেই দেশের গণ্যমান্য লোক আর রাষ্ট্রদরবারের লোকদের ঠিকমতো পরিচয় আগে থেকে জেনে রাখা। তাদের রীতি আর রুচি, ওজন আর মর্যাদা এ সব এই অপেক্ষার সময়টুকুতে ঠিকমতো জেনে নিতে হবে। সামাজিক ওজন আর রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া হচ্ছে ডিপ্লোম্যাসির কসরতের প্রথম পাঠ।

বিশেষ করে স্পেনে। সেখানে গোটা সাম্রাজ্যই উচ্ছন্নে গিয়েছিল সামন্ত অভিজাতদের মর্যাদার খেয়োখেয়িতে। এহেন দেশে সেই মর্যাদার ধাপের পর ধাপ সোনার নিক্তির ওজনে নজর করে রাখতে হবে। সেই হিসাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে হবে তাদের দিকে। তাদের ব্যবহারকে দাম দিতে হবে। একটু ত্রুটি, একটু হিসাবে গরমিল হলেই তার ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

বছর কয়েক আগে রাজা গণতন্ত্রের ধাক্কা সামলাতে না পেরে দেশ থেকে চুপিসারে পলাতক হয়েছিলেন। তার পর বেশ কয়েক বছর রিপাবলিকের সাম্যবাদ রাজনীতি আর সম্পত্তি জাতীয়করণ চলেছিল। এখনও সাধারণ লোকের তুলনামূলক দারিদ্রের মেঝেটা বেশ নিচুতেই রয়েছে। তবু উঁচু মহলের রমরমা অবস্থার তারতম্য হয় নি।

কাজেই রমেনকে এই ক'দিন ধরেই হিস্পানি সমাজের মধ্যমণিদের মতি আর গতি, চেহারা আর চরিত্র সব কিছু সম্বন্ধেই খবরগুলি মনে মনে রপ্ত করে নিতে হচ্ছিল। সরকারি রাজপুরুষদের চেয়ে এদের পরিচয়ের প্রয়োজন এদেশে কম জরুরি নয়। এই সব লোক রূপে আর রুপায়, বংশে আর বনেদিয়ানায় দেশের সেরা শ্রেণী। এই সব ডুক (ডিউক), কণ্ডে (কাউন্ট) গ্র্যান্ডির দল। ঠাটে আর জাঁক-জমকে তারা সবাইকে দিশেহারা করে দেয়। জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিজেদের সম্বন্ধে তারা জানান দিয়ে রেখেছে।

কাজেই কোনও কন্‌ডেসা এই দরকারি জলসাঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোরা চাহনি আর চাপা হাসি শুরু হয়ে যেতে পারে তা রমেন অনুমান করে নিল।

এই মুহূর্তে সেই ছিদাম মুদি লেনের রমেন পাত্র নয় সে।

হিজ এক্সেলেন্সি রামন পিয়েত্রোর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। প্রটোকল-এ ও সম্বন্ধে কখনও ভুল করে না। কখনও পা পিছলোয় না বা হোঁচট খায় না।

তবু সে আগাম যাচাই করে নিতে চায় নিজে থেকে। শ্যামবাজারের সন্তান, পাড়ার পাইকারির থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে রাষ্ট্রের রাজরথে পৌঁছেছে। তাকে আগাম মূল্যায়ন, ক্ষিপ্র মানসিক যাচাই এসব শিখতে হয়েছে বৈকি। নিজের কমনসেন্সের অকরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পাঠ নিতে হয়েছে পুঁথি থেকে নয়, প্রতিযোগিতার বন্ধুর নিষ্ঠুর পথ থেকে।

বিদ্যুতের মতো সে ভেবে নিল।

না। এই কন্ডেসা সেই দলের নয় যারা দিনমানেও ক্লাবের চত্বরে দামি ব্যাংকারদের সঙ্গে ফ্যান্সি টেবিলে টিয়ো পেপে মদ নিয়ে বসে পথ নিরীক্ষণ করেন। অথবা নামী বুল ফাইটারদের চোখের জ্যোতি প্রখরতর করে তোলেন প্রেমের পালিশে। অথবা রেসিং মোটর চালকদের দুরু দুরু বুক সত্ত্বেও দৃঢ় দৃঢ় মুঠিতে স্টিয়ারিং হুইল ধরার প্রেরণা জোগান।

তার বাইরে আরও কিছু। আরও অনেক বেশি।

মন কষতে থাকল হিসাব।

কান শুনতে লাগল গুঞ্জন।

চোখ করতে থাকল নিরীক্ষণ।

তাস্তো মোস্তা, স্প্যানিশ মন্তব্যটা কানে এল।

অর্থাৎ দুজনেই সমান সমান। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। একেবার যাকে বলে তুল্য মূল্য।

রমেন মনে মনে বুঝল যে দ্যাবা আর দেবীর কথা হচ্ছে। কন্ডে আর কন্ডেসা দুজনেরই বিশেষ কিছু কেচ্ছা আছে। আর ঝাঁজ এত বেশি যে এই জলসাঘরের রাজকীয় কম্যান্ড পারফরম্যান্সের নাচগানের হুল্লোড়ও তাকে চাপা দিতে পারবে না।

স্বামীর আছে ধন আর বনেদী বংশ। এই দুই মূলধন সে খাটাচ্ছে ঘোড়ার পিছনে। স্ত্রী কার পিছনে ছুটছে তা দেখার অবসর নেই।

ফিস ফিস করে মন্তব্য হল---শুধু ঘোড়া নয়, ছোঁড়াও আছে।

আর স্ত্রীর আছে হিস্পানো—সুইৎসা মোটরকার আর মাতাদোরদের প্রতি প্রেম। যে কোনও সুন্দর তরুণ বুলফাইটার হলেই হল। হালে এমনি একজন মাতাদোরের মোহে কন্ডেসা পড়েছেন যার নিজের নারীর প্রতি নজর নেই। এমন কি সব সাংসারিক সুবিধা প্রতিপত্তি জুগিয়ে দেবার মালিক বড় ঘরের ঘরণীদের প্রতিও না।

কিন্তু তা হলেও কন্ডেসা নাহি ছোড়তা। এক তরফা প্রেমের তাড়না তাকে বুলফাইটের ষাঁড়ের চেয়ে বেশি দুর্বার গতিতে এই মাতাদোরের প্রতি তাড়িয়ে নিয়ে চলছে।

যে ভদ্রলোক স্বামীর অস্বাভাবিক প্রেমের কথা ফাঁস করেছিলেন তিনিই বোধ হয় আবার মন্তব্য করলেন। গলার স্বর শুনে রমেনের অন্তত তাই মনে হল।

তিনি কুট্‌স করে টিপ্পনী ছাড়লেন, তাস্তো মোস্তা। স্বামী এমন প্রেমের পিছনে ছুটছে যার কোনও পরিণতি নেই। স্ত্রী-ই বা কম যাবে কেন? সে এমন প্রেমের পিছনে ছুটছে যার কোনও প্রতিদান নেই।

সহানুভূতির সুরে কে যেন বলে উঠলেন, হায়, প্রেম তো এমনই জিনিস। একেবারে অন্ধ।

টিপ্পনীকার ছাড়লেন না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—কিন্তু সমাজ তো অন্ধ নয়। আর আমাদের মাদ্রিলেনোদের, মাদ্রিদের রসিকদের চোখ খোলাই আছে।

হিজ এক্সেলেন্সি পিয়েত্রোর খুব লোভ হল। এই রসাল কথাবার্তায় যোগ দিতে। শুনিয়ে দিতে কটি মোক্ষম কথা। হিস্পানি সুন্দরীরা অপরূপা, শতরূপা। কিন্তু সমাজ চায় যে সব কিছু অভিষেক আর অভিসার এসে শেষ হয়ে যাক ট্রাডিশনের লোহার গরাদের ওপারে। তাই তো যে যুগে সমস্ত পাশ্চাত্য পৃথিবীতে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, সমাজকে যেখানে পারমিসিভ অর্থাৎ অনুমোদনশীল বলে নাম দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এই কন্ডেসার প্রেমের প্রয়াস নিয়ে দরবারীদের কেন আর এত মাথাব্যথা—

কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্রদূতের পক্ষে চুপ করে থাকা, চেপে যাওয়াই বিজ্ঞতার লক্ষণ। কান আর চোখ খোলা রাখ। কিন্তু মুখ খুলো না। তোমার বাণী রূপ পেয়ে যাবে শত প্রতিধ্বনিতে।

ওদিকে ততক্ষণে কন্ডেসার নবতম মাতাদোরের প্রতি আসক্তির খোশ গল্প চলছে। তরুণ যোদ্ধার প্রিয় ডাক নাম হচ্ছে অ্যাপোলো। পাল পাল মেয়ে ছোটে তার পিছনে পিছনে। দরবারের সুন্দরী তার বংশগত খেতাব আর ঝকমকে হিস্পানো সুইৎসা খানা নিয়েও তেমন জুত করতে পারছেন না।

—কারণটা কী বল না গোপনে।

—আরে তুমি তো দেখছি একটি আস্ত গবেট। তাই বোঝ না যে তরুণ অ্যাপোলো আন্দালুসিয়ার দক্ষিণী উত্তাপে কাঁচা ট্যাঞ্জেরিন লেবু পাকিয়ে লাল করে তুলতে চায়। ঠিক যেমন করে অনিচ্ছুক ষাঁড়কে গরম করে তুলে খেলার মঞ্চে তাকে বধ করে। পেকে গিয়েছে এমন ট্যাঞ্জেরিন লেবুতে তার লোভ নেই। পাকানোর খেলায় কত সুখ। আর কিছুতে নেই। তা না হয় নেই। কিন্তু এত মধুভাষিণী সুহাসিনী সুন্দরী তো মিঠে বুলিতেই বয়সের ভার কমিয়ে নিতে পারে।

টিপ্পনীকার চাপা হাসিতে উজ্জ্বল মুখে বলল—আরে, অ্যাপোলোর সঙ্গে কথা বলবার মোকাই যে মিলছে না আমাদের কন্ডেসার। এই ধরো না ব্ল্যাক মার্কেটে টিকিট কিনে ছুটে গেলেন টালাভেরা বন্দরে। এই গরমে কমসে কম ত্রিশ মাইলের পাড়ি। হাতে একরাশ গোলাপ। ফ্রন্ট বক্সে বসে অ্যাপোলোকে নিজে হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু ছোড়াটা কোনও না কোনও কাঁচাডাঁশা পেয়ারার হাত থেকে রুমালখানা তুলে নিল।

কন্ডেসার প্রেমকরুণ নয়নের দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ওহ্, তাই বুঝি উনি হঠাৎ এসে উদয় হলেন আমাদের মধ্যে? তা বলি, ব্যাপারখানা কী? ওর গোলাপগুলি কি এল ইন্ডিয়ানোর হাতে তুলে দেবার প্ল্যান আছে না কি?

শুনতে শুনতে এল ইন্ডিয়ানো রমেনের কান ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে। নিশ্চিন্ত মনে যে সামনের দিকে কান আর মন দিয়ে নাচগান আর অভিনয় দেখবে তার উপায় নেই।

এখন যে নৃত্যগীত সংবলিত অভিনয় দেখানো হচ্ছে তার তুলনা হয়তো আর কোথাও নেই। এটা শুধু স্পেনের নয়, বিশেষ করে মাদ্রিদের একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। শুধু নাচ নয়, শুধু গান নয়, শুধু অভিনয় নয়, শুধু তিনটি ললিত কলার সংমিশ্রণও নয়। সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে রসে স্বাদে উজ্জ্বলতায় একটা অপরূপ অনুষ্ঠান।

যে তিনটি কলা দিয়ে মানুষ নিজের মনের কথা আর ব্যথা, সুখ আর স্বপ্নকে ফুটিয়ে তোলে সেই তিনটিই আছে এতে। এবং আছে আরও কিছু যাকে কোনও চারুশিল্পের বর্ণনার মধ্যে রাখা যাবে না। অথচ সেই অধরা রাগিণী সুরে আর ছন্দে আর ভাবলে মনের মধ্যে তুলবে অনুরণন।

অপেরার চেয়ে সুরেলা, অর্কেস্ট্রার চেয়ে মিঠে, অভিনয়ের চেয়ে বেশি-আন্তরিক বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হবে এই সমন্বয়কে। এর নামটিতেও একটা বেশ গরগরে মশলা দিয়ে তৈরি মুখরোচক একটা কিছুর ইসারা আছে। নামটি হচ্ছে থারথুয়েলা।

ইয়োরোপের কোনও মিউজিক হলে এমনটি পাওয়া যাবে না। প্যারিসের ফলি বারজেয়ারে আছে বেশি লাস্য। মিলানের স্কালাতে অনেক বেশি সুরলহরী, মস্কোর বলশাইয়ে অনেক বেশি ছন্দ মাধুর্য। থারথুয়েলা তাদের তুলনায় অনেকটা মেঠো। তবু তা অতুলনীয় ভাবে মিঠে। মেঠো, কিন্তু মিঠে।

আর একান্তভাবে মাদ্রিদের।

সেই থারথুয়েলাতে রমেন মন দিতে পারছে না এই কাউন্টের ঘরণীর প্রেম কাহিনির জারিজুরির কল্যাণে।

সামনের যবনিকা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিচিত্র কসটিউম পোশাকে সেজে একটি দল কোরাসে গাইল যে মাদ্রিদে থাকাই হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং আরামে আনন্দে ভরপুর হয়ে বেঁচে থাকা।

তারপরেই মঞ্চে নাচের ছন্দে উদয় হল এক সুঠাম স্বচ্ছপরনী তরুণী। কিন্তু তার নৃত্যটা বড় কথা নয়। তার গানের গলাখানা একেবারে খাঁটি 'সোপ্রানো'। তার পরেই এল এক তরুণ। 'টেনর'—গলার সুরে সে গেয়ে উঠল। আবার এল এক কোরাসের দল। তাদের সুরেলা বক্তব্য হল এই যে শহরের ব্রেটিরো পার্কে উদ্যান ভ্রমণ। স্বর্গের ইডেন গার্ডেনে বেড়ানোর চেয়ে বেশি আমেজ এনে দেয়। কিছু কওয়া, কিছু খাওয়া, কিছু নেচে নেচে ভেসে যাওয়া এই নাট্যদৃশ্য রমেনকে বার বার নিজের জীবন-এর পিছন দিকে, পিছনের দিকে আকর্ষণ করতে লাগল।

তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল। অনেক কিছু মনে করিয়ে দিতে লাগল। জীবনের ঝরা পাতাগুলি বসন্তের নিঃশ্বাসে প্রাণ ফিরে পেতে লাগল। নবীন মুকুলে নব সৌরভে জেগে উঠতে লাগল।

সেই জীবনের প্রথম বেলায় প্রথম থারথুয়েলা দেখতে এসে একেবারে পিছনের দিকে সবচেয়ে সস্তা গ্যালারিতে বসে কে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমাদের ইংলাটেরাতে অর্থাৎ ইংলন্ডে স্টেজে যে রিভিউ দেখানো হয় সেগুলিও কি এরকম—

আমাদের ইংলাটেরা? বিলেতে ছাত্র হয়ে এসেছি বলে কি ওই দেশটাই আমার হয়ে গিয়েছিল নাকি? কিন্তু ও সে কথা তোলেনি।

কাকে সে উত্তর দিয়েছিল? বলেছিল যে, মোটেই নয়; কোনও তুলনাই হয় না। রিভিউগুলিতে আছে শুধু সুন্দর সুন্দর মেয়ে আর যত রাজ্যের নকলকে রসিকতা। এই থারথুয়েলা হচ্ছে আমার মতে আসল জীবনের একটা টুকরো।

কে তখন আবার প্রশ্ন করেছিল যে কতটুকু টুকরো বলে তুমি মনে করো?

কাকে রমেন উত্তরে শুনিয়েছিল? একটা পরিপূর্ণ টুকরো; আন্তরিক ভাবে আনন্দ সুন্দর; এই হচ্ছে স্পেন আর স্পেনের বদলে ঠিক অমন আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না?

রমেন মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল—খুব জমাট একখানা জবাব দিয়েছিলে তখন, বেশ রসিয়ে

রসিয়ে। মনে আছে কি সেই ফ্লোর শোর নামটা?

মনে মনে সে নিজেকেই উত্তর দিল—মনে আবার নেই? সেই পালাটার নাম আমাকে সমস্ত জীবন পরিহাস করে এসেছে। নাম ছিল স্টুডেন্ট প্রিন্স।

রমেনের মনে পড়ল যে বিশেষ করে সেই যুগে অর্থাৎ সে যখন প্রথম ছাত্র অবস্থায় স্পেনে, বিশেষ করে মাদ্রিদে জার্নালিজম শিক্ষার পাঠ নিয়েছিল সে শিখতে এসেছিল তখন এই রকম নৃত্যগীত নাট্যের লীলা সারা দেশ জুড়ে চলত। এই মাদ্রিদেই অনেক পালা চালু ছিল। নিছক নিয়তির পরিহাস যে প্রায় চালচুলোহীন একজন ভারতীয় ছাত্র দেশে যার নুন আনতে পান্তা ফুরায় আর বিলেতে পান্তা আনতে নুন, সেই রমেন যে পালা দেখতে গেল তার নাম ছিল স্টুডেন্ট প্রিন্স।

কিন্তু অতীতের স্মৃতিচারণ করবার সুযোগ নেই এই দরবারি হলে।

সেই কন্ডেসা এখনও পিছনের সারির রসিকদের জিভের ডগায় রসের জোগান দিচ্ছেন। রমেন পরিষ্কার শুনতে পেল একজন বলছেন—বাব্‌বারে বাবা। তুমি যে রকম কন্ডেসার পিছনে পড়েছ মনে হচ্ছে তোমার নিজেরই নজর আছে ওর উপর।

বেশ গরম হয়ে অন্য লোকটি উত্তর দিলেন—কেন? অন্যায় কিছু হবে তাতে? নটবর নাগর ডন জুয়ান কি আমাদের আদর্শ নায়ক নয়? আমাদের সকলেরই পাইকার হিরো নয়?

হালকা ঠাণ্ডার সুরে একটা উত্তর রমেনের কানে এল—অবশ্য অবশ্য। কিন্তু তোমার বয়সের কথা ভুলো না ভায়া। সেটা ঢাকবে কী দিয়ে?

উত্তেজিত সুরে অন্য লোকটি শুনিয়ে দিলেন—কেন? ভডকা দিয়ে? পুরুষরা যখন ওই রাশিয়ান সুরা খায় তখন চোখে ডবল দেখে। আব মেয়েরা যখন খায় তখন দেখে মাত্র অর্ধেক। কন্ডেসাকে ভডকায় বাজিয়ে নিয়ে আমি বিশ্ব জগৎ আধখানা দেখিয়ে দেব। আমাব বয়সটাকেও।

এদিকে ততক্ষণে স্টেজেব উপব অ্যাবথুয়েলাব একটা করুণ গান হচ্ছে।

পরাজিতের আশাহতের গান। যে গান স্পেনের উচ্ছ্বাস আনন্দ আব উত্তপ্ত আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক খাপ খায না। কিন্তু দুঃখ কি নেই বা ছিল না ওদের জীবনে?

ছিল, প্রচুর ছিল। এখনও আছে।

মুহূর্তের জন্য বমেন আগের দিন সন্ধ্যার কথা মনে কবল। স্পেনের হিসাবে খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ রাত আটটায় সে ডিনার খেয়ে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে একলা মোটরে করে অনেক দূর রাতে ঘুরে বেড়িয়ে স্পেনের আস্বাদ নতুন করে গ্রহণ করবে।

অ্যামবাসির ভারতীয় রাঁধুনীর রান্না স্বদেশী ডিনারের সঙ্গে সে একটা হিস্পানি পানীয় খেয়েছিল। লম্বা সরু একটা পাত্রে—অনেকটা মোগলযুগেব মিনার কাজ করা পানপাত্রের মতো। তার টলটলে স্বচ্ছ সিন্দূর রঙের কাচের পাত্র থেকে ঢেলেছিল সংগ্রিয়া সুরা। লাল হিস্পানি সুরা, কইনাক ব্র্যান্ডি, মিনারাল হজমী জল, টুকরো টুকরো কমলার কুচি, আনারসের কুচি, টুকটুকে লাল চেরি আর সবুজ লেবুর রস। সব মিলিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে পাঁচমিশেল সুরা তৈরি হল তার নাম সাংগ্রিয়া। যা দেহকে করে শীতল আর মনকে গরম, প্রিয়ার কবোষ্ণ প্রথম পরশের মতো।

সেই সুরার সামান্য উষ্ণতা রমেনের মনে এনে দিয়েছিল তৃপ্তি। তার, আর একটা সুখ স্মৃতি, দুঃখের মধ্যেও স্মৃতি উঁকি মেরে যেমন করে সুখের কথা জানিয়ে যায় তেমন একটা সুখের স্মৃতি। তার আর মোটরে করে নিশীথ অভিযানে বের হওয়া হয় নি। স্মৃতির আবেশে সে মগ্ন হয়ে কত রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিল তা সে নিজেই জানে না।—

আগের নিভৃত রাতের সেই আবেশ তাকে আবার ঘিরে ধরল। দরকারি মজলিশি সমারোহের মধ্যেও।

তারই আচ্ছন্নতায় বিভোর হয়ে সেই গানটা শুনল :—

"চলে গিয়েই বুঝতে পারলাম।
সাগরবারি এমন নোনা কেন।
অশ্রুভরা লবণবারি,
ও গো বঁধু হৃদয় ভারী,
তোমার কাছে এনু ফিরে,

শুধু জানো তোমায় ছেড়ে
আর যাব না, আর কখনও না।"

ঘন ঘন হাততালির মধ্য দিয়ে এই বিশিষ্ট নৃত্যগীত কলার আলেখ্য শেষ হল। দশ মিনিটের বিরতি। সবাই পাশের ঘরে চলে গেল। আবার শ্যাম্পেন পরিবেশন হবে যে—

ইন্ডিয়ান অ্যামবাসাডর চীফ অব প্রটোকলের সঙ্গে ফিস ফিস করেও কোনও কথা বললেন না। দশ মিনিট পরে সবাই এল ফিরে। শুধু মাননীয় বিশেষ অতিথিটিই অনুপস্থিত।

সাংবাদিক আর রসিকজনদের চোখে নিখোঁজ।

।। ৩।।

কারেরা সান হেরানিমো।

হিরণ্ময় সরণী। রমেনের সোনার স্বপ্নের সরণী।

নামটা কি ভোলবার? তার রেশ যে এখনও রিন রিন করে বেজে ওঠে মনের মধ্যে।

সেই রাস্তার মোড়ে পা দিতেই রমেনের পা দুখানা যেন সীসের মতো ভারী হয়ে গেল। তার মন শিকারীর গুলিবিদ্ধ বলাকার মতো ছটফট করতে লাগল।

হা ভগবান। ডিয়স মিয়ো। মাই গড।

একবারে নিশুতি রাত। পাছে কেউ ওর সন্ধান পায় বা হদিস খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয় সে ভয় ছিল দস্তুর মতো। সে জন্যই সে মাদ্রিদের চৌরঙ্গী পুয়ের্তা জেল সল অর্থাৎ সূর্যতোরণের আলো ঝলমল দশমাথার মোড়ে অ্যাম্বাসির সি.ডি. মার্কা মোটর থেকে নেমে গিয়েছিল।

গভীর রাত ওখানে যেন মদির মধ্যাহ্ন। চঞ্চল-চরণ রঙিন-মন নরনারীর ভিড়ে সে সহজে মিশে গেল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে হেরোনিমো সরণীর বাঁকে এসে নিরালায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু'পাশে বিরাট বিরাট প্রাসাদ। তাদের গা ঘেঁষে সে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। এই রাস্তাটায় দুয়েকটা অফিস ব্যাঙ্ক আর নাইট ক্লাব ছাড়া আর সবই বড়লোকদের বসতবাড়ি। অর্থাৎ অনেকটা নির্জন। আর দুপাশের আলোগুলি চোখধাঁধানো নয়। বসতি পল্লীর রাত্রির আভিজাত্য বিজলীর আলোর বাড়াবাড়ি দিয়ে ওরা নষ্ট করতে দেয় না।

অর্থাৎ রমেনেব ফর্ম্যাল দরবারী পোশাক কালো চাপকান আর সাদা চুড়িদার পায়জামা হঠাৎ কারও নজরে পড়বে না। মিডনাইট ব্লু নিশুতি রাতের মতো রঙের হালকা টপকোটে সমস্তটা শরীর ঢাকা। অত্যন্ত সাবধানে তার দরবারি আবরণ লুকানো। সামনে পালাথিয়ো দেল কংগ্রেসো নামের অনুপম সুন্দর প্রাসাদ। সেখানে লালকর্টেস অর্থাৎ হিস্পানি পার্লামেন্ট বসে। তার উজ্জ্বল আলোর মালা পর্যন্ত ওকে চিনিয়ে দিতে পারবে না।

সেই প্রাসাদের বিরাট দুটো ব্রোঞ্জের তৈরি সিংহ হেলাভরে ঘাড় বেঁকিয়ে সমস্তটা হেরোনিমো সরণী নজরে রাখে। তারাও বোধ হয় এই ভিন্‌দেশী এক্‌সট্রানহেরো-কে চিনে নিতে পারল না।

রমেনের কিন্তু চিনতে ভুল হল না। সে এই পুরানো বন্ধুদুটিকে মনে মনে সম্ভাষণ করে গেল।

অভিজাত এই পথ দিয়ে সে কত রাত্রিতে তার হোটেলে ফিরে গেছে। সূর্যতোরণ থেকে যতটা ভিতরের দিকে অর্থাৎ দূরে সে হোটেলের দিকে এগিয়েছে, বিরাট বিরাট প্রাসাদের বদলে টেরাকোটা রঙে ছিমছাম লাল বাড়িগুলি সরণীর দুপাশে দাঁড়িয়েছে। রাজসিক ঐশ্বর্য নয়। তবু সেইগুলি সমৃদ্ধির পরিবর্তে অন্তত স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা শান্তিময় সংসারের বাণী শুনিয়েছে। কথা না বলা বাণীটুকু এই রাজপথে সরবে আত্মঘোষণা করছে।

কিন্তু মনের মধ্যে যে নীরবে গেয়ে উঠছে একটা বাণী :

'আজি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে।'

ওগো, সে দিন যে দেওয়া হয় নি আপনারে। দেওয়া যে হয়নি। হয়নি।

অনেকগুলি সুন্দর প্রাসাদের মাঝখানে যেন ফুলের মতো দাঁড়িয়েছিল হোটেল আগিলার। নিচে গ্রাউন্ড

ফ্লোরে সাজানো গোছানো ঝকঝকে নানা পশরার দোকান। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বেশ কয়েকটি। তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে লিফটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বহুতল এই ম্যানসনের কোন্ তলাতে যে হোটেলটি তা আজ তার মনে নেই। লিফটে পৌঁছোবার পথটিও অন্ধকারে যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে। সুন্দর দোকানগুলির প্লেট গ্লাসগুলি স্টীল সাটারের পাল্লা দিয়ে ঢাকা। এত রাত হয়ে গেছে যে তখন আর কেউ উইন্ডো শপিং করতে আসবে না। ঘুম সাগরের বুকে মুদিত কমলের মতো যেন হোটেলটা।

এ দিকে লিফট্টাকেও তার জায়গায় আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে বেশ শক্ত পেল্লায় একটি দরজা। বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তালা বন্ধ রয়েছে।

তার মানে?

রমেনের মনের চঞ্চলতা বেড়ে গেল। মাথায় রক্তপ্রবাহ হল দ্রুততর। তা হলে? এত উপরের ফ্লোরে হোটেলে সে উঠবে গিয়ে কী করে এখন?

তখনই মনে পড়ে গেল সারা পৃথিবীর মধ্যে মাদ্রিদেই এহেন পবিস্থিতির সহজ ব্যবস্থা আছে। এই শহরে সবার সেরা আকর্ষণীয় মানুষ হচ্ছে সেরেনো। অর্থাৎ নিশীথ রাতের চৌকিদার। গভীর রাতে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে মাঝরাতে বাহিরে হৈ হল্লা করে বা কাজ সেরে ফিরে নিজের আস্তানায় বা হোটেলে ঢোকা! অথচ সদর দরজার চাবি সঙ্গে হয়তো নেই। হয়তো এত রাতে ফিরে আসাটা কেউ আশাও করছে না।

কিন্তু তা বলে তোমায় রাস্তায় রাত কাটাতে হবে না। ভিতর থেকে তালা বন্ধ। দরজার সামনে হাততালি দিলেই অন্ধকারের কোন্ কোনা থেকে অদৃশ্য চৌকিদার নিঃশব্দে হাজির হবে। সব সদর দরজার চাবির আর সবচেয়ে দজ্জাল ডাণ্ডা হাতে সে উদয় হবে। আঁধার রাতে পূর্ণচন্দ্রের মতো। খুব ভদ্রভাবে হেসে তোমার দরকারের দরজাটি তার চাবি দিয়ে খুলে দেবে আর টুপিটি হেলিয়ে সেলাম করবে। সামান্য কিছু দর্শনী পেলেই সে আবার অদর্শন হয়ে যাবে।

রমেনের হাততালি শুনেই সেই পাড়ার সেরেনো এসে হাজির হল। হোটেলে থাকতে যাবে শুনে লিফটের সামনের দরজা চাবি দিয়ে খুলে দিল। রমেন লিফটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা আবার আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলে লিফট উপরে উঠে চলল। লিফট হোটেলের ফ্লোরে উঠলে আবার রমেনকে হোটেলের সদর দরজার ঘন্টি টিপতে হবে।

ততক্ষণ-ততক্ষণ-নির্জন পথে রাত্রি নিশীথে সন্ন্যাসী একা যাত্রী। পথে নয়, মনোরথে।

না। একা নয়, সোনাঝরা সন্ধ্যার উৎসবপ্রাঙ্গণ পার হয়ে, সন্তর্পণে এড়িয়ে একটি রক্ত করা হিয়া তার সঙ্গী।

হোটেলের সদর দরজায় এই নিশুতি রাতে বিনা নোটিশের এই আগন্তুককে এখন ঘন্টির বোতাম টিপতে হবে। দুধের মতো সাদা, মার্বেল পাথরের মতো ঝকঝকে গোল বোতাম থেকে আলো ছিটকিয়ে পড়ছে। ঘন্টি টিপলে যখন ভিতর থেকে দরজা খুলে হোটেলের রিসেপশনিস্ট অভ্যর্থনাকারিণী মহিলা শুধাবে—কে তুমি? তখন রমেন কি পরিচয় দেবে?

প্রায় চল্লিশ বছর আগে শোনা একটা কাহিনি মনে পড়ল। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে জাঁকিয়ে বসার আগে রাজধানী ছিল এল্ এস্কারিয়াল নামের একটা ছোট শহরে। পাহাড়ের পদপ্রান্তে সেই চারদিক দেওয়ালে ঘেরা শহরটি একাধারে চারচারটে কাজের কেন্দ্র ছিল। এর প্রাসাদ থেকে রাজা রাজ্য শাসন করতেন। এর বিরাট সমাধিসৌধে একজনের পর একজন রাজার দেহাবশেষ চোখধাঁধানো মার্বেলের আধারে রাখা আছে। সেখানে আছে একটি মঠ আর একটি বিশাল গির্জা, যার চিত্রশালা আর কারুকার্যের তুলনা নেই।

সেখানে বারোটা গ্রীক ধাঁচের স্তম্ভ, তার দুটো ব্রোঞ্জের দরজাওলা প্রবেশদ্বারে স্পেনের রাজাদের সব নিয়ে আসা হত। তখন শুরু হত প্রশ্নোত্তরের পালা। মঠের সন্ন্যাসীরা শুধোতেন, কে ভিতরে ঢুকতে চায়?

হিস্পানি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। এই উত্তরে চলবে না। আবার প্রশ্ন হত :

—কে ভিতরে আসতে চায়?

—স্পেনের রাজা।

না। এতেও চলবে না। আবার প্রশ্ন হত :

—কে ভিতরে আসতে চায়?

—কার্লস (চার্লস) নামে একজন মানুষ।

এবার, অর্থাৎ মানুষ কার্লসের পরিচয়ের শেষ চিহ্ন শবটিকে তার শবাধারে আসতে দেবার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হত।

প্রত্যেক রাজার বেলাই তাই।

রমেনের এই কাহিনিটা মনে পড়ল। যে এই গল্পটা ওকে শুনিয়েছিল তাকে—তাকে মনে পড়লে সমস্তটা অন্তরাত্মা থর থর করে শিহরিয়ে উঠে। এখনও এবং সারা জীবন ধরে সেই শিহরণ নিরন্তর তার অন্তরকে মথিত মুকুলিত করে তুলেছে।

হ্যাঁ, রমেন মানুষ, এস্কোরিয়াল প্রাসাদের নয়, আগিলার হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোল। ওগো খোল দরজা। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে এসেছি তোমারি দ্বারে, হে বিদেশিনী।'

আমি রমেন, সেই রমেন। আমি রঙিন গোল্ড ফিশের কাঁচের বয়াম থেকে বেরিয়ে এসেছি। ডিপ্লোম্যাটিক জগতে অভিজাত জীবন আর বিদগ্ধ বিলাসকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্য বলে মনে করা হয়। আপনা মর্জিতে চলে সেই জীবন।

কিন্তু অভিজাত দরবারি জগৎ থেকে আমি চুপিসাড়ে সরে এসেছি। এই বিরাট বিলাসী শহরের রাজকীয় নিমন্ত্রণের আড়ম্বর আর ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি। নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে সন্ন্যাসীর মতো একা নামহীন পরিচয়হীন ভাবে হাঁটার আনন্দ অনুভব করতে করতে এসেছি। আজ বিশ্ব-সংসারে আমার যে ভূমিকা তা থেকে আগোচরে ছাড় নিয়ে এসেছি। উড়ো চিঠির মতো উড়ো অপরিচয় নিয়ে আসতে পেরে একটা মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি। নিষ্কৃতির আনন্দ পাচ্ছি। তা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

মনের খুশিতে রমেন মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ফেলল। শূন্যে ছুঁড়ে দিল। ওগো, দরজা খোল।

দরজা খুলে গেল।

—ডিয়স মিয়ো। এত রাতে আপনি কে বটে?

খুব বুড়ি একটি মহিলা মাথা ভরা সাদা চুল আর চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল।

রমেন নিজেকে সামলিয়ে নিল। শুধু বলল—সিনরা, ইন্ডিয়া থেকে একজন ভিজিটর।

—ভিতরে আসুন। ইট ইজ মাই প্লেজার। এল গুস্টো এস মিয়ো।

বৃদ্ধার স্নিগ্ধ ভদ্রতা রমেনের মনকে স্পর্শ করল।

ঠিক আগেকার মতই একটা স্বচ্ছ আন্তরিকতা। নিমেষের জন্য মনে হল, যে এতো একটা হোটেল মাত্র নয়। এ যেন একটা 'কারমেন' অর্থাৎ গ্রামদেশের বাগান বাড়ি। তার মনোহর আঙিনায় যেতে হবে কাজ করা রেলিং-ঘেরা আঁকাবাঁকা হাঁটা পথ দিয়ে। ধাপে ধাপে একটুখানি টিলার মতো জায়গায় পৌছোতে হবে। লতানো ফুল দিয়ে সাজানো সেই বাগিচার কুটিরে পিয়ানোর টুং টাং যেন এখনই শোনা যাবে। মৃদু গুঞ্জনে অর্কেস্ট্রার ঝংকারের মতো বাজাবে—নচেস্ এন, লস্, জার্ডিনেস ডি এস্পানিয়া হিস্পানি বাগিচার রাতগুলি।

এই তো সেই এস্পানিয়া।

এই তো সেই মানস বাগান।

এই তো সেই রাত।

কেবল নেই সেই গীটারের গুঞ্জন।

যে গুঞ্জন সেই প্রথম রাতের নতুন অতিথি অচেনা হোটেলের 'ফইয়ার' বা সামনের চত্বরে ঢুকেই শুনতে পেয়েছিল। কোনও বন্ধ দরজার ওপার থেকে আসছিল সেই মৃদু বাজনা। আর দেওয়ালে ঝুলছিল গুচ্ছ গুচ্ছ নারাঙ্গী। কমলা রঙ আর সৌরভে ভরা।

অতিথির কাছে চারিদিকে বন্ধ এই চত্বরটাকেই মনে হয়েছিল যেন একটা দেওয়ালে ঘেরা সাজানো কমলা কুঞ্জ। নতুন শেখা ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় সে মনে মনে বলেছিল—এই তো আমার কাছে একটা পাতিয়ো, আঙিনা। একটি লস নারান্যাহোস কমলা কুঞ্জ, তারই রঙ আর সৌরভকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে এই গীটারের গুঞ্জন।

তরুণ স্বপ্নবিলাসী বিদেশী।

তার বদলে আজ দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রবীণ। গোপনতা-প্রয়াসী। ঠিক বিদেশী এখন তাকে বলা যায় না। বরং বিশ্বপ্রবাসী বলা চলে।

অভ্যর্থনা করতে গিয়ে বৃদ্ধাই প্রথম নীরবতা ভাঙল।

বিদেশে যে কোন হোটেল বা পেনশন বা আলবেয়ার্গো অর্থাৎ বোর্ডিং হাউসে ঠাঁই চাইতে গেলে সবার আগে দেখাতে হবে পাশপোর্ট।

বৃদ্ধা পাসপোর্ট দেখতে চাইল।

হালকা ওভারকোটের পকেটে অবশ্যই পাসপোর্ট ছিল। বিশেষ করে স্পেনে বিদেশীকে সব সময় পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে হয়। নিজের নিরাপত্তার জন্য। আর পুলিশের প্রশ্ন এড়াবার জন্য।

কিন্তু রমেন কী করে পাসপোর্টটা দেখায়? গোপনে সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে পড়া যায়, অপরিচিতের ভিড়ে পবিচয়হীনতার স্রোতে ভেসে যাওয়া যায়। কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের পরিচয়কে সে এড়িয়ে যাবে কী করে? এই জাতের পাসপোর্টের খয়েরি রঙটাকে সে ঢাকে কী করে? বুড়ির নজরে তো সাধারণ লোকের নীলরঙের মলাটের পাসপোর্ট সর্বদাই আসে, সেটাই প্রত্যাশিত এ হেন স্থানে।

কিন্তু খয়েরি রঙ দেখলেই তার চোখ চকচক কবে উঠবে। একজন বিদেশী ডিপ্লোম্যাট তার হোটেলে এসে উঠেছে। এমন কথাটা কি আর সে চেপে বাখবে? হোটেলের মর্যাদা আর ব্যবসার সুবিধা দুটোই যে এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। খববটা চাউর করতে মানা কবলেই সন্দেহ মাথা চাগিয়ে উঠবে। শুধু প্রতিবেশীরা নয়, পুলিশও জানবে।

কাল ভোরেই বুড়ি গার্ডিয়া সিভিল অর্থাৎ পুলিশে খবব দেবে। রাত পর্যন্ত যে সব অতিথি এসেছে তার তালিকা আর বিববণ ভোরে দিয়ে দেওয়াটি সাধাবণ নিয়ম। তাব সঙ্গে সঙ্গে সব জানাজানি হয়ে যাবে। যদি বা এই রাতটুকু তার গোপন অভিসারের কাহিনি লুকানো থাকে। মাদ্রিদের পুলিশের তৎপরতা সব কিছুই ফাঁস করে দেবে।

বেহিসাবি আবেগে যখন রমেন চুপিসারে বেবিয়ে এসেছিল তখন এই কথাটা মনে আসে নি।

কিন্তু চকিতে মনস্থির করে ফেলার ক্ষমতা ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে চাকরির একটা শিক্ষা।

সে বৃদ্ধাকে বলল—আপনার রেজিস্ট্রারটা খুলুন, আমি নিজের হাতে সব লিখে দিচ্ছি। আমাদের পাসপোর্টে আবার হিন্দি ভাষায় অনেক কিছু লেখা থাকে কিনা। জানেন সিনবা, ইন্ডিয়া, আর ইন্ডিয়া ইংলেসা নেই। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন।

বৃদ্ধা খামটা বের করে ফর্মটা সামনে এনে ধরার আগেই বমেন ক্ষিপ্রহাতে নিজের হাতে দস্তানার আড়ালে পাসপোর্টের মলাটটা উলটিয়ে ফেলল। খুব যত্ন করে মনোযোগ দিয়ে পাসপোর্টের ভিতরের পাতাগুলি উলটিয়ে যে পৃষ্ঠাতে ডিপ্লোম্যাটিক কথাটা লেখা আছে সেটা চেপে দিল।

রাত নিশুতি। বৃদ্ধাও তো শুয়ে ছিল। সে তার পাসপোর্টটা যাচাই করে দেখবার জন্য নিজের হাতে তুলে নিল না। শুধু ফর্মটা পুরোপুরি লেখা হয়েছে কিনা তা দেখে নিল।

রমেন সব কথাই ঠিক মতো লিখেছিল। শুধু প্রফেশন বা পেশাব বেলা সংক্ষেপে লিখেছিল সরকারি চাকুরি। নিজেকে এমন করে আড়াল কবে রাখা যে কতখানি আত্মত্যাগ তা অন্যলোকের পক্ষে বোঝা শক্ত। ফরেন সার্ভিসের নিম্নতম পদেব লোকও তার ডিপ্লোম্যাটিক ছাপ এবং তার অভাবে অন্তত ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত জাহির করতে ছাড়ে না। তার যত নিচেব সিঁড়িতে তার ঠাঁই সাড়া দেয় সে তত সরব। বিশ্বজন জানুক। তা না হলে যে জীবনই বৃথা।

ক'দিনের জন্য ঘর চাই সেই কলমে সে লিখেছিল এক রাত্রি এবং একা।

'একা' কথাটা দেখে বৃদ্ধা খুব বিনয় দেখিয়ে আর ক্ষমা ভিক্ষা করে জিজ্ঞেস করল যে কটার সময় পেতি দে জুনে অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট চাই। এবং যদি তা না দিতে হয় তা হলেই সুবিধা হয়। কারণ...

রমেন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার মিনতি থামিয়ে দিয়ে বলল—না, না। আমার ব্রেকফাস্টের দরকার নেই। আমি ভোরবেলাই অন্য জায়গায় চলে যাব। সেখানে আগে থেকেই ঘর ঠিক করা আছে। কেবল এই একটা রাতের জন্যই জায়গা নেই সেখানে।—

বৃদ্ধা বলল—আমাদের এখানে কয়েকটা ঘর খালি আছে। যেটা পছন্দ হয় নিতে পারেন। তবে এত রাতে আপনি বোধ হয় ডিনার খেয়েই এসেছেন। অবশ্য এখন আমাদের কিছু তৈরি নেই। যদি চান একটু গরম মেনেস্ত্রা আপনার ঘরে রেখে আসতে পারি।—

মেনেস্ত্রা।

মানস তারা।

গরম জলপাইয়ের তেলে রশুন ভেজে লাল টকটকে করে হরেক রকম সব্জি তাতে ঢেলে দেওয়া হয়। বাঁধাকপি বা ফুলকপির ডাটা পর্যন্ত। গরম জল সিদ্ধ হতে হতে সেটা সুরুয়া হয়ে যাবে। তখন তাতে ঢালা হবে আগে থেকে সাঁতলান কিছু মাছের টুকরো আর মুরগির মাংসের কুচি। আর কিছু সেদ্ধ করা চাল। উপরে ছড়িয়ে দাও শুকনো চীজের গুঁড়ো।

যার পকেটে নেই রেস্ত অথচ পেটে রয়েছে খিদে আর রসনায় আছে স্বাদ তার অসময়ের ভরসা হচ্ছে মেনেস্ত্রা।

যত দাম কম তত তরলতা বেশি আর মাছ মাংসের টুকরো ছোট। এদিকে সেই অল্প বয়সে খিদেটি বড়ই বড় হয়ে দেখা দেয়।

সব দিক দিয়ে এই দেশটি স্টাডি করবার জন্য সকালেই হোটেল থেকে বেরিয়ে রমেন দিনের পর দিন শুধু মেনেস্ত্রা দিয়ে খাওয়া সেরেছে। খাওয়া ঠিক সারেনি, খিদে মেরেছে। উপরের ভাসমান চীজের গুঁড়ো আরামে চাখতে চাখতে নিচের তরল সুরুয়ায় কটি মাংসের টুকরো দেখা যায় তা গুনে গুনে দেখেছে। এদেশে আবার ছাই ভোজন হচ্ছে একটা বিলাস, একটা শিল্পকলা।

সবাই তখন দুপুরে খানা আর সিয়েস্তার জন্য কম সে কম তিন ঘণ্টার বিরতি নিত। অপরাহ্নের মধ্যে একটা মিষ্টি রোমান্সের স্বপ্ন ছিল।

সেটার স্বপ্ন ভঙ্গ করতে চায় না বলেই সবাই, এমন কি ছাত্ররাও, বিকেল চারটের সময় খেত চায়ের বদলে লাঞ্চ। অবশ্য পাঁচটার সময় খেলে বনেদিয়ানাটা আরও বেশি ফুলে উঠত। এবং আনন্দ বিলাসের চেয়ে বেশি বনেদিয়ানা আর কিছুতেই নেই।

এমনি মিঠে আমেজ ভরা আরামে ধীরে, সুধীরে সেই ভোজন তো বলতে গেলে এক রকম ভজনানন্দের ব্যাপার ছিল। এদিকে রাতে কোনও ভদ্রলোক এগারোটাব আগে ডিনারে বসত না। তার পরে থিয়েটার শুরু হত। একটায়, মানে দুপুরে নয়, নিশীথের নিবিড়তায়।

খাওয়ার মধ্যেও ছিল ছন্দময় নিবিড়তা এ হেন দেশে। এমন পরিবেশে বেচারা রমেন শুধু এক পাত্র মেনেস্ত্রা নিয়ে মানস তারা গোনা ছাড়া আর কি করে সময় কাটাতে পারত?

সুরুয়াও হায়, ফুরিয়ে যায়। তারা গোনা হয়ে যায় সারা। তাড়া অবশ্য দিত না রিস্টোরান্টির ওয়েটার। তবু বসে থাকা হয়ে উঠত শক্ত। বাকি সময়টুকু কাটানো একটা সমস্যা। থিসিসের জন্য নোট লিখে আর কত সময় কাটে?

মনে পড়ল যে একবার সপ্তাহের শেষে মনটা হয়ে উঠেছিল উদার। অথচ পকেটটা গড়ের মাঠ। তবু সে খুশির আবেশে সাহস করে পুয়ের্তা দেল সল অর্থাৎ শহরের চৌরঙ্গির কাছে একটা নাম করা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েছিল। সেটার নাম ছিল লুই ক্যান্ডেলের গুহা। স্পেনের রবিন হুড লুই ক্যান্ডেলার নামে এই নাম করা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ছিল সে একটা বিশ্বলুট বাসনায়।

ভালো নামী জায়গায় বসে খাওয়ার চেয়ে বেশি কাম্য আর কী হতে পারত রমেনের মতো রেস্তহীন পরদেশী ছাত্রের?

ঝলমলে পোশাকে সাজা ওয়েটার যখন সামনে এসে হেসে মাথা নিচু করে 'বাও' করল সেই অভিবাদনের উত্তরে সে শুধু বলতে পেরেছিল—মেনেস্ত্রা। আর কিছু নয়।

না। সেই ওয়েটারের বিস্ময় ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কুণ্ঠিত দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্ত নয়।

এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকে একটু নৈতিক সাহস দিয়ে ঠেকা দেবার জন্য ভেবেছিল—ঠিক আছে। এখন আমি চালচুলোহীন ভিখারী রবিন হুডের মতো এসেছি। কিন্তু এই মেনেস্ত্রা সুধা খেয়ে শক্তি সঞ্চয় করেই আমার যে এখানে বসে বসে খাওয়ার মতো সময় হাতে নেই তা বুঝিয়ে দেবার মতো ভাব দেখিয়ে দেব। বলে যাব যে সোজা চলে যাচ্ছি রাসত্রোতে। সেখানে রাজার ঐশ্বর্যের মতো মূল্যবান পুরোনো ঘরণীদের শৌখিন সামগ্রী ছড়ানো থাকে, সেই রাস্তার দোকানে দোকানে বিহার প্রত্যেক সংস্কৃতি-পূজারির বিলাস।

প্রত্যেক অবস্থাপন্ন বিদেশীই রাসত্রো নামের রাস্তায় পুরোনো কিউরিয়ো আর শিল্পসামগ্রী সওদা করতে যায়; আর সেখানে ঘুরে বেড়ানোও যে একটা সত্যি বনেদিয়ানার লক্ষণ।

হঠাৎ একটা দাওমাফিক সওদা সেখানে করতে পারলে বড়লোক রবিনহুডের মতো টাকা ফেলাছড়া

করা খরচ করাও সম্ভব হতে পারে।

কিন্তু তার আগের পরিচ্ছেদে এই স্প্যেনের মানস তারা শুনেই সময় কাটাতে হবে।

সেই মেনেস্ত্রার এক পাত্র এই বৃদ্ধা তার ঘরে এখন রেখে শুভরাত্রি জানিয়ে সরে যাবে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল—কোন্ ঘরটা আপনার পছন্দ একটু দেখে নিন, সিনর। বড় রাস্তার উপর কয়েকটা ঘর খালি আছে।

রমেন হঠাৎ বলে ফেলল—নুমেরো থিংকো। পাঁচ নম্বর।

বৃদ্ধার চোখ নিশ্চয়ই ঘুমে ভরে এসেছিল। না হলে সে আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে অন্তত ভাবত যে এই নবাগত বিদেশী কী করে জানল যে বড় রাস্তার উপর একটা ঘর আছে যার নম্বর পাঁচ।

কিন্তু বেঁফাস ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রমেন তাড়াতাড়ি বলল—মুচাস গ্রাথিয়াস। বহু ধন্যবাদ। মেনেস্ত্রা আমার লাগবে না। আমি খুব ক্লান্ত। শুধু ঘরটা খুলে দিন অনুগ্রহ করে।

হ্যাঁ, এই যে দিচ্ছি। ঘর তৈরিই আছে। বুয়েনস নচে সিনর, শুভ রাত্রি, মহাশয়।

রমেন ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের বর্তমানের উপরও দরজা বন্ধ করে দিল।

॥ ৪॥

ছিদাম মুদির লেন থেকে মাদ্রিদ বহু বহু দূর অস্ত্।

বন্ধ দরজা পিছনে রেখে থমকিয়ে দাঁড়াল রমেন।

সামনে ডিমেব আকৃতি সুডৌল টেবিল। তার মাঝখানে একটা মিনার কাজকরা ফুলদানি। তার পাশে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ কমলা ফুলের কুঁড়ি। কমলা কোরক অরেঞ্জ ব্লসম।

শুধু কমলাকলির নয়, একটা নব বিবাহের মৃদু সৌরভ সমস্তটা ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে।

রমেনের গবম দেশে ঘরের দরজা জানলা প্রায় সবসময় খোলা থাকে। প্রখর আলোয় প্রচুর হাওয়ায় উড়ে চলে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়। হারিয়ে যায় অনেক সুরভি, অনেক স্বপ্ন। একটুখানি একটা ঘরে বাইরের নজরের আড়ালে তাদের একেবারে নিজের করে, নবীন করে আরও মুঠির মধ্যে ধরে রাখার সুযোগ মেলে না।

অন্তত সহজে মেলে না, সব সময় মেলে না—একান্তে অন্তরালে অন্তরের বাসনাকে মুকুলিত করে তোলার মতো সুবিধা বা অবসর।

বাইশ বছর বয়সের রমেন। বসন্তের কুঁড়িকে তার জীবনে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করে তুলবার নিমেষ সে এখনও খুঁজে পায় নি। আর তারই সামনে ছড়ানো রয়েছে এই ঘরের একান্তে নিভৃতে অরেঞ্জ ব্লসম।

জুন মাস অর্থাৎ সবস বসন্তে গীতগোবিন্দ রমেনের মনে পড়ল। ইচ্ছে কমলা ফুলের জন্য উৎসর্গ করা। চিরদিনের অনন্ত প্রেমের প্রতীক। পাশ্চাত্য প্রথায় বিবাহের ফুল। বধূর সিঁথি মোরের মতো সাজানো হয়। ফুলের ভাষায় বধূকে বলা হয়, তুমি পবিত্র, তুমি প্রেমের অর্ঘ্য পাবার যোগ্য। তুমি সাধনার ধন। এই ফুলের সৌরভ বরষের পর বরষ তোমার জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

স্বর্গীয় নারীত্বের মূর্তি শ্রেয়সী তুমি প্রেয়সী! অসীমতায় উদারতায়, উষসী তুমি নববধূ।

সেই বাণীরই উচ্চারণ করেছিলেন গ্রীক রূপক যাতে দেবরাজ জুপিটার যখন তিনি জুনোকে দেবরানী করে বরণ করে নেন। সেই সময় তিনি প্রেয়সীকে একটি সোনালি আপেল উপহার দিয়েছিলেন। সেটি হল কমলা।

সেই কমলার কলি নববিবাহিতদের জীবনে ফোটাতে হয়। তাই তো নববধূ সিঁথিমোর হয়ে সাজে কমলাকলি। অরেঞ্জ ব্লসমকে গ্রীক আর রোম্যান নববধূরা আনন্দের প্রতীক বলে তুলে নিত।

শোভায় সৌরভে রূপকথার আবেশে মগ্ন মন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমেন।

আজ রাতে বুঝি সব কিছু মিলে রমেনের মনে বসন্তকে জাগিয়ে তোলার মুহূর্তটিকে তৈরি করে তুলছে।

না হলে, এই পাশের ঘর থেকে কেন ভেসে আসছে গীটারের মৃদু গুঞ্জন। তালে লয়ে দ্রুত কিন্তু সুরের ধ্বনি খুব মৃদু, মধুর ভাবে অস্ফুট। পশ্চিম জগতে প্রতিবেশীর নিজস্ব অস্তিত্ব আর নিরালা শান্তি কেউ নষ্ট করে না। তাই বোধ হয় গীটার বাজানো হচ্ছে এত মৃদুভাবে।

ও গো, কে তুমি এই সুরলহর ছড়িয়ে চলেছ এই হোটেলে আমারই পাশের ঘরে? আরও একটু উঁচু পর্দায় বাজালে আমার প্রাণে যে তার ঢেউ আরও সবলে এসে তা ছড়িয়ে পড়ত। কে তুমি?

স্পেনে আসবার আগে বই পড়ে রমেন সে দেশের অনেক নাচগান বাজনা সম্বন্ধে মোটামুটি প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে এসেছিল। শুধু সংস্কৃতির সন্ধান নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবসাদারি কারণ ছিল। নিজের দেশে তখনও জার্নালিজমের কোর্স পাকাপাকি ভাবে শুরু হয়নি। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শেখাবার বা তাতে ডিগ্রি দেবার ব্যবস্থা চালু হয় নি। কিন্তু এই বিদ্যাটা শিখবার সুযোগ তার হাতের মুঠোয় হঠাৎ এসে গিয়েছে।

তাছাড়া বসে হিসাব করে দেখেছিল যে তার যা বিদ্যার বহর আর মাথার দৌড় তাতে ওই হিতৈষী আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবরা বি.এ.-টা পাশের পরেই কোনরকমে একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা আরম্ভ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ক্লাসে রিপন কলেজে আইনটা পড়াও ভালো। কোনও চাকরি সুবিধামতো না পেলে অগতির গতি হিসাবে ওকালতিটা মক্স করা যাবে।

বাঙালি যুবকের গতানুগতিক পথ।

ডানপিটে না হোক বেপরোয়া বলে রমেনের বদনাম ছিল। দুর্লভ দুঃসাহসে ভর করে সে বি.এ. পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ডালহৌসি পাড়া-বেড়ানিয়া দলে নাম না লিখিয়ে একটা নতুন লাইন নেবার পথ খুঁজতে লাগল। সিনেট হাউসের পিছনে একটা ছাত্রদের খবর দেবার অফিস আছে সেখানেও।

এদিকে শুধু বাংলা দেশ নয়, গোটা ভারতবর্ষই তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ধাক্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই চঞ্চলতা রমেন আর তার সব জীবন্ত বন্ধুদের মনেই ঢেউ তুলেছে।

নেতাদের নিত্য নূতন বাণী। তরুণদের প্রতি বিপদজনকভাবে জীবন কাটানোর আহ্বান। তাদের মনে উন্মাদনা জাগিয়ে সুভাষচন্দ্র বোস আই. সি. এস. নামক স্বর্গে তৈরি বৃত্তি ছেড়ে সাধারণ মানুষের জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ করলেন। জহরলাল নেহরু রাজার মতো জীবনযাপনের সুযোগ ছেড়ে পথে এসে নামলেন। নিজের দারিদ্র্যের উপর জয়ী হয়ে নতুন অর্জিত ঐশ্বর্য ছেড়ে এসে চিত্তরঞ্জন দেশের চিত্ত জয় করলেন।

লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে দেশের ডাক হয়ে গেল অন্তরাত্মার আহ্বান। সে আহ্বান তরুণদের ঘর ছেড়ে পথে নামাল। পথ ছেড়ে পুলিশ হাজতে।

সেখান থেকে অনেককে ঠেলল কারাগারে। আর একবার সরকারি ছাপ পড়লে সারা জীবন তার ছোপ আর উঠবে না।

দেশ যত ধ্বনি তোলে বন্দেমাতরম্ শাসকের তত হয় মাথা গরম। গায়ে খদ্দর দেখা গেলেই গোপন খাতায় নাম ওঠে। কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে বেশি বেশি ঘুরে বেড়ালেই জাগে সন্দেহ। সঙ্গ মানেই সংঘ। আর সংঘ মানেই সন্ত্রাস।

পৃথিবীর সব দেশেই বিদেশী শাসকের অভিধানে এই সব কথার এই একটি মানেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাপ মা-দের মনও ভরে উঠল ভয়ে। ঘরে উঠতি বয়সি ছেলে, এমন কি স্কুলের উপরের ক্লাসের কিশোর বালক থাকলেই ভয়ের কথা। কখন ছেলে কী রকম বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বা সম্পূর্ণ না জেনেই কোনও গুপ্ত বিপ্লবীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সেই ভয়ে বাপ মা-দের মন অস্থির, ব্যাকুল। অনেকেই ভাবতেন যে অন্তত তার ছেলে বাবা মা ভাই বোনের কথা ভুলে নিজে স্বদেশীর পথে পা বাড়াবে না। নিজের বর্তমান আর বাকি সকলের ভবিষ্যৎ শেষ করে দেবে না।

কিন্তু এই রকম ভরসাও বাপ মায়েদের বেশি দিন শান্তি দিতে পারল না। গান্ধীজীর দণ্ডী অভিযান যেন ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মতো কাজ করল। দলে দলে কিশোর তরুণ তরুণী পিতা মাতার বাধার বিন্ধ্যাচল ভেঙে দিল। নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার হিমালয় অতিক্রম করে গঙ্গা প্রবাহের মতো সারা দেশে স্বদেশী মন্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। পৌরাণিক কাহিনির সগর রাজার মৃত অসংখ্য সন্তানের মতো অসংখ্য লোক সেই প্রবাহের স্পর্শে পরাধীনতার ঘুম শেষ করে স্বাধীনতায় জেগে উঠতে চাইল।

রমেনের বাপমায়ের চিন্তার অন্ত নেই। নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে কারও কারও ছেলে এরকমভাবে জেলে গেছে। ওঁরা মনে করতেন ও জানতেন যে তারা নির্দোষ। শুধু মনে দেশকে ভালোবাসা, মুখে সে কথার স্বীকারকরণে খদ্দর আর পাড়ার জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম এছাড়া এমন কিছুই তাদের বিশেষত্ব ছিল না যাতে পুলিশের চোখে অপরাধী হতে পারে।

কিন্তু একটু সন্দেহ হলেই অপরাধ নিশ্চয় আছে এমন ধারণা তখন শাসকমহলে ছিল। হাজতে কেন, শুধু থানায় হাজিরা দিতে ডাকা মানেই ছাপ পড়ে যাওয়া।

রমেনের এক সহপাঠীকে পুলিশ থানায় নিয়ে গেল জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তার মেসের ঘরের দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো ছিল একটা খদ্দরের শার্ট। তার মালিক কে তা জানা দরকার। ইলিসিয়াম রো অর্থাৎ স্বর্গ সরণী রাস্তায় অবস্থিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের টিকটিকিদের নজরে পড়েছে সেই শার্টটা। পাড়ায় শোরগোল পড়ে গেল। তাহলে নিরীহ চেহারার পড়ুয়া ছোকরাও আছে এর মধ্যে। কিসের মধ্যে তা কেউ খোলাখুলি বলল না। এর মধ্যে কথাটাই একটা বিরাট কারবারের ইঙ্গিত বয়ে আনে। বোমা থেকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, রবিবার রবিবারে মুষ্টিভিক্ষা করে সেবাশ্রমে নাইট ক্লাস চালানো থেকে লবণ সত্যাগ্রহ যে কোনও কিছু হতে পারে।

মোট কথা ছাপোষা বাঙালির পাখির বাসার মতো ভঙ্গুর সংসারে একটা তোলপাড় করা ভূমিকম্প।

প্রস্রাবের জন্য গলি আর বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে বেসরকারি ভাবে জনসাধারণের জায়গা বলে স্বীকৃত জায়গাটা আছে সেখান থেকে গলির শেষ বাড়িটার ছোট্ট অন্ধকুটুরি পর্যন্ত এই পুলিশী জবাবদিহির কথাটা ডালপালা গজিয়ে বড় হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল।

সেই রাতেই নজরে পড়ল রমেনের পড়ার টেবিলে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'। তার ভিতরে ছিল বিদ্রোহী সৈনিক কবির একটি ছবি। আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহী স্বদেশ প্রেমিক বীর ম্যাকসুইনি ইংরেজের জেলে প্রতিবাদ করে অনশন করে মারা গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে বিদ্রোহী কবির তুলনা করে অনশনরত কবির ছবির নিচে লেখা-বাংলার ম্যাকসুইনি।

আর তার নিচে কবির 'বিদ্রোহী' কবিতা থেকে তুলে দেওয়া তিনটি লাইন।

"ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর?
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।"

শুধু সেখানেই যদি শেষ হত তাহলেও যথেষ্ট চিন্তার কারণ থাকত।

কিন্তু একেবারে ভয় ভাবনার ব্যাপার হয়ে দেখা দিল, এই বইখানার ভিতরের পাতাটা।

বইয়ের উৎসর্গের পাতায় সুন্দর গোটা গোটা হরফে লিখেছে এই জীবন পণ করা পড়ুয়া, এই কলার ছাত্র : নিজেকে দিলাম। আর কবিতার তিনটি লাইন তার নিচে উদ্ধৃত করা :—

"আমরা তাজা খুনে লাল করেছি,
সরস্বতীর শ্বেতকমল,
আমরা ছাত্রদল।"

সর্বহারা এই নিজেকে উৎসর্গ করা বইটির মালিক আর কেউ নয়। স্বয়ং সেই সহপাঠী বন্ধু, যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে যে তার মেসের ঘরের দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো খদ্দরের শার্টটা কার। যারই হোক না কেন তার নিজের ভবিষ্যতের বারোটা বেজে গেছে।

এবার টিকটিকির খুদে অদৃশ্য চোখ এই বাড়ির ছেলের উপরই এসে পড়ল বলে।

আর একবার সেই শ্যেনদৃষ্টি পড়া আর শনির দৃষ্টি পড়া একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। শান্তি স্বস্ত্যয়নে গ্রহরা হয়তো তুষ্ট হয়। কিন্তু উপগ্রহরা অত সহজে ভোলে না। বিশেষ করে কারও সর্বনাশে যখন অন্য কারও পৌষ মাসের পথ খুলে যেতে পারে।

ঝানু হাড়পাকা টিকটিকি অবশ্য আরও এক কাঠি বাড়া। জানলায় জানলায় আনাচে কানাচে যাদের গতিবিধি তারা শুধু হাড়পাকা নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে কড়া সেদ্ধ তাই।

তারা বলত যে সব ছেলেকে তারা জালে তুলে আনছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এত অবস্থাহীন যে বেশ কয়েক বছরের জন্য তাদের খোরপোষের ভাবনা থাকবে না। চাই কি সরকার সদাশয় হলে তাদের বাপ মা বা পোষ্য পরিজনের জন্য একটা মাসোহারা অর্ডারও হয়ে যেতে পারে। অবশ্য তার কতটুকু বা একটুও ওরা পাবে কি না সেটা অন্য কথা কর্তব্যরত টিকটিকিদের সে সব নিয়ে চিন্তা করার কথা নয়। সময়ও নেই।

দেশ জুড়েই যে ছোঁড়াগুলোর নাচন কুঁদন চলেছে।

ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যায়। কথাটা যে কতখানি সত্যি তা বুঝতে পারবেন না। কারণ স্বর্গ সরণীর অফিসের পথটা সর্ব সাধারণের জন্য খোলা নয়। দেশময় স্বদেশী ঝড় যখন উঠেছে ঝরা পাতা যে রাশি রাশি

জড়ো হয়ে ঝাড়ুদারদের টুকরিতে তোলা হয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কী?

রাত দশটার সময় রমেন বাড়ি ফিরল। বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে অনেক রাত। আর ওই স্বদেশী সময়ে আরও বেশি সন্দেহজনক।

ছেলে ঘরে ঢুকতেই বাবা একেবারে সোজাসুজি এত রাত করে ফেরার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

মা তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন নিজের মনের উৎকণ্ঠার কথা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা যোগ করে দিলেন, এ দিকে রাস্তায় দুর্ঘটনা, ও দিকে পুলিশের পাড়ায় আনাগোনা, দুটোর মাঝখানে আমরা যে ছটফটিয়ে মরছি সে কথা ভাববার দায়িত্ব তোমার নেই দেখছি।

মা ফোড়ন কাটলেন নাকি সুরে, একরত্তিও নেই।

রমেন অনেকক্ষণ ওদের এক তরফা দুঃখ আর কাঁদুনি আর অভিযোগ শুনল। চুপ করে শুনল।

আর মনে মনে ভাবতে লাগল কথাটা কী করে পাড়া যায়।

সে জানে না বাবা মা কিভাবে কথাটা নেবেন। কী তার প্রতিক্রিয়া হবে। তাই সে এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

তারপর মা যখন আবার পথে দুর্ঘটনার ভয় সম্বন্ধে কাঁদুনি গাইতে শুরু করলেন তখন রমেন আর থাকতে পারল না। অনেকটা যেন উল্লাসেই বলে ফেলল, অ্যাকসিডেন্টই তো হয়েছিল।

অ্যা! অ্যা! অ্যাকসিডেন্ট! আর তুই হতভাগা বেশ খুশি মনে সেটা জানাচ্ছিস?

রমেন একেবারে দু'পাটি দাঁত বের করে বলল, হ্যাঁ খুশি মনে জানাচ্ছি। কিন্তু পুরোটা খুশি হতে পারছি না, তোমাদের মত না জানা পর্যন্ত।

মা এবার বোমা ফাটিয়ে বললেন—হতভাগা, তুই একেবারে স্বদেশী ডাকাত হয়ে উঠেছিস। তোর বন্ধুকে নিয়ে গেল থানায়, আর তুই অ্যাকসিডেন্ট করে দাঁত বের করে হাসছিস।

বাবা বুঝলেন যে একটা বিশেষ কিছু ব্যাপার হয়েছে। নিছক পথ দুর্ঘটনাই নয়। অন্তত বিশেষ রকমের জখম বা ওই ধরনের কিছু নয়। তাহলে অত নিশ্চিন্ত ভাবে খুশি ভাব দেখিয়ে গুণধর পুত্র দুর্ঘটনার ঘোষণা করত না।

তিনি মাকে বললেন—ছেলেটাকে এখন আগে তো খেতে দাও।

বোঝাই যাচ্ছে যে জখম টখম কিছু হয় নি। লালবাজারের পুলিশী ব্যাপারও নয়। তবে আর চিন্তার কী আছে? আগে পাত পেড়ে দাও।

কিন্তু রমেন রুখে দাঁড়াল। বলল, আগে যাবার কথা শোন। পরে খাবার কথা।

ঘাবড়িয়ে গেলেন ওরা দুজনেই। এমন কোথা যাবার কথা থাকতে পারে যার জন্য রাত দশটার পরেও খাওয়া স্থগিত রাখতে হবে।

বাঙালি জীবনে সবচেয়ে কাম্য বড় ঘটনা যে খাওয়া, আটপৌরে সংসারে এর চেয়ে বড় কথা যে আর কিছু নেই, তা এই যুগের দায়িত্বহীন ছেলেরা একেবারেই বোঝে না।

বাবা অবশ্যই মনে মনে নিজেকে বোঝালেন যে বুঝবে বাছাধন শীগ্‌গিরই, নিজের অন্ন নিজে উপায় করবার প্রয়োজন হলে আপনা থেকেই বুঝবে। বাপের হোটেল তো চিরকালের নয়।

মা-ও মনে মনে নিজেকে বোঝালেন বুঝবে বোকা ছেলে শীগ্‌গিরই, নিজের ঘর সংসার হলেই বুঝবে। মায়ের ঘরকন্না তো চিরকালের নয়।

তবু ওরা সংসারে অভিজ্ঞ লোক। অনেক মার খেয়েছেন। পোড় হয়েছেন অনেক। কাজেই শান্ত মনে বললেন, সবই শুনছি বাবা। খেতে বসে, খেতে খেতে বলো। রাত অনেক হল।

তারপর রমেন যে কাহিনি বলল তা শুনতে শুনতে আর তার সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে রাত যে কত হয়ে গেল তার হিসাব ছিল না।

রমেন যা বলল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু হল এই।

বিকালে নিত্যকার মতো গড়ের মাঠে খেলা দেখে সে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। গ্র্যান্ড হোটেলের কাছাকাছি চওড়া চৌরঙ্গি পার হবার সময় হঠাৎ চাপা পড়ল, বাচ্চা চাপা পড়ল বলে একটা রব উঠল। কোনও দিকে না তাকিয়ে, নিজের কথা না ভেবে সে সামনে ছুটে গিয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে মোটরের প্রায় তলা থেকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারে নি। মোটরের বামপারের ধাক্কা লেগে সে ছিটকিয়ে

পড়ল।

ততক্ষণে মারমুখী জনতা গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। আর দূরে দেখা গেল যে পুলিশও ছুটে আসছে। হয় ভিড়ের উপর লাঠি চালিয়ে সাহেব চালককে বাঁচাবে। না হয়, তার নম্বর প্রভৃতি নিয়ে থানায় নিয়ে যাবে।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে সে ছুটে মোটরের সামনে এল। সাহেবকে ইংরেজিতে বলল—শিগ্‌গির আমায় হাসপাতাল নিয়ে যাচ্ছেন বলে মোটরে তুলে নিন। না হলে হয় জনতা, না হয় পুলিশ নির্ঘাৎ গোলমাল বাধাবে।

বিদেশী চালক একেবারে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এতদূর যে গড়াবে তা তিনি মোটেই আন্দাজ করতে পারেন নি। শুধু বাচ্চাটা হঠাৎ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটার ফলে চাপা পড়তে যাচ্ছিল আর এই যুবক নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়েছে, এটুকু তিনি বুঝেছিলেন। সেজন্য তিনি যুবককে তুলে এনে ধন্যবাদ দেবার জন্য গাড়িও থামিয়েছিলেন আর ততক্ষণে এ কি মহামারী কাণ্ড তাকে ঘিরে।

কিন্তু তার পরে যে কী হতে পারত এবং এই অচেনা তরুণ তাকে যে কী রকম প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়ে সেই ঘটনার সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়েছে তা বুঝতেও তার সময় লাগল না। মোটরটা আবার চালিয়ে এগোতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে আরম্ভ করলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের মানুষের মুখের চেহারা চেনা কোনও ইংরেজের পক্ষে শক্ত নয়।

ততক্ষণে রমেন গলা উঁচু করে চেঁচাচ্ছে, পি.জি. হসপিটাল এই দিকে, এই দিকে। মোটর সামনের দিকে নিয়ে চলুন। আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

রাগে আর ইংরেজের প্রতি বিরাগে টগবগ করে ছুটে ওঠা দুর্দান্ত ভিড় তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে দিল।

দূর থেকে যে পুলিশ সার্জেন্টের দল রাজার জাতের প্রতিনিধিকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে আসছিল তারাও এই অবস্থা দেখে আর এগিয়ে গেল না।

পরিস্থিতিটা সব দিক দিয়ে মিটে গেল।

শুধু মিটল না এই বিদেশীর কৌতূহল। তিনি মোটর চালাতে চালাতে বার বার রমেনের মুখের দিকে তাকালেন। সেখানে কোনও আত্মতৃপ্তি বা উদ্ধত বাহাদুরির লেশমাত্র ছাপ নেই। যেন বিশেষ কিছুই হয় নি। যেন এরকম অবস্থায় একটা বাচ্চাকে আর একজন রাজার জাত ইংরেজকে রক্ষা করতে ছুটে আসা সমান ভাবেই স্বাভাবিক। আর ওর কাছে প্রত্যাশিত।

একটু দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এসে রমেন নেমে যেতে চাইল। বলল, এবার আমি নেমে যাই। আর আপনিও যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে যান, পথে আর কোনও হামলার আশংকা নেই।

তিনি বললেন—ওয়েল মাই বয়—তোমায় আমি ধন্যবাদই যে শুধু দিচ্ছি তা নয়। আমি তোমার সম্বন্ধে একটু কৌতূহলী হয়ে উঠছি। লাইভ ইয়ুথ, একজন জীবন্ত যুবকের সন্ধান পেলাম। হোটেলে এসে খানিকক্ষণ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললে আমি খুশি হব।

এই পর্যটকের ডাক খোলা পথ যার সাথী তার কাছে ফেলনা নয়। রমেন খুশি মনে কিন্তু কোনও বাড়াবাড়ি আগ্রহ না দেখিয়ে রাজি হল। তার চরিত্রের ভারসাম্য দেখে লন্ডন ইয়ুনিভার্সিটির এই প্রবীণ সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যক্ষ বিশেষ চমৎকৃত হলেন।

সে সময়ে সারা দেশ ইংরেজ প্রভুর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। দেশের যুবশক্তি বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজাচ্ছে এহেন সময় এরকম একটি যুবক মারকাটারি স্বদেশী মার্কা হলে তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করত। আর চাকরির খোঁজে বেকার হলে সাহেব মুরুব্বি লাভের আশায় লাফিয়ে উঠত। রমেন সে সব কিছুই না করে শুধু সংক্ষেপে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমার ইচ্ছা আছে জানতে যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে একজন টুরিস্ট ইংরেজ কী ভাবেন। তাই আপনার সঙ্গে যেতে আমি রাজি আছি। আপনার মতামত নির্ভীক নিরপেক্ষ হবে।

সাংবাদিক বিভাগের অধ্যক্ষ কিন্তু রমেনের মনের সংবাদ অনেক কিছুই পেলেন। এবং এই দেশে এমন ছেলের পথ কত ছোট, তার ভবিষ্যৎ কতটুকু সবই বুঝতে পারলেন। এবং ভাবলেন যে এমন একটি খাঁটি মানুষকে তিনি সাধ্যমত সুযোগ দিলে আজ বিকালে যে মহা উপকার করেছে তার ছোট একটা প্রতিদান দেওয়া হবে। দৃষ্টিভঙ্গি আর মানসিক গড়নে সে জার্নালিজমের উপযুক্ত ছাত্র হবে নিঃসন্দেহে।

লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে একটা ছোট বৃত্তি সমেত বিনা বেতনের সীট নিজের বিভাগে দেওয়া তার পক্ষে খুব সহজ। তার বহু বছরের বন্ধু যে বাঙালি ভদ্রলোকের মোটর নিয়ে তিনি নিজে ড্রাইভ করে কলকাতা

বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তিনি এমন একটি সংঘের কর্মকর্তা যেখান থেকে প্রতি বছর দুটি কলকাতার ছাত্রকে বি.আই.এস.এন. কোম্পানির জাহাজে কলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় পড়তে যাবার জন্য টিকিট দেওয়া হয়।

অধ্যাপক নিজেই তার এ দেশীয় বন্ধুর সঙ্গে প্যাসেজ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন। রমেন কি পারবে এই অফারটা নিতে? বাবা মাকে বুঝিয়ে, বিলেতে পড়তে আসতে? আর বৃত্তির টাকা ছাড়াও সামান্য কিছু বাড়তি টাকা মাঝে মাঝে দরকার হলে তারও ব্যবস্থা করতে?

রমেন চুপ করে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল উচ্চাকাঙক্ষার আকাশের চাঁদ হাতে এসে ধরা দিচ্ছে। কিন্তু অন্য দিকে হতাশা আর বেকারির পাতাল তার অতল গহ্বর নিয়ে পায়ের কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে। সে ভাবতে লাগল। এতক্ষণ পরে এই প্রথম তার মন উদ্বেল হয়ে উঠল। প্রায় নাটকীয়তায় ভরা একটা অনুভব।

প্রফেসার বললেন, মাই ডিয়ার ল্যাড। তুমি ভাববার জন্য সময় নাও। আমি তিনদিনের জন্য দার্জিলিং যাচ্ছি। পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের উপর সূর্যোদয় দেখতে। তারপর তুমি আমায় জবাব দিয়ো। কিন্তু পাকা কথা চাই। হ্যাঁ কিংবা না। যে ফাউন্ডেশান এই বৃত্তি দেবে তার জবাবের অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত রমেন মৃদু স্বরে কিছু দৃঢ় ভাবে বলে—স্যার আমিও জীবনে সূর্যোদয় দেখতে চাই।

॥ ৫ ॥

বাঁশরি বাজায়ে চলে যায়।

সেই বাংলা গানের রেকর্ডটা রমেনের মনে পড়ল। তার মন মাতিয়ে রাখা সুর দুটো বছর বিলেতে পড়াশুনা করে এখন কথায় কথায় সে বাংলার বদলে ইংরেজি জিভের আগায় এসে পড়ে। সে নিজের মনেই বলে উঠল—হন্টিং মেলডি।

না। সে নিজেই ভাবল সে ঠিক হল না। এই গীটার ধ্বনি তো চলে যাচ্ছে না। এ তো শুধু বাজছে না। এর মূর্ছনা মনের মধ্যে তুলছে প্রতিধ্বনি। বন্ধ ঘরের চার দেওয়ালে ঘুরে ঘুরে সামনের ওই কমলার কলিগুলিকে স্পর্শ করে যাচ্ছে।

তারপর কমলা ফুলের সৌরভ মেখে সে অশরীরী সুর ওর অন্তরে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। কিন্তু...

কিন্তু কে বাঁশি বাজায়?

নাটকীয় ভাবে তার বিদেশে আসার ব্যবস্থা যখন হয়েই গেল তখন সে তার পূর্ব বাংলার গ্রামে একবার গিয়েছিল। সবাই তাকে একবার দেখতে চায়। যেন এই বিলেত যাবার কথাটাই তাকে একটা নতুন মানুষ করে তুলেছে। প্রতিদিনের পরিচিত সেই রমেন নয়। অন্য কেউ। যে অনেকখানি প্রত্যাশা দিয়ে ঘেরা, বিস্ময় দিয়ে ভরা।

তার তরফ থেকে সে-ও দেশকে নতুন করে দেখল। এই নিস্তরঙ্গ নিভৃত গ্রাম্য জীবনকে তার আশ্চর্য চির চেনা মনে হল। এই নিস্তরঙ্গ নিভৃত গ্রাম্য লোককেই মনে হল কত আপন। কত গভীরভাবে জানা। নিবিড়ভাবে চেনা। যাদের ছেড়ে যেতে মায়া হয়। যাদের কাছ থেকে সরে আসতে মন সরে না। তবু এখন শুরু হবে তার অচেনার দিকে অভিযান। অজানার অভিসারে।

সন্ধ্যা এসেছিল ঝিঁঝির ডাক আর জোনাকির আলো নিয়ে। রাত্রি এসেছিল মাথার উপর তারার আকাশপ্রদীপ জ্বেলে। বাড়ির পুকুরের বুকে কুমুদ ফুল চাঁদের আলোয় হেসে হেসে ওকে সম্ভাষণ করেছিল। আপনজনের মতো।

আর সেই পুকুরপাড়ে বসে ঘাটু গানের দলের এক কিশোর সুরেলা কণ্ঠে গান করেছিল, কে বাঁশি বাজায়।

রাতে খাবার পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে ঘাটুগানের ব্যবস্থা হয়েছিল। রমেনের জন্য বিদায় অভিনন্দন। গ্রামের নবীন শিক্ষিত তরুণরা ভেবেছিল যে খাঁটি স্বদেশী গ্রাম বাংলার পল্লী গীতির নমুনা দিয়ে তাকে সম্বর্ধনা করবে। যেন বিদেশী অর্কেস্ট্রা আর নাচগানের হুল্লোড়ে দেশের আনন্দধারাকে সে না ভুলে যায়। তাদের সামান্য আর হঠাৎ ব্যবস্থার আয়োজনের মধ্যে ছিল এই রমেনের কাছে প্রায় অপরিচিত ঘাটু গান।

কে বাঁশি বাজায়।

রমেনও এই বদ্ধ ঘরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই গীটারের ধ্বনি শুনতে লাগল। কে বাঁশি বাজায়।

কমলা ফুলের মৃদু সৌরভ আর গীটারের ভেসে আসা রেশ এই রুদ্ধ ঘরে ওর মনের দ্বার খুলেছিল।

মন। সে মন নিয়ে রমেনকে এই দুটো বছরের মধ্যে বিলেতে মাতামাতি করতে হয়নি। সেখানকার উন্মাদনা-ঘেরা বসন্তের মাদকতা-ভরা যৌবনে মধুরের আমন্ত্রণকে সে অবহেলা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল। এই শতকের প্রথম দিকের বাংলা সমাজের ঠাণ্ডা বদ্ধ জলাভূমি থেকে সে যেন উত্তাপে আকুল সাগরবেলায় এসে পড়েছিল। বিশেষ করে ইউরোপের মাতাল করা গ্রীষ্ম ঋতুতে।

তবু চঞ্চলতা অনুভব করেও সে ব্যাকুল হয় নি। সামনে কর্তব্য। পিছনে বাবা মা দেশ। ডাইনে বাঁয়ে সামান্য বৃত্তি তার ফ্রি স্টুডেন্টশিপের বেড়াজাল। রেসের ঘোড়ার চোখ জোড়ার দু'পাশের ঠুলির মতো।

আর মেয়াদও খুব সামান্য।

এমন একাগ্রভাবে পড়াশুনার ফলে সেই অধ্যাপক খুশি হয়ে তাকে বলেছিলেন যে, তাকে উনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু এম. এ. পরীক্ষার জন্য একটা থিসিস তাকে পেশ করতে হবে। এবং তার জন্য নির্বাচিত বিষয় হল একটা অন্য দেশ সম্বন্ধে রিপোর্ট।

সেই হিতৈষী গুরু তাকে আরও বুঝিয়েছিলেন যে একজন ভারতীয় একটা ইয়োরোপীয় দেশ সম্বন্ধে রিপোর্ট পরীক্ষায় পেশ করলে সেটা বিশেষ আকর্ষণীয় হবে। আর পরীক্ষকরাও বেশি দাম দেবেন সেটার। জার্নালিজমে ফরেন করেসপন্ডেন্ট হওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর সহজে উন্নতির পথ। ভবিষ্যতের জন্য স্বর্ণতোরণ।

রমেন মৃদু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল, কিন্তু স্যার, আমি ইয়োরোপীয় জীবনের সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত হলাম কোথায়? কী করে এ সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য কিছু লিখতে পারব? পরীক্ষকদের নিজেদের দেশ ইংলন্ডের জীবন সম্বন্ধে যা কিছু লিখব তার মধ্যেই তাঁরা অনেক ফাঁক সহজে খুঁজে পাবেন। আর কন্টিনেন্টের কোনও দেশে গিয়ে অন্তত মাসতিনেক থাকবার, ঘুরে দেখবার পয়সা আমি কোথায় পাব? এর চেয়ে কম সময় থাকলে একটা নতুন দেশ সম্বন্ধে লেখা যায় না। আমেরিকান স্টাইলে 'ডুয়িং ইঞ্জিনিয়ার' মতো কিছু করলে তো চলবে না।

গুরু হেসে অভয় দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, রমেন, সে কথা আমি আগেই চিন্তা করে রেখেছি। তুমি যাবে স্পেনে। সব চেয়ে সস্তা দেশ। বিপ্লবের গণ্ডগোলে আজকাল টুরিস্টরা বিশেষ যাচ্ছে না ও দেশে। এই ডামাডোলের বাজারে আর সহজে চরে বেড়ানোর পথের বাইরে বলে তুমি যা লিখবে তাই আমাদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হবে। স্পেনের সম্বন্ধে আমরা হালে নতুন করে নজর দিচ্ছি।

রমেন গভীর প্রত্যয়ভরে গুরুর দিকে তাকাল।

তিনি ওকে আরও উৎসাহ দিলেন, আমি মনে করি যে এত অল্প সময়ে তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েট থিসিস দিতে যাচ্ছ বলে একটু গুণগত ঘাটতি থাকতেও পারে। সেটা কিন্তু অনেক বেশি পুষিয়ে যাবে, ওই দেশের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব দিয়ে।

আর...

রমেন কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু তার চোখে জগতের প্রশ্ন।

আর, তোমার জন্য একটা 'অ্যাসাইনমেন্ট'ও জোগাড় করেছি। প্রভিন্সিয়াল পেপার বটে, কিন্তু এই সাপ্তাহিক কাগজে তুমি সপ্তাহে মোটে একটা করে লেখা রিপোর্ট পাঠাবে। এই সাময়িক কাজের জন্য তুমি যা পারিশ্রমিক পাবে তাতে তোমার বাড়তি খরচ পুষিয়ে যাবে। তা ছাড়া...

রমেনের শুধু কথাটি না কয়ে আশ্চর্য হয়ে শুনে যাবার দিন।

গুরুগম্ভীরভাবে যোগ করে দিলেন—তাছাড়া এই কাজটি ভালোভাবে করতে পারলে ওটা প্রাদেশিক কাগজ হলেও ওই অভিজ্ঞতার দাম থাকবে অনেক। তোমাদের দেশের যে কোনও ইংরেজি ভাষার কাগজ তোমায় লুফে নেবে ভবিষ্যতে।

হায় ওরে মানবহৃদয়।

মুখে কৃতজ্ঞতা জানাবারও সময়টুকু নেই। দাঁড়াবার সময় যে নাই তা তো এ ঊর্ধ্বশ্বাসে অহরহ ছোটার দেশে সদা সর্বদাই মালুম হয়।

অধ্যক্ষ ওর মতামত জানাতে চাইলেনই না বলা চলে।

বরং ফস করে বলে ফেললেন, রেল স্টেশনেই বীমা কোম্পানির লোক হাজির থাকে। ট্রেনে উঠবার আগে একটা মোটা ইনসিওরেন্স স্টেশনেই করে নিয়ো। তার সেই ফর্মের একটা কপি তোমার বাবা-মার নামে দান করে অ্যাসাইন করে ওখানেই ডাক বাক্সে ফেলে যেয়ো। তোমার ব্যাঙ্কের ঠিকানা দিয়ে। যদি ইনসার্জেন্ট বিদ্রোহী সেনা বা সরকারি গার্ডিয়া সিভিল, পুলিশ বাহিনীর হাতে কোনও অঘটন ঘটে তার প্রথম ব্যবস্থা ওদের জন্য করা রইল। পরের ব্যবস্থা ব্যাঙ্কেই সব করে নেবে ঠিকঠাক মতো।

রমেন একেবারে নীরব। খুশিটা শুকনো, কিন্তু চোখ দুটো নয়। কৃতজ্ঞতা না অনিশ্চিত ভয় কোন্‌টার ফল তা ঠিক বোঝা গেল না।

ওর মুখের ভাব দেখে অধ্যক্ষ হেসে উঠেছিলেন। বলেছিলেন—বোকা ছেলে, তোমার প্রিমিয়ামের পাউন্ড গুলোই যে জলে যাবে তাও বুঝতে পারলে না। আরে, তোমার গায়ের রঙ আর চেহারাই যে তোমার পাসপোর্ট। অব্যর্থ রক্ষা কবচ।

সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনই সন্দেহ ছিল না।

ফ্রান্স আর স্পেনের সীমান্ত পর্যন্ত সে রাতের ট্রেনে এসেছিল। প্যারিস থেকে সুদ এক্সপ্রেস অর্থাৎ দক্ষিণাপথ এক্সপ্রসে ইয়োরোপের সাধারণ থার্ডক্লাস কামরায় এসেছিল। অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। আরামদায়ক গদি মোড়ানো আসন। পিঠ ঠেস দিয়ে গদিতে মাথা রেখে বসে বসেই বিনা অসুবিধায় সেনট্রাল হিটিং করা কামরায় রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়।—

সব রাতের আর লম্বা পাড়ির ট্রেনেই থার্ড ক্লাসেও এত সুব্যবস্থা।...

কিন্তু রাতে ভ্রমণ করলে দেশ দেখা হয় না। হয় না লোকের সঙ্গে মেলামেশা আলাপ আলোচনা। অথচ দিনের নিকট-পাল্লার ট্রেনে স্পেনে থার্ড ক্লাসে গদির ব্যবস্থা নেই, নেই শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার মতো হিটিং গরম করার ব্যবস্থা। গাড়িগুলি নড়বড়ে। গেঁয়ো হিস্পানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গয়ং গচ্ছ ভাবে চলে।

কিন্তু রমেনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে সেই মানুষগুলি আর তাদের জীবনযাত্রা।

তাই সে স্লো ট্রেন নিয়ে দিন দুপুরে সব সহযাত্রী-যাত্রিণীদের সঙ্গে ভাব করতে করতে চলল।

বুদ্ধি করে সে একটা স্টেশনে কিছু কিউরিয়ো আর স্ন্যাক্‌স কিনে নিয়েছিল, তাদের মধ্যে সেগুলি বিলিয়ে দিতেই তারাও খুশি হয়ে এগিয়ে গেল। নিজেদের লাকড়িমার্কা সসেজ আর গ্রামের হাতে তৈরি লাল মদ ওকে দিল। ওই সতেজতার চীজ, গাছের ডালের মতো রুটি আর লাল মদ, সব শেষে কফি—রাজ-রাজড়ার ভোজ কোথায় লাগে।

ওরা তো গেয়েই উঠল—

ও মরেনো মিয়ো,
ও আমিগো।
ওগো আমার বাদামী বর্ণের বন্ধু। প্রিয় বন্ধু।

সুরের প্রতিটি ঝংকারে সহযাত্রিণীরা আসর দিতে লাগল। ওলে ও ওলে। ওলো তোরা শোন, শোন আমাদের বাদামি বন্ধুর রূপকথা। ও আমিগো। ও গো প্রিয় বন্ধু।

সেই বন্ধুত্বের জের সারা দুপুর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় মাদ্রিদ পর্যন্ত চলল। পথে যারা নেমে গিয়েছিল, তারাও মধুর ভাবে বলেছিল—আদিয়স, আদিয়স।

রমেনের মনে হয়েছিল ওরা বলছে, বিদায় নয়, তুমি আবার এসো।

সহযাত্রী যারা মাদ্রিদে নামল তারা স্টেশনে সোরগোল তুলে হোটেলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষণিকের বিদেশী বন্ধুর জন্য একটা বেশ বড় হোটেলে খুব সস্তা দরেই ঘরও ঠিক করে দিল।

হোটেলের লোকটি মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানাল, দেশী লোকের চাপে পড়ে সে বিদেশীকে দারুণ কনসেশন দিয়েছে। ন্যায্য দরের মাত্র সিকি ভাগ চার্জ করবে। যদি এখন সিনর অনুগ্রহ করেন...।

রমেন হাতে চাঁদ পেল। তার বাজেটের চেয়ে কম খরচে এই ভালো হোটেল, এত বড় পাড়ায়।

এবং ঘরে পৌঁছেই সে আরও যা পেল তা তো ভাষার মধ্যে ধরা ছিল না।

মধুর চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ ছড়াচ্ছে কার গীটারের ধ্বনি? কোন্ নবদম্পতির স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে এই কমলা কলির সুরভি? আমার জীবনে একি স্বপ্নের সঞ্চার? এই ঘরে? পাশের ঘরে? অন্তরে বাহিরে।

এ দিকে রিসেপশন থেকে যে অ্যাটেনডেন্টটি সুটকেস বয়ে এনেছিল সে দক্ষিণা হাতে নিয়ে উৎসাহে হেসে জানিয়ে গিয়েছিল যে ব্যাংকোয়েট হলে পাঁচ নম্বর টেবিলে তার জন্য খানা পরিবেশন করা হবে।

কমলার সৌরভ আর গীটারের ঝংকারে তন্ময় রমেন মানা করতে পারেনি। এখন রেস্তর কথা ভেবে সে নিরস্ত হবে কেমন করে?

কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হয়। বাথরুমে প্রচুর গরম জলের মধ্যে বাথটবে শুয়ে আর তার পর ঝরনা কল অর্থাৎ শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে তার মনে নানারকম সম্ভাবনার কথা উদয় হল। সে যদি এখন হোটেল রেস্তোরাঁয় পাঁচ নম্বর টেবিলে গিয়ে না খায়? হয়তো ওই পরিচালকের আমন্ত্রণ ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে নি এই অজুহাতে সে না খেলেও খাবারের দাম দিতে হবে।

আবার এত রাতে বাইরে গিয়ে সস্তার রেস্তোরাঁ অথবা টুরিস্ট মেনু যদি খুঁজে বের করতে না পারে তাহলে রাস্তার বিস্ট্রো অর্থাৎ সস্তার হরেক খাবার জিনিসের দোকান থেকে কিছু মামুলি জিনিস খেয়ে প্রায় আধপেটে অসহায়ে বাকি রাতটুকু কাটাতে হবে।

তার চেয়ে বেশি মুশকিল হয় যদি সে আধপেটা খেয়ে হোটেলে ফিরে এসেই ভরপেট ভোজের বিলটি হাতে হাতে পায় নিজে হাতে সই করে দেবার জন্য। স্টেশনে সহযাত্রী এই দেশের দরদী লোকদের দরদামের কল্যাণে এত সস্তায় ঘর সে পেয়ে গিয়েছে। তার কাছ থেকে এখন অন্যান্য আইটেম ন্যায্য দাম উসুল না করে এরা ছাড়বে কেন?

ভেন্ডেটা অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়া যে এদেশের একটা অভিজাত প্রতিষ্ঠান। মর্যাদার ব্যাপার।

মৃদু মন্দ পায়ে দুরুদুরু বুক নিয়ে রমেন চলল অভিসারে। অভিসারে শ্রীমতী চলেছে। 'অভিসারে' কথাগুলি রমেন নিজেকেই শোনাল বারবার ব্যাংকোয়েট হলের অভিমুখে যেতে যেতে। বুকে বল ভরসা জোগাচ্ছে না যে, কাজেই কবিতা আউড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে হচ্ছে।

ফ্যাসাদে পড়ে ফেঁসে যাতে না যেতে হয়—তার জন্য একটা মানসিকতাকে বলে একসারসাইজ অথবা প্রস্তুতি বা মহড়া।

ইয়োরোপে আসবার আগে রমেন একটি খুব ভালো জিনিস শিখেছিল। ভদ্র আর মিষ্টি ব্যবহার। সে নিজেকে সব সময় বোঝাত যে এই ব্যবহার ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যানার্স, সেটা হচ্ছে অংক শাস্ত্রের শূন্যের মতো। নিজে থেকে শূন্যের কোনও মূল্য নেই, কিন্তু তার সহায়তা নিলে তার সব কিছুরই দাম অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।

সেই ম্যানার্সের মহিমা তাকে কলকাতার সেঁত পথের দুর্ঘটনা থেকে বিলেতের রাজপথ বেয়ে এই ঐতিহ্য আর রহস্যে ভরা দেশে এগিয়ে আসতে সুবিধা করে দিয়েছে।

তারই কল্যাণে সে এই দেশের অদেখা রোমান্সের গভীরে অবগাহন করবে। সে শুধু পরদেশী একস্ট্রানহেরো নয়, পরদেশী রস ও আত্মার সন্ধানী হয়ে এসেছে। মার্কিন ইংরেজি ভাষায় 'দি স্পীকার' সন্ধানী কথাটার একটা মায়াময় ব্যঞ্জনা আর সুরে ভরা গুঞ্জন আছে। তরুণের মুখে অরুণিমা ফুটে উঠল।

রমেন ভাবতে লাগল। অথির বিজুরির মতো চিন্তার লহরি মনে খেলে গেল।

হ্যাঁ, আমি অবস্থাহীন হতে পারি। আমার পকেটে আরশোলা ডন মারতে পারে। কিন্তু শিল্পরসিক মাদ্রিদের একটা নামী হোটেলের সাজানো ব্যাংকোয়েট রুমে ভোজন উৎসবে যোগ দিতে এসেছি। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

রমেন যেন শ্যামবাজারকে সম্বোধন করে বলছে।

মোটেই নয়, মশায়।

অন্তত এই দেশে নয়। এই মাদ্রিদে নয়।

কারণটা কি তা সে নিজেকে মনে মনে সমঝাল। এই মাদ্রিদে এদেশের সব চেয়ে বেশি দামি ও নামী রাজদরবারের চিত্রশিল্পী ভেলাসকেথ কার ছবি এঁকেছিলেন, জানেন মশায়রা? একটি শতছিন্ন পোশাক পরা কপর্দকহীন ভিখারির। তার সেই রঙিন অয়েল পেইন্টিংটি কালই সকালে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রশালা এখানকার প্রাদো মিউজিয়ামে দেখে আসতে আজ্ঞা হয়।

এই কথা ভাবতেই তার মাথা উঁচু হয়ে উঠল।

সেই উঁচু মাথাটি কিন্তু সে মিষ্টি মোলায়েম হাসিমাখা ভদ্রতায় নিচু করল। ব্যাংকোয়েট হলে যারা ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে খেতে বসেছিল তাদের সকলের দিকে সামান্য একটু হেলিয়ে দিল। বিদেশী তরুণ এসেছে, আপনাদের সকলকে সপ্রেম নমস্কার পাঠাচ্ছে। এমনি একটা ভাব।

এই ভাবটা লন্ডনের কোনও বড় রেস্তোরাঁ বা হোটেলে অপ্রয়োজন হত। সম্ভবত অলক্ষিত থেকে যেত।

কিন্তু এখানে সঙ্গে সঙ্গে সে উষ্ণ সাড়া পেয়ে গেল। নম্র ভদ্রতার পুরস্কার।

যারা যারা লক্ষ করেছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদানে মাথা নোয়াল। হাসিমুখের মৌন অভ্যর্থনা জানাল। একটু খুশির আমেজে এই হোটেলের গীটার বাদক টেবিলে টুং টাং শুনিয়ে বাজাচ্ছিল। সে রমেনের টেবিলে এসে একটা উচ্ছ্বসিত ঝংকার তুলল।

বেচারার কৃচ্ছ্রসাধনের গোনা গাঁথা কড়ির মধ্যে পেট ভরানোর প্ল্যানটি কোথায় উড়ে গেল।

সে ভেবে রেখেছিল যে রাস্তায় নেমে গা ঢাকা দিয়ে একটা সস্তার ট্যাবের্নাতে ঢুকে পড়বে। সামনের যে ঘরটাতে ওয়াইন পর্ব চলে সেটা যেন নেই বা সেখানে জায়গাই নেই এমন একখানা কবি কবি ভাব দেখিয়ে পেছনের ঘরের যে কোনায় কয়েকটি খাবার টেবিলে ঠাসা রয়েছে সেখানে গিয়ে বসবে।

খাবারের দামটাই হবে সেখানে খুব নিচু স্তরের, কিন্তু মানদণ্ডটা নয়। আর পুরো ডিনারেব অর্ডারও দিতে হবে না। প্লাতো কম্বিনাদো অর্থাৎ যা কিছু পদ ওই ট্যাবের্নাতে সেদিন মজুদ আছে তারই পাঁচমিশালি থালা নিয়ে সস্তা বাঁধা দরে পেট ভরিয়ে আসবে।

শুধু তাই নয়। যদি দামটা নেহাত সস্তা হয় তার সরাইটা বেশি দূবে না হয় তাহলে সেখানে রোজ খাবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে রেটটা পারে তো একটু কমিয়ে নেবার চেষ্টা করবে।

তার বদলে এ যে রাজসমারোহ হয়ে গেল।

একবার ধর্মতলার মোড়ে হলিউড কাফের সেই অ্যাডভেঞ্চারটার কথা মনে পড়ে গেল। বন্ধুদের মধ্যে একজন সেদিন সেই বছরই চালু কাবুলি স্যান্ডাল পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। বেশ মোটা উঁচু গোল, ঝকঝকে, পালিশ, গ্লেস চামড়া। তার উপর ভেলভেটের লাল টুকটুকে একটা গোল ফুল। বন্ধুটি বেজায় স্মার্ট কিনা। খাস প্রেসিডেন্সি কলেজের ইডেন হিন্দু হোস্টেলের মাল।

পায়ের কাবুলি গরম তার মাথায় চড়েছিল। সেই সন্ধ্যায় সে বলেছিল—দ্যাখ, আজ একটা ভীষণ কিছু করে ফেলতে প্রাণ চাইছে। মানে শুধু চাইছে না, একেবারে আকুপাকু করছে। এই স্যান্ডালের রঙটা হচ্ছে শ্যাম্পেনের রঙ, আর তার ক্রাউনিং গ্লোরি ফুলটা হচ্ছে ভ্যাঁ রুজের রঙ। চল, ওই হলিউড ক্যাফেতে একটা কেবিনে গিয়ে হ্যাম আর রেডওয়াইন নিয়ে বসা যাক্।

তখন সবে আরম্ভ ত্রিশের শতক। গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহ তখনও চলছে। তার মধ্যে এহেন দুঃসাহসী একটা প্রস্তাব ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

কিন্তু পদ্মা পার হয়ে এসে যে কাবুলি স্যান্ডাল পায়ের তলায় পেতেছে, তাকে রুখবে কে? বিশেষ করে রেস্ত যখন তার।

অন্যান্য বন্ধুরা একটু আপত্তি তুলেছিল। রমেনের তো ভীষণ মুশকিল। রেড ওয়াইন? হ্যাম যদি বা হজম করা যায়, ওয়াইনের গন্ধ যে বাড়ি মাত করে তুলবে? বাড়ি ফিরতে হবে তো।

কিন্তু কাবুলি কলকাতিয়াকে নাহি ছোড়েগা।

'পড়েছি যবনের হাতে।
খানা খেতে হবে সাথে।'

শেষ পর্যন্ত রক্ষা করল রমেন চিকেন কাটলেট আর ভিমটো নিয়ে।

যবনের হাতে আবার সে পড়েছে এই মাদ্রিদের হোটেলে। বকের পালকের মতো নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা দস্তানা পরা হাতে গেয়ারসঁ অর্থাৎ বেয়ারা ভিনোর তালিকাটি সামনে মেলে ধরেছে। একেবারে বিগ্রহের সামনে নৈবেদ্যের রেকাবির মতো।

মাননীয় মহাপ্রভুর যে রস পছন্দ হয় তাই পরিবেশন করা হবে।

এদিকে রমেন তালিকার মধ্যে অনেকগুলির নামই জানে না। তাদের মাহাত্ম্যের পরিচয় সে কোথায়

পাবে?

কিছু সোমরস পছন্দ করতেই হবে। এ তো আর পথের ধারের রেস্তোরাঁ নয়। সেখানে বাইরে প্লেট গ্লাসের দেওয়ালের কাচের মধ্যে দিয়েই দেখে নেওয়া যায় যে পিছনে টাঙানো খাদ্য তালিকার মধ্যে শেষ লাইনে লেখা আছে ভ্যাঁ কম্‌প্রি অর্থাৎ মোট দামের মধ্যে মদের মূল্য ধরা আছে। এই টেবিলে বসে বিপদই হল। একটি বোতল আলাদা নিতে হবে। যতটুকু খুশি খাও। দামটি আলাদা এবং পুরো বোতলের।

ততক্ষণে বেশ রুচির পরিচয় দিয়ে সাজানো আরও বিপদ এসে হাজির হয়েছে।

টাপা।

চুটকি চাটের জমকালো খানদানী সংস্করণ হচ্ছে টাপা। সে পড়ে এসেছিল যে স্পেনেব সর্বত্র এই টাপার বার আছে। মদের বারের মতো। কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা লোকটি বিয়ার বা অন্য কোনও পানীয় পরিবেশন করছে, তার পাশে থরে থরে সাজানো টুকি টুকি সুটকির থালা। পছন্দ মতো বেছে নাও, তার দাম দাও। প্লাস দশ পার্সেন্ট দক্ষিণাটুকুও।

হয়তো একটা গোলাকার থালায় সাজানো সামুদ্রিক খাবার—চিংড়ি থেকে হেরিং আর একটাতে পনীরের টুকরো থেকে সার্ডিন মাছ। আরেকটাতে হ্যাম আর ব্রেন কাটলেট, লিভার প্রভৃতি হরেক রকম মাংসের কারদানি। হয়তো আরেকটাতে সাজানো ডিমের নানান কারবার, অমলেটের টুকরো থেকে ফুলের মতো কেয়াবি করে কাটা ডিমসিদ্ধ। কাঁকড়ার ডিম, কচ্ছপের মাংসের টুকরো, শেখ কাবাব এরাও বাদ যায় না। পিঁয়াজ, টম্যাটো, জলপাই, শশার কুচি এরাও টাপার টুপটাপ করে মুখে তোলার তালিকার মধ্যে সেজে গুজে আছে।

মুড়মুড়ে করে ভাজা ককটেল সসেজ কয়েকটা জলপাইয়ের সঙ্গে তুলে নেবে কিনা ভাবতে লাগল। এ দিকে মেথো অর্থাৎ ওয়েটার ওয়াইন লিস্টেব মধ্যে থেকে কোনও ওয়াইন বাছা হয় কিনা তা জানবার জন্য নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল।

হায়! হায়! ছোটখাট রেস্তোরাঁয় ভিনো ভিলা কাসা অর্থাৎ ঘবে তৈরি আর বোতলে পাকা ভাবে বন্ধ না করা সস্তা মদ পাওয়া যায়। এখানে তো সে সব বালাই নেই।

ইতিমধ্যে পাশের টেবিলে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল : সাত নম্বর টেবিল।

রমেন লক্ষ করেছিল যে সেই টেবিলে চারজন বসেছিল। দেখলেই বুঝতে দেরি হয় না যে সম্ভ্রান্ত একটি পরিবার। সম্ভবত হিস্পানি। বাবা, মা, ছেলে আর মেয়ে। বেশ হাসিখুশি। সম্পূর্ণতা আর প্রসন্নতার ভাব উপচে পড়ছে।

সেই টেবিলের দিক থেকে একজন ওয়েটার মিনার কাজ করা একটা টুকরি করে ওর কাছে নিয়ে এল একটা শ্যাম্পেনের বোতল। বেতের নয়, হিস্পানি কোনও ধাতুর তৈরি টুকরিতে বরফে ডোবানো বোতল। সঙ্গে একটি ভিজিটিং কার্ড আর ছোট একটি মনোগ্রাম আঁকা কাগজের স্লিপ।

তাতে খুব সৌজন্য দেখিয়ে ইংরেজিতে লেখা আছে যে. এদেশের নূতন অতিথিকে তিনি একটু সামান্য পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। গ্রহণ করলে সপরিবারে তিনি খুব সুখী হবেন।

আড়চোখে একবার ওই টেবিলের দিকে রমেন তাকাল। তার রেস্তর আকৃতির সম্বন্ধে সন্দেহ করে এই ভদ্রতাটুকু করছে না তো?

সম্ভবত নয়।

এই হোটেলে যারা থাকতে আসে তারা মোটেই সাধারণ অবস্থার লোক হবে না। স্টেশনে যে চুলচেরা দরদাম করা হয়েছিল সে খবর তো এরা জানে না। নিজের পরনে রয়েছে লন্ডনের কাটা স্যুট। সেটার অভিজাত ধাঁচ আর সুদৃশ্য কাপড়, রুচি, তার ভালো অবস্থারই স্পষ্ট পরিচয় দেয়। গোটা ইয়োরোপে এত সস্তায় এত ভালো স্যুট তৈরি হয় না।

তবে? তবে নিশ্চয়ই নিছক সৌজন্য। হিস্পানিরা তো আতিথেয়তা আর ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত। তাই হবে।

তবু রমেন মাথা নাড়ল। মুখে বলল, মুচাস গ্রাথিয়াস, প্রচুর গ্রাথিয়াস। প্রচুর ধন্যবাদ। কিন্তু অনুগ্রহ করে সহৃদয় উপহার দাতাকে ফেরত দাও।

প্রতিবেশী টেবিলে সহৃদয় পরিবার সেটা লক্ষ করল। নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলল।

তারপর মেয়েটি সলজ্জ হাসিভরা মুখে রমেনের টেবিলে উঠে এল। তাকে সবিনয়ে আর ফরাসি কায়দায় ভদ্রতা আর নম্রতা দেখিয়ে ওদের টেবিলে এসে ওদের সঙ্গে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করল।

ত্রস্তপদে ব্যস্তভাবে রমেন উঠে দাঁড়াল। মুখোমুখি, সামনাসামনি।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি আবিষ্কারের আশ্চর্যে ভরা উপস্থিতি। যার মধ্যে অতীত যায় মুছে। বর্তমান যায় ভরে।

আর ভবিষ্যৎ?

॥ ৬॥

মেয়েটির দিকেই তাকাচ্ছিল রমেন বার বার।

যখন তাকাচ্ছিল না তখনও মন যেন চোখ মেলে ওকে দেখতে চাইছিল।

চোরা চাহনি চলবে না। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে সেটা অসভ্যতা। সোজা তাকিয়ে দেখো, কিন্তু অপলকে নয়। অন্তরে বিহ্বল হয়ে যাও। কিন্তু বাহিরে বিবশ হয়ো না যেন।

বেচারি রমেন?

তার দোষ কী? বিংশ শতাব্দীতেও কলকাতা আর মাদ্রিদের মাঝখানে যেন একটা অতলান্তিক মহাসাগর। এমন কি লন্ডন প্যারিস আর এই মাদ্রিদের মধ্যেও তেমনি একটা মহাসিন্ধুর ব্যবধান সে অনুভব করছে।

ইসাবেল মেয়েটি যেন একটি ইনফ্যাটা অর্থাৎ হিস্পানি রাজকন্যা। সহজ সরল প্রাণের আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন আনন্দ লন্ডন প্যারিসের শত নৃত্য-চঞ্চলতার মধ্যে সে দেখতে পায়নি।

'ভাসা তস্য বিভাতি সর্বমিদম্।' কথাগুলি রমেনের অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এল। কোনও প্রেমগাথার কলি নয়, কোনও কবির ভালোবাসায় রাঙানো কথা নয়, একেবারে উপনিষদের বাণী। যাঁর আলোকে এই সব কিছুই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁরই আলো এই তরুণীর মুখে ফুটে উঠেছে।

আর সেই আলোতে সব কিছুই আলোকিত। মনে পড়ল বেদে উষার বর্ণনা। 'তা ইন্দ্রেব সমনা সমানীরমীত বর্ণা উষশচরন্তি।' রূপবতী অপরিবর্তিত, বর্ণময়ী, দীপ্ত শুদ্ধকান্তিপূর্ণ তার দেহ। সে হচ্ছে উষা। ইসাবেলই সশরীরে উষা।

প্রেম নয়, প্রণয় নয়, রূপের আভাস নয়, ভূমার উদ্ভাস।

ব্যাংকোয়েট হলে ডাইনিং টেবিলের সামনে একটি জলজ্যান্ত তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে ভূমার আবেশে অভিভূত থাকা যায় না।

যতই অনির্বচনীয় লাগুক ওর আয়ত দুটি চোখ। যতই অভিভূত করে ফেলুক ওর স্বভাবসুন্দর অকৃত্রিম হাসি। যতই ওর উপস্থিতিতে মনে হোক যেন সামনে প্রসারিত অনন্ত একটি নিষ্কলঙ্ক তুষার প্রান্তর। রমেনকে সামাজিক প্রাণী হিসাবে চলতে হবে।

পরিচয়-পর্ব শেষ হল। শুরু হল আহার।

আহারের চেয়ে বড় হচ্ছে পান।

পানানন্দের প্রাণ হচ্ছে তার পরিবেশে। এ রসের রসিকরা রমেনকে নিরেট বর্বর বলে নাম দিয়েছিল। কারণ সে এই রসের বিশেষ কিছু বুঝত না। বিলেতে শীতে যখন তারা সবাই রসিয়ে রসিয়ে উষ্ণ আমেজে নিজেদের তারিয়ে নিত তখন যদি বা কখনও সে একটু ওয়াইন নিয়ে বসত তাকে দেখে মনে হত যে সে নিমের পাঁচন পরখ করে দেখছে।

পাঞ্চ পর্যন্ত নয়, স্রেফ পাঁচন।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা ওর আশা ছেড়ে দিয়েছিল। ড্রিংকের জন্য আর ডাকাডাকি করত না।

কেবল একবার একজন পানরসে নতুন দীক্ষা নিয়ে ওকে বলেছিল—কথায় আছে যে একোয়া পিউরা অর্থাৎ নির্মল জল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পানীয়। কিন্তু এদেশে এসে আমার পাপের বোঝা এত ভারী হয়ে যাচ্ছে যে পুণ্যে ভরা পানীয়ের অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। কী বল হে রমেন?

বলেই সে রমেনের কাঁধ বেশ মুরুব্বির মতো হাসতে হাসতে চাপড়িয়ে দিয়েছিল।

রমেন কিন্তু কথার উত্তরে কথা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য রকম যুক্তি দেখিয়েছিল।

সে বলেছিল—ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের পূজনীয়রা, বৈদিক পুরোহিতরা দেবতাকেই সোমরস অফার করত। আমি কোন্ পুণ্যবান্ মহাত্মা বটে যে আমায় কিনা তুমি তা অফার করবে? আমি সেই উপহারের যোগ্যই বা হলাম কোন্ সুবাদে?

হোপলেস, হোপলেস, রমেন তোর উপর এক ফোঁটা সস্তা বিয়ার পর্যন্ত অপব্যয় করা উচিত নয়। বলতে বলতে সেই নবীন রসিক তার নিজের গেলাসে মন দিয়েছিল।

আর এখন?

একেবারে শ্যাম্পেন। যে 'মোথো' ওয়েটার সবচেয়ে কুলীন মদ তার গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে তার হাতের দস্তানার শুভ্রতাও চেয়ে দেখবার মতো।

পিছনের দেওয়াল জোড়া একটা বিরাট অয়েল পেন্টিংয়ের ছবি সামনের ফ্রেমে বাঁধানো আয়নায় মোড়া দেওয়ালে দেখা যাচ্ছে। একেবারে নিখুঁত প্রতিবিম্ব। ভেলাসকেথের বিশ্ববিখ্যাত ছবি—দি টিপলারস্—পানরসিকের দল। মেঘমুক্ত আকাশের উজ্জ্বল পটভূমিকায় আনন্দ—পানানন্দ—যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সুরার দেবতা একটা কাঠের বাক্স মদ রাখার ড্রামের উপর বসে একজন সৈন্যকে উপহার দিচ্ছে। সেই সৈন্যের চারপাশে অনেক লোক, সাধারণ চাষাভুষো। তারাও দেবতার রসাল দয়া থেকে বঞ্চিত হবে না।

পণ্ডিতরা এই ছবিটি সম্বন্ধে লিখেছেন যে ইয়োরোপের এত সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশ আর কোনও ছবিতে নেই। আর সেই পরিবেশে এই সাধারণ মানুষগুলি স্বর্গসুধার প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত। সেই আনন্দের প্রকাশ এককথায় অতুলনীয়। পটভূমিকায় এই ছবিটি।

আন্তরিকভাবে নতুন অতিথিকে আমন্ত্রণ সেই চিত্রকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

অপরিচয়ের বহু দূর দেশের, সাত সাগর পারের বাধা ডিঙিয়ে একটা নিবিড়তার রং তাকে করে তুলেছে আরও মধুর। উজ্জ্বলে মধুরে মেশামিশি।

এমনিতেই বিদেশী টুরিস্টদের টানবার জন্য স্পেনের হোটেলে হোটেলে নতুন নতুন সাজসজ্জা। কিন্তু পুরোনো কালের আভিজাত্যের সৌন্দর্য দিয়ে তাতেই বিদেশীদের মন বেশি মজবে।

ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন বাড়ির অভ্যন্তরের রূপায়ণ করা স্পেনে খুব সহজ। প্রাচীন নক্‌শা আর ধরন-ধারনের একটা সুন্দর ঐতিহ্য আছে।

শোভন প্রাচীন ধরনের আসবাব দিয়ে সাজানো এই হোটেলের ড্রয়িং রুম। ব্যাংকোয়েট হলের দেওয়ালে একদিকে ওই বিরাট অয়েল পেন্টিং অন্যদিকে আয়নায় তার প্রতিফলন। অন্য দেওয়াল দুটিতে বনেদি ব্রোকেডের কিংখাবে মোড়া প্যানেলের পর প্যানেল। ঝাড় লণ্ঠনের ভিতর সাজানো মোমবাতির চূড়া থেকে বিজলী ঠিকরিয়ে সেই ব্রোকেডের উপর চকমক করছে।

সিনর পেপে রিবেরা নিজের গ্লাসটি সপ্রেমে তুলে বললেন—অ্যামেজিং শ্যাম্পেন। আশ্চর্য এই শ্যাম্পেন। আমরা এটি টোস্ট করব আমাদের নবীন অতিথির জন্য, হিয়ার্স টু...

সপ্রতিভ ভাবে রমেন বলল—এই শ্যাম্পেন টোস্ট ড্রিংক করার পক্ষে টু গুড, বড্ড বেশি ভালো। বিশেষ করে আমার জন্য।

পেপে-পরিবারের সবাই তাকে পেপে বলে ডাকছিল—বাধা দিলেন—না, না, তুমি আমাদের ভিন্‌দেশী অতিথি। সাত সাগরের ভাবাবেশ নিয়ে এদেশে এই রাতে হাজির হয়েছ। অতএব...

রমেন হাসি মুখে বলল—এত ভালো পানীয়ের সঙ্গে ইমোশান মিশিয়ে ফেলা কি ঠিক হবে? এর স্বাদকেই যেন তাতে উপেক্ষা করা হবে।

সিনরা রিবেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, অ্যাঁ। তুমি দেখছি একটি জলজ্যান্ত কবি। ইমোশন আর শ্যাম্পেনের ককটেল তৈরি করে ফেললে বেশ সুন্দরভাবে। হে আমাদের বাডিং পোয়েট, শ্যাম্পেনের প্রেরণায় তুমি মাদ্রিদে প্রথম নিশীথের সম্বন্ধে বোধ হয় একটা সুন্দর কবিতা লিখে ফেলতে পারবে।

সর্বনাশ।

বেচারি সাংবাদিকতার ছাত্র; আটপৌরে অবস্থার সাধারণ পরিবেশে মানুষ, বাঙালির ছেলে। আপনা থেকে যেটুকু কবিতা মনে মনে অনুভব করে আর লুকিয়ে লুকিয়ে রচনা করবার চেষ্টা করে তার বেশি সে কিছুই করেনি।

আর এই শ্যাম্পেনের মদিরা—মধুর ব্যাংকোয়েট হলে এই ভদ্রমহিলা তাকে কবি বলে সম্বোধন

করছেন। কবি বলে ভাবছেন।

ভাগ্যিস এই চার জনের টেবিলেই পঞ্চম ব্যক্তির ঠিক মুখোমুখি যে মূর্তিমতী কবিতাটি মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বসে আছে সে এই কথাটি বলেনি। তাহলে এই রবীন্দ্রনাথ পড়া তরুণের মল্লিকা বনের কী অবস্থা হত?

সে কোনও রকমে সলজ্জভাব দেখিয়ে বলল—আমি নেহাত ছাত্র কি না। তাই...

তাই যে কী হয় তা বলবার অবকাশ ভদ্রলোকটি দিলেন না।

খুব সপ্রশংস দৃষ্টিতে বললেন—বেশ আনন্দের কথা। তুমি ছাত্র—মানব জাতি তোমার স্টাডির একটা অঙ্গ নিশ্চয়ই। আমরাও এদেশে এসেছি এই দেশটা স্টাডি করতে। আর তোমাকে পেলাম একটা বাড়তি অধ্যয়নের বস্তু হিসাবে।

রমেন একটু যেন মনে মনে হতাশ হল।

সে এই পরিবারকে হিস্পানি বলে ধরে নিয়েছিল। এবং একটি সম্পন্ন হিস্পানি পরিবারের বিষয় ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি গতিবিধি প্রভৃতি ওর রিসার্চ আর রিপোর্টের সুবিধাজনক মালমশলা হয়ে উঠত। কিন্তু নাম আর চেহারায় তো দস্তুরমতো স্প্যানিশ। তবে কি সাউথ আমেরিকান এরা? আমেরিকার আধুনিকতায় দীক্ষিত?

আর সে জন্যই বোধ হয় একেবারে অচেনা ভিন্‌দেশীর সঙ্গে এমন দিলখোলা ভাবে মিশতে পারছে। এই রাজনৈতিক অশান্তির যুগে কোনও স্থানীয় হিস্পানি হয়তো এতটা কবত না। অন্তত এত বড় হোটেলে সবার সামনে নয়।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি। রমেন মনে মনে বুঝে নিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী কোনও হিস্পানি মেয়ে বিয়ের আগে পুরুষকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারত না। সমাজ ছিল এমনি কঠোর। ভারতবর্ষের চেয়েও। পর্দা নেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি হৃদয়হীন এই দূরত্বটুকু। এদের অনুরাগ-পর্ব আমাদের চেয়েও বেশি দুরূহ। প্রেমিক শুধু গীর্জায় গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারত। জানালার কারুকার্যখচিত লোহার গরাদের তলায় এসে ফেলতে পারত দীর্ঘশ্বাস। প্রহরী ছাড়া যে প্রেয়সী পথে বের হবে না।

হায়! প্রেম নিবেদনেরও ভাষা ছিল বাঁধাগতের চৌহদ্দিতে আটকানো। অনন্ত গুটি ছয় মাস ওইরকম মামুলি নিবেদন চালাতে হবে ধাপে ধাপে। একটুও ভুলচুক হলে প্রেয়সী ভাবতে পারে যে প্রেমিক যথেষ্ট পরিমাণে সত্যি সত্যি ভালোবাসে না। না হলে স্বরলিপির বাঁধাধরা সংকেত ভুলে যাচ্ছে কেন? সমাজের বিধিব্যবস্থা বড় কড়া। বাধা নিষেধের বেড়াজালে ভরা।

এমন কি এই ত্রিশের দশকেও। এই নতুন প্রজাতন্ত্র আর অশান্তিভরা ভাঙচুর সত্ত্বেও।

সেই পটভূমিকায় এই ভদ্রলোক তার ছেলে সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও মেয়েকে একজন অচেনা বিদেশীর টেবিলে পাঠিয়ে দিলেন কি না তাকে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের টেবিলে এনে খাওয়াতে।

রমেনের হিসাবে ভুল হয় নি।

পেপের হিসাবেও ভুল হয় নি। তিনি বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি ইন্ডিয়া ইংলেসার লোক। ইংলন্ডে পড়তে এসেছ। জানো? আমিও পেরু থেকে অক্সফোর্ডে পড়তে এসেছিলাম। তাই তোমায় ডাকলাম। যৌবনের ইংলন্ডকে একবার তোমার মধ্যে দিয়ে ঝালিয়ে নেব। সিনরা, ডন আর ইসাবেলও একবার ইংলন্ডে গিয়েছিল। শীঘ্রই আবার যাব ইলাটেরাতে বেড়াতে। তোমার মাধ্যমে ওদের শিক্ষাদীক্ষা মতিগতির সঙ্গে আরেকটা আগাম পরিচয় হয়ে যাবে। মন্দ কী?

বলেই তিনি গৃহিণীর দিকে হাসি ভরা চোখে তাকালেন। সিনরাও হাসি দিয়েই জবাব দিলেন।

কিন্তু রমেন বুঝতে পারল। ওর মাধ্যমে ইংলন্ডের গতিপ্রকৃতির পরিচয়টা আসল কথা নয়। অসহায় অনভিজ্ঞ বিদেশী ছাত্র বিব্রত বোধ করছে বুঝতে পেরে সহায়তা করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। তা ছাড়া কৌতূহল মেটাবার জন্য ওরা ভদ্রতা করেছেন। সম্ভবত আরও সহায়তা করবেন। কিন্তু পাছে এই যুবক তাকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে মনে করে সে জন্যই এই কথাগুলি ভদ্রলোক পেড়েছেন।

অক্সফোর্ডের শিক্ষা তো অন্যের মনের দিকে তাকিয়ে চলা, ওখানে ছাত্রজীবনের একটা বড় শিক্ষা।

সিনরা বললেন—তুমি তো ডনের বয়সি। তোমায় আমি রামন বলে ডাকব, কি বল?

রমেন খুশিতে ভরা সুরে বলল, সেটা তো আমারই আনন্দের কথা।

জানো রামন, তুমি যদি ডনের বয়সি না হতে তা হলেই শ্যাম্পেনের গ্লাস সম্বন্ধে তোমায় কী বলতাম জানো? বলতাম—মাই ডিয়ার পোয়েট, তুমি শ্যাম্পেনে মাতাল হলে তোমায় একেবারে চা-আ-র্মিং মনোমোহন দেখাবে।

পাশ্চাত্য সমাজ কি না। পিতা পেপে হাতের গ্লাসটি তুলে একটা টোস্ট প্রস্তাব করলেন—টু মাই আমাদা—আমার প্রেয়সীর প্রতি, যিনি একমাত্র লেডি, যিনি প্রমত্ত আর প্রকৃতিস্থ দুই অবস্থাতেই একই রকম চার্মিং থাকেন।

একটু থেমে গলার স্বর নামিয়ে এনে যোগ করে দিলেন—দুঃখের বিষয় তাকে এমত্ত অবস্থায় কখনও দেখতে পেলাম না।

পাশচাত্য সমাজ কি না। ছেলে আর মেয়ে দুজনেই খুশিতে উপচিয়ে পড়ল।

পাছে অচেনা বিদেশী ওদের ভুল বোঝে তাই ইসাবেল সামনের দিকে একটু মাথাটা ঝুঁকিয়ে কাছে এনে নিচু স্বরে বলল—আমাদের বাবা মা এত সুখী দম্পতি যে রঙ্গে রসে এমন কি মনান্তরের ব্যাপারেও ছেলেমানুষি করতে ছাড়ে না। দে আর এভারগ্রীন। চিরসবুজ ওরা।

রমেন উঠে দাঁড়াল। ওর হাতের গ্লাসের শ্যাম্পেন এখনও সে ঠোঁটে প্রায় ছোঁয়ায় নি। আলতো ভাবে একটু ছুঁইয়ে সে একটি টোস্ট ঘোষণা করল। টু দি রিবেরা পরিবার—বিশেষ করে পেপের প্রতি। এবং যাদের মনে মডার্নিস্মো মুভমেন্ট আধুনিকতাবাদ, জীবনে এস্থেটিক ভ্যালুজ সুন্দরের মূল্যায়ন, আর সর্ব কর্মে আনন্দের পরশ নিরন্তর বজায় আছে—ফর এভার অ্যান্ড এভার।

ইংলন্ডের কোনও বড় হোটেল হলে এই টেবিলে কী চলেছে তা অনেকের নজরেই আসত না। যাদের আসত তারাও না দেখার ভাণ করত। যারা ভালো করে নজর করত তারাও অন্যের এক্সোটিক উটকো কাণ্ডকারখানাকে উপেক্ষা করে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখত। ওদের চরিত্রের মধ্যে দূরত্ব, ব্যবধান, নোনা জলে ঘেরা দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা বেশি মাত্রায় প্রকট।

কিন্তু স্পেনের ব্যাপারই আলাদা।

এদের জীবন কেমন একটা—ঠিক রহস্য নয়—রোমাঞ্চে ভরা। এই এ ক'দিনেই রমেন পদে পদে তার আভাস পেয়েছে। এরা নিজেদের বাইরে প্রকাশ করে ফেলে অসংকোচে, এমন কী অকপটে।—

রমেন মনে করেছে যে, এরা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, মাটিতে গড়া মানুষ ধরণীর ধূলির ধন।

তা না হলে এই সন্ধ্যার এই পরিচয় এমনভাবে ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠছে?

আর প্রতিদিনের সামান্যতাকে পর্যন্ত এরা উপেক্ষা করে না। যেভাবে ওরা রমেনকে আপন করে নিতে চাচ্ছে যেন দিন যাপনের প্রাত্যহিক ব্যাপারের সঙ্গেও ওরা ওকে মিশিয়ে নেবে।

আপাতত এই টেবিলের চারদিকে অন্য টেবিলের ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা এসে জমায়েত হলেন।

কেন?

ওরা সবাই কী এমন এক্সাইটিং লোক, কী এমন মনের মাদকতায় ভরা যে রমেনকে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যক্তি মনে করেছে? এরা সবাই তো দেখছি জেন্টলমেন অ্যান্ড লেডিজ।

অথচ ওদেব জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এমন একটা টনটনে আভিজাত্যের অহঙ্কার আছে যার সম্বন্ধে বহু বিদেশী পর্যটকই সমালোচনা করেছে। হিডালগো অর্থাৎ একজন বনেদি হিস্পানি যেন সপ্তম স্বর্গের অধিবাসী। তার বাস হয়তো একটি মাত্র কামরা, বেশ হয়তো একটি মাত্র স্যুট। কিন্তু সে এমনিভাবে নিজেকে বয়ে বেড়াবে যেন নবাব খানজা খাঁর সাক্ষাৎ নাতি। বড় ইমারতে যেন তার নিবাস, তার বেশবাস যেন আসে লন্ডনের সবচেয়ে নামী দর্জিপাড়া স্যাভাইল রো-তে তৈরি হয়ে।

তার ফলে যেমন ওদের ক্ষতি হয়েছে অসামান্য, সামান্য কাজে কোনও মাথাওয়ালা বা বড় বংশের লোক হাত লাগাতে চায় নি, তেমনি স্বচ্ছলতা আর টাকাকড়ির গজ ফিতে দিয়ে মানুষের মহত্ত্বকে মাপতে যায় নি। হিস্পানি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র ডন কুইকসোট সেজন্য অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ গরিব হয়েও ডিউক কাউন্টদের সঙ্গে সমান তালে চলতে অসুবিধা বা দ্বিধা বোধ করে নি।

ঠিক আছে। আমি রমেন পাত্র ছিদাম মুদি লেনের নোনাধরা বাড়ির ঘুণে খাওয়া চৌকাঠ পার হয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেছি। তোমাদের মাদ্রিদ শহরের চৌরঙ্গি পুয়ের্তা দেল সলের খুব কাছে ঝকমকে হোটেলে এসে উঠেছি। আমার কৌলিন্য হচ্ছে ছাত্রের গোত্র দিয়ে, মি. পাত্রের পকেটের ছিটেফোঁটা

দিয়ে নয়।

রমেনের বুক বড় আর মাথা উঁচু হয়ে উঠল।

রিবেরা পরিবারের প্রতি টোস্টের ভাষা আর ভঙ্গি ব্যাংকোয়েট হলের সবারই নজরে পড়েছিল। কানে এসেছিল—

এমনিতেই ভিনদেশী বলে তার দিকে লোকে তাকাবেই।

তার উপর দেশের ভিতরে নানান অশান্তির জন্য টুরিস্ট আসা কমে গিয়েছে। অথচ সরকার প্রাণপণে দেশে ট্যুরিস্ট টানবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে হলেও এই হোটেলে আজ একজন মাত্র বিদেশী টুরিস্ট উঠেছে। তায় ইউরোপীয়ান নয় অথচ চালচলনে ইউরোপীয়দের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলে। স্বভাবতই সবাই ওকে কোনও না কোনও অছিলায় লক্ষ করছিল।

এমন সময় তার রুচিতে মোড়া ভাব আর কাব্য ভরা ভাষা ওদের সবাইকে আশ্চর্য করে দিল।

এস্টুপেন্ডো (স্টুপেন্ডাস), মারাভিল্লোসো (মার্ভেলাস) এই সব ভারী ভারী কথায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে করতে ওরা রমেনদের টেবিলে এসে জড়ো হল।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে রিবেরা পরিবার যেন গৌণ হয়ে গেল। এই বিদেশীই আসল ব্যক্তি এই টেবিলে, তার ভাষণ শুনেই এরা সবাই উল্লসিত হয়ে উঠেছে।

বিব্রত বিস্মিত রমেন একবার মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। ডনের পাশে বসানো বাড়তি একটা চেয়ারে সে বসেছিল। টেবিলের ওপারে বসে ইসাবেল। সেও আশ্চর্য হয়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঝলমল জমকালো মুখে দুটি চোখ রাত্রির মতো নিকষ-কালো, বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল আর মখমলের মতো মোলায়েম। আবার মনে মনে বলল বেদের উষার কথা—সামনা-সামনীর মিত বর্ণন। জ্যোতির্বসনা, আলোর আবরণে।

ধীরে ধীরে রমেন নিজের মধ্যে ফিরে এল। বুলফাইটের দেশে এসে সে যেন হঠাৎ নিজেই একজন বুলফাইটের মাতাদোর হয়ে গেছে। কোন্ আরব্যরজনীর জাদুকরের জাদুদণ্ডের স্পর্শে!

এখন তাকে, এই হোটেলের হঠাৎ অনুরাগী অপরিচিত অধিবাসীদের মোকাবিলা করতে হবে। ষাঁড়ের লড়াইয়ের রঙ্গভূমিতে কৃপাণ হাতে নায়ক যত লীলাভরে তার রক্তের মতো রঙিন চাদর আর রুপোর মতো ঝকঝকে তলোয়ার নিয়ে ষাঁড়কে নাচায় তার বেশিরভাগই হচ্ছে তার অনুরাগী ভক্তদের খুশি মেজাজে রাখবার জন্য। মাতাদোরের নাম আর জনপ্রিয়তার মূলে থাকে যতখানি রণনৈপুণ্য তার চেয়ে বেশি থাকে অনুরাগীদের অন্ধভক্তি।

রমেন হঠাৎ উচ্ছ্বাসের বশে একটা কাব্যময়, বাঙালিসুলভ বাণীতে বানানো টোস্ট ঘোষণা করে এদের প্রশংসা পেয়েছে। তাকে যে এখন ঠিক সেই চড়া স্বরে এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। মাতাদোরদের মতই।

কোথা থেকে কী সব হয়ে যাচ্ছে। দুঃসাহসী তরুণের সামনে দুয়ার খুলে যাচ্ছে একটার পর একটা। মনে পড়ল ইংরাজি কথাটা—নান বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভস্ দি ফেয়ার। সাহসী ছাড়া অন্য কেহ জীবনবঁধুর যোগ্য হয় না।

জীবনবঁধু?

॥ ৭॥

এবার ভোজনের পালা।

অন্যান্য টেবিলের রসিক সজ্জনরা রমেনের প্রচুর তারিফ করেছেন। তাকে ওদেরও আতিথ্য পালা করে নিতে বলেছেন। পালটা অতিথি সৎকার করে ওদের খাওয়াতে গেলে ছেলেমানুষের যে কত খরচ হবে সে কথা অবশ্য ওরা ভোলেন নি। তবে ব্যাপারটা সে-ভাবে যেন সে না দেখে তার পথ তৈরি করে দিয়েছেন। বলেছেন যে, ভিন্ দেশের অতিথিকে ওরা তো সহজে পাবেন না। সেই সৌভাগ্য যখন হয়েছে, ওরা জনে জনে আলাদা ভাবে তার সঙ্গে একটু মিশবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হবেন।

প্রতিদিন শুধু সঙ্গদান। সেই কতদূরের রোমাঞ্চকর ইন্ডিয়ার একটু মনের আভাস, জীবনের কাহিনি শুনতে ওরা খুবই উৎসুক।

রমেন যে ছাত্র, সেটুকু ওঁরা সবাই লক্ষ্য করেছেন। সে নিশ্চয়ই হিডালগো অর্থাৎ বনেদি বংশের লোক। তবে ছাত্র তো, : কাজেই তার কাছ থেকে খরচা হয় এমন কোনও পান বা ভোজন স্বভাবতই ওঁরা প্রত্যাশা করেন না। নিজেরাই বললেন—আপনি তো খুব ব্যস্ত থাকবেন, কাজেই শুধু একটু সঙ্গসুখ দেবেন আমাদের।

পাশের টেবিল থেকে পেপে আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে হোটেলের মেনু কার্ড হাতে নিয়ে রমেন একটু বিব্রত বোধ করছিল। তিনি এমন একটা ভাব দেখালেন যেন সেই অস্বচ্ছন্দ ভাবটা মেনুর দামের জন্য নয়। কোন্ খাবারটা ওর পছন্দ হবে শুধু সেটাই যেন ছিল সমস্যা।

কাজেই তিনি এই টেবিলের মেনু কার্ডটা নিয়ে বললেন—রামন, তুমি এদেশে নতুন এসেছ। আমাকেই তোমার পছন্দ মতো একটা খাবার বেছে নিতে দাও। আর যাই হোক, এই পদগুলি আবার সব স্প্যানিশ নামেতে লেখা। বিদেশীরা একটু অসুবিধা তো বোধ করবেই।

রমেন কৃতজ্ঞভাবে সম্মতি জানাল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই টিপিক্যাল স্প্যানিশ খাবারের অর্ডার দেবেন। তার স্বাদ, সৌরভ আর সুরুচি বর্ণনা তার রিপোর্টে বেশ রসিয়ে লেখা যাবে। দাম নিশ্চয়ই হবে ভারী চড়া কিন্তু রিপোর্টের মূল্য হবে আরও গুরুতর। সে একটু উৎসাহ দেখিয়ে শুধু সংক্ষেপে বলল—আমি তো স্পেনকে জানতেই এসেছি। রোমাঞ্চকর, রহস্যময়ী রূপসী স্পানিয়া।

বলেই সে বেশ বুদ্ধি করে যোগ করে দিল একটা বিশেষ ব্যঞ্জনাময় কথা—ড্যুয়েন্ডে। স্পেনের আছে অনির্বচনীয় একটা ড্যুয়েন্ডে।

ব্যাস বাজিমাৎ।

হাজারটা ভারী ভারী বিশেষণ দিয়ে যে প্রশংসা শেষ করা যায় না। স্প্যানিশ ভাষায় এই একটি কথায় তা সীমাহীন বাণীময় হয়ে ওঠে।

রমেন সেটা আগে থেকেই শিখে এসেছিল। এখন মোক্ষম মুহূর্তে সেই বাক্যটি ব্যবহার করে বসল।

প্রশংসা ওদের প্রত্যেকের চোখে ফুটে উঠল। এমন রসগ্রাহী আর অনুভূতিময় টুরিস্ট দেখা যায় না। একে খুব ভালো করে আপ্যায়ন করাই উচিত।

চারদিকে প্রসন্নতা ছাড়িয়ে সিনরা বললেন—পেপে, তুমি রামনের জন্য গাথপাচো অর্ডার দাও।

তারপর রমেনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, রামন ডিয়ার, জানি না তুমি সুরুয়াটা পছন্দ করবে কিনা। তবে চেষ্টা করো চেখে দেখতে। কারণ লোকে কথা বলে গাথপাচো হচ্ছে স্পেন।

ডন তাড়াতাড়ি যোগ দিল—যেমন নাচের জগতে ফ্ল্যামেঙ্কো হচ্ছে স্পেন।

মা বলে উঠলেন—ঠিক তাই। তবে আমি তোমায় এই সুরুয়া কী কী জিনিস দিয়ে তৈরি হয় তা-ও সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। কারণ হয়তো তোমরাও এমন কিছু তৈরি করো। তার মালমশলা কী কী তা জানলে খাবার ইচ্ছাটা বোধ হয় একটু বাড়ে। জিনিসটার স্বাদও বাড়ে। অচেনা মনে হয় না।

রমেন উৎসাহ দেখিয়ে জানতে চাইল। মনে মনে সে রিপোর্ট তৈরি করছে।

দুটো বাসী রুটির ক্রাম্ব বানিয়ে গুড়িয়ে নাও। জলে ভিজে কাইয়ের মতো হয়ে যাবে। বেশ কিছু পাকা টম্যাটো, শশার কুচি, কাঁচা ঝালহীন পেপার মানে সবুজ লংকা, রসুন, পিঁয়াজ পিমিয়েন্টো নুন দিয়ে সাঁতলিয়ে নাও। তারপর মেশাও জলপাইয়ের তেল আর ভিনিগার। ওগুলি ফেটিয়ে ফেটিয়ে তরল করে ফেলো আর তারপর রুটির কাইটা মেশাও। ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা করে নাও। গরম দিনের ক্লান্তিটা প্রত্যেক চামচের সঙ্গে মুছে যাবে।

—কী? তেমন কিছু আহামরি মনে হচ্ছে না, না?

রমেনকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্রীমতী রিবেরাই এই প্রশ্নটি করলেন। তিনি তো আর জানতেন না যে রমেন রিপোর্ট তৈরির মুসাবিদা করেছে।

লজ্জিতভাবে রমেন বলল—না, না সিনরা। আমার তো খুব এক্সাইটিং মনে হচ্ছে।

খুশি হয়ে তিনি বললেন—যখন জিনিসটা আরও হরেক সব্‌জির পাত্রের সঙ্গে পরিবেশন করবে তখন দেখো তার চেহারা আর চটক।

অবশ্য, অবশ্য। খুব সুন্দর হবে। আমাদের গেছো পাচন তো নয়।

—কী, কী, তোমাদেরও আছে না কি গাথপাচো? সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

বেফাঁস একটা নাম বলে ফেলে রমেন বিব্রত হয়েছিল। সেটা ঢাকবার জন্য বলল—না, মানে

ইংলাটেরাতে রোজ রোজ ডিশ ওয়াটারের মতো সাদামাঠা সিদ্ধ জল সুপের নামে গলাধঃকরণ করতে হয় কিনা। তাই একটু একসাইটেড হয়ে উঠেছি। আর আমাদের দেশে সাধারণত সুরুয়া খাওয়া হয় না।

পেপে বললেন—তবে তোমার জন্য আরও একটা জিনিস অর্ডার দিচ্ছি যার কাছাকাছি রকম পদার্থ তোমাদের দেশে খায় বলে শুনেছি। অক্সফোর্ডে একজন ভারতীয় ছাত্র আমায় রেঁধে খাইয়েছিল। বেশ মনে আছে তার চমৎকার স্বাদটা, আরোথ আলা ভ্যালেন্সিয়ানা।

উৎসুক হয়ে রমেন পেপের দিকে তাকাল।

কিন্তু কথা বললেন পেপের গৃহিণী। জানো, একজন পৃথিবীবিখ্যাত বিদেশী লেখক নাকি বলেছেন যে এই খারাপ, অতি খারাপ সংসারে দয়াল ভগবান এদিক সেদিকে মানুষকে তার মন্দভাগ্য থেকে কিছু নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং তার মধ্যে একটি হচ্ছে আরোথ। ভ্যালেন্সিয়ার একটি বড় রেস্তোরাঁয় আমি এই লেখাটা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো দেখেছি।

এতক্ষণে মুখ ফুটল ইসাবেলের। সে হেসে বলল—মামণি, তুমি বলেছিলে যে এই খাবারটা সোনার থালায় করেই খাওয়া উচিত। কই, সেই কথাটাও আমাদের নবীন অতিথিকে বল। আরও বল যে আমাদের পেরু থেকেই এই দেশে সোনা আসত।

মায়ের উপর দিয়ে স্বচ্ছ সরল একটা পরিহাস।

ইসাবেলের মা ততক্ষণে আরোথের রান্নার ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। বিদেশী যেন অপরিচিত অনভ্যস্ত খাবার দেখে তার গুণ আস্বাদ করতে পেছপা না হয়।

তিনি বোঝাতে লাগলেন—জাফরান দিয়ে রাঙানো একটু সুগন্ধী চাল দিয়ে এটা তৈরি হয়। লাল বিচিহীন লংকাও দেওয়া হয়। সামুদ্রিক গেঁড়ি ও গুগলির মাংস, বাগদা চিংড়ি, গলদা, কাঁকড়ার টুকরো, কচি মুরগির টুকরো এসব দিয়ে রান্না হয়। লাল পিমেন্টো আর সবুজ মটরশুটি নকশা করে সাজানো হয় তার উপরে। তার বেশ একটু গরগরে রঙ আর ঝালঝাল স্বাদ। ওঃ, ভাবতেই জিভে জল এসে যায়।

টকটকে সোনালি রঙের জাফরান দিয়ে রাঙানো আরোথ যদি খাওয়া যায় সোনার থালায় না হোক, সোনার খনির দেশ পেরুর একটি পরিবারের সঙ্গে? আর এমন একটি পরিবারের সঙ্গে যাদের হৃদয় সোনার মতো উষ্ণ উজ্জ্বলতায় ভরা?

আহা? কী সোনা দিয়ে বাঁধানো কপাল আমার—মনে মনে রমেন ভাবতে লাগল।

আর সবার উপরে সোনার স্পর্শ ওর মনে যে এনে দিচ্ছে একটি আগুনবরণী তরুণী সেকথা সে মনের একেবারে গভীর অন্তরালে চেপে রেখেছে।

সংগোপনে মনের খনির আঁধার গহনে।

সোনার আসল রঙটা ধরা পড়ে শুধু আগুনের পরশে। সংসারে কবি আর প্রেমিকরা সেটা নিয়ে কিন্তু মাথা ঘামায় নি। থির বিজরী বরণ গোরী হলেই সোনার বরনী। দেশে অপক্ব মন আর অপরিণত নয়ন নিয়ে রমেনও সেটুকুই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু কৈশোর যৌবন দুহু মেলি গেলা যে বয়সে আর যে দেশে সেখানকার বিপ্লব-কেন্দ্রিক শহর লন্ডনে এসে প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল। বুঝেছিল রঙের বৈচিত্র্য আর বৈভব। স্ক্যানডিনেভিয়ার তুষারশুভ্র, ফরাসিদের দুধে আলতা আর ইটালি গ্রীসের উজ্জ্বল গৌর যে একই বর্ণ নয় তা সে প্রথম সতৃষ্ণ নয়ন মেলে বুঝতে পারল। আমার নয়ন ভুলানো এলে। আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে। কবির এই কলিগুলি বার বার স্বপ্নবিধুর ব্যঞ্জনা নিয়ে মনের মধ্যে গুঞ্জন করত।

বয়সটা যে একুশ বাইশ।

স্পেনে যে প্রচণ্ড রোদের আর আফ্রিকান মুরদের সঙ্গে রক্ত সংমিশ্রণের কল্যাণে গায়ের রঙ অনেকক্ষেত্রে আরও একটু ভারতীয়, মানে ফর্সা ভারতীয় ধাঁচের হবে তা সে আগে থেকেই ধরে নিয়েছিল। এমন কি উত্তর স্পেন অথবা দক্ষিণ স্পেনের লোক কি না তা পর্যন্ত যে গায়ের রঙ দেখে চেনা সম্ভব তাও সে জেনে এসেছিল।

এই কদিন ধরেই সে হিস্পানিদের বিশেষ করে মেয়েদের গায়ের রঙ আর মুখের ভাবের দিকে নজর রেখেছে। মনে মনে বিচার করেছে যে অমুক মেয়েটিকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলব। সে কি প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত সহজ ভঙ্গিমার আন্দালুসিয়ান দক্ষিণী যার কাজল কালো মদির আঁখিতারায় আরব্য রজনীর গভীরতা অনুভব করতে ভুল হয় না?

অথবা সে গরবিনী অগ্রগামিনী (প্রোগেসিস্টা) কাটালান প্রদেশের কন্যা, উত্তরপূর্বে বার্সিলোনায় যে মাথায় সোনালি বা আগুনরাঙা কেশর ঝুলিয়ে ঝলমল করে বেড়ায়?

অথবা সে নিশীথ কালো মাথা আর শ্বেতপদ্মের মতো মুখ নিয়ে মধ্য হিস্পানি ক্যাস্টিলের আত্মসমাহিত শোভনতা বজায় রেখে বিরাজ করে?

রমেন বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ এ কোন্ শ্রেণীতে সে এই সামনে বসা মেয়েটিকে ফেলবে।

যে সংবাদপত্রের জন্য তাকে লিখতে হবে তারা বেলস্ অফ্ স্পেন হিস্পানি বালাদের উপর একটি বিশেষ রচনা চেয়েছে। কারণ? কারণটা যেমন মিষ্টি, তেমনি ব্যবসাদারি।

সুইট মুচাচা। বেল অব স্পেন।

ওগো মিষ্টি মেয়ে, ওগো হিস্পানি রূপসী, এই গানটা গোটা ইংলন্ড আর আমেরিকা মাতিয়ে তুলেছে। লক্ষ লক্ষ রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে আর প্রত্যেক নাচঘরে সুইচ মুচাচার তালে তালে চঞ্চলচরণগুলি পরান করে তুলেছে অরুণবরণী।

অতএব প্রথম সপ্তাহেই চাই স্পেনের রূপসীদের উপর রচনার প্রথম কিস্তি। রঙিন ছবি কর্তৃপক্ষ আগেই জোগাড় করেছে। এখন লেখাটি পেলেই ব্লকের সঙ্গে সাজিয়ে ওরা সেই এক সংখ্যাতেই বাজার মাত করবার তালে আছে। রমেনকে বলে দিয়েছে যে দরকারমতো কড়া রোম্যান্সের রঙ লেখার মধ্যে যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কাঞ্চনমূল্যটা সম্ভবত রোম্যান্সের রঙের উপরই নির্ভর করবে।

আর দক্ষিণার পরিমাণের উপর নির্ভর করবে একটু সময় নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে দেখে তার চেয়ে একটা ভালো থিসিস লেখা। এই তো মোটে প্রথম সোপান।

কাঞ্চন মূল্য, পেরুর সোনা পেরুর এই সোনালি রঙের মেয়েটি সব কিছু তাকে শুধু সোনার মতো আগুন-রাঙা রূপের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

এই তো সেই তরুণী যার গায়ের রঙ হিস্পানিদের চেয়ে শুভ্রতর কিন্তু নর্ডিক উগ্র শ্বেতের চেয়ে স্নিগ্ধতর, অথচ অনুরাগের অতীন্দ্রিয় এমন কি অনুচ্চারিত বাসনার রঙ উষ্ণ। তার গায়ের রঙের কোনও শ্রেণীবিন্যাস সে করতে পারছিল না। ইংরেজি পাঠক আবার কালার শেড রঙের আভার স্তর বিভাগ সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন। ওদের চোখ আর দৃষ্টিভঙ্গি দুই-ই বড্ড বেশি স্পেশ্যালাইজ করেছে এ সম্বন্ধে।

নাঃ।

নতুন পরিচিত, প্রায় অপরিচিত একটি বিদেশী পরিবারের সহৃদয় আমন্ত্রণের প্রতিদানে এসব কী রকম চিন্তা? রিবেরা পরিবার যদি টের পায় যে এই অচেনা যুবক তাদের আতিথ্যের ক্ষণটিতে সব আদরযত্ন উপেক্ষা করে তাদেরই তরুণী কন্যার গায়ের রঙের বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেছে সেটা কি তাঁরা অত্যন্ত হীন নীচতা বলে মনে করবেন না?—

মনে মনে সংগোপনে তাঁদের উদারতার অপমান করা হয়ে যাচ্ছে। অপব্যবহার তো সামান্য কথা। একেবারে যাকে বলা চলে অসম্মান। ছিঃ।

রমেন নিজের মনকে সংযত করতে চেষ্টা করল। রূপের চিন্তা তো বড় কথা হয়ে গেল। রসাল আলোচনা পর্যন্ত ভদ্রসমাজে উপস্থিত যারা আছে তাদের বাদ দিয়েই করতে হয়। সভ্য সজ্জনের মধ্যে এটা অনুলিখিত নিয়ম।

ঠিক। প্রেজেন্ট কোম্পানিকে বাদ দিয়েই আলোচনা করা মঙ্গল। রমেন অন্যায় অনুচিত কিছু করবে না। সে এই মেয়েটিকে তার মনে মনে হিস্পানি রূপসীদের সম্বন্ধে হিসাব কষা থেকে বাদ দিয়ে চলবে।

কিন্তু ইসাবেলের মুখখানা যে স্ফটিকের আয়নার মতো পরিষ্কার। তার সুশ্রী ডৌলটি যে অজানা কিসের আভাসে ভরা। তার চোখ দুটি যে সমুদ্রের বুকে ভাসমান নীলিমায় উজ্জ্বল। সমস্তটা মিলিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের সাধনার বস্তু। তার সরলতা এখনও অবিকশিত একটা প্রতিভার স্বাক্ষর পেয়েছে। সামান্য একটু শোভন অনুভবের স্পর্শেই যেন সে মনে মনে কেঁপে ওঠে। তার মধ্যে যেন ঘুমিয়ে আছে মহান বাসনা, বিরাট নাটকীয়তা, বিপুল স্বপ্নের সম্ভাবনা।

ইসাবেল নামটা স্প্যানিশে আদর করে ছেটে নিয়ে বেলিটা বানিয়েছে। এই পরিবার আরও বেশি আদর করে তাকে ডাকে শুধু বেল বলে।

কিন্তু সে এই পরিবারের আর সবাকার মতো ওকে বেল বলে ডাকবে না পর্যন্ত। বেল কথাটি ফরাসি আর ইংরেজিতে যে কথার মতো শোনায় তার মানে হচ্ছে রূপসী। অপরূপ রূপের সরলতায় ভরা এই মেয়েটির সঙ্গে রূপের কোনও সম্পর্কই রাখবে না। কী চিন্তনে কী বা আহ্বানে।

তবু—তবু একথা তো রমেন নিজেব মনের কাছে অস্বীকার করতে পারছে না যে ইসাবেলকে দেখে ওর নিজেকেই এখন খুব ভালো বলে মনে হচ্ছে। যেন আরও শিক্ষিত, আরও সার্থক আরও তাৎপর্যপূর্ণ। যেন ভবিষ্যতের স্বপ্নদর্শী। ইসাবেল সমস্ত তাজা প্রাণময়ী তরুণীদের সারির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়। যেন নির্মল আনন্দে জীবনে স্বপ্নের শিল্পের তুলি ওর হাতে আছে।

যেন সমস্তটা জীবনের দৃশ্যটাকে সে আলোয় ভরে তুলতে পারে।

আবার উপনিষদের সেই মন্ত্রবাণীতে ওর সমস্ত মগ্ন চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে গেল—'ভাসা তস্য বিভাতি সর্বমিদম্।'

ভেসে এল—যেন কোনও মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে এল সুরেলা গলায় একটি প্রশ্ন। সত্যিকার সহানুভূতি ভরা একটি প্রশ্ন। ভিন্নদেশীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্তরের উৎকণ্ঠা।

আরোথ কিন্তু জলপাইয়ের তেলে রান্না হয়। আপনার কি তা ভালো লাগবে?

রমেন এমনভাবে অভিভূত হয়েছিল যে এই ক্ষণটুকু সে সামনের দিকে চোখ মেলে টেবিলের ওপারে ইসাবেলের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না।

চোখ নিচু রেখেই সে উত্তর দিল।

এই গভীর ভাবাবেশের গ্রহণ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলে এখন চলবে না। সংসারের আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক সামাজিক মানুষ হিসাবে চলতে হবে, সে তাই উজ্জ্বল ঠাণ্ডার আলো দিয়ে এই মেঘমেদুরতা দূরে সরিয়ে দিবার চেষ্টা করল।

রমেন চোখ নিচু রেখেই বলল—এই কটি দিনে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে জলপাইয়ের তেল রান্নার মাধ্যম হিসাবে মন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কী এই তেল হচ্ছে কোঁকড়া কোঁকড়া কেশবতী কন্যার মতো। যখন সে ভালো তখন সে খুব, খুবই ভালো। যৎপরোনাস্তি ভালো।

ডন হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—ফ্যান্টাস্টিক।

অতি আশ্চর্য। বেল যেমন বাহাদুরি করে সদালাপী করতে চেয়েছিল তার উপযুক্ত জবাব পেয়েছে। এখন থেকে, মা আমি বেলকে কোঁকড়া কেশবতী বালিকা বলেই ডাকব। ও যতই আপত্তি করুক যে সাবালিকা হয়ে গেছে ওকে আমি সবসময়ই বালিকা মনে করি। আমাদের বিদেশী অতিথি খুব নিরপেক্ষ ভাবেই সেই সত্যটা প্রকাশ করে ফেলেছেন।

পেপে এবার এদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিলেন। সম্ভবত তার কুমারী তরুণী কন্যা যাতে প্রথম দর্শনেই অপরিচিত বিদেশী যুবকের সঙ্গে আলাপে বেশি না জড়িয়ে পড়ে সেইজন্য। অন্তত রমেনের তাই মনে হল। নিজেকেও তো বেশ সাবধানে পা ফেলে দূরত্ব রেখে এগোতে হবে।

মেয়েটির দিকে নয়।

হিস্পানি রূপসীদের দিকে।

তার সংবাদপত্রের মধ্যে ম্যাগাজিনের প্রথম প্রবন্ধই এদের নিয়ে। তা ছাড়া তার পরীক্ষার জন্য থিসিসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ্য হবে এই বিষয়টা। সে সুযোগ তার হাতে এসে গেছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে।

দায়িত্বহীন ভাবে হালকা হাসি খেলায় অবহেলায় সেটা নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

পেপে বললেন—রমেন তুমি আরোথের সঙ্গে ল্যাংগোস্টা চেখে দেখতে পারো। একেবারে টিপিক্যাল স্প্যানিশ জিনিস। ইয়া বড় বড় গলদা চিংড়ির কুচি ভাজা চমৎকার একটা সস দিয়ে ড্রেস করে সাজিয়ে দেয়।

পেপে-গৃহিণী যোগ দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী চমৎকার সেই সসটা। জাফরান, হোয়াইট ওয়াইন, টম্যাটো, জ্যামাইকার সবুজ ঝালহীন লংকা পিমেন্টো আর পারস্‌লি ধনে পাতা এসব দিয়ে তৈরি। একেবারে রাজাদের যোগ্য ভোজ।

মাথা নেড়ে কর্তা বললেন—এই খাদ্যটার জন্য বিশেষ ভাবে নাম করেছে এখনকার বোটিন নামে একটা রেস্তোরাঁ। তিনশ বছরের পুরানো প্রতিষ্ঠান। ওরা ল্যাংগোস্টা পরিবেশন করে পুড়িয়ে কালো করে

ফেলা পুরানো মাটির থালায়।

রমেন উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল—হাউ একসাইটিং! একেবারে রোমাঞ্চ লেগে যাচ্ছে শুনতেই।

অন্তরের রোমাঞ্চ থেকে স্বাদের স্বর্গে সরে এসে রমেন বেঁচে গেল।

পেপে শুনে খুব খুশি হলেন। এই ছেলেটি শুধু সভ্য আর শিক্ষিত নয়। এদের একটা উদার রুচি আর দৃষ্টিভঙ্গি আছে। যদিও অচেনা লোকটিকে পরিবারের টেবিলে যেতে আমন্ত্রণ করে তিনি একটু দুঃসাহসী রিস্‌ক ঝুঁকি নিয়েছিলেন ছেলেটি এই পারিবারিক ভোজনের অতিথি হিসাবে অপাত্র নয়।

তিনি ওকে স্পেনের খাওয়া-দাওয়ার রীতিনীতি আর প্রণালী সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল করবেন ঠিক করলেন। ও তো দেখছি বেশ কিছু এখনই জানে। কাজেই প্রথম ভাগ থেকে খাদ্য-পরিচয় পাঠ করাতে হবে না।

তিনি বললেন—রামন, আমরা স্প্যানিশ বংশের হলেও আসলে পেরুর আদিবাসী। তাই আমরা এদের মতো এত দেরিতে খেতে বসি না। খাঁটি স্প্যানিয়ার্ড, বিশেষ করে সোসাইটি পিপল রাত আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত 'পারক্রল' করে অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো এখানে ওখানে একটা চাটা নিল। চাটা হচ্ছে রেড বা হোয়াইট ওয়াইন। সঙ্গে নিল কিছু পাঙ্কো বা টাপা। টাপা সাধারণত বানায় মাছ ভাজা, কচি বাছুরের মাংস, ডিম বা চিংড়ি দিয়ে। ভাজে মাখন বা অলিভ অয়েল দিয়ে। সঙ্গে থাকে গুগলি আর ছোট সসেজের টুকরো। বেশ খিদে তৈরি করার মতো ব্যবস্থা, তাই না?

রমেন হেসে বলল—আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্‌। আপনার কাছে যা প্রাণবন্ত বর্ণনা শুনছি তাতে দেশে ফিরে একটা নতুন কথা চালু করবার চেষ্টা করব। শ্রবনে পূর্ণভোজনম্‌। বলার মতো করে বলতে পারলে তা শুনলেই পেট ভরে যায়।

শুনে পেপে আহ্লাদে আটখানা।

শ্যাম্পেনের ছিপি তো বেশ একটু আগেই খুলেছিল। এতক্ষণে মনের ছিপিও খুলে গেছে। উষ্ণ অন্তরঙ্গতা সবারই মুখের হাসিতে ভাষণে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

ওদিকে গোয়ারসাঁর গ্লাভস্‌ পরা হাতে প্লেটের উপর সাজানো আরোথ। রমেন একদৃষ্টিতে সেই বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

পেপে সেটা লক্ষ করেছেন।

হেসে বললেন—এটার আরেকটা নাম আছে— যে নামে সারা পৃথিবীতে এটাকে চেনে। এতক্ষণ শুধু ইচ্ছা করেই সেই নামটা ফাঁস করিনি।

কুঞ্চিত কেশবতী কিশোরীর কণ্ঠে রিনিরিনি করে উঠল সুরেলা প্রশ্ন, কেন পেপে? নিশ্চয়ই কোনও রোম্যান্টিক কারণ আছে। কী কারণ, পেপে ডিয়ার?

পেপে রমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন—আরোথের খুব পবিচিত চালু নাম হচ্ছে পায়েলা। রামন, তোমাদের দেশের পিলাওয়ের মতো। শুনতে আর খেতে। নাও, মাই ডিয়ার বয়, ডোনট ফিল 'হোমসিক'।

হোমসিক? সামনে রয়েছে জাফরানে রাঙানো পোলাও। কিন্তু মনের আকাশে যে রামধনুর উঁকিঝুঁকি।

॥ ৮॥

ভোরের সারস হালকা পাখা মেলে উড়ে এল।

ঠিক এমনি ভাবে রমেন পরদিন ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের পাতিয়োতে অর্থাৎ অঙ্গনে এসে দাঁড়াল।

হোটেলের প্রথম কামরা অর্থাৎ রিসেপশন রুমটি পর্যন্ত কী সুন্দর করে সাজানো। দেওয়ালে দেওয়ালে হয় ফ্রেস্কো, না হয় ম্যুরাল ছবি আঁকা। উপর থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন তার ঝকমকে স্ফটিকের ঝুলমিগুলি গাঁথা আছে কারুকার্য করা লোহার ফ্রেমে। চারদিকে পিতলের টবে বসানো পাম গাছ। আর প্রত্যেক বাইরের দিকের ঘরের সামনে একটু করে ঝুলবারান্দা, নানা নকশাকাটা প্রাচীন লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা।

এত ঐশ্বর্য আর সাজসজ্জার মধ্যে থাকতে অনভ্যস্ত চোখ সব পরিবেশটুকু যেন পান করে নিচ্ছিল। একবার মনে পড়ল ছিদাম মুদি লেনের কথা। সেই লেনের একটা তস্য সেকেন্ড বাইলেন পর্যন্ত আছে

না কি? এখন যেন পরিষ্কার মনে পড়ছে না।

মনে পড়ুক আর না পড়ুক কিছু যায় আসে না।

রমেন এখন ভোরের সারস হয়ে মুক্ত নীল আকাশের তলায় সবুজ সায়রের বুকে ছায়া ফেলে শুভ্র সমুজ্জ্বল পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দেশে পিছনে ফেলে আসা দারিদ্র্য আর তাকে দুপুরের হাহাকার ভরা তাপে দগ্ধে মারতে পারবে না। সে একবার ভেবে নিল, যে দেশে সে এখন এসেছে সেখানকার অমর চরিত্র হচ্ছে ডন কুইকসোট। একটা ছোট শহরের কপর্দকহীন সামন্ত হয়েও সারা পৃথিবীকে হাসিখুশিতে ভরিয়ে রেখেছে। কিন্তু সে জন্মেছিল একটা জেলে। দারুণ গ্রীষ্মের অঞ্চল দক্ষিণ সেভিল শহরের জেলে।

এবং সেই সেভিলেই যৌবন কাটিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত থারভান্টেস। পৃথিবীখ্যাত শিল্পীশ্রেষ্ঠ ম্যুরিলো আর ভেলাসকেথও সেখানেই জন্মেছিলেন।

দাঁড়াও না, রমেন পাত্রও ওই ভাঙাচোরা নোংরা কলকাতার এক পরিচয়হীন ঘুমন্ত গলিতে জন্মেও একদিন জেগে উঠবে বিশাল বিশ্বে। তারই শুভ উদ্বোধন হয়ে গেছে। তারই একটি সোনার সন্ধ্যার সন্ধান সে পেয়ে গেছে এরই মধ্যে।

তার নতুন শেখা একটা স্প্যানিশ 'ফ্রেজ' শব্দসমষ্টি মনে পড়ল—এল বিয়েন ডুভোগো. এল মাল সিগুরো ই থিয়েতো—যা ভালো তা সংশয়ময়, যা খারাপ তা নিশ্চিত আর নির্ঘাৎ।

না। ভোরের সারস সে আজ। সন্ধ্যার কাকের মতো আঁধার কুলায় তার জন্য নয়।

সে এত ভালো করে তার প্রথম ডেসপ্যাচটি লিখবে যে তাতেই কাগজের কর্তৃপক্ষ আর পাঠকরা মুগ্ধ হয়ে যাবে। সেই শুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সে পাচ্ছে এখনই। এখন শুধু মাথা স্থির আর মন শান্ত রেখে কাজ করে যেতে হবে। সাধনায় সিদ্ধির জন্য চাই সাধ্যাতীত যত্ন শত অসুবিধা সত্ত্বেও। নিষ্ঠা ছাড়া প্রতিষ্ঠা কে কোথায় পেয়েছে?

যে বিখ্যাত সাহিত্যিক থার ভান্টেসের কথা সে এইমাত্র ভাবছিল, তিনিও বেকার অবস্থাতেই তাঁর অমর কাহিনি লিখেছিলেন। তিনি আমেরিকায় একটা চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। সেটা পেলে হয়তো ডন কুইকসোট রচনা করা আর হত না। তবু, তবু হায়, স্বনামধন্য সাহিত্যিক তার বিরাটত্ব সত্ত্বেও বেচারি। যে যুগেই তিনি জন্মেছিলেন আর যে রকম গরিব ভাগ্যহীন তিনি ছিলেন তা রমেন একবার মনে করে নিল. নিয়ে ভরসা পেল।

তিনি একটা তিন অংকের নাটক লিখে যা পেতেন তাতেও মোটে তিনটে গাধা কিনতে পারা যেত। তাকে একবার আফ্রিকাতে ক্রীতদাস করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশটা গাধার দাম দিয়ে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সাহিত্যিককে মুক্তি দেওয়া হয়। হায়! তার সঙ্গে জড়িত টাকার হিসাব কিনা গাধার দামের সঙ্গে তুলনা করে স্থির করা হয়!

আর ওই বিরাট ব্যক্তিটিকে শুধু বেঁচে থাকবার মতো দুটি অন্ন পেতে আরও যে সব হীন অসম্মানে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তা রমেন এই মিষ্টি ভোরবেলায় মনে করতে চাইল না। সাহিত্যিকের সব দুঃখ আর দারিদ্রের কুয়াশা ভেদ করে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তার রচনা, রসাল হাসি আর রাঙানো মানবিকতা। তার কাছে সেটাই একমাত্র সত্য।

রমেন নিজেকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করল, বলত, কী সেই বস্তুটি যা ভগবান কখনও চেয়ে দেখে না, রাজরাজড়ারা প্রায়ই নজরে করে না, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রত্যেকদিন দেখে? সেটি হচ্ছে ভাগ্যের সঙ্গে ঠাট্টা।

'বিশ্ব যখন নিদ্রাগমন
গগন অন্ধকার—'

মাদ্রিদের গগন মোটেই অন্ধকার নয় এখন, কিন্তু মাদ্রিদ পুরোপুরি নিদ্রামগন। রাত সাড়ে দশটা, এগারোটায় যারা খেতে বসে তারা এবার ছটায় উঠবে এটা আশা করা যায় না। যারা খুব ভোরে ট্রেন ধরতে যাবে তারা আগের রাতেই ব্যবস্থা করে রাখে। কিন্তু রমেনের জন্য এত ভোরে কী বন্দোবস্ত হবে? আর কে বা করবে? কেনই বা করবে?

কিন্তু সে নিজেকে সামলিয়ে নিল। সে একটা নবজীবনের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। সাফল্যের, সৌভাগ্যের চাবিকাঠি তার অধ্যাপক নিজে ব্যবস্থা করে হাতে তুলে দিয়েছেন। এখন সে এই রকম কোনও

বিষণ্ন চিন্তা এমনকি নিঃসঙ্গ মুহূর্তে পর্যন্ত মনের ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না।

স্পেনকে কথায় বলে হোম অব সিয়েস্তা অ্যান্ড ফিয়েস্তা। নিজের হোম থেকে যখন সে বের হয়ে পড়েছে সেদিন থেকেই সে তেলেজলে মানুষ ধুতো আর ভেতো বাঙালির সিয়েস্তাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে স্টীমারে উঠেছে। এন বাকি রইল ফিয়েস্তা আব উৎসব।

এই দেশের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে এখন মনের মধ্যে উৎসব সাজাবে।

সিয়েস্তা আর ফিয়েস্তা।

কথা দুটো খুব মনে ধরেছিল। তাই সে নিজেব থেকেই একটু জোরে উচ্চারণ করে বসল সিয়েস্তা আর ফিয়েস্তা।

খুট করে রিসেপশন ডেস্কে একটু আওয়াজ হল। মৃদু মহিলা কণ্ঠের সুপ্রভাত শুনতে পেল রমেন।

বুয়েনস ভিয়াজ, সিনর। চকিতে রমেন নিজেকে সামলিয়ে নিল। খুশি মনে প্লাট সুপ্রভাত জানাল। একবাব নয়, দুবার।

বেলা আটটার আগে রেগুলার রিসেপশনিস্ট কাউন্টারে এসে হাজির হবে না। তবে শহরের কেন্দ্রস্থলে হোটেল। সারা দিন রাতে যে কোনও সময় অতিথি আসতে পাবে বা যারা আছে তাদের দরকাব হতে পারে। অতএব রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত কম ব্যস্ততার সময়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ওই কাউন্টারের কাজ চালিয়ে নেয়। সব হোটেলেই এইরকম ব্যবস্থা।

সম্ভবত সে কাউন্টাবেব আড়ালে ইজি চেয়ারে একটু সিয়েস্তা কবছিল। হঠাৎ রমেনের কথা শুনে উঠে পড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

হাসিমুখে বমেন এগিয়ে এল। হোটেলের এই শ্রেণীব কর্মীবা অনেক ভাষা জানে। ফরাসি আব ইংরেজি অবশ্যই জানে। অতএব ভাষাব অসুবিধা হবে না।

তা ছাড়া খাঁটী হিস্পানি, তাব উপর আগের জেনারেশনের মহিলা। সম্ভবত যাকে বলে সরল, ঘোর প্যাঁচ ছাড়া অর্থাৎ আনসফিস্টিকেটেড। এর চোখ দিয়ে এব দেশেব একটা ছবি দেখা যাক।

হিস্পানিরা কথা বলতে সর্বদাই তৈরি, তাব উপর মহিলাবা। তায় বয়স পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। পূর্ব দেশের একজন তরুণের ইচ্ছুক কানে সে বেশ বাড়িয়ে রসিয়ে বর্ণনা শুরু করে দিল।

অবশ্য তার সঙ্গে দুজনের জন্য দু-কাপ গরম কফি।

রিসেপশনিস্ট এমন উৎসুক শ্রোতা হয়তো অনেকদিন পায়নি। নৰ্টে আমেরিকানেরা তো পায়ে চাকা বেঁধে আসে। আর জার্মানরা, ইংরেজরা এমন বানিয়া ...এ কত বেশি দ্রষ্টব্য দেখে পয়সা বেশি উসুল করতে পারবে তারই হিসাব কষে। এই চেহাবা দেখছি একটু অন্য ধবনেব। অতএব ওকে ভালো কবে দেশটার খবর জানানো যাক। বাইরের পৃথিবীটা যে তাব মায়াময় দেশটাকে এখনও ভালো কবে চিনতে পারল না।

জানেন সিনর, সত্যি এস্পানিয়া হচ্ছে ফিয়েস্তার দেশ। নাচ গান ফুর্তি হৈ হুল্লোড়—প্রাণ যা চায়। আর যদি আপনি ফিয়েস্তার দিনের মধ্যেই গুরুগম্ভীর ধর্মকর্ম চান তাহলে হোলি উইকে কাটিড্রালে গিয়ে মাথা নিচু করে মোমবাতি জ্বালিয়ে হাঁটু গেড়ে বসুন। তবে সেখানেও এমন রঙিন কাঁচের, ভাস্কর্যেব আব চিত্রশিল্পের কারুকার্য দেখবেন, যে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি আর আনন্দকে সঙ্গে জড়িয়ে উদয় হবে।

রমেন জিজ্ঞেস করল-- আপনাদের এত যে সেন্টস্ ডে আছে। সেই সন্ত দিবসেও কি একই রকম চলে?

--ওঃ, মোটে আধঘণ্টার 'মাস' অর্থাৎ প্রার্থনার সমাবেশ। দুপুর থেকেই শুরু হয় বুলফাইটের জমায়েত।

রমেনের মুখে বোধহয় বুলফাইটের প্রতি প্রীতির চিহ্ন দেখা গেল না। তা ইন্ডিয়ার লোকরা তো লড়ুয়ে প্রকৃতির নয়। ভদ্রমহিলা সারা বিশ্বেব অতিথি চরিয়ে বেড়ায়। কোন্ দেবতাব জন্য কোন্ নৈবেদ্য তা বুঝতে দেরি হল না।

শুধু বুল ফাইটই নয়। ফিয়েস্তা গুলজার হয়ে ওঠে নাচ, বাজনা আর আতসবাজিতে। আমাদের রাতগুলো হচ্ছে জীবনকে জাগিয়ে বাখার জন্য ঘুমিয়ে হারিয়ে ফেলার জন্য নয়। টুরিস্ট অফিস সরকারি পাত্রোনাতোর সচিত্র পুস্তিকা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

রমেন বহু ধন্যবাদ দিয়ে হেসে বলল—সে সবই আমি পড়ে নিয়েছি। তার বাইরের কিছু বললে সুখী

হব।

—ঠিক বলেছেন সিনর, আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি যে আপনি সত্যিকারের টুরিস্ট। স্পেনে ভালোবেসে তার অন্তরের মাধুর্যকে খুঁজতে এসেছেন।

রমেন এই প্রশংসা শুনে একটু উসখুস করতে লাগল। অথচ কথার স্রোতে বাধা দিলে বর্ণনার খেই হারিয়ে যাবে। তাতে তারই লোকসান হবার সম্ভাবনা।

কাজেই সে শুধু হেসে নমস্কার জানাল নীরবে।

সিনরা মনের খুশিতে বলে চলল—এই দেখুন না। আমাদের দেশের ছোটখাটো শহরগুলিতেও এত সব স্থানীয় ফেরিয়া হয়—আর বারোমাসে তেরোপার্বণ যাকে বলে—সেই সব মেলারই বা বাহার কত। এই আজই ধরুন না এই শহরে কী কী হচ্ছে; জানাব আপনাকে?

রমেন হাসিমুখে শুধু মাথা নাড়ল।

সিনরা ততক্ষণে বোধহয় ধরে নিয়েছে যে রমেনের মনের দৃশ্যপট খুব বিস্তৃত। সারা দেশময় ছড়িয়ে। অতএব সে বলল—আমাদের ধর্মের সঙ্গে আনন্দের অঙ্গাঙ্গী যোগ দেখে ঘাবড়াবেন না। আমরা জানি জীবন কী করে ভোগ করতে হয়। আঙুল চুষতে চুষতে তা থেকেই সুরার স্বাদ পাওয়ার মন্ত্র আমরা জানি। গত রাতে ব্যাংকোয়েট হলে হয়তো আপনার মনেও আঙুরলতা দোলানি দিয়ে গেছে। ভুলবেন না এটা স্পেন। রূপ প্রেম আনন্দ দিয়ে তৈরি। আপনিও ভাগ্য ভালো হলে প্রেমে পড়বেন নির্ঘাত।

এই বিগত যৌবনের বাণীগুলি তো শুধু সামান্য এক হোটেল কামিনীর ভাষ্য বলে মনে হচ্ছে না। বিস্ময়ে রমেন বলে উঠল—আপনি বলছেন এ কথা? স্পেন যে ধর্মে ভরা দেশ।

উচ্ছ্বসিত হয়ে মাথা দুলিয়ে সিনরা জানাল—ধর্মের নামে ঘাবড়াবেন না। এই দেখুন না, সাধুসন্তদের পুণ্যদিনগুলির শুরু হয় আগের সন্ধ্যায় ভারবেনা উৎসব করে। রাতভোর তার স্ফূর্তি চলে। আনন্দের বাসনাকে অপূর্ণ রেখে গীর্জায় গেলে মন যে গজগজ করতে থাকবে, তাই আগের রাতে মহা স্ফূর্তির ভারবেনা চলতে থাকে।

রমেন ভাবল একে যদি আমাদের দেশের মেলাগুলির কথা একটু আধটু বলি তাহলে হয়তো এ আরও বেশি উৎসাহ পাবে। সে সংক্ষেপে বলল—সিনরা, আমার শুনতে ভীষণ ভালো লাগছে। তোমাদের এ সব উৎসবই আমি দেখে যাব। আর আমাদের দেশেও তো রথের মেলা, শিবের গাজন প্রভৃতি অনেক কিছু উৎসব আছে ধর্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে। তাই এসব তুলনামূলক ব্যাপারের খোঁজ পেয়ে খুব ভালো লাগছে।

উৎসাহ পেয়ে সিনরা বলল—কিন্তু সিনর, আপনি আমাদের একটা 'ফাল্লা' না দেখে চলে যাবেন না। পুরাকালে গ্রীক রোম্যানরা যেমন সব গরমাগরম রক্ত-মাংসের আবেশভরা প্যাগানে ফুর্তিতে আত্মহারা হয়ে উঠত আমাদের 'ফাল্লা'গুলিতে ঠিক সেই রকম হয়। সংসারের কোনও স্ফূর্তিই ফাল্লাতে বাদ যায় না। তার মধ্যে সব চেয়ে নিরেমিষ্যি যেটুকু তা হচ্ছে, স্থানীয় পুরানো যুগের কস্টিউম পরে সারা রাত উদ্দাম নাচ। আপনি অন্তত এইটুকুতে যেন অংশ গ্রহণ করেন। হিস্পানি উন্মাদনা অনুভব করবেন আপনার শিরায় শিরায়, রক্তলহরীতে।

সাবাস, সিনরা, সাবাস। বুয়েনস, ভিয়াজ সিনর—বলতে বলতেই কথাবার্তায় যোগ দিল হোটেলের আর একজন বাসিন্দা।

ভদ্রলোক বেশ আপনজনের মতই দুজনের সঙ্গে জমিয়ে নিল। ইংলন্ডের মতো পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষায় দূরে সরে রইল না। হেসে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিল—আমি মার্টিনো, সেভিলিয়া থেকে আসছি।

যে রকম প্রেমসে সে সেভিল শহরকে সেভিলিয়া বলে বলল তা অন্য অন্য হিস্পানিদের সেভিলিয়া বলার চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। বেশ বোঝা যায় ভদ্রলোক একটু সংস্কৃতি-ঘেঁষা; পড়াশোনা আর পৃথিবীর সঙ্গে ভালোরকম পরিচয় আছে। রমেনের তো এই রকম লোকের সঙ্গেই দরকার।

রমেন নিজের পরিচয় দিল।

মার্টিনো সিনরাকে বলল—আপনি আমাদের নূতন অতিথিকে যা যা উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন জীবন্ত তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আমি দুঃখিত যে আপনার কথার মধ্যে বাধা দিয়ে ফেলেছি। তবে আমার শুনতে এত ভালো লাগছিল যে এই সঙ্গের মধ্যে যোগ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি।

সিনরা সবিনয়ে হাসিমুখে ধন্যবাদ দিল।

মার্টিনো তখন বলল—সিনরা, আপনি সিনর পিয়োত্রাকে একটা রমেরিয়াতে যোগ দিবার ব্যবস্থা করে দিন।

রমেন উৎসুক হয়ে উঠল। বাঃ, স্পেনের দৃশ্যপট একটার পর একটা বেশ সুন্দরভাবে চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে।

রমেরিয়া?—রমেন উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল। দুজনের দিকেই চেয়ে।

অর্থাৎ তোমরা যে কেউ আমায় এই নতুন ব্যাপারটার কথা শোনাতে পারো।

স্পেনে সবাই কথা কয়। বিদেশীর সঙ্গে আরও বেশি করে। আর এই হোটেল মহিলা একজন বিদেশীকে তার নিজের দেশের মন-মাতানো ব্যাপারগুলির সন্ধান দিচ্ছে। কাজেই সে-ই শোনাল রমেরিয়ার রমনীয় কথা।

রমেনের দেশে লোকে বনভোজন করতে যায় নিরবিলি জায়গায়। সাধারণত বনে জঙ্গলে নয়, লোকালয়ের ধারে কাছে। আর শনিবার হিস্পানিয়াতে লোকে রমেরিয়া করে অর্থাৎ চড়ুইভাতিতে বেরিয়ে পড়ে, গীর্জা বা অন্যান্য ধর্মের স্থানে আর হোলি ডের বদলে হলিডে পালন করে সেখানে।

রমেন মনে মনে বলল—বাঃ, বেশ তো পুণ্য তিথিকে ছাপিয়ে ওঠে পূর্ণ স্ফূর্তি।

প্রৌঢ়া বলল—ওঃ, সে এক ব্যাপার। আনন্দ-সন্ধানীদের সে এক বিরাট মিছিল চলে। রঙ-বেরঙের শোভাযাত্রা। ঝকমকে সাজপোশাকে সাজিয়ে দেওয়া হয় ঘোড়াগুলিকে, মিউল টানা গাড়িগুলিকে। রঙের ফোয়ারায় দিলদরিয়া হয়ে যায়। সিনর পিয়োত্রা, আপনাকে একবারে রমেরিয়াতে যেতেই হবে।

সুযোগ হবে কি না, সংগতিতে কুলাবে কি না কে জানে। তবু রমেন বলল—খুব খুশি হব তাহলে।

মার্টিনো এবার বলল—সিনর পিয়োত্রা, আপনি যখন এত ভোরে তৈরি হয়ে গেছেন, আসুন এই সুন্দর সকালটা মাদ্রিদের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যাক।

রমেন তো পা বাড়িয়েই ছিল। এখন হাতে স্বর্গ পেল।

মার্টিনো বলল—চলুন আজ শুধু পুয়েত্রো দেল সলের চারপাশেই ঘুরবেন। এই সিটি সেন্টারের দশ মোড় থেকে ট্রাম সব দিকেই যাচ্ছে মিষ্টি টুং-টাং আওয়াজ করতে করতে। অন্যান্য শহরের ট্রামের মতো ঘড় ঘড় শব্দ করে নয়। আপনাকে দেখিয়ে দেব কোন্ দিক থেকে কত নম্বর ট্রামে চড়ে কোথায় যেতে পারবেন। আর তাছাড়া রোম্যান্টিক গলিগুলিব সন্ধান।

রমেন জেনে এসেছিল যে শুধু শহরের কেন্দ্রমণি নয়, এই সূর্যতোরণ হচ্ছে একটা অন্তরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বাঁধা আধখানি চাঁদ ভাঙা। দশটি রাস্তা এখান থেকে দশ দিকে চলে গেছে অথচ এর একটা ক্ল্যাসিক্যাল মায়ায় ঘেরা অন্তরঙ্গতা আছে।

খোলা মন আর মুগ্ধ চোখ দিয়ে সে ভোরের সূর্যতোরণের দিকে উদ্দেশ্য করে বলে ফেলল—এইখানে সত্যিকারের টুরিস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হচ্ছে ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকা। জাদুতে ভরা ভোরের এই প্লাজা।

সবিস্ময়ে মার্টিনো বলল—আশ্চর্য, আশ্চর্য, সুন্দর আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি সত্যি এস্পানিয়াকে ভালোবাসতে পারবেন।

রমেন আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করল না। অকপটে স্বীকার করল—এখন আমি বুঝতে পারছি কেন এত কবি সাহিত্যিক আর গীতিকাররা সূর্যতোরণের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। অবশ্য যেভাবে আধুনিকতা ধেয়ে আসছে কতদিন এমন থাকবে?

তারপর সে রবীন্দ্রনাথ থেকে দুটি লাইন এই জায়গাটির প্রতি নিবেদন করল। গভীর গলায় তার আবৃত্তি—

'তোমার নয়ন জ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান।'

অচেনা ভাষায় অজানা ভঙ্গিতে এই কথাগুলি শুনে মার্টিনো তার মানে জানতে চাইল।

উৎসাহিত হয়ে রমেন ইংরেজিতে অনুবাদ শুনিয়ে দিল। মার্টিনোর মনে কথাগুলি যাতে আরও বেশি সাড়া জাগায় সে জন্য সে তার নতুন শেখা সামান্য স্প্যানিশেও অনুবাদ করার চেষ্টা করল।

মুগ্ধ হয়ে মার্টিনো শুনল।

একটু পরে বলল—কিন্তু প্রেমবেদনার আপনারা কতটুকু জানেন? সে জানে আমার হিস্পানি মেয়েরা। মর্মে মর্মে তারা ব্যথা আর ব্যর্থতা ভোগ করে। জ্বলে তারা মুখ বুজে। মনে মনে দগ্ধে মরে।

শুনে রমেন অবাক হয়ে গেল। সে অবশ্য সেইধরনের কিছু শুনেছিল। তা বলে এত তীব্র সেই যন্ত্রণা? এত হাহাকারে ভরা, হতাশ্বাসে ঘেরা?

সে জিজ্ঞাসা করল—আপনাদের দেশে এত আনন্দ উল্লাস, এত প্রেমগাথা; তবুও কী করে ঘটে এত বেদনা, দীর্ঘশ্বাস, এত আত্মনিপীড়ন? সে কি সম্ভব?

মার্টিনো বলল—সেটাই আমাদের জীবনে একটা হেঁয়ালি। আমাদের জানলাগুলি দেখছেন? এত যে শ্যামল লতাপাতার কেয়ারি তাকে ফোটানো হয়েছে হৃদয়হীন লোহার বাঁধনে। এই পুয়ের্তার উপরেই দেখুন। কেমন সব কারুকার্য ভরা লোহার 'রেহা' অর্থাৎ গ্রিলের গরাদ দিয়ে বন্ধ করা। ওই গরাদের ওপারে প্রেয়সী প্রেমবাসনায় পোড়ে। আর এপারে প্রেমিক সেরিনেড করে গানে গানে প্রেমবেদনা জানায়। আমাদের ভদ্রঘরের মেয়েদের পর্দা সেই মুসলমান মুরদের যুগের মতই কড়া। রাতের আঁধারে ওরা প্রেমের বাণী চালাচালি করে। উন্মাদনা দুপক্ষের মধ্যেই প্রচণ্ড। এমন কি রাস্তায় অন্য কোনও প্রণয়প্রার্থীকেও সে আসতে দেবে না। খুন খারাপি পর্যন্ত হয়ে যায়।

বাঙালি কবির বর্ণনায় অভিসারের পথে থাকত শুধু চোরকাঁটা।

রমেন মৃদুস্বরে বলল—প্রেমের পথ কোনও দেশেই ফুলে ছাওয়া থাকে না।

মার্টিনো উত্তেজিত হয়ে উঠল—ফুল? এ দেশে কাঁটাই শুধু নয়। তলোয়ারের ফলা নিয়ে বাপ ভাই এরা অপ্রার্থিত প্রেমিককে তাড়া করে। অন্তত গলির মোড় পর্যন্ত। আপনারা আমাদের প্রচণ্ড প্রেমের কথা পড়েছেন, ডন জুয়ানের কাহিনিও জানেন। কিন্তু সাধারণ ভদ্র বা অভিজাত বংশের হিস্পানি মেয়ের করুণ অবস্থা জানেন না।

রমেন বলল, তার মানে আপনাদের সমাজের চোখে প্রেম একটা রোগ। স্প্যানিশ কবিতা নাটক পড়ে মনে হয় যে এদেশের লোক প্রবল প্রেম অনুভব করে। তার মানে এটা একটা উৎকট রোগ। প্রথম দর্শনেই যা মানুষকে কাহিল করে ফেলে।

মাথা নেড়ে মার্টিনো বলল, অবশ্যই তা করে। একটুকু চোখে চোখে চাওয়া, একটা সুগঠিত দেহ দেখা আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড প্যাশনের আগুন জ্বালা শুরু।

রমেন বলল, দেখুন আমি যে দেশ থেকে আসছি সে দেশেও প্রেম খুব সহজ নয়। তবে আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে আর সব জানলা খুলে যাচ্ছে।

সযত্নে মমতা দিয়ে কারুকার্য করা লোহার গরাদগুলির দিকে তাকিয়ে রমেন যোগ করল—আজকাল তো সদব দরজা পর্যন্ত খুলে যাচ্ছে।

মার্টিনো বলল, শুনে খুব সুখী হলাম। আমাদের দেশে এই ত্রিশের দশকেও একটা সংঘাতিক বিপ্লব না আসা পর্যন্ত তা সম্ভব হবে না। এই তো ইংলন্ডে গিয়ে দেখলাম যে তাদের তরুণ তরুণীরা ডাহা প্রেমে পড়েও সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজেদের বেশ সামলিয়ে চলে। আমার মনে হল যে ওরা এমনি শালীনতার সাধনা করে দিনের বেলা যে সন্ধ্যায় কাজকর্ম সারার পর হুইস্কি না টানা পর্যন্ত প্রেম আর শানিয়ে ওঠে না।

রমেন বলল—সেটা তো ভালো ব্যবস্থাই মনে হয়। কাজের বেলায় কাজী; কাজ ফুরোলেই মজি।

হতাশার ভাব মুখে ফুটিয়ে মার্টিনো জানাল, কিন্তু আমরা যে সারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই প্রেম করতে চাই।

চোখে হাসি টেনে এনে রমেন শুধাল—অতি উত্তম আদর্শ; কিন্তু বাধাটা কোথায়?

বাধা? বাধা? মার্টিনো একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল—বাধা হচ্ছে বিবাহ। আমাদের মধ্যে প্রেম তখনই শুধু চালাতে দেওয়া হবে যখন তার শেষ আর শীঘ্র লক্ষ্য হচ্ছে বিয়ে। হ্যাঁ এর নাম না কি প্রেম?

দুজনেই চুপ করে হাঁটতে লাগল। রমেন যে এদেশে আসার আগে এত স্পানিশ প্রেমের কবিতা পড়ে এসেছে সেগুলি এখন কেমন যেন পানসে আর বিবর্ণ মনে হতে লাগল। শুধু সাজানো বাগানে কী হবে—যদি সংসারেই ফুল না ফোটে?

ততক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মার্টিনো বলল, হ্যাঁ, বাপ মা-র অমতে দুজনেই পালিয়ে বিয়ে করতে

পারে। তবে পৈত্রিক সম্পত্তি একেবারে ত্যাগ করতে হবে।

রমেন মৃদুস্বরে বলল—প্রেম তো পয়সার চেয়ে বড়।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু ওই যে হোটেলের সিনরাকে দেখেছেন। সে সারা জীবন গরাদের ওপারে থাকতে চায় নি। প্রেম করে বেরিয়ে এসেছিল, আর এখন কী করছে তা তো দেখলেন!

॥ ৯॥

মন কেমন করছে নাকি সিনর পিয়োত্রা? খানিকটা হেঁটে বেড়ানোর পর ওরা পথের পাশে একটি কফিখানায় বসে ছিল। রমেনের মন সত্যি একটু উদাস হয়ে গিয়েছিল। বাংলা কাব্য সাহিত্য পড়া মন অসহায় প্রেমের দুঃখ আর নিরাশার ছবি দেখতে অভ্যস্ত। নিজের দেশে একরকম অনেক ঘটনা দেখেছে। কিন্তু ইয়োরোপেও?

ইউরোপ যে মানুষকে মূল্য দিতে শিখেছে। তবু এমন কেন হয়?

নিজেকে সে একটু প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল। আর যাই হোক স্পেন হচ্ছে ইয়োরোপের ভারতবর্ষ। পুরোপুরি না হলেও বেশ খানিকটা। ধনী দরিদ্রের ব্যবধানে, অভিজাতদের দেশের প্রতি কর্তব্যে উদাসীনতায়, সমাজের রক্ষণশীলতায়। না হলে এ দেশে তো পর্দা নেই, তবু প্রেমের বেলা এত কড়াকড়ি। বিয়ের গাঁটছড়াকে বেঁধে রেখেছে বাপ মায়ের আর সমাজের দড়াদড়ি।

মার্টিনো বলল—আপনি তো শুধু একটি সংসারের মধ্যেকার নারীর উদাহরণ দেখলেন। নারীর মর্মবেদনা যদি বুঝতে চান শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সব মেয়ে 'নান' অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে তাদের কথা ভেবে দেখুন। ছেলে মেয়ে দু পক্ষেরই জন্য এ দেশে গীর্জায় ঢুকে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড প্রফেশন।

রমেন বাধা দিল—কিন্তু তারা তো নিজেরা যেচে, সংসার ছেড়ে গেছে, মঠে দীক্ষা নিয়েছে, সংসারের বাইরের সুখ পেয়েছে, সম্ভবত উপরেরও।

কঠোর প্রতিবাদ করল মার্টিনো—হ্যাঁ, বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হবে বটে। কিন্তু গীর্জার কী দারুণ দাপট এই দেশে—বিশেষ করে মেয়েদের উপর—তা তো জানেন না। প্রত্যেক প্রাদেশিক শহরে গীর্জা থেকে শাসিয়ে দেওয়া হয়—এই বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ বছরের পরেও—যে মেয়েরা খাটো পোশাক পরবে না, বারো বছর বয়স থেকেই হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলের স্কার্ট লম্বা গাউন পরবে, পাতলুন পরবে না, খাটো হাতা ব্লাউজ পরবে না। আঁটসাঁট পোশাক পরলে নাকি অসতী হয়ে যায়। একলা অথবা নিরবিলি জায়গায় বেড়ানো নাকি অসচ্চরিত্রের লক্ষণ। ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন আপনি এর চেয়ে নান হয়ে মঠের নামধারী কেল্লার মধ্য নিজের যৌবনকে লুকিয়ে চেপে রাখা সহজ কি না।

রমেন বুঝল যে মার্টিনোর মনে কোনও নিদারুণ দাগা আছে। সহানুভূতির সঙ্গে বলল—যারা বিশেষ করে ছোট ছোট জায়গায় এই সব অনুশাসন মেনে চলতে চায় না তারা বোধ হয় সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে সব সয়ে নিতে পারে। শেষ পর্যন্ত শান্তিও পায় হয়তো।

মার্টিনো আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল—সিনর পিয়োত্রা, আমি শুধু কটি পুরোনো গানের গোটা কয়েক লাইন আপনাকে শোনাব। এই গানটা নাকি সমস্ত 'নানারি' মানে সন্ন্যাসিনীদের মঠেও গোপনে গাওয়া হয়। তাঁদের মর্মবেদনা।

"কি হবে রূপ আর লাবণি দিয়ে?
যদি না দেখাতে পারি,
ভোগে না লাগাতে পারি?
জীবন আশাহীনা কি করি নিয়ে?
হায় রে অবিচার!
নিয়তি হাহাকার,
মুকতি পাব শুধু মরণে গিয়ে।"

রমেন স্তব্ধ হয়ে শুনল। যৌবনের অবদমন অনেক দেশেই, অনেক সমাজেই নিষ্ঠুর সত্য হিসাবে চালু আছে। তার নিজের দেশেও যথেষ্ট। তবু এত দারুণ পরিমাণে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু যে দেশ ডন জুয়ানের জন্ম দিয়েছে আর যে দেশে রাশি রাশি ডন জুয়ান জলজ্যান্ত ভাবে বিহার করছে সেখানে মেয়েদের চারধারে এত

লক্ষ্মণের গণ্ডিরেখা এঁকে রাখা কী করে সম্ভব হল?

রমেন তার প্রশ্নটা পরিষ্কারভাবে মার্টিনোর সামনে তুলে ধরল।

মার্টিনো হেসে জবাব দিল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমি নয়া জমানায় জন্ম নিয়েছি। শিক্ষা পেয়েছি বার্সিলোনায়, সেখানে ছাত্রমাত্রেই কম বেশি বিপ্লবী। আপনাদের অক্সফোর্ডকে...

রমেন বাধা দিল—আমাদের অক্সফোর্ড? কবে থেকে?

মার্টিনো গম্ভীরভাবে বলল—ইন্ডিয়া ইংলেসের সব ছাত্রই, আমি মনে করি যে, অক্সফোর্ডে পাঠ নিয়েছে। অবশ্য বেশির ভাগ মনে মনে নিয়েছে। সেই জন্যই তো আপনাদের দেশে এত আন্দোলন, স্বাধীনতার চেষ্টা সব কিছু ছাত্ররা চালাচ্ছে। ইংল্যান্ডে শেষ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে নেতা হয়েছে। গ্যান্ডি ফর ইনস্‌টান্স।

রমেন মনে মনে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্মরণ করল। দেশে থাকলে সে-ও হয়তো এতদিনে সত্যাগ্রহে যোগ দিত। অক্সফোর্ডের স্বাধীনতার ছোঁয়াচও তার মনেও লেগেছিল।

সে আরেকটি কথা স্মরণ করল। সে লন্ডনের স্কুল অব ইকনমিকসে একবার পলিটিকসের ক্লাসে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। বিশেষভাবে সেজন্য অনুমতি নিতে হয়েছিল। সেখানে লাস্কি সেদিন রাজনৈতিক মতবাদ মহত্ত্বের সঙ্গে মিশে গেলে কেমনভাবে দেবত্বে পরিণত হয় তো ব্যাখ্যা করতে করতে বলেছিলেন যে ভারতের তেত্রিশ কোটি পৌরাণিক দেবতার স্থান দখল করেছেন একজন আধুনিক মানব—মহাট্‌মা গ্যান্ডি।

কিন্তু সেসব চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিলে এই আলাপের খেই হারিয়ে যাবে। সে তাই বলল, হ্যাঁ মানছি যে অক্সফোর্ড আমাদেরও বটে। এখন আপনার কথা বলে চলুন।

মার্টিনো বলল—অক্সফোর্ড হচ্ছে হোম অব লস্ট কজেজ—হেরে যাওয়া আদর্শের মাতৃভূমি। আর বার্সিলোনা হচ্ছে ফ্যাক্টরি অব উইনিং কজেজ্—যে সব আদর্শ জিততে বাধ্য তার প্রস্তুতিক্ষেত্র। সেই সেখানে শিক্ষিত আমি স্পেনের পুরানো পন্থার সব অন্তর্জ্বালাকে তুলে ধরতে চাই। শোধরাতে চাই। তাই আমি অল্প বয়স থেকেই স্পেনের প্রেম আর বিয়ের প্রথাগুলির সমালোচনা করে আসছি।

প্রণয় আর পরিণয়—ভদ্রলোকের প্রাণের মধ্যে পঞ্চশরের লীলা বেশ হিস্পানি ঢঙে রঙিন হয়ে আছে—মনে মনে ভাবল রমেন।

মুখে বলল, আমার কথাটার কিন্তু এখনও জবাব দেননি। আমার কাছে একটু হেঁয়ালি ঠেকছে। যে দেশে যৌবন মানেই প্যাশন সে দেশে নারী কী করে থেকে যায় নাগালের বাইরে? বাসনার আগুনকে কি ওই নকশাকাটা 'রেহার' লোহা ঠেকিয়ে রাখতে পারে চিরকাল? আপনি তো বলছেন যে আগুন ওপাশেও জ্বলছে। এমন কি নানদের লম্বা ঝুলওয়ালা কালো গাউনের ভিতরেও।

মার্টিনোর উত্তেজনা ততক্ষণে একটু যেন শান্ত হয়ে এসেছে। সে বলল, বেশ দার্শনিক ভাবে বলল—সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছে আমাদের মেয়েদের অসামান্য রূপ। রূপ হচ্ছে সমুদ্রের মতো উত্তাল। শ্যাম্পেনের মতো মাথায় চড়ে যায়—একেবারে সর্বনাশ এই মধুরা মদিরা। তাই একে আপন করতে হয় সামান্য পরিমাণে। রয়ে সয়ে। কিন্তু তা কি সম্ভব তরুণ রক্তে?

বহু না-বলা বেদনা লুকানো ছিল এই ছোট্ট প্রশ্নে। বহু অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস, অপূর্ণতার হাহাকার। রমেনের মন সহানুভূতিতে ভরে গেল। সে ঠিক করল যে নিজে থেকে সে এই প্রসঙ্গ আর তুলবে না।

কিন্তু মার্টিনোই এ প্রসঙ্গটা ছাড়ল না। সে গভীরভাবে যোগ করে দিল—সংস্কার আর সময় এগিয়ে চলতে চায় না। তরুণই শুধু বুড়িয়ে যায়।

রমেন নিঃশব্দে নীরবে একবার মার্টিনোর মুখের দিকে তাকাল। আর কিছু না।

মার্টিনো দীর্ঘশ্বাস ফেলল—এদিকে চার্চ চায় যে তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক। যৌবনের রোগ ওদের চোখে অমার্জনীয় অপরাধ। আবার বাপ-মায়েরাও অল্পবয়সের বিয়ে পছন্দ করে। ওরা অবশ্য অন্য কারণ দেখায়। রক্ষণশীল নয়, রোম্যান্টিক কারণ। বুঝলেন কিছু, কারো মিয়ো?

কারো মিয়ো অর্থাৎ প্রিয় আমার বুঝি বুঝি করেও বুঝতে চাইল না। সে তো এদের চোখ দিয়ে এদের দেশকে দেখবার একটা খাঁটি সুযোগ পেয়ে গেছে। সেটা ছাড়বে কেন? মনে মনে কিন্তু ওর রিপোর্টের মালমশলা তৈরি হচ্ছে।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে মুটিয়ে যায়। আমাদের ক্যাথলিক ধর্মের কল্যাণে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। ঘর ভাঙার ভয়ডর নেই। তাই বিয়ের পর থেকেই মেয়েরা দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে সুখে স্বচ্ছন্দে মুটোতে থাকে। খাওয়া-দাওয়াটা যে কত ভালো আর সস্তা তা তো দেখছেন। কাজেই কী মর্মান্তিক ব্যাপারটা কত সহজে শুরু হয় ভেবে দেখুন। আর কোনও দেশে কি বিবাহিতা তরুণীরা এত শীঘ্র মুটোয়?

রমেন সে দিক দিয়ে গেল না। মুটিয়ে যাওয়ার চেয়ে রোমান্সের ব্যাপারটা অনেক বেশি পাঠককে টানবে। সে তো পাঠকদের জন্যই লিখছে। সমাজের ইতিহাস নয়।

—কিন্তু বাপ মায়ের কাছে একটা রোম্যান্টিক কারণ আছে যে বললেন আপনি।

—বললাম তো। বাপ মায়েরাও তো অল্প বয়সেই বাপ মা হয়েছে। মনের রস কষ তো শুকিয়ে যায়নি। তাই ওরা চায় যে মেয়ে যতদিন তন্বী থাকবে তত বেশি দিন তার তরুণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রোম্যান্স খুঁজে বেড়াবে। ওরা জামাই বাবাজীকে তাড়াতাড়ি স্বপ্নভঙ্গের দুঃখের মধ্যে ফেলতে চায় না। ঘরে মুটকি বৌ আর বাইরে তন্বী রক্ষিতা এই দুয়ের সমন্বয় বাবাজী কবে শুরু করে দেবে কে জানে?

রমেন হাসল, কিন্তু ইংলন্ডে তো দেখলাম মেয়েরা বেশ পাতলা ছিমছাম থাকছে অনেক বয়স পর্যন্ত। আপনাদের মেয়েরা এত লাবণ্য সত্ত্বেও তারুণ্যের ছোপ বজায় রাখতে চায় না না কি?

বেশ বিজ্ঞের মতো মার্টিনো জবাব দিল—যা সহজে পাওয়া যায় তা রাখবার জন্য কেউ কষ্ট করে না। তার দাম দেয় না। ইংল্যান্ডে দিন-রাতে যে ঘর ভাঙছে দুড়দাড়, বিয়ে-থা হয়ে যাচ্ছে সাবাড়। তাই সেই ঘর বজায় রাখার জন্য মন রাখতে হয় অহরহ।

রমেন বলল—সে কথা ঠিক। অনেকের সঙ্গে পাল্লায় একেশ্বরী থাকার বাসনা সৌন্দর্য সাধনার একটা মূল মন্ত্র।

নতুন দেশ এবং এত অতিথিবৎসল দেশ। তার একজন সম্ভবত নিরাশ আর পরাজিত যুবকের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে তার দেশের সম্বন্ধে সমালোচনাই বেশি হয়ে যাচ্ছে। এই ভেবে রমেন কথার মোড় ঘোরাতে চাইল।

—তা দেখুন, সব দেশেই, এমন কি হালের ইংল্যান্ডেরও কুমারী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে গেলে অথচ বিয়ে না হলে 'আর্ট ভয়েজে' পাঠানো হয়। অর্থাৎ ফ্যাসন মাফিক আর্টের স্কুলে নাম লিখিয়ে রাখা বা বিদেশ বেড়াতে গিয়ে মনোমত পাত্র গেঁথে তোলা এসব ব্যবস্থা খুব চালু আছে। এটাকে বলতে পারেন রোম্যান্সের মিস্টিসিজম। তা...তা...

রমেনকে একটু ইতস্তত করতে দেখে মার্টিনো বলল—বলেই ফেলুন না আপনার গোপন প্রশ্নটা। আমি তো বিদেশী অতিথির কাছে এমনভাবে মন খুলে ধরেছি যা গীর্জায় গিয়ে পাদ্রির কাছে গোপনে পাপের স্বীকারোক্তি কনফেশনের সময়ও করব না।

রমেন এক মুহূর্ত ভেবে নিল। দেখি না একটু তল ফোঁড় দিয়ে। সন্তর্পণে একটু ডেপথ চার্জ দিয়ে মন দরিয়ার কোন্ ডোবা তরুণীটি ভেসে ওঠে।

—মানে, আপনি বেশ মিস্টিক মনে হচ্ছে এ সম্বন্ধে। তাই ভাবছিলাম কোনও মিস্টিক রোম্যান্স...

হো হো করে হেসে উঠল মার্টিনো—রোম্যান্সের মিস্টিসিজম বুঝবার জন্য মিস্টিক হবার দরকার আছে না কি? ভালোবাসা বুঝবার জন্য আপনাকে নিজেই প্রেমে পড়তে হবে না কি? কী বলেন, কারো মিয়ো?

সপ্রতিভ ভাবে রমেন উত্তর দিল—প্রেমের দেবতা হচ্ছে অন্ধ। কাজেই যে প্রেমে পড়ে সে অনেক কিছুই দেখতে পায় না। সেই জন্য প্রথম প্রেমের নিমেষে রোম্যান্স হয়ে ওঠে গভীর, গাঢ়। অনেক জিনিস ঢাকা পড়ে যায়। তাই রোম্যান্সে মিস্টিসিজম মিশে যাওয়া সহজ।

মার্টিনো এই ভিনদেশী নতুন তরুণ বন্ধুর পিঠ চাপড়িয়ে বলে উঠল—ওলে, ওলে। সাবাস, সাবাস। তাহলে আমি এখন খোলাখুলি বলেই ফেলি, হে আমার আমিগো ইন্টিমো, একটা বিশেষ সদুপদেশ।

আমিগো ইন্টিমো অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাসিমুখে বলল—সদুপদেশ সব সময়ই আমি চাই। যদিও সব সময় সেগুলি সদুপদেশ নয়। অথবা হয়তো আমি নিই না।

—তার মানে? মার্টিনোর আয়ত চোখ দুটি প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন বড় হয়ে উঠল।

—মানে, মানে হচ্ছে যে, যে রকম ভাবে আপনি গীর্জার ব্যাপারে গরম হয়ে আছেন তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে আপনি একটা গীর্জার না হোক মঠের গ্রীলের ওপারের কোনও দীক্ষিতা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে প্রেম

করতে সদুপদেশ দেবেন।

—আপনার মতো দিলখোলা অথচ চোখ-বোজা বালককে অনেক উপদেশ দেওয়া দরকার।

রমেন একটু বিব্রত বোধ করল। সে দিলখোলা ভাবে চলছে নিশ্চয়ই। নিজে মন খুলে কথা না বললে কারও মন থেকে কথা টেনে বের করতে পারবে না। যে কাজ তাকে করে যেতে হবে সে জন্য অনেকের সঙ্গে মিশতে হবে, অনেকের মনের কথা জানতে হবে। তাই সে দিলখোলা।

কিন্তু চোখ বোজা?

কোন্ জিনিসটা সে দেখতে পাচ্ছে না? অথবা দেখেও দেখছে না? ভদ্রলোককে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করাই ভালো। যদি দরকারি কিছু নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে তা সময় থাকতে খেয়াল করাই ভালো।

তাই সে জানতে চাইল যে কোন্ জিনিসটা সে দেখছে না। কিসের জন্য শুধু এই সকালবেলার ভ্রমণের সাথী তাকে চোখবোজা বলে মনে করছে?

মার্টিনো বেশ রহস্যময় একখানা হাসি হানল।

হানাই বলা চলে—এমনি ভাবে মার্টিনো হাসিটুকু বেশ তেরছা ভাবে প্রকাশ করল।

রমেন বলল—আপনি একেবারে হেঁয়ালিতে নিজেকে ঘিরে রাখছেন। আপনার হাসিব মানে খুঁজে বের করা আমার মতো আনাড়ি, সংসারে অনভিজ্ঞ লোকের কর্ম নয়।

হিস্পানি হাসিটুকু আরও তেরচা হয়ে রমেনের মুখের ওপর নেমে এল। যেন টলেডো শহরের তৈরি ঝকমকে মিনার কাজ করা একটা বাঁকানো তলোয়ার ওর মুখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

রমেনের হঠাৎ মনে হল যে যারা খুব প্রচণ্ডভাবে 'প্যাশনেট' ভাবে প্রেমে পড়ে এই নির্বিকার সংসাবেব হৃদয়হীন দোলানিতে ছটফট করতে বাধ্য হয় তাদের মনের অবচেতনে সম্ভবত এমনি একটা রহস্যবিধুরতা বিরাজ করে। মার্টিনো কোনও ঘটনা খুলে বলে নি। কিন্তু যেরকম মনোভাব প্রকাশ করেছে তাতে অনেক কিছু কল্পনা করে নেওয়া যাক। অনেক আশাহীনা বেদনার চুনী পান্না তার মধ্যে মনোলীনা হয়ে আছে।

মার্টিনো কিন্তু নিজের অন্তরের কোনও আভাসই দিল না। কেন সে ওকে চোখ বোজা বলেছে তাও ব্যাখ্যা করল না। শুধু যেন বেশ বিশ্বস্ত ভাবে, অন্তরঙ্গ ভাবে বলছে এমনভাবে গলার স্বর নামিয়ে অনুরোধ করল—আমি গো, আপনি কার্টা আসোরাসা লিখতে শিখুন। শীঘ্রই প্রেমপত্র লেখার প্রয়োজন হবে।

হো হো করে রমেন হেসে উঠল। এই শহরের মধ্যে যথেষ্ট হৈ হৈ হল্লা উচ্চহাস্য প্রভৃতি শোনা যায়। এই পাড়ার শব্দ লহরিও তো ভোর থেকেই শুরু হয় ট্রামের টুং টুং ধ্বনি দিয়ে। তবু তারও মধ্যে রমেনের হাসি সকলের নজরে পড়ার মতো প্রাণভরা হাসি।

তার বন্ধুও সেই হাসিতে যোগ দিল।

হাসির ঢেউ দূরে সরে যাবার পর মার্টিনো গতরাতে হোটেলের রিসেপশন লাউঞ্জে তার চেহারা সম্বন্ধে কী আলোচনা হয়েছিল তা জানাল।

—আপনি তো খাবার পর সবাইকে বুয়েনস নচে শুভরাত্রি জানিয়ে আর রিবেরা পরিবারকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে কয়েক মিনিট পরে ঘরে চলে গেলেন।

একটু যেন কৈফিয়ত দেবার মতো করে রমেন বলল—হ্যাঁ আমি সারাদিন ট্রেনে চড়ে বেশ ক্লান্ত ছিলাম, তা ছাড়া এদেশের গভীব রাত পর্যন্ত জেগে থাকার অভ্যাসটা এখনও রপ্ত হয়নি তো।

—ওঃ তাই বলুন। কিন্তু বন্ধু, এ দেশকে যদি জানতে চান তবে রাত জাগতে শিখুন। না হলে সব মজাই মাটি।

—কেন?

—বাঃ রে, রাতেই তো লোকে জানে লোকের চোখ খোলে, মন কথা কয়।

রমেন মনে মনে ভাবল—অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিরা যে রকম লিখেছিলেন বাহির কৈনু ঘর তেমন আমাকেও এদেশে রাতি কৈনু দিবস ভাবতে হবে।

মুখে বলল—এবার থেকে তা-ই করব। সামান্য একটু অভ্যাস বদলিয়ে নেওয়া, এ আর বেশি কী?

—অবশ্য বেশি কিছুই নয়। তবে পরিবর্তে আপনার লাভ হবে অনেক, অনেক। আসল এস্পানিয়াকে জানতে হলে রাত জাগতে হবে। রাত কী রানী আমাদের রূপসী এস্পানিয়া।

বলেই মার্টিনো আবার সেই রহস্যে ভরা হাসি হাসল।

তারপর গতরাতের আলোচনায় রমেনের সম্বন্ধে হোটেলের অতিথিদের কী মতামত হয়েছিল তার সারাংশ জানাল। এত কৌতূহলে ভরা, কিন্তু কল্পনায় ঘেরা সেই মতামত।

জানেন, প্রথমেই আপনার চেহারা নিয়ে সবাই পড়ল। তা আমি, আগেই বলে রাখছি, সিনর যে শুনে শুনে আমার একটু জেলাসি হয়েছিল। তবু কোনও কেরিদা (প্রেয়সী) যখন এই বর্ণনার মধ্যে জড়িত নেই তখন আপনাকে মাপ করে দিচ্ছি। তবে একটু হুঁশিয়ারও করে দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে।

রমেনকে উসখুস করতে দেখে সে শুরু করল—আমরা তো এদেশে ভারতবর্ষের লোক বিশেষ দেখি নি। তাই আপনার চেহারা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। দেখলাম যে জিব্রল্টারের দোকানদারদের মতো চেহারা মোটেই নয়। গায়ের রঙ একরকম বটে, তবে আমরা তো গায়ের রঙ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাই না।

—তবে?

—মুশকিলে পড়লাম চেহারা নিয়ে। আপনার চেহারাটা আমাদের চোখে বড্ড চেনা চেনা ঠেকল। যেন সবাই এই মুখের ধাঁচ, ওই চোখের চাহনি, সব মিলিয়ে একটু সুকুমার উপস্থিতি আমাদেরই কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হিস্পানির মধ্যে দেখেছি।

সলজ্জ ভাবে রমেন বলল—আমি খুব 'ফ্লাটারড্ ফিল' করছি বন্ধু। অবশ্য লজ্জাও লাগছে যে আমার মতো সামান্য একজন ছাত্রকে আপনারা এত আলোচনার যোগ্য বস্তু বলে মনে করছেন।

—সামান্য? জানেন, আমরা সবাই কাল ওই ম্যুরাল, আর ফ্রেস্কো পেন্টিং দিয়ে সাজানো রিসেপশন লাউঞ্জে বসে আপনার চেহারার মধ্যে কাকে খুঁজে পেয়েছি?

রমেন হাসল—মানছি, যে স্পেনের সুরা খুব অদ্ভুত পদার্থ। সারা পৃথিবীটাকেই ভালো লাগিয়ে দেয়। এহেন মন্তব্য করে আপনি আমাদের চোখ আর রুচিকে অসম্মান দেখাচ্ছেন, সিনর।

অসন্তোষ দেখিয়ে মার্টিনো চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠে পড়ল। আবার কী ভেবে ধপাস করে বসে পড়ল। পথের পাশে কফিশালা। রাস্তা থেকে দেখা যায়। তাই বোধ হয় নিজেকে সামলিয়ে নিল।

—না, মশায় না। শুধু অমন্টিল্লাদো সুরা খেয়ে আমাদের চোখের বা মনের রঙ বদল হয় না। অত নাবালক নই আমরা। অবশ্য রিবেরা পরিবার আপনার সম্মানে শ্যাম্পেন খেয়েছিল। দি কুইন অব ওয়াইনস জাগিয়ে তোলে বাসনার রানীকে। বলতে বলতে মার্টিনোর চোখ একটু যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। রমেন তা নজর করেও কোনও গুরুত্ব দিল না।

মার্টিনোর ভাষ্য আবার চলতে লাগল। জানেন, আমরা বিচার করে দেখলাম যে আপনার মুখখানা একটু সরু, বুদ্ধিদীপ্ত, তরতাজা। একটু লম্বাটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফ্রেঞ্চকাট রাখলে বেশ ঢাকা পড়ে মানিয়ে যাবে। আপনার কালো চুলের নিচে কপাল একটু উঁচু কিন্তু বেশ অভিজাত, চোখ দুটি গভীর, নজর করতে অভ্যস্ত আর চিন্তাশীলতায় ভরা। আপনার ঔৎসুক্যের মধ্যে বুদ্ধির ছাপ আছে কিন্তু ইমোশনের অভাব। আর কেমন একটা নির্লিপ্ততা রয়েছে সব কিছুর মধ্যে। সম্ভবত একটু মিস্টিসিজম মাখানো আছে আপনার মুখে।

সব বিশেষত্বের তালিকা হল। কিন্তু কোন্ বিশেষ হিস্পানির মধ্যে আমরা এত সব দেখেছি? এবং কোন্ সেই হিস্পানি যার ছবির সঙ্গে আমাদের হামেসা সাক্ষাৎ হয়?

অনেকে অনেক বিখ্যাত স্প্যানিয়ার্ডের চেহারা উল্লেখ করলেন—কবি, নেতা, রাজপুত্র, জেনারেল, ডিউক, চিত্রকর। এমন কি প্রাদোর গ্যালারির ছবি পর্যন্ত। কিন্তু চেনা-চেনা অথচ মিলছে না। এমনই এই একস্ট্রানহেরো বিদেশীর চেহারা।

শেষ পর্যন্ত একজন বলে উঠল—ইউরেকা। আমি আবিষ্কার করেছি এই নতুন একস্ট্রানহেরোর মুখ কিন্তু যার মতো দেখতে সে-ও আরেক বিদেশী। অবশ্য স্পেন তাকে নিজস্ব হিস্পানি করে আপনজন করে নিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী এল গ্রেকো। সিনর, আপনার মুখখানা হচ্ছে এল গ্রেকো। আর...আর কে এই আবিষ্কার করেছে জানেন?

রমেন কিছু বলার আগেই মার্টিনো রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে জানাল—সিনরিনা ইসাবেল রিবেরা।

॥ ১০॥

বুয়েনস ডিয়াজ, সিনর রিবেরা।

বুয়েনস ডিয়াজ, রামন।

রমেন সুপ্রভাত জানাবার সময় ভেবেচিন্তেই গতরাতের নিমন্ত্রণ কর্তাকে সিনর রিবেরা বলে সম্বোধন করেছিল। রাতের মায়াময় আলোয় ব্যাংকোয়েট হলে আপনা থেকেই মানুষ কাছাকাছি হয়ে যায়। অল্প আলাপের পরেই ভিনোর উষ্ণতার মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তখন যাকে পরিবারের আর সবার সঙ্গে সে-ও পেপে বলে ডেকেছে আজ ভোরের নরম আলোর সময়টুকু পার হয়ে যাবার পরে সেই ডাকনামে কী আর তাকে ডাকা চলে?

তাছাড়া পেপে কথাটা যেন কেমন কেমন করে পাপা অর্থাৎ বাবা এরকম একটা ভাব এনে দেয়। ডন আর ইসাবেলার সমবয়সি বলে ওদের সামনে ওদের সঙ্গে সঙ্গে সে নামে ডাকতে কিছু অসুবিধা নেই। কিন্তু একা নিজে সে যে একজন জেন্টলম্যান অ্যাট লার্জ। মাত্র ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এতটা কাছে আসতে চাওয়া ঠিক নয়।

বেশি বয়সের সম্মান আর দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে এখন। অতএব সিনর রিবেরা।

কিন্তু প্রৌঢ় অবসরপ্রাপ্ত বিদেশে বেড়াতে আসা টুরিস্ট ভদ্রলোকের পক্ষে কোনও ছেলেমেয়েদের বয়সি তরুণকে প্রথম নামে ডাকতে বাধা নেই।

হাসিখুশি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, কী, তুমি এক চক্কর ঘুরে এলে দেখছি। বেশ করেছ। রোমে থাকার সময় রোম্যানদের মতো চলতে হয়। কিন্তু স্পেন দেখতে এসে স্পেনের লোকের মতো চললে টুরিস্ট ঠকে যাবে। তুমি ভোরে বেরিয়ে পড়ে ভালো করেছিলে।

রমেনও হেসে বলল—বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আপনিও এদেশের হিসাবে তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়েছেন।

রিবেরা বললেন—হিসাবে আমি অনেকটা সুইজারল্যান্ডের লোকদের মতো। ওরা জাগে তাড়াতাড়ি, তবে ওঠে দেরি করে।

রমেন জানতে চায়, শুনতে চায়। নিজের মন্তব্য বা বিদ্যা জাহির করে সুযোগ নষ্ট করতে চায় না। সে তাই প্রশ্ন করল—আর স্প্যানিয়ার্ডরা?

উত্তরে রিবেরা একটা পালটা প্রশ্ন করলেন—তুমি কি মনে করো যে তুমি একজন গুড স্প্যানিয়ার্ড হবে অথচ বেলা নটার সময় ঘুম থেকে উঠে পড়বে?

বলেই তিনি হো হো করে দিলখোলা হাসি হেসে উঠলেন। হোটেলের সামনের ঘুরপাক খাওয়া কাচের দরজার পাঁচ পাঁচটা পাল্লাই যেন সে হাসিকে প্রতিধ্বনিত করে 'ফাইয়ার' অর্থাৎ রিসেপশন হলের মধ্যে ফেরত পাঠিয়ে দিল। সমস্তটা ঘর গমগম করতে লাগল।

হলঘরের সামনের দিকটা বড় রাস্তার উপরে। ক্যারেরা সান হেরোনিমোর অনেকখানিই উপর থেকে প্লেট গ্লাসের দেয়ালের ভিতর থেকে দেখা যায়।

রমেনকে নিয়ে তিনি সেই কাচের দেয়ালের পাশে বসলেন।

কাচের স্বর্গ।

রিবেরারা আর হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দারা গত রাতে শুতে চলে যাবার পর তার সম্বন্ধে কী সব আলোচনা করেছিল তার খানিকটা আভাস সে মার্টিনোর মুখে শুনেছে। কাজেই রমেন এখন কম কথা বলবে। সে নম্রভাবে রিবেরার কাছে এই দেশ সম্বন্ধে জানতে চাইল।

রিবেরা বললেন—জানো আমরা দু'তিন পুরুষ আগেও স্প্যানিশ ছিলাম। এখন পেরুভিয়ান। পেরুর নাগরিক জাতি শিক্ষা আর বৃত্তিতে। উত্তর আমেরিকার ছাপ আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা এসে গেছে। তার উপর ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ছিলাম বলে অনেক দেশে ঘুরেছি। সবে রিটায়ার করেছি।

খুশি ভাব দেখিয়ে রমেন বলল—আমার কী সৌভাগ্য। আপনার অভিজ্ঞ চোখ এত দেখেছে যে আমার এই দেশ দেখার পক্ষে তার চেয়ে ভালো গাইড আর কিছু হতে পারে না।

মাথা নাড়লেন রিবেরা—উঁহু, ঠিক হবে না। আমার দৃষ্টিভঙ্গি এত বেশি সফিস্টিকেটে হয়ে গেছে যে তা যদি তোমার প্রথম দেখা আর প্রথম ভাবাকে রাঙিয়ে দেয় তাহলে তোমার থিসিসের পক্ষে সেটা অসুবিধাজনক হবে। তুমি নিজে দেখ, নিজে ভাবো। তুমি হচ্ছ ছাত্র। যখন তুমি লেখা শেষ করতে যাবে তখন

বরং আমি বা অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকরা যা মনে করে তার নিরিখে তোমার রায়কে যাচাই করে নিয়ো।

রমেন ভাবতে লাগল। কথাটা বোধ হয় উনি ঠিকই বলেছেন। আমার নিজস্ব প্রত্যক্ষ রিঅ্যাকশন, মতামত এসব যদি প্রথমেই অন্যের প্রভাবের মধ্যে পড়ে তাহলে কি সেগুলিতে আন্তরিকতা থাকবে?

বরং আমি নিজের চোখ দিয়ে দেখব, মন দিয়ে যাচাই করব আর সবার শেষে অন্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছোব।

তখন যদি প্রচলিত ভাবধারার বিপক্ষে নিজের মতামত দিই সেটারও আকর্ষণ থাকবে। এক বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হননি; বরং তাকে হালকা আর সামান্য রূপে দেখিয়েছিলেন। গতানুগতিকের বিরুদ্ধে যাবার জন্য তিনি সবার দ্বারা স্বীকৃত সত্যের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। দেখাই যাক না আমার মনে কী রকম ভাব হয় এই রহস্যমধুরা এস্পানিয়া সম্বন্ধে।

রমেন সে কথা তাকে বলল। তিনি উৎসাহ দেখিয়ে সায় দিলেন।

তারপর রমেনের নিজের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। সেদিন সে কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কী দেখবে প্রভৃতি। এবং দিনের সফরে বের হবার আগেই ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট ডেসুইয়ানো খাবার নিমন্ত্রণ জানালেন।

সে মনে মনে বিব্রত বোধ করল।

গতরাতে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে একটা রাজকীয় ডিনার খেয়েছে। জীবনে প্রথম স্বর্গের উপযুক্ত, দেবতাদের ভোগ্য বলে বিখ্যাত শ্যাম্পেন পান করেছে। আবার এখন ডেসুইয়ানো?

এত আষ্টেপৃষ্ঠে ঋণী হয়ে থাকা ভালো নয়। তার আত্মসম্মান আর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে লেখার জন্য খেয়ালখুশিতে ঘুরে বেড়ানো দুয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। কিন্তু সেকথা এই স্নেহশীল বাপের বয়সি বিদেশী ভদ্রলোককে বলা চলে না। একেবারে নতুন যে ওদের সঙ্গে পরিচয়।

সে ভেবে রেখেছিল যে দুবার কফি খেয়েছে ঘুম থেকে উঠে। অতএব সকালের খাওয়া তার হয়ে গেছে। তার ঘুরে ফিরে দেখা আর শেখার ফাঁকে এক সময় কোনও সস্তা রেস্তোরাঁতে টুরিস্ট মেনু নিয়ে বসবে। শহরতলী এলাকায় চলে যাবে, সেখানে রাইয়ের রুটি নিয়ে বসবে। স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে এই টাটকা রুটির তুলনা নেই। এমন মুচমুচে আর মিঠে। মুখে দিতেই যেন মিলিয়ে যায়। সঙ্গে নেবে একটু মাখন আর জলপাই। দুয়েকটা আঞ্চোভি, হেরিং স্নাতের সামুদ্রিক মাছ, একটু ইলিশ ইলিশ গন্ধ তাতে ভুরভুর করে। ব্যাস, একেবারে সবচেয়ে কম খরচে রাজা-রাজড়ার যোগ্য খানা।

তার সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবে ভিনোভিলা কাসা অর্থাৎ ঘরের তৈরি মদ। জলের মতো সস্তা। তার আলাদা দাম দিতে হবে না। কিন্তু বাকি দিনটা কাজ করার জন্য তাজা করে তুলবে।

কিন্তু সে কথা তো এই নতুন চেনা ভদ্রলোককে বলা যায় না। এবং উনি যে রকম স্নেহ দেখাচ্ছেন তাতে ওর পকেটের দৌড় বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই ওকে আরও অনেক বার একসঙ্গে খাবার আমন্ত্রণ জানাবেন। শ্রীমতী রিবেরাকে নিয়েও পীড়াপীড়ি করাবেন। নিজের কাছেই সেটা মনে হবে বাড়াবাড়ি।

অথচ খাবার নিমন্ত্রণ করা মাত্র তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলে উনি মনে করবেন যে এড়াবার মতলবেই বেরিয়ে গেল। তাতে এর মধ্যে একটু আঘাত দেওয়া হবে।

কাজেই সে শুধু বলল যে সে মিনিট পনেরোর মধ্যে কাজের জন্য বেরিয়ে পড়বে। সেই সময়টুকু যদি সিনর রিবেরার সঙ্গ পায় সে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করবে। সিনরা, ডন আর ইসাবেল যখন বাইরে আসবে তখন উনি যদি তার কম্‌প্লিমেন্টস আর ধন্যবাদ জানিয়ে দেন সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

রিবেরা খুশি হয়ে বললেন—রামন, তোমার কাজের জন্য এত উৎসাহ দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। এই দেশে কিন্তু উৎসাহ উঁচু তলার লোকরা খরচ করে শুধু একটি কাজে।

উৎসুক রমেন বলল—ফেরিয়ার সময়? বুলফাইট দেখার জন্য?

শুনে রিবেরা হাসলেন—সে তো সর্বসাধারণ করে। অসাধারণরা অর্থাৎ হিডালগো আর ডিপ্লোম্যাট এরা কী ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি উৎসাহ দেখায় তা বরং তোমায় সংক্ষেপে বলি।

সেই মহলের কথা রমেনের নাগালের বাইরে হয়তো থেকে যাবে। সে জন্যই তিনি এই বিষয়টা পাড়লেন। রমেনও তাতে খুব উৎসাহ পেল।

সিনর রিবেরা তার আত্মকাহিনি শুরু করলেন—তোমায় বলেছি যে আমি সবে রিটায়ার করেছি এবং

দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি। এই ম্যাড্রিদেই আমি পেরুর অ্যাম্বাসাডর ছিলাম। এবং সেই খাতিরে এরা আমাকে যে দু'তিন মাস এদেশে থাকব সেই সময়ের জন্য সব রকম ডিপ্লোম্যাটিক প্রিভিলেজ দিয়েছে। মায় থিয়েটার ড্যান্স হল, ড্রিংকস প্রভৃতি অনেক কিছুতে সস্তা ডিপ্লোম্যাটিক রেট পর্যন্ত। কাজেই আমিও একটু রেখে ঢেকে, একটু নাম স্থানকাল পাত্র বদলিয়ে বলব। তাতে আশা করি তোমার ব্যাপার আর বাতাবরণ বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না।

সাগ্রহে রমেন বলল—না, মোটেই না। বরং আরও বেশি করে কল্পনাকে শানিয়ে নিতে পারব।

তিনি বললেন—তার বিশেষ দরকার হবে না। আমি পরিষ্কার ভাবে এই জগতের ছবিটা তুলে ধরব। এই মহলে খানাটা বড় জরুরি আর তার চেয়েও বেশি হচ্ছে পিনা। তার জন্য চেনা জানা একেবারে পুরোপুরি দরকার। চেনাজানা না থাকলে শোনা সম্ভব নয়।

রমেন মনে মনে ভাবল—চরকে সেই জন্যই চারচক্ষু বলা হয়। আর বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত বা তার দপ্তর ভদ্র আর বনেদি ভাবেই চরের কাজ করে।

ধরো, একটা অন্য দেশের উদাহরণ দিয়ে বলি। ইংরেজিতে বলে যে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ ইংরেজরা জিতেছিলেন ইটন স্কুলের খেলার মাঠে। ঠিক সেই রকম ভাবে ডিপ্লোম্যাটরা যুদ্ধ জিতে রাখেন রিসেপশনে, ব্যাংকোয়েটে খানাপিনার মধ্যে দিয়ে। ইংরেজরা কামাল আতাতুর্ককে কী করে হাত করে রেখেছিল, জানো? ওই ক্ষমতাশালী বিরাট পুরুষ আর ব্রিটিশ রাজদূত আঙ্কারায় কামালের বাসভবনে সারারাত একসঙ্গে বসে ওমর খৈয়ামের মতো পেয়ালা নিয়ে মৌজে মেতে থাকতেন। তারপর কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির এই দুই দেশের মধ্যে গাঁটছড়া কাটবার সাধ্য থাকবে?

রমেনের মুখে একটু আশ্চর্যভাব দেখে তিনি বললেন—তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না? কিন্তু আমাদের আপনা থেকেই এই ধরনের শিক্ষা হয়ে যায়। যদি সারারাত তাসের 'পোকার' খেলা চলে অথবা ব্যাংকোয়েটের পর পোকার খেলা শুরু হয় ধরে নিতে হবে যে কোনও রাজনৈতিক বা বাণিজ্য ব্যাপারে মঞ্চ সাজানো হচ্ছে। তুখোড় ডিপ্লোম্যাট তখন হয়তো ক্যাবারে নাচ দেখতে দেখতে যার হাতে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আছে তার দিকে নজর রাখবেন অথবা তার সাথীদের ওজন করে নেবেন। তার টেবিলে নিমন্ত্রণ পেয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নেবেন। ঢুলুঢুলু চোখে হাঁটিহাঁটি পা পা করে সেখানে যদি হাজির হন তার পিছনে একটা মতলব আছে। নিজের দেশের রাষ্ট্রের দরকার সবার উপরে। তার জন্য সারারাত জাগো, অফুরান পান করো, নয়নমোহিনী নারীর নগ্ননৃত্য দ্যাখো—সবই শাস্ত্রসম্মত।

রমেন মনে মনে ভাবল যে ভারতের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই, ভারতীয় ডিপ্লোম্যাটও নেই। তবু দেশ স্বাধীন হলে এই সব নতুন দায় আর অধ্যায় শুরু হবে হয়তো।

রিবেরো বলে চলেছেন—কিন্তু এসব কারবার হিস্পানি অভিজাতদের চরিত্রে একেবারে জন্মগত। একটু ট্রেনিং দিলেই হয়। ওরা এমনিতেই জীবনের এই দিকটা এমন মক্স করে রেখেছে যে একটু সুযোগ পেলেই ওস্তাদিতে মাত করে দেবে। তবে...

একটু থেমে বললেন—তবে সব ওস্তাদিই নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ওজন আর আর্থিক বুনিয়াদের ওপর।

রমেনের মনে এই মন্তব্যটা আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে রইল।

সঙ্গে সঙ্গে তার এটাও খেয়াল হল যে ভাগ্যক্রমে সে একজন রিটায়ার্ড ডিপ্লোম্যাটের কাছে এসে পড়েছে যিনি এখন আর এই বৃত্তিতে নেই বলে সহজে মুখ খুলতে পারবেন। তা ছাড়া বিদেশে বেড়াতে এলে এমনিতেই মন খুলে যায়।

সে নিজে যখন সাংবাদিক হতে চলেছে এই ভদ্রলোকের কাছে ওদের রহস্যময় জগৎ সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। নিজের দেশে তো রয়টারের মতো সেরা সংবাদ পরিবেশনের প্রতিষ্ঠানের খোদ কর্তারা ছাড়া আর কেউ ডিপ্লোম্যাটদের নাগাল পায় না।

রিবেরোও এ সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ দেখালেন। ওঁর নিজের অতীত স্মৃতি ও বিগত জগৎ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলার পরে বললেন—জানো, রামন, বেল কী বলছিল কাল রাতে তোমার সম্বন্ধে?

রমেনের মন রঙিন হয়ে উঠল। মুখের রঙ তো ভারতীয় বর্ণের কল্যাণে সহজে ধরা পড়বে না।

মার্টিনোর মুখে সে বেলের মন্তব্য নিজের সম্বন্ধে যা শুনেছে তা-ই ওর প্রাণে ঝংকার তোলার পক্ষে

যথেষ্ট। বাঙালি জন্ম আটপৌরে জীবনে, ক্লিষ্ট পিষ্ট যৌবনে এর চেয়ে বেশি কিছু সে অত কল্পনাই করতে পারে না। তাকে দেখলে না কি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর কথা মনে পড়ে যায়? কার মনে পড়ে যায়? কোন্ রহস্যহাসিনী মোনালিসার?

রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদের নায়ক গদাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল।

কী জানি এখন সে আবার কী শুনবে? রূপসীর মুখের অমৃত মাখা কোন্ রূপকথা?

জানো রামন, মেয়ে আমার সাহিত্য আর কল্পনাবিলাসী। আর চিত্রশিল্পের সত্যিকারের সমঝদার। সত্যি কথা বলতে কী প্রাদো মিউজিয়ামের প্রতি ওর আকর্ষণের জনাই আমরা স্পেনে এসেছি। না হলে, এ তো আমাদের দেখা দেশ। আর আমাদের দেশের চেয়ে এমন কিছু অন্যরকম নয়। তুমি নিশ্চয়ই জানো এই দেশের লোকরা, আমাদের পূর্বপুরুষরাই পেরু জয় করে সেখানে বসবাস করছে।

সেই ইতিহাস শোনার জন্য রমেন মোটেই মরছে না। অথচ কী করে জানায় কোন্ কথাগুলি শুনবার জন্য তার সমস্ত অন্তরাত্মা উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

ভালো লাগার এ কি বিচিত্র প্রকাশ!

জানো রামন, বেল বলছিল—বাবা, এল ইন্ডিয়ানোর চেহারা দেখে মনে হয় ওকে যেন তোমাদের প্রফেশনেই স্বাভাবিক ভাবে মানাত। বেল তো ছবির, বিশেষ করে পার্সোনালিটি পেন্টিংয়েব স্টাডি ভালোই করেছে। কোনও মাস্টার পেন্টারেব আঁকা মুখে কী বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে তা সে এই বয়সেই আলোচনা করতে পারে। তাই ওব কথাগুলি আমরা অমনি উড়িয়ে দিই না। বরং চিন্তার স্বাধীনতা বিকাশ করার জন্য বিন্দুমাত্র বাধা দিই না।

রমেন মনে মনে ভাবল---আমিও না।

বেল বলছিল যে তোমার মুখেব ধাঁচ হচ্ছে ডিপ্লোম্যাট গোছের। হাসিখুশি, বুদ্ধিমন্ত, পরিহাসে উজ্জ্বল। অ্যাডভেঞ্চারের জন্য প্রস্তুত, হরেকরকম চিন্তাধারার সঙ্গে মানিয়ে নিতে ইচ্ছুক। যে কোনও সঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অ্যাট হোম হয়ে মিশতে পারবে, কিন্তু নিজের কোট ছাড়বে না।

সে আরও বলছিল যে সে অবশ্য সামান্য অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারে নি যে ডিপ্লোম্যাটদের মতো সংগীত থেকে সুর, ছবি থেকে কবিতা, শ্রমিক থেকে রাজনীতিক সব কিছু বিষয়ে আলাপ করতে পারো কি না।

শুনে ওর মা হেসে বললেন—পাগলী মেয়ে, এসব তো অভ্যাসে শিখে নিতে হয়। তোর বাবাও তো সে ভাবেই মক্শো করেছিলেন।

বেল বলল—তা যদি হয় তবে তো কথাই নেই। ওর সরু মুখ, উৎসুক চোখ, কাটা কাটা চেহারা আর লম্বাটে আঙুল তো এল গ্রেকোর আঁকা ডিপ্লোম্যাটদের চেহারাগুলির সঙ্গে মিলে যায়।

বলেই সিনব রিবেরা হাসতে শুরু করলেন---বেল আবার এল গ্রেকোর ছবির স্পেশ্যাল স্টাডি করছে। প্রাদো-তে তার আঁকা বুকে হাত রাখা ভদ্রলোকেব যে ছবি আছে সেটিকে যে কত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছে তার হিসাব নেই।

রমেনের মন ততক্ষণে ছবি আর ডিপ্লোম্যাট প্রভৃতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সে ভাবছিল—এল গ্রেকো যে মেয়েটির হিরো তা তো স্পেনের ঝকমকে উজ্জ্বল আলোর মতই পরিষ্কার। এই শিল্পী ছিলেন গ্রীসের লোক। স্পেন তাকে আপন করে নিয়েছে, আদর করে নাম দিয়েছে এল গ্রেকো।

অবশ্য হিস্পানি মেয়েরা প্রবলভাবে প্যাশন, রক্তরাঙা প্রেম অনুভব করে। কিন্তু উষার মতো শুভ্র এই মেয়েটি আমায় কেন বলছে—এল ইন্ডিয়ানো? আমার স্বদেশী নামটা তো বেশ সুন্দর ল্যাটিন ধাঁচে এরা ভেঙে নিয়েছে। অবশ্য পাত্রকে পিয়োত্রো না বলে পেড্রো বললে আরও বেশি হিস্পানি শোনাত। কিন্তু আমার নিজের কানে বড্ড বেশি পাদ্রি পাদ্রি ধ্বনি আসত। পিয়োত্রো বললে প্রিয় প্রিয় মনে হয়।

কিন্তু এল গ্রেকো যার হিরো সেই হৃদয়হরণী আমার নাম দিয়েছে এল ইন্ডিয়ানো, তার হৃদয়তন্ত্রীতে কি ঝংকার জেগেছে নাকি? দরশ মুগ্ধা?

এই চিন্তাটা সে সঙ্গে সঙ্গেই সামলিয়ে নিল। ভাবল, যে বিলেতে এসে ভারতীয় ছেলেদের অন্ধকার থেকে আলোকে আসার মতো অবস্থা হয়। তাই যে কোনও বিলেতি মেয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকলেই

সে মনে করে বসে যে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে। অন্তত পড়তে চায়। একটি বারও কিন্তু সে ভেবে দেখে না যে বিদেশী নবাগতর পোশাক বা হাবভাব দেখে মেয়েটির মজা লাগছে বা সাধারণ ভদ্রতা বা ঔৎসুক্যর জন্য হাসছে। আমার অন্তত এ হেন বোকামি সাজে না।

এদিকে পেপে নিজের স্মৃতিচারণ করছিলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, প্রথমে আমিও তাই ভাবতাম। পরে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে আর ইয়োরোপে কাজ করে আরও নতুন কিছু শিখলাম। তোমার কি সে সব শুনতে কৌতূহল হচ্ছে, রামন?

সে তাড়াতাড়ি বলল—হ্যাঁ, —সিনর রিবেরা। একজন এত বড় সিনিয়র ডিপ্লোম্যাটের অভিজ্ঞতার ফল জানতে পারাও সৌভাগ্য। অনুগ্রহ করে বলুন, খুলে বলুন।

তিনি বললেন—খুলেই বলব। মেয়েরা তো এখানে উপস্থিত নেই। বেল আরও বলছিল কবির সঙ্গে কবিতা পাঠ করার, ক্ষমতাও ডিপ্লোম্যাটের মেক-আপের একটা অঙ্গ। কিন্তু সে জানে না শুধু তাই নয়। আধুনিক নাটক দেখতে গিয়ে নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিনয়ের শেষে হৈ-হল্লা, স্প্যানিশ উপন্যাসের স্টাইলে জলদস্যুদের সঙ্গে খানাপিনার পালা পর্যন্ত, তোমায় গল্প বানিয়ে বলতে হবে শিল্পীর মতো, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে হবে প্রেমিকদের মতো। আর ডিপ্লোম্যাটিক ষড়যন্ত্রে নিজের কোট পুরো বজায় রাখতে হবে—দরকার হলে কোমরের পোশাকি তরোয়ালটি খুলে চালাতে হবে।

—একেবারে রোম্যান্টিক, হেসে বলল রমেন।

—রোম্যান্টিক বলে রোম্যান্টিক কিন্তু আরও একটা পোজ নিতে হবে মাঝে মাঝে। রহস্যবাদী কবি মিষ্টিকরা যে রূপের প্রশস্তি করে তার প্রতি একটা ব্যাকুল বাসনার বাণী ছাড়তে হবে সময় বুঝে। এখন বোঝ ব্যাপারখানা।

রমেন প্রায় অভিভূত। ছিদাম মুদি লেন, লন্ডনের ইউনিভার্সিটি পাড়া আর এ হেন ডিপ্লোম্যাটিক সার্কল।

ওর মাথাও যেন সার্কলের মতো বৃত্তাকারে ঘুরবে এখনই।

রিবেরা উঠে পড়লেন—যাই, এখন ঘরে গিয়ে দেখি ওরা উঠল কিনা।

চলে যাবার সময় একটু থামলেন। বললেন—পরশু রাতে আমরা একটা ফ্ল্যামেঙ্কো ড্যান্স দেখতে যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে এলে সবাই খুব খুশি হব।

ফ্ল্যামেঙ্কো ড্যান্স? যা দেখতে পৃথিবীর সব দেশ থেকে লোক এদেশে আসে? স্পেনের একেবারে নিজস্ব নৃত্য। তার গর্ব, তার গৌরব। তার প্রাণের পরিচয়।

এই নাচের একটা ভালো বর্ণনা, সমঝদার রসিক সজ্জনের সঙ্গে বসে দেখে অনুভব করে তার বর্ণনা তার থিসিস আর ডেসপ্যাচকে সফল করে তুলবে যে।

তবু সে মুখে আপত্তি জানাল। অনেক অনুগ্রহ নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। অনেক ঋণের বন্ধন।

কিন্তু রিবেরা ছাড়লেন না। স্নেহভরে কিন্তু প্রায় আদেশের সুরে বললেন—রামন তোমায় আসতেই হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা তোমাকে স্পেন অ্যাট ইট্‌স বেস্ট দেখিয়ে দেব। সংকোচ কোরো না। কোনও বাড়তি খরচ আমাদের লাগবে না। ছয়জনের একটা বক্স নিয়েছি। তা-ও ডিপ্লোম্যাটিক কনসেশনে।

হাতে চাঁদ আর কাকে বলে?

॥ ১১ ॥

"না বলা বাণীর দিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশীটি সাজালো—"

কেমন করে যে হয়ে গেল।

রমেন সারাদিন তার কাজের মধ্যে থেকে থেকেই সেই কথাটুকু ভেবেছে। সেই গানের চরণ দুটিই গুনগুনিয়েছে।

তার তরুণ মনে কোথা দিয়ে যে কী হয়ে যাচ্ছে।

পেরুর তরুণী। তাকে চেনে না, জানে না। জানবার সম্ভাবনাও নেই। চালচুলোহীন এক ভারতীয়

ছাত্র—যার একমাত্র বলবার মতো পরিচয় লন্ডনের ছাত্র হিসাবে স্পেনকে বুঝতে আসা, তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা তাও একটা পরীক্ষার জন্য। প্রতিষ্ঠিত লেখক জন গান্‌থানের মতো কোনও দেশের ইনসাইড স্টোরি অর্থাৎ ভিতরের ছবি ফোটানোর মর্যাদা তার লেখা কোনদিন পাবে না। যে পত্রিকার জন্য সে লিখছে তাকেই বা এই দেশে কে চিনছে? পলিটিক্যাল করেস্‌পন্ডেন্ট হলে বরং কথা ছিল।

সারা দিন সে রাস্তায় রাস্তায় মানে কয়েকটি বিশেষ রাস্তায়, স্ট্র্যাটেজিক মোড়ে মোড়ে, পথের পাশে কাফের টেবিলে কফি রেখে চোখ সামনে মেলে দিয়েছে। পাশের টেবিলের লোকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলেছে। মানে, যাচাই করে দেখেছে যে কারও কল্যাণে কোনও মূল্যবান মতামত বা যোগাযোগ কিছু বের হয় কিনা। প্রথম দিনটা শহরটাকে আর তার নাগরিক নাগরিকাদের দূর থেকে বাইরে থেকে বুঝতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ কোনও দুয়ার হয়তো খুলেও যেতে পারে।

এর পর শুরু হবে লন্ডন থেকে সঙ্গে আনা পরিচয়পত্রগুলির সূত্র ধরে আলাপ আর আলোচনা। ইউনিভার্সিটি মহলে যাতায়াত; যে সব বই পড়ে আগাম কিছু খবর আর ধারণা আর নোট নিয়ে এসেছে সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা। নিজের চোখ আর নিজের মনে কষ্টিপাথরে।

সে হিসাবে আজ প্রথম দিনটা হাতে একটু সময় আছে। জীবনের রাজপথের উপরেই যে মাদ্রিদকে সে দেখছে তার সঙ্গে সহজ সংস্কারমুক্ত মিতালী পাতাবে আজ।

কাজেই ফাঁকে ফাঁকে এই পেরুর পরিবারের কথা মনের মধ্যে এসে উঁকি মারছে। তার নিজের মনে যে ঢেউ উঠেছিল তাকে সে ঠেকিয়ে রেখেছে। রাজা ক্যানিয়ুট মোসাহেবদের কথার অসাড়তা খুলে ধরবার জন্য বলেছিলেন—সমুদ্র, তুমি এই পর্যন্ত মাত্র আসতে পারো; আর এসো না। তিনি জানতেন যে সমুদ্র মানুষের কথা শুনবে না। সেই মানুষ ধরণীর অধীশ্বর হলেও নয়।

রমেনও জানে যে মানস সাগরও তার কথা মানবে না। তবু অনেক সাংসারিক ব্যস্ততা, বহু বাস্তব কারণ দিয়ে সে বালির বাঁধ বানিয়ে নিয়েছে।

অন্তত কিছুক্ষণ সেই বাঁধ কাজ করতে পারত। তারপর সমুদ্রের বুকে দুদিক থেকে দুটি তরণী যেমন করে পরস্পরের দিকে আলোর দৃষ্টি ছড়াতে ছড়াতে দুদিকে দূর সরে যায় তেমন ভাবেই সে আর বেল স্বাভাবিক সংসারিক গতিতে দূরে চলে যেত।

একটুকু ছোঁয়া লাগে না। না, ছোঁয়া পর্যন্ত নয়। এতটুকু ভালো লাগে। কিন্তু তা নিয়ে রঙে রসে কল্পনার জাল বেশিক্ষণ বোনা যায় না। তাকে বেশিদিন টানা যায় না। বেশি দূরও না।

কিন্তু এ কি হল? ভোরে মার্টিনো কী জানিয়ে গেল? পরে পেপে কী বলে ফেললেন।

সবকিছু মিলিয়ে এ কি শুধু একটুকু কথা। তাই নিয়ে কি মনে মনে গুন গুন করে, রচি মম ফাল্গুনী।

সব কিছু পর্যবেক্ষণের আর সব নতুন লোকদের সঙ্গে পরিচয় আলাপের পর্দার আড়াল থেকে সেই ফাল্গুনীর ভাবনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

রমেন নিজেকে সমঝাল—ওই মেয়েটি তার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে তার মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত মনোভাব নেই। থাকতে পারেই না। রাস্তার পথচারী বা হোটেলের যে কোনও প্রান্তের মুখের আদলে যদি কোনও বিখ্যাত হিস্পানি শিল্পীর মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় তা হলে অলস আলাপনের মধ্যে এমন একটা কথা উঠতে পারে। তাতে যে মন্তব্য করল বা যার সম্বন্ধে করল তাদের কারও কিছুই যায় আসে না। তার মধ্যে কোনও মানে খুঁজতে চাওয়া শুধু বোকামি নয়, হাস্যকর মূর্খামি। রমেন, ছিদাম মুদি লেনে লালিত, অবহেলিত, সারা রাস্তায় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার দৌলতে দেশ থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্র রমেন, পলাশের নেশা তোমার জন্য নয়।

"তাই নিয়ে যায় বেলা
নূপুরের তাল শুনি।"

ওরে বধির, এই নূপুর তোমার জন্য নয়। ওই তালও নয়।

আর না-বলা বাণী কিছুই নেই ওই সাদৃশ্যের মধ্যে। বা তা খুঁজে পাওয়ার মধ্যে। নেই তার মধ্যে কোনও আকুলতা। তা দিয়ে তোমার বাঁশিটি সাজাতে যেয়ো না।

আর তোমার দিক থেকেও ব্যাপারটা বিচার করে রাখো। তুমি সামান্য একটু ঠাট্টা করেছিলে জলপাই তেল আর কিশোরী বালিকাদের তুলনা করে। কিন্তু সেই কুঞ্চিত কেশবতী কুমারীর বাবা তাকে সেই

পরিহাসের দিকে যে এগিয়ে আসতে দেন নি সে কথা ভুলো না। ওরে সাবধানী পথিক, বারেক ও পথ ভুলে ফিরো না। তাহলে মরবারও পথ পাবে না।

ধনে না। মনেও না। জীবনে তো নয়ই।

তবু, তবু রমেন ভোলে কী করে যে সকালবেলা পেপে নিজেই তাকে বেলের মন্তব্যগুলি শুনিয়েছেন। অবশ্য কথায় কথায়। এখন আর ওই নতুন পরিচিত স্নেহপরায়ণ বিদেশী প্রৌঢ়কে সিনর রিবেরা বলে মনে করতে ইচ্ছা করে না। তিনি হচ্ছেন পেপে, এই রূপসীর অন্তরঙ্গ সখার মতো পিতা, পেপে।

রমেনের বিশ্লেষণে ব্যস্ত চিত্ত কিন্তু তাতেও ভুলল না। তাকে শোনাল—ছাড় তোমার মানসিক অসাধুতা, তোমার হিপক্রিসি। তোমার এত কিছু জাল বোনা, ফাল্গুনী ফানুস রচনা সবই তো নিজের দিক থেকে সৃষ্টি করেছ। সবই তো তার আলোতে উজ্জ্বল করে রঙিন করে দেখছ। এমনই দেখা দেখেছ যে সৃষ্টির প্রথম সাহিত্যের যুগে চলে গেলে তুমি। তুমি সবচেয়ে আধুনিক আর অনিশ্চয়তা ভরা পাঠ্য বিষয় জার্নালিজমের ছাত্র। অন্য কোনও রসের শাস্ত্রে মন উঠল না তোমার। একেবারে অন্তবিহীন পথ হাতড়িয়ে পেরিয়ে পৌঁছোলে কিনা উপনিষদে? 'ভাসা তস্য বিভাতি সর্বথিদম্' ভাবতে ভাবতে একেবারে ভেসে গেলে?

একটি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা অপরিচিতা কিশোরীর রূপের প্রথম ধাক্কাতেই তুমি কিনা চর্মচক্ষুতে দিব্য আলোকের উদ্ভাস অনুভব করলে? তোমার কোনও আশা নেই, রমেন।

একটি মানবীর জন্য অনুভবে যে এমন করে অভিভূত হয়ে পড়ে তার কোনও ভবিষ্যতের ভরসা নেই।

কিন্তু এই মুহূর্তে রমেনের একটা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আছে। হিস্পানি নারী সম্বন্ধে সে তার প্রথম ডেসপ্যাচ লিখবার খসড়া করেছে। এবং তার জন্য যথেষ্ট গরম মালমশলা এরই মধ্যে জোগাড় করেছে। আজ যে মিউজিক হলে রিবেরা পরিবার তাকে নিয়ে যাবেন সেখানে সম্ভবত বহু হিস্পানি নারীর আগমন হবে। সে একা গেলে যতটা স্বাধীন সংকোচহীন ভাবে তাদের স্টাডি করতে পারত এদের সঙ্গে আর মধ্যে থেকে ততটা করা সম্ভব হবে না। শোভনও হবে না।

তবে একটা কথা থেকে যায়। সেই কথাটি সে হাসতে হাসতে-ই রিবেরাদের বলল। রাত তখন দশটা, ওরা একটু সকাল সকাল ডিনার সেরে রেখেছিলেন। অর্থাৎ মিউজিক হলে শুধু কিছু পানীয় নিয়ে বসলেই হবে। মাদ্রিদে বেশ কয়েকটা থিয়েটারে, ক্যাবারে আর নাইট ক্লাবে ফ্ল্যামেংকো নাচ দেখানো হয়। কিন্তু ওরা যেখানে যাচ্ছেন সেটা একটা 'স্পেশ্যাল ডাইভ' অর্থাৎ সবিশেষ কী বললে ঠিক মনটা পরিষ্কার হয়—আস্তানা? সত্যিকারের কন্যাইসোররা, রসগ্রাহীরা, এই জায়গাটিতে স্পেনের খাঁটি ফ্ল্যামেংকো নাচ দেখতে আসেন। এই জায়গাটির নাম 'থাম্বা'। এর গুরু গুরু গৌরবের ডমরু ধ্বনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।

রমেন বুদ্ধি করে বাইরে থেকেই রাতের খাবার শেষ করে এসেছিল। ওদের বলে গিয়েছিল যে বাইরে কাজে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। তাই সে বাইরে খেয়েই ফিরে ওদের সঙ্গে হোটেলে মিলিত হবে। সস্তায় প্লাটো কম্বিনাডো অর্থাৎ পাঁচমিশেলি পদের সংক্ষিপ্ত অথচ ভরপেট সস্তা খানা খেয়ে সে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছিল।

তার থিসিস আর ডেসপ্যাচ দুইয়ের সাফল্যের পথ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। মন খুশিতে ভরপুর।

সেই খুশির আবেশে সে থাম্বাতে তাদের জন্য রিজার্ভ করা টেবিলে বসে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিল। সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গাতে গুটিকয়েক ঝুল বারান্দার মতো এক্সক্লুসিভ জায়গা রয়েছে। তাদের উপর দুজনের মতো টেবিল। দুখানা ভেলভেটে মোড়া চেয়ার হরেক নকশাকাটা পায়া তার হাতল নিয়ে আধখানা চাঁদের মতো টেবিলের তিন দিকে বসানো। যাতে প্রত্যেকেই নাচগুলি পরিষ্কার বাধাহীন ভাবে দেখতে পায়। আর দেয়াল জুড়ে দেখতে পায় একটি প্রসিদ্ধ তৈলচিত্রের প্রতিলিপি—চাঁদের আলোয় ইটালির উপবন। তারই পটভূমিকায় নাচবে প্রাণহরা ফ্ল্যামেংকো। সিঁদুরে লাল ভেলভেট আর প্লাস দিয়ে সব আসবাব মোড়া। দেওয়ালগুলিতে ফ্রেস্কো পেন্টিং। মেঝের চারধারে সোনালি আর স্কার্লেট লতাপাতার কারুকার্য ভরা কার্পেট। স্পেন যখন বেলজিয়ামের অধীশ্বর ছিল তখনকার কালের বেলজিয়ান কাট গ্লাসের শ্যান্ডেলিয়ার গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুরের মতো সিলিং থেকে তারার আলো নিয়ে ঝুলছে।

প্রথম দর্শনেই রমেনের নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল।

ওদের সবারই নজর ছিল এই বিদেশী অতিথির দিকে। তার মুখে কী রকম একটা ভাব দেখে শ্রীমতী রিবেরা জিজ্ঞেস করলেন—কী রামন, তোমার কি খুব হয়রান লাগছে? সারাদিন যা ঘোরাঘুরি করেছ।

রমেন তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলিয়ে নিল—না না, আমি মোটেই ক্লান্ত বোধ করছি না। যদি এমন কিছু ভাব দেখিয়ে থাকি তার জন্য দুঃখিত। আমি সত্যি সত্যি ভাবছিলাম যে...

কী যে ভাবছিল তা সে খুলে বলবে কেমন করে। ছিদাম মুদি লেন থেকে ঐশ্বর্যে জড়ানো থাম্বো মিউজিক হল। ওর কাছে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ফ্রম দি লগ কেবিন টু দি হোয়াইট হাউসের চেয়ে অনেক বেশি দূর যাত্রা। অবিশ্বাস্য বলতে গেলে সেই ধাপে ধাপে আরোহণ লাকড়ির ডেরা থেকে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ। গরিব, প্রায় অনাথ পালক গারফিল্ডের লগ কেবিন অন্তত অত ভাঙা চোরা নোংরা, অত আশাহীনতার পঙ্ককুণ্ড ছিল না। আমেরিকার সেই প্রেসিডেন্ট রমেনের মতো এত অসহায় অবস্থা থেকে শুরু করেন নি।

মানবতার অত অবমাননা কি কোনও দেশে এমন ভাবে হয়? আর এমন করে গা সহ্য হয়ে যায়?

সে সব চিন্তা এখন দূর যাক কিন্তু সিনরার কথার জবাব দিতে হবে।

কী বলবে? কি বলবে? এমন কিছু বলতে হবে যা বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে এবং যাব মধ্যে ওই পিছনে ফেলে আসা আশাহীন পরাজয়ের কোনও নিঃশ্বাস মাত্র থাকবে না।

মুখে হাসি এনে সে বলল। —আমি এ দেশে আসার সময় ভেবেছিলাম...

কী ভেবেছিলাম তা বলতে গিয়ে রমেন খেই হারিয়ে ফেলল। ভাবতে লাগল যে, বেল যে নীল গাউন পরে রয়েছে সেটা কেমন কেমন যেন ভারতীয় শাড়ির মতো দেখাচ্ছে। কী করে এটা হল?

এমন সময় সে দেখতে পেল যে, সব টেবিলের সামনেই সুবেসা সুন্দরীরা হলের পক্ষ থেকে শ্যাম্পেন এনে হাজির করছে এবং হাসি মুখে মাথা হেলিয়ে অর্ডারের অপেক্ষা করছে।

রমেনের মাথায় উত্তরটা জুগিয়ে গেল, ভেবেছিলাম যে স্পেনের চমৎকার চমৎকার সাধারণ নাচ আর গানগুলি প্রথমে উপভোগ করে একেবারে শেষে এসে ফ্ল্যামেংকো দেখব। তার মানে হচ্ছে যে রেস্পেক্টেবল রেডওয়াইন প্রভৃতি দিয়ে দিন শুরু করে রাতে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে বসব। আমার এমনই সৌভাগ্য যে শুরুই করছি শ্যাম্পেন দিয়ে।

ডন উজ্জ্বলতায় ভরপুর। সবাই এই উত্তর শুনে চমৎকৃত। কিন্তু যৌবনের ধর্ম হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া। অতএব সে-ই সবার প্রথমে এই চমৎকাব মন্তব্যে তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা শুনিয়ে দিল—ওলে, ওলে রামন, সাবাস, সাবাস রামন। শুধু নজর রেখো যেন রাত তেরোটার পর বিজন ঘরে মামুলি বাড়িতে তৈরি ভিনো ভিলা কাসা নিয়ে না বসতে হয়।

কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল না কি কিছু? অথবা শুধুই একজন দিলখোলা যুবকের স্বাভাবিক চটকদার পালটা জবাব? ওর চোখে কৌতুক আর মুখে দুষ্টুমি।

কিন্তু রমেন কিছু সিদ্ধান্তে পৌছবার সময় পেল না। সবিস্ময়ে, যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে শুনল বেলের রিনরিনে হাসি ভরা জলতরঙ্গের সুর।

চমৎকার হবে; চমৎকার হবে। রাত বারোটা বেজে গেছে মাদ্রিদ ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা মধ্যযুগের ট্রুবাডুর সেজে গীটার আর টাম্বুরিন বাজিয়ে বাজিয়ে দল বেঁধে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রমেনও তাদের দলে মিশে গীটার বাজাচ্ছে। লাল নীল কালো হলদে রঙের স্ট্রাইপ দেওয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের গাউন সবার গায়ে। ভিনো ভিলা কাসা পান করে নিয়েছে সবাই হোস্টেলে—রিফেক্টরি ঘরে। তার উষ্ণ উত্তাপ তাদের মুখের হাসিতে, গলার গানে, আঙুলের চালনে। দি টিউনা। 'টিউনা' 'টিউনা' দলের মতো আনন্দের দুনিয়ায় আর কোথাও পাবে না, রমেন সেই টিউনাদের সংগীতে নিজের দেশের টিউন শোনাচ্ছে, আর সেই সুর পৌঁছে যাচ্ছে একেবারে যাকে বলে হিমালয়ান হাইটস্ শ্রেষ্ঠতার চূড়ায়।

হিমালয়ের উচ্চতায় কাঞ্চনঝঙ্ঘার মতো ঝকমক করে উঠল রমেনের হিয়া।

পেপে আর সিনরা দেখে শুনে খুব খুশি। ছেলে মেয়েকে এত আনন্দে উচ্ছ্বসিত দেখলে কোন্ বাপ মায়ের মন খুশিতে ভরে না যায়? প্রায় ওদের সমবয়সি একজন বিদেশী ছাত্র একসঙ্গে ওদের আনন্দে যোগ দিতে পারছে দেখে ওরা সেই প্রায় অপরিচিত তরুণের উপরও খুব খুশি। ছেলে আর মেয়ের ছুটির সময়টুকু বেশ জমে উঠেছে। ধন্যবাদ, মুচাস গ্রাথিয়াস, এল ইন্ডিয়ানো।

ততক্ষণে সেই সুবেশা তরুণী 'ডনচেল্লা'র দল সুরা আর কেক আর অন্যান্য টুকিটাকি খাবার টেবিলে টেবিলে পরিবেশন শেষ করেছে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল আলোগুলি স্তিমিত হয়ে আসছে। চারিদিকে সাজানো ফুলের রাশি যেন এখনই ঘুমিয়ে পড়বে—তারই প্রস্তুতি।

ফ্ল্যামেংকো নাচগান শিল্পকলা হিসাবে শুধু অপূর্ব নয়। একবারে অদ্বিতীয় গীটার বাজবে, সুরেলা কণ্ঠ গাইবে, যৌবনের জাগ্রত দেহ প্রাণবন্ত নৃত্য বিকশিত হয়ে উঠবে আর করতালির তালে তালে সাগরবেলার তমালতালী বনরাজির মর্মরধ্বনি মনে করাবে। এতসব মিলিয়ে যে সুরসভা সৃষ্টি হয় সেখানে মধুমত্ত ভুজঙ্গ সম লুব্ধ দর্শক উদ্দাম সংগীতের সাগরে সমগ্র মগ্ন চৈতন্য নিয়ে ডুবে যায়।

এই নৃত্যসভা যেন এই নাচের জন্যই বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। মাটির লেভেলের নিচে সেলারের মতো জায়গা। তার দরজাগুলিতে মধ্যযুগের দুর্গের দরজার মতো লোহার ফলা ফোটানো। সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের সিলিং থেকে নেমে এসেছে নকশাকাটা ঝুরি—বটগাছের ঝুরির মতো, আর তাতে জড়ানো আছে আঙুরের লতা।

রমেন আগে দেখেছিল শুধু ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্য। এখন নজরে পড়ল তার সঙ্গে রুচিতে ভরা পরিচয় তিনটি পুরুষ আর একটি নারী মঞ্চে উপস্থিত হল। গীটার বাদক, গায়ক আর নর্তক আঁটাসাঁট পোশাক পরে এসেছে। পরে এল একটি তরুণী। তার অভ্যর্থনায় যে ভাবে সবাই খুশিতে উদ্দাম উদ্বেলিত হয়ে উঠল তাতে কোনই সন্দেহ রইল না যে সে সতিই প্রেমিয়ো নাথনাল ডি বেইল অর্থাৎ দেশের সবার সেবা ব্যালেরিনা।

এস্‌মেরাল্ডা, এস্‌মেরাল্ডা বলে চার দিকে হর্ষভরা আহ্বান শুরু হল।

এস্‌মেরাল্ডা? নামটা যে অতি পরিচিত? রমেন কোথায় শুনেছে এই নাম; কোন্ কাগজে কোন্ বইয়ে।

হ্যাঁ, মনে পড়ল। অমর ফরাসি সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর হাঞ্চ ব্যাক অব নোট্‌র ডাম উপন্যাসের যাযাবর নর্তকী এস্‌মেরাল্ডা। বিশ্বসাহিত্যে মরকত মণি এমারেল্ডোর মতো জ্বলজ্বল করছে এই নায়িকা নর্তকী। যাযাবরী ঠিক কথা। এই ফ্ল্যামেংকো নাচটাই তো জিপ্‌সিদের সঙ্গে জড়িত, আবার মূরদের রক্ত দোলা জাগানোর মতো মদির।

কিন্তু মেয়েটি বড়বেশি সুন্দরী। এত সুন্দরী যে শিল্প হিসাবে নাচটিই বোধ হয় পিছনে পড়ে যাবে। প্রতিটি উদ্দাম ভঙ্গিমা উত্তাল রঙ্গিমা বিলোল হিল্লোল দর্শকের দৃষ্টি দর্শন থেকে দেহে সরিয়ে আনবে। রূপায়ণ থেকে রূপে।

তবু রমেন তা সমর্থন করল মনে মনে। আধার সুন্দর হলেই আধেয় বেশি ফুটে ওঠে। রূপ ছাড়া যে অপরূপে উত্তরণ সম্ভব হয় না।

ততক্ষণে গীটার বাদক গীটারে কয়েকটা মূর্ছনা তুলেছে, একটা পরিবেশ জমিয়ে তুলবার প্রস্তুতি চালাচ্ছে।

এস্‌মেরাল্ডার দ্রুত চরণ শিঞ্জন যেন সবাইকে ধ্যান ভঙ্গ করে হৃদয়টি সেই চরণ যুগলে ঢেলে দিতে আহ্বান জানাচ্ছিল। তার দুটি সুঠাম বাহুর আলোড়ন, দশটি চাঁপার কলির চকিত চমকের মুদ্রা হাতের ক্যাস্টানেটের খঞ্জনীর মতো ধ্বনি দ্রুত লয়ে সবাইকে সুন্দরের মন্দিরে আহ্বান করতে লাগল।

একটি মূর্তিমান কবিতা ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ সৃষ্টি করে উদ্দাম তালে লয়ে নাচতে লাগল। কবিতার ছন্দে ছন্দে উষার শিশিরের মতো স্বচ্ছ বসনের স্তরে স্তরে কুঞ্চিত এলায়িত ঢেউগুলি মঞ্চময় উড়ে বেড়াতে লাগল। সাগর লহরি সমান।

প্রজাপতি পাখনা মেলে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। ফ্ল্যামেংকো অগ্নিশিখা তেমনি করে নানা নকশায়, উল্লাসে, উত্তাপে; উচ্ছ্বাসে লেলিহান হয়ে গতির আবেগে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আগুন-জ্বালায় রাঙিয়ে দিল সবাকার মন। সময়ের সীমারেখা হারিয়ে গেল।

নাচের প্রথম পর্ব শেষ হল। ভাবে বিভোর হয়ে পেপে যেন কোন্ রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে তার সত্তা এই নাচঘরে, এই ঝুল বারান্দায় গোল টেবিলে ফিরে এল।

আজকের রাত্রির কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের পুলকিত চঞ্চলতা বেলকেও অভিভূত করে রেখেছিল। সে তার বাবাকে মিষ্টি হেসে পরিহাস করল—পেপে এই নাচের মধ্যে ডুয়েন্ডে খুঁজে পেয়েছে।

ডুয়েন্ডে হচ্ছে একটা রহস্যময়, অনির্বচনীয় মাধুরী। তাকে শুধু অনুভব করতে হয়, বর্ণনা করা যায় না। তার সারমর্ম হচ্ছে হিস্পানি জগতের পরমত্বে গাঁথা। স্পেনের আকাশ বাতাস থেকে যেন ঝরে পড়ে এই

দিব্য মাধুরী।

পেপে হেসে বললেন—ঠিক বলেছ বেল। ম্যাগ্‌নিফিকা, ম্যাগ্‌নিফিকা এস্‌মেরাল্ডা। এস্টুপেন্ডা এস্‌মেরাল্ডা।

মহামোহিনী এই মরকত মণি।

রমেনের উচিত হবে এ সম্বন্ধে নিজের কোনও অভিমত দেওয়া। না হলে ওরা ভাবতে পারে যে তার তেমন পছন্দ হয়নি। আরও খারাপ হবে যদি ওরা ভাবে যে সে স্প্যানিশ কেন, কোনো সংগীতেরই সমঝদার নয়।

কাজেই সে-ও তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাল। এবং শেষ পর্যন্ত বলল—আমাদের দেশের নাচের তুলনায় এই ফ্ল্যামেংকো হচ্ছে একেবারে সালসা পিকান্টে। গরগরে ঝালে ভরা গরমাগরম নাচ।

ডন বলল—তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এদেশে এই সালসা পিকান্টে নামে একটা গরম মিউজিকও আছে। গ্রীষ্মের রাতে বাড়ির ছাদে, না হয় রাস্তায় ডাক বাক্সে, মোটরের গায়ে কাঠের চামচ ঠুকে ঠুকে শহুরে ছোকবারা গান বাজনা চালায়। নেহাত খারাপ মানদণ্ড নয় অবশ্য। আর কন্‌হুংটো বলে একটা বাজনা আছে যাকে মেলা বা উৎসবের ব্যান্ড বাজনার মজাদার বংশধর বলতে পারো। অপেরা বা সিম্‌ফনির মতো উঁচু দরের নয়। কিন্তু চমৎকার তাদের সুর, তাদের তাল লয় আর ঐক্যতান।

বেলই বা কম যাবে কেন? বিদেশী অতিথি যে একটু আগেই বলে ছিল তার বাসনা ছিল রেড ওয়াইন দিয়ে দিনটা শুরু করে রাত্রি নিশীথ শেষ করা শ্যাম্পেন দিয়ে। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে বলল—তোমার উচিত হবে কংগা দিয়ে সন্ধ্যা শুরু করা।

—কংগাটা কীরকম মিউজিক? এটার কথাও বইয়ে পড়িনি।

—কংগা হচ্ছে ফুর্তির রসে ভরপুর আর প্রাণের প্রাচুর্যে ভরাট। ঠকাঠক ঠকাঠক তাল চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে করতালি আর পদচালনা শুরু হবে। আর বুকের দুরু দুরু শুরু হলেই ওটা মিনিয়েচার সিম্‌ফনিতে পরিণত হয়।

রমেন একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল—আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে। সংগীতের দেশে এসেও সেই গেরো কাটল না। এমনি কপাল—হোটেলে আমার পাশের ঘরে প্রথম কয়েক রাত গীটারের মোহিনী মায়ায় ভরা টুং টং রেওয়াজ শুনতে পেতাম। তা আমার এমনি কপাল—কে বাজাত জানি না, সে বোধহয় চলে গেছে।

স্নেহশীলা সিনরা বললেন—চলে যায় নি। সে ঘরে বেল গীটার বাজায়। কিন্তু অনেক রাতে ফেরার পর তোমার ঘুমের অসুবিধা হবে বলে আর রাতে বাজায় না।

কিন্তু অনাহত বীণার রাগিণী রমেনের বুকে বেজে উঠল।

॥ ১২ ॥

কদিন ধরে রমেনের আর কোনও খবর নেই।

ফ্ল্যামেংকোর মদির মধুর রাতটির পর সে প্রত্যেকটা দিন আর রাতের বেশির ভাগ তার কাজের মধ্যে ডুবে রইল। ভোরবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাতে। ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানেই কাজের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। লাইব্রেরির একটি টেরে বসে রিপোর্ট লেখার কাজ সারে।

সেখানেই ব্যবস্থা করেছে সস্তায় সবগুলি খাবার খেয়ে নেবার। কারণটা খুব স্বাভাবিক।

সঙ্গে সঙ্গে ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে চলে আসবার ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু ট্রেনের সহযাত্রীদের কল্যাণে সে এত সস্তায় হোটেলে জায়গা পেয়েছিল যে হোস্টেলে তার চেয়ে বিশেষ কম খরচ হত না। তার উপর শহরের কেন্দ্রে আর অভিজাত জায়গায় থাকার অনেক সুবিধা আছে।

একটা অভিজাত ঠিকানা বহু উঁচু মহলের সঙ্গে যোগাযোগের আর নামকরা লোকদের কাছে পরিচয়ের চমৎকার পাসপোর্ট। শুধু একজন ইউনিভার্সিটি মার্কা তরুণকে ইন্টারভিউ দিতে কারই বা উৎসাহ হবে?

কিন্তু...

কিন্তু সবার উপরে কারণটি কী, রমেন? সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে। বেশ ত? পথ

ভুলতে না চাও, অন্তত মন খুলে স্বীকার করো।

সেই স্বীকারটুকু সে কী ক'রে করে?

নিরুপায় রমেন নিজেকে গভীরভাবে কাজে ডুবিয়ে রাখল। ইচ্ছা করেই দেরিতে রাতের গভীরে হোটেলে ফিরতে লাগল।

রিবেরাদের কাছে বড় ঋণী হয়ে যাচ্ছে। অথচ সামান্যতম প্রতিদানও দেবার মতো তার কোনও সঙ্গতি নেই। নিজেরই যুক্তিটাকে আরও জোরালো করবার জন্য সে নিজেকে আরও বোঝাল যে হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দারাও তাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করে রেখেছে। অবশ্য তারা বলেছে যে তাদের শুধু সঙ্গ দিলেই যথেষ্ট প্রতিদান দেওয়া হবে। সেটা তো শুধু মুখের ভদ্রতা। সামাজিক নিয়মে তাকেও তো পালটা খাওয়াতে হবে। অন্তত পক্ষে হোটেলের বারে বসে ফরাসি বোর্দো সুরা বা বিকল্প হিস্পানি রিওহা দিয়ে আপ্যায়ন করতে হবে।

অবশ্য আসল কথাটি সেই এড়িয়ে গেল।

হোটেলের আওতা এড়ানো যায়। কিন্তু হৃদয়ের হাতছানি এড়াবে কী করে?

একটা রাতে হোটেলে ফিরে সে রিসেপশনে গিয়ে ঘরের চাবি চাইতেই চাবির সঙ্গে একটি চিঠি পেল। সিনরা রিবেরা লিখেছেন, রমেন তুমি খুব নটি বয়, দুষ্টু ছেলে। সারা দিন রাত এত কাজ নিয়ে মেতে আছ যো অ্যান্টিকে একবারও মনে পড়ছে না। যত রাতেই ফেরো আমাদের ঘরে ফোন করলে সুখী হব। বিশেষ জরুরি।

এর পর আর এড়ানো যায় না।

ঘরে গিয়েই সে টেলিফোন করল। সে বুঝতেই পারল না যে কত উৎসাহে, কত তাড়াহুড়ো করে সে নিজে যোগাযোগ করে ফেলল। যেন এই আহ্বানটুকুর জন্যই সে অনন্ত কাল ধরে অতন্দ্র রাত্রিগুলি কাটিয়ে যাচ্ছিল।

স্নেহভরে শ্রীমতী রিবেরা ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। কয়েকটা কথার পর পেপে ফোন ধরলেন। প্রায় যেন আদেশ করে বললেন—লাউঞ্জে চলে এসো। এত রাত পর্যন্ত যখন কাজ করছ আর আধঘণ্টা দেরি হলে কোনও ক্ষতি হবে না। আমাদের সঙ্গে একটা নাইট ক্যাপ পান করবে।

রমেন মৃদু আপত্তি তুলেছিল।

কিন্তু পেপে শুনলেন না—কোনও ওজর চলবে না। একটা নাইট ক্যাপে ঘুম ভালো হবে। তাতে পুষিয়ে যাবে। আমরা দুজনেই বেরিয়ে আসছি।

দুজনেই। শুধু দুজনেই?

আশাকে যেন আড়াল করে দিল নিরাশা।

ওঃ, এই তো পেয়েছি। ইসাবেলকে বেল নামে ডাকতে বাধছে। এতদিন বুঝতে পারছিলাম না কী নামে ডাকব। পুরো নামটি যেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তাই কোনও নামেই ডাকিনি। বেল নাম শুনলেই ইংরেজি আর ফরাসি বেল কথাটা মনে পড়ে। কিন্তু রূপসী বিলাসিনী রূপে আমি ওকে ভাবতে চাইনি। ও যে তার চেয়ে পবিত্র, বেশি মহীয়সী। তাই এই কদিন ওকে ডাকতেই পারিনি। এবার থেকে তাকে মনে মনে ডাকব আশা বলে। সুযোগ বুঝে ওদের সবাইকে বলব যে ভারতীয় ভাষায় কথাটার পরিশব্দ হচ্ছে আশা আর মানেটা খুব মহৎ। ওরা নিশ্চয় এমন কিছু আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া ওদের সামনে ডাকবার দরকারই বা কী? মনের মধ্যেও আহ্বান করছি বলতে গেলে অহরহ।

আগে থেকেই সে ভেবে রেখেছিল যে এদের কাছে নিজের ঋণের ভার আর বাড়াবে না। তাই লাউঞ্জে যখন এরা জানতে চাইলেন যে রমেন কী নাইট ক্যাপ পছন্দ করবে সে চটপট বলে ফেলল 'শোকোলা' অর্থাৎ পানীয় চকলেট।

ওরা শুনে খুশি হলেন। রমেনের সুরাতে আসক্তি নেই তা বুঝেছিলেন। এখন দেখলেন যে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর আছে। ভালো সিরিয়াস স্টুডেন্টদের তো এমনই হওয়া উচিত।

কাজ কী রকম হচ্ছে তার খবরাখবর নিয়ে ওরা বললেন যে ওরা একদিন পরে বুলফাইট দেখতে যাচ্ছেন। রমেনের অবশ্যই সঙ্গে আসা উচিত। বুলফাইট তো তাকে একদিন দেখতে হবেই, কারণ এটা ছাড়া স্পেন সম্বন্ধে রিপোর্ট বা থিসিস একেবারে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

রমেন হেসে ফেলল—সম্পূর্ণ সত্য কথা। একেবারে শিবহীন দক্ষযজ্ঞ।

ওরা এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। রমেন সংক্ষেপে পৌরাণিক কাহিনিটা জানাল।

শুনে দুজনেই খুব হাসলেন।

তারপর রিবেরা বললেন—তবে আমাদের এই নাটকে মাতাদোরকে এক হিসাবে শিব বলতে পারো। সে মারণ যজ্ঞের খেলাই খেলে। তবে মারণের আগে থাকে নাচন-কুদন।

রমেন মন্তব্য করল—অর্থাৎ আর্টের ছড়াছড়ি। দর্শকের মন আর ষাঁড়ের আক্রমণ দুই নিয়ে খেলাখেলি। ষাঁড় বেচারাও অবশ্য এক হিসাবে দর্শক। নিজের মৃত্যুর আগে তারই সঙ্গে অভিনয়ের দর্শক।

বলেই সে নীরব হয়ে গেল।

সামনে রাখা গরম শোকোলা ঠাণ্ডা হয় গেল। কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই।

পেপের চেয়ে বেশি সহানুভূতি দিয়ে তার স্ত্রী ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনিই এই নীরবতা ভাঙলেন—রামন, তোমার হয়তো শেষ পর্যন্ত এই বুলফাইট ভালো লাগবে না। তা যদি না লাগে তুমি অন্য এক হিসাবে জিনিসটা দেখো। পৃথিবীর সব দেশেই লোকে শিকারে যায়। তা নিয়ে ঘটা করে। ফলাও করে বর্ণনা করে। সে গুলি তো আরও নিষ্ঠুর। এ যুগে কী সাংঘাতিক সব বন্দুক রাইফেল বেরিয়েছে অথচ পশুর হাতে সম্বল তার সেই আদিম যুগের আত্মরক্ষার উপায়, মানে শিং, নখ আর দাঁত। অসহায়ের সম্বল।

মাথা নিচু করে রমেন স্বীকার করল—সে কথা সম্পূর্ণ সত্য, মাদ্রে।

মাদ্রে অর্থাৎ মা। এই নামে সে কখনও সিনরা রিবেরাকে ডাকেনি। সিনরকেও কখনও পাদ্রে অর্থাৎ পিতা বলে ডাকবার চিন্তাও সে করতে পারত না। পেপে কথাটা পাপা অর্থাৎ পিতার মতো শোনালেও তার অর্থ অন্য। এই মুহূর্তে সিনরা রিবেরার মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সে ডন আর বেলের সম্বোধন মাদ্রে নিজের মুখে এনে ফেলল।

সিনরা বললেন—তবেই ভেবে দেখো, রামন, বুলফাইটে একেবারে বাছাই করা শক্তসমর্থ তীক্ষ্ণ শিংওয়ালা ষাঁড়কে উত্তেজিত করে শুধু তলোয়ার হাতে মানুষ তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। মানুষ যোদ্ধা। নিজেও মরতে পারে। কিন্তু মরুক অথবা মারুক, হারুক অথবা জিতুক—এই যুদ্ধটা অতটা অসমান নয়। মানে, পাখি শিকার, বাঘ শিকার, ফকস হান্টিং এসবের মতো অসম যুদ্ধ নয়। এবং এতে যে পক্ষই মারুক নোটিশ দিয়ে, খেলা দেখিয়ে তবে মারবে।

—আমি তো তা অস্বীকার করছি না, সিনরা রিবেরা।

সিনরা এই সম্বোধনের পরিবর্তন লক্ষ করলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তো বলবার কিছু থাকতে পারে না।

পেপে এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি মুখ খুললেন—রামন, ইটস্ এ ডিল। এই কথা রইল। তোমার ভালো না লাগলে যে কোনও স্টেজে বুল রিং ছেড়ে চলে এসো। আমরা কিছুই মনে করব না। অবশ্য আমি মনে করি যে অন্তত একটা বুলফাইটের প্রত্যক্ষদর্শী না হলে তোমার থিসিসের পক্ষে অসুবিধা হবে। আর এই ফাইটটার টিকিটও আমরা কনসেশনে পেয়েছি। কাজেই তুমি বিনা সংকোচে আমাদের সঙ্গে এসো।

আমাদের বলতে উনি নিশ্চয়ই গোটা পরিবারকেই বোঝাচ্ছেন। হিস্পানি আর ল্যাটিন আমেরিকার মেয়েরা তো বুলফাইট দেখতে অভ্যস্তই থাকে।

অতএব বেলও বাদ থাকবে না। লন্ডনে এক বন্ধুর ঘরে রবীন্দ্রনাথের একটি গানের রেকর্ড সে প্রায়ই শুনত। সেই গানটি হঠাৎ মনে ঝংকার দিয়ে উঠল—

"কাছে থেকে দূর রচিলে কেন গো আঁধারে।"

আরও একটি কারণে তাকে এই বুলফাইট দেখতে যেতে হবে। সেদিন সকালেই যে দৃশ্য সে দেখেছে সেটা শুধু প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য। হিস্পানি জীবনের বাকি নাটকটা কী ভাবে রচিত হয় তা সে অনুমান করে নিতে পারে। কিন্তু শেষ অংকের শেষ দৃশ্যটা নিজের চোখে না দেখলে মাতাদোর জীবনের নাটকীয়তা তার লেখাতে সম্পূর্ণভাবে ফোটাতে পারবে না।

মাদ্রিদের মেছুয়াবাজার বস্তি এলাকায় সে সকালবেলা গিয়েছিল। কলকাতার পরিচিত মেছুয়াবাজার আর বস্তির সঙ্গে যে শুধু স্পেন কেন, ইয়োরোপের কোনও দেশেরই গরিব পাড়া আর স্লাম লাইফের তুলনা হবে না তা সে আগেই জানত। তবু সবচেয়ে গরিব আর নোংরা অঞ্চল ঘুরে তার অনুভব করে আসা

দরকার। দীনের চেয়ে দীন সবহারাদের ডেরার মধ্যে না গেলে জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইংরেজিতে বলে পেন্টিং দি লিলি, পদ্ম ফুলে রঙ লাগানো—সে তো সবাই করে। আর সহজে করে। আর তা এমনিতেই সুন্দর দেখায়, শিল্পের পরশের অপেক্ষা করে না।

ইয়োরোপের হিসাবে একটি দরিদ্র দেশ স্পেন। তার সব চেয়ে পিছনে পড়ে থাকা গরিব এলাকায় সে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় দারিদ্র্য, কোথায় ভাঙাচোরা, কোথায় হতাশ্বাসের কালিমা। কলকাতার ছবির সঙ্গে যে মিলছে না।

অর্থাৎ গরিব হতে পারে; কিন্তু মানবতার অপমান অত গভীর, অত নিষ্ঠুর নয় এদেশে।

আরে, এই পাড়াতেও যে পাবলিক পার্ক রয়েছে। আর তাতে ঘাস, ফুল, লতা এমন কি রেলিং পর্যন্ত আছে। আশ্চর্য ওগুলি চুরি করে উপড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করবার মতো দুরবস্থা কি এঁদের মধ্যে নেই না কি?

অন্ততপক্ষে বিক্রি না হোক, বিক্রি করে ফেলবার জন্য কারও হাত নিশপিশ করে না না কি?

এদের দেশে এই-ত সেদিন বিপ্লব হয়ে গেছে। রাজাকে সরিয়ে জনগণতন্ত্র রিপাবলিক বসানো হয়েছে। তবু জনগণ তাদের মৌলিক নাশকতার অধিকাব খাটাচ্ছে না যে।

ওই যে কটা ছেলে খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরে পার্কের এক কোনায় হুটোপাটি করছে। রমেন তাদের দিকে এগিয়ে গেল। নিজের নতুন শেখা স্প্যানিশ ভাষায় ওদের সম্ভাষণ করল। ওরা খুশি হয়ে রমেনকে নিজেদের খেলা দেখাতে লাগল।

একটা ছেলে হাতে কেপ অর্থাৎ রঙিন চাদরের টুকরো নিয়ে নাচাচ্ছে। আরেকটা ছেলের দুহাতে দুটো ষাঁড়ের শিঙ। সে মাথা নিচু করে, ষাঁড়ের মতো আওয়াজ করে সেই কেপের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। প্রথম জন কেপ নাচাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, ফেরাচ্ছে। আবার নিজেই নেচে নেচে বুদ্ধি করে সরে যাচ্ছে। ষাঁড়কে খেলাচ্ছে। ষাঁড় ছোকরাও উত্তেজিত হয়ে তাড়ার পর তাড়া চালাচ্ছে। একটু পরে ওরা পালা বদল করছে। অন্যরা ওদের ভুল নিয়ে আলোচনা করছে। তাড়া আর এড়ানোর মধ্যে আরও মুন্সিয়ানা আনার পথ বাতলাচ্ছে। একেবারে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে প্রাণান্ত প্র্যাকটিস।

বিদেশী লোক দেখে দুজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এল। রমেনের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করল। খেলা অবশ্য থামল না।

কলকাতার গলি আর গলিস্য গলিতে শুধু হাত পা মেলা বা আড্ডার অঙ্গ হিসাবে তিনখানা ইঁট খাটিয়ে ব্যাটবল খেলাতে এদের প্র্যাকটিস শেষ হবে না। গলাখোলা শার্ট আর বিবর্ণ কর্ডুরয়ের ট্রাউজার্স পরা প্রবীণটি বলল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ছেলেরা মরণ বাঁচন পণ করে এই নকল ষাঁড়ের লড়াই অভ্যাস করবে। সারা দেশ জুড়ে এই খেলার মহড়া চলে। এরা না খেয়ে মরতে চায় না। বাঁচতে চায়। বাঁচতে গিয়ে যদি মরে তা-ও ভি আচ্ছা।

রমেন জিজ্ঞাসা করল, এত ব্যাপক ভাবে এই খেলা চলে কেন? আরও কত কিছু তো করবার আছে এই বয়সে।

হেসে প্রবীণ উত্তর দিল, সিনর, আপনি জানেন না যে ষাঁড়ের লড়াইয়ের পথ ধরে গরিব ছেলেরা অন্ন সংস্থান করে, অবস্থা ফেরায়, সুন্দরী আর সম্পত্তিশালী কন্যাদের অযাচিত প্রেম পায়। হয়তো তাদের মধ্যে থেকে গৃহলক্ষ্মীও সংগ্রহ হয়ে যাবে।

—শিখবার জন্য আর হাতে কলমে দক্ষ হবার জন্য মওকা পায় কেমন করে?

—কেন? সারা দেশ জুড়ে মাঠে মাঠেই এই অহরহ সাধনা, ঘরে ঘরে আয়নার সামনে সাবলীল গতি আর ভঙ্গির অভ্যাস। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম কি ব্যর্থ হতে পারে? মোট কথা এরা বাপ-মায়ের গলগ্রহ না হয়ে অল্পবয়স থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথ খুঁজছে। আমাদের জমিদারদের দেখে জনসাধারণকে বিচার করবেন না যেন, সিনর।

—এরা হাতে কলমে অভ্যাস পায় কী করে?

—জানেন, সিনর? এরা ছোট ছোট জায়গায় যাবে যেখানে তরুণ ষাঁড়দের যাচাই করা হয়। মানুষের মতো পশুরও তো যোগ্যতার পরীক্ষা হয়। আর হবে না-ই বা কেন?

—তার মানে?

—মানে খুব সহজ। যদি এই ছেলেদের মধ্যে কেউ সত্যি উপরে উঠে যায় সে প্রত্যেক লড়াইয়ে কম

সে কম চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা কামাবে। বছরে সত্তর-আশিটা লড়াই তার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। সিনর, জেনে রাখবেন যে লড়াইয়ের আঘাতের চেয়ে অভাবের আঘাত, ক্ষুধার আঘাত অনেক, অনেক বেশি মারাত্মক।

রমেন তা খুব ভালো করেই জানে। এত নামী দামী হোটেলে বাস, এত সচ্ছল স্নেহবৎসল পরিবারের সঙ্গে ঘোরা ফেরা সত্ত্বেও রোজ সকালের ভেসাইয়ুনো আর রাতের কমিডা খাওয়া পর্যন্ত, ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত পেসেটা পয়সার হিসাব করবার সময় সে কথা মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

সেখান থেকে চলে আসার সময় রমেন নিজের নোটবুকে একটি প্রশ্ন লিখে নিয়েছিল, এই ছেলেরা সত্যি সত্যি কিসের জন্য প্রাণপণে মহড়া দিচ্ছে? হাততালি? না টাকাকড়ি? না, সম্মানের অস্ত্রচিহ্ন? না, মৃত্যুর হাতছানি?

শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত করেছিল এই সব কিছুর মধ্যে যে ভিত্তিটা আসলে প্রবলভাবে শক্ত হয়ে আছে তা হচ্ছে প্রাইড। অহংকার ঠিক নয়। গর্ব, গৌরবে উজ্জ্বল আর দুঃসাহসে ভরা।

সেই কথাই সে বুলফাইটের এরেনাতে ভিবেরাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করছিল। কর্তা গিন্নি মেয়ে অতিথি আর ছেলে এক সারিতে পাশাপাশি বসে। অতিথি দুচোখ দিয়ে সমস্তটা দৃশ্য, রণক্ষেত্র, বৃষরাজ, দর্শকবৃন্দ, দর্শিকাদের ফ্যাশন প্যারেড আর যোদ্ধাদের স্যুট অব লাইটস ঝলমলে আলোর মতো পোশাক সবই খুব গভীর ভাবে দেখে নিয়েছিল।

এবং আলোচনাতেই সে সেই গভীরতা মিশিয়ে ফেলল। একটা লড়াইয়ের পর সাময়িক বিরতির সময়।

সে বলল—এই বুলফাইটের নেশার মধ্যেই স্পেনের চরিত্রের গর্ব ভাবটা বুঝতে পারা যায়। ডন কুইকসোটের মানসিক গঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। তা না হলে অমন একটা চরিত্র সব দেশ ছেড়ে এই দেশের সাহিত্যে রূপ পাবে কেন?

বাপ আর মেয়ে একসঙ্গে ওকে চেপে ধরল। রমেন, তোমার কথাগুলি বড্ড হেঁয়ালি। বুলফাইট কিন্তু বড্ড প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। একজন না একজনের প্রাণ নিয়ে সে খেলার সাঙ্গ হয়। অতএব খুলে বলো—এর মধ্যে হিস্পানি চরিত্র কোথায় এল।

ইসাবেল হাতের ব্যাগ খুলে সবাইকে ছোট ছোট মিষ্টি চিউইংগাম চুষতে দিল। একেবারে মার্কিন প্রথায়।

উৎসাহিত হয়ে রমেন বলল-- সাহস যখন দিচ্ছেন আপনারা। মনে মনে কিন্তু সে ইসাবেলকেই ধন্যবাদ দিয়েছিল সাহস জোগানোর জন্য। একটু থেমে সে বলল--তখন প্রথমে দুঃসাহসের কথাই বলি। সেটা হিস্পানি চরিত্রে উপচিয়ে পড়ছে বলেই বুলফাইটে এত মাতোয়ারা হয়ে যায় সবাই। তাই সবচেয়ে পাগল করা জনপ্রিয়তা দিয়ে একে পুজো করে। আসলে বুলফাইট জিনিসটা কী?

প্রশ্ন করেই সে সামনের লীলার অঙ্গনের দিকে তাকাল। একটা যুদ্ধ এইমাত্র একটা দুরন্ত ষাঁড়ের রণভঙ্গে শেষ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের শেষ দৃশ্য সে দেখেনি। চোখ বুজে শুধু দর্শকের উল্লাস, উৎসাহ আর জয়ধ্বনি শুনেছিল। এখন সে রক্তমাখা বালির জায়গাটা একবার দেখে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল। ইসাবেলের চোখের দিকে। মরণ থেকে জীবনে ফিরে আসতে হবে তাকে। না হলে এদের আতিথ্যকে অবহেলা করে তাকে উঠে আসতে হবে। ইসাবেল, না, আশা, আশা, আমি প্রাণ ফিরে পাবার আশায় তোমার চোখের দিকে তাকালাম। বেলও যে সবার অলক্ষিতে সুবিধা পেলেই তাকাচ্ছে।

কিন্তু কাউকে নিজের মনের মুমূর্ষু ভাবের কথা বুঝতে দেওয়া চলবে না। সেটা হবে আতিথ্যের অপমান।

সে তাড়াতাড়ি শুরু করল—বুলফাইট হচ্ছে আসলে দুঃসাহসের চরম পরীক্ষা। ষাঁড়কে বিবশ করবার আগে নিজের মনের ত্রাসকে বশ করতে হবে। যে বিপদ থেকে মারাত্মক ভয় আসবে তাকে যে জয় করতে পারে সে-ই হচ্ছে প্রকৃত সাহসী। গীর্জায় বা মন্দিরে মানুষ প্রেম ভরে লীলায়িত ভাবে দীপ ঘুরিয়ে আরতি করে। বুল রিংয়ে যোদ্ধা কৃপাণ নিয়ে খেল দেখাতে দেখাতে একদিকে ম্যাজেন্টা অন্যদিকে হলদে রঙের আঁচল ঘুরিয়ে আরতি করে। সব মিলিয়ে দুটো জিনিষই অত্যন্ত স্টাইলে ভরা রিচ্যুয়ালের ব্যাপার।

ওরা, সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রমেনের দিকে তাকাল। বুলফাইটের প্রতি বিতৃষ্ণা রমেন সেদিন রাতে

গোপন করেনি। কিন্তু তার এমন মনীষায় মোড়া ব্যাখ্যা, এমন পূজার আরতির সঙ্গে তুলনা ওঁরা মোটেই আশা করতে পারেন নি।

পারেনি রমেন নিজেও।

কিন্তু কী করে কী যে হয়ে যাচ্ছে।

সে কি এতক্ষণ প্রকাশ করছিল বুদ্ধি দিয়ে ভরা ভাষণ? না, মন দিয়ে গড়া সংগীত?

সে ভাবল যে এই সংগীতকেও একটা সময়ে এনে শেষ করা উচিত। না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তাই সে বলল—বুলফাইট হচ্ছে একটা ব্যালের মতো শারীরিক কলাকুশলতা আর ছন্দোবদ্ধ নৃত্যগীতে মেশানো একটা বিশেষভাবে হিস্পানি ব্যালে।

ততক্ষণে বালির মধ্যেও আবার সেই ব্যালে শুরু হয়ে গেছে। কেপ অর্থাৎ আহ্লাদী আঁচল হাওয়ার মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক নতুন মাতাদোর নতুন একটা ষাঁড়কে উত্তপ্ত করে তুলছে। তারপর টগবগে ঘোড়ায় চড়ে বর্শা হাতে এক পিকাদোর ষাঁড়কে আরও খেপিয়ে তুলল। তারপর ব্যান্ডোরিল্লোরা চিত্র বিচিত্র রঙিন ছোট ছোট কাঁটা তার কাঁধে বিঁধিয়ে দিল। শেষ দৃশ্যে একহাতে মুলেটা অর্থাৎ লাল ওড়না মুড়িয়ে মুড়িয়ে আবার সেই হাতেই তরোয়াল ধরে মাতাদোর ষাঁড়কে খেলাতে লাগল।

সেই খেলনার লীলা, স্প্যানিশ ভাষায় ফায়েনা, সেটাই এই যুদ্ধের চরম পরিণামের আগেকার চূড়ান্ত শিল্পকলা।

নিপুণ হাতে মুলেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাতাদোর তার ফায়েনার লীলা দেখতে লাগল। যে কোনও মুহূর্তে সহ্যের সীমা হারিয়ে ক্রুদ্ধ বৃষরাজ শেষ গর্জন ভরা চার্জ করে ছুটে আসবে। মাতাদোর তখন ষাঁড়ের দুটি রুখে দাঁড়ানো শিঙের মাঝখান দিয়ে শিল্পীর মতো নিজেকে চালান করে ষাঁড়ের মোক্ষম কোনও স্থানে অসি বিদ্ধ করে তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করবে।

আফিথিয়োনাডো অর্থাৎ অনুরাগী ভক্তদের ওলে ওলে ধ্বনিতে অ্যারেনা ভরে গেল।

রমেন এই ধ্বনি শুনে চোখ বুজে ফেলল। অন্তরাত্মার গহনে একটা অসহ্য আকুলি বিকুলি।

মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে প্রাণের গভীরে সে শুনতে পেল কে তাকে মৃদুস্বরে কানে কানে বলছে— চোখ মেল, চোখ মেল। স্যুট অব লাইটস ছাড়াই তুমি সংসারে সাহসী হয়ে চলতে পারবে। তুমি বীর হও।

বিসরি ত্রাস লোকলাজে কেন সে এ কথাগুলি শোনাল?

॥ ১৩ ॥

'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'

তাকে—সেই পরমাকে আমি যে পেলাম রাতের আঁধারে।

বুলফাইটের সেই আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্তটা রমেন সহ্য করতে পারবে না বলে চোখ বুজে ফেলেছিল। শুধু চোখের পাতাই বন্ধ করেনি। পাতার নিচে সব যেন কেমন অন্ধকার অন্ধকার ঠেকছিল। রাত্রির আঁধার— উজ্জ্বল দিনের আলোর মধ্যে।

সেই আঁধার রাতে উন্মত্ত উল্লসিত জন-অরণ্যের নির্জনতায় রমেন পরিপূর্ণভাবে নিজের করে অনুভব করল ইসাবেলকে।

যে তাকে এল গ্রেকোর সঙ্গে তুলনা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছে যে সেই বিদেশীকে হিস্পানি করে নেওয়া হয়েছিল।

যে তার মুখের ছাঁদে, মনের গড়নে ভাবী কালের একজন ডিপ্লোম্যাটকে আবিষ্কার করে তার গুণাগুণ বিচার করেছে বাপ মায়ের সামনে।

যে পাছে তার সারাদিন ও সন্ধ্যার ক্লান্তির পর পাশের ঘরে ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য নিজের ঘরে গীটার বাজানো বন্ধ রেখেছে।...

যে নিজের বাপ মা ভাই, চারপাশের মানুষের ভিড় ভুলে গিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওকে বীর হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। মাতাদোরের মতো স্যুট অব লাইটস ছাড়াই।...

সেই ইসাবেল। সেই বেল। সেই আশা। বীণাবাদিনীর শতদল দলে রমেনের মানসসায়রে করিছে সে

টলোমল।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমেন শুধু সেই কথাগুলিই ভাবছিল।

বুল রিং থেকে রিবেরারা ওকে সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে এসেছিলেন। ওদের মনে ছিল যে রমেন বুলফাইট দেখতে যেতে খুব উৎসাহী ছিল না। ওরা এটাও জানতেন যে খাস স্পেনেই বহু লোক আছে যারা এই উৎসবটা পছন্দ করে না। এবং সহ্য করতে পারে না।

সে রকম অবস্থায় রমেনের মতো একজন বিদেশীর প্রথম এই যুদ্ধ দেখতে এসে হঠাৎ স্নায়ুর চাপ অনুভব করা অস্বাভাবিক নয়। এটাও তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে সে মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা দমন করে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। তবু ওরা সাবধান হতে চেয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ওকে নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে নানারকম গল্পের মধ্যে দিয়ে ওর এই অভিজ্ঞতাটাকে সহজ করে তুলেছিলেন। যেন কোনও লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ না করে।

বেল যে ওর কানে কানে কিছু বলেছিল তা ওরা কেউ লক্ষই করেন নি। ষাঁড় আর মাতাদোরের মধ্যে মরণ আক্রমণের চরম মুহূর্তটিকে তৃতীয় ব্যক্তি কী করছে বা বলছে সে দিকে খেয়াল করবার মতো বুলফাইট প্রেমিক এখনও জন্মায়নি।

কাজেই খুব স্বাভাবিক যে ওরা কিছুই শোনেন নি। অতএব কিছুই ভাবেন নি। শুধু বেলের মুখ রমেনের দিকে এগিয়ে রয়েছে লক্ষ করে দেখলেন যে রমেন চোখ সাময়িক ভাবে বুজে ফেলেছে। অর্থাৎ আসন্ন মারণ সমারোহটা তার স্নায়ু সইতে পারছে না।

না পারুক। কারও কারও প্রথম প্রথম ওরকম হয়ে থাকে। পরে ঠিক হয়ে যায়।

তবু বিদেশী, তার ছেলের বয়সি। এবং ওরাই নিজেদের মোটরে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। নিজেদের সঙ্গেই ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। সবগুলি লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না।

পেপে বললেন—অন্যদিন হলে তোমায় বলতাম যে ইউনিভার্সিটি এলাকায় চলে যাও একটা ব্রান্ডি খেয়ে। এবং সেখানে কোনও কাফেতে ঢুকে পড় টেরটুলিয়ার জন্য।

টেরটুলিয়া অর্থাৎ দল বেঁধে গভীর আড্ডা মারার জন্য কোনও বাঙালিকে বলতে হয় না। বছর দুই আগে হলে রমেনকে দ্বিতীয়বার বলতে হত না।

কিন্তু দায়িত্ব আর কর্তব্য তাকে অন্য মানুষ করে দিয়েছে। সার্থক কিছু করতে হবে। সফল হতে হবে। নিজের জন্য, বাবা মার জন্য, দেশের জন্য।

আর প্রফেসারের জন্য।

সবার পরে, কিন্তু সবার উপরে আরও একজন যোগ হয়েছে সে তালিকায়।

সে জানে না। তাকে জানানো যায়ও না।

আশা—না, শুধু আশা নয়। উষা! ইসাবেল তার জীবনে এনে দিয়েছে আশা, এনে দিয়েছে উষা।

পেপে ততক্ষণে আমন্টিল্লাডো অর্থাৎ মাঝারি রকম ড্রাই হিস্পানি অ্যাপারিটিফ সুরার রসে নিজেকে একটু উৎসাহিত করে তুলেছেন। সারা জীবন কাজ করেছেন। সরকারি কাজের দায়িত্ব আর মাহাত্ম্য মাথায় নিয়ে দেশে দেশে গিয়ে প্রবাসী হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। স্পেনের অবস্থাপন্ন জমিদার শ্রেণীর বিলাসী অলসতা তাঁর পছন্দ হয় নি।

তিনি বললেন—অবশ্য টেরটুলিয়া আমি নিজে মোটেই পছন্দ করি না। দৈনন্দিন প্রোগ্রাম হিসাবে ওটা একেবারে সর্বনেশে অভ্যাস। জানি না এরা কি করে দিনের পর দিন এরকম করে সময় কাটায়। যেন বেড়ানো, হাসাহাসি আর গুলতানি ছাড়া সংসারে আর কিছুই সারবস্তু নেই। এমনিভাবে ওরা বিভোর। কাফের জীবন সিয়েস্তার মতই অবশ্যকরণীয় বাস্তব জিনিস। কাজ করার ব্যাপারে ওদের বিতৃষ্ণা একটা মজ্জাগত ব্যাপার। অথচ অনেকেরই হয়তো মাসের শেষ পর্যন্ত ধার না করে চালানোর সংগতি নেই। কিন্তু তা যে আছে সেটা অন্যদের বোঝাবার জন্যই আরও বেশি করে কাফে কোম্পানি করে বেড়াবে।

অন্যদিন হলে রমেন খুশি হয়ে এই আলাপে যোগ দিত। শুধু ওদের সঙ্গে থেকে নিজে খুশি হওয়া বা ওদের খুশি করা নয়—দেশটাকে অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখা, নিরপেক্ষ ভাবে জানা। কত বড় একটা সুবিধা।

কিন্তু আজ আর এই আলাপ আলোচনা তার ভালো লাগছিল না। সে নিজের মনের সঙ্গে আলোচনা

করে নিতে হয়। নিজের, মানে সেই মানুষটির, যার দীপ্তি ছড়ানোর মতো কোনও স্যুট অব লাইটস নেই অথচ যার জীবনে উষার উদয় হয়েছে অরুণিমার আশায় আকাশ ভরে।

জাগর রাতের পরে সত্যিই যখন আকাশে যার উদয় হল সে তখন মন স্থির করে ফেলেছে। অতটা সে মধুরের ধ্যানে কাটিয়েছে। এখন দিনটা কাটাবে মানুষের সন্ধানে।

স্পেনের মেয়েদের সম্বন্ধে সে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। থিসিসের কাঠামো রচনার মতো প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ করেছে। এখন স্পেনের পুরুষদেব পালা।

এদের সম্বন্ধে সে অনেক কিছুই মাল মশলা সংগ্রহ করছে। পেয়েছে অনেক বাহিরের খবর আর অন্তরের পরিচয়। কিন্তু সে সব হচ্ছে সাংসারিক হিসাব।

যে হিসাব তার রচনাকে সার্থকতার উর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতে পারে তার সন্ধান:পেতে গেলে সংসারের অতীত-সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্য নিতে হবে। স্পেনের কবি সাহিত্যিকদের চেয়ে চিত্রশিল্পীদের দৃষ্টি বোধ হয় বেশি পরিমাণে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

শিল্পীই তো সত্যের সন্ধানী। সুন্দরের পূজারি।

অতএব ভোরবেলা রমেন সেদিন প্রাদো মিউজিয়ামে কাটাবে ঠিক করল।

প্রাদো কথাটার মানে হচ্ছে প্রান্তর, রাখালিয়া বাট। মনে পড়তেই মন যেন গুনগুন করে উঠল- দূরদেশী রাখাল ছেলের মতো তোমার বাটে বটের ছায়ায় আমি খেলতে এসেছি। তোমাব প্রাণে কি আমার সুর সত্যি সত্যিই বাজবে?

গানটা রমেনের মনের মধ্যে নিজে থেকে ঝংকার দিয়ে উঠল।

হোটেলের আওতা তুমি এড়াতে পারো। কিন্তু হৃদয়ের হাতছানিকে ঠেকাবে কী করে?

কিন্তু আপাতত হোটেল থেকে বেরিয়ে সে কর্তব্যের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রাদো-তে যে সব টিপিক্যাল স্প্যানিয়ার্ড, বাজা থেকে রায়ত শিল্পীদের তুলির টানে মৃত্যু থেকে অমরত্বে উঠে গেছেন তাদের সে একবার স্টাডি করবে।

সাধারণ লোক, দুঃখী দরিদ্র, ভীরু লোকের মন আব চেহাবা ছবিব মধ্য দিযে অনুভব কবতে চাইলে গোয়ার আঁধার রঙে আঁকা ছবিগুলির তুলনা নেই। নেপোলিয়নের বাহিনীর হাত থেকে পলায়মান বা অত্যাচারিত হিস্পানিদের ছবি "এচিং" কবে এঁকেছিলেন গোয়া। অতুলনীয়ভাবে জীবন্ত সেসব ছবি তো জীবনযুদ্ধের হাত থেকে আজীবন পলাতক বা পরাজিতদের চিরকালের ছবি। রমেন ভেবেছিল যে সে সেগুলি দিয়েই আরম্ভ করবে।

ভেবেছিল যে তার পরে সে স্টাডি করবে ভেলাসকেথের আঁকা রাজকুমার কার্লসের ছবিগুলি। বাল্য থেকে সতেরো পর্যন্ত বয়সের বেশ কয়েকখানা ছবি আছে কার্লসের। ধাপে ধাপে বুদ্ধিমন্ত বালক কী করে কামার্ত হয়ে কৈশোরেই শেষ হয়ে গেল। তার মধ্যে হিস্পানি জীবনের একটা দিকের ছবি পাবে।

ভেবেছিল ও অনেক কিছুই; এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত 'লাস মেনিনাস' ছবিটি পর্যন্ত। "বিশ্বের চিত্রশিল্পের চূড়ান্ত কৃতি" বলে রসিক সজ্জনদের অভিমত এই ছবিটির নিচে দেওয়ালে খোদাই করা আছে। রাজকন্যার মেইডস অব অনারদের সঙ্গে যে সব পুরুষদের মুখ আঁকা আছে তা থেকেও অনেককিছু শিখবার আছে।

কিন্তু নিজেরই অগোচরে সে অন্য কোথাও এসে দাঁড়িয়েছে। যখন খেয়াল হল চোখ মেলে দেখল যে সে দূরে অন্য একটি কামরায়, অন্য এক শিল্পাচার্যের পেন্টিংয়ের ঘরে দাঁড়িয়ে। সামনে রয়েছে কোন্ ছবি এটি? কোন্ শিল্পীর? কী তার বিষয়বস্তু?

এল গ্রেকোর আঁকা সেই বিখ্যাত ভদ্রলোকটি বুকের উপর ডান হাত রেখে রমেনের দিকেই যেন তাকিয়ে আছেন। এই অভিজাত মার্কুইস হিস্পানি ক্যাবালেরোদের চূড়ান্ত প্রতীক চিত্র। তিনি গহন কালো অতীতের পটভূমিকায় থেকে উজ্জ্বল নয়নে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। পশ্চাৎপট কালো হতে পারে, কিন্তু তার ভেতর থেকে একটি উজ্জ্বল চিন্তাশীল মুখ বেরিয়ে এসেছে। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র স্তরে স্তরে কোঁকড়ানো কলার সমস্তটা মুখমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে। ডান হাতটাও ওই রকম ফুলের পাপড়ির মতো ঢেউ খেলানো সাদা ফ্রিল দিয়ে ঘেরা। আর কোমরে ঝোলানো তরোয়ালের কাজ করা হাতলটি শুধু দেখা যাচ্ছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে মর্যাদাবোধ দীপ্তভাবে ফুটে উঠেছে। কর্মে সফল, বংশে সম্ভ্রান্ত, মননে সমাহিত একটি ব্যক্তিত্ব। উষা কেন এই

নবীনের মুখে ওই প্রবীণের আদল খুঁজে পেল? কেন?

রমেনের মধ্যে কোন্ সম্ভাবনার জ্যোতি সে দেখতে পেয়েছে? কোন্ আশার উষায় তুমি আমায় জাগিয়ে তুলতে চাও, ইসাবেল? কোন্ উষার আশায়?

প্রশ্নটা তার কাছে এত বড় হয়ে দেখা দিল যে সে নিজেই তার কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তার অতীত ভুলে গেল, তার বর্তমানও বুঝি মুছে গেল। শুধু ভবিষ্যৎ, শুধু ভবিষ্যতের জন্য ব্যাকুল চিত্ত অজানা সাধনে মগ্ন হতে চাইছে?

রমেনের আকৃতির মধ্যে একটি শ্রেয়সী নারী এল গ্রেকোব প্রতিচ্ছবি পেয়েছে। তার প্রকৃতির মধ্যে সেই শিল্পীর আঁকা চরিত্রের সাফল্য সার্থকতা সৌষ্ঠব যদি সে বিকশিত করে তুলতে পাবে তবেই তো শ্রেয়সীকে প্রেয়সীর রূপে আবাহন করতে পারে। তবেই। শুধু তবেই।

কতক্ষণ যে রমেন সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে নিজেই জানত না। সময় তখন থমকিয়ে স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছিল ওর জন্য। কত লোক, দর্শক, বিদেশী টুরিস্ট ওর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে এই ছবি ও অন্যান্য ছবি দেখে চলে গেল তার খবর তার রাখবার কথা নয়। ঐ দর্শকরাও কোনও শব্দ বা মন্তব্য না করে একজন শিল্পরসিকের ধ্যানকে মনে মনে সম্মান করে চলে গেল।

মানী লোকরাই তো মানের মর্যাদা বোঝে। বহুদূর দেশের লোক বলে চেহারাতেই দেখা যাচ্ছে। সে যখন এত তন্ময় হয়ে আছে তার ধ্যান কেন ভঙ্গ করতে যাবে অন্য লোকেরা।

অনেকক্ষণ পরে—কতক্ষণ পরে তা সে বলতে পারবে না—কানের কাছে একটি মৃদু ডাক শুনতে পেল—রামন।

হঠাৎ চমকিয়ে উঠে রমেন পিছন ফিরে তাকাল।

অপ্রস্তুত মুখ করে দেখতে পেল ডন আর ইসাবেল দাঁড়িয়ে আছে।

ডনের মুখে কৌতুক।

বেলের চোখে করুণা।

ডন হেসে বলল—রামন তোমায় দেখছি একজন স্প্যানিশ গ্র্যান্ডি একেবারে এনস্লেভ করে ফেলছে। ছবিটাই যদি এমন করে বেঁধে ফেলতে পারে, ছবির মানুষটা না জানি জ্যান্ত থাকলে তোমায় কী করে ফেলত?

অপ্রস্তুত ভাবটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে রমেন উত্তর দিল—জ্যান্ত থাকলে বোধ হয় ডুয়েল লড়তে আহ্বান করত। ওর ছবিটাকে এতক্ষণ ধরে দখলে রেখেছি বলে জেলাসির চোটে।

এরকমভাবে মানসিক তন্ময়তাকে এড়িয়ে যাবার ফলে ডন তাকে আর এ সম্বন্ধে লেগপুল করবার সুবিধা পেল না। কিন্তু এত সহজে ডন তাকে রেহাই দিল না।

আমরা বেশ অনেকক্ষণ আগে তোমায় এই ছবির সামনে দেখে গেছি। একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছ। বেল বলল যে তুমি বোধহয় হিস্পানি 'হিডালগোদের' স্টাডি করছ, অতএব তোমায় ডাকাডাকি করে বিরক্ত না করাই ভালো। কিন্তু আমি কী বললাম জানো?

রমেন কথার ডুয়েলে নেমেছে। সে মন্তব্য করল—যাদের দেশে দাঁড়িয়ে আছি তাদেরই বুঝতে পারছি না, শুধু চেহারা আর পোশাক দেখে বেড়াচ্ছি। তোমরা তো আরও দূরের লোক। তোমাদের মনের কথা বাইরে দেখে কী করে বুঝব?

বেল সম্ভবত দূরের লোক এই বর্ণনাটা পছন্দ কবল না। মনে মনে ভাবল—আমিও কি দূরের লোক? এতদিনেও কি বুঝতে পারোনি।

বেল উত্তর দিল—তুমি আর্ট স্টাডি করছ, আর মনের কথা বুঝতে পারবে না?

রমেন তার তন্ময় অবস্থার কথাটা একেবারে চাপা দিতে চায়। যার চিন্তায় তন্ময় সেই মনোময়ীর সামনে নিজেকে ধরা দেবে কী করে। কিসের দাবিতে?

সে হেসে বলল—আর্ট হচ্ছে সুন্দরী নারী। যদি তাকে পছন্দ কর তো আব বুঝতে চেয়ো না।

খুব শীতল স্বরে বেল জিজ্ঞাসা করল—তার মানে? না বুঝেই পছন্দ করে নিতে হবে নাকি? তবে বিচার, আলোচনা এসব সমালোচকরা কেন করে?

কারণ, কারণ তারা বুঝতে চায় না! যদি বা বোঝে, ভালবাসে না। ভালবাসায় তাদের দরকারই নেই।

ডন এবার একটু আঘাত করার সুযোগ পেল—তবে তুমি এতক্ষণ ধরে ওই ছবিটিতে কী দেখছিলে? কী পেয়েছিলে? সমালোচনা, না ভালোবাসা?

রমনের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কেন এতক্ষণ ধরে দেখছিল, কী ভাবছিল তা কী করে প্রকাশ করে? সে একবার বেলের দিকে তাকাল। সে যে বুঝছে তা রমেন প্রথমেই তার চোখ দেখে বুঝেছিল। তবু আরেকবার তাকাল। যেন কোনও গ্রীক ভাস্করের খোদাই করা মর্মরমূর্তির সামনে রমেন দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে মূর্তির চোখে যৌবন বেদনার বদলে ফুটে উঠেছে অজন্তার অবলোকিতেশ্বরের জাগ্রত করুণা।

ডনই শেষ পর্যন্ত এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটাল। রমেনের মনের টানাপোড়েন সে জানত না; সন্দেহও করেনি। শুধু প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসে বলল—এই দেখ, কেমন বাজে সময় নষ্ট করছি। এতদিন পরে বাবা মাকে ছাড়াই আমরা একা বের হতে পেরেছি। প্রাদো-তে একবারও একা আসবার সুবিধা হয়নি। গ্যোয়ার সেই ছবিখানা ভালো করে, প্রেমসে দেখাও হয়ে ওঠেনি। আর সময় নষ্ট নয়। চলো বেল, চলো রামন। গ্যোয়ার ঘরে যাই।

বেল হেসে রাগের ভাব নকল করে বলল—ডন, খবরদার 'নটি' হয়ো না যেন।

খুব মুরুব্বিয়ানা ভাব দেখিয়ে ডন পালটা সাবধান করে দিল—ভুলো না যে বাবা মা বিশ্রাম নিচ্ছেন বলে তোমায় 'শ্যাপেরন' করার ভারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি জানি সেটা কত শক্ত দায়িত্ব। তোমার মতো আর্ট-পাগল তরুণীরা সমাজের সব চেয়ে কঠিন সমস্যা। তাই রামনকেও আমার দায়িত্বটা ভাগ করে নিতে অনুরোধ করছি।

বুঝতে কোনও অসুবিধা ছিল না যে ডন গ্যোয়ার আঁকা একটি নারীর নগ্ন দু'খানা পৃথিবীখ্যাত ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায়। ওর বয়সের যে কোনও তরুণের মতো। কিন্তু বাপ মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কি আর তা করা যায়? অথচ এখানে টিশিয়ান আর রুবেনসের আঁকা একরাশি নগ্ন চিত্রও সাজানো আছে। আহা এত অনাবৃত রূপের ডালি। এই মওকায় সেগুলি রসিয়ে রসিয়ে দেখা যাক।

গ্যোয়ার ছবি দুটিকে সংক্ষেপে বলা হয় মাহা; মানে বিলাসিনী তরুণী। একটি হচ্ছে মাহা ভেস্টিডা সুবেশা; আর অন্যটি মাহা ডেস্‌নুডা নগ্নিকা। একটি নারী একই ভঙ্গিতে লাস্যময় বিলাসে শয্যায় অর্ধশয়ানা। তফাত শুধু বসনে আর বিবসনে।

ডন আবেগে উল্লসিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—রামন, বামন দেখো, কী অপরূপ শোভন দেহভঙ্গি; কী রঙ্গিণী রূপ। যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে আবাহন করছে।

রমেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দুর্বার আকর্ষণের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে ডন ভুলে গেছে যে বোন সঙ্গে আছে, কিন্তু রমেন নিজে কী করে ভোলে?

আরও আকুল উচ্ছ্বাসে ডন বলে উঠল—আঃ। আমি যদি গ্যোয়া হতাম. .

ওর অস্বস্তিকর আনন্দের রাশ একটু টেনে ধরার জন্য রমেন বলল—তাহলে, তুমি বোধহয় এই ছবি আঁকতেই পারতে না। এই সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে ওকে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে।

মুচকি হেসে বেল বলল—তাতে অবশ্য চিত্রকরের নিজেরই লাভ হত কিন্তু বিশ্বময় রসিকসজ্জনদের কী দারুণ লোকসান তা ভেবে দেখো।

ডন বলল—যতদূর জানা যায় শিল্পী লাভের ব্যাপারে এক কানাকড়িও ছাড়েন নি। ছবি দুটি তার যে গোপন প্রেয়সীরই হোক বইয়ে লেখে যে শিল্পী তাকে সব দিকেই মজিয়ে ছিলেন। এতদূর যে, যে প্রধানমন্ত্রী এই দুটো অর্ডার দিয়ে আঁকিয়ে ছিলেন তিনি জেলাস হয়ে নগ্নিকাটিকে অন্য ছবির তলায় লুকিয়ে ঢেকে রেখে একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। এই দুটি ছবির মধ্যে শুধু নাকি ওইটুকুই তফাত। একটির মুখে দেহলীলার তৃপ্তির আভাস।

একটু দম নিয়ে ডন জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা রমেন, তুমি তো লন্ডন থেকে আসছ। সেখানে মেয়েরা খুব স্বাধীন! ফ্ল্যাপার মেয়েরা কত কিছুই করে বেড়ায় শুনেছি। ন্যুডিটিও যথেষ্ট চলছে স্টেজে। সী-সাইডে সাগরস্নানও অনেকখানি সুবিধা এনে দেয় ওদেশে। তুমি এ সম্বন্ধে কী মনে করো; আহা বিউটি ইন এ বিকিনি।

ডনের এহেন রূপ-তৃষ্ণার রূপ সে আগে দেখেনি। কী উত্তর সে দেবে এখন? এবং ইসাবেলের উপস্থিতিতে?

তবু সে ভেবে নিল যে এই আমার একটা পরীক্ষা। আমার উষা আমায় চিনে নিক, তারপরই বুঝতে পারব উষার আশা আছে কিনা আমার আকাশে।

রমেন বলল—কলেজ থেকে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য জোসেফিন বেকারের নগ্ননৃত্য দেখে তার উপর রিপোর্টটি লিখতে দিয়েছিল। পৃথিবীবিখ্যাত এই নৃত্যশিল্পীর নাচ লন্ডনের স্টেজে আমরা ছাত্ররা দেখতে গেলাম। ইউনিভার্সিটির ইনভিটেশন টিকিট নিয়ে সস্তা দামে। কভেন্ট গার্ডেন অপেরার স্টেজে তার প্রবেশ দেখলাম—যেন একটা আবির্ভাব। স্টেজের প্লাটফর্মটা আয়নায় মোড়া। তার পরনে শুধু একগুচ্ছ কলা। না, আর কিছুই নয়। কিন্তু তার নাচ দেখে একেবারেই আমার মনে হল না—সম্পূর্ণ ভুলেই গেলাম যে তিনি বিবসনা।

বেল অস্ফুট স্বরে বলল—আশ্চর্য, শিল্পের কী পরশ। শিল্পীর কী প্রতিভা? তারপর কী হল রামন?

রমেন বলল—শিল্পীর এত উঁচু অন্তঃকরণে যে তিনি নাচের পর নিজেই এই কাঁচা হবু সাংবাদিক ছাত্রদের ডেকে পাঠালেন তাঁর নিজস্ব গ্রীনরুমে। তিনি তখন আদিম কদলীসজ্জা খসিয়ে ফেলে স্বাভাবিক মহিলা হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর অন্তর আলোড়ন করা গান 'মাদিয়ানা'র কণ্ঠস্বর তাঁর কথার মধ্যে রিন রিন করে উঠছে। তিনি কী বললেন, জানো?

রুদ্ধশ্বাসে ওরা দুজনেই তা শুনতে চাইল। ডনের যৌবন ব্যাকুলতার বর্ষাতে শরতের সুর লেগেছে।

জোসেফিন বেকার বললেন, আমি কিন্তু মোটেই নগ্ন ছিলাম না। কেবল আমার দেহের উপর কিছু ছিল না—এই মাত্র। আমেরিকার বরফশীতল সেন্ট লুই শহরের নিগ্রোপাড়া ঘেট্টোতে যখন আমার শীত করত, তখন আমি নাচতাম। নাচতে নাচতে নিজেকে গরম রাখতাম। আমি আজ ইন্টারন্যাশন্যাল ক্যাবারে শিল্পী হয়েছি বটে, কিন্তু সেই উত্তাপ আমার রয়ে গেছে। সেই হচ্ছে আমার বসন।

ওরা তিনজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তিন জনের মনে একটা চাপা উত্তেজনা। যেন ওরা এইমাত্র যে নৃত্যের কাহিনি শুনেছে তা থেকে মর্মে বুঝেছে যে নগ্নতা ছাড়া আরও অনেক, অনেক কিছু আছে শিল্পকর্মে। ওই সামনের লাস্যময়ী বিলাসিনীব অর্ধশয়না নগ্ন চিত্র প্রতিভায় মোড়া। ঠিক যেমন ভাবে জোসেফিন বেকার প্রতি শ্রোতার কানে জনে জনে তার কণ্ঠসুধা বিতরণ করে যান, তার সোপ্রানো সুরেলা কণ্ঠ যেমন ভাবে কানে কানে আকুল করে তোলে, তার দেহ যেমন ভাবে নয়ন মনকে আবাহন করে—সুন্দরের অনিন্দ্য মন্দিরে। শিল্প দেহে ঢেকে থাকে না; রূপে বন্দী হয় না। অরূপে অবগাহন করে।

একটু পরে ডন ওদের দুজনের চোখের দিকে তাকাল। বুঝল, অনেক কিছু বুঝল। আরও কিছু বুঝল।

তারপর বলল—এই ছবি দেখার অভিজ্ঞতা শুধু হৃদয়হরণী নয়, হৃদয়-হয়রানীও বটে। তারপর তোমাদের নিশ্চয়ই একটু বিশ্রাম দরকার। আমি আরও দুয়েকটা ছবি সেরে আসছি। তোমরা দুজনে বরং এগিয়ে যাও। পার্কে দেল রেটিরোতে রোজেলাদাতে চলে যাও। সেখানে লিলি সায়রের পারে গোলাপ কুঞ্জে বসে বিশ্রাম করো। আমি শিগগিরি তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব।

ওরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রমেন? পাশাপাশি যেন ভেসে যেতে যেতে তার মুখ থেকে দুটি লাইন আপনা থেকে বেরিয়ে এল :—

'দেহের দেউল প্রান্তে একান্তে অদেহী গাথা গাই, বাসনা পাশরি'
যেন আদি কবি বাল্মীকির শ্লোকের উচ্ছ্বাস।

॥ ১৪ ॥

রোবিন্দ্রো নাট টাগোরে?

সহসা উচ্ছ্বাসের জোয়ারে রমেনের মুখ থেকে যে কবিতা বেরিয়ে এসেছিল তা যেমন অভাবনীয় তেমনি তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

তাই সে ইসাবেলের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারল না।

শুধু সে অনুভব করেছিল যে গত কটি দিন ধরে যে চিন্তা, রাত্রি জুড়ে যে চঞ্চলতা তার মনের গহনে সাগরের অন্তস্থলে লহরির মতো গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল তা-ই শেষ পর্যন্ত হঠাৎ তার অন্তর থেকে বিদ্যুতের

মতো আবেগ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

সে কি নিজেই ওই লাইন দুটি রচনা করেছিল? কবিতা সে পড়েছে প্রচুর, আবৃত্তি করেছে প্রাণ ভরে। কিন্তু আগে রচনা তো করেনি কখনও।

এখন যে অনিন্দ্যসুন্দর দুটি লাইন তার মন থেকে সৃষ্ট হল, মুখ দিয়ে প্রকাশিত হল, তা তার নিজের কৃতিত্ব নয়। পাশে হেঁটে চলেছে একটি বিদ্যুৎলতা বিজয়ীর মতো গোরী, মেঘের মতো মেদুর, প্রথম বর্ষার মতো সৌরভসরসা। সেই বিদ্যুতেরই সহসা পরশ, সহাস্য প্রকাশ হচ্ছে এই দুটি লাইন।

তার জীবনের প্রথম প্রেমের পরম নিমেষ।

সে কোনও উত্তর দিতে পারল না। অতখানি বড় একটি ভিন্‌দেশী নাম বোধহয় মুখে আনতে অসুবিধা হচ্ছিল। বোধ হয় ইসাবেল ভেবেছিল যে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে প্রথম নামটির উল্লেখই যথেষ্ট।

সে আবার শুধাল—রোবিন ড্রো? রমেনের কানে তখনও সাগর কল্লোলের মতো ভাষাহীন সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। কী যে সে শুনল তা সে নিজেই ধরতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত বলল—না, রুবেন ডারিয়ো নয়।

বেল বলল—তা আমি বুঝেছি। রুবেন ডারিয়োর কবিতা নিশ্চয়ই তোমার ভাষাতে অনুবাদ হয়নি। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম রোবিন্‌দ্রোর কবিতা কি না। কিন্তু তোমার কথা আর মুখের চেহারা দেখে মনে করছি যে তারও নয়। তবে...

একটু মায়া ভরা স্বরে বেল মৃদু ভাবে জিজ্ঞাসা করল—তবে কি তোমার? প্রশ্নের মধ্যে একটা আকুলতা ছিল। দ্বিতীয় বার তোমার কথাটা ব্যবহার করাতে সেটা আরও বেশি ফুটে উঠল।

তরুভরা বনভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে ওরা কুমুদ সায়রের পারে পৌঁছে গেছে। ওদের হাঁটা পথের বীথির দুপাশে ছিল সবুজের সমারোহ, বিরাট বিরাট বনস্পতি আর কেয়ারি করে সাজানো ঝোপঝাড়। এখন ওরা এসে পড়ল গোলাপকুঞ্জগুলির রঙিন সুরভিত অঞ্চলে।

সেখানে আরাম করে বসবার জন্য বেশ কিছু লতার ছায়া ঘেরা পাথরের বেদী আছে। কিন্তু ওরা সেখানে না বসে সায়রের একেবারে পারে পাথরের বাঁধানো প্রান্তে হাঁটু মুড়ে বসল। দুই প্রকৃতির শিশুর মতো।

বেল আবার বলল—বুঝেছি, তোমার নীরবতার মধ্যেই লুকানো আছে তোমার উত্তর। এই কবিতা শুধু যে তোমার স্বতঃস্ফূর্ত রচনা তা নয়, তোমার মনের বচন। তোমার নিজের ভাষায়। তার ধ্বনির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি তার মানে। তবু একবার তার পুরো অনুবাদটা আমায় শোনাও।

তা শোনার পর সে বলল—জানো, তুমি কত স্বর্গীয়। কত অতীন্দ্রিয় ভাবে ইথিরিয়াল তোমার মন। তারই প্রকাশ তোমার ওই দুটি কথাতে অদেহী গাথা।

রমেন চুপ করে রইল। কালিদাস বর পাবার সাধনায় মৌন। বীণাপাণির বীণার সুর এবার বেজে উঠুক।

বেল যেন সেটুকু বুঝল। বুঝে সেই নীরবতার মর্যাদা দিল নিজে মৌন থেকে।

একটু পরে সে-ই নীরবতা ভাঙল—তুমি রুবেন ডারিয়োর নাম তুলেছিলে। আমাদের স্প্যানিসের সবচেয়ে বড় আধুনিক কবি। আমাদের কাব্য-বিলাসীদের কাছে একেবারে হিরো। জানো, ডারিয়ো দক্ষিণ আমেরিকার এক অখ্যাত গ্রামে অজ্ঞাত ভাবে মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু স্প্যানিশ ভাষায় যা কিছু মোহ আর মাধুরীতে ভরা হতে পারে সবই তাতে আছে। ফরাসি সুরার মতো মাদকতাময় তার কাব্য। একটা অচিন রাগিনির ঝংকার তাতে শোনা যায়। তুমি পড়েছ তার কবিতা, রামন?

লন্ডন থেকে রওনা হবার আগে প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এমন দুয়েকটা কবিতা পড়েছিল বৈকি। এবং তার মনে সাড়া জেগেছিল বলে সে অনুবাদও করেছিল। এখন তারই একটি আবৃত্তি করল :—

"নিমেষের কুসুমেরে নাও তুলি,
গাহে গান মায়াবিনী বুলবুলি
রাতের মাধবী গানগুলি।"

আবেশে বিকশিত কুসুমকলির মতো আঙুলগুলি দিয়ে বেল রমেনের একটি হাত তুলে নিল। কমলা কলির লাবণ্যের আবরণে নারাঙ্গীর বর্ণালী উত্তাপ।

প্রেয়সীর প্রথম স্পর্শ, কুমারীর নব নীরব প্রীতি। ওদের প্রথম প্রণয় প্রকাশের মূক সাক্ষী হয়ে রইল স্পেনের রাজা রানীদের শুভ্র সারি সারি প্রস্তর মূর্তি।

খানিক পরে বেলই শুরু করল—জানো, আমি তোমাদের রোবিন্‌দ্রোর কবিতা পড়েছি। আমাদের একজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া মহাকবি পেমান তাঁর অনুবাদ করেছেন। আমি মনে করি যে ডারিয়োর রক্তমাংসের উম্মাদনা ভরা কবিতা স্পেনের নিস্তরঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে নতুন রস আর রঙ এনে দিয়েছে। কিন্তু তোমাদের কবির আকাশের লীলা সেখানে নেই। তবে...

তবে...বলে বেল চুপ করে গেল।

কেন? কেন চুপ করে গেল? রমেন যে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ওরে প্রত্যেকটি কথা, কথার অন্তর্নিহিত অর্থ, অর্থের সম্ভাবনা সব কিছু বুঝবার, অন্তরের মধ্যে বিশেষ আলোকে উদ্ভাসিত করে দেখবার চেষ্টা করছিল। ইসাবেল তার জীবনে যে উষা এনে দিয়েছে, আশা সঞ্চার করেছে তার বিন্দুমাত্র যতিভঙ্গও যে তার পক্ষে প্রাণান্তকর।

সে উৎসুক ভাবে উষার দিকে আশাভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

বেল নীরবতা ভাঙল—তবে আমি ডারিয়োকে এখন বেশি পছন্দ করি। কারণ কী জানো?

বল না, কারণটা। তুমি যে কারণটি খুঁজে পেয়েছ সেটি তো আমরা মনের কথা হতে পারে।

ডারিয়োর চোখের উপর ভুরুজোড়া একটা নিবিড়তার ভাব প্রকাশ করত, যেটা তোমার আছে। তিনি হিস্পানির চেয়ে বেশি ভারতীয়, চেহারা আর চরিত্র দুইয়েতেই। তিনি বলতেন যে আমাদের যুগের কবিদের ফ্রক কোর্ট আর গ্লাভস আর পেটেন্ট লেদার-শু পরা উচিত কারণ মডার্ন আর্ট হচ্ছে আভিজাত্যের জিনিস। ছন্নছাড়ার ছাপ তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, মানানসইও নয়। তুমি ছাত্র, তবু তোমারও সে ছাপ লেশমাত্র নেই। আর্ট হচ্ছে আভিজাত্য।

রবীন্দ্রনাথও সেই কথাই মনে করেন। তাঁর মানস আর মূর্তি দুই-ই আভিজাত্যে ভরা।

বেল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর—তারপর সে যা বলল তার দীপ্তি বিদ্যুতের মতো রমেনের সমস্ত অস্তিত্বকে উদ্ভাসিত, আলোয় আলোকিত করে দিল।

বেল বলল—দ্বিধাহীন, সংশয়হীন কণ্ঠে বলল—তোমায় দেখলে আমার রুবেন ডারিয়োর জীবন আর চেহারা মনে পড়ে। তরুণ ডারিয়ো যিনি সংসারে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য বিদেশে, ইউরোপে এলেন। যিনি মানুষের চঞ্চল মানস আর চলমান মুহূর্তগুলিকে জীবনের মাধুরী দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন। তোমার মুখের আকৃতি, দৃষ্টির ভঙ্গি তার মতো। তুমি এসেছ ইয়োরোপে প্রতিষ্ঠার সন্ধানে। তোমার লেখনীতে, একদিন সাংবাদিকতা সাহিত্যের রূপ নিয়ে ফুটে উঠবে। তুমি বড়ো হবে।

রমেনের সমস্ত অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠল। উষার আশা পূর্ণ করার মতো ভাগ্য বা ক্ষমতা কোনটাই হয়তো তার হবে না। যাকে সে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে তার আশাভঙ্গের কারণ সে কিছুতেই হতে চাইবে না।

অতএব এই আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। অথচ বেশি রকম অন্যদিকে ঘোরালে উষা আহত হতে পারে। এমন কি মনে করতে পারে যে সে ওর উৎসাহে, হয়তো অনুরাগে, ঠাণ্ডা জল ঢালছে।

ছিঃ, তা কী করা যায়?

খুব সন্তর্পণে সে বলল—আমার এই মুহূর্তে অন্য একজন স্প্যানিশ কবির কথাও মনে হচ্ছে। হুয়ান হিমেনেথ, যিনি তার আমাদাকে (প্রেয়সী) অনুসরণ করে আমেরিকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন আর তাকে স্ত্রী হিসাবে ফিরিয়ে এনেছিলেন সঙ্গে করে। কিন্তু...

এবার মাঝপথে থেমে যাবার পালা তার নিজের।

কারণ বেলের মুখে একটা অপরূপ রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছে।

রমেন নিস্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু বেল তা দেখে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তুমি কাকে অনুসরণ করে স্পেনে এসেছ?

মৃদুস্বরে রমেন উত্তর দিল—সত্যি কথা বলছি। সকলের ভাগ্যে যাত্রাপথ অতি মধুর হয় না। অত মধু-সন্ধানীও হয় না। এই কবির প্রাণে আছে গান, চোখে স্নিগ্ধ রঙ...

বেল বাধা দিয়ে বলে উঠল—কিন্তু কবিতায় আছে উদাসী শরৎ আর বিষণ্ন সন্ধ্যা।

নিজেদের ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ আর অনুরাগের আভাস থেকে দূরে এই আলোচনা সরে আসছে মনে করে রমেন একটু উৎসাহিত হল। অন্তত উৎসাহ দেখাল—বুঝেছি। ডারিয়োর চেয়ে হিমেনেথের ভাবধারায় সরে আসাই ভালো হচ্ছে এখন। এই উদাসী অপরাহ্ণে...

বেল আবার ওকে থামিয়ে দিল।

বলল, আমার কথাটা শেষ করিনি এখনও। এই কবি নিশ্চয়ই একদিন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান পাবেন। হয়তো নোবেল প্রাইজও পাবেন। কিন্তু তা সম্ভব হবে বিষাদের জন্য নয়, আনন্দের জন্য; আশায় ভরা আনন্দের জন্য। আমি তার ভালো বালডাস ডি প্রিমাভেরা অর্থাৎ বসন্তের সংগীত থেকে একটা কবিতা তোমায় শোনাচ্ছি কাম টু দি ফিল্ডস্ ফর রোজমারি, চিরসবুজ সুরভি লতাগুল্ম রোজমারির প্রান্তরে এসো। আসবে সেখানে তুমি, রামন আমার সঙ্গে? পর রমেরো ই পর আমোর। রোজমারির জন্য আর প্রেমের জন্য?

এই কবিতাটি রমেন জানত না। কিন্তু খুশি মনে বলল—চল, তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রোজমারীর ঝোপে ভরা প্রান্তরে যাব। ভামোনোস, ভামোনাস। চল, চল।

—তবে এই তোমার হাত দুটি আমি তুলে ধরলাম। আমার হৃদয়ে, আমার অন্তরাত্মাতে। এবার তুমি শোন—

শুধালেম—তোমায় ভালোবাসতে দেবে কি?
প্রেমে হয়ে উৎফুল্ল
আমারে সে বলল—
মুকুলিত বসন্তেরে যবে আমি নিরখি—
দিয়ে মোর সব হিয়া
হইব তোমারি প্রিয়া।

প্রাচীন ঋষিরা কবিকে বলতেন স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। এই দুই নবীন প্রাণ নিজেদেব ভাষায় যা বলতে পারল না তা প্রকাশ করল কবির শরণ নিয়ে। হায়! ভীরু প্রেম।

এদিকে ওদের চারদিকে দূরে দূরে লোকেরা আনাগোনা শুরু করেছে। এমনিতেই ত্রিশের দশকেও মাদ্রিদের ভীষণ ভাবে পিউরিটান সিটি হিসাবে নাম রয়েছে। অবশ্য ক্যাবারে জাতীয় জায়গাতে বা নাচঘরে যে সব আদিরসে ভরা বস্তু পরিবেশন করা হয় তার তুলনা প্যারিসেও পাবে না কেউ। কিন্তু তা বলে প্রকাশ্যে? রাজপথে? সাধারণের জন্য প্রমোদ উদ্যানে?

নুন্‌কা। নুন্‌কা। নেভার নেভার।

হিস্পানি মেয়েরা খাটো বা আঁটসাঁট পোশাক পরে পথে বের হবে? প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটবে। পাহারাদার সাথী ছাড়া পায়চারি করবে? গীর্জায় গিয়ে বিয়ের সম্ভাবনা বা প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পরপুরুষের হাত ধরবে?

তা হলে সমাজ আছে কেন? পুলিশ আছে কেন?

এই রেটিরো পার্কে প্রণয়ী-প্রণয়িনীরা অবশ্য এসে থাকে। নটবররাও বারবধূ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একাকিনী বিদেশিনী সাহসিনীদের পিছু নেবার মতো রসিক নাগরের অভাব হয় না। সে সবই জানা আছে। মেনেও নিয়েছে সবাই।

কিন্তু তা বলে এই দুজনকে?

এরা ভাই-বোন নয়। চেহারাতেও নাগর-নাগরী বলে মালুম হয় না। একটি নবোদ্ভিন্নযৌবনা শ্বেতাঙ্গী আর একটি ভিনদেশী তরুণ। মুখে তাদের তন্ময়তা, দেহে বড় কাছাকাছি। প্রত্যেক রসিক হিস্পানি দর্শকের নজর আর খোঁজখবরের উপযুক্ত বিষয়বস্তু।

বেশ কয়েকজন আনাগোনা করতে-করতে একটু-একটু করে কাছাকাছি এগিয়ে এল। অথচ রেটিরো পার্ক এমনি একটা সুসভ্য জায়গা যে শত নিরিবিলি হলেও কেউ অভদ্রতা করে বা কৌতূহল দেখিয়ে তার স্থানমাহাত্ম্য নষ্ট করবে না।

গার্ডেন অব ইডেন থেকে দুজনে পৃথিবীর রাজপথে নেমে এল।

হায়! এখানকার তরুবীথিকার মাঝখানের সরণীতে স্বপ্ন রচনা আর সম্ভব নয়। স্বপ্ন একবার ভঙ্গ হলে তাকে সাঙ্গ করে দিতে হয়। থাকুক শুধু তার স্মৃতি, তার রেশ, তার সৌরভ।

খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে রমেন বলে উঠল—আরে ডন যে এখনও এল না। ও তো প্রাদো থেকে বেরিয়ে এখানে এসে আমাদের খুঁজবে।

বেল সংকোচে বলল—এখনও যখন এসে পৌঁছোয় নি, বোধ হয় আর আমাদের খোঁজে আসবে না। হোটেলও হাঁটা পথের মধ্যেই। কাজেই ভাববেও না।

দুজন-দুজনের দিকে সুধাঝরা দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। ওরা আর পরস্পরের হাত ধরে নেই। কিন্তু মনে-মনে একসঙ্গে একীভূত হয়ে যৌবনেব তোরণ দিয়ে জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু পাশাপাশি বা হাত ধরাধরি করে চলা সাধারণ হিস্পানি যৌবনের জন্য নয়।

স্পেনের ছোটখাট শহরগুলিতে ছেলেরা আর মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা কী ভাবে হাঁটে আর পরস্পরকে দেখে আর দেখায় তার বর্ণনা বেল দিতে আরম্ভ করল—জানো, রামন সে এক মজার দৃশ্য। আমরা পৃথিবীর বহু দেশ বাবার সঙ্গে ঘুরেছি বলে আমাদের কাছে মজার মনে হয়। অথচ এদের কাছে এটা একটা ট্র্যাডিশনের মতন।

রমেনের শুনতে খুব মজা লাগছিল। এই মাত্র রুবেন ডারিয়ো আর হুয়ান হিমেনেথের কবিতা ওদের মনে যে বসন্ত-চঞ্চলতা জাগিয়েছে, দেহে যে অতনুর অভিষেক জ্বালিয়েছে, তা থেকে নিষ্কৃতি না হোক, অন্তত বিরতি দরকার। খুব আগ্রহ দেখিয়ে সে শুনতে চাইল।

"জানো, রামন তোমার একবার একা একা ওই সব সান্ধ্য ভ্রমণে যাওয়া দরকার। স্পেনেব যৌবনকে সব চেয়ে কাছে থেকে দেখতে পাবে। নিবিড় ভাবে অনুভব করতে পারবে। শহরের ঠিক মাঝখানে হচ্ছে প্লাজা। সেখানে নোঙরহীন তরুণবা রোজ সন্ধ্যায় দল বেঁধে হাঁটে। আর হাঁটে কুমারী মেয়ের দল হাতে হাত দিয়ে মানে মেয়েরা পরস্পরেব হাতে হাত দিয়ে।

—তাহলে মজাটা কোথায়?

— সেটাই তো বলছি। একদল যদি শুরু কবে পুব থেকে, অন্য দল শুরু করবে পশ্চিম থেকে। প্রত্যেকবার হাঁটার পালাতে প্রত্যেক তরুণ প্রত্যেক তরুণীকে মাঝপথে মুখোমুখি, চোখাচোখি। সব বলাবলি অবশ্য শুধু চোখে চোখে। তার চেয়ে বেশি মাখামাখি নিষিদ্ধ। বলতো, কেমন ব্যাপাব?

রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেলার ভান করল—হায়, নদীর এপার থেকে ওপারেরটিকে চিনব কেমন কবে। যেখানে পাশাপাশিই চেনা যায় না সেখানে পারাপারের বেড়া যে দুস্তর পারাবার হয়ে উঠবে। মোট কথা আমার দ্বারা হবে না।

বেলের মুখ লাল হয়ে উঠল। রমেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

বেল আবার শুরু করল—তোমার কথা হচ্ছে না। প্রেজেন্ট কম্পানি সব সময়ই হিসাবের বাইরে থাকবে। ওরা কিন্তু এই ভাবেই প্রেম নিবেদন আর মন জানাজানি করতে অভ্যস্ত। তোমরা. যাবা এই বিদ্যার গোপন কথা জানো না তারা বুঝতেই পারবে না এটা কত সহজ আর সোজাসুজি।

—তার মানে? শুধু দূর থেকে চোখের বাণেই বাজিমাত?

—ওস্তাদের কাছে ঠিক তাই, মোটে ঘণ্টা দুইয়ের প্যারেডেই যুদ্ধের ফয়সালা শেষ। এই পায়ে চলার যুদ্ধে এরা প্রত্যহ নামে, চোখ মারে আর মাথা নাড়ে, মুচকি হাসে আর বোঝাপড়ায় আসে। তাই যদিও বাইরের লোকরা জানে না, বোঝে না, সত্যি কত সহজে এবা ঠিকমতো বাছাই করে নেয়। আর জীবন-ভোর ঘরসংসার অক্ষুন্ন ভাবে বজায় রেখে যায়। স্পেনের লোকরা এই প্রথাটাকে খুব দাম দেয় কিন্তু।

রমেন একটু দুষ্টুমি করবার লোভ সামলাতে পারল না—বেশ তো, আমিও দিচ্ছি। তবে শুধু একটা শর্তে।

হেসে বেল উত্তর দিল—বেশ তো তোমার শর্তটা বল। আজ সন্ধ্যায় হোটেলের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেব যে একজন বিদেশী যুবক 'ইভনিং পাসিয়ো'-তে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে চায়। দেশের বিভিন্ন শহর থাকে নিজেদের খরচায় জামাই আদর দেখিয়ে যেন নেমন্তন্ন করে নিয়ে যায়।

রমেন জানাল যে তার শর্তটা এখনও জানানো হয়নি, যুদ্ধের শর্ত অবশ্য। সন্ধির কিনা তা আগে বলা যায় না।

—কী সেই শর্তটা?

মুখ গম্ভীর করে রমেন তার শর্তটা ঘোষণা করল—এই মুহূর্তে যে পাশাপাশি হাঁটছে তাকেও সেই 'পাসিও'-তে পারাপার করতে হবে।

ততোধিক গম্ভীর মুখে বেল উত্তর দিল—কিন্তু তাকে নিয়ে টানাটানি কেন? সে তো যুদ্ধে নামতে চায় না।

বেশ আক্রমণের ভঙ্গিতে রমেন ঘোষণা করল—কিন্তু এই যুদ্ধে নিরীহ নিরপেক্ষ হিসাবে কেউ পার পায় না। তুমি যদি শান্তি আর সন্ধি চাও তাহলে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ দেশ দখলের চেয়ে হৃদয় হরণ অনেক গুরুতর অপরাধ।

ভয়ের ভান করে বেল জানাল এই যুদ্ধের জগৎ থেকে পালিয়ে আমি বরং রাম্বালাতে আশ্রয় নেব।

যেন যুদ্ধ হয়েই গেছে এমন একটা আত্মপ্রসাদের ভাব দেখিয়ে রমেন বলল—অর্থাৎ মাদ্রিদ থেকে একেবারে বার্সিলোনায়। কিন্তু রাম্বাল তো হচ্ছে চরণ-সরণী। শুধু পায়ে হেঁটে বেড়ানোর বুলেভার্ড। কিন্তু হে পলায়মানা বীরনারী, ওই বিরাট ম্যালে লুকিয়ে থাকার জায়গা তো সুবিধামত পাবে না।

—কেন? সেখানে এত ফুলের স্টল সাজানো আছে থরে থরে। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর চরণ-সরণী।

—অর্থাৎ ফুলদলের মাঝে একটি সচল ফুল লুকিয়ে থাকবে এই প্ল্যান করেছ? কিন্তু ওরা তা সহ্য করবে কেন? ওদের চেয়ে বেশি সুন্দর, বেশি সৌরভময়ী কাউকে নিজেদের মধ্যে ঠাঁই করে নিতে এসেছে দেখলে হিংসায় বিট্রে করে দেবে। ফুলরা বিশ্বাসঘাতক হয়, তা বুঝি জানো না এখনও।

কপট রাগ দেখিয়ে বেল বলল—আজ দুপুরেই তা প্রথম দেখলাম। বিশ্বাস করে রেটিরো পার্কের গোলাপ কুঞ্জে এসেছিলাম একজন নিরীহ মুখচোরা পিটার প্যানের সঙ্গে। আর দেখ তো স্থলে গোলাপ, জলে লিলি—কেমন দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। এখন সামলাই কী করে?

আহত পৌরুষের অভিমানে রমেন জিজ্ঞাসা করল—মাত্র পিটার প্যান ছাড়া আর কিছুই আমার মধ্যে তুমি দেখতে পাওনি, উষা?

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে এসে উষা মৃদুস্বরে বলল—জানো রামন, হিস্পানি তরুণদের চোখে আগুন জ্বালা ছাড়া যেন আর কিছুই নজরে পড়ে না। এই প্রথম তোমায় দেখলাম যে আনন্দ-সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকাল। যার ভাষায় আছে সুধা আর দৃষ্টিতে আছে বিস্ময়। যে আমার মনকে আবিষ্কার করতে চায়, কিন্তু আগ্রাসী নয়।

আরও মৃদুস্বরে, যেন শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যই, রমন উষাকে শোনাল, উষার আশ্বাসে সে যে সেই বিস্ময়ের আবরণ খুলে বেরিয়ে এসেছে, তার নিজের আকাশ যে আজ উষার আশায় ভরে উঠতে চাইছে, ইসাবেল।

তাই সম্পূর্ণ নামটি ধরেই তাকে ডাকতে প্রাণ চাইল।

ইসাবেল কোনও উত্তর দিল না।

হোটেলটা দেখা যাচ্ছে। যেন নিজেদেরই অজানতে ওরা সামান্য একটু তফাত হয়ে হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি অবশ্য, মাখামাখি না হলেও।

স্পেনে কুমারী মেয়েরা শ্যাপেরন ছাড়া সাধারণত রাস্তায় হাঁটে না।

হোটেলের রিসেপশনে কামরার চাবি চাইতেই রিসেপশনিস্ট রমেনকে জানাল যে তার জন্য একটা চিঠি তার ঘরের টেবিলে রাখা আছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রমেন ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পাশের পাঁচ নম্বর ঘরের দরজা খোলার মৃদু আওয়াজও সে শুনতে পেল। বন্ধ করার শব্দও।

টেবিলে পড়ে আছে একটি চিঠি। চিরসবুজ সুবাসিত রোজমারি ফিল্ড থেকে কোনও লিপি নয়। দূর দেশের এক ঘিঞ্জি পাড়া থেকে ডাকে দেওয়া একটা বালি কাগজের খাম।

॥ ১৫ ॥

বালি কাগজের রঙ।
সময়ের ছোপে বিবর্ণ, আশাহীন

ধূসর রঙ।

এমন কি বহু ব্যবহারে মলিন সাদা পর্যন্ত নয়। কচি কলাপাতার মতো সবুজ আশা বা অপরাজিতা ফুলের মতো নীল নিবিড়তা অবশ্যই নয়। একেবারেই বালি কাগজের রঙের নিঃশেষ করা, আশাকে শুষে নেওয়া মরুভূমি।

রমেন অনেকক্ষণ খামটার দিকে তাকিয়ে রইল। শূন্য মনে। নিস্পৃহ ভাবে।

সে একটু আগেই বার্সিলোনায় লা রামব্লা নামের চরণ-সরণী নিয়ে ঝলমলে হাসিঠাট্টা করেছিল। সেটাকে এখন একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে হল। হাসিখুশি পরিবেশের জন্য রাম্বলার মতো জাদুতে ভরা হাঁটার পথ পৃথিবীতে সম্ভবত আর কোথাও নেই। ওই মনোরম কুঞ্জবনের মতো পথে ভোর রাত পর্যন্ত আনন্দময় জীবন শুধু জেগেই থাকে না। বিশ্বজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। দুঃখকে পিছনে ফেলে এসো। দৈন্যকে ভুলে যাও। মুক্তির নিঃশ্বাস নাও।

সেখানে আলো ঝলমল করে। আনন্দ কাকলীর মতো গুঞ্জন করে। বর্ণালীময় জীবন সেখানে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে।

যৌবন সোনার তোরণের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে সে সিংহাসনে বসে। সেইখানেই তো তার চিরকালের অধিকার।

এক সেভিল ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও এত সুসজ্জিত সুন্দর নরনারীর মেলা মেলে না। তাদের গতির ছন্দ মোহিনী রঙ্গ আনন্দের ভঙ্গি বুঝিয়ে দেয় যে দুঃখ দুর্দশা হচ্ছে জয় করে ফেলার বস্তু। সুখ সৌভাগ্য হচ্ছে লাভের যোগ্য ধন।

পথের দুধারে ছায়াঘন স্নিগ্ধ প্লেন গাছ আব সারিসারি সাজানো ফুলের স্টল প্রাণ ভরে প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে উপভোগ করে সবাই।

না গিয়েও রাম্বলাতে রমেন রমণীয় জীবন এই মাত্র আস্বাদ করে এসেছে।

রমেনের মন এখনও সেখানে। চোখ চিঠির খামে। কিন্তু কোনও সুখস্মৃতি কি জড়িয়ে নেই ওই চিঠি যেখান থেকে এসেছে সেখানকার সঙ্গে?

আছে, আছে, সব কিছুই রক্তঝরা হিয়ার মর্মস্থলে ফুটে আছে। এমন কি গলি মোড়ের শিউলি গাছটি পর্যন্ত। ছেলেবেলায় সে মর্নিং স্কুলে যাবার সময় ওই শিউলির তলায় দাঁড়িয়ে প্রাণভরে আরামে নিঃশ্বাস নিত। মাটিতে টুপটাপ করে ঝরে পড়া শিউলি ফুল তুলে নিত।

যতদিনে সে বড় হল সেই গাছে আর ফুল ফুটতে পায় না। কুঁড়ি অবস্থাতেই চুরি হয়ে যায়, আর সিউলিতলাটা পাড়ার পাইকারি প্রস্রাব-কেন্দ্র হয়ে উঠল।

সে সব চিন্তার চেয়ে চিঠিটা খুলে পড়াতে বেশি সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। একটা বাস্তব অলঙ্ঘ্য সত্য হচ্ছে ওই চিঠি, তাতে আছে নিজেদের পরিবারের প্রাত্যহিক জীবন সমস্যা, আর্থিক টানাটানি, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, আরও কত কী।

এই বিশেষ কাজে স্পেনে হঠাৎ আসাতে বাবা মা ছেলের বৈষয়িক সাফল্যের আগাম সম্ভাবনা দেখেছেন, করেছেন সাংসারিক সুরাহার হিসাব। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সার্থকতা নয়, অর্থকারিতা।

তা ছাড়া—তা ছাড়া পাখি শুধু খড়কুটোর সন্ধানেই আকাশে উড়ুক। নীলিমার স্বপ্ন যেন সে সেখানে না খোঁজে।

তা হলে যে গোটা মহাভারতখানাই অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর এই জন্যই তো গরিব দেশের বাপমায়েরা অল্পবয়সি ছেলেদের বিদেশে পাঠাতে এত ভয় পান।

ওরা বিশেষ করে শুধু নীলিমার স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত হবে, নীড় গড়তে চাইবে না শেষ পর্যন্ত—এমন ভরসাই বা কোথায়?

স্বপ্নের সংস্পর্শে এলে আর শান্তি থাকে না। নীড় গড়তে চাওয়ার বিরুদ্ধেও টেকে না কোনও

গ্যারান্টি।

একই খামের ভিতর বুড়ো দাদামশাইও একখানা রসিকতা ভরা রসকরা পরিবেশন করেছিলেন। তাতে স্পেনের গরম যৌবনের হাওয়া, নরম রূপের জোয়ার প্রভৃতি হরেক রসাল কথা ছিল। আর ছিল সেই মোক্ষম সাবধানের বাণী; মায়া রাক্ষসীদের হাত থেকে হুঁশিয়ার। সে দেশে কালো রঙ বা প্রজার জাতের বিরুদ্ধে ছুঁতমার্গ নেই। অতএব সাধু, আরও সাবধান।

দাদামশাইয়ের চিঠিটা সে কুটি কুটি করে ফালতু কাগজের টুকরিতে ফেলে দিল। খেলো—ঠাট্টা মশকরার চেয়ে বেশি দাম নেই সে চিঠির। কিন্তু বাবা মার চিঠির নীরব কথাগুলি যে অত্যন্ত সরব হয়ে মনের মধ্যে বাজছে।

পাশের ঘরে মৃদু গীটারের মূর্ছনা শুরু হয়েছে। রমেন কান পেতে শুনতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে রাতে পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেজন্য এই গীটারের বাজনা সে আর শুনতে পায় না। আজ এখন ঘুমের সময় নয়। হোটেলের প্রায় সব ঘরই এখন খালি। যে যার কাজে বা বেড়াতে গেছে।

কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘরে যে একটি হৃদয় রোজমারি ফিল্ডে বিহার করতে চায় সে খবর তো গীটার আজ জানে।

গীটার আরও অনেক কথা জানে।

সেদিন বুলফাইট দেখবার জন্য রিবেরাদের মোটরে একসঙ্গে যেতে যেতে মোটরের রেডিয়োতে একটা ইংরেজি গান বাজাচ্ছিল, অত্যন্ত চালু আর জনপ্রিয় গান। এমন কোনও রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, ড্যান্স হল নেই যেখানে এই গানটা বার বার বাজানো হচ্ছে না। এবং এর বাজনার সবচেয়ে বেশি মোহিনী সুর হচ্ছে গীটারের ঝংকার, রমেন কান পেতে শুনছিল, অনেক দিন পরে হঠাৎ একটা খুব বেশি পরিচিত ইংরেজি নাচের বাজনা আর গান। আইল অব কাপ্রি।

ওর সে দিনকার সেই তন্ময়তা অন্তত একজন খুব ভালো করে, খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করেছিল।

কাপ্‌রি দ্বীপেতে পেয়েছিনু তারে
পুরোনো নিরালা তরুছায়া তলে

সেই সুরটিই এখন গীটারে রেওয়াজ করছে পাশের ঘরের অধিবাসিনী।

রমেন কান পেতে শুনতে লাগল। সমস্তটা মন, সমগ্র চৈতন্য আর অন্তরাত্মা দিয়ে।

''আই সেড, লেডি, আই অ্যাম এ রোভার''—ওগো আমি ভ্রমণকারী। রমেন মনে মনে বলল—হ্যাঁ, আমিও ভ্রমণকারী। কিন্তু শুধু কি নিরুদ্দেশে ভ্রমণকারী?

গীটারের ধ্বনিতেই কথাগুলির মধ্যে অস্ফুট প্রেম নিবেদন আছে। তারই গুঞ্জন বার বার ঝংকৃত হয়ে উঠতে লাগল। মূল রেকর্ডের চেয়ে অনেক, অনেক বেশীবার গীটার এখন আবৃত্তি করতে লাগল এই গুঞ্জনটুকু। তার মধ্যে রমেন একটা অপরিষ্কার মানে খুঁজে পেল। ওগো ভিনদেশী ভ্রমণকারী, তুমি স্বীকৃতি দাও, তুমি স্বীকার করো।

কিন্তু আমি কি স্বীকার করিনি?

আমি তো সমস্ত হৃদয় দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি, উষা, যে সারাজীবন আমি তোমার সঙ্গে, তোমার হাত ধরে রোজমারি ফিল্ডে যাব। ইভনিং পাসিয়োতে সন্ধ্যার বিহারে যে প্রেমের সঞ্চার নিয়ে পরিহাস করেছি তাতেও তো আমি রাজি হব বলেছি যদি শুধু তুমিও মুখোমুখি হয়ে বিচরণ করে আমায় প্রেয়সী নির্বাচনের সুযোগ দাও।

আই অ্যাম এ রোভার- —বার বার ঝংকারে ঝংকারে গীটারের মূর্ছনা ওর হৃদয়ের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ মনে হল সেটা শুধু ইংরেজি সুর নয়, শুধু ইটালির নীলসাগরের মধ্যেকার দ্বীপের গান নয়, এ হচ্ছে রমেনের নিজের ভাষায়, নিজের দেশের প্রেমের গান—

'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে এসেছি তোমারি দেশে
ওগো বিদেশিনী।'

অথচ ইংরেজি গানটা যে বিয়োগান্ত। নতুন পাওয়া প্রিয়ার হাতটি তুলে চুম্বন দিতে গিয়ে গায়ক দেখেছিল যে তার আঙুলে রয়েছে একটি সোনার আঙটি। অর্থাৎ প্রিয়া হয় বাগ্‌দত্তা, নয় বিবাহিতা। এবং ইট ওয়াজ গুড বাই অন দি আইল অব কাপ্‌রি।

কিন্তু আমার জীবনে যে উষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, যে আশার বাণী এনে দিয়েছে সে তো কারও বাগ্‌দত্তা নয়। অন্য কাউকে সে আগে ভালোবাসেনি, তার নীরব নিভৃত অন্তরের অকথিত বাণীই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বেলের জীবনে প্রথম প্রেম। কিশোরীর সরল সংযত নিষ্পাপ প্রেম ভগবান কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। প্রেমের পথে তুলে ধরবেন না কোনও ব্যাঘাত; আনবেন না কোনও বাধা বিঘ্ন।

জীবনের একটা সমস্যায় জর্জর নিমেষে সে ভগবানের নাম স্মরণ করল। একজন হিন্দু, অন্যজন রোম্যান ক্যাথলিক। কিন্তু যাঁর চোখে প্রেমের ধর্মে ওরা দুজন এক, তারই শরণ সে নিল।

তোমারে চিনি গো চিনি, ওগো বিদেশিনী। তোমারে হেরেছি হৃদি মাঝারে। এখন তোমায় যে পেতে চাই—ইহ সংসারে, ওগো বিদেশিনী।

কিন্তু ওই যে বালি কাগজের খামের মধ্যকার চিঠি।

নাঃ। তারও উত্তর আছে আমার জীবনে। আমি এমন ভাবে সফল হব যে আমার পিছনের পারিবারিক দুঃখদারিদ্র্য, জীবনের পরিবেশের গ্লানি আর ম্লানিমা আমাদের প্রেমের পথে আনবে না কোনও সংশয়, ফোটাবে না কোনও কাঁটা।

হ্যাঁ, আমি ওইসব সমস্যা কিছুই অস্বীকার করছি না। ওই দুই জগতের তফাত, দুই জীবন ধারার সংঘাত সবই স্বীকার করছি। তবু আমি জয়ী হব, আমি জয়ী হব। শক্তি দাও, সাহস দাও আমার উষা, আমার আশা। স্যুট অব লাইটস ছাড়াই আমি তোমার প্রেমের বীর্যে বীর হব। আমার মনে হবে—

"যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।"

ওই চিঠির জবাব আমি খুঁজে পাব আমার কাজে। আজই তার শুভ আরম্ভ হয়েছে, রেটিরো পার্কের রোজেলাদা স্বাক্ষী রইল। আর রইল গীটারের ঝংকার—যাত্রার পথে মাঙ্গলিক উলুধ্বনির মতো।

দরজা খুলে নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ইউনিভার্সিটিতে লাইব্রেরির যে কোনায় সে রেফারেন্সের বই দিয়ে নিজের নিভৃত কেল্লা বানিয়ে নিয়েছে সেখানে বসে আজ সকালে চিত্রশিল্পীদের আঁকা যে পুরুষ চরিত্র-মহিমা সে লক্ষ করেছে সে সম্বন্ধে তার অনুভবগুলি মনের মধ্যে তাজা থাকতে থাকতে লিখে ফেলবে। বেলকে একবার দেখে যাবার ব্যাকুলতা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই লোভ সে সংবরণ করল। বেল তার সুরসাধনায় মগ্ন থাকুক। তার সাধনা আর আমাব সাধনা দুই একদিন একই সাগরের মোহনায় এসে মিশে যাবে। সে বাজিয়ে চলুক।

মন্ত্রের মতো করে সে স্প্যানিশে গুঞ্জন করল—নোলো তাচের ভেলিস। সে যেন না থামে। সে মনে করতে থাকুক যে আমাকেই সে গীটার বাজিয়ে শোনাচ্ছে। তাতে তার ভালো লাগবে, ঠিক আমার যেমন লাগছে। তোমার বীণায় সুর ছিল আর আমার লেখনীতে ঢেলে দাও প্রেরণা।

তা ছাড়া, তা ছাড়া, এই নির্জন অপরাহ্নে আমি যদি ওর ঘরের দরজায় টোকা দিই আর কেউ দেখে ফেলে? অথবা হোটেলের টেলিফোন গার্লকে ওর সঙ্গে ফোন মিলিয়ে দিতে বলি? সেই খবরটা এই রসিক অথচ রক্ষণশীল সমাজে, এই হোটেলের প্রমোদ ভ্রমণকারী বাসিন্দা মহলে কীরকম লকলক করে রসিয়ে উঠতে পারে তা রমেন ভুলবে কেমন করে?

সংযমে সুন্দর, শোভনতায় সার্থক হয়ে উঠুক আমাদের প্রেম।

রিসেপশনে ঘরের চাবি জমা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। সেখানে আসা মাত্র রিসেপশনিস্ট শুভেচ্ছা জানিয়ে মৃদু হেসে বলল—দুখানা 'কেব্‌ল' আছে সিনর, এই মাত্র এসেছে। আমি নিশ্চিত যে আপনার কোনও জোরালো সুখবর আছে। তাহলে আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছি, সিনর।

এরা কথা একটু বেশিই কয়। বিশেষ করে আনন্দ জানাবার বেলা। অভিনন্দন যে হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে তা বোঝাবার জন্য এরা কার্পণ্য করে না।

রমেন প্রচুর ধন্যবাদ মুচাস গ্রাথিয়াস জানিয়ে 'কেব্‌ল' দুটি নিয়ে কাছের জানলার পাশে চেয়ারে এসে বসল। দুটি টেলিগ্রামই ইংলন্ড থেকে।

প্রথমটি সেই প্রভিন্সিয়াল কাগজের পক্ষ থেকে। শিগগির সেভিলে চলে যাও। সেখানে পরশু থেকে

যে হোলি ইকি এবং উৎসবের মেলা আরম্ভ হচ্ছে তার রঙচঙে বিবরণ চাই। এত সংক্ষিপ্ত নোটিশ দেওয়ার জন্য দুঃখিত কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাদের 'লেট ডাউন' করবে না। এবং সব খরচ পুষিয়ে দেবে। প্রফেসারের সঙ্গে আলাচনা করে নিয়েছি। তিনি রাজি আছেন।

দ্বিতীয় কেব্‌লটি প্রফেসারের। তিনিও লিখেছেন যে শত অসুবিধা হলেও এই অনুরোধটা ফেলতে পারবে না। এতে একটা প্রকৃত সাংবাদিক জীবনের শিক্ষা আর ডিসিপ্লিন হয়ে যাবে। এবং তোমার থিসিসের পক্ষেও খুব ভালো মাল মশলা হবে। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারত না।

হতেও তা পারত না। কিন্তু আর কিছু দিন পরেও তো হতে পারত?

জীবনের পরম সন্ধিক্ষণে চরম বিচ্ছেদ। পরম আনন্দের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো চরম ব্যথা।

মুহূর্তে রমেনের মন কঠিন হয়ে উঠল। এই অনুরোধও সত্যিকারের একটা হুকুম। সেও পত্রিকার মাইনে করা কর্মচারী নয়; শুধু কয়েকটা সাপ্তাহিক ডেসপ্যাচ পাঠানোর চুক্তি হয়েছে। সেভিলের মেলা সম্বন্ধে যা পড়াশোনা করেছে তার উপর নির্ভর করে সে এখান থেকেই ডেসপ্যাচ পাঠাতে পারে। বড় জোর মার্টিনোর সঙ্গে একটু ভাবসাব করে তারই চোখে তার শহরকে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠাতে পারে।

কিন্তু অধ্যাপক, তাঁর অভিমত তো শুধু অনুরোধ বা আদেশ নয়। তাঁকে ফাঁকি দেওয়া মানে শুধু অকৃতজ্ঞতা নয়, নিজেকেও ফাঁকি দেওয়া। সে না দেখেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ কাগজে পাঠাতে পারে। কিন্তু অধ্যাপকের সঙ্গে মিথ্যাচরণ করবে কী করে?

অথচ উষাকে ছেড়ে যাবই বা কী করে? একদিন, মাত্র একদিন আগে হলেও কোনমতে রক্তাক্ত হিয়া আর অনিচ্ছুক দেহ নিয়ে চলে যেতে হয়তো পারত। কিন্তু আজ? এই রোজেলাদার মায়াময় দ্বিপ্রহরে দুজনের অন্তরাত্মা গোলাপের মতো বিকশিত হয়ে ওঠার পরে সমস্তটা বিশ্বসংসার যে বদলিয়ে গিয়েছে।

শূন্য দৃষ্টি আকাশের শূন্যতার দিকে মেলে দিয়ে সে চুপ করে বসে রইল।

—রামন!

হঠাৎ মৃদুস্বরে এই ডাক শুনে সে পাশের দিকে তাকাল। উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে বেল।

মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখানোর সাধারণ ভদ্রতার চিহ্ন হচ্ছে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো। কিন্তু রমেন তো শুধু সম্মান দেখাচ্ছে না। সে খুব মমতা দিয়ে একটি চেয়ার পাশে বসাল এবং বেলকে বসবার জন্য আহ্বান করল।

লাউঞ্জ একেবারে ফাঁকা। শুধু রিসেপশনিস্টের নজর এসে পড়ছে সেখানে। যদি এখানে সেখানে সাজানো চেয়ারগুলিতে আরও কিছু লোক বসে থাকত তাহলে পরিস্থিতিটা সহজ হত। রমেন তখন অনেকের মধ্যে হত একজন। যে কোনও লোকের মতো তার সঙ্গে বসে আলাপ করা যায়। কিন্তু এখন পরিবেশটা যে একেবারে অন্য রঙ নিয়েছে। দুজনে মুখোমুখি, জগতে কেহ কোথা নাহি আর।

আছে। 'অবশ্য' আরও কিছু আছে। উষা এই খানিকক্ষণ আগেই যে বলেছিল যে রোজেলাদায় স্থলে গোলাপ আর জলে লিলি কী যে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। তার স্মৃতি এখানে অতনু হয়ে বিরাজ করছে।

রমেন একটু চঞ্চল, একটু দিশেহারা হয়ে উঠল। এই রক্ষণশীল দেশ, এই কুমারী কন্যা, এই স্বয়ম্ সমর্পিতা স্বপ্নসঙ্গিনী।

সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল—এখানেই কি বসবে উষা? কত লোক আনাগোনা করবে তার ঠিক নেই?

স্মিত মুখে উষা বলল—এখানেই তো ভালো। আমাদের বাসস্থান হোটেলেই তো বসছি। 'টাপার' বারে বা পথের ধারের কাফের কোনও ক্ষণ-সঙ্গিনী তো এখানে নেই। ওঃ, তুমি তো এ দেশকে এখনও ভালো করে চেন নি।

কৃতজ্ঞ চিত্তে রমেন বলল—ঠিক তুমিই ঠিক বলেছ উষা। শোন, যথক্ষণ শুধু তুমি আমার কাছে আছ তোমায় ডাকব উষা, না হয় আশা। কেন, তা তোমায় খুলে বলছি। গভীর গোপন মানে আছে এই দুটি নামে।

বেল বাধা দিল—এখনি বলতে হবে না। এটুকু আমি বুঝে নিয়েছি যে সবাই যে নামে আমায় ডাকে সে নামে তুমি ডাকতে চাও না। আর এই দুটো নামে আমার পুরো নামের প্রথম অংশের সঙ্গে মিল আছে। তার অর্থ যাই হোক, পরে বললেই চলবে। কিন্তু আগে বল, এই কেব্‌ল দুটোতে এমন কি আছে যা তোমায় এত ভাবিয়ে তুলেছে।

বেল আবার বলল—একটু অপেক্ষা করো। ততক্ষণে কফি আর কিছু টাপা অর্ডার দিয়ে আসি। তাহলে

আমাদের কথাবার্তা খুব স্বাভাবিক দেখাবে। কোন্ চাট তোমার ভালো লাগবে বলত? চিংড়ি, না চিকেন?

কফি আর চাট তো শুধু উপলক্ষ্য।

রমেন কেব্‌ল দুটোর কথা বলল। নিজের দেশের পরিবেশে পারিবারিক অবস্থার কথাও খুলে বলল। জানাল যে শুধু বাঁধাধরা অল্প টাকা সম্বল ছাত্রই সে নয়। তার পশ্চাৎপটে আছে অনেক অসহায়তা।

বেল হেসে উড়িয়ে দিল অসহায়তাকে। যেন উষার উদয়ের আলোতে কুয়াশাকে সরিয়ে দিল। মুছে দিল।

সে বলল—পাশ্চাত্য জগতে সব প্রকৃত ছাত্রকেই অল্প মাসোহারার মধ্যে ডিসিপ্লিনে চলতে হয়। নিশ্চয়ই জান যে ছুটিতে ছুটিতে নানারকম কাজ, এমন কি থালা-বাসন মাজা, ঝাট পাট কাপড় কাচার কাজ করে সেই পয়সায় তারা পড়ার খরচ চালায়। তোমাদের দেশে সেই রেওয়াজ বা রাস্তা নেই বলে তুমি মনে মনে মর‍্যাল সাপোর্ট পাচ্ছ না বোধ হয়।

কুণ্ঠিত ভাবে রমেন জিজ্ঞাসা করল—আমায় কি তুমি সেজন্য সংকুচিত দেখেছ কখনও?

বেল খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে রমেনের দিকে পূর্ণভাবে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, রামন প্রথম বার যখ্‌ন তোমার টেবিলে এত লোকের সামনেই তোমার সম্মুখে দাঁড়ালাম তখনই আমার কি মনে হচ্ছিল জানো?

খুব ভরসায় ভরা দৃষ্টি রমেন উষার দিকে মেলে নীরব রইল।

বেল বলল—পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অপেরা স্রষ্টা ভার্ডির একটি গান। রিগোলেট্টো অপেরা পালার নায়িকা বুঝতে পারছে যে ছাত্রের ছদ্মবেশে যে লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে একজন ডিউক। অবশ্য তোমাদের দেশ থেকে যারা ইয়োরোপে বেড়াতে আসে তাদের সবাইকে সাধারণ লোকরা রাজা মহারাজা বলে মনে করে বসে। তারাও তেমনি ভাঁওতা দিয়ে চলাফেরা করে।

প্রায় অস্ফুট স্বরে রামন জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তুমি আমায় কী মনে করেছিলে, উষা?

গভীর ভাবে বেল বলল—সে কথা জানাবার সময় চলে গেছে। প্রয়োজনও আর নেই। তবু এটুকু বলব—তুমি বিদেশী আবহাওয়া, অপরিচিত জায়গা সব সত্ত্বেও আপন মহিমায় অবিচল ছিলে। মানিব্যাগ মার্কা মহারাজা নও, ছন্নছাড়া ছাত্রও নও। মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ একটি মূর্তি। আর প্রতিদিনের সমস্যার উপরে মাথা তুলে দাঁড়ানো এক বীর। তাই...

বেল স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিকক্ষণ। কিন্তু রমেনের মনে হল যেন অনন্ত কালস্রোত ওর সামনে দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে। একটুও থামছে না। একটুও বাকি কথাটুকু শুনবার অবসর দিচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত বেলই সেই নীরবতা ভাঙল। বেশ বুঝতে পারা গেল যে নিজের মনের সঙ্গে কতখানি দ্বন্দ্ব, কতখানি বোঝাপড়ার পরে সে এখন কথা কইল।

—তাই, তোমাকে সেভিলে যেতে হবে।

রমেন নীরবে ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। কোনও কথা কইল না। এমন কি নীরবতাকে সহনীয় করে তুলবার সহজ পথ ধরে সে একটা টাপা পর্যন্ত মুখে তুলে নিল না।

খানিক পরে বেলই আবার নীরবতা ভাঙল, ভাঙল সংকোচ, সন্তর্পণের ব্যবধান। একেবারে পাশে এসে বসে একাত্ম হয়ে গেল—রামন, তুমি জানো যে তোমার চেয়ে আমার কষ্ট কিছুমাত্র কম হবে না। তবু আমি চাই যে তুমি কর্তব্যে বড় হও, জীবনে সফল হও। আমাকে কদিন দেখতে পাবে না। আমিও তোমাকে দেখতে পাব না। তাতে কী হল? মনের মধ্যে মহিমায় আর মাধুরীতে ভরা মূর্তিতে তোমাকে সব সময় অনুভব করব। আর ভাবব যে...

বেলের কণ্ঠ প্রায় রোধ হয়ে গেল। রমেনেরও কিছু বলার সাধ্য রইল না। রইল শুধু দুটি দেহের ঘনীভূত উষ্ণতা।

একটু পরে বেলই আবার শুরু করল—আর রামন, আর ভাবব যে তোমাকে, তোমার ভবিষ্যৎকে আমি আড়াল করে রাখিনি।

রমেনের সমস্তটা অন্তরাত্মা শিহরিয়ে উঠল। কই? দেহের মদির শিহরণ তো আত্মাকে ভরিয়ে তুলতে পারছে না।

উষার এই কথাটি যে এককালে তার সমস্তটা আশাকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। যে ভবিষ্যতের ভিত্তি

সে গড়বার স্বপ্ন দেখছে তা গোড়াতেই চুরমার হয়ে যেতে পারে। তা হলে?...

তার মনের এই ভয়, এই ভাবনা বেল বোধহয় বুঝতে পারল। যাকে ভালোবাসি তাকে কি এমন করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়?

তাই সে নিজেই সামান্য একটু হেসে রমেনের দিকে চাটের প্লেট এগিয়ে দিল। পরে যোগ করে দিল—তুমি যে কত ছেলে মানুষ, তারই আরেকটা প্রমাণ দিলে। আমি একটা বেশ দশাসই সেন্টিমেন্ট মাখানো কথা ছেড়ে দিলাম, আর তুমি অমনি পড়লে মুষড়ে। আরে বাবা, হোলিউইক স্টারের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে; সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ফেরিয়া। সেই মেলা আর ক্যার্নির্ভ্যালে যা সব দেখবে তার গল্প তুমি আমায় জীবন ভোর শোনাতে পারবে। কত বড় গল্পের ঝুলি তোমার লাভ হবে জানো?

রমেন ব্যাকুলভাবে দুটি কথার উপর ভরসা করতে চাইল—জীবন ভোর? তুমি বলছ জীবন ভোর?

নীরব নিবিড় হাসিতে উষার মুখ যেন ভোরের আলোয় ভরে উঠল।

॥ ১৬ ॥

ভোর রাত চারটে।

মধ্য রাতের ঘুমের শেষ।

উষার স্বপ্নের শুরু।

রমেনের জীবনে উষার স্বপ্নের শুরু হতে না হতেই গভীর রাতের ঘুমটি তো নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন আগামী স্বপ্নটির সম্ভাবনাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে অতলে তলিয়ে যাবে নাকি? কিন্তু আগেকার ঘুমের নিস্তরঙ্গ সায়রে সে তো আর ফিরে যেতে পারবে না।

ভোর রাত চারটেয় সেভিল শহরের প্রাচীন পাড়ার প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে রমেন ভাবছিল। স্পেনের শীত রাতে তীব্র অথচ দিনে আমেজ ভরা, শীত শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারের বুক চিরে বসন্তের উষা এখানো উঁকি দিতে শুরু করেনি। কিন্তু মাঠে মাঠে আগুন জ্বালানো হয়েছে আর দক্ষিণ দিগন্ত তারই আভায় আলোর পরশ পাচ্ছে।

সেভিলের উৎসবগুলি আরম্ভ হয়ে গেছে। এমনি করে পুরো সপ্তাহ ধরে রোজ শেষরাত থেকে সার্কাস আর ক্যার্নির্ভ্যাল, হেঁটে বেড়ানো আর হাতের ক্যাস্টানেটের (খঞ্জনীর) ধ্বনি জীবনকে জাগিয়ে তুলবে।

স্প্যানিশ ক্যাস্টানেটকে রমেন খঞ্জনী নাম দিয়েছে। ফ্লামেঙ্কোর উদ্দাম নৃত্য চঞ্চলতায় চরণ যখন মুখর, ঘাগরা যখন উড়ছে ফুরফুর ঘূর্ণির তালে, করও তখন মূক নয়। তালে তালে খটখট ধ্বনি তুলে নাচের ছন্দে ছন্দে হৃদয়ের স্পন্দনকে দ্রুততর করে তোলে। সেই কাঠের খঞ্জনী হচ্ছে ক্যাস্টানেট।

শুধু খঞ্জনী নয়, করতালির ধ্বনি তুলে মেলার লোকরা, পুরুষ আর রমণীরা, দলে দলে একটা অনুচ্চারিত গানের সুর বাজিয়ে চলেছে। মেলার মোহেই ওরা মাতাল।

কিন্তু, রমেনের চোখে এই চমৎকার দৃশ্য কোনও মোহই জাগাতে পারছে না। মনে আনতে পারছে না কোনও বিশেষ মায়ার আবেশ। সে একটা বিরাট রিক্ততা অনুভব করছে। এই মোহন মিছিলের প্রস্তুতি তাকে কোনও উৎসবের পরশ দিতে পারছে না।

সেভিলে এসে টুরিস্টরা প্রিয়জনদের কাছে রঙিন পোস্টকার্ড পাঠায়। এই শহরটাই হচ্ছে একটা স্প্যানিশ পোস্টকার্ড। তাকে জীবনে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। স্পেনের সবকিছুই যে তাতে পুরোমাত্রায় আছে। শেরি আর প্রেয়সীর জন্য সেরিনেড সংগীত। প্রেম জাগানিয়া কমলা কলি আর অঙ্গনে উচ্ছ্বসিত ঝরণাধারা। রূপবান মাতাদোর আর কালো সূক্ষ্ম লেসের শালে সজ্জিতা সিনরিটা। উদ্দাম ফ্ল্যামেঙ্কো নাচ আর খঞ্জনীর সঙ্গে মাতাল করা গীটারের ঝংকার। শহর ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের কারুকার্যে মণ্ডিত। আবার ডন জুয়ানের লীলা খেলার অনুকরণে মুখরিত।

বেঁচে, প্রাণভরে উষ্ণ নিঃশ্বাস আর উত্তপ্ত রক্তধারা নিয়ে বেঁচে থাকতে গেলে আর কী চাই?

রমেনের আর যা চাই তার কথা তুলে লাভ নেই। কর্তব্যের পথ যে দেখিয়ে দিয়েছে তাকে রিক্ত রক্তঝরা হৃদয় নিয়ে স্মরণ করতে করতে সে খুব ভালো করে, খুব পরিশ্রম করে কাজ করবে।

করতেই হবে।

কারণটি রমেন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করল।

সন্ধ্যার ট্রেনে ওঠার একটু পরেই ট্রেনের করিডর দিয়ে ওকে খুঁজতে খুঁজতে যে হাজির হল তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। হোটেলের সহ-বাসিন্দা মার্টিনো।

মনে পড়ল যে মাদ্রিদে প্রথম সকালে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মার্টিনো বলেছিল যে, সে সেভিলের অধিবাসী। কিন্তু এই সময়েই, এই ট্রেনেই যে সে-ও নিজের শহরে চলেছে তা রমেন জানবে কী করে? সেদিনের পর মাত্র দুয়েকবার সকালে শুভেচ্ছা বিনিময় ছাড়া আর কোনও কথাবার্তাও হয়নি। কাজেই সে একটু আশ্চর্য হয়েছিল।

অবশ্য পরে একটু ভাবার পর সে আর তেমন আশ্চর্য বোধ করেনি। বরং লজ্জিত বোধ করেছিল যে সে নিজে যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যুৎপন্নমতি নয়। সারা পৃথিবী থেকে লোক এই উৎসবের সময় সেভিলে আসে। আর সেখানকার নিজস্ব ঘরে সেভিলের লোকটিও যে এই সময় ফিরে আসবে সেটা খুবই স্বাভাবিক।

পুজোর ছুটিতে সব বাঙাল পূর্ববঙ্গবাসী দেশে উৎসব করবার জন্য হুড়মুড় করে শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড় করে। যে না করে তার বাঙালত্ব ফিকে হয়ে এসেছে বলে অন্যেরা ঠাট্টা করে। আর সেভিল এমনি গভীর রঙে রাঙানো স্পেনের হৃদয় যে কোনও সেভিলানার মনের রঙ ফিকে হয়ে যাবার সাধ্যই নেই।

মার্টিনোর মনের রঙ যে ফিকে হয়ে আসেনি তা রমেন সেদিন সকালে খুব পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছিল।

নিজে ফার্স্ট ক্লাস স্লিপিং কোচ থেকে কেন মার্টিনো এই নাইট ট্রেনের থার্ড ক্লাসে ঘুরতে এসেছে এই প্রশ্নের কোনও উত্তরের ধার কাছ দিয়েও সে গেল না। বরং বেশ আরামে রমেনের পাশে জাঁকিয়ে বসল। অর্থাৎ অনেক রাত পর্য্যন্ত সে এখানেই আড্ডা দেবে তা স্পষ্ট। ভাগ্যিস নাইট ট্রেনে থার্ড ক্লাসগুলিও বেশ ভালো গদি আঁটা। আর সেন্ট্রাল হিটিংও ঠিকমতো চালু থাকে। না হলে রমেনের আরও বেশি লজ্জা করত।

আপনি থেকে ওরা তুমিতে নেমে এল। সে রমেনকে বলল—আমি ভাবছি যে আমার খুব ভাগ্য ভালো যে এখানে হঠাৎ তোমায় দেখতে পেলাম। স্পেনের মানুষকে যদি চিনতে চাও থার্ড ক্লাসে এসো। সেখানেই আসল মানুষ ও তার প্রকৃত চরিত্রের খোঁজ পাবে। জানো, এই ট্রেন ভর্তি লোক প্রায় সবাই সেভিল যাচ্ছে। কারণ গোটা ইয়োরোপে এই হোলি উইকের মতো ধার্মিকতা ভরা অথচ দামাল ভাবের চূড়ান্ত পরব আর কোথাও হয় না। রবিবার বিকেলে সুর করে গুড ফ্রাইডেব সূর্যাস্তের শেষ অস্তরেখা পর্যন্ত চলবে মিছিলের পর মিছিল। একেবারে অনন্ত শোভাযাত্রা।

রমেন অবশ্য এই কটা দিন একটু স্বচ্ছল ভাবে থাকতে পারবে। পত্রিকা তো বলে দিয়েছে যে সব খরচই ওরা দেবে। এত বড় ভিড়ের মেলার সময় সেভিলে যে অসম্ভব বেশি খরচ পড়বে তা ওরা নিশ্চয়ই বোঝে আর জানে। কিন্তু টেলিগ্রামে টাকা আসবে মাদ্রিদের হোটেলে। নিজে সেভিলে কোথায় উঠবে তার স্থিরতা নেই বলে সেখানে টাকা আনানো সম্ভব হচ্ছে না, হাতের টাকাই সম্বল।

তবে মাদ্রিদের হোটেলে সেই ঘরটিই আগেকার সস্তা দরেই ঠিক করে রেখে এসেছে। সস্তা দরটা অবশ্য আসল কারণ নয়।

হোটেলের কর্তৃপক্ষেরও আপত্তি হয় নি। কারণ বিদেশী টুরিস্ট যারা সেভিলে যাচ্ছে তারা স্পেনের অনিশ্চয় অবস্থার জন্য মাদ্রিদে বেড়াতে বিশেষ আসবে না।

মার্টিনো খুব অতিথিবৎসলতা দেখাল। বেশ আন্তরিকতা মাখা সুরে বলল—এত লাস্ট মোমেন্টে চলেছ, সেভিলে থাকবার জায়গা কি ঠিক করে রেখেছ কোথাও?

রমেন তা করে উঠতে পারে নি। অচেনা বিদেশী কোনও এজেন্সির মাধ্যমে হোটেলের ব্যবস্থা করতে গেলে যে খরচ করতে হবে তত টাকা ওর সঙ্গে নেই। মার্টিনো বলল, সে জন্য কোনও ভাবনা হয়তো করতে হবে না। আমার চেনা দুয়েকজন হোটেল মালিক আছে। তাদের কারও হোটেলে ব্যবস্থা করে দেব। অবশ্য আমি যদি তোমায় অতিথি হিসাবে।...

রমেন তাড়াতাড়ি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল—না, না মার্টিনো। তোমার বাড়িতে হয়তো অনেক আত্মীয় বা পরিচিত লোক এই সময় আসবে। আমাদের দেশে যেমন আসে। তা ছাড়া তাদের দেখাশোনাও তো করতে হবে। আমায় হোটেল ঠিক করে দিলেই সুখী হব।

মার্টিনো এর পর যা প্রস্তাব করল—তাতে রমেন হাতে স্বর্গ পেল। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই সেভিল

চেনে, উৎসবও নতুন নয়। সে নিজে প্রত্যেকদিন রামনকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে সবকিছু দেখাবে। যাতে কম হাঙ্গামে বেশি দেখতে বুঝতে পারে সে ব্যবস্থা সব করবে। এবং যাতে সব ঠিক মতো ব্যবস্থামত প্রোগ্রাম করা যায় তার জন্য এখনই সে সব নোট করে দিচ্ছে।

সেই প্রোগ্রাম অনুসারেই রমেন ভোর রাতে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্টিনো ওকে বলেছিল যে ভোর রাতের আধো আঁধারে পূজা উৎসবের প্রস্তুতির জন্য শান্ত মনে হাজার হাজার লোক মূক নীরবতার মধ্যে শুধু মৃদু করতালি দেয়, তাতে সেভিলের প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাবে এবং সেটি অনুভব করতে হবে একা। এ-কা-কী।

রমেনও তাই চেয়েছিল। যার কথা শুনে তাকেই ছেড়ে দূরে এসেছে, তাকে এই পুণ্য সপ্তাহের উষায় একা অনুভব করতে সে চেয়েছিল। মার্টিনো বাক্যবাগীশ, আর সেভিলের পরিবেশ আর বিশদ বিবরণ নিয়ে এত কথা বলে যাবে যে নীরবে উষার কথা ভাববার সুবিধা পাবে না। অতএব ওদের মধ্যে ঠিক হয়েছিল যে সন্ধ্যাবেলা ওরা সাড়ে পাঁচশ বছরের পুরানো ক্যাথিড্রালের কাছে মিলিত হবে।

মার্টিনো ওকে বলেছিল—তুমি নিশ্চয়ই জানো, রামন, যে গীর্জা মূরদের পরাজয় করার স্মৃতিস্তম্ভ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আর সব চেয়ে বেশি অলংকরণে চিত্রাঙ্কণে সাজানো। সেভিলের সন্তান ম্যুরিলোর সব চেয়ে ভালো চিত্রগুলি এখানে আছে। ব্লেসেড ভার্জিনের চোখ দুটি ম্যুরিলো এমন করে এঁকেছেন যে তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে সেভিলের প্রাণভরা করুণা তাতে ধরা পড়েছে।

রমেন ভাবল যে মার্টিনোকে একটু সহৃদয় ভাবে খোঁচাতে পারলে হয়তো ওর হৃদয়ের করুণ কাহিনিটুকু বের হয়ে আসবে। সেই দিন মাদ্রিদে মার্টিনোর মনের জ্বালা বেশ একটু ধিকি ধিকি জ্বলতে শুরু করেছিল। আর একটু সময় আর সহানুভূতি হলে সে সেদিনই কিছু জানতে পারত। অপরিচয়ের বাধা বহু হিস্পানির কাছেই খুব বড় প্রতিবন্ধক নয়। ওরা মুখ খোলে সহজে, মনে মজে সহসা।

তার জন্য চাই একটু সময় আর একটু সহানুভূতি।

এই কদিন দুটি জিনিসই রমেনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব।

শহরের প্রতিটি ধর্মস্থানের চূড়া থেকে সুললিত ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। একটা সংযত পবিত্রভাব প্রত্যেক রাস্তা, গলিপথ, পুরোনো বাড়ির অলিন্দকে ছেয়ে রেখেছে। মানবের সন্তান যিশু খ্রিস্টের বেদনা আর মরণ মনে রেখেছে সবাই। প্রত্যেক গীর্জায় ছোট ছোট ছেলেরা সাদা আর নীলপোশাক পরে, সাদা আর নীল পালকের টুপি পরে নিষ্পাপ মুখ, করুণ কণ্ঠ নিয়ে গান গাইছে।

প্রত্যেক গীর্জা থেকেই কুমারী মাতা ও মানবের সন্তানের মূর্তি মঞ্চে তুলে বের করা হবে। মূর্তিগুলি শহর প্রদক্ষিণ করে, শহরের হৃদয়কে স্পর্শ করে, মানুষকে অভিভূত করে আবার গীর্জায় ফিরে আসবে।

মূর্তিগুলি প্রায় জীবন্ত বলে মনে হয়। শুধু জীবন্ত নয় ইহলোকের প্রাণ আর দেবলোকের করুণায় ভরা।

মঞ্চের উপর মূর্তি, নিচে অদৃশ্য রয়েছে বাহকের দল। তাদের কাঁধে পালকির মতো করে মঞ্চে বাহিত হবে। কিন্তু তাদের সমস্তটা শরীর একেবারে পা পর্যন্ত রেশমী ব্রোকেডের ঘেরাটোপে ঢাকা। জলের বদলে জন-নদীর স্রোত। তাতে ভাসমান মহিমায় নৌকার মতো এই "পাসো" অর্থাৎ ফ্লোটগুলি। অগণিত মানুষের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথে বিশ্রাম তরণীর মতো হেলেদুলে ভেসে ভেসে চলবে তারা।

ভার্জিন মেরির মূর্তিগুলি সাধারণত অনাড়ম্বর কিন্তু রাজকীয় মহিমায় মাখা। হয়তো কেশপাশ আর ভ্রূযুগল সত্যকার নারীর কেশ দিয়ে তৈরি। হয়তো স্নেহার্দ্র দুটি নয়ন থেকে কাচের তৈরি অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়েছে। হয়তো শুধু শ খানেক প্রকাণ্ড মোমবাতি ছাড়া আর কোনও অলংকরণ নেই। কিন্তু মহিমময়ী মাতা।

খ্রিস্টের মূর্তিগুলিতে জীবন যন্ত্রণা একেবারে জাগ্রত। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। বর্শার আঘাতে বক্ষের ক্ষতস্থানে রক্তের ধারা। মাথার উপর কাঁটার মুকুট, তার পাশে পাশে রক্তবিন্দু। মানুষের যন্ত্রণাকে যিনি নিজের করে নিয়ে তাকে পরিত্রাণ করবেন সেই মহান মানবের সন্তান।

আর সমস্তটা দৃশ্যকে পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ দেবার জন্য মঞ্চের চারকোনায় রোম্যান সাম্রাজ্যের ঝলমলে পোশাকে ইম্‌পিরিয়্যাল গার্ডস। শিরস্ত্রাণ থেকে চরণের চপ্পল পর্যন্ত বর্মাবৃত রোম্যান সেঞ্চুরিয়ন তাদের বলা হত।

রমেন সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রতিটি দ্রষ্টব্য দেখে দেখে মনে গেঁথে নিচ্ছিল। মার্টিনোও সব কিছু বুঝিয়ে

যাচ্ছিল—সব বিশেষত্ব, সব পটভূমি, সব ইতিহাস।

কিন্তু থেকে থেকে মার্টিনো একটু যেন নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। দৃষ্টি তার কোন্ সুদূরে। মনে কোন্ উদাস আভাস।

এই ভাবের পরিবর্তন রমেনের নজর এড়াল না। সে শুধু বলল—তোমার যদি ক্লান্তি লেগে থাকে তাহলে এখন এই ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়া যাক।

মার্টিনো অন্যমনস্ক ভাবে হাসল। সামান্য একটু অজুহাতও দেখাল—এই যে মাঝে মাঝে কোনও মহিলা একটি মূর্তির সামনে হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান গেয়ে ওঠে এটাতে আমায় দিশেহারা করে দেয়। যীশুর অন্তরের করুণা আর জীবনের করুণতা, ভার্জিন মেরীর বিষাদ ব্যথা বিপ্লবী আমাকেও মথিত করে তোলে।

রমেন মোটেই আশ্চর্য হল না। এই হঠাৎ হঠাৎ গেয়ে ওঠা তার নিজের খুব ভালোই লেগেছিল। এত স্বতঃস্ফূর্ত সেই গানগুলি আর এত মনে নাড়া দিয়ে যায় যে খারাপ লাগবার কথা নয়। তা ছাড়া অনেকগুলি গান বেশ শিক্ষিত অভ্যস্ত এমন কী প্রফেশন্যাল কণ্ঠের গান। নিজেকে উজাড় করে এমন করে গান গাইবার পরিবেশও গায়ক-গায়িকার জীবনে বিশেষ আসে না। সায়েতা নামের এই গানগুলি সত্য সত্যই স্বতঃস্ফূর্ত।

যাই হোক যার সঙ্গে এসেছে তার মতো তার মর্জি মেনে চলাই ভদ্রতা আর বুদ্ধিমানের লক্ষণ। অতএব রমেন বলল—হ্যাঁ, আমাকেও এই দৃশ্য আর এই গানের প্রথম সংঘাত একটু যেন কেমন করে দিচ্ছে। আরও কত কিছু দেখবার আছে। এই তো মোটে প্রথম দিন। চল, এবার বেবিয়ে পড়া যাক।

ওরা ভিড় কাটিয়ে ক্যাথিড্রালের পাশ দিয়ে হেঁটে ম্যুরিলো বাগানে গিয়ে একটা নিবালা কোনায় বসল। এই আলো ভরা সন্ধ্যায় ছায়া ঘেরা বাগানে বিশেষ কেউ আসবে না।

রমেনও এই সুযোগটুকুরই অপেক্ষায় ছিল।

একটুখানি নীরবতা, একটুখানি নিরালা, একটুখানি মন নিয়ে নাড়াচাড়া। তারপব রমেনই কথাটা পাড়ল—আচ্ছা মার্টিনো, তুমি আমায় এতখানি বন্ধু বলে গ্রহণ কবেছ বলেই কথাটা তুলছি। যদি ব্যথা পাও বা ধৃষ্টতা মনে করো তাহলে বয়সে ছোট বলে ক্ষমা করো।

বিষণ্ণ হাসিটুকু মাত্র সেই কথাগুলির উত্তর হিসাবে ম্যুরিলো বাগানের আকাশে ভেসে গেল।

কিন্তু কেমন করে মার্টিনো সহানুভূতিতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবে?

একটু পরে সে নিজেই বলল—জানো, বামন, আশ্চর্য আমাদেব এই ধর্মের প্রবণতা। এটা আমাদের জীবনে একটা রূপকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের সঙ্গে আমরা জীবনকে জড়িয়ে নিয়েছি। তবু ঠিক ধার্মিক আমরা নই বর্তমান যুগে। একটা অধ্যাত্ম ক্ষয়িষ্ণুতাব মধ্যে আমবা পড়ে গেছি। একটা নদীর জল উৎস থেকে অনেক দূরে সরে আসতে আসতে যেন ঘোলাটে হয়ে চারধারে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক তেমনি করে ধর্মপ্রবণতা আমাদের জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলেছে। অথচ....

সে চুপ করে গেল দেখে রমেনই খেই ধরিয়ে দিল—অথচ..

ম্লানভাবে মার্টিনো বলল—অথচ সেই ধর্মপ্রবণতাকে মানুষের মন নয়, গীর্জার বিধান নিয়ন্ত্রণ করছে। দেখলে না, বাচ্চা গাইয়ে ছেলেগুলি এর মধ্যেই গীর্জাব আওতায় এসে গেছে।

কুণ্ঠায় জড়িত স্বরে রমেন ব্যাপারটা আরও ভালো করে বুঝতে চাইল। এবং মার্টিনোর মতো বার্সিলোনায় শিক্ষিত বিপ্লবমুখী যুবককে কী ভাবে সেই বিধান বাঁধতে পারে তাও জানতে চাইল। অবশ্য মার্টিনো যদি মনে ব্যথা না পায়।

না। মার্টিনো মনে ব্যথা পাবে না। বরং একজন সমব্যথীর কাছে মন খুলতে পারলে সুখী হবে।

সমব্যথী? মার্টিনো কেন এ-কথাটা ব্যবহাব করল? কিসের ইঙ্গিত এতে লুকানো আছে? কিন্তু রমেন বাইরে সেই ভাব আর সেই কথাটুকু উপেক্ষা করে গেল।

মার্টিনো বলল—জান, আজ আমি কেন সেভিলে এসেছি? কেন ক্যাথিড্রালে ম্যুরিলোর আঁকা ব্লেসেড ভার্জিন ছবির নিচে এত ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—এখন শুধু তোমার বলবার পালা, কারো মিয়ো মার্টিনো। আমি শুধু শুনে যাব। কোনও বাধা দেব না। কোনও মন্তব্য নয়।

—ঠিক, তবো শোন, কারো মিয়ো। আমাদের আইনে ছেলেরা চোদ্দ আর মেয়েরা বারো বছরের হলেই বিয়ে করতে পারে। অর্থাৎ স্পেনের উষ্ণতা আর কমলা রঙের উত্তাপ আমাদের বেশ তাড়াতাড়ি পাকিয়ে

দেয়। কিন্তু মেয়েরা একুশ না হওয়া পর্যন্ত বাপ-মায়ের অনুমতি চাই। না পেলে অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে আমাদের মধ্যে যে উন্মাদনা আছে, আছে যে অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকার গুণ, তাকে শুধু মিস্টিসিজম দিয়ে মুড়ে রাখবে কী করে? আমাদের মধ্যে প্যাশনের প্রাবল্য বড় বেশি। তার সঙ্গে সংযমের সংঘাতে কীরকম যে ট্রাজেডি হতে পারে তা, বিদেশী নতুন আগন্তুক তুমি, তোমায় বোঝাব কী করে?

প্রেমের প্রেরণা আর অতীন্দ্রিয়তার অত্যাচার এই দুয়ের ফলে এমন একটা ট্রাডিশন গড়ে উঠেছে যার ফলে অনেকদিন, দীর্ঘ বর্ষ ধরে শুধু অপেক্ষা আর প্রেম নিবেদন করে যেতে হয়। কুমারীর সতীত্বকে ঘিরে থাকে চরম সংযম। একেবারে অক্টোপাশের মতো। আর তার নাগপাশে জড়ানো বিয়ের আগে যৌবন।

ফলে মেয়েরাও বেশ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। ওরাই নির্বাচন করে, নির্বাচিত হয় না। পুরুষ করবে আত্মসমর্পণ, নারী করবে গ্রহণ।

এর পর মার্টিনো বেশ কিছুক্ষণ নীরব রইল।

রমেনই নীরবতা ভাঙল। মৃদুস্বরে বলল—তাতে ক্ষতি কী? সমর্পণ আর গ্রহণ দুই-ই তো এক হয়ে যায় হৃদয় বিনিময়ে। গীর্জায় তো দুজনকেই বলতে হয়—আমি সম্মত। আই উইল। সংসারে এর চেয়ে মধুর বড় কথা আর কি আছে?

মার্টিনো একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল—সে কথা তো আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু এই হিস্পানি নিয়মের ফলে তৃষ্ণার আবেগে ভরা প্রেমিকের চেয়ে শান্ত লাজুক নীরব যুবকদেরই সাফল্যের আশা বেশি। ভেবে দেখ, ধমনী ভরা লাল রক্ত আর নিয়মে গড়া নীল নির্লিপ্ততার মধ্যে কী বিরাট অমিল, অসামঞ্জস্য।

বলে সে এমন ভাবে রমেনের দিকে তাকাল যে রমেন বেশ বিব্রত বোধ করল। কে জানে মার্টিনো তার আর ইসাবেলের সম্বন্ধে কিছু আঁচ করেছে কিনা। এবং সেই জন্যই তার দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাচ্ছে কি না।

কথাটা যদি রমেনের দিকেই তাক করে বলা হয়ে থাকে সে দিক থেকে আলোচনাটা সরাবার জন্য সে বলল—তুমি বলছ ধমনীর লাল রক্ত অথচ আমরা তো জানি যে সাংগ্রে আথুল অর্থাৎ নীল রক্ত, বংশমর্যাদার নীল রক্ত কথাটা তোমাদের দেশেই তৈরি হয়েছিল।

আরও উত্তেজিত হয়ে মার্টিনো এই কথাটা উপেক্ষা করে গেল—তুমিই বল রমেন, বার্সিলোনার নব্য বিদ্রোহী শিক্ষা আর সেভিলিয়ার উত্তপ্ত রক্তঝরা নিয়ে আমি কী করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারি?

এবার রমেনের পালা তার দিকে তাকাবার।

মার্টিনো আবার শুরু করল—আমার কেরিদার (প্রেয়সী) নামটা না হয় না-ই করলাম। তার বংশের নীলরক্ত আমার রাগরক্ত যৌবনকে গ্রাহ্যই করল না। নিজেদের প্রাসাদে সে প্রায় ওরিয়েন্টাল পর্দার মতো অন্তরালে থাকত। আর সেই প্রেয়সীই যখন রাজপথে বের হত একটা ভাবগম্ভীর রাজহংসীর মতো ভঙ্গিমা তার সমস্তটা তনু দেহকে তোমাদের শাড়ির মতো মুড়ে রাখত। আমার কী দোষ বল?

ম্যুরিলো বাগিচায় সেই অমর চিত্রশিল্পীর আত্মা কি কখনও কখনও, বিশেষ করে এমন পূর্ণ সন্ধ্যায়, তার নিজের সৃষ্ট শিল্পকীর্তিগুলি দেখে যেতে আসে? যদি আসে মার্টিনোর মুখে এখন যে করুণ অথচ কমনীয়, রক্তিম, অথচ রক্তাক্ত ভাব ফুটে উঠেছে তা তাঁর তুলির অমর্যাদা নিশ্চয়ই করবে না। অবিবাহিতা মাতা মেরির মুখে বিস্ময় আর বিভ্রান্তি, ব্যাকুলতা আর দিব্যভাব যিনি এমন করে এঁকেছেন তিনি একটি মানবের মুখকে উপেক্ষা করবেন না।

রাজপথে কী হয়েছিল তা মার্টিনো খুলে বলে নি। হয়তো এমন কিছুই হয় নি। কিন্তু বিশের দশকের স্পেনে একটি কুমারী মেয়ের হাতটুকু প্রকাশ্যে ছুঁলেই তো গেল গেল রব উঠত। আন্দালুসিয়ার উত্তপ্ত রক্ত আর বার্সিলোনার বিদ্রোহী বন্ধন মুক্তি এই দুইয়ে মিলে প্রকাশ্যে কী করেছিল, কী ঘটিয়েছিল তার বিবরণ অপ্রকাশিত রইল।

রমেনও প্রাণ ধরে জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

গীর্জা আর সমাজ একেবারে গর্জিয়ে উঠল।

অভিমানিনী আমার সরমে মরে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করল। কনভেন্টে দীক্ষিত হল। আশ্চর্য! ওর বাবা মা পর্যন্ত অমত করলেন না। আমার মতো শিক্ষিত রুচিবান প্রাণবন্ত যুবকের চেয়ে প্রার্থনায় ভরা আত্মনিপীড়নে মোড়া জীবন যৌবন থেকে বঞ্চিত মঠ নামক কারাগার বেশি গ্রহণযোগ্য হল। ওর বাবা মা

হল রাজি, সমাজ হল খুশি আর গীর্জা করল আশীর্বাদ। কেবল...

—কেবল কী, বন্ধু?

—কেবল দুটি বুভুক্ষু হৃদয় আর নিরুদ্ধ যৌবন ওই মঠের লতাপাতার কারুকার্য করা লোহার গরাদের দুধারে খাঁচার পাখির মতো মাথা ঠুকে মরবে।

—কেন? একবার মঠে দীক্ষিত হলে আর নাম কাটানো সম্ভব হয় না নাকি?

—হয়। কিন্তু এদেশে বাচ্চা বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের সন্ন্যাসী করে দেওয়ার যে রেওয়াজ আছে তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে অনেক মনের জোর দরকার। প্রত্যেক বনেদি বংশ গীর্জার অন্ধ ভক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্র এ পর্যন্ত চোখ বুজে গীর্জাকে মদত দিয়েছে। আবার প্রতিদানে গীর্জা সব কায়েমি স্বার্থ আর জমিদারিকে শক্তি জুগিয়ে থাকে। কাজেই বোঝ।

রমেন এর পর কী বলবে?

কিছু বলাও নিরাপদ নয়। সামান্য রাজনীতির গন্ধ থাকলেও এদেশে বিদেশীকে নিয়ে টানাটানি হয়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

তবু সে বলল—তবে, তুমি সেই গীর্জাতেই এই হোলি উইকের উৎসবে এলে কেন? বিশেষ করে ক্যাথিড্রালের ভিতরে? তুমি কী প্রার্থনা করেছিলে?

আহত স্বরে মার্টিনো উত্তর দিল—বার্সিলোনার ছাত্র অন্তত গীর্জায় প্রার্থনা করে না।

—তবে তুমি কী আশা নিয়ে সেখানে যাও?

—আশা আমি এখনও ছাড়িনি। কে জানে, কেরিদা যদি কখনও মত বদলায়। যদি সংসারে ফিরে আসতে চায়।

রমেন আশ্চর্য হয়ে গেল—তাও কি সম্ভব।

গভীর ভাবে মার্টিনো বলল—সম্ভব। যদি বুকে সাহস থাকে। যদি প্রেমে টান থাকে। সে তো আমাকে সত্যিই ভালোবাসত। এবং আমি জানি যে এখনও বাসে।

একটু থেমে সে আরও বলল—সন্ন্যাসীরা যখন মঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে তারা আধ্যাত্মিকতার ঠিক উলটো পথে যায়। ক্যালদেরনের নাটকে কি পড়েছ যে এক সন্ন্যাসিনী মঠ ছেড়ে ডাকাত দলের সর্দার হয়েছিল? এই তো কয়েক বছর আগে ডনা মারিয়া ডি গাঞ্চিয়া কনভেন্ট ছেড়ে এসে একেবারে বুল ফাইটার হয়ে গেল। টরেরো হিসাবে রূপ সাহস আর নৈপুণ্যের জন্য নাম করে কয়েক বছর পরে আবার সন্ন্যাসে ফিরে গেল।

অবিশ্বাসে রমেন জিজ্ঞাসা করল—সত্যি?

গম্ভীরভাবে মার্টিনো জবাব দিল—অবশ্য সত্যি। ছাপা বইয়ে তার জীবনী লেখা হয়েছে। এমন কি তার সন্ন্যাস-ভগ্নীরাও রিফ্লেক্টেড গ্লোরিতে পুলকিত, মুগ্ধ, গর্বিত হয়েছিল। তিরস্কার করা তো দূরের কথা, নিজেরাই পুরস্কৃত বোধ করেছিল।

রমেন বলল—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরটা বাকি রয়ে গেল। তুমি কেন ক্যাথিড্রালে গেলে?

রুদ্ধ হৃদয়ে মার্টিনো বলল—প্রতি বছর এই পুণ্যতিথিতে আমি ওখানে যাই। ওর মঠের সব সন্ন্যাসীরাও দল বেঁধে যায়। পবিত্র পূজার ঝারি হাতে সংযত পদক্ষেপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে সব সন্ন্যাসিনীর মধ্যে ও একেশ্বেরী হয়ে বিচরণ করে। সে তো পদচারণ নয়, জীবনের আঙ্গিনায় নৃত্য। অথবা রোম্যান কোনও দেবীর গতি ভঙ্গিমা।..

....আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে চোখে চোখ রেখে নীরবে নিবিড় নিঃসংশয় পূর্ণপ্রেম বিনিময় হয়। স্প্যানিশ সাহিত্যে এই দৃষ্টি নিবিড় মর্যাদাময় দৃষ্টি বিনিময়কে মিরাদা বলে। —যে দৃষ্টি অস্বস্তি সৃষ্টি করে না, কিন্তু প্রেমসুধা বৃষ্টি করে, সেই মিরাদা ওকে নিবেদন করি। ম্যুরিলোর ব্লেসেড ভার্জিনের জাগ্রত করুণা-দৃষ্টি হয়তো একদিন ওর আর আমার মিরাদাকে আবার মিলিয়ে দেবে।

॥ ১৭ ॥

গোপন প্রেম।

তার মাধুরীই সব চেয়ে বেশি।

তার সৌরভই সকল সুখের সার।

তার বর্ণালীই অদেখা বলে সব দেখিয়ে দেয়।

সব শোভা, পরাগের মতো প্রাণের পরতে পরতে লুকানো, সাজানো রাশি রাশি রেণু। অস্তিত্বের অণুতে অণুতে, তনুর প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ছড়ানো সেই শোভাময় প্রেমরাগ।

মাদ্রিদের রেল স্টেশনে ট্রেন ঢুকবার সময় রমেন জানালা দিয়ে মুখ বের করে রেখেছিল। কিন্তু সেটা নিছক ছেলেবেলাকার অভ্যাসই নয়। নিছক কৌতূহলই নয়। এদেশের লোকরা স্টেশনে প্রিয় বা প্রার্থিত আত্মীয় অতিথির প্রত্যাশায় কী রকম মুখ করে থাকে, উৎসুক হয়, উচ্ছ্বসিত হয় তা বিচার করে দেখতে হবে।

তার বেশি সে কিছু প্রত্যাশা করে নি।

কী প্রার্থনা করেছিল সে প্রশ্ন এখানে ওঠেই না।

প্রাণের প্রার্থনা আর সমাজের সংযম এখানে এক ফল এনে দেবে না। কিছুই মিলবে না।

কিন্তু প্রেম যে প্রশ্নের প্রতীক্ষায় বসে থাকে না। যখন তখন অপ্রত্যাশিতভাবে হৃদয়কে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করে।

একটি মুক্তর মতো ধবধবে দস্তানা ওর দিকে নেড়ে নেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। রমেন আশ্চর্য হয়ে সেই দস্তানার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দস্তানার অধিকারিণীর দিকে।

অমনি মনে হল যেন রাশি রাশি কালা বা নীল শৈবালদলের মাঝখানে একটি শ্বেত কমল জেগে উঠেছে। সকালের ট্রেনের যাত্রীদের সাথে মিলিত হতে যারা এসেছে তারা প্রায় সবাই পুরুষ। কালো বা নীল রঙের স্যুট পরনে। সেই ভিড়ের মেঘপুঞ্জের মাঝখানে উদয় হয়েছে হাস্যমুখী উষা।

এবং একা। নিজস্ব একেশ্বরী মহিমায়।

বিশের শতকে ত্রিশের দশকের মাদ্রিদে একটা বিস্ময় ব্যাপার। বলতে গেলে অভাবনীয়। তাই তো প্রাণ চাইলেও সে প্রার্থনা করতে পারেনি।

হালকা ফাইবারের স্যুটকেস হাতে রমেন প্রায় লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

বিলেতের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ছাড়ার আগে বা পৌঁছোনোর পরে প্রিয়জনের সঙ্গে বিরহ বা মিলনের যে ক্ষণিকের প্রকাশ দেখা যায় তার অনুকরণ এখানে চলবে কি? দেবে কি অন্তত একটি হালকা চুম্বন? মুখ একেবারে উন্মুখ হয়ে উঠল।

তবু উচ্ছ্বসিত রমেন নিজেকে সামলিয়ে নিল।

ভাবল—ছিঃ, তুমি না ভারতীয় সমাজের?

ভাবল—ছিঃ, তোমার প্রিয়া না অবিবাহিতা এবং হিস্পানি বংশের?

ভাবল—উষা কি এই আত্মসংবরণে নিরাশ হল? না, সন্তুষ্ট হল? তার দেহেও কি বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়েছিল?

এদিকে বেল-এর এ সম্বন্ধে কিছু ভাববার সময় ছিল না। এমন কি মামুলি কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত নয়।

সে সোজা তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে স্টেশনের চত্বরের মধ্যে থেকেই একটি ট্যাক্সি নিল। তার আগে স্টেশনের যাত্রীদের মাল রাখবাব ক্লোকরুমে রমেনের স্যুটকেস জমা দিল। তারপর ট্যাক্সিকে সোজা হুকুম দিল—চলো ২১ নং কালিয়ে দেল প্রাদো—দি অ্যাটিনেয়ো—অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরি।

মাদ্রিদের ন্যাশনাল লাইব্রেরির পরেই এর স্থান। কিন্তু সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে দি অ্যাটেনিয়ো সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি। সকাল থেকে রাত দুটো পর্যন্ত খোলা থাকে। আর ইন্‌টেক্‌চুয়ালদের সবচেয়ে প্রিয় কেন্দ্র। এত আড্ডা আর তর্ক বয়ে যায় এর ক্লাব রুমে যে এই ঘরটির নাম হচ্ছে লোহারদের কামারশালা।

লাইব্রেরির বিরাট ভোজনশালা রিফেক্টরির একটা নিরালা খুপড়িতে কফি আর কিছু 'টাপা' নিয়ে দুজন সামনাসামনি বসল।

এতক্ষণে রমেনের নজরে পড়ল যে বেলের কমলা রঙের শর্টকোটের উপর একটা ছোট্ট আমেরিকান

ফ্ল্যাগ বুকের কাছে আঁটা। কমলা রঙের কোর্ট। লা বুয়েনার এই রঙের বধূসজ্জার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এই মিলনটা কি শুধুই আকস্মিক হবে?

বিস্ময়ে রমেন ব্যাপারটা জানতে চাইল।

খানিকটা অনুমান করেছিল। কিন্তু ট্রেন থেকে নামার পর একটার পর একটা বিস্ময়ে সে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল। তাই সে নিজের অনুমানের উপর নির্ভর না করে ব্যাপারটা জানতে চাইল।

খুব বাহাদুরির হাসি হেসে সে বলল—জানো, সুবিধামত স্পেনে অ-হিস্পানি কাণ্ডকারখানা করতে চাইলে বিদেশীর ভোল নিতে হয়। চেহারাতে হিস্পানি আর সাউথ আমেরিকানে এমন আর কী তফাত? অথচ আমি একা রেলস্টেশনে ছুটে এলাম। লোকে তাকাবে আর মানে খুঁজবার চেষ্টা করবে। তাই কৌতূহলীদের নোটিশ দিয়ে রাখলাম যে আমি নর্টে আমেরিকানো। একলা স্বাধীন গতিবিধি আমার জন্য স্বাভাবিক ব্যবস্থা। হ্যান্ডস্ অফ, ঈ-মাদ্রিলেনোস্।

হেসে উঠল রমেনও।

তারপর বলল—কিন্তু নর্টে আমেরিকানো সাজবার—আগের পর্বটা কী করে ব্যবস্থা করলে? হোটেল থেকে একা বেরিয়ে এলে যে বড়? পেপে আর তোমার মা...

আরো খুশিতে উপচিয়ে উঠে বেল ওর কফিতে একগাদা চিনির কিউব ঢেলে দিল।

বলল—আগে পান করো তোমাদের ইন্ডিয়ান শরবৎ। সাউথ আমেরিকান কফিতে তোমার মাথা খুলছে না দেখছি।

মাথা গম্ভীরভাবে নেড়ে অসহায়ের ভান করে রমেন দুঃখ প্রকাশ করল। —সেদিন 'রোজালেদা'-তে একটি সাউথ আমেরিকান বালিকা আমায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে রামধনুতে চড়িয়ে কোথায় যে নিয়ে গেল তারপর থেকে আর আমার মাথাটাও আমার নেই। মনটাও আমার নেই। কাজেই আমার কাছে তোমার প্রত্যাশা করবার কিছুই বাকি নেই।

—প্রত্যাশা করবার আছে বলেই তো ছুটে এসেছি। বাবা মা জানে যে আমি প্রায়ই অ্যাথোনিয়োতে পড়তে আসি। ওঁরা অথবা ডন পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। আর প্রাদোর এত কাছে; কাজেই দরকাব মতো হোটেলের ট্যাক্সি এসে নিয়ে যায়। আজ সকালে ডন সঙ্গে এসেছিল।

একটু মুচকি হেসে বেল যোগ করে দিল ডন প্রাদোর নগ্ন চিত্রগুলি নিয়ে মেতেছে। সে জানে আরও কিছু রসের সন্ধানও পেয়ে থাকবে। অবশ্য বেলা দুটোর সময় এখানে আমায়—নিরীহ আমায়—সঙ্গে নিয়ে যেতে আসবে। জানো, এইটুকু গোপনতা কত মধুতে ভরে দিয়েছে তোমার সঙ্গে আমার মিলনকে।

একটু থেমে বলল—আর তুমি হোটেলে চলে যাবে বেলা দেড়টার সময়।

আরও একটু থেমে বলল—জানো, কবিরা বলেন প্রেমের পথ মসৃণ নয়। আমি বলি, যদি সত্যি প্রেম তাকে তাহলে কাঁটায় ভরা পথেও ফুলের পাপড়ি ঝরে ঝরে তাকে আবাহন করে। এই দেখ না, তুমি সেভিল থেকে এলে যে স্টেশনে সে স্টেশনটার আর হোটেলের ঠিক মাঝপথে পড়ছে প্রাদো আর অ্যাটোনিয়ো।

রমেন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রথম প্রণয়ভীরু কিশোরী প্রেমের গোপনতায় অবগাহন করে গভীরে জেগে উঠেছে।

বেলকে আজ যেন কথায় পেয়েছে। বাণীতে বাণীতে ধ্বনিত হয়ে উঠছে ওর ভাষা। ও যা বলতে চাইছে তা তো শুধু কথা নয়। বাণী। বিরহবেদনার ওপার থেকে ভেসে আসা বাণী।

বেল বলল—বাবা মাকে বলে এসেছি আজকাল আমি স্প্যানিশ মহিলা কবি রোজালিয়ার কবিতা এখানে বসে স্টাডি করছি। জানো, রোজালিয়ার মতো ব্যর্থ বিরহবেদনার কাব্য পৃথিবীতে বোধ হয় কোনও মেয়ে কখনও লেখেনি।

ব্যর্থ—বিরহ—বেদনা।

রমেন এই গোলাপবালার কাব্য আলাচনা শুনতে চাইছিল না। একশ বছর আগেকার সমাজের নিঃসঙ্গ বঞ্চিতা কবি রোজালিয়া।

কিন্তু বেল ততক্ষণে আবৃত্তি শুরু করেছে :

"তোমার সুরভি মোরে দাও,
সব সেরা রূপসী গোলাপ

পিপাসার অনলে নেভাও
নির্ঝরের সজল প্রলাপ;
দহিছে দহিছে মোরে হায়!
ঢাকা সূক্ষ্ম মেঘ আবরণে,
চিকন লেসের ওড়নায়
প্রজ্বলন্ত রবির কিরণে।''

মাত্র দিন পনেরোর ব্যবধান। তারই মধ্যে এত তীব্র বিরহ দহন জ্বালা।

বাঙালি, ভারতীয়, ব্যর্থতা আর হাহাকারের বালুরাশির মধ্যে অস্ট্রিচ পাখির মতো মুখ লুকিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমের প্রাসাদে রমেন এখন আর ঠিক সেই মানুষের সারিতে বসে নেই।

সে পারলে দুহাত দিয়ে ঠেলে গ্রাম বাংলার পুকুরের ঠাস বোনার মতো পানার ভিড় সবলে সরিয়ে দেবে। পানার নিচের স্বচ্ছ পানীয় জল সে ছেঁকে তুলতে চায়।

তাছাড়া তার জীবনে যে উষার উদয় হয়েছে। আশার আশ্বাস পেয়েছে।

সেই ইসাবেলকে সে এক আশালতা, আঁধারে আবৃতা কবির কবিতা আবৃত্তি করতে দিতে চায় না। সে তো ভালো করেই জানে যে রমেনের আকাশে উষার আবাহন সঙ্গীত বেজে উঠেছে।

সে একটু শক্ত ভাবেই বাধা দিল।

বলল—প্রিয়া উষা আমার। এবার আমার প্রিয় এক কবির কথা তোমায় শোনাতে দাও। সে কবি যে তোমারও প্রিয় তা তো তুমি আগেই বলেছ।

বেল যেন চৈতন্য ফিরে পেল।

সে জিজ্ঞাসা করল—টাগোরে?

—হ্যাঁ, উষা, টাগোরে। তার একটি গান তোমায় গুনগুনিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি আগে।

বলেই সে খুব মৃদু স্বরে খুব আবেগ দিয়ে গুনগুন করে উঠল—

''প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি একি দুস্তর লজ্জায়।''
সুন্দর এসে ফিরে যায়।

তারপর সে তার অনুবাদ করল। তারপর বলল—উষা, আমার কবি এখন আমাদের দুজনেরই কবি।

প্রসন্ন বিস্ময়ে চোখের ভুরু আকাশে তুলে বেল তার মানে জানাতে চাইল।

রমেন বলল—এই মুহূর্তে, আজ সকাল থেকে তুমি যা করেছ তারই ছবি আছে এই গানে। তবে তুমি সেই দুস্তর লজ্জা পার হয়ে চোখ খোলা রেখে প্রাণ যা চায় তা-ই করতে সফল হয়েছ। তুমি তো সার্থক প্রেমিকা। হীনপ্রাণা হরিণী তো তুমি নও। তোমার এত কাছে আমি যে এসে পৌঁছেছি সে তো তোমারই সাফল্য। আমি কি আজ তোমার এত কাছে এসে ফিরে যাব?

টেবিলের ওপার থেকে, যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে বেল তার হাতটি বাড়িয়ে দিল। বলল—এই আমি তোমার হাতের মধ্যে আমার হাতটি তুলে দিলাম। তুমি একে কোনও দিন ছেড়ে দিয়ো না যেন। রামন।

রমেন বলল—কখনও না। সারাজীবন এবং জীবনের পর জীবনান্তরেও না। আমাদের দেশে, আমাদের ধর্মে একে বলে পাণিগ্রহণ। সম্পূর্ণ শুদ্ধ শাস্ত্রমতে বিবাহ। তুমি আমারই উষা হয়ে গেছ, ইসাবেল।

বেল হাসল। প্রসন্ন পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণ হাসি।

বলল—জানো রামন, আমি অ্যাটেনিয়োর লাইব্রেরিতে বসে বসে এই কটা দিন তোমাদের দেশ সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে বই পড়েছি। অনেক কিছু অবশ্য বুঝতে পারিনি। তোমায় যা দেখছি তার সঙ্গে অনেক অমিল পাচ্ছি। কিন্তু তুমিই আমার কাছে সত্য...

আবেগের চঞ্চলতা সামলিয়ে নিয়ে সে বলল—সমাজ, সংসার, কল্পনা, দূর থেকে দেখে বা পড়ে শেখা জ্ঞান সব কিছু ছাপিয়ে তোমায় যা দেখেছি সেই তাকেই তো ভালোবেসেছি, রামন। তোমার সব কিছুকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছ তুমি।

রমেন রুদ্ধকণ্ঠে বলল—আমার পটভূমি, আমার পরিবেশ সম্বন্ধে বই পড়ে যেটুকু জেনেছ তার চেয়ে

অনেক বেশি? অনেক গভীর ভাবে তোমার পটভূমি, তোমার পরিবেশ সম্বন্ধে আমি জেনেছি। কাজেই তোমার প্রেম অনেক বেশি শক্ত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসা প্রেম। উষা, আমি তার মর্যাদা আজীবন রাখব।

লাইব্রেরির রিফেক্টরি—। কাফেটোরিয়ার মতো। নিজেরা খাবার এনে টেবিলে বসেছে। কিন্তু একটি ওয়েট্রেস খালি প্লেট, কাপ প্রভৃতি সরিয়ে নিয়ে যেতে এল।

ওরা তাড়াতাড়ি কথার বিষয়বস্তু পালটিয়ে ফেলল। যদিও প্রায় সব কথাবার্তাই ইংরেজিতে হচ্ছিল—কে জানে এই ওয়েট্রেস ওদের নিরালায় বসে তন্ময়তা লক্ষ করে কিছু বুঝবার চেষ্টা করতে পারে।

বেল সেই মেয়েলোকটিকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে প্রশ্ন করল—রমেন, তুমি সেভিলে গিয়ে কী কী দেখলে তা তো আমায় সবটা বললে না। জিপসি আস্তানায় গিয়েছিলে? তাদের কাছে হাত গুনিয়েছিলে? তাদের গান আর নাচ তোমার কেমন লাগল? থারভান্টেস লা গিটানিল্লা বইতে মুক্ত স্বাধীন জীবনের প্রেমকে জিপসিদের সঙ্গে জড়িয়ো না।

রমেন সবই বুঝল। জিপসিরা নিজের জীবনে মরচে ধরতে দেয় না।

সপ্রতিভ ভাবে বলল—বাব্বা রে বাবা। একেবারে এক নিঃশ্বাসে এতগুলি প্রশ্ন?

হেসে বেল জানাল যে একটা একটা করে প্রশ্নের উত্তর দিলেই চলবে। তবে সবগুলিরই উত্তর চাই।

রমেন এই সুযোগ ছাড়ল না। মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়, সেই সবচয়ে বড় ভরসার কথাটা? উষা যে আশা ওর মনে জাগিয়ে সেভিলে যেতে ওকে রাজি করিয়েছিল?

জীবনভোর গল্প শোনাবার মতো মালমশলা।

শুধু তাই নয়। তার সঙ্গে জড়িত আছে এক সঙ্গে এক জীবন জড়িয়ে থাকা। এক প্রাণে, এক হৃদয় হয়ে।

উষা তো জেনেই নিচ্ছে যে রমেনের দেশ, সমাজ, সংসার কত অন্য রকমের। কত অন্য জীবনের, অন্য জগতের লোক সে। তারপরও সে এখন নিজের সমাজের সংস্কার আর বাধা নিষেধ বুদ্ধি করে এড়িয়ে গোপনে স্টেশনে এসেছে। সংগোপনে এথেনিয়াম লাইব্রেরিতে নিয়ে এসেছে। সপ্রেমে নিজের হাতটির সঙ্গে নিজের হিয়াটিও সমর্পণ করেছে।

রমেনের চিন্তাধারা কিন্তু বেলের কথার স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

হায়! দাঁড়াবার সময় যে নেই। —এই লাইব্রেরির দুর্লভ সুযোগটা হোটেলে ফিরে গেলে আর ফিরে পাবে না।

বেলা দেড়টা দুটোর মধ্যে ডন এসে হাজির হবে। তার আগেই লাইব্রেরির পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের জটলা লেগে উঠবে। রসাল চাহনি হেনে মুচকি হেসে পাশ দিয়ে সরে যাবে। ভিনদেশী ছাত্রছাত্রীরা অবশ্য তার চেয়ে বেশি কিছু করবে না।

কিন্তু হিস্পানি ছাত্ররা হিংসায় জ্বলে না উঠলেও জেগে উঠবে। ভবিষ্যতে বেলকে একা দেখলেই কাছে ভিড়তে চেষ্টা করবে। অনেক সম্ভাবনার সন্ধান করতে শুরু করবে।

আর হিস্পানি ছাত্রীরা সংখ্যায় খুব কম হলেও কম কাতর হবে না। আহা! মহারাজাদের দেশের লোক। কী জাদুই না জানে মন মজাবার ব্যাপারে। তাই স্বর্গরাজ্যের রানীর প্রসাদ পেয়ে, জ্ঞানের রানীর রাজত্বে এসে প্রেমের রানীর আরাধনায় মেতেছে।

একেবারে একাধারে জুনো অ্যাথেনা আর ভিনাশের বর পেয়ে গেছে এই রাজার কুমার প্যারিস।

এই হল ইন্ডিয়ানো।

প্রসন্ন প্রচ্ছন্ন আনন্দে, সম্ভবত অহংকারেও বেল একবার চারিদিক তাকিয়ে নিল।

তারা জিজ্ঞেস করল—কই, চুপ করে আছ যে বড়! মনে হচ্ছে কোনও গিটানা অর্থাৎ জিপসি মেয়ের নাচ দেখে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলে।

রমেন আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করল—গিটানার নাচ?

মাথা ঝাঁকিয়ে বেল বলে উঠল—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, গিটানার এক্সোটিক চমক লাগানো নাচ আর গান। যে যুগ আর যে সমাজ তুমি দেখনি সেই ফোক আর্ট হঠাৎ প্রথমবার দেখে বোধহয় ফ্ল্যাট হয়ে গিয়েছ। নতুন স্বাদ, নতুন সুর তোমার মনকে এমনই দোলা দিয়েছে। জানো, ওদের ক্ল্যাসিক ভঙ্গির সর্পনৃত্যকে জ্ঞানী, গুণী

বয়স্ক লোকরাও আরব রমণীদের বেলি ডান্স বলে মনে করে? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে?

সাধে কী আর তিনশো বছর আগে ফাদার মারিয়ানা ও থারাবান্দা নামের নাচনেওয়ালীদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে ওদের গানের কথাগুলি এত অশ্লীল আর নাচের ভঙ্গিগুলি এত ইঙ্গিতে ভরা যে নরকেও ওদের ঠাঁই হবে না।

এতক্ষণে রমেন একটু একটু বুঝতে পারল। সেই চিরকালের নারী। যতই অনভিজ্ঞ কিশোরী হোক, যতই হোক নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুসুম, প্রিয়ের আকাশে সে একেশ্বরী চাঁদিনী হয়ে বিরাজ করতে চাইবে।

একটুখানি হঠাৎ খসে যাওয়া তারকার ঝলক, একটি মুহূর্তের মেঘের ভেসে আসাও সেই আকাশে সে সইতে পারবে না।

সব উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসলে সবটুকুই যে চাইবে। পরিপূর্ণ প্রেমের প্রতিদান তো এই।

রমেনের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রাদো মিউজিয়াম, গ্যোয়ার আঁকা বিবসনা সুন্দরীর ছবির সামনে অকপটে নৃত্যশিল্পী জোসেফিন বেকারের নগ্ননৃত্যের কাহিনি সে বেলকে জানিয়েছিল। এবং তাতে বেল অসন্তুষ্ট হয়নি।

সম্ভবত সেই কাহিনির সরল স্বীকার বেলের অন্তরের মধ্যে ঘুমন্ত প্রেমিকাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

সে আবার সরল স্বীকার করবে।

যাকে ভালোবাসে তার কাছে ভোল ধরে ভোলাবে না।

রমেন বলল—আমি ভবিষ্যৎ গোনাবার জন্য গিয়েছিলাম ঠিকই তবে কপাল ভালো যে কোনও কাঁচা বয়সী কবি বেদেনীর পাল্লায় পড়িনি। এমন বেদেনী জাদুকরী যার চোখের চোবা জাদুই মনের আঁধার থেকে ভবিষ্যতকে টেনে বের করে আনতে পারে।

রমেন দেখল যে দেশে ধান খেতের আলের পাশ দিয়ে ঝিরঝির করে জল যেমন করে পাশের খেতের কচি চিকণ ধানের চারার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে তেমন করে একটা মিষ্টি হাসি বেলের দুই ঠোঁটের পাশ দিয়ে সারামুখে ছড়িয়ে পড়ছে।

সেই হাসি পরিহাস না প্রসন্নতা তা সে ভেবে দেখতে চাইল না।

সে শুধু শুনল—বল না রামন, তোমার সেই কাঁচা বয়সি বেদেনীটির বর্ণনা।

ছিল কি এই প্রশ্নের মধ্যে একটুখানি জেলাসির রঙ? এই মুহূর্তে সে জেলাসি কথাটার বংলা প্রতিশব্দ খুজে পেল না। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তো আগে কখনও হয়নি।

রমেন বলল—আমার শুধু মনে আছে যে তার লম্বা, দীঘল কালো কেশরাশি মাথার পিছনে ঘাড়ের উপর বন্যার মতো বয়ে যাচ্ছে। তার উজ্জ্বল চিকণ গায়ের রঙের উপর তাঁবুতে ভরা প্রান্তরের অন্ধকার পিছলিয়ে যাচ্ছে। তার কৈশোর লাবণ্য এখনও বুঝি নারীত্বে বিকশিত হয়নি।

দুষ্টু অথচ মিষ্টি হাসি এই বর্ণনাকে বাধা দিল—হয়েছে, ঢের হয়েছে রামন। তুমি কী করে সে খবরটুকু পেলে? পরখ করে দেখেছ বুঝি?

এই বাধা না মেনে রমেনের বর্ণনা স্রোতের মতো বয়ে চলল—ওর উচ্ছ্বসিত তনুলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাণের উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছিল। তার মুখখানাতে অনেকটা আমাদের দেশের পানের মতো ডৌল আর চোখ দুটিতে বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা মাখামাখি হয়ে আছে। তার কণ্ঠস্বর যেন আদর করে ডাকে আর হাসি সোহাগে ভরে দেয় সারা মুখটিতে।

খিল খিল করে হাসি কুল কুল ধ্বনিতে ভরা জলের ধারাকে এবার ডুবিয়ে দিল।

রমেন সেটুকু লক্ষ করল অথচ যেন আমল দিল না। তার ধারাবিবরণী চলল।

যাবাবরী সুন্দরী পামিয়াদো অর্থাৎ হাততালি দিয়ে আমায় ডাক দিল। তাকিয়ে দেখলাম যে তার মুখের চারপাশে একটা যেন জ্যোতির বৃত্ত ঘিরে আছে। সেই আলোর সাহায্যে আমার ভবিষ্যৎ সে দেখে দেবে। আমি একটু একটু করে এগিয়ে গেলাম। আঁখির টানেই নিজের পানে টেনে নিল।

—কতখানি এগিয়ে গেলে, রামন? কত কাছে?

একটু ধৈর্য ধরো। সবই তো বলছি। একেবারে অকপটে। একটুও রেখে ঢেকে নয়। বেদেনীর সামনে ছিল একটা ছোট্ট ঢাক। তার আওয়াজ নাকি হৃদয়ে গুরু গুরু ডমরু রব জাগিয়ে তোলে। আর এই ভাবেই সে অভিভূত করে ফেলে তার খদ্দেরকে। সেই পান্ডোরা অর্থাৎ হিস্পানি ঢাকের একপিঠে যখন যাযাবরী তার

চাঁপার মতো চিকণ আঙুল চালিয়ে সুর তোলে তখন ঢাকের অন্য পিঠে ভবিষ্যৎবাণীর সংকেত ফুটে ওঠে।

অধীর স্বরে বেল বলে উঠল—উঃ, এত দূর তুমি সেই ডাইনি বেদেনীকে অধ্যয়ন করে নিয়েছিলে? তারপরও যে বড় তার হাত থেকে মুক্তি নিয়ে ফিরে এলে?

খুব নিরীহের মতো মুখ করে রমেন চুপ করে রইল।

বেল আবার প্রশ্ন করল—কী, চুপ করে আছ কিসের ভয়ে? ওঃ, সেই গিটানার নাম বুঝি ছিল পাপ্রিকা?

অর্থাৎ ধানী লঙ্কা।

যেন ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেছে এমন একটু মুখের ভাব করল রমেন।

তারপর আস্তে আস্তে বলল—ঠিক বলেছ। আশ্চর্য দেখছি। তুমিও গুনতে জানো নাকি?

বেল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—কেন? কেন তুমি এ হেন অসম্ভব অবিশ্বাস্য ধারণা করেছ?

মুখ খুব কাঁচুমাচু করে রমেন অস্ফুট স্বরে জানাল—ঠিক বলেছ তুমি। তার বর্তমান নাম পাপ্রিকা। অবশ্য বাপ-মায়ের দেওয়া আগের নাম কী একটা যেন ছিল..

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। নাম ছিল ইসাবেল।

কিন্তু বেল তাতেও দমল না।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—কিন্তু সেই মেয়েটি তো রোম্যান্টিক ট্রাডিশনে ভরা, নাটকীয়তায় আর মুগ্ধভাবে রাঙানো সেভিলের ফেরিয়াতে যায় নি। উত্তপ্ত বসন্ত রাতের কমলা সৌরভে আত্মহারা হয়ে উঠবার সুযোগ পায়নি।

রমেন আরও যোগ করে দিল—আমি তো তাই ভাবছি। সেখানকার লেসের মতো সূক্ষ্ম নক্‌সা কাটা লোহার গ্রীলগুলির পিছনে তার দেখা পেলাম না। কালো কাজল চোখে কটাক্ষ হানতে অভ্যস্ত আন্দালুসিয়ার সুন্দরীদের ভিড়ে টুঁড়ে টুঁড়েও তার দেখা মিলল না।

বেল বলল—ঠিক কথা। পোক মিউজিক আর সফিস্টিকেটেড মিউজিক, দুইয়ে মিলে মিশে সেখানে খুব মনমাতানো 'টোনাডিল্লা' আছে। স্টাইলে ভরা আর সর্বসাধারণের অংশ নেওয়ার মতো সংগীত আর মিউজিক্যাল অভিনয়। সেটা প্রেমসে উপভোগ করবার জন্য সে হাজির ছিল না। এমনকি যাবাবরীরা কন্টে হোন্ডো নামে গভীর গহীন গীত গায় তাতেও সে বঞ্চিত ছিল।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে রমেন বলল—'বনে বনে ঢুঁড়ত—বঁধুয়া কাহা গই?'

এতক্ষণে তাকে যেন অভয় দিয়ে বেল বলল—সে তো 'ফেরারির' দেশে চলে গেছে বলে খবর পেয়েছি। খবরটা খুব খাঁটি। এই জিপসিরা যে দেশ থেকে আদ্যিকালে এসেছিল সেই দেশেরই এক যাযাবর এই খবরটা জানিয়ে গেছে।

আশ্চর্যভাব দেখিয়ে কপালে দুচোখ তুলে রমেন বলল—গেছে নাকি? যাক্, আপদ বিদায় হয়েছে। না হলে সে হয়তো আরও জানিয়ে যেত যে জনপ্রিয় কাহিনির ঠাকুরমার ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসে সেই পরীরা প্রথমে মধ্যযুগের রোম্যান্সগুলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। শিশির বিন্দুর মতো চকচকে হালকা পাখায় ফুলের রেণু মেখে উড়তে উড়তে ওরা এখন রক্তমাংসের মানবীতে পরিণত হয়েছে। এই রহস্যময় স্পেনে এসে সেই খোঁজটা পেলাম।

রুদ্ধশ্বাসে বেল প্রশ্ন করল—তারপর সেই পরীরা এখন কী করছে? এক আধজন কি তোমাদের ইন্ডিয়াতেও গিয়ে পৌঁছোয় না কি?

রুদ্ধশ্বাসে রমেনও পালটা প্রশ্ন করল—এ হেন সম্ভাবনার খবর তোমার কাছে আছে নাকি?

গভীরভাবে বেল সংক্ষেপে উত্তর দিল—সে খবর তো সেই দেশের লোকেরই জানার কথা।

একটু থেমে আবার বলল—পরীদের তো নিজেদের আলাদা কোনও দেশ নেই। রামধনুর পথ দিয়ে আনাগোনা করে।

হঠাৎ রমেনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ঠিক বলেছ উষা। পেরু থেকে ভারত। রামধনুর পথে একটুও দূর নয়। দুরূহও নয়।

॥ ১৮ ॥

আবার সেই বঞ্চিতা প্রণয়ব্যথিতা নারী।

হোটেলের সেই মহিলা রিসেপশনিস্টের কাহিনি রমেনকে খুব দুঃখ দিয়েছিল। আহা বেচারি বাপ-মায়ের আর সমাজের অমতে বিয়ে করে বেরিয়ে আসার ফলে এখন রিসেপশনিস্ট হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

আজকাল উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী রিসেপশনিস্টরা পশ্চিম ইয়োরোপে প্রায়ই হোটেলে আগন্তুক ধনী লোকদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পায়। কখনও কখনও উপরি আয় আর আরাম ছাড়াও তাদের গেঁথে তুলে গাঁটছড়া বাঁধারও ব্যবস্থা করে নেয়।

কিন্তু স্পেনের ব্যাপার আলাদা।

একে বিশ্বব্যাপী মন্দার দশক। তায় দেশের মধ্যে অশান্তির ফলে ধনী বিদেশী টুরিস্টও তেমন বিশেষ আসে না।

এদিকে যৌবন যাই যাই করছে। অথচ বেচারির প্রেম অভাবের হাওয়ায় উঠে গিয়ে যে নতুন পথ খুলে ধরবে তারও সম্ভাবনা নেই। একনিষ্ঠার অনেক যন্ত্রণা।

এরকম ব্যর্থতার কাহিনি পড়তে মন্দ লাগে না। বাংলা গল্পে বেশ জমিয়ে রসিয়ে লেখা যায়। কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনে চোখের সামনে আনন্দ দেয় না।

তাই রমেন ভদ্রমহিলাকে একটু এড়িয়েই চলতে চায়। যদিও সে বিদেশী ট্যুরিস্টকে সংবাদ দিতে, সন্ধান দিতে, সহায়তা করতে সবসময়ই উৎসুক।

ইতিমধ্যে মার্টিনো সেভিল থেকে ফিরে এসেছে। তার রাজহংসী এবার ফেরিয়ার সময় গোপনে তাকে জানিয়েছে যে ফার্স্ট কমিউনিয়ন প্রথম দীক্ষা নেবার যে আনন্দ হিস্পানি সন্ন্যাসিনীদের অন্তরে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকে তা ওর মনে ফিকে হয়ে এসেছে।

রমেন শুনে আশ্চর্য হল—অবশ্য তুমি বলেছিলে যে কোনও কোনও সন্ন্যাসিনী দীক্ষাকে উপেক্ষা করে সংসারে ফিরে আসে। কিন্তু তোমার আমাদা যে বিশেষ বনেদি বংশের মেয়ে। তার বংশের ঐতিহ্য, মর্যাদা এসবই তো তার এই নতুন বাসনাকে বাধা দেবে।

মার্টিনো অধীর হয়ে উঠল—অবশ্য, অবশ্য বাধা দেবে। কিন্তু অমন বংশের মেয়ে বলেই অতখানি সাহস হয়েছে তার। অন্য কোনও মেয়ে হলে...

হঠাৎ সে চুপ করে গেল।

রমেন রহস্যের সন্ধান পেল। মনে হচ্ছে মার্টিনো হয়তো কিছু ফাঁস করতে ইতস্তত করছে।

তাই রমেন একটু যেন মিনতিই করল—বল না বন্ধু, আসল ব্যাপারটা কী? অন্য কোনও মেয়ে হলে কি হতে পারত?

প্রায় যেন একটা বোমা ফেটে উঠল।

—তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ যে আমাদের সাধারণ মেয়েরা অল্প বয়স থেকেই পেখম মেলতে শেখে—

—মানে তুমি বলছ যে তারা জন্ম-ময়ূরের জাত?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক তাই। আমাদের তরুণ-তরুণী দুই সেক্সই প্রথম থেকে পেখম মেলতে শেখে। অরুণ কিরণের দেশ। নারাঙ্গির উত্তপ্ত রঙের দেশ। বিশেষ করে মেয়েরা মনে করে যে নজর, আদর আর আরাধনা ওদের পাওনা। জন্ম থেকেই পাওনা।

রমেন হেসে ফেলল—সে তো সব দেশেই বোধ হয় তাই। ইংরেজিতে বলে নারী জন্মেছে প্রেম নিবেদন পাবার জন্য, দেবার জন্য নয়।

মার্টিনো খেপে গেল—ছাই তোমার ইংরেজি বয়ান। ওই ইংরেজিতে আছে যে পুরুষের জীবনে ভালোবাসা একটু টুকরো মাত্র, আলাদা অংশ। নারীর সমস্তটা সত্তাই হচ্ছে প্রেম।

হিস্পানি জীবন সম্বন্ধে যে গোপন সংবাদ ঝলকের মতো মার্টিনোর আলোচনায় ফুটে উঠতে যাচ্ছিল তাকে রমেন মাঠে মারা যেতে দেবে না।

সে মেনে নিল সব কথা। এবং বলল—এবার জানাও তোমাদের নারীর অন্তরের কথা।

বেশ উত্তপ্তভাবে মার্টিনো বলল—দেখনি কি তুমি পথে ঘাটে তরুণীদের ভাবন? কেমন দীর্ঘ নিবিড়

সাহসী চাহনি হেনে তারা তরুণদের দিকে তাকিয়ে থাকে? প্রত্যাশা করে প্রেমার্ত নজর? দাবি করে, প্রায় দাবিই বলতে পারো—গ্যারান্টি অ্যাটেনশন? তৃষ্ণার আকুলতাকে লিপস্টিক দিয়ে ঢাকা যায় না।

মিষ্টি হাসল রমেন—হায়! এত সুধা অধরে, তবু ধরা যায় না। অধরা। এত মধু বক্ষে, তবু বাধা দুস্তর। অধীরা।

কপট দীর্ঘশ্বাসে নয়, সত্যিকারের অন্তর ভরা হতাশা নিয়ে মার্টিনো বলল—আমাদের শহরগুলির পার্কে পার্কে নিরালা কোনায় প্রেমের লীলা দেখেছ কি?

রমেন মাথা নাড়ল সমান হতাশা দেখিয়ে। হায়, সময় হয়নি। মার্টিনোর মতো সহৃদয় বন্ধু থাকা সত্ত্বেও।

—তাহলে তুমি স্পেনের নিরুদ্ধ তারুণ্যকেই দেখনি। ওদের প্রেম নিবেদন আর বেদনা অবশ্য সমাজের আর পরিবারের অনুমোদিত হওয়া চাই। ওটাই প্রথম পর্ব।

হেসে রমেন তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পাঠে প্রমোশন চাইল।

—বাঃ। এই তো বেশ রসিয়ে উঠেছ বাছাধন। তবে মন দিয়ে শোন। চেয়ারে বসে তরুণী। সাজে গোজে ঢাকা। তোমার ইংলোটেরার মতো আঁটসাঁট আর খাটো ঢাকনায় ফুটিয়ে তোলা নয়। এই রিপাবলিকান স্বাধীনতার যুগেও নয়।

তা, তিনি তো বসে বেঞ্চিতে। রূপকথার প্রত্যাশায়।

এক যে ছিল রাজকন্যা।

রাজকন্যার মতো মহিমায় ভরা মূর্তি। ঠিক সামনে হাঁটু গেড়ে প্রেমিক সম্ভ্রমে ভরা কয়েক ইঞ্চির দূরত্ব রক্ষা করছে। মাঝে মাঝে যেন আনমনে তার হাত সাহস করে এগোচ্ছে। কিন্তু স্পর্শ করছে না। হয়তো কাঁপতে কাঁপতে আঙুলের প্রান্ত দিয়ে ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। অমনি সুচতুরা নিজের হাতটি নিপুণ ভাবে সরিয়ে নিল। নিরাশার বাতাস দিয়ে আগুন জাগিয়ে তুলতে চায়।

রমেন কাব্য করে বলল—ব্যাস, শুধু এইটুকুই? আগুনের শুধু শিখা, তার দেখা নেই? রঙ নেই?

গম্ভীরভাবে মার্টিনো উত্তর দিল—না। চুমু খেতে পার। তবে গালে। ঠোঁটে নয়। ওটা অশ্লীলতা।

—তা হলে ধাপে ধাপে এগোবে কত দিনে?

—কেন? দীর্ঘকাল ধরে বাগদত্তা হয়ে থাকবে। ইনি দেখাবেন অভিমান, সন্দেহ, কাকাতুয়ার ককোয়েট্রি। উনি দেবেন উপহার, নিবেদন আর দীর্ঘশ্বাস। ইনি আসলে দিতে চান অনুরাগ নয়, অনুগ্রহ। উনি ভোগ করেন দেহের নিগ্রহ। আর বাপমায়েরা চান প্যাশন নয়। পরিণয়। একেবারে সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের কারবার।

রমেন একটু যেন অবিশ্বাস করতে চাইল—তুমি বোধ হয় নিজে ব্যথা পেয়েছ বলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছ।

মার্টিনো সমান ভাবেই উত্তেজিত—একেবারে খাঁটি নিজ্জস সত্য। প্রকৃতি অনুকূল। কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল। তাই বঞ্চিতা বেচারিরা ভীষণ জেলাসিতে ভোগে। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। পুরুষের দৃষ্টিতে একেশ্বরী হয়ে থাকতে চায়।

রমেন তবু হাসছে;—সেটা স্বাভাবিক। সব দেশেই।

মার্টিনো প্রতিবাদ করল—তুমি ছেলেমানুষ। কিছু জানো না। অন্য কোনও দেশের মেয়েরা ফুলে ফুলে এত সাজে না। কানে দোলায় না এত আভরণ। বাহুবল্লরী, স্কন্ধ আর চাঁপার মতো আঙুল দোলায় না এত উষ্ণ মাদকতায় ভরে নিয়ে।

এবার রমেন আলোচনার ক্ষেত্রটি আরও ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল। তাকে যে জানতে হবে অনেক কিছু।

—কিন্তু মার্টিনো, মুচাচাদের নিয়েই তুমি পক্ষপাত দেখাচ্ছ। মুচাচোদের কথা যে বলছ না?

—মুচাচো? মুচাচো? উঠতি বয়সের মিঙ্গের দল? অন্যাদের সিস্টারদের সম্বন্ধে ওদের ভাব-ভঙ্গিতে একটা সিনিস্টার অ্যাপ্রোচ আছে। দেখ না, বুরুসের মতো মুস্টাশ, লম্বা কালো সাইডবার্ন, রোদে পোড়া রঙ আর ওঠা-বসার মধ্যে সর্বদা একটা মারমুখো ভঙ্গি। ডান হাতটা প্যান্টালুনের পকেটের গভীর গহ্বরে ঢোকানো। যেন এখনই কোনও হলদে পাখি ছোঁ মেরে ধরতে যাচ্ছে।

রমেন সে সব বিশেষত্ব অবশ্যই লক্ষ্য করেছে।

সে জানতে চায় তার লক্ষ্যপথের বাইরের কথা।

তাই সে এখন বাধা দিল—এবার বলল, মার্টিনো, তোমার ঐ সন্ন্যাসিনী মঠের মেয়েদের কথা। আমরা আসল আলোচনা থেকে সরে যাচ্ছি?

মার্টিনো বলল—আমি সেই আসল কথাতেই আসবার চেষ্টা করছি। সংসারের মিঙ্গেরা যদি এমন ধারা হয় সন্ন্যাসের মস্করাই বা বাঁদর বৃত্তি ছেড়ে দেবে কেন? জানো, আমাদের দীক্ষিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে বেশ কিছু সাধু বাইরে রক্ষিতা রাখে। অবশ্য বাইরের লোক কিছু বাড়িয়েও বলতে পারে। মনে মনে হয়তো নিজেরা যা চায় তাই সাধুদের ঘাড়ে চাপায়। তাতেও কিছুটা আরাম পায়।

খুব বিজ্ঞের মতো রমেন বলল—খুবই সম্ভব। তবে ভুলো না যেন ডন জুয়ানের সম্বন্ধে সবচেয়ে রসাল রচনাটি একজন সন্ন্যাসীরই লেখা। কিন্তু হিস্পানি সমাজ কী করে এসব সহ্য করে?

—করে, কারণ গীর্জা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র শাসন আর রক্ষণশীল সমাজের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়। তাছাড়া সমাজ ভাবে যে সন্ন্যাসীদের রক্ষিতা রাখার প্রথাটা সমাজের মেয়েদের নিরাপদ রেখেছে।

রমেন মন্তব্য করল যে সেটা স্বাভাবিক। সব দেশেই পতিতা বৃত্তিকে লোকে জিইয়ে রাখে অনেকটা সেই কারণে।

অসহিষ্ণু হয়ে উঠল মার্টিনো—কিন্তু রামন। ব্যাপারটা এত ব্যাপক আর এত বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে আমার প্রিয়া যে 'নানারি'তে আছে সেই মঠের দিকে হাত বাড়িয়েছে একজন জোরদার যাজক।—আর তুমি তো জানো সেই মঠে কে হচ্ছে ফেয়ারেস্ট ফ্লাওয়ার?

প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল রমেন।

কোনও রকমে নিজেকে সামলিয়ে সে বলল—তুমি কমই বলেছ মার্টিনো। তোমার প্রেয়সী শুধু সুন্দরতম কুসুম নয়, পবিত্রতম নৈবেদ্য। তাকে তুমি মঠের বাইরে নিয়ে এসো। তিনি এখন নিশ্চয়ই রাজি হবেন। তোমাদের সমাজেও বিপ্লব এসে পড়ল বলে। তিনি হোন তার অগ্রদূত। বার্সিলোনার বন্দরও তোমাদের পাড়ি দেওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে।

ম্লানভাবে হাসল মার্টিনো।

বলল—জানো, আমি সেখানে ছাত্র ছিলাম। সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখানো সেখানই শিখেছি। আন্দালুসিয়ার অর্থাৎ দক্ষিণ স্পেনের জমিদারি সামন্ততন্ত্রের ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলে সাধারণ চাকরির সন্ধানে বার্সিলোনার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারব। কিন্তু যাকে ভালোবাসি তাকে কী করে ওই কষ্ট ওই ত্যাগের, ওই কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে এনে ফেলব?

একটু থেমে বলল—ভালোবাসি বলেই পারি না, রামন।

বলিষ্ঠ আশ্বাস জানাল রমেন —ভালোবাস বলেই পারবে। তাছাড়া ওই জোরদার যাজকের কথাটা ভুলো না। —তুমি যদি সত্যি ভালোবাস, সে যদি সত্যি ভালোবাসে, তাহলে প্রথম দিকে কুঁড়েঘরের জীবন যাপনটা এমন কিছু শক্ত নয়। তাছাড়া তোমার এই দেশে কুঁড়েঘরের জীবন আমার দেশের মতো মনুষ্যত্বের অপমান আর অসহায়তায় ভরা নয়।

বলেই রমেন নিজের কথায় নিজেই বিরাট একটা ধাক্কা খেল। চোখের সামনে খুলে গেল একটা প্রচণ্ড মরুভূমির দৃশ্য। রৌদ্রের দাহে সব প্রেম ঝলসিয়ে যাচ্ছে। বালির ঝড়ে সব রস নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের তাড়নায় সব মরূদ্যান মিলিয়ে যাচ্ছে। মরীচিকা ছাড়া কিছুই টিকছে না।

প্রাণপণ চেষ্টা করে সে নিজের মনকে সেই দিক আর দৃশ্য থেকে সরিয়ে নিল। নিজেকে এর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে শীঘ্রই। রক্তরাগের শোভা শুকিয়ে যাবার আগেই।

কিন্তু ওরে অস্ট্রিচ পাখি। আরও কটা দিন তুই বালুরাশিতে মুখ ঢেকে থাক। সুধাশ্যামলিমার স্বপ্নে মজে থাক—। ততদিন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা কর।

মার্টিনো বলল—কুঁড়েঘরের জীবন আমাদের কাছে এমন কিছু অজানা নয়। কারণ, আমরা কুটিরকে কুঞ্জের আবরণ দিয়ে চলতে পারি। তাতেই আনন্দ করে নিতে জানি। আমাদের প্রায় প্রত্যেকেই মনের মধ্যে এক একটি গ্র্যান্ডি। নবাব খাঞ্জা-খান। আমাদের মাইনে হয় খুব কম। কিন্তু বাইরের চটক আর চালচলনে তাই বলে প্রাণ ধরে কাটাচিপি করতে পারি না।

রমেন মৃদুস্বরে আশ্বাস দিলে— কিন্তু মার্টিনো, তোমার তো অবস্থা ভালো।

—হ্যাঁ, ভালো। বেশ ভালো। কিন্তু বাবা ব্যবস্থা করে রেখেছেন এক ড্যুকেসার অর্থাৎ ডাচেসের মতো জাঁদরেল মহিলার আরও এক কাঠি সরেস কন্যার জন্য। রাজি না হলেই সম্পত্তি চলে যাবে দেবোত্তর হয়ে। অর্থাৎ গীর্জাওলাদের রক্ষিতার সংখ্যাও হয়তো বাড়বে। আর আমি গীর্জার ইঁদুরের মতো শুকিয়ে-মুখিয়ে থাকব। লাইক এ চার্চ মাউস।

তা কী করে সম্ভব? আশ্চর্য রয়ে গেল রমেন। তুমি সে অবস্থায় বার্সিলোনায় লেখাপড়া শিখলে কী করে?

—তখনও রাজা ছিল দেশে। অর্থাৎ বার্সিলোনা যে হঠাৎ অত বাড় বেড়ে উঠবে বা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী সরকার গীর্জার পাখনা কাটতে চাইবে তা কেউ ভাবেনি। মোট কথা আমার এই লন্ডনকাট স্যুট আর হাতে তৈরি মেজরকা দ্বীপের জুতো সব বিদায় নেবে বংশের বিরুদ্ধে বিয়ে করলে।

—আশ্চর্য! তোমার সুইটহার্টও তো খুব বড় বংশের। করুণ হাসি হাসল মার্টিনো—ও, তুমি বুঝি রোমিও জুলিয়েট পড়নি?

রোমিও জুলিয়েট কথাটি শুনেই দূর থেকে সেই সিনরা এগিয়ে এল।

সে শুনেছিল শুধু রোমিও। তাই—

এগিয়ে এসে হেসে 'বাউ' করে সামনে মাথা হেলিয়ে বলল—সিনর পিয়েত্রো, রমেরিয়ার—খবর একটি আমি পেয়েছি। মাত্র মাইল ত্রিশ দূরে একটা ছোট্ট শহরে রমেরিয়া হচ্ছে। আপনি অবশ্য সেটা দেখে আসুন।

তারপর মার্টিনোকে সে বলল—বুয়েনস সিনর মার্টিনো, আপনি যদি আপনার বন্ধুর সঙ্গে যান তাহলে বেশ চমৎকার হয়। ওকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। তাছাড়া আরও একটা বিশেষ অনুষ্ঠানও হবে সেখানে। জানেন তো বর্সিলোনা অঞ্চলের লোক একজন হলে ব্যবসা, দুজন হলে কর্পোরেশন আর তিনজন হল অর্কেস্ট্রা শুরু করে।

দুজনেই উৎসুক হয়ে জানতে চাইল।

সিনরা খুব গদগদ হয়ে উঠল তাতে। অতিথিবৎসলা হিস্পানি নারী সার্থকতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

বর্সিলোনা, খাস বার্সিলোনা থেকে হাজার খানেক তীর্থযাত্রী এসেছে সেখানে। তারা ঘোষণা করেছে যে তারা এই রসকষহীন ক্যাস্টিল প্রদেশের লোকদের নাচের আনন্দ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেবে এই রবিবারে। খাস ক্যাটালোনিয়ার সার্ডানা ড্যান্স।

রমেন খুব আনন্দিত হল—আমি যে কত ধন্যবাদ আপনাকে দেব, সিনরা—তা ভাষায় বোঝাতে পারব না। বার্সিলোনায় এত কম দিন ছিলাম যে সার্ভানা ড্যান্স না দেখেই চলে এসেছি!

খুশিতে বিগলিতা সিনরা মাথা ঝাঁকালেন—উহুঁ; সার্ডানা না দেখা পর্যন্ত আপনাকে আমি স্পেন ছেড়ে যেতেই দিতাম না। তবে সার্ডানা দেখার সময় রক্তিম রিওহা সুরা নিশ্চয়ই পান করবেন। এই সুরা সার্ডনার দল সঙ্গে নিয়ে আসবে ঠিকই—। আর বিদেশীকে স্পেনের এই সম্পদটি না চাখিয়ে ছাড়বে না।

রমেনকে সিনরা আরও জানাল—এটা আর আমাদের অন্যান্য প্রায় সব উৎসবপর্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী চলে তা আপনি দেখেছেন। আমবা যতটা ধার্মিক, ঠিক ততটাই প্যাগান। ক্যাথলিক ধর্ম স্থানীয় প্যাগান প্রথা আর প্রার্থনাগৃহ দুই-ই নিজস্ব করে নিয়েছিল যে।

তাই দেখবেন পথে যেতে যেতে তীর্থযাত্রীর দল পায়ে হেঁটে, মিউলে টানা গাড়িতে, ঘোড়ায় চড়ে দলে দলে চলেছে। অসম্ভব রকম সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে সমস্তটা অঞ্চল ভরা। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। রক্ত করে আনচান।

মনের ভজন আর বনভোজন মিশে এক হয়ে যায় যাত্রীদের অবিরাম গানে, গীটার আর খঞ্জনী বাজনায়, হাসি আর হৈ-হল্লাতে।

মার্টিনো একটু রসিকতা করার লোভ সামলাতে পারল না—সিনরা, নারীরাও কি অভাজনদের সনে ভজনে চলে নাকি?

চোখ আয়ত করে, দুটি কান পর্যন্ত হাসির ধনুক টেনে সিনরা জানাল—না চললে চলবে কী করে? মনে আগুন জ্বালাবে কারা? বনে নয়, মনে। যে সব মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে পিলিয়নে চড়ে জড়াজড়ি করে যাবার সুবিধা পায় না তারা ওয়াগনে বসে চলে। ফুল ফুলে সাজানো, কাগজের রঙিন শিকলিতে জড়ানো

ওয়াগনের মধ্যে ম্যান্টিলা শালের মধ্যে মুখগুলি গোলাপের মতো ফুটে থাকে।

একটু থেমে মুচকি হেসে সিনরা বলল—সিনর পিয়েত্রো, ইউ মাস্ট ফল ইন লভ বিফোর লিভিং স্পেন। স্পেন ছাড়বার আগে আপনাকে প্রেমে পড়তেই হবে। 'এস্টর লোকো পর' পাগলের মতো প্রেমে পড়তে হবে।

একটু ডাইনিং হলের দিকে চাহনি হেনে বলল, এই রামেরিয়াতেই ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখুন না কেন?

মার্টিনো রমেনের বিব্রত ভাব লক্ষ করল।

তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিল—সিনরা, দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

খুব ভালো মানুষের মতো মুখ করে সিনরা বলল—হিজ এক্সেলেন্সি রিবেরাদেরও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করুন না কেন।

রমেনের আঁতে ঘা লাগল। মার্টিনো ঠিক লক্ষ্য করল।

তাই সে জিজ্ঞাসা করল—একটু রুক্ষভাবেই—ওদের এর মধ্যে টেনে আনছেন কেন, সিনরা?

আরও বেশি নিরীহের মতো মুখ করে সিনরা বলল—না, কোনও বিশেষ কারণ নেই। ওদের তো মোটর আছে। পুরো পরিবার একসঙ্গে চড়ুইভাতি করলে, চড়ে বেড়ালে সবাই খুব খুশি হবে। এই আর কী।

কারণ দুটো অবশ্য তেমন মাথা ঘামানোর মতো কিছু নয়। তবু রমেন পছন্দ করল না।

মার্টিনো কানে কানে রমেনকে অনুরোধ করল—খবরদার, রিবেরাদের যেন আমাদের দুজনের সঙ্গে রমেরিয়াতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ো না।

রমেন আশ্চর্য হয়ে গেল—কেন বল তো? এত আনন্দের বিহার। তায় তীর্থক্ষেত্রের পথে। তুমি আপত্তি করছ কেন?

মার্টিনো শুধু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—যা বলছি তাই করো। আমরা ট্যাক্সিতে যাব। তুমি আমার অতিথি। ব্যাস।

পথের শোভাযাত্রা শুধু শোভার নয়, সৌহার্দের সৌন্দর্যের যাত্রা। গানে বাজনায় বাতাস ভরে গেছে। আনন্দের কলকাকলীতে আকাশ মুখরিত।

এদিনে সার্ডানা নৃত্যমণ্ডলী গড়ে উঠছে—

একটা হালকা খুশি মেজাজের সুর বাজছে ব্যান্ডে। সমস্তটা প্লাজা নৃত্যে উৎসুক নারী পুরুষে ভরা। হাজার খানেক লোক তো হবেই। তাদের সংখ্যা নয়, মনের সংগীতই আসল কথা।

সবাই তাদের সান্ডে বেস্ট পোশাক পরেছে—

বাজনাটা ধর্মমূলক নয়। কিন্তু গীর্জায় যাবার পথে বা সেখান থেকে বেরিয়ে সবাই বাজনাকে তারিফ করে যাচ্ছে।

সবাই একমনে বাজনা শুনছে। যেন এই টুকুই সব।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দেখতে দেখতে রমেন ভাবল বা রে, নাচ কোথায়? এত যে শুনেছিলাম যে ক্যাটাল্যান প্রদেশের সবচেয়ে মনমাতানো স্বতঃস্ফূর্ত নাচ হচ্ছে এটি। এরা দেখছি সবাই শূন্য দৃষ্টিতে যেন শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা গোনার মতলবে নাকি?

হঠাৎ অবাক হয়ে সে দেখল যে সে নজরই করতে পারেনি কখন নাচ শুরু হয়ে গেছে।

খাঁটি লোকনৃত্য।

হাতে হাত ধরে গোল হয়ে সবাই নাচছে। একটি নারীর পরে একটি পুরুষ। তারপর একটি নারী। দেখতে দেখতে অনেকগুলি বৃত্ত রচনা হয়ে গেল।

সবাই নাচছে। সবাই যেন হান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথার পাত্র-পাত্রী। প্লাজার এক কোনায় মঞ্চের উপর ব্যান্ড বাজছে। কিন্তু তা বাজছে প্রত্যেক নাচিয়ে পাত্র-পাত্রীর মনের মধ্যে। না হলে অত তন্ময় হয়ে নাচবে কী করে?

না হলে অত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকবে কী করে?

খানিক পরে প্রথম নাচটা শেষ হল।

রমেন এবার বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দ্বিতীয় নাচটা কী করে শুরু হয় তা নজর করতে লাগল। বাজনা চলছে।

হঠাৎ একটি তরুণী বৃক্ষের মাঝখানে পোঁতা নিশানের ডাণ্ডার তলায় তার ভ্যানিটি ব্যাগ অর্থাৎ বনিতা-বটুয়া রাখল। আর রাখল তার কমনীয় হাতের রমনীয় দস্তানা জোড়া।

পরমুহূর্তে একটি তরুণ নিজের কোট খুলে সযত্নে পাট করে বটুয়ার উপর বেশ প্রেমভরে রাখল।

শুরু হল নাচ—

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা জোড়ায় জোড়ায় তাদের হাত ব্যাগ কোট প্রভৃতি বৃত্তের মাঝখানে স্তূপ করে ধীরে মন্থর গতিতে নাচতে শুরু করল।

একটি চরণ দক্ষিণে, পরেরটি বাঁয়ে। আবার সেই গতির পুনরাবৃত্তি। গতি ক্রমশ দ্রুততর হল বাজনার তালে তালে।

প্রতিটি নারীর দুপাশে দুই পুরুষ। প্রতি পুরুষের দুপাশে দুই নারী। পৃথিবীটা যে গোল তা সবাই জানে। সার্ডানা নাচ দেখে শিখে নিক সবাই যে পুরুষ ও নারী পরস্পরের পাশে ঘোরে।

হর-গৌরী।

মার্টিনো ফিস্ ফিস্ করে রমেনকে বলল—গ্রীসে আমি এই রকম নাচ দেখেছি। সারি সারি নারী পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে নাচে। কিন্তু নারী পুরুষের অঙ্গাঙ্গী হয়ে নাচের সায়রে ভেসে বেড়াই আমরা এই স্পেনে।

নিত্য নতুন নতুন সুর তৈরি হয় এই নাচের বাজনার জন্য। মেঠো বাঁশি আর উড উইন্ডের সুরের পরশ মনকে দোলা দিয়ে যায়।

গীর্জার প্রচ্ছদপটে এই নাচে একটা সুন্দর লীলায়িত রোম্যান্স খুঁজে পেল রমেন। যেন দূর প্রান্তর থেকে ভেসে আসা রাখালিয়া বাঁশির সুর নেচে বেড়াচ্ছে।

তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ বাতি জ্বালাবার জন্য বৃত্তেব মধ্যে এসে হাজির হল। কাঁধে তার একটা লম্বা আঁকশি—। তাই দিয়ে সে বাতি জ্বালিয়ে দিল।

সাঁজের আকাশ-প্রদীপ যেন জ্বলে উঠল সবার মনে।

মাথা নেড়ে হাসি মুখে সবাই বিদেশী দর্শক রমেনকেও নাচে যোগ দেবার জন্য বার বার আহ্বান জানাল।

তার মধ্যে যে আনন্দ আর মাধুর্য মেশানো ছিল তা সে কোনদিন ভুলবে না।

কিন্তু সে যে বেলের কথাই ভাবছিল।

প্রকাশ্য পথে সবার সামনে কবে ওরা এমন করে আনন্দ কুড়াতে কুড়াতে চলতে পারবে?

ওকে অনেকক্ষণ তন্ময় আব নীরব দেখে মার্টিনো প্রশ্ন করল—আজকের এই উৎসব সম্বন্ধে কিছু ভাবছ, বন্ধু?

হঠাৎ যেন রমেনের ধ্যান ভঙ্গ হল।

সে যা বলল তা যেন শুধু কথা নয়, মন্ত্রবাণী।

সে বলল—ভাবছি তোমাদের অনুষ্ঠানগুলির সৌষ্ঠব আর সাধনার কথা। ভাবছি তাদের রঙ আর লীলার কথা। ধ্বনি আর সংগীতের সমন্বয়। হৃদয়ের বিষাদ অনুভব শক্তির প্রতি মমতা। মানুষের প্রয়াসের এই তো হচ্ছে পরম লক্ষ্য। সুখের ঐতিহ্যকে পূজাবেদীতে বসিয়ে তোমরা জীবনকে অন্য সব জাতির চেয়ে বেশি উপরে তুলে ধরেছ—

শুনতে শুনতে মার্টিনো অভিভূত হয়ে গেল।

গভীর ভাবে মন্তব্য করল—তুমি যেন এখন অ্যাথেনিয়ামের মঞ্চে উঠে স্পেনের বাণী সম্বন্ধে বলছ, প্রিয় বন্ধু। হঠাৎ অ্যাথেনিয়ামের নাম শুনে রমেন চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই লাইব্রেরির নিরালা কোনা। সেই রক্তরাগ কুসুম প্রস্ফুটিত করে তোলা।

হঠাৎ সমস্তটা দিগন্ত যেন আলোয় আলো হয়ে উঠল।

তবু রমেন একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারল না। সিনরা ওকে রমেরিয়াতে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিল কেন?

মার্টিনো সম্ভবত খানিকটা আঁচ করতে পেরেছে। তাই ওকে জিজ্ঞাসা করতে বাধা নেই—

মার্টিনো সংক্ষেপে জানাল—রবিবারের ভজন আর নাচগানের পর সোমবার চলে বিশ্রাম বিহার আর

প্রেম কেলি। রমেরিয়াতে কুমারী কন্যাদের উপর পাহারা একটু ঢিলা হয়ে যায়। এমন কি সাদামাটা মেয়েরাও স্বামী সংগ্রহ করে ফেলে।

বুদ্ধিমান বিদেশী তরুণ তুমি। আর বেশি জানতে চেয়ো না।

॥ ১৯ ॥

মনের গহনে অবগাহন করে রইল রমেন বাকি দিনটুকু।

গোপন প্রেমকে সে বাসনায় রঙিন হয়ে উঠতে দেখল।

শুধু বাসনায় রঙিন নয়, সংসারে নিলীন।

শুধু হৃদয়ের সিংহাসনে নয়, সংসারের সত্যের আসনে।

কিন্তু হায়, কোথায় সেই সংসার, কোথায় সেই সত্য! রামধনুর সেতু দিয়ে পরীরা পারাপার করতে পারে।

রঙ দিয়ে মোহন স্বপ্নের জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। দুদিকের নোয়ানো কোনা দিয়ে অনেক খোঁচা খোঁচা কোনাকে নমনীয়, এমন কি কমনীয় করে নিতে পারে।

তবু, তবু রামধনু তো ভাসে আকাশে। সংসারে নেমে তো আসে না। সত্যের বাস্তবের মাঝখানে আসন পাতে না। আসীন থাকে না।

সেই রামধনু নিয়ে রমেন কোথায় যাবে? হৃদয়ের বাইরে নিয়ে এসে কোথায় বসাবে? তাই তো গোপন প্রেম মনের গহনে সাগর পারের ঢেউয়ের মতো নেচে নেচে আঘাত করে যেতে লাগল। পাড় ভাসিয়ে। পিছুটান জাগিয়ে। কিন্তু বাসা বাঁধতে পারল না।

বাসা অবশ্য বেঁধেছিল একটি জায়গায়। সন্ধ্যার গীতের মতো গীত এখন মনে এল অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরির বিরাট হলে পড়তে ঢুকবার অভিনয়টা অন্তত একটু ক্ষণ সময়ের জন্য হলেও করে যেতে হবে। সেজন্য উঠে পড়বার মুহূর্তে ইসাবেল আর রমেন দেখল যে, যে নিরালা কোণে কফি আর টাপা নিয়ে বসেছিল তার কাচের টেবিলে রাজ্যের ট্রে ওয়েট্রেসরা সাজিয়ে রেখে গেছে।

অর্থাৎ খানিক পরে যখন দলে দলে পড়ুয়ারা কাফেটোরিয়াতে ঢুকে কাউন্টারে খাবার নেবার জন্য দাঁড়াবে তার আগে এখানে এসে প্রত্যেকে একটা করে ট্রে তুলে নেবে।

সেই ট্রে-র বিন্ধ্যাচল চমৎকার একটি আড়াল তৈরি করেছে। নির্জন হলের নিরালা কোনায় এই নিবিড় আড়াল রমেনকে দুঃসাহসী করে তুলল।

আর ইসাবেল? সাহসিনী ইসাবেল তো বার বার নিজেকে প্রকাশ করে তুলেছে।

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।

রমেন মধুর মরণে মরতে উন্মুখ হয়ে উঠল।

সকালে স্টেশনে সকলের সামনে সে যা করতে পারেনি তা পশ্চিম ইয়োরোপে করলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। সে নিজের চোখে দেখেছে আখচার।

কিন্তু স্পেনের রামায়ণে বিবাহ ধূমারুণ লোচনশ্রী না হওয়া পর্যন্ত যে বাল্মীকি কেন, কালিদাস পর্যন্ত হাত-পা বাঁধা অসহায়। হিস্পানি প্রথা অনুসারে বিয়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবার আগে হিসাবে মাপা মন দেওয়া নেওয়ার জন্য অন্ততপক্ষে ছ মাসের মেয়াদ থাকে। তাতে ধাপে ধাপে এগোবার যে ব্যবস্থা তাতে এহেন অনুপান কোথাও নেই। ত্রিশের দশকেও না।

এমন কি বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে ভাবী বধূকে সিনেমায় নিয়ে গেলেও আঁধারে তার হাতটি ধরতে পারো মাত্র তিনটি মিনিট।

ঘড়ি অবশ্য অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায় না। তবু ব্যবস্থার উদ্দেশ্যটা খুবই পরিষ্কার।

মার্টিনোর প্রেয়সী সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠের জানালার গ্রীলের ওপার থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

পেরুর পরিবার অবশ্য অতকিছু রক্ষণশীল নয়। তবু একে হিস্পানি বংশ, তায় খোদ স্পেন দেশ। আবার পুরোনো কর্মভূমি আর পরিচিত সমাজ।

সহসা ভেসে গেল, ভেসে গেল সব হিসাব। সব সমাজের মাপকাঠি। সব সংসারের আঁটাসাটি।

সহসা দুজনেই বাসনাব্যাকুল হয়ে নিবিড় ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মাঝখানের ছোট্ট সরু টেবিলটি কোনও বাধাই দিতে পারল না। নিরুপায় নিশ্চল টেবিল লজ্জায় কাঠ হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। মাঝেতে বহে বিরহ বাহিনী। তাকে অতিক্রম করে রমেন বাঁকা তলোয়ারটি বেলের ব্লাউজে সযত্নে পরিয়ে দিল।

আর, আর সেই বিরহ নদীর দুই পার থেকে দুই চখাচখী ঘন ঘন মিলন চুম্বনে প্রথম গোপন প্রণয়কে ধন্য করে তুলল।

অনুরাগের উত্তাপে ভরা মুখ চোখ নিয়ে বেল আর তার আসন ছেড়ে উঠতে পারল না। অথচ একবার লোক দেখানো ভাবে পড়বার পাবলিক হলে চেহারাটা দেখানো দরকার।

কী জানি যদি কেউ খোঁজ খবর নেয়। ডন যদি ওখান থেকে ফিরে চলে যায়।

দ্রুত নিঃশ্বাস আর বুকের উত্তেজনা একটু সামলিয়ে নিয়ে বেল বলল—রামন, এ আমার কী হল। সমস্তটা দেহে যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। মনে হচ্ছে যেন গায়ের প্রত্যেকটি রোঁয়া-পাখির পালকের মতো ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

নিজেকে ততক্ষণে রমেন সামলিয়ে নিয়েছে।

এখন যে উষায় সে রঙের অরুণ প্লাবন জাগিয়ে তুলেছে তাকে সামলানো তারই দায়িত্ব।

কিন্তু কথা দিয়ে বুঝিয়ে কী করে সে পালাবে তা জানে না। দুই অনভিজ্ঞের ব্যাপার তো। মুখে হঠাৎ কথা জোগাল না।

সে গুন গুন করতে শুরু করল।

পরে বলল।—শোন, তুমি আমায় একদিন মাদ্রিদ ইউনিভার্সিটির পথচারী গাইয়ে ছাত্র টিউনাদের দল দেখাতে চেয়েছিলে। সেই টিউনাতে আমি যে গানের সুর দিয়েছিলাম সেটা শোন। তোমার গীটারে তুলে পাশের ঘব থেকে আমায় শুনিয়ো কিন্তু। আমার একান্ত নিজস্ব হুইস্পারিং টিউন। কানে কানে শোনার সুর। শুধু আমার মন থেকে তোমার কানে।

দি টিউনা গীটারে ভারতীয় গানের সুর। বাসনার বর্ষা শরতের স্রোতের মতো মন্থর হয়ে এল।

রমেন গুন গুন করতে লাগল। লাইব্রেরির বা কলেজের রিফেক্টরিতে লন্ডনে তো মাঝে মাঝে বেলা এগারোটাতেই গান, বাজন' এমনকি নাচের আসর বসে যায়। যারা পড়তে চাও তারা ক্লাসরুমে বা লাইব্রেরিতে কেটে পড়। আমাদের কিল জয় অর্থাৎ আনন্দ বিতাড়ন হয়ো না। মোদ্দা কথা।

তবে মাদ্রিদে আর দোষ কী?

বরং ওরা ভেবে নিক যে এই লন্ডনের ছাত্র মাদ্রিদে সবচেয়ে আধুনিক হালচাল আমদানি করছে। যদি অবশ্য ভাববার বা কথা তুলবার কোনও লোক এখন হাজির হয়।

সে গুন গুন করে গাইল :

"মোর ঘুম ঘোরে কে এলে মনোহর
শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর আবেশে বিকশিল তনু
নীপ সম নিরুপম, মনোরম।"

মনোরম কথাটি সে ভাবের আবেগে বদলিয়ে নিল। গাইল প্রিয়তম। প্রিয়তম। ওগো, তুমিই তো আমায় স্বীকার করে নিয়েছ।

ভিনদেশী প্রিয়তম! নয়ন দিয়েই তো প্রেমের শুরু। হিস্পানি কানে এই সুরের ছন্দময় দোলা মায়াজাল বিস্তার করে যাবে। রমেন তার থিসিস লিখবার সময় মনে মনে এই সম্ভাবনা ভেবে দেখেছিল। যদি না-ও দেখত, এই মোহমদির স্বপ্নসুন্দর গান ছাড়া আর কোন্ গান সে উষাকে শোনাতে পারত? এই ঘুমঘোরে চুপে চুপে নয়ন চুমে যাওয়ার নিমেষে?

গজলের সুরের উষ্ণ মুরিশ আবেশ আর আকুতি সমস্ত আরব্য রজনীব রোমাঞ্চ নিয়ে বেলের তনু মন আবার কদমকেশরের মতো বিকশিত করে দিল।

রমেনের মনেও জাগল তার সংবেদন।

তবু সে ভাবল যে এবার এই গানের কথাগুলি অনুবাদ—গদ্যে অনুবাদ করে দিলে হয়তো বেলের মতো রোমাঞ্চ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

অনুবাদের আগে সে বলল—জানো, উষা, আমার জীবনে প্রথম যখন চাইতে শিখলাম, আমার চোখ দেখেছিল একটি কদম গাছ। তার নারাঙ্গির মতো রঙ আর ইয়োরোপসুলভ মৃদু সুরভি আমার সমস্ত কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এখন তার কারণটা বুঝতে পারছি। একই জীবনে প্রেম আর পূজাকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দেয় বলে।

হেসে বেল মাথা নাড়ল—তুমি রামন জন্ম থেকেই রোম্যান্টিক। তাই বোধ হয় তোমার নাম রেখেছিল রামন।

খুশি হয়ে রমেন বলল—আরে আমাদের ধর্মই যে রোম্যান্টিক। প্রেমিক ভাবে ভগবানকে ভজনা করা এক বোধ হয় হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মেই করা হয়েছে। আর সেই ধর্মের রূপকথাতে, ভগবানের রূপ বর্ণনাতে কদম ফুল হচ্ছে প্রেমের ফুল। প্রেমের স্পর্শে তাই দেহের অণু-পরমাণুতে যে রোমাঞ্চ জাগে তা ওই কদম ফুলের কেশরের মতো আবেশে বিকশিত হয়ে ওঠে। তোমাদের ফুল তো 'থিস ডাউনের' পালকের মতো হালকা, নারাঙ্গির মতো রঙিন, কমলা কলির মতো সুরভিত। প্রেমের গানে গানে নন্দিত। আজ তোমার আর আমার দেহে মনে সেই কদম ফুলের জাগরণ হয়েছে। শিহরণ হয়েছে। আমাদের দুজনেরই দেহ আর মন এরপর আর কখনও আঁধারে ফুলের মতো মুদে যাবে না।

মৃদু হেসে বেল মাথা নাড়ল। আনন্দে না বেদনায় কে জানে।

সে বলল—সবই তো বুঝলাম, রামন। এখন এই জাগরণকে গোপন করি কী করে? লুকোই কোথায়? আর তা না করতে পারলে কে জানে হয়তো শিগগিরি তোমাকেই হারাতে হবে।

দৃঢ়স্বরে রমেন প্রতিবাদ করল—না, আমাকে হারাতে হবে না। আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যাব না। তোমার প্রেম হারাব না। তুমিও আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। তোমার শপথ।

তোমার শপথ, রামন। আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না। তোমাকে জেনেছি। সেই জানা-ই আমার পরম পাওয়া।

বলতে বলতে বেল ব্যস্ত হয়ে উঠল—আরে ডন যে এসে পড়ছে মনে হচ্ছে। দূরে মনে হচ্ছে ও-ই আসছে। অমি চললাম। বাইরের ড্রাইভে ওকে ধরব। তারপর অন্য দিকে নিয়ে যাব। দশ মিনিট পরে তুমি রেল স্টেশনে গিয়ে তোমার মাল ক্লোকরুম থেকে নিয়ে চলে যেয়ো।

প্রায় দৌড়তে শুরু করেছে এমন সময় সে পিছু ফিরে বলে গেল—আর আজ রাতে ডিনারের পর হোটেলের লাউঞ্জে আমাদের সকলের সঙ্গে একত্র বসে গল্প কোরো। সবটা যেন স্বাভাবিক থাকে। তাতে আমাকেও স্বাভাবিক হতে সাহায্য করবে। আচ্ছা, আদিয়স, আদিয়স, রামন।

সেভিলের হোলি উইকের রিপোর্ট রমেন সেখান থেকেই তৈরি করে ইংলন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফেরিয়া সম্বন্ধে রিপোর্টও অনেকটা তৈরি ছিল। ইউনিভার্সিটিতে তার খুপরিতে বসে সেটা সম্পূর্ণ করে নিল। গুটিকয়েক চিঠি লিখল। তারপর রিফেক্টরিতে ডিনার খেয়ে রাত দশটায় হোটেলে ফিরে এল।

রিবেরা পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। সংসারে হিসাবের বাইরের বিশেষ কারণটা তো উষা পরিষ্কার ভাবে বলে গিয়েছিল অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরিতে।

হোটেলের লাউঞ্জের একটি বিশেষ সুসজ্জিত কোনায় রিবেরা পরিবারের চারজনেই বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে গল্প করছিল।

রমেন দূর থেকেই এক নজরে বুঝতে পেরেছিল যে তাদের মধ্যে একজন এমন কোণে চেয়ারে বসেছে যাতে ডবল ঘুরপাক খাওয়া কাচের ছয় পাল্লার বিরাট দরজা দিয়ে কারা যাতায়াত করছে তা দেখতে পাওয়া যায়।

সেই একজনের দৃষ্টিতে আছে চকিত চাহনির চোরা চঞ্চলতা। মনে না জানি কোন্ চমকিত আনন্দের অশান্ত ঢেউগুলিকে ঢাকার প্রয়াস।

তার চোখের অরুণিমা মাইকেল এঞ্জেলোর চোখকে মনে করিয়ে দেয়। সেকথা রমেন তাকে বলেওছে কয়েকবার। আজ কি সেই অরুণিমা চোখ ছাপিয়ে এসে মুখে ফুটে রয়েছে? তরুণী উষার দুটি গালে অরুণ উচ্ছ্বাস?

রমেনের হাতের সুন্দর পোর্টফোলিয়ো ব্যাগটা ছিল বিলেতের সেই পত্রিকার উপহার। তাদেরই নাম তার উপর সোনালি অক্ষরে আঁকা। উপহারের মধ্যে দিয়ে প্রচারও হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধির আভিজাত্যও প্রমাণ হয়ে থাকছে...। নিছক ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র তো এমন একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে চলাফেরা করার মতো রেস্ত পাবে না।

আজ সন্ধ্যায়, থুড়ি রাতে সেই ব্যাগটা থেকে রিপোর্ট আর রেফারেন্স বইয়ের বদলে কয়েকটি সুন্দর মোড়ক বের হল।

প্রাথমিক শুভ সম্ভাষণ আর হাতে হাত মেলানোর পরে অবশ্য।

বাপ-মায়ের সামনে, পরিচিত পরিবারের গণ্ডির মধ্যে, নিজেদের সাময়িক নিবাসের খোলামেলা পাবলিক রুমে কুমারীর হাতটি তুলে নিয়ে করমর্দন করতে বাধা নেই। আর যাই হোক, বহু দেশের ডিপ্লোম্যাটিক সার্কলে ওরা ঘুরেছে—

তবু ফ্রান্স তো নয়। না হলে রমেন সামনে মাথা বেশ অনেকখানি ঝুঁকিয়ে শ্রীমতী রিবেরার হাতটি তুলে ধরে একটু চুমু খেয়ে নিত। নিমেষের আবেশ ফুরোবার আগেই বেলের হাতেও—না, না, শুধু তার হৃদয়ে একটি গোপন স্বাক্ষর মুদ্রিত করে দিত।

কিন্তু এটা স্পেন।

এবং ওরে সাবধানী পথিক, তোমার গোপন স্বাক্ষরের প্রকাশ্য...

রমেন কথাটা ঠিকমতো মনেই করতে পারল না। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সকলের সঙ্গে শুধু হ্যান্ডশেক করে শুভ সম্ভাষণ করল।

মহিলাদের বেলা একটু সামান্য কাছে এসে। কাছে ঝুঁকে এসে। সবার কনিষ্ঠা যে, তাকে অবশ্য সবার পরে।

এবং সবার চেয়ে অন্তর দিয়ে। একটি হৃদয় আরেকটি হৃদয়কে বুঝে নিতে ভুল করল না। আরক্ত দুটি অন্তর।

কুশল প্রশ্ন প্রভৃতি মামুলি কথাবার্তার পরে রমেন একটু সংকোচ, একটু সম্ভ্রম দেখিয়ে সেভিল থেকে আনা রিকুয়ের্দো অর্থাৎ প্রীতি ও স্মৃতির চিহ্নগুলি ওদের উপহার দিল।

ঝকমক করে ধাতুর উপর মিনার কাজ করা জিনিসগুলি ঘরের কোনাকে উজ্জ্বল করে তুলল। হাসিখুশি ভাব সকলেই প্রকাশ করল। এবং শুধু মামুলি ধন্যবাদ আর রমেনের রুচির প্রশংসা দিয়েই তা শেষ হল না।

শুধু শ্রীমতী রিবেরা মৃদু প্রতিবাদ করলেন—তুমি এখনও শুধু ছাত্র, কেন তুমি আমাদের জন্য খরচ করে এসব কিনতে গেলে?

রমেন পালটা শোনাল—বা রে, রমেনের বদলে ডন যদি সেভিলে যেত উৎসবের সময়, বিশেষ করে একটা পারিশ্রমিক সমেত কাজ পেয়ে, তাকে কি আপনি বাধা দিতে পারতেন?

রিবেরা-পত্নী বললেন—কিন্তু তুমি কত দূর দেশ থেকে আসছ। কত অজানা খরচের ধাক্কায় পড়তে পারো। তোমায় তো হিসাব করে আর পকেটে কিছু রিজার্ভ রেখেই চলতে হবে।

রমেন অবশ্য হিসাবের ধার কাছ দিয়েও যেতে চায় না। নানা দিকে ওরা রমেনের যা খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছেন তার তুলনায় সে আর এমন কী খরচ করেছে।

তাছাড়া উষার মতো অমূল্য সম্পদ, স্বর্গের স্বপ্নভরা সম্পদ যেখান থেকে সে পাচ্ছে তাদের জন্য যে সমস্তটা মর্ত্যই উজাড় করে ঢেলে দেওয়া চলে।

সে তাই মূল্যের দিক থেকে অমূল্যের দিকে সবার দৃষ্টি ফেরাতে চাইল।

পেপে সেভিলের ক্যাথিড্রালের মাথার জিরাল্ডা নামক দর্শনীয় চূড়ার চেহারা একটি টাইপিন পেয়ে মহাখুশি। তাড়াতাড়ি দামি মেজরিকা মুক্তার টাইপিন খুলে নিয়ে রমেনের উপহার পরে নিলেন।

তিনি খুব উচ্ছ্বসিত ভাবে বললেন—ঠিক এই জিনিসটি তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন কিনতে। এটির কল্যাণে সারা পৃথিবীর লোকই জানতে পারবে যে তিনি সেভিলের সমঝদার।

শ্রীমতী রিবেরা কমলা গুচ্ছের মতো দেখতে ব্রুচটি পেয়ে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে শুধু সেভিলের নয়, সমস্ত আন্দালুসিয় অঞ্চলের সৌরভ তিনি মনে মনে আঘ্রাণ করবেন এটি পরে।

ডন তার ব্যালেরিনা নর্তকীর ভঙ্গিমাময় কাফ লিংক দুটি পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়ল। ফ্ল্যামেংকো নাচের দুয়েকটা তরঙ্গ নেচে সে গেয়ে উঠল সব চেয়ে বিখ্যাত ফ্ল্যামেংকো গান।

পেটেনারা, ওগো ইহুদি রূপসী।

তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

আর বেল?

সবার শেষে বেলও বাদ গেল না। কিন্তু এই নতুন উপহার উপস্থিত হল সহসা বিস্ময়ের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে। একটি ছোট গীটারের পিনওলা পেন্ডান্ট। বুকের ব্লাউজ বা কোট থেকে ঝুলবে। হৃদয়ের সব অনাহত সংগীত একজনের কানে কানে শোনাবার জন্য।

সহসা বিস্ময়েরই কথা।

কারণ সে দিনই সকালে অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরির গোপন কোনায় রমেন বেলের ব্লাউজে সেভিলের স্মৃতিচিহ্ন মিনার কাজ করা তরোয়ালটি নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল।

এই একটি জিনিসই সে প্রথমে কিনেছিল। যাযাবরী যখন হাত দেখে ভবিষ্যৎ গণনার সময় প্রশ্ন করেছিল যে তলোয়ার কেন কিনলে, বরং একটি গীটার কিনতে পারতে তখন রমেন এ সম্বন্ধে আরও চিন্তা করেছিল।

তখন রমেন ভেবেছিল যে রিবেরাদের সকলের জন্যই কিছু না কিছু উপহার নিয়ে যাওয়া দরকার। স্বাভাবিক দেখাবে।

তবে তলোয়ারটি ওর একেবারে নিজস্ব চিন্তা আর পছন্দের ফল। মধ্য যুগের গ্যালান্ট নাইটের মতো সে তার প্রেয়সীকে এটি উপহার দিল। শুধু মাল্য বিনিময়েই হৃদয় বিনিময় হয় না। তাকে রক্ষা করতে হয়. তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় বীর্য দিয়ে।

তরবারি হচ্ছে নারীর কাছে একেশ্বর প্রেমের প্রতীক।

আর পুরুষের কাছে তার পৌরুষের স্বাক্ষর।

সেই তরবারি সে উষার ব্লাউজে যখন গোপনে পরিয়ে দিয়েছিল তখন তার হাত দুটি এত সপ্রেমে সন্তর্পণে লীলাভরে ব্যবহার করেছিল যেন কোনও চঞ্চল অশালীনতা তার স্পর্শকে মলিন করে না তোলে।

প্রথম প্রিয় পরশে পুলকিত তনুতে তনুতে অনুতে অণুতে অসহ শিহরণ অনুভব করেও বেল নিজকে সংবরণ করে নিয়ে ছিল কোনও রকমে।

পূর্ণিমার রাতে সাগরের জোয়ারকে বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করে রাখার চেষ্টার মতো।

শেষ পর্যন্ত সে জোয়ার কূল ছাপিয়ে চুম্বনে চুম্বনে বেলের তৃষ্ণার্ত মুখের বেলাভূমিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বেল এখন পরিষ্কার বুঝতে পারল এই দ্বিতীয় দফা উপহারের উদ্দেশ্য।

বাহিরে ঝংকৃত হোক গীটারের গুঞ্জন।

অন্তরে অতন্দ্র প্রহরী থাকুক গোপন তরবারি। শর্ট কোট বা ওভার কোট এমন কি ম্যান্টিলার আড়ালে।

গোপন প্রেমের অন্তর্লীন মাধুরী।

ডন কিন্তু অনেক কিছুই বুঝেছিল। যা নজরের বাইরে ছিল, নয়নে পড়েনি—মন দিয়ে তারও অনুমান করে নিচ্ছিল।

পুরোপুরি হিস্পানি হলে ডনের মাথায় এতেই রক্ত চড়ে যেত। হয়তো হঠাৎ কোনও হঠকারিতাও করে বসতে পারত। কিন্তু তাতে বেলের সম্বন্ধে নীচ বা সংকীর্ণ মনের রসিক লোকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হত।

বাবা-মাকে সে এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে দিতে পারত। অবশ্য বাবা মা পশ্চিমের অনেক দেশের রাজকার্য করে স্বাধীন সমাজের ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার মর্যাদা দেখেছেন। তারা সেই স্বাধীনতার অঙ্কুরটুকুও যদি নিজেদের মেয়ের বেলা বরদাস্ত না করতে চান তাহলে বেলের প্রতি হয়তো অবিচার হবে।

তাছাড়া বেল বা রমেন দুজনেই একেবারে নিষ্পাপ নিরীহ। যাকে বলে কিশোর কিশোরী। আচারে আচরণে এমনকি আলাপে হাসি ঠাট্টায় পর্যন্ত কখনও শালীনতার মাত্রা ছাড়ায়নি। কী করে বড় ভাই বোনের সম্বন্ধে এমন একটা কথা তুলতে পারে যাতে তার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার মনে হবে।

সবার উপরে একথা ঠিক যে রামন শীঘ্রই দূর দেশ ইংলাটারেতে ফিরে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত গেলে রামধনুর রঙ আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়।

তার আগে নির্দোষ আনন্দে ভালো লাগার একটু রঙের ছোপ যদি কয়েক দিনের মায়া বুলিয়ে যায় তাতে সে নব যুবক হয়ে নিজে বাধ সাধবে কোন্ সুবাদে?

ভেডাসই—(এবং) বিভেকানন্ডোর দেশের এবং ধর্মের তরুণ এই রমেন। একটাই ল্যাটিন বংশের কিশোরীর প্রথম জেগে ওঠার সাথী হিসাবে রমেন অনেক বেশি নিরাপদ।

তরুণ তুর্কিমার্কা কোনও হিস্পানি কাবাল্যেরো বেলকে আকৃষ্ট করতে পারলে কামনার রক্তরাঙা কোন্ পথে আনাগোনা শুরু হত তা কে জানে।

তখন অবশ্যই বাবা-মাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

হয়তো নিজে সে ব্যাপারে নাক গলাতে বাধ্য হত। স্পেনের লোক নয়। তবু হিস্পানি সমাজ তো বটে! ক্যাথলিক ধর্ম তো বটে।

কিন্তু বড় ভাই যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, নজর রাখছে একটু হুশিয়ারি বোনকে সমঝিয়ে দেওয়া ভালো।

তবে এমন ভাবে দিতে হবে যাতে শালীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতা একটুও না ক্ষুণ্ণ হয়। মেয়েরা আবার এ যুগে নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বড়ই সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পশ্চিম সমাজে নারীবিপ্লব এল বলে।

এই হিস্পানি নারীদের সামনের লোহার 'রেহা' বেড়াজাল যতই লতাপাতার কারুকার্য ভরা হোক না কেন, বেড়াটা যে লোহার, ফুলের মালার নয়, তা ওরা চিরকালই জানে। গীর্জার শাসন আর সমাজের পাষাণ দুই ই এক সঙ্গে ভেসে যাবার দিন এল বলে।

আশ্চর্য!

গীর্জার কথাই ডনকে খেই ধরিয়ে দিল।

আজ সকালে ও প্রাদোর নগ্ন চিত্রগুলির শিল্পরস উপভোগ করতে করতে ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী কর্‌রেজিয়োর ছবিগুলির ঘরে এসে পড়েছিল। সেখানে একটি ধর্মমূলক ছবির মাধুরী দেখে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এত অভিভূত যে বোনকে আনবার জন্য লাইব্রেরিতে যেতেও দেরি হয়ে গেল।

নলি মে তাংজেরে।

ছুঁয়ো না আমায়।

ডন এখন খুব উৎসাহ দেখিয়ে সেই ছবিটির কথা তুলল।

হঠাৎ এই বিষয়টি পাড়বার কোনও আপাত কারণ ছিল না। তবু সে বলল—রমেন আমাদের সবাইকে সেভিল থেকে আনা উপহার দিয়েছে। আমি এখন তার প্রতিদানে ওকে আমার একটি আবিষ্কারের কাহিনি উপহার দিচ্ছি। স্পেন সম্বন্ধে ওর থিসিসে আশা করি এই গল্পের ছবিটি একটা বিশেষ স্থান পাবে।

মা হেসে বাধা দিলেন—স্মৃতি চিহ্নের প্রতিদানে শুধু কাহিনি।

রমেনের দিকে তাকিয়ে ডন বলল—হ্যাঁ, এটাও একটা স্মৃতিচিহ্ন বলতে পারো। চিরকাল ধরে মনে রাখার মতো।

রমেন উৎসাহ দিল—বলো, বলে ফেলো ডন। আমিও তো কাহিনি-ই শুনতে চাই—ঘটনা জানতে চাই। তা-ই মনে রাখবার মতো ধন। চাই কি, আমার থিসিসে ঢুকিয়ে দেব।

বেশ একটু জাঁকিয়ে বসে উৎসাহে দম দিয়ে ডন শুরু করল।

নলি মে তাংজেরে হচ্ছে একটা আশ্চর্য ধরনের অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর পেন্টিং। পরে গাইড বুক পড়ে জানলাম যে এটি হচ্ছে সুপ্রিম রিলিজিয়াস পেন্টিং।

দুষ্টুমি ভরা হাসি দিয়ে বেল দাদাকে আঘাত করল—ধর্মমূলক চিত্রে তোমার ভক্তি আছে বলে তো কোনও দিন মনে হয়নি। আজ যে বড় ভক্তি একেবারে আসক্তির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কী দাদা?

ভাই বোনে একটা ছন্দমধুর আলাপ শুরু হবে মনে করে বাপ মা খুব উৎসুক হয়ে উঠলেন। ছেলে মেয়েদের স্বাধীন চিন্তার উৎসাহ দেওয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পৃথিবীর রীতি।

একটা আবিষ্কার, বেল। একটা আশ্চর্য আবিষ্কার। পৌরাণিক ভক্তিমূলক ছবি। মাগডালার মেরি আর যীশু খ্রিস্ট। কিন্তু একেবারে ইহলোকের রসে জারিয়ে নেওয়া ছবি। মডলিন মেরি তখনও সামান্য নারী। তোমার ভাষাতেই বলছি বেল, ভক্তি নয়, আসক্তিতে বিভোর। সে ঝলমলে ব্রোকেডের পোশাকে মোহিনী

তিলোত্তমা সেজে গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মতো মনোহর খ্রিস্টকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যাচ্ছে। নারীর অন্তরঙ্গতা, ইন্দ্রিয় সচেতন রূপরাশি রঙে রঙে যেন গীতি কবিতার মতো ফুটে উঠেছে। কামিনী যে কত কামনীয়া, কমনীয়া হতে পারে তার পরম প্রকাশ।

পেপে গৃহিণীর কানে কানে বললেন—ডনও যে কবি হয়ে উঠেছে। দেখছি। কী ব্যাপার বলতো?

কিন্তু ডন বাপ মায়ের দিকে নজরই দিল না। শুধু মাঝে মাঝে বোনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত।

—আশ্চর্য। যতদূর পর্যন্ত এগোলে ধার্মিকের চেতনায় আঘাত না লাগে ঠিক ততখানি পর্যন্ত শিল্পী এই দুটি মূর্তিকে মানব মানবীর মাধুরী মিশিয়ে এঁকেছেন। মডলিন মদালসা, আবেশে বিহ্বল, আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলা। অন্যদিকে ডান হাত সামনে ছড়িয়ে যীশু। মখমলের মতো নরম নীল আকাশের পটভূমিকায় বনভূমি আলো করে দাঁড়িয়ে বলছেন তিনি।

ছুঁয়ো না আমায়।

বাণবিদ্ধ হরিণী অন্তরে অন্তরে ছটফট করে উঠল।

ওই ছবির আকাশ ছিল বাসনার রঙে নীল। কিন্তু হরিণীর হিয়া যে বেদনার রঙে নীল হয়ে উঠল।

অথচ তাকে অ্যাপেলোর পরম প্রশান্তি দেখিয়ে নারীর সুকুমার সূক্ষ্ম অনুভবকে ঢেকে রাখতে হবে।

ঢেকে রাখতে হবে রমেনকেও।

শুধু সে প্রাণ ধরে তাকে বলতে পারবে না—নলি মে তাংজেরে। রক্তরাগ যে ফুটেছে শুধু মুখে নয়, দেহে মনে।

ডনের বর্ণনা শেষ হতে না হতেই বেল উঠে পড়ল। দাদাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল। সবাইকে জানাল শুভ রাত্রি।

কারণ দেখাল—গীটারের রেওয়াজ। রাত হয়ে যাচ্ছে। হোটেলের বাসিন্দারা ঘুমাতে যাবার আগেই গীটার বাজানো শেষ করতে হবে।

শুধু রমেন মনে মনে ভাবতে লাগল—উষা সম্ভবত আজই এই গজলের সুরটা গীটারে তুলবার চেষ্টা করবে।

"মোর আবেশে বিকশিত তনু
নীপ সম, প্রিয়তম।"

॥ ২০ ॥

ঘুমঘোরে এলে মনোহর।

মনোহরিণীর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকানো সম্ভব ছিল না। শোভনও হত না। গোপন প্রেমের আড়ালটুকু বজায় রাখতেই হবে। কিন্তু মনের কাছে তো কিছুই গোপন নয়। তাই রমেনের মনের গোপনতায় এই গানের কলিটুকু উঁকি মেরেছিল। ঘুমের মতো মায়ার মধ্য দিয়ে। হঠাৎ ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ডন যে এ কাহিনিটা বলল, এত রসিয়ে, এত ফেনিয়ে তার ভিতরের কারণটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঠিক। ঠিক বুঝতে পেরেছি। সেদিন প্রাদো মিউজিয়ামে ডন যে আমাদের দুজনকে বড় ভালো মানুষের মতো লিলি সায়রের পাশে গোলাপ বাগিচায় এক সঙ্গে বেড়াতে যেতে দিয়েছিল সে তো শুধু নিজে একা একা নগ্ন চিত্রগুলি দেখবে বলে নয়। আরও কিছু হয়তো ছিল।

সে নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করেছিল। অথচ প্রথম, একেবারে প্রথম অবস্থা বলে কোনও বাধা দেয়নি। হয়তো নিঃসঙ্গ বোনের প্রতি একটু সহানুভূতিও হয়েছিল। আর যাই হোক, পশ্চিম পৃথিবীর সমাজ তো।

কিন্তু এখন যেন এই ছবির কাহিনির মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। একটা তীর ছোঁড়া হয়েছে বোনের দিকে।

তা নাহলে উষা হঠাৎ গীটার অভ্যাসের কারণ দেখিয়ে উঠে গেল কেন? সে-ই তো লাইব্রেরিতে ওকে একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই সময়টা কাটাবার কথা বলেছিল যাতে নিজেও স্বাভাবিক বোধ করতে পারে।

স্বাভাবিক ভাব দেখানোই এখন বড় কথা। নিজেকেও স্বাভাবিক ভাব দেখাতে হবে। ভবিষ্যতের অন্ধকারের দিকে তাকানোর সময় নেই। সে রকম আলোর রেখাও নেই। বর্তমানটুকুকে টিকিয়ে রাখতে হবে

অন্তত। উষা যে উঠে চলে গেল তাও তো এই বর্তমানটুকুর জন্যেই।

অতএব বেল যে উঠে গেছে তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু কারণ নেই এ হেন ভাব দেখিয়ে সে ডনকে বলল তুমি তো এই ছবিটাকে সুপ্রিম রিলিজিয়াস পেন্টিং বলে বর্ণনা করে বসলে। কিন্তু ম্যুরিলোর ব্লেসেড ভার্জিনের ছবিটি দেখেছ কি?

ডন হার মেনে বলল—না, দেখিনি। নাম শুনেছি অবশ্য। এমন করুণাধারা নাকি অন্য কারও চোখে নেই।

নিমেষে রমেন এই "ছুঁয়ো না আমায়" ছবিটির প্রভাব থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে পেল।

সে হেসে বলল—ডন, তোমার মতো চিত্র রসিকের কর্তব্য হচ্ছে এখনই সেভিলে চলে যাওয়া। একটি মাস সেই ছবিটি অধ্যয়ন করা। মেরি মাতার করুণায় তোমারও দিব্যদৃষ্টি হবে।

এমন ভাবে রমেন এই দিব্য দৃষ্টি কথাটা বলল যে বাপ-মাও হেসে আকুল।

শ্রীমতী রিবেরা রাতের ডিনারের পর ওয়াইনের উত্তাপে একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি বললেন—কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে ডন ওখানে গেলে প্রথম দিনই করুণা লাভ করবে। আর দিব্য দৃষ্টি নিয়ে জিপসিদের কাছে ভবিষ্যৎ গণনার জন্য ছোটাছুটি শুরু করবে। ওর ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস পরীক্ষার ফল কী হবে তার জন্য ও ছটফট করে বেড়াচ্ছে কিনা। আরও মাস দুই দেরি আছে। কিন্তু দুদিনও তর সইছে না।

ভবিষ্যৎ জীবিকার কথা ওঠাতে ডন জিপসিদের সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাল।

রমেন বেঁচে গেল।

এখন বেলের উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে। ডনও আর এ নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবে না। এবং সে নিজে ভারতীয় বলে বেশ ওয়াকিবহাল ভাব দেখিয়ে ওদের মনোযোগ এ দিকে টেনে রাখতে পারবে।

পেপে জিপসিদের কথা ওঠাতে তার ওয়াইন গ্লাসটি সরিয়ে রাখলেন।

একটু প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্য নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন—এ সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু বলবার আছে। আমি স্পেনে পোস্টেড হবার পর আমার দেশের গভর্নমেন্ট আমায় এ সম্বন্ধে স্টাডি করে নোট পাঠাতে বলেছিল। কারণ পেরুতে তখন বিরাট একটা স্প্যানিশ জিপসির দল হাজির হয়েছিল আর উৎপাত করছিল।

রমেন এইটেই চাইছিল। বয়োজ্যেষ্ঠ পেপে মুখ খুলুন। সবাই ওর কথা শুনবে। শুনতে শুনতে ডন পর্যন্ত বেল আর রমেনের ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবে।

রমেন যেন ডনের পক্ষ নিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলল—কই সেভিলে তো কোনও উৎপাত দেখলাম না। উৎসবেই তো ওরা মেতে ছিল। বরং মনে হল যে ক্ষণকালের জন্য আনন্দ দিতে গান বাজনায় মন মাতিয়ে দিতে ওরা ওস্তাদ।

পেপে হাত নেড়ে রমেনের ওকালতিটা যেন এক পাশে সরিয়ে দিলেন। বললেন—ডনের বয়সি ছেলে-মেয়েরা বড্ড ভুল করে। মনে করে যাযাবর মানে হচ্ছে বাঁধনছেঁড়া অথচ পাওয়ার অতীত, অসম্ভব একটা রোম্যান্টিক স্বপ্ন। প্যাশনেট জীবন-যাত্রার জন্য উঠতি বাসনা। উদ্দেশ্যহীন সার্থকতাহীন 'গুড ফর নাথিং' ভাবে একটা সন্দেহজনক অতএব রহস্যময় জীবনযাত্রা।

শ্রীমতী রিবেরা হেসে কর্তার গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিয়ে বললেন—যথেষ্ট হয়েছে, পেপে। এবার বরং আমরা রামনকে এ সম্বন্ধে বলবার সুযোগ দিই। ও তো প্রাচ্য দেশের সব জ্ঞান আর রহস্য এমন কি জিপসি জীবনের উৎসের দেশ থেকে আসছে।

রমেন এই সুযোগটিই চাইছিল।

দেরি না করে সে শুরু করল—ডন অবশ্য প্রধানত তার ভবিষ্যৎ কেরিয়ারের খবর নেবার জন্যই তাদের সম্বন্ধে আকৃষ্ট হবে।

ডন এ হেন ঠাট্টায় রুষ্ট হয়ে বলল—বেশ তো, ওদের কাছে যাব না। তুমিই আমার হাত দেখে বল না কেন?

রমেন কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে না দেখে মাকে উদ্দেশ্য করে ডন বলল—দেখছ মাদ্রে, রামন শুধু

মেয়েদের হাত দেখে। এই কথা থেকে অন্য কোনও কথা বা চিন্তা এসে পড়তে পারে তা ভেবে নিয়ে রমেন প্রাণপণে কথা ঘোরাল—না, না ডন, হাত দেখাটা ইন্ডিয়ার বিশেষত্ব নয়। আমাদের জ্যোতিষীরা কুষ্ঠী দেখে। জিপসিরা দেখে হাত। দাও তোমার কুষ্ঠীখানা একবার।

সে জ্যোতিষের ধার কাছে দিয়েও যায় না। কিন্তু কথা ঘোরানোর কথায় কাজ হল।

জিপসিদের সম্বন্ধে পেপে সরকারি কারণে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সেটুকু এই দুই বালককে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

না হলে, এরা হয়তো কোনও মায়াবিনী জিপসি সুন্দরীর পাল্লায় পড়বে।

তিনি বললেন—আমরা নিজেদের দুশ্চিন্তাকে দমন করতে পারি না বলেই ভাগ্য গণনা করাতে যাই। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। বরং ভবিষ্যৎবাণীর জন্য সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা বেড়ে বেড়ে চলে। আমি তো দেখেছি যে লোকে তাদের আশা নয়, ভয় ভাবনাগুলিই গণৎকারের কাছে তুলে ধরে। সেগুলিরই সমর্থন চায়। এই ভাবে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি আর কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

শ্রীমতী একটু অধীর হয়ে উঠলেন—তুমি বড় দার্শনিক হয়ে উঠেছ দেখছি। আজ আর তুমি ঘুমোতে পারবে না।

লজ্জিত হয়ে পেপে বললে—আমি শুধু একটি দার্শনিক কথা বলেই চুপ করব। ভবিষ্যতের জন্য ভয় ভাবনা অন্তরকে দরিদ্র করে ফেলে। কিন্তু দুঃখকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা মনকে ঐশ্বর্য এনে দিতে পারে।

রমেন একটু বিজ্ঞতা দেখাবার লোভ সামলাতে পারল না।

সে বলল—পেপে, আমরা নিজেরাই তো মনের দুঃখগুলির আভাস গণৎকারকে জানিয়ে দিই। তারা তাই থেকে সব কিছু ধরে ফেলে। সে অনুসারে ভবিষ্যৎবাণী করে। ওদের ভাষায় আছে—বি কাস্টেসকো মেরেল-ই-আগ অর্থাৎ জ্বালানী কাঠ না থাকলে আগুন থাকে না। কাজেই ওরা বেশ বুঝে নেয় মানুষ কী চায়। তবু আমরা সেই আগুনের আলোয় নিজেদের ভাগ্যকে দেখে নিতে চাই।

পেপে বললেন—তবে মনে কোরো না যে আমি ডনকে বারণ করছি বেদেদের কাছে যেতে। ওদের নাচ গান ওহ্ এমনটি আর হয় না। তবে আমি একটি সত্য গল্প বলছি, শোন।

সবাই তাদের চেয়ারগুলি আরও কাছে টেনে এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। পেপেকে যখন গল্পে পেয়ে বসে তখন তার জুড়ি পাওয়া ভার।

তিনি বললেন—আমি তখন জার্মানিতে। তোমরা জানো যে ভাবগম্ভীর ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের রানী হচ্ছে জার্মানি। অথচ ক্লাসিক্যাল হলেও বীঠোফেন শুবার্ট, হেইডনদের মতো শ্রেষ্ঠ সুরকার জিপসি সংগীতের ভাবধারা গ্রহণ করে নিতে দ্বিধা করতেন না। ও দেশের একটা বড় সংস্কৃতির কেন্দ্র ডারমস্টাট শহরে গিয়ে দেখি যে শহরতলীতে বেদেরা বাসা, মানে তাঁবু গেড়েছে। তাদের মধ্যে একজন বেহালা বাদক বিশেষ ভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খোঁজ নিয়ে দেখলাম সে দি গ্রেট যোহান বাখের বড় ছেলে। নোটর্‌ডামে অর্গান বাজানোর সম্মান ছেড়ে দিয়ে সে এক যাযাবর সংগীতের দলের সঙ্গে সভ্যতা ত্যাগ করে বনে চলে গেল। সবাই ওকে মার্গসংগীত সাধনার জন্য সভ্যতার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্বাধীন স্বেচ্ছা বিচরণের আদিম প্রবৃত্তি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। মুছে দিল সামাজিক সম্মান, ঐশ্বর্যময় অপেরা হাউস, লক্ষ লোকের করতালি।

রমেন স্তম্ভিত হয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে উঠল বাংলায়—যাযাবর না জাদুকর।

ওরা কথাটার মানে জানতে চাইলেন। রমেন অনুবাদ করে বুঝিয়ে বলল।

কেবল বলল না নিজের অভিজ্ঞতার কথা। নিজেরও বেলের সম্বন্ধে রহস্যময় ভবিষ্যৎবাণীর কথা। সে কথা উষাকেও এখানে সে প্রাণ ধরে বলতে পারেনি।

শ্রীমতী রিবেরা শঙ্কিতভাবে রমেনকে বললেন—রামন, তুমি কিন্তু খবরদার ওদের ধারে কাছেও যাবে না।

রমেন হেসে বলল—বা রে, আপনি বরং ডনকে সাবধান করে দিন। এই দেশে কত জিপসি আস্তানা আছে তার হিসাব নেই। সেভিল, বার্সিলোনা, গ্রানাডা সব জায়গাতেই। আর তাদের নাচগান, ছলাকলাও স্প্যানিশ সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্নেহময়ী শ্রীমতী হাসলেন—না, রামন। ভয় আমার তোমার জন্যই। তোমার মধ্যে মাঝেমাঝেই নজর

করি একটা সুদূরের দিকে দৃষ্টি। ইংরেজিতে যাকে বলে ফার অ্যাওয়ে লুক। যা সংসারে স্পৃহাহীন নয়, তবু উদাসীন। সাংসারিক বিবেচনা যার মনে শুধু লিলি ফুলের পাতার উপর জলবিন্দুর মতো টলমল করে। যে কোনও সময় খসে যেতে পারে। কিন্তু বসে থাকবে না।

এবার পেপের পালা।

তিনি গৃহিণীকে বললেন—তুমিও যেন একটু কবি কবি হয়ে উঠেছ। আজ সন্ধ্যায়। এমন মুডে তো তোমায় কখনও দেখিনি।

অপ্রতিভ হলেন শ্রীমতী। মাথা নেড়ে সংক্ষেপে জানালেন যে মুড-টুড কিছু নয়। কদিন রামনকে দেখেননি এবং রামন তো শীঘ্রই কাজ শেষ করে লন্ডনে ফিরে যাবে। তাই একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—এই আর কী।

পেপে বললেন—আমার একটা ভালো প্ল্যান আছে। আচ্ছা রামন, আন্দাজ করে বলতো আর কত দিন তোমার স্পেনের মেয়াদ। তার মধ্যে কটাদিনই বা তুমি মাদ্রিদে থাকবে?

রমেন জানাল যে সে সেভিলের সঙ্গেই দক্ষিণ স্পেনে যা কিছু দেখবার ও করবার তা সেরে নিয়েছে। গ্রানাডা, কর্দোভা, ভ্যালেন্সিয়া। এখন অন্তত এক সপ্তায় ঠায় মাদ্রিদে থাকতে কোনও অসুবিধা হবে না।

মা-ত্র এ-ক স-প্তা-হ।

কথাটা বলতেই রমেনের মন বেদনায় টনটন করে উঠল।

শুরু না হতে হতেই শেষের কথা এসে পড়ল। আগমনী হতে সবে শুরু হয়েছে। বিসর্জনের বিষণ্ণ আহ্বানকে কেন পেপে মনে করিয়ে দিলেন?

অস্ট্রিচ পাখি যে সুখের বালুচরে মুখ লুকিয়ে রেখে বাইরের অকরুণ রিক্ত সংসাবকে ভুলে থাকতে চেয়েছিল।

কিন্তু কথাটা যখন উঠে পড়েছে, তার মোকবিলা করতে হবেই। এবং বাস্তব দৃষ্টিতে। বীরের মতো। উষা যে ওকে কানে কানে বলেছিল মাতাদারের সুইট অব লাইট্স ছাড়াই ওকে সংসারের মুখোমুখি হতে হবে সাহস করে। নির্ভর না করেই নির্ভয় হতে হবে।

পেপে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি সপ্তাহ দুয়েক এখানে থাকতে পারো না? তাহলে...

ডন প্রায় লাফিয়ে উঠল।

সে বোনকে একটু হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। সাবধানবাণী যে বাণের মতো যথাস্থানে বিঁধেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এখন তার প্রতি একটু সদয় হওয়া চলে। বিশেষ করে রামন যখন শীঘ্রই চলে যাচ্ছে নিঃসন্দেহে। ততদিনে বোন নিজেকে সামলিয়ে নেবে।

তাই ডন বলে উঠল—রামন, বাস্তবভঙ্গিতে আমি একটা প্ল্যান দিচ্ছি। তুমি সম্ভবত মাদ্রিদ্‌কেই একটু অবহেলা করে ফেলেছ।

রমেন আশ্চর্য হয়ে গেল—মাদ্রিদকে?

—অবশ্যই, রামন, ভেবে দেখ, নেপোলিয়ন তার ভাই জোসেফকে জোর করে স্পেনের রাজা করে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর লিখেছিলেন যে তিনি নিজে প্যারিসের প্রাসাদে যে ভাবে আছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আরামে আড়ম্বরে ভাই জোসেফ মাদ্রিদের রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠান করছে। ভেবে দেখ...

শ্রীমতী রিবেরা ডনের কথার স্রোতে বাধা দিলেন।

বললেন—এতে ভেবে দেখবার কী আছে? প্যারিসের চেয়ে মাদ্রিদ অনেক বেশি আরামের বিলাসের শহর। অনেক বেশি পুরোনো দিনের মাধুর্যে ভরা। অনেক বেশি রোম্যান্টিক।

এবার ডন বাধা দিল। ওই রোম্যান্টিক কথাটা সে মোটেই পছন্দ করল না। মা তো রামনকে নিয়েই ব্যস্ত। বেলের মুখের দিকে তাকায় না নাকি?

ডন বলল—রোম্যান্সকে চুলোয় যেতে দাও। রাজপ্রাসাদে এসো। এখানকার রাজপ্রাসাদে রমেন একটু মন দিয়ে নজর দিক। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর কার্পেট আছে সেখানে। সেগুলি পেতে রাখলে পরপর লম্বায় পাঁচ মাইল জুড়ে পড়ে থাকবে। রামন তাদের মধ্যে অন্য একটা স্পেনের গন্ধ পাবে। ভার্সাই প্রাসাদ তুলনায় শিশু।

রমেন যেন ভেসে যেতে একটুখানি খড়কুটো অবলম্বন হিসাবে পেয়ে গেল। সে খুব উৎসাহ দেখাল।

ডন বলে চলল—রামন, তুলনা করে নাও শহরতলির রাস্তাগুলির সঙ্গে প্রাসাদের কার্পেট পাতা কক্ষগুলি। আর...

রমেন সঙ্গে সঙ্গে বলল—আর?

—আর ভেবে দেখ, বুদ্ধু রাজা কার্লস চার নম্বর আর তার পরপুরুষদের জন্য পাগল ইটালিয়ান রানী মারিয়া লুইসার কথা। ওরা কিন্তু রাজদরবারের বাঁধা শিল্পী হিসাবে এনে বসল গ্যোইয়াকে। সেই গ্যোইয়া মানবতার মহিমায় উজ্জ্বল তুলি দিয়ে ওই রাজ দম্পতির চরিত্রের বুদ্ধিহীন, শক্তিহীন দুর্বলতার দিকগুলি নির্দয় ভাবে ভাবীকালের জন্য অমর করে তুলে ধরেছেন। ওরা ভেবেও দেখেনি যে শিল্পীর মনকে মাইনে দিয়ে ফরমাইশ দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না।

বাইরে তার পূর্ণ সমর্থন জানাল রমেন।

কিন্তু মনে মনে যোগ করে নিল—একেবারে খাঁটি কথা। ঠিক তেমন করেই প্রেমকে নিষেধ দিয়ে, হুকুম দিয়ে আটকিয়ে রাখা যায় না।

ডন বলে চলল—তুমি ওখানকার স্কার্লেট আর গোল্ড থ্রোন রুমে রাজসিংহাসনের ছাদের সোনায় মোড়া কারুকার্য সম্বন্ধে একটা সোশ্যালিস্টিক ভাষ্য লিখে দাও। আরও বেশি চমকপ্রদ হবে...

রমেন একটু ঠাট্টা করল—ডন, তুমি তোমার ছুটিটা বেশ কাজে লাগিয়েছ দেখা যাচ্ছে।

ডন কোনও বাধা মানল না—আমি যদি তুমি হতাম, তার সঙ্গে জুড়ে দিতাম আগেকার রাজাদের সঙ্গে এখনকার সাধারণ মানুষের অবস্থা আর আরামের ব্যবস্থার তুলনা। ওই রাজপ্রাসাদে একটা ওষুধ বানাবার কারখানা আছে শুধু রাজবংশের জন্য। হরেক রকম বাঁকানো শিশি আর তার চেয়ে বেশি বাঁকা প্রেসক্রিপশন। জ্বর হলে ডাক্তারি বড়ি না খেয়ে পূর্ণিমার রাতে ধরা কোলা ব্যাঙের লিভার মিহি ভাবে চূর্ণ করে খেয়ে নিত রাজারা।

গম্ভীর ভাবে পেপে বললেন—এই রকম বিলাসের অন্ত নেই এই দেশে। এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ওই রাজা চতুর্থ চার্লসের একটা খামার বাড়ি আছে। তার বাথরুমের দেওয়ালগুলি প্ল্যাটিনাম আর সোনায় মোড়া।

শ্রীমতী রিবেরা বললেন—কিন্তু পেপে, তুমি যে রামনকে জিজ্ঞেস করছিলে সে কতদিন মাদ্রিদে থাকতে পারবে।

পেপে লজ্জিত হলেন—সত্যিই তো। আসল কথাটাই ভুলে গেছি। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, রামন, তুমি আরও দুটো সপ্তাহ এখানে থেকে যাও। তারপর আমরা সবাই মোটরে করে সালামাঙ্কায় যাব। ইয়োরোপের সবচেয়ে বনেদি বিশ্ববিদ্যালয়। তুমি নিশ্চয়ই সেখানে যাবে। তাছাড়া মোটরে ঘুরলে পথে পথে গ্রামাঞ্চল আর আসল নির্ভেজাল লোকদের দেখতে পাবে।

রমেন সাগ্রহে জানাল যে তাকে ফেরবার পথে অবশ্যই সালামাঙ্কাতে যেতে হবে।

—তবে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে চল। আমরা খুব খুশি হব। ডন আর বেল সমবয়সি বন্ধু পেয়ে এত খুশি হয়ে আছে। আর এরকম একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বমুখী মনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও আনন্দেরই কথা। তুমি 'না' করতে পারবে না, কিন্তু।

মন বলছে যাব। বিবেচনা বলছে—যেয়ো না, আরও জড়িয়ে পড়ো না যেন। মন বলছে—তুমি যদি এই সহৃদয় প্রস্তাবটা গ্রহণ না করো, উষার কত কষ্ট হবে, সেটা অন্তত ভেবে দেখ। তুমি তো এখন থেকে আর একা নও। যা করবে, যা ভাববে তার সঙ্গে আরেক জনের সুখ-দুঃখ জড়িয়ে পড়ছে। ভবিষ্যতে কদিন এই সৌভাগ্য তোমাদের থাকবে তা তোমরা কেউ জানো না। যেটুকু পাচ্ছ সেটুকু হেলায় হারিয়ো না।

মনে পড়ল সে নিজেই উষাকে রুবেন ডারিয়োর কবিতা শুনিয়েছিল—

'ক্ষণিকের কুসুমেরে নাও তুলি।'

সালামাঙ্কায় মোটরে যাওয়া, সেখানে এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এই ক্ষণিক সৌভাগ্য বুকে তুলে নাও। তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে আরও কদিন সময় পাবে।

যার জীবনে পিছনে ছিল অন্ধকার আর সামনে রয়েছে অনিশ্চয়তা, তাকে ক্ষণিকের কুসুমটিই তুলে নিতেই হবে।

আজ যাকে আকাশকুসুম মনে হচ্ছে, কে জানে হয়তো তা চিরন্তন সত্য হয়ে ফুটে উঠবে। দেখছ না

তোমার আকাশ যে উষার আলোয় ভরে গেছে। আশার আশ্বাসে সেই আকাশে কুসুম মুকুলিত হয়ে উঠছে। এখন বাকিটুকু নির্ভর করছে তোমার উপর।

ভুলো না। ভুলো না। আজই সকালে তুমি কুসুমের রঙ একজনের মুখে এঁকে দিয়েছ। মনকে রাঙিয়ে তুলেছ। ভুবনকে ভরিয়ে দিয়েছ।

'ভুলো না। ভুলো না।'

রমেনকে চুপ করে থাকতে দেখে পেপে ভাবলেন যে বোধ হয় তার আপত্তি নেই। কিন্তু অন্যান্য কাজের প্ল্যানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কথা চিন্তা করছে।

তাই তিনি বললেন—অবশ্য এখনই তোমায় উত্তর দিতে হবে না। একটু সময় নাও ভেবে নিতে।

রমেন আর দেরি করল না।

বলল—আমি প্ল্যান ঠিক করে নিয়েছি। আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, আমায় যে সুযোগ দিয়েছেন তার তুলনা নেই। ধন্যবাদ দিলে তাকে ছোট করে দেখা হবে। অতএব মামুলি ধন্যবাদ দেব না।

শ্রীমতী বললেন—রামন, তোমার কাছে যে আমরা মামুলি ভদ্রতা প্রত্যাশা করি না তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। বরং ধন্যবাদ যদি দিতে হয় আমাদেরই দেওয়া উচিত।

আশ্চর্য হয়ে রমেন তাঁর দিকে তাকাল।

তিনি হেসে বললেন—ওঁর চাকুরি জীবনে আমরা অনেক দিন আব অনেক বার স্পেনে থেকেছি। এখন ছুটি কাটাতে এসেও সেই স্পেন আর স্প্যানিশ বন্ধুবান্ধব আর বাধা নিষেধ। তুমি তার মধ্যে এনে দিলে একটা তাজা আমেজ, নতুন আবহাওয়া। বিশেষ করে ডন আর বেল যে কী খুশি।

এবার রমেন ডনের দিকে তাকাল।

বমেন তো শীঘ্রই চলে যাবে। অতএব বেলের সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নেই। অঙ্কুর থেকে চারা গজিয়ে উঠবার সময় হবে না। পশ্চিমের ফুল সূর্যমুখী হয়ে উঠবার সময় পাবে না।

কাজেই ডন খুব প্রসন্নতা উদারতা দেখিয়ে হেসে বলল রামনের কল্যাণে শুধু যে আমরা তার প্রাচীন দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম তা নয় নতুন ইয়োরোপ সম্বন্ধেও বেশ কিছু শেখা যাচ্ছে। আর এই পুরোনো স্পেনকেও দেখছি নতুন আলোতে। জানো মা, স্প্যানিশদের সম্বন্ধে ওর নতুন বর্ণনা?

শ্রীমতী খুব খুশি হয়ে জানতে চাইলেন। জানো মা, রামন বলে যে স্প্যানিয়ার্ডরা হচ্ছে এ নেশন অব ডান্সার্স।

পেপে হেসে তাঁর গ্লাসটিতে একটা সপ্রেম চুমুক দিলেন। এমন ভাবে, এমন রসিয়ে, তারিয়ে যে সে চুমুককেও চুম্বনও বলা চলে।

বলা বাহুল্য, রমেনের মনেই এই তুলনাটা এসেছিল। সে অবশ্য চুপ করে রইল। তার মনের আকাশ যে আজ চুম্বনে চুম্বনে রাঙানো উষার অরুণিমায়।

গ্লাসটি শেষ করে পেপেই বর্ণনার কারণটা জানতে চাইলেন।

রমেন যেন বেঁচে গেল। এই সন্ধ্যার আলাপ যতদূর সম্ভব বেলকে বাদ দিয়ে, দূরে রেখে চলতে থাকুক।

সে চেয়ারটা একটু সামনের দিকে টেনে এনে বেশ জমিয়ে শুরু করল—আমি তো যা দেখছি স্পেনের জীবনকে জানতে গেলে তার চলনকে অধ্যয়ন করতে হবে। চলে চলেই ওরা প্রাণের প্রমাণ দেয়।

শ্রীমতী রিবেরা বললেন—বাঃ রামন। তুমি এ সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে ফেলো না কেন।

রমেন খুশি হয়ে বলল—আমিও তো সেই কথাই বলতে চাই। এই দেখুন না, এদেশের লোক কেমন সুন্দর গতিভঙ্গি নিয়ে হাঁটে। শুধু রামব্লাতে কেন, এই পুয়ের্তা দেল সলের উপবনের মতো সাজানো খণ্ডগুলিও ভোররাত পর্যন্ত রঙবেরঙের পোশাকের শোভাযাত্রায় সেজে থাকে। অশ্রান্ত আলাপের গুঞ্জন মৌমাছির মতো চলতে থাকে। উপছিয়ে পড়া প্রাণের খুশিতে শুধু নিজেদের নয়, বিদেশী টুরিস্টদের পর্যন্ত মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করে দেয়। আর...

বলতে বলতে রমেন থমকে গেল।

স্পেনের মেয়েদের কথা ঠোঁটে এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কথাটি কি এই পরিবারের মধ্যে উল্লেখ করা ঠিক হবে? বিশেষ করে ডনের উপস্থিতিতে?

করেরেজিয়োর সেই অনুপম ছবির উল্লেখ সে ভুলবে কেমন করে। নেলি মে তাংজোরে। ছুঁয়ো না আমায়।

কিন্তু ডনই তাকে টেনে আনল। বলল—আর কী, রামন? তোমার মনে কি ডেপথ চার্জ দিতে হবে না কি এবার? তোমার বাণীগুলি যেন এক একখানা জার্মান সাবমেরিন। মনের অতল ঠেলে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। একটি টার্গেট সম্ভবত খুঁজে পেয়েছি।

রমেন আর সামলাতে পারল না।

সে বলল—আর মেয়েরা এমন সাবলীল গতিতে নিজেকে বহন করে চলে এবং ছেলেরাও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করে যে ওরা যেন একটা নেশন অব ডান্সার্স।

পেপে উচ্ছ্বসিত হয়ে রমেনকে কোনও ওয়াইন বেছে নিয়ে পান করতে অনুরোধ করলেন। পানের প্রতি তেমন কোনও টান নেই দেখে ওরা আজকাল রমেনকে সুরার জন্য অনুরোধ করতেন না। কিন্তু এমন একটা বর্ণনাকে সেলিব্রেট করা, অভিনন্দন করা উচিত। উঠে পড়বার আগে "ওয়ান ফর দি নাইট।"

রমেন সবিনয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বারণ করল। পেপে বললেন—আচ্ছা বেশ। তবে মনে রেখো যে আমাদের সঙ্গে সালামাঙ্কা আসছ।

রমেন রাজি ছিল। তবে একটা শর্তে।

সে ওদের সঙ্গে মোটরে যাবে। তবে সেখানে গিয়ে ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে উঠবে। ওদের সঙ্গে এক হোটেলে নয়। কারণ দেখাল বেশ যুক্তিসঙ্গত ভাবে।

সে ছাত্র জীবনের পরিবেশ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া অনুভব করতে চায়। মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়ে নেবে।

রিবেরা পরিবার সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝলেন। মোটরে একসঙ্গে যেতে বাড়তি খরচ নেই। কিন্তু এক হোটেলে থাকলে রমেনের খরচ পড়বে অনেক বেশি। অথচ সে তাদের নিজের জন্য হোটেল বিলের টাকা দিতে দেবে না। ওর আত্মসম্মান জ্ঞানে ওদের আনন্দই হল।

কিন্তু রমেনের মনের আসল কারণটি রমেনরই থাকুক।

ও যে পেপের অনুরোধে কোনও ড্রিংক এখন নিল না সেটাও একটি বিশেষ কারণে।

মন এত উচ্ছ্বসিত, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে রামধনু বেয়ে সপ্তম স্বর্গে আনাগোনা করছে যে শেষ পর্যন্ত সুরার আবেশে সুরের দরজায় টোকা মারতে যাবে নাকি?

সুরের দরজায় সে টোকা দেয়নি।

নিচে পুরু কার্পেটে মোড়া প্যাসেজ দিয়ে না হেঁটে আ-ঢাকা কাঠের মেঝেতে হাঁটতে হাঁটতে একটুখানি সে থমকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঠের মেঝের উপর দিয়ে চলার শব্দ তাই হঠাৎ একটু থেমেছিল।

আর সেই মুহূর্তেই যেন প্রতীক্ষায় রত একটি মূর্তি দরজা একটুখানি খুলে ধরল। একটি মুখ থেকে প্রায় নিঃশব্দে একটি সোনার ধ্বনি বেরিয়ে এল।

—কাল দুপুরে অ্যাথেনিয়ামে এসো।

॥ ২১ ॥

সিংহ যেন তার কেশর হেলিয়ে নিজেকে প্রকাশ করল।

গর্জনের প্রয়োজন নেই। বেলের সমস্তটা মন বনের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। শুধু মন নয়, দেহও সেই কাঁপন অনুভব করছে। ওর কালো আঁখিতারার চারপাশে অরুণাভ ছায়া বিরাজ করছে। মাইকেল এঞ্জেলোর চোখের মতো। সেভিলের কিউরিয়ো শপেলা রুবিয়ার দোকানে জিনিস কিনবার সময় রমেন তার প্রেয়সীর চোখের রঙেরই বর্ণনা দিয়েছিল।

সেই রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মিনার কাজ করা বাঁকা তলোয়ার লা রুবিয়া বাছাই করে দিয়েছিল।

সেই তলোয়ার বেলের ঈষৎ উদ্বেলিত বুকের উপর ব্লাউসে বসানো আছে। সাগর লহরির উপর বঙ্কিম ফেনার মতো সেই তলোয়ার ওঠানামা করছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। তার রঙের প্রতিফলন দুই চোখের মণিতে।

মনের আকাশের রঙ আঁখিতারায়। এল কর্ভো আল্‌ফান্‌হে। খাপখোলা বাঁকা তলোয়ারের ঝিলিক যেন ঝিলম নদীর বুকে খেলে যাচ্ছে।

রমেন সামনে বসে দেখছে আর ভাবছে। সুন্দরীকে চোখের জল সুন্দরতর করে তোলে। কবিরা তার বর্ণনা করে গেছেন যুগে যুগে।

সুন্দরীকে চোখের আগুন আরও যে কত বেশি সুন্দর করে তোলে তা রমেন মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। 'কি রূপ নেহারেনু। অপরূপ পেখলুঁ বামা।'

শুধু সৌন্দর্য নয়, সহানুভূতি নয়, সাগ্নিক প্রকাশই নারীকে সব চেয়ে রূপসী করে তোলে। আগুন তো শুধু দাহ করে না, দীপ্তিও দেয়। সেই দীপ্তির জ্বালা অপরূপ জ্যোতিতে ফুটে উঠেছে উষার চোখ দুটিতে।

রাগ আর অনুরাগ একসঙ্গে মাখামাখি হয়ে ফুটে রয়েছে উষার মুখে।

একদৃষ্টে সেই জ্বালা আর জ্যোতি মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রমেন। একবারে মৌন। উষার চোখ মুখর, কিন্তু মুখ মৌন। তার মনেও সেই জ্বালার আগুন, সেই জ্যোতির আভা। কিন্তু উষাই তাকে স্বাভাবিক ভাব দেখাতে নির্দেশ দিয়েছিল। তাই সে এত ঘণ্টা ধরে চুপ করে ছিল।

অবশ্য রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না। একদিকে মিলন-চুম্বনের অফুরান রেশ। অন্যদিকে ডনের ওই ছবিটির উল্লেখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঠেস।

কোন্‌টিকে সে রাতে শুয়ে শুয়ে নিজের চিন্তার মধ্যে প্রথম ঠাঁই দেবে?

একটি তাকে আচ্ছন্ন করে সুখের সপ্তম স্বর্গে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যটি তাকে শাসন করে আগামি বিচ্ছেদের সম্ভাবনার অতলের দিকে পথ দেখাচ্ছে। এবং সব কিছুর উপরে উষার আশাভরা আহ্বান। আবার গোপনে মিলনের আবাহন।

এই আমন্ত্রণটুকুই সব চেয়ে বড়। এইটুকুই সকালের স্বর্গসুখকে রাতের স্বপ্নভঙ্গের হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

বেল বলল, বেশ রাগের ভঙ্গিতে বলল—কই, তুমি বড় চুপ করে আছ? খুব মৃদু স্বরে রমেন উত্তর দিল—আমি তোমার মনকে অনুভব করছি চুপ করে।

বেল এ হেন উত্তর শুনে একটু যেন শান্ত হল—তুমি কি অনুভব করতে পারছ। আমি কী দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করছি?

প্রশান্ত সান্ত্বনার সুরে রমেন বলল—অবশ্যই, উষা, নিশ্চয়ই।

জ্বালাময় চাহনি সামনে মেলে ধরল বেল।

যেন সামনে কোনও বাধা নিষেধের অনড় প্রাচীর গাঁথা রয়েছে যেন শুধু দৃষ্টি হেনেই সেই প্রাচীরকে সে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে। এবং নস্যাৎ করে দিতে পারবে।

দৃপ্ত অথচ মৃদুস্বরে বেল বলল—নলি মে তাংজেরে! নলি মে তাংজেরে। ডন আমায় কৌশলে সোজা সদুপদেশ দিতে চেষ্টা করেছে। আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আঘাত করতে চাইছে। ওই ছবিটা সম্বন্ধে ছলনাময় উল্লেখ করে সে আমায় সাবধান করে দিচ্ছে। বোকা, বোকা আমার দাদা। বোঝে না যে আমি যা করি দু-চোখ খোলা রেখেই করি। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। নিজে জেনে, বুঝে, যাচিয়ে।

মৃদু উৎসাহে রমেন বলল—সে সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। উষা, তোমার বুদ্ধি; তোমরা ব্যক্তিত্ব কখনই তোমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে না।

বেল উৎসাহিত হয়ে বলল—ঠিক তাই। আমার বাবা মা এখনও কিছু জানে না। বুঝতেও পারেনি। এবং সময় হলে সবই আমি নিজে থেকে জানাব। কখনও তাদের সঙ্গে ছলনা বা গোপনতা করব না। কিন্তু আমার নিজের মনে জানি যে আমি পেয়েছি। জানি যে এখন থেকে কাকে নিয়ে আমার মন ভরবে সে খোঁজ আমায় করতে হবে না। যাকে পেলে আমি পরিপূর্ণ হব তার খোঁজ পেয়েছি।

রমেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রেয়সীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মধ্যে সাঙ্গ হয়েছে যার সন্ধান সেই বিদেশিনী প্রেয়সী।

বেল আবার বলল—তাই আমি ডনের সুকৌশল সাবধানবাণী উপেক্ষা করছি। এই যে আমার হাতটি তোমার হাতে তুলে দিলাম। এই খুপড়ির মতো কোণায় চারদিকে ইন্ডিয়ান সাহিত্যিকদের লেখা বইয়ের শেলফে কেউ বই খুঁজতে আসবে না। তুমি আমার আরও কাছে এসো রামন। আরও কাছে, আরও ভালো

করে জড়িয়ে ধরে থাক।

সুখের সপ্তম স্বর্গে রাশি রাশি যৌবনের পারিজাত ফুল মুকুলিত হতে লাগল ওদের সর্বাঙ্গে। সর্ব ইন্দ্রিয় চেতনায়। সকল মগ্ন চৈতন্যে।

বেলই প্রথম নীরবতা ভাঙল—আশ্চর্য রামন? অ্যাপোলোর মতো রূপ আর যৌবন কি ধর্মের জগতে অস্পৃশ্য? কেন কোনও মুগ্ধা তরুণী তাকে স্পর্শ করতে পর্যন্ত পারবে না?

এই বিগলিত বাসনার সোনার রঙকে রমেন ওই মধ্যযুগের ধর্মমূলক নিপীড়নের দিকে নিয়ে যেতে দিতে চায় না। যদিও ওই ছবিটির প্রচ্ছদপটের রঙ নীল, উজ্জ্বল ভুবনমোহন নীল।

নীল, নীল, না, বেদনায় নীল নয়। নীলের মধ্যে অন্য কোনও সার্থক ইঙ্গিত আছে। উষাতে বিলীন হয়ে সে সেই নীলের অর্থ খুঁজে বের করবে।

সেই ফ্ল্যামেঙ্কো নৃত্যের রাতে বেল নীল রঙের শাড়ি এফেক্টময় গাউন পরেছিল। পৃথিবীবিখ্যাত ফ্যাশন ড্রেস ডিজাইনার প্যারিসের শিয়াপারেল্লির ডিজাইন করা। প্রেয়সীর অঙ্গে নীল শাড়ি। প্রিয়ের প্রতি গোপন প্রেম প্রকাশের এই সূক্ষ্ম অভিনব কল্পনার কথা রমেনের মনে পড়ে গেল।

চলে নীল শাড়ি। নীল। নীল। অন্যপক্ষে চন্দনচর্চিত নয়, চেনা ও ধরার অতীত রহস্যময় সৌরভে চর্চিত তনু—সৌরভচর্চিত নীল কলেবর?

পেয়েছি, পেয়েছি। আমি রামন, শ্যামল বর্ণের রামন, তোমার অঙ্গ সৌরভে চর্চিত নীল কলেবর রামন।

পেয়েছি। নেলি মে তাংজেরের প্রত্যুত্তর শ্রীরাধার আত্মাঞ্জলি।

গভীর ভাবে আশ্বাস ভরে রমেন বলে উঠল—জানো উষা, আমাদের ধর্মেও ওই নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে প্রেমিক-প্রেমিকার ভগবৎপ্রেমের ধর্মমূলক ছবি আছে। কিন্তু মানুষকে, প্রেমিক, প্রেমিকাকে সেই ধর্ম বঞ্চিত করেনি। প্রেমরসে সিঞ্চিত করেছে। জীবন যৌবন সফল করি মাননু তার ফলে। দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা। আমাদের প্রেম মানবকে আশ্রয় করে দেবতাতে পৌঁছোয়।

ব্যাকুলা, বাসনা-ব্যাকুলা, ইসাবেল বলল—বল, বল, রামন, তোমার দেশের সেই ছবির কথা বল। এই লাইব্রেরির এই কোনাতে বসেই আমি, মনে পড়ছে যে, এই প্রেমধর্ম সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। কদিন আগেই। তোমাদের সেই মুগ্ধার নাম কি রাধা?

রমেন আশ্চর্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে মুখে কথা সরল না। এই ভিনদেশী কিশোরী তার প্রতি এতদূর, এত গভীর ভাবে সব মন প্রাণ উজাড় করে আকৃষ্ট হয়েছে যে অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরিতে বসে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকথা পর্যন্ত পড়েছে।

উৎফুল্ল হয়ে রমেন বলল—ঠিক বলেছ উষা। রাধা, শ্রীরাধিকা। এমন করে বুঝি কোনও নারী ইহ সংসারে কোনও দিন, কোনও যুগে ভালোবাসেনি। সব লোকলজ্জা, সমাজের নিষেধ, সংসারের বারণ সব উপেক্ষা করে।

উৎসুক হয়ে উষা প্রশ্ন করল—তোমাদের মতো রক্ষণশীল দেশেও? সেখানে সমাজের শাসন স্পেনের মতই কঠিন, লোহার জালে ঘেরা। সম্ভবত আমাদের চেয়ে বেশিই হবে।

রমেন মাথা নাড়ল—হ্যাঁ। কিন্তু জানো উষা শ্রীরাধার চেয়ে বেশি গভীর ভাবে প্রেম আর কেউ অনুভব করেনি। তার প্রেমের চেয়ে বেশি নন্দিত, বন্দিত আর কারও প্রেম হয়নি।

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে উষা প্রশ্ন করল—কী করে তা সম্ভব হল, রামন?

রমেন বলল—যত বাধা তত সুধা। যত সুদূর তত মধুর।

পুলকিত চম্পা, না চম্পা নয় উষা সরমে অরুণবরণী হয়ে একটু যেন দূরে সরে যেতে চাইল।

শেষ পর্যন্ত হেসে উঠে বলল—আমি একটু বেশি মধুর হতে চাচ্ছি তোমার কাছে। তাই একটু দূরে সরে গিয়ে দেখি কেমন লাগে তোমার।

যেন ত্রাসে অধীর হয়ে উঠল রমেন—দোহাই তোমার উষা, তুমি অসম্ভব সুদূর। তুমি হচ্ছ পেরুর। এর চেয়ে বেশি মধুর আর আমার সহ্য হবে না।

মধুরা কিন্তু একান্তভাবে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এসেও 'ছুঁয়ো না আমায়' ছবিটির কথা ভুলতে পারে নি।

বেল বলল—কই নলি মে তাংজেরের প্রত্যুত্তরটা বুঝিয়ে বললে না তো? রাধা কী করেছিলেন?

—তবে শোন উষা সেই ছবিটির কথা। আমাদের কলকাতার একজন সামান্য অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা ছবি। কিন্তু কররেজিয়োর ছবির চেয়ে কম বর্ণসুষমা নেই তাতে। অমনি নীল পটভূমি। রাধা বুকের কাছে দুটি হাত এনে মাগডালার মেরির মতো নত হয়ে আত্মাঞ্জলি দিতে চাইছে কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ পরম মনোহর সাজে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিমান অ্যাপোলো যেন।

বেল বাধা দিল—তোমাদের কল্পনাতে কৃষ্ণ তো চিকণ কালো অর্থাৎ তোমার মতো গায়ের রঙ?

প্রফুল্ল হাসিতে, উদ্ভাসিত হয়ে রমেন বলল—আর রাধা হচ্ছেন ধনী, কাঞ্চনবরণী। ঠিক তোমার মতো। পুলকিত উষার মুখে অরুণিমা ছড়িয়ে পড়ল।

রমেন তখনও থামেনি—ছবিটা সামান্য। কিন্তু তোমার আমার মিলনটা অসামান্য। আর সবটুকুকে ধন্য করে তুলেছে প্রেমের কবির লাইনগুলি। শোন, তোমায় গুনগুনিয়ে শুনিয়ে দিই। এই বিরাট রিডিং রুমের এই কোনায় কারও কানে তা পৌঁছোবে না। আর কারও কানের জন্য নয়ও সেই কবিতা।

বঁধু কি আর বলিব আমি জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈনু দাসী।

গুনগুনের পর সে প্রেমভরে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উষা বলে উঠল—বুঝেছি, সব বুঝেছি। নারী প্রেমে পড়ে সব যখন উজাড় করে দেয় তখন সে সব প্রতিদানে পাবার জন্যই দেয়। তাই সে হয় নিঃস্ব, হয় দাসী। কারণ সে যে তখন ঐশ্বর্যময়ী: দি রিচেস্ট মিলিয়নেরারেস—তাই সে বিনা দ্বিধায় নিজেকে ঘোষণা করতে পারে দাসী বলে। প্রেমের চরণে দুজনেই তখন দাসদাসী। কী চমৎকার গভীর, অদ্ভুত সম্পূর্ণ তোমাদের প্রেমের ধর্ম।

গভীরভাবে রমেনও যোগ দিল—এই হচ্ছে আমাদের আত্মাঞ্জলি। তোমাকে আমি সব উৎসর্গ করেছি।

তুমিও আমায় অঞ্জলি দিয়েছ তোমার সব। ওরা দুজন আরও ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে এল। খানিক পরে বেলই নীরবতা ভাঙল। —জানো রামন, কী করে তুমি আমায় জয় করে নিতে শুরু করেছিলে?

মাথা নাড়ল রমেন।

—না, জানি না, শুধু এটুকু জানি যে আমি পিজারোর মতো পেরু, সোনায় ভরা দেশ পেরু, জয় করতে এগিয়ে যাইনি। এবং এখানে স্প্যানিশ বীর অভিযান নায়ক পিজারোর মতো মার্কুইস ডি লা কঙ্কিস্টা পদবী নিয়ে বসিনি।

—ঠিক সেই উদার নিস্পৃহতার অস্ত্র দিয়েই তুমি আমায় জয় করে নিয়েছে রামন। তুমি বলেছিলে—যত বাধা তত সুধা। আমি বলছি—যত মুক্তি তত বন্ধন। যত তুমি ছিলে উদাসীন, তত আমি হতে চেয়েছি তোমার বক্ষোলীন।

—কী করে তুমি জানলে যে আমি ছিলাম উদাসীন? তুমি তো জানো না যে আমার সম্বন্ধে তোমার প্রতিটি অনকূল মন্তব্য যা মার্টিনো বা তোমার বাবা আমায় কথায় কথায় জানিয়ে ছিলেন তা আমার মনকে, কেমন করে আমায় রাঙিয়ে তুলেছিল। প্রেমের প্রলেপে প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছিল।

—তবু, তা সত্ত্বেও তুমি যে নিস্পৃহতা দেখিয়েছিলে তা আমায় নীরবে নিবিড়ভাবে বেঁধে ফেলেছিল। আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম যে ফ্ল্যামেঙ্কো ড্যান্স দেখার রাতে আমার পরা শাড়ি এফেক্ট ইভনিং গাউন পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে একটুও মন্তব্য বের করতে পারল না। অন্য যে কোনও যুবক এই সংকেতটুকুকে কল্পনায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

—আমার মন যে তোমার সর্বাঙ্গে সাগর বেলার উর্মির মতো আছড়িয়ে আছড়িয়ে পড়ছিল না তা তুমি জানলে কী করে, উষা?

—তা-ও কি বলে দিতে হবে, ওগো, বোকা আমার, ইন্টারমিশনের বিরতিতে সবাই আমরা 'ফইয়ারে' অডিটোরিয়ামের বাইরে গেলাম। আমি ইচ্ছা করে একটু পেছিয়ে ছিলাম, তুমি স্বভাবতই পিছনে আমার কাছে। আমি ইচ্ছা করেই ওই শাড়ি এফেক্টের সঙ্গে ম্যাচ করা রাফলড় হ্যাঙ্কি, কুঞ্চিত রুমাল মেঝের মার্বেলে

ফেলে দিলাম। তুমি সেটি সযত্নে তুলে দিলে। কোনো মধ্যযুগের নাইট বা এ যুগের মাতাদোর এই আনকোরা ছাত্র তোমার চেয়ে বেশি লীলায়িত ভঙ্গিতে সেটি আমার হাতে তুলে দিতে পারত না। কিন্তু..

—কিন্তু?

রমেন সপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে ধরল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সেই মনোহর সেবার মূল্য আদায় করে নিতে ছাড়ত না। অনুরক্ত প্রেমিকের ভঙ্গিতে হাতে একটু চুমু দিত। এমনভাবে যে তাতে ফরাসিসুলভ ভব্যতার চেয়ে অধরোষ্ঠের তৃষ্ণা পরিষ্কার ফুটে উঠত। আশ্চর্য, তুমি তার কিছুই করলে না। তোমার ভঙ্গিতে ছিল লীলা, লোভ নয়।

—কী করে তুমি জানলে উষা? আমি হয়তো নিজের লোভকে লুকোতে বেশি ওস্তাদ। হয়তো জিতে নেবার জন্যই যাই না এগিয়ে। অসম প্রেমের রণে কোমল কৌশল।

—তুমি নারীর চোখকে, যে নারী নিজে থেকে সত্যি ভালোবেসেছে, তার চোখকে ঠকাতে পারবে না। আমি ওই গাউন আগের দিনই কিনেছিলাম অনেক অজুহাত দেখিয়ে। ফ্ল্যামেঙ্কো নর্তকীরা ঢেউ খেলানো গাউন পরে। নতুন শাড়ি, স্টাইল, সারা প্যারিসকে মাত করেছে, শিয়াপারেল্লির ডিজাইন এই একটিই মাত্র মাদ্রিদে পৌঁছেছে এমন সব কী বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু সব কিছু যুক্তির খেলা ছিল শুধু তুমি চোখ মেলে দেখবে বলে। অথচ...

—অথচ কি হল উষা?

—অথচ তুমি তোমাদের দেবতা শিবের মতো ধ্যানমগ্ন ভাবে রইলে। তপস্বিনী উমার দিকে চোখ মেলে তাকালে না।

—তুমি জানো সেই উমার কাহিনি উষা?

জানি না আবার? এই অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরির এই আর্কিভস ডেস ইন্ডিয়স মার্কা নিরালা কোনাতে বসেই আমি কবি কালিদাসের সম্বন্ধে বই পড়ে। তার দুখানি কাব্যের কাহিনি পড়েছি জানো?

—আশ্চর্য তুমি আমায় অবাক করে দিচ্ছ, উষা। আমাদের দেশে কেউ একথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না।

পরম আশ্বাসের আভাস দিয়ে বেল বলল—চাইবে, যারা ভালোবেসেছে তারা বিশ্বাস করতে চাইবে। তুমি ইংলাটেরাতে আসার আগে তার কাব্য, সমাজ ব্যবস্থা এসব সম্বন্ধে পড়নি? পড়নি এস্পানিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু এদেশে আসার আগে?

—কিন্তু সে তো শুধু জীবিকার প্রয়োজনে।

—আমি যে পড়েছি জীবনের প্রয়োজনে, রামন। আমার দায় যে তাই অনেক বেশি।

রমেন হঠাৎ বলে ফেলল—কিন্তু শকুন্তলার কাহিনি হয়তো পড়েছ। তার কী অবস্থা হয়েছিল তা নিশ্চয়ই পড়েছ।

বেল তাতে অপ্রস্তুত হল না।

বলল—কিন্তু শকুন্তলার প্রেমে সোনার সঙ্গে খাদ মিশে ছিল। তাই হল তার দুর্গতি। সে যদি অচেনা সন্তান নিয়ে দরবারে হাজির না হত, দুষ্মন্ত আবার হয়তো প্রেমকে চিনে নিত। তাছাড়া শেষ পর্যন্ত শকুন্তলা তো সবই পেয়েছিল। তার ছেলের নামেই তোমার দেশের নাম হয়ে গেল।

তর্কে হার মেনে রমেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে উষার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। উষার মানসিক প্রস্তুতি, প্রেমের পথে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি ওকে অভিভূত করে ফেলল।

সোনালী শস্য, সিঁদুর রাঙা ফল, রসভরা আঙুর আর জাফরানি রঙের পাপ্রিকা শরতের স্পেনকে উৎসবের দেশ তরে তোলে। নবীন ধান্যে হয়ে যাবে 'নবান্ন' ভারতের যে উৎসবে, সেই পরিণতি হয়। আহা! তোমারে সাজায়ে দিল কে শ্বেতচন্দনতিলকে।

সেই অলকা তিলকা সে কি দেখবার সৌভাগ্য পাবে এই ভিনদেশী বধূর গৌরাননে?

যে স্বপ্ন দেখবার জন্য সে ভিন্‌দেশে আসেনি সেই স্বপ্ন কি সত্য হয়ে উঠবে তার জীবনে তার শিক্ষার কর্মের সফলতার মূল্য হিসাবে?

রমেন এত অভিভূত হয়ে গেল যে আর কোনও কথাই তার মনে এল না।

অথচ একেবারে চুপ করে থাকলে এই মধুর সুরের মায়াজাল মিলিয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত রমেন

বেলকে প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা উষা, তুমি এত কবিতা পড়ো, কবিতা আবৃত্তি করো, স্পেনে বসে কালিদাসের কাহিনি জানো। তুমি নিজেও কবিতা লেখো নাকি?

বিস্ময়ে বেল বলল—কেন তুমি এ হেন অনুমান করছ? তার মানে তুমিও গোপনে কবিতা লেখ।

রমেন হেসে ফেলল—না, উষা, গোপনে প্রেম করা যায়। কিন্তু প্রকাশ্যে করতে হয় বিয়ে। তেমনি গোপনে কবিতা অনুভব করা যায়। কিন্তু কাব্যরচনা হয়ে যায় প্রকাশিত।

অধীর হয়ে বেল বাধা দিল—আবার তুমি তত্ত্বকথা আউড়াচ্ছ। তবে মনের সত্য আর কাব্যের তত্ত্ব দুই-ই মানুষকে প্রেম অনুভব করতে সহায়তা করে। তোদো সির্ভে আলস্ আমান্টেস্। সবকিছুই প্রেমিকদের সেবায় আসে। কাজে লাগে। সহায়তা করে।

আবার খুব কাছাকাছি মাখামাখি হয়ে এসে রমেন আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করল—সত্যি বলছ, উষা? উষা, আমার আশা।

সমস্ত আন্তরিকতা আর সরলতা মিশিয়ে বেল বলল—একেবারে খাঁটি সত্য বলছি। আমাদের সবচেয়ে বড় সনেট রচয়িতা কবি গঙ্গোরা ঠিক তোমার মতো বয়সেই সেই সাড়ে তিনশ বছর আগে লিখেছিলেন—তোঁদো সির্ভে আলস্ আমন্টেস। আধো সুখে ঘেরা আধো মন গড়া এক প্রেমের জগৎ তিনি তৈরি করেছিলেন তরুণ প্রেমের কবিতায়। কিন্তু তিনি স্বীকার করতেন যে শুধু সংগীতের মতো প্রাণবন্ত কলাই মানুষের মনের বৈচিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তাই তো আমি গীটার বাজাই। তার ঝংকার তার উচ্ছ্বাস আমার মনকে প্রকাশ করে। গভীরে মধুরে।

একটুখানি থেমে, যেন দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বেল আবার বলল—তখন কী জানতাম যে সেই গীটার বাজাতে শিখেছিলাম শেষ পর্যন্ত তোমায় শোনাবার জন্য।

এবার হেসে রমেন প্রতিবাদ করল—কিন্তু তুমি তো সেই গীটার বাজানো বন্ধই করেছিলে আমার জন্য। তুমি আমার ঘুমের কথা ভাবলে, প্রেমের কথা নয়। সুর যে স্বপ্ন সৃষ্টি করে, সুখে ভরিয়ে দেয় সে কথা ভাবলে না। আর আমারই জন্য ভেবে তুমি বাজনা বন্ধ করেছিলে তা জানতে পর্যন্ত আমি পারতাম না যদি তোমার মা নিরীহ মনে সে কথা ফ্ল্যামেঙ্কোর রাতে আমায় না জানাতেন।

মিষ্টি হেসে উঠল বেল—মা, আমার মিষ্টি মামণি এখনও জানে না, সন্দেহও করে না প্রতিবেশীর ঘুমের প্রতি এতখানি সুবিবেচনা কেন আমি দেখিয়েছিলাম। বলেই সে একটু নিবিড় হয়ে কাছে এল।

এবং গভীর স্বরে আবৃত্তি করল :—লামানো

সিয়েন্টে আল আমোর কি সে এস্কন্ডো ট্রাস লাস রোজাস।

গোলাপ ফুলের আড়ালেতে
যে প্রেম লুকায়ে থাকে সাথে
অনুভব করে বারে বারে।

তারপর আবার তার হাত দুটি রমেনের হাতে তুলে দিল।

যেন কুলায়-প্রত্যাশী পাখি মধুর আনন্দ কাকলী করে তার শান্তি নিবিড় নীড়ে সে আশ্রয় নিল। গঙ্কোরার কবিতা যেন মিলন পিয়াসিনীর অন্তরে গঙ্কোরা রাগিণীর ঝংকার তুলল।

রমেন ওর দিকে একান্ত ভাবে তাকিয়ে রইল। ওদের দুজনের মনের কথা তো শতেক যুগের প্রেমের কবিরাই ধ্বনিত করে রেখেছে।

শান্ত আত্মস্থ স্বরে বেল বলল—কী দেখছ তুমি রামন, অত করে?

সমান শান্ত ভাবে রমেন উত্তর দিল—দেখছি তোমাকে। শুধু তোমাকে। তোমার মুখে দেখছি নিজের মনকে। আর, আর রক্তরাগ দেখছি তোমার মুখে। প্রেমে রাঙানো ফুল রক্তরাগ রাশি রাশি ফুটে উঠেছে তোমার দুটো গালে।

পুলকিত হয়ে বেল বলল—রক্তরাগ বুঝি কোনও বিশেষ ভারতীয় ফুলের নাম? দেখতে কেমন? কতটা সুন্দর?

রমেন বলল—রক্তরাগ ফুল অদ্ভুত সুন্দর। আমাদের দেশে তার খুব প্রচলনও নেই, পরিচয়ও নেই। কিন্তু সাতটি পাপড়ি, কোঁকড়ানো আরক্ত কমলা রঙের সাতটি পাপড়িতে সাজানো এই ফুল অপরূপ সুন্দর। আর সেই ফুল ফোটে স্তবকে স্তবকে। ফুলে ফুলে রক্তরাগ আকাশের মতো অন্তরকেও রাঙিয়ে তোলে।

রঙিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বেল বলল—সেই ফুলের কথা মনে করেই কী তুমি আমায় প্রথম রাতে কুঞ্চিত কেশবতী বলেছিলে? রক্তরাগ কি এই দেশে হয় না? আর, না হয় নাই হল, তোমার দেশে, আমাদের বাগানে দেখব সেই ফুল।

আমাদের বাগানে। রাশি রাশি ফুলের স্তবক মুকুলিত হয়ে উঠল মনে।

রমেন বলল—তুমি নিশ্চয়ই সেই ফুল জানো। জানো, তোমার পেরু থেকেই সেই ফুল ভারতে আনা হয়। রক্তরাগ ফুলের নাম হচ্ছে কার্ডিয়া।

—কার্ডিয়া ম্যাগনিফিকা, সুপার্বা।

বাসনাবিবশ হয়ে রমেন ওকে বলল—রক্তরাগের মতো আরেকটি ফুল পেরু থেকে ভারতে নিয়ে যাব। আমি নিয়ে যাব। তোমাকে পেরু থেকে ভারতে।

আবার সে বলল—পেরুর ঋণ আমি এমনি করেই পরিশোধ করব।

বলতে বলতে ওদের দুজনের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। রক্তধারা ধমনীতে হল চঞ্চল। অধরোষ্ঠ হল বাসনা তরঙ্গে টলমল। পেরুর ঋণ রমেন এখন পরিশোধ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ভুলে গেল, রমেন ভুলে গেল যে রক্তরাগ ফুলগাছ থেকে পেড়ে আনলে শুকিয়ে যায়, মিইয়ে যায়। তাই গাছ থেকে তাকে না নামিয়েই রক্তরাগ উপভোগ করতে হয়, অনুভব করতে হয়। রূপরঙ্গে আত্মহারা হতে হয় তার নিজের পরিবেশে রেখে।

কিন্তু সে ভুলতে পারল না—দুজনেরই যৌবন জাগরণ ওদের ভুলতে দিল না—যে রক্তরাগ গাছের কাঠের দাহিকা শক্তি প্রচণ্ড। এর কাঠে কাঠে ঘষে অরণি কাষ্ঠের মতো, আগুন জ্বালানো যায় সহজে, খুব তাড়াতাড়ি। সরস স্পর্শে সহর্ষ ঘর্ষণে অতনু অনল জ্বলে ওঠে।

রমেন যখন প্রাণের আবেগে বেলের মুখে সপ্তপর্ণের মতো সাত সাত বার করে রক্তরাগ ফুল ফুটিয়ে তুলছে তখন প্রেমের আবেশে বেল বলছে বার বার—'নেলি মে তাংজেরে'র এই হচ্ছে জবাব। নলি তাংজেরের ভেলিস।

আমি চাই না যে তুমি থেমে যাও।

॥ ২২ ॥

জীবনে সবচেয়ে বড় তিনটি সুখ কী কী? জান কি তুমি, আমাদা? রামনের এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো অবস্থা তখনও বেলের ফিরে আসে নি।

রক্তরাগ তার রাশি রাশি রক্ত ফুটিয়ে এখনও উষার ঘুমকে অরুণিমায় ভরে রেখেছে।

তবু যেন মুখ তুলে চোখ মেলে হাসল।

বলল—এই তো সব চেয়ে বেশি সুখ, আমিগো, একটি সুখেই আমি পরিতৃপ্ত। তিনটিতে আমার দরকার নেই।

বেলের মুখে লজ্জা আর তৃপ্তির ছোঁয়া লেগে আছে।

রমেন আবার বলল—সেভেন্থ হেভেনে না পৌঁছিয়েই তুমি সন্তুষ্ট। কিন্তু উষা, জীবনের পূর্ণতা তখনই আসে যখন উষা সারা দিনের মধ্যে জাগ্রত থেকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের গভীরে এক হয়ে যায়। রমেনের কথার ইঙ্গিত সংগীতের মতো ঝংকার জাগাল বেলের দেহে। তবু—তবু—এখনও নয়, প্রিয় এখনও নয়।

তাই বেলই কথার মোড় হালকা ভাবে ঘুরিয়ে দিল—তুমি যে তিনটি সুখের কথা বলছিলে। কী সেই তিনটি সুখ, রামন? অবশ্য এই সুখটি বাদ দিয়ে। এটি হিসাবের বাইরে।

রমেন বলল—এই তালিকাটা মার্টিনো তৈরি করেছে। সেভিলের স্বপ্ন সরণী সিয়েরপেসে দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। সবচেয়ে বড় সুখ তিনটি তার মতে তরুণ হওয়া, সেভিলে থাকা আর সন্ধ্যায় সুন্দরী তরুণীরা যখন বিহার করে তখন সরণীতে গিয়ে দাঁড়ানো।

কপট রাগ দেখিয়ে বেল ভুরু দুটো উপরে তুলল—বেশ তো, যাও না সিয়েরপেসে। আজই সন্ধ্যায় ট্রেন নাও। কাল সন্ধ্যায় থার্ড হেভেনে সশরীরে বিচরণ করতে পারবে। তোমার সেভেন্থ হেভেনও সেখানেই

মিলে যাবে।

গভীর ভাবে রমেন আবার এগিয়ে এল।

যেটুকু দূরত্ব বেল সৃষ্টি করে নিয়েছিল এই একটুক্ষণে সেটা বিলোপ করে দিয়ে রমেন এবার বেলের ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত মাইকেল এঞ্জেলোর মতো অরুণাভ রঙের আঁখি দুটির উপর রক্তরাগ ফুটিয়ে দিল।

কোনও বাধাই মানল না।

জীবনে এমন পরম নিমেষ তো বার বার আসে না। সুযোগও হাতের মুঠোয় এসে হাজির হয় না।

—ছাড়, ছাড়, এবার একটু নিজেকে সামলাও। লাইব্রেরির এই কোণাটা নিরালা হলেও নিরাপদ নয়। হঠাৎ কোনও ছাত্র বা আর কেউ এসে হাজির হলে কী হবে বল তো?

—ছাড়ব না তোমায় কোনও দিনই। কোনও নিমেষের জন্যও নয়। তবে এখন তোমার চোখ দুটিতে মুদ্রিত করে দিলাম একটি সত্য সুন্দর কবিতার বাণী।

সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে
তোমার দুখানি নয়নে।

আর কোনওদিন, উষা, তুমি আমায় অন্য নারী নিয়ে এরকম ঠাট্টাও কোরো না যেন। অনুতপ্ত হয়ে উষা বলল—মাপ করো, আমায় মাপ করো। আমি নেহাতই ঠাট্টা করেছিলাম। তোমায় আঘাত দিতে চাইনি। জাগিয়ে তুলতেও নয়।

জাগিয়ে তোলার যে উদ্দেশ্য ছিল না তাতে রমেন মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল। জাগার লগ্ন যে এখনও আসেনি।

রক্তরাগ ফুল ওরা অনেক ফুটিয়েছে।

কিন্তু রক্তরাগের শুধু রক্তই এখন ওদের জীবনে ফুটে থাকুক। আগুন যেন জ্বলে না ওঠে। সমস্তটা মানস যেন বাদশাহী রঙমহল হয়ে উঠতে চাচ্ছে।

কারণ আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে থেকে থেকেই সাড়া জাগাচ্ছে। দেহকে দিচ্ছে নাড়া। ইচ্ছাকে করছে ইসারা।

মনের মধ্যে একবার সেই স্ফুলিঙ্গ অতনুর আগুনের মতো জ্বলে উঠতে চাইল। রমেন প্রাণপণে মনকে অন্যদিকে সরাতে চেষ্টা করল।

স্ফুলিঙ্গের কথা ভাবতে ভাবতে সে আতসবাজির স্ফুলিঙ্গের কথা মনে করবার চেষ্টা করল। মনের আকাশে নয় ভ্যালেন্সিয়ার আকাশে কিসের ফিন্‌কি সে দেখেছিল আশ্চর্যে আত্মহারা হয়ে?

সেভিল থেকে ফিরবার সময় সে ভ্যালেন্সিয়া শহর ঘুরে এসেছিল। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী। নীল ভূমধ্যসাগরের পারে অপরূপ শহর। নানা উৎসবে সমারোহে ভরপুর গীতোচ্ছল ভ্যালেন্সিয়া। কথায় বলে যে এটি হচ্ছে ইউরোপের আতসবাজির রাজধানী।

সেখানে তখন একটা বাজির উৎসব হচ্ছিল। না দেখে গেলে তার রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সম্ভবত উষাও অপ্রসন্ন হবে।

কিন্তু সে নিজে প্রসন্ন হবে যদি এই এক ফাঁকে এক দৌড়ে রাতের ট্রেনে যাতায়াত করে করে ভ্যালেন্সিয়ার বাজি পোড়ানো আর ওড়ানো দেখে আসতে পারে। কারণ মাদ্রিদে তাহলে একটানা একটু বেশি দিন থাকা সম্ভব হবে।

আগুনে আগুন হয়ে উঠেছিল কমলা-সৌরভে আর শোভায় সুন্দরী ভ্যালেন্সিয়া। উৎসবটার নাম ছিল ফাল্লা। বাজি পোড়ানো, আনন্দ উল্লাস আর নাচগান পাল্লা দিয়ে এই ফাল্লা উৎসবকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। শহরের চৌরঙ্গিতে বিরাট বিরাট কাঠের কাঠামো। ঘোড়া, নৌকা, সোনার খনি সব কিছুই কাঠ দিয়ে বানানো হয়েছে, এমনকি ওদের চোখে যারা দুষমণ তারাও বাদ যায়নি।

কাঠের প্রত্যেক পাল্লা রঙিন বারুদে মোড়া।

আবার প্রত্যেক কাঠের টুকরো বাজির শিকলি দিয়ে বাঁধা।

পতাকার মতো। সরস্বতী পূজার শিকলির মতো। দেবদারু গাছের পত্রপল্লবের মতো।

সন্ধ্যার পরে অগণিত দর্শকের ভিড়ে অনুকূল পবনে আগুন লাগানো হল। সুসজ্জিত পুরুষ আর নারীর সমাবেশ সেই আগুনে উজ্জ্বল হয়ে উল্লসিত হয়ে আরও 'অথির বিজুরি'র মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

রঙমহল ভরে যেন রঙমশালের খেলা।

সমস্ত ভ্যালেন্সিয়ার মনে অগ্রিম অভিষেক শুরু হয়েছিল।

রমেন সেই আগুন জ্বালার দিকে মন সরিয়ে দিয়ে নিজের আগুনকে সংবরণ করার চেষ্টা করল।

তারপর সে যা বলল তা বেলকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল।

সে বলল—উষা, তুমি পর পর দুদিন আমায় এখানে নিয়ে এসেছ। গোপনে, মনের গহনের পরিচয় দিয়ে আমাকেই তুমি নিয়ে নিয়েছ। এখন আমি তোমায় একটি জায়গায় নিয়ে যেতে চাই। বিনোদন করতে চাই।

মনের খুশিকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে সে মৃদু হাসল—তুমি কেন মিছেমিছি খরচ করতে যাবে এখন? সারা জীবন ধরেই তো ভবিষ্যতে সে সুযোগ তুমি পাবে।

ব্যাকুল ভাবে, আশায় উৎফুল্ল হয়ে রমেন বলল—সেই সারা জীবন তো আমায় আজকের এই দিনটিকে, এই জীবনকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে না। আজ আমি সামান্য ছাত্র। কিন্তু আমার অসামান্য ভাগ্য। আমি হচ্ছি স্টুডেন্ট প্রিন্স।

স্টুডেন্ট প্রিন্স। তুমি প্রিন্স, রামন নতুন স্কলারশিপ পেয়েছ তুমি?

হেসে মাথা দোলাল রমেন—না, কোনও স্কলারশিপ নয়, কোনও দানসম্পত্তি নয়। কিন্তু সামান্য একটু খরচা তোমার আমার দুজনের জন্য। যা করতে পেরেই আমি অনুভব করছি যে আমি স্টুডেন্ট প্রিন্স।

আনন্দে উৎফুল্ল উষা প্রশ্ন করল—ব্যাপারটা কী খুলে বলতো? বার বার স্টুডেন্ট প্রিন্স বলে নিজেকে যে বড় ঘোষণা করছ। ব্যাপারটা খুব সরল। কাগজে পড়ছিলাম যে বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা রমবার্গের বিশ্ববিখ্যাত মিউজিক্যাল অপেরেট্টা স্টুডেন্ট প্রিন্স এখানে থারথুয়েলা নাচ-গানে অভিনয়ের জন্য মঞ্চস্থ করা হবে।

—ওহ্, সেই রমবার্গের স্টুডেন্ট প্রিন্স। রমবার্গের ব্লসমটাইম আমরা নিউইয়র্কে দেখেছিলাম। কাগজে কাগজে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 'রেড রিভিয়ু' বলে মার্কিনরা। অপেরেট্টার ইতিহাসে এমন আলোড়ন নাকি আর কখনও হয়নি। সেই রমবার্গের রচনা?

—হ্যাঁ, সেই রমবার্গের। আমি মিউজিক্যাল সাপ্লিমেন্টে রমবার্গের জীবনীটাও পড়ে নিয়েছি। অবশ্য এই পালাটার কাহিনি প্রকাশ করেনি। ওটা নাকি গোপন রাখা হচ্ছে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

—তুমি যে রকম ভাবে বলছ তাতে মনে হচ্ছে যে এই শিল্পীর জীবনীতে তুমি নতুন কিছু পেয়েছ।

—সত্যি, উষা, নতুন কিছু। আর সেইটুকু তোমায় না জানিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

—বল, রামন, বল। তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। আমার শান্তি আমার সর্বস্ব।

—জানো, উষা। রমবার্গও আমারই মতো সাধারণ ঘরের ছেলে। হাঙ্গেরির একটা সামান্য শহরে জন্ম। কলকাতার চেয়ে তার আর্থিক বা নাগরিক অবস্থা মোটেই বেশি স্বচ্ছল নয়।

বাধা দিল বেল—তুমি বার বার কলকাতার বা ইন্ডিয়ার উল্লেখ কর কেন বল তো? আমি তো জানি যে তুমি তোমার পরিবেশ বা সংসারের চেয়ে অনেক উপরে। সেই উর্ধ্বেই তুমি থাকবে সেইখানেই তোমায় আমি চাই। সেখানেই তোমায় পাব।

রমেন বলল—তা তো আমি জানি, উষা। স্বপ্ন দিয়ে সত্যকে সুন্দর করে তোলা যায়। কিন্তু সত্যকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তোমায় তো আমি বিন্দুমাত্রও ছলনা করতে পারব না। ঠকাতে পারব না। সত্যকে জেনে, মেনে তবেই তুমি সেই স্বপ্ন রচনা করতে পারবে যা বিলীন হয়ে যাবে না। যা আমার দেশের মতো মরুভূমিতে মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাবে না।

বেলের মন এখন এত সুখে বিভোর যে সে এই ভারী কথার মধ্যে যেতে চাইল না। দুজনের জীবনে সাংসারিক হিসাবে অনেক বাধা আছে। বিভিন্নতা আছে। সেগুলির সঙ্গে সে না করতে পারছে বোঝাপড়া, না করতে পারছে অতিক্রম এবং তা না করতে পারা পর্যন্ত সে তো বাপ মাকেও গিয়ে বলতে পারছে না কিছু।

তাই সে বাধা দিল—থাকুক ঐ সব ভারী ভারী আলোচনা। রমবার্গের জীবনীটাই জানতে চাই। কারণ তুমি যে একদিন ওর চেয়েও সফল হবে এই প্রত্যাশায় আছি।

—না, না, আমার স্বপ্ন, আমার আকাঙ্ক্ষা অতদূর পর্যন্ত পৌঁছোনো অসম্ভব। কিন্তু তুমি এসেছ আমার জীবনে উষা হয়ে। দিয়েছ উপনিষদের আহ্বান—'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' তাই তোমায় আশায়-ভরা হিয়া নিয়ে

এই শিল্পীর সাফল্যের কাহিনি শোনাচ্ছি। প্রত্যেকের সাফল্যের মধ্যে নিজের সোপান সন্ধান করছি।

রমবার্গ ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ছাত্র। বড় বড় নদীতে বিরাট সেতু তৈরির কাজের স্বপ্ন দেখত। কিন্তু গরিব পিছুপড়া হাঙ্গেরিতে তার জন্য কোনও সুযোগ ছিল না।

এল সে প্রত্যেক অ্যাম্বিশাস ইয়োরোপীয় তরুণের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ আমেরিকাতে। পকেটে নেই পয়সা। হাতে নেই কাজ।

তা বলে সে বেকার থাকবে না। বাবার সামান্য পুঁজি থেকে সাহায্য নেবে না। সে বাজাতে জানত। নিউইয়র্কের নিম্নবিত্ত পাড়াতে এক হাঙ্গেরীয়ান রেস্তোরাঁয় সামান্য হাত খরচা আর দুবেলা খাওয়ার বিনিময়ে বাজাতে শুরু করল। পাঁচ বছর চলল এই।

শেষ পর্যন্ত এই হাঙ্গেরীয়ান গুলাশ রান্নার মশলা মাখা গন্ধ আর খানা টেবিলের লাল চৌকো কাটা টেবিল ক্লথের চার পাশে কত ভিড় জমছে নজর করার হাত থেকে তা উদ্ধার করল বিখ্যাত কম্পোজার শ্যুবার্ট বংশের শিল্পীরা।

একদিন ওরা নেহাতই আকস্মিক ভাবে ক্লান্ত হয়েই রেস্তোরাঁয় এসে বসেছিল। বাজনা শুনে সোজা নিজেদের ব্রডওয়েতে চালু গীতমুখর পালার জন্য বাজাবার কন্ট্রাক্ট করে নিয়ে গেল।

যে তরুণ কেবল সখের জন্য এককালে যোহান স্ট্র্যাসের প্রতিষ্ঠিত সংগীতশালাতে যাতায়াত করত সে নদীর এপার ওপার সেতু বাঁধার স্বপ্ন থেকে সরে এসে ভাবীকালের প্রেমিক মনের এপার ওপার গানে গানে স্মরণীয় করে বেঁধে ফেলল। তার 'ইউ আর মাই সঙ্গ অব লভ' তুমিই আমার প্রেম গাথা চিরকালের গান হয়ে গেল।

মাথাটি রমেনের দিকে পরম নির্ভরশীলভাবে হেলিয়ে দিয়ে বেল প্রশ্ন করল—কেমন করে এই পরিবর্তন সম্ভব হল, রামন, কোন্ জাদু মন্ত্রে?

রমেন গভীর ভাবে বলল—প্রেম, সংগীতের প্রেম আর নিজের মনীষা। তৃতীয় কোনও কারণ ছিল বলে জানা নেই।

দুটি প্রেমসিক্ত আঁখি প্রিয়ের দিকে মেলে বেল যেন নিজের মনকেই বলল—তুমিও তো সেই রকম যাদুমন্ত্রে সত্যিকারের স্টুডেন্ট প্রিন্স হয়ে উঠতে পারো, রামন।

রমেন মনে গেঁথে রাখল ঊষার আলোভরা বাণী।

কিন্তু কাহিনি চালিয়ে গেল রমবার্গের। যার অলোকসামান্য সাফল্য ওর মনেও আলো এনে দিচ্ছে। আশায় ভরিয়ে তুলেছে। ঊষার অরুণ আলোয়।

রমবার্গ ভিয়েনার অপেরাটার ঢঙ আর ঘরানাকে আমেরিকান মঞ্চে রোপণ করল। ভিয়েনা তো, জানো তুমি, এমন একটা নগরী যেখানে পুব আর পশ্চিম প্রেম নিয়ে, উত্তর গান দিয়ে আর দক্ষিণ নাচ দিয়ে ঘেরা। সেই ভিয়েনার মে ওয়াইন অর্থাৎ বাসন্তী সুরার মাদকতা মাতিয়ে তুলল বিশ্বের মনকে। কিন্তু হুবহু চালান করে আমাদানি করল না সেটা।

তা করলে ওর গানের সুর পৃথিবী তোলপাড় করে তুলতে পারত না। সে ভিয়েনার প্রাণের মাঝে ধরে রাখা পরম্পরাকে পরিবর্তন করে নিল।

—তার মানে? ঠিক বুঝলাম না।

—মানে, এই ধরো, ব্লু ডানিয়ুবের নীলের সঙ্গে একটু আমেরিকান ইন্ডিগো মিশিয়ে নেওয়া। মানে, নিজের রচনায় ভিয়েনীজ ওয়ালজের সঙ্গে মিসিসিপির জ্যাজ মিশিয়ে নেওয়া।

প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল বেল। তবে পাবলিক লাইব্রেরি তো।

ওরা নিরিবিলিতে নিরালা কোনায় বসে আছে। হঠাৎ হাততালি দিলে হয়তো কোনও কর্মী বা ছাত্র এসে হাজির হবে।

বেল বলল—আশ্চর্য, ছবির মতো তুমি ব্যাপারটা ফুটিয়ে তুলেছ। তুমি এককালে বিরাট উঁচুস্তরের জার্নালিস্ট এবং তার চেয়ে বড় কিছু হবেই হবে।

গভীর ভাবে রমেন স্বীকার করল—আমার সেই দুরাকাঙ্ক্ষা হয়েছে তোমার ভালোবাসা পাবার পর থেকে। তাছাড়া, তাছাড়া...।

বিনা সংকোচে বলো রামন, তাছাড়া আর কী তুমি ভাবছ।

আরও একটি রমবার্গের কাহিনি তোমায় জানাতে চাই। কুড়ি বছর পরে রমবার্গ দেশে ফিরল। দেশে, বাপ-মায়ের কাছে। তাঁরা শুনেছিলেন ছেলের খ্যাতির কথা। কিন্তু ছেলেকে দেখেননি এতদিন। ছেলে যখন সেই গ্রাম্য শহরে ফিরে এল তাঁরা সেই বিখ্যাত মিউজিক শুনতে চাইলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত আছি এই বলে সেদিনকার মতো ক্ষমা চাইল; পরের দিন অজুহাত দেখাল যে মেজাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

বেশ কয়েকদিন এমনিভাবে ছেলে এড়িয়ে গেল। বাপ মা নিরাশ হয়ে হয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ এক বিকেলে রাজা মহারাজার যোগ্য একটি ঝলমলে ঘোড়ায় টানা গাড়ি বাপ-মাকে শহরে টাউন হলে তুলে নিয়ে গেল। সেখানকার ম্যানেজার সসম্মানে তাদের একেবারে রয়্যাল বক্সে এনে বসাল। ছেলে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে কোথায় যেন চলে গেল। অডিটোরিয়ামে একা দুই বুড়ো বুড়ি।

হতভম্ব। ওরা একেবারে হতভম্ব। কোনও মানে খুঁজে পেলেন না এমন তাজ্জব ব্যাপারের।

হঠাৎ ষাটজন বাদকের অর্কেস্ট্রা তাদের বাদ্যযন্ত্র টিউন আপ করতে আরম্ভ করল। ফ্যান ফেয়ারের মোহন আওয়াজে উচ্চকিত হয়ে বৃদ্ধ দম্পতি জেগে উঠে দেখলেন কনডাক্টারের বেটন হাতে ইভনিং ড্রেস পরে ছেলে উইংস থেকে বেরিয়ে এল।

ছেলে পিতা-মাতাকে গভীর ভাবে নত হয়ে মঞ্চ থেকে প্রণতি জানাল।

তারপর শুরু হল ছেলের সৃষ্ট সুরঝংকার। সেই সুরের সুরধনী যা রেকর্ডে শুনে লোকে মনে করত যে 'লভার কাম ব্যাক টু মি', 'ব্লসম টাইম' প্রভৃতির রচয়িতা রমবার্গ আর বর্তমানে ইহলোকের পিয়ানো বা অর্কেস্ট্রা বাজায় না। পরলোকে গিয়ে অমর সুরকারদের সঙ্গে বসে সোনার হার্প বাজিয়ে থাকে আজকাল।

দু'ঘণ্টা চলল সেই সুরলহরি।

সংগীতের ইতিহাসে এই একটিমাত্র রজনী যেখানে ছিল দুটি মাত্র শ্রোতা, তিন জোড়া চোখের অশ্রু। আর একটিও করতালি নয়।

আমিও উষা, আমিও এমনি করে সফল হয়ে বাবা মার সামনে দাঁড়াতে চাই।

একটি মাত্র শ্রোতা বলে নীরব হয়ে রইল। সাক্ষী রইল শুধু লাইব্রেরি কাফ লেদার আর সোনালি কারুকার্য বাঁধানো পুস্তক প্রহরীরা। ঠিক এমনি নীরবে ভরা দুজনে স্টুডেন্ট প্রিন্স গীতনাট্যের থারথুয়েলা অভিনয় দেখান।

ম্যাটিনি শো। সাংবাদিকতার সিনিয়র বিদেশ থেকে আসা ছাত্র হিসাবে রমেন কনসেশন টিকিট জোগাড় করেছিল দুটি। হোটেলে সবাই জানত বেল গেছে লাইব্রেরিতে আর রামন ইউনিভার্সিটিতে।

কি অদ্ভুত জমকালো অভিনয়। রম্যপ্রদ মধ্যযুগের কস্‌টিউম। রোম্যান্টিক হাইডেলবার্গের মন মাতানো সিনারি আর ঝম্‌ঝমে ঝংকারে ভরা অর্কেস্ট্রা সঙ্গে অভিনয়। গান প্রত্যেক দৃশ্য মন কেড়ে নিচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে শিল্পকলা সংগীতে মূর্ছনায় একাত্ম হয়ে উঠেছে।

কার্লসবার্গ নমে একটি রূপকথার রাজ্য। যুবরাজ কার্ল ফ্রান্‌জ রাজধানীতে বসে বসে 'বোরড' হয়ে গেছে। অতএব সে আনন্দে ভরা মনোহর শহর হাইডেলবার্গে গোপনে ছাত্রের ছদ্মবেশে এসে হাজির। সুন্দরের ধ্যান লীন রাইন নদীর আর তন্দ্রাভরা নেকার নদীর সঙ্গমে এসে সে সংগীতের, জীবন সংগীতের সন্ধান পেল।

'গোল্ডেন ডেজ' সোনালি দিনগুলি এই গানের মাধুর্যে সব শ্রোতা আত্মহারা।

বেল আর রমেনের হাতে হাত ধরা। যে ভাষা তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তা ওই সোনালি দিনগুলির মতই মধুতে ভরা মধুক্ষরা।

গীতগোবিন্দের রাখাল প্রেমিক, বিহরতি হরিরিহ সরস বসতে। এখানে ছদ্মবেশী ছাত্র ফুলে ফুলে ভরা বসন্তে ছাত্রদের সঙ্গে গাইতে গাইতে সোনালি আপেল নামে রাইন্‌ অর্থাৎ সরায়ে এসে হাজির হল। ড্রিংকিং-এর মধ্যে ওরা রোম্যান্সের জয় গান গাইল। সরাইয়ের মালিকের মেয়ে কথিত এই সুন্দরী নারী সম্বন্ধে একটা খুব আবেগভরা গান ফ্রান্‌জকে উপহার দিল।

বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে পরিণত হল। "ডীপ ইন্‌ মাই-হার্ট ডিয়ার" গানটিতে দুজনে মনের গহনে যে প্রেম সঞ্চার হয়েছে তা প্রকাশ করল। তার স্বীকৃতি দিল।

প্রেমের প্রেরণায় প্রিন্স একটি সুন্দর সন্ধ্যায় ক্যাথির বাতায়ন তলে প্রেমের গান সেরেনেড গাইল।

কিন্তু হায় ৰূপকথাব প্রেম বামধনুব বঙেব মতই মিলিয়ে যায়।

বাজপুত্রকে বাজপথে ফিবে আসতে হল। পিতাব মৃত্যুব পব। বাজনীতিব শাসনে একটি বাজকুমাবীকে বিযেও কবতে হল। তাব আগে ক্যাথি আব ফ্রানৎজ বিদাযবেলায মানতে বাধ্য হযেছিল যে এই প্রেম জীবনে, সংসাবে আসন পাবে না। তাবা গাইল বার্ডস আব উইঙ্গিং। বলাকা উড়ে যায। হায উড়ে যায।

প্রিন্স কিন্তু সবাই কন্যাকে ভুলতে পাবল না। বাজা হযে বাজপুত্রীকে বিযে কবাব পবও সে আবাব হাইডেলবার্গে এসেছিল। ক্যাথিকে শেষবাবেব মতো ভালোবাসাব বিদায জানিযেছিল।

ওবা যে এত গভীব ভাবে আত্মহাবা হযে গান কবেছিল জাস্ট উই টু—

শুধু আমবা দুজনে।

সে গানেব বেশ শেষ হযে গেল এই ভাবেই।

ওবা শপথ কবল যে বাইবেব জগতে যদিও এই হচ্ছে শেষ বিদায ওবা যে ভালোবেসেছিল পবস্পবকে সেকথা কোনও দিনও ভুলবে না।

প্রীতিব স্মৃতিকে বিস্মৃতি দিযে ডুবিযে কি দেওযা যায?

ওবা দুজনে মানে বেল আব বমেন কাহিনিটি তো জানত না।

বমেন প্রাণপণে স্মবণ কবল কবিগুরুব নিজেব মুখ থেকে শোনা কবিতা মহুযাব আবৃত্তি। 'নির্ভয' নামেব কবিতা।

'আমবা দু'জনা স্বর্গ খেলনা
গড়িব না ধবণীতে

*** *** ***

কিছু নাহি ভয, জানি নিশ্চয
তুমি আছ আমি আছি।

বমেন প্রাণপণে স্মবণ কবল। আব বেল? বেল হাততালি দিতে ভুলে গেল। জগৎসংসাব ভুলে গেল। চাবদিকে বাব বাব হাততালি পড়ছে। বাব বাব কার্টেন কল হচ্ছে অর্থাৎ মুগ্ধ দর্শক শ্রোতাব দলেব উচ্ছ্বসিত কবতালি প্রচ্ছদপটকে উঠিযে দিচ্ছে। কুশীলববা পাদপ্রদীপেব সামনে এসে ওদেব আনন্দ অভিনন্দন বাব বাব হাসিমুখে নত মাথায গ্রহণ কবছে।

কিন্তু বেল কাকে অভিনন্দন জানাবে? কী কবে জানাবে? কোন্ প্রাণে।

সবাই প্রায যখন বেব হযে গেছে তখন ওবা দুজনে নীববে বেবিযে এল।

বেল শুধু প্রশ্ন কবল—বামন, তুমি কি জানতে এই গীতিনাট্যেব কাহিনিটা?

প্রায কান্নাব সুবে বমেন উত্তব দিল--বিশ্বাস কবো বেল, আমি শুধু এব সংগীতেব প্রশংসাই শুনেছিলাম। আব পালাটাব নামে আকৃষ্ট হযেছিলাম।

একটু পবে বমেন বেলকে ভবসা দেবাব চেষ্টা কবল—উশা, গল্প তো শুধু গল্পই। তাতে অত ঘাবড়ালে চলে? তা হলে সংসাবই অচল হযে যেত।

ম্লান ভাবে উষা বলল—তবু, তবু কেমন একটা ট্র্যাজেডিব ছাযা এসে পড়েছে শেষটাতে। অত আনন্দ যদি আসে প্রাণে, তাকে জীবন টেনে ধবে বাখতে পাবে না কেন?

বমেন সাহস দেবাব চেষ্টা কবল—জানতো শেলিব সেই কবিতাটা—আমাদেব সবচেয়ে করুণ কাহিনিগুলিই সবচেযে মধুব সংগীত। তাই বমবার্গ প্রিন্সকে দুঃসাহস দেখিযে জীবনে জযী দেখাতে চাযনি।

হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত সে বলল—আব দেখ তো। আমিও স্টুডেন্ট প্রিন্স নই। তুমিও সবাইকন্যা নও। ববং তুমি প্রিন্সেস আব আমি শুধুই স্টুডেন্ট। ফলে আমাদেব বেলা যবনিকা নেমে আসবে মিলনের মধ্যে, বিবহে নয়।

বেল শুধু একটু ম্লান হাসি হাসল।

॥ ২৩ ॥

সোনার শহর সালামাঙ্কা। স্প্যানিশ সভ্যতার শৈশবের লীলাভূমি।

আপন মনে রমেন এই কথাগুলি বলে ফেলল আপন ভাষায়।

মোটরে সহযাত্রী হয়ে সে রিবেরা পরিবারের সঙ্গে সালামাঙ্কায় এসে পৌঁছেছে। ডন তাদের মোটর চালাচ্ছে। ভোর বেলায় সূর্য উঠি উঠি করছে। ওরা সবাই এই বাংলা কথাগুলির মানে জানতে চাইল। অনুবাদ শুনে সবাই খুব খুশি।

বিশেষ করে পেপে রিবেরা। তারই প্ল্যান অনুসারে ওরা আগেরদিন রাতে কাছাকাছি একটা খুব ছোট শহরে ছোট হোটেলে বিশ্রাম নিয়েছিল।

শ্রীমতী রিবেরা পথে আবার একটা হল্ট করে ছোট্ট অজানা জায়গায় থেমে রাত কাটাতে চাননি। অনর্থক হ্যাঙ্গাম। তাছাড়া সারা পথ পাহাড়ি চড়াই উৎরাই বেয়ে মোটর চলবে। ওই হ্যাঙ্গামটা একেবারে শেষ করাই ভালো।

অবশ্য সঙ্গে বিছানা-পাট্টা বয়ে বেড়াতে হয় না। ঘটি বাটি কম্বল খাবার ব্যবস্থা এসবের হ্যাঙ্গাম পশ্চিম জগতে ঘুরে বেড়াবার সময় পোয়াতে হয় না। তবুও একটা জায়গায় অনর্থক রাত কাটাতে কে চায়?

কিন্তু পেপে সালামাঙ্কায় ভোর বেলাই পৌঁছতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন—পশ্চিম পৃথিবীতে, বিশেষ তাদের হিস্পানি পৃথিবীতে, যেখানে শিক্ষা সভ্যতার রেনায়সেন্স উদয় হয়েছিল সেখানে প্রভাত বেলাই প্রণতি জানানো মানানসই হবে এবং তিনি আরো বলেছিলেন যে আরও একটা কারণ আছে। সেটা সবাই নিজেরা নিজেদের চোখে দেখে যাচাই করে নিক। উনি আগে থেকে ফাঁস করবেন না।

সবাই সেই যাচাই করে আহ্লাদে উপচিয়ে উঠল। কিন্তু রমেনের আহ্লাদের আবও বাড়তি কারণ ছিল। ভোরের আলোয় তার জীবনে একটি নতুন আবিষ্কার।

উষার অরুণ আলো এসে পড়েছে শুধু পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটি বিরাট ক্যাথিড্রালের চূড়ায় চূড়ায় নয়, তার উষার প্রসাধনহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভরা মুখখানিতে। উষার আলোর প্লাবন প্রসাধন।

দেখে রমেনের সংস্কৃত কথাটির কথা মনে হল প্রিয় প্রসাধন। সংসারে আর কোনও প্রেমিক কী এমন করে স্বভাব সৌন্দর্যের পটভূমিতে প্রকৃতির প্রসাধনে তার প্রেয়সীকে দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছে কখনও?

শহরের সীমান্তে টর্মেস নদীর পারে পুরাকালের রোম্যান সেতুর উপর মোটরটা ডন থামাল। সবাই নেমে এল।

নদীর পারে সেতুর নিচে রজকিনীরা হাঁটু গেড়ে রাজ্যের কাপড় চোপড় নিয়ে পরিচ্ছন্নতার দেবীর উপাসনা করছে।

এই মুহূর্তে রমেন রজকিনীদের ধোপানী বলে মনে করতে পারল না। কাপড় কাচাকে মোটেই বৈষয়িক সামান্য কাজ বলে মনে হল না। একটা আভিজাত্য আছে তাতে।

সমস্তটা সংসারই যে সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ওই রবিরশ্মির পথ বেয়ে রমেন নিমেষের জন্য প্রাচীন ভারতের আর্য জগতে ফিরে গেল।

সে যেন সেই সত্যিকারের খাঁটি আর্য। সে উষার প্রশস্তি করছে। সেই উষা, যে ঋগ্‌বেদের গানের অনুসারে পুরুষকে কর্মে প্রেরণা দেয়। যে স্বর্গের দুহিতা আনন্দিত মনে জ্যোতির্ময়ী হয়ে উদয় হয়। দিনে দিনে প্রভূত সৌভাগ্য এনে দেয়। অন্ধকার দূর করে দেয়।

সে মনে মনে ঋগ্‌বেদের উষাসূক্ত আউড়িয়ে গেল। এই চিরযৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা আকাশ-কন্যা উষা আজ চোখের সামনে অন্ধকার দূর করে দাঁড়িয়ে আছে।

চকিতে রমেনের সেই সূক্তগুলিও মনে পড়ল যেখানে উষাকে আহ্বান করা হচ্ছে যে হে যুবতী, সুন্দর দীপ্তিতে মোহন হাসিতে তুমি আমার সামনে বক্ষোস্থল অনাবৃত করে।

সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে সামলিয়ে নিল। আজও নয়, এখনও নয়।

রমেনের ধ্যান ভঙ্গ করে পেপে বললেন—বুঝেছ তুমি নিশ্চয় রামন, কেন আমরা ভোরবেলা এখানে এসে পৌঁছোলাম। আমাদের পিছন অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠছে। তার আলো পশ্চিমে নদীর ওপারে, প্রাচীন রোম্যান সভ্যতার সেতু পার হয়ে সালামাঙ্কার গীর্জাগুলির চূড়ায় চূড়ায় পড়ছে। ভেবে দেখ এই

চিত্রটির সার্থকতা।

একটু থেমে আবার বললেন—তার চেয়েও প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এথেন্সের পার্থেনন মন্দিরগুলির মর্মর পাথরের বর্তমান রঙের মতো রঙ দেখাচ্ছে এই গীর্জাগুলির পাথরে রোদের আলো পড়ে। তুমি বোধ হয় জানো না আমি গ্রীসে পোস্টেড হয়েছিলাম। বেল জন্মেছিল এথেন্সে।

বেল—গ্রীস-যবনী—হেলেন—চন্দ্রগুপ্ত।

ভোরের আকাশের প্রায় অস্ফুট তারায় তারায় যেন আলোর অলকালীলা জেগে উঠল।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন বীর। হলেন বিজয়ী। আইয়োনীয়ান অর্থাৎ যবন সম্রাটের কন্যাকে লাভ করলেন। আমি কি কোনদিন বিজয়ী হয়ে সংসারে মাথা তুলে এই রাষ্ট্রদূতের যবনী কন্যার পাণি প্রার্থনার যোগ্য হতে পারব?

দেখো, দেখো, রামন, ওই পুরোনো যুগের পাথরে বাঁধানো রোমান্টিক পথ গলি দেখ। ইউনিভার্সিটি, গীর্জাগুলি, মঠ আর মনাস্টারী, কনভেন্ট আর প্রাসাদ, সবই গ্রীক্ মার্বেলের রঙের প্রলেপ পেয়ে গেছে এখন। এইটেই তোমাদের দেখাতে চেয়েছিলাম। দেখ, দেখ, এই সোনালি দেওয়ালগুলিতে, নিজের বাসের কামরা লজিংগুলির দেওয়ালে আগেকার দিনে ছাত্ররা লাল গেরি রঙে নিজেদের নাম খোদাই করে যেত।

শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৃষ্টিতেও সেগুলি ধুয়ে যায় নি। একটু নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি বললেন—ঠিক যেমন করে প্রতিভার স্বাক্ষর মুছে যায় না।

শ্রীমতী বিবেরা মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন—পেপে, আসলে দেখছি যে তুমিই কবি। কী ব্যাপার বলো তো?

পেপে হেসে বললেন—ভুলে যেয়ো না, আমার আমাদা, যে আমি এককালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছিলাম। হিস্পানি অবদানের মধ্যে সালামাঙ্কার স্থান সম্বন্ধে একখানা গুরুগম্ভীর বক্তৃতাও দিয়েছিলাম। ফলে পেলাম কী তা তো জানো। ডক্টরেট হনরিজ কজা। অবশ্য অনারারী ডক্টরেট নামের সঙ্গে লেখা নিয়ম নয়।

শ্রীমতী খুব আনন্দের সঙ্গে বললেন—সে কথা কি কখনও ভোলা যায়। এই ইউভির্সিটি অক্সফোর্ড প্যারিসের সঙ্গে সম্মানের এক সারিতে বসে আছে। আর সমান ভাবেই প্রাচীন সেই প্রতিষ্ঠান তোমায় এত মর্যাদা দিয়েছে।

আমিও সেখানে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাব। রেকটরকে বলেছি যে আমার সঙ্গে একজন ভারতীয় যুবক আছে যে কবি সম্মেলনে টেগোরের কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে চমৎকৃত করে দেবে। সালামাঙ্কা আর শান্তিনিকেতন। ভেবে দেখ ব্যাপারখানা। রামনকে বিদায় দেওয়ার আগে একটা নিরীহ উপহার। পেপে মুচকি হাসলেন।

কিন্তু শ্রীমতী বললেন—সর্বনাশ করেছ। রামন যথেষ্ট সাহিত্যিক স্প্যানিশ জানে না। যখন সভার সকলে অনুবাদ শোনানোর দাবি করবে তখন?

কি আছে, বেলকে একটা শেষ সুবিধা দেব রামন চলে যাবার আগে মিশবার জন্য। বেলই অনুবাদ করবে আর তা পড়বে। তাতে ওরও পরিচয় আর স্বীকৃতি হবে।

ছাই হবে। আমার ভালো লাগছে না। এবাব রামন আর বেল আবার নিরালায় মিলবার সুযোগ পেল এবং আসন্ন বিরহের বিদায়ের সন্ধ্যাটুকু অস্ত আলোয় মধুর বিধুর মদির হয়ে উঠল। রামন অনেকক্ষণ চিন্তা করল। বিদায়ের চরম মুহূর্তে হৃদয়ের পরম স্বীকারটুকু ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সেই সময়ের জন্য মানানসই কোনও কবিতা তার মনে এল না। মাত্র একটি সোনার সন্ধ্যা হাতে। কবিতা বড় হলে চলবে না; তার বিরাট সভাগৃহে উচ্ছ্বসিত লোকদের সামনে তার ভুলভ্রান্তি বা থেমে যাওয়া সর্বনাশ সৃষ্টি করবে। এবং বেলের পাশে দাঁড়িয়ে। এবং এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করতে হবে যার ভিতরের মানে বেলের কাছে প্রেমের প্রকাশ্য স্বীকৃতি মনে হবে। অতএব রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতার শরণ নিতে হবে।

ওঃ ঠিক তো। তাতে আরও মনের কথা বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। যেন এই দেশ আর তার বরনারী দুজনকেই মনে মনে আবাহন করছি। যা একজনই বুঝবে। এমন গান যা একটি দেশের আত্মা আর একটি মানব মানসী দুজনকেই শোনানো চলে।

ভাবতে হবে কী সেই গান যা এই সুন্দরী এস্পানা ও তার মধ্যেকার সেরা প্রেয়সী দুজনকেই এক সঙ্গেই উদ্দেশ্য করা যায়। লোক তো আর বুঝবে না।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনী
(স্পেন বিদেশিনী)
তুমি থাকো সিন্ধু পারে
ওগো হিস্পানি,
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে,
ওগো হিস্পানি।
আমি আকাশে পাতিয়া কান
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ,
ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারই দ্বারে,
ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাকো সিন্ধু পারে
ওগো হিস্পানি।

আনন্দে বিহ্বল, উল্লাসে তন্ময় অনুবাদকারিণী বেল গানের সুর সঙ্গে সঙ্গে গীটারে তুলে নিল। সে কথা আর কেউ জানল না।

কবি সম্মেলনের ডিরেক্টর ওদের দুজনকে স্টেজে তুলে দিলেন---সিনর রামন পিয়েত্রো, সিনরা ইসাবেল পিয়েত্রো। বিশেষ আনন্দের কথা যে টাগোরের কবিতা মূল আর অনুবাদ এই দম্পতি পরিবেশন করবেন। হতভম্ব অভিভূত রিবেরা দম্পতি শুনলেন রমেনের আবেগময় আবৃত্তি, ইসাবেলের সুরেলা অনুবাদ ও বিস্ময়ের পর বিস্ময় সবার শেষে রমেনের গুনগুন করে গানের সঙ্গে বেলের গীটার ধ্বনি।

'ওলে' 'ওলে' এই করতালি মুখর বাণীতে বিরাট কবি সম্মেলনের ঘর ভরে গেল।

ওলে? উলু? ওটা কি উলু ধ্বনি? ওটা কিসের স্বীকৃতি?

॥ ২৪ ॥

উলু ধ্বনি দিয়ে হল মিলনের স্বীকৃতি
উৎসব দিয়ে সবে সেই মিলনের স্বাগত।

অন্তত দুটি অন্তর মুগ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মাকে সেই আশ্বাস দিল।

রমেনের কবিতা পাঠ আর বেলের তার অনুবাদ আবৃত্তি দিয়ে কাব্য আসর শেষ হয়েছিল।

এবার শুরু হল কবি সংবর্ধনার জন্য উৎসব। কবিরা সবাই একসঙ্গে সারি সারি বসেছিল মঞ্চে। অনুবাদ পাঠের সুবাদে বেল রমেনের পাশে।

সামনের সারিতে দর্শকদের ও শ্রোতাদের মধ্যে বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে ছিলেন রিবেরা পরিবার। তাদের দুপাশে পুরসভার কাউন্সিলার আর ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের দল।

তাদের সামনে গম্ভীর ভাব ধারণ করে নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মনের মধ্যে ওই অদ্ভুত সুন্দর কবিতার অন্তরের মধ্যেকার ভাবটি ওদের কাছে হয়তো ধরা পড়ত না। হয়তো একটু চকিত সন্দেহের বিদ্যুৎ উঁকি দিয়ে বাস্তব অনুষ্ঠানসূচীর ভিড়ে মিলিয়ে যেত।

কিন্তু ইউনিভার্সিটির রেক্টর মুখে বলার ভুলে অজান্তে মনের সত্যকে যে ভাবে প্রকাশ করে ফেললেন তার পর থেকেই সন্দেহটা ঘনিয়ে উঠতে লাগল। এদিকে ওদের দুজনকে মঞ্চের উপর নিয়ে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছে। কাজেই বেলকে তার ব্যবহার বা ভাবভঙ্গিতে একটু সমঝিয়ে চলবার সম্বন্ধে সাবধান করে দেবার সুযোগ হল না।

মেয়েটা আবার কাব্যরসিক। অনেকটা আধুনিকা বলে হিস্পানি সমাজের অনুশাসনের পরোয়াই করে না। অথচ মনটা এত সাদা, নিষ্পাপ যে এসব সম্বন্ধে সোজাসুজি কোনও হুঁশিয়ারি শোনালে তার মনটাই ব্যথা পাবে।

উঠতি বয়সের মেয়ের মা বাপের হাজারো সমস্যা। সমস্যাটা বড় প্রকট হয়ে উঠল মেয়ের আবৃত্তির মধ্যে। অত আবেগ, অত অন্তর নিংড়ানো মাধুর্য, অত প্রেমে ভরা প্রেমে ঝরা সুরেলা স্বর সে কোথায় পেল? আর ওব গীটার বাজানো?

আচ্ছা, এস্পানিয়াকে রূপসী নারীরূপে বন্দনা, তিলোত্তমা রূপে বর্ণনা এসবের একটা সংক্রামক প্রেরণা না হয় আছে। কিন্তু আবৃত্তির শেষে উদ্বেলিত বুক উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে যার দিকে বেল বার বার তাকাচ্ছিল--- শুধু তাকাচ্ছিল বললে ঠিক হবে না—দৃষ্টি বিনিময় করছিল সে তো শুধু কবিতার রচয়িতা নয়। সে যে রক্ত মাংসের মানুষ, আরক্ত তারুণ্যের প্রতিমূর্তি। রামন।

রামন পিয়েত্রো।

সেই রামন যে কদিন আগে ডিনারের পর হোটেলে লাউঞ্জে কফির পেয়ালার সামনে বসেছিল। নিশ্চয়ই জানত যে ব্যাংকোয়েট রুম থেকে বেরিয়ে আমরা ওকে দেখতে পাব। এবং অবশ্যই শুভেচ্ছা জানিয়ে ওর সঙ্গে বসে খানিকটা আলাপও করব।

করছিলামও তাই।

জিজ্ঞেস করেছিলাম সে কার বই পড়ছে।

সে সন্তর্পণে বইটা বন্ধ করে ফেলেছিল। শুধু বলেছিল, রুবেন ডারিয়োর কবিতা।

কে না জানে যে ডারিয়োর কবিতা এত বেশি এক্‌সোটিক যে তাকে অনেক সময় কুইকসোটিক মনে হয়। তার প্রেমের কবিতায় এত জ্বালা আর এত আগুনের হলকা যে হিস্পানি পৃথিবী তাকে সামলাতে পারে না।

সেই আগুন ভরা নিঃশ্বাসে স্পেনের বহু প্রেমিক-প্রেমিকার মন ঝরা পাতার মতো ঝড়ে উড়ে গেছে।

আর রামন কি না বেশ রসিয়ে খাসা জমিয়ে সেই ডারিয়োর কবিতা পড়ছিল। লক্ষ্য বস্তুটা ছিল কে?

মেয়েও তেমনি কাব্যপাগল। দিব্যি মিষ্টি করে হেসে আমরা বসবার আগেই বলে বসল—শোনাও না, রামন, একটুখানি রুবেনের কবিতা।

ডারিয়ো নয়, রুবেন। রামনের সঙ্গে মিল আছে কিনা।

আর রামনও কিনা এমনি রসিয়ে পড়তে শুরু করল যেন যে পড়ছে সে রামন নয়, রুবেন নিজেই।

হেরেছিনু তারে কলুষবিহীন উষা,
হাসিতে তাহার অসীমা কুসুম ভাষা;
গহীন তাহার কালো কেশ পাশে
জড়ানো নিশা ও বেদন নিঃশ্বাসে।

আমরা ভেবেছিলাম যে নিজের দেশে তো বেচারা এমন গরম কবিতার আস্বাদ পায় না। তাই এতই বিভোর হয়ে ডারিয়ো পড়ছে। কিন্তু বেলের কেন এত অধীর আগ্রহ হয়েছিল?

তবু অবশ্য তেমন গায়ে মাখিনি।

কিন্তু এ যে একেবারে নিজেই একখানা জলজ্যান্ত কবি দেখছি। অবশ্য এত অদ্ভুত সুন্দর মনমাতানো কবিতা পড়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে। তবু...

তবু...। নাঃ, ওই দুজনের দৃষ্টি বিনিময়টা বড় অশোভন। একেবারে ইন্দ্রসভায়। সবার দৃষ্টি পথে। সবারই নজর যে সুন্দরী তরুণী আবৃত্তিকারিণীর মুখের দিকে একেবারে যাকে বলে নিবদ্ধ সে খেয়ালই মেয়েটার ছিল না।

পেপে বিষণ্ণ মনে মাথা নাড়লেন—মেয়েটা এত সরল, সংসারের কিছুই বোঝে না, জানে না। বেচারা

হয়তো ভবিষ্যতে অনেক কষ্টই পাবে।

মাদ্রে সায় দিলেন।

কিন্তু যোগ করলেন—তোমারই যত দোষ। অনেক দিন থেকে বলছি যে ওকে উপযুক্ত ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দাও। বিবাহযোগ্য ছেলেদের সঙ্গে বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে মেলামেশা করতে করতে এতদিনে মনটা স্থির হয়ে যেত। হয়তো বিয়েও হয়ে যেত। গাইডেড ম্যাট্রিমনি, পেছন থেকে সুতো টেনে ঘটকালি আমাদের সমাজের আগুয়ান পরিবারগুলির পক্ষে সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা। তা তুমি তো কান দিলে না। মেয়ে পড়াশুনা করছে। স্বাধীন জীবনের আনন্দ আরও কিছুদিন ভোগ করতে দাও—এই হচ্ছে তোমার মত। এখন সামলাও তার ঠ্যালা।

পেপে সংসারে অনেক দেখেছেন। অনেক সঙ, ঢঙ, অনেক রঙ।

তাই উনি এখনও বিচলিত ভাব দেখালেন না।

শুধু বললেন—মুখটা শ্রীমতীর কানের খুব কাছে এনে বললেন—তুমি মিছে ঘাবড়াচ্ছ, আমাদা। ওরকম রসাল একটা কবিতা পড়তে পড়তে যে কোনও তরুণ-তরুণীর মন একটু যেন কেমন-কেমন করে ওঠে। তোমার উঠত না?

চটে উঠলেন শ্রীমতী।

চাপা গর্জনে বললেন—তা বলে কখনও পাঁচজনের সামনে, একেবারে খোলাখুলি সভায় কারও পানে চাউনি হেনেছি?

যেন শ্রীমতীকেই শান্ত করবার জন্য, কিন্তু আসলে বেলের ব্যাপারটি ধামাচাপা দেবার জন্য পেপে মুচকি হাসলেন।

মা আরও চটে গেলেন। গালের প্রসাধনের রক্তিম রঙ ভেদ করে রাগ যেন টগবগ করে ফেটে বের হল।

তা দেখে পেপে বললেন—আমাদা, তোমার বেলা যে আমি ছিলাম। কেবল আমি, কেবল প্রিয়ে আমি। বেলের তো কেউ নেই। এই রামনের কবিতা একটা সাময়িক কি খেয়াল শুধু। খেয়ালের খেলা। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—তুমি চোখ মেলে সব দেখেও ভাবছ, কিচ্ছু নেই?

—হ্যাঁ, চোখ মেলেই বলছি। সবাই যে দেখল সেটাই অস্বস্তির কথা। তা না হলে, রামন তো আর কদিন পরেই চলে যাচ্ছে। তখন সবাই ব্যাপারটা ভুলে যাবে। বেল ও।

—তুমি কী করে নিশ্চিন্ত হচ্ছ যে রামন ঠিকই চলে যাবে? ওর এখন প্রত্যেক দিন এখানে থাকা মানে এই হতচ্ছাড়া কবিতার আবেশটাকে প্রত্যেক দিন বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাকিয়ে তোলার মওকা। একদিকে উপোষী যৌবনের দেশের উজ্জ্বল ছোকরা। অন্যদিকে কাব্য আর শিল্পে মজে থাকা সরল মেয়ে।

—শোন, প্রেয়সী। ডিপ্লোম্যাসি করে কাটালাম সারা জীবন, সারা পৃথিবীতে। যাকে বলে ফ্রম চায়না টু পেরু। আর এই ঝামেলাটা সামলাতে পারব না? প্ল্যান আমি এর মধ্যেই মনে মনে এঁটে নিয়েছি।

স্বামীর দিকে সপ্রশংস একটি দৃষ্টি হেনে শ্রীমতী সোফার মধ্যেই আরও একটু নিবিড় হয়ে এলেন।

এদিকে বেল আর রমেনও নিবিড় হয়ে এল। পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি। উষ্ণ সান্নিধ্য। উত্তপ্ত অন্তর। অন্তরঙ্গ সংগীত।

কবিরা নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ।

সব দেশে, সর্বকালে।

স্পেনের মতো সঙ্গসুধা রসে মাতোয়ারা লোকের দেশেও যে সব কবির অনুরক্ত ভক্ত। বিশেষ করে তরুণী ভক্তরা—ডারিয়োর মতো রঙিন কবির সঙ্গসুধার লোভে মধুমত্ত ভৃঙ্গের মতো ঘোরাফেরা করে সেই কবিরাও।

বিশেষ করে ইংরেজিতে যাকে বলে কমিউনিটি স্পিরিট তা কবিদের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না।

সালামাঙ্কার কবি সম্মেলন সেটা ভালো করেই বোঝে। সে জন্য ওরা যা ব্যবস্থা করে তার মধ্যে যেন নাইট অপেরার ছোঁয়া থাকে।

গায়কদের কোরাসের কথা সবাই জানে। এরা এমন একটা ব্যবস্থা করে যাকে কবিদের কোরাস বলা

চলে।

সালামাঙ্কা নিজেই যে একখানা কাব্য। কাস্টিল প্রদেশের উজ্জ্বল নীল আকাশের পটভূমিতে সোনালি প্রস্তরে খোদাই করা শঙ্খ-ঝলমল কাব্য।

কবিতা পাঠ শেষ হবার পর কবিদের সেই প্রাসাদের সিঁড়িতে পুরু গালিচা মোড়া ধাপগুলিতে বসিয়ে দেওয়া হল। মঞ্চে যে ভাবে বসানো হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই। ভারতীয় কবি আর পেরুর অনুবাদিকা আবার পাশাপাশি। বিশিষ্ট অতিথিদের বসানো হল ব্যালকনিতে।

বেলকে তার ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান করে দেবার বা সংকেত করবার কোনও সুযোগই রিবেরা পেলেন না।

কবি সংবর্ধনার জন্য নিমন্ত্রিত নর্তক-নর্তকীরা প্রথমে একটি স্কোয়্যার ডান্স অর্থাৎ চতুষ্কোণ নাচ নাচল। পুরুষ আর নারীরা পরস্পরের মুখোমুখি। গভীর সুখে সুখী নিশ্চয়ই।

ক্যাস্টানেট অর্থাৎ রমেনের ভাষায় খঞ্জনীর বদলে তাদের হাতে যে প্রেমজুড়ি কর্তালের মতো মিঠে আওয়াজ করছিল তা সেই সুখকেই তালে তালে ঘোষণা করছিল।

নাচের মধ্যেই একটি নৃত্য অভিনয়।

একজন বয়স্ক লোক একটু পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন নাচ দেখতে দেখতে প্রাণে পেল প্রেরণা আর দেহে যৌবনের জোয়ার। পুরুষ সিংহের মতো সে এক লাফে এই চতুষ্কোণের ঠিক কেন্দ্রে এসে হাজির হল। এবং একটি সুন্দরী তরুণীর ঠিক মুখোমুখি।

ওরা আম্বাভোলার মতো দ্বৈত নাচ শুরু করল। পুরুষের আবাহন গরবিনী নারী বার বার অবহেলা ভরে ফিরিয়ে দিল।

তারপর পুরুষটি প্রথমে রাগ, তারপর অনুনয়, তারপর সর্বস্ব সমর্পণের ভঙ্গিতে নাচল। ক্রমশ বরফ গলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তরুণী হল মোহিনী, হল বিগলিতা, হল স্বয়ং সমর্পিতা।

মে পোল, অর্থাৎ বসন্তের ধ্বজার চারপাশ দিয়ে লাল আর হলুদ ফিতে জড়িয়ে সবাই নাচল।

প্রেমের হল জয়। বয়স আর মন হার মেনে ওদের মিলিয়ে দিল।

ঘন ঘন ট্যাপাদ্রা অর্থাৎ প্রেমজুড়ির মধুর ধ্বনির মধ্যে এবার শুরু হল একটি একক নাচ।

সবচেয়ে সুন্দরী যৌবনবতী আর লাস্যময়ী একটি তরুণী এবার সেই প্রাঙ্গণ আলো করে মায়ায় ভরা নৃত্য-ভঙ্গিতে দাঁড়াল। সামনের সিঁড়িতে সারি সারি বসে থাকা শ'খানেক কবিকে সপ্রেম সংবর্ধনা জানাল। লীলায়িত ভঙ্গিতে। এলায়িত দেহলতা দুলিয়ে।

একমাত্র বিদেশী কবি রমেন।

তার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অনুরাগ ভরা চাহনি। রঙে রসে টসটসে ঠোঁটদুটি কামদেবের ধনুকের মতো বাঁকিয়ে সে কি যেন নিবেদন করল তাকে।

যখন রামধনুর রঙের দিকে গেল রমেনের মন তখন হঠাৎ বেল তার আরও বেশি কাছে সরে এল। আরও নিবিড় হয়ে। মধুর হয়ে।

একি প্রশংসার প্রলেপ?

একি ঈর্ষার ইশারা?

পিছনে উঁচু ব্যালকনিতে বসা রিবেরাদের নজরে পড়ল সবই। এই ঘনিষ্ঠতা, এই তন্ময়তাকে তারা ঠেকাবে কী করে?

রিবেরা গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ততক্ষণে প্রাণবন্ত একটি উদ্দাম নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। রূপসীর রূপ সেই নৃত্যপর ঘূর্ণির আবেগে চারদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন।

রমেনের মনে পড়ল বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার লাইন : শি ওয়াকস্ ইন বিউটি। এই নর্তকী যেন রূপের মধ্যে নাচছে। রূপতরঙ্গে রঙ্গে ত্রিভঙ্গ হয়ে সুরসভাতলে নৃত্য করছে উর্বশী।

সামনে বিলোল হিল্লোল উর্বশী।

পাশে, একেবারে কাছে, হিয়ার মাঝে রয়েছে ফ্যান্টম অব্ ডিলাইট। আনন্দ মায়াচারিণী প্রেয়সী।

এদিকে উর্বশীর দেহলতা নিমেষে নিমেষে সব দ্রুত গতিরঙ্গ থামিয়ে স্থাণু হয়ে যাচ্ছে।

তখন শুধু চরণের গোড়ালি দুটি মৃদু ট্যাপট্যাপ শব্দ তুলছে। কিন্তু বাহু-বল্লরী দুটি নেচে চলেছে। শূন্যে ধীরে সুধীরে নানারকম মুদ্রা এঁকে চলেছে। তারপর হঠাৎ যেন থরহরি কম্পের মধ্যে জেগে উঠে জগঝম্প প্রলয় নাচন শুরু করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের পাশ দিয়ে পিছনে চকিত চাহনি হানছে অর্থপূর্ণ ভাবে।

আর সবটা সময় মাথার উপর দিয়ে কোমরে চারপাশে হাওয়ার দোলায় চলেছে সুতীক্ষ্ণ ঝিল্লীস্বনের মতো ধ্বনি।

হঠাৎ বাজনা উল্লাসে জেগে উঠল। দ্রুত লয়ে নেচে উঠল। রমেনের মনে পড়ল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে সাজিয়ে রাখা আছে বিরাট বিরাট সব প্রাচীন গ্রীক ফুলদানি। তাদের গায়ে খোদাই করা আছে নৃত্যরত তরুণীদের মূর্তি।

ইংরেজ কবি কীট্‌সের একটি অমর কবিতার কথাও মনে পড়ল। ওড্ অন্ দি গ্রেসীয়ান আর্ন।

বিবর্ণ হবে না প্রিয়া যদিও পাওনি তার সুধা;
রূপসী রহিবে সে-ও, ভালোবেসে যাবে তুমি সদা।

এই বাজনার প্রেরণায় প্রাণ পেয়ে সেই গ্রীক নর্তকীরা যেন হঠাৎ নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে সারি বেঁধে তারা ভারতের কবি হ্যাঁ, কবি তার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই মুহূর্তে যে সে কবি, প্রেম প্রাণ পাওয়া কবি, আর তার পেরুর প্রিয়ার সামনে লীলায়িত হয়ে উঠল। জীবন ধারণ করে। রূপের সাধনে।

রমেন উষার কানে কানে শোনাল—"এভাব উইন্ট দাও লভ অ্যান্ড শি বি ফেয়ার।"

সেই গ্রীক ফুলদানিগুলির প্রেমিক-প্রেমিকার অধরোষ্ঠ এমন পরস্পরকে স্পর্শ করছে কি করছে না তা অবান্তর হয়ে গেল।

এই সহসা ফুটে ওঠা, প্রত্যাশার ওপারে কোনও গহন বনে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে অর্কিড ফুলের মতো ফুটে ওঠা রমেনের কবিতার গুঞ্জরণের সঙ্গে প্রেমিক-প্রেমিকা নাচতে লাগল। দেহের দেউল প্রান্তে একান্তে অদেহী গাথা গাইতে গাইতে তাদের অধরোষ্ঠ লীলায়িত হয়ে উঠল। তারা দুজনে মিলে হয়ে গেল অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

উৎসবের রূপসী নর্তকীদের মধ্যমণিরূপে এই মূর্তি।

মায়া, না স্বপ্ন, না মতিভ্রম? দুজনে কোনও মন্ত্রে এক হয়ে গেল?

রামন যাই নিজে মনে করে থাকুক, সমস্ত কবি আর নিমন্ত্রিতরা দু'চোখ সার্থক করে এই নর্তকীর নৃত্য দেখেছিল।

নাচতে নাচতে ঐ রূপসী সহসা তার লহরে লহরে পার্ট করা স্কার্টের উদ্দাম খুশির দোলায় বর্তমানকে তার সমস্ত বেদনা আর বাসনা সুদ্ধ একেবারে বিলোপ করে দিল।

উৎসবের শেষ হতে চায় না স্পেনে।

ওরা যেমন পরবের জন্য গর্ব করে, তেমনি তার জন্য যত্ন আর নিষ্ঠাও করে। কবি সম্মেলন —সে কী সহজ কথা? পৃথিবীতে আর কোথাও, অন্য কোনও দেশে কবিদের এই সম্মান নেই। তায় সালামাঙ্কা শহর হিস্পানি সভ্যতার দোলনা।

নাচের পর সবাইকে আবার সেই বিরাট সভাগৃহে নিয়ে যাওয়া হল। এবার কাব্যসুধার বদলে কারণ-সুধা। অর্থাৎ ককটেল পার্টি।

ঘরটিকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে নূতন করে। কিন্তু সব হিস্পানি ধরনে। কবি সম্মেলন যে জাতীয় উৎসব।

এতক্ষণে রমেন ভালো করে চারদিকে তাকাবার মতো মন পেল। কবিতা পাঠের আগে মন ছিল শান্ত। অনিশ্চয়তা, সংশয়ে ভরা। সে জানত যে সে ছিদাম মুদী লেনের সেই ছেলে, সাংবাদিকতার মতো অনাদরের সাবজেক্টের ছাত্র; বলতে গেলে, অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যের কল্যাণে লন্ডনের ছাত্র। হঠাৎ তার দেশের কবি হিসাবে তাকে এই বিরাট বনেদি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আরও, আরও অনেক বেশি স্বপ্নের অগোচর ছিল গোপন স্বপনচারিণী উষা।

কিন্তু প্রেমের কোনও সীমান্ত নেই। সীমানা নেই। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। 'মায়ার খেলার' এই গান সে দেশে বিশ্বকবির কল্যাণে শুনেছে। কিন্তু সেই মায়ার খেলা যে বিদেশে তার নিজের জীবনেই ঘটবে তা

যে সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

কাজেই প্রেমকে সে জীবনের মধ্যে আসন পেতে গ্রহণ করলেও পৃথিবীর হিসাবে ধরে নি।

কবিতা যে অন্য জিনিস। অন্য পৃথিবীরই, অন্য মনীষার ধন। শুধু মন নয়, শুধু দেহ তো নিশ্চয়ই নয়। অলোকসুন্দর সাধনার ধন। তা যে পুষ্পবৃষ্টির মতো তার মনের উপর ঝরে পড়ল এখানে। কবিগুরুর ভাষায়, "তুমি সে আকাশ ভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক"।

তবু সে স্বীকার করে যে প্রেম ছাড়া তার প্রাণে এই সাময়িক পারিজাত ফুল ফুটতই না।

সেই পারিজাতের শোভা আর সুরভি তাকে পুরোপুরি দিশেহারা করে রেখেছিল এতক্ষণ।

এবার এতক্ষণে সে কাব্যের আবেশের বাইরে এসে দাঁড়াল। থরে থরে ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজানো সোনালি, নীল রেশমী লেসের আচ্ছাদনে ঢাকা টেবিলগুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, নারী আর পুরুষ ওর চারদিক ঘিরে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গে সঙ্গে বেলও তাদের বৃত্তের মাঝখানে। ওদের কৌতূহলের পাত্রী। আকর্ষণের মধ্যমণি।

এখন তো কোনও সন্দেহই নেই যে বেল হচ্ছে হিস্পানি বংশের মেয়ে।

যারা ওর পরিচয় প্রথম 'হলে' ঢোকার সময় শোনেনি তারা ওকে রহস্য আর রোমাঞ্চময় পেরুর ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সেলেন্সি সিনর রিবেরাব মেয়ে বলে জানবে না। কিন্তু কাছে থেকে দেখে বুঝতে ভুল করবে না যে সে ভারতীয় নয়। হিস্পানি বা কোনও ইউরোপীয় হয়তো, ইটালিয়ান মেয়ে।

আর, আর তার শাড়ি এফেক্ট গাউনটির মানে বানিয়ে নিতে মোটেই দ্বিধা করবে না।

ওই বিরাট হলঘরটিকে সভাগৃহ না বললে মানানসই বর্ণনা করা হবে না। আরক্ত নয়, হালকা কমলা রঙের পাথরের উপর উদ্ধত শোভায় লতাপাতার কারুকার্য দর্শককে দিশেহারা করে তোলে। প্রায় যেন আকাশ ছোঁয়া উঁচু উঁচু থামগুলি যেন মনকে ডাক দিচ্ছে। পাল্লা দিয়ে কল্পনাকে উপরের দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমারোহ আর সাজসজ্জায় সব দিক দিয়ে অভিভূত করে ফেলবার মতো।

সেই পরিবেশে অরুণবরণী সুরার প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে একজন মহিলা সাতলহরি মুক্তা মালায় কণ্ঠ দুলিয়ে রমেনকে অভিনন্দন করলেন তার কবিতার জন্য।

পরমুহূর্তেই তিনি আরও অভিনন্দন জানালেন যে রমেনের বধূ অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিতে কবিতার অনুবাদ আবৃত্তি করে স্বামীর আর কবিতার দুয়েরই মর্যাদা বানিয়ে দিয়েছে।

রমেন জীবনে এই প্রথম একটা ককটেল পার্টিতে এসেছে। যদিও লন্ডনে ছোট ছোট জায়গায় বা কলেজের হলে ড্রিংক পার্টিতে গিয়েছে, এই রকম অভিজাত কেতাদুরস্ত ককটেল পার্টি এই প্রথম।

তবে সে শুনেছিল যে এইসব পার্টিতে মানুষের মন যখন রঙিন হয়ে ওঠে তখন কোনও কথারই সামনাসামনি সরাসরি প্রতিবাদ করতে নেই। তাতে নাকি পার্টির যতিভঙ্গ হয়। মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। এখন কী সে এই রঙিন মনগুলির কল্পনাকে ভেঙে দেবে?

দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

কিন্তু যদি পার্টির সুর কেটে যায়?

যদিও বেল তার কেউ নয়, শুধু অল্পদিনের পরিচিত বিদেশী পরিবারের কন্যা এই বেল জানায়, তাহলে কি আরও বেশি গুঞ্জন উঠবে না? একজন শুধুই ছাত্র আর অন্যজন এক অ্যাম্বাসাডরের মেয়ে? এই স্পেনের মতো রক্ষণশীল শ্রেণীসচেতন দেশে? সে একবার বেলের লজ্জারক্ত মুখের দিকে তাকাল। আর একবার দূরে যদি রিবেরাদের লক্ষ্য করতে পারে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যখন দেখল যে পেপেকে দূরে দেখা যাচ্ছে। উনিও সম্ভবত এই দিকেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। রমেন ত্রস্ত হয়। শান্তভাবে বেলকে বলল, সিনরিনা, হিজ এক্সেলেন্সি আপনার পিতা বোধহয় আপনাকে খুঁজছেন। ওই দিকে। আপনি একবার ওঁর কাছে গিয়ে দেখুন।

বেল নয়, উষা নয়, আশা নয়।

শুধু সিনরিনা। অর্থাৎ কোনও একজন বিদেশী হিজ এক্সেলেন্সির-র কন্যা। অর্থাৎ শুধু পরিচিতা। বড়জোর বন্ধুস্থানীয়া।

অর্থাৎ নানা ভাষা জানার কল্যাণেই সম্ভবত পরিচয় হয়েছিল। আর সে জন্যই সিনরিনা অনুবাদ করেছেন, আবৃত্তি করেছেন। হঠাৎ বুদ্ধিতে যতটুকু কুলাল রমেন ততটাই এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করে

দেখাতে চাইল। ওদের মধ্যে যে প্রাণঢালা চাহনি বিনিময় হয়েছে, যে অন্তরঙ্গতার আবেশ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে তা হয়তো নাচের উপর বিজলির স্পটলাইট পড়াতে অনেকেরই নজরে পড়েনি।

কাব্যরসিক আর নৃত্যরসপিপাসুদের চোখকে অত সহজে যে ফাঁকি দেওয়া যায় না সে কথা রমেন হিসাবের মধ্যে আনতেই চাইল না। অথবা পারল না।

সে ভাবতেই চাইল না যে এই সোনার শহরের উদার প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সান্ধ্য পাসিয়োতে যখন সারাটা শহরের তরুণ আর তরুণীই শুধু নয়, সমস্ত নরনারী এধার থেকে ওধার, ওধার থেকে এধারে পারাপারের বিহারে নামবে তখন তাদের চোখের কোণার হাসিতে থাকবে কাদের প্রেমের কাহিনি। মুখের কোণা দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে কোন্ ভিনদেশীদের কাব্যে মোড়া রূপকথা।

সন্ধ্যার পর সন্ধ্যায় সেই রূপকথা পল্লবিত হয়ে উঠবে নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা নিয়ে।

ঠিক যেমন করেই সভাগৃহের থামগুলিতে পল্লবিত হয়ে রয়েছে অসংখ্য কারুকার্য। উপাসনার কোণাটি একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এলাহি কাজ করা 'বাস্-রিলিফ'।

আসন্ন বিচ্ছেদের তীরে দাঁড়িয়ে দুটি পুলকিত কিন্তু ব্যথিত হিয়া যে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে, তাকাতে সাহস পাবে না সে কথাটুকু এই শিল্পকলাকে ব্যথায় স্পন্দিত করে তুলবে না।

মানুষের সুখকে তারা ভরিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু দুঃখকে পারে না সরিয়ে দিতে। অথবা সারিয়ে দিতে।

সেই রাতে সাপার শেষ করে কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে পেপে বললেন, রামন, আমাদের কী সুখেই না কেটে গেল এই সামান্য কটা সপ্তাহ। তুমি আমাদের যে আনন্দ দিয়েছ তা আমরা কেউ কোনদিনই ভুলব না।

একটু থেমে বললেন—বিশেষ করে আজ কবি-সম্মেলনে তুমি যে অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়েছ তা তোমার আসল কাজ সাংবাদিকতায় নিশ্চয়ই দেখাতে পারবে। লন্ডনে গিয়ে তোমার বাকি সময়টুকু প্রাণপণে খেটে যাও। পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে। তুমি সফল হয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করো। তোমার বাবা মা নিশ্চয়ই কত ব্যাকুল হয়ে তোমার পথ চেয়ে দিন গুনছেন।

রমেনকে বলতে গেলে প্রায় কিছুই বলতে দিলেন না। শুধু আর যে দুদিন সালামাঙ্কায় ওঁরা আছেন সে দুদিন রমেনকে নিরিবিলিতে বিশ্রাম ও লাইব্রেরিতে কাটানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। বেশ আদেশের সুরে।

আরও জানালেন যে আগের ব্যবস্থা মতোই ওরা সবাই—মায় রমেন—মোটরে সান সিবাস্টিয়ানে সমুদ্র তীরের প্রমোদ শহরে যাবেন। সেখান থেকেই রমেনের লন্ডনে ফিরে যাওয়ার সুবিধা হবে।

তবে সান সিবাস্টিয়ানে স্পেনের সব বড় বড় মন্ত্রী প্রভৃতিরা হলিডে করতে যায়। কাছেই ওরাও ওখানকার সবচেয়ে দামি হোটেলে উঠবেন। যদিও সেখানে ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেই। রমেন আশা করি কোনও সুবিধামত হোটেলে বন্দোবস্ত করতে পারবে।

এতক্ষণে রমেন আর চুপ করে থাকা সম্ভব মনে করল না। যে কোন সস্তা হোটেলে উঠে নিজের আর্থিক অবস্থাকে তুলনা করিয়ে দেবে না। সে ছাত্র, এই তার সবচেয়ে অভিজাত পরিচয়।

রমেন বলল—পেপে, আমি কোনও সুবিধামত ইয়ুথ হোস্টেলে ব্যবস্থা করে নেব। এই কটা সপ্তাহ আমার জীবনে যা আনন্দ, যা গ্রাথিয়া পেলাম তার জন্য রিবেরা পরিবারকে আমি শুধু মুচাস গ্রাথিয়াস জানাব না। সেটা হবে অত্যন্ত খেলো কথা। আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি যা পেয়েছি তা তুলনাহীন।

শ্রীমতী রিবেরা এবার মুখ খুললেন। ছেলেটির উপর যে এত মায়া পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু নিজের মেয়েকেও তো রক্ষা করতে হবে।

তিনি বললেন—ওই হোটেলে সব সরকারি মন্ত্রী সেক্রেটারির দল ওঠে বলে ওখানে তোমার হুট করে চলে আসা একটু শক্ত হবে বটে। কিন্তু তোমার ইয়ুথ হোস্টেলের ফোন নম্বর দিয়ো। আমরাই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। ভুলো না কিন্তু?

ডন উৎসাহ ভরে মাথা নেড়ে সায় দিল।

বেল একমনে চুপ করে বসে রইল।

তার দুটি পদপল্লবের শুভ্রতাকে ঘিরে শিয়াপারেল্লির শাড়ি এফেক্ট গাউনের নীলাভ জরির সোনালি ঘের একটি অপরূপ পদ্মপাতার টলমলে ভাব সৃষ্টি করেছে।

সেই দিকে তার দৃষ্টি।

রমেনেরও। আর তো দুজনে পরস্পরের দিকে সরাসরি বা চোরাচাহনিতে তাকাতে পারছে না। তাই তাদের দুজনের দৃষ্টি মিলিত হয়ে পড়ছে সেইখানে। যেখানে চরম শতদলে পরান দুটি টলমল টলমল করতে করতে মিলিত হয়ে রইল।

সেই রাতের শেষ কফি পাত্র শেষ করবার আগে পেপে সবাইকে খোশ মেজাজে একটি গল্প শোনালেন। রামন এখন গেস্ট হাউসে ফিরে যাবে। তাই ওয়ান ফর দি রোড।

একজন আমেরিকান মিলিয়নেয়ার ঘোষণা করেছিলেন যে যদি কেউ নীল ডোরাকাটা জেব্রা আবিষ্কার করতে পারে তাকে পাঁচ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেবেন।

শুনেই একজন ইংরেজ একটা সোলার টুপি, রাইফেল আর তাঁবু কিনে প্রথম জাহাজেই আফ্রিকা রওনা হয়ে গেল।

একজন জার্মান লাইব্রেরিতে হাজির হয়ে জেব্রা সম্বন্ধে যত রাজ্যের বই আছে সব নিয়ে বসল।

একজন ফরাসি একটা মিউল (অশ্বতর) কিনল। নীল রঙ দিয়ে যত্ন করে তার শরীরে ডোরা কাটল। তারপর তাকে নিয়ে হাজির হল সেই আমেরিকানের কাছে পুরস্কার দাবি করবার জন্য।

সবাইকে টেক্কা দিল একজন স্প্যানিয়ার্ড। বেশ আরামসে খুব দামি একখানা খানা খেয়ে নিল। তারপর সিগার টানতে টানতে স্বপ্ন দেখতে লাগল পুরস্কারটা সে কেমন করে উপভোগ করবে।

॥ ২৫ ॥

জাদুঘরটা যেন জাদুমন্ত্রে ফুলবাগিচা হয়ে গেল। বেল একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এমন একটা সৌভাগ্য যাদুমন্ত্রেই একমাত্র সম্ভব।

রমেন বুঝেছিল যে পেপে রিবেরা খুব স্পষ্ট অথচ ভদ্রভাবে রমেনকে তার স্থান কোথায় আর গতি কোন্ পথে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

স্পেনে রোমান্সের রাঙা আঁধার গলিতে অবাঞ্ছিত প্রেমিককে তলোয়ার নিয়ে পর্যন্ত তাড়া করা হয়ে থাকে।

আবার মেয়েরাও কম যায় না। জানালার নিচে থেকে প্রথামত প্রেম নিবেদন পেয়ে বিদায় জানিয়ে দেবার সময় প্রেমিকা হয়তো প্রেমিককে প্রশ্নই করে বসবে—ওঃ, এবার তুমি বুঝি কোনও নষ্ট মেয়ের কাছে যাবে।

কিন্তু সে সব তো হচ্ছে একেবারে মধ্যযুগের অন্ধকারের রেশ-টানা কারবার। রিবেরারা যে শিক্ষার আর যে শ্রেণীর মানুস সেখানে এসব মাটিমাখা কারবার মনের মধ্যে মেশানো হয় না।

তাদের জগতে যে মর্যাদা আর মনুষ্যত্ববোধ আছে তাতে পেপে যা বলেছেন তাই যথেষ্ট।

তার নিষেধ যেমন প্রচ্ছন্ন তেমনি পরিচ্ছন্ন।

রমেন সে ইঙ্গিত গ্রহণ করতে ভুল করেনি।

ভালোই হল যে এখানেই শেষ হচ্ছে।

তবু তো, তবু তো এখনও হাতে রেখেছে প্রায় তিনশ মাইলের পাড়ি।

এক সঙ্গে, এক মোটরে সমুদ্র-স্নানের বেলাভূমি সান সিবাস্টিয়ান পর্যন্ত পাশাপাশি নয়, তবু তো এক মোটরে। একই পথে। হৃদয়ের গতিপথও যে একই থাকবে।

পথে কোনও বড় শহরে লাঞ্চের সময় আবার তো মুখোমুখি দেখা হবে। বসা হবে।

এবং কথাবার্তাও হবে।

ওরা যে রকম সব কিছুকেই স্বাভাবিক ভাবে দেখাতে আর শেষ করতে চেয়েছেন সেটুকুর জন্যও সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছে। হঠাৎ বিদায়ও নয়।

কালচারড্ সমাজের পরিশীলিত ব্যবহার। তার শেষ বিদায়টুকুও গলা ধাক্কায় নয়, বিবেচনায় বিদগ্ধতায় ভরা।

এবং রমেনও সে বিবেচনাকে সম্মান দেবে। হাজার কষ্ট হলেও সে কষ্টকে দমন করবে। সংযমে সুন্দর

হোক তার বিচ্ছেদ পর্ব।

সে নদীর স্রোতকে লক গেট দিয়ে কেমন করে হঠাৎ সবলে অথচ সুষ্ঠু ভাবে রোধ করে দেওয়া হয় তা দেখেছে। যাকে সে ভালোবাসে তার বাবা সেই লক গেট নামিয়ে দিচ্ছেন। গিলোটিন নামাচ্ছেন না।

শুধু যে প্রেমধারা লক গেটের এপারে রয়ে গেল তা মনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফেনায় ফেনায় আকুল হয়ে থাকবে। সামনের সমস্তটা জীবন রবিরশ্মির মতো তার উপর পড়ে নানা রকম রঙ তৈরি করবে থেকে থেকে। সেই রঙের লীলাই তার স্মৃতিকে ভরিয়ে রাখবে।

আর যে প্রেমরাশি ওপারে চলে গেল তাও বিফলে যাবে না। তার জীবনের পথকে শ্যামল স্নিগ্ধ করে রাখবে। সফলতার ফসলে ভরিয়ে তুলবে।

সে কথা মনে হতেই সে উৎসাহ পেল।

ওই তিন রসিক ছোকরা যাই বলুক, যতই নোংরা হোক ওদের মন আর আচরণ সে নিজে তাতে বিচলিত হবে না।

বরং প্রাণপণে চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি সফল হতে। যদি হঠাৎ আবার অধ্যাপকের আলাদীনের প্রদীপের মতো আরও কোনও প্রদীপ তার জীবনে জ্বলে ওঠে সে তো এসে রিবেরাদের সামনে আবার দাঁড়াতে পারে।

প্রেমের দাবিতে তার পুরস্কার প্রার্থনা করতে পারে।

কিন্তু উষাকে ততদিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ করবার সুযোগ সে পাবে কী করে? কোথায়?

নিজে থেকে যেচে দেখা করতে যাওয়া কী ঠিক হবে? যদি সে যায়ও ওরা সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করবেন। ঠিক আগের মতোই মনে হবে। কিন্তু চোখ সতর্ক পাহারা দেবে। নিঃসন্দেহে নিমেয়ে তো আর ফিরে আসবে না।

এই মুহূর্তে সে কবিতাকে ধিক্কার দিল। কেন ছাই সে কবিতা আবৃত্তি করতে গেল। আর কেনই বা তাতে নিজের মনকে এমন করে গোপনতাব বাইরে নিয়ে এল? জেনে শুনে প্রিয়ার হিয়ার আড়ালটুকুও সরিয়ে দিল।

বিচ্ছেদ তো সামনে ছিলই। সামনেই থাকবে সীমাহীন মরুপ্রান্তরের মতো। এখন যে সেই মরুর পারে লবণ সাগরও এনে ফেলেছে সে নিজেই।

সেই সাগর আর সেই মরু যে কোনদিন ওরা পার হয়ে একসঙ্গে মিলতে পারবে না সে কথা ওই তিন অচেনা যুবকও অসভ্য ভাষায় কিন্তু স্পষ্ট ভঙ্গিতে মনে করিয়ে দিয়েছে।

স্বপ্নকে সৃষ্টি করা সহজ। যা সে করেছে।

সংসার তাকে কিন্তু সংহার করতে পারে আরও সহজে। যা ওই ছোকরারা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

অশান্ত চিন্তায় অস্থির হয়ে সে মিউজিয়ামে এসেছিল। যদি অতীতকে দেখে দেখে ভবিষ্যৎ না হোক বর্তমানকে খানিকক্ষণের জন্য ভোলা যায়।

কিন্তু সেই বিস্মৃতিটুকুও সে পেল না।

জগৎ জুড়ে যে বিরাট বেকার সমস্যা চলছে তার ধাক্কায় স্পেনও কম বেসামাল হয়নি। বরং হয়েছে আরও বেশি। তার নিজস্ব ধন দৌলত খুব কম। তার উপর প্রজাতন্ত্র সরকার। রাজাকে দেশ থেকে তাড়ানোব পর এখনও দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে নি। সমৃদ্ধি তো নয়ই। দারিদ্র্য বেড়ে গেছে। বেকারদের আশা নেই, অন্ন নেই, মনকে বিশ্রাম দেবার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নেই। তাই নিরুপায় হয়ে তারা দুপুরে দলে দলে মিউজিয়ামে আসে। সংস্কৃতির সন্ধানে নয়। বিনা খরচে বসে দাঁড়িয়ে সময় কাটাবার জন্য। সান্ধ্য বিহারে বের হতে গেলে একটু ভালো জামা কাপড় দরকার। সেই বেড়ানোর চরণধ্বনির তালে তালে যে স্পেনের জীবনের জলতরঙ্গ বেজে বেজে চলে।

কিন্তু মিউজিয়ামে কে আর বেশভূষার বাহার দেখতে অথবা দেখাতে আসে?

রমেন এসেছিল মনকে বিশ্রাম দিতে আর পারলে তার থিসিসের জন্য আরও কিছু তথ্য জোগাড় করতে।

কিন্তু সে যা দেখল তাতে তার মন আরও অশান্ত হয়ে উঠল। দেওয়ালে টাঙানো চিত্র বা পাথরের বেদিতে রাখা শিল্পকীর্তি দেখবে কী করে। গরিব অথবা আসন্ন দারিদ্র্যের ভয়ে সন্ত্রস্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মিছিল যে সবটুকু দৃষ্টি টেনে ধরছে।

এই যে মানুষগুলো এরা এই মিউজিয়াম দেখতে আসার মানুষ নয়। ওদের এখানে মানায় না। পাণ্ডুর মুখ আর প্রায় ছেঁড়াফাড়া পোশাকে ওদের ওই ছবিগুলির সামনে, ওই মূর্তিগুলির পাশে খাপছাড়া মনে হচ্ছে।

ওরা অবশ্য হাতদুটো অনেকেই পিঠের দিকে পিছনে জোড়া করে রেখেছে। নেপোলিয়নও তাই রাখতেন। কিন্তু সেই ভঙ্গিটি ছিল তাঁর ভাবনার ভঙ্গি, বিচার-বিবেচনার প্রস্তুতি। কিন্তু ওদের ভাবনা হচ্ছে অন্নবস্ত্রের। যুদ্ধে জয় না, রাজ্য-শাসনের নয়।

ওরা রেনেসাঁসের শিল্পকলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। কতক্ষণ বিনা পয়সায় আর বিনা প্রতিবাদে লাল গদিমোড়া সোফায় বসে ছবিগুলি না দেখে চোখ বুজে আরাম করতে পারবে তাই মাথা ঘামানোর বস্তু।

আশ্চর্য! বাড়ি গিয়ে চোখ বুজে বিশ্রামের উপায় নেই। অভাব মুখ হাঁ করে গিলতে আসবে। পেটে কিছু দিতে গেলে পকেট থেকে পেসেতা বের করতে হয়। অনুর্বর পাহাড়ি অঞ্চল ক্যাস্টিলের মাটি পকেটে কিছু তুলে দিতে চায় না সহজে।

রমেন ক্যাস্টিলের মানুষ সম্বন্ধে নোট করবার জন্যই কি মিউজিয়ামে ঢুকেছে? সে যে দেখছে একটা নীরব অলিখিত অখ্যাত জীবনশিল্প। যেখানে মানুষের হাতে কাজ নেই, পকেটে পেসেতা নেই, প্রাণে ভরসা নেই, তবু তারা আর্টের মন্দিরে এসেছে একেবারে নিঃশেষে, নিরাশ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। ওই সুন্দর মূর্তি আর তাদের রঙিন মায়ার মধ্যে খিদের হাত থেকে বাঁচবার মতো রুটি আর শীতের হাত থেকে বাঁচবার রিওহা সুরা জোগাড়ের অক্ষমতার কথা ক্ষণিক ভুলে থাকবার জন্য।

রমেন একটা বিশেষ চিন্তা মনের মধ্যে গেঁথে নিল। সে লিখবে স্পেন সম্বন্ধে যে—শতাব্দীর পর শতাব্দী স্পেন নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকার ধনরত্ন দখল করে ঘরে তুলেছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি দিয়ে সেই ঘরকে চিরকালের শোভায় ভরে দিয়েছে। কিন্তু ঘরের সকল মানুষের জন্য সামান্য অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

শুধু চিত্তের বিত্তে সংসার ভরানো যায় না।

এই চমৎকার কথাগুলি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল বেল আসছে।

হঠাৎ দুজনই দুজনকে দেখে একেবারে আশ্চর্য।

তারপরই আনন্দে অভিভূত। এত বেশি অপ্রত্যাশিত যে দুজনেই খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

বেলই প্রথমে নীরবতা ভাঙল—জান রামন, আমি এই দুদিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। আর ভেবেছি যে এখন আর দেরি না করে বাবা-মাকে তোমার কথা বলব। কিন্তু তোমায় না জানিয়ে কী করে বলি? অথচ কী করেই বা তোমায় জানাব? ওঁরা যা ব্যবস্থা করেছেন তাতে ওঁদের সঙ্গে ছাড়া একা তোমায় তো আর দেখতেই পাব না।

রমেন কী বলবে ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত শুধু..

প্রশ্ন করল, তুমি কী করে ধরলে, বেল, যে আমি এখানে আসব?

বেল জানে ওর হাতে সময় খুব কম। ওদের এই একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয়তো আর আসবেই না। কাজেই সে এইসব সামান্য কথায় সময় নষ্ট করতে চায় না।

সে দ্রুত বলে চলল—তোমার উষা তোমার গতিবিধি না জানলেও তোমায় খুঁজে বের করবে ঠিকই। আমরা সবাই মিলে এই শহরের সব কিছুই এই কদিনে দেখে সেরেছি। এখন আমি দুপুরে বাকি দ্রষ্টব্য মিউজিয়ামে যেতে চাই। তুমিও যে এটা এখনও দেখনি। বাবা মা গেছেন রেস্টুরেন্টের লাঞ্চে। ডন আমায় এখানে পৌঁছে দিয়ে নিজের ধান্দায় কোথায় গেছে। ঘণ্টাখানেক সময় পাব। চল বেসমেন্টের রিফেক্টরিতে গিয়ে বসি।

হায়! দাঁড়াবার সময় যে নাই।

ক্যান্টিনে বসে বেল কফির চামচ নাড়তে নাড়তে বলল—এখন তুমিই বল রামন, আর কি দেরি করা যায়? ওঁরা সবাই বুঝেছেন আর বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তুমিও কয়েক দিনের মধ্যে—ইংল্যান্টেরাতে চলে যেতে বাধ্য। অতএব আমরা যাতে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি, বোঝাবুঝি সোজাসুজি ব্যবস্থা না করতে পারি সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সান সিবাস্টিয়ানের প্রোগ্রাম সে ভাবেই তৈরি হয়েছে। অতএব এখনই বল আমাদের কী করা উচিত। একটা বাস্তব ব্যবস্থা বল। কবিতার ভাবাবেশ দিয়ে নিজেদের মনকে আর এড়িয়ে যাওয়ার সময় নেই।

একসঙ্গে একটানা এতগুলি কথা বলে বেল উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল।

রমেন খুব ক্ষীণ স্বরে বলল—তুমিই বল কী করা উচিত হবে। তোমার নিজের জগতে, নিজের পরিবেশে, নিজের পরিবারে রয়েছ। তোমার পক্ষে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়া এই অবস্থায় সহজ। ভালোবাসার বিহ্বলতায় ভুল করা আমার পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া...

—তাছাড়া কী, রামন?

—তোমার পক্ষে যা ক্ষতিকর হতে পারে এমন কিছুই আমি করতে চাইব না।

হিস্পানি বংশের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

—ক্ষতির কথা তুলো না রামন। যদি ভালোবেসে থাক এবং আমি জানি যে তুমি ভালোবেসেছ, হ্যাঁ আমাকে ভালোবেসেছ—তুমি যা করতে চাইবে তা কখনই আমার পক্ষে ক্ষতিকর হবে না।

—হবে না উষা? ধরো, আমরা যদি দুজনে তোমার বাবা-মার কাছে নিজেদের ইচ্ছার কথা বলি আর তারা এক তুড়িতে আমায় তাড়িয়ে দেন অযোগ্য, দুরাকাঙ্ক্ষী, চাল-চুলোহীন, পরাধীন দেশের কালা আদমি বলে তা তোমার পক্ষে কত সাংঘাতিক ক্ষতিকর হবে? ওদিকে দেশে আমার বাবা মা যদি তাদের জাতধর্ম সব কিছুর বিরোধী বলে, মায়াবিনী বলে তোমায় অভিসম্পাত দিতে থাকেন, তাহলে সেটাও তোমার পক্ষে কত ক্ষতিকর আর অপমানজনক হবে?

হতাশার সুর উষার কণ্ঠে ফুটে উঠল—তার মানে, দুটো দিকই বন্ধ? এরকম অবস্থায় দুটো প্রাণ এক হয়ে যায় কী করে?

ম্লান হাসি রমেনের মুখে ফুটে উঠল—আগেকার যুগে সে জন্যই ইংলন্ডে গ্রেট্না গ্রীনের বিয়ে চালু হয়েছিল।

ব্যাকুল হয়ে বেল বলল—গ্রেট্না গ্রীন? ইংলন্ডে আমি ঐ নামটা সমবয়সী মেয়েদের মুখে শুনেছি বটে। ব্যাপারটা কি খুলে বলতো। আমাদের একটা পথও খুঁজে বের করতে হচ্ছে।

রমেন গ্রেট্না গ্রীনের কাহিনি বলল—প্রায় দুশো বছর আগে বিলেতে এমন একটা আইন হল যাতে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করলে তা বে-আইনী হত। কিন্তু ইংলন্ডের সীমান্তের ঠিক ওপারেই একজন চোরাকারবারি গ্রেট্না গ্রামে চোরাই বিয়ের ব্যবস্থা চালু করল। নিজেকে পুরুত পাদ্রি বলে ঘোষণা করল। সে শুধু তোমাদের আর কোনও বিয়ে আছে কি না আর পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে নিতে রাজি আছ কি না এইটুকু প্রশ্ন করেই সাক্ষীদের সামনে ওদের বিয়ে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করে দিত।

—টিকত কি এ হেন বিয়ে?

—ওই পুরুত মহাপ্রভু কামারশালায় হাতুড়ি ঠুকে বিয়ের ঘোষণা করত। বলত যে দুটো লোহা যখন আগুনে তেতে লাল হয়ে ওঠে তখনই তাকে পিটিয়ে মিলিয়ে দেওয়া যায়। তাই সে জোড়া লেগে যায় তাড়াতাড়ি। আর কখনও হয় না ছাড়াছাড়ি। কিন্তু...

—কিন্তু কী, রামন?

বেচারি বেলের স্বরে কোনও উৎসাহের সাড়া নেই।

নেই রামনেরও মনে।

সে বলল—কিন্তু জীবনের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে সুন্দর ঘটনাটুকু বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধুরীতে, মহিমায়, আশীর্বাদে ভরা থাকবে না? এ কল্পনাও করা যায় না। শুধু ফুলের মালা নয়, সংগীতের দোলা নয়, শুধু দুজনের আনন্দ ঢালা আশা ভরা মিলন নয়। বিয়ে তো যে তার চেয়ে অনেক বড়।

প্রত্যয়ে ভরা অনুভব নিয়ে বেল বলল—আমিও তাই মনে করি, রামন। তাই বিশ্বাস করি। আমাদের মন্ত্রে বলে বিয়ে হচ্ছে 'টু লভ অ্যান্ড চেরিশ অ্যান্ড টু ওবে'। ভালোবাসা মনের মণিকোঠায় লালন করা, মেনে চলা! কত বড় জীবন-সংগীত, রামন। সেই সংগীত কি ভাঙাচোরা দিয়ে শুরু করা যায়?

—আমিও তো সেই কথাই ভাবি, আমার উষা। আমার উষাকে কি আমি আঁধারে ঢেকে লুকিয়ে আপনার করে নিতে পারি? সব চেয়ে নির্মল আলো, সব চেয়ে পবিত্র পরিবেশ যে এনে দিয়েছে জীবনে তাকে প্রিয় গুরুজনদের দীর্ঘশ্বাসে অন্ধকার আর অভাবের অভিশাপে অস্থির করে রাখব এটা তো চিন্তাও করা যায় না, বেল।

বেল লক্ষ্য করল যে রমেন এখন আর তাকে আশা বা উষা বলে ডাকল না।

অর্থাৎ আশাহীন ভাবে কথা কইছে। উষার আলো পাচ্ছে না।

কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। হাল ছেড়ে দিলেই লক্ষ্যপথ ঠিক থাকবে না। সম্ভবত শুধু নিরাশায় চোরা-বালিতে নয়, দুঃসহ বিচ্ছেদের ঘূর্ণিতে তারা দুজনেই তলিয়ে যাবে।

কাজেই বেল বেশ শক্ত ভাবে আলোচনার পথ ঠিক করে দিল।

বেল বলল—শোন রামন, তুমি না পুরুষ? তুমি কী ভুলে যাচ্ছ যে নারীই পুরুষের উপর নির্ভর করে।

রমেন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল—কিন্তু বেল, তুমি ভুলো না যে পুরুষ নারীর কাছে সাহস পায়, ভরসা পায়। আমাদের ধর্মে নারী হচ্ছে শক্তি, একেবারে আদ্যাশক্তি। তাই তো দুর্বল আমি, ভীরু আমি, তোমার বুদ্ধিই চাইছি।

বেল খানিকটা আশ্বস্ত হল—আচ্ছা রামন, তুমি নিশ্চয়ই জান যে আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে এন্‌গেজমেন্ট চলতে থাকে বাগ্‌দত্তা হবার পরে। অবশ্য সে সময়টাকে নানান ধরনের রোম্যান্সের রঙ দিয়ে জীবন্ত করে রাখা হয়। আমরা যদি বাবা-মাকে বুঝিয়ে লং এন্‌গেজমেন্টে আবদ্ধ থাকি যতদিন না তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছ, তাহলে কেমন হয়? তোমার তো আর খুব বেশি দিন বাকি নেই কোর্স শেষ করবার।

ম্লান ভাবে রমেন বলল—প্রথমত তোমার বাবা-মা রাজি হবেন না তাদের এমন মেয়েকে অনিশ্চয়তার মধ্যে একজন অচেনা বহুদূর দেশের চালচুলোহীন ছেলের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা হতে। পেপে জীবনে সফল স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠাবান। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, বিশ্বসংসার দেখেছেন। তাঁর উদার মনোভাবও যেমন আছে, প্রাচ্যের দুর্দশা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তেমনি হয়েছে। আর আমাদের তরফ থেকে ধর্ম আর ঐতিহ্য যে উদারতা দিয়েছে, সমাজ আর দারিদ্র্য তাকে একেবারে কঠিন ভাবে ছোট করে রেখেছে।

—কিন্তু ইংলন্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে...

রমেন বেলকে সেই তালিকা শেষ করতে দিল না।

সে বলল—ওসব দেশের উপর দিয়ে যুদ্ধের ঝড় বয়ে গেছে। সম্পদের স্বাচ্ছল্যের বানে ওদের মন ভেসে উঠেছে। ওদের নতুন জমানার ছেলেমেয়েরা যে স্বাধীনতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে তা তোমার সমাজেও নেই। আমার সমাজে তো নেই-ই। তা ছাড়া...

—তা ছাড়া, কী রামন?

—তাছাড়া সমাজকে উপেক্ষা করে, সবাইকে ছেড়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের দুজনের পথ করে নেওয়া এই বেকারির যুগে একজন ভারতীয়ের পক্ষে ইউরোপেও সহজ নয়।

—কেন, তোমার দেশে? সেখানে তোমার মতো কোয়ালিফাইড যোগ্য লোক তো খুব বেশি হবে না। তুমি তো নিজেই বলেছ যে জার্নালিজম তোমার দেশে একটা নতুন বিদ্যা। এখনও বলতে গেলে চালু হয়নি। কাজেই তোমার তো সুযোগ খুব বেশি।

ম্লান হাসি হাসল রমেন—তুমি জানো না বেল, আমার দেশে দারিদ্র্য কী সাংঘাতিক ভাবে গভীর। তুমি তা ধারণাই করতে পারবে না। অত গরিব দেশে নতুন বিদ্যা সহজে দাম পায় না। তায় পরাধীন দেশ। আমি...

বাধা দিল বেল—কাগজে যা দেখছি, ইন্ডিয়ার স্বাধীনতা শীঘ্রই এসে যাবে। তখন তো তোমার পথ খুলে যাবে। তোমার দেশ তোমাকে মাথায় তুলে নেবে। আর আমি অনেক আগে থেকেই সেই তোমাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম এই আনন্দে বিভোর হয়ে যাব।

রমেন বলল—অত আগাম স্বপ্ন দেখে অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দেওয়া চলে না। পরশু রাতে পেপে যে চার তরুণের গল্প বলেছিলেন তা কি তুমি ভুলে গেছ। তিনি আমায় সেই স্প্যানিয়ার্ড ছোকরার মতো স্বপ্ন না দেখার উপদেশই দিয়েছেন সেই গল্পে।

—কিন্তু তুমি তো শুধু স্বপ্ন দেখছ না। তাকে সত্যে পরিণত করবার জন্য সাধনা করছ।

—হায়, সেই সাধনার কোনও দাম নেই গরিব দেশে। আমি তো দেখেছি মাদ্রিদের সব চেয়ে গরিব পাড়ার চেহারা। ওই পাড়াটার নামই বা কী সুন্দর—পালোমা, মানে পায়রা। আর আমার কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকদের পাড়াগুলিও মুদি মিস্ত্রি এসবের নাম সুখে বহন করে নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। পরবের আগে সন্ধ্যায় দেখলাম পালোমা ভরে গেছে ফুল আর রঙিন কাগজের শিকলি আর নতুন রঙ করা সামনের দেওয়ালের চেহারাতে। বারান্দা থেকে লোকে ঝুলিয়ে দিয়েছে সুন্দর সুন্দর কার্পেট আর কারুকার্য করা কাপড়।

উৎসুক ভাবে বেল বলল—কই, তুমি তো আমায় বলনি। বললে আমরা সবাই মিলে দেখতে যেতাম।

রমেন আবার ম্লান ভাবে হাসল—বলিনি ইচ্ছে করেই। আমার দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনা করবার জন্যই একা গিয়েছিলাম। পালোমার চেয়ে অবস্থাপন্ন পাড়ার অভাব নেই কলকাতায়। কিন্তু কোথায় পাব সেখানে পালোমার আতসবাজির খেলা, পুরানো দিনের কস্টিউম পোশাকের বাহার, নাচগানের মিছিল। উজ্জ্বল উদ্বেলিত যৌবন অশ্রান্ত উৎসাহে ভোরবেলা পর্যন্ত উৎসব করে কাটাল, যে অফুরান প্রাণ অহরহ তোমরা সংসারের প্রত্যেক পরতে পরতে ঢেলে দিয়ে জীবনে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পেয়েছ।

—অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও রামন?

বিষণ্ণ ভাবে যেন নিজেকে শোনাচ্ছে এমন ভাবে রমেন বলল—গভীর ভাবে আমি চিন্তা করেছি বেল। সেই রোজেলাদা গোলাপবাগের মুকুন্দ সায়রের তীরে বসেই—সে চিন্তা কমলের কাঁটার মতো খচখচ করে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু ভেবে ভেবে কোনও সুরাহা পাইনি। শুধু স্বপনপারে বসে সুখের ঢেউ গুনেছি। সমুদ্র পার হবার পথ বের করতে পারিনি।

ওকে বাধা দিয়ে বেল একটু বিরক্ত ভাব দেখাল—তুমি এখনও হেঁয়ালিতে কথা বলছ। ভাবছ না যে খেয়ালি হিয়া নিয়ে আর চলবে না। বাস্তব সংসারে নেমে এস। বল, কোন্ পথে কি ভাবে আমরা এখন গেলে ঠিক হয়।

—তুমিই বল, বেল। আমার চেয়ে অনেক পরিষ্কার ভাবে তুমি বুদ্ধি দিতে পারবে।

—হ্যাঁ, আমিই বলব। আমিই একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছি। তুমি মন খুলে সহজ ভাষায় সরল ভাবে উত্তর দিয়ে যাও। সেই জন্যেই আমি এত কৌশল করে এই সময়টুকু তোমাকে খুঁজে তোমার সঙ্গে নিরিবিলি আলোচনা করবার ব্যবস্থা করেছি।

—তুমি প্রশ্ন করে যাও, বেল। আমি খোলাখুলি সব উত্তর দেব। যদি দেখি যে কোনও সমস্যা তোমার নজর এড়িয়ে গেছে তাও তোমায় জানিয়ে দেব। যত দুঃখ পাই, যত দুঃখ দিই সব সহ্য হবে যদি তার মধ্যে ছলনা না থাকে।

—বেশ, প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে তুমি যদি সাহস পাও তাহলে আমি তোমার স্ত্রী হিসাবে পৃথিবীর যে কোনও দেশে থাকতে রাজি আছি। পশ্চিমের সব আধুনিক সমাজের মেয়ের সেই সৎসাহস আছে। ভালোবেসে তারাই বিশ্বের বাসিন্দা হতে শিখেছে।

—ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু সেই সাহসী মেয়েদের স্বামীদের এমন সঙ্গতি থাকা উচিত যার জোরে স্ত্রীরা মাঝে মাঝেই নিজের আত্মীয়স্বজন সমাজের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। সেই সঙ্গতি আমার কোনও দিন হবে কি না তার ভরসা নেই। তাছাড়া আজ যার দুমুঠো চালের ব্যবস্থা নেই, কোনও দিন হবে কি না তারও ঠিক নেই, তার পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ভবিষ্যতে চলাচলের অবস্থা হিসাবের মধ্যেই আনা উচিত নয়।

—বুঝলাম। আবার তুমি আর্থিক অবস্থার কথাই তুলছ। আমি তো বলেইছি যে লং এনগেজমেন্ট আমাদের মধ্যে চালু আছে। তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। আজই আমি গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলব। যদি ওঁরা রাজি না হন, আমি তবু তোমার জন্যই অপেক্ষা করব। সেখানে ওঁদের জোর খাটবে না। জোর ওঁরা করবেনও না। ওঁদের শিক্ষা অন্যরকম।

রমেন তবু মাথা নাড়ল।

সে বলল—কিন্তু আমি সাফল্যের শুধু নয়, সঙ্গতির কোনও ইঙ্গিত না পাওয়া পর্যন্ত কী পরিচয়ে, কিসের ভরসায় তাঁদের সামনে দাঁড়াব? আজ আমি যা আমি শুধু সেটুকু নিয়ে দাঁড়ালে যে তোমারই অসম্মান করব আমি। না, বেল, তা হয় না।

ব্যাকুল ভাবে বেল বলল—তবে? তাছাড়া ওঁরা তো স্পষ্ট বুঝেছেন যে আমি তোমায় ভালোবাসি। এবং একদিন ওঁদের আশ্রয় ছেড়েই হয়তো স্বাধীন ভাবে তোমার কাছে চলে আসতে পারি। কাজেই বাগ্‌দত্তা হয়ে না থাকলে ওঁরা তো উঠে পড়ে লাগবেন আমার বিয়ের জন্য। আমার প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। অথচ ওঁরা যা করতে চাইবেন তা হবে স্বাভাবিক।

বিষণ্ণ রমেন হয়রানি আর হারমানা সুরে বলল—তা মানতেই হচ্ছে—যদিও মন মানছে না।

বেল প্রায় যেন কেঁদে উঠল—তবে? ...তবে কী আমার ভালোবাসার মধ্যে কোনও ভুল ছিল?

রমেন পরাজিতের মতো, অসহায়ের মতো প্রায় ডুবে যাওয়া মানুষের মতো আদর্শের খড়কুটো অবলম্বন করে ভেসে থাকতে চাইল।

সে বলল—না, ভালোবাসায় ভুল ছিল না। ভুল থাকে না। ভুল হয় হিসাবে। কিন্তু আমরা তো হিসাব করে—ভালোবাসতে যাইনি।

ক্যান্টিনের দেওয়াল ঘড়ি মিঠে আওয়াজ করে পাঁচবার বেজে উঠল।

বেল চঞ্চল হয়ে উঠল। তাকে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিউজিয়ামের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে হবে।

সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বলল—রামন, আমিগো ইন্টিমো, আমার প্রিয়তম, আমায় এখনই উঠে যেতে হচ্ছে। ডন দরজার কাছে অপেক্ষা করবে। কিন্তু আমাদের হিসাবে এখনও মিল হল না। সান সিবাস্টিয়ানে তোমার থাকবার জায়গা ঠিক করেই হোটেলে ফোন কোরো। আমাদের স্যুইটে আমি সব সময় ফোনের কাছে কাছে থাকব। আমার গলা শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে সব চেয়ে আগে তোমার ঠিকানা আর ফোন দেবে। তার পরে অন্য কথা। যে সব কথার জন্য আমি ফোনটা বাবা কী মাকে দিয়ে দেব।

একটু ভরসা পেয়ে রমেন বলল—কিন্তু তুমি কী করে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

হেসে বেল জানাল সে প্রায়ই ক্লান্ত আছে বলে জানাবে। এই লম্বা মোটরে পাড়ির জন্য সেটা সবাই বিশ্বাস করবে। আর সেখানে সান্ধ্য কক্‌টেল পার্টি রোজই লেগে থাকবে। বাবা-মা রোজ নেমন্তন্ন। ডনের রোজ স্বাধীন বিচরণ। সি সাইডে গরম ঋতুর মেজাজই আলাদা।

রমেন বেলের খুব কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু আরও লোক সেই 'হল'-এ আছে বলে নিজেকে সামলিয়ে নিল।

বেল প্রশ্ন করল—আমায় কিছু বলবে রামন?

—হ্যাঁ মনে পড়ছে। প্রথম রাতে হোটেল আগিলারে ঘরে ঢুকলাম। পাশের ঘরে বাজছে গীটার। সামনে টেবিলে রয়েছে এলোমেলো করে ছড়ানো কমলা ফুলের কলি। তাই নিয়ে পরে স্বপ্ন দেখতাম। কোনও নববিবাহিত যুগল ওই কমলা কলি ছড়িয়ে ফেলেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন তোমাকে নিয়ে যাব তখন একটি কলিও ফেলে যাব না। তোমাকে নিয়ে, পরিপূর্ণ আনন্দকে নিয়ে ভরা সৌরভে হবে আমাদের মধুযামিনী।

করুণ মুখে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল সাহসিনী তেজস্বিনী তরুণী।

নব বিবাহের পর কমলা কলি অবহেলায় ফেলে গেলে অকল্যাণ হয়।

॥ ২৬ ॥

রমেনও স্বপ্নই দেখছিল। প্লাজাতে। শঙ্খ গৃহের কাছে।

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।

ছেলেবেলা থেকে সবাই মুখস্থ করে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য কী কী? পরীক্ষায় সে নিয়ে প্রশ্নও করা হয়।

কিন্তু অষ্টম আশ্চর্যটি কী?

সে সম্বন্ধে লোকে একমত নয়।

রমেন যখন অধ্যাপকের কল্যাণে লন্ডন ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগে হঠাৎ ভর্তি হল তখন বারবার এই কথাটা তার মনে এসেছিল।

সে ভেবেছিল যে তার কাছে এই বিলেতে আসা, কলেজে ভর্তি হওয়া এটাই অষ্টম আশ্চর্য।

সত্যি কথা বলতে কী তাকে এই উত্তরটা একবার দিতেও হয়েছিল।

প্রথম দুয়েক দিন কলেজে কোনও বক্তৃতা হয় না। শুধু হয় অধ্যাপকের সঙ্গে ছাত্রদের আর ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ পরিচয়।

রমেনের সঙ্গে কলকাতা ইউনিভার্সিটির জার্নালিজম বিভাগের কোনও ছাপ নেই। এমন নামের কোনও কোর্স সেখানে ছিল না। তাই ছাপের প্রশ্নই ওঠে না।

তাই প্রায় প্রত্যেক লেকচারারই ওকে বিশেষ করে বাজিয়ে নিতেন। রমেন সেটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল।

একজন লেকচারার ওকে প্রথম দিকেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের উপর ওকে একটা ফিচার লিখতে দিলে ও কোন্ জিনিস বা ব্যাপার নিয়ে লিখবে।

রমেন প্রথমে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছিল যে ব্যাপারটা ঐতিহাসিক, না ভৌগোলিক বা শিল্পকলা কোন্ ক্ষেত্র থেকে বেছে নিতে হবে।

এ সম্বন্ধে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল।

তখন সে বলল—আমার নিজস্ব একান্ত ব্যক্তিগত দিক দিয়ে বলব যে আমি যে বিলেতে এলাম আর জার্নালিজম ক্লাসে পড়তে এলাম এটাই আমার নিজের চোখে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। সানডে অবজারভার পত্রিকায় প্রধান পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে খুব মুখরোচক একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে।

লেকচারার শুনে চমৎকৃত হলেন।

সহপাঠীরা হল আশ্চর্য।

কিন্তু কেউ এ নিয়ে ওকে কোনও প্রশ্ন করল না। ভিতরের কথা জানতে চাইল না। কেবল সেই অধ্যাপক ওকে ডেকে এনে বলেছিলেন—ব্রাভো মাই বয়। প্রত্যেক লোকের নিজস্ব চিন্তা আর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা সম্মান দিই। আশা করি তুমি নিজেকে এই অষ্টম আশ্চর্যের যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারবে।

এখন কিন্তু রমেন অন্য একটি অষ্টম আশ্চর্য তার জীবনে ঘটতে দেখেছে।

সামান্য রমেন একটি অসামান্য সোনার খনি পেয়ে গিয়েছিল। সেই অবিশ্বাস্য আবিষ্কার সে মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কিন্তু জীবনে তার আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারল কই?

আগমনীর সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জনের ক্ষণ এসে গেল।

পেরু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোনার সম্পদে ভরা দেশ। সেই সোনার দেশের সোনার বধূ আমার। তাকে আমার ভালোবাসা দিয়ে নীরব আবাহন দিয়ে জয় করেছিলাম।

আগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা, বিজয়ের বাসনা দিয়ে নয়।

এই দুটো দিন তাকে নিরালায় বিশ্রাম নিতে, না হয় ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে কাজ করতে বলেছেন পেপে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার।

সেই জেব্রার গল্পটার-ও।

যদি সেই নির্দেশ না শোনে তাহলে হয়ত সান সিবাস্টিয়ান পর্যন্ত এক সঙ্গে যাওয়ার পথটুকুও থাকবে না। সালামাঙ্কা ছোট্ট শহর। রিবেরাদের হোটেল আর ওর গেস্ট হাউস খুব বেশি দূরে নয়। বেলের সঙ্গে দেখা ওদের অলক্ষিতে অসম্ভব।

তাছাড়া সে তো কোন অসভ্য গোপনতা বা অসৎ উদ্দেশ্য মনের মধ্যে পুষে রাখেনি।

বেলকেও সে কোন অন্যায় সমালোচনার মুখোমুখী হতে দেবে না। যেটুকু তার বাবা মা, ভাই নজর করেছে তাতেই এই অসভ্য অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে। আর নয়, আর বেশি নয়।

এদিকে সালামাঙ্কার রসিক লোকরা আর কবিরা নিশ্চয়ই ওদের দুজনকে আবার একসঙ্গে দেখলে মুখরোচক আলোচনা শুরু করবে। শুধু সম্মেলনের জন্যই ওরা কাছাকাছি এসেছিল এরকম সামান্য সীমাবদ্ধ কল্পনা করে ক্ষান্ত থাকবে না।

কিন্তু সোনার খনি যে পেয়েছিলাম?

শুধু পেয়েছিলাম নয়, জয় করেছিলাম।

রূপকথার 'এল ডোরাডো'—সোনার শহর। নাম তার ছিল মনোয়া। পেরুর রাজা রোজ সেখানে গড়াগড়ি দিয়ে সর্বাঙ্গে স্বর্ণধূলি মেখে নিতেন। সে নিজে কিন্তু দেহ দিয়ে দেহে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সোনা মাখার কথা কখনও চিন্তাও করেনি।

সে বাইবেলের রাজা সলোমনের গানের সেরা গানটি সর্বদা মনে করত। আমার প্রেয়সী হচ্ছে একটি দেহ দিয়ে সীমাঘেরা উদ্যান।

পেরু জয় করেছিল এক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষাদীক্ষাহীন স্প্যানিয়ার্ড পিজারো। সে সুসভ্য ইংকার রাজার-মণিমাণিক্য খচিত বাগান দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সেই উপবনে সাজানো ছিল সোনার জলে

রুপোর পাতার কারুকার্য। রাজাদের মৃতদেহ মমি করে সোনায় খচিত সিংহাসনে জহরতের পোশাক পরিয়ে রাখা ছিল। সূর্যমন্দিরের বিরাট দেওয়ালগুলিতে সাতশ সোনার থালা সাজানো ছিল আর মন্দিরের চারপাশ ঘিরে খাঁটি সোনার কার্নিশ ছিল।

পিজারো ছলনা আর বিশ্বাসঘাতকতা করে পেরু দখল করেছিল।

তার চেয়ে অনেক বড় ঐশ্বর্য অযাচিত ভাবে রমেনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কামের তাড়নায়। প্রেমের মহিমায়। কিন্তু রমেন পাত্র ফ্রান্সিস্কো পিজারো নয়।

প্রেমের মর্যাদা সে পরিপূর্ণ ভাবে বজায় রাখবে।

আশ্চর্য? পিজারো কোথা থেকে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে? তার নিজের জন্মের ইতিহাস কি ছিল?

স্প্যানিশ ভাষায় অশ্লীল অবৈধ চরিত্রহীনতাকে খুব মোলায়েম করে বলা হয় ডেসুয়েডো অর্থাৎ অসাবধানতা। পিজারোর বাবার এই রকম অসাবধানতার অভ্যাস ছিল। অনেক নীচ মেয়েলোকের মধ্যে তার মাও এই রকম ডেসুয়োডোর শিকার ছিল। যে স্পেনকে সবচেয়ে বেশি লুঠ করে এনে উপহার দিয়েছিল, তার জন্মবৃত্তান্তকে স্পেনও চেপে রাখতে পারেনি।

সোনা দিয়েও সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না।

পেরুর কথা মনে হতে পিজারোর কথাও আপনা থেকেই রমেনের মনে এসেছিল।

কিন্তু সে এখন প্লাজা মেয়রের শোভন প্রমেনাডে সন্ধ্যা বিহারের চত্বরে কফির পেয়ালার সামনে বসে আছে।

এত আসন্ন বিচ্ছেদব্যথার মধ্যেও সে নিজেকে সামলিয়ে রেখেছে। প্রেমের মর্যাদা সে দেবেই।

পিজারোর চেয়ে অনেক বড় সে। অনেক বেশি সম্পদের সন্ধান সে পেয়েছে সে পরাধীন ভারতবর্ষের ধনহীন পরিবারের ছেলে হতে পারে। কিন্তু মহিমায় তার মাথা থাকবে উঁচু। তার বংশ, তার ঐতিহ্য, তার স্বদেশ থাকবে অতুলনীয় ভাবে নিষ্কলঙ্ক—

সেই ভাবের অনুপ্রেরণাতেই সে অসহ্য অসহায় দুঃখের মধ্যে, অযাচিত সৌভাগ্যের যেটুকু পেয়েছে তার কথাই ভাবতে চাইছিল।

দুঃখ, অসীম জীবনভরা দুঃখ তো পাবই। কিন্তু আমি তো এমন কিছু যোগ্যতা অর্জন করিনি যার বলে, যার পুণ্যে এতখানি সুখ পেয়েছি।

যা পেয়েছি তার কথাই এখন ভাবব।

এবং যার কাছ থেকে পেয়েছি তাকে আমার দুঃখটুকুর ছোঁয়া পেতে দেব না। সে যাতে ভুল না বোঝে সেটুকু দেখবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু আমার দুঃখে তাকে ভারাক্রান্ত করব না।

সে যে ভালোবেসেছে।

আমিও যে ভালোবেসেছি।

এই স্পেন দেশটাই যেন ভালোবাসাবাসির জন্য তৈরি হয়ে আছে—বাংলায় এই কথাগুলি পিছন থেকে হঠাৎ রমেন শুনতে পেয়ে চমকিয়ে উঠল।

বুঝল যে এই পথের উপরের কাফেতে তার ঠিক পিছনেই জন দুই তিন বাঙালি বসেছে! তারা হয়তো আমার মুখ দেখতে পায়নি। আশা করি আমায় চেনেও না। মোটকথা চুপ করে ওদের কথাগুলি এই থামটার আড়াল থেকে শুনে যাই। ওরা উঠে পড়লেই আমি সরে পড়ব।

একজন বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলছিল—দ্যাখ না মজা। স্পেনের মজা হচ্ছে সাড়ে বত্রিশ ভাজা। প্রত্যেকটি শহরেই পুরোনো রাস্তাগুলো একেবারে রোম্যান্সে ভরানো।

একজন জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে শব্দ করে বলল—স্বীকার করেই ফেলো না বাছাধন, যে শুধু রোম্যান্সে ভরানো নয়। সুন্দরী দিয়ে জড়ানো। হাঁটতে চাও তো মালের সঙ্গে মাখামাখি করে হাঁটো। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

—ঠিক মরমের কথা বলে ফেলেছিস, গুরুদেব। এই সাকীদের সঙ্গে জড়াজড়ির আমেজ জাগাবার জন্যেই এই সরু গলিগুলো এত তকতকে ঝকঝকে। কই, আমাদের দেশ তো চরিত্র নষ্ট করবার জন্য এমন সব উসকানি আর হাতছানি দেয় না। কাশীতে, আগ্রাতে তো এমন সাজানো গোছানো পরিষ্কার সরু পথঘাট নেই। সেখানে যদি মজা লুটতে চাও তো নাক আর চোখ বন্ধ রাখো। তার মানে শরীরটা নেহাত আঁকুপাঁকু

করে উঠলে তবেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেয়ো। চারদিকেই চরিত্র রক্ষার মোক্ষম রক্ষা-কবচ আমাদের দেশে। আর এখানে?

—আর এখানে?

বাকি দুজনই এই ভাষ্যকারের কথার উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

—এখানে সরু গলিগুলো যে বৃন্দাবন কা কুঞ্জগলি। দুপাশে বাড়িগুলো ধবধবে সাদা, জানালায় লোহার শিক নেই, আছে নকশাকাটা গ্রীল। লতাপাতা আঁকা ঢালাই লোহার গেট দিয়ে ঢুকে পড় ঠাণ্ডা উঠোনে। তার মাঝখানে খেলছে ফোয়ারা। চারপাশে ফার্নের পাতাবাহার। সবকিছু মিলে একটা নিরালা রহস্য।

—তার মানে কী রে, ভন্টো?

ভন্টো বলে যাকে ডাকা হল সেই তালেবর যুবক হেসে উঠল—বুঝবি তোরা ঘণ্টা। এই ভন্টো সঙ্গে এসেছে বলেই তোদের জ্ঞান দিচ্ছে। না হলে চোখ বুজে বুজে না দেখেই ফিরে যেতিস।

—ধানাই পানাই ছেড়ে বল না সেই নিরালা রহস্যের খোশ-খবরটা।

অনুরোধের জন্য ভন্টো মোটেই অপেক্ষা করে ছিল না। তবে একটু সাধিয়ে নিতে হয়। সিনিয়র ওস্তাদের দাম বাড়ে তাতে। সেটুকুই ওর লাভ।

দেশ থেকে কড়া তাগাদা আসছে ফিরে আসার জন্য। পাশ সে যে করতে পারবে না, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। বাড়ি থেকে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে এসেছে। তাই সস্তায় ডন জুয়ানের দেশটা সেরে যাবে। এই সুযোগে যদি একটু ডন জুয়ানি করে যৌবনটা সার্থক করে যাওয়া যায়।

ফস করে সে শুরু করল—বোকচন্দর তোরা। কিস্‌সু বুঝিস না। এই সব ছায়াঘেরা আড়াল আবডালের ব্যবস্থা কেন এ দেশে? স্রেফ উদ্দেশ্য একটাই। না হলে আমাদের অত গরম দেশেও যত্তো সব ন্যাড়া উঠোন আর বেপর্দা দরজা জানালা কেন?

বলেই সে এমন ভাবে ট্যারা চাহনি হানল যেন ওদের দিকে পিছনে করে বসে থাকা ভারতীয় ছোকরাটাই এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য দায়ী।

ভন্টোর কথার সারমর্ম হচ্ছে যে স্পেনের এই সব ব্যবস্থার মধ্যে আর্ট-টার্ট কিস্‌সু নেই। শুধু আঁটসাঁট সমাজে ফস্কা গেরোর মওকা মিলিয়ে দেওয়া। মওকা, ব্রাদার এন্তার মওকা। একেবারে খোলা গোলে হট্‌শট, শিওর শট।

—তুই কী করে জানলি রে ভন্টো?

—হু হু বাছাধনরা, তবে শোন। দুশো বছর আগে এদের সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে লিখেছিল এক মোক্ষম বিষয়। নাম তার কাদাল্‌সো। সে নিজেদের নোংরা কাদাকে স্রেফ গঙ্গামাটিতে দাঁড় করিয়ে দিল। লিখল যে স্প্যানিশরা প্রেম করবার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকে। পিরিতে টইটম্বুর। কোথায় লাগে ছাই ফ্রেঞ্চ সম্রাট লুইয়ের লীলার দরবার।

—তা তুই এত জানলি কী করে রে, ভন্টো? প্রমাণ পেয়েছিস কিছু? হাতেনাতে?

প্রশ্ন শুনে রেগে টঙ হয়ে গেল ভন্টো।

সংক্ষেপে বলল—দ্যাখ, এরা কিছু রেখে ঢেকে রাখে না। তোরা তো পড়াশোনার ধার কাছ দিয়েও যাস না। ডন জুয়ান নাটকটা যদি পড়তিস তো বুঝতিস। রসিক নাগরের আবার মিষ্টি কথায় ভিজিয়ে মজিয়ে নেবার দরকারটুকুও হত না। সময় অপব্যয় সে করত না। সব স্প্যানিশ মেয়ের মধ্যেই নাগরী থারলিনা লুকিয়ে থাকে।

—তার মানে? থারলিনা আবার কোন্ সুন্দরী?

—থারলিনা পিরিতের জন্য এমনি পাগল ছিল যে ডন জুয়ান ওকে দুটো মিঠে কথাও শোনায় নি। শুধু অঙ্গ-ভঙ্গি করে ভেতরে আসতে বলেছিল। মোটেই মন ভুলিয়ে পটায়নি। শুধু ইচ্ছাটুকু জানিয়েছিল। আর ওই জানানোতেই বাজিমাত।

—কেয়া বাত, কেয়া বাত, ভন্টো সর্দার।

—কেয়া বাত বলিস কি রে বোকচন্দর। থারলিনা এককথায় কুপোকাত। কারণ রসিক ঠাকুর শুধু নিজে রস পান করেন না, রসিয়ে দেন। তিনি বলেছিলেন যে এক শুধু বোকা মেয়েই ওর কাছে একবার সুখ

পেয়ে পরে অসুখী বোধ করবে। আরে বাবা, পাঁচিলই যদি না টপকাতে হল, কৌমার্যই যদি হরণ করা না হল, তাহলে প্রেম করে সুখ কী?

—অতএব...

—অতএব দেশসুদ্ধ মেয়ে নিজেকে বুদ্ধিমতী প্রমাণ করবার জন্য পাগল। কেবল ভন্টোর কপাল ফুটো। সেই স্বর্ণলঙ্কাও নেই, সেই নারীদেরও হদিস মিলছে না।

—মিলেছে, ব্রাদার, মিলেছে। ওই যে সামনের টেবিলেই বসে আছে ওস্তাদ। দেখেছিস তো কাল পোয়েট্‌স্ কংগ্রেসে।

—দেখিনি আবার। সম্মেলনের সভায় তো আমাদের ঢুকতে দেয়নি। কবি-সংবর্ধনার জন্য স্কোয়ারে যে নাচ হচ্ছিল সেখানে টুরিস্ট এজেন্সি 'পাত্রোনাতো' নাচ দেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বলিহারি বুদ্ধি যাই বল। বাঙাল তো।

স্রেফ ধাপ্পা দিয়ে কবি সেজে কবিদের সঙ্গে বসে গেল। অমনি জুটে গেল এক জলজ্যান্ত থারলিনা।

এরপর আর চুপ করে শুনে যাওয়া চলে না।

যদি রমেন চুপ করে আরও শুনে যায় তাহলে সে ইসাবেলের সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা সহ্য করে যাবে। অথবা নিজেকে সামলাতে না পেরে ওই বিশ্ববকাটে বিশ্বনিন্দুকদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাবে।

প্রথমটি অসম্ভব।

দ্বিতীয়টি বিপজ্জনক। যে দুর্নাম বা গুজব না ছড়ানোর জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছে ঠিক তাই আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

মুখরোচক সেই ঝগড়া সম্ভবত মারামারিতে দাঁড়াবে। সেই কাহিনি লতায় পাতায় বেড়ে উঠে শুধু ইসাবেল নয়, তার পরিবারের অসম্মান করবে।

তার নিজের দেশের লোকদের নামেও চুনকালি কম পড়বে না।

চাই কী এই বকাটে ছোকরারা রমেনের কলকাতার ঠিকানা জোগাড় করে বাড়িতে নোংরা একটি চিঠিও ঝেড়ে দেবে।

ডিয়স মিয়ো।

চারদিকেই নোংরামি। হা ভগবান।

না, সে বলিষ্ঠ ভাবে এই সম্ভাবনার মোকাবিলা করবে।

বাহুবলই একমাত্র বল নয়। কলকাতায় গলির মোড়ে প্যাকাটির মতো শুট্‌কো হাতের মুঠি পাকিয়ে ঘুঁষি উঁচিয়ে যারা চেঁচায়—চলে আয় অলপ্পেয়ে, হাত থাকতে মুখ কেন। সে দলে সে কোনদিনই ছিল না।

এখনও সে সেই পথে যাবে না।

নিন্দুকদের, নীচমনের লোকদের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে। মুঠির নয়, মুখের নয়, চরিত্রের জোরে।

সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। রাগ নয়, বিরক্তি নয়, সভ্যতার সততার আলোতে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তাকাল।

ভন্টো কোম্পানিকে দেখে সে পলকের জন্য চমকিয়ে উঠল। তার স্মৃতিতে একটু নাড়াচাড়া পড়ল। কোথায় দেখেছি একে? কোথায়?

ভন্টোই এগিয়ে এল। তার মুখে লালসার হাসি।

রমেনের মন ঘৃণায় ঘিন ঘিন করে উঠল। যেন কতগুলি পোকা ওই লোকটার মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে কিল বিল করে উঠেছে। যেন তারই ফলে হাসির রেখার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ঘৃণা করলে চলবে না।

সংসারের সবকিছুর সম্মান নির্ভর করছে এই মুখোমুখি মোকাবিলার উপর। শুধু সম্মান নয়, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত।

আর কিছু না হোক, দুরন্ত যৌবনের তাড়নায় যে রকমের দড়িছেঁড়া উট্‌কো নারীকে সঙ্গে নিয়ে ছোকরারা লন্ডনের নিরালায় এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় ইসাবেল যে তাদের জগতের মেয়ে নয় সেটা এরা জেনে যাক।

কলসি কাঁখের মতো করে যে সব ফ্ল্যাপারকে জড়িয়ে ধরে যৌবনের পানা পুকুরে জল আনতে যায় ছোকরারা, তাদের কথা মনে আসতেই রমেনের মন আপনা থেকে শামুকের মতো গুটিয়ে গেল।

কিন্তু না, এই রকম ভাবে সংকুচিত হয়ে গেলে চলবে না। তাতে তার নিজেরই হার হবে। এবং একেবারে প্রথম দফাতেই।

ততক্ষণে ভন্টো একটা চেয়ার টেনে এনে ওকে নিজেদের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

রমেন কিন্তু ওদের কারও মুখ চোখ বা ভাবভঙ্গি দেখে ওদের চিনতে পারল না।

একবারে হালের মার্কিন মার্কা হাঁক একখানা দিয়ে ভন্টো জিজ্ঞাসা করল—হাই, হোয়াট আর ইউ ডুইং ইন স্পেন? জাস্ট নোজিং অ্যারাউন্ড?

প্রশ্নটাই রমেনকে তার গুটিয়ে আসা শামুকের খোল থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল।

সে বলল—না। নাক ঘুষিয়ে দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি না। জার্নালিজমের থিসিস করবার জন্য স্পেন সম্বন্ধে লিখছি। ইউনিভার্সিটির নির্দেশ।

খবরের কাগজের জন্য লোক পাঠানোর কাজটার কথা বলল না। বিশ্বাস নেই, হয়তো বলে বসবে তাহলে দামি নাইট ক্লাবে নিয়ে চল। তোমার উপার্জনটা সার্থক হোক।

তাছাড়া যত কম কথা নিজের সম্বন্ধে জানায় ততই ভালো। এদের মতিগতির নমুনা আলোচনাতেই মালুম হয়েছে।

নিজেকে ধরা ছোঁয়া বা চেনা জানার মধ্যে আনবে না।

এটা সেটা সামান্য সামান্য কথাবার্তা চলতে লাগল।

হঠাৎ ভন্টোই বলে বসল—ইউরেকা। আপনিই সেই ছিদাম মুদি লেনের সুসন্তান না?

সুসন্তান?

কোনও রকমে মেজাজ বজায় রেখে রমেন জবাব দিল—সুসন্তান মানে? হোয়াট ডু ইউ মিন? অবশ্য আমি লন্ডন ইউনিভার্সিটির একটা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়ে পড়তে এসেছি। বলতে পারেন যে পাড়ার আর কারও সে সৌভাগ্যটুকু হয়নি।

ভন্টো বুঝে নিল যে একে সহজে টলানো যাবে না। অথচ একটা স্প্যানিশ মুচাচার ধারেকাছে কী করে আসা যায়?

এদেশে আবার ছুরি-ছোরাটাও নাকি সহজে চলে। পুলিশও বিদেশীদের চরিত্র রক্ষা করবার জন্য সজাগ থাকে বলে ওয়াকিবহাল লোকেরা বলে থাকে।

ভন্টো তাই সবিনয়ে হেসে বলল—না, মানে, আই মিন কাল দূর থেকে দেখলাম যে আপনি কবিদের মধ্যে বসে আছেন। পাশে বসে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে। আপনি নাকি কবিতা আউড়িয়েছিলেন আর সুন্দরীটি তার অনুবাদ স্প্যানিশে শুনিয়েছে। দারুণ পারফর্ম্যান্স আপনাদের যুগলের। আমরা শুনেছি সবই।

রমেন লক্ষ্য করল যে মেয়েটির বর্ণনা বেশ রসিয়ে দেওয়া হল এবং সে নিজে কবিতা 'আউড়িয়েছে'।

অর্থাৎ লালসা আর তাচ্ছিল্য দুই-ই মিশে আছে এই লোকটির অন্তরে। রমেন গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়ল। দেখা যাক মূর্তিমান আরও কী বলে।

মূর্তিমান আস্তে আস্তে মনের ঢাকনা খুলতে লাগল।

—তা মশায়, আপনি বাহাদুর ব্যক্তি। বিদেশে এসে কবি-সম্মেলন। রূপসী বান্ধবীও জুটে গেল। আর কবিতার দৌলতে তিনি আপনার উপর বিশেষ প্রসন্ন মনে হল। দূর থেকে দেখলাম।

অসভ্য ইঙ্গিতের জন্য মনে মনে চটলেও মুখে তা প্রকাশ করবার উপায় নেই। চুপ করে রইল রমেন।

ভন্টো আরও ডেপথ চার্জ দিতে লাগল—অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিতরা বলে কবিতা আর বনিতা নিজে থেকে এসে হাজির হলে খুবই সুখের ব্যাপার হয়। তা দেশে থাকতে বা বিলেতে আপনি কখনও কবিতা লিখতেন বলে শুনিনি। দুটো বিদ্যেই তা হলে হালে স্পেনে এসে অর্জন করেছেন দেখছি। বেশ কুইক ওয়ার্ক তো। আপনার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবার বাধা দিতেই হবে। এই অভদ্র লোকটি বড় বেশি দূর এগোচ্ছে। এর সঙ্গীরাও বেশ মজা পাচ্ছে।

রমেন বলল—আপনি বা আপনার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আমার কবিতাচর্চা সম্বন্ধেও না এবং যিনি আমার কবিতা অনুবাদ করে আমাকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান পেতে সাহায্য করেছেন তার সম্বন্ধেও না। অতএব সেই ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে কোনও কথাই আপনাদের তোলা উচিত নয়। তার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চান তাহলে পোয়েটস কংগ্রেস যাঁরা করেছেন তাঁদের কাছে খবর নিতে

পারেন। অথবা এই ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে পারেন।

সে অবশ্য বুঝেছিল এই কাপুরুষদের সে সাহস হবে না। বরং হুট্ করে কোনও খোঁজ-খবর অকারণে নিতে গেলে লার্ডিয়া সিভিলের জিম্মায় বাছাধনদের চালান যাবার ব্যবস্থা হতে পারে।

বিদেশী অ্যাম্বাসাডরের কন্যা। প্রটোকলই তার প্রথম প্রটেকশন।

দুষ্টদের থাকে না সাহস। আর নষ্টদের থাকে না চক্ষুলজ্জা। ভন্টো দুটি দলেই নাম লেখানো মহারথী।

সে ওই সম্ভাবনার কথা খুব ভালো করেই বোঝে। তাই সে স্পেনে এসে মুখ বদলানোর ব্যবস্থা করতে সাহস পাচ্ছিল না। এখন রমেনকে দেখে তার সাহস আর ভরসা দুই-ই হয়েছে। কাজেই সে রমেনকে কাজে লাগাবে। চটিয়ে দিয়ে নিজের মতলবটি ফাঁসিয়ে ফেলার মতো বোকা সে নয়।

অতএব ভন্টো ভোল বদলাল। তার বন্ধুরাও।

আলাপ একটু ভদ্রতাতে বইতে শুরু করল।

তবু মাছি ভন ভন করে সেই জায়গাতেই ঘুরে ফিরে ফিরে আসে।

ভন্টো বলে বসল—আচ্ছা মহাশয়, আপনি তো দুয়েকদিন পরে লন্ডনে ফিরে যাচ্ছেন। আপনার বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে যান না। সাধ-আহ্লাদ তো আমাদের প্রাণেও আছে।

রমেন কোনও রকমে নিজের উত্তেজনা চেপে রাখল। শুধু বলল—যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনারা পরিচিত হতে চাচ্ছেন আপনাদের তার সঙ্গে পরিচয়ের যোগ্য বলে তিনি মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে সামান্য আলাপেই এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছি।

ভন্টো হার মানবার ছেলে নয়। আরেকটি ডেপথ চার্জ ঝাড়ল।

সোজা বলে বসল—আপনি এত গভীর ভাবে যে বুঝেছেন তাতে মনে হচ্ছে যে আপনারা অনেক দূর গড়িয়েছেন। কিন্তু কিসের ভরসায় তা আপনিই জানেন।

পাছে রমেন বাধা দেয় সেই পথ বন্ধ করবার জন্য ভন্টো তোড়ে বলে চলল—আপনি তো ছিদাম মুদি লেনের ছেলে। সে রাস্তা এমন নয়, সে পাড়ায় এমন ফ্যামিলি থাকে না যেখানে একটি বিদেশী বধূ নিয়ে আপনি তুলতে পারবেন। সেখানে সাদা জাতের মেয়ে রাজার জাত না হলেও টিকতে পারবে না। আর আপনার নিজের অবস্থা ভালো করেই বুঝতে পারছি। আমাদের এক পাত্তর রেড ওয়াইন পর্যন্ত অফার করবার মুরোদ নেই। আর পাশ করে দেশে ফিরেও তো সেই অষ্টরম্ভা আর হরিমটর ছাড়া আর কিছু জুটবে না। তার চেয়ে মেম বৌয়ের ইয়া লম্বা শখ আর ফুটানি সিকেয় তুলে রেখে সুখ করে নিন। এবং এই রস্তাটিকে...

রক্তচক্ষু রমেন আর নিজেকে সামলাতে পারল না। প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল...

হঠাৎ মনে পড়ল ইসাবেলের মুখ।

সে এখন এই অপমান বহন করে গোপন করে চলে গেলে নিজের ছাড়া আর সব দিকই রক্ষা পাবে।

অন্যপক্ষে একটা 'সিন ক্রিয়েটেড' হলে সেই দৃশ্য আর তার রটনা ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

ভাগ্যিস বাংলায় কথাবার্তা হচ্ছে।

সে শুধু বলল—দেখুন—যে মহত্ত্বের, যে মহীয়সীর নাগাল আপনারা কোনও দিন পাবেন না, তাকে ছোট করে দেখতে চেয়ে নিজেদেরই আপনারা ছোট করেছেন। আমার কথা বলতেও ঘৃণা হচ্ছে। আমি চললাম।

ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে ভন্টো আবার বলল—আমিও সংসারে অনেক দেখেছি, অনেক চেখেছি। কলসি কাঁখে কম করিনি ব্রাদার। মশায়, আমার সাফ বাত। যদি আপনাদের মধ্যে প্রেম ফ্রেম হয়ে থাকে তাহলে এখানেই দাঁড়ি টেনে দিয়ে কেটে পড়ুন। মনের টান নিয়ে হাওয়ার মধ্যে টানাটানি করা চলে না। আর যদি...

আর যদি কী হয় তা শুনবার জন্য রমেন সেখানে ছিল না।

॥ ২৭ ॥

ঝিবঝিবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

এই মবশুমে সান সিবাস্টিযানে প্রথম বৃষ্টি। কেউ এব জন্য তৈবি ছিল না। সকলেই হঠাৎ বর্ষণেব মধ্যে ধবা পড়ল।

সাগববেলা এখানে অদ্ভুত সুন্দব। বেলাভূমি যেন হাসিখুশি ভাবে হেলা-ফেলায নিজেকে প্রসাবিত কবে দিয়েছে সমুদ্রেব শান্ত বিস্তাবেব দিকে। ছেলেপুলেবা নিশ্চিন্ত ভাবে সেখানে হুটোপুটি কবে খেলা কবছিল।

ইসাবেল আব বমেন মুগ্ধ নযনে ওদেব খেলা দেখছিল। দেখছিল আব ভাবছিল।

যা ভাবছিল ওবা—একটি শান্ত সুখী দম্পতি, দুযেকটি ছেলে-মেয়ে চোখেব সামনে খেলে বেড়াচ্ছে সে ভাবনা কবাব সময ওদেব হযনি।

অন্তত এখন নয। এই বযসে নয। এটা যে শুধু ফুল ফোটানোব পালা। বঙ ছড়ানোব ঋতু।

কিন্তু বিচ্ছেদ যে অমোঘ ভাবে ওদেব মেঘেব মতো আচ্ছন্ন কবে ফেলেছে।

তাই যে স্বপ্ন হযতো কোনও দিন দেখতে পাবে না, অন্তত যে স্বপ্ন দেখাব পথ খুঁজে পাচ্ছে না সেই স্বপ্নই ওদেব চোখেব সামনে বাব বাব ফুটে উঠেছে।

ভাগ্যেব পবিহাস।

এমন কি বমেনেব মুখ থেকে যে কথাটা হঠাৎ বেবিয়ে এল সেটাও পবিহাস ছাড়া কী?

--দেখ দেখ, বেল, সমুদ্রটা কী বকম বিবর্ণ দেখাচ্ছে। আশাহীন ইংলিশ আকাশেব মতো।

সে কথাটা বেলকে আব নিজেকে মনে না কবিযে দিলেই কি চলত না? মোটে তো সামান্য কটি ঘণ্টা নিজেবা একসঙ্গে থাকতে পাবছে।

আব মোটে তো কটা দিন বাকি আছে হাতে।

বিবেবাবা হযতো ভদ্রতা কবে একদিন ওকে ফোন কববেন। ওব স্থান যে কোথায তা পবোক্ষে বোঝাবাব জন্য হোটেলে নয, বাইবে কোথাও নিয়ে খাওযাবেন। মেয়ে ওব সঙ্গ আব মোহেব আওতা থেকে যে বক্ষা পাবে সেই সৌভাগ্য ভদ্র ভাবে 'সেলিব্রেট' কববাব জন্য। ওবা কেমন সুন্দব সভ্য আব সহৃদয ভাবে সাবা পথ ওব সঙ্গে ব্যবহাব কবেছেন। বাইবে থেকে কেউ সেই শেষ ভোজনেব সঙ্গে মেশানো নিষ্কৃতিব আনন্দটা টেবও পাবে না।

সান সিবাস্টিযানে যত বাড়ি আছে তাব চেযে অনেক অনেক বেশি আছে হোটেল। শুধু স্পেন নয সাবা পৃথিবী থেকে লোকে এখানে ছুটি কাটাতে আসে। বসন্তেব আমেজে খোশ মেজাজে খবচ কবে, সমুদ্রস্নান কবে।

"বো ব্রুমেল" মার্কা লক্কা পাযবাব দলও আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। স্পেনেব পুরুষবা এখানে এলেই সাজগোজ কববাব ধুম পড়ে যায তাদেব মধ্যে। মাদ্রিদ থেকে সবকাবি কর্মচাবীবা এসে নিজেদেব সুপুরুষ আব সুসজ্জিত পুরুষ কবে তোলাব পাল্লায সাবা বছবেব সঞ্চযটুকু শেষ কবে যায।

বুদ্ধিমান ডিপার্টমেন্টাল স্টোবগুলিও সেই মযূব মনেব উপযোগী কবে তাদেব শো উইন্ডোগুলি সাজিযে বাখে। অবশ্য ইংলন্ড আমেবিকাব মতো স্পেনেব ওই কাচেব পিছনে সাজানো শৌখিন সামগ্রীগুলি প্রধানত মেযেদেব জন্যই উৎসর্গ কবা থাকে না। পুরুষদেব জন্য জিনিসই বেশি।

লন্ডন নিউইযর্কে, অকসফোর্ড স্ট্রীট ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউতে ঘুবে বেড়ালে মনে হতে পাবে যে পশ্চিম সভ্যতা মেযেদেব সাজাবার আব প্রসাধন দিযে রূপসী কবে তুলবাব জন্যই সৃষ্টি হযেছিল।

কিন্তু স্পেনে দোকানেব কাছে মোড়া শো-কেসে নাবীব ওযার্ডবোবেব সব বহস্য ভাণ্ডাব খুলে দেখানোটা অশোভন মনে কবে। তাই উঁচু দেওযালে বা হোর্ডিংযেও নাবী বাহাব বেশি নেই।

পশ্চিম ইযোবোপে বা আমেবিকাতে নাবী পুরুষেব সম্পর্কে যে প্রকাশ্য আলোচনাকে মন বোঝাবুঝিব পথ বলে প্রচাব কবা হয তাকে এই উত্তপ্ত যৌবনতৃষ্ণাব দেশে অশ্লীল বলে মনে কবে।

অথচ মজাব ব্যাপাব এই যে হিস্পানিরা ওই সব দেশেব পুরুষদেব কৃপাব চোখে দেখে।

আহা বেচাবা ওবা।

আমরা যে বকম গবম তেজী আর চোখা ভাষায় নাবীব সঙ্গে, বিশেষ করে পবনাবীর সঙ্গে, রসালাপ

করি তা করার মুরদও ওদের নেই। ওদের পৌরুষের উপর ঘোমটার ঢাকনা আছে।

ওদের এমনি জিভের বাঁধন যে আমাদের মতো রসের ভাষায় ফষ্টি-নষ্টি করাকেও ওরা অসভ্যতা মনে করে।

দেখ না, আমাদের রাজদরবার পর্যন্ত কেমন আঁটসাঁট বাঁধনে বাঁধা ছিল। সেই চারশো বছর প্রায় আগে ফরাসি রাজকন্যা এলিজাবেথকে আটত্রিশ বছর বয়সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তৃতীয় স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করলেন। ওই পনেরো বছরের কনে আর তার হাসিখুশি সখীদের কেমন কায়দা করে সারা জীবনের মতো রাজদরবারের বাঁধা দস্তুর আঁর আঁধার আদব-কায়দার মধ্যে আটকিয়ে ফেলা হল।

পায়ে পায়ে প্রতি পদক্ষেপে শৃঙ্খল।

কিন্তু পুরুষরা স্বাধীন।

সান সিবাস্টিয়ানে ছুটি কাটাতে এলে আরও বেশি স্বাধীন। আরও বেশি শৌখিন।

এই সি-সাইড হচ্ছে শখ আর সাধের জন্য খোলা মাঠ।

কাজেই সরকার খুব সুবিবেচনা করে সামান্য আয়ের ভদ্রলোকদের জন্য সস্তা সরাইখানা 'পাবাদর' তৈরি করে দিয়েছে। দামে সস্তা কিন্তু সমাজের চোখে সম্মানিত।

এমনিতেই জগৎ-জোড়া মন্দার বাজার।

তায় জমিদারি থেকে আদায়-পত্র হয় না। এদিকে নতুন প্রজাতন্ত্র সংস্কার ডিউক কাউন্টদের মোটেই সুনজরে দেখে না। বরং ট্যাক্স বসাতে চায় প্রাচীন ঐতিহ্যে ভবা কেল্লা আর প্রাসাদগুলির উপর। তাই আগেকার বার-ভুঁইয়াদের বংশধররা সেসব সম্পত্তি নিজে থেকে সরকারকে দান করছে। সরকারও সেগুলিকে টুরিস্ট, বিশেষ করে বিদেশী টুরিস্টদের আকর্ষণ করবার মতো করে বদলিয়ে নিচ্ছে। প্রাসাদ হয়ে যাচ্ছে পাবাদব।

একটা পুরোনো প্রাসাদকে নতুন ইন্টিরিয়ব ডেকোবেশনের কল্যাণে শৌখিন পাবাদরে পবিণত কবা হয়েছে। লন্ডন ইউনিভার্সিটির ছাত্র এই সুবাদে রমেন সেখানে ঘর পেয়ে গেল। বমেনের যা বিষয়বস্তু তাতে দেশেব ভালো পাবলিসিটি হবে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই যোন রিবেরাদেব হোটেলে। বেল তো বসেই ছিল ঠিকানা আর ফোন নম্বব পাবার আশায়। তাব পর শ্রীমতী রিবেরা ওই পারাদরেব ঠিকানা পেয়ে এত খুশি হলেন যেন রমেন নিজেই সেই প্রাসাদেব মালিক। হারানিধি খুঁজে পেয়ে নিজেব বাজপাটে যেন গিয়ে বসেছে এমন একটা ভাব। দু-এক দিনের মধ্যেই আবার যোগাযোগ করবেন নিজেই।

কিন্তু যোগাযোগ করল ইসাবেল।

বাবা-মার লম্বা লাঞ্চ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইনফর্মাল ড্রিংক পার্টি একটা টিলার চূড়ার এক্সক্লুসিভ ক্লাবে। অর্থাৎ পোশাক বদলাতে হোটেলে ফিরে আসবেন না।

দূরদৃষ্টি মেয়ের হিসাবে ভুল হয়নি।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রের পারে। ইন্টারন্যাশনাল রিজর্ট। প্রাচ্য-প্রতীচ্যেব মেলামেশা দেখতে অভ্যস্ত শহর এবং সমুদ্রের তীরভূমি দিয়ে মোটর যেতে দেওযা হয না। কাজেই বাবা-মা বা ওই দামি হোটেলের কোনও চেনা বাসিন্দার নজরে ওরা পড়বে না।

—দেখ, দেখ রামন তাজা আর রসাল আপেলের মতো টুকটুকে গাল ছেলে-মেয়েগুলোর। আহা, ওরা নেচে বেড়াচ্ছে। কেমন হাসিখুশিতে চেহারা ভরপুর।

—দেখ, দেখ বেল ওই বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা পর্যন্ত ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। কেমন রঙিন বেলুনের গোছা ওড়াতে ওড়াতে চলেছে। যেন ছেলেপিলেরা আর নিজেরা একসঙ্গে সেগুলি নিয়ে ওড়াবে। গোল গোল মিঠাই, লিকোরিস টফি হাতে নিয়ে চলেছে। যেন সাগর বেলার নুড়ি পাথর।

—দেখ, দেখ বামন, এই হাসিখুশি মায়ের হাতে একটা নেটের ঝোলা। সোনালি রঙের কাগজে মোড়া মোহরের মতো চকোলেটে ভরা। বোধহয় বীচের সব ছেলে মেয়েদের ডেকে বিলিয়ে দেবে।

—দেখ, দেখ, বেল, ওই মেয়েটিকে দেখ। কেমন আত্মপ্রত্যয়ে ভরা, যেন আর বাচ্চাটি নেই, বড় হয়ে গেছে। কেমন গুছিয়ে বেছে নিচ্ছে ফেরিওয়ালার টুকরি থেকে একটা চকোলেটের তৈরি আপেল। বছর দশেক আগে তুমি নিশ্চয়ই ঠিক এই রকম করতে।

শান্ত প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল মুখ বেল রমেনের দিকে তুলে ধরল। যেন প্রশ্ন করতে চাচ্ছে যে এখন আমি কীরকম করছি তা ধরতে পারছ কি?

রমেন সে প্রশ্ন বুঝল।

কিন্তু একটু এড়িয়ে গিয়ে ভবিষ্যতের কথা তুলল।

ভবিষ্যৎই যে ভরসা। বর্তমান যে আশাহীন। এখনই ফুরিয়ে যাবার জন্য তৈরি।

রমেন বলল—আর দশ বছর পরে তুমি কী রকম করবে তাই দেখবার চেষ্টা করছি।

আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে বেল প্রশ্ন করল—বল না, কী তুমি দেখতে পাচ্ছ।

রমেন দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিল। একটা বাঁকে যেখানে নীল জল আর সবুজ তরুলতা পাহাড়ের পায়ে এসে মিশে গেছে সে দিকে চোখ রেখে বলল—তুমি সেই তুমিই থেকে যাবে। দি এটার্নাল ফ্যান্টম অব ডিলাইট। চিরকালের আনন্দমায়ারূপিণি। কোনদিনও বদলাবে না তুমি। বরফ হয়ে যাবে না। ঝরে পড়বে না।

—আবার তোমার কবিতা শুনছি, রামন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে এটা পোয়েট্স কংগ্রেস নয়। শুনছি শুধু আমি একা।

—ঠিকই তো। শোনাচ্ছি শুধু তোমাকে একা। কিন্তু শুধু কবি সম্মেলন কেন, সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে শোনাবার মতো সত্য কথা যে, তুমি কোনদিন বদলাবে না। চিরতরুণী চির রূপসী, নিত্য নন্দিনী তুমি উষা।

ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিল বেল—তোমার হয়েছে কী বল তো? কোথায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে একটা কিছু পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করবার কথা। না, তুমি কাব্য করে চলেছ। যেন আমাদের হাতে সময় অফুরন্ত। আর তুমিও এদেশে মৌরসী পাট্টা পেয়ে গেছ।

হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল রমেন।

সে বলল—তুমি যে আসতে পেরেছ তাতেই আমি এত আনন্দ পেয়েছি যে আর সব কথা পিছনে চলে গেছে।

বেল সন্তুষ্ট হল না—তুমি চিরকালের হোপলেস। তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না। আমি কত ভরসা করেছিলাম, তুমি বুদ্ধি দিয়ে বিচক্ষণতা দিয়ে কোনও পথ বের করতে পারবে। তা তুমি তো ওকথা ভাবছই না।

রমেন খুব নিচু স্বরে বলল—ভাবছি উষা, কিন্তু আশা পাচ্ছি না। তুমি যে আমায় বুদ্ধি দিয়ে পথ দেখাবে সেটাই আমার একমাত্র ভরসা।

বেল বলল—চল, এখান থেকে চলে যাই। বৃষ্টি নামাতে এখানে ছাউনির তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি কখন থেমে গিয়েছে। ওই যে অনেক দূরের রাজপ্রাসাদটা, যেখানে রাজারা মাদ্রিদ থেকে অবসর কাটাতে আসত। ওর কাছে উপসাগরটা বাঁকের মুখে রোদে ঝলমল করছে। ওই দিকে যেতে যেতে হয়তো কোনও বুদ্ধি এসে যাবে।

ওরা চলল অপরাহ্নের সূর্যকিরণের পথে।

কিন্তু বেলই বাধা দিল।

না, ও দিকটা এত সুন্দর যে অনেকেই ওদিকে যাবে। অন্তত বাইনোকুলার দিয়ে দূর থেকে দেখবে। তার চেয়ে চল শহরের দিকটাতে।

নিরিবিলির সন্ধানে ওরা একটার পর একটা ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভিতরে চার দিক নজর করে ভালো করে দেখে আবার বেরিয়ে অন্য রেস্তোরাঁয় ঢুকে নজর করা। যেন প্রাদো মিউজিয়ামে একটার পর একটা অয়েল পেন্টিং নজর করছে আবার সরে যাচ্ছে।

যতক্ষণ না মনের মতো একটি ছবিতে মন বসে যায়।

শেষ পর্যন্ত ওরা একটা খুব অন্ধকার গোছের নিরালা সাধারণ রেস্তোরাঁয় বসল। বাইরের লোকের কাছে মনে হবে যেন একটা ডাকাত দলের লুকোবার আস্তানা। তার অন্ধকার কুঠরি বোঝাই ওয়াইন ব্যারেল আর বোতল। কাঠের বেঞ্চি আর রশির টেবিল। চারপাশে সসেজ আর রসুন ঝুলছে। যেন মমতা ভরে অর্কিড সাজানো হয়েছে।

হঠাৎ একজন ডাকসাইটে ডাকাতের মতো চেহারার লোক উঁকি মেরে গেল। রমেন রীতিমত ঘাবড়িয়ে

গেল। ফরাসি-হিস্পানি সীমান্ত শহর। তিন দিকে পাহাড়ি এলাকা। ওস্তাদ কোনও খুনি বা ফেরারি কি না কে জানে। অবশ্য এক ঝিলিক হাসি বিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু বাইরে যত কাঠখোট্টা হয় এদেশের লোক যে ততই মিঠে হাসে।

অপর দিকে এমন আস্তানাই নিরাপদ। ওরা জানাশানা কোনও লোকের নজরে পড়বে না।

বেল কোটের উপর আমেরিকান ফ্ল্যাগ লাগিয়ে নিল। অর্থাৎ বিদেশী টুরিস্ট মেয়ে—সেটা জেনে রেখো।

ওরা অনেকক্ষণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করল। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় পৌঁছাতে লাগল। রমেনের অসহায় নিঃসম্বল অবস্থা।

দারিদ্র্যকে সংস্কৃত নাটক বলেছে সর্বশূন্যা।

সেই শূন্যের চারিদিকে ঘুরছে এই পৃথিবী।

টাকার চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। কিন্তু দারিদ্র্যের চারদিকে খায় ঘুরপাক।

তাকে ভোলার উপায় নেই।

নেই পথ প্রতিবাদের।

যে সব যুক্তি তর্ক সালামাঙ্কাতে ওদের মিলনের এমন কি বাগদত্তা হয়ে থাকাব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সেইগুলি প্রত্যেকটাই অনড় অচল পাথরের মতো দুজনের মাঝখানে দুজনের পথ রুখে রয়ে গেল।

ওরা ধর্মের বাধা, দেশাচার আর সমাজের ব্যবধান, দেশের দূরত্ব সব কিছুই অতিক্রম করে আসতে পারত। অন্তহীন সেই বিধিনিষেধকে ওরা এড়িয়ে যাবার মতো উপায় বের করল। তবুও...

তবুও রমেন নিজের আর্থিক অনটনের মধ্যে, নিশ্চিত অনশনের মধ্যে তার প্রেমের পাত্রীকে টেনে নামিয়ে আনতে পারবে না।

বেল বার বার মিনতি করল—আমি তোমার দারিদ্র্য, তোমার সংগ্রামে সমান ভাগ নেব। তোমার সত্যিকারের সহধর্মিণী হব। তোমার জন্য তোমার দেশকে ভালোবাসব। এখনই ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু বাবা-মার আশীর্বাদ নিয়ে বাগ্‌দত্তা করে যাও। তোমার বাবা-মার সম্মতিও আনিয়ে নাও।

রমেন সম্পূর্ণ রূপে রাজি। কিন্তু কী করে রিবেরা পরিবারের চোখে তাদের এমন মেয়েকে এত সামান্যের প্রণয়িনী হিসাবে দাঁড় করাবে। তার নিজের সব চেয়ে বড় সম্পদের অসম্মান করাবে?

এ যুক্তির কোনও জবাব নেই।

তবু বেল পালটা আক্রমণ করল—তার মানে, তুমি যদি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে বা ভালো রোজগেরে যুবক হতে তাহলে তোমার আপত্তি হত না? তার মানে তোমাব আর আমার দুজনেরই ওজন হচ্ছে টাকার হিসাব দিয়ে? ভালোবাসা হচ্ছে শুধু ভিখারি? তার নিজের দামও নেই; দাবিও নাকচ?

বেলের তর্কের তোড়ে রমেন হেরে গেল।

কী করে সে এই সংসারে অনভিজ্ঞ, কঠিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়হীন তরুণীকে বোঝাবে যে প্রেম আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কিন্তু সংসারের নিষ্ঠুর সীমানা তাকে স্বীকার করতে চায় না। সহ্য করতে পারে না। বাইরে একঘরে করে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়।

আর সে নিজেও যে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, রক্তাক্ত হৃদয়ে এই সব যুক্তি তর্ক তুলছে। সেগুলিকে সে মানতে চায় না। কিন্তু জানে যে অস্বীকার করতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সে দুর্বল ভাবে বলল—উষা, আমার আশা, তোমার কথাই ঠিক। তোমার কথা ভেবেই তোমার যুক্তি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমায় আরও কয়েকটা দিন ভাবতে দাও। তোমাকে যে শুধু অনিশ্চয়তার মধ্যে নয়, সংসারে সবার চোখে নামিয়ে আনব সেই ব্যথাটা মন থেকে এখনও সরাতে পারছি না।

বেলের অন্তর কেঁপে উঠল।

সে স্পষ্ট বুঝল কী দারুণ টানাপোড়েন চলছে বেচারির মনে। ভালোবাসে বলেই ভালোবাসার ধনকে ব্যথা দিতে চাইছে না। অথচ তাকে ব্যথার মধ্যে টেনে আনতেও চায় না।

কিন্তু দুজনকেই ভালোবাসার জন্য মূল্য দিতে হবে।

এমন করে মূল্য দিতে হবে তা সে ভাবেনি। ভালো যে সে বেসে ফেলবে কাউকে সেই সম্ভাবনাকেও তো সে হিসাবের মধ্যে আনেনি। আর শেষ পর্যন্ত সে যদি সেই অমূল্য অমৃতের আস্বাদই পেল, তা পেল

এমন অবস্থায়, এমন একজনকে ভালোবেসে যা সংসারের চোখে অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব।

যা ধোপে টেকার কথা নয়।

বেচারির নিজের মাথাও গরম হয়ে উঠল। গত ক'দিন থেকেই মনের মধ্যে এই ঝড়, এই যুদ্ধ চলছিল। এখন সে আর সহ্য করতে পারছে না।

এমন সময় সেই অন্ধকারপ্রায় রেস্তোরাঁর গুহায় রেডিয়ো বেজে উঠল। প্রেমের গান। উত্তপ্ত, আকুল, সব সমর্পণ করে দিতে উন্মুখ প্রেম।

বেলকে সেই গানের দিকে কান পাততে দেখে রমেন কথা বলবার মতো একটা কিছু পেল।

সে মৃদুস্বরে বলল—ওই গান আমাদের কোনও সমাধান দিচ্ছে না। ক্রুনাররা গুনগুনিয়ে প্রেমের সম্বন্ধেই গান করে, বিয়ের সম্বন্ধে নয়। সবচেয়ে ঝাঁঝালো কাদা মাটি মাখা চাষাড়ে প্রেম থেকে সুকুমার নিখাদ প্রণয় সবকিছুই তাতে থাকে, কেবল সংসারে তা বিয়ের বেদী প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

অনেক তর্ক, অনেক চিন্তা আর ঘুরে বেড়ানোর পর বেচারি বেল খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

সে বলল—চল রামন এখান থেকে। আমার মাথাটা ধরেছে। চল একটু সি বেদিং করে আসি। সমুদ্রের পারে কাঠের কুঠরিগুলিতে ধোপদুরস্ত সুইমিং কস্টিউম প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনেক দিন সমুদ্রস্নান করিনি। তুমি চল আমার সঙ্গে।

রমেন রাজি হল না।

সে একটু দূরে থাকবে। মানে কাছেই, কিন্তু এত কাছে যেন যে হোটেলের কোনও লোক বা রিবেরাদের পরিচিত কেউ তীরভূমিতে ওদের দুজনকে একসঙ্গে এসেছে বলে মনে করবে।

বেল তাতে রাজি হল।

রমেনের চোখ দিয়ে সে পরিস্থিতিটা দেখল।

এবং রমেন দেখল, দেখল একটি স্বপ্নের তরণী।

আমেরিকাতে ক্ষনিকা মানসসুন্দরীকে তরুণ ছাত্ররা বলে ড্রিম বোট। স্বপ্নের তরণী। তার কাছে, তার বাড়িতে উপহার পাঠিয়ে দেয় গার্ডেনিয়া ফুল।

রমেন তার স্বপ্ন তরণীর সঙ্গে প্রেম-সায়রে এক হয়ে মিলতে পারবে না। পারবে না তার কাছে উপহার পাঠাতে প্রেমের প্রতীক গার্ডেনিয়া।

কিন্তু অপরূপ পেখলুঁ বামা।

স্নানের সাজে। ঝলমল জলতরঙ্গের মাঝে। আকাশ আর সাগরের মিলনগীতি যেখানে বাজে। দিন আর রাত্রি যেখানে মিশে যায় রক্তিম লাজে।

বিদ্যুৎলতার মতো তনুদেহ, দুটি চরণে যেন সংগীত ঝরে পড়ছে। বুকটি যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় প্রিয় মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। গাল দুটিতে, আঁখি তারকায় সন্ধ্যার আলো উজ্জ্বলতা মাখিয়ে দিচ্ছে। কোঁকড়ানো কেশের রাশি দুলছে আনন্দের তালে তালে। একটা মধুর আহ্বান একবার খেয়ালি পাখির খুশি ভরা ডাকের মতো রমেনের কানে ভেসে এল।

ওই তো প্রায় বুক পর্যন্ত সবুজাভ নীল জলে ডুবিয়ে বেল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। হাততালি দিচ্ছে। হাতছানি দিচ্ছে সুদূরের দিকে।

সুদূরের দিকে? না, নিজের দিকে? যে নিজের বুক মথিত করে সাগরের লহরিমালা কুলকুল করে প্রেম জাগিয়ে তুলছে মনে, যৌবনে, জীবনে।

সোনার বরণী তরুণী! ধরে নাও সে তার নিজের প্রেয়সী বেল নয়। সে অন্য কেউ, অন্য কোনও বিস্ময় ছড়ানো প্রতিমা, যাকে প্রার্থনা করে বিশ্বের যৌবন। অনাদিকাল থেকে অনন্ত দিন রাত্রি ধরে।

কিন্তু সে তো সেই ভিনাস, সেই উর্বশী। যার সমুদ্র থেকে উঠে আসার ছবি এঁকে একজন ইটালিয়ান হয়ে গেলেন অমর চিত্রশিল্পী। যাকে বিশ্ববাসনার বিকাশের মর্মস্থলে বসিয়ে একজন ভারতীয় হয়ে গেলেন চির যৌবনের কবি।

এ তো সেই সোনার বরণী তরুণী। বত্তিচেলি একে আঁকেন নি। রবীন্দ্রনাথ একে রচনা করেন নি। এ যে আমারই জন্য রচিত হয়েছে। আমারই, শুধু আমারই।

সিক্ত দেহের ভাঁজে ভাঁজে লাবণ্যের বন্যা।

এ কী রহস্য, এ কী বিস্ময়, এ কী জীবনহরণী অনন্ত মরণ।

এ যে আমারই, শুধু আমারই, প্রতিটি ছন্দ ভরা আনন্দ স্পন্দনে শুধু আমারই।

সংকটে ভরা অতীত, সংগ্রামে ভরা বর্তমান, সংশয়ে ভীরু ভবিষ্যৎ সব মুছে গেল, মুছে গেল রমেনের মন থেকে।

সে উঠে দাঁড়াল। টান টান হয়ে, কঠিন প্রতীক্ষায়।

বেল উঠে আসছে সাগরের বুক থেকে। পশ্চিম সাগরের উপর সূর্য প্রায় ডুবি ডুবি করছে। জলরাশির ভিতর থেকে একেবারে রবির পথ থেকে যেন সে উঠে আসছে। তার দুটি সুগঠিত কাঁধের উপর একটি বিরাট আলোময় প্রভা। সেই প্রভাতেই যেন সে ভেসে আছে।

প্রতিটি পদক্ষেপে সে কাছে আসছে আর রঙিন রক্তিম আলো তার উপর এসে পড়ছে। পদে পদে সেই আলো উজ্জ্বলতর হচ্ছে। হতে হতে অস্তসূর্য তার মাথার চারপাশে দেবী প্রতিমার গোল প্রভার মতো হয়ে শোভা পেল।

রমেনের চোখে বিশ্বের বিস্ময় দেখে বেল থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিশ্বের প্রথম সৃষ্ট নারী। নীল আকাশ, সবুজ সমুদ্র আর শুভ্র ফেনার রাশি পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে।

কতক্ষণ দুজনে বিস্ময়ে আনন্দের স্পন্দনের ছন্দ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল তা ওরা জানে না। কখন যে হঠাৎ সহানুভূতিতে সূর্য সমুদ্রের তলায় অন্তর্ধান করল আর সরমে সন্ধ্যা অবগুণ্ঠন টেনে দিল তাও ওরা জানে না।

রমেনের যখন চৈতন্য হল তখন সে দেখল যে সে একান্ত নিবিড় ভাবে বেঁচে আছে। দুটি মূর্তি পরস্পরের বাহুর বাঁধনে দাঁড়িয়ে আছে। যে বাহু অতীতকে ভুলিয়ে দিয়েছে। বর্তমানকে সরিয়ে দিয়েছে। যে বাহু সবলে প্রেমকে আকুল আলিঙ্গনে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।

চোখ দুজনেরই বন্ধ, কারণ তারা প্রেম ছাড়া আর কিছু দেখতে চায় না। অনুভব করতে চায় না।

রক্তস্রোতও বোধ হয় বন্ধ কারণ দুটি দেহের শিরায় শিরায় যে রক্তধারা বইছে তা যে দুটি হৃদয়ের স্পন্দনে ধরা পড়ে গেছে।

তাদের বোধশক্তির বাইরে যেন ছিল এই অনুভব, এই অলৌকিক প্রথম বিস্ময়।

খানিকক্ষণ পরে রমেনই প্রথম মৃদুস্বরে ডাকল—উষা।

বেল শূন্য দৃষ্টিতে রমেনের দিকে তাকাল। যে চাহনির মধ্যে কোনও মানে পাওয়া যাবে না। সব ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়ে তাকানোর মতো চাহনি। সে যেন কোনও অজানা সুদূরের দিকে তাকাল।

একটি অচেনা অপ্রকাশ মুখের রেখাগুলি অব্যক্ত আনন্দে অনুভবে কোমল হয়ে আছে।

বেল তার একটি হাত ধীরে সুধীরে রমেনের গলা ঘিরে রেখেছে। রমেনের সমস্ত অন্তরাত্মা সেই স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওর সবটুকু জীবনকে প্রেমের জল সিঞ্চন করে লতার মতো লালিত করে তুলছে।

বেলের চোখ দুটি আবেশে, গরম তৃপ্তির আবেশে মুদে আছে। হাত দুটি প্রাণের পূর্ণ স্বীকৃতিকে পূজা উপচারের মতো বহন করে আছে। ওকে এত নিষ্পাপ, নিশ্চিত, নির্ভরশীল দেখাচ্ছে। অথচ সুইমিং কস্টিউমের ভেজা আবরণ ওর ঈষৎ পরিপূর্ণ যৌবনে গঠিত তনুলতার প্রায় উন্মুক্ত সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখতে পারছে না।

সাগর বেলায় রাশি রাশি ঢেউ গুন গুন করে গান গেয়ে যাচ্ছে। মায়াময় চাঁদের হাসি বেলের দেহের উপর রূপের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। স্নানান্তের সিক্ত কেশরাশি থেকে বিন্দু বিন্দু বারি মুখের উপর দিয়ে নেমে বুকের উপত্যকায় সুধীরে গড়িয়ে পড়ছে। সোনার বরণী রাজকন্যার সর্ব অঙ্গে রত্নাকর সমুদ্রের রত্নমালার অভিষেক।

সেই রাজকন্যা—যাকে রূপকথার রাজপুত্র রমেন সপ্ত সাগরের ওপার থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসে কৈশোরের ঘুমঘোর থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

যৌবনের সোনার কাঠির জাদু দিয়ে।

ঘুমের মোহ থেকে জাগরণের মায়াতে।

জাদুকর রাজপুত্রের অন্তরাত্মা শিহরিয়ে উঠল। বেলের আকুল আঙুলগুলি আর চাঁপার কলি নেই। বুভুক্ষু অগ্নিশিখার মতো রমেনের দেহে লেলিহান হয়ে উঠেছে। তার কণ্ঠকে সবলে নিচে নামিয়ে এনেছে।

তাকে এবার জীবনের একটি বাঁকে মোড় নেবার জন্য চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কোমল কান্ত পরশ কঠিন অশান্ত হরষে সরস হয়ে উঠতে চাইছে।

তৃষ্ণায় আতুর আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে রমেন সহসা সত্যের মুহূর্তটির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। তার অন্তরের একান্ত অন্তর্নিহিত আকৃতির সামনা-সামনি। যৌবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে এবার সে কি সেই রমনীয় সীমানা অতিক্রম করতে যাবে?

কিন্তু যাকে সে এই দূর বিদেশে একেবারে পুরোপুরি সর্বস্ব দিয়ে সর্বস্ব প্রতিদানে নিয়ে গ্রহণ করতে যাচ্ছে, নূতন জীবনে একসঙ্গে একদেহ হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে তার জন্য যোগ্যতা যে অর্জন করা হয়নি।

তাই যাকে সে হৃদয়ের সর্বস্ব সমর্পণ করেছে তাকে সংসারে নিজস্ব ছাপ এখনই কী করে এঁকে দেবে?

সে কৈশোর যৌবনের সমুজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো দেহ-কাঁপানো মনমাতানো বৈতরণী তীরে দাঁড়িয়ে রইল। থমকিয়ে চমকিত হয়ে।

ঠিক আগের নিমেষের সঞ্চারিত পল্লবিত অগ্নিদহনের পরিবর্তে গম্ভীর নিগূঢ় বিষাদে ভরে গেল তার মন।

এবং শুধু নিজের দিক থেকেই নয়।

সেই আগুনের লাভাস্রোতের টানে দেহ বৈতরণীতে অবগাহনের আগের মুহূর্তে সে হঠাৎ মৃদু মিনতি শুনতে পেল—নলি মে তাংজেরে, নলি মে তাংজেরে—ছুঁয়ো না আমায়।

॥ ২৮ ॥

সাগরবারির লহরে লহরে ঢেউ না কি?

অথবা রাশি রাশি কুয়াশা?

বিস্কে উপসাগরের এমনিতেই বড় বদনাম। এত পাগলের মতো ঢেউ, মাতালের মতো কুয়াশা এমন ভাবে পৃথিবীতে আর কোথাও বোধহয় টলমল করে না। সান সিবাস্টিয়ান বেশ 'শেলটার' করা সি-সাইড। সব কিছু থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা সাগর বিলাসের বেলা ভূমি।

তবু বিস্কের হাতছানির মধ্যেই পড়ে।

আর রমেনের মনেও তো সেই বিক্ষুব্ধ বিস্কে, বিশাল বিস্কে। ইসাবেলও তার হাত থেকে পার পায়নি।

কিন্তু কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের ভিতরটা তো অচেনা হবেই। নমেরো থিংকো, পাঁচ নম্বর কামরার ভিতরে রমেন তো কোনও দিন আসেনি। আসা সম্ভবই ছিল না। তার ভিতরের আসবাবপত্র, ইনটিরিয়র ডেকরেশন এসব সামান্য কথা আলোচনার সময়ই কোনও দিন ওরা পায়নি। পরস্পর দুজনকে নিয়েই ছিল ওদের আলাপন।

শুধু তাই গীটারের ধ্বনি, আর সেই গীটার-বাদিনী এই দুটিই তো সে চেনে। মর্মর অন্তস্তলে, মর্মমূলে। আর সব কিছুই তো গৌণ। গোনাগাঁথার বাইরে।

—তুমি, তুমি, বেল?

—হ্যাঁ, রামন, আমি। তোমার বেল। তোমারি বেল। এখনো এবং চিরকাল। আর তুমি, তুমি?

—আমিও তোমার। সেই জন্যেই তো এই অন্তহীন ব্যবধান পার হয়ে, সব বাধা এড়িয়ে তোমার কাছে এসেছি।

—কিন্তু রামন, তুমি রামন অমন করে চলে গেলে কেন? তোমায় যে কত প্রত্যাশা করেছিলাম।

প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়েও রামন, হিজ এক্‌সেলেন্সি রামন পিয়েত্রো, কোনও রকমে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

আজ সে কাঁদবে না, তার উষাকে কাঁদাবে না।

সে শুধু বলে—আমি চলে তো যাইনি, বেল, শুধু সেই চালচুলোহীন অসহায় তরুণ চলে গিয়েছিল। আমি তো তোমার কাছেই ছিলাম। আমার প্রতিশ্রুতি তো আমি রেখেছি।

ম্লান হাসিতে উষার মুখ ভরে গেল।

সে বলল—হ্যাঁ, তুমি আমাদের নোবেল লরিয়েট কবি হিমনেথের একটা কবিতা তোমার চিঠিতে

লিখেছিলে বটে :—

আমি তো ফিরিব না। নিশীথিনী
উত্তাপে নীরব শান্ত বিহগিনী
ধরারে পাড়াবে ঘুম আলোমাখা
ওগো, চাঁদিনী, একাকী মোর চাঁদিনী।

রমেন প্রায় চুপে চুপে বাকিটুকু আবৃত্তি করল :—

আমি তো রহিব না সেথা আর
বাতায়ন পথেতে তোমার
আসিবে নবীন করা হাওয়া
সেই তো আমারে হবে পাওয়া—।

ম্লান হেসে বেল বলল—শুধু সেইটুকু?

মাথা নিচু করে রইল রমেন।

আবার বেল বলল—শুধু সেইটুকু?

এবার রমেন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বেলের দিকে তাকাল। বলল—আর আমি কী করতে পারতাম সেদিন, উষা? সঙ্গে শুধু তো ছিল একটা পরাজিত অতীত আর পলাতক প্রেম। সেটুকু সম্বল করে কি তোমায় চাওয়া যায়?

এবার প্রায় কেঁদে ফেলার পালা ইসাবেলের। সে একটা আর্তনাদের মতো স্বর কোনও রকমে চেপে মৃদুভাবে উচ্চারণ করল—পরাজিত অতীত আর পলাতক প্রেম। কেন, কেন রামন, তুমি মনে করলে না আশা ভরা উষা আর প্রেমে ভরা প্রাণ?

রমেন চুপ করে রইল। গীটার গুঞ্জন আর কমলা কলির সৌরভ সব যেন ওলটপালট করে দিচ্ছে।

প্রথমটি জীবনে এনে দিল ঝংকার।

দ্বিতীয়টি ছড়িয়ে দিল স্বপ্নসংহার।

মনে পড়ল যে বেলই তাকে ছড়িয়ে ফেলে যাওয়া কমলা কলি যে অমঙ্গলের লক্ষণ তা জানিয়েছিল। এবং জানিয়ে নিজেও ভয়ে শিউরে উঠেছিল।

কিন্তু বেলের অন্তরের ব্যথা অনুভব করে রমেন সে কথাটা আর মনে করিয়ে দিল না। স্বপ্নসংহার তো হয়েই গিয়েছিল।

বেলই আবার বলল—জানো, রামন, তোমার সঙ্গে সাগর তীরে শেষ দেখার সময় তোমার বুকে বাঁধা ছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ তার হিসাব ছিল না। স্বপ্ন ভেঙে গেল যখন দেখলাম যে তুমি আমার অনুরোধ সত্যি সত্যি শুনলে। নলিমে তাংজেরে—ছুঁয়ো না আমায়। কিন্তু তুমি কেন, কেন আমার বারণটুকু শুনলে? নিবারণ করার সাধ্য তো আমার ছিল না একটুও। হায়, কিছুই বোঝনি তুমি।

রমেন, পরাজিত রমেন, পলাতক রমেন চুপ করে রইল। যার জন্য হিজ একেসেলেন্সি রাষ্ট্রীয় পরিচয়-পত্র ক্রিডেনশিয়াল পেশের পরের সরকারি উৎসব থেকে পলাতক হয়েছে, তার সামনে রমেন পরাজিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বেল যেন নিজেকেই শোনাতে লাগল—আহা, কী মধুর, মধুর প্রেম। আধো ঢাকা সুধামাখা ভীরু প্রেম। কারণ—যৌবন যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। জ্বলন্ত অনলকে পুরুষ দেহের কারাগার বন্দী করে নিতে চায়। তিলে তিলে তার দাহ মিলিয়ে যায়। প্রত্যহের ব্যবহারে তার তীব্রতা যায় হারিয়ে। কিন্তু প্রথম প্রেম? ফুটে উঠতে উৎসুক প্রেম?

একটু থেমে বেলই আবার কথা কইল। হিস্পানি প্রাণ প্রকাশে মুখর হয়ে উঠেছে।

—জানো রামন, পৌঁছে যাবার চেয়ে এগিয়ে চলাই বেশি মনোহর। পৌঁছানোর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে থাকার মতো মোক্ষম সময় আর হয় না। তোমার কাছে আমি পৌঁছোতে চেয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে চিরকালের জন্য জড়িয়ে যেতে।

—উষা, আমিও তাই চেয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে আবদ্ধ অথচ তুমি বন্ধনহীন। যুক্ত অথচ মুক্ত। যারা মুক্ত শুধু তারাই তো পুরোপুরি নিজেদের দিতে পারে।

—তুমি বড় দার্শনিকের মতো কথা বলছ, রামন। একেবারে হিন্দু দার্শনিক বোধ হয়।

—না, উষা। আমি দর্শনের গেরুয়া রঙ দিয়ে আমার উষার অরুণিমাকে ছুপিয়ে রাখিনি। আমার সুখ দুঃখ তোমার হাত দুটিতে তুলে দিয়েছিলাম। তাই জীবনের বোঝাটা সেখান থেকে নামাতে চাইনি। আমার আত্মাকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঠেলে নিয়েছিলাম। যাতে তোমার ভালোবাসাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। পেয়ে যাওয়ার, ঘরে তুলে নেবার ইচ্ছাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। যাতে নিত্যই নব নব বিস্ময়ে তোমার প্রেম অনুভব করতে পারি।

করুণভাবে মাথা নাড়ল বেল।

—জানো রামন, আমিও সে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখতে পারিনি। দেখলাম যে তোমার অনুভবকে শুধু ছবির মতো ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখলে চলে না। শুধু আয়নায় দেখে দেখে দিন কাটে না। শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বাবাকে বললাম যে লন্ডনে বেড়াতে যেতে চাই।

প্রায় অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে রামন জানাল—আমি তা জানি, উষা। টাইম্‌স্ কাগজের সোসাইটি কলমে দেখেছিলাম যে তোমরা এসেছ। বুঝেছিলাম যে আমার খোঁজ করছ। কিন্তু...

—কিন্তু কী, রামন? চুপ করে আছ কেন?

—উত্তর দেবার মুখ যে নেই, বেল। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছিলাম যে বিশ্বব্যাপী ডিপ্রেশনের বাজারে আমার দেশে বা অন্য কোথাও আমার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ভরসাও নেই। তাই পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা না করেই তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ দেশে পালালাম। ঠিকানা পর্যন্ত রেখে যাইনি।

এতক্ষণে ইসাবেল যেন একটু আশ্বস্ত হল। গভীর প্রত্যয় নিয়ে সে বলল—কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে পালাতে পারোনি, রামন। আমি দেখলাম যে আমার সেই মনের আয়নাতে তোমার মূর্তি আর প্রতিবিম্ব নয়, একেবারে খোদাই হয়ে গেছে। সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে আমি গভীর ভাবে নিবিড়রূপে আপনার করে নিলাম। আশ্চর্য, এমন আশ্চর্য ব্যাপারও হয়। তাই হল আমার জীবনে।

—বল, বল, বেল। আমি আবার আমার সেই জীবনে ফিরে এসেছি। তোমার অনুভব দিয়ে আমার অন্তরাত্মাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে দাও।

—জানো রামন। আশ্চর্য সেই প্রেম। সে একটি অতিথি, ভিনদেশী অতিথি হয়ে এল। ক্ষণিকের মাধুরী ভরা দ্বীপটি যেন ভাসতে ভাসতে আমার চিরকালের সঙ্গে এক হয়ে গেল। আরও অনুভব করলাম যে আমার ভালোবাসা যেন ডানা মেলে ওড়া পাখি—তোমার সেই বিরাট হিমালয়ের পানে ডানা মেলে উড়ে গেল। আর প্রাণহীন সাদা তুষার-স্তূপকে তোমার উষার অরুণবর্ণে রাঙিয়ে রাখল।

একটু থেমে বেল বলল—বড্ড কবিতার মতো শোনাচ্ছে, না? অবাস্তব, অসম্ভব অনুভব, তাই না?

একটি মুগ্ধপ্রাণ সংসারের ফর্ম্যালিটি আর হিসাব-নিকাশের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে প্রেয়সীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—জানো, রামন, আমি আবার মাদ্রিদে ফিরে এসেছিলাম। বেশ কয়েক বছর পরে। এবার তোমার প্রিয় স্প্যানিশ কবি হিমেনেথের স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই টাগোরের ভক্ত, তাঁর অনেক কবিতা জানেন। সিনরা হিমেনেথের কাছেই আমার বাকি জীবনটুকুর পাথেয় পেয়ে গেলাম। টাগোরের লেখা।

—আচ্ছা রামন, তুমিও এখন কবিতা লেখ না কি? লিখেছ কি কোনও কবিতা আমায় নিয়ে? সালামাঙ্কার সেই কবিসভার মতো—দু'রকম মানে দিয়ে ভরে, যাতে কেউ জানতে না পারে। অজানা আমি রইব শুধু তোমার কাছে জানা। শুধু তোমার কাছে।

—না উষা, আমি কবিতা লিখি না। শুধু কঠোর নিষ্ঠুর গদ্যে সংবাদ লিখেছি। শুধু কলম নয়, 'এল কার্ভো'র মতো, ছুরির মতো ধারালো ভাবে আমার এখানে ফিরে আসার পথ কেটে কেটে তৈরি করে নিয়েছি। আমার দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের সরকারের কাছে স্বীকৃতি পেলাম। তারই ফলে আমার আজকের ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিস। তোমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মুখ।

একটা নিবিড় নিস্তব্ধতায় ঘরটা যেন ভরে গেল। এত কম কথায় এত কঠিনভাবে অন্তরের প্রেম কেউ কি প্রকাশ করেছে কোনও দিন?

বেলই নীরবতা ভাঙল—আর আমি কী করতাম, জানো রামন? তোমার প্রিয় কবির গীতাঞ্জলি অনুবাদ

করেছিলেন কবি হিমেনেথ। সেই অনুবাদেই পড়েছিলাম :

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে
কূলহারা সেই সমুদ্র মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে।

তন্ময় ভাবে রামন সাড়া দিল—তোমার সেই গীটারের ধ্বনি চিরদিন শুনে আসছি মনে মনে, বেল।

বেল বলল—শুধু তো তাই নয়। সিনরা হিমেনেথ মাদ্রিদ থেকে টাগোরকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা আমি মনে মনে তোমাকেও লিখেছি বার বার।

—বল, বল, বেল সেই চিঠির কথা।

—তিনি তোমার কবিকে লিখেছিলেন, "এত দিন মনে মনেই তোমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। ....জানি যে তোমার ঠিকানা যদি পেতাম বা সত্যি সত্যি চিঠি লিখতাম তো হলেও এই এত বছর যা অনুভব করেছি তার কিছুই প্রকাশ করতে পারতাম না।"

—আশ্চর্য, আশ্চর্য, বেল। আমিও যে তাই ভাবতাম।

—শুধু তাই নয়, রামন। টাগোরের শেষের কবিতাও আমি পড়েছি। আর মনে মনে পেয়েছি অশেষ আশ্বাস, অসীম অনুভব।

রমেন অভিভূত হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

—জানো, রামন, যদিও তোমার খবর কিছুই জানতাম না, এটা তো জানতাম যে তুমি সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছ। উপরে উঠতে চেষ্টা করতে করতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছ। সে সময়ে, সেই মুহূর্তগুলিতে তোমার সহধর্মিণী নিশ্চয়ই তোমার জন্য সব কিছু করেছেন, সব সহায়তা, সব দুঃখে অংশ নেওয়া।

—সে কথা সম্পূর্ণ সত্য বেল। আমি ভাগ্যবান।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তবু জানো, শেষের কবিতা পড়ে ভাবতাম যে প্রত্যহের ম্লান দিনগুলির বাইরেও তুমি আকাশের দিকে তাকাও। সেই আকাশে তোমার উষার দিকে তাকিয়েও তুমি কিছু নিষ্কৃতি, কিছু মুক্তি পাও। সংসারের সহধর্মিণী তো সবটা ভরে রাখে না। তার কাছ থেকে আঘাতও পেতে হয়। তার জন্য দুঃখও সইতে হয়। সেই নিমেষে সংসারের হাত থেকে পরিত্রাণ বয়ে নিয়ে আসে, হেসে দাঁড়ায় মনের সীমানায় ভিনদেশী বঁধু।

—সত্যি, সত্যি তুমি বলেছ, বেল। পৃথিবীতে সব প্রেমেরই এই রূপ। একজনের মধ্যেই দুজনকে পাওয়ার সৌভাগ্য যদি নাও হয় ভিনদেশী বঁধু আমরা রচনা করে নিই সংগোপনে, মনের গহনে।

একটুক্ষণ পরে রমেন বলল—আচ্ছা বেল, তুমি টাগোরের আরেকটি কবিতার কথা বলছিলে। তোমার আমার এই বিরহের উপর তৈরি সেতু। সেটি আমায় শোনাও। ভীরু প্রেমের একমাত্র ভাষাই তো হচ্ছে কবিতা।

গভীর স্বরে মধুর সুরে বেল শোনাল—

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে।

জানো রামন—এই কবিতাটি আমার সমস্ত বিরহকে সহনীয় করে দিল। ভাবতাম যে, প্রাদো মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে যখন অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরিতে হেঁটে যাই তুমি ঐ সোনালি নুড়ি পাথরের ড্রাইভে আমার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছ। স্মরণের সরণী বেয়ে নিত্য, আমার আসা যাওয়া।

রামন বলল—হ্যাঁ, আমিও দেখি যেন আকাশে ছায়াপথ থেকে তুমি হাসছ। সান সিবাস্টিয়ানের সাগরজলের মতো স্নিগ্ধ তোমার চোখ। আমার মনের প্রতিচ্ছবি সেখানে।

বিশ বছর ধরে জমে থাকা বরফ হিমালয়ের চূড়ায় বসন্তের স্পর্শ পেয়ে গলতে শুরু করল।

—জানো রামন, আমি একদিন আকাশে দুহাত মুঠো করে তুলে ধরে বলেছিলাম—তোমার মুঠিতে আমার জীবন সমর্পণ করলাম। শূন্য কিন্তু মায়ামন্ত্রে পূর্ণ সেই মুঠিতে আমি অশেষ ঐশ্বর্য অনুভব করেছিলাম। আকাশের অসীম শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুমিও নিশ্চয় আমার স্বপ্ন দেখেছ। স্বপ্ন দেখেছ আর ভেবেছ যে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দিয়ে তুমি আমায় সব সংসার থেকে আড়াল করে বাঁচিয়ে রেখেছ। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ সদুপদেশ

আর ঝড়ের মতো তিরস্কার তাই আমার গানে কোনও দিন বিঁধত না। ক্রমে ক্রমে আমার নিরালা পড়ুয়া জীবন সবাই স্বাভাবিক ভাবে সয়ে নিল। সর্বদা ভাবতাম আমি যে ভালোবেসেছিলাম, ভালোবাসা পেয়েছিলাম তাই-ই যথেষ্ট।

দ্বিধাজড়িত স্বরে রমেন জিজ্ঞাসা করল—আর তুমি আমার সম্বন্ধে তখন কি ভাবতে বেল?

কুণ্ঠাহীন ভাবে বেল উত্তর দিল—আমি শান্ত হয়ে ভেবে দেখলাম যে তুমি যা স্থির করেছ তাই আমি মেনে নেব। আমার কাছে শুধু একটি জিনিসের দাম আছে—তুমি নিজেকে স্বীকার করে নাও। তোমার সিদ্ধান্ত, তোমার পথ তোমার কাছে সত্য থাকুক। তা যদি হয় তাহলে আমার কখনও কোনও কষ্টই কষ্ট বলে মনে হবে না।

—আমার নিঃসঙ্গ অসহ নিমেষগুলিতে আমিও তা মনে করেই নিজেকে নিজের কাছে সহনীয় করে রাখতাম। মনে আছে বেল, তুমি সাগরস্নান থেকে উঠে আসছ। তোমার পায়ের নিচে বালিগুলি ভেজা। তোমার স্লিপার জোড়া জলে শপশপ করছে। তুমি মুখ তুলে ধরলে আমার মুখে। গভীর আবেশে নিবিড় ভাবে যেন একটি বই চোখের সামনে মেলে দিলে আমার পাঠের জন্য। সেটিই ছিল আমাদের শেষ দেখা।

—তুমি তখন কী ভেবেছিলে, রামন?

—আমি মনে করেছিলাম যে তুমি আমায় বলতে চাচ্ছ, দেখে নাও আমি তোমায় কত ভালোবাসি, যেন বলতে চাচ্ছ যে আমি যদি সর্বদা তোমায় ততখানি না-ও ভালোবাসি অন্তত সেই মুহূর্তে যেন সমান সমান ভালোবাসি। কারণ তুমি তো একটুও বদলাবে না সেটা যে আমি জানি, তা তুমি জানো।

—ঠিক বলেছ আমার প্রিয়, আমার অপরিবর্তনীয় প্রিয়।

—অপরিবর্তনীয়? একবারে যে কাব্য হয়ে গেল, বেল। তবে শোন। আমিও ছোট্ট একটা লাইন শোনাই ইংরেজি থেকে—

আমি ভালোবেসে যাব চিরকাল,
রূপবতী রয়ে যাবে তুমি।

এতক্ষণে প্রাণ খুলে হেসে উঠল উষা।

তারপর বলল—আচ্ছা, কেরিদো মিয়ো, আমার প্রিয়, তোমার দুঃখের দিনের প্রেমের কথা তো সবই বলেছ। আজ রাতে তোমার বিজয়ের দিনের সম্মানের রাতের কাহিনিটুকু শোনাবে না? তোমার ট্রায়াম্ফের উৎসব রজনীর কথা—এই মাদ্রিদে—যেখানে কেবল সাংসারিক কারণে তুমি হেরে যেতে বাধ্য হয়েছিলে।

ঠিক কথাই তো। হিজ একসেলেন্সি রমেন পাত্র তার পরাজয়ের ক্ষেত্রে এসে রাষ্ট্রমর্যাদার মুকুট পরেছে আজ রাতে। রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয় পেশ করার আড়ম্বর, রাষ্ট্রসম্মানের উৎসবের প্রধান অতিথির মর্যাদা পেয়ে সে বিশ বছর আগেকার পরাজয়ের শোধ নিয়েছে।

কিন্তু নিতে পেরেছে কি? ওই যে মাঝখানের বিশটি ব্যর্থ বছরের ব্যবধান? তাকে ফিরিয়ে পাবে কি সে?

পাবে, পাবে।

এই তো বেল রয়েছে সঙ্গে, সামনে। স্মরণের সমস্ত সুধা মাধুরীতে ভরা ইসাবেল রিবেরা। এই কামরা নুতুমেরো থিংকো। যে ঘরে প্রবেশের অধিকার তখন তার ছিল না।

প্রসন্ন হাসি হেসে রমেন বলল—জানো, বেল, এখানে পৌঁছোন পর্যন্ত তোমার কথা সব সময় আমায় ঘিরে রয়েছে। একেবারেই সেই অ্যাথেনিয়াম লাইব্রেরির গোপন চুম্বনের অফুরান আবেশে। সুইট্ সেভেন্টিন অ্যান্ড ইয়েট আনকিস্ড। জীবনের প্রথম চুম্বনটি দিয়েছি তাকেই।

—তুমি তো জানো, রিসেপশনগুলিতে স্টেট্ ব্যাংকোয়েটের সময় কী কীরকম ভাবে চোখ ধাঁধানো হৃদয়-হরণী রূপসীদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হয়। তোমাদের স্পেনের ব্যাপার আরও জমকালো। এত রূপ আর এত বাহার কোথা থেকে যে সমাবেশ করা হয়। একজন অ্যাম্বাসাডরের কাছ থেকে যে সব মিঠে আরও মোলায়েম 'প্লেজানট্রি' পিরিত কথা সুন্দরীরা প্রত্যাশা করে তার ষোলআনা সদ্ব্যবহার করার মওকা মেলে এই সব দরবারে। চুটিয়ে ফ্লার্ট করে রঙ্গিনীদের ফ্ল্যাট করে দাও। ল্যাটিন দেশগুলির বিশেষ দস্তুর।

—তুমি কী করলে তাই বল, রামন? আহা কি ভাগ্যিস, আমি সেখানে হাজির থেকে তোমার পথের কাঁটা হইনি।

—আহা মরি! কী মধুর কথাই না বললে তুমি, আমার আমাদা। আগে তো শোন।

—জানো বেল, ডজন খানেক ‘প্রভোকেটিভ’ উত্তেজনা জাগানিয়া সুন্দরী আমার কাছেপিঠে ময়ূরের মতো পেখম মেলে ঘুরতে লাগল। চোখে আঁকা মাস্কারা আর মাখা আমন্ত্রণ।

এই বলে রমেন একটু মুচ্‌কি হাসল। বেল যে কত জেলাস হয়ে উঠতে পারে তা সে ভোলে নি।

—জান, বেল, তোমাদের নাম করা এক কন্ডেসা...। হৃদয় হরণ করা তার একরকম প্রফেশনই বলা চলে—তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেই এগিয়ে এলেন। আমার তো কলারসিক বলে একটু নাম আছে। এদিকে উনি নিজেই একখানা জলজ্যান্ত ললিতকলা। ভাবলেন যে তার সারি সারি বিজয়ের মুকুটের মধ্যে আরেকটি ট্রফি যোগ দিতে যাচ্ছেন।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বেল জিজ্ঞাসা করল—তারপর কী হল সেটাই আগে বল না ছাই।

হেসে রমেন বলল—কন্ডেসা তার হার বুঝতে পেরে একটা স্ট্রিং কক্‌টেলের অর্ডার দিলেন। পুরুষ নিমন্ত্রিতরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যে অন্তত একবার পুরুষদের মান রক্ষা হল।

রমেন এখানেই শেষ করল না। বলল—বাকিটুকুও শোন, বেল। আমার জয়ের মালা তোমার শিরের লরেল পাতার মালার মতো পরিয়ে দিতে চাই।

শুনে বেল কী আরও একটু কাছে এগিয়ে এল? ওর নিঃশ্বাসে কিসের সুবাস? কমলা কলির? বিয়ের অনুষ্ঠানের অরেঞ্জ ব্লসমের?

যে বিয়ে ওদের হয়নি সেই শুভ বিবাহের?

—জানো বেল, বেশ কয়েকটি গ্র্যান্ড লেডি আমার দিকে এগিয়ে এলেন। নাচের বাজনা শুরু হলেই প্রথম নাচটি আরম্ভ করবার অধিকার আছে বিশেষ অতিথির। রাষ্ট্রপতি তো উপস্থিত নেই।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বেল জিজ্ঞাসা করল—তোমারই সম্মানে উৎসব। তুমি কার সঙ্গে নাচ শুরু করলে, রামন?

ম্লান হবার পালা এবার রমেনের।

সে বলল—কিন্তু তুমি তো সেখান ছিলে না, বেল। তোমার সঙ্গে যেখানে মিলন হল সেই নগরে, সেখানকার প্রাসাদের উৎসবে তুমি তো ছিলে না, উষা। আমি তো আগে জানতাম না যে এই নুমেরো থিংকো কামরায় এলে আবার তোমার দেখা পাব।

খুশি হয়ে বেল জানতে চাইল রমেনের এই সন্ধ্যার উৎসবের কথা—বিজয়ের কথা।

রমেন বলতে লাগল—আমি এই সব মহীয়সী মহিলাদের টাইটেলগুলি প্রায় পাশ কাটিয়ে একটি ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে মাথা ভর্তি সাদা কেশের রাশি নিয়ে বসে আছেন একজন সৌম্য বর্ষীয়সী। বেশ ধীরে একটি ‘বাও’ করে বয়সের মর্যাদা দেখিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। পিছনে রয়ে গেল কাব্যের উপেক্ষিতার দল, আর সেই নটবর শ্রেণী যারা আবহমান কাল থেকে শুধু অভ্যর্থনাই পেয়ে এসেছে।

বাকি সন্ধ্যাটুকু আমি একেবারে ‘লায়নাইজড হিরো’ হয়ে রইলাম। তোমার রামন বীর হয়ে গেল, একেবারে পুরুষসিংহ।

তার পরেই রমেন প্রায় ভেঙে পড়ল—বেল, বেল, উষা, আশা আমার, তুমি কেন সেখানে ছিলে না? এত কাছে আছ, মনের মধ্যে তো সর্বদাই, শহরের মধ্যেও এত কাছে। আমার এখানে অ্যাম্বাসাডর হয়ে আসা তো কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছিলে। এত কাছে, অথচ আমার বিজয়োৎসবের মুহূর্তে তুমি কত দূরে। ক-ত দূ-রে।

কেন? কেন?

কেউ তো এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না এখন।

অধীর হয়ে উঠল রমেন।

স্মৃতিময় বাসন্তী উষায় সে উষার দুটি হাতে নিজের ভবিষ্যৎ তুলে দিতে পারলে সুখী হত। ওদের দুজনকেই তো প্রেম এমন একটি অদেখা বাঁধনে যুক্ত করে দিয়েছিল। অজানা সাধনে রমেন তিলে তিলে নিজেকে এগিয়ে এনেছে। নিজের আত্মাকে সংসারের সীমানা অতিক্রম করিয়ে এইখানে এসে পৌঁছেছে।

সেদিনকার তরুণ উষার ত্যাগ যে বিসর্জন নয় তার প্রমাণ তো সে আত্মার অক্ষরে অক্ষরে এই প্রৌঢ় নিশার বুকে এঁকে দিয়েছে। একটি নবীন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে পড়ল। ভীরু প্রেমের ভাষা।

তোমায় নতুন করে পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণে;
ও মোর ভালোবাসার ধন।

না। রমেন তো ক্ষণে ক্ষণে হারায়নি। একবার শুধু সরে এসেছিল। তা-ও হার মেনে সরে আসেনি। জয়ের সাধনার জন্য দূরে চলে গিয়েছিল।

আজ সে ভাগ্যের সঙ্গে হিসাব নিকাশ করবে;

কিন্তু কই? বেল, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?

শুধু সরে গিয়েছিলাম বলে এত সাজা? এই মাত্র তো তুমি আমার সঙ্গে কত কথাই বললে। এখনই প্রেমের সেই পুরানো জেলাসি পর্যন্ত দেখালে। সংসারের ভাষায় বলবার সাহস ছিল না বলে যে কাব্যের ভাষায় বলতে তা-ও তো বললে এখনই।

তবে? তবে?

কিন্তু কেউ তো উত্তর দিচ্ছে না এখন।

যদি কেউ আমার এ কাহিনি জানতে পারে সে কবির ভাষায় বলবে—ভালো যে বেসেছিলাম, ভালোবাসা যে পেয়েছিলাম তা-ই যথেষ্ট।

না। না।

শুধু তাই দিয়ে সারা জীবন কাটানো যায় না। তাই তো সকাল থেকেই সংগ্রিয়া সুরা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তারপর দরবারি অনুষ্ঠানে একটার পর একটা নতুন নতুন হিস্পানি সুরা 'টোস্ট' হিসাবে পান করেছি। 'টোস্ট' প্রত্যেক বারই পান না করলে অমর্যাদা দেখানো হয়। কিন্তু শুধু সে জন্যই কি পান করে চলেছি।

হরেক রকমের সুরা ভিতরে গিয়ে মিশলে তাদের মিলিত আবেশ খুব বেড়ে যায়। তবুও, সব জেনেশুনেই পান করেছি।

চোখের স্বপ্ন, মনের কল্পনা যে উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। সত্য হয়ে ফুটে উঠছে শুধু এই পাঁচ নম্বর কামরা নুমেরো থিংকোর নিঃসঙ্গ নিষ্ঠুর নিঃসীম শূন্যতা।

মর্নিং হ্যাঙওভারের আমেজ নয়, জীবনভোর স্মরণ বিস্মরণের আবেশ। তার কান্নাহাসির দোলা। তার পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা। অগীত সংগীত। অজ্ঞাত ভাগ্য।

সব কিছুর মেলানো দোলা রাতের গভীরে মনের মহাসিন্ধুকে তোলপাড় করে তুলেছিল।

তার অন্তহীন আহ্বানের আশাহীন আকুলতা। মর্মে মর্মে অনুভব।

হিজ এক্সেলেন্সি সিনর রামন পিয়োত্রো, ছিদাম মুদি লেনের সেই রমেন পাত্র হেরে গিয়ে ধীরে ধীরে সান হেরোনিমো সোনার স্বপ্নের সরণীতে ধীরে ধীরে নেমে এসে ট্যাক্সি ধরলেন।

সামনে একটার পর একটা প্রটোকল অনুসারে কর্তব্যের তালিকা তৈরি আছে। সেগুলি অবহেলা করলে তাঁর প্রেমেরই পরাজয় হবে। হবে তার উষারই অমর্যাদা।

কলারসিক অ্যাম্বাসাডরের মুখে ক্লান্ত প্রসন্নতার ছাপ।

এদিকে এম্বাসিতে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন অফিসাররা। আড়চোখে তাকিয়ে সেই মুখে তাঁরা অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। অনুক্ত, অব্যক্ত সেই সব প্রশ্ন।

কিন্তু জীবনের গহনের কোনও ধরাছোঁয়াই কি এখন সেখানে পাবে কেউ?

রাজার কুমার পক্ষিরাজে

অনু ও ভরতকে

ভূমিকা

দলাই লামা

থেকচেন চোয়েলিং
ম্যাকলিয়ডগঞ্জ ১৭৬ ২১৯
কাঙরা জিলা
হিমাচল প্রদেশ

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জ্ঞান গরিমার জন্য এবং বুদ্ধের শিক্ষানীতি চর্চার পথ নিঃসংশয়ে অনুসরণ করে চলতে আমাদের দীক্ষিত করার জন্য তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে থাকেন।

অতীশ যে সময়ে তিব্বতে আমন্ত্রিত হন তখন যে ধর্মব্যবস্থার রাজা লাং ধর্মের রাজত্বকালে অবনতি ঘটে সবেমাত্র আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছে। তাঁর বিচক্ষণতার ফলে তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের শোধনের কাজে বিপুল অবদান রাখতে এবং ঐ ধর্মমতের ব্যাপক প্রসারতায় সহায়তা করতে পেরেছিলেন।

অতীশ সম্পর্কে শ্রীদেবেশ দাশের বইটিকে আমি স্বাগত জানাই। সেই মহান্ আচার্য সম্পর্কে লেখা অনেক গ্রন্থাদির মধ্যে এইটিও হবে আর একটি সংযোজন। আমি সুনিশ্চিত যে, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে বহুকালের প্রাচীন সুসম্পর্কের সচেতনতা প্রসারের ক্ষেত্রে এই বই সহায়তা করবে।

দলাই লামা

১

সে এক রাজপুত্তুর—যায় দেশে বিদেশে। তেপান্তরে। সাত সমুদ্দুর আর তেরো নদী মাঝখানে থাকলে কী হবে? পথের ঝড়-ঝাপটা, অজানা দেশের আপদ-বিপদ, এমনকি রাক্ষস-খোক্ষসের মতো শত্তুরের দল কিছুতেই রাজপুত্তুরকে টলাতে পারে না।

সে-যে রাজার কুমার।

যে দেশে সে যাবে, সেখানে ঘুমিয়ে আছে রূপকথার মতোই এক রহস্যময়ী রাজকন্যে। কত যুগ ধরে তার প্রাণ-ভোমরা নিথর হয়ে আছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সে রাজকন্যে হল—একটা দেশ। একটা দেশকে কোনও রাজকন্যার সঙ্গে তুলনা কোনও রূপকথা করেনি। কিন্তু এই কাহিনি যে সেরা রূপকথা।

সেই-রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সোনার জীয়ন কাঠি ছুঁইয়ে, অনাচারে ভরা, অন্যায়ে ঘেরা সেই দেশটির—সেই ঘুমন্ত রাজকন্যাটির নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অনেক বাধা আসবে, বিপত্তি হবে। মোহিনী মায়া দিয়ে ডাইনি বুড়ি ভোলাতে চাইবে রাজপুত্তুরকে। কিন্তু পারবে না।

কারণ, রাজপুত্র জানে যে, সে চলেছে মহান একটা মন্ত্র নিয়ে। মহান একটা ব্রত পালনের সঙ্কল্প নিয়ে। পরের মঙ্গলের জন্য তার নিজের জীবন সে সঁপে দিয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদ আছে তাঁর মাথার ওপর। সে জয়ী হবেই হবে। সেই দেশ—সেই রাজকন্যে জেগে উঠবে নতুন জীবনে। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। পৃথিবী হবে সুখী, স্বচ্ছন্দ, শান্তিময়।

সেই হাজার বছর আগেকার রূপকথার মতো কাহিনির নায়ক এবং সেই রাজপুত্তুর ছিলেন এক অসামান্য বাঙালি।

আর রাজকন্যাটি ছিলেন—হিমালয়ের মেয়ে, হিমালয়ের মাথার মণি। তখন নাম ছিল হিমবন্ত—এখন যাকে বলি তিব্বত।

২

রূপকথার মতো এই গল্পেও রাজপুত্র, রাজকন্যা, ঢাল-তলোয়ারের ঝনঝনানি—সবই আছে। এমন কি রাজাকে কারাগারে বন্দী করে রাখা, তার জন্য মুক্তিপণ দাবি করা—সবই ঘটেছিল।

রাক্ষস-খোক্ষসের মতো শত্রুর দল, পাহাড়ি ডাকাতের দল, ডাকিনী যোগিনী, কত কিছু এসেছিল ঘিরে। কত অলৌকিক ঘটনা, আশ্চর্য পরিবেশ হয়েছিল সৃষ্টি।

কিন্তু আরও যা আছে, তা এই রাজপুত্রের কাহিনিকে পৃথিবীতে অতুলনীয় করে রেখেছে।

সেই কাহিনি তুলে ধরা দরকার। আমরা বাঙালিরা, ভারতবাসীরা যে কত উঁচুতে উঠতে পারি, তার পরিচয় আছে এই কাহিনিতে। যার বিবরণ রূপকথায় ভরা হলেও সত্য দিয়ে ঘেরা।

বাঙালি রাজপুত্রটি কত কষ্ট স্বীকার করলেন, বিদেশে বিভুঁয়ে চিরকালের জন্য যেন স্বেচ্ছায় নির্বাসনেই চলে গেলেন তিনি। ওই দেশে গেলে তাঁর নিজের আয়ু কমে যাবে, এমন সাবধান বাণী শুনেও মহান উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হয়েছিলেন। কোন্ রূপকথাতে রাজপুত্র এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছে ? কোন্ রাজপুত্র, আদ্যিকালে বা এইকালেই এমন স্বার্থত্যাগ করেছে?

আর বিদেশে অভিযান? রহস্য আর রোমাঞ্চের দেশে মহান্ ব্রত নিয়ে চলে যাওয়া। অজানা পথে অচেনা লোকের মধ্যে একা এগিয়ে যাওয়া? তখনকার দিনে ভাবা যেত না।

যারা সঙ্গে চলল, তারা কেউ নিজের দেশের লোক নয়, নিজের জাতির লোক তো নয়ই। শুধু ধর্মের টানে, ভগবানে ভরসা করে এমন দেশে যাওয়া—যা এখনও পর্যন্ত একরকম নিষিদ্ধ দেশ—আজ পর্যন্ত, সে-দেশে সহজে কেউ ঢুকতে পারে না। তেমন এক নির্বান্ধব দেশে কোন্ দুঃসাহসে গিয়েছিল সেই রাজপুত্রটি?

সুমেরু কুমেরু দেশে তুমি যে-কোনও সময় যেতে পারো, যদি মনে থাকে সাহস, দেহে শক্তি অর্থাৎ অল্প বয়স, সুস্বাস্থ্য আর থাকে বৈজ্ঞানিক সাহায্য সাজ-সরঞ্জাম।

কিন্তু হাজার বছর আগের অজানা জঙ্গলে ভরা, ডাকাতে ভরা, পাহাড়ে ঘেরা বরফে ঢাকা দেশে যাওয়া? তন্ত্রমন্ত্রের দেশ তিব্বতে? আর ষাট বছর বয়সে?

আমাদের এই রূপকথা তেমনই এক রাজপুত্রকে নিয়ে।

এমনি রাজার কুমার নন—তিনি হয়েছেন পণ্ডিত, হয়েছেন সন্ন্যাসী, হয়েছেন সবচেয়ে বড় শিক্ষাদাতা—উপাধ্যায়।

আজকের যুগে আমরা পরীক্ষা পাস করে, নয়তো বিশাল বিশাল বই লিখে অনেক উপাধি পাই, মহামহোপাধ্যায় হয়ে যেতেও পারি। হাজার বছর আগে কিন্তু উপাধি পাওয়া সহজ ছিল না। বড় বড় পণ্ডিতেরা, জ্ঞানীগুণীজনেরা নিজেরা উপাধি দিতেন। তার জন্য কঠিন পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য হতে হত। মর্যাদা অর্জন করতে হত।

তিব্বতের তেমনই এই বিরাট পণ্ডিত ছিলেন লামা তারানাথ। তিনি একখানি পুঁথিতে লিখেছেন যে, তখনকার বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে বড় আচার্যকে 'পাহারাদার' বলে মনে করা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিদ্যা সব জ্ঞান যে পাকাপাকিভাবে বিশুদ্ধ আছে আর তা সঠিকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁকেই সব প্রহরা দিতে হত। একের পর এক ছ'জন তেমন পাহারাদারের পর, আর তেমন সুযোগ্য আচার্য বেশ কিছুদিন প্রহরার জন্য পাওয়া যায় নি। তার পরে সেখানে গিয়েছিলেন উপাধ্যায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

ওই বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি চলে যাওয়ার পরেও আবার সাত বছর কোনও যোগ্য প্রধান আচার্য বা প্রহরার লোক পাওয়া যায়নি।

এই ছিলেন আমাদের গুরু দীপঙ্কর। তিন তিনবার চেষ্টা-যত্ন করেই তাঁকে তিব্বত-রাজ নিজের দেশে ধর্মসংস্কার আর সুনীতি প্রচারের জন্য আনাতে পেরেছিলেন।

তৃতীয়বার চেষ্টার সময় বিক্রমশিলায় সব শ্রেণী মিলে আট হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মহাসম্মেলন হয়েছিল। নাগচো নামে এক তিব্বতী পণ্ডিত-রাজদূত দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করতে আর রাজি করাতে এসেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে ওই ভিড়ে যাঁকে সবচেয়ে উজ্জ্বল, সম্মানের যোগ্য, মহিমায় মণ্ডিত দেখবে—জেনো, তিনিই হচ্ছেন দীপঙ্কর।

তাঁর চারিপাশে বিরাট বিরাট পণ্ডিতেরা ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আকাশের তারার মতো। আর তিনি যেন সেখানে পূর্ণচন্দ্র।

৩

এবার রাজপুত্রের প্রথম জীবন আর বাড়িঘরের খবর নেওয়া যাক।

আজকের দিনে 'বাংলা' বললে যে অঞ্চল বোঝায়, চিরকাল যে শুধু সেটুকুই 'বাংলা দেশ' নামে পরিচিত ছিল, তা নয়। আর 'বাংলা' নামটাও এমনভাবে বলা হত না। কথাটা ছিল 'বঙ্গাল'। তখনকার দিনে তো আর ভূগোলের মানচিত্র ছিল না। বাঁধাবাঁধি সীমান্ত টেনে দেওয়া হত না। একটা বড় লড়াইয়ের ফলে কিংবা বড় রাজত্ব তৈরি হয়ে গেলে দেশের নাম বা সীমানা বদলে যেতে পারত। শুধু কোনও নদী বা শহর বা জঙ্গল, এসব দিয়ে একটা সীমানা মোটামুটি ধরে নেওয়া হত। তা, সেই নদীগুলি সরে যায়, শহরগুলি মুছে যায়। অত জঙ্গল তো মানুষ নিজের দরকারে কেটে সাফ করে দেয়। অন্য দিকে, অযত্নে ফেলে রাখা প্রান্তর আগাছার আক্রমণে আপনা থেকে নতুন জঙ্গল হয়ে যায়। এত মানুষের ভিড় তো সে যুগে হয় নি।

এ যুগে পাটনা বেড়াতে গেলে লোকে নালন্দা নামে যে জায়গাটাও অবশ্যই দেখতে যায়, সেটি ছিল এই 'বঙ্গাল' দেশেরই কাছে। মাটি খুঁড়ে হাজার বছর আগেকার সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট শহরটি চোখের সামনে আজ হাজির করা হয়েছে। একসময়ে সেখানে হাজার হাজার ছাত্র আর পণ্ডিত বাস করতেন। পড়াশোনা হত পুরোদমে।

সমুদ্র পেরিয়ে, না হয় হিমালয় ডিঙিয়ে, চীন মঙ্গোলিয়া মালয় সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গা থেকে সেখানে বড় বড় পণ্ডিতেরা আসতেন। তাঁরা আসতেন নালন্দার পণ্ডিতদের কাছে আরও বেশি বিদ্যা লাভ করবার জন্য, আরও সঠিকভাবে ধর্ম শিক্ষা করবার জন্য। প্রাচীন পুঁথিপত্র নকল করে নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করে দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াবার জন্য।

আর বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর মতো, তাঁর দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির স্থান বোধগয়ার মতো, এই যে শিক্ষাদানের স্থান নালন্দা, সেটিও ছিল সে যুগের এক মহা পবিত্র তীর্থ।

ভুললে চলবে না, সব ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের লোকই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। এই নালন্দায় বৌদ্ধ ধর্মের যে পন্থা চলিত ছিল, তার নাম বজ্রযান। বুদ্ধগয়ার নাম ছিল বজ্রাসন। আর নালন্দার পূর্বদিকে ছিল 'বঙ্গাল' নামে সেই একটি মহান্ দেশ। সেই দেশের রাজা কল্যাণশ্রী, রানি পদ্মপ্রভা।

রাজা কল্যাণশ্রীর ছেলের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। খুব ছোট বয়সেই রাজা তাঁকে জেতারি নামে এক সন্ন্যাসী অবধূতের কাছে লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন। জেতারি তাঁকে পাঁচটা শাস্ত্র পড়ালেন। আর সেগুলি ছিল এমন সব বিষয় যা ধর্ম আর দর্শন পড়ার জন্য শিষ্যকে তৈরি করে দেবে।

তিনি রাজপুত্রকে আরও একটি শিক্ষা দিলেন। —'দেখ বাবা, তুমি রাজার ছেলে। বিক্রমপুরের গৌড়রাজ বংশের ছেলে। বাবার রাজ্য থেকে অনেক দূরে লেখাপড়া শেখবার জন্য চলে না গেলে তোমার মন থেকে অহংভাব যাবে না। অহং ভাব না গেলে প্রকৃত বিদ্যালাভ হয় না।'

এমন একটি উপদেশের দরকারও ছিল। ছাত্র যে জন্মেছিলেন এমন এক শহরে যেখানে দু'লক্ষ লোকের বাস। তখনকার হিসাবে সেটা ছিল বিরাট এক মহানগর। তার মাঝখানে রাজার রাজধানী। অঢেল ঐশ্বর্য, বড় বড় প্রাসাদ, জাঁকজমক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথঘাট। জমজমাট রাজপাট।

তার ঠিক মাঝখানে রাজপ্রাসাদ। নাম তার সুবর্ণধ্বজ।

একজন তিব্বতী ঐতিহাসিক লিখে গেছেন যে, স্বয়ং শাক্যমুনি চন্দ্রগর্ভকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ঘর সংসার ছেড়ে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাহলে ধর্মের ভবিষ্যৎ সুগম হবে।

কাজেই, সব আরাম আর বিলাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রাজার কুমার। দীক্ষা নেওয়ার পর নাম হল দীপঙ্কর।

রাজপুত্রের অভিযান শুরু হল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর রূপকথার খোঁজে নয়। নতুন রাজত্ব পত্তনের জন্য নয়।

তিনি বিদ্যা লাভ করবেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানারকম ভাগ ছিল, নানা মত ছিল। প্রধান ছিল হীনযান আর মহাযান। তিনি এই দুটি মতেরই ত্রিপিটক গ্রন্থ গভীরভাবে চর্চা করলেন। মাধ্যমিক আর যোগাচার্য নামে আরও দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। তন্ত্রশাস্ত্রের চার-চারটি শাখায় পণ্ডিত ছিলেন। অর্থাৎ তখনকার ভাষায় তিনি হলেন 'তির্থিক'।

'তির্থিক' কথাটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু সে-যুগে তীর্থ আর ধর্ম যে পাশাপাশি থাকত। একটি ছেড়ে অন্যটি হত না।

আবার তির্থিক তার্কিকও হতেন। তখনকার যুগে কোন্ ধর্ম বড়, তার বিচার প্রায়ই হত তর্ক দিয়ে, তরোয়াল দিয়ে নয়।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীরা অলৌকিক রূপকথার চেয়ে অনেক বেশি অদ্ভুত একটা জিনিস আছে আমাদের এই রাজকুমার-কাহিনিতে। তা হচ্ছে—তৃতীয় নয়ন। জ্ঞানের দৃষ্টি। তৃতীয় চোখ নয়। তিব্বতের কোনও কোনও সাধুসন্ত নাকি তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চা করে তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করতেন। রাজপুত্রের সেই তৃতীয় নয়ন যেন খুলে গেল ধর্মের দিকে—সংসার এড়িয়ে, রাজপাটের আরাম ছাড়িয়ে।

তিনি নীতি, ধ্যান আর ধর্ম, এই ত্রিশিক্ষা নিলেন একটি বৌদ্ধ বিহারে। এমনই বিদ্যা আর মনের সম্পদ অর্জন করলেন যে, মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ের আচার্য মহাসাংঘিক শীল রক্ষিত তাঁকে সমস্ত গোপন মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। আর নাম দিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে সবার ওপরের শ্রেণীতে উঠে গেলেন। আর বোধিসত্ত্বের মন্ত্র লাভ করলেন। মগধের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ দার্শনিকদের কাছে পাঠ নিয়ে তিনি জ্ঞানের রাজা হলেন।

এই ভাবে গড়ে উঠল এই রাজপুত্রের মন-জাগানো প্রাণ-বাঁচানোর সোনার কাঠি।

রাজপুত্র জানতেন যে, সুবর্ণ দ্বীপের মহাসাংঘিক হচ্ছেন আচার্য চন্দ্রকীর্তি। সুবর্ণ দ্বীপ ছিল ব্রহ্মদেশের তখনকার নাম এবং প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বড় পীঠস্থান ছিল ব্রহ্মদেশ। বৌদ্ধধর্মের গূঢ় রহস্যের চাবিকাঠিটি তখন ছিল শুধু সেই আচার্যের কাছে। তাই দীপঙ্কর বণিকদের জাহাজে চড়ে তাদেরই সঙ্গে চললেন সমুদ্র পেরিয়ে। মাসের পর মাস কেটে গেল সমুদ্রে। ঝড়ের পর ঝড় আর দুরন্ত ঘূর্ণি রাক্ষস-

খোক্কসদের মতো তাকে গ্রাস করতে এল বারে বারে। বঙ্গোপসাগর চিরকালই অশান্ত, বিপদে ভরা। পালতোলা নৌকো প্রায়ই হয়ে যায় ডুবু ডুবু।

পঞ্চাশ বছর আগে এদেশ থেকে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করতে যেতাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজে মাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে। আজকাল আমরা আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে যাই মাত্র কুড়ি ঘণ্টায়। তুলনা করে ভাবতে হয় সে যুগে দীপঙ্কর কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন! আর কত বিপদ মাথায় করে বিদ্যা অর্জনের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন!

কিন্তু রাখে বুদ্ধ, মারে কে?

বারো বছর পরে তিনি সেখান থেকে আরও দূরে চললেন। এবার লঙ্কা দ্বীপে। তখন নাম ছিল তাম্রদ্বীপ। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কা। সেখানে যদি কোনও নতুন জ্ঞানের সোনার খনি পাওয়া যায়।

সেখান থেকে আরও জঙ্গলে ভরা দ্বীপ ঘুরে তিনি মগধে ফিরে এলেন। মগধে তখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বৌদ্ধ পণ্ডিতের আশ্রম। রাজা ন্যায়পাল তাঁকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হতে অনুরোধ করলেন। তাছাড়া নালন্দায় থাকার সময়ে তিনি অন্যান্য ধর্মের তির্থিক অর্থাৎ ধর্মাচারী তার্কিকদের ধর্ম আলোচনায় হারিয়ে দিলেন।

কনৌজের রাজা সে সময়ে বাংলার রাজা ন্যায়পালের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। দীপঙ্করের সম্মান এত বেশি ছিল, দুই রাজাই তাঁর পরামর্শ নিয়ে তাঁরই শর্ত মেনে নিয়ে যুদ্ধ মিটিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। সে-যুগে বঙ্গাল বলতে যে বিরাট দেশ বোঝাত, মগধ ছিল তারই অংশ।

এমন মহাপুরুষের কথা আমরা খুব কমই জানি, যাঁর কাছে পণ্ডিত ধার্মিক আর রাজা-মহারাজেরাও সমানভাবে মাথা নিচু করে এসে দাঁড়ায়!

একবার তুলনা করে দেখতে লোভ হয়—পৃথিবীর ইতিহাসে কি এমনটি কোথাও ঘটেছে যেখানে দুজন রাজা যুদ্ধ করতে গিয়ে ধার্মিক লোকের পণ্ডিত লোকের কথা মেনে সন্ধি করেছেন, শান্তি স্থাপন করেছেন? আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষাই এই।

৪

'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।'

শুধু তো রাজপুত্র নন, ধর্মগুরুও তিনি। এত অল্প বয়সে সাগর পেরিয়ে দেশ-দেশান্তর থেকে শাস্ত্র বিদ্যা লাভ করে দীপঙ্কর হয়েছেন পণ্ডিত চূড়ামণি। তাই চাণক্য পণ্ডিতের লেখা শ্লোকেরই কথা কয়টি এমন পরিপূর্ণভাবে খুব কম মানুষের জীবনেই ফুটে উঠেছে।

প্রথমে রাজপুত্রের সাংসারিক জীবনের কথাই ধরা যাক।

আশ্চর্যের কথা, তার কোনও বিবরণ তাঁর নিজের দেশে নিজের ভাষায় লেখা বইতে বা ইতিহাসের পুঁথির মধ্যে বিশেষ পাই না। তার জন্যে আমাদের যেতে হবে সেই রূপকথার রাজকন্যার দেশে, অর্থাৎ নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে।

আরও আশ্চর্যের কথা যে, সে-সব কিছুর বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আর নথিপত্র আমাদের নজরে প্রথম এল তাঁর জন্মের নয় শ বছর পরে। অর্থাৎ মাত্র এক শ বছর আগে। সে-সব পেয়েছি আমরা তিব্বত আর মঙ্গোলিয়ার ভাষায় লেখা পুঁথিতে। সেগুলি মিলিয়ে দেখতে হয়েছে চীনাভাষায় অনুবাদ করা সংস্করণের সঙ্গে।

এর কারণটা শুনলে খুব আশ্চর্য ঠেকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে বারে বারে।

এই ধরা যাক বৌদ্ধধর্মেরই কথা। ভারতবর্ষে তার উদয় হল, বিস্তার হল ব্যাপকভাবে। আলোড়িত হল আসমুদ্রহিমাচল। সেই বৌদ্ধধর্মের দীপশিখা নিয়ে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা মধ্যযুগ পর্যন্ত দেশে দেশে আলো জ্বালালেন। মধ্য এশিয়ায় যে সব দেশ এখন রাশিয়ার মধ্যে আছে, সেখান থেকে চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা দ্বীপ, শ্যাম, মালয়, এমনিভাবে গোটা দ্বীপময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের জয়গান ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ হয়েছিলেন বৌদ্ধ।

অথচ সেই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল—দেড় হাজার বছর ধরে বিরাজ করার

পরেও। অত বিদ্যা, অত ত্যাগ, রাজসম্মান কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারল না।

শুধু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কেন, তারও উত্তরে, তারও পশ্চিমে হিমালয় কারাকোরাম হিন্দুকুশ শৈলমালার ওপারে ছড়িয়ে পড়েছিল বুদ্ধের বাণী, বৌদ্ধধর্মের নানা প্রথা, নানা দর্শন শাস্ত্র। হাজার হাজার মঠ, সংঘারাম, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সর্বত্র। অশোক, হর্ষবর্ধন, কণিষ্কের মতো মহান রাজারা সেগুলিকে তুলে ধরেন।

তবু হাজার দেড়েক বছরের মধ্যে সে-সব লোপ পেয়ে গেল। অনেকখানি নষ্ট হল বিদেশী আক্রমণের চাপে। কারণ, প্রায়ই অন্য ধর্ম—বিশেষ করে নতুন ধর্ম এসে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। এদিকে পুরোনো হিন্দু বৈদিক ধর্মচর্চাও নতুন জীবন আর নতুন রূপ নিয়ে বহু বৌদ্ধকে সনাতন হিন্দুধর্মের দিকে আকৃষ্ট করল।

তাছাড়া সম্পত্তির লোভও ধর্মের কম অনিষ্ট করেনি। রাজারা মঠগুলিতে অনেক দান করতেন। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের ভরণপোষণের জন্য শুধু নয়—বিদ্যাচর্চার জন্য, সমুদ্র পেরিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে আসা পণ্ডিতদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্যও রাজারা সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে দিতেন।

বিদেশী আক্রমণকারীরা সেজন্য মনে করত যে, ওই সব মঠ বা ধর্মবিহারে অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে। কাজেই, সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ির চেয়ে সন্ন্যাসীদের মঠ আর ধর্মবিহারগুলির ওপরেই বিদেশী লুঠেরা সৈন্যদের নজর থাকত অনেক বেশি।

তিব্বতী পুঁথিতে আছে যে, অতীশকে সেখানকার রাজা সাম্মানিক দক্ষিণাস্বরূপ যে বিপুল পরিমাণ সোনা অর্পণ করেছিলেন, তার সবটাই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চা আর সন্ন্যাসীদের মঠ ও ধর্মবিহারগুলি সংস্কার সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করা হয়েছিল।

হায়! আসল ধনরত্ন যে সোনাদানা নয়—তা হল মনের রত্নসামগ্রী, সে কথা বিদেশী লুঠেরা সৈন্যেরা আর তাদের রাজারা জানবে কেমন করে? অন্যান্য দেশে তো রাজারাজড়ারা এসব পারমার্থিক দিকে সাধারণত মন দিতেন না।

অবশ্য পশ্চিম আর উত্তর ভারতবর্ষে অনেক হিন্দু মন্দিরে রাজ্যের ঐশ্বর্য জড়ো করে উজাড় করে দেওয়া হত দেবতার পায়ে।

গজনী এককালে বৌদ্ধধর্মের বড় কেন্দ্র ছিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের দেশ হয়ে গেল। গজনীর সুলতান মামুদ তেরো-তেরো বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন—শুধু অন্য ধর্মের মঠমন্দির ভেঙেচুরে ইসলাম ধর্মপ্রচারের পুণ্য কাজ করতে নয়—সারা হিন্দুস্থানের ভক্তদের আর রাজা-রাজড়াদের দান স্বরূপ সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন সম্পদের লোভেই। যেমন, সৌরাষ্ট্রর সোমনাথ মন্দির লুঠ করে সুলতান মামুদ যা ধনরত্ন হীরে জহরত পেয়েছিলেন, তার বিপুল হিসাব তাঁর সময়কার ঐতিহাসিকেরা লিখে গেছেন। এইভাবে বিভিন্ন মুসলমান আর বৌদ্ধ তিব্বতী লেখকদের রচনা থেকেই জানা যায়—বৌদ্ধধর্ম কেমন করে লোপ পেয়ে গেল।

কিন্তু পূর্বভারতে বৌদ্ধ ধর্মবিহারগুলির সম্পদ ছিল অপার্থিব। তবু সেগুলি বিদেশী আক্রমণের কবল থেকে রক্ষা পায়নি। সাধারণ লোক, ধনী, বণিক, সামন্ত, রাজবংশের সবাই সেখানে দান করতেন। রাজারা ছিলেন সেগুলির পৃষ্ঠপোষক। অতএব লুঠেরাদের লক্ষ্য ছিল সেদিকেও।

এমনি ঘটনা ঘটেছিল সুদূর মিশরেও। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার পৃথিবীর মধ্যে হয়ে উঠেছিল নামকরা। সেই শহরটি যখন আরব সৈন্যেরা জিতে নিল, তখন তারা ফাঁপরে পড়ল। রাশি রাশি বই। তার মানে জানা নেই, আর মানে খুঁজে বের করবার সময়ও নেই। সৈন্যেরা অতশত ধার ধারে না। ওরা ঠিক করে নিল যে ওই সব বইতে যা আছে, তা যদি কোরানে থেকে থাকে, তাহলে ওগুলোর আর দরকার নেই। আর কোরানের বাইরের যদি কিছু থাকে, তাহলে সেগুলি থাকার দরকার নেই। অতএব ঝামেলা চুকিয়ে ফেল—দাও সব পুড়িয়ে।

পরে পণ্ডিতেরা হয়তো হাহাকার করেছিলেন যে, কত অমূল্য বিদ্যা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তেমনি, আমাদের দেশেও কত প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্য হয়তো এমনি করেই লোপ পেয়ে গেছে।

পূর্বভারতের একটি ধর্মবিহারেও এমনি কাণ্ডের কথা মুসলমান ঐতিহাসিকের লেখায় পাই। একটি ধর্মবিহার আক্রমণ করে সৈন্যেরা এমন খুনখারাপি আর লুঠপাট চালাল যে, সেখানকার গ্রন্থাগারে যেসব বই

ছিল, সেগুলির অর্থ বা বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য গোটা শহরেই একজনও 'নেড়া মাথা' অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু পাওয়া গেল না। বৌদ্ধধর্মের জীবনীশক্তি ছিল সেই ভিক্ষু মুণ্ডিতমস্তক পণ্ডিতেরা।

তাহলে সেই বইগুলির আর সেই জায়গায় যে বিদ্যাচর্চা হত, তার কী হল? আর সেই সারগর্ভ বিদ্যাচর্চার ওপর নির্ভর করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে ধর্মবিশ্বাস, তারই-বা কী হল?

৫

যে-জগতের কথা এখানে বলছি, সেখানে কিন্তু রাজকন্যারা সকলেই রূপকথার রাজকন্যাদের মতো মোহিনী মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলেন না। বরং তাঁদের অনেকেই অশিক্ষা কুসংস্কার এসব দূর করে মানুষের মন বড় করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচ্যের অনেক নারী একাজে এগিয়েছিলেন।

তাঁরা যেসব দেশ থেকে এসে রাজরানী হয়ে ছিলেন, সে দেশগুলিতে পবিত্র ধর্মের আলো জ্বলেছিল। আর সে-আলো ভারতবর্ষ থেকেই আনা আলো।

অবশ্য প্রায় তেরো-চোদ্দ শ' বছর আগে আমাদের দেশেও হিন্দু আর বৌদ্ধ দুটি ধর্মেই সাধারণভাবে অনেক অনাচার ঢুকেছিল। আর সাধারণ লোকেরা সেইগুলিকেও ধর্ম আচরণ বলে মনে করে নিয়েছিল। তন্ত্রচর্চার নামে এমন সব দেব-দেবীর ব্যাখ্যা, প্রক্রিয়া আর পূজা-অর্চনা আরম্ভ হল, যা সে যুগেও সাধুব্যক্তিরা ঠিক বলে মনে করতেন না। তাঁদের অগ্রাহ্য করে উপনিষদের বাণী আর বুদ্ধদেবের শিক্ষা যেন ছাইচাপা পড়ে গেল।

অথচ আশ্চর্যের কথা—সে-সব ভুল প্রক্রিয়াগুলি অসাধারণ দৈব ক্ষমতা বা সিদ্ধি ফললাভ এনে দেয়, এই মনে করেই সাধারণ লোকেরা বেশ মেনে নিয়েছিল। শিক্ষিত পদস্থ লোকেরাও সেই যুগ-প্রভাবে বশীভূত হয়ে ছিলেন।

একটা কথা আছে না? —ভয় থেকে ভক্তি। তাই বলা হত, প্রেতাত্মা ডাকিনী যোগিনী যক্ষ রাক্ষস মার, এরাই নাকি মানুষকে চালিয়ে বেড়ায়। এরাই ভাগ্যের হেরফের করে দিতে পারে।

যদি এইরকম ভয় ধরানোর মতো ধারণা মানুষকে শাসনে রাখতে পারে, অবশ করে তোলে, তাহলে মূর্খ মানুষেরা তাদেরই ভগবান ভেবে পূজা করবে। মনে করবে, ওই সব ডাকিনী-যোগিনীদের ক্ষমতা বুঝি অসীম।

অনেক তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসী সাধারণ মানুষকে এইসব বুঝিয়ে ধর্মের আচার-আচরণে নোংরামি এনে দিয়েছিল—এনেছিল অনেক অনাচার, অসংখ্য কুসংস্কার, অগণিত বিশ্রী প্রক্রিয়া।

হাজার বছর আগে সারা উত্তর ভারতে, এমনকি বাংলায় নেপালে কাশ্মীরে অনেক অনাচার চলত। ভগবান বুদ্ধের পরিচ্ছন্ন উদার পরোপকারী ধর্মচর্চাও এই আওতার বাইরে থাকতে পারেনি।

তিব্বতে বন-পা নামে এক ধর্মচর্চা প্রচলিত ছিল। এই ধর্মবিশ্বাসের ফলে, বন-পা ধর্মের লোকেরা জাদুবিদ্যায় ওস্তাদ ছিল—ভূতপ্রেত আর পাতালের কাল্পনিক রক্তমাংসখাদক উপদেবতাদের খুশি রাখবার জন্য হরেকরকম গুপ্ত প্রক্রিয়া অভ্যাস করত। মর্ত্যের অশরীরী আত্মাদের আর স্বর্গের দেবতাদেরও পূজা করত। ভূতের ওঝারাই ছিল ওই ধর্মচর্চার পুরোহিত। কাজেই হরেক রকম কুসংস্কার ওদের সরল ধর্মবিশ্বাসকে ছাইচাপার মতো ঢেকে রেখেছিল।

প্রায় তেরো শ' বছর আগে তিব্বতে খুব বিক্রমশালী এক রাজা ছিলেন। নাম স্রং-সান্-গাম্পো। তিনি দুটি বিয়ে করেছিলেন। একটি নেপালের রাজকন্যা, আরেকটি চীনের রাজকন্যা। দুজনেই ধর্মপ্রাণা বৌদ্ধ।

নেপালের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্মণকে চিঠি লিখলেন—আমি তিব্বতরাজ—ধর্মের যে দশটি পুণ্য বিধি আছে, তা আমি মেনে চলি না। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার কন্যাদান করেন আর আমি ধর্মপালন করি এই চান, তাহলে পাঁচ হাজার গুণ ধর্মমন্দির তৈরি করব।

নেপালের রাজা রাজি হলেন। ভারতবর্ষকে তিব্বতে বলা হত আর্যভূমি। সেই দেশের বিদ্যা আর সভ্যতার খবর রাজা পেয়েছিলেন। তাঁর নজর তাই এতদূর ছড়িয়ে পড়ল।

রাজকন্যার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব পাওয়ার কথা রূপকথায় আছে। কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে একটি পবিত্র উন্নত জীবনের দিশা নিজে থেকে নেওয়া—এটা একটা নতুন রূপকথা। অথচ সত্যি ঘটনা।

ধর্মের সঙ্গে এল শিক্ষা, সভ্যতা আর অক্ষরলিপি। এর আগে তিব্বতে কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। কাজেই লোকেরা লিখতে বা পড়তে জানত না। রাজা তাঁর মন্ত্রী থম-মি সম্ভোটকে বিশেষ করে এই অভাব দূর করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মন্ত্রী লিপিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও অক্ষর শিক্ষা করলেন। তার পরে গেলেন নালন্দাতে। সেখানে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করলেন।

সেই সময়ে চীন থেকে শিক্ষার্থী পরিব্রাজক হুয়েন সাং-ও নালন্দায় এসেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, ভারতে অগণিত সংঘারাম আছে। কিন্তু গৌরবে আর সম্পদে নালন্দাই সবচেয়ে বড়। এখানে মঠে পুরোহিত পণ্ডিত আর ছাত্র সংখ্যায় প্রায় সর্বদাই দশ হাজারের ওপর থাকে। তখনকার জনসংখ্যার হিসাবে সেটা এক বিরাট ব্যাপার।

তারও এক শ' বছর পরে নালন্দা আর বঙ্গদেশের সঙ্গে তিব্বতের আরও বেশি সম্বন্ধ সৃষ্টি হল। রাজা খ্রি সং-দু-সান্ বুঝেছিলেন যে, বন-পা নামে যে ধর্মপ্রথা তিব্বতের সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা খুব উন্নত নীতি অনুসরণ করে না। তিনি গৌড়ের পণ্ডিত শান্তরক্ষিতকে আমন্ত্রণ করলেন।

ইনি তখন নালন্দার ধর্মবিহারের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত আর মগধরাজের গুরু ছিলেন। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ পদ আর প্রতিষ্ঠা ছেড়ে তিনি অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে তিব্বতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই তিব্বতবাসীরা প্রচলিত ধর্মচর্চা 'বন-পা' পরিত্যাগ করে প্রকৃত শুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। তাঁকে নাম দেওয়া হল আচার্য বোধিসত্ত্ব। তাঁরই এক তিব্বতী শিষ্য পরে প্রথম লামা হয়েছিলেন।

'লামা' কথাটির অর্থ হচ্ছে গুরুজন। মঠের প্রধান বা সবচেয়ে সেরা সন্ন্যাসীকে লামা বলা হত।

গৌড়ের সন্তান শান্তরক্ষিতের সম্বন্ধী গুরু পদ্মসম্ভব এই 'লামা' প্রথাটি প্রথম প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন স্বনামধন্য তান্ত্রিক সাধক। তাঁর দেশের নামটিও ছিল বড় আকর্ষণীয়—'উদ্যান'।

আগেই বলেছি যে, শ' দুই বছর পরে তাঁরই দেশ গজনী থেকে মুসলমান আক্রমণকারী লুঠেরা সুলতান মাহমুদ তেরো-তেরো বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করতে এসেছিল। অথচ মাহমুদের মাত্র দু শ' বছর আগেব ওই বৌদ্ধ দেশের চেহারা আর চরিত্র ছিল একেবারে অন্যরকম।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন 'উদ্যান' নামে দেশটিকে ভারতের উত্তর অংশ বলে লিখেছিলেন। নালন্দাকে বৌদ্ধধর্মের 'অক্স্‌ফোর্ড' বলা হত। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হল পাশ্চাত্য দেশে সব সেরা শিক্ষাচর্চা কেন্দ্র। কারণ সবচেয়ে বড় পণ্ডিতেরা সেখানে পড়াতে আসতেন—সেখানে সবচেয়ে ভালো ছাত্ররাই ভর্তি হতে পারত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান আচার্য হয়েছিলেন পদ্মসম্ভব। তিনিও রাজার আমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়েছিলেন।

শান্তরক্ষিত বৌদ্ধধর্মের নীতি আর নিয়মগুলির সঠিক ব্যবস্থা করার ভার পেলেন। পদ্মসম্ভব পেলেন বৌদ্ধ আচার-বিচারের তান্ত্রিক শাখার দায়িত্ব।

এখানে তন্ত্রচর্চার, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের তন্ত্রচর্চার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাক।

ইতালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলো অবশ্য অনেক চটকদার কথা রঙ চড়িয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছিলেন। তবুও তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে 'গুণ' করে অর্থাৎ বশ করে ফেলার বিদ্যাচর্চায় উদ্যান-দেশ আর কাশ্মীরের লোকেরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা নাকি ভূতপ্রেত নামাতে পারত আর তাদের খেলনাগুলিকে দিয়ে কথা বলাতেও পারত। জাদুবিদ্যার বলে তারা আবহাওয়া বদলিয়ে দিতে পারত—এমনকি, অন্ধকার সৃষ্টি করতেও পারত।

মার্কো পোলো লিখেছিলেন যে, এসব স্বচক্ষে যে না দেখেছে, সে বিশ্বাসই করতে পারবে না। তাঁর মতে, এই হচ্ছে সেই দেশ—যেখান থেকে পুতুল পুজো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চীনা ধার্মিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং-ও লিখেছিলেন যে, ওই দেশের লোকেদের 'গুণ' করে ফেলার দক্ষতা আছে। জাদুমন্ত্র ব্যবহার করাটা তাদের কাছে ছিল একটা দস্তুর মতো শেখবার জিনিস। অতি জনপ্রিয় মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষ দক্ষশিল্পীসুলভ পেশা যাকে বলে।

সেই দেশ ভারতবর্ষের পণ্ডিত পদ্মসম্ভব নালন্দা থেকে তিব্বতে এসেই সেখানকার সেইসব বশীকরণ পটু শয়তানদের হারিয়ে দিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের মতো তাঁরও নাকি বজ্র ছিল। তাই দিয়ে তিনি শয়তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। আর ক্ষমতাও নষ্ট করে দিতেন। তিনি গোঁড়া তান্ত্রিক মতে শিক্ষা দিতেন আর নিজের আদি দেশের মায়া জাদুমন্ত্র এসবও নিজের কাজে লাগাতেন।

এমন সময় চীন থেকে একজন বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে তর্কে এই দুই পণ্ডিত এঁটে উঠলেন না। এই ছিল সেকালে আমাদের দেশের রীতি। আর আমাদের ধর্ম আর মতের প্রভাব যে সব দেশে গিয়েছিল, সে সব দেশেও ছিল এই বিশেষত্ব। ধর্মের লড়াই হত শাস্ত্র বিষয়ে তর্ক দিয়ে। তলোয়ার দিয়ে নয়। ব্যাখ্যা দিয়ে। বর্শা বল্লম দিয়ে নয়। এটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিচিত্র ব্যাপার।

সেই তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা নিবেদন করলেন যে, মগধে আরও বড় একজন আচার্য আছেন—নাম তাঁর কমলশীল। তাঁকে এই ধর্মযুদ্ধের জন্য আনানো হোক। বিরাট তিব্বত দরবারে চীনের প্রচারক পণ্ডিতকে ধর্মব্যাখ্যায় হারিয়ে দিলেন। রাজা তাঁকেই তখন সে যুগের তিব্বতের আধিভৌতিক বৌদ্ধধর্মের গুরু হিসাবে বরণ করে নিলেন।

এই সব কাহিনির পটভূমিতে আমাদের কাহিনির রাজপুত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে। আরও এক শ' বছর পরে সেই নালন্দার ধর্মবিহারে, সেই বঙ্গালদেশের রাজধানী মগধে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পণ্ডিত শিরোমণি হয়েছিলেন। বাঙালি পাল বংশ তখন মগধে রাজত্ব করছেন। রাজা মহীপাল তাঁকে বজ্রাসন (আজকের বুদ্ধগয়া) থেকে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এলেন।

আমরা দিদিমা ঠাকুমার কাছে সুয়োরানী আর দুয়োরানীর গল্প শুনেছি—অনেকে রূপকথার গল্পেও তা পড়েছি। এই দুই রানীর মধ্যে হয়েছে ঝগড়া, হিংসা, ক্ষমতার লড়াই—এমনি কত কিছু। মোটকথা, সংসারে অশান্তি আর রাজা বেচারার প্রাণান্ত! আর দুয়োরানীর দুঃখের সীমা নেই।

মোটামুটি এই হল সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পের ছক।

এই রূপকথার মতো মন-ভরানো কিন্তু ইতিহাসের সত্য কাহিনিতে চমকপ্রদ দুই রানীর গল্পও আছে। কিন্তু তা একটু অন্য ধাঁচের ব্যাপার। মহাপুরুষদের জীবনকাহিনি যে অন্যরকমের হবে, তা তো স্বাভাবিক। এখানে তো শুধু সংসার ধর্ম নয়, শুধু রাজ্যশাসনের কর্ম নয়—ধর্ম আছে তার মূলে। এবং সেটা সদ্ধর্ম—যার অন্য নাম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম।

একটু আগে নেপালের রাজকন্যার সঙ্গে তিব্বতে পবিত্র ধর্মের প্রচার হল, শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ঘটল।

কয়েক বছর পরে তিব্বতের রাজা চীনের রাজকন্যাকেও বিয়ে করেন। আগের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন মন্ত্রী সম্ভোট। এবার কিন্তু আরেক মন্ত্রী সম্বন্ধ আনলেন, রাজার ওপর যাঁর প্রভাব ছিল আরও বেশি।

চীনের কাহিনিতে বলে যে, চীনের সম্রাট তিব্বতের রাজাকে অনেক উপহার পাঠিয়েছিলেন আর বন্ধুত্বের চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বতের পক্ষ থেকে দাবি এল যে, চীনের রাজকুমারীকে তাদের রাজার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

চীন তাতে রাজি হল না। তখন তিব্বত দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে চীন আক্রমণ করল। আট বছর যুদ্ধের পর চীনের সম্রাট তাই-সুঙ তাঁর মেয়ে ওয়েং ডেঙ কুং চু-কে তিব্বত রাজ স্রং-সন্-গাম্পোর সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

তার মানে হচ্ছে যে, দুই সতীনের ঝগড়া, রেষারেষি আর ক্ষমতার লড়াইয়ের সব রকম পরিবেশই তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এই বোধহয় প্রথমবার সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পের কাহিনি একটু অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল।

এই দুই রানীই ছিলেন বৌদ্ধ আর তাঁদের দুজনের প্রভাবেই রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। চীনের ইতিহাসে আছে যে, রাজা চীনের সংস্কৃতির দিকে খুব আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। সে-দেশের লোকের আচার ব্যবহার চালচলন পোশাক-আশাক সবই তাঁর খুব পছন্দ হল। তাঁর নিজের দেশের অনেক প্রথাকেই তিনি অসভ্য মনে করতে লাগলেন। সামন্ত আর বড়লোকদের ছেলেদের চীনে লেখাপড়া শিখতে পাঠালেন। চামড়া আর বনাতের বদলে কারুকার্যময় কাপড় আর চীনা রেশমের রাজপোশাক বানিয়ে নিলেন।

তিব্বতের ইতিহাসকারেরা অবশ্য অতটা স্বীকার করেন না—বিশেষ করে লেখাপড়ার বিষয়ে। তাঁরা পরিষ্কার লিখে গেছেন যে, মন্ত্রী সম্ভোট নিজে বাচাই করা এক দল তিব্বতীকে নিয়ে আর্যভূমি অর্থাৎ ভারতে গিয়েছিলেন এবং সেই দেশ থেকে বিদ্যা আর ক্ষর লেখার লিপি নিয়ে এসেছিলেন। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতী লিপি আর ব্যাকরণের সঙ্গে ভারতীয় লিপি আর ব্যাকরণের খুব কাছাকাছি মিল আছে দেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভারতীয় উৎসটার কথাই ঠিক।

বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে এই রকম ভিন্ন মত থাকলেও সব তিব্বতীরাই কিন্তু একমত যে, নেপালী রানী ও চীনা রানী দুজনেই সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যাপারে একযোগে কাজ করেছিলেন।

অর্থাৎ দুয়োরানী-সুয়োরানীর যে চিরকালের রেষারেষির গল্প আমরা শুনি, তা ধর্মের রাজ্য তিব্বতে ঘটেনি ঠিক সেইভাবে।

রাজার এরকম সাধু সংকল্প আর চেষ্টাকে প্রজারা এত সম্মান দিয়েছিল যে, তারা তাঁকে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার বলে মনে করত। তাঁর দুই রানীকে তারা দেবীর আসনে বসিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও রাজা এবং রানীদের এভাবে দেবতার মতো পুজো করা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

তিব্বতীরা এই দুই রানীকে এত ভক্তি করত যে, তাঁদের কোনও ছেলেমেয়ে যে হয়নি, সেটাও তাঁদের দৈবীত্বের একটা প্রমাণ বলে ধবে নিয়েছিল।

নেপালী রানী নিজের দেশ থেকে তারা-দেবীর মূর্তি আনিয়েছিলেন, আর চীনা রানী আনিয়েছিলেন শাক্যমুনির মূর্তি। বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি তিব্বতে সেই প্রথম আনা হল। রাজধানীর নাম হল লাসা অর্থাৎ দেবতার ধাম। সেখানে চীনারানীর আনা শাক্যমুনির মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল নেপালী রানীর চেষ্টায়। চীনা রানীর নাম হল শ্বেততারা আর নেপালী রানীর পরিচয় হল নীলতারা।

এঁদের দুজনের মধ্যে এত ভাব আব মতেব মিল সম্বন্ধে অবশ্য পশ্চিমের পণ্ডিতেরা পুরোপুরি একমত হতে পারেননি। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাঁরাই সে দেশে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাব ফলেই পরে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য মতবাদ আর দীপঙ্করের আগমন সম্ভব হয়েছিল।

৬

ঠাকুরমার ঝুলি থেকে টুক্ করে ইতিহাস বেরিয়ে আসতে পারে কি? সোনার পাথরবাটি কি হওয়া সম্ভব? অথচ রাজপুত্র দীপঙ্করের জীবনে তা হয়েছিল। এমন একটি রূপকথা এখানে বলছি যার তুলনা ঠাকুরমার কোনও ঝুলিতেই পাওয়া যাবে না। সত্যিকথা বলতে কি, পৃথিবীর কোনও রূপকথাতেই হয়তো নেই এমন একটা অলৌকিক গন্ধ। এই কাহিনিটির মধ্যে এমন সব তত্ত্বকথা আছে, যা আমাদের চিরকালের আদর্শ। শুধু তাই নয়, আমাদের এই রাজার কুমারের জীবনাদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত পুণ্যকর্মের কাহিনিও সেটি।

রূপকথা আর পুণ্যকথা এমনভাবে ক'টি গল্পে মিশে আছে?

তাছাড়া ঠাকুরমার ঝুলি তো একেবারেই গল্প। লিখিত-পড়িত কোনও প্রমাণই নেই সে-সব গল্পকথাব।

এখন যে গল্পটি বলছি সেটি কিন্তু একাধিক তিব্বতী ইতিহাসেই লেখা আছে। তার মানে, কিছু পরিমাণ সত্য তার মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল। বাংলার পুরোনো ইতিহাসের মধ্যে তার সমর্থন পাই।

লামা তারানাথ নামে একজন প্রখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিতের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, বাংলার সম্রাট গোপাল আর দেবপালের রাজত্বকালে অর্থাৎ এগারো শ' বছর আগে ওদন্তপুরী নামে একটি অতি বিখ্যাত মন্দির তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে সেই মন্দির তৈরির টাকা পাওয়া গেল আর কেমন করে একজন উপাসক তা সম্ভব করে তুললেন, সেটা বড় মজার গল্প। বিশ্বাসের যোগ্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাসের ছাইটুকু যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিলে আসল কথাটুকু বুঝতে অসুবিধা হবে না।

মগধের কাছে একজন অতি পবিত্র চরিত্রের তির্থিক সন্ন্যাসী থাকতেন। যে সব সন্ন্যাসী তীর্থক্ষেত্রে বা পুণ্যস্থানে গায়ে ভস্ম মেখে আর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে বাস করতেন, তাঁদের বলা হত 'তির্থিক'। সেই তির্থিক সন্ন্যাসীটির অলৌকিক সব ক্ষমতা ছিল। তিনি একবার শবশাধনা করবেন ইচ্ছা করলেন। আমাদের দেশে কাপালিকেরা এবং কোনও কোনও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীরা শ্মশানে বসে শবদেহ নিয়ে পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড চর্চা করত। এই তির্থিক সন্ন্যাসীও তাই করতে চাইলেন।

কিন্তু সেজন্য এমন একজন সঙ্গী দরকার যিনি হবেন খুব বলবান, যাঁর কোনও রোগ নেই আর ন'টি

গুণ তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। তাঁকে হতে হবে সত্যবাদী, পণ্ডিত, নির্ভীক, বহুবিদ্যাধর এবং আচার-বিচার প্রক্রিয়ায় নিষ্ঠাবান, পারদর্শী। অমন একটা সাংঘাতিক সাধনায় এমন সবদিক দিয়ে সুদক্ষ সুপটু সঙ্গী চাই। কিন্তু এহেন লোক কোথায় পাওয়া যায়?

পাওয়া গেল একজনকে। কিন্তু তিনি হিন্দু নন, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ উপাসক। তবে সাধনার পথে অন্য ধর্মের লোক হওয়াটা কোনও বাধা নয়। ভারতবর্ষের মানুষের সব ধর্মেই এই একটি বিশেষত্ব দেখা যেত।

বৌদ্ধ বললেন, আমি তির্থিকের সহকারী হব, সেটা কেমন করে সম্ভব?

তির্থিক বললেন, তোমাকে তো তির্থিক হতে হবে না। আমরা দুজনেই সাধনা করব। আমাদের লক্ষ্য তো একই। তা ছাড়া এই সাধনায় যা সাংসারিক লাভ তোমার হবে অর্থাৎ ধনরত্ন পাবে, তা সবই তোমার ধর্মের প্রচার কার্যে নিয়োগ করতে পারবে।

উপাসক তাঁর গুরুর কাছে নির্দেশ চাইলেন। সব ব্যাপারেই নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। ইচ্ছামতো কিছু করা কোনও ধর্মেই চলত না। গুরু সম্মতি জানালেন আর উপাসক সেই তির্থিকের সঙ্গে শবসাধনায় বসলেন।

এইবার আরম্ভ হল অলৌকিক কাণ্ড। তির্থিক বললেন, সাধনা করতে করতে যখন প্রায় সফল হয়ে আসবে, তখন শব তার জিভটা বের করে দেবে। সে-সময় উপাসক যদি চট্‌ করে জিভটি ধরে ফেলতে পারেন, তাহলেই মহাসিদ্ধি লাভ হবে। প্রথম বারের চেষ্টাতেই যদি ধরতে না পারা যায়, তাহলে হবে মাঝারি রকমের সিদ্ধি। আর যদি তৃতীয় চেষ্টায় ধরা যায়, তাহলে মোটামুটি রকম সাফল্য হবে। কিন্তু যদি সেবারও ধরা না যায়, তাহলে মৃতদেহটি জীবন্ত হয়ে উঠে দুজন সাধককেই গিলে ফেলবে।

উপাসক দু'বার ব্যর্থ হলেন। তৃতীয়বারেও না পারলে ওই শবদেহ যে হঠাৎ জেগে উঠে এই দুই জলজ্যান্ত সাধুকেই ফেলবে গিলে।

হায় রে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প! সেখানে প্রাণধারী জীবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। আর এ যে মড়ার সঙ্গে লড়াই! সেই মড়া বেঁচে উঠে জীবন্ত মানুষদেরই খেয়ে ফেলবে! কী করা যায় এ হেন অবস্থায়? কোনও রূপকথাতেই তো এরকম লড়াইয়ের কথা বলে না! কী হবে উপায়?

উপাসক এবার শবদেহটির একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বসলেন। শবদেহ এবার জিভ বের করলেই নিজের দু'পাটি দাঁত দিয়ে ওই জিভ ধরে ফেলবার জন্য তৈরি হলেন। এবার মরি-বাঁচি করে তিনি মড়ার জিভ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে কামড়িয়ে ধরে ফেললেন।

হরি, হরি! এ কী হল! কোথায় গেল মড়ার জ্যান্ত জিভ। এ যে একখানা খাপ-খোলা তলোয়ার! কোথায় গেল মড়া? এ যে সোনার তৈরি একটা শবদেহ! ঝকঝক করছে খাঁটি সোনা!

এবারও উপাসক নাছোড়বান্দা। তলোয়ারই সই! তিনি সেটাকে টেনে বের করে এনে শবদেহটির চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। করতে করতে শূন্যে উড়ে গেলেন। তারপর আকাশে খুশিমতো বেড়াতে আরম্ভ করলেন।

তাই না দেখে তির্থিক বললেন, 'দাও, তলোয়ার আমাকে দাও। ওটা আমারই পাওনা। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমি এই অঘটন ঘটিয়েছি।'

'উহুঁ, আমি তাতে রাজি নই। শূন্যে আকাশে ঘুরে বেড়াবার মজা আমি পেয়েছি। সেই মজা আরও বেশি করে আশ মিটিয়ে করে নিই। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াই। তারপর দেখা যাবে।'—উপাসক বললেন।

এই বলে এক লাফে উপাসক উড়ে চললেন সুমেরুর দিকে—যাকে আমরা বলি উত্তর মেরু, পৃথিবীর মানচিত্রের মাথার মুকুট, ঝকঝকে বরফে ঘেরা। সেখানে চারটি দ্বীপ তিনি দেখতে পেলেন। তাঁর সাধ মিটল। এবার তিনি তির্থিকের কাছে ফিরে এসে তাঁকে তলোয়ারটি দিয়ে দিলেন।

ঘোড়ায় চড়ে রূপকথার রাজার কুমার ঘুরে বেড়ায় আকাশের মধ্যে দিয়ে—না হয়, ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে ভেসে যায় দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু শুধু তলোয়ার হাতে নিয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনি আর কোনও অলৌকিক কাহিনিতে বোধ হয় নেই।

তির্থিক খুশি হয়ে তাঁকে বললেন—'তুমি তলোয়ারের বদলে এই সোনার দেহটা নাও। যত খুশি সোনা কেটে কেটে নাও, শুধু হাড় কেটো না যেন। আর সেই সোনা কোনও অপকর্মে খরচ করো না। যে কোনও পুণ্যের কাজে খরচ কোরো। তাহলে দেখবে যে, যতটা সোনা তুমি কেটে নিয়েছ, রাতারাতি ততটা সোনা

আবার ওই শরীরের গজিয়ে উঠবে। এই রকম করে তুমি অনেক ভালো কাজ করতে পারবে।'

এই বলে তলোয়ারটি হাতে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। তাঁর সিদ্ধি হয়ে গেল।

আর উপাসকের কী হল?

সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার—মনে রাখবার মতো ব্যাপার—যার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কাজেই এই রূপকথাটি শুধু গাঁজাখুরি গল্প নয়, তার মধ্যে অনেক সত্যও আছে, আর তা থেকে শেখবার মতো জিনিসও আছে।

উপাসক সেই সোনা খরচ করে একটি মন্দির তৈরি করালেন। সেখানে শুধু পূজা নয়, শাস্ত্রচর্চাও হতে লাগল। তিনি সুমেরুতে চারটি দ্বীপ দেখে এসেছিলেন। এই মন্দিরেরও চারটি শিখর হল। উড়ে গিয়ে সুমেরু দেখেছিলেন বলে ওই মহান মন্দিরটির নাম হল ওদন্তপুরী। একেই পুরানো বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে বলা হয়েছে ওদন্তপুরী।

এই মন্দির আর শিক্ষাপীঠ কোনও রাজা বা ধনীর দানে তৈরি হয়নি। সাধারণ একজন উপাসকেব অসাধারণ ভক্তি আর ভালোবাসার ফলে গড়ে উঠেছিল। পাঁচ শ' জন ভিক্ষু আর পাঁচ শ' জন ভক্ত সেখানে মন্দিরের খরচে থাকতেন, শিক্ষালাভ করতেন, ধ্যান পূজা অর্চনা করতেন।

উপাসক জানতেন যে, তাঁর জীবৎকালের পরে অন্য লোকেরা লোভে পড়ে সেই সোনা অন্য কাজে লাগাতে পারো। তাই তিনি মৃত্যুর আগে সেই সোনার দেহটি মাটিতে পুঁতে ফেললেন। লোভের জিনিস সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে নেই।

তার পরের খরচ কী করে চলবে? তিনি ওদন্তপুরী মন্দিরটি রাজা দেবপালকে দান করে দিলেন। মন্দিরের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের হাত থেকে বাংলার সবচেয়ে পরাক্রমশালী সম্রাট গ্রহণ করলেন। ইতিহাসে এরকম একটি আশ্চর্য ঘটনা আর কোথাও আমরা পেয়েছি কি? তিব্বতের ইতিহাস 'সুম্পা' গ্রন্থে এই কাহিনিটা লেখা আছে। রূপকথাব বঙটুকু বাদ দিয়ে পড়লেই আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

এই মন্দিবটি ঠিক কোথায় ছিল, তা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তবে নালন্দার কাছেই ছিল। একজন তিব্বতী গবেষক মনে করেন যে, পাটনা থেকে রাজগীর যাবার পথে বিহার শরীফের কাছে যে টিলাটি এখনও দেখা যায়, সেটিই ছিল ওদন্তপুরী বিহার। এরই ধরনে গড়া হয়েছিল তিব্বতের একটি বিখ্যাত মন্দির, সেই মন্দিরটির চিহ্ন এখনও আছে এবং তারও গড়ন ঐরকম চারিদিকে চারটি চূড়াওয়ালা। তাছাড়া সেই টিলাটি তিব্বতের দিকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছিল।

আমাদের রাজার কুমার পণ্ডিত দীপঙ্কর এই মন্দিরটিকে সযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন। নালন্দার জ্ঞানী পণ্ডিতের কীর্তি শুধুমাত্র নালন্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এত কাছের এই মন্দিরটিও তাঁর সেবাযত্ন পেয়েছিল। তিব্বতের একাধিক ইতিহাস সেকথা বার বার বলেছে। বিক্রমশিলা আর ওদন্তপুরী—দুটিরই সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান আর পার্থিব প্রমাণ আমাদের সঠিক জানা নেই—শুধু জানা আছে, দীপঙ্করের সঙ্গে এ দুটির গভীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল।

৭

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কেবল একটি মানুষ অর্থাৎ একক ব্যক্তি মাত্র ছিলেন না। বলতে গেলে তিনি চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতার ভাবময় জগতে একটা ধারাবাহিকতার উদাহরণ, একটি ঐতিহ্যের প্রতিমূর্তি।

সেই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মূর্তিকে তিব্বতে আনতে চাইলেন রাজা লা লামা য়েশেহদ। কারণ, বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের স্রোত আবার দেশে বইয়ে দিতে হবে। দেশে যে তান্ত্রিক আচার আর বন-পা'র রহস্যময় রীতিনীতি বৌদ্ধধর্মের মধ্যে অনেক অশুদ্ধ আচার-আচরণ এনে দিয়েছিল।

কিন্তু মানুষের চিন্তার জগতে কিছু আনব মনে করলেই আনা যায় না। রাজা বিশেষভাবে শিক্ষিত একুশজন শ্রমণকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। তুষারপথের ঠাণ্ডা গরমে, জঙ্গলের সাপ-বাঘের কবলে আর তরাইয়ের জ্বরজারিতে উনিশজনই মারা গেলেন। বাকি দু-জন সংস্কৃত আর বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করে দেশে ফিরে এলেন। তাঁরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ধার্মিকতা আর শাস্ত্রজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সাহস করে ওই বিরাট পুরুষের কাছে এগোতেই পারলেন না।

রাজার আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে গেল। তিনি আরেকজন প্রতিনিধিকে একশ' জন সঙ্গী আর অনেক

সোনা দিয়ে আবার পাঠালেন। হিমালয় অতিক্রম করে তাঁরা দীপঙ্করের কাছে এসে রাজার নিবেদন জানালেন। তিনি বললেন, 'আমার তাহলে তিব্বতে যাবার দুটি কারণ হতে পারে। আমি অনেক সোনাদানা পাব আর সেখানকার লোক আমায় ভালোবেসে মহাত্মা বলে শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু প্রথমটা আমি চাই না। আর দ্বিতীয়টাতেও আমার কোনও লোভ নেই।'

চোখের জল ফেলতে ফেলতে হতাশ হয়েই তিব্বতী পণ্ডিত দেশে ফিরে গেলেন।

তৃতীয়বার দীপঙ্করের সন্ধানে পণ্ডিত পাঠাবার জন্য রাজা নেপালের সীমান্তে এগিয়ে এলেন। যদি আরও সোনা সংগ্রহ করা যায়, তাহলে হয়তো তাঁকে আবার আমন্ত্রণ করা যাবে।

এবার রাজা নিজেই এক শত্রু রাজার হাতে বন্দী হলেন। শত্রু তিব্বতরাজের মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করল যে, তিব্বতরাজকে তার ধর্ম গ্রহণ করে তার অধীন হতে হবে অথবা বন্দীর সমান ওজনের সোনা দিতে হবে।

অনেক কষ্টে জোগাড় করা সোনা পরিমাণে সামান্য কম হল। তখন রাজার ভাইপো আরও সোনা জোগাড় করার চেষ্টা করতে চাইলেন।

বন্দী রাজা বললেন—'বাছা আমার, পরধর্ম গ্রহণ করার চেয়ে প্রাণ দেওয়া ভালো। আর যা সোনা তুমি জোগাড় করতে পেরেছ, তা ফেরত নিয়ে যাও। দেশের ধর্মবিহারগুলিতে পূজার জন্য খরচ করো আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কাছে দূত পাঠাও। তাঁকে জানাও যে, তাঁর জন্য আর বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য সোনা জোগাড় করতে গিয়ে আমি বন্দী হয়েছি। তিনি যেন আশীর্বাদ করেন, যেন পরজন্মেও তাঁর আশীর্বাদ পাই। আমার জীবনের বাসনা ছিল যে, তাঁকে তিব্বতে এনে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করাব। সে সাধ পূর্ণ হল না। আমি তাই ''ত্রিশরণে''র দয়া ভিক্ষা করছি।'

এই 'ত্রিশরণ' হল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—যা আমরা সবাই বৌদ্ধ মন্দিরে এবং নানা সভা সমিতিতে শুনে থাকি।

রাজা বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করলেন।

তাঁর ভাইপো রাজা হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা আবার করা হল। এবার ভারতে এলেন নাগচো নামে এক তরুণ তিব্বতী পণ্ডিত অর্থাৎ লোচব। তিনি আগেই ভারতবর্ষে একবার এসে সংস্কৃত আর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেওয়া হল একশ' জন সহচর। আর দেওয়া হল দীপঙ্করের জন্য, তাঁর নিজের খরচের জন্য, পথের প্রয়োজনের জন্য আলাদা আলাদা পরিমাণ সোনা।

এত সোনা সঙ্গে নেওয়াই একটা বিপদ ছিল। আর শেষ পর্যন্ত এত সঙ্গী তো তিনি আনেন নি। পথের সম্বল রইল শুধু বুদ্ধের চরণকমলে নিবেদিত প্রার্থনামন্ত্র—'ওম্ মণিপদ্মে হুম্'। যারা দার্জিলিং-এর কাছে ঘুম শহরে বৌদ্ধমঠে গিয়েছে, তারা সবাই এই প্রার্থনা শুনেছে।

গঙ্গার পারে এক টিলার ওপর বিরাট বিক্রমশিলা ধর্মবিহার। সেখানে তিব্বতী পণ্ডিতদের জন্য সংরক্ষিত বাড়িতে থেকে নাগচো নামে তরুণ পণ্ডিতের তিব্বতী গুরু গ্যাৎসন পড়াশোনা করতেন। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন—'দীপঙ্করের চরিত্র আর মেধা এমনই উচ্চ স্তরের যে, তিনি তিব্বতে গেলে দেশের সত্যিই উপকার হবে। কিন্তু তিনি বোধ হয় যাবেনই না। তবে এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী হচ্ছেন স্থবির রত্নাকর। তাঁর ছাত্র হয়ে শিক্ষা অর্জন করতে থাক। ধীরে ধীরে দেখা যাবে।'

সময় বুঝে এই দুই তিব্বতী লোচব দীপঙ্করের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন। জানালেন তিব্বতের বর্তমান কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অবস্থার কথা, কেমন করে রাজারা একের পর এক সংস্কার করতে চেষ্টা করেছেন। সবার ওপরে রাজা সা লামার নালন্দা থেকে দীপঙ্করকে আনানোর চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে বন্দীদশা ও মৃত্যুর ঘটনাও তাঁকে জানানো হল।

রাজা নিজের মুক্তির বদলে দেশের ধর্মসংস্কার চেয়েছিলেন। আর সেই সৎকর্ম সাধন করতে চেয়েছিলেন দীপঙ্করের মাধ্যমে। সব শুনে দীপঙ্কর এবার অত্যন্ত বিচলিত হলেন। বললেন যে, তিব্বতে এই পরিণত বয়সে তিনি প্রকৃত ধর্মের ও দেশের সেবা হবে কিনা, সে বিষয়ে তাঁর অন্তর-দেবতার কাছ থেকে নির্দেশ নেবেন। কিন্তু রাজার পাঠানো উপহার সোনা তিনি ফেরত দিলেন।

সেই রাতেই তিনি তারা দেবীর পূজা করলেন। প্রতিমার সামনে মণ্ডল অর্থাৎ গোল করে সাজানো

নৈবেদ্য রেখে প্রার্থনা করলেন। দৈব আদেশ চাইলেন তিনটি বিষয়ে—তিব্বতে গেলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোনও সেবা হবে কি না—তিব্বতের রাজর্ষির বাসনা সত্যই পূর্ণ হবে কি না। সব শেষের প্রশ্ন নিজের আয়ু এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে।

মহাপ্রাণ মানুষ এমন করেই মহা-প্রার্থনা করেন। নিজের মঙ্গল আর মুক্তির জন্য নয়। বিশ্বজনের জন্য।

৮

দীপঙ্কর কেমন করে সব মানুষের প্রতি দয়া আর ভালোবাসার শিক্ষা পেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে একটি চমৎকার তিব্বতী কাহিনি এখানে বলতে হবে।

জম্বুদ্বীপের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি একবার মগধে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার মন্দিরে অনেক ধন দান করেছিলেন।

সেখানে একজন বৃদ্ধ সস্ত্রীক বাস করতেন। দেবতা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ভিক্ষু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এখানে আছেন এবং তাঁকে উপহার দিলে অনেক পুণ্য হবে।

বৃদ্ধটি দীপঙ্করকে খুঁজে বের করলেন মন্দিরে, যেখানে তিনি পূজা করছিলেন। বৃদ্ধের উপহার তিনি নিলেন কিন্তু পরে তাঁর মনে হল যে, কাজটা ঠিক হয়নি। ভিক্ষু জীবনের সম্মান ভোগ করার চেয়ে নির্জনে তপস্যা করা অনেক ভালো কাজ। তাই তিনি কৃষ্ণগলিতে গিয়ে ধ্যান করে জীবন কাটাতে লাগলেন।

আরেকজন বয়স্ক পণ্ডিত একথা জানতে পেরে দীপঙ্করকে বলেছিলেন, 'আপনি কুলদেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন, সাধারণ সিদ্ধিলাভও করেছেন। আপনার এখন নিভৃত জঙ্গল পর্বতে ধ্যান করে সময় নষ্ট না করে করুণা ও মৈত্রীর প্রসার প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সেটাই হবে আপনার প্রকৃত সাধনা। প্রাণীকুলের মঙ্গলের জন্য আপনি সব সৎ কর্ম করুন আজীবন এবং সংসারের শেষদিন পর্যন্ত।

তখন তাঁর মনে পড়েছিল যে, সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশে) তাঁর গুরুদেব ধর্মকীর্তিও এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি এবার মানবের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

এইভাবেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ কর্মগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তিব্বত যাত্রা আর সে দেশে এত ত্যাগ স্বীকার করে কষ্টবরণ করে তাঁর ধর্মপ্রচারের মূল উৎস ছিল এখানে।

কাজেই তিনি যে তার' দেবীর কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করবেন তা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এই জন্য যে, তিনি যাবেন এমন একটি অজানা দুর্গম দেশে, যেখানে ঘোর তন্ত্রমন্ত্রের চলন আছে। আছে দৈত্যদানব রাক্ষস খোক্কসের কাহিনি—একেবারে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প যাকে বলে।

দীপঙ্করের উদ্যোগে তিব্বতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম প্রচারের গুরুত্ব বুঝতে হলে তার আগের যুগে সে-দেশের বৌদ্ধ ধর্ম কিভাবে প্রচলিত ছিল, তা জানতে হবে। তিব্বতীরা ভূত প্রেত ও অলৌকিক ঘটনা, এসবে কতখানি বিশ্বাস করত, তাও বুঝতে হবে। ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো সেই সব গল্প কিছু এখানে বলছি। এগুলি কিন্তু শুধু মুখে মুখে তৈরি গল্প নয়—তিব্বতের ইতিহাসে লেখা আছে এসব কাহিনি।

খৃসরন সান্ নামে একজন রাজা বৌদ্ধধর্মকে তিব্বতের রাষ্ট্রধর্ম বলে সম্মান দিয়েছিলেন। তিনজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের প্রভাবে তা সম্ভব হয়েছিল। মজার কথা হচ্ছে এই যে, ভূত প্রেতের গল্পগুলি এই তিন পণ্ডিতের তিব্বত বাসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

শান্তরক্ষিত রাজার এক মন্ত্রীর নিমন্ত্রণে সে দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিছু লোক খুব হট্টগোল করলেন। সে-রকম ঘটনা তো অনেকদেশেই নতুন ধর্মপ্রচারের সময়ে হয়েছিল। এদেশে কিন্তু শয়তান আর অপদেবতারা নাকি জেগে উঠেছিল প্রবল বিরোধিতা করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তাঁকে বিদায় দেওয়া হল এ জন্য যে তাঁর ওদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আসার ফলেই নাকি একটা শহর বানে ভেসে গেল, একটা রাজবাড়িতে বাজ পড়ল, দেশে মড়ক শুরু হল। কিন্তু তিনি পরামর্শ দিয়ে গেলেন যে, গুরু পদ্মসম্ভবকে নিয়ে এলে তিনি মায়ামন্ত্রের জোরে সে দেশের ভূত প্রেত আর অপদেবতাদের শায়েস্তা করতে পারবেন। তিনি নাকি তা করতে পেরেছিলেন আর তাদের সকলকে নিজের দলের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন।

তার ফলে শান্তরক্ষিত তিব্বতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিলেন এবং এই দুই পণ্ডিত মিলে বৌদ্ধধর্ম চারিদিকে প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন।

কিছুদিন পরে একজন চীনা বৌদ্ধের সঙ্গে এদের শিষ্যদের তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল এবং ভারতবর্ষ থেকে রাজা আরও একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। তাঁর কাছে চীনা পণ্ডিত হার মেনে গেলেন।

লক্ষ্য করতে হবে যে, ভূত প্রেতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তিব্বতে ধর্ম নিয়ে হিংসাত্মক লড়াই হত না।

পদ্মসম্ভবের নামে তিব্বতে অনেক গল্প আছে। তাঁর জন্মকাহিনিও অলৌকিক। তাঁর জন্মের সময়ে অশেষ আলোর উৎস অমিতাভ বুদ্ধ নিজে নতুন অবতাররূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তার লক্ষণস্বরূপ সে দেশের একটি পবিত্র হ্রদে বিদ্যুতের মতো লাল আলো এসে পড়েছিল একটি সুন্দর পদ্মফুলের ওপর। আর সেই পদ্মফুলের পাপড়িগুলির ওপরে একটি দেবশিশু বসে ছিল। সেজন্য এই নবজাত শিশুর নাম দেওয়া হয়েছিল পদ্মসম্ভব।

তিনি বাল্যকাল থেকেই অনেক রকম অলৌকিক ব্যাপার দেখাতে পারতেন বলে তিব্বতী রূপকথায় আছে। এগুলি সব তিব্বতী বইতে লেখা আছে, আর এগুলি সবাই সত্যঘটনা বলেই বিশ্বাস করত। দু-একটি তিব্বতী রূপকথার গল্প এখানে বলা যাক।

একবার এক দানবী দুটো পাহাড়ের মধ্যে পদ্মসম্ভবকে পিষে ফেলে শেষ করে দেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি নিজের দৈব ক্ষমতায় আকাশে উড়ে গিয়ে পাহাড়ের জাঁতাকলকে এড়িয়ে গেলেন। তখন সেই দানবী তার বশ্যতা স্বীকার করল আর তাঁর ধর্মে দীক্ষা নিল। সেই ধর্মে তন্ত্রের সঙ্গে মেশানো ছিল সৎ আচরণ আর সাধু জীবনযাত্রার উপদেশ।

আরেকবার এক দানবী তাঁর ওপর বজ্রবিদ্যুৎ ছুড়তে লাগল। তিনি দানবীর বরফের আস্তানাকে গলিয়ে একটা হ্রদে পরিণত করে দিলেন। সেই হ্রদ গরমে টগবগ করে ফুটতে লাগল আর দানবীর হাড় পর্যন্ত সিদ্ধ হয়ে গেল। তখনও সে ফুটন্ত জল থেকে বের হয়ে আসছে না দেখে তিনি একটা বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। এবার দানবী উঠে এসে পদ্মসম্ভবের অধীনতা স্বীকার করল আর তাঁর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। দানবীকে তখন একটি ভালো বৌদ্ধ নামও দেওয়া হল।

বিশেষ লক্ষ্য করবার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই সব তিব্বতী কাহিনিতে ধর্ম আর অধর্মের লড়াইয়ের ভিত্তি আছে আর সবগুলিতেই ধর্ম হয়েছে জয়ী।

আরও লক্ষ্য করতে হবে যে, পাপ শুধু যে হেরে গেছে তা নয়, পুণ্যের কাছে মাথা নত করেছে, পুণ্যবান হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ ধর্মেরই জয় হয়েছে পুরোপুরি সব দিক দিয়ে।

তিব্বতে এই রকম চিন্তাভাবনার পরিবেশ ছিল হাজার-বারো শ' বছর আগে। তার মধ্যে সেদেশে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব হতে পেরেছিল।

৯

একবার স্বপ্নে তারা দেবী দীপঙ্করকে তিব্বতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কাছেই একটি পাহাড়ে ছোট্ট মন্দির আছে। সেখানে এসে সাধিকা তাঁকে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন।

সকালে সেখানে গিয়ে দীপঙ্কর তারা প্রতিমার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

কোথা থেকে কেউ জানে না—একজন যোগিনী সেখানে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর কেশরাশি পূজার ভূমি পর্যন্ত বিস্মৃত। তিনিই প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন—'বৎস, তুমি তিব্বতে গেলে সে দেশের মানুষের অনেক অনেক উপকার হবে। বিশেষ করে উপকার হবে একজন উপাসকের, এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে কল্যাণ হবে সমস্ত দেশের।'

কেউ কেউ বলেন, সেই উপাসক হচ্ছেন ব্রমটন নামে দীপঙ্করের প্রধান শিষ্য এবং উত্তরাধিকারী। আবার কেউ বলেন, সেই উপাসক হচ্ছেন ভাবীকালের দলাই লামা। একের পর এক ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রকর্তা হয়ে দলাই লামারা তিব্বতকে চালিয়েছেন।

এই দলাই লামা প্রথাটি প্রবর্তিত হয় দীপঙ্করের শিক্ষা ব্যবস্থা আর সংস্কারের ফলে।

মঙ্গোল ভাষায় 'দলাই' কথার অর্থ হচ্ছে সাগরের মতো বিরাট।

দীপঙ্করকে যোগিনী আরও বলেছিলেন,—'কিন্তু বৎস, তোমার আয়ু বিশ বছর কমে যাবে তিব্বতে

গেলে। ওই দেশে যাবার ফলে তুমি ৯২ বছরের বদলে মাত্র ৭২ বছর বাঁচবে।

দীপঙ্কর তখনই মনস্থির করে ফেললেন। নিজেকে ভালোবাসার চেয়ে মানুষকে ভালোবাসা অনেক বড়। ভগবান বুদ্ধেরই বিধান। তিব্বতের কল্যাণেই হবে পৃথিবীর মঙ্গল। সুতরাং তার চেয়ে বড়কিছু কাম্য হতে পারে না।

কিন্তু দৈবনির্দেশও যাচাই করে নেওয়া দরকার—বিশেষ করে সবটুকু সিদ্ধান্তই যখন তাঁর নিজেরই মনেই ঠিক করে নিতে হচ্ছে।

তিনি বজ্রাসনে অর্থাৎ বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরে গিয়ে আবার পূজা দিয়ে নির্দেশ নিতে চাইলেন। একজন আচার্য তাঁকে জানালেন যে, সেই মন্দিরে বাদামী জটাজূটধারিণী এক বৃদ্ধা যোগিনী আছেন। তিনিই সঠিক নির্দেশ দিতে পারবেন।

বজ্রাসনে যাবার পথেই এক মহাপুণ্যবতী যোগিনীর সঙ্গে দেখা হল। দীপঙ্কব তাঁকে মনে মনে প্রণাম করে প্রশ্নগুলি জানালেন।

যোগিনী তাঁকে বললেন,—'অবশ্যই তুমি তিব্বতে যাও। তোমার স্বাস্থ্য বা আয়ুর যা হয় হোক—অসংখ্য মানুষের মঙ্গল তুমি করতে পারবে।'

দীপঙ্কর বুঝলেন যে, স্বয়ং আর্যতারা দেবী মানবীর রূপ ধরে এই আদেশ দিয়ে গেলেন।

বজ্রাসনে বজ্রতারার মন্দিরে গিয়ে তিনি বাদামী জটাজূটধারিণী বৃদ্ধ যোগিনীব সাক্ষাৎ পেলেন। তিনিও সেই একই আদেশ ও ভবিষ্যৎবাণী করলেন এবং বললেন যে, তাঁর তিব্বত গমনের ফলে এমন একজন উপাসকের প্রথা শুরু হবে, যে ধার্মিক ব্যক্তি আত্মার অন্ধকার দূর করে দিতে পারবেন আর ভবিষ্যৎ জন্মে বৌদ্ধধর্মের রহস্যগুলি অভ্যাস ক'রে সম্পূর্ণতা লাভ করবেন।

এই উপাসক হচ্ছেন দলাই লামা। এই দলাই লামা উপাসক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তি এইভাবেই দীপঙ্করের উদ্যোগেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে অজ্ঞাত, একাধারে ধর্মনেতা এবং রাষ্ট্রপিতার ব্যবস্থা হল এই 'দলাই লামা' প্রথা।

খ্রিস্টধর্মেও এককালে পোপ ছিলেন খ্রিস্টানদের ধর্মপিতা আর ভ্যাটিকান রাজ্যের অধিপতি। এখনও সেই প্রথা আছে, তবে আগের তুলনায় পোপের ক্ষমতা অনেকটা কমে গেছে এবং অলৌকিক রহস্য কখনও তাঁকে ঘিরে রাখেনি।

তুষারের দেশ, তন্ত্রমন্ত্রের রাজ্য তিব্বত। তার সঙ্গে কী রোম বা ভ্যাটিকান রাজ্যের তুলনা হয়?

তা ছাড়া, পোপকে সৃষ্টি করেছিলেন একজন প্রবল পরাক্রমী সম্রাট শার্লেমান।

আর, দলাই লামার সৃষ্টি হয়েছিল কোনও রাজার প্রতাপে নয়—ধর্মের প্রভাবে।

ইতালিয়ান পর্যটক মার্কো পোলোর লেখা একটি কাহিনি এখানে মনে পড়ে। ভীষণ নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিজ খাঁ প্রায় আট শ' বছর আগে তিব্বত জয় করেছিলেন। তাঁর বংশধর চীনের সম্রাট কুবলাই খাঁ এমন একটি ধর্মপ্রথার খোঁজ করছিলেন, যা তাঁর সাম্রাজ্যের জনগণের অর্ধসভ্য সম্প্রদায়গুলিকে একই সূত্রে সুসংহত করে রাখতে পারবে।

আমাদের মহাভারতেও আছে—যা মানুষকে ধারণ করে রাখতে পারে, তাই হচ্ছে ধর্ম। এমন সহজ উদার আর পরিষ্কারভাবে ধর্মের বর্ণনা বোধ হয় আব কোথাও করা হয়নি।

এই উদ্দেশ্যে কুবলাই খাঁ সকল ধর্মের চূড়ামণিদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীপঙ্করের পাঠানো তিব্বতে প্রবর্তিত শাক্য-পা বৌদ্ধধর্মের সেরা লামা আর পোপের পাঠানো খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের এক নেতা।

সভ্যতার প্রথম যুগে, এমন কি দু-তিন শ' বছর আগেও, অলৌকিক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়ে মানুষকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হত। তন্ত্রমন্ত্রের কারসাজি জানতে হত।

সেই অনুসারে কুবলাই খাঁ তাঁদের বললেন,'আপনারা এমন কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম দেখান, যা আপনাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।'

খ্রীস্টানরা আশ্চর্য করে দেবার মতো কোনও ক্রিয়াকর্ম দেখাতে পারলেন না। বৌদ্ধ লামার অলৌকিক ক্ষমতার বলে সম্রাটের সুরার পাত্রটি আপনা থেকে তাঁর ঠোঁটে উঠে এল।

তিনি শাক্য-পা লামাকে বৌদ্ধ লামা ধর্মের শিরামণি বলে ঘোষণা করলেন। তাঁকে তিব্বতের ধর্ম ও

রাষ্ট্রের অধিপতি করে দিলেন। বিনিময়ে শুধু একটি প্রতিদান চাইলেন যে, চীনের সম্রাটদের অভিষেক আর পুণ্যস্নান করিয়ে দেবেন প্রধান লামা।

তিব্বতী পণ্ডিতদের সাহায্যে শাক্য-পা চীনের ধর্মগ্রন্থগুলি থেকে অনুবাদ করে ও মূল থেকে মিলিয়ে মঙ্গোলীয় ভাষায় এক বৃহৎ লামা ধর্মগ্রন্থ তৈরি করলেন। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ এইভাবে দীপঙ্করের শিক্ষা ব্যবস্থা ও ধর্মসংস্কারের ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী উপকৃত হল।

শুধু তাই নয়। পনেরো শতকে দীপঙ্করের সংস্কার করা ধর্মপ্রথা 'কদম্-পা' আরও পবিত্রভাবে গড়ে উঠল। তার নাম হল 'গেলুগ্-পা' অর্থাৎ পুণ্যপথ।

এই শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতে সেই পথ চলে আসছে। সব দেশেই এমনভাবে একই মূলধর্মের অনেক শাখা-প্রশাখা, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মন সব সময়েই নতুন কিছুর খোঁজে, নতুন ভাবধারা নিয়ে, নতুন পথে আরও এগিয়ে যেতে চায়।

তিব্বতে দীপঙ্কর সেই মহান ধারাই চালু করে গেছেন।

১০

বিক্রমশিলায় পুরো তিন বছরের অপেক্ষা। সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা। তরুণ তিব্বতী পণ্ডিত নাগচো এতদিন সেখানে থাকার পর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত রওনা হবার সময় হল।

নাগচো তাঁর গুরু স্থবির রত্নাকরের কাছে বিদায় নিতে গেলন।

গুরু বললেন—'হে আয়ুষ্মান্, দীপঙ্কর বিহনে অন্ধকার হয়ে যাবে ভারতবর্ষ। তিনি দেশের বহু প্রথা-প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডারী। তাঁর বিদায়ের পরে অনেক মঠ শূন্য মনে হবে। এদিকে ভারতবর্ষের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। তুরস্কের সৈন্যদল এদেশে এসেছে। আমি ভয়ানক চিন্তিত। তবু তুমি দীপঙ্করকে তোমার দেশে নিয়ে যাও। তাতে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণ হবে।'

যাত্রাপথে দীপঙ্কর ভারতবর্ষে ও নেপালে বিভিন্ন জায়গায় মঠ স্থাপন করেছিলেন।

যে সব সন্ন্যাসী তীর্থক্ষেত্রে বা পুণ্যস্থানে গায়ে ভস্ম আর কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে বাস করতেন, তাঁদের তির্থিক বলা হত। ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশ এই তির্থিকদের কাছে পবিত্র একটি স্থান ছিল। তাঁদের আচার্য ছিলেন পনেরো জন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের ধর্মমত সম্বন্ধে দীপঙ্করের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আলোচনা করে সন্তুষ্ট হলেন তাঁরা, আর সম্মান ও ভালোবাসার চিহ্ন হিসাবে তাঁকে একটি ছাতা উপহার দিলেন।

ছাতা ছিল সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মানের চিহ্ন। পায়ে হেঁটে তাঁরা পথে ঘাটে জঙ্গলে রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ধর্ম প্রচার করতেন। ভগবানের আশীর্বাদ তাঁদের ছায়া দেয়। রাজছত্রের চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে সন্ন্যাসীর এই ছত্র।

কুম্ভমেলায় গেলে দেখা যায় বড় বড় ধর্ম সম্প্রদায়ের মিছিলের মধ্যমণি গুরুর মাথার ওপর রয়েছে প্রকাণ্ড বাহারি ছাতা। সম্প্রদায়ের শিষ্যদের কাছে সেই ছাতা রাজার রাজছত্রের চেয়েও বেশি সম্মানের বস্তু। হাজার বছর আগে সারা ভারতবর্ষেই এই ছাতার চল ছিল।

সন্ন্যাসীদের ছাতার মহিমা সম্পর্কে তিব্বতী বইতে অনেক বর্ণনা আছে। দীপঙ্করের কাহিনিতেও আছে ছাতার কথা।

দীপঙ্করের সময়ে বাংলার বৌদ্ধরা প্রায়ই ধর্ম আর শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে তির্থিকদের কাছে হাব মেনে যেতেন। তির্থিকদেব তীর্থক্ষেত্রে যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে সমস্ত সময় কাটত। দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে আর তর্কযুদ্ধে নিপুণতার কল্যাণে অনেক বৌদ্ধ যাঁরা আগে তির্থিক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার বৌদ্ধমতে ফিরে এসেছিলেন।

একজন তির্থিকের মেয়ে দীপঙ্করকে দেখে খুব পছন্দ করলেন। ভাবলেন যে, তাঁকে যদি ভিক্ষুর অবস্থা থেকে তির্থিক সংসারী করে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁকে বিয়ে করতে পারবেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে তাঁর বাবা তখন দীপঙ্করকে দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু মেয়েটির বাবা নিজেই শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম নিতে বাধ্য হলেন।

একবার পাঁচটি ছত্রধর এক দক্ষিণী পণ্ডিত দীপঙ্করকে তর্কযুদ্ধে নামতে আহ্বান জানালেন—'আপনি

হচ্ছেন বৌদ্ধদেব মধ্যে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত আব আমাকে সবাই বলে অ-বৌদ্ধদেব মধ্যে সেবা বিদ্বান। আসুন, আমরা তর্কেব লড়াইয়ে নামি।'

মগধেব বাজা নিজে হলেন সেই তর্কসভাব বিচাবক আব সেখানে দীপঙ্কব শ্রীজ্ঞান সেই বিদ্বান পণ্ডিতকে তর্ক মাধ্যমে শাস্ত্রেব নানা প্রশ্নোত্তবে সম্পূর্ণভাবে পবাজিত কবে পণ্ডিতকে এবং তাঁব সমস্ত শিষ্যকেও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত কবে নিলেন।

এব পবে আট ছত্রধাবী এক পণ্ডিত এবং তাব পবে তেবো ছত্রধাবী আবও একজন পণ্ডিতও দীপঙ্কবেব সঙ্গে শাস্ত্রবিষয়ে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন। দুজনেই কিন্তু হেবে যান।

তির্থিক সন্নাসীদেব মধ্যে অনেক শৈব, বৈষ্ণব, কপিল প্রভৃতি নানা মতেব উপাসক ছিলেন। একবাব একজন তির্থিক বিদ্বেষবশত দীপঙ্কবকে শেষ কবে দেবাব জন্য আঠাবোজন ডাকাতকে পাঠিয়েছিলেন। ডাকাতবা দীপঙ্কবেব সৌম্য দেবতাব মতো মুখখানি দেখে একেবাবে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। তিনি শুধু বললেন—'ওদেব যেন ভগবান দয়া কবেন।'

এখানে যীশুখ্রিস্ট আব শ্রীচৈতন্যদেবেব কাহিনি মনে পড়ে যায়। তাই না? তাঁবাও তো এমনিভাবেই পাপীদেব ক্ষমা কববাব জন্য ভগবানেব কাছে প্রার্থনা কবেছিলেন।

নেপাল সীমান্তেও সেখানকাব এক জমিদাব দীপঙ্কবেব পিছনে ডাকাত লাগিয়েছিলেন। তাবাও দীপঙ্কবেব সামনে তাদেব তীব ধনুক ফেলে যেন মন্ত্রবলে নিস্তব্ধ হয়ে নিশ্চল মূর্তিব মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

নেপালে আর্য স্বযম্ভু নামে একটি পবিত্র মন্দিব ছিল। দীপঙ্কব সেখানে স্থানীয় বাজা আব প্রজাদেব মঙ্গলেব জন্য পূজা দিলেন। তাবাও এই মহান পণ্ডিতকে সম্মান দেখাল।

পথে দীপঙ্কব একজন কালস্থবিব অর্থাৎ মহাপণ্ডিতেব কাছে গেলেন। তাঁকে পুবো ছয় দিন ধবে 'পাবমিতা' নামে একটি ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনালেন। তাঁকে বোঝালেন যে, বোধি অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান পেতে গেলে মন্ত্র আব পাবমিতা দুটিই আয়ত্ত কবা দবকাব।

এবপব দীপঙ্কব বচনা কবেছিলেন 'চর্যা সংগ্রহ প্রদীপ'। তাঁব সঙ্গী লোচব অর্থাৎ বৌদ্ধ পণ্ডিত মল শাস্ত্র থেকে তিব্বতী ভাষায় তা অনুবাদ কবেছিলেন।

ভাগ্যিস কবেছিলেন। না হলে এই বচনাব এবং আবও অনেক প্রাচীন বচনাব অস্তিত্ব অজানা থেকে যেত।

চর্যা হচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব সবচেয়ে প্রথম উদাহবণ। এগুলি ছিল ধর্মবিশ্বাস আব মানুষেব সুখ দুঃখ সম্বন্ধে গান এবং কবিতা। তাব চেয়ে বেশি পুবনো বাংলা সাহিত্যেব নমুনা আমবা এখনও পাইনি।

নেপালেব বাজা অনন্তকীর্তি তাঁব দববাবে দীপঙ্কবকে প্রভূত সম্মান আব আদব যত্ন সহকাবে অভ্যর্থনা কবলেন। তিনি বাজাকে উপহাব দিলেন একটি হাতি। আব বললেন যে, এই হাতিকে যেন অস্ত্রশস্ত্র বহন কবতে দেওযা না হয, যুদ্ধেব কাজে ব্যবহাব না কবা হয। হাতিটিকে কেবলমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ, পুঁথিপত্র পবিত্র জিনিসপত্র আব দেবমূর্তি যেন বহন কবতে দেওয়া হয।

এই উপহাবেব বদলে দীপঙ্কব কী চাইলেন, তা আমাদেব মনে বাখা উচিত। মান নয ধন নয, সংসাবেব কোনও সুযোগ-সুবিধা নয—শুধু চাইলেন যে, একটা ধর্মবিহাব সেখানে স্থাপন কবা হোক।

আব সেটি দীপঙ্কবেব নিজেব নামে নয—ওই ধর্মবিহাবটিব নাম হবে সেই স্থানেব নামে। তাই সেই ধর্মবিহাবেব নাম হল 'থানবিহাব'।

সেদেশেব বাজাব ছেলে নিজে বাজ্যপাটেব দাবি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। দেশ ছেড়ে আসবাব পবে বাজপুত্র দীপঙ্কবেব প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হলেন আব এক বাজপুত্র।

১১

বাজপুত্র দীপঙ্কব শ্রীজ্ঞান সন্ন্যাসীব বেশে চলেছেন ঘোড়ায চড়ে।

একা নয। কেবলমাত্র সঙ্গে আসা সন্ন্যাসী-সাথীদেব মধ্যে নয। তিব্বতবাজ পাঠিয়েছিলেন এক শ' ঘোড়সওয়াব—দেশেব সীমান্তে তাঁকে অভ্যর্থনা কবাব জন্য। সবাই সাদা অলঙ্কাবে সাজানো ঘোড়ায চড়া। ঘোড়সওয়াবদেব সঙ্গে চাবজন সেনাপতি। প্রত্যেকেব দু'পাশে ষোলজন কবে বর্শাধাবী। মোট চৌষট্টি জন বর্শাধাবী।

বর্শাগুলির মাথায় মানুষ-মারা তেকোনা লোহা নয়, ছিল সাদা পতাকা। বাকি সবারই হাতে ছোট ছোট পতাকা। আর কুড়িটি সাটিনের ছাতা। বাঁশি, শিঙা, আর হরেকরকম তিব্বতী বাজনার সুরেলা অভ্যর্থনা। কিন্তু ভাবে গম্ভীর। মন্ত্রপাঠ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে—'ওম্ মণিপদ্মে হুম্'।

সবার নেতৃত্বে এসেছেন রাজার নিজের প্রতিনিধি। তাঁর সঙ্গে পাঁচজন সহচর আর নানা উপহার। সোনা, মধুপর্ক আর চা। চীনা ড্রাগনের মূর্তি আঁকা চা-দানি। কিন্তু তিব্বতী ধরনে বানানো চা।

সেই চা পরিবেশন করে রাজ-প্রতিনিধি বললেন—'সম্মানিত মুনিবর, আপনি অনুগহ করে এই দেবভোগ্য পানীয় গ্রহণ করুন। এটি হচ্ছে স্বর্গের ইচ্ছাতরুর নির্যাস।'

উঁচু আসন থেকে দীপঙ্কর বললেন—'যোগাযাগ তো বড়ই শুভ মনে হচ্ছে। এই দামি আধারটি শুধু কী দেখতেই চমৎকার! এর মধ্যে আছে ইচ্ছাতরুর জীবনদায়িনী রস। এর নাম কী?'

তিব্বতী লোচব বললেন—'পূজনীয় গুরুদেব, এর নাম চা। তিব্বতের সাধুরা এটি পান করেন। চায়ের পাতা খাওয়া হয় না বলেই জানি। তবে চায়ের পাতাগুলি সোডা, নুন আর মাখন মিশিয়ে ফোটানো জলে ঘুটে নেওয়া হয়। তার নির্যাসই হচ্ছে চা। এর অনেক গুণ আছে।'

দীপঙ্কর বললেন—'তিব্বতের সাধুদের পুণ্যের ফলেই এমন চমৎকার পানীয় চা-এর সৃষ্টি হয়েছে।'

চায়ের প্রশংসা করে তিব্বতে একটি স্তোত্রও চালু আছে। লোকে বলে, সেটি দীপঙ্করেরই রচনা।

সকালে-বিকালে ঘরে ঘরে বসে চা খাওয়ার সময়, সেই বরফের দেশে অজানা রাজ্যে যিনি হাজার বছর আগে মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছা নির্বাসন বরণ করেছিলেন, তাঁর কথা অনেকেরই হয়তো মনে পড়ে!

আরও এগিয়ে এসে দীপঙ্কর মানস সরোবরে পৌঁছলেন। জায়গাটি যেমন পবিত্র, তেমনি সুন্দর মনে হল। তিনি সেখানে পরলোকগত আত্মাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। তিব্বতে তর্পণের কোনও নিয়ম ছিল না। তাঁর শেখানো তর্পণের প্রথা এখনও চালু আছে। তাঁরই নামে সেই তর্পণ প্রথাকে বলা হয় 'দীপংমা'।

এবার তিন শ ঘোড়সওয়ার আর চারজন সেনাপতি চললেন দীপঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে। সবারই পোশাক পরিচ্ছদ সাদা। শান্তির রঙ।

প্রধান সেনাপতি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—'সবচেয়ে বেশি গুণবান জ্ঞানবান আপনি। তিব্বতের সবাকার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবতার রূপ ধরে আপনি আর্যভূমি থেকে এসেছেন। এমনই আপনার কৃপা। আপনি চিন্তামণি। আপনার কাছে যা প্রার্থনা করি তা-ই আপনি দিতে পারেন। আমাদের দেশে ধর্ম সম্পদ নেই। আপনার কাছে তা আছে। ...আপনার আগমনে আমাদের সুখী দেশ আরও সুখী হল।'

'চিন্তামণি' কথাটির মানে ছিল এমন একটি মণি যার কাছে যে কোনও জিনিস চাওয়া হোক, তাই পাওয়া যায়।

তিব্বতের প্রধান ব্যক্তিরা চেয়েছিলেন ধর্মের প্রসার, ধর্মের সংস্কার। দীপঙ্করের কাছে তাঁরা তার পথনির্দেশ পেয়েছিলেন পুরো মাত্রায়।

দীপঙ্করকে এই সেনাপতি আরও বলেছিলেন, 'প্রজাদের ধর্মগুণ আর সঞ্চিত পুণ্যের ফলে রাজার শক্তি আর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। রাজা আর প্রজা উভয় পক্ষের পুণ্যের বলে সবদিকেই বিবাদ-বিসম্বাদ আর অশান্তি দূর হয়ে গেছে। এখন আপনার আগমনে আমরা আরও উন্নতি লাভ করব। বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তিতে সুমেরু পর্বতের মতো অবিচল থাকব। আমাদের প্রার্থনা যে, আপনি আমাদের রাজার মঠ থোলিনে একবার অনুগ্রহ করে পদার্পণ করুন।'

এই রকম অভ্যর্থনা করে তিন শ' ঘোড়সওয়ারের সামনে দীপঙ্করকে রেখে তাঁরা বন্দনা গান করতে করতে এগিয়ে চললেন।

প্রধান সৈনাপতি পথে আবার দীপঙ্করকে সম্মান-প্রণিপাত জানিয়ে বললেন—'বর্তমান যুগে দীপঙ্কর হচ্ছেন বুদ্ধের প্রতিভূ আর বৌদ্ধধর্মের শিরোমণি। তিনি সারা জগতের শ্রদ্ধার পাত্র। পবিত্রতার জন্য সমস্ত জীবিত প্রাণী, এমনকি দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।'

দীপঙ্করের তিব্বতী জীবনীকারের ভাষায়—'তাঁর ঘোড়া মৃদুমন্থর গতিতে সোনার রাজহংসের মতো সাবলীলভাবে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে যোগবলে তিনি ঘোড়ার রেকাবি না ছুঁয়েই হাতখানেক ওপরে উঠে যেতে লাগলেন—সবাই তাঁকে দেখুক, অনুভব করুক—এই ছিল তাঁর অভিলাষ।'

ষাট বছর বয়সের দীপঙ্করের সুন্দর চেহারা, সৌম্য ভাবভঙ্গি আর প্রসন্ন হাসি তাঁকে দেবতাদের মতো

সম্মানের যোগ্য করে তুলেছিল। সংস্কৃত মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করছিলেন আর প্রত্যেকটি পঙক্তির শেষে নিজের মাতৃভাষায় স্বস্তিবাচন করছিলেন।—

এরপর তিব্বতরাজের প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে দীপঙ্করকে অভ্যর্থনা জানালেন—'হে প্রভু, আমাদের ভক্তি ও ধর্মভাবনার প্রধান, আপনি সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি করুণা করে নিজের দেশ ছেড়ে এত দূরে এসেছেন, আমাদের সৎ শিক্ষার সুযোগ দিতে, পথের পরিশ্রম উপেক্ষা করে।'

এই কথা বলে প্রধান মন্ত্রী কিংখাবের কাজ করা বিরাট একটি অবলোকিতেশ্বরের চিত্র দীপঙ্করকে উপহার দিলেন। দীপঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করে সেটিকে পূত পবিত্র করে দিলেন। তারপর প্রত্যেক মন্ত্রী শ্রদ্ধাভরে তাঁকে সাদা উত্তরীয় অর্ঘ্য দিলেন।

তিনি যে অতি + ঈশ—সবার বড়—মহাপ্রভু! তাই দীপঙ্কর হলেন অতীশ।

১২

'আমি তাঁর চরণে প্রার্থনা করছি—
যিনি সর্বত্র সম্মানিত।
তুষিত স্বর্গে যাঁর নাম বিমল আকাশ,
আর্যদেশে যাঁর নাম দীপঙ্কর,
হিমবন্ত দেশে যাঁর নাম শ্রীমৎ অতীশ।'

এই স্তোত্র রচনা করেছিলেন অতীশের প্রধান শিষ্য ব্রমটন। তাঁরই জীবদ্দশায়। এই ব্রমটনই তাঁর প্রচলিত মতবাদ আর ধর্মাচার প্রচার করে নিজের দেশে অমরতা লাভ করেছেন।

অতীশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই 'বোধিপথ প্রদীপ'—তিনি নিজে এই বইয়ের যে টীকা রচনা করেছিলেন, সুদূর চীনদেশে তার একটি অনুলিপি পাওয়া গেছে। তাতে প্রথমেই রচয়িতার নাম আছে—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তারপর লেখা আছে—'বর্তমান যুগে বঙ্গাল দেশে জন্ম নিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের অবতার'। বইখানি অনুবাদ করেছিলেন আর পরিশুদ্ধ করে নিয়েছিলেন ভারতীয় মহাপণ্ডিত গুরু বোধিসত্ত্ব বাঙালি শ্রীদীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানপাদ আর লোচব ভিক্ষু জয়শীল (অর্থাৎ নাগচো)।

বিদেশে একজন বাঙালির এত বিপুল সম্মান আর তাঁব একক প্রচেষ্টায় একটি ভিন্ন দেশে ধর্মপ্রথার এত ব্যাপক এবং আমূল সংস্কার অবশ্য সহজে হয়নি।

লামা প্রথার একটা উদাহরণ দিলেই এই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। তিব্বতের এক রাজা খানিকটা উদার আর পরিচ্ছন্ন মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে নির্ভুল ধর্মশাস্ত্র আর সেগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আনিয়ে লামাদের সেই অনুসারে চলতে বলেছিলেন। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির ফলে রাজার বাই লান দারমা ক্রোধের বশে রাজাকে খুন করলেন। যে সব লামা শুদ্ধ বৌদ্ধ প্রথাগুলি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের ওপর দুর্বিষহ অত্যাচার চালালেন। মন্দির মঠ ধ্বংস করে, শাস্ত্র পুঁথিগুলি পুড়িয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না—অহিংসার সেবক লামাদের জোর করে কসাইয়ের কাজ করতেও বাধ্য করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শাক্যমুনির মূর্তি দেশে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই প্রজারা দুঃখী আর গরিব হয়ে পড়েছে। তাঁর কুশিক্ষার ফলেই তাদের মতিগতি চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। ..ধনীরাও তাঁকে উৎসাহ দিল।

একজন লামা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভৌতিক নৃত্যের নাচওয়ালা সাজলেন। মাথায় কালো টুপি পরে, ঘুরে ঘুরে রাজপ্রাসাদের সামনে নাচতে লাগলেন। প্রজারা রাজাকে শয়তান বলে মনে করত—তারা বলত যে, রাজার চুলের নিচে দুটো শিং লুকোনো আছে। কাজেই লামাও খুব হুঁশিয়ার হয়ে সাজপোশাক পরে রাজাকে খুন করবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছিলেন। তাঁর জোব্বার চওড়া হাতার ভেতরে লুকোনো ছিল তীর ধনুক।

রাজা সেই লামার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নিজের খুব কাছে সেই লামাকে ডেকে নিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লামা প্রথম প্রণামের ভঙ্গিতে ধনুক বাঁকিয়ে নিলেন—দ্বিতীয় প্রণামের সময় পরালেন তীর—আর তৃতীয় প্রণামের ছলে ছদ্মবেশী লামা তীর মেরে রাজাকে ঘায়েল করে ফেললেন। আর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—'আমি হচ্ছি কালো দৈত্য! পাপী রাজাকে এমনি করেই শেষ করে দিতে হয়।'

শুরু হল চারিদিকে হুলস্থূল। সেই সুযোগে কাছে বেঁধে রাখা কালো ঘোড়ায় চড়ে হত্যাকারী উধাও।

আর নদীতে ঝাঁপ। ঘোড়ার গায়ে মাখানো কালো রঙ নদীর জলে ধুয়ে গেল। লামা তাঁর কালো পোশাক উলটিয়ে নিয়ে সাদা পোশাক পরে সাদা ঘোড়ায় চড়ে নদী থেকে বেরিয়ে এলেন। সে যেন এক জাদুর খেলা।

মাত্র তিন বছর ধরে রাজার অমানুষিক অত্যাচারের ফলে বেশির ভাগ পণ্ডিতই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

এমনি সব কাণ্ড সেই যুগে সেদেশে হত। এমনই সেই দেশে অতীশ নিয়ে গিয়েছিলেন অহিংসার বাণী, মৈত্রীর ধর্ম, আর শান্তির মন্ত্র। নিজের দেশে তিনি বজ্রযান মতের বৌদ্ধ ধর্মপ্রথা মেনে চলতেন। ক্রমে তিনি তার সঙ্গে মিশিয়ে নিলেন আরও সুনীতিপূর্ণ মহাযান ধর্মপ্রথার পবিত্র শুদ্ধ ব্যাখ্যা। সে-কাজ ছিল অসম্ভব রকম কঠিন ব্যাপার।

ছিল পদে পদে বাধা আর বিরোধিতা।

রিন চেন জান পো নামে পঁচাশি বছর বয়সের এক পণ্ডিত প্রথমেই বাধা দিলেন। খোদ রাজধানীতেই তাঁর ধর্মবিহারে থরে থরে সাজানো ছিল তান্ত্রিক দেবদেবীদের মূর্তি। ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের ক্ষমতা রাখত সেই সব দেবদেবী—অবশ্য তান্ত্রিক ভক্ত আর ভীতুস্বভাবের লোকেদের চোখে তাই মনে হত। তিব্বতে তখন প্রায় সবাই সেই পথের পথিক।

অতীশ সেই ধর্মবিহারে ঢুকেই এক নাগাড়ে প্রত্যেকটি মূর্তির জন্য এক-একটি স্তোত্র রচনা করলেন। তারপর পূজারীর মাদুরে এসে বসলেন। একটি মাত্র আসনে একেবার বসেই এত স্তোত্র বচনা? পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে এসব রচনা করেছে?'

অতীশ বললেন—'আমি। এবং এই এখনই।'

নিজেব চেয়ে চব্বিশ বছরের ছোট এই বিদেশী বৌদ্ধের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে বৃদ্ধ শুধু যে আশ্চর্য হলেন তাই নয়—তিনি অতীশের কাছে বজ্রযানের 'মোহন আয়না' নামে একটি বিদ্যা শিখে নিলেন। ফলে, গভীর ধর্মভাব তাঁর মনে জেগে উঠল। তিনিও অতীশের সঙ্গে একাসনে ধর্মচর্চা করতে চাইলেন।

কিন্তু অতীশ তাঁকে বোঝালেন 'সেটা তো মাত্র বাইরের কথা। হে মহান্ লোচব, আপনাব অন্তবের কথা ভেবে দেখুন। আপনার অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করুন—পৃথিবীব মানুষের এত দুঃখ কষ্ট কেমন করে আমরা সহ্য করে আছি? আর সহ্য করা যায় না। আসুন, তাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করুন। সেই সাধনার জন্য বুদ্ধের দয়া প্রার্থনা করুন। সাধনা করুন।'

একথা শুনে সেই মহাপণ্ডিত রিন চেন জান পো তাঁর মন থেকে বিদ্যা আর সম্মানের অভিমান দূর করে দিলেন। তিনি একটি মন্দির তৈরি করালেন। তাতে একটার পর একটা তিনটি দরজা রাখলেন সাধনভজনের ঘরে যাওয়ার জন্য। প্রথম দরজার মাথার ওপর লেখা রইল 'এই দরজা পেরিয়ে যদি আমি সংসারের মোহ নিয়ে যাই, তাহলে আমার মাথা যেন দু'টুকরো হয়ে যায়।'

মাঝখানের দরজার মাথায় লেখা রইল—'এই দরজা পেরিয়ে যদি মুহূর্তের জন্যও নিজের স্বার্থ চিন্তা করি, তাহলে আমার মাথা যেন দু'টুকরো হয়ে যায়।'

শেষ দরজার মাথায় লেখা রইল—'এর ওধারে যদি এক মুহূর্তের জনাও সাধারণ চিন্তা নিয়ে ঢুকি, তাহলে মৃত্যু যেন আমার মাথা দু'টুকরো করে দেয়।'

মোহ, স্বার্থ, আর সাধারণ চিন্তা সব বিসর্জন দিয়েই তো ত্রিরত্নের শরণ নিতে হবে। ভগবান বুদ্ধ, ধর্ম, আর ধর্মের সঙ্ঘ—এই তিনটি হচ্ছে বৌদ্ধদের রত্ন। তাদের শরণ নিতে হবে।

অতীশের পবিত্র ধর্মমতের কাছে তখনকার তিব্বতী গুরুদের আন্তরিক নতি স্বীকারের অনেক প্রমাণ ইয়োরোপের পণ্ডিতেরা নথিপত্র খুঁজে, পাথর ও তামার প্রাচীন পটের লেখন উদ্ধার করে পেয়েছেন। নাগচো ছিলেন অতীশের উনিশ বছর যাবৎ সঙ্গী—তাঁর মুখে মুখে বলা বাণীর লিপি বা অতীশের সাক্ষাৎ শিষ্যদের লেখা পুঁথির বাইরেও এরকম অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই মহাপণ্ডিত রিন চেন জান পো-ও তাঁর নিজের লেখা ধর্মগ্রন্থগুলি, এমনকি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থখানি পর্যন্ত, অতীশকে দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে নিয়েছিলেন।

অনেক ধর্মসংস্কারকের অন্ধ গোঁড়ামি থাকে। তার ফলে শুধু দলাদলি হয়, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত লেগে যায়। পৃথিবীময় তার প্রমাণ ছড়ানো আছে।

কিন্তু অতীশ গোঁড়ামির কাছেও ঘেঁষেননি। তিব্বতে অলৌকিক কথা কাহিনি আর প্রেতাত্মার পূজার

চল ছিল। বৌদ্ধ ভৈরবী নিয়ে সাধনা, ঘটা করে বলিদান। মারণ, উচাটন, বশীকরণ, শিলাবৃষ্টি নামিয়ে আনা—এই সবে বিশ্বাস ছিল। ছিল রহস্যময় তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার। সেগুলির মধ্যে থেকে বাহুল্য বর্জন করে সারাংশটুকু তিনি বজ্রযান প্রথার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের মহান্ দর্শন আর নীতিজ্ঞান যা তথাগত বুদ্ধ নিজে প্রচার করেছিলেন, অতীশ তার সবটুকুই তিব্বতে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাই তিনি সংহার না করেও ব্যাপক সংস্কার করতে পেরেছিলেন এবং তিব্বতের মানুষকে ধর্মের স্থায়ী সম্পদ দিতে পেরেছিলেন।

তিব্বত নিষিদ্ধ দেশ বলেই সবাই জানত। আর তার রাজধানী লাসা ছিল রহস্যে ঘেরা এক নগরী। কোনও বিদেশী পথিক, এমনকি রাজপুরুষের জাত বলে এক সময়ে পরিচিত ইয়োরোপীয়রা, বিশেষত ইংরেজরা, তিব্বতে ঢুকতেই পারত না।

এ হেন তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন বাঙালি কেমন করে গিয়েছিলেন, কেমন ভাবে তিব্বতীদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন, সেকথা জানলে আশ্চর্য হতে হয়। শুধু বাংলার কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অসম্ভব, প্রায় অলৌকিক ঘটনা কখনও ঘটেনি।

অতীশ যখন লাসার মন্দিরের মধ্যে প্রথম গিয়েছিলেন, তখন দাড়িওয়ালা একজন লম্বা লোক দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—তাঁর আগমন সার্থক হোক—এই বলে তাঁকে শুভকামনা জানালেন। অতীশ তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি অদৃশ্য—যেন মন্দিরের ভিতরের অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির মধ্যে সে অভ্যর্থনাকারী মিলিয়ে গেলেন!

অতীশ মনের দুঃখে বলে উঠলেন—হায়! অবলোকিতেশ্বরকে পেলাম না।'

তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন—তিব্বতীরা এত সুন্দর মন্দির কিভাবে তৈরি করল। এমন সময়ে এক পাগলিনী সামনে হাজির। জিজ্ঞেস করল—'তুমি কি এই মন্দিরের ইতিহাস জানতে চাও?'

অতীশ মনে মনে বুঝলেন যে, ইনি পাগলিনী নন—আসলে এক যোগিনী। তাই তাঁকে প্রণাম করলেন।

যোগিনী বললেন—'এই মন্দিরের ইতিহাস তুমি এর কলস-স্তম্ভের দশ গজ নিচে পাবে—তবে কাউকে বোলো না যেন।'

সেই জায়গাটি খুঁড়ে ইতিহাস লেখা পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানকার ভাণ্ডারী তাঁকে বললেন—'তুমি এই পুঁথি পড়তে পারো, অনুলিপি করে নিতে পারো, কিন্তু শুধু একদিনের মধ্যে যতটা সম্ভব।'

অতীশের শিষ্য আর সঙ্গী চারজন তাঁর সঙ্গে বসে প্রায় সম্পূর্ণ পুঁথিখানি অনুলিপি করে নিলেন। সেটি এখনও আছে, আর এই কাহিনি লিখে গেছেন তাঁরই জীবনীকার আর শিষ্যসঙ্গী ব্রমটন।

প্রকৃত ধর্মচর্চা এনে দেয় বিনয়। আর সেই বিনয় এবং করুণা দিয়েই বহু মানুষের মন জয় করা যায়। অতীশ দীপঙ্কর এই পথেই সহজভাবে সাধারণ ভাষায় সরল বিবরণে ধর্মের তত্ত্বকথা সাধারণের মনের মধ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

এমনি সহজভাবেই অতীশ এক জায়গায় উপদেশ দিয়েছিলেন—'যতদিন তুমি সংসারের জীবন আর ধনসম্পদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখছ, কখনও বোলো না যে তুমি ভিক্ষু। কারণ সে-সব হচ্ছে সংসারীর জন্য।'

—'তুমি হয়তো আশ্রমে থাক। তবু যতক্ষণ সংসারের পিছুটান থাকবে বা অপরকে সাহায্য করতে না পারবে, কখনও বোলো না যে তুমি মঠে বাস করো, তুমি ভিক্ষু। তুমি এরকম বললে তা সংসারীদের প্রতি মিথ্যা আচরণ হবে। তুমি অন্যকে ঠকাতে চাইলে নিজেই আসলে ঠকবে। ক্ষমা ধর্মের কথা কখনও ভুলো না।'

—'যারা ধর্মপ্রাণ, তাদের তুমি কখনও ঠকাতে পারবে না। গুরু ও দেবতাদের কাছে কী শপথ করেছ তা ভুলো না।'

—'কখনও বোলো না যে এটা বড় শক্ত কাজ, তাই কালকের জন্য তুলে রাখছি। এ হেন দুর্বলতা ধর্মের পথে বাধা। মনে রেখো যে, মৃত্যুর সময়েও তুমি অহঙ্কার করতে পারো না যে, তুমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিজেকে চেনো, নিজেকে জানো। সেটাই কঠিনতম্ ধর্ম আচরণ।'

উপনিষদেও ঠিক এই শিক্ষার কথাই আছে—'আত্মানং বিদ্ধি'। খ্রিস্টধর্মেও বলে 'নো দাইসেল্ফ'।

অতীশ নিজের জীবনে এই সরল বাণীগুলি মেনে চলেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের পবিত্রতা আর প্রচারিত নীতিকথা সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে আসন লাভ করেছিল যে, সেই আচরণ বিধি তিব্বতের

সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে।

একবার এক ভিক্ষুণী তাঁকে একটি দামি উপহার দেয়। প্রতিদানে তিনি উপদেশ দেন—'যারা রুগণ, যারা ক্লান্ত, যারা দুঃখী, তাদের সেবা করো। বৃদ্ধদের এবং পিতামাতাকে সেবা করো। সেটাই প্রকৃত ধর্ম। সেটাই তোমাকে বোধিচিত্ত নিয়ে ধ্যান করার সমান পুণ্য এনে দেবে।'

অতীশের এই বাণীগুলি এই যুগে বারে বারে স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

পশ্চিম তিব্বতের রাজা ও বাংলার রাজা ন্যায়পাল ছিলেন অতীশ দীপঙ্করের বিশেষ ভক্ত। ন্যায়পালকে তিনি 'বিমলরত্ন লেখন' নামে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—'লাভ করো না, লোভ করো না। মৈত্রী আর করুণা তোমার মনে বিরাজ করুক।

রাজা আর জনগণ, সকলের জন্যই ছিল তাঁর একই বাণী। তাই তো তিনি হয়েছিলেন সর্বজনপূজ্য। তাই তিনি সত্যিই অতীশ।

১৩

একবার এক ভক্ত এসে অতীশকে নিবেদন করলেন—'মহাপ্রভু, দারুল-পা নামে একজন লোক গুরু বলে নিজেকে জাহির করছে। বলছে তার অনেক ''অভিজ্ঞান'' আছে। আছে নাকি অনেক অলৌকিক শক্তি। সে নানাভাবে প্রতারণা প্রবঞ্চনা করে বহু লোককে বিভ্রান্ত করছে। আপনি তাকে অনুগ্রহ করে পরাভূত করুন। না হলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের পথে নিদারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।'

অতীশ হেসে বললেন—'মনে হচ্ছে, তাকে পরাভূত করবার জন্য আমায় একটা বেশ বড় বাহিনীই পাঠাতে হবে।'

তারপর তাঁর উপদেশ মতো সেই ভক্তটি নিজের মুখের মধ্যে একটি ছোট মটরদানা রাখলেন, আর সেই দারুল-পা গুরুর কাছে গিয়ে বললেন—'বলুন তো গুরু মহারাজ, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অতীত জন্মগুলির কাহিনি। আর তাঁর ভবিষ্যৎ জন্মগুলির কাহিনি। অর্থাৎ বৌদ্ধজাতক কাহিনি।'

দারুল-পা একটুও দ্বিধা না করে অনেক কাহিনি বলে গেল।

সে-সব কাহিনি প্রমাণ করবার কিংবা মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করবার তো কোনও উপায় নেই। একজন গুরু বলছেন। কুসংস্কারে ভরা দেশের ভক্তরা বিশ্বাস তো করবেই। মারণ উচাটন বশীকরণ এ সব তান্ত্রিক ক্রিয়া ওদের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল যে!

তখন অতীশের সেই ভক্তটি দারুল-পা গুরুকে বললেন—'আচ্ছা গুরুজী, এবার বলুন ত—আমার মুখের মধ্যে কী আছে?'

জন্মজন্মান্তরের খবর পর্যন্ত দৈবশক্তি দিয়ে দিব্যচক্ষে সব যে দেখতে পাচ্ছিল, সে কিন্তু এই সামান্য জড়-জাগতিক মটর দানাটির কথা বলতেই পারল না!

মোট কথা, দারুল-পা গুরু এইভাবে অতি সহজে পরাভূত হয়ে গেল। উপস্থিত সবাই অট্টহাস্য করে সেই প্রতারক গুরুর প্রবঞ্চনামূলক ধর্মপ্রচার অগ্রাহ্য করে দিল।

অতীশ মহাপ্রভুর ধর্মকথার ভিত্তি হচ্ছে—সুনীতি চর্চা, সৎচরিত্র গঠন, আর সাধুকথা পর্যালোচনা। সেগুলি সকলকে সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। এজন্যই ওই মানুষের মনে স্থায়ী আসন পেয়েছিল অতীশের সে-সব কথা। তাঁর প্রচারিত ধর্মপ্রথা এসব কারণেই দ্রুতগতিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা তিব্বতে।

অতীশের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কেও অনেক কাহিনি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। আগেকার কালে যেরকম রটনা খুব সহজ ছিল। যীশুখ্রিস্টের নামেও এরকম অনেক কাহিনি আছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশে মানুষ সব কিছুই বৈজ্ঞানিক আর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই করে নিতে চায়, তবুও সেসব কাহিনি প্রচলিত আছে।

প্রতি যুগেই ধর্মগুরু আর মহাত্মাদের নামে অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনি প্রচলিত হয়ে যায়—যদিও সেগুলি তাঁদের মাহাত্ম্য-মর্যাদাকে স্পর্শ করতে পারে না, কারণ তাঁদের মহত্ত্ব ওই সব কাহিনির ওপর নির্ভর করে না—কারণ তাঁদের প্রেম, করুণার মাধ্যমে মানবসত্তাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে তোলার উপযোগী বাণীর ওপর।

প্রাচীন বাইবেলে আমরা 'টেন কম্যান্ডমেন্ট্স'-এর কথা পড়েছি। প্রকৃত মানুষ হবার জন্য সেই দশটি অনুশাসন। সংসারে ঠিক পথে চলার জন্য প্রচারিত হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের সেই দশটি নীতি—পবিত্র সাধু জীবন যাপনের দশটি নিয়ম।

ঠিক তেমনি দশটি নিয়মবিধি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উপদেশাবলীর মধ্যে আমরা পেয়েছি। ভারতীয় ভাষায় এর নাম চর্যা—তিব্বতী ভাষায় 'পিয়দ-পাই-গ্লু'।

এই দশটি বিধিনিষেধ হচ্ছে—

১) কাউকে মেরো না,

২) চুরি কোরো না,

৩) সমাজে নিন্দিত আচরণ কোরো না,

৪) মিথ্যা কথা বোলো না,

৫) গালাগালি দিয়ো না,

৬) বোকার মতো বাজে কথা বোলো না,

৭) পরনিন্দা কোরো না,

৮) লোভ কোরো না,

৯) অপরের ক্ষতি চিন্তা কোরো না,

১০) অধর্ম চিন্তা কোরো না।

তিব্বতী বইতে এই উপদেশাবলী শুরু হয়েছে আর্য মঞ্জুশ্রীকে প্রণিপাত জানিয়ে। 'কুমারভূত' অর্থাৎ চিরতারুণ্যের মূর্তপ্রতীক এই মঞ্জুশ্রী অর্থাৎ দিব্য বোধিসত্ত্ব। তিনি দেবী সরস্বতীর মতো অনন্তযৌবন, অনন্তপ্রজ্ঞার আধার। তিব্বতে সব শিক্ষার উপাসনার সূচনা হয় তাঁরই বন্দনা দিয়ে। সকল বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতীক তিনি। দেশকাল পাত্র নির্বিশেষে চিরকালের জন্য তাঁর প্রয়োজন। সেইজন্য সব রচনাতেই মঞ্জুশ্রীর বন্দনা দিয়ে শুরু করেছেন অতীশ। আর তিব্বতবাসী সকলেও অতীশকেই মঞ্জুশ্রী বলে অন্তরের মাঝে স্থান দিয়েছে। তাদের ভাষায় তিনি হচ্ছেন 'জোবার্জে পাল-দন অতীশ'—মহামান্য পরম মহান্ অতীশ। তিব্বতী কথ্যভাষায় 'অতীশ' শব্দটিকে বলা হয় 'অতিশা'।

এছাড়া অতীশ বন্দনা করেছেন বজ্রাসনের। বুদ্ধের একটি নাম বজ্রাসন। তাছাড়া বজ্রাসন হচ্ছে গয়া—বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতম স্থান। সেখানেই অতীশ শিক্ষালাভ করেছেন এবং শিক্ষাদানও করেছেন।

'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' গ্রন্থে অতীশ লিখেছেন—'প্রথমে চিত্তকে জাগাও' আর বোধিসত্ত্বকে স্মরণ করো। ধর্মের সূত্রগুলি পাঠ করো, শাস্ত্রের সুবচন শোন। তোমার ব্রতের পবিত্রতা রক্ষা করো কায় বাক আর চিত্ত দিয়ে। তাদের কলুষিত হতে দিয়ো না। নিজের আচার ব্যবহার পবিত্র রাখ আর পরিমাণে বেশি খেয়ো না।'

খুব সহজ ভাষায় তিনি যা করতে বলেছেন, তার মধ্যে কোনও দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা নেই—নেই সন্দেহ বা ভুল বোঝবার সম্ভাবনা।

আর মন স্থির করে পূজা করা? সে বড় কঠিন কাজ।

তারও সরল ব্যবস্থা অতীশ দিয়েছেন।—

—'রাতের প্রথম ও শেষভাগে ঘুমিয়ো না। যোগাসন অভ্যাস করো। অসৎ চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দাও। মনকে ভালো চিন্তায় পূর্ণ করে রাখ। সেই মনঃসংযোগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যোগসাধনা।'

—'রাতের শেষভাগে ঘুম ভেঙে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নাও। সহজ হয়ে বসে ধর্মচিন্তা করো। বাজে চিন্তা বা কল্পনা মনে এলে ধ্যান ছেড়ে উঠে পড়ো আর ওই সব কিছুই যে মায়া, তা মনে করতে থাক। সেই সময়ে পূজা করো, প্রার্থনা করো, আর 'সপ্তাঙ্গ অর্চনা' করো। অর্থাৎ সর্বদেহ পূজায় নিবেদন করো। তারপর আবার ধ্যান শুরু করে দেখ।'

ভালো হবার ভালো থাকবার কত সহজ উপায়! সকল দেশে সকল যুগেই আমরা সবাই অনায়াসে এই অভ্যাসগুলি শুরু করে দেখতে পারি।

অথচ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী চূড়ামণি ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিব্বতে পদার্পণের তিন বছরের মধ্যেই তিনি 'বোধিপথ প্রদীপ' রচনা করেন। তাতে আছে মাত্র ৬৬টি শ্লোক। তার মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মচিন্তা আর আচার-প্রথার পরিপূর্ণ চিত্র রয়েছে। তাঁর ধর্মপ্রচারক জীবনের সার বিশ্বাস-নীতি বিধৃত আছে ওই গ্রন্থটিতে

এবং তার প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মজীবনে হয়েছে খুবই ব্যাপক।

বৌদ্ধধর্মের একটি উন্নত মতবাদ 'মহাযান' পন্থার শিক্ষানীতি মেনে নিয়ে তিনি সর্বজনীন বিশ্বজনীন মুক্তির উপাসক ছিলেন। বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় যাকে বলা হয় 'সর্বজনীন মানবতা'—তারই প্রথম প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত তিনিই। অতীশকে আমরা বলতে চাই প্রথম বাঙালি ইউনিভার্সাল ম্যান।

দার্শনিক হিসাবে অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের 'মাধ্যমিক' পন্থার পণ্ডিত ছিলেন এবং 'শূন্যবাদ' অর্থাৎ নাস্তিকতা প্রচার করেছিলেন। এই শূন্যবাদ অর্থাৎ মহাশূন্য থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে, এটা বাঙালি কবি ও সাধুসন্তদেরই মতবাদ ছিল এবং অতীশ যে বাঙালি ছিলেন, এটি তারই একটি পরোক্ষ প্রমাণ।

তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন—'ছোটবড় সব প্রাণীর সঙ্গে ''মৈত্রী চিত্ত'' নিয়ে সম্বন্ধ করো। সব দুঃখীজনের দিকে তাকাও, তাদের দুঃখ দুরবস্থার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করো। শুধু নিজে তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভের জন্য, আলোকপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়ো না। সংসারে পরের দুঃখ দূর করবার জন্য ব্রত নাও।'

এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দেরও এই বাণী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে?'

একটু আগে অতীশের যে শূন্যবাদের কথা বলেছি, তা হল এই যে, প্রকৃতির মধ্যে যা স্বভাবত বিরাজ করে আছে, তাকে তো তৈরি করতে হয়নি, সুতরাং সবই সৃষ্টি হয়েছে মহাশূন্য থেকে। আর যার অস্তিত্ব নেই, তার কথা চিন্তা করার দরকারও নেই।

তাছাড়া অতীশ বলতেন, 'এই পৃথিবীর সবই মায়াময়। জীবনের শেষে নির্বাণ এসে সেই মায়াময় বিভ্রান্তিকর পৃথিবী থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। শাস্ত্র পাঠ করে. যুক্তিতর্ক দিয়ে চিন্তা করে বুঝে নাও যে, ধ্যানই হচ্ছে মুক্তির এবং নির্বাণের একমাত্র পথ।'

অতীশ বুঝেছিলেন—এ রকম গভীর দর্শন আর তত্ত্বকথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না। তাই তিনি নৈতিক সাধুজীবনের অর্থাৎ 'উপায়'-এর) প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। 'উপায়' ছাড়া 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ পাণ্ডিত্য যেমন অর্থহীন, তেমনই 'প্রজ্ঞা' ছাড়া 'উপায়'-ও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ছয়টি 'পারমিতা' অর্থাৎ বিশেষ গুণ মানুষের মধ্যে চর্চা করতে বলেছিলেন। সেগুলি হল—দান, শীল (নৈতিক জীবন), ক্ষমা, বীর্য, ধ্যান আর প্রজ্ঞা। প্রথম পাঁচটি হচ্ছে 'উপায়' অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা পাণ্ডিত্যকে প্রতিদিনের জীবনে সফল করে তোলার পথে সেগুলির চর্চা একান্ত প্রয়োজন।

অতীশের ধর্মসংস্কারের ফলে 'কদম্-পা' নামে একটি পরিচ্ছন্ন ধর্মপ্রথা প্রবর্তিত হতে পেরেছিল। নোংরামিতে ভরা তান্ত্রিকতাকে এক নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দেওয়া যায়নি। কিন্তু অতীশ অতি সযত্নে অধম মধ্যম আর উত্তম, তিন ধরনের মানুষের জন্যই শান্তি, উন্নতি আর মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত এই 'কদম্-পা' ধর্মপ্রথাই আরও পরিমার্জিত হয়ে পরে 'গেলুগ্-পা' প্রথায় পরিণত হয়েছিল। বহু ব্যাপক হয়েছিল সেই ধর্মপ্রথার প্রভাব। অতীশের 'বোধিপথ প্রদীপ' গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু ছিল এই ধর্মপ্রথার ব্যাখ্যা।

একসময়ে পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা উপদেশে সর্বসাধারণের জন্য সম্রাট অশোক—' দেবনাম্ পিয় পিয়দশি অশোক'—বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্যের বিজয় হয়ে থাকে ধর্মের মধ্য দিয়ে—সেই বিজয় ইহলোক আর পরলোক দুটিতেই কার্যকর। এই দুই লোকে ফলদায়ী সেই আনন্দই আমার সকল সন্তানের আনন্দ হোক।'

অতীশ দীপঙ্কর সেই আনন্দেই তিব্বত বিজয় করেছিলেন।

১৪

পৃথিবীতে কখনও কোনও দেশেই ধর্মের পথ সহজ ছিল না।

খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ইতিহাসও আমরা জানি। যীশু কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তা কেউ কোনদিন ভুলবে না। তাঁর শিষ্যরাও কিভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তা মনে করলেও শিউরে উঠতে হয়।

মনে পড়ে সেই চিরকালের প্রশ্ন : মানুষ কোথায় চলেছে? কোন্ পথে? ...ল্যাটিন ভাষায় সেই বিখ্যাত দুটি কথা : কো ভাদিস্?

সেই তুলনায় ভারতবর্ষে কোনও নতুন ধর্মমত প্রচার অথবা সংস্কার হয়েছে অনেক ভালোভাবে

অহিংস পথেই। তার জন্য নির্যাতন বা রক্তপাত অনেক কম হয়েছে। সম্ভবত সেটা দেশের গুণ। এদেশের মানুষের মহত্ত্ব। আর নতুন পথের পথিকৃৎ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শুভ বিচারবুদ্ধি।

তিব্বতের সঙ্গে আর্যভূমির (ভারতবর্ষের), বিশেষ করে বঙ্গালের (বৃহৎ অর্থে বহুদূর বিস্তৃত বাংলা অঞ্চলের) সম্বন্ধ এত গভীর ছিল যে, এদেশের এই মহৎ গুণগুলি হিমবন্ত (তিব্বত) দেশের মধ্যেও আমরা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত দেখতে পাই।

আর অতীশের তিব্বতে ধর্মপ্রচারের মধ্যেই আছে তার পূর্ণ পরিচয়।

তান্ত্রিক আর পণ্ডিতের দল তাঁকে বারে বার ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে কত রকম ভাবে প্রশ্ন করেছে। তর্কযুদ্ধ হয়েছে কত বার। কিন্তু খুন খারাপি হয়নি কখনও।

বিশেষ করে তান্ত্রিক আচার-বিধিগুলির গোঁড়া সমর্থকরা তো অনেক কিছুই হাঙ্গামা করতে পারত। কিন্তু পারেনি কারণ অতীশ নিজে সকল ধর্মাচারের মূলে বিনয় আর ব্রহ্মচর্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সারা জীবনে ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি বারে বার বলেছেন—'প্রকৃত বৌদ্ধের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার নীতিবোধ আর চরিত্র মাধুর্যে। তার ধ্যানে আর কল্যাণব্রতে।'

ছ'জন তিব্বতী তান্ত্রিক-প্রধান একবার তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে তাঁর মতামতের জন্য। তর্কযুদ্ধ শুরু হলে কোথায় যে তাঁরা শেষ করতেন, তার ঠিক নেই। তিনি নিজের লেখা 'বোধিপথপ্রদীপ' গ্রন্থখানি তাঁদের পড়তে দিলেন। বললেন—'রাজা বোধিপ্রভ নিজে এই সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার সব উত্তর এই গ্রন্থেই আছে।'

ছোট্ট সেই গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে মন চলে যায় অন্যদিকে—শান্তির দিকে, ধ্যানের দিকে। সাংসারিক ক্ষুদ্র কলহাদি আর ক্ষমতার জন্য হিংসাদ্বন্দ্বের অনেক ওপরে।

ওইসব পণ্ডিতেরা তন্ত্রমন্ত্র সাধনার ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। অতীশের কাছে নতুন কথা আর সহজ পথের সন্ধান পেয়ে তাঁরা চিন্তার নতুন আলোর নিশানা পেলেন।

অতীশ তাঁদের বলেছিলেন—'তন্ত্রসাধনার মূল তত্ত্বটুকুর প্রথম পাঠ হচ্ছে নৈতিকচরিত্র গঠন আর প্রকৃত গুরুর কাছে শিক্ষা।' তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, তান্ত্রিক-অভিলাষী সব পাপ আর কুচিন্তার ওপরে উঠতে পেরেছে, তখনই শিষ্যকে সিদ্ধিলাভে উপযুক্ত মনে করবেন।

সেই স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হলে কোনও শিষ্য কখনোই বলিদান, ব্যভিচার, শত্রুনিপাতের জন্য মাটিতে মন্ত্র পুঁতে রাখা, ঝড়বৃষ্টির আবাহন করা—এসব সামান্য আর গর্হিত কাজ করতে চাইবেই না।

কোন্ শিষ্য এমন উচ্চস্তরে উঠতে চাইবে না? এমনই উচ্চ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে কেমন সহজ অথচ পরোক্ষভাবে অতীশ সে-দেশে তান্ত্রিক সাধনার গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিলেন।

সৎকর্মের সুফলের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সেজন্য শিষ্যেরা তাঁকে 'কর্মপণ্ডিত' বলে অভিহিত করেছিল। ধর্মগুরু অতীশ তাতেই সন্তুষ্ট। বললেন—'এই নামটুকুও অনেক কল্যাণের কারণ হবে।'

একটি বিরোধীদলের নেত্রী তাঁকে বিব্রত করে তোলার জন্য দলে দলে রাস্তার ছেলে-ছোকরাকে তাঁর পিছনে লাগালেন। তারা কয়েকটা নোংরা কবিতা গাইতে গাইতে অতীশকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করত। একজন তাঁর কাছে এসে চেঁচাতে লাগল—'এই পণ্ডিতটা কিছুই জানে না। এর চেলা লোচবেরা কোনও কিছুই ঠিকমতো তিব্বতীতে অনুবাদ করে না। এঁর ধর্মপ্রচারের সময়ও নেই, আর রাজারও নেই বুদ্ধি।'

আর একজন কবি কবিতা লিখল যে, অতীশ তিব্বতে আসার পর থেকে দেশে যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা হচ্ছে ধর্ম নয়—রোগ। দেশের প্রত্যেকটি উপত্যকা আর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

অতীশ কিন্তু এসবে ভ্রূক্ষেপও করেননি। শুধু তিনি বলেছিলেন—'এসব নোংরা নালিশ থেকে হাজার যোজন দূরে থাক। এসব গ্রাহ্য কোরো না।'

একবার তাঁকে অপদস্থ করার জন্য কয়েকজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেছিল—'আপনি পরজন্মে কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন বলুন তো?'

তিনি হেসে বললেন—'যেখানেই হোক, তোমাদের দেশে নয়।'

—'কেন?'

—'কেন? তোমরা যদি ধর্মের উপদেশ মানতে না চাও, ভগবানকে শ্রদ্ধাভরে পূজা করতে না পারো,

তোমাদের মধ্যে জন্মিয়ে কী লাভ হবে?'

কত সহজ সরলভাবে তিনি তাদের উপদেশ আর শিক্ষা দিয়েছিলেন।

পশুপক্ষীদের প্রতিও অতীশের অসামান্য মমতা ছিল। তিব্বতে আসার পথে তিনি অসহায় তিনটি কুকুরছানা পেয়েছিলেন। তাদের তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বাছুর ছাগল সব রকম প্রাণীই তাঁর যত্ন পেত। তাদের সঙ্গে কথা বলতেন আদর করে জড়িয়ে ধরে। তাঁর এক শিষ্য এর প্রতিবাদ করে জিজ্ঞাসা করেছিল—'আপনি এমন করেন কেন? আমাদের জমিদার-সামন্তেরা তো এরকম করেন না। তাঁরা এসব পছন্দও করেন না।'

অতীশ উত্তর দিয়েছিলেন—'আমি প্রাণীদের সবচেয়ে ভালোবাসি। তোমাদের সামন্তদের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। যারা অবলা জীব, তাদের প্রতিই তো বেশি করুণা, বেশি মৈত্রী দরকার।'

আমরাও তো বাংলা কবিতায় পড়েছি—'জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাধারারও সেটি হচ্ছে সারকথা।

একবার চারজন পণ্ডিত তাঁর কাছে এসে মহাযান মতবাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি জানতে চাইলেন। খানিকক্ষণ ধ্যান করবার পর অতীশ বললেন—'অনেকরকম সিদ্ধান্ত আছে, তবে সেগুলির আসল সারমর্মটুকু জানলেই চলবে।'

পণ্ডিতেরা তখন জানতে চাইলেন—'আসল সিদ্ধান্ত কি? আর অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিই-বা সহজে সংক্ষেপে কি করে জানা যাবে?'

অতীশ দীপঙ্কর তখন বলেছিলেন—'আসল হচ্ছে করুণা। সব প্রাণীদের জন্যই করুণার প্রয়োজন। তাদের দিতে হবে সীমাহীন করুণা। বোধিচিত্তই শুধু দিতে পারে সেই করুণা।'

তথাগত বুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—এঁরাও সেই করুণার বাণীই প্রচার করে গিয়েছেন।

পশ্চিম তিব্বতের রাজা বোধিপ্রভু তিব্বতের জনগণের পক্ষ থেকে অতীশকে এক শ' 'পাল' সোনা আর মূল্যবান মণিরত্নখচিত সোনার সপ্তরত্ন প্রণামী দিয়েছিলেন। অতীশের উদ্দেশে তিনি স্তোত্র রচনা করে বলেছিলেন—'যারা আপনার বাণী শুনেছে, আপনাকে স্পর্শ করেছে, প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা না করে পারেনি। ইহজগতে আপনার সঙ্গে তুলনা করার মতো কেহই নেই।'

সেই অতুলনীয় অতীশের পদপ্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া সব সম্পদ, এমনকি তাঁর নিজের উপাস্য মূর্তিগুলিও সবই তিনি তিব্বতে অনেক চৈত্য আর মঠ স্থাপনের জন্য, ধর্মপ্রচার আর সৎ জীবনযাত্রার জন্য দান করে গিয়েছিলেন।

১৫

খুবই তাজ্জব কথা যে, বাঙালি জাতি এতদিন এক মহান্ বাঙালি শ্রীঅতীশ দীপঙ্করের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই যে তাঁর সম্পর্কে এত ঘটনা, আর রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য কাহিনি, এগুলি আমরা কোথায় পেলাম? আমাদের দেশের কোনও লেখাতেই তো পুরনো কালে এসব পাইনি।

ছেলেবেলা থেকেই আমরা শুনেছি যে তিব্বত হল ডাকিনী যোগিনী জাদুবিদ্যার দেশ—জোরদার তন্ত্রমন্ত্রের লীলাভূমি। ওদের দেশের বরফ আর লামাদের কথাই বইতে পড়েছি। তবে অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে এত খবর কোথায় পেলাম?

এখন জেনেছি যে, ওদের দেশেই বাঙালি লেখকের রচিত 'চর্যাগীতি' পাওয়া গেছে—তিব্বতী ভাষায় যার নাম 'পিয়দ-পাই-গ্লু'।

আশ্চর্য, এই 'চর্যা' নামের গীতিকবিতাগুলিই বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পুরনো নমুনা! কিন্তু আমরা সে-কথা বছর ষাট-সত্তর আগে জানতামই। না। বাঙালি নিজের ভাষার সেই ইতিহাসই জানত না।

আরও আশ্চর্য, এই প্রাচীন বাংলার নমুনা আমাদের নিজেদের দেশে কোথাও পাওয়া যায়নি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে গিয়ে সেখানকার রাজদরবারের প্রাচীন গ্রন্থাগারে এই 'চর্যাগীতি' পুঁথি খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেক যত্ন করে তাঁর খুঁজে পাওয়া পুঁথিটির ভাষা বাংলা কিনা, তা বুঝতে চেষ্টা করেন। দীর্ঘকাল ধরে পাঠোদ্ধার করে তিনি হাজার বছরের পুরনো সেই

'চর্যাগীতি' অর্থাৎ বাংলা বৌদ্ধ গান ও দোহা সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। ফরাসি পণ্ডিত কর্দিয়ে এই পুঁথিতে তিব্বতী ভাষা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য নির্ণয় করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাজে সহযোগিতাই করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় অতীশের আরও দু'খানি বাংলা রচনার সন্ধানও পেয়েছিলেন। সেগুলি হল—'বজ্রবীর সাধন' ও 'বলবিধি'। দুটিতেই অতীশ যে বাঙালি, তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তা ছাড়াও অতীশের অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসন বজ্রগীতি', একটির নাম 'চর্যাগীতি', আরেকটি 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা'। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্তনের মতো। গানের নাম চর্যাপদ। বাঙালিদের কীর্তনের গানকে পদ বলা হত, তখন তারই পরিচয় ছিল চর্যাপদ। তখনকার দিনে আমাদের দেশে সাধারণ লোক ও মেয়েরা যে ধরনের ছড়া কাটিত, অনেকটা সেই ধরনে এই গানগুলি সরল ভাষায় রচিত হয়েছিল।

খুবই দুঃখের কথা এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, অতীশের মূল রচনা আমরা এখনও পাইনি। আরও বেশি আশ্চর্য কথা হচ্ছে যে, চীনের রাজধানী বেজিং-এর লাইব্রেরিতে পাওয়া তিব্বতী ত্রিপিটকে এগুলি পাওয়া গেছে। মূল বাংলা পেলাম না, পেলাম অনুবাদ। কিন্তু ভাবে, ভাবনায় প্রকাশভঙ্গিতে সেগুলি বাঙালিরই সৃষ্টি। আমাদের কাছে তার নিদর্শন এসে পৌঁছল দূর দুর্গম বিদেশ থেকে।

আরও আশ্চর্যের কথা আছে।

ভারতবর্ষে তো আমরা অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানতাম না। পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে 'অতীশের ভিটা' নামে ছোট্ট একটা ঢিবি ছাড়া আর কিছুই তার নামের বা কাজের বা ধর্মের পরিচয় বহন করছে না। এমন কি যে বিক্রমশিলা বিহারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর বিশেষ লীলাক্ষেত্র ছিল, তা যে ঠিক কোথায়, তাও কেউ জানে না। সেটা গঙ্গার পারে মুঙ্গেরের কাছেই কোথাও ছিল, শুধু এইটুকুই জানা গেছে। আর তাঁর প্রধান শিক্ষাদানের স্থান বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) তো তুর্কি আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এ যাবৎ আমরা অতীশ দীপঙ্করের যেসব কাহিনি কথা পেয়েছি, সেগুলির মূল আকর হচ্ছে তিব্বতী রচনা। মঙ্গোলীয় ভাষায় তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা পাওয়া গেছে, সেগুলিও তিব্বতীভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর রচনার বাংলা মূল যদিও পাওয়া যায়নি, তবে কোনও কোনও রচনার মূল সংস্কৃত পাওয়া গেছে বা গড়ে নেওয়া গেছে।

প্রধানত ভারতীয় রচনার তিব্বতী অনুবাদগুলি আমরা পাই একটি বিরাট সাহিত্য সংগ্রহে। তার নাম হল 'তাঞ্জুর'। অতীশের চরণে নিবেদিত কিছু কিছু স্তোত্র ও প্রার্থনা তিব্বতী ভাষায় ওই সাহিত্য সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া গেছে।

দীর্ঘ তেরো বছর ধরে দুর্গম তিব্বতে অতীশ যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছিল। আর সেই জায়গাগুলি পবিত্র পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

বাহাত্তর বছর বয়সে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে অতীশ 'তুষিত' লোকে অর্থাৎ পবিত্র পরলোকধাম স্বর্গে চলে গেলেন। অতীশের দেহরক্ষার পরে ফাগসোর্‌পো অর্থাৎ কল্যাণমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর জীবনকাহিনি লিখতে চান। মহাপ্রভু দীপঙ্করের উনিশ বছরের যে সঙ্গী লোচব, নাম তাঁর নাগচো, তখনও জীবিত ছিলেন। তিন বছর তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাছে শুনে শুনে এই ভিক্ষু অতীশের জীবনী রচনা করেন। সে আজকের কথা নয়। তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থখানি রচনা সম্পূর্ণ হয় ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে।

'তাঞ্জুর' সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থটি চৌদ্দ শতকে আবার শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছিল। তাতেই অতীশ দীপঙ্করের রচনাগুলি প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারও পরে বৌদ্ধধর্মে মহাজ্ঞানী একজন তিব্বতী পণ্ডিত বুস্‌টন রিন-পো-চে (১২৯০-১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ) 'ভারতবর্ষ ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। রুশীয় পণ্ডিত রোরিখ প্রভৃতি অনেক তিব্বত-বিশেষজ্ঞ সেই গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ প্রামাণিক এবং মূল্যবান ইতিহাস বলে মেনে নিয়েছেন।

তারও কয়েক বছর পরে গস্‌ নামে একজন লোচব অর্থাৎ তিব্বতী পণ্ডিত (১৩৯২-১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ) 'নীল আখ্যান' নামে আরও একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

এর চার শ' বছর পরে অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি সুম্পা নামে এক তিব্বতী ঐতিহাসিক 'ইচ্ছাপূরণ তরু' নামে আরও একখানি গ্রন্থ লেখেন।

প্রথম বাঙালি তিব্বত অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাস ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই সব বই, বিশেষ করে শেষেরটির

ওপর নির্ভর করে আমাদের সামনে এই মহান্ বাঙালির ইতিহাস তুলে ধরলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি দলাই লামার কাছে আবেদন করেন এবং সেই নিষিদ্ধ দেশে ১৮৭৯ সালে প্রথম তিনি যান। ১৮৮১ সালে তাসি লামা তাঁকে আবার তিব্বতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

একটা অজানা দেশের রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশে এমন সুদীর্ঘ কালব্যাপী তীর্থযাত্রার কাহিনি আর কখনও ইতিহাসে দেখা যায়নি।

সুদূর জার্মানির বার্লিন শহরবাসী জার্মান পণ্ডিত কপ্পেন প্রথম তিব্বতের বাইরের একজন বিদেশী, যিনি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে লামা ধর্মপ্রথা ও তিব্বতী মঠ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইতে অতীশের অসামান্য গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে লেখেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র দাসের লেখা অতীশের জীবনী প্রকাশের আগে অতীশ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ বিশেষ কোনও নজর দেয়নি।

ফ্রাংক নামে আরও একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিক তিব্বতের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত তাঁর লেখা গ্রন্থটিতেও অতীশের জীবনের প্রামাণিক ঘটনাগুলি গ্রথিত করেছেন। অস্টিন ওয়াডেল নামেও একজন ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক বিভিন্ন মূল তিব্বতী গ্রন্থ থেকে অতীশের জীবনী যাচাই করে নিয়ে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

অতীশের রচনার সংখ্যা আর সেগুলির ধর্মবিষয়ক মূল্য ছিল বিপুল। সেগুলি অবলম্বন করেই উননব্বই জন ভারতীয় আচার্য তিব্বতে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় তিন পণ্ডিত ও প্রচারক ছিলেন শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব ও কমলশীল। তান্ত্রিক সাধনা আর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য পদ্মসম্ভব সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। লামা তন্ত্রের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চা তিনিই চালু করেছিলেন। কিন্তু ধর্মনীতি ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল বৌদ্ধপ্রথার জন্য অতীশকেই দেবতার মতো সর্বত্র পূজা করা হয়।

লামারা অবশ্য বোধিসত্ত্বদের মধ্যে মঞ্জুশ্রীকেই সবার ওপরে আসন দেন। ব্রহ্মচর্যের, সৎ চরিত্রের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের মূর্ত প্রতীকরূপে সকলে তাঁর পূজা করে থাকেন। প্রকৃত পবিত্র ধর্মের বিধানে তিনিই শিরোমণি এবং তাঁরই অবতাররূপে তিব্বত অতীশকে বরণ করেছিল। মহাযানী বৌদ্ধেরাও মঞ্জুশ্রীকে ধর্মের স্বর্গীয় রক্ষক বলে মনে করে। তিব্বত, চীন, নেপাল ও ভারতেও এই মঞ্জুশ্রীর অবতাররূপেই অতীশ দীপঙ্কর পূজিত হয়ে থাকেন।

ভারতের নাম সব শেষে দিলাম, কারণ নিজের দেশেই তাঁর নাম লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতী বই পড়ে প্রথম তাঁর কথা জানতে পারেন এবং তিনি দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে অতীশের এই মহান্ কাহিনি জানান।

অতীশের সাক্ষাৎ শিষ্য ব্রমটন এই বলে স্তোত্র রচনা করেছিলেন : 'আপনার মতো মহাপণ্ডিত ছাড়াও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু লোকে তার গভীর তাৎপর্য বুঝতে পারত না। আপনিই তাদের সঠিক শিক্ষাদান করতে পেরেছেন। আপনার চরণে আমি প্রণিপাত করি।'

১৬

অতীশ দীপঙ্কর কি সত্যিই বাঙালি ছিলেন?

এই প্রশ্ন শুনে হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খেতে হয়। অতীশ নাকি বাঙালি ছিলেন না।

তিব্বত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ একজন বাঙালি পণ্ডিত বাংলার একটি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় সত্যিই লিখেছেন যে, তিনি 'আর্যভূমির পূর্বাঞ্চলে সম্ভবত সাহোরে' জন্মেছিলেন। আরেকজন বিখ্যাত পণ্ডিত বিহারের রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেন যে, তাঁর জন্মস্থান ছিল ভাগলপুর। 'বৌদ্ধধর্মের ২৫০০ বছর' নামে গ্রন্থটিতে তিনি লিখেছেন যে, প্রামাণিক তিব্বতী গ্রন্থগুলি পড়লে কোনও সন্দেহ থাকে না যে, অতীশ ভাগলপুরে জন্মেছিলেন ।...কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি কী আর কোথায় পেলেন, তা কিছু লেখেননি।

আরও দু'একজন বিদেশী পণ্ডিতও মনে করেছেন যে, অতীশের জন্ম উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে, বিশেষ করে 'উদ্যান' নামে একটি জায়গাতে, অথবা 'মণ্ডি' নামে অন্য একটি জায়গাতে।

এদিকে আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি যে, অতীশ বাঙালি ছিলেন। সেকথা আমরা ছেলেবেলায় স্বদেশী গানে গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছি—হিমালয় লঙ্ঘন করে বাঙালির ছেলে তিব্বতে

গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারে।

প্রথম বাঙালি বিশ্বমানব ছিলেন অতীশ। সেই তিনি নাকি আসলে বাঙালি নন!

ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার।

হায়, বাঙালি বুঝি কোনদিন ইতিহাস লেখেনি। বৃষ্টির জলে, নদীর বানে, ভেসে যাওয়া দেশে এমনিতেই কোনও তাম্রশাসন বা পাথরে লেখা লিপি পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া আমরা কখনও নিজেদের ইতিহাস খুঁজে খুঁজে কষ্ট করে বের করবার জন্য পরিশ্রম করিনি।

এমনকি, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে 'অতীশের ভিটা' নামে পরিচিত যে মাটির ঢিবি রয়েছে, সেটা পর্যন্ত খুঁড়ে তার নিচে কোনও প্রমাণ মেলে কিনা, তাও দেখবার চেষ্টা এখনও হয়নি। বাঙালিদের মধ্যে প্রাচীন মহত্তম এক মহামানব সম্বন্ধে সেখানকার লোকমুখের কথাটুকু ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

অতীশ বাঙালি ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে তথ্য খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই দেখব তাঁর সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রশিষ্য, তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধমতের প্রতিষ্ঠাতা ব্রমটন কী বলেছেন। তিনি যা লিখেছিলেন, তা হল এই—

'আমি তাঁর চরণে প্রণিপাত করি
আর্যদেশে যাঁর নাম দীপঙ্কর
হিমবন্ত দেশে যাঁর নাম শ্রীমৎ অতীশ।'

এই আর্যদেশ যে ভারতবর্ষ, তা সকলেই জানে। কিন্তু অতীশের জন্ম তার কোন্ অংশে?

অতীশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'বোধিপথ প্রদীপ'-এর যে টীকা ব্রমটন নিজে করেছিলেন, তার অনুলিপি পাওয়া গেছে আরও দূরের দেশে অর্থাৎ চীনে। তাতে প্রথমেই লেখা আছে রচনাকারীর নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তার পর লেখা আছে—'বর্তমান যুগে বঙ্গাল দেশে জন্ম নিয়েছেন ভগবান বুদ্ধের অবতার।' ...'গ্রন্থখানি অনুবাদ করে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন ভারতীয় মহাপতি গুরু বোধিসত্ত্ব বঙ্গালী শ্রীদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপাদ আর লোচব ভিক্ষু জয়শীল।'

এই জয়শীল ছিলেন তিব্বতের তরুণ পণ্ডিত নাগচো। রাজার দূত হয়ে তিনি অতীশকে তিন বছর ধরে সাধ্য সাধনা করে স্বদেশে নিয়ে যেতে রাজি করান। উনিশ বছর ধরে তিনি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁর গুরু যখন বঙ্গালী, তখন দেখা দরকার বঙ্গাল কোথায় ছিল।

'বঙ্গাল' বলতে মোগলরা যাকে বলত 'সুবে বাংলা' বা ইংরেজরা বলত 'বেংগল', শুধু সেটুকু ধরে নিলে চলবে না। আর শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলা দেশের মধ্যে তাকে ধরে রাখাও ঠিক হবে না। ইতিহাসের খেলায় বাংলার সীমানা তো বারে বার বদলিয়ে গিয়েছে। যে বস্তু ঠিক রয়ে গেছে, বদলায় নি, প্রাণের জোয়ারে জীবন্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা হচ্ছে বাঙালির সংস্কৃতি।

তিব্বত সেটাই লক্ষ্য করেছে আর বাঙালি বলতে কাকে ধরা হয়, তা বুঝতে ভুল করেনি। একটা উদাহরণ ধরা যাক। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে চীনের সম্রাট হুয়াং তেরোটি সোনার পাতে একখানি চিঠি লিখে তরুণ দলাই লামাকে ধর্মশিক্ষা দেবার আদেশ দেন। পাঞ্চেন লামার আদেশ মেনে ভুটানের রাজা তখন কোচবিহারের বন্দী রাজাকে মুক্তি দেন এবং কোচ রাজা 'বঙ্গাল দেশের অধিপতি' ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি আবেদন পাঠান। শেষ পর্যন্ত পাঞ্চেন লামার অনুরোধে বঙ্গালের অধিপতি ভুটানের ভূখণ্ড ছেড়ে দেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তিব্বত ও চীনের চোখে বঙ্গাল বলতে যা বোঝাত, তার মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলা দেশ নিশ্চয়ই ছিল। তবে তর্ক উঠতে পারে যে, বিহার বা ভাগলপুরও আগে বাংলা দেশের মধ্যে পড়ত।

এরপর তাহলে ভাগলপুরের কথায় আসা যাক। গ্রন্থকার পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্বীকার করেন যে, রাজপুত্র (পরবর্তীকালে অতীশ) যখন অবধূত জেতারির কাছে উপদেশ নিতে যান, তখন জেতারি তাঁকে বলেন—'তোমায় প্রথমেই ভুলতে হবে যে, তুমি রাজার ছেলে, সেই অহঙ্কার ছাড়তে হবে। না হলে শিক্ষা হয় না, ধর্মশিক্ষা তো হয়ই না। কাজেই, তোমাকে পিতৃরাজ্য আর রাজধানী ছেড়ে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।'

সেই হিসাবে, বিহারের ভাগলপুর অতীশের জন্মস্থান হলে সেখান থেকে বিহারের নালন্দা অর্থাৎ অতীশের শিক্ষালয় এমন কিছু দূর ছিল না। কিন্তু অতীশের প্রকৃত জন্মস্থান বাংলার বিক্রমপুর থেকে বিহারের

নালন্দা সত্যিই ছিল বহু বহু দূরের জায়গা।

তিব্বতী ইতিহাস অনুসারে অতীশ ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়রাজবংশে বঙ্গের বিক্রমণিপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গুরুর গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়তো তিব্বতী ইতিহাসে তাঁর পিতার রাজ্য আর ঐশ্বর্যের কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে, বজ্রাসন অর্থাৎ বুদ্ধগয়া এবং নালন্দার পূর্বদিকে বহু দূরে অর্থাৎ বঙ্গদেশের বিক্রমপুরেই রাজার পুত্র হয়ে অতীশের জন্মগ্রহণের কথা তিব্বতী গ্রন্থগুলি পুরোপুরি সমর্থন করে।

এই সিদ্ধান্ত তিব্বতবিদ্ ওয়াডেল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম বা লামাধর্ম' নামে বইখানিতে সমর্থন করেছেন এবং বাঙালি তিব্বতবিদ্ শরৎচন্দ্র দাসের অভিমত সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। মূল আবিষ্কারের গৌরব অবশ্য শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়েরই, আর ওয়াডেল সাহেব লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র দাসের অভিমতটি মূল তিব্বতী পুঁথিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে তিনি সঠিক বলেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়। প্রায় একশ বছর আগে লেখা তাঁর ওই বইটিতে শরৎচন্দ্রের কাছে নিজের ঋণ খোলা মনে স্বীকার করে গেছেন।

দশ বছর পরে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ডের অভিযানের সঙ্গে তিনি আবার তিব্বতে যান। ততদিনে তিব্বতের ভাষা, ধর্ম আর ঐতিহ্যের সঙ্গে ওয়াডেলের আরও গভীর পরিচয় হয়েছে। তিনি আবার যাচাই করে লিখেছেন যে, তাঁর আগের কোনও সিদ্ধান্তই বর্জন করবার কোনও কারণ খুঁজে পাননি, অর্থাৎ তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত যে, অতীশের জন্মস্থান বঙ্গ দেশের বিক্রমপুরেই।

তার মানে এই যে, অতীশের জন্মস্থানের ব্যাপারে শরৎচন্দ্র দাস যে অতীশ জীবনী ১৮৯৩ সালে 'জারনাল অব বুদ্ধিস্টিক সোসাইটি' নামে এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, তার সমর্থন পাচ্ছি বিদেশী নিরপেক্ষ পণ্ডিতের কাছে।

বাংলা ১৩৪৮ সনে 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় ডক্টর শহিদুল্লা লিখেছিলেন যে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে ভুসুকু নামে এক শিষ্যের উল্লেখ করেন একজন তিব্বতীয় লামা তারানাথ। ওই ভুসুকুর জীবৎকাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ। খুব সম্ভবত ইনিই চর্যাপদে উল্লিখিত ভুসুকু। তিনি ছিলেন এই বঙ্গাল দেশেরই একজন প্রাচীন কবি—যেমন, তাঁর গুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশও ছিলেন এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য।

ইয়োরোপ আমেরিকার পণ্ডিতেরা শুধুমাত্র বাইরের বা ইতিহাসে পাওয়া প্রমাণের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেন না। বিষয়বস্তুর ভিতর থেকে পরোক্ষ প্রমাণ দিয়েও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যাচাই করে নিয়ে থাকেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন যে, তিব্বত রাজগ্রন্থাগারের যে গ্রন্থ-তালিকা বা 'তেঙ্গুর' প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায়, চর্যাপদে উল্লিখিত লুই নামে ব্যক্তিটিও বাংলারই লোক। তিনি লিখেছেন—'লুই-এর জীবৎকাল ঠিক করিতে হইলে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার একখানি গ্রন্থে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থখানির নাম "অভিসময় বিভঙ্গ"। একই দেশের লোক এবং একই ভাষাভাষী না হলে এই সাহায্য সহজ বা সম্ভবও হয়তো হত না।

অতীশ যে বাঙালি ছিলেন তার একটি সম্পূর্ণ নতুন তিব্বতী প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি তিব্বতের মহাপণ্ডিত নাগোয়াং নিমা গবেষণা করে খুঁজে পেয়েছেন এবং অতীশের জীবনের বহু তথ্যসামগ্রী তিনি তিব্বতী প্রাচীন গ্রন্থগুলি থেকে উদ্ধার করেছেন। মূলগ্রন্থগুলির নামও তিনি দিয়েছেন। তাছাড়া অতীশ সম্বন্ধে যে সব জনশ্রুতি বা কাহিনি এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে, সেগুলিও তিনি বিবেচনা করে দেখেছেন।

গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতী অধ্যাপক লামা চিম্পা সংশোধন করে যাচাই করে নিয়েছেন। কাজেই, এই নতুন নিরপেক্ষ প্রমাণকে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট বলে কেউ বাতিল করে দিতে পারবে না।

গ্রন্থখানিতে লেখা আছে যে, গৌড়ের (বঙ্গালের) কল্যাণশ্রী নামে একজন প্রবল শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন কুবেরের মতো ধনী। তাঁর প্রাসাদকে বলা হত 'ন শ' নিরানব্বইটি স্বর্ণপতাকার প্রাসাদ—কারণ প্রাসাদের শীর্ষদেশে শোভা পেত সেই সুবর্ণমণ্ডিত নিশানগুলি।

সেই রাজা কল্যাণশ্রীর প্রধান রানী শ্রীমতী প্রভাবতীর তিনটি ছেলে—দীপঙ্কর ছিলেন দ্বিতীয় ছেলে, নাম চন্দ্রগর্ভ। প্রাসাদের উপর তলায় যখন তাঁর জন্ম হয়, তখন সংগীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। রাজা এবং

রানী আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, সদ্যোজাত শিশুটির সামনে একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল যেন কোথা থেকে এসে পড়ল, আর শিশুটির সুন্দর মুখখানি দেখাচ্ছিল ঠিক তারাদেবীর মতো! সেজন্যই তারাদেবী ছিলেন দীপঙ্করের সারাজীবনের উপাস্য দেবী আর জন্মজন্মান্তর ধরে তাঁর কৃপা দীপঙ্কর পেয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব এবং যীশুখ্রিস্ট যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়েও এমন অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল বলে কাহিনি প্রচলিত আছে। এসব তো আর যুক্তিতর্ক বা বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে যাচাই করে নেওয়া যায় না। এগুলিকে মহাপুরুষদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের সময়ে মায়ের বা ভক্তদের বিশেষ অনুভব বলে ধ'রে নিতে পারা যায়। প্রত্যেক যুগেই, এমনকি এই শতকেও এই ধরনের কাহিনি তৈরি হয়ে থাকে। আর অনেক লোকই সে-সব বিশ্বাস করতে ভালোবাসে।

অতীশের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে জড়িয়ে আছে সমসাময়িক বাঙালি ধর্মপ্রচারকদের শূন্যবাদ। বাঙালি কবি আর সাধুসন্তরাই এই শূন্যবাদ প্রচার করতেন। অতীশ নিজে যে বাঙালি ছিলেন তার একটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হল এই শূন্যবাদ চর্চা—যা ছিল বাঙালিদেরই ভাবধারার পরিচায়ক।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিত কর্দিয়ে চর্যাগীতিগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা সংকলন করেছিলেন। তার মধ্যে অতীশের চর্যাগীতির নাম থাকলেও সেই গীতির পাঠ আমরা পাইনি। আর আমরা নিজেদের দেশে তো কিছুই পাইনি। যা কিছু তথ্যসামগ্রী, পুরনো পুঁথি সবই আসলে অথবা অনুবাদে পাওয়া গেছে নেপালে, তিব্বতে, চীনে, এমনকি মঙ্গোলিয়ায়। কিন্তু তিব্বতের রাজদরবারের গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকায় অর্থাৎ 'তাঞ্জুর'এ আছে 'অতীশ চর্যাসংগ্রহ-প্রদীপ'। চর্যা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বাংলা গীতি কবিতা। অতীশ যে সময়ে জন্মেছিলেন সেই সময়ে ওই চর্যাগীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল।

আরও প্রমাণ হচ্ছে তাঁর রচিত বহু সংকীর্তনের পদ, তাঁর রচিত 'বজ্রাসন গীতি' 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা', 'বলবীর সাধন' এবং 'বলবিধি' গ্রন্থগুলি। কিন্তু সেই সব গ্রন্থের মূল বাংলা রচনা এখনও পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে শুধু দূরদূরান্তর দেশের ভাষার অনুবাদে। কিন্তু সংকীর্তন যে বাঙালির প্রাণের ধন, তার কী কোনও প্রমাণের দরকার আছে?

সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে মুখের ভাষা, মায়ের কোলে যে-ভাষা শেখা হয়, সেই ভাষা। অতীশের রচনা তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলিয়ান ভাষায় আমরা পেতে পারি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখের ভাষার চেয়ে, বড় প্রমাণ কী হতে পারে? তাঁর উনিশ বছরের সঙ্গী পণ্ডিত নাগচো যেভাবে মুখে মুখে অতীশের জীবনী বলে গিয়েছিলেন এবং এক তিব্বতী ভিক্ষু তাই শুনে প্রথম যে অতীশ জীবনী লিখেছিলেন, তাতে অতীশের একটি উক্তি আছে—'অতি ভালো, অতি ভালো হয়, অতি মঙ্গল'। এই ধরনের বাণীর মধ্যে দিয়ে অতীশ মনের ভাব বা আনন্দ প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে 'মঙ্গল' কথাটি না হয় সংস্কৃতমূলক; অবাঙালিরাও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু 'ভালো' যে একেবারে বাঙালির মুখের কথা। অতীশ নিজে উচ্চারণ না করলে সে কথা তাঁর সঙ্গীরা বা জীবনীকার নিজে থেকে জানতে পারতেন না।

শেষ কথা এই যে, নাগচো-বর্ণিত অতীশ-জীবনীতে এবং তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 'সুম্পাত' গ্রন্থে যে বিক্রমপুর (বিক্রমশিলা নয়) অতীশের জন্মস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক এবং আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পুরোপুরি মিলেছে। ওয়াডেল, যাস্কে, কর্দিয়ে আর তিব্বত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অনেক বিদেশী নিরপেক্ষ পণ্ডিতেরাও সেই সব প্রমাণ সমর্থন করেছেন।

এখানে সব শেষে কিন্তু পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার করতে হবে আমাদের ঋণ একজন বাঙালির কাছে। তাঁর নাম আমরা এখন প্রায় ভুলেই গেছি।

অতীশ দীপঙ্করের জীবৎকালের প্রায় ন শ'বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে এক শ' বছর আগে তিব্বতকে নতুন করে আবিষ্কার করেন সেই বাঙালি শরৎচন্দ্র দাস। সে যুগে তিব্বতে ঢোকা সম্পূর্ণ বারণ ছিল। তিব্বত কোনও বিদেশীকে সে দেশে ঢুকতে অনুমতি দিত না। শরৎচন্দ্র দাস সাধারণ বাঙালি হয়ে সামান্য চাকুরি করেও কেবল অন্তরের টানে আর জ্ঞানসংগ্রহের প্রেরণায় ওই দুর্গম অজ্ঞাত দেশে যাওয়ার অনুমতি চান এবং ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাশি লামার আমন্ত্রণে সে দেশে যান। এই যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল তাঁর নিজেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

অন্যদিকে ব্রিটিশরাজকে তিব্বত খুব সন্দেহের চোখে দেখত। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে অনেক দাপটের সঙ্গে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড যে অভিযান তিব্বতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার

মধ্যেকার দু-জন ইংরেজ সে-দেশ সম্বন্ধে অনেক কুৎসাই লিখে গিয়েছেন।

সেই বিরুদ্ধ পরিবেশেও বাঙালি অভিযাত্রী পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস রহস্যময় লাসার বর্ণনা আর তিব্বতের যে প্রকৃত পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা তখনকার সাম্রাজ্যবাদী বিলেতেও সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ইংলন্ডের 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি' পত্রিকা আর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন সংবাদপত্র 'লন্ডন টাইম্‌স্' উচ্ছ্বসিতভাবে সে সম্বন্ধে প্রশংসামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল।

'টাইম্‌স্' লিখেছিল—'অতি সামান্য কয়েকজন বাঙালি পণ্ডিত আছেন, যাঁরা ইয়োরোপের বিদেশ আবিষ্কারকদের চেয়েও অনেক বেশি গুণবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁরা বিনয়নম্র মধুর ব্যবহার দিয়ে বিরোধ আর সন্দেহকে জয় করতে পারেন। তাঁদের কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আর দৃঢ় কর্তব্যবোধ সব বাধাকে জয় করতে পারে, যা আমাদের (অর্থাৎ ইয়োরোপীয়দের) মধ্যে নেই। শরৎচন্দ্র দাসকে বৌদ্ধ পণ্ডিত আর রাজকর্মচারীরা সবাই খুশি মনে সাহায্য—সহযোগিতা করেছেন। স্বয়ং দলাই লামা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বৌদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য পূজা পেয়েছেন তিনি।

শরৎচন্দ্র দাস সম্পর্কে এত কথা লেখার দরকার আছে শুধু তাঁর কীর্তি এ যুগে স্মরণ করবার জন্য নয়—অতীশ দীপঙ্কর যে বাঙালি এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত যে সঠিক আর অনেক মৌলিক গবেষণার ফলেই সেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, তা বোঝাবার জন্য।

বাঙালি তার নিজের এমন বিজয়গৌরব ভুলে থাকলে মনে হয়, সে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। এসব কাহিনি পড়লে প্রত্যেক বাঙালির মনে সেই হারানো আত্মবিশ্বাস যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

প্রথম ধরেছে কলি

উৎসর্গ

অতি পরিচিতের মধ্যেও অপরূপের সন্ধানী
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুহৃদ্বরেষু—

কবি পরিচিতি

বৃহত্তর বঙ্গের সুদূর উত্তর-পশ্চিম দিক্‌দেশে সমুদিত একজন নূতন কবিকে আজ আমরা বঙ্গ-সরস্বতীর কাব্যকুঞ্জে স্বাগত অভিবাদন জানাইতেছি। নবাগতের নাম, ঠিক কবি হিসাবে না হইলেও, ইতিপূর্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ হইতে রাজশেখর বসু পর্যন্ত যথাকালে তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত 'ইয়োরোপা' গ্রন্থের শুভ অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

ইহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যপুস্তক। ইহাতে ৭০টি লিরিক কবিতা সমাবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কবিতায় ভাব ও সুরের ঐশ্বর্য, ভাষা ও ছন্দের বৈচিত্র্য এবং রসানুভূতির বিশিষ্ট পরিচয় আছে। অবহিত চিত্তে পাঠ করিলে চিন্তার গভীরতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যাত্রারম্ভের নবীন উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও ধ্যান-গম্ভীর সংযমের নিঃসন্দেহ সন্ধান মিলে। কবির কাব্যসাধনা যে সার্থক হইয়া উঠিবে ইহা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের এত অল্পকাল মধ্যে কাব্যসৃষ্টির মৌলিক সফলতা যে কোনও কবির পক্ষে অসাধ্য না হইলেও অতিশয় দুঃসাধ্য। তাই আশার ও মৌলিক সৃষ্টি কুশলতার আলোক দেখিতে পাইলেই আমরা আনন্দিত হইয়া উঠি এবং সেই কবিকে শুভ সম্মান জানাইবার যে স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মে তাহা তাঁহার কবিধর্মের একাগ্রতা ও তপস্যানিষ্ঠার প্রতি নিবেদনেরই স্বরূপ।

এ যুগে অনেক নূতন কবির রচনায় কষ্ট কল্পনা ও কৃত্রিমতা দোষের আধিক্য দেখিয়া যেমন দুঃখ ও নৈরাশ্য জাগিয়া উঠে, বর্তমান কবির রচনায় সেইরূপ স্বচ্ছ আন্তরিকতা দেখিয়া আমরা সেই পরিমাণে উল্লসিত হইয়া উঠি এবং সেই কারণেই আমরা তাঁহাকে দ্বিগুণতর উৎসাহে বরণ করিয়া লইতে চাই। কারণ জানি আন্তরিকতাই কবি-প্রাণের সত্যকার পরিচয় এবং কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মত সেই প্রকৃতিগত পরিচয় যে কবি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, বাণীকুঞ্জে তাঁহার অকুণ্ঠিত প্রবেশাধিকার আছে।

কবিতাগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত বা আদর্শগত প্রণয়ধর্মী, কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট প্রেমের কবিতার সুলভ রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্নগোত্রীয়। মাত্র দুঃখবিলাসে নয়, সুষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম। অহেতুক উচ্ছ্বাসে নয়, উদারতা ও সংযমে ইহাদের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রেমের পরিস্ফুট রূপমূর্তিটি বহিঃপ্রকৃতির আভরণ পরিহার করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিতে আবরণ লাভ করিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যই আমাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছে।

গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা সমালোচনা-সাহিত্যের অঙ্গীভূত। এই ক্ষুদ্র রচনা কবি-পরিচিতি মাত্র।

'ইলাবাস'
বালিগঞ্জ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবধারা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা যে স্বভাবত ঘটিতেছে তাহা নহে। বর্তমান যুগের কবিরা তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিবার জন্য ও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়াই সে প্রভাব এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং বর্তমান ইয়োরোপীয় কবিগণের ধারা অনুকরণ করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের কবি এই ক্রমোপচীয়মান সাময়িক অনুকৃতির ধারা অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু ক্রমবিলীয়মান রবীন্দ্র প্রভাবকে এড়াইবার সচেতন চেষ্টা না করিয়া চিরন্তনী কাব্যধারা অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগের নবোদ্ভিন্ন কবিগণ নরনারীর প্রেমরাগকে যে antiromantic দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এই কবিতাগুলি সেই দৃষ্টিতে দেখার ফল নয়। পক্ষান্তবে প্রেমেব sensuous দৃষ্টিভঙ্গি আমরা কালিদাস, বৈষ্ণব কবিগণ এবং কীট্স, টেনিসন, বায়রন প্রভৃতি বিদেশী কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করি তাহাও ইহাতে নাই। ব্রাউনিং শেলী, রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে প্রেমরাগকে উপভোগ কবিয়াছেন এবং উপভোগেব আনন্দকে বাণীরূপ দিয়াছেন এই কবির মধ্যেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাই। তাঁহাব প্রেমেব উৎস কবিচিত্তের subjectivity—object বা প্রেমের পাত্র আশ্রয়, আলম্বন বা উপলক্ষ্য মাত্র। কবি আত্মহৃদয় বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তদ্গত হইয়া উপভোগ করিয়াছেন এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ দিযাছেন।

কবির প্রেমাবেগ সর্বত্র সংযত, শুচি, অপ্রমত্ত, অনুদ্ধত ও প্রশান্ত। কোথাও উদ্বেলতা, উচ্ছলতা বা আবিলতা নাই, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রমত্ত উৎক্রোশ, কুরব-কুরবীব আর্তনাদ বা ডাহুক-ডাহুকীর বক্ষবিদারী কণ্ঠরব নাই। কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় যেন নিদাঘ মধ্যাহ্নে গৃহবলভির সুখনীড়ে সদ্যোজাগরিত কপোত-কপোতীর স্বত উৎসারিত কলকূজন শুনিতেছি। ইহাতে মিলনের মাদকতাও নাই, বিরহের হাহাকারও নাই। ইংবেজিতে যাহাকে বলে intellectulisation of emotion, কবিব তাহাই বৈশিষ্ট্য।

কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্যে ও গঠনসৌষ্ঠবে ববীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীব কবিতার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ছন্দে বচিত। ভাবের উপযোগী করিয়া ছন্দোনির্বাচনেব নিপুণতা ও ছন্দের সহিত ভাবের বাজযোটক রসজ্ঞ পাঠকেব দৃষ্টি এডাইবে না।

এই প্রাগল্ভ নির্লজ্জ অমিতভাষণের যুগেও ভাবপ্রকাশ ও রসসৃষ্টির পক্ষে যতগুলি শব্দ অপরিহার্য কেবল সেই শব্দগুলিকেই কবি ছন্দে রূপায়িত করিয়াছেন। শব্দের পল্লবজালে কোথাও ভাবের কুসুম সমাচ্ছন্ন হয় নাই।

পাঠকের বসবোধের প্রতি কবিব শ্রদ্ধা আছে। তাই তিনি এক পংক্তি বসঘন উক্তির তিন চাব পংক্তি ব্যাখ্যা দিয়া কবিতাব আয়তনকে আয়ততব করিয়া তুলেন নাই।

প্রেমেব গীতিকবিতায় প্রকৃতির স্থান আছে—কিন্তু তাহা গৌণ। কবি তাই প্রকৃতির নিজস্ব জীবন্ত সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিয়া তাহাকে রসাবেষ্টনীর অঙ্গীভূত অথবা উদ্দীপন বিভাগেব আশ্রয় স্বরূপ কবিয়া তুলিয়াছেন।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজের সাগ্রহ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কবির ইহাই কিন্তু প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাই কুণ্ঠা সহকারে তিনি প্রথম কবিতার নামকরণ করিয়াছেন 'কবি আমি নই'। এ কুণ্ঠার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হইলেও প্রথম গ্রন্থ নয়। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত 'ইয়োরোপা' তাঁহার প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচায়িত করিয়াছেন তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয়পত্রের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

আমি তাই আমার এই ভূমিকাটিকে পরিচায়িকা না বলিয়া সংবর্ধনা বলিতে চাই। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের পক্ষ হইতে এই কনীয়ান্ সতীর্থটিকে পরম সমাদরে বাংলার কাব্যতীর্থে আমরা বরণ করিয়া লইতেছি। ইতি—

শ্রীকালিদাস রায়

'সন্ধ্যার কুলায়'
টালিগঞ্জ

কৈফিয়ত

এই কবিতাগুলি প্রথম দু সংস্করণে 'প্রেমরাগ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে নতুন রূপায়ণের সঙ্গে বদলিয়েছে তাদের নামায়ন।

এমনি কত ফুল
বেদনা ভয় ভুল
গোপনে ঝরিয়া গেছে বনে;
এমনি কত গীত
জাগায়ে এ নিশীথ
মুরছি' মুছিয়া মরে মনে।

সে বনে তুমি এলে
পরশ তব পেলে
বিকশি' উঠিত সুখে তারা;
তোমারি হিয়াকোণে
এ গান দিন গোণে,
ধ্বনিবে তোমার পেলে সাড়া

কবি আমি নই

তোমার দু'হাতে ধরি, ভুলো মোরে, করো মোরে ক্ষমা
ভুলো আমি কবি,
বিস্মৃতির শূন্য গর্ভে হোক্ লুপ্ত স্মৃতি নিরুপমা,
মুছে যাক্ সবি;
বর্ষার পূর্ণিমা রাতে জেনো আমি কবি নই শুধু
তোমার হৃদয়-পাত্রে আসি নাই ঢেলে দিতে মধু,
নাহি সাধ পুষ্পমাল্যে, এত দিন সঞ্চিত অমিয়ে
ছন্দ-মগ্ন হিয়ে।

ভুলো, যদি কোনো দিন আনন্দের সুধা প্রস্রবণে
ঢালিয়া হৃদয়ে,
করে থাকি চিত্ত জয়, চুপি-চুপি তোমার শ্রবণে
উৎকণ্ঠিত হয়ে
কয়ে থাকি কোনো কথা, যদি কভু বিবশ অধীরে
তোমারে জাগায়ে থাকি কল্লোলিত বেদনার তীরে
—উন্মোচি হৃদয় তব কুণ্ঠামৌন লাজত্রস্ত ক্ষণে
কবির লিখনে।

জীবনের কোনো দিন অনন্তর ক্ষণেক আভাস
পারিবে না কবি
আঁকিয়া দেখাতে তোমা বৃথা খুলি বাহিরের বাস—
অসম্পূর্ণ ছবি;
যে কথা ব্যথায় ভরি কহিয়াছি—অলস সঞ্চয়,
আনন্দ যা সে তো শুধু কল্পনার দীন পরিচয়,
একান্ত যা আপনার রহিল তা গভীর গোপনে
নিশান্ত স্বপনে।

তাই আমি কিছু নহি, নহি স্রষ্টা, প্রকাশের দূত,
কবি আমি নই;
প্রয়াস করিনু কত রচিতে যা সুন্দর অদ্ভুত,
কোথা ছন্দ-ময়ী!
ভুলে যাও কে বা কবি, কে সাজায় অপরূপ ডালা,
মুগ্ধ মনে বসিল কে পূজাপীঠে, মন্দারের মালা
ধন্য হ'ল কার গলে, খুঁজিয়ো না তোমার কবিরে
বহুজন-ভিড়ে।

হেথা ক্ষুদ্র গৃহকোণে নাই সভা, নাই কোলাহল,
উৎসুক নয়ন
বাহিরে ঘুরিয়া ফিরে, অশ্রু চিন্তা বেদনা বিফল;
কুসুম চয়ন
করিতে হবে না হেথা প্রয়োজনে আদেশে মাগিয়া,

তোমার রজনীগন্ধা বিকশিবে আমারি লাগিয়া,
বিসারি লোচন মন নেহারিব প্রেমমুগ্ধ ছবি;
নহি আমি কবি!

অসম্পূর্ণ কবিতার অসমাপ্ত ভূষণ-শিঞ্জনে
ডুবায় কথারে,
প্রাণ যাহা দিতে চায় ব্যর্থকাম হৃদয় রঞ্জনে
এ নীরবতারে
নাই বা ভাঙিনু ভুলে তাই দিয়ে; যাক্ যাক্ দূরে,
পারি না যে সাধ তোর মিটাইতে কবিতা মধুরে,
তুমি শুধু তৃপ্ত রও ফুটাইয়া প্রেম পদ্মরাগ—
সেই সত্য থাক্।

প্রেমরাগ

আমার উদয়-শৈলে প্রেমরাগ সদা ঝলমল,
হে প্রফুল্ল বিকচ কমল.
সংসারের যে সায়রে উচ্ছলিত বারি রাশি 'পরে
স্বপনে দোদুল দোল তরঙ্গিত হিন্দোলের ভরে
তাহাতে পড়ুক আসি নবোদিত আমার কিরণ
যদি ভালো লাগে তব বর তারে খুলি আবরণ
হিয়া মাঝে স্বপ্নসমারোহে
প্রেমাবিষ্ট মোহে।

নিত্য মায়ামহোৎসব তব তরে মর্মের জগতে,
এ ধরার কণ্টকিত পথে
কল্যাণ কামনা সনে পাতি দিব প্রেম-আস্তরণ—
সেই পথে যাবে তুমি, পুষ্প 'পরে পড়িবে চরণ,
আস যদি সেথা তুমি কল্পনার কত আলিম্পনে
কত রূপে সাজাইয়া হেরি তোমা মুগ্ধ তৃপ্ত মনে;
এ জীবনে তব প্রিয় সুর
বাজে সুমধুর।

আমার বরষা নভে পরিপূর্ণ দশ দিশ ঝাঁপে,
বেণুবন থর থর কাঁপে,
মুছে গেছে সারা বিশ্ব, কোথা দিক কোথা পথ নাহি,
একান্ত নীরবে তরী দুঃখস্রোত-মাঝে চলে বাহি,
বিপুল জীবন-নদে কোথা পাব, কোথা আলো-শিখা!
সহসা সরাই আমি অন্ধকার মেঘ-যবনিকা—
রবি-রশ্মি ঝলকিয়া ঝরে
তব মুখ 'পরে।

আমার নির্মেঘ নভে বিসারিয়া সচঞ্চল পাখা
দলে দলে চলিছে বলাকা,
নির্জন বালুর 'পরে শ্বেত শুচি কাশ-কুন্দ-রাশি
অম্লান অশোক মুখে জানাইছে তোমা শুভ হাসি,
যে বনান্তে শ্যামলিমা পত্র পুষ্পে সুশোভন হারে,
যে ক্ষেত্রেতে স্বর্ণ-শস্য মুঠি মুঠি লক্ষ্মীর সম্ভারে,
সেথা শোভে তব জ্যোতিরেখা
শুভ্র অভ্র-লেখা।

আমর বসন্ত দিল কত নব প্রিয় পুষ্পহার,
পরাণের শ্রেষ্ঠ উপচার—
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, ফুটে কলি, জাগে পূর্ণশশী,
ঘেরি তব মূর্তিখানি মূরছিয়া রহে মধু নিশি,
পুষ্প 'পরে হাসে পুষ্প, তৃণ 'পরে নব তৃণদল,
অনন্ত যৌবন রঙ্গে নাচি চলে পরাণ চঞ্চল;
তুমি শুধু থেকো হাসিমুখে
অনন্ত কৌতুকে।

সন্ধ্যাস্বপ্ন

হায়
আসিল বিদায়,
উৎসবের আয়োজন-মাঝে
মোহিনী সোহিনী তাই সহসাই বাজে,
বেলা শেষ হয়ে আসে. মুছে যায় প্রান্তরের ছায়া
নয়নে স্বপন রচি বিছাইয়া নবতর মায়া,
দিন চলে যেতে চায়, বেদনার ধ্বনি
ছল ছল জল-মাঝে শুনি;
শেষ সব কাজ
আজ।
তাই
কথা কার পাই
শুনিতে অন্তর-মাঝে; মন
কার সম্ভাষণ তরে হয়েছে উন্মন,
কার ব্যগ্র আলিম্পন অনন্ত আকাশ মথি আসে
কার মৌন ব্যাকুলতা উতলা মাতাল বায়ু-শ্বাসে,
অধীর অথির হ'ল পরাণ চঞ্চল
উচ্ছ্বসিল কম্প্র বনতল;
পাইনু সহসা
ভাষা।

এই
ম্লান দিবসেই
ভুলাইয়া স্বপন আমার
অস্তরাগে ভরে গেল অন্তর আমার,
বসন্তের ঝরা ফুল পরাগ ছড়ানো পথ বেয়ে
পরিপূর্ণ হরষের রসে ভরা পাত্র তরে চেয়ে
বিফলে জাগিছে আশা; তারি তরে সুখ,
আশাহীন অবসন্ন বুক,
বিফল বেদনা?
না, না!

দিনে
শুধু তারে বিনে
মুছে গেল পৃথিবীর আশা,
ধরাতলে ভেঙে পড়ে কল্পনার বাসা,
সোনার কমল ফুটি অপ্রকাশে কোথা হয় হারা,
বিজন আঁধার-কোণে তরুশাখা মিছে দুলে সারা,
রূপের মন্দিরতলে নাহি রূপলেশ,
ক্ষণপ্রভা ছলনার বেশ;
স্বপ্ন-সহচরি,
মরি!

মধু
আলোকের শীধু
উদ্বেলিত দিবাসিন্ধু-তটে
হাসির হেমাভা ছোঁয়া দিগন্তের পটে.
সুখসুপ্তি তরে ম্লান ঘনাল আঁধার সাঁঝ শেষে;
ধীরে জাগে শুকতারা, আধফোটা পুষ্পকলি হাসে,
আনন্দের অলক্তক কল্পনার ডালি
সবি আছে প্রেমদীপ জ্বালি;
আর নাই, তাই
যাই।
গানে
গেছ অস্ত পানে,
অচল শিখরে তব তরে
স্বপ্ন-মৌন সুধা রহিবে অনন্ত ভরে;
আমি যাব ভুল পথে, সেতা কাঁটা বিঁধিবে চরণে,
মোরে হেরি পাণ্ডু শশী নভতলে বরিবে মরণে।
হে মানসী, কল্যাণ কামনাখানি রাখি
চলে যাবে কোন্ পথে পাখি—
তারে বেস ভালো;
আলো!

স্বপ্নরাত্রি

বহু যুগ পরে
ফিরিলাম স্বপ্ন পরে প্রেয়সীর ঘরে
বিহ্বল আবেশে সুখে যেথা শুক্লা রাতি
মাধবীর তৃপ্ত হাসি রাখিয়াছে পাতি
নির্মল শয্যার 'পরে; সুষুপ্তা যামিনী
তার মাঝে সুপ্তা মোর স্থির সৌদামিনী;
বহু বর্ষশেষে
হেরিনু বধূরে পুন পরম নিমেষে।

এ মুহূর্তটিরে
চঞ্চল জীবন-মাঝে শ্রেষ্ঠ সাধে ঘিরে
কেমন অক্ষয় রাখি পরিবর্তনের
স্রোত হতে দূরে? মোর প্রথম ক্ষণের
ব্যাকুল হৃদয়-বার্তা মধুরে গুঞ্জরি'
অনুরাগে হর্ষে লাজে দিব তারে ভরি'
শুধু দুটি কথা,
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি নীরবতা।

সেই তো মোদের
চঞ্চলের মাঝে তবু অনন্ত বোধের
পরিণত ক্ষণটুকু আশাভরা হিয়া,
গীতচ্ছন্দে মধুগন্ধে হাতে হাত দিয়া
নীরবে বসিয়া থাকা গভীর রাত্রিতে,
পাশাপাশি দুটি প্রাণ থাকিবে ধ্বনিতে—
নিদ্রা অবসানে
বধূ মোর সাড়া দিবে অনন্তের কানে।

হয়তো সাধ্বসে
সন্তর্পণে স্পর্শ রাখি খেয়ালের বশে
সহসা চলিয়া যাব অর্ধ জাগরণে
নিমীলিত শুকতারা উন্মীলন ক্ষণে;
স্পন্দিত শ্রীঅঙ্গখানি সুধীরে বিথারি
কমল পল্লব সম রাহিবে নেহারি
মোর পথটিরে,
রবে মোর স্পর্শরস পুলকেতে ঘিরে।

জীবনে নিবিড়
অনুভবরাশি হেথা করিয়াছে ভিড়,
জাগিছে নীরব রাত্রি, অতন্দ্র আকাশ,
তিলোত্তম এতটুকু পূর্ণের প্রকাশ
টলমল করে যেন নয়নের নীর—
নাহি স্পর্শি তারে মোর পরম রাত্রির
রাখিনু সম্মান,
শুধু মোর দৃষ্টিটুকু দিয়ে গেনু দান।

কৈশোর ব্যাকুলতা

আপনারে আপনার মাঝে
পারি না যে রাখিতে ধরিয়া,
ভিতরে আছাড়ি খালি বাজে
বক্ষতলে বাসনায় হিয়া।

পারি না যে ক্ষণেকের তরে
বুঝিতে কেন যে প্রাণে এত
অজানা ব্যাকুল আশা মরে
কারে ঘেরি মোহে অবিরত।

জানি না কি লাগি মৌন রাতে
কাঁপে তারা চাহিয়া আমারে,
কি লাগি আসিছে আঁখিপাতে
ঘুমঘোর আবেশে আঁধারে।

ইচ্ছা হয় আপনারে নিয়া
তরঙ্গিত স্বপ্ন নদীনীরে
কার হাতে দিই বিলাইয়া,
আশাগুঞ্জে কারে সাধে ঘিরে।

বিদায় কৈশোর

বিদায় কৈশোর।
এতদিনে আজি মুগ্ধ ভোর
উষার নয়ন হ'তে নীলিমার স্বপ্ন সনে টুটে
গিয়াছে চলিয়া; ওই আজ ছুটে
নিষ্ঠুর অরুণ আলো চোখে খালি বাজে
কাজে ও অকাজে।
জাগিছে জীবনদীপ্তি, জাগিছে প্রভাত,
তাই অকস্মাৎ
রূঢ় আলো কি পথ দেখায়;
কৈশোর বিদায়।

দুঃমহ আবেগ-ভরা প্রাণ
গাহে গান,
ডুবে শুকতারা;
দিকে দিকে শয্যা নিদ্রাহারা
উঠে জেগে; সুদূরের রবি
আনে বাণী যৌবনের—প্রভাতী ভৈরবী
আকুল করিয়া তুলে;

জীবনের এই সিন্ধুকূলে
তরঙ্গ আছাড়ি' কাঁদে উদাসীন বেলাভূমি 'পরে
হৃদয় শিহরে;
কাল ছুটে অনিমেষ অনিরুদ্ধ গতি
নাহি মানে কার লাভ কার কিবা ক্ষতি
নাহি জ্ঞান ওর,
বিদায় কৈশোর।

আজিকার প্রভাতী সভায়
তোমার সে মুগ্ধ গান শ্রোতা নাহি পায়,
ফিরে শুধু অনাদরে দূরে
সুরে বা বেসুরে।
কিশোরী প্রিয়ার স্বপ্ন শেষ চিরতরে;
যদি তারে এ জীবন ধ'রে
ফিরে চাই শুনিবে না কানে,
মর্ম্মরের মাঝে তীব্র হতাশ্বাস আনে,
চাহিয়া বিফলে
কি কাজ ভিজিয়া ব্যথা মৌনতার জলে?
মালা গেছে, আছে তার ডোর,
বিদায় কৈশোর।

কে পারে ফিরাতে
পূর্ণিমার লব্ধ পূর্ণ রাতে!
যত ডাকি, যত কাঁদি আকুল ব্যথায়—
কি লাভ, সে ফিরিবে না, মুখের কথায়
ফিবে না যে নিষ্ঠুর নিয়তি
এই তার গতি।
কালিকার হেমন্তিকা রাতি
নিবায়েছে বাতি—

কালি শুক্লা অগ্রহাণী নিশা
সুখের আশায় ডুবা, আনন্দেতে মিশা
পরশিয়া কিশোরী বঁধুকে
মরেছে মধুরে;
সে রাত্রির মুহূর্তেক হ'তে
পারিবে না শত যত্নে তুমি কোনো মতে
রাখিতে অক্ষয় করি
এ জীবন ভরি
একটিও বেদনার কাঁটা; শুধু সে
বিস্মৃত প্রদোষে
বুকেতে বাজিবে বড় সারাক্ষণ ভোর
বিদায় কৈশোর।

কাল
অচেনা রাখাল
বাজায়ে গিয়াছে মোর তরুতলে বসি,—
মন-মাঝে পশি
গেছে সে রাখিয়া
আনন্দ-বেদনা-ভরা অভিমানী হিয়া
তারে ধরি কহায়ো না কথা
মুগ্ধ আকুলতা
কুঞ্জে কুঞ্জে মরুক ফিরিয়া;
না হলে সরিয়া
যাবে যে সে রহস্যমধুর
চির লজ্জাকুণ্ঠ চির প্রিয় মধু সুর

ভাবিয়ো না তার কথা নিদ্রাহীন প্রেম বেদনায়
হেথা শুধু সুররেশে বিষাদ ঘনায়;
আমাদের মলিন ধরণী,—
স্বপ্নের সরণি
রূঢ়ভাবে হেথা ভাঙে, হয় নিশি ভোর—
বিদায় কৈশোর।

নাই, নাই,
কারে তুমি ডাকিছ সদাই?
সে যে তব দু দিনের লাগি
রয়েছিল জাগি—
আজ তাই গেল চলে, বসন্ত বাতাস
পিছনে রাখিয়া গেল যৌবন আকাশ;
কল্পনার মায়া গুঞ্জরণে
কোনো শান্ত ক্ষণে
দিয়ে যাবে নব স্বাদ তোমার ও হিয়ে,
অলক্ষ্যের দ্বারপথ দিয়ে
আসিবে আবার,
বিস্মৃতির মর্মে বসি ডাকি বারবার
গাবে গাথা সুখস্বপনের
বপনের
নবীন জীবন আশা নব পুষ্পকোর;
বিদায় কৈশোর।

বসন্ত উচ্ছ্বাস

আজিকে বসন্ত-রাতে স্মরি' তোমা, মোর প্রাণপ্রিয়া,
এসেছি আবার,
ফাল্গুনে মঞ্জুল কুঞ্জে নিভৃত বঞ্জুল বনচ্ছায়ে
পরাণে সবার
লেগেছে পুলক শিহরণ; আত্মহারা রহিয়াছে
দক্ষিণ পবন
তাই তো তোমার লাগি বেদনায় ব্যথিয়া কাঁপিয়া
উঠে মোর মন।

বাসন্তী নিশায় আজ পুষ্প গন্ধ ঘন সমীরণ
বহে যে এখনো;
কোকিল গাহে না গান, রভসে ঝরিয়া পড়ে পাতা
কেন কি গো জান?
অদূর-অতীত শীত পদচিহ্ন মুছে নি এখনো
বনানীর ধার,
বিজন বিপিনে নাই প্রাণস্পন্দ শুধু দেখা খানি
না পাইয়া কার?

তুমি তো বুঝনি কেন দক্ষিণ বাতাস বহে আসে
ফুলদল চুমি',
প্রত্যাসন্ন আনন্দের রেশ কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
মম মনভূমি
বকুল বনের ব্যথা নিঃশ্বসিয়া উঠিছে সহসা
তোমার লাগিয়া,
গগনে চাঁদেরে চাহি তব তরে বসি বাতায়নে
কে বহে জাগিয়া।

উদাসে বাউল গাহে বসি একা মাধবী-বিতানে,
বাজে একতারা
অনন্ত বিরহ ঝরি অবনী ভাসায়ে লয়ে যায়
সে সুরের ধারা,
চকিতে শুনিতে যদি তাব ব্যথা আসি একধারে
সে পথপ্রান্তের
বাজিত হৃদয়ে তব মম সর্ব্ব মর্ম্ম দুঃখ ব্যথা
দিন দিনান্তের।

চলে না লহরী লীলা; কবিতা নিঝর রসহীন,
মিটাও পিপাসা;
মূক আজি পিককণ্ঠ, ফুটে না মুখর মুখে গান,
দাও তারে ভাষা,
ভাষা মাগে তব ছন্দ, ছন্দ রহে স্পন্দহীন হয়ে
না পেয়ে পরশ—
বিরহী হিয়াটি চাহে বহুদিন হ'তে সঙ্গ তব
অমৃত সরস।

নয়নে নয়নে মৃদুহাস্য মাঝে অঙ্গুলি-সংকেতে,
ওগো বেদরদী,
আলেয়া দেখায়েছিলে কেন বারে বারে নিভাইয়া
দিবে তারে যদি?
বিচ্ছেদ মুছিয়া হও আবির্ভাব, উঠুক ফুটিয়া
মিলনের জ্যোতি
নবোদ্ভিন্ন জীবনের অনন্ত আনন্দ যদি ফিরে
তাহে কার ক্ষতি!

এমনি বিচিত্র খেলা অফুরান্ আলোছায়াময়
জীবন অম্বরে;
দিগন্তে মেঘের পাছে সূর্য পানে না যাইয়া প্রাণ
কেমনে সম্বরে?
রক্তরাঙ্গা অশোকের তরুমূলে রয়েছি বসিয়া
এখনো একাকী—
আরো কত হবে দেরি, বসন্ত যে এসে চলে যায়
বারে বারে ডাকি।

দোলরাগ

আজ দোললীলা,
প্রেমরাগ পরিপূর্ণ ফাগুনের খেলা
হবে আজ প্রিয় সাথে;
আজিকার মধুগন্ধ গীতচ্ছন্দা রাতে
বসন্তের শুক্লা পূর্ণশশী
শত প্রণয়ীর মুখে দেখে যাবে হাসি;
কত জনে পাঠাইবে কুম্‌কুমের ডালা,
শূন্য মোর থালা—
তোমারে দিবার মত বাকি কিছু নাই,
আমি তাই
নিভৃতে রাঙাব বলে করিয়াছি স্থির,
সামান্য আবীর।

সামান্য আবীর!
জাগিবে না কোনোখানে আনন্দের মীড়,
নাহি তার গৌরবের জ্যোতি,
কোথায় সে পাবে? লজ্জা মোর অতি—
কোথায় মাখাব তোমা কোন্ অন্ধকারে
কোন্ বনমল্লিকার মধু-গন্ধ-ভারে,
কোন্ অন্ত নাহি জানা বসন্ত সন্ধ্যায়
দোলা-জাগা ভালো-লাগা ব্যর্থ বাসনায়
বিজন বীথির তলে থর থর হিয়া
রবে মর্মরিয়া?

কোথায় সে চমকিত ছায়া-সুনিবিড়
মিলনের মেলা, যেথায় অধীর
নাহি পাওয়া অফুরান্ মাত্র একজন
রবে অপেক্ষিয়া; যার লাগি মন
আজিকার বাসন্তিকা রাতে
বার বার মাতে,
বায়ুর নিঃশ্বাস ভরে আত্ম নিবেদিয়া
উঠেছে ক্রন্দিয়া?

ক্ষমা করো মোরে
আজ সাঁঝে অনুরাগ ভরে
যদি মোরা নিভৃতে দুজনে
না করি খেয়াল খেলা সার্থক কূজনে,
না করি তোমার কানে দুটি গুঞ্জরণ
পুলক হিল্লোল ফুল্ল উল্লসিত মন।

সে দিনের বাঁশি
হারায়েছে, সে দিনের কথা কওয়া, হাসি
আজ শ্রান্ত রয়েছে চাহিয়া;
সে দিনের হিয়া
ধূসর মরুর পথে লুটায় নীরব
যেথায় তারকা লুপ্ত, আলো ক্লান্ত, বিধুর উৎসব

চেয়ো না চমকি',
তোমার পুষ্পের কুঞ্জে রয়ো না থমকি,
যেয়ো ভুলে যে তোমারে চেয়েছিল কাছে,
তার পাছে
ফিরায়ো না আঁখি; আমাদের অবল হৃদয়—
হায় হায় নাই, যে সময়;
দাঁড়াইতে ক্ষণতরে, ফেলিতে নিঃশ্বাস;
বুঝে না মোদের ব্যথা তারাভরা বসন্ত আকাশ।

তাই মোর ক্ষুদ্র উপহার
তাহার অচেনা জনে কি দিবে সম্ভার?
সে মানুষ চির দূরে; মাঝের বিরহে
শ্রান্ত প্রাণ বহে
পার হবে হেন শক্তি কোথা?
তারি নীরবতা
বিভল করেছে তারে; তারি বেদরদী
ভুলে চাওয়া আধো পাওয়া প্রেম নিরবধি
নিরাশ করিয়া গেছে আশা ক্লান্ত মনে
নিরুপায় নিঃসহায় ক্ষণে।

তোমার ও অলকার কোণে
যদি কোনো ক্ষণে
অবুঝ বসন্ত বায়ু উড়াইয়া আনে
আমার এ দানে,
যদি কোনো ক্লান্ত সুপ্ত রাতে
মূক তারা শিহরিয়া উঠে বেদনাতে
কর্মহীন পূর্ণ অন্ধকারে
শত হীরা মণি জ্যোতি হারে
আঁকি যায় টীকা
ক্ষণিকের হোমানল শিখা,
পূজামূর্তি যদি এ জীবনে
ব্যর্থ আয়োজনে
রহে জ্বলি অমলিন হেম—
তব তরে উৎসর্গ দিলেম
সেই মম প্রেম।

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে

কালি শুক্লা বসন্তের রাতে
যে পরশ পেয়েছিনু তারে আজ প্রাতে
রাখিয়াছি অলখে অন্তরে; মধুনিশি
জ্বেলেছিল গন্ধদীপ হর্ষে রসে মিশি'
দক্ষিণ-ব্যাকুল; সে আলোক নির্নিমেষে
রয়েছিল চাহি'—ধীরে নিভেছিল হেসে

কালি শুক্লা বসন্তনিশায়
মধুরে আকুল চাঁদ দিগন্ত ভাসায়,
চারিধারে কুহরিল বসন্ত-প্রলাপী
বকুল তরুর শাখে রাত্রি গেল যাপি,
প্রিয় সম্ভাষণ হেরি'জাগে পুষ্পকলি;
শিহরি' আকাশে চাঁদ পড়েছিল ঢলি'।

কালি শুক্লা বসন্তরজনী
হরিল সকল মন; থামিল ব্যজনি'
দক্ষিণ বাতাস; ঘুমে অচেতন ধরা
ফুটিল রজনীগন্ধা মধুগন্ধভরা;
ঘুমানু অসহ সুখে অলকা সুদূরে,
একাকী বিনিদ্র প্রেম হরিল বঁধুরে।

বসন্ত বিদায়

বসন্ত মম, যে নিরুপম
যায় নি চলি' যবে
মাধব মাস করিল মিনতি,
সোহিনী রাগে, স্বপন জাগে
পরাণ ধরি সবে
না দিনু তারে বিদায়-আরতি;
চূত মুকুল চুমি' দুকূল
উড়ায়ে মনোভাব
পুষ্পশরে ক্ষণেক দিল ক্ষমা,—
তবুও মোর আলস ঘোর
না টুটে, চিরনব
বেদন ধরে মূরতি অনুপমা।

গহীন রাতে দখিন বাতে
শেফালী তরু মাথে
ডাকিয়া গেল কোকিল কুহু কুহু,
নিঝুম বনে ঘুমে পবনে
পাপিয়া পিয়া সাথে,
সপ্তপর্ণ ঝরিল মুহুর্মুহু,
বকুল বাঁকে ফাঁকে ফাঁকে
লুঠিল চাঁদ গায়ে,
কহিয়া গেল—সময় এল তব;
নদীর ধারে বাঁশের ঝাড়ে
ঘুমাল মাঝি নায়ে,
থামিল জলে ছলাৎছল রব।

মাধব মাসে মধুর হাসে
এমন মিঠে সময়ে
বিদায় দিব পরাণ ধরি' কেমনে!
আজো যে হিয়ে ব্যথা জাগিয়ে
শতেক অনুনয়ে
তোমার স্মৃতি রণিছে মনোভবনে।
আঁধার কোণে বিজন বনে
জ্বলিছে এক দেউটি,—
দেউলে দেব—নিবান তারে যায়?
সরসী জলে কিরণ জ্বলে
ফুটেছে ঊর্মি কটী—
ঢাকিতে ছায়া হাত যে কাঁপে হায়।

বাহির ভুবনে মন পবনে
দোদুল দোলা সাথে
চলিয়া যেবা গেল অকারণে
আমার কাছে বাঁধা সে আছে,
হৃদয়ে সে যে মাতে,
না মানে কভু কাহারো বারণে—
তোমার তরে বোশেখী ঝড়ে
চখা ও চখী গানে
রহে সে আজো কুসুম লয়ে বসি',
খুঁজিছে মধু ভ্রমর-বধূ,
পিক যে বুক হানে
পিয়ার তরে; জাগিছে পূর্ণশশী।

বাজিল বেণু লোধ্র-রেণু
উড়িল গগন ছায়ি
যাহার হাতে পরশ-সুধা পেয়ে,
ডাহুক ডাকে তরুর শাখে
পাখি যে উঠে গাহি',
চরণ পাতে পুষ্পে ধরা ছেয়ে,
তাহারে আমি দিবস যামি'
মনের মাঝে লভি'
মাধব মাসে ফুলের সাজে হেরি—
মম অনন্ত নব বসন্ত
সঙ্গে, হে সখা, সবি
রাখিব আমি সুচির সুখ ধরি'।

হেলা ও ফেলা ফুলের মেলা
সারাটি বেলা বহে
ঢলিয়া পড়ে গগনকোণে রবি
আমার ধরা স্বপন-ভরা
তোমারে ত্বরা চাহে,
মনের মাঝে জাগিছে মুগ্ধ ছবি;
দিবস গেলে দু পাখা মেলে
কুলায়-পানে পাখি
ঝাপটি আসে দেহ আর মন লয়ে—
তেমনি করে আমার তরে
আসিয়ো, না দূরে থাকি';
তখনি মধু পারিবে যেতে বয়ে।

উজ্জীবন

হে বসন্ত, তুমি গেছ চলে
মালঞ্চ অঞ্চল হরি' শুষ্ক করি' মধু পদ্মদলে,
ভুলে গেছ অলস নিশায়,—
উন্মাদ কর্মের স্রোতে তরী ভাসায়ে
হেথা চলি দূর হ'তে দূরে;
পরাণবধূরে
তবু কি ভুলিতে পারি?

কত বার হারি'
ত্যজিতে হয়েছে শুষ্ক হার,
আমার ঐশ্বর্য্যভার
লুঠিয়া লইয়া গেছে দাবি সকলের;
অসীম বলের
নাহি বাকি ক্ষুদ্রলেশ, নাহি পূর্বজয়,
শুধুই পড়িয়া থাকে গতস্মৃতি—দিনান্তের ক্ষয়।

হে বসন্ত, তুমি নাই, নাই,
ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে মম কোনো কণাই
নাহি বাকি মোর লাগি';
তবুও তো আজো আছি জাগি'
লভিবারে পরাণবধূরে
আমারি সোহাগে ঘেরা প্রেমমৌন মিনতিমধুরে।
কিন্তু নাই—শুধু একা আছি,
যখনি তাহারে পাই, হে বসন্ত, এখনি যে বাঁচি।

সুদূর

হে সুদূর, জীবনের কোন্ ছায়াবনে
পাতিয়াছ আশ্রম তোমার? কার সনে
হবে খেলা, রবে প্রেম, লবে চিত্ত কার
আপনার বিনিময়ে পূর্ণ অধিকার?

ফুটাইবে অলখ পরশে কার মুখে
হাসি, কাঁদাইবে কারে বেদনায়, সুখে
বসিবে কাহার সাথে প্রসারিয়া কর
আসিবে যখন ঘিরে দুঃখ ভয়ঙ্কর?

হে সুদূর প্রিয়তম, সন্ধ্যা অন্ধকারে
জ্বালায়েছি এ-প্রদীপ, মত্ত হাহাকারে
আসে বায়ু, আপনার ক্লান্ত হস্ত দিয়ে
তোমার লাগিয়া তারে রেখেছি বাঁচিয়ে;
আঁধারে অন্তর তলে উজলি দেখিয়ো
ভালোবাস যারে সে যে আমি—আমি, প্রিয়।

আহ্বান

হেথা এস, এস এক কোণে
বিশ্ব যেথা মুদিয়াছে আঁখি,
অপলক রাত্রি যেথা গোনে
অন্ধকারে নিমেষ একাকী।

হেথা এস সকল আকাশ
ঢাকিয়াছে আড়ালে যেখানে,
যেথায় অনন্ত ধরে রয়
মোহ পুষ্প কল্পনা বিতানে।

হেথা দূরে পৃথিবীর কাজ
ত্যজিয়াছে ধূসর বসন,
খুলে নেছে দিবসের সাজ,
বহে নাই ঝড় সন্ সন্।

শুধু প্রেম করে আনাগোনা,
ফিরে গেছে অশ্রু ব্যথা লয়ে,
তোমা লয়ে শুধু স্বপ্ন বোনা;
হেথা এস আমার হৃদয়ে।

সাধনা

এখনো দিয়ো না কিছু, অন্তরালে আরো কিছু দিন
অলখে দাঁড়ায়ে থেকো মরীচিকা দূরপ্রান্তে লীন
হয়ে যাক দিগন্তরে; এনো না প্রসাদ ডালা দীন
কোণে হেথাকার, কোনো খেয়ালী নিমেষে
অমর করো না মোরে ভুলে ভালোবেসে
বাসন্তী কুসুম সব অনুপম হেসে
সুধা দৃষ্টি পাতে
অনন্তের সাথে
রাতে।
দূরে
রাজো স্বপ্নপুরে;
উষার নূপুরে
জাগে নি আলোর ছন্দ, ঘোচে নাই ভয়,
আসে নি মহেন্দ্র-ক্ষণ, হয় নি সময়,
আজিও টলে যে মন, তব বরাভয়
এখনো চেয়ো না দিতে, পূজাশেষে সব বাসনাই
পারি নি আহুতি দিতে, ধ্যান মোর সাঙ্গ হয় নাই;
চাহিতে পারি না কিছু, হে চিন্ময়ী, দূরে থেকো তাই।

গোপন প্রেম

করো তারে ক্ষমা
যদি কারো জীবনের অমা
তোমার অজানা স্পর্শে হয়ে যায় দূর,
নিত্যকার উদাস বিধুর
রাত্রি আসে প্রেমস্বপ্নে ভরিয়া শূন্যতা,
লয়ে সার্থকতা,
লভিয়া জীবনাতীত অমৃত সরস
অলখ পরশ।

জানিবে না তুমি
যে দক্ষিণ বায়ু আসে চুমি'
তোমার কাননে, সে যে হেথা প্রতিদিন
স্পর্শ দিয়ে রাখিছে নবীন
মোর প্রেমে; করি এ মিনতি
তোমার হয় নি যদি ক্ষতি
এই দূর নিভৃত অর্চনা
করিয়ো মার্জনা

বাধা

জানি তুমি আজো দূরে একান্ত বিজনে
স্মরিবে আমার নাম যেথা শান্ত ক্ষণে
পশিবে না কোলাহল, আলোকের ভিড়
ঘুচাবে না চিররাত্রি কালের তিমির
রূঢ় স্পর্শ দিয়া; তব ধৈর্যের মহিমা
সহিবে সহস্র ক্লেশ সংসারের সীমা
তুচ্ছ করি অবহেলে; চরণ পরশি'
মোহ বন্ধনের পাশ দূরে যাবে খসি'।

আমি তাই দূর দেশে একান্ত বিজনে
এখনো অতীত পানে দীর্ঘ নির্বাসনে
রহিনু চাহিয়া; এতটুকু জিজ্ঞাসায়
নাহি করি অভিযোগ, সুনম্র আশায়
বরি অনাগত কাল; সংসারের বাধা
মানিয়া রাখিনু তব প্রেমের মর্যাদা।

মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী

মাঝেতে বিচ্ছেদ নদী, এপারেতে ভাবি আমি মনে
বহে যে দুঃখের স্রোত, তারে পার হব বা কেমনে?
ঘুম ভাঙে কাহার আহ্বানে
যে রহিল দূরে তার স্বপ্নমূর্তি হেরি কোন্‌খানে।

সহস্র উৎকণ্ঠা নিত্য, ডাকে বান অশান্ত উচ্ছলি,
আশ্রয় প্রান্তর মোর খর স্রোতে মুছে যায় চলি,
লুপ্ত হ'ল ব্যবধান সীমা;
সমগ্র অম্বরে মোর ফোটে মধু স্মৃতির গরিমা।

যত ভাবি যত স্মরি প্রাণপুষ্প স্বচ্ছন্দে বিকশি'
কমনীয় হাসি হাসে, এ ভুবনে জাগে পূর্ণশশী,
হেথাকার উদ্‌ভ্রান্ত সমীরে
দগ্ধ ধূপ গন্ধ সম স্নিগ্ধ শান্তি ছড়াইছে ধীরে।

জীবনে আলোক-রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্তি জ্বালি' তুমি দিয়েছ সন্ধান,
লভিয়াছি তৃপ্তি আপনার;
অভীষ্ট অঙ্গুলী স্পর্শে বাজে প্রাণে ঝঙ্কার বীণার।

প্রতীক্ষা

তোমারে প্রতীক্ষা করি দিনান্ত বেলায়
পশ্চিমের আভা স্বর্ণচ্ছায়
যবে গড়ে রক্তরাগে আপনারে মেলি'
পূরবের সেতু, দীর্ঘ ছায়া ফেলি'
সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে
আঁখি সিক্ত নীরে
পরশি' সাগর বারি দিগন্ত রোদনে
অন্তরের নিভৃত বোধনে,
সমাহিত শান্ত ধীর মৌন ব্যাকুলতা
এতটুকু কহে না তো কথা,
ভাঙে না রাত্রির
নিবিড় নীরব বার্তা—মিলন যাত্রীর
গোপন কাহিনীটুকু; উদ্বেলিয়া তম
রাত্রিশেষে যেথা স্বপ্ন সম
মিশে যায় পূরব দুয়ারে
সেথা মৌনতারে
লইয়াছি বরি'
চির সন্ধ্যা হ'তে উষা প্রতীক্ষায় ভরি'।

পড়ে মনে পড়ে

পড়ে মনে পড়ে
বিস্মৃতির অন্ধকার রুদ্ধদ্বার ঘরে
পেয়েছিনু তার দেখা। বাহিরের আলো
ক্লান্তিভরা এ নয়নে লাগে নাই ভালো,
পরম নির্ভর ভরে তার দুটি হাতে
সমর্পিয়া এ জীবন বসেছিনু সাথে।

সেই সন্ধ্যাবেলা
পৃথিবীর এক প্রান্তে একান্ত নিরালা
তার সাথে দুটি কথা ক'ব ছিল মনে
যে কথাটি গুঞ্জরিয়া গূঢ় সঙ্গোপনে
ফিরেছিল অশ্রান্ত ভাষায়। বারে বারে
তার পানে তাকাইয়া দু-নয়ন হারে।

সহসা বাতাস
আকুল করিয়া গেল মুক্ত কেশপাশ,
মাধবী উৎসব রাতি হ'ল আনমনা,
অধীর হৃদয়াবেগে ভুলিনু আপনা,
দুই হাতে তুলে ধরি' তার মাথা নিয়ে
মৃদু কম্প্রস্বরে শুধু ডাকিলাম,—প্রিয়ে।

সে ডাকে শিহরি'
আবেশ বিহ্বল হিয়া উঠে মধু ভরি',
পুলকে কাঁপিল তনু পরাণ বধূর
লাজমৌন প্রেমারুণ মিনতি মধুর,
স্বপ্নমাখা আঁখিদুটি স্তব্ধ পূর্ণরাতে
সুধীরে নামিয়া গেল গুরু বেদনাতে।

পরে কতদিন
গেছে নব সম্ভাষণে, এমনি নবীন
ধরণীর স্বর্ণাঞ্চল যুগান্তর ধ'রে,
যে ডাকটি রাখিয়াছে এ জীবন ভ'রে
শুধু সেইটুকু ছাড়া আর সবি ভুলে
গেছি চিরবিস্মৃতির বিস্মরণী কূলে।

জন্মদিনে

মোর জন্মদিনে
মধুর হৃদয়াবেগে দূর পথ চিনে
ফিরিনু অতীতে,—যেথায় অপরাজিতা
তিলোত্তমা মালাখানি যতনে রচিতা
তেমনি অম্লান রহে আনন্দরাশিতে
কত তৃপ্ত নিমেষের হাসিতে বাঁশিতে।
মাধুরীনিবিড়
উচ্ছ্বসিছে শত স্মৃতি প্লাবি' প্রাণতীর।

জনমবাসরে

সমুখে আঁধার ভাগ্য অচেনা অক্ষরে
রাখিছে লিখন, ভয়ে ভুলে প্রকম্পিত হিয়া
কেমনে চলিব একা সাধ আশা নিয়া
দীর্ঘ মরুযাত্রা-পথে; স্মরিনু অতীতে,—
সে জীবন মূর্তি লভি' আসে গন্ধে গীতে
এই জন্মদিনে—
অনন্তের কাছে বাঁধা রহিলাম ঋণে।

স্মরণ

তোমারে লভিয়াছিনু সৌরভ-মদির পূর্ণিমাতে
আকুল দুখানি বক্ষে এক ছন্দে বাজি' অনিমেষে
মধুর প্রসন্ন প্রেম উচ্ছ্বসি' উঠিল যেই রাতে,
বসন্ত জাগিল যবে পূর্ণতার তৃপ্ত হাসি হেসে।

তোমারে লভিয়াছিনু; তুমি যাচি' বক্ষে এসেছিলে
প্রসারিয়া বাহু তব, স্মরি' সুপ্ত রাত্রির পূর্ণতা
তোমাতে বিহ্বল সুখে মোর চিত্ত আবেশে নিখিলে
হেরেছিল শুধু শুভ্র প্রস্ফুটিত গোলাপের লতা।

আজিও প্রবাসে দূরে সৌরভ-মদির পূর্ণিমাতে
একাকী উন্মুখ সাধে বক্ষ মোর প্রতীক্ষায় জাগে,
আবার আবেশ-মত্ত পুষ্পলতা বসন্তের সাথে
বিকশি' হাসিবে দূরে; চিত্তে তাই কত দোলা লাগে—

তোমার উৎসব স্মরি' তাই স্তব্ধ পরিপূর্ণ হিয়া
শুভ্র গোলাপের গুচ্ছে মুখ ঢাকি' রহিনু বসিয়া।

আমি

আমি লিখি সে তো শুধু ছন্দ আর কথা,
মূর্তি ধরে তুচ্ছ দীন গানে;
যা লিখি না তা যে মোর অন্তরের ব্যথা,
দীপ্তি পায় হৃদিরক্ত দানে।

আমি ডাকি ছোট নাম মাধুরী ভরায়ে,
সে শুনিবে বিপুল পুলকে;
যা ডাকি না অচেনা ও অনন্ত ছড়ায়ে
জমা হয় নামহীন লোকে।

আমি কবি, তবু জানি সাধারণ ভিড়ে
এতটুকু ঠাঁই নাহি আশা;
মোর মাঝে সুপ্ত সেই নীরব কবিরে
চিনে সে কি মিটাবে পিপাসা?

উইপিং উইলো
(Weeping Willow)

ঝঞ্ঝা যবে নেমে আসে প্রান্তরের সানুদেশে পশি',
হে বিষণ্ণা শোভনা রূপসী,
মেঘে নভ আঁধারিয়া ছড়াইয়া পড়ে কেশপাশ,
মুছে যায় ধরণীতে আলোকের মৃদুমন্দ হাস,
হাহাকারে বনভূমি বারম্বার জানায় মিনতি,
পর্বত-শিখরে তরু অসহায়ে করে শুধু নতি;
তব শিরে, হে ক্রন্দসী নারী,
মেঘ ঢালে বারি।

অঝোর বর্ষণ সাথে ক্রন্দন উচ্ছ্বাস রণি' বাজে
বিলাপে মুখর ছন্দ মাঝে;
তোমার মর্মরধ্বনি শূন্য মাঝে কোথায় হারায়,
সঘন কেশের রাশি কাঁদি' কাঁদি' লুটায ধরায়,
পেলব পল্লবদেহ কাঁপি' কাঁপি' পড়ে মুরছিয়া,
অশ্রান্ত মেঘের ডাকে থাকি' থাকি' চমকায় হিয়া;
ভাষা মৌন স্তব্ধতার ভারে
সান্দ্র অন্ধকারে।

ফেনিল যৌবনমত্তা উপলমুখরা চিত্ররেখা
লুকায়ে লয়েছে শেষ লেখা,
শস্যশীর্ষ শিহরিয়া তরঙ্গিয়া উঠে সচঞ্চলে,
পর্ব্বতের গম্ভীরতা মর্মব্যথা বলে বনতলে,
আকাশ তারকা-চক্ষু মুদি' ফেলে তোমার লাগিয়া,
অনন্ত বিরহ ফিরে তোমা মাঝে মূরতি মাগিয়া;
ধীরে ধীরে আসে সন্ধ্যাসতী
অতি ক্ষুণ্ণ মতি।

অম্বরের প্রান্ত ছিঁড়ি' মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকে
অশ্রুভরা আঁখির পলকে,
মেঘের মাঝারে হারা আঁধার ঘনায় তোমা ঘেরি',
উতলা কলাপী থামে তোমার আকুল নতি হেরি'—
মেদুর দাদুরী ডাকে, ঝিল্লীরবে কাজল অমাতে
কদম্ব-কেশর রাশি মোহভরে চলিছে ঘুমাতে;
অশান্ত পবন সারারাতি
করে মাতামাতি।

থামিয়া গিয়াছে বৃষ্টি; বনান্তের বেণুকুঞ্জ মাঝে
নীরব প্রশান্ত স্বপ্ন রাজে।
নভে শুভ্র অভ্রমালা, দলে দলে চঞ্চল বলাকা
নীলিমা সায়র মথি' প্রসারিছে লঘু শ্বেত পাখা,
সুস্নিগ্ধ ধরণীতলে সুরভি-উচ্ছ্বাস উঠে জাগি,'

তরুণ তরুণ কর আসে দ্বারে আবাহন মাগি';
তুমি ঘন আনত কুন্তলা
কাঁদ অচঞ্চলা

অমেয় বেদনা তব একনিষ্ঠা ব্যথিতা 'উইলো'
ক্ষণ তরে কেমনে বা ভুলো?
মর্মের মন্দিরতলে লভিয়া অনন্ত জীবন,
নিভৃত অন্তরলোকে মানিলে যা প্রাণপ্রিয় ধন,
মুছাবে তাহার স্মৃতি ক্ষণিকের তুচ্ছ হাসিরাশি?
এমনি প্রয়াস কত অশ্রুধারে গিয়াছে যে ভাসি';
তব প্রাণ তাই চিরমরু,
অশ্রুকন্যা তরু!

স্বীকার

হেথায় সাগর-তীরে তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসের সাথে
মনে মনে যত খেলা দ্বিপ্রহরে তোমাতে আমাতে,
যতই কবিতা লিখি' পদ্ম সম দিই ভাসাইয়া
ভরিতে সুদূর ব্যবধান, যতবার পূর্ণ আশা নিয়া
মৃদুমন্দ সুরে ডাকি একখানা তিলোত্তম নাম,
তাহে বীজমন্ত্র সম সুগোপনে রাখিয়া গেলাম
প্রশ্নাতীত বাণীহীন প্রেম। জানি শুধাবে না তুমি
এ পশ্চিম তীর হ'তে যে বসন্তবায়ু ধীরে চুমি'
যেতেছে তোমার চারিধার কেন তাহে নাই আজ
যৌবন প্রলাপ-গাথা মোর, নবীন পুষ্পিত সাজ,
অনুপম প্রিয়কণ্ঠে কেন নাই মধু উপহার।
জানি কিছু শুধাবে না; তবু জেনো সুদীন স্বীকার
কল্পনা উচ্ছ্বাস পুষ্প লভেছে সকলি পরিণাম
সুমহান্ মৌনতায় উচ্চারিয়া একখানি নাম।

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়

আজি স্তব্ধ প্রবাস সন্ধ্যায়
যে কথা বলিতে চাই সে কথাটি হায়
লুপ্ত হয়ে গেছে কোথা; তাই এ নিমেষে
মোর যত ব্যাকুলতা তোমার উদ্দেশে
দিনু তারে সমর্পিয়া; মৌনতার বাধা
হয়তো বুঝিয়া তারে, দিবে বা মর্যাদা।

আজি শান্ত প্রবাস প্রদোষে
আমি ভাবিতেছি যেথা দূরে আছ বসে
সেথা কি স্মরিছ মোরে, পাছে হেথাকার
যে মূক ব্যথার শাস্তি নিঃশব্দ আঁধার
ছড়ায়ে অম্বরতলে তা করে করুণ
তোমার আকাশখানি উজ্জ্বল অরুণ।

আজি পূর্ণ প্রদোষের সাঁঝে
জীবনে যা কিছু সত্য ঐশ্বর্য বিরাজে
সবি যেন পাও তুমি, দীনতার দান
ডুবে যাক এ আঁধারে, আনন্দ সন্ধান
নিয়ো গানে নবরূপে; যা কিছু পুরানো
থাকুক আমারি তাহা বেদনা ঝরানো।

নীরবতা

তোমার জীবনপাত্রে আনন্দের ডালিখানি মোর
উৎসর্গ করেছি নিত্য মুগ্ধ চিত্তে তোমাতে বিভোর,
অরূপ কল্পনাময়ী মাধুরীর অমৃত মূরতি
সৃজিয়া হেরেছি তাহে তব শুভ্র অতুলন জ্যোতি
দিয়েছে আপন ছায়া; সেই স্নিগ্ধ ছায়ার বিস্তার
কম্পমান কবি হিয়ে করে আজো চাঞ্চল্য সঞ্চার
বসন্তের কোকিল-কূজনে; স্তব্ধ সুপ্ত রাত্রিখানি
বিস্মৃত সে স্বপ্নটিরে জাগাইয়া বিশ্বে আনে টানি'।

জীবনযাত্রায় তব সেদিনের আনন্দ আভাস
প্রভাতদীপ্তির মত থাক জাগি'; তাহারি বিকাশ
হোক্ পূর্ণ দিনে দিনে। আমি যদি স্মৃতিমগ্ন হিয়া
বহুদূরে স্তব্ধ থাকি যেথা কক্ষে অগ্নি উদ্ভাসিয়া
যায় সন্ধ্যা অন্ধকারে—এইটুকু নিয়ো তুমি মানি'
এই দীন নীরবতা মোর প্রেমে করে নাই হানি।

বিদেশিনী

আর বেশি দিন নাহি হেথাকার বাস,
পেতেছি শরৎ-শেষ মাধুরীর শ্বাস,
ক্ষমা করো তবে তুলে লই এ প্রবাস
শীত আকাশের কুহেলী ঢাকার আগে
হে বিনোদিনী,
বিদায় বিধুর আঁখিতে বিষাদ জাগে,
হে বিদেশিনী।

মনোহরা তুমি, তোমার হাসির ধারা,
পলকে পুলকে দিতে তুমি যে ইসারা,
যে কথা কহিতে যে আভাসে দিতে সাড়া,
সবি জমা হয়ে মনেতে মরিবে ঘুরে,
চারুবেশিনী,
রহিব যখন সাতটি সাগর দূরে
হে বিদেশিনী।

বিচার কর নি কে বিদেশী কে বা দেশে
রয়েছে, যখন এসেছে সবাই হেসে
তুমিও হেসেছ, তোমার কনক কেশে
ঝলসে সোনার সূর্য-কিরণধারা
হৃদয় জিনি',
হাসিতে ভাষিতে বেশেতে তুলেছ সাড়া,
হে বিদেশিনী।

স্বীকার কর নি জীবনে দুঃখের ভার,
চরণ নাচনে মরণ মেনেছে হার,
অপরিচিতের প্রাণে তুলি' ঝঙ্কার
মোহ-অঞ্জন লাগায়েছ প্রীত চোখে
রিনিকি ঝিনি
কানে বাজে সুর ছাপি' মিছে দুখ শোকে
হে বিদেশিনী।

তোমার কুঞ্জ-কাননে মঞ্জুবীথিতে
কত বিচিত্র ফুল ফোটে কত গীতিতে,
ভরেছ আকাশ, জ্বালায়েছ আলো নিশীথে,
সুচির যুবতী, এদেশের প্রাণ চরণে
রয়েছে ঋণী,
সুখ দেছ আর পাঠায়েছ নরে রণে,
হে বিদেশিনী।

বাঁচিয়া কি সুখ, কি লাভ রাখিয়া জীবনে,
ভোগ করা রূপ রস শত রূপে ভুবনে,
গান গেয়ে চলা, নেচে চলা যেন পবনে—
নীল নয়নের ছায়া রাঙাইল আকাশে,
মধুহাসিনী,
তোমারি লাগিয়া পুরুষ নিজেরে বিকাশে
হে বিদেশিনী।

দুখেরে দিয়েছ তাহার যা কিছু দাবি,
হৃদয় ভাঙিলে প্রেমযমুনায় নাবি'
আবার সেজেছ নব প্রাণস্রোতে প্লাবি',

গড়েছ ভেঙেছ হাসিখেলা-ঘর জীবনে,
হে বিরহিণী।
প্রতিটি ক্ষণিক সত্যে মানিয়া স্বপনে,
হে বিদেশিনী।

তোমার ভুবনে যে ছিল ক্ষণিক অতিথি
দিয়েছ যাহারে সুধা ও মাধুরী গীতি
সে বিদায় লবে লয়ে আনন্দ স্মৃতি
নূতন জগতে নব প্রাণ সন্ধানে
পথটি চিনি',
তোমায় স্মরিবে সুচির সসম্মানে,
হে বিদেশিনী।

ব্যথা

তোমার জীবন মোরে সাদরে দিয়াছে উপহার
নিরুপম শুভ্র শুচি ব্যথা। অমলিন পুষ্পহার
ব'লে তারে নিছি তুলিয়া সাগ্রহে, মধুস্পর্শে রসে
অমৃত নিষেকে তারে লতা সম যতনে হরষে
মর্মতলে রাখি বাঁচাইয়া, প্রীতির শিশির জলে
নিত্য বিকশিত রাখি পেলব পল্লবময় দলে
সুগোপনে; স্মৃতির সৌরভসারে দিই বাড়াইয়া।
মৃদু গন্ধ তার। ছিল মরু, মালঞ্চ করেছি হিয়া।

স্নিগ্ধ দীপ্তি সুকুমার সন্ধ্যা'র প্রথম তারা সম
ভাতিছে উদয়াকাশে নাশিয়া আমার সব তম
অনিমেষ চাহি'; শান্ত সুগভীর স্তব্ধ রজনীর
অতল সাগরতলে কল্লোলিত বেদনা-ধ্বনির
আভাসের মত গান তবু ও যে ভেদি' নীরবতা
কথা কয়ে উঠে প্রাণে; তাব দান, ওগো, এ যে ব্যথা।

অভিযোগ

এই শান্তি, সুখের আশ্বাস!
সারাদিন ভীরু হিয়া আশা করে, ভোলে নিয়া
বিশ্বজোড়া অসীম বিশ্বাস;
কল্পনার জাল বোনে খালি পল পল গোণে
বাসনার বেদনায় মরে,
ভাবে কখন যে তুমি পদস্পর্শে মোর ভূমি
দিয়ে যাবে প্রেমে সোনা করে।

এই আশা ছলনার খেলা।
নীরব গগনতলে অগোনা, তারকা ঝলে,
সারারাত্রি লোকের মেলা।
দিনের প্রখর তাপে সে মাধুরী কোথা ঝাপে
এ আকাশ সে আকাশ নাই;
যত রূঢ় বাস্তবতা পরশিয়া দেয় ব্যথা
তত বুঝি তুমিও সদাই
আড়ালে সরিয়া যাও, বাঁধন ছিঁড়িয়া দাও
যখনি হৃদয়ে পড়ে টান,—
আমি হেথা একা ব'সে ক্লান্ত আশাটির শ্বশে
মনে মনে মুছি ব্যবধান।

আমি সাধে ভুল লয়ে রচে যাই কিশলয়ে
মনোমত একখানি মালা,
প্রতিটি পাতায় লেখা হৃদয় অনলরেখা
শুনাইব তোমায় নিরালা;
আশা করি প্রাণপণে যুঝি আপনার মনে
আসিবে বুঝিবা তুমি নিজে,
মোর হাতে হাত দিয়া শুনি তব মুগ্ধ হিয়া
উঠিবে শিশির সম ভিজে;
পুলকে আপনি উঠি' পুষ্পদল প্রায় ফুটি'
চাহিবে আমারে সব দিতে,
আমিও আপনাহারা রুধিয়া নিরাশাধারা
ভুলিয়া চাহিব তোমা নিতে।

মিছে কল্পনার খেলা, কল্লোলিত সিন্ধুবেলা
ডুবাইয়া লয়েছে বিফলে,
যে সৌধ রচিয়াছিনু তাও এই ডালি দিনু;
কত ঝঞ্ঝা হৃদয়ের দলে।
সুখভরা যে জগৎ মোর সেথা অন্য পথ,
তারো দূরে রয়েছ, নিঠুর,
সেথায় চাহ না মোরে, ছল নিত্য মোহঘোরে,
ভুলাও শুনায়ে মিঠে সুর।
সকলেরি শেষ আছে, কিছু আগে কিছু পাছে
লবে টেনে মাতৃস্নেহে ধরা;
তুমি মিথ্যা, প্রেম মিথ্যা, বাকি যা রহিল তা
সত্য শুধু দুঃখের পশরা।

আমারে চেয়ো না তুমি

মোরে
কভু স্বপ্ন ঘোরে
চাহিয়ো না ভুলে, গুরু ভার
সহিবে না সুকোমল বুকে, বার বার
নামাইতে হবে বোঝা, ক্ষণে ক্ষণে ফেলিতে নিশ্বাস,
মুছিতে কপোল শুভ্র, অতীতের হারানো সুবাস
খুঁজিতে কুসুমদলে, সন্ধ্যারাগে রক্তিম আকাশ
যেথায় অনন্ত প্রেম বহিছে নীরবে
উর্ধ মুখে ক্লান্ত আঁখি রবে
চাহিয়া আশায়
হায়।
হিয়া
উঠিবে কাঁপিয়া
বেদনার অরুণিমা ছেয়ে
রবে মুখে; আমি যে অশান্ত স্রোতে ধেয়ে
বার বার মাথা খুঁড়ি বালুকাবেলায়, উর্মিহারে
ব্যথা উদ্বেলিয়া যাই, আসি না তো মাতায়ে তোমারে
সুধা স্নিগ্ধ মৃদু মন্দ গুঞ্জরণে কল্লোল ঝঙ্কারে;
অতৃপ্তির অকরুণ উচ্ছ্বাসের ভরে
রত্ন মাগি তোমার সাগরে—
লই মুঠি মুঠি
লুঠি'।

তোমারে চাহি না আমি

তোমারে চাহি না আমি—চাহিয়া কি হবে?
লতার পল্লব প্রান্ত
শিশির সিঞ্চিত কান্ত
কতক্ষণ শোভা পায় প্রভাত উৎসবে?
রন্ধ্রহীন তব বাঁশি
সঙ্গীতের আশানাশী;
অশ্রুজলে শিলামূর্তি ভিজাব নীরবে?

তোমারে চাহি না—ভুল মান অভিমান
যে নাহি সহিতে পারে,
সংশয় মুছাতে নারে,
তৃষ্ণার আবেগ ক্ষণে সুশীতল পান
পাত্রখানি নাহি হাতে;
স্নিগ্ধ বাণী বেদনাতে
নাহি রচে সেতুখানি মুছি' ব্যবধান।

তোমারে—যে তুমি অন্ধের মত সুখে
চলেছ আপন পথে
উল্লাসে খেয়াল রথে,
ভাব নাই ভরিয়াছ দুঃখ কার বুকে,
ক্ষমায় দেখ নি কারে;
স্নেহ সিক্ত উপচারে
প্রেম পূজারতি তরে জাগ নি উন্মুখে।

কলহান্তরিতা

তবুও কি চাহি নাই তারে? কত দিন
তাহারে ফিরায়ে দিছি, ভুলে উদাসীন
কয়েছি নিঠুর কথা—তবু কি ফিরিয়া
ভাবি নাই আসিবে সে ক্ষমা শান্তি নিয়া
আবার আমারি কাছে? নাই যদি ভালো
বাসিতাম—এত গান এত হাসি আলো
স্তব্ধ কি হইয়া যেত বেদনা বিধুর?

সে অবুঝ জানে নাই বাদলের সুর
সাহানার বাঁশি কত শরৎ শেফালী।
পূজা ধূপ-দীপ কত আয়োজন ডালি
ইচ্ছা ছিল দিই তারে; এ নৈবেদ্যখানি
আড়াল করিয়া দিল অকরুণ বাণী,
শুধুই ফিরায়ে দিনু—হৃদয়-মাঝারে
নিশিদিন তবুও কি চাহি নাই তারে?

গোপন

করো মোরে ক্ষমা।
আজিকার এই নিরুপমা
সুখ-স্মৃতিখানি
নিয়ো না, কবিতা, তুমি বিশ্বমাঝে টানি'
তব পুষ্প আচ্ছাদন ভরে
মনের একান্ত কথা রাখিয়াছ কত বন্দী ক'রে;
লুকানো মর্মের মন্ত্রধ্বনি
বরণ আহ্বানে তব চমকিয়া দিনরাত্রি শুনি,
রাখো রাখো এরে,
আমারি সোহাগ মেঘ সঘনে রাখুক একে ঘিরে,

আমার এ সুখ
মোর কাছে বড় বেশি, উৎসুক উন্মুখ
রহে সে জাগিয়া;
মিছাই মাগিয়া
ফিরিয়ো না অলক্ষিতে একটু আভাস।
আবরণহীন তব বাহিরের বাস—
সেথা জ্বলিবে না এই দাহমুক্ত প্রেম,
এরে আমি রাখিয়া দিলেম
গোপন অন্তরে
ক্ষম মোরে, চাহিও না, পারিব না দিতে প্রাণ ধ'রে।

অপরাজিতা

(রবীন্দ্রনাথের 'জয়-পরাজয়' গল্পের নায়িকা)

তোমার সভার কোলাহল হ'লে সারা
একে একে যবে ডুবে যায় সব তারা,
নিশীথ গগনে আঁধার বাঁধনহারা
নামিছে যখন, সেই ক্ষণটুকু লাগি'
অবিকশিতা
মোর শেষ গীতি শুনাতে প্রসাদ মাগি,
অপরাজিতা।

রাজসভা-মাঝে আছে কত কবিদল
সাজাইতে তব উৎসব ঝলমল—
সবাই বিজয়ী, সবাই ধরণীতল
মোহিছে, লভিছে তোমার মুকুটমণি
সুপরিচিতা,
মোর সাধ শুধু শুনিতে নূপুরধ্বনি,
অপরাজিতা।

বহুদূর হ'তে আসে কত মধুকর,
বাতায়ন-পথে স্তব গান নির্ঝর
প্রসারিয়া উঠে কত রাগে কত স্বর;
মোর সুর নাই, গাহিতে জানি না, শুধু
অপরিমিতা
আশা ছিল, আর তব আশ্বাস মধু,
অপরাজিতা।

সেদিন মুখর বর্ষা গোধূলি বেলা
রাজ-বাতায়নে সাজে নি প্রদীপ মেলা,
কি জানি সহসা তব খেয়ালের খেলা—

চকিতে তোমার আঁখি-আহ্বান বাণী
বিজলী-সিতা
জাগাল আমার অপটু হৃদয়খানি,
অপরাজিতা।

সে নিশেষ হ'তে নীরব আঁধার রাতে
হেরেছি লিখিত এ হৃদয়ে বেদনাতে
তোমার স্বীকার ভাষাহীন আঁখিপাতে,
সুদূর লোকের স্বপনের রাজবালা
প্রণয়ভীতা,
ঝলিছে সমুখে অমল কণ্ঠমালা,
অপরাজিতা।

তারপর নিতি রাজসভা গৃহতলে
গোপন বারতা বাণী পূজারতি ছলে
রচিয়াছি লয়ে আকাশ-কুসুমদলে—
জানি না অলখে গ্রহণ করেছ কি না,
হে সুচরিতা,
কবিকুল হাসে শুনিয়া সরল বীণা,
অপরাজিতা।

যে গান হেথায় অবুঝের মত ফেরে,
রূপ নিতে চায় তোমার চরণ ঘেরে,
মানে নি ধরার পরিপাটি নিয়মেরে
সে গান থামিবে আজিকে নিশীথ শেষে
গোপন মিতা,
ধ্যানেতে হেরিয়া তোমারে বধূর বেশে,
অপরাজিতা

যে গান গেয়েছি, যে গাথা রহিল বাকি,
যে সুখ লভেছি, যে বেদনে মুখ ঢাকি,
সাধ আশা সব সাধনার ধন রাখি'
যাই সঁপি' তোমা এড়ায়ে লোকের ভিড়ে
মধুরচিতা,
সহসা স্মরিবে কখনো বা এ কবিরে,
অপরাজিতা।

সে ক্ষণটুকুরে করুণ করো না, মোর
ব্যথার আভাস না পরশে এ বিভোর
জীবনের জ্যোতি, নববিকাশের ভোর,
তুমি চেয়েছিলে তাই গেয়েছিনু গান—
গোপনে গীতা—
যা কিছু লভেছি তা-ও তো তোমারি দান,
অপরাজিতা।

ভালোবেসো

ভালোবেসো, ভালোবেসো, শুধু ভালোবেসো,
প্রতিটি করুণ ক্লান্ত নিমিষেতে এসো
হৃদয় ভরিয়া। আজো স্মৃতির আহ্বানে
নিশার আঁধার ত্যজি' তপনের পানে
আত্মহারা চেয়ে থাকি, উদয় গিরির
প্রথম আলোক সনে দূর পূর্ব্ব তীর
আশায় উদ্ভাসি' উঠে যবে; মনে মনে
অলিখিত লিপি মোর পশ্চিম পবনে
দিই সঁপে সরমে আবেশে সুখে। আজো
দূরের দেবতা মোর যেথায় বিরাজো
দিব্য প্রেমদ্যুতি লয়ে সেথা অভিমান
সর্ব্ব ব্যথা অশ্রুধারা লভে অবসান;
প্রেমে শান্ত কান্তরূপে অনিমেষে হেসো;
আমারে, আমারে, প্রিয়, তুমি ভালোবেসো।

ভালোবাসি

ভালোবাসি, ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি।
আপন অন্তর হ'তে মধুরে উচ্ছ্বাসি'
পুষ্পসম বাণী ফুটে; হেরি নিরন্তর
মোর সর্ব কর্ম চিন্তা আশায় স্বাক্ষর
রেখে যায় বাধাহীন অবিনাশী প্রেম;
তারি স্পর্শে মোর দীন ক্লান্ত চিত্তে হেম
নিকষিত রূপে জাগে, আনে নবীনতা
পুরাতন এই প্রাণে; করুণ দীনতা
ঢাকে রাজ আস্তরণে; আত্মা উচ্চশির
আকাশ ভেদিয়া ওঠে সেথা তুমি স্থির
দাঁড়ায়েছ ধ্রুবতারা প্রত্যহের গ্লানি
হ'তে ঊর্ধ্বলোকে। তোমার নৈবেদ্যখানি
পরশি' জীবনাতীত করো সুখে হাসি'—
পরম নিমেষে সেই শেষ ভালোবাসি।

অভিমান

তোমারে এ পূর্ণিমার রাতে
পড়িল যে মনে বার বার,
মোর স্মৃতি উদিল কি সাথে
মুছে গেল যবে অন্ধকার?

প্রত্যহের কাজে ভয়ে ভুলে
টানিয়া দিয়াছি অবসান,
ছুঁয়েছ কি আমার মুকুলে
একবারও সারা দিনমান?

আমারে যে করিল উতলা
স্বপ্নমৌন আহ্বান তোমার,
স্মরিলে কি মোব দেওয়া মালা,
এক ফোঁটা সলিলেব ভার?

না যদি পড়িয়া থাকে মনে
নাই বা পড়িল, ক্ষোভ নাই,
কত সুখ লভেছি গোপনে
একান্ত আমারি ধন তাই।

না হয় ভুলেছ নিশীথেই,
ভুলিয়াছ আপনার সাথে,
তোমাবে লভেছি মনে এই
শ্রেষ্ঠ মোর পূর্ণিমাব বাতে।

সাথী

একদা যে ছিনু তব সাথী—
আজ যবে রাতি
আসিবে লজ্জার মত চারিদিকে ঘিরে,
ভয়াকুল ফিরে
চাবে যবে কারো হাতে আত্ম সঁপিবাবে,
দ্বিধা দুর্নিবারে
পাবে নাকো কোনো দিকে পথ,
সকল জগৎ
আবরিয়া রবে ক্ষুণ্নমনে—
সেই ক্ষণে,—
মোর চিরপ্রিয়,
আমারে স্মরিয়ো।

একদা যে ছিনু তব সাথী—
পথে সুখে মাতি'
আনমনে যা দিয়েছ তার
ভাব নাই বিনিময়ে পাবে অধিকার,
যা দিয়েছ চাহ নাই ফিরে,
সেই সব বসন্ত সমীরে
আকুল হইয়া ঘোরে আমার মাঝারে;

একদিন লয়েছিলে যারে
আজো সে রহিল কাছে, যদি ভালো লাগে,
যদি ব্যথা জাগে,—
ওগো চিরপ্রিয়,
অন্ধকারে তাহারে বরিয়ো।

সাথের চলা

সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ
মলিন মম অঙ্গে ভরে ধূলি,
সারাটি পথে ধ্বনিল কানে তাহারি গীতরেশ,
কত না ফুলে দলিয়া গেনু ভুলি'—
কখনো হাত চাপিনু হাতে,
আত্মহাবা চলিনু সাথে,
পথের শেষে ব্যাকুল বাথা
রহিতে আমি নাবি।

বিদায়কালে মগ্ন হ'ল বুকেব উর্মিববে
অফুট কথা প্রাণের ছবিখানি,
মাতিয়া ছিনু তাহাতে নিতি দৃষ্টি মহোৎসবে
দ্বিধা না করি' হার যে আমি মানি—
আপন কথা কহিলি এত,
স্বপনজাল রচিলি কত,
কি ফল পেলি? কিছুই না তো,
কেবলি অশ্রুবারি।

সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ,
হাতেই রহে বিদায় পাত্রখানি,
যে ফুল তুলি' তাহার লাগি' করিনু উদ্দেশ
প্রতিদান তার কি পাব নাহি জানি;
আবেশে ভরে সকল হিয়া
প্রতি নিমেষে উঠে কাঁপিয়া;
তাহারে হেরি' শূন্য ভরি'
উছলি' উঠে সুখে।

বিদায় কালে মগ্ন হ'ল বুকের উর্মিরবে
কি সান্ত্বনা গেল সে দিয়া মোরে;
মিলন মালা উজল হ'ল পরশ গৌরবে,
শিহরে তনু পুলক মধুঘোরে,
আমারে মনে রাখিবে কি না
কোথাও ঠাঁই মিলবে কি না
যেমন রাঙা একটি কাঁটা
বিঁধিবে তার বুকে।

সাথের চলা সাঙ্গ হ'ল, পথ যে হ'ল শেষ;
যাত্রাপথ নতুন ক'রে সুরু,
বিজয়মালা গেঁথেছি পুন, নাহিক দৈন্য লেশ,
রক্তকমলে পূর্ণ যে মোর মরু;
প্রাণের খেলা এখনো চলে
আপন মনে, চাহে না ফলে,
মরম মম সরমে মরে,
কেমন জানি করে।

জীবন যবে বিদায় নিবে ধরণীবক্ষ হ'তে—
আঁখির পরে আঁধার যবনিকা
মৃত্যু কালিমা ঘনায়ে আসি' নামিবে ইন্দ্ররথে,
পরাবে ভাল তাহারি রাজটীকা,
সমুখে আলো উদিবে ধীরে,
আমারে হাসি' স্মরিল কি রে?
চাই যে আমি বাসিতে ভালো
তাহারে তারি তরে।

দেহ

আমার সর্বাঙ্গ ঘেরি' যে ব্যাকুল বাণী
যত অশ্রুধৌত শাস্তি লইয়াছে মানি'
আপনার পরিণাম সদেহ প্রকাশে
বিকশি' উঠেছে আজি শোভা আর বাসে
পুষ্প সম পূর্ণ হ'য়ে; কিছু সার্থকতা
লভেছে ফোটার মাঝে, আর যত কথা
কহিবার বাকি আছে—নৈবেদ্য তোমার,
শুধু উৎসর্গের মাঝে পরিচয় তার।

তুমি জেনো এই দেহ প্রাণের বিকাশ,
তাই এত বাণী ফোটে, গানের আভাস
হেথা বিশ্বলোক ছানি' বাসা বাঁধিয়াছে
তোমারে শুনাবে ব'লে; তাই মিশে আছে
দেহের অতীতাকাশে তোমার প্রভাতে
এ জীবনে যা শুভ্রতা নক্ষত্রের সাথে।

সাগরিকা

আজো কি পড়ে না মনে
বসন্ত সমীরণে
খেলিতাম কত খেলা বালুকাবেলায়,
ফেনার মালায়
সাজালাম কত রূপে তোমার উপরে,
কত সাধ ভরে
রচিলাম ইন্দ্রধনু দিগন্তে তোমার,
কত যাচে নিশি পূর্ণিমার
তোমার অতলস্পর্শ প্লাবনে ভাটায়,
অসীমের বক্ষ ফাটা আকুলতা কত যে লুটায়;
সাগরিকা কল্লোলেতে মাতিছে আপনে-
তাই কি পড়ে না মোরে মনে?

যুগযুগান্তের কথা প্রতি রাত্রি উৎসবের শেষে
তিলে তিলে জমিছে নিমেষে
উষার উদয়াচলে স্বর্ণ আভা রাশি
ইঙ্গিতে করিছে মৃদু হাসি,
নিশান্তমিলন স্বপ্নশেষে
সমাপ্তি যে আসিয়াছে বিষণ্ণার বেশে,—

এ পাথার পারে আজি সকলি উন্মনা,
তাদের অশান্ত ক্ষোভ স্তব্ধ যে হ'ল না;
ভাষা সুবিপুল
প্লাবিয়া ভাঙিয়া মম কূল
মিলালো যে তরঙ্গের কম্পনের সনে,—
তাই কি পড়ে না মোরে মনে?

দুঃখের প্রদোষ অন্ধকারে
বারে বারে
সমুখে দুলিয়া খেলে চঞ্চলার নীল যবনিকা;
ব্যর্থকাম প্রণয়ের মালার মণিকা
নিজ গলে ধ'রে
উৎসর্জিনু আপনায় অতল সাগরে।
আমারে মরণ রূপে লভিয়াছ আপনার সনে
তাই কি পড়ে না মোরে মনে?

ধ্রুবতারা

তুমি ধ্রুবতারা। সংসার ত্যজেছে মোরে
পথ নাই, দিশা নাই; চারিদিকে ঘোরে
ঘূর্ণির অতল পাক। ওই যেথা তীরে
বহু দূরে ম্লানাশায় মুছেছে তিমিরে
সেথায় আশ্রয় নাই, ডাকিবে না কেহ
প্রসারিয়া হাত, খুলিয়া দিবে না গেহ।
ক্ষুব্ধ মৌন রাত্রি কাটে একা শান্তিহারা;
তুমি জাগো একাকিনী, মম ধ্রুবতারা।

শুধু তুমি রও চেয়ে। বিশ্ব ঘুমঘোরে
অসাড় নিস্পন্দ স্তব্ধ। কত রাত্রি ধ'রে
নির্নিমেষ আছ চেয়ে। অসীম বেদনা
কাঁপিয়া মুরছি' মরে তুমি কি বোঝ না?
স্পর্শ দাও, আলো দাও, সুখসুধাধারা—
ওগো বঁধু মম, তুমি মোর ধ্রুবতারা।

আমারে কি দিবে?

আমারে কি দিবে?
সুখ ঢালি অবিরত কি আছে দিবার মত
ভূলোকে ত্রিদিবে?
স্তব্ধ আশা নিশিদিন চাহি' রহে উদাসীন,
দু' হাতে তাহার
তুলিয়া দিবার ধন রেখেছ কি অনুক্ষণ
নিজ ফুলহার?
গোপনে যা কিছু চাই কোথা না খুঁজিয়া পাই
মিছে মরি ঘুরে,
নিত্য হেরি মরীচিকা মোহন আবেশ মাখা
লুকায় সুদূরে।
তোমার ও সরোবরে জল টলমল করে,
মনে কত আশা—
অমৃত সায়রতলে ঢাকিয়া কমলদলে
মিটাব পিপাসা।
আমার এ নীড়খানি কখন টুটিবে জানি
ঝড় বয় বেগে,
তরুশাখা মর মর আবাসটি পড়ো পড়ো
রাত কাটে জেগে।
তোমার শাখার পানে ব্যাকুল হিয়াটি টানে
শান্তি আছে হোথা;

বহে যে ব্যাকুল বায় আবেগে কম্পিত প্রায়,
স্পর্শ লাগে কোথা।
জীবনের সে নিমেষে ঢাকি' অনন্তের বেশে
একাকী রহিবে—
তখন আমার লাগি' রবে কি নিজেই জাগি'?
আমারে কি দিবে?

শ্রেষ্ঠ দান

আমার সে কল্পলোক আপনারে নিয়ে
কত ফুল ফুটায়েছে, প্রান্ত উথলিয়ে
উঠেছে অমৃতবিন্দু, সুখ শতদল
ফুটেছে আলো স্তরে, লীলা অচঞ্চল
কৌতুকে রয়েছে জাগি,' বসন্ত বাতাস
ছুঁয়ে গেছে মল্লীমালা, শুভ্র বনকাশ
জানায়েছে হাসি, নদী গেয়ে গেছে গান;
তুমি শুধু দিলে তব সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

যেথা দাঁড়ায়েছ তুমি, আমার জীবন
পারিবে না সেথা যেতে, অনন্ত স্বপন
তবু তো ভেঙেছ তুমি অঙ্গুলি পরশে;
তাই তাহা তোমা দিনু, তুমি ব্যথারসে
তাহারে ডুবালে, মোর সুখের সন্ধান
রহিল ব্যথায় ফুটে, তব শ্রেষ্ঠ দান।

তন্ময়ো বিরহে

কাল রাত্রিশেষে
লয়েছ বিদায় যবে হেসে,
চকিতে ফিরিয়া ক'য়ে কথা কানাকানি
পরাইলে সবে মালাখানি,
বুঝিলাম তোমার এ ফিরে চ'লে যাওয়া,
বিষাদে এ বিদায়ের মায়া,
এ যে পূর্ণ অনন্ত মিলন—
ভ'রে রাখা মন।
এ শুধু বিয়োগস্তব্ধ দ্বারে
পিছে রেখে আসা সিন্ধুপারে,
ফেলে আসা শুষ্ক পুষ্পহার,
সাজানো এ মালাখানি দিয়ে নব প্রণয়-সম্ভার।

রাত্রিশেষ মিলনের মালা
তোমারি উত্তরী গন্ধ ঢালা
দিবসের তাপক্লান্ত পরাণবঁধুরে
সুধাস্পর্শে সুখস্বপ্নে মুগ্ধ রাখে অনন্ত মধুরে
সন্ধ্যার পূর্ণতা পরে ফিরাইয়া আনে
তোমারে আমারি হিয়া পানে।
এই পাওয়া, থাকা পথ চেয়ে
গোপনে যে ভরেছে হৃদয়ে
নিত্য নব ঐশ্বর্যের দানে
অমৃতের ধ্যানে;
এই তো অমর্তলোকে চিরদিনকার
ফিরে পাওয়া বিরহেতে রাত্রে বারবার।

চাওয়া পাওয়া

কি চাব তোমার কাছে? দাও নাই সুখ,
হয়েছে বিমুখ
বৃথা অন্ধ অন্তরের মত্ত ব্যাকুলতা,
যত কথা
উঠেছিল পরাণে গুঞ্জরি'
সব ঝরি'
আশার কানন গেছে ভরি'।

মেলিয়া নয়ন
দেখি গত রজনীর বিফল চয়ন
শুকায়ে রয়েছে এক সাথে;
আজ প্রাতে
প্রেম তারে ভুলে গেল ছুঁয়ে,
পেল প্রাণ ভুঁয়ে;
ফিরে নিলে সেই মালা মাথাখানি নুয়ে।

কি চাব তোমার কাছে? কথা কও নাই,
আমি তাই
তোমার সে নীরবতা এ প্রাণ ভরিয়া
গানরূপে নিয়েছি গড়িয়া;
সেই সব
রহিল নীরব
অতল-মরণ-স্নিগ্ধ দৃষ্টি মহোৎসব।

তোমার সে গান
পেল বুঝি অমৃত সন্ধান,
আজ তুমি নিজে
তোমারি চোখের জলে ভিজে
শুনিতেছ অপলক বসি'
আমারে পরশি';
মৌনতা মুখর হ'ল ও হৃদয়ে পশি'।

কি চাব তোমার কাছে? চাহ নাই ফিরে
একান্ত অধীরে
বিদায় লইয়া গেছ তুমি,
আমার এ ভূমি—
ছেয়ে গেল শ্বেত বালুকণা
ফুল ফুটিল না,
পর্ণে পত্রে শ্যামলিমা রহিল অজানা।

আজ নিশিভোরে
ঘুমায় অশান্ত ধরা মোহ নিদ্রাঘোরে,
আঁধারের পানে
শুকতারা মৃদু হাসি হানে;
অলক্ষিতে তব পিছু চাওয়া
ভ'রে দেয় তারাদলে মায়া
সেই তো তোমার দিঠি, পুষ্পকুঞ্জে তোমা ফিরে পাওয়া।

কি চাব তোমার কাছে? ছিনায়ে আপনি
নিয়ে গেছ মুক্তিলিপিখানি,
নিয়ে গেছ হৃদয় তোমার
অতি গুরুভার।
দাবি তার না রেখেছ, না রেখেছ দায়;
মুক্তির বিদায়
দিয়াছ যে তুমি আপনায়।

প্রেম নিরঞ্জন
তোমার নয়নকোণে কি দিল অঞ্জন,
তোমার সে মুক্তি হোমানলে
মুক্তিরে দেখিতে পাও বন্ধনের দৃঢ় পাশ ব'লে,
আস ফিরে হেসে,
তোমারি সকাশে
তব সর্ব্ব নিষ্ঠুরতা প্রেম হ'য়ে শুধু ফিরে আসে।

একান্তে

আজো যে পড়িছে মনে। এমনি আঁধার
আরো কোন সন্ধ্যাবেলা রোধি' গৃহদ্বার
একান্তে বসিয়া তোমা ভাবা, চুপে চুপে
নাম লয়ে খেলা, সাজাইয়া দীপে ধূপে
স্মৃতিরে দেউল করা, সহসা ব্যাকুল
চকিতে চমকি' ওঠা মানসের ভুল
তাও ভালো লাগা; শুধু অকারণ সুখে
ভ'রে যায় মন। আজো ধীরে নতমুখে
কাঁদি' ফেরে গোধূলির আলো। সিক্ত বায়
মেঘের অলকে খেলি' কারে বুঝি চায়
মদির মন্থর, অন্য মনে থাকি' থাকি'
উদাসিয়া দেয়া ডাকে; বসিয়া একাকী
অনুভব করি সবি। শুধু সংগোপনে
তোমার প্রতিটি কথা রহে জুড়ি' মনে।

কিশোর প্রেম

হয়তো কখনো তুমি অবুঝ নিমেষে
হেরিবে পশ্চাতে ফিরে কালস্রোতে ভেসে
গেছে চ'লে প্রেমের কৈশোর লীলাময়,
সেই ক্ষণ-অবকাশে প্রীতি-বিনিময়,
মুগ্ধ আলাপন শত, খেয়ালের খেলা;
আজিকার এই ম্লান সায়াহ্নের বেলা
তব স্পর্শমণিটুকু এ জীবন মাঝে
অনন্তের ধনরূপে গৌরবে বিরাজে—
সেই শ্রেষ্ঠ সত্য মোরে।

তার পরে আর
হয় নি এ হিয়ে নব মাধুরী সঞ্চার
নব অভ্যুদয়; আত্ম বিকাশের পথে
সম্মুখে চলেছ তুমি জীবনের রথে,
তবুও তাকাবে ফিরে—উৎকণ্ঠিত হিয়া
তাই সে কৈশোর দ্বারে রহি প্রতীক্ষিয়া।

বিদায়

পূর্ণ করি' সারা মন ঘন কালো মেঘ,
দাঁড়াইয়া বিদায়ের তীরে
আনি নাই আজ সাথে বর্ষণ আবেগ
দেখা হবে শুষ্ক অশ্রুনীরে,
কহিব না কোন কথা, কাঁপিবে না চোখ,
এই শান্ত নীরবতা তাই জয়ী হোক্;
সহসা কাতর হিয়া নাহি পড়ে লুটে,
নাহি যেন আসে চোখে জল,
তোমার অশোক ধৈর্য তাও যদি টুটে
সেই রবে আমার সম্বল।

হয়তো লভিতে কারে সাধ হবে ভুলে
বসন্তের স্পন্দনের সনে,
কি জানি কাহার লাগি' মধুরে ব্যাকুলে
মৃণাল ফুটাবে কাঁটা মনে:
যাহারে চাহিতে এত ভাবিয়ো না তায়,
শ্রান্ত হিয়ে বসিয়ো না রুদ্ধ বেদনায়,
তবু যদি আমারেই চাও অকারণ
পাবে না তো এ জীবনে আর,
পারিলে মনেরে দিয়ে প্রবোধ বারণ,
করিয়ো না আশার সঞ্চার।

সংসারের সার রত্ন তুমি রবে দূরে
মাঝে রবে বিস্মৃতির দেশ,
কি হবে সে বিচ্ছেদেরে গাহিয়া মধুরে,
হয়ে যাক্ কবিতার শেষ
আমার বর্ষায় বারি যা গিয়াছে দিয়ে
তা যদি শ্যামল রাখে তোমার ও হিয়ে
অসীম সৌভাগ্য মোর—হেমন্তের দিনে
শ্যাম শোভা ভরিবে ভুবনে,
সে দিন হয়তো তুমি আমারেও বিনে
পাবে মোরে মধুগন্ধী বনে।

শুধায়ো না কোন্ প্রাণে রব আমি একা
কেমনে কাটিবে মোর দিন,
চেয়ো না জানিতে কিছু, তব শেষ টীকা
থাকুক বিষাদরেখা হীন;
আমারে যা দিয়েছিলে শেষ অবসান,
নীরব প্রশান্তি প্রাণে তুলেছে আহ্বান,
লিখেছে অনল দিয়ে সাধনার নাম,
নিরুপম সুখ দেছে ভ'রে,
অন্তর বেদনা মোর লভে পরিণাম
প্রিয় নামে অনন্ত আখরে।

সম্বল

বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বায়
যদি ভারী হ'য়ে আসে স্মরিয়া তোমায়,
যদি কভু বিরহার্ত হৃদয়ের ভার
ভুলে যেতে চায় তবে বসন্ত সন্ধ্যার
সীমন্ত সিন্দূর রাগ—সে হৃদয়খানি
দূরান্তরে ভরাইব সাধনার বাণী
গুঞ্জরিয়া। যতটুকু তব স্পর্শ ডালা
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা
জীবন ভরাতে পারে শুধু সে টুকুরে
যদি পাই,—তার বেশি ব্যথাহত সুরে
চাহিব না প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও,
যা বরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও
জ্বলিবে অনল হ'য়ে তুমি দিয়ো তাই—
সে আগুন ছানি' আলো লভিব সদাই।

আলো

আলো রূপে চিত্ত জুড়ে ছিলে একদিন।
আজিকার উচ্ছ্বাসবিহীন
সন্ধ্যার ম্লানিমা
তারে ঘিরে দিতে চায় অকারণ সীমা,
টেনে দিতে সোনার বিস্মৃতি,
সেদিনের গীতি
ভ'রে ছিল যে পূর্ণ আকাশে
শূন্য রূপে দেখাইতে তারে অবিশ্বাসে।

তুমি তাই আসন্ন আঁধারে
পাতো নি আসন তব বর্ণচ্ছটাহারে,
বিফলে করুণ ক'রে তোলো নি প্রদোষ,
করো নাই রোষ;
এড়ায়ে তমসা স্তব্ধ, ক্লান্ত কোলাহল
শোভিতেছ দীপ্ত ঝলমল
প্রসন্ন পুলকে
অশ্রুর কালিমা হ'তে বহু উর্ধ্বলোকে।

বিপ্রলব্ধা

এ প্রেম আমার
আপন ঐশ্বর্য ভার
কার হাতে দিয়েছিল তুলে?
আজ খালি ভুলে
কেন বারে বারে ভাবি মিছে সবি মিছে,
চাই ফিরে পিছে,
নিয়ে যাই ফিরায়ে আবার
এ প্রেম আমার?
স্বভাব-বৈরাগী
ছিল না সে জাগি',
চায় নি ফুটিতে,
পারে নি বাসন্তী বায়ে দুলিয়া লুটিতে—
কেন তুমি এলে
তোমার ও স্বপ্ন-পাখা মেলে,
মায়া স্পর্শে প্রেমসাধনায়
জাগাইলে তারে বেদনায়?

কেন তুমি এলে
কুঁড়িটিতে মধুগন্ধ ঢেলে?
কেন বা ভুলালে
কোন্ কালে
যারে কেহ জানে নাই, পড়ে নাই কাহারো নয়নে—
তোমার চয়নে
কেন তারে নিলে
টানিয়া নিখিলে।
তার পরে অলস বেলায়
উদাস হেলায়
এই শাখে, এই পুষ্পে, তৃণে
দিনে দিনে
যত রস যত বারিকণা
পড়িল না
কে রাখিল খবর তাহার,
এ প্রেম আমার?

হায়
এ কি সত্যি, প্রথম উষায়
যে গুঞ্জনধ্বনি
সোহাগেতে পল পল গণি'
কানেঁ কানে
অবিরাম ভরে গানে গানে,—
এ কি সত্য, মধ্যাহ্ন বাতাস
ফেলিলে নিঃশ্বাস
স্তব্ধ হয় তাও?

এ কি সত্য, হায়, এও কি উধাও
হইবে নিমেষে?
কভু ও কি বলে নি সে
আমি চুপে চুপে
বার বার সত্যে দীপ্তরূপে
আসি ফিরে আসি,
কত শ্রান্ত প্রহরেও এই সাধা বাঁশি
কখনো থামে নি
দিবস যামিনী?
যে মধুর বাণী
কহিতে চাহ নি কানাকানি
শুধুই পরশে
জানায়েছ গোপনে হরষে
তা কি হবে শেষ?
প্রতিটি নিমেষ
অনন্ত করিয়াছিলে যদি
নিরবধি
তাহা কি রবে না?
আর কানে কখনো কবে না—
আমি ছিনু, আমি আছি, চিরকাল থাকি;
এ বিশ্বে একাকী
নিশীথের বায়ে
মরিতে হবে না তোমা বিফলে দুলায়ে,
আমি আছি তব চারি পাশে
আকুল বাতাসে?
এই থাকা, ক্ষণিকের থাকা
এ কি ফাঁকা?
নাই সত্তা এর?
নিমেষের
অরূপ সুন্দর থাকা, এ কি মিথ্যা হবে?
তোমার উৎসবে
এতটুকু ঠাঁই আর নাই?
তাই
এ ও কি ভুলিয়া যাবে? প্রীতি বরণের
এ জাগরণের
কথাটুকু ভুলে যাবে শয়নে আবার,
এ প্রেম আমার?
এ কি স্বপ্ন খেয়ালের সুখে?
আমার সমুখে
যে ধ্রুবতারাটি,
অমৃতের যে উৎসধারাটি,
এই সুখ, এই তৃপ্তি পাওয়া,
তোমা পানে চাওয়া

সবি স্বপ্ন? তাই হবে বুঝি,
মিছে সেথা খুঁজি,
আমারি মানস মূর্তি—নও কিছু নিজে,
তুমিও স্বপ্ন যে।

পরিচয়

আজিকার এই স্তব্ধ উচ্ছ্বাসবিহীন
নিস্পন্দ চাহিয়া থাকা আকাশের পানে
মুক্ত বাতায়ন পথে, নীলিমায় লীন
অসীমের অনুভব উদার আহ্বানে,
এই শান্ত পথটির ধূসর প্রসারে
লক্ষ্যহীন খেয়ালেতে উদাস নিমেষে
চকিতে চমকি' ওঠা, মনে হয় কারে
যেন দূরে হেরিলাম পরিচিত বেশে
এই শূন্য কক্ষকোণে নতমুখে ধীরে
ওষ্ঠেতে মিলায়ে যায় একখানি নাম,
নীরবে নিমীলি আঁখি স্মৃতিটুকু ঘিরে
অতীত জীবন তীর্থে চরম প্রণাম—

নিরুদ্ধ আমার যত অশ্রুর সঞ্চয়
তার মাঝে পাই তব পূর্ণ পরিচয়।

আমারে ভুলিয়ো

আমারে ভুলিয়ো,—যদি একা পথ পানে
চাও তবু মোর স্মৃতি মনে নাহি হানে
বেদনার কাঁটা, উৎসবের নিশা ভোরে
যদি বা জাগিয়া হের বিচ্ছেদের ঘোরে
শুধু জ্বলে ম্লানালোক প্রদীপে স্মৃতির।

কি হবে রাখিয়া মনে পরাণে প্রীতির
উৎস যদি যায় শুকাইয়া? কত বার
কত জন দিবে ডালি কুসুমসম্ভার,
ফেলিবে আপন ছায়া তোমার মুকুরে,
তার মাঝে দীন কোণে লুপ্ত প্রায় দূরে
পারিবি না রহিতে মলিন। দীপ্ত রূপে
না যদি হেরিতে পাও, উপচারে ধূপে
না যদি দেউল সাজে—নম চিরপ্রিয়,
মিছে রাখিয়ো না মনে, আমারে ভুলিয়ো।

অবিস্মরণীয়

আমারে ভুলিয়া যাবে তুমি?
বসন্ত চুমিয়া বনভূমি
যখন চলিয়া যাবে দূরে
বাজিবে যে মনে ঘুরে ঘুরে
এই ফুলে এই ফলে নাই
সেই শোভা রস রূপ; তাই
আঁখিপাতা কেন নেমে আসে?
সে কি তবে মোরে ভালোবাসে?

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে মন আবরিয়া,
মেঘের ডমরু গুরু রবে
আকুল অবশ তনু হবে,
গাহিবে বরষা ক্ষণে ক্ষণে,
তখনো যে পড়িবে স্মরণে,—
এ কি ব্যথা? এ কি বিফলতা?
এই কি মিলন চঞ্চলতা?

কোন দিন শরৎ শোভায়
আকাশের আধফোটা গায়
সহসা কাঁদিয়া বহি যাবে
মেঘরেখা ছল ছল ভাবে,
তখনো আমার কথাখানি
বাতাস বহিয়া দিবে আনি';
ভুলে যাবে কি করিয়া মোরে
স্মৃতি ধারা প্লাবিত এ ঘরে?
মোরে তুমি ভুলিতে পার কি?
থেকে থেকে হৃদয় পুলকি'
ফুটিবে যে পুষ্পদল প্রায়,
অনুরাগ দোলা দিবে তায়,
থেকে থেকে বসন্ত প্রলাপে
দুটি শাখা পরশিয়া কাঁপে;
তব চিত্ত মাঝে দিবা যামী
ভুলিবার অতীত যে আমি।

মনে রেখো

বলেছিলে মনে রেখো তোমার আঁখির নীলাম্বরে
বিদায় মেঘের ছায়া পড়িল যখন। মন ভ'রে
শুনেছিনু দুটি কথা আকুল সহস্র বাণী যবে
বক্ষ ভেদি' মাথা ফাটে পাষাণ দুয়ারে। সগৌরবে
রুধেছিনু তারে। তার পরে সেই দুটি ছোট কথা
অহরহ মনে আসে, সমুদ্রের কল্লোলের ব্যথা
সাথে ল'য়ে, অনন্ত অম্বরে নীলনিদ্রা করুণতা
কত ছেয়ে গেল তারে, প্রতি উষা হাসি' অরুণতা
দিল তারে স্পর্শ করি', প্রতি সন্ধ্যা সীমন্ত-সিন্দূরে
রাঙায়ে দিয়েছে মোর মধুমৌন পরম বন্ধুরে।
কত স্বপ্ন কাঁদে তারে ঘিরে; কত সুখ কল্পনায়
গাহে সে যে প্রদোষ আঁধারে, কত মূক বেদনায়
ধ্বনিছে আহ্বান তার। এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো—
মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো।

ভুলিব না

ভুলিব না আমি হেথা যত দূর হ'তে বহুদূরে
ভেসে যাই অকূল পাথারে, যত উদাস বিধুরে
ক্লান্ত আঁখি মেলে থাকি পশ্চিমের পানে। পলে পলে
আরো দূরে যাই চ'লে; নিতি হিয়া জাগিছে বিফলে,
কতদিন তাকায়েছি প্রাচীন পূরবে কার লাগি';
উন্মনা আঁধার রাতে চমকিয়া কতবার জাগি
কার ডাক এলো ভাবি।

হেথা দিন কাটে না আমার,
দিবা রাত্রি কল্লোলিয়া কাঁদি' যায় অতল পাথার
বিরহী হিয়ার দ্বারে দ্বারে। সারাদিন ক্লান্ত মনে
নীরব নীলের স্বপ্ন মিশে যায় অশান্ত ক্রন্দনে
অব্যক্ত অসীম শূন্যমাঝে। হোথা বিবশ ব্যাকুল
ভরিছে দিনান্ত বেলা ক্লান্ত রবি ম্লানিমা আকুল;
নাহি তীর, নাহি তরী, নাহি আশা শুধু, চিরপ্রিয়,
আজ তুমি ধ্রুবতারা, অন্ধরাতে তুমি না ভুলিয়ো।

রাখী

উষার অরুণরাগ সন্ধ্যার আরক্ত লাজ ছানি'
লাবণি মিলায়ে ল'য়ে হৃদয়ের প্রস্ফুট কোরকে
মৌনতার মধুমাখা পরিপূর্ণ প্রণয়ের বাণী
আনন্দসুন্দর মন্ত্রে এই হেথা সৃজিলাম তোকে।

জীবনের ধ্যানখানি তারে রূপ পারি না যে দিতে,
ভাষা যে ডুবিয়া যায় আঁখির অতলে:
দিগন্ত আভার মত রাঙাইয়া সুতার রাখীতে
বিকশি উঠেছে প্রেম অরবিন্দ দলে।

ধরিত্রীর নিত্য কাজ পথে ছোটা, অবসর নাই,
তার মাঝে কেহ না তাকায়
একটি আকুল হিয়া কার পানে চলেছে সদাই,
বিশ্বময় লুটাইতে চায়।

যার পরিচয় নাই পুষ্প প্রান্তে শিশির মতন,
যে সৌরভ অকারণ তারে
কেহ খুঁজিবে না কিছু কোথা তার তৃপ্তি নিকেতন,
সাজাবে না সৌরভের ভারে।

তাহারে বাঁধিতে হবে, ভরিতে যে হবে চিরদিন
জড়াইয়া বাঁশির নিঃশ্বাসে,
কালের প্রবাহে ভাসি যায় সবি চ'লে উদাসীন,
মরি আমি উৎকণ্ঠিত ত্রাসে।

একটি মুগ্ধ স্পর্শ কেবা মোরে দিল উপহার
অনন্ত অক্ষয়—
ওরে রাখী, এ জীবনে তুই থাক গোপনে তাহার
হাতের বলয়।

মোর দেশ দূর
পূর্ণিমার আলোক সেতুর
শুভ্রতা রচেছে যার এ বন্ধন, নব পরিচয়,
সেথা জাগিবে আজি পরম বিস্ময়
হেরিয়া আমারে
যে আমি ছিলাম মৌন বিস্মৃতির পারে।
তার দৃষ্টিখানি
লভিবে নূতন দীপ্তি এ আলোক ছানি'
পরিবে সে নববাস, তার তৃপ্ত হাসি
নভ প্লাবি' উঠিবে উচ্ছ্বাসি';
তবেই তো রাত্রি পাবে সীমা—
এ রাখী পূর্ণিমা।

বন্ধন পরায়ে দিনু। পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদ
হাসিল মোদের 'পরে, চারি চক্ষে অতুলন সাধ
ফুটিল সপ্রেমে। তার পরে এত মাস বর্ষ মাঝে
তেমনি পূর্ণিমা আসে, স্মৃতি জাগে; কত বুকে বাজে
আশার তরঙ্গ দোলা; শুধু আমি দূরদূরান্তরে
সেই শুভ্র দুটি হাতে রক্ত রাখী সে মিলন স্মরে
গাঁথি কল্পনার মালা; সে রাত্রির অনন্ত বন্ধনে
আমি-ই রহিনু বাঁধা—হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে।

স্বপ্ন

শুধু
বুঝি স্বপ্ন মধু?
স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় আর?
এই খালি তারে ভাবা, পিছে বার বার
পথ পানে চেয়ে থাকা, সুনিভৃত ক্লান্ত অবসরে
চমকি' চাহিয়া ওঠা, খুঁজে মরা জীবন দোসরে?
আমারে স্মরিছে চোখে অশ্রুযূথী ল'য়ে,
রাখিয়াছে চিত্ত কিশলয়ে
মোর নাম লিখি
সে কি?
সে কি
উঠিবে চমকি'
ত্রস্ত লাজে নিরাশা সায়রে
চকিত বিদ্যুৎ সম ঘন মেঘ স্তরে
হেরিয়া আশার দীপ স্মৃতির আলোকে? ক্ষণিকের
মায়া তাও ভালো লাগে, ভালো লাগে সকল দিকের
শ্রান্তি জ্বালা ভুলে থাকা স্বপ্ননীড়টিরে;
তাই ব্যর্থ নভ হ'তে ফিরে
কুলায় প্রত্যাশী
আসি।

একা

বুঝিবে না—বাতায়নে কত দীর্ঘ অসহ রজনী
একা ব'সে ব'সে হায় অসহায়ে পল পল গণি
কাটিতে চাহে না আর; ঘুমঘোরে উদাস অবনী,
উদাসী তুমিও। কেমনে জানিবে বল
সারা রাত্রি মেঘ বারি অশান্ত চঞ্চল
করে খেলা, বিফলে জাগায়
সুপ্ত মোর সে আশারে হায়,
বিশ্বে আনে টানি'
স্তব্ধ মোর বাণী,
রানী।
আঁখি
মুদে রাত, ডাকি'
যায় থাকি' থাকি'
ঝিল্লীদল, যায় দূরে মিশে
প্রতীক্ষার প্রতিটি নিমিষে
দীপরেখা; এ জীবন একটি যামিনী
গভীর তিমিরময়; শিথিল কামিনী
ঝ'রে যায়, তারা ডোবে, বাদল কাজরী ওঠে মাতি'
ব্যাপিয়া আঁধার; মনে বোঝাপড়া করি, ওগো সাথী,
তব সনে। কত পরে পূর্ণ হবে উপাসনা রাতি?

সংসারাতীত

ভাবিয়াছিলাম
তব বক্ষে আজ মোর নাম
রেখে যাব চিরদিন তরে,
এ জীবন ভ'রে
ধ্বনিবে তোমার কানে কানে
ছন্দে গানে
আমার এ নাম; তব ত্রস্ত আঁখি
থাকি' থাকি'
উঠিবে চঞ্চল হয়ে তিমিরের তলে,
চকিতে রহস্যভরা পলে
দেখিবে ক্ষণিকা
মোর নামে জ্বালা দীপশিখা।

সেই লগ্ন যদি নাই এলো,
আকুল চৈতালি স্বপ্ন যদি বা মিলালো,
বসন্ত মঞ্জরী সাথে
রক্তিম হৃদয়ে রচা পাতে
এ পত্রটি পাঠাইনু তোমার উৎসবে—
প'ড়ো তাই নিশান্তের স্বপ্ন তব ভঙ্গ হবে যবে।

লিখিলাম,—
এ মুহূর্তে এই লভিলাম
তব মনে ঠাঁই;
সদাই
যাহা করিয়াছি দান, গাহিয়াছি নিজে
আমারি চোখের জলে ভিজে,
সে যে আজ তোমার বিপিনে
আকম্পিত তৃণে
আছে জাগি' আকুল চঞ্চল,
তব প্রেম-পল্লব অঞ্চল
এই মোরে স্মরে
অশ্রান্ত মর্ম্মরে।

আমি কিন্তু হেথা আর নাই,
মোরে ঠাঁই
দিয়াছে যে নিখিলে বিধাতা
কণ্টকিত ধূলিশয্যা পাতা।
যা পেয়েছি আমার হৃদয়ে
উৎকণ্ঠিত হয়ে
সব দিছি তব হাতে তুলি';
মোর লাগি' ধূলি
রেখেছে দেবতা,
কখনো আমি কি তা
ভয়ে ভুলে ত্যজিবারে পারি?
আমারে যে দিতে হবে পাড়ি
কাল বৈশাখীতে,
বসন্তের দোলা দেওয়া গীতে
দক্ষিণ পবনে
সুখসুপ্তি অলস স্বপনে
কি হবে আমার
প্রণয়ের কুসুমিত ভার?
আছে জেগে বৈশাখের তীব্র জ্বালা দীপ্ত ভয়ঙ্কর;
মিলনের ছায়াঘেরা ঘর—
সেথা হ'তে এসেছি বাহিরে
সামান্যের ভিড়ে,
গেছি ভুলে আনন্দের হাসি,
পরেছি যাচিয়া গলে অশান্তির ফাঁসি,
কর্ম্মময় শ্রান্তিপূর্ণ আমার জীবন
কোন্ স্তব্ধ ক্ষণ
নিঃশব্দে ছাড়ায়ে গেছে প্রেমের প্রভাতে
আজি এই বিচ্ছেদের রাতে।

ডাকিয়ো না,—'পান্থ, ফিরে চাও'—
অতিথি তোমার দূরে হয়েছে উধাও
মাতিতে দুঃখের সাথে রণে।
দৈন্য যেই ক্ষণে
দেহে মনে সংসারেতে হতাশার শ্বাস
রেখে যাবে, ধূলিলিপ্ত বাস,
ভালো লাগিবে না কিছু আর,
সেই ক্ষণে মনে হবে বৃথা এ সংসার;
বিরলে ভাবিব এ জগৎ
কত দীর্ঘ কন্টকিত পথ
আশা ছায়াহীন,—
যাতনা সহিতে হবে রুদ্ধ ওষ্ঠে দৃপ্ত উদাসীন,
কেহ থাকিবে না স্বপ্নে বাড়াইতে হাত,
অসন্তোষে রাত
অনিদ্রায় কেটে যাবে শূন্য নিঃস্ব ম্লান,
পরাজয় ব্যথা অপমান
ভ্রূক্ষেপে ভুলিতে হবে, আপনারে দিতে হবে বলি
প্রত্যহের ক্ষুদ্রতায় হাসিমুখে মিলায়ে সকলি,
কহিতে পাব না কিছু খুলে কারো কাছে
একাকী থাকিতে হবে; বাহিরে কে সান্ত্বনা বা যাচে?
বক্ষে ক্ষুধানল লয়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাতে এ অচেনা
পথ প্রান্তে লুটাইবে; কেহ থাকিবে না
স্নেহ প্রেমে শুধাইতে তুচ্ছ মোর নাম।
—এই লিখিলাম।

স্বপ্ন গেছে টুটে;
ছিন্ন সূত্রে মালা তব ধূলিতলে লুটে,
সেই ক্ষণে থাক যদি দূরে—
পরাণ বন্ধুরে
হয়তো রবে না মনে, হয় তা চকিতে
কভু অলক্ষিতে
ইচ্ছা হবে আমারে ফিরাতে
সেই স্তব্ধ বিরহার্ত নিরুপায় রাতে,
ফিরাইতে তোমার হৃদয়ে
উৎকণ্ঠিত হয়ে।

কোথা দূরে তব স্নিগ্ধ মিলন আগার?
এ হৃদয়—এ তো শুধু শুষ্ক পত্রভার,
দিয়েছেন আমারে দেবতা;
তব মন বিনিময়ে আমি কিন্তু তা
দিতে নাহি পারিব তোমারে।
কত সুখে যারে
ফুল দিয়ে সাজায়েছি আজ পূর্ণিমায়
কাঁটা দিয়ে সাজাব তোমায়?

আমার এ ভরা দুঃখ কর্মের পশরা
সর্বসুখহারা
রহিল আমারি; তোমার নিকুঞ্জে
ঘন পুষ্প পুঞ্জে
যে সৌরভ তার মাঝে স্মরো এই নিষ্ফলে,
আপনি তা হলে
মোর সাথে দেখা হবে সুখে বার বার
সংসারের সীমার ওপার।

আষাঢ় দিবসে

প্রতি বর্ষে এই দিনে মেঘম্লান আলোকে আঁধারে
ফিরে আসি দূরান্তরে তোমার জীবনে নবদ্বারে
সাগ্রহে রভসে আশে. কাব্যলোকে শ্যাম বীথিকায়
বেতস নিকুঞ্জ তলে ক্বণিত নূপুর শিঞ্জি'পায়
আস যেথা প্রিয় অভিসারে। তোমার পৃথিবী হ'তে
নির্বাসিত কবি দূরে তব কেশ সৌরভের স্রোতে
পথ খোঁজে সারা বর্ষ; মনে মনে করিতেছে ধ্যান,
মেঘ উত্তরীয় প্রান্ত নভোতলে মুছে ব্যবধান।

আত্মসমর্পণ আশে শেষ করি' দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
এড়ায়ে অতীত অশ্রু আনিলাম পুষ্পিত শাখায়
মৌন প্রীতি অভিজ্ঞান। আজিকার আষাঢ় দিবসে
তোমার ও বল্লীকুঞ্জে যেথা তম মূরছে বিবশে,
সশরীরী হে বিদ্যুৎ, উদ্ভাসি পরশো তারে; যদি
ভালো লাগে লহ মোরে মোর শেষ অণুটি অবধি।

নব মেঘদূত

তৃপ্তিহীন কত সাধ আশা
বাদলের মিনতি আকুল
বক্ষতলে পাতিয়াছে বাস
বাসনার বিকচ মুকুল।
আমার জীবন' পরে কার
অতল সলাজ নত আঁখি
রাখিয়া গিয়াছে জলভার
মেদুর মেঘের ছায়া আঁকি'।
যাহার জীবন হ'তে মোর
সাতটি সাগর ব্যবধান
পাঠাল সে কি এ স্মৃতিডোর
রচিল মনের সেতুখান?

সে আজ পাঠাল মেঘে লিপি
ভুলিয়া ছিলাম যারে ভিড়ে,
আমার ভাবনা মরে কাঁপি'
তাহারে, তাহারে শুধু ঘিরে।

পথিক মেঘের হাতে দিয়ে
পাঠায়েছি মনটি আমার
বেদনায় তাহারে জাগিয়ে
বেজে যাবে বাদল ধামার।

হাজার লোকের মাঝে থেকে
সেই খালি বুঝিবে এ বাণী,
চপলা চমক দিয়ে চোখে
স্মরাবে আমারি কথাখানি।

সব কাজে সুখেতে দুখেতে
তার গলে যে মালা জড়ানো
তার প্রিয় পরশে বুকেতে
জাগিবে যে মিলন হারানো।

যুক্ত করে আমারে চাহিয়া
সংসারের আকাশের পানে
তাকাবে সে; কপোল বাহিয়া
বিন্দু অশ্রু ঝরিবে, কে জানে!

অন্ধকারে পথরেখা লীন,
নদীতট ছল ছল করে,
ছায়ালোকে দিবস মলিন
মুদি' আঁখি পুলকে শিহরে;

দিগন্তর কহে কত কি যে,
রুদ্ধদ্বার গৃহগুলি দূরে,
মৌন যত পথগুলি ভিজে,
বৃষ্টি পড়ে সশঙ্কিত সুরে।

বাঁশবন থর থর কাঁপে
দীপশিখা নিভে বুঝি আসে,
হাত তুলে গাছগুলি ঝাপে
ডাক দেয় বাহিরে বাতাসে।

সারা সন্ধ্যা রহিয়া রহিয়া
দোহা লাগি' করি আতি পাতি,
অধীর ব্যাকুল দুটি হিয়া—
একেলা কাটে না সারা রাতি।

যে পথে পাখিরা নাহি চলে
এলোচুল মেঘেরা ছড়ায়
যার পাশে কাশবন দুলে,
তৃণশিখা যে পথ ভরায়;

যে পথেতে নীপের অঞ্জলি;
যেথা ডাকে উতলা কলাপী;
ওঠে শ্যাম তমাল চঞ্চলি'
সে পথ ব্যথায় রহে ব্যাপি'!

বাতায়নে দুটি হিয়া চায়
মেঘম্লান সুদূর আকাশে;
দেহসীমা পলকে হারায়
দুটি মন দোহা ভালবাসে।
বিশ্বজুড়ে বেদনা লুটায়
মেঘ মুছে দেয় ব্যবধান;
একেতে দু'জন মিলে যায়—
সারা রাত্রি কাজরীর গান।

চিরদিনের সুর

বহু আগেকার প্রেম এই পূর্ণ ব্যাকুল নিশীথে
বার বার ফিরে আসে সুপ্তিহীন বাদলের গীতে,
স্মরায় হারানো দিন। সে সময় ছিল যেই গান
তারালোক হ'তে লুটে আনে ফিরে তাহার সন্ধান,
দূর জন্মান্তর ভেদি' সেদিনের পরাণ বধূরে
সাজায়ে আনিয়া দিল মোর পাশে পুরাতন সুরে।

যুগে যুগে পরাইনু তার গলে যে মল্লিকা মালা,
সোহাগে ঢাকিয়াছিনু উত্তরীয়ে মধুগন্ধ ঢালা,
যে ভাষায় ডাকিলাম কানে কানে মৃদু হাতে ধরি',
যে ডাকে পরাণ ছাপি' উথলিল তার হিয়া ভরি'—
সে মালা নবীন হ'ল, অনুরাগে রাঙা উত্তরীয়,
সে ভাষায় সেই ডাকে সাড়া দিল মোর কানে প্রিয়
পুরাতন প্রেমে। এমনি অনন্তকাল বারে বার
বেজেছে বাদল সুর পুরাতন চিরদিনকার।

বন্ধু

বন্ধু, এখন চ'লে যাবে তুমি দূরে
সাঙ্গ হবে যে দুদিনের হাসি-গান,
পারিব না আর রচিতে স্বপ্নপুরে
যে সুখ রাত্রি হয়ে যাবে অবসান;
বেদনা ঘনায়ে আসিছে ভুবনে নত,
এমন আলোক আসে নি জীবনে শত,
ক্ষণিকের খেলা বসন্ত'মায়া মত
পরশি' তোমারে মিলাইয়া যাবে দূরে;
কি হবে স্মরণে মধু আবরণে বরি'—
বিদায় যে দিতে হবে সে জীবনবঁধুরে।

বন্ধু রে, কত সাধ আশা দিয়ে ঘিরে
সৃজন করেছি মোদের অমরাখানি,
কতবার ঢালি' হৃদয় সরসীনীরে
পুষ্পের মত ফুটায়েছি প্রেমবাণী,
গন্ধমদির অন্ধকারের তলে
বিধুর হেরেছি মধুর পদ্মদলে,
জীবন যমুনা অতল তিমির তলে
একটি চাঁদনী শতধা হইয়া লুটে,
সন্ধ্যা বন্দে মোদের মিলনটিরে,
ঝিল্লী স্বনিছে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে।

বন্ধু, মোদের উৎসব-সভা-গেহ
সজ্জিত ছিল তোমার আলোক দিয়ে,
আমি সেথা কবি; অন্তরভরা স্নেহ
মুগ্ধ শুনেছে আপন চিত্ত নিয়ে;
উষসী খুলেছে মাধুরী জড়িত আলো,
প্রদোষ ঢেলেছে তন্দ্রা জড়ানো কালো,
তার মাঝে সব লেগেছিল মনে ভালো,
মাধুরী জড়ায়ে অধীর হৃদয়ভার
তোমারে দিয়েছি, তৃপ্তি কমল মোর,
কল্পনা মালা নিয়েছ কণ্ঠহার।

বন্ধু, এ ভরা বিশ্ব নিঃস্ব করি'
লুটিয়া এনেছি সহস্র সুখরাশি,
মাধবীকুঞ্জ গুঞ্জনতানে ভরি'
মুখর করেছে মধুকর কত হাসি,
বকুল ফুটেছে আকুল সন্ধ্যাকালে,
ঝরেছে রভসে তোমার হৃদয়ে ভালে,
আবেশে বিকশি' কুসুমিকা মধু ঢালে,
তার মাঝে তুমি বসেছ, হেসেছ, প্রীতি
উৎস উথলি' সিক্ত করেছে মোরে,
মৌনে শিহরি' কাঁপিছে পাগল স্মৃতি!

বন্ধু, মোদের নাহি যে সময় হাতে,
যেতে হয় একা বন্ধুর গিরি দরী
পার হয়ে কত, থাকে না তো প্রিয় সাথে,
মিছে অন্তর মত্ত কাঁদিছে মরি';
প্রান্তর-পারে অস্তগিরির লালে
উদ্ভাসি' উঠে হৃদয় শোণিত ভালে,
ঊর্ধ্ব সাগরে একমনে পাখি পালে
গৃহপানে যায়, কেহ না তাকায় ফিরে;
এই তো জীবন! পৃথিবী সুদূরে রবে
আসিবে যখন দুঃখ ক্লান্তি ঘিরে।

বন্ধু, জান না হেথায় বিপুল নদে
নাহি পার কোথা, আলোকরশ্মি নাই,
ভেসে যেতে হয় অন্ধ শিথিল পদে,
যদি কোথা উঠে প্রাণের রত্ন পাই
তাও ত্যজে হায় উন্মাদ কালো জলে
ঝাঁপায়ে পড়ি যে নিঃশেষ আশা বলে,
এই কি জীবন! প্রিয় ধ্রুবতারা ব'লে
যাহারে চিনেছি তারেও ত্যজিয়া আসি;
শান্তির আশা উচ্ছ্বাস ভাষা কই?
মৃত্যু স্রোতেরে এতই কি ভালোবাসি?

বন্ধু, তবুও তোমাব পবশ রাগে
অমৃতবিন্দু প্রলেপ দিয়েছে অঙ্গে,
স্মরণ-সিন্ধু মথিয়া কেবলি জাগে
আমার যা কিছু লভেছি তোমার সঙ্গে;
নিভৃত হিয়ায় লেগেছে পুলক-দোলা,
তোমারি চিন্তা মরণ ক্লান্তি ভোলা;
তুমি নাই পাশে, নাই মৃদু কথা বলা,
একাকী বসিয়া ধ্যানেতে ভাবি যে মনে
যে জীবন আমি কাটিয়েছি তব সাথে
লক্ষ জনমে মিলিব কি তার সনে?

বন্ধু, কঠিন সংসার-মরুপথ
নাই ছায়া জল, আছে শুধু ব্যথা শ্রান্তি,
দেখা দেয় না তো নব মলয়ের রথ
শীতের ধ্বংস নাশিয়া ছড়াতে শান্তি;
বিছাইয়া গেছ তোমার কমলগুলি
ঢাকিয়া দিয়াছ ঊষর মরুর ধূলি
আমি সুখে তাই স্মৃতির মৃণাল তুলি'
রচিয়া লয়েছি স্বপন-শয্যাখানি;
আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব
দিয়েছ আমারে তোমার অমৃত আনি'।

পরম মুহূর্ত

এ মুহূর্তটিরে
আসা যাওয়া সময়ের তীরে
হারায়ো না বহুদূর বিস্মৃতির দেশে।
কাল কত ভেসে
কোথা যায় কে জানে ঠিকানা
স্বর্গ হতে আনা

এ মুহূর্ত্তটিরে
তিলোত্তম সাধখানি ঘিরে
রচেছিনু মনে
তোমার স্মরণে।

কত স্বপ্ন ভাঙে চোরে গড়ে,
কত সত্য ভিত্তিহারা ভূমিতলে পড়ে,
আমিই একাকী
যাই রাখি'
আমার সকল
যা কিছু দিবার আছে—তাই তো সম্বল।

বিশ্ব জুড়ে কত যাওয়া আসা,
নিত্য কাঁদা হাসা।
নিরাশার দুঃখ ক্ষতি মরণের ভারে—
চুপি চুপি এড়াইতে তারে
পাবি না যে; মুখরিত মহাকাল রথচক্রতলে
ছিন্ন ভিন্ন নিষ্পেষিয়া ফেলি' দিবে কোথায় সবলে;
মুছে যাবে এ পুরানো নাম—
তুচ্ছ পরিণাম!

ভুলিয়ো না তারে
কত বার তব কণ্ঠহারে
যোগায়েছি ফুল : তা সবার সেরা
প্রিয় নামে ঘেরা
এ কুসুম কোথা ফেলিয়ো না,
তারে ভুলিয়ো না।

পূর্ণিমা

এই কি তোমার প্রেম পূর্ণিমার কানে কানে কহ,
হে অন্তরচারী,
মিলনের স্বপ্ন শেষে বিচ্ছেদের রাত্রে অহরহ
গগনে বিহারি'
যে দূতীটি দেখা দিত, চলে যেত আশা জাগাইয়া
হাসিয়া নিমেষে
সে কি আজ দেখা দিল অভিসারে ব্যথারে দলিয়া
পূর্ণিমার বেশে?

চির তৃপ্তিবিহীনের অন্তরালে রহিয়া অদূরে
আর্ত্ত ব্যবধান
রচেছিলে সংগোপনে আপনি যে ছলিয়া বঁধুরে,

প্রাণে প্রাণে টান
খসাল কি তারে ভুলে তোমার এ আত্ম-নিবেদনে;
ত্যজি নির্বাসন
তাই কি আসিলে কাছে পূর্ণতার অসহ বেদনে,
অন্তরের ধন?

কূলহারা কামনায় শান্তিময় সুষুপ্তির পারে
তোমার সম্ভাষে
জাগে যে লহরী-লীলা হৃদয়ের কিনারে কিনারে
আলোকের ভাষে,
তোমার হাসির ছায়া আকাশেরে সাজায়ে অশেষে
রহিল না দূরে;
ধরা দেছ আপনায় মুগ্ধ রাত্রে অসীমের দেশে
মানস-মুকুরে।

বহুদিন প্রতীক্ষায় অবসানে এক রাত্রি দেখা
সোনার মন্দিরে
নিশান্তের অপরূপ তোমার এ রূপজ্যোতি লেখা;
হৃদয়ে বন্দীরে
তবু যে ত্যজিতে হবে শিশিরাশ্রু মুছিয়া গোপনে,
ক্ষণিকের খেলা—
এত কি মিছার দুঃখ রোধি যারে প্রভাতী স্বপনে
একান্ত একেলা!

এ পূর্ণিমা যাবে চলে, লুপ্ত হবে মধুর উচ্ছ্বাস
অমলিন প্রীতি,
কোথাকার বিন্দু সুখ কোথা যায় ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
শুধু জাগে স্মৃতি;
কেহ জানিবে না কিছু মিলায় যে উৎসবের বাঁশি
শ্রান্ত উদাসীন,
চরণরেখারে মুছে লুকাইবে অতৃপ্তিতে হাসি
পরিচয়হীন।

শুধু কতটুকু সুখ আশঙ্কায় উৎকণ্ঠ ব্যাকুল
কতক্ষণ তরে!
প্রতিটি নিঃশ্বাস সাথে কাঁপি' মরে মরম মুকুল
পলক ভিতরে।
কেমনে ভুলিয়া যাপি কোন্ প্রাণে সায়াহ্ন আঁধার
ক্লান্ত অবসরে?
বিধুর বাতাস বহি' আনে ঘন স্মৃতির সম্ভার
জীবন দোসরে।

সেও ভালো! শক্তি নাই লুকাইয়া অনির্বচনীয়ে
চাহি যে ঢাকিতে,
জীবনে আনন্দবিন্দু অনন্ত সে নিমেষের প্রিয়ে
পারি না রাখিতে;
একটি অমৃত স্পর্শ হৃদয়ের কুসুমকোরকে
বহিয়া সমীরে
চলিছে অম্বর পানে ভুলাইয়া দুঃখ ক্লান্তি শোকে
গন্ধসম ধীরে।

প্রত্যাবর্তন

আবার আসিনু ফিরে—দূরে যত অন্যমনে ঘুরি
তত মোর ছেড়ে আসা অনুপম প্রেমের মাধুরী
জাগায় আহ্বান প্রাণে, কানে কানে কয় মৃদুভাষে
চিনিতে আপনা, জানিতে এ যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে,
যে বাণী গোপন ছিল মুক্তার মতন অন্তরালে
স্বীকার করিতে তারে, বরণটীকার মত ভালে
বহিতে গৌরবে। তাই অরণ্যের পল্লব মর্মরে
দীর্ঘ দূর যাত্রাপথে কল্লোলিত অসীম সাগরে
বার বার খুঁজে ফিরি সুন্দরের স্পর্শ লেখাখানি,
সঙ্গীত আভাস তাব, পদচিহ্নটুকু; জানি জানি
তারি দেযা স্পর্শমণি এ ভুবনে অলখে বিরাজে;
তাহারে খুঁজিয়া মোর চির যাত্রা শেষ হ'ল না যে।
আবার আসিনু ফিরে তাই—ওগো তোমারে যে চিনি,
জীবনের কাছে তব স্পর্শ বিনা রয়ে যাব ঋণী।

মিলন

আবার ডাকিলে মোরে।
ভেবেছিনু সব হ'ল শেষ
আজিকার মত খেলা; নাহি রবে বিন্দুমাত্র লেশ
গত চিন্তা, সাঙ্গ কাজ, নিরুদ্ধ প্রয়াস—কোন ক্ষোভ
অকৃত কর্মের লাগি', অকথিত বাণী তরে লোভ
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তৃষা—নাহি রবে; অফুরান্ আশা
বাসনা বিভল হয়ে রবে না লুটায়ে; ব্যর্থ হাসা
মর্ম্মান্ত রোদন সাথে উঠিবে না ফুটে।

যাও ভুলে
তোমারে চেয়েছি কভু; অনায়াস ছলনারে তুলে
করো না বঞ্চনা আপনায়, মিছার কল্পনাজালে
রচিয়ো না সহচরে; তব অমলিন ভালে
দিয়ে যাই শেষ টীকা মোর।

এ মোর সান্ত্বনা নহে
ক্লান্ত প্রাণে ধূলিপথে অন্যমনে ভুল বোঝা ব'হে
উন্মুখ হৃদয়পদ্ম নিজ হাতে নাহি খোল যদি
অনন্ত নিখিলপুরে সযতনে; কাল নিরবধি
নিরুপায় প্রশ্নাতীত—তোমা হ'তে রচিল আড়াল,
দীপালী উৎসব দিল ঢাকি'! মাঝে ব্যবধান কাল
দেখিতে দিল না মোরে পূর্ণিমা রজনী, শ্রী হারায়ে
সে চাঁদ আঁধার কোলে থমকিয়া রহিল দাঁড়ায়ে—
মাঝে এল ছায়া।

আজ তুমি নাহি এলে। তবু জানি
একদা আসিবে ফিরে; সেই শুভ অনন্তের বাণী
পরাণ গোপন পুরে উঠিছে মথিয়া; সে সময়ে
এ নিমেষে অনিমেষে মিশিবে তাহাব সাথে। তুমি—
যে তুমি অনাদি হ'তে মোর তরে কত দেশ ভূমি
কত যুগ ধ'রে কত জন্ম ব্যাপি' কবেছ লঙ্ঘন,
যে তুমি সীমার মাঝে অসীমের অরূপ বন্ধন
নিলে পরি' গলে অনন্তের তরে ফিরি' অন্বেষিয়া
চির যুগ প্রীতিময় স্মৃতিপূর্ণ প্রত্যাশিত হিয়া
লয়ে ভুলি' আপনারে,—সে তুমি যে ভুলে আপনায়
আমি হয়ে আসিবে আমার কাছে, আমি যে আমায়
হারাব তোমার মাঝে।

সে দিনও যে ভুবন ভরিয়া
ভারে ভারে আয়োজন, পৃথিবীর সকল হবিয়া
তিলোত্তম রূপে সাজি' রবে সুর মন্দাকিনী নদী
তার 'পরে বাহিবে তোমার তরী, ভোগবতী যদি
চপল লীলার লাস্যে আসে মরুমাঝে হবে হারা,
মনের মাণিক্য মঠে পূর্ণ হবে ঐশ্বর্যের ধারা;
এসেছ কি আস নাই তারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ তব বাণী,
অনন্তেতে পরিপূর্ণ পাব তোমা—জানি, আমি জানি।

নবজন্ম

জীবন মৃত্যুর মাঝে তারা সম কাঁপিয়া কাঁপিয়া
কাটায়েছি কত নিশি আঁধার ব্যাপিয়া
সুখজ্যোতি হীন,
অসাড় রয়েছি ভুলে যোগনিদ্রালীন;
সহসা এ কি হ'ল—নূতন আলোক
পরিপূর্ণ করে বিশ্বলোক,
ঘুম ভাঙে, মোহ টুটে, মরণ নমিয়া সরে দূরে
সহস্র জীবনহীন আঁধার জগৎ ঘুরে ঘুরে
চেতনা যে এই লভিলাম
লহ এ প্রণাম।

অচল পাষাণ শৈলে কঠিন তুষার
গলিল কল্লোল রোলে, ছোটে পারাবার,
বাঁধন লুটায়ে পড়ে, ভয়ে কাঁপে শত দুঃখ ভুল,
প্লাবি' প্রাণকূল
তরঙ্গ দুলিয়া নামে তীরে তীরে ধ্বংসলেশ আঁকি',
মৃত্যুর তাপের দাহ নাহি নাহি বাকি,
পূরে মনস্কাম;
লহ এ প্রণাম।

স্বর্গ-মন্দাকিনী হ'তে ধারা ঝরি' ঝরি'
তুলিয়া লয়েছে পূত করি'
মুক্তিস্নানে মম উৎসমুখ;
তরঙ্গিত চঞ্চল এ বুক,
নিঃসীম নির্মল নীল ছায়া নিখিল গগনে
জয়যাত্রা ক্ষণে;
সন্ধ্যার গৈরিক রাগ, উষার উষসী স্মৃতিদীপ
ক্লান্ত ভালে দিল স্নেহটীপ;
মলিনতা মুছে ল'য়ে পূর্ণতায় প্রাণ হ'তে প্রাণে
ছন্দে গানে
আসিয়াছি নব মহিমায়।
রূপ হ'তে অরূপ সীমায়।
আঁধারের রাজ্য পারে আলো গাহে তব মন্ত্রনাম
লহ এ প্রণাম।

অতীত সঞ্চয়গেহে পূর্বজন্ম পদচিহ্নগুলি
লেপিয়া মুছিয়া ছিল হতাশ্বাস ঝটিকার ধূলি—
অবসন্ন স্মৃতিধারা হয়েছে মুখর,
মহাস্রোতে শূন্যতার ভরিল অন্তর;
সে সব অন্বেষি' ধীরে কত তাপ সহি'
এই তীরে এসেছি বিরহী;
কত দূর জন্মান্তর, নাহি জানা কত সিন্ধুপার
অপরিচয়ের পথে লঙ্ঘিয়া প্রাকার
হেথা আমি আসিলাম; এ কি মুগ্ধ শোভা
ক্লান্তমনোলোভা!
অনন্ত জীবন-স্রোত ঝরে গলি' গলি'
দিনু তাহে আপনা অঞ্জলি—
নব প্রাণ নব প্রেমে এই সঁপিলাম,
লহ এ প্রণাম
এ প্রাণের পূর্ণ পরিণাম।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত